শনিবারের চিঠি

৩২শ বর্ষ
রবীন্দ্র-সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৬৭
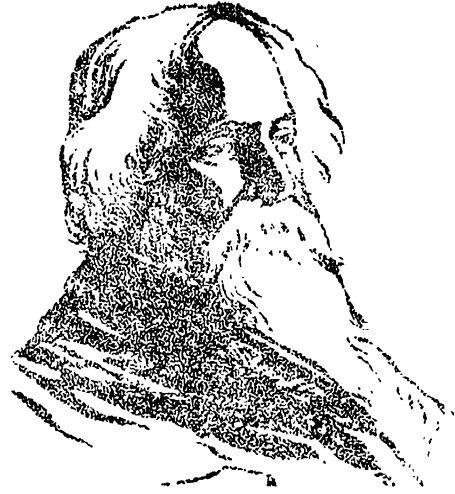
রবীন্দ্রনাথ

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

আর এক বছর পরেই রবীন্দ্রনাথের জন্মের পর একশো বছর অতীত হবে। সেই জন্মবার্ষিকীর উৎসব পালনের জন্য দেশে এবং অল্প কিছু বিদেশে প্রস্তুতি আরম্ভ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর মধ্যে জন্মেছিলেন সে সৌভাগ্যের কথা বাঙালীর মনে আজ বড় হয়ে না দেখা দিয়ে পারে না। বর্তমানে ভবভূতির 'বিপুলা পৃথ্বী' মানুষের কাছে ছোট হয়ে গেছে, এবং দিন দিন ক্রমশঃ বেশী ছোট হচ্ছে। এক মহাদেশের এক প্রান্ত থেকে, অন্য মহাদেশের দূর প্রান্তে পৌঁছতে মানুষের যা সময় লাগছে, পূর্বের তুলনায় তাকে সময় লাগছে না-ই বলতে হয়। আমাদের এই পৃথিবী এক ও অখণ্ড, এবং তাকে জুড়ে যে মানুষ তারাও এক ও অখণ্ড, মানুষের মনে এ ধারণা সৃষ্টি হওয়ার পরিবেশ আজ অনুকূল। কিন্তু এ পরিবেশ বিফল হবে ও বিকৃত ফল প্রসব করবে, যদি না সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এ সত্যদৃষ্টি লাভ করে যে মানুষের যে একত্ব তা নানা ভিন্নত্বের মধ্যে একত্ব। মানুষের একত্ব একতারার চড়া সুরে নয়, নানা সুরের বৈচিত্র্যের ঐক্য। মানুষের বুদ্ধি ও প্রতিভা একদেশে এক জাতির মধ্যে বড় যা সৃষ্টি করে, তা সব দেশের সব জাতির মানুষের পরম সম্পদ। এ সম্পদের বহুলাংশ সব দেশের সব কালের মানুষ অজ্ঞান ও অহমিকার মায়ায় অগ্রাহ্য করেছে ও আজও করছে। কিন্তু দেশ ও জাতির সৌভাগ্যের মাপ—তাদের দেশের ও জাতির মানুষ বিশ্ববীণার সুর-সঙ্গতিতে কেমন ও কত তার উপহার এনেছে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভা এ বীণায় যে বহু বিচিত্র সুরের তার উপহার এনেছে, বাঙালীর সে সৌভাগ্য আজ স্মরণ করার দিন।

স্বাভাবিক ভাবেই বাঙালীর মনে ঔৎসুক্য জন্মেছে পৃথিবীর নানা ভাষায় প্রাচীন ও আধুনিক কাব্যসাহিত্যের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির বিচার করতে। অল্প কয়েকজন বাঙালী রসজ্ঞ ও সমালোচক এ কাজ আরম্ভ করেছেন। এবং আশা করা যায় নানা ভাষার কাব্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় যত নিবিড় হবে, সে আলোচনা তত গভীরতর হতে থাকবে। নানা দেশের কাব্যের বিচার ও মূল্যায়ন আমরা নিজের বোধ ও রসজ্ঞতা দিয়ে করব. ভিন্নদেশী সমালোচকের বাক্য ও বিচার চরম

বলে মেনে কাজ সারব না। পৃথিবীর যেগুলি কালজয়ী কাব্যসৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের কাব্যকৃতির বিচার তাদের তুলনায়। কোনও কিছু একটু নূতনের স্বাদ পেলেই নবীন কাব্য ও তার কবিকে শ্রেষ্ঠ কাব্য ও কবি বলে প্রচারের 'টপিক্যাল' মননশীলতা ও রসজ্ঞতার ফ্যাশন মারাত্মক। বড়-ছোট, সাময়িক ও চিরকালীনের ভেদ-জ্ঞান সেখানে লোপ পায়। কাব্য ও সাহিত্যের সৃষ্টি যেন নূতন নূতন কলের সৃষ্টি! পরবর্তী কল তার কর্ম-দক্ষতায় পূর্ববর্তী কলকে বাতিল করে, তার শুধু ঐতিহাসিক মূল্য অবশিষ্ট রাখে।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও কাব্যসৃষ্টির বিচারে আমাদের আর এক বাধা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার উপর বাঙালীর অন্তহীন ও অসম্ভব দাবি। আমাদের কোনও কোনও পণ্ডিত-সমালোচক আড়ম্বরের সঙ্গে প্রমাণ করেছেন যে রবীন্দ্রনাথ 'ম্যাকবেথে'র মত নাটক লিখতে পারতেন না, যেন সেক্সপীয়র 'চিত্রাঙ্গদা'র মত কাব্য রচনা করতে পারতেন। পৃথিবীর সমস্ত মহাকবির কাব্যের সমস্ত গুণ রবীন্দ্রনাথের কাব্যে নেই। যেন থাকা উচিত ছিল, কিন্তু যখন নেই সেটা তাঁর কাব্যের শ্রেষ্ঠত্বের লাঘব। রবীন্দ্রনাথ যে এক কবিতায় বলেছেন, তিনি জানেন তাঁর কবিতা নানা বিচিত্র পথে গেলেও সর্বত্রগ্রামী নয়, সেটা যেন মহাকবির মনের এক বিচিত্র অভাববোধের প্রকাশ নয়, নিজের কাব্যসৃষ্টির বিরূপ ও সত্য সমালোচনা।

কিন্তু বাঙালীর কাছে রবীন্দ্রনাথ কেবল তাদের ভাষার মহাকবি ও মহাসাহিত্যিক নন। বিগত একশো বছরে বাঙালীর মন ও চিন্তা যে আকার নিয়ে গড়ে উঠেছে তার এক অতি বড় অংশ রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রভাবে ঘটেছে। আমাদের বাংলা ভাষা ও তার গড়নের চিন্তা, কাব্য ও তার ছন্দ ও রীতির চিন্তা, আমাদের সামাজিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষার লক্ষ্য ও তার পদ্ধতি ও উপায়ের চিন্তা, পৃথিবীর সকল মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের চিন্তা—সব কিছু রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রমুখী বিরাট প্রতিভার স্পর্শে মূর্তি ও প্রাণ পেয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আমরা মুখে যা বলি, লেখায় যা লিখি, তার কত ভাগ পদ ও উপকরণ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য থেকে এসেছে ভেবে দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। আমাদের দেশের আকাশ, তাতে রৌদ্র মেঘের খেলা, দেশের তরু-লতা-শস্যের শ্যামলতা, তার ঋতু-বৈচিত্র্য, এ কি আজ আমরা কেবল নিজের চোখে দেখছি? মহাকবির দৃষ্টি ও কল্পনা সে দেখায় কতখানি জুড়ে আছে?

রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী ও বিরাট প্রতিভা নিয়ে পৃথিবীতে অতি অল্প প্রতিভাধরের জন্ম হয়েছে। এ প্রতিভার মহাভার তিনি অতি সহজেই বহন করেছেন। প্রতিভা তাঁর জীবনের কোনও দিকে শুষ্কতা ও অপূর্ণতা আনে নি। প্রতিভা এক বিশেষ দিকে মনের প্রবণতা ও সৃষ্টির ক্ষমতা। তার দাবি মেটাতে মনের অন্য বহু দিকের উপর টান পড়ে, এবং জীবনে অসামঞ্জস্য আনে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিরাট ভাণ্ডার থেকে এক দিকের প্রয়োজনে যতই ব্যয় হোক, অন্য বহুদিকের প্রয়োজনের জন্য সে ভাণ্ডার পূর্ণই থাকে। রবীন্দ্রনাথের মত প্রতি-ভাধরের অসামঞ্জস্যহীন পরিপূর্ণ জীবন ইতিহাসের এক আশ্চর্য সৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথের কাছে বাঙালীর ঋণ ও কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। অনেকে রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব বলেন—যার মধ্যে তাঁর সঙ্গে সম্পর্কের অন্তরঙ্গতার একটু ছোঁয়া আছে। কিন্তু অতি ব্যাপক অর্থে তিনি আমাদের সকলের গুরু চোখে জ্ঞানের অঞ্জন দিয়ে তিনি আমাদের বোধি ও অনুভূতিকে মোহ থেকে মুক্ত করেছেন। রসের অঞ্জন দিয়ে আমাদের আনন্দকে কলুষহীন মহানন্দে উত্তীর্ণ করেছেন।

মেক্সিকোতে রবীন্দ্র-সাহিত্য

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৯৫২ সালে জানুয়ারি আর ফেব্রুয়ারি মাসে আমার মেক্সিকো দেশ দেখে আসবার একটু সুযোগ ঘটেছিল। ছ' মাসের জন্য আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া শহরের অন্যতর বিশ্ববিদ্যালয় পেন্‌সিলভেনিয়া ইউনিভার্‌সিটির দ্বারা অধ্যাপনার জন্য আমন্ত্রিত হই। ছ' মাস ফিলাডেলফিয়াতে কাটাবার পরে মেক্সিকো দেশে ঘুরে আসবার সুযোগ পাই। মেক্সিকো নানা বিষয়ে আমেরিকার সংযুক্তরাষ্ট্রের থেকে একেবারে আলাদা, এবং আর কতকগুলি বিষয়ে ভারতবর্ষের সঙ্গে মেক্সিকোর খুব মিল আছে। দেশটি ভারতবর্ষের প্রায় antipodes-এ অবস্থিত—অর্থাৎ ভূ-গোলকে ভারতবর্ষের ঠিক বিপরীত দিকে মেক্সিকো অবস্থিত। দেশটিতে প্রাচীন আর আধুনিকের এক অপূর্ব সমাবেশ দেখা যায়। কলম্বস্-কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কারের বহু পূর্বে, ইউরোপ থেকে স্প্যানিশ জাতির মানুষের আমেরিকা-মহাদেশে পদার্পণ ঘটবার বহু শতাব্দী পূর্ব থেকেই, মেক্সিকোর অধিবাসীরা একটি বড়-দরের সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। নাহুয়া, জাপোতেক, মিস্তেক, মায়া প্রভৃতি নানা উপজাতির লোকেরা, যীশু-খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্ব থেকেই একটা উঁচু-দরের সভ্যতা গড়ে তোলে। এই সভ্যতার একটা অদ্ভুত কথা এই যে, এরা লোহার ব্যবহার জান্‌ত না—ধাতুর মধ্যে এরা তামা সোনা ও রুপো এই কটিই জান্‌ত। এদের কাটবার, কঠিন বস্তু ছেদন করবার একমাত্র অস্ত্র ছিল পাথর। পাথরেরই ছেনি দিয়ে বড় বড় পাথর কেটে এরা যে বিরাট্ বিরাট্ মন্দির ও অন্য প্রাসাদ আর ভাস্কর্য্য প্রভৃতি তৈরি ক'রে গিয়েছে, তা দেখে এখন আমাদের বিস্ময় লাগে। এদের নিজেদের ধর্ম ও দেবতা, নানা শিল্পকলা, সুসংবদ্ধ সমাজ, বড় বড় সাম্রাজ্য, এ-সব ছিল। কিন্তু স্পেন থেকে ইউরোপীয়েরা গিয়ে এদের মধ্যে এক উৎপাতের মত দেখা দিলে; আর এদের প্রাচীন সভ্যতা এই আক্রমণকারী স্পেনীয়দের হাতে ধ্বংস পেলে। এখন মেক্সিকোর লোকেরা হ'চ্ছে, প্রাচীন মেক্সিকোর নানা উপজাতির মানুষ আর তাদের উপরে যারা দোর্দণ্ড-প্রতাপে এই প্রায় সাড়ে-চার শ' বছর ধ'রে শাসন ক'রে আস্‌ছে, সেই স্পেনীয় জাতির মানুষ, এদের মিশ্রণের ফল। প্রাচীন ধর্ম এদের আর নেই, জোর ক'রে স্পেনীয়রা এদের রোমান-কাথলিক খ্রীষ্টান ক'রে দিয়েছে। প্রাচীন মন্দির প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ এখন প্রত্নতত্ত্বের আলোচনার বিষয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। বিশুদ্ধ আদিম অধিবাসীরা এখনও শতকরা প্রায় চল্লিশ হবে। আর বাকি ষাট হ'চ্ছে, স্পেনীয় আর আমেরিকার সুসভ্য আদিম জাতির মিশ্রণ-জাত। যারা বিশুদ্ধ স্প্যানিশ ছিল, তারা এখন এই মিশ্র জাতির মধ্যেই মিশে গিয়েছে বা যাচ্ছে। ভাষায় এরা এখন স্পেনীয় হ'য়ে যাচ্ছে। নাহুয়া, মায়া, মিস্তেক, জাপোতেক, ওতোমি প্রভৃতি নানা ভাষা জন-সাধারণ ঘরে ব্যবহার ক'রলেও, এ-সব ভাষায় সাহিত্য নেই, সকলেই স্কুলে কলেজে স্প্যানিশ শেখে, আর স্প্যানিশই এদের সাধারণ ভাষা হ'য়ে যাচ্ছে। স্প্যানিশ ভাষার মাধ্যমেই বাইরের জগতের সঙ্গে এদের যোগাযোগ হ'য়ে থাকে। এক হিসাবে ধ'রতে গেলে, এরা এখন স্পেনীয় জাতেরই যেন একটি শাখা, যদিও এদের জীবন-যাত্রার পদ্ধতিতে, রীতি-নীতিতে, মনোভাবে আর চিন্তাপ্রণালীতে আদিম আমেরিকার বৈশিষ্ট্য অনেকটাই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে যেমন আর্য্য আর অনার্য্য মিশে ভারতীয় হিন্দু জাতির সৃষ্টি, মেক্সিকোতেও তেমনি সুসভ্য আদিম

আমেরিকান জাতি আর স্পেনীয় জাতি, এই দুটি মিলে আধুনিক মেক্সিকান জাতি। মেক্সিকোতে যাবার আগ্রহ এইজন্য ছিল যে, সেখানে গিয়ে এই অভিনব মেক্সিকান জাতি কি ভাবে গ'ড়ে উঠছে আর উঠেছে, তার একটু চাক্ষুষ পরিচয় করা।

মেক্সিকো দেশের রাজধানীর নাম হচ্ছে 'মেক্সিকো নগর'। স্পেনীয়রা ১৫২১ সালে মেক্সিকো দেশ জয় করে। তার কয়েক শত বৎসর পূর্বেই এই মেক্সিকো শহরের গোড়াপত্তন হয়েছিল। মেক্সিকো-নগরটি এখন আমেরিকান মহাদেশের এক প্রধান নগর। আর এই নগরের স্বকীয় একটা রূপ ও বৈশিষ্ট্য আছে। প্রাচীন আমেরিকা-যুগের অনেক ভগ্নাংশ আর স্পেনীয়দের দান—অনেক নোতুন জিনিসের মিশ্রণে শহরটি অপূর্ব।

আমি মেক্সিকো শহর আর মেক্সিকান জাতির পর্য্যালোচনা করবার জন্যই ওদেশে যাই। এখনকার মেক্সিকান শিক্ষিত ব্যক্তিরা রক্তে কোথাও শুদ্ধ আদিম আমেরিকান, কোথাও বা মিশ্র, আর কোথাও বা শুদ্ধ স্প্যানিশ হ'লেও, একটি উন্নত মনোভাবের জাতি। মেক্সিকোতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। জনশিক্ষার প্রচারও খুব বেশী। মেক্সিকোর আধুনিক শিল্পকলা এ যুগের শিল্পে কতকগুলি নোতুন ধারা এনে দিয়েছে। বাইরের জগতের হাওয়া এদের মনে খুবই খেলছে।

এহেন মেক্সিকোতে গিয়ে একটি অপ্রত্যাশিত ব্যাপার দেখে যেমন বিস্মিত তেমনি প্রীতও হ'লুম, সেটি হচ্ছে— আধুনিক মেক্সিকোর শিক্ষিত ও বিদগ্ধ সমাজের মনে ভারতবর্ষের প্রভাব, আর সেই প্রভাব এসেছে স্বামী বিবেকানন্দ আর রবীন্দ্রনাথের রচনাকে অবলম্বন ক'রে। মেক্সিকো শহরে পৌঁছবার দুদিন পরেই আমাদের ভারতবর্ষের রাজদূত মেক্সিকো দেশে পদার্পণ ক'রলেন। সংযুক্ত-রাষ্ট্র আর মেক্সিকো—আমেরিকার এই দুই দেশের জন্য একজন রাজদূতই নিযুক্ত আছেন। ১৯৫১-২ সালে আমাদের রাজদূত ছিলেন শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেন। ইনি যোগ্যতার সঙ্গে নিজের কর্তব্য পরিচালনা করেন, আর ওয়াশিংটন থেকে মেক্সিকোতে আসেন—ভারত-সরকারের পরিচয়-পত্র মেক্সিকোর রাষ্ট্রপতির কাছে দাখিল করবার জন্য। শ্রীযুক্ত সেন ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ছাত্র ছিলেন। মেক্সিকোতে তাঁর সাহচর্য্য করবার আমার খুবই সুযোগ মেলে, আর তাঁর সঙ্গে আমি কয়েকটি জায়গায় ঘুরি। দু-একটি বিষয়ে স্বদেশের জন্য তাঁর সঙ্গে মিলে একটু কাজ করবার সুযোগও আমি পাই।

ভারতবর্ষের রাজদূত মেক্সিকোতে এসেছেন— মেক্সিকোর অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রতে এলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন মেক্সিকো বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি ছাত্র আর কয়েকজন অধ্যাপক। এঁরা সকলেই চান, ভারতবর্ষের সংস্কৃতি সম্বন্ধে কিছু জানতে, ভারতবর্ষ ও মেক্সিকো এই দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগ কি ক'রে পাকা করা যায়; আর ছাত্রেরা বিশেষভাবে জানতে চায়, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে। ভারতের রাজদূত যে অল্প কয়দিনের জন্য মেক্সিকোয় গিয়েছিলেন, তাঁকে তখন নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হ'ত। এই সাংস্কৃতিক ব্যাপারে জিজ্ঞাসু মেক্সিকান অধ্যাপক আর ছাত্রদের কাছে তিনি আমার কথা বলেন—ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমার অধ্যাপক এসেছেন, তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে আপনারা আলাপ করুন, তিনিই আপনাদের নানা খবর দিতে পারবেন; আর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল, রবীন্দ্রনাথের কথাও তিনি অনেক ব'লতে পারবেন। আমাকেও তিনি খবর পাঠিয়ে দিলেন, আর আমার হোটেলে এসে আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে এঁদের ব'লে দিলেন।

এই ভাবে মেক্সিকো শহরের প্রাচীন ও আধুনিকের উত্তরাধিকারী এই নবীন মেক্সিকান জাতির কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত ও সংস্কারপূত ছাত্র ও অধ্যাপকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ মিত্রতা ঘ'টল। এর পূর্বে মেক্সিকো শহরের রাস্তায় চলাফেরা ক'রবার সময় একটি জিনিস দেখে আমি চমকে যাই। আমাদের দেশের মতই বড় রাস্তার ধারে ফুটপাথের ওপর যেখানেই একটু খোলা জায়গা পেয়েছে, সেখানেই নানা রকম জিনিসের ফেরিওলারা পসার সাজিয়ে পথ-চলতি লোকের কাছে

নিজেদের জিনিস বিক্রি ক'রছে—কোথাও ফল, কোথাও বা চকোলেট বা নানা রকমের মিষ্টি, কোথাও নানা মণিহারি জিনিস, আর কোথাও বই। এই রকম ফুটপাথের ধারে ছোট-খাট সাজানো বইয়ের দোকান দেখ্‌লে দাঁড়িয়ে প'ড়তুম। এ-বই ও-বই সে-বই হাঁট্‌কে একটু দেখতুম, আর কখনও বা অল্প দামে দু-একখানা কিনতুমও। সব বই স্প্যানিশ ভাষায় লেখা। বই আছে, ক্যালেণ্ডার আছে, খাতা-পেনসিলও আছে। বেশীর ভাগই বই বাজে উপন্যাসের—প্রেম আর খুনোখুনির ব্যাপার নিয়েই। আবার স্প্যানিশ ভাষার পুরাতন ও আধুনিক শ্রেষ্ঠ লেখকদেরও বই বেশ পাওয়া যায়। এই রকম একটি ছোট দোকানে হঠাৎ দেখি, স্প্যানিশ ভাষায় স্বামী বিবেকানন্দের বই—যেমন 'রাজযোগ', 'আমার গুরুদেব', 'শিকাগো বক্তৃতা' ইত্যাদি। দেখে তো অদ্ভুত লাগ্‌ল। তারপরে আরও দেখলুম, রবীন্দ্রনাথের বইয়েরও স্প্যানিশ অনুবাদ। এগুলি বাজে ডিটেক্‌টিভ নভেল আর রোমান-কাথলিক ধর্মের বই আর যৌন-আবেদনের নানা ছাইপাঁশ বই—এ সবের পাশেও এই বইও বিক্রি হচ্ছে। এর মানে এই নয় যে, মেক্সিকোর পথ-চলতি মানুষ সকলেই বিবেকানন্দ আর রবীন্দ্রনাথের লেখা কিনে পড়ে। তবে এটা নিশ্চয়ই যে, দু-চারজন লোক অবশ্যই আছেন, যাঁদের কাছে এই-সব বইয়ের চাহিদা আছে—আর তাঁদের জন্যেই ফেরিওলারা এই সব বই এনে রাখে। সুদূর মেক্সিকোর সাধারণ মানুষের অন্ততঃ একটি শ্রেণীর কাছে ভারতীয় চিন্তা ও দর্শন আর ভারতীয় কবিতা ও উপন্যাস—এর একটা আবেদন নিশ্চয়ই পৌঁচেছে, এবং সেখানে এর কিছুটা আদরও হয়েছে।

ইউনিভার্‌সিটির এই ছাত্র আর অধ্যাপকদের পেয়ে আমি খুবই খুশী হ'লুম। বিশেষতঃ এই সব তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের পেয়ে। অধ্যাপকেরা চান, যাতে ভারত-বর্ষের সঙ্গে মেক্সিকোর একটা ভাবগত আদান-প্রদানের কায়েমী বন্দোবস্ত আমাদের রাজদূত ক'রে দিয়ে যান, এই বন্দোবস্ত অনুসারে যাতে ক'রে ভারতবর্ষের অধ্যাপক ও ছাত্র মেক্সিকোয় আস্‌তে পারে, আর মেক্সিকোর ছাত্র ও অধ্যাপক ভারতবর্ষে যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা চায়, আমি যখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত আর তাঁরই নগর-কলকাতার অধিবাসী—বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ছাত্রদের কাছে আমি যেন একদিন রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ করি। এ বিষয়ে দেখলুম জনদশ-বারো ছাত্রের উৎসাহ বেশী। এদের মধ্যে তিন-চারটি মেয়েও ছিল। এরা সকলেই কলেজে পড়ে—কেউ বিজ্ঞান, কেউ সাহিত্য, কেউ দর্শন আর কেউ আইন। এই ছাত্রদের সঙ্গে আমার বেশ সদ্ভাব হ'য়ে গেল, যদিও এদের সঙ্গে মেলামেশা করবার জন্য আমি তিনটি কি চারটি দিনের বেশী পাই নি। এরা আমাকে বললে যে, এদের মধ্যে একটা ছোট পাঠচক্র গ'ড়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে—এরা তার নাম দিয়েছে Grupo Rabindranath Tagore (গ্রুপো রাবিন্দ্রানাৎ তাগোরে)। এই পাঠচক্রে এরা নিয়মিতভাবে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা ক'রে থাকে। ইংরিজিতে রবীন্দ্রনাথের লেখা যা বেরিয়েছে, সে সবেরই স্প্যানিশ অনুবাদ হয়েছে—কতকগুলি বইয়ের স্পেন দেশে, কতগুলি আমেরিকার আর্জেন্টিনায় আর অন্যত্র। আবার এই-সব অনুবাদকে অবলম্বন ক'রে একটি নাতিক্ষুদ্র রবীন্দ্র-রচনার চয়নিকাও স্প্যানিশ ভাষায় বেরিয়েছে। ছাত্রেরা এই বই আমাকে দেখালে—এদের হাতে তিন-চার খণ্ড এই বই ছিল। আর আমি এই বই দুই-একখানি ওদের কাছ থেকে নিয়ে পাতা উল্‌টে দেখলুম—অনেক জায়গাতেই পাঠকেরা লাল নীল বা কালো পেনসিলে বা কালিতে দাগ দিয়ে রেখেছে—রবীন্দ্রনাথের যে-সব রচনার অংশ তাদের ভাল লেগেছে।

এটা দেখে একজন ভারতবাসী বা বাঙালীর মনে একটা আনন্দ হবারই কথা। পৃথিবীর একেবারে উল্‌টো দিকে এতগুলি তরুণ-তরুণীর সঙ্গে, প্রবীণ অধ্যাপকের সঙ্গে একটা ভাবসাম্য পাওয়া গেল—এটা কি কম কথা। এদের সঙ্গে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের কাছে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে আলোচনা ক'রতে আমি সানন্দে সম্মত হলুম। এদের সঙ্গে আরও দুই-একটি বিষয়ে আমার আলোচনা হ'ল। একদিন এরা আমাকে ধ'রে নিয়ে গেল একটি দামী

মেক্সিকান হোটেলে আমাকে খাওয়াবে ব'লে, সেখানে বিশুদ্ধ মেক্সিকান ভোজ্য আমাকে খাওয়ালে। আমি ওদের জিজ্ঞাসা করলুম, বলো তো, তোমরা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এমন কি পেয়েছ, যার জন্যে তাঁর বই এই ভাবে যত্ন ক'রে প'ড়ছ আর তাঁর কথা শুনতে চাচ্ছ? তাতে দু-তিনটি ছেলে ব'ললে, দেখুন, উনি জীবনের সম্বন্ধে, প্রেমের সম্বন্ধে, মানুষের কর্তব্য সম্বন্ধে এত খাঁটি কথা এমন মিষ্টি ক'রে বলেছেন, তেমনটি আমরা সাধারণতঃ পাই না। এই জন্য এঁর বই প'ড়ে আনন্দ পাই, এঁকে ছাড়তে পারি না। আমি ব'ললুম, এহ বাহ্য, ভিতরের কথা কি বলো। জীবন, প্রেম, মানুষের পুরুষার্থ এ-সব নিয়ে ইউরোপেরও বড়-বড় কবি খুব ভাল-ভাল কথা অনেক ব'লে গিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ হয়তো খুব মিষ্টি ক'রে বলেছেন, কিন্তু তাতে তাঁর বৈশিষ্ট্য কোথায়? তখন এরা একটু ভেবে ব'ললে, এঁর মধ্যে আমরা পাই একটা বিশ্বমানবিকতার বাণী, সব মানুষ যে এক আর সকলের মধ্যেই যে নিজেকে আমরা পেতে পারি সেই কথা। আমি বললুম, এও তো নতুন কথা নয়, প্রাচীন আধুনিক সব দেশেরই বিশ্ব-কবিদের মধ্যে এ ধরনের বিশ্বমানবিকতা তো দুর্লভ বস্তু নয়। তখন এদের মধ্যে দু-একজন একটু ভেবে ব'ললে, দেখুন, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অতীন্দ্রিয় জগতের একটা আভাস পাই, একটা আধ্যাত্মিকতার সুর তাঁর লেখার মধ্যে আছে যেটা মানুষকে উঁচুতে তুলে নিয়ে যায়, আর মানুষকে আকুল করে—এটা তো আর সব কবির মধ্য পাই না। আমি ব'ললুম, আমাদেরও তাই মনে হয়, এবং সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথের লেখা আমাদের মনের আর হৃদয়ের বস্তু হ'য়ে আছে—জীবন, মানব আর শাশ্বত সত্তা, এই তিনই তাঁর প্রতিভার ঝলকে অদ্ভুত সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

আমি এদের ব্যবস্থামত মেক্সিকো বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-কলেজে আহূত একটি ছাত্রদের সভাতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে এলুম। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধ'রে ব'ললুম। শ্রোতার সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হবে—ইংরিজি সকলে বোঝে না, তবে অনেকেই বোঝে, সেইজন্য চট করে পঞ্চাশের বেশী শ্রোতা সংগ্রহ করা বোধ হয় কঠিন হয়। বক্তৃতার পর এদের মধ্যে কেউ-কেউ প্রশ্ন ক'রলে—কতকগুলি প্রশ্ন বোকার মতন, ছেলেমানুষের মতন, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অজ্ঞতারই পরিচায়ক; আবার দু-চারটি প্রশ্ন বেশ বুদ্ধিমানের মত, তার মধ্যে অন্তর্দৃষ্টিও ছিল। বক্তৃতা সাঙ্গ হবার পরে, চমৎকার ইংরিজিতে একজন অধ্যাপক আমাকে ধন্যবাদ দিলেন। ইনি ব'ললেন, যখন আমরা ভারতবর্ষের কথা চিন্তা করি, তখন ভারতবর্ষের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির আর তার সমন্বয়-প্রবৃত্তির কাছে আমাদের মন সম্ভ্রমে নত হ'য়ে যায়, আমাদের নিজেদের যেন অনেকটা খর্ব ব'লে মনে হয়। এর জবাবেও আমাকে ব'লতে হ'ল, আমাদের এখন যা অবস্থা তাতে প্রাচীন ভারতের কতকগুলি আদর্শ—যার একটা আবেদন এখনও বিশ্বমানবের কাছে আছে—তা থেকে আমরা কতটা ভ্রষ্ট হ'য়ে প'ড়ছি সেকথা যখন ভাবি তখন আমরা নিজেদের লজ্জা রাখবার স্থান পাই না।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিশ্বব্যাপী আবেদন আর প্রভাব আমরা এইভাবে পৃথিবীর সর্বত্রই দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথ এমন জিনিস সব দেশের সব জাতির সব কালের মানুষকে দিয়ে গিয়েছেন যে, সে জিনিস কেউ ছাড়তে পারবে না, তা সর্বত্র সকলের হৃদয়ের ধন হ'য়ে থাকবে।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা তাঁর রচনার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিতর্কমূলক ও ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতিময়। অতি-আধুনিক কবিতার মনের মেজাজ ও রূপসজ্জা দেখে মনে হয় ছন্দোবদ্ধ, আবেগোচ্ছল, ধ্বনিস্পন্দনের সঙ্গীতময় কবিতার দিন বোধ হয় শেষ হয়েছে। অন্ততঃ অদূর-ভবিষ্যতে তার যে পুনঃ-প্রচলন হবে এমন আশা খুব ক্ষীণ মনে হয়। আধুনিক কবিরা রবীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দ ও তার পেছনে যে নিম্নসুরের ভাব-ভাবনা ক্রিয়াশীল তারই অনুশীলন করছেন। কবির মন এখন আর কল্পনা-বিহারী, সৌন্দর্য-তন্ময় নয়—বাস্তব জগতের খুব কাছাকাছি বিচরণশীল। পরিচিত বস্তুজগৎ ও তথ্যসঞ্চয়ের চারিপাশে যে আবেগ-কল্পনার একটা সঙ্কীর্ণ বৃত্ত রচিত হয়, বাস্তব জীবনের তত্ত্বরস থেকে কাব্যানুভূতির যে একটা ক্ষীণ, অ-গভীর ধারা প্রবাহিত হয়, কবিগোষ্ঠী সেই নাতিপ্রশস্ত সীমার মধ্যেই আবদ্ধ। কাব্যে আমরা এখন আর অবগাহন-স্নানের সম্পূর্ণ আত্মনিমজ্জনের আনন্দ অনুভব করি না; ক্ষীণস্রোতা নদীর বালুকা সরিয়ে তার থেকে দু ঘটি জল তুলে কোন মতে অঙ্গপ্রক্ষালনের উদ্দেশ্য মিটিয়ে নিই। কবিতা আর নিবিড় আবেশে আত্মবিস্মৃতি ঘটায় না; কবিতা-পাঠক হেঁয়ালির জাল ছাড়াতে ছাড়াতে, সমস্যার তীক্ষ্ণ কণ্টক-বিদ্ধ হতে হতে, খুব সতর্ক পদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে জঙ্গল ভাঙার সগর্ব আত্মপ্রসাদ অনুভব করে। কাব্যপাঠের আনন্দ এখন কেতকী ফুলের মধুর ন্যায় কণ্টকনিষেধবারিত। সুতরাং আধুনিক কাব্য-বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার নতুন মূল্যায়ন বিশেষ প্রয়োজনীয়।

যুগজীবনের আবেগ ও অনুভূতির মাত্রার উপর সমকালীন কবিতার বাগ্‌রীতি (idiom) অন্তরের রূপময়তা ও আঙ্গিকের প্রসাধনকলা নির্ভরশীল। কালিদাস ও ভবভূতির কবিতা, কাদম্বরী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বা কালীপ্রসন্ন ঘোষের গদ্যরীতি এ যুগে বিসদৃশ ঠেকে এদের অন্তর্নিহিত কোন আতিশয্যের জন্য নয়, কিন্তু আধুনিক ভাবছন্দের সঙ্গে ওই জাতীয় কাব্যছন্দের অসামঞ্জস্যের জন্য। এমন কি, কিছুদিন আগের পারিবারিক চিঠি লেখার পদ্ধতিও এখন কৃত্রিম ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ বলে মনে হয়। এখন পিতাকে লেখা চিঠিতে প্রণামের সংখ্যা শতকোটি থেকে এককে নেমেছে; শিরোনামা ও সম্বোধন-রীতিতে ভক্তিরস উদ্বেলতা বাস্তব জীবনের তটভূমির উচ্চতালে যাতে না ছাপায় আমাদের ঔচিত্যবোধ সেদিকে সচেতন। এমন কি, দাম্পত্য প্রেমনিবেদনের চিঠিপত্রও প্রণয় প্রকাশের অত্যুচ্ছ্বাস বর্জন করে রীতিমত মিতভাষী ও পরিহাসকুশল হয়ে উঠেছে। মোট কথা, ভাবের আতিশয্য, বর্ণনার আতিশয্য, সৌন্দর্যসন্ধানের আতিশয্য, ছন্দলালিত্যের আতিশয্য—ইত্যাদি সর্ববিধ আতিশয্য এখন আমাদের রুচিসমর্থন থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আমরা সর্বপ্রকার আবেগের মাত্রাধিক্য শিষ্ট রীতিবিরোধী ও অমার্জিত মানসবর্বরতার নিদর্শন বলে ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছি। রবীন্দ্রনাথের 'মানসী', 'সোনার তরী'র যুগের কবিতা এবং 'লিপিকা'র ন্যায় অতিরিক্ত ভাবোচ্ছ্বাসস্ফীত গদ্য রচনা যেন ক্রমশঃ নীরব পাঠ ও উপভোগ থেকে সরে গিয়ে অভিনয়ধর্মী, মঞ্চোপযোগী আবৃত্তির আশ্রয়ে আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করছে। মিষ্টান্নের অতিরিক্ত মিষ্টত্বের ন্যায় আবেগপ্রধান ও সুরময় কবিতা যেন প্রৌঢ় রুচির বিমুখতায় ঈষৎ বিস্বাদ ঠেকছে।

ক্রান্তদর্শী কবি প্রতিভার পূর্বানুমানবলে বুঝতে পেরেছিলেন যে আমাদের বড় বড় ভৌগোলিক নদীর ন্যায় আমাদের মানস-স্রোতস্বতীও ক্রমশঃ মজে আসছে। তার আবেগ-প্রবাহ ধারণ ও বহন করার শক্তি দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। এই প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে সমতা রক্ষা করার জন্যই তিনি আবেগনিয়ন্ত্রণনীতি গ্রহণ করেছেন। অতীত যুগে আমরা চৈতন্যধর্ম-প্রভাবিত হয়ে প্রেমাশ্রু-পাতে বড় বাড়াবাড়ি করেছি; আমাদের ভাবোচ্ছ্বাসের

বড়ই মাত্রাধিক্য ঘটেছিল। দেবতার প্রতি স্তবস্তুতি, ভক্তিরসের আতিশয্য, ভগবৎ কৃপালাভের জন্য অতি-ব্যাকুলতা, দেবতার সঙ্গে মধুর সম্পর্কের কল্পনা আমাদের স্বাভাবিক আবেগপ্রবণতার সঞ্চয় প্রায় নিঃশেষিত করে নিয়ে এসেছিল। যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তা দেশপ্রীতি, নারীবন্দনা, প্রকৃতিসৌন্দর্যমুগ্ধতা ও ধর্মসাধনার আকুতির বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে হতে গতিবেগ হারিয়ে প্রথানুস্মৃতির বালুকারাশির মধ্যে প্রায় অন্তর্হিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নিজের কবিতা প্রধানতঃ অধ্যাত্মব্যঞ্জনাময় প্রেম ও ঐশীলীলার অপ্রাকৃত মাধুরী এই দ্বিমুখী ধারার আশ্রয়ে পূর্ণতার মহাসমুদ্রের অভিমুখে অভিসার করেছে। তাঁর অনুরাগী পাঠকবৃন্দ তাঁর অনুপম কাব্যসৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছে কিন্তু তাঁর ভাবচেতনা তাদের অন্তর-সমর্থন লাভ করে নি। সুতরাং কবির কাব্যরসে রুচির সঙ্গে দৃঢ় জীবন-প্রত্যয়ের সংযোগে যে প্রভাব চিত্তে বদ্ধমূল ও সহজ সংস্কারে পরিণত হয়, রবীন্দ্রনাথের কবিতার নিছক সৌন্দর্য-আবেদন সে পরিণতিতে পৌঁছয় নি। সেই জন্য রবীন্দ্র-কাব্য যে পরিমাণে আমাদের মুগ্ধ বিস্ময় উৎপাদন করেছে, সে পরিমাণে আমাদের জীবনমূলে রসসিঞ্চন করে নি। রবীন্দ্রনাথের ঔপনিষদিক চেতনা, তাঁর রহস্যময় জীবনবোধ, তাঁর সীমা ও অসীমের মিলন-প্রয়াস, তাঁর আনন্দবাদ ও গতিতত্ত্ব, তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে দৃঢ় অধ্যাত্মপ্রত্যয়জাত ধারণা—এগুলি তাঁর কাব্যের খাতিরে আমরা মেনে নিই। আমাদের নিজের জীবনে এদের সত্য বলে অনুভব করি না। আমরা এগুলিকে কবির কল্পনাবিলাস মনে করি, তাঁর প্রত্যক্ষ উপলব্ধিজাত জীবনসত্যের মর্যাদা দিই না। 'গীতাঞ্জলি'-'গীতিমাল্য'-'গীতালি'র ঐশীলীলাবিষয়ক কবিতাগুলি যদি গানের সুরে বসানো না হত, ওদের সঙ্গীত-সুরমাধুর্য যদি আমাদের আকর্ষণ না করত, তবে কাব্যে গভীর জীবনানুভূতির প্রকাশ বলে আমরা এদের একটা কবিতাও পড়তাম কি না সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে তাঁর সমকালীন পাঠক-বর্গের মানস ব্যবধানের বিষয়ে সম্যক্ সচেতন ছিলেন। তিনি জানতেন যে তাঁর অপরূপ-চিত্রিত কাব্য-পদ্ম সমকালীন রুচির ভ্রমরকে বেশীদিন মধুদানে পরিতৃপ্ত করতে পারবে না—এই চঞ্চল ভ্রমর তাঁর কবিতা-শতদলকে বারবার বেষ্টন করে গুঞ্জনধ্বনি তুলবে, কিন্তু মধুপানে নিবিষ্টচিত্ত হয়ে এর উপর স্থির হয়ে বসবে না। তিনি নারায়ণী কথা পরিবেশন করবেন, কিন্তু তাঁর শ্রোতারা নরের বেশী অগ্রসর হবেন না। তিনি অধ্যাত্মলীলারসে বিভোর থাকবেন, কিন্তু এঁরা চান বড়জোর গণতান্ত্রিক সাম্যবাদ ও মানবিক সমবেদনা। দার্শনিক তত্ত্বের ছিটে-ফোঁটা এঁরা আস্বাদন করতে পারেন চাটনিরূপে, খাদ্যরূপে নয়। রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক জীবনদর্শন এঁরা কখনই গ্রহণ করবেন না, তবে ওর ভাঙা দু-একটা টুকরো নিজেদের অভ্যস্ত ভোগবাদ ও বৈজ্ঞানিক আত্মকর্তৃত্ববাদের পাদপূরণে নিয়োগ করতে এঁদের হয়তো বিশেষ আপত্তি থাকবে না। এঁরা নিজের জগৎ ছেড়ে রবীন্দ্র-ভাবজগতে কখনই সম্পূর্ণভাবে বিচরণ করবেন না—তবে দুই জগতের সুবিধা যদি একসঙ্গে ভোগ করা যায়, তবে সে সুযোগ গ্রহণ করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। কাজেই পর্বত যখন মহম্মদের কাছে এল না, তখন অগত্যা মহম্মদই গদ্য-কবিতার ঢালু জমি বেয়ে তাঁর অধ্যাত্ম স্বর্গ থেকে এই মর্ত্য পর্বতের কাছে নেমে এলেন। গদ্যকবিতা সেই অবতরণ-সোপানেরই কাব্যরূপ।

২

এই হল কবি-মনস্তত্ত্বের দিক থেকে গদ্যকবিতার উদ্ভব-রহস্য। কিন্তু কবি এই নতুন রীতি অবলম্বনের যে কৈফিয়ত দিলেন তাতে তাঁর আশঙ্কার এই দিকটার কোন প্রতিফলন হল না। বরং তিনি অবরোহণ-প্রক্রিয়াকে আরোহণ-প্রয়াসরূপেই প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করলেন। সাধারণ পিতার তাঁর শেষজাত সন্তানের প্রতি যেমন ভালবাসার মাত্রাধিক্য দেখা যায়, তেমনি কবি-পিতার ও তাঁর প্রতিভার অন্তিম প্রসবের প্রতি অতি-পক্ষপাত অনেকটা স্বাভাবিক। বোধ হয় সেই স্নেহদুর্বল পিতৃহৃদয়ের তাগিদে তিনি তাঁর পূর্বতন ছন্দোবদ্ধ কাব্য-

রচনাকে কতকটা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে তাঁর নবপরীক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব-ঘোষণায় অত্যুৎসাহ দেখিয়েছেন। তিনি ছন্দ-রচনার অলঙ্কার-সজ্জার প্রতি বিদ্রূপ কটাক্ষপাত করেছেন, ওর অবগুণ্ঠনের সলজ্জ শালীনতা ও বেনারসী শাড়ির স্খলিত-অঞ্চল, ভূম্যবলুণ্ঠিত অতিবিস্তারের প্রতি অসমর্থন জানিয়েছেন, কবিতার প্রাণবস্তু যে সুপ্রাচীন আলঙ্কারিক গোষ্ঠীনির্দিষ্ট, অজ্ঞাতসংজ্ঞ রস তা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন ও গদ্যকবিতায় রস আছে বলেই যে তা অপাঙ্‌ক্তেয় নয় এইরূপ দাবি করেছেন। এখন রস শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে সহৃদয় পাঠকের সানন্দ উপভোগের উপর। এই রস ভাবের সর্বজনীনতা বিধান করে বলেই এ মার্জিতরুচি পাঠকের মনে আনন্দ সঞ্চারের হেতু। গদ্যকবিতায় রস আছে স্বীকার করলেও এ রসের বিশুদ্ধি, উৎকর্ষ ও পরিমাণ নিয়ে তারতম্য থাকা খুবই স্বাভাবিক। ধ্রুপদী গানের আনন্দ আর টপ্পা-ঠুংরির আনন্দ ঠিক একজাতীয় নয়। মধু, মিছরি, চিনি, গুড় সকলের মধ্যেই মিষ্ট রস আছে, কিন্তু তাদের আস্বাদে তারতম্য আছে। সুতবাং গদ্যকবিতার যে রস তা কোন্ জাতীয়, ছন্দবিধৃত কবিতার সঙ্গে তুলনায় উৎকৃষ্ট কি নিকৃষ্ট তা নির্ধারণ না করলে প্রশ্নের প্রকৃত মীমাংসা হবে না।

দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথ ধরে নিয়েছেন যে অতিনিরূপিত কাব্যছন্দ ভাবের স্বচ্ছন্দবিহারের বিরোধী, ও একমাত্র গদ্যছন্দেই এই স্বচ্ছন্দ বিকাশ সম্ভব। এরূপ একতরফা ডিগ্রীতে সত্যনিরূপণ হবে কি না সন্দেহ। শ্রেষ্ঠ কবির হাতে কাব্যছন্দ কখনই ভাবপ্রকাশের পরিপন্থী নয়। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত শ্রেষ্ঠ ছন্দোবদ্ধ কবিতা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একযোগে সাক্ষ্য দেয়। অপটু কবির হাতে ছন্দ-প্রয়োজন হয়তো ভাবানুবর্তনে বাধা সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু ছন্দের সত্যকার মর্যাদা অক্ষম কবিকৃতির দৃষ্টান্তে বিচারণীয় নয়। অক্ষম কবি যদি ছন্দের খাতিরে ভাবকে ক্ষুণ্ণ করেন, তবে অক্ষম গদ্যকবিতা রচয়িতাও তাঁর বিচ্ছিন্ন উক্তি-পরম্পরার সাহায্যে ভাবসংহতি বিধান করতে অসমর্থ হবেন। কবি এখানে নৃত্যছন্দ ও চলার স্বভাবমনোহর ছন্দের তুলনা করে দ্বিতীয়রূপ গতিভঙ্গীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছেন। কোন কলাবিদ্যাই স্বভাববিরোধী নয়, স্বভাবের অন্তর্লীন, উন্নততর ছন্দসুষমার আবিষ্কার। নৃত্যকুশলার কলাবিদ্যাসাধনাজাত গতিচ্ছন্দ সহজ গতির মনোহারিত্বের অস্বীকৃতি নয়, স্বভাবসৌন্দর্যের পূর্ণতর বিকাশ। এ না হলে কলাবিদ্যার কোন মূল্যই থাকত না, এর স্বভাববিরুদ্ধ কৃত্রিম ঠাটই একে চিরকাল সৌন্দর্য-লোক থেকে নির্বাসিত করত। যাদের মধ্যে এই কৃত্রিম প্রয়াস অতিপ্রকট, তাদের প্রতি নাচুনে মেয়ে বলে আমরা সরাসরি অনাস্থা জ্ঞাপন করি। নৃত্যকলাতেও যেমন, কাব্যকলাতেও তেমনি যা স্বভাবকে অনুবর্তন করেও তাকে অতিক্রম করে, স্বভাবের সঙ্গে তার যে কোথাও অসঙ্গতি আছে এ সন্দেহ আমাদের মন থেকে সম্পূর্ণ দূর করে, তাই শ্রেষ্ঠ পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং এ যুক্তি শ্রেষ্ঠ ছন্দকবিতা সম্বন্ধে অচল। প্রমথ চৌধুরী সত্যই বলেছেন—

> "ভালবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন
> শিল্পী যাহে মুক্তি লভে, অপরে ক্রন্দন।"

রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন যে গদ্যকবিতারও ছন্দ আছে; তবে এ ছন্দ দুনিরীক্ষ্য, ভাবের অন্তর্লীন, কাব্যছন্দের মত উদ্বেল নয়। কবি এখানে বলছেন যে এই ছন্দ সম্পূর্ণরূপে ভাবানুগামী, স্বতন্ত্র-অস্তিত্বহীন, মানব-দেহাভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন শিরা-উপশিরার ন্যায় রক্তধারাবাহী, কিন্তু বাহিরে অপ্রকট। পক্ষান্তরে কাব্যছন্দ শুধু ভাবের অধীন গৌণ শক্তি নয়, তার সমশক্তিসম্পন্ন, তুল্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত সহযোগী। একটি নিঃশ্বাসবায়ুর ন্যায় অলক্ষিতভাবে ক্রিয়াশীল ও প্রাণশক্তির আধার, অপরটি মলয়পবনের ন্যায় অস্ফুট-ভাব-কলিকাকে পূর্ণ কুসুমের রূপে ও গন্ধে বিকশিত করে। অবশ্য কোন ভাব ছন্দসাহায্যব্যতিরেকেই স্বপ্রকাশ, আবার কোন কোন ভাব ছন্দের সাহায্য না পেলে আত্মবিকাশ করতে পারে না। সুতরাং ছন্দের প্রয়োগ-অপ্রয়োগ কেবল কবির ইচ্ছানুসারে হবে না; এটা নির্ভর করবে বিষয়ের উপযোগিতা ও কবি বিষয়টির অন্তর্নিহিত রসকে কি পরিমাণে স্ফুরিত করতে চান তার উপর। কোন্ খাদ্য কি পরিমাণ জ্বালে সিদ্ধ হয়ে রসপরিণতি লাভ করবে তা

ঠিক হবে খাদ্যের প্রকৃতি ও খাদ্যরন্ধনের প্রণালী দ্বারা। সুতরাং গদ্যছন্দ যে কাব্যছন্দের চেয়ে রসবিকাশের বেশী অনুকূল এরূপ অভিমত যুক্তিসহ নয়। বরং মৃদু ছন্দের তাপে অপক্ব খাদ্যই যে তৈরি হবার বেশী সম্ভাবনা এই ধারণাই বেশী যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। অবশ্য কোন কোন জাতীয় ভাবের স্বাদ কচি শশার মত, কাঁচাতেই ভাল এটা স্বীকার করতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ গদ্যকবিতার স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করতে অনেকগুলি উপমা প্রয়োগ করেছেন এবং উপমাই যে যুক্তি এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। তিনি কাব্যছন্দকে পদ্মার সঙ্গে ও গদ্যছন্দকে কোপাইয়ের সঙ্গে উপমিত করেছেন। পদ্মার দুকূলপ্লাবী-তরঙ্গোচ্ছ্বাসে এপার ও ওপার, প্রাত্যহিক জীবন ও প্রত্যহাতীত ভাবজীবনের মধ্যে সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কোপাইয়ের ক্ষীণ স্রোত ও শান্ত প্রবাহে উভয় তটের মধ্যে, জলে ও স্থলে সম্বন্ধ অটুট থাকে। পদ্মার দুর্বার স্রোতে কেবল বড় বড় সমুদ্রগামী জলযানই ভাসতে পারে; কোপাইয়ের স্বল্প জলে মানুষ গরু খড়বোঝাই গাড়ি ও ভাঙা ছাতা মাথায় তিন টাকা বেতনের গ্রাম্য গুরু সবাই স্বচ্ছন্দে পার হয়ে যায়। এই দুই নদী কাব্যানুভূতির, কবিকল্পনা প্রসারের দুটি স্তরের প্রতীক। কিন্তু এতে এদের আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠতা ও গ্রহণযোগ্যতার কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না। ভাঙা ছাতার যদি কোন কাব্য থাকে, তবে তা ছাতার মতই ক্ষুদ্রায়তন হবে; তার ছোট বেষ্টনীটির মধ্যে মাথা ঢাকার বাস্তব প্রয়োজনের অতীত আর কোন মহত্তর তাৎপর্য, কোন সুদূরপ্রসারী ভাব-পরিবেশ না থাকাই সম্ভব। যাঁরা ভাঙা ছাতার কাব্যেই তৃপ্তি পাবেন তাঁদের ভাবোদ্রেক প্রয়োজন যে অত্যন্ত সীমিত তা স্বতঃপ্রমাণিত। ছাতার আড়ালে বিরাট নভোমণ্ডলকে দেখার তাদের বিশেষ ইচ্ছা নেই। সহজের ভাবরস আস্বাদন করতে পারে এমন লোকের সংখ্যা-প্রাচুর্য বোধ হয় সমাজের পক্ষে হিতকর। কিন্তু এঁরা যে আদর্শ কাব্যরসবোদ্ধা বা সহৃদয় সামাজিকের শীর্ষস্থানীয় এরূপ দাবি কেউ করবে না। তা ছাড়া কেবল উল্লেখেই কোন কবিত্ব নেই। কবি কোলাব্যাঙের ইতিহাস বা গুবরে পোকার কাহিনী বা নেড়ী কুকুরের ট্রাজেডি লিখতে পারেন নি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাঁর কোন কোন অন্ধস্তাবক এই অলিখিত শূন্যতার মধ্যেই গদ্যকবিতার আশ্চর্য পরিধিবিস্তার ও জীবনকৌতূহল প্রত্যক্ষ করেছেন। কবি যা লিখেছেন তার চেয়ে তিনি যা লেখেন নি তাই তাদের বেশী প্রশংসার উদ্রেক করেছে। এর চেয়ে সাংঘাতিক বিচার-বিভ্রম কল্পনা করাও দুরূহ।

৩

এখন রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতাবিষয়ক মন্তব্যগুলির মধ্যে কতটুকু শাশ্বত সত্য আছে তা বিচার্য। পূর্বেই বলেছি যে বর্তমান যুগের লেখক ও পাঠকদের মধ্যে একটা নিরুচ্ছ্বাস, তথ্যনিষ্ঠ ও আতিশয্যবর্জিত মনোভাব প্রাধান্য পেয়েছে। আদর্শবাদের প্রতি আস্থাহীনতা ও বাস্তব জীবনের চাপ এই রুচিপরিবর্তনের মুখ্য কারণ। কারণ যাই হোক, কাব্যে এর প্রভাব অনস্বীকার্য। বাস্তব জীবনের ভাবছন্দের সঙ্গে কাব্যের আবেগছন্দের একটা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে; এই সম্বন্ধ স্বীকার না করলে কাব্যের জীবননিষ্ঠতা ক্ষুণ্ণ হবে। আজকাল "মানস-সুন্দরী", "যেতে নাহি দিব", "উর্বশী", "বর্ষশেষ" প্রভৃতি কবিতায় যে কল্পলোকবিহার ও আবেগনিবিড়তা রূপ পেয়েছে, তা যুগরুচিপুষ্ট, মোহভঙ্গে তিক্ত পাঠকের মনে কোন অনুভূতি-সাম্য জাগায় না। এইসব কবিতাতে কবি যে আমাদেরই মনের কথা বলছেন এই ধারণা আমাদের মন থেকে ক্রমশঃ লোপ পাচ্ছে। যেমন তাজমহলকে আমরা বিস্ময়স্তম্ভিত দৃষ্টিতে দেখি, কিন্তু এর বিরাট, অনুপম শিল্পশ্রীমণ্ডিত প্রাসাদকে নিজেদের বাসস্থান বলে কল্পনা করতে পারি না—রবীন্দ্রকাব্যের মায়াসৌধের প্রতি আমাদের অনেকটা সেইরূপ মনোভাব। পাঠকের জীবনবোধের মধ্যে অনুরূপ কাব্যানুভূতির অঙ্কুর থাকলে তবেই তা রবীন্দ্রকাব্যলীলাকে অন্তরে গ্রহণ করতে পারবে। গদ্যকবিতায় সাধারণ পাঠক ও কবির মনে

সেই ছন্দসমতাটি রক্ষিত হয়েছে—পাঠক যা গ্রহণ করতে পারে, কবি সেই অনুপাতেই তাঁর দানকে সীমিত করেছেন। সুদীর্ঘকাল কাব্য-অনুশীলনের ফলে, কাব্যময় প্রতিবেশে বাস করার জন্য আমাদের মনে যে অপরিণত, অথচ সহজে উদ্রিক্ত কাব্যরসবাসনা জেগেছে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গদ্যকাব্যে তারই পরিতৃপ্তিসাধন করতে চেয়েছেন। একজন শ্রেষ্ঠ সুরশিল্পীর সুর পরিবেশনে দুটি পদ্ধতি আছে। প্রথম যখন তিনি গুণীজনের আসরে বসে নানা বাদ্যযন্ত্রে সুর বেঁধে, তাললয়সমন্বিত বিশুদ্ধ রাগিণী পরিবেশন করেন, তখন তিনি বিদগ্ধ শ্রোতার যে পরিমাণে মনোরঞ্জন করেন, সঙ্গীতানভিজ্ঞ প্রাকৃত জনসাধারণের ঠিক সেই পরিমাণে বিরক্তিভাজন হন। সেই শিল্পী যখন ঘরোয়া বৈঠকে বাদ্যযন্ত্রের আড়ম্বর ও রাগরাগিণীর পরিপূর্ণ রূপায়ন বর্জন করে নিজের মনে সুর ভাঁজেন, কালোয়াতি চাল ছেড়ে শুধু কণ্ঠস্বরের মৃদু গুঞ্জনে, আলাপের যদৃচ্ছ শিথিলতায় একটা সহজ-মধুর পরিবেশ গড়ে তোলেন তখন প্রাকৃত শ্রোতাদের হৃদয়তন্ত্রীতে এই অনায়াস সুরবিস্তার মুগ্ধ ঝঙ্কার তোলে। গদ্যকবিতাও তাই তার সরলতা, তার কল্পনার ন্যূনতা, তার প্রাত্যহিক জীবনের তথ্যনির্ভরতার জন্যই অধিকসংখ্যক পাঠকের মনে একটা মৃদু অনুরণন জাগায়। এই গণতান্ত্রিক চেতনার যুগে হরিপদ কেরানীই সম্রাট আকবরের চেয়ে আমাদের বেশী আপনার জন, আমাদের জনপ্রিয় প্রতিনিধি। তার মনের ব্যর্থ প্রণয়কল্পনার সজল-করুণ স্পর্শটি কাব্যরূপান্তরের অপেক্ষা না রেখেই বিষয়গত আকর্ষণের জন্যই আমাদের মনে রেখাপাত করে। আমরা এইরূপ কবিতার বিচার করি কাব্যাদর্শের মানদণ্ডে নয়, সহমর্মিতার সহজ টানে। সাজাহানের মত অক্ষয়-আদর্শনিষ্ঠ প্রেমের তাজমহল নির্মাণের আমাদের ক্ষমতা নেই বলেই হরিপদ কেরানীর করুণ বঞ্চনাই আমাদের মর্মে বিদ্ধ হয়। কিন্তু একফোঁটা যত্ননিরুদ্ধ চোখের জল, একটি ব্যথাতুর, স্মৃতিমন্থর দীর্ঘশ্বাস কি তাজমহলের কালজয়ী গৌরবের, অপূর্ব শিল্পনির্মিতির প্রতিস্পর্ধী হতে পারে? পুরাণে অবশ্য সত্যভামার অভিমানচূর্ণকারী পরীক্ষায় কৃষ্ণনামাঙ্কিত তুলসীপত্র স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের দেহ ও তাঁর ভাণ্ডার-সঞ্চিত সমস্ত রত্নরাশির চেয়ে তুলাদণ্ডে অধিক ভারী হয়েছিল। পুরাণে যা ঘটেছিল, কাব্যেও কি তারই পুনরাবৃত্তি হবে?

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় দাবি যে তিনি গদ্যছন্দের দ্বারা কবিতার পরিধি বিস্তার করেছেন। এ দাবি সত্য হলেও অনন্য নয়। যুগে যুগে লোকসাহিত্য, লোকসঙ্গীত, লোকশিল্প অভিজাত কলাসৌন্দর্যের সম্প্রসারণ সাধন করেছে। কবি-ঝুমুরের গান, বাউলসঙ্গীত, পটুয়া শিল্প, রায়বেঁশে নৃত্য—এসবই তো সমুন্নত আদর্শ শিল্পকলার প্রাকৃতজনোচিত রূপান্তর। গদ্যকবিতা হয়তো মর্যাদার দিক দিয়ে কাব্যের আদর্শ থেকে এতটা অবনমিত হয় নি। তবুও যে মানসপ্রবণতা, যে দুরূহ থেকে সহজের দিকে যাওয়া লোকায়ত রূপসৃষ্টির মূল প্রেরণা, গদ্যকবিতার ক্ষেত্রেও মোটামুটি তারই প্রয়োগ হয়েছে। অবশ্য পরিবেশ-পার্থক্য ও উপাদান-সাঙ্কর্যের জন্য এদের মধ্যে কিছু স্বাদবৈচিত্র্যও পাওয়া যায়। গল্পরস, মনোবিশ্লেষণের রস, তুচ্ছ উপকরণ থেকে উদ্ভূত একরকম তৃণসুলভ গন্ধ, অলস অর্ধোক্তির আয়েসী আমেজ, দার্শনিক মননের আলগা সুতোর গাঁথুনি—এই বিমিশ্র বিচিত্রতা এই কবিতাগুলি থেকে বিকীর্ণ হয়েছে। যারা বিশুদ্ধ কাব্য-সৌন্দর্য উপভোগের অনধিকারী, তারা এই সহজ-উৎসারিত রসপ্রাচুর্যে বিশেষ তৃপ্তি লাভ করতে পারে। সুতরাং এই জাতীয় কবিতা শ্রেষ্ঠত্বের দাবি না করতে পারলেও বহুবিধ রুচিকে পরিতৃপ্ত করার দাবি ন্যায্যভাবেই উত্থাপিত করতে পারে। অনুর্বর জমিতে নিকৃষ্ট ধরনের শস্য উৎপন্ন হলেও তাতে আমাদের খাদ্যসরবরাহ বৃদ্ধি পায়, সুতরাং মোটের উপর এতে আমাদের লাভই হয়।

রবীন্দ্রনাথ আরও একটি দাবি করেছেন, যেটি গদ্যকবিতার শ্রেষ্ঠত্ব-ঘোষণামূলক। তিনি বলেছেন যে তিনি গদ্যছন্দে এমন অনেক কবিতা লিখেছেন যা তিনি প্রচলিত কাব্যছন্দে লিখতে পারতেন না। অবশ্য ছোট ও আঁকাবাঁকা খালে যে জাতীয় ডিঙি নৌকা চলে তা বৃহত্তর নদীতে অচল। কেউ যদি পদ্মার বৃহৎ বজরা নিয়ে সুন্দরবনের খুঁড়ি খালে প্রবেশ করতে চান তাতে তাঁর

নৌচালননৈপুণ্যের অভাবই সূচিত হবে। বিষয়ের সঙ্গে রূপবন্ধের যে সহজ সম্পর্ক থাকে এ তারই স্বীকৃতি মাত্র। যে সমস্ত বিরল ক্ষেত্রে বিশাল কাল বা স্থানের পটভূমিকায় এক বিপুল গতিবেগসম্পন্ন ঘটনা বা আবেগপ্রবাহ বর্ণনার প্রয়োজন হয় সেইসব ক্ষেত্রেই গদ্যকবিতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথের "শিশুতীর্থ" কবিতাটির সর্বাপেক্ষা উপযোগী-প্রকাশ গদ্যছন্দেই সম্ভব। পদ্যের নিয়মিত ছন্দে এই বিরাট বহুমুখী ভাব-আন্দোলনকে প্রতিফলিত করা যায় না। অন্যান্য ক্ষেত্রে গদ্যকবিতা যে সাধারণ কবিতার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর, নিরপেক্ষ বিচারের মানদণ্ডে তা প্রতিষ্ঠিত করা দুরূহ।

রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন যে, যে গদ্যছন্দকে যথাযথ আয়ত্ত ও প্রয়োগ করতে পারবে তার থাকা চাই রাজপ্রতাপ, কেন না এ ছন্দ বাইরে থেকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় না, অন্তর থেকে এর সূক্ষ্ম গতিস্পন্দ ফুটিয়ে তুলতে হয়। কাব্যছন্দের প্রবহমানতা বা ধ্বনিঝঙ্কার বাদ দিয়েও যদি গদ্যছন্দে সেইরূপ আকর্ষণীশক্তির পরিচয় দিতে হয়, তবে ছন্দপ্রয়োগকুশলতা যে আরও সূক্ষ্ম ও উন্নত পর্যায়ের হওয়া প্রয়োজন সে তো স্বতঃসিদ্ধ সত্য। বাহিরের সহায়তা একেবারে বর্জন করে ভাবানুভূতির অন্তর্নিহিত প্রেরণা থেকে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর, অথচ বিষয়ের রূপবিধানে সক্ষম ছন্দস্পন্দের আবিষ্কার অত্যন্ত উন্নত কলাকৌশলের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে থিওরি হিসাবে তা যতদূর অবিসংবাদিত সত্য, প্রয়োগের দিক দিয়ে তার সার্থক উদাহরণের সংখ্যা সে পরিমাণে খুব বিরল। রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র কাব্যসৌন্দর্য-সৃষ্টির মধ্যে তিনি এই জাতীয় দৃষ্টান্ত বিশেষ রেখে যেতে পারেন নি। তাঁর পরবর্তীদের রচনায় এর পরিচয় আরও দুর্লভ। মানুষের রুচি ও সৌন্দর্যবোধ কাব্যের অলঙ্করণাতিশয্যের প্রতি বিমুখ হয়েছে, হয়তো মিলের মোহও কিছুটা কাটিয়েছে কিন্তু কাব্যোচিত ছন্দস্পন্দ ও ধ্বনিপ্রবাহকে একেবারে ত্যাগ করতে পারে নি। ভাবের আবেদনকে মনের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে ভাবাতিরিক্ত কিছুটা ব্যঞ্জনাশক্তি ও বিন্যাসকৌশল এখনও অপরিহার্য আছে। রিক্ত ভাব-নির্ভরতার সীমানির্দেশ এখনও সর্বস্বীকৃতরূপে নির্ধারিত হয় নি। কাজেই রবীন্দ্রনাথ কাব্যের সুদূর ভবিষ্যৎ মণ্ডন-কলা সম্বন্ধে কিছুটা সন্ধান দিলেও বর্তমান কবিকৃতির উপর তাঁর যে প্রভাব তা সর্বতঃ শুভ কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। হয়তো এই নতুন আদর্শের দিকে আমরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হব, কিন্তু তা আমাদের কাব্য-মনোভাবের সহজ সর্বজনীন প্রকাশ কোনদিন হতে পারবে কি না তা অনিশ্চিতের পর্যায়েই রয়ে গেল।

প্রথম আলোর চরণধ্বনি

শ্রীসজনীকান্ত দাস

যে কবির খ্যাতি বিশ্বব্যাপ্ত হইয়াছে তিনি পূর্বগামীদের অনুকরণ ও অনুসরণের দ্বারা বাণীসাধনা শুরু করিয়াছেন ইহা পাথুরে প্রমাণ সম্বলিত অকাট্য ইতিহাস হইলেও কাব্যসম্মিত সত্য হইতে পারে না। মহাকবি বাল্মীকি "মা নিষাদ···" দিয়াই যাত্রা আরম্ভ করিবেন, "অস্তি কশ্চিৎ বাগ্‌বিশেষঃ"—বিরূপ সহধর্মিণীর নিকট কিংবদন্তীমূলক এই মিনতির মধ্যেই মহাকবি কালিদাসের চারিটি কাব্যের সূচনা নিহিত থাকিবে। শিশু বা নিতান্ত বালক রবীন্দ্রনাথের "দ্বিরেফ" শব্দ শোভিত পদ্ম বিষয়ক, বর্ষাসমাগমে মীনগণের হীনাবস্থা মোচন বিষয়ক অথবা আমসত্ত্ব-কদলী-সন্দেশ বিষয়ক রচনা আলেকজাণ্ডার পোপের (?) "Mother mother, mercy take I will never verses make" অথবা কবিবর ঈশ্বর গুপ্তের "রেতে মশা, দিনে মাছি, এই তাড়িয়ে কলকেতায় আছি" পর্যায়ের পদ্য বা ভার্স মাত্র, কাব্য নয়। শিশু, বালক বা কিশোর রবীন্দ্রনাথের যে সকল কবিতা বা কাব্যাংশ এতাবৎকাল আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তিনি তাঁহার 'জীবনস্মৃতি' বা অন্যত্র যে সকল কবিতার উল্লেখ করিয়াছেন তাহার সবগুলিই যে কালিদাস-শেক্সপীয়ারের অনুবাদ এবং মধুসূদন-বিহারীলাল-হেমচন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-অক্ষয় চৌধুরীর অনুকরণ অথবা সবগুলিই যে নিছক ভার্স বা পদ্য ইহা মানিতে হইলে প্রত্যুষের অরুণাভার মধ্যে মধ্যাহ্ন-রবির দীপ্তির সম্ভাবনাকেও অস্বীকার করিতে হয়। যে প্রেরণায় প্রকাশ্য সূর্যোদয়ের পূর্বেই পূর্বদিগন্ত রাঙিয়া উঠে সেই স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা কবির প্রথম আত্মপ্রকাশের মধ্যে নিশ্চিত ভাবে না থাকিলে সেই কবিজীবন শেষ পর্যন্ত সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। সচরাচর আমরা দেখিতে পাই বাল্যকালে সকল কবির দেশাত্মবোধক কবিতাগুলি পূর্বগামীদের প্রভাবেই রচিত হইয়া থাকে, বিশেষ করিয়া কবি যদি পরাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করেন তাহা হইলে সংক্রামক ব্যাধির মত পরাধীনতা-পাশ-ছেদনের আবেগ বা জ্বর তাঁহাকে আক্রমণ করেই। রবীন্দ্রকাব্যের আদি-পর্বের হিন্দুমেলায় পঠিত বা পঠিত হইবার জন্য রচিত কবিতাগুলি, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে সন্নিবিষ্ট গান বা কবিতাগুলি, ভারতবিষয়ক ও 'প্রকৃতির খেদ' শীর্ষক কবিতা নিঃসংশয়ে এই পর্যায়ের সংক্রামিত কবিতা। সর্বপ্রথম মুদ্রিত গান "একসূত্রে বাঁধিয়াছি—" ও সর্বপ্রথম মুদ্রিত বেনামী কবিতা "অভিলাষ"ও ওই পর্যায়েই পড়ে। প্রাথমিক কবিতাগুলির তালিকা মোটামুটি এইরূপ দাঁড়ায়:

১। একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম' নাটকে ১৮৭৪ ৯ই জুলাই।

২। অভিলাষ—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ১৮৭৪ নবেম্বর-ডিসেম্বর।

৩। "হিন্দুমেলার উপহার"—'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় স্বনামে ১৮৭৫ ২৫শে ফেব্রুয়ারি।

৪। প্রকৃতির খেদ—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ১৮৭৫ জুন।

৫। জ্বল্ জ্বল্ চিতা—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটকে ১৮৭৫ ৩০ নবেম্বর।

৬। প্রলাপ (১, ২, ৩) 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বে' ১৮৭৬ ২৫ ফেব্রুয়ারি হইতে।

৭। দেখিছ না অয়ি ভারতসাগর—১৮৭৭ সনে হিন্দুমেলায় পঠিত; জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বপ্নময়ী' নাটকে ১৮৮২।

৮। অয়ি বিষাদিনী বীণা—'জাতীয় সঙ্গীত' প্রথম ভাগ দ্বিতীয় সংস্করণে ১৮৭৮ ৩০ আগষ্ট।

৯। ভারতরে তোর কলঙ্কিত—ঐ ঐ ঐ ১৮৭৮ ৩০ আগষ্ট

এই তালিকায় অনুবাদ কবিতাগুলিকে বাদ দেওয়া

হইয়াছে বলিয়া আন্দাজ ১৮৭৩-৭৪ সনে অনূদিত ও পরবর্তীকালে 'ভারতী'র "সম্পাদকীয় বৈঠকে" প্রকাশিত 'ম্যাকবেথ' ও 'কুমারসম্ভব' হইতে অনুবাদ বাদ দিয়াছি। ১২৮৪ শ্রাবণ (১৮৭৭ জুলাই) হইতে প্রকাশিত 'ভারতী' মাসিকপত্রকে ঐতিহাসিককালের কীর্তির মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে অর্থাৎ "তোমারি তরে মা সঁপিনু" প্রভৃতি গান এবং 'শৈশব সঙ্গীত' ও 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র কবিতাগুলি তালিকায় ধরা হয় নাই।

উপরোক্ত কবিতাগুলির মধ্যে "প্রথম আলোর চরণধ্বনি" শুনিতে পাইলে আমিই সর্বাধিক খুশী হইতাম কারণ ৩নং "হিন্দুমেলার উপহার" এবং ৫ ও ৬ নং "জ্বল্ জ্বল্ চিতা" ও "প্রলাপ" কবিতা দুইটি ছাড়া বাকি ছয়টি বেনামী কবিতা বহু পরিশ্রম ও অনুসন্ধান করিয়া আমিই সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত করি। রবীন্দ্রনাথের স্বনামে প্রকাশিত তৃতীয় কবিতাটি পুরাতন দ্বিভাষিক 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ঘাঁটিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আবিষ্কার করেন। পঞ্চম ও ষষ্ঠ কবিতা যে রবীন্দ্রনাথের তাহা পূর্বেই প্রচারিত হইয়াছিল। আমি ১৯৩৯ সনে এই সন্ধান-কার্যে রবীন্দ্রনাথের সাহায্য পাইয়াছিলাম এবং আবিষ্কারের সংবাদ সে সময় বাংলাদেশের যাবতীয় সংবাদ-পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় শিরোনামায় ঘোষিত হইয়াছিল। ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের 'শনিবারের চিঠি'তেও "রবীন্দ্ররচনাপঞ্জী" নামে এইগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণী প্রকাশ করি। এই সামান্য ঘটনাটির উল্লেখ অত্যন্ত দুঃখের সহিত এই কারণে করিতে হইতেছে যে পরবর্তী রবীন্দ্রগবেষকেরা অনবধানতাবশতঃ রবীন্দ্রসাগর-সেতু-বন্ধনে এই অধম কাঠ-বিড়ালীর সামান্য সাহায্যটুকু স্মরণে রাখেন নাই।

যাহা হউক, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রাক্‌'সন্ধ্যাসঙ্গীত' যুগের কবিতাগুলিকে আমল দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'কেও বাদ দিতে পারিলে তিনি খুশী হইতেন কিন্তু ভাবের দিক দিয়া এই কাব্যেই সর্বপ্রথম তাঁহার নিজস্বতা ফুটিয়াছে এই ধারণার বশবর্তী হইয়া তিনি এইগুলিকে রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার মতে 'কড়ি ও কোমলে'ই তাঁহার নিজস্ব ভাব স্বকীয় রূপ বা ফর্ম লইয়া বিশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সেইখান হইতেই তাঁহার কাব্যরচনাবলীকে তিনি অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিতে রাজি হইয়াছিলেন। আদিযুগের কথা প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছিলেন :

"ইতিহাস সবই মনে রাখতে চায় কিন্তু সাহিত্য অনেক ভোলে। ছাপাখানা ঐতিহাসিকের সহায়। সাহিত্যের মধ্যে আছে বাছাই করার ধর্ম, ছাপাখানা তার প্রবল বাধা। কবির রচনাক্ষেত্রকে তুলনা করা যেতে পারে নীহারিকার সঙ্গে। তার বিস্তীর্ণ ঝাপসা আলোর মাঝে মাঝে ফুটে উঠেছে সংহত ও সমাপ্ত সৃষ্টি। সেই গুলিই কাব্য। আমার রচনায় আমি তাদেরই স্বীকার করতে চাই। বাকি যত ক্ষীণ বাষ্পীয় ফাঁকগুলি যথার্থ সাহিত্যের শামিল নয়। ঐতিহাসিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী; বাষ্প নক্ষত্র, ফাঁক কোনোটাকেই সে বাদ দিতে চায় না।"

কবির নিজের কাব্য সম্বন্ধে নির্মম মত আর একটি বাক্যে ঘোষিত হইয়াছে—"অরণ্যকে চেনাতে গেলেই জঙ্গলকে সাফ করা চাই, কুঠারের দরকার।" জীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় আপত্তি করিয়া বলিয়াছেন, "কিন্তু জীবনীলেখক হিসাবে আমাদের মত অন্যরূপ; সাহিত্য-সৃষ্টির এই অরুণযুগকে রবীন্দ্র-কাব্যজিজ্ঞাসা হইতে বর্জন করিবার অধিকার আমাদের নাই। রবীন্দ্র-প্রতিভা উন্মেষের সূচনা হয় এই যুগেই।"

প্রতিভা-উন্মেষের বিশেষ পরিচয় কিন্তু এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত আদি-পর্বের কবিতাগুলিতে ফুটিয়া উঠে নাই। "অভিলাষ" কবিতার

> "অতিক্রম করা যায় যত পান্থশালা,
> তত যেন অগ্রসর হতে ইচ্ছা হয়।"

অথবা "প্রকৃতির খেদ"-এর

> "সেই এক অভিনব, মধুর সৌন্দর্য্য তব,
> আজিও অঙ্কিত তাহা রয়েছে মানসে।
> আঁধার সাগর তলে একটি রতন জ্বলে
> একটি নক্ষত্র শোভে মেঘান্ধ আকাশে।"

প্রভৃতি বালকের রচনা হিসাবে চমক লাগায় বটে কিন্তু কাব্যের জাদুস্পর্শে মনকে অভিভূত করে না।

সর্বপ্রথম এই জাদুর ছোঁয়াচ মেলে "অবসাদ" শীর্ষক একটি সম্পূর্ণ বিস্মৃত কবিতায়। প্রভাতকুমার তাঁহার 'রবীন্দ্রজীবনী' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রথমখণ্ডের ৭০-৭১ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মালতীপুঁথি হইতে "একটি কবিতার কিয়দংশ" উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—

"হে কবিতা—হে কল্পনা
জাগাও-জাগাও দেবি উঠাও আমারে দীনহীন
ঢাল এ হৃদয় মাঝে জ্বলন্ত অনলময় বল—" ইত্যাদি।

প্রভাতকুমার বলিয়াছেন, "কবিতাটি আমেদাবাদে ১৮৭৮ জুলাই ৬ তারিখে লিখিত।"

মালতীপুঁথি আমি দেখি নাই। কিন্তু সম্পূর্ণ কবিতাটি "অবসাদ" শিরোনামায় মুদ্রিত দেখিয়াছি। কবিতাটির শেষে "বালক"রচিত বলিয়া উল্লেখ আছে এবং এই উল্লেখ যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকৃত তাহাতে সংশয় নাই। তাই আমাদের মনে হয় মালতীপুঁথির প্রভাতবাবু কর্তৃক প্রদত্ত তারিখে কিছু ভুল আছে। ১৮৭৮ সনের ৬ই জুলাই তারিখে লিখিত কবিতা ১৮৮৬ সনের মাচ মাসে পত্রস্থ করিয়া তাহাকে বালকের লেখা বলিয়া জাহির অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথ করিবেন না। পঁচিশ বৎসরের যুবক সোওয়া সতের বৎসরের যুবাকে "বালক" বলিয়া অবজ্ঞা করিতেই পারেন না। সূচীপত্রেও "বাল্যকালের লেখা" বলা হইয়াছে। কবিতাটি সম্পূর্ণ মুদ্রিত করিতেছি :

অবসাদ

দয়াময়ি, বাণি, বীণাপাণি,
জাগাও—জাগাও, দেবি, উঠাও আমারে দীন হীন!
ঢাল' এ হৃদয় মাঝে জ্বলন্ত অনলময় বল!
দিনে দিনে অবসাদে হইতেছি অবশ মলিন;
নিৰ্জ্জীব এ হৃদয়ের দাঁড়াবার নাই যেন বল!
নিদাঘ-তপন-শুষ্ক ম্রিয়মান লতার মতন
ক্রমে অবসন্ন হোয়ে পড়িতেছি ভূমিতে লুটায়ে,
চারি দিকে চেয়ে দেখি শ্রান্ত আঁখি করি উন্মীলন—
বন্ধুহীন—প্রাণহীন—জনহীন—মরু মরু মরু—
আঁধার—আঁধার সব—নাই জল নাই তৃণ তরু,—
নিৰ্জ্জীব হৃদয় মোর ভূমি তলে পড়িছে লুটায়ে;
এস দেবি, এস, মোরে,
রাখ এ মূৰ্চ্ছার ঘোরে;
বলহীন হৃদয়েরে দাও দেবি, দাওগো উঠায়ে!
দাও দেবি সে ক্ষমতা, ও গো দেবি, শিখাও সে মায়া—
যাহাতে জ্বলন্ত, দগ্ধ, নিরানন্দ মরুমাঝে থাকি
হৃদয় উপরে পড়ে স্বরগের নন্দনের ছায়া,—
শুনি সুহৃদের স্বর থাকিলেও বিজনে একাকী!
দাও দেবি সে ক্ষমতা, যাহে এই নীরব শ্মশানে,
হৃদয়-প্রমোদ-বনে বাজে সদা আনন্দের গীত!
মুমূর্ষু মনের ভার—
পারি না বহিতে আর—
হইতেছি অবসন্ন—বলহীন—চেতনা-রহিত—
অজ্ঞাত পৃথিবী-তলে—অকৰ্ম্মণ্য—অনাথ—অজ্ঞান—
উঠাও উঠাও মোরে—করহ নূতন প্রাণ দান!
পৃথিবীর কৰ্ম্মক্ষেত্রে যুঝিব—যুঝিব দিবারাত—
কালের প্রস্তর-পটে লিখিব অক্ষয় নিজনাম।
অবশ নিদ্রায় পড়ি করিব না এ শরীর পাত,
মানুষ জন্মেছি যবে করিব কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান!
দুর্গম উন্নতি পথে পৃথ্বি তরে গঠিব সোপান,
তাই বলি দেবি—
সংসারের ভগ্নোদ্যম, অবসন্ন, দুৰ্ব্বল পথিকে
করগো জীবন দান তোমার ও অমৃত নিষেকে!

ইহা কবির সম্পূর্ণ নিজের স্বর, প্রথম আলোর চরণধ্বনি। আমার অনুমান এই কবিতার রচনাকাল আরও অন্ততঃ চার-পাঁচ বৎসর পূর্বে, কবিতাটি "অভিলাষ" কবিতার সমসাময়িক হওয়াই সম্ভব। রবীন্দ্র-কাব্য-মহীরুহের সদ্যজাত দ্বিদল অঙ্কুর—"অভিলাষ" ও "অবসাদ"। কবি স্বয়ং 'জীবনস্মৃতি'তে বিদ্যালয়ের শিক্ষায় ব্যর্থ ও কবিতার অজস্রতায় সার্থক এইকালের কথা এই ভাবে বলিয়াছেন—

"বাড়ির লোকেরা আমার হাল ছাড়িয়া দিলেন। কোনোদিন আমার কিছু হইবে এমন আশা, না আমার না আর-কাহারও মনে রহিল। কাজেই কোনো কিছুর

ভরসা না রাখিয়া আপন মনে কেবল কবিতার খাতা ভরাইতে লাগিলাম। সে লেখাও তেমনি। মনের মধ্যে আর কিছুই নাই, কেবল তপ্ত বাষ্প আছে—সেই বাষ্পভরা বুদ্বুদরাশি, সেই আবেগের ফেনিলতা, অলস কল্পনার আবর্তের টানে পাক খাইয়া নিরর্থক ভাবে ঘুরিতে লাগিল। তাহার মধ্যে কোনো রূপের সৃষ্টি নাই, কেবল গতির চাঞ্চল্য আছে। কেবল টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিয়া ফুটিয়া ওঠা, ফাটিয়া ফাটিয়া পড়া। তাহার মধ্যে বস্তু যাহা কিছু ছিল তাহা আমার নহে, সে অন্য কবিদের অনুকরণ; উহার মধ্যে আমার যেটুকু সে কেবল একটা অশান্তি, ভিতরকার একটা দুরন্ত আক্ষেপ। যখন শক্তির পরিণতি হয় নাই অথচ বেগ জন্মিয়াছে তখন সে একটা ভারি অন্ধ আন্দোলনের অবস্থা।"

এই "অশান্তি…আক্ষেপ…অন্ধ আন্দোলনের অবস্থা"য় "অবসাদ" কবিতাটি লেখা। একদিকে আত্মীয়স্বজনের তাঁহার সম্বন্ধীয় "উচ্চ অভিলাষ"কে ধিক্কার দিয়া বালক-কবি বলিতেছেন—

"জনমনোমুগ্ধকর উচ্চ অভিলাষ।
তোমার বন্ধুর পথ অনন্ত অপার।"

অন্যদিকে নিদারুণ অবসাদের মধ্যে বাণী-বীণাপাণির শরণ লইয়া বলিতেছেন—

"জাগাও জাগাও দেবি, উঠাও আমারে দীনহীন।…
ক্রমে অবসন্ন হোয়ে পড়িতেছি ভূমিতে লুটায়ে,
চারিদিকে চেয়ে দেখি শ্রান্ত আঁখি করি উন্মীলন—
বন্ধুহীন—প্রাণহীন—জনহীন—মরু মরু মরু—
আঁধার—আঁধার সব—নাই জল নাই তৃণ তরু,—
নির্জ্জীব হৃদয় মোর ভূমিতলে পড়িছে লুটায়ে।"

চারিদিক দিয়া লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত কবি একমাত্র কাব্যসরস্বতীর কৃপাপ্রার্থী—

"অজ্ঞাত পৃথিবী-তলে—অকর্মণ্য—অনাথ—অজ্ঞান—
উঠাও উঠাও মোরে—করহ নূতন প্রাণ দান!
পৃথিবীর কর্মক্ষেত্রে যুঝিব—যুঝিব দিবারাত—
কালের প্রস্তর-পটে লিখিব অক্ষয় নিজ নাম।"

বালক-কবির এ ব্যাকুল প্রার্থনা দেবী যে শুনিয়াছিলেন কালের প্রস্তর-পটে তাঁহার অক্ষয় নাম তাহার প্রমাণ দিতেছে। এই ছন্দোবদ্ধ প্রার্থনা অনুকরণ নয়, অনুসরণ নয়, উহা অবসন্ন কবির একান্ত হৃদয়ের কথা—নিজের কথা। প্রথম আলোর সুনিশ্চিত চরণধ্বনি ইহা।

উপরে 'জীবনস্মৃতি' হইতে যে সময়ের কথা উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা হইতেছে পিতার সহিত প্রথম শান্তিনিকেতন ও হিমালয় ভ্রমণান্তে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরের কাল। ১৮৭৩ সনের মাঝামাঝি রবীন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসেন—তখন তাঁহার বয়স বারো বছর মাত্র।

১৮৯৮ সনের ২৯ জানুয়ারি তারিখে রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন—"এক-একবার মনে হয়, আমার মধ্যে দুটো বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব চলছে। একটা আমাকে সর্বদা বিশ্রাম এবং পরিসমাপ্তির দিকে আহ্বান করছে, আর একটা আমাকে কিছুতে বিশ্রাম করতে দিচ্ছে না।"

এই দ্বন্দ্ব সেই বাল্যের "অবসাদ" ও "অভিলাষে"র দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বই আমরা পরবর্তী কালে "সন্ধ্যাসঙ্গীত" ও "প্রভাত সঙ্গীতে"র দ্বন্দ্বরূপে দেখিতে পাই; 'মানসী' এবং 'কড়ি ও কোমলে' সেই একই দ্বন্দ্ব।

প্রথম-আলোর-চরণধ্বনি-"অবসাদে"র প্রদীপ্ত ভাস্বর রূপ আমরা দেখিতে পাই দীর্ঘকাল পরে লেখা (২৩ ফাল্গুন, ১৩০০) 'চিত্রা'র "এবার ফিরাও মোরে" কবিতায়। সেখানে কবি বলিতেছেন:

"এ দৈন্যমাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এস স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।

এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে, রঙ্গময়ী। দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর, ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়।
বিজন বিষাদঘন অন্তরের নিকুঞ্জচ্ছায়ায়
রেখো না বসায়ে আর। দিন যায়, সন্ধ্যা হয়ে আসে।
অন্ধকারে ঢাকে দিশি, নিরাশ্বাস উদাস বাতাসে
নিঃশ্বসিয়া কেঁদে ওঠে বন। বাহিরিনু হেথা হতে

উন্মুক্ত অম্বরতলে, ধূসরপ্রসর রাজপথে
জনতার মাঝখানে। কোথা যাও, পান্থ, কোথা যাও,
আমি নহি পরিচিত, মোর পানে ফিরিয়া তাকাও।
বলো মোরে নাম তব, আমারে ক'রো না অবিশ্বাস।
সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টিমাঝে বহুকাল করিয়াছি বাস
সঙ্গীহীন রাত্রিদিন ; তাই মোর অপরূপ বেশ,
আচার নূতনতর ; তাই মোর চক্ষে স্বপ্নাবেশ,
বক্ষে জ্বলে ক্ষুধানল। যেদিন জগতে চলে আসি,
কোন্ মা আমারে দিলি শুধু এই খেলাবার বাঁশি।
বাজাতে বাজাতে তাই মুগ্ধ হয়ে আপনার সুরে
দীর্ঘদিন দীর্ঘরাত্রি চলে গেনু একান্ত সুদূরে
ছাড়ায়ে সংসারসীমা। সে-বাঁশিতে শিখেছি যে-সুর
তাহারি উল্লাসে যদি গীতশূন্য অবসাদপুর
ধ্বনিয়া তুলিতে পারি, মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সংগীতে
কর্মহীন জীবনের এক প্রান্ত পারি তরঙ্গিতে
শুধু মুহূর্তের তরে, দুঃখ যদি পায় তার ভাষা,
সুপ্তি হতে জেগে ওঠে অন্তরের গভীর পিপাসা
স্বর্গের অমৃত লাগি—তবে ধন্য হবে মোর গান,
শত শত অসন্তোষ মহাগীতে লভিবে নির্বাণ।"

বালক-কবির "অবসাদে" ইহারই প্রথম চরণধ্বনি শুনিতে পাই—

"দাও দেবি সে ক্ষমতা, ওগো দেবি শিখাও সে মায়া—
যাহাতে জলন্ত দগ্ধ, নিরানন্দ মরুমাঝে থাকি
হৃদয় উপরে পড়ে স্বরগের নন্দনের ছায়া—
শুনি সুহৃদের স্বর থাকিলেও বিজনে একাকী।
দাও দেবি সে ক্ষমতা, যাহে এই নীরব শ্মশানে,
হৃদয়-প্রমোদ-বনে বাজে সদা আনন্দের গীত।
মুমূর্ষু মনের ভার—পারি না বহিতে আর—
হইতেছি—অবসন্ন—বলহীন—চেতনারহিত।"

রবীন্দ্র-কাব্যের আদি পর্বের বিচার-বিশ্লেষণ করিতে করিতে হঠাৎ এই "অবসাদে" আসিয়া সাহিত্যরসিকের চিত্ত বিস্ময়বিমুগ্ধ ও উৎফুল্ল হইয়া উঠে এবং কবিরই পরবর্তী গানের ভাষায় তাঁহাকে বলিতে ইচ্ছা হয়—

"নীল অতলের কোথা থেকে উদাস তারে করল যে কে।
গোপনবাসী সেই উদাসীর ঠিক-ঠিকানা নেই॥
'সুপ্তি শয়ন আয় ছেড়ে আয়' জাগে যে তার ভাষা,
সে বলে, 'চল আছে যেথায় সাগরপারের বাসা।'
দেশবিদেশের সকল ধারা সেইখানে হয় বাঁধনহারা,
কোণের প্রদীপ মিলায় শিখা জ্যোতিঃসমুদ্রেই॥
প্রথম আলোর চরণধ্বনি উঠল বেজে যেই॥"

ঠাকুরবাড়ির নিভৃত গৃহকোণের ভীরু প্রদীপশিখা শেষ পর্যন্ত জ্যোতিঃসমুদ্রে শুধু লীন হয় নাই, জ্যোতিঃসমুদ্রকে আলোড়িত উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে। প্রথম-আলোর-চরণধ্বনি এই "অবসাদ" কবিতায় ভাস্বর জ্যোতির সূচনা যে লুকায়িত আছে তাহা নিঃসংশয়ে ঘোষণা করা যায়, কারণ অবসন্ন বলহীন ভগ্নোদ্যম বালক-কবির বাগ্দেবীর কাছে সেদিনের প্রার্থনা

"কালের প্রস্তর-পটে লিখিব অক্ষয় নিজ নাম"—

ব্যর্থ হয় নাই।

●

প্রণাম করি পঁচিশে বৈশাখে

প্রণাম করি পঁচিশে বৈশাখে,—
আমার কবি তোমার কবি সবার কবি তাঁকে।
তাঁহারি মাঝে মিলিয়াছিল মোদের প্রাণধারা,
একটি রবি দিনের নভে মোরা রাতের তারা।
বিশ্বপ্লাবী আলোকে থর মুছিয়া গেছি সবে,
প্রকাশ পাব হয়তো কোনো রাতের উৎসবে।
যদিও জানি বহুযুগের পার
তারার আলো ভাসাতে পারে আকাশ-পারাবার
প্রণাম করি পঁচিশে বৈশাখে
সারা যুগের সার্থকতা ঘিরিয়া থাক্ তাঁকে॥

রবীন্দ্রজীবনীর নূতন উপকরণ

শ্রীসজনীকান্ত দাস

১৩৪৬ বঙ্গাব্দে (১৯৩৯ খ্রীঃ) যখন "রবীন্দ্ররচনাপঞ্জী" লিখিতে ও বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 'রবীন্দ্ররচনাবলী'র অচলিত সংগ্রহ সম্পাদন করিতেছিলাম, তখন কেমন করিয়া কোথা হইতে মনে নাই রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি পত্র ও পত্রাংশ আমার হস্তগত হয়, ওই সঙ্গে অপরের লেখা একটি ইংরেজীপত্রও ছিল। সেই সময় চেষ্টা করিলে এইগুলি সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করিতে পারিতাম, আজ ভগ্নস্বাস্থ্যে সে উদ্যম হারাইয়াছি। অন্য উৎসাহী গবেষক চেষ্টা করিলে হারানো যোগসূত্র পুনঃস্থাপিত হইতে পারে এবং শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার প্রয়োজনবোধ করিলে পরবর্তী সংস্করণ 'রবীন্দ্রজীবনী'তে যথাস্থানে এগুলির ব্যবহার করিতে পারিবেন এই আশায় পত্রগুলি যদৃষ্টং তচ্ছাপিতম্ করিতেছি। পত্রগুলি একান্তভাবে বৈষয়িক, সেইজন্যই জীবনীকারের পক্ষে ইহাদের মূল্য বেশী। পত্রগুলি ইতিপূর্বে অন্যত্র প্রকাশিত হইয়াছে কিনা তাহাও আমার জানা নাই।

পত্র (১)

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

প্রিয়বরেষু,

আপনার প্রেরিত দান এই মাত্র পাইয়া কত খুসি হইলাম বলিতে পারি না। এই পঞ্চাশটি টাকার সঙ্গে আপনার যে প্রীতি ও শ্রদ্ধা দিয়াছেন তাহা আমার হৃদয়ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইল। রাজা মহারাজেরা অনুগ্রহ করিয়া মনোরথ পূরণ করিলেও বন্ধুত্বের আনুকূল্যের মত তাহা এমন মধুর বোধ হয় না—আপনি হৃদয়ের সঙ্গে দিয়াছেন, আমি আপনাকে হৃদয় প্রত্যর্পণ করিতেছি। আপনি মঙ্গলকার্যে সহায়তা করিলেন। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করিবেন। একবার অবকাশমত শান্তিনিকেতনে আসিবেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন কেবল যে বন্ধুকে সহায়তা করিলেন তাহা নহে দেশের মঙ্গলকর্মে যোগদান করিলেন।

শান্তিনিকেতনের ছাতিমতলায় একদিন দস্যুতা হইত জানেন বোধ হয়। আজকাল আমিই প্রধান দস্যু সাজিয়া এখানে বসিয়া আছি, যেরূপ গতিক দেখিতেছি তাহাতে রাজামহারাজরা পালাইয়া রক্ষা পাইবেন, কেবল বিশ্বস্ত বন্ধুদেরই পালাইবার রাস্তা নাই। ইতি ২৫শে মাঘ ১৩০৮

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র (২)

ওঁ

প্রিয়বন্ধুবরেষু,

ঈশ্বর আমাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন— এক্ষণে আমাকে ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। আপনার দ্বারে আমার এই প্রার্থনা যে বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের একটি ছাত্রের ব্যয়ভার আপনাকে গ্রহণ করিতেই হইবে। অধিক নহে, বৎসরে ১৮০ টাকা। প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে যদি এই টাকাটি দেন তবে তাহা আমার পরলোকগতা পত্নীর মৃত্যুবার্ষিক মঙ্গলদান বলিয়া আমি তৃপ্তিলাভ করিব এবং তাহাতে ঈশ্বর আপনারও কল্যাণ করিবেন।

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র (৩)

ওঁ

[কলিকাতা]

প্রিয়বরেষু,

আমাদের আত্মীয় এবং কুষ্টিয়া মোকামের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীকে আপনার কাছে পাঠাইতেছি। এবারে আমাদের অঞ্চলে সুবৃষ্টি হওয়ায় যথেষ্ট পাট আশা করিতেছি। কাজ করিতে ইচ্ছা করেন! কল আছে, লোকও এবার ভাল, বৎসরও আশাজনক, যদি মনোযোগ করেন তবে আপনার তাহাতে ক্ষতি হইবেনা এবং আমাদেরও না হইবার কথা। মহেন্দ্র দাস আমাদের সহিত কাজের বন্দোবস্ত করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। আপনি কি বলেন? একবার না হয়

আপিসের যাইবার পথে সাক্ষাৎ করিয়াই যান্ না। আমার যানবাহনের ঐকান্তিক অভাববশতঃ ফস্ করিয়া কোথাও নড়িতে চাই না—নহিলে গরজের তাড়ায় আজই হাজির হইব সংকল্প ছিল। বিরক্ত করিলাম কিছু মনে করিবেন না—আপনিও করিলে আমি মার্জ্জনা করিব। ইতি বুধবার

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র (৪)

ঔ

প্রিয়বরেষু,

পত্রবাহক আমার শ্যালক শ্রীমান নগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী। দীর্ঘকাল কুষ্টিয়ায় থাকিয়া পাটের কর্ম্ম করিয়াছেন। আপনার যদি পাটের কারবার সম্বন্ধে কোনো বিশ্বাসী কর্ম্মচারীর প্রয়োজন থাকে ও ইহার পরে সেই বিশ্বাস স্থাপন করেন তবে আশা করি আপনাকে অনুতাপ করিতে হইবে না। আপনার প্রয়োজন যদি না থাকে তবে বন্ধুবান্ধবের প্রয়োজন থাকিলেও তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবেন। ইহাকে যদি কোনো কাজের সূত্রে জড়িত করিয়া দিতে পারেন তবে ভদ্র ব্রাহ্মণের উপকার করা হইবে। ইনি এণ্ট্রেন্সে উত্তীর্ণ।

আপনি জুরির হাজ্রি দিতে কবে হইতে যাইবেন? একসঙ্গে যাতায়াত করিলে ক্ষতি কি আছে? ইতি বৃহস্পতিবার

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র (অংশ) ৫

....

সমস্যা আছে।

পুরীতে আমার যে জমি ও গোটাকতক ঘর আছে তাহাতে বাসযোগ্য বাড়ি করিয়া দিলে অনেক টাকা ভাড়া [পাওয়া] যাইতে পারে সেখানকার বন্ধুবান্ধবেরা এইরূপ বলেন। রথীরা দেখিয়া আসিয়াছে সেখানে অতি সামান্য ঘরে প্রত্যহ দেড়টাকা দুইটাকা ভাড়া পাওয়া যায়। হাজার পাঁচেক খরচ করিলে মাসে ১০০্র কাছাকাছি ভাড়া পাইবার কথা। বিদ্যালয়ের fund হইতে এই বাড়িটা করিয়া দিলে কিরূপ হয়? তা যদি না হয় সেখানকার ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট বলিতেছিলেন কুমার শরৎ সিংহ পুরীতে জমি কিনিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক। যদি হাজার তিন চার টাকা পাওয়া [যায়] তবে তাঁহাকে বেচিয়া ঐ টাকা বিদ্যালয়ে জমা করা যাইতে পারে। তুমি কাহাকেও দিয়া শরৎ সিংহের নিকট যাচাই করিতে পার? ২৬শে বৈশাখ

রবিকাকা

পত্র (৬) (রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত ইংরেজীপত্র)।

9th May 1904
[২৮ বৈশাখ ১৩১১]

My Dear Radharaman,

You are probably aware that Rabi Babu has got some land with a building on it on the seaside at Puri. He intends to repair and add to the building in order to make it suitable for his accommodation. But the succession of mishaps in his family has taken him down completely—and he has given up all ideas of pleasure and enjoyment. He is therefore desirous of selling off the place and make over the proceeds in aid of his School. He has heard from the magistrate of Puri that Kumar Sarat Chandra Sinha of Paikpara is anxious to secure some land on the seaside at Puri. If this is true can you enquire if Rabi Babu's place will suit him. I have not seen it myself but have been told that the site is excellent in the midst of the European quarter and it will not be easy for the Kumar to secure a more favourable site. If the Kumar approves there need be no difficulty about the price—for Rabi Babu does not want the money himself but for the School. Will you enquire and let me know as soon as you can.

I enclose Rabi Babu's letter.

Yours sincerely
Ramani Mohan Chatterjee

রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা। মনে হয় পূর্ববর্তী পত্রাংশ তাঁহাকেই লেখা। খুড়শ্বশুর হিসাবে রবীন্দ্রনাথ "রবিকাকা" লিখিয়াছিলেন। উক্ত পত্রাংশ রমণীমোহনকে লিখিত হইলে উহার তারিখ ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে, ২৬শে বৈশাখ ১৩১১।

রবীন্দ্রনাথের ছবি

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শব্দের ধ্বনি ও ছন্দ নিয়ে সারা জীবন খেলা করে ৬৭ বৎসর বয়েসে রবীন্দ্রনাথ নিঃশব্দ রেখার ছন্দ নিয়ে খেলা শুরু করেন। যখন শব্দের জগতে লীলা করছিলেন তখন শব্দ তার অর্থ দিয়ে কবির সচেতন মনের নজর দাবি করছিল। তাই অর্থের দিকে নজর দিয়ে শব্দ চয়ন করছিলেন কবি! কবিতা শুধু অর্থহীন কথার সমষ্টি নয়, শুধু ধ্বনি নয়, অর্থবান শব্দের ধ্বনিময় সমষ্টি।

রেখার নিঃশব্দ জগতে অর্থ নেই, ধ্বনি নেই। রেখা স্বয়ংসম্পূর্ণা, রূপ ছাড়া তার আর কোনও অর্থ নেই। নীল আকাশে আলসভরে ভেসে-যাওয়া শরতের মেঘের যে রূপ, তার সৌন্দর্য ছাড়া আর কি কোনও অর্থ আছে? রূপ অর্থ-হারা, তাই শব্দহীন রেখা অর্থ প্রকাশ করে না, শুধু রূপ ধরে দেয় চোখের সামনে। তাই রেখার জগতে, রূপের জগতে সচেতন মনের খবরদারির প্রয়োজন নেই।

মনের যে মহল থেকে মহাকবির কাব্যগুলি বের হয়ে এসেছিল আমাদের জগতে, সে মহলটি ছিল সচেতন মনের মহল, সেখানে শব্দের বাছাই ছিল, অর্থ-সচেতনতা ছিল। শিল্পী রবীন্দ্রনাথের ছবিগুলি তাঁর অন্তরের যে মহল থেকে এল সেই অবচেতন মনের মহলে কোন চেতন-বাছাই নেই, সচেতন মনের রুচির শাসন নেই। তাই রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও রবীন্দ্রনাথের ছবি—এ দুটির জন্ম তাঁর অন্তর্লোকের দুটি সম্পূর্ণ আলাদা মানস-মৃত্তিকা থেকে। সে কথা কবি নিজে বলেছেন 'শেষ সপ্তকে'র দুটি কবিতায়। তিনি বলছেন—

"পড়েছি আজ রেখার মায়ায়।
কথা ধনী, ঘরের মেয়ে,
অর্থ আনে সঙ্গে করে,
মুখরার মন রাখতে-চিন্তা করতে হয় বিস্তর।
রেখা অপ্রগল্‌ভা, অর্থহীনা,
তার সঙ্গে আমার যে ব্যবহার সবই নিরর্থক।
কথা আমাকে প্রশ্রয় দেয় না, তার কঠিন শাসন;
রেখা আমার যথেচ্ছাচারে হাসে,
তর্জনী তোলে না।"

আর একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছবির সম্বন্ধে বলছেন—

"ঘটনার ডাক-পিওনগিরি করে না সে।
নিজেরই সংবাদ সে নিজে।
জগতে রূপের আনাগোনা চল্‌ছে
সেই সঙ্গে আমার ছবিও এক-একটি রূপ,
অজানা থেকে বেরিয়ে আসছে জানার দ্বারে।
সে প্রতিরূপ নয়।"

কবিতা নিয়ে দিঙনাগাচার্যয়ানা করতে সঙ্কোচ হয়, তবু এই কটি লাইনের মধ্যে রূপ-সৃষ্টির মূল তত্ত্ব এমন করে ধরে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ যে সেটা মেনে না ধরে মন রেহাই দিচ্ছে না।

শিল্পী রবীন্দ্রনাথ অসংশয়ে সকলকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে তাঁর ছবি ঘটনার মোট বহন করে জায়গায় জায়গায় সেটা পৌঁছে দেয় না। তাঁর ছবি ঘটনার মুটেগিরি করে না। ঘটনার মুটেগিরি করে সমাজতত্ত্ববিদ, রাজনীতিবিদ, কিন্তু রস-স্রষ্টা কখনও না। রস-স্রষ্টার সৃষ্টি ঘটনার মোট নামিয়ে দিয়ে আসে না এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে। রস-স্রষ্টার অন্তরের রস-সিঞ্চনে সে সৃষ্টি অনন্য, একটি সামান্য ঘটনাকেও সে অসামান্য করে তোলে। ঘটনাটি সৃষ্টির পক্ষে উপলক্ষমাত্র, রূপের সার্থক প্রকাশই আসল কথা। রবীন্দ্রনাথ বলছেন তাঁর ছবি সে প্রতিরূপ নয়। একটি রূপকে সে দেখল আর হুবহু তার নকল করল, ফোটোগ্রাফির এই নকলনবিসিয়ানা তাঁর ছবি করে না। তাঁর ছবি এই পৃথিবীর অসংখ্য রূপের মধ্যে একটি রূপ। তার নিজের রূপের অর্থাৎ সার্থক প্রকাশের দ্বারাই সে আমাদের স্বীকৃতি সহজেই দাবি করে ও পায়। রূপই হচ্ছে একমাত্র সংবাদ যা ছবি বহন করে আর সে সংবাদ তার নিজের রূপের সংবাদ, আর কোনও সংবাদ নয়।

নিজের রূপের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত এই যে ছবি, সে ছবির উৎস অন্তরের কোন্ স্তরে? যেখানে বুদ্ধি তার বিচার ও বিশ্লেষণের বুনুনি রচনা করছে সেখান থেকে কি ছবি আসছে? না, আদবেই নয়, ছবি আসছে অবচেতন মনের মহাসমুদ্র-তল থেকে। সেখানে রূপ আছে, কিন্তু নেই বুদ্ধির খেলা, বিচার কিংবা সংস্কারের শাসন।

তাই ছবির উৎস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বললেন, শিল্প হচ্ছে প্রত্যক্ষ অনুভূতি, অবচেতন ও প্রয়োজনাতিরিক্ত লোকের বাসিন্দে। Art belongs to the region of intuition, unconscious, the superfluous.

তিনি বললেন, রূপের ছন্দময়তাতেই রূপের চরম প্রকাশ—the rythmic significance of form which is ultimate.

রূপই রূপের উদ্দেশ্য, তার আর কোনও উদ্দেশ্য নেই।

বিশেষ কতকগুলি আঙ্গিকের কারাগারে ভারতীয় শিল্পকে বন্দী রাখাতে যারা গর্ব অনুভব করে ও সেই অনড় অচল স্থাণুত্বকে ভারতীয়তা বলে জাহির করে, তাদের সেই মৃত সংস্কারবদ্ধতাকে আঘাত করে শিল্পীদের বললেন রবীন্দ্রনাথ: "আমি জোরের সঙ্গে বলবো আমাদের শিল্পীদের যে তাঁরা যেন এমন কিছু সৃষ্টি করবার বাধ্যবাধকতা অস্বীকার করেন যাকে 'ভারতীয় শিল্প' বলে লেবেল দেওয়া যায়। দাগ-মারা জন্তুদের মতো একই খোঁয়াড়ে বন্দী হতে এই শিল্পীরা যেন গর্বের সঙ্গে অস্বীকার করেন—"I strongly urge our artists vehemently to deny their obligation carefully to produce something that can be labelled as Indian art according to some old world mannerism. Let them proudly refuse to be herded into a pen like branded beasts." (The meaning of Art)

কতকগুলি বাঁধা-ধরা ছন্দের কারাগার থেকে যিনি কবিতাকে মুক্তি দিয়েছেন, ছবির বেলায় তিনি কতকগুলো বাঁধা-ধরা আঙ্গিক ও রূপ-লক্ষণের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত ছবিকে মুক্তি না দিয়ে পারেন কি করে?

সৃষ্টির ক্ষেত্রে রসের শাসন ছাড়া তিনি আর সব ভাটিপাড়াগিরিকে অস্বীকার করেছেন। শিল্পে জাতীয়তাবাদ তেমনি বর্জনীয় যেমন রাজনীতির ক্ষেত্রে বর্জনীয়। আঙ্গিক আসবে রূপের ধারণা থেকে, আঙ্গিক বিচিত্র হবে, শিল্পী সৃষ্টির প্রয়োজনে যেমন উপাদান সংগ্রহ করবে সারা পৃথিবী থেকে তেমনি সৃষ্টির প্রয়োজনে আঙ্গিকও গ্রহণ করবে বিশ্বের শিল্প জগৎ থেকে। ভৌগোলিক সীমানার দ্বারা মনকে আল দিয়ে বেঁধে রাখা বিংশ শতাব্দীতে মধ্যযুগের অস্তিত্বের পরিচয় দেয়। রবীন্দ্রনাথ মনের আল ভাঙার নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর সাহিত্যে ও শিল্পে। ভবিষ্যতে যে-সব শিল্পী আসবেন তাঁরা সাহস পাবেন রবীন্দ্রনাথের এই বাঁধ-ভাঙা নির্দেশ স্মরণ করে।

প্রায় তিন হাজার ছবি রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন। অবচেতনের উৎস থেকে ছবিগুলি রেখার ঝরনার মত বের হয়ে এসেছে। কিন্তু সৃষ্টির জন্যে উপকরণ যে কত সামান্য হতে পারে আর সেই সামান্য উপকরণগুলি যে অসামান্য শিল্প-সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট, রবীন্দ্রনাথ তার প্রমাণ দিয়ে গেছেন।

কলম, আঙুলের ডগা, কাপড়ের একটু টুকরো—এই হল তাঁর শিল্প-সাধনার যন্ত্র, আর কালি, কিছু রঙ, যেমন-তেমন কাগজ—এই ছিল তাঁর শিল্পের উপকরণ। দামী তুলি ও রঙ তাঁর ছবি আঁকার রঙমহলে প্রবেশ করে নি কখনও। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে উপকরণের বহুলতা সৃষ্টির লাবণ্যকে অবগুণ্ঠিত করে দেয়। সাধারণ লোক উপকরণের চটকেই মুগ্ধ হয়ে যায়, সৃষ্টির মনোহারিত্ব সরে যায় দৃষ্টির সামনে থেকে। তাই সহজ হবার সাধনা শিল্পীর পক্ষে কঠিনতম সাধনা। শিল্পী রবীন্দ্রনাথ এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে একটি প্রশ্ন

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

এই রচনাটি প্রবন্ধ নয়। প্রবন্ধের বিস্তার, তথ্য ও যুক্তি এর মধ্যে নেই। একটি প্রসঙ্গ বা তর্কের উত্থাপন রচনাটির উদ্দেশ্য—তাই একে প্রবন্ধ না বলে একটি প্রশ্ন বলা যেতে পারে। আশা করি যোগ্য ব্যক্তিরা এর যথোচিত উত্তর যথাসময়ে দেবেন।

রবীন্দ্রনাথের জীবন সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়েছে, রবীন্দ্র-সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হয়েছে যথেষ্ট, আরও হবে। আর রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য মিলিয়ে আলোচনাও শুরু হয়েছে। এই প্রশ্নটি রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য-সম্পর্কিত অর্থাৎ জীবনের প্রভাবে যেভাবে তাঁর সাহিত্য গড়ে উঠেছে সেই সম্পর্কিত।

রবীন্দ্রনাথ ত্রিশ বৎসর বয়সে শিলাইদ গিয়ে কিছুকাল স্থায়ীভাবে সেখানে বাস করেছিলেন, যার ফলে তাঁর সাহিত্য একটি বিশেষ গতি ও রূপ লাভ করেছিল। তারপরে চল্লিশ বৎসর বয়সে ১৯০১ সনে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় স্থাপন করে সেখানে এসে বসলেন। বলা যেতে পারে যে শেষ চল্লিশ বৎসরকাল তিনি স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে বাস করেছিলেন। এখন আমার জিজ্ঞাস্য, শান্তিনিকেতন বাসের প্রভাব তাঁর সাহিত্যে কি চিহ্ন রেখে গিয়েছে। শান্তিনিকেতনের নিসর্গ এবং শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গ তাঁর রচনাকে কি বিশেষ একটি আকারে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল? করেছিল বলেই আমার মনে হয়।

১৯০৮ সনে তিনি 'শারদোৎসব' নাটক রচনা করেন—তার পরে আরও অনেক নাটক তিনি লিখেছেন। এইসব নাটকের সঙ্গে আগের যুগে লিখিত নাটকের একটা প্রভেদ আছে। 'শারদোৎসব', 'অচলায়তন', 'রাজা', 'ফাল্গুনী' প্রভৃতি নাটকে প্রথম বারের জন্য দেখতে পাই একটি গানের দল—যার নায়ক কোন ক্ষেত্রে দাদাঠাকুর বা ঠাকুরদাদা। আগের কোন নাটকে এ জিনিসটি পাই না। এখানেই শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের (পরবর্তীকালে ছাত্রীদেরও বটে) প্রভাব। দলবদ্ধভাবে গান গাইতে পারে এমন বালক বালিকা আগে হাতের কাছে ছিল না, এবারে তিনি পেলেন আর পেলেন তাদের নেতারূপে "সকল নাটের কাণ্ডারী, সকল গানের ভাণ্ডারী" দ্বিজেন্দ্রনাথকে। বাস্তবের সুযোগটিকে তিনি শিল্পক্ষেত্রে টেনে এনে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন।

'শারদোৎসব', 'অচলায়তন' ও 'ফাল্গুনী' নাটকে শুধু পুরুষের ভূমিকা। এখানেও শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রভাব। মুখ্যত তাদের অভিনয়ের জন্য এসব নাটক লিখিত বলেই এগুলো নারী ভূমিকা-বর্জিত। তারপরে যখন সেখানে অনেক ছাত্রী জুটল, কেবল তাদের দিয়ে অভিনয় করাবার জন্যে তিনি 'নটীর পূজা' লিখলেন—এটি পুরুষ ভূমিকা-বর্জিত, শেষমুহূর্তে তাঁর নিজের জন্য উপালির ভূমিকার সৃষ্টি হয়েছিল।

তারপরে যখন শান্তিনিকেতনের শিক্ষার একটি অঙ্গ হয়ে দাঁড়াল নৃত্য, তখন তাঁর পক্ষে নৃত্যনাট্যগুলো লেখা সম্ভব হল। শান্তিনিকেতনের প্রথম আমলে লিখিত নাটকে গান আছে, নাচ নেই—অন্ততঃ আনুষ্ঠানিক নৃত্য নেই, কেন না তখনও নৃত্য শান্তিনিকেতনের শিক্ষার অঙ্গ হয়ে ওঠে নি। রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের নাটক এই কারণেই নৃত্য ও সঙ্গীতপ্রধান—তখন গানের দল, নাচের দল বেশ তৈরি হয়ে উঠেছে। প্রধানতঃ তাঁর নাটকগুলোর উপরেই শান্তিনিকেতনের প্রভাব খুব স্পষ্ট, কারণ নাটক হচ্ছে যৌথশিল্প—অনেক লোক মিললে তবে তাকে রূপ দেওয়া সম্ভব। এই ধরনের অনেক লোক, তন্মধ্যে গানের দল, নাচের দল প্রধান জুগিয়েছে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী।

তারপরে 'শান্তিনিকেতন' নামে প্রকাশিত তাঁর ধর্মোপদেশের উপরেও আছে শান্তিনিকেতনের প্রভাব। সেখানকার নিঃসঙ্গ নিসর্গ অবশ্যই কবির সাধনার মূল প্রেরণা, কিন্তু সেই প্রেরণা বাণী পেয়েছে শান্তিনিকেতনের সাপ্তাহিক মন্দির বা উপাসনা উপলক্ষে। এই উপলক্ষ না থাকলে এই ধারাবাহিক বাণী উৎসারিত ও লিখিত হত কিনা সন্দেহ।

আপাততঃ এই দুটি বিষয়ের উপরে শান্তিনিকেতনের প্রভাব চোখে পড়ছে, তলিয়ে আলোচনা করলে আরও কিছু প্রভাব চোখে নিশ্চয় পড়বে। এই প্রসঙ্গটিকে একটি প্রশ্নাকারে উত্থাপন করাই এই রচনার লক্ষ্য। এখন আশা করা যায়, যোগ্য ব্যক্তিরা ধীরভাবে খুঁটিয়ে বিচার করে এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে আমার মত পাঠককে তৃপ্তিদান করবেন।

বিদেশে রবীন্দ্রনাথ

ভবানী মুখোপাধ্যায়

নোবেল পুরস্কার পাওয়ার আগেই য়ুরোপে রবীন্দ্রনাথের কবি হিসাবে স্বীকৃতি মিলেছে। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-বিজয়ের শুরু।

রবীন্দ্রনাথ লণ্ডনে এসে পৌঁছেছিলেন ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুন তারিখে। রবীন্দ্রনাথের হাতে ছিল তাঁর নানা কাব্যগ্রন্থের মধ্য থেকে নির্বাচিত কিছু কবিতার ইংরেজী অনুবাদ। এই অনুবাদও যে সার্থক এবং সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছিল তা নয়, তবু রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের পরিচয় ছিল সেই অনূদিত কবিতাগুলিতে।

এই বছর ১লা জুলাই তারিখে, অর্থাৎ লণ্ডনে পৌঁছনোর এক পক্ষ কালের মধ্যেই শিল্পী উইলিয়াম রথেনস্টাইন তাঁর বন্ধু জর্জ বার্নাড শ'কে যে চিঠিখানি লিখেছিলেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই চিঠিতে রথেনস্টাইন তথা বিদগ্ধ ইংলণ্ডের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় পাওয়া যাবে:

> ...আমার একান্ত বাসনা তুমি এসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখে যাও। একদিন এসে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে যাও। বাংলার সাহিত্য, শিল্প, শিক্ষা, প্রজ্ঞা, ধর্ম, আভিজাত্য, গণতন্ত্র প্রভৃতি সবকিছুরই প্রতিনিধি এই রবীন্দ্রনাথ। ভারতের আর কোনও দূত যদি আমাদের পক্ষে দেখা না সম্ভব হয় তা হলে এই একটি মানুষকে দেখেই ধারণা করা যাবে যে ভারতবর্ষ সারা বিশ্বের মধ্যে এক সার্থকতম দেশ।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে উইলিয়াম রথেনস্টাইনের পরিচয় এর কয়েক বছর আগে ভারতবর্ষে ঘটেছিল। রথেনস্টাইন এসেছিলেন অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে, সেই সূত্রে আলাপ। রবীন্দ্রনাথ সেই যোগসূত্র ধরেই লণ্ডনে পৌঁছে উইলিয়াম রথেনস্টাইনের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। কথাপ্রসঙ্গে একদিন কয়েকটি কবিতার অনুবাদ পাঠ করে শোনালেন রথেনস্টাইনকে। কবিতাগুলি রথেনস্টাইনকে মুগ্ধ করল। তার কয়েকটি বেছে নিয়ে টাইপ করিয়ে রথেনস্টাইন তাঁর যে সব বন্ধুদের পাঠালেন তাঁদের মধ্যে ইয়েট্স্, স্টপফোর্ড-ব্রুক্স্ ও ব্রাডলী উল্লেখযোগ্য। বলা বাহুল্য, এঁরা সকলেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠে অভিভূত ও বিস্মিত হলেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা তাঁদের ভাল লেগেছে। কবিও এই উৎসাহ ও প্রশস্তি লাভে পুলকিত হলেন।

রথেনস্টাইন এই অভাবনীয় উৎসাহ লক্ষ্য করে আনন্দিত হলেন এবং তাঁর বাসভবনে এক বৃহত্তর মজলিসের আয়োজন করলেন। এই সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত হলেন মে সিনক্লেয়ার, ইভিলিন আণ্ডারহিল, আর্নেস্ট রিস্, ফক্স-স্ট্রাংওয়েজ, চার্লস ট্রেভেলিয়ান, এজরা পাউণ্ড, এলিস মেনেল, হেনরী নেভিনসন প্রভৃতি। সেদিনকার অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ করে শোনালেন উইলিয়াম বাটলার ইয়েট্স্।

এই দিনই রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম দেখলেন চার্লস এনড্রুজকে, তিনি তখন দিল্লীর সেণ্ট ষ্টিফেন্স কলেজে অধ্যাপনার কাজ নিয়েছেন।

ইংরেজী সংস্করণ 'গীতাঞ্জলী'র মোট ১০৩টি কবিতার ৫১টি 'গীতাঞ্জলী'র, ১৭টি 'গীতিমাল্যে'র, ১৬টি 'নৈবেদ্য'র, ১১টি 'খেয়া'র, ৩টি 'শিশু'র, আর বাকিগুলি 'চৈতালী,' 'স্মরণ,' 'কল্পনা,' 'উৎসর্গ,' 'অচলায়তন' থেকে একটি করে গৃহীত। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর এই কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

"Gitanjali—(Song Offerings)—A colleetion of prose translations made by the author from the original Bengali—with an Introduction by W. B. Yeats: Printed at the Chiswick Press for the India Society"—

ইংরেজী 'গীতাঞ্জলী'র এই টাইটেল পেজ। এই গ্রন্থের ৭৫০ খণ্ড মাত্র ছাপা হয়, তার মধ্যে ২৫০ খানি সর্বসাধারণের মধ্যে বিক্রির ব্যবস্থা ছিল।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিজের কথা বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "বাংলা গীতাঞ্জলীর কবিতা আপনমনেই ইংরেজীতে তর্জমা করেছিলুম। শরীর অসুস্থ ছিল, আর কিছু করার ছিল না। কোনও দিন এগুলি ছাপা হবে এমন স্পর্ধার কথা স্বপ্নেও ভাবিনি। তার কারণ প্রকাশযোগ্য ইংরেজী লেখার শক্তি আমার নেই—এই ধারণাই আমার মনে বদ্ধমূল ছিল।

খাতাখানা যখন কবি ইয়েটসের হাতে পড়ল তিনি একদিন রথেনস্টাইনের বাড়িতে অনেকগুলি ইংরেজ সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসজ্ঞকে তার থেকে কিছু আবৃত্তি করে শোনাবেন বলে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আমি মনের মধ্যে ভারী সঙ্কুচিত হলেম। তার দুটি কারণ ছিল। নিতান্ত সাদাসিধে ধরনের দশবারো লাইনের কবিতা শুনিয়ে কোনদিন আমি কোনও বাঙালী শ্রোতাকে যথেষ্ট তৃপ্তি পেতে দেখিনি।··· ইয়েটস সেদিনকার সভায় পাঁচ-সাতটি মাত্র কবিতা একটির পর আর একটি শুনিয়ে পড়া শেষ করলেন। ইংরেজ শ্রোতারা নীরবে শুনলেন। নীরবে চলে গেলেন—দস্তুর পালনের উপযুক্ত ধন্যবাদ পর্যন্ত আমাকে দিলেন না। সে রাত্রে নিতান্ত লজ্জিত হয়ে বাসায় ফিরে গেলাম।

পরের দিন চিঠি আসতে লাগল। দেশান্তরে যে খ্যাতি লাভ করেছি তার অভাবনীয়তার বিস্ময় সেই দিনই সম্পূর্ণভাবে আমাকে অভিভূত করেছে।"

(তীর্থংকর—দিলীপকুমার রায়। পৃঃ ১৩৮)

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সংশয়াচ্ছন্ন, বাংলা কবিতার ইংরাজি তর্জমা, কেমন হবে। কতটুকু বা পাওয়া যাবে। য়ুরোপকে আকর্ষণ করবে বাংলাদেশের কবির এই স্বল্পায়তন কবিতা? এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে Fortnightly Review নামক বিখ্যাত পত্রিকায় কবি এজরা পাউণ্ড-কৃত সুদীর্ঘ সমালোচনায়। প্রবন্ধটি যখন প্রকাশিত হয়, তখনও কবি নোবেল প্রাইজে সম্মানিত হন নি, তাই এই প্রবন্ধটি বিশেষ মূল্যবান। এজরা পাউণ্ড লিখেছেন:

···শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতাগুচ্ছের প্রকাশ (Gitanjali) আমার কাছে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। পাঠক হয়তো আমার বক্তব্য ঠিক বুঝবেন না, আমার বক্তব্য কবির কাব্যে প্রমাণিত। এই কবিতা অতি ধীরে, শান্ত পরিবেশে ও···উঁচু স্বরে পাঠ করতে হবে। এই কবিতার অনুবাদক স্বয়ং সুরকার, তাই সেই মহৎ শিল্পীর অভিব্যক্তি সূক্ষ্ম সঙ্গীতের মাধ্যমে।

মাসাধিক কাল কবি ইয়েটসের ভবনে গিয়ে দেখেছিলাম এই মহাকবির আগমনে তিনি চঞ্চল হয়ে উঠেছেন, এই কবি আমাদের চেয়ে মহৎ ও বিরাট। কোথায় যে আমার বক্তব্য শুরু করি তাই ভাবছি। বাংলাদেশের জনসংখ্যা পাঁচ কোটি। প্রথম নজরে মনে হবে রেলগাড়ি আর গ্রামোফোন দেশটাকে আচ্ছন্ন করেছে। কিন্তু এহ বাহ্য, এই দেশের অন্তঃসলিলা সংস্কৃতি আধুনিক প্রভেঁসের সঙ্গে তুলনীয়। এই বাংলাদেশের মহাকবি ও গীতিকার শ্রীযুক্ত ঠাকুর। জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা, সেই সুর 'লা মার্সাই'-এর সঙ্গে তুলনা করা চলে। তাঁর 'সোনার বাংলা' শুনলাম। সম্পূর্ণ প্রাচ্য সুর, অপূর্ব তার মাদকতা, জনতাকে স্পর্শ করার শক্তি তার আছে। হালকা চালের গান, ঢঙটা ঘনিষ্ঠ এবং উদ্দীপনাময়।

এই কথা উল্লেখ করার হেতু এই যে এতদ্বারা সহজেই বোঝা যাবে যে দান্তে বর্ণিত মহাকাব্যের ত্রিবিধ গুণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের করায়ত্ত, যথা—প্রেম, দেশাত্মবোধ ও আত্মার মুক্তি।

এজরা পাউণ্ড তাঁর সুদীর্ঘ প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ, এবং মহৎ কবির লক্ষণ সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রদূত। রবীন্দ্রনাথের কবিতাপাঠের সময় সহসা সেই কক্ষে গৃহকর্ত্রীর ছোট মেয়ে এসে হৈ-হৈ শুরু করল, কবি কবিতা থামিয়ে হেসে উঠলেন। এজরা

পাউণ্ডের এই দৃশ্য ভাল লেগেছে। মনে প্রশ্ন জেগেছে নন্দনতত্ত্ব আলোচনা আর শিশুর হাসি কি একই সুরে বাঁধা ?

তারপর রবীন্দ্রনাথের কবিতার গুণাগুণ বিচারকালে বলেছেন :

…এই কবিতায় আছে এক নিস্তরঙ্গ স্তব্ধতা, যেন সহসা নবীন গ্রীসকে আবিষ্কার করলাম। য়ুরোপে রেঁনেসাসের কালে যেমন ফিরে এসেছিল ভারসাম্য, তেমনই একালের যান্ত্রিক ঘূর্ণী হাওয়ার মধ্যে এক সংস্কৃত, শান্ত, মধুরতার পরিবেশ আবির্ভূত হল। অডিসির নীতি 'শরীর সুস্থ থাকলেই মন সুস্থ'। মধ্যযুগীয় অস্পষ্ট মানসিকতা এই নীতিকে বেশীদূর নিয়ে যেতে পারে নি। বিভ্রান্ত চিন্তাকে মুক্ত করে নি। রবীন্দ্রনাথ এনেছেন সুস্থ সুস্থিরতা।

এ আমার আকস্মিক অত্যুক্তি নয়, উচ্ছ্বাস নয়, প্রায় মাসাধিককাল এই বিষয়ে চিন্তা করেছি। শ্রীযুক্ত ঠাকুরের যে সমস্ত রচনা আজও অনূদিত হয় নি সে বিষয় বলার সময় আসে নি তবে যে কাব্যগ্রন্থ আমার হাতে আছে তার সঙ্গে তুলনা করার জন্য যে গ্রন্থ মনে পড়ছে তার নাম দান্তের 'পারডিসো'।

এই সুদীর্ঘ উদ্ধৃতিটুকু না দিলে এজরা পাউণ্ডের বিরাট আলোচনার পরিচয় পাঠককে দেওয়া সম্ভব হত না। এই প্রবন্ধে নিঃসন্দেহে সেই কালেই রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে ইংলণ্ডের বিদগ্ধ সমাজকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যাবে। পাউণ্ড এই প্রবন্ধের এক জায়গায় বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে নিজেকে অতিশয় অসভ্য বন্য বর্বর বলে মনে হয়—যেন আদিম-যুগের মানুষ।

রবীন্দ্রনাথের ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের লণ্ডন যাত্রা সবদিক থেকেই সার্থক হয়েছিল। তিনি লণ্ডন পৌছনোর এক মাসের মধ্যেই The Nation নামক ইংরাজী সাপ্তাহিকের কর্তৃপক্ষ 'ত্রেকোদারো হোটেলে' কবি-সম্বর্ধনায় এক বিরাট পার্টির আয়োজন করেন। এই সম্বর্ধনা ভোজে বিদগ্ধ ইংরেজ সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। এই সময়েই জন মেসফিলড্, বারট্রাণ্ড রাসেল, এইচ. জি. ওয়েলস প্রভৃতির সঙ্গে কবির পরিচয় ঘটে।

এই সম্বর্ধনা ও খ্যাতির মূলে গীতাঞ্জলির সেই কয়েকটি অনূদিত কবিতা। ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীকে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেছেন : "এই কবিতাগুলি আমি লিখব বলে লিখিনি, এ আমার জীবনের ভেতরের জিনিস—এ আমার সত্যকারের আত্ম নিবেদন—এর মধ্যে আমার জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখ, সমস্ত সাধনা মিলিত হয়ে আপনি আকার ধারণ করেছে। এই জীবনের জিনিস জীবনের ক্ষেত্রে আদর পায় এ কথা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি, কিন্তু এ কথা বোঝানো শক্ত।" [চিঠিপত্র—৫ম খণ্ড]

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের যে সামান্যতম নমুনা য়ুরোপ সেদিন পেয়েছিল তাতেই তারা মেতে উঠেছিল। কারণ, তার মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল নতুন দিগন্তের আভাস, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ছিল এক অনাবিষ্কৃত জগতের আভাস, সারা বিশ্বের নয়নে তাই কবির কবিতা সেদিন ধাঁধা লাগিয়েছিল।

বারবার রবীন্দ্রনাথের মনে প্রশ্ন জেগেছে কি আছে আমার কবিতায়, যা নিয়ে এই বিদেশীর দল এমন মেতে উঠেছে। তাঁর প্রশ্নের জবাবে সেদিন তাঁরা বলেছিলেন—আমরা যা করতে চাই, যা করতে চেয়েছি, তুমি তাই করেছ, তাই এই অভিনন্দন।

আঁদ্রে জিদের জার্নালে আছে যে 'ডাকঘরে'র ইংরাজী অনুবাদের প্রুফকাপি যখন ম্যাকমিলন কোম্পানি তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন তখন তিনি এমনই আত্মহারা হয়ে পড়েন যে সেই রাতেই তারযোগে ফরাসী অনুবাদের অনুমতি প্রার্থনা করেন। আঁদ্রে জিদ 'গীতাঞ্জলি'র ফরাসী অনুবাদও করেছিলেন। সেদিনও তিনি উত্তেজিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে বলেছিলেন—তোমার মত কবির পথ চেয়েই বসেছিলাম। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র ফরাসী অনুবাদের সুদীর্ঘ ভূমিকাশেষে যে কথা আঁদ্রে জিদ

২২ পৃষ্ঠার ৩৫ পংক্তিতে "দ্বিজেন্দ্রনাথকে" স্থলে "দিনেন্দ্রনাথকে" হইবে।

বলেছেন, তার মধ্যে তাঁর সব বলা হয়েছে মনে করি: "গীতাঞ্জলির শেষ কটি কবিতায় মৃত্যুর মন্ত্র ধ্বনিত। এর চেয়ে ভাবগম্ভীর ও সুমধুর স্বর আমি কোনও দেশের কোনও সাহিত্যে আর শুনি নি।"

য়ুরোপ সেদিন রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে পেয়েছিল শান্তি ও সান্ত্বনা। জীবনের রহস্যলোকের চাবিকাঠি, তাই সারা পৃথিবী ভারতবর্ষের কবিকে সেদিন এইভাবে দু বাহু প্রসারিত করে হৃদয়ে গ্রহণ করেছিল।

এই ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দেই রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা যাত্রা করেন, তারপর সারা আমেরিকা ভ্রমণ করে আবার লণ্ডন হয়ে স্বদেশে ফেরেন ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর। নোবেল পুরস্কারের সংবাদ ভারতে আসে ১৩ই নভেম্বর ১৯১৩।

রবীন্দ্রনাথের এই আমেরিকা ভ্রমণের বিস্তারিত বিবরণ অতি সুন্দর ভাবে লিখেছেন মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর "বিশ্বের চোখে বিশ্বকবি" নামক প্রবন্ধাবলীতে (যুগান্তর)। এই কালে তাঁর ইংরাজী 'Gitanjali'-র ম্যাকমিলন সংস্করণ 'Gardener' এবং 'Crescent Moon' প্রকাশিত হল, ইংরাজী 'Gitanjali'-র প্রথম প্রকাশক 'চিত্রাঙ্গদা'র ইংরাজী অনুবাদ 'Chitra' প্রকাশ করলেন।

রবীন্দ্রনাথের আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতাবলী 'Personality', এবং লণ্ডনে ক্যাক্স্টন হলে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে প্রদত্ত বক্তৃতাবলী 'Sadhana' নামক প্রবন্ধ সংগ্রহে সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। ভারতীয় ঐতিহ্য ধর্ম দর্শন ইত্যাদি বিষয়েই এইসব প্রবন্ধে কবি আলোচনা করেছেন।

এর পর ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে কবি জাপান ভ্রমণে গিয়েছিলেন। তখন প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'Friut Gathering'—বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের নির্বাচিত ৬৭টি কবিতার সংকলন এই গ্রন্থে পরিবেশিত। জাপানে কোবে শহরে রবীন্দ্রনাথকে যেদিন "জাপানী সাংবাদিক সমিতি" সম্বর্ধনার আয়োজন করেন সেইদিন কাউন্ট ওকুমা জাপানী ভাষায় কবিকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন, কবি তাঁর প্রতিভাষণ দিয়েছিলেন বাংলা ভাষায়। জাপানে রবীন্দ্রনাথ "The Spirit of Japan" এবং 'The Message of India to Japan" এই দুটি বিষয়ে বক্তৃতাদান করেন, রবীন্দ্রনাথের অপ্রিয় সত্যভাষণের ফলে জাপানী কর্তৃপক্ষরা তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হন। এই সময়েই ভারতীয়দের প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ক্যানাডার ভ্যানকুবেরের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন।

আমেরিকার 'স্বর্ণপ্রীতি' ও 'অর্থগৃধ্নুতা'র প্রতি কবির কটাক্ষে সে দেশেও তাঁকে অপ্রীতিভাজন হতে হয়েছে। সত্যভাষণে এবং সত্যনিষ্ঠায় অচঞ্চল রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থে নিজের বক্তব্যকে অনুচ্চারিত রাখেন নি।

এই সূত্রে 'Personality' নামক প্রবন্ধসংগ্রহ থেকে পশ্চিম সম্পর্কিত উক্তিটি বিশেষ অর্থসূচক। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

The west may believe in the Soul of Man, but she does not really believe that the universe has a Soul. Yet this is the belief of the East, and the whole mental contributions of the East to mankind is filled with this idea.

বিশ্বের সঙ্গে মানুষের নিবিড় আত্মিক যোগ। এই সংযোগই বিশ্বেরও প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে, এই বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের ছিল। আকাশভরা সূর্যতারা বিশ্বভরা প্রাণ এ শিক্ষা রবীন্দ্রনাথ ভারতের মাটি থেকে লাভ করে বিশ্ববাসীকে শুনিয়েছেন। প্রায় এই কালেই বলেছেন—আমাদের সভ্যতার জন্ম অরণ্যে, সেই জন্মলগনে পারিপার্শ্বিক অবস্থাই তার প্রবৃত্তিকে গড়ে তুলেছে। ক্যাক্স্টন হলে যে সব বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার মধ্যে বলেছেন:

...when a Man does not realise his kinship with the world, he lives in a prison-house whose walls are alien to him". (Sadhana)

৩০শে মে ১৯১৯ তারিখে রবীন্দ্রনাথ জালিয়ানওয়ালা বাগের অত্যাচারের প্রতিবাদে নাইট উপাধি ত্যাগ করেন। লর্ড চেমসফোর্ডকে তিনি জানালেন: "আমার এই প্রতিবাদ

আমার আতঙ্কিত দেশবাসীর মৌনযন্ত্রণার অভিব্যক্তি"--(Surprised into a dumb anguish of terror.) বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের এই বিচিত্র প্রতিবাদে সেদিন ঘরে-বাইরে একটা বিস্ময়ের ঢেউ জেগেছিল। এর পর ১৯২০তে রবীন্দ্রনাথ আবার য়ুরোপ যাত্রা করলেন। আগা খাঁকে জাহাজে সহযাত্রী হিসাবে পেয়েছিলেন। তিনি কবিকে হাফিজ আবৃত্তি করে শোনাতেন, মাঝে মাঝে সুফীবাদ সম্পর্কে আলোচনাও করতেন। লণ্ডনে পৌঁছে রথেনস্টাইন হাডসন, বার্নাড শ, ফকস্-স্ট্রাংওয়েজ, নিকোলাস রোয়েরিখ, কানিংহাম গ্রেহাম প্রভৃতির সঙ্গে দেখা হল। ১৯শে জুন তারিখে অক্সফোর্ডে এক ছাত্রসভায় কবির ভাষণ দানের কথা ডাঃ রবার্ট ব্রীজেসের সেদিন সভাপতিত্ব করার কথা। তিনি তখন ইংলণ্ডের রাজকবি। তিনি সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন না, চিঠি লিখে জানালেন :

...I do not feel able to accept the invitation, which I have just received, to speak at the meeting in Oxford on friday—I am writing, especially as I never sent any answer to your several communications since the late disturbances in India....

[পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ—অমল হোম : পৃ. ৮.]

মৈত্রেয়ী দেবীর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' নামক গ্রন্থেও এ কথার উল্লেখ আছে :

ওদের ওটা খুব অপমান লেগেছিল। তারপর ইংলণ্ডে গিয়ে দেখলাম—ওরা সে কথা ভুলতে পারছে না। ইংরেজ রাজভক্ত জাত—রাজাকে প্রত্যাখ্যান তাই অত আঘাত দিয়েছিল ওদের।

কবি ইংলণ্ডের এই শীতল অভ্যর্থনা থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্যই (with a feeling of relief from studied coolness) ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে আগস্ট মাসে ফ্রান্সে গিয়ে পৌঁছলেন। কবি এই সময়ে ফ্রান্সের ধনকুবের মঁসিয়ে কানের গৃহে অতিথি হয়েছিলেন। এই সুযোগে তিনি যুদ্ধের ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন এবং অত্যন্ত বেদনাবোধ করেছিলেন। ফ্রান্সের প্রখ্যাত মহিলা কবি কঁতেস দ্য নোয়াইলে এই সময়েই কবিকে জানান যে, ঠিক যে কালে মহাযুদ্ধ ঘোষিত হল সেই মুহূর্তে তিনি এবং মঁসিয়ে ক্লেমেন্সো রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র ফরাসী অনুবাদ পড়েছিলেন। যুদ্ধের হতাশা, জ্বালা এবং তীব্রতার নিদারুণ অশান্তি থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য ভারতীয় কবির কবিতাই সেদিন তাঁদের মনে শান্তি ও স্বস্তি দান করেছিল।

আরেকটি অনুরূপ কাহিনী এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ঠিক যেদিন মহাযুদ্ধের অবসান ঘটল, সেইদিন তরুণ ইংরেজ কবি উইলফ্রেড ওয়েনের শেলের আঘাতে মৃত্যু হয়—সম্ভবতঃ ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে। তাঁর ব্যক্তিগত জিনিস ও কাগজপত্র তাঁর শোকসন্তপ্ত জননীর কাছে 'ওয়ার অফিস' থেকে পাঠানো হল। সেই বৃদ্ধা ওয়েনের নোটবই পড়তে পড়তে আবিষ্কার করলেন কয়েক ছত্র কবিতা এবং তার তলায় লেখা আছে এই কয় ছত্র (কবিতাটি স্মরণে নেই) আমার মনে এই দুঃসময়ে অতিশয় শান্তিদান করেছে। বৃদ্ধা কোনদিন ঠাকুর কবির নাম শোনেন নি, তবু কবিকে সন্ধান করে তাঁর ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে একবার শুনেছিলাম যে তাঁরা যখন ফ্রান্সে তখন কবিকে একবার ট্যাক্সি চড়ে কোথায় যেতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ নেমে যাওয়ার পর ট্যাক্সিচালক শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রশ্ন করেন—এই ঋষিতুল্য মানুষটি কে! শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় বললেন—হিন্দুকবি রবীন্দ্রনাথ টেগোর।

এই কথা শোনার সঙ্গেই সেই ট্যাক্সিচালক সবিনয়ে তার ভাড়া প্রত্যাখ্যান করল। বলল—আমি কবির 'ডাকঘর' নাটকের ফরাসী অনুবাদ পাঠ করে বিশেষ আনন্দ পেয়েছি, তাঁকে বহন করেছি এ আমার সৌভাগ্য। কি করে ভাড়া নেব?—ঘটনাগুলি সামান্য হলেও অসামান্য। সর্বসাধারণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কি ভাবে সংযোগ ঘটেছিল এ তারই পরিচয়।

রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী' নাটকটিও ফ্রান্সে বিশেষ সমাদর লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ 'ফাল্গুনী' সম্পর্কে এক জায়গায়

বলেছেন, "শারদোৎসব থেকে ফাল্গুনী পর্যন্ত যতগুলি নাটক লিখেচি, যখন বিশেষ করে মন দিয়ে দেখি তখন দেখতে পাই প্রত্যেকের ভিতরকার ধুয়োটা ওই একই—জীবনকে সত্য বলে জানতে গেলে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার পরিচয় চাই। এই তত্ত্ব য়ুরোপ বুঝেচে।"

Les Nouvelles Litteraires নামক ফরাসী সাহিত্য পত্রিকায় 'ফাল্গুনী'র যে সুদীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়, প্রমথ চৌধুরী মহাশয় তার একটি বঙ্গানুবাদ করেন। ফরাসী লেখকের বক্তব্যের সামান্য অংশ উদ্ধৃত করা হল, সেক্সপীয়রের A Midsummer Night's Dream নামক নাটকের সঙ্গে তুলনা করে লেখক বলেছেন :

> আমার বিশ্বাস যে বিলাতের মহা-নাট্যকার তাঁর ফুরফুরে কল্পনার খেলা দেখিয়ে কেবল আমাদের চিত্তবিনোদন ও চিন্তার ভার অপনোদন করতে চেয়েছিলেন। অপরপক্ষে হিন্দু মহাকবি রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য তাঁর ফাল্গুনীতে আমাদের একটি সর্বজনীন তত্ত্বের উপদেশ দেওয়া। তিনি পৃথিবীর চিরযৌবনের উৎসব সম্পাদনে রত··· (সবুজপত্র—জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩)

'ফাল্গুনী'র মূল সুর যৌবনের এগিয়ে চলার বাণী য়ুরোপকে সেদিন আনন্দ দিয়েছে।

জার্মানীর কাপুত শহরে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎকার ঘটে। সেই সময় আইনস্টাইন প্রশ্ন করেন :

জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনও দৈবশক্তিতে কি আপনি বিশ্বাসী ?

উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেন : বিচ্ছিন্ন শক্তি নয়, মানুষের সীমাহীন ব্যক্তিত্ব বিশ্বকে ধারণায় আনে। মানুষের ব্যক্তিত্বের আয়ত্তে সবকিছু আসে। বিশ্ব সত্য, মানুষ সত্য। প্রোটন ও ইলেকট্রন এবং তাদের পরস্পরের মধ্যকার ফাঁকটুকু মিলেই বস্তু গড়ে ওঠে। তবু বস্তুর আপাতকঠিন রূপ। তেমনই ব্যক্তিসমূহ নিয়ে বিশ্বমানব, ব্যক্তির মধ্যে আছে মানবসম্বন্ধের সংযোগ এবং এই সংযোগই মানুষকে জীবন্ত ঐক্যে বেঁধেছে। সমগ্র বিশ্ব এইভাবে সংশ্লিষ্ট। এই হল মানবীয় বিশ্বের আহুতি। আমি সেই ভাবধারাকেই শিল্প, সাহিত্য ও মানুষের ধর্ম-জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রকাশ করেছি।

সুদীর্ঘ কথোপকথন—শেষের লাইনটিতে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য সুন্দরভাবে প্রকাশিত। তাই তাঁর চিত্রপ্রদর্শনীর পরিচয় পত্রিকায় ফরাসী মহিলা কবি কঁতেস দ্য নোয়াইলস লিখেছেন : "How noble he was and unstinted this wise man, in communion with himself, enigmatical and yet transparent, like the Silver Sea !"

রবীন্দ্রনাথের ছবিও য়ুরোপকে সেদিন বিস্মিত করেছিল, স্তব্ধ করেছিল।

রবীন্দ্রনাথ ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে যখন বার্লিনে গিয়েছিলেন তখন সেখানে তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা দান করা হয়। এমনই একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন তৎকালীন (১৯২০-২৬) বার্লিনস্থ ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত ভাইকাউন্ট ডি এবারনন। সেই ডায়েরীর সামান্য অংশ উদ্ধৃত করছি :

> জুন ৩, ১৯২১। গতকাল ভারতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানে এসেছিলেন। কি সুন্দর মূর্তি, সাধুমানবের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তরঙ্গায়িত চুল আর দাড়িতে রমণীয় আকৃতি। যীশুখ্রীষ্টের যে মূর্তি আমাদের কল্পনায় গড়া তার চেয়ে মনোহর। তাঁর ধীর, মৃদু, মসৃণ কণ্ঠস্বর আমাকে মুগ্ধ করেছে। স্ক্যানডানভিয়া ও জার্মানীতে তিনি বিপুল অভ্যর্থনা লাভ করেছেন।
>
> গতকাল হেলেন, (লেডী ডি এবারনন, প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রোসবেরীর কন্যা) একটি সভায় তাঁর কবিতাপাঠ শুনতে গিয়েছিল, সভাগৃহের ভেতরে তো ভিড়ের জন্য ঢুকতে পারে নি, এমন কি সেই রাস্তাতেই পৌঁছতে পারে নি, এমনই প্রচণ্ড জনসমাগম হয়েছিল।···

সেদিন য়ুরোপ নির্লিপ্ত, আত্মস্থ, নৈর্ব্যক্তিক রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে বিস্মিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপকে বারবার দেখেছেন অন্তরঙ্গভাবে, তার পোশাকী ও আটপৌরে চেহারা রবীন্দ্রনাথের চোখে ধরা পড়েছে। তিনি সত্যভাষণে চিরদিনই নির্ভিকত্ব দেখিয়েছেন। তাই ভাইকাউন্ট ডি এবারননের সেই ১৯২১ সনের ডায়েরীর সামান্য কয়েকটি কথার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের য়ুরোপ-সম্পর্কিত স্পষ্ট উক্তি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত। অনেক পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কালান্তরে' প্রাক্-মহাসমরের য়ুরোপ ও সমরোত্তর য়ুরোপে ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে যে বিরোধ বেধেছে তা বলেছেন। য়ুরোপের সংস্কৃতিতে মনুষ্যত্ব আজ নির্বাসিত, সেখানে স্থানাধিকার করেছে পশুবল। খ্রীষ্টীয় নীতির বাক্য ঠাণ্ডা সিন্দুকে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। মুখোশ খুলে পড়েছে য়ুরোপের—তার ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে তার পশু-প্রকৃতি। মানুষের অধ্যাত্ম সম্পদকে বিকশিত করতে হবে, মানুষকে তার স্বর্ণসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে—এই ছিল রবীন্দ্রনাথের বাণী।

প্রমথ চৌধুরী মহাশয় লিখেছেন :

> রবীন্দ্রনাথের বাণী ইউরোপের বহুলোকের মনে যে প্রবেশ করেছে ও স্থান পেয়েছে এটা হচ্ছে ইউরোপের গৌরবের কথা। এ থেকে শুধু এই প্রমাণ হয় যে ইউরোপের বহুলোক শিক্ষা-দীক্ষার ফলে সেই মন লাভ করেছে, যে মন পৃথিবীর সকল দেশের সকল জাতের বড় কথা সাদরে গ্রহণ করতে পারে। (সবুজপত্র—শ্রাবণ ১৩৩৪)

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে কবি চীন এবং জাপান ভ্রমণে গিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য তাঁর সাম্য ও মৈত্রীর বাণী সব দেশেই সমান সাড়া জাগিয়েছে। চীনা তরুণ সম্প্রদায়ের ডাঃ হু সী কবির গুণমুগ্ধ ভক্ত শিষ্য হয়ে পড়েন। জাপানে কবির সঙ্গে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সাক্ষাৎকার ঘটে। জুলাই মাসে কবি স্বদেশে ফিরে আসেন।

এই ১৯২৪ সনের সেপ্টেম্বরে আবার দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রা করেন। পেরুর স্বাধীনতা-শতবার্ষিকীর আমন্ত্রণ কবি গ্রহণ করেছিলেন। সান ইসাডোরে গুণমুগ্ধ ভক্ত ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সুন্দর বাগানবাড়িতে কবি কিছুদিন বিশ্রাম গ্রহণ করেন। এই সময়ে 'পূরবী'র অধিকাংশ কবিতাগুলি লিখিত হয়, 'পূরবী' এই ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকেই কবি 'বিজয়া' নামে উৎসর্গ করেন। এই ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো ১৯৩০ সনের মার্চ মাসে কবির শিল্পপ্রদর্শনীর ব্যাপারেও বিশেষ সাহায্য করেন।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কবি ইতালী যাত্রা করেন। মুসোলিনী কবির সঙ্গে দেখা করেন। কবির উক্তি নিয়ে কিঞ্চিৎ ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। ফ্যাসিস্ত সরকার কবির বাণীর সুবিধামত অংশ নিয়ে নিজেদের প্রচারকার্যে ব্যবহার করেন। 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়েনে', ইতালীয় বিধানসভার সদস্য ম্যাত্তিয়েত্তি কবির ফ্যাসিবিরোধী মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন। প্রফেসর ডি. লেসনী বলেছেন : "Tagore's conversations with reporters in Italy were the product of there people: the reporter, the interpretor and Tagore himself." সুতরাং এই অবস্থায় যেমন বিকৃতি ঘটা সম্ভব তাই হয়েছে।

আগস্টে কবি ইংলণ্ডে ফিরে এলেন। ইংলণ্ডে রথেনস্টাইন, রবার্ট ব্রীজেস্ প্রভৃতি পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করে কবি নরওয়ের সম্রাটের আমন্ত্রণে অসলো শহরে অভ্যর্থিত হলেন। স্টকহোলমে স্বেন হেদিন, বিয়র্নসেন, যোহান বোয়ার প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয় হল। কোপেনহেগেনে দার্শনিক হফডিং এবং বিখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক জর্জ ব্রানডেসের সঙ্গেও কবির যোগাযোগ ঘটেছিল।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১৯২৬ সনে 'লীগ অব নেশনসে'র আমন্ত্রণে যখন জেনেভায় গিয়েছিলেন তখন রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপে। তিনি Rabindra Nath At Dresden নামক প্রবন্ধে সেই সময় য়ুরোপে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিরকম আগ্রহ লক্ষ্য করেছেন তা লিখেছেন। বারবার তাঁকে রবীন্দ্রনাথ মনে করে সাধারণ মানুষ ভিড় করে এসেছেন। রামানন্দবাবু লিখেছেন :

নির্ধারিত সময়ের কিছু আগে সভাস্থলে পৌঁছিলাম। তিন চার সহস্র মানুষ ধরে এমনই বিরাট সভাকক্ষ। একটিও আসন খালি নাই। অনেকে দণ্ডায়মান, শ্রোতাদের অনেকেই রমণী। এঁদের অনেকেই ইংরাজী জানেন, যাঁহারা জানেন না তাঁহাদের জন্য বার্লিন য়ুনিভার্সিটির হিন্দী অধ্যাপক পণ্ডিত তারাচাঁদ রায় জার্মান ভাষায় কবির বক্তব্য অনুবাদ করিয়া দিলেন, ইনি পাঞ্জাব প্রদেশবাসী। অনেক রিপোর্টার ছিলেন, তাঁহারাও অধিকাংশক্ষেত্রে নারী। যিনি সমগ্র বক্তৃতা লিখিয়াছেন তিনি নারী। কবি অনেকগুলি ইংরাজী ও বাংলা কবিতা আবৃত্তি করিলেন। কবিতা পাঠের সময় ঘনঘন হর্ষধ্বনি হইতেছিল। The Crescent Moon হইতে যে সব কবিতা পাঠ করা হইল, তাহা বিশেষভাবে সমাদৃত হইল, ফলে কবিকে নির্ধারিত সংখ্যার বেশী কবিতা পাঠ করিতে হইল। নিম্নলিখিত কবিতাটি কবিকে দু-তিনবার পড়িতে হইল—

"Why are those tears in your eyes,
my child ?
How horrid of them to be always
scolding you for nothing ?"

বিস্তারিতভাবে সমগ্র প্রবন্ধ উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। এর পর কবি রাশিয়া গিয়েছেন। তাঁর 'রাশিয়ার চিঠি'র আবেদন আজও অম্লান।

আজ পৃথিবীতে যে যুগান্তকারী দ্বন্দ্বের সূচনা হয়েছে, সে ভিন্ন ভিন্ন মহাজাতির মধ্যে নয়, মানুষের দুই বিভাগের মধ্যে, শাসয়িতা ও শাসিতে, শোষয়িতা ও শুষ্ক।···আমাদের দুঃখই, আমাদের দৈন্যই আমাদের মহাশক্তি। সেইটেতেই জগৎ জুড়ে আমাদের সম্মিলন এবং সেইটেতেই ভবিষ্যতকে আমরা অধিকার করব। অথচ যারা ধনিক তারা কিছুতেই একত্র মিলতে পারে না, স্বার্থের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরে তারা বিচ্ছিন্ন। [রাশিয়ার চিঠি]

রবীন্দ্রনাথ এক হিসাবে ধর্মগুরু। তিনি স্বয়ং একটি ধর্মের প্রবর্তক ও প্রচারক। সারা বিশ্ব জুড়ে তিনি ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করেছেন, তার নীতি ছিল 'একলা চলোরে'— তাই এ তাঁর একক প্রচেষ্টা। তিনি যে ধর্মপ্রচার করেছেন তার নাম মানবধর্ম।

তাই ১৯১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দেই রবীন্দ্রনাথ আমেরিকার শ্রোতাদের বলেছেন :

"God with us is not a distant God; He belongs to our homes, as well to our temples. We feel His nearness to us in all the human relationship of love and affection, and in our festivities. He is the Chief Guest whom we honour. In seasons of flower and fruits in the coming of the rain, in the fullness of the autumn, we see the hem of His mantle and here his footsteps. We worship Him in all the true objects of our worship and love him whenever our love is true. In the woman who is good we feel Him, in the man who is true we know Him, in our children He is born again and again, the Eternal Child. Therefore religious songs are our love songs." (Personality)

বুদ্ধের পর ভারতবর্ষের বাণী এমন সুন্দর ভাবে বিশ্বের দরবারে আর কে প্রচার করেছেন জানি না। তাই যোহান বোয়ার বলেছেন : "He is India bringing to Europe a new divine symbol, not the Cross but Lotus."

এই প্রবন্ধটি আসলে একটি সুবৃহৎ বক্তব্যের কাঠামো। স্বল্প পরিসরে সমস্ত কথা বলা সম্ভব নয়। কবির বিশ্বজয়ের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসও নয়। এই প্রবন্ধে এইটুকু দেখানোর প্রয়াস করেছি যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবদ্দশায় নোবেল পুরস্কার পাওয়ার আগে থেকে এবং তিরোভাবের কাল পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বে প্রচুর সম্মান ও সম্বর্ধনা লাভ করেছেন, সমসাময়িক চিন্তানায়কদের কাছে বিস্ময়কর অভিনন্দনলাভ করেছেন কিন্তু আজ তাঁর তিরোধানের পর কুড়ি বছরও কাটে নি য়ুরোপের একমাত্র সমাজতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রগুলি ছাড়া আর কোথাও রবীন্দ্রনাথ নেই। আজ থেকে কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে যাঁরা রবীন্দ্রনাথের কথা শুনেছেন বা পড়েছেন তাঁরা প্রবীণ হয়েছেন, এখন যাদের বয়স কুড়ি-পঁচিশ তারা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছুই জানে না, এ কথা যাঁরা ঘন ঘন য়ুরোপ ঘুরে আসছেন তাঁদের মুখেই শোনা গেছে। এর কারণ বাঙালী তার কর্তব্য পালন করে নি। ভারতরাষ্ট্র তার দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত নন। আর আমাদের নিজস্ব 'বিশ্বভারতী' ভারতের বাইরে তো নয়ই, ভারতের অন্য প্রদেশে রবীন্দ্রসাহিত্য বা জীবনী প্রচারে যে চেষ্টা করেছেন তা জানার কৌতূহল হয়। আজ বিদেশে রবীন্দ্রনাথ অনুপস্থিত এবং এখনও তজ্জন্য সচেষ্ট না হলে বাঙালীকে চরম প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

আবহাওয়া

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেকালের আবহাওয়া একালে বদলে গেছে; এখানকার মানুষই যেন অন্য রকম হয়ে জন্মাচ্ছে। সে মজলিস নেই, মজলিসী লোকও নেই। কিন্তু সেকালে আমাদের কি ছিল? এই বাড়িতেই দেখেছি, যখন যেখানে যেমনটি প্রয়োজন ঠিক তেমনটি পাওয়া যেত; সব যেন আগে থেকে তৈরি হয়ে আছে। বৈজ্ঞানিক হিসেবের সঙ্কীর্ণতায় প্রাণবস্তুর কাটছাঁট তখনও শুরু হয় নি। নানা প্রয়োজন এবং বাহুল্যের সরবরাহ ক'রে মজলিসকে বাঁচিয়ে রাখা যাদের কাজ ছিল, সেই চাকর-বাকররাও ছিল তেমনই, মজলিসের রস তাদেরও ছুঁয়ে যেত। আজকাল মজলিস নাম দেয় বটে, কিন্তু তাতে মজলিসত্ব কিছু নেই; তফাত বুঝতে পারি না—আনন্দ-সভায় আর শোকসভায়; সেই সভাপতি, সেই উদ্বোধন-সঙ্গীত, সেই বক্তৃতা, সেই সমাপ্তি-সঙ্গীত। সবই আছে, মজলিসের প্রাণটুকুই শুধু নেই।

সেকালের বৈঠকেরও এই দুর্গতি হয়েছে। সে আমলে এই মজলিস আর বৈঠক ছিল সত্যি, জীবন্ত; আমরাও তার শেষ রেশটুকু দেখেছি। ও বাড়িতে বসত বড় জ্যাঠামশাইদের বৈঠক সকালে; বাবামশাই বড় জ্যাঠামশাই সবাই বসতেন দক্ষিণের বারান্দায়। বড় জ্যাঠামশাই **'স্বপ্নপ্রয়াণ'** লিখছেন, তাই নিয়ে অবিরত চলছে সাহিত্য-আলোচনা; দার্শনিকেরা আসতেন, পণ্ডিতেরা আসতেন, নিজের নিজের সটকা নিয়ে আসর জমিয়ে সবাই বসতেন; অবাধে বইত সাহিত্যের হাওয়া। ছেলেবেলায় উঁকিঝুঁকি মেরে আমিও দেখেছি এই বৈঠকের চেহারা।

সন্ধ্যায় বসত জ্যোতিকাকামশাইদের বৈঠক। এ বৈঠকের চেহারা ছিল আর এক রকম; সেখানে আসতেন তারক পালিত, ছোট অক্ষয়বাবু, কবি বিহারীলাল। রবিকা বয়সে ছোট হ'লেও এই বৈঠকেই যোগ দিতেন। এখানে মেয়েদেরও প্রবেশাধিকার ছিল। নতুন কাকীমা অর্থাৎ জ্যোতিকার স্ত্রী ছিলেন এই বৈঠকের কর্ত্রী। এখানে চলত গান, বাজনা, কবিতার পর কবিতা পাঠ।

এ বাড়িতে বাবামশাইয়ের ছিল আলাদা বৈঠক, এখানে পাড়া-পড়শীরা এসে বসত, তামাক, গান-বাজনা, খোশগল্প চলত; অক্ষয় মজুমদার টপ্পা গাইতেন; অম্বুরী তামাকের গন্ধে আসর মাত হয়ে থাকত। সেখানে আমাদের প্রবেশাধিকার ছিল না।

সে যুগের তিন রকম মজলিসের ছবি দিলুম। এই আবহাওয়ার মধ্যে রবিকা বড় হয়েছেন। তখন সব দিকে সামঞ্জস্য বজায় ছিল, শিল্প সাহিত্য গানের অফুরন্ত বিকাশের মধ্যে তিনি মানুষ। সে যুগে এমন বিদ্বদ্‌জন-সমাগম আর কোথাও হ'ত না। বঙ্কিমবাবু আসতেন। মনে আছে, একবার রবিকার 'কাল-মৃগয়া' নাটকটি আগাগোড়া গান গেয়ে তাঁকে শোনানো হয়েছিল। আবছা মনে পড়ছে আমাদের উপর ভার ছিল ফুলদানি সাজাবার। সহবৎদুরস্ত ভাল কাপড় জামা প'রে হাজির হবার হুকুম হ'ল আমাদের উপর। একালের মত এলোমেলো অগোছালো ভাবে ছেলেরা যেখানে সেখানে যেতে পারত না। এই জীবনযাত্রার মধ্যে যিনি মানুষ, তিনি যে সকলবিধ সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রতি নিষ্ঠা দেখাবেন, সে আর বিচিত্র কি? আমাদের এই বাড়ির জীবনযাত্রা পুরাতন চালে অনেক দিন চলেছিল। আমাদের আমলেও এর জের ছিল কিছু। তারপর আস্তে আস্তে আজকালকার ক্লাবের সৃষ্টি হ'ল, পুরাতন চাল বিদায় নিলে।

যেমন বাইরে, অন্দর মহলেও তেমনই। দেখেছি গুরুজনের সম্পর্ককে সমীহ ক'রে চলার রেওয়াজ; খাওয়া-দাওয়া, সাজ-পোশাকে তাঁদেরও একটু বেচাল হওয়ার জো ছিল না।

একটা ঘটনার কথা আমার মনে পড়ছে। অরুদা একবার চা-বাগান থেকে ফিরে এলেন, একেবারে পুরোদস্তুর সাহেব—কোট-প্যান্ট হ্যাট-টাই, কুলী খাটিয়ে মেজাজও হয়েছে সাহেবী। ইংরেজী ফ্যাশান-দুরস্ত সাজ প'রে তিনি একদিন বাইরে বেরুচ্ছেন, দেউড়ির বাইরে এসেছেন, উপরের বারান্দা থেকে বড় জ্যাঠামশাইয়ের নজরে প'ড়ে গেলেন। অমনই শুরু হ'ল হাঁকডাক। জ্যেঠামশাই উপর থেকেই বললেন, অরু, এই অভব্য বেশে তুমি চলেছ রাস্তায়? একটা বিপর্য্যয় ব্যাপার ঘটে গেল। চাকর ছুটল, দরোয়ান ছুটল, অরুদার আর পাত্তাই পাওয়া গেল না। সাজ-পোশাকের দস্তুর তখন মেনে চলতেই হ'ত—এক ছোটে বেরুনো বারণ ছিল। বে-আইনী পোশাকে ছোট ছেলেদেরও কাউকে যদি সদরে দেখা যেত, অমনই তলব পড়ত চাকরদের, কঠিন শাস্তি পেতে হ'ত তাদের। আজ আর আমার কিছু বলবার নেই। আমি লুঙি প'রে ব'সে আছি, আমাদের ছেলেরা হ্যাট-কোট পরছে।

যা বলছিলুম। ইদানীং দেখছি, সব তফাত হয়ে গেছে। ছোটখাটো স্মৃতি-সভা, টাউন-হলের সভা, গান-বাজনার আসর সবই যেন এক রকম। বিয়ের বাসর আর মৃত্যু-বাসর সবই এক। এগুলো আমাদের বড় চোখে লাগে। রবিকাকে একবার বলেছিলুম, রবিকা, একটা ব্যবস্থা কর দেখি, এ রকম তো আর দেখতে পারি নে। সব অনুষ্ঠানগুলো তালগোল পাকিয়ে এক হয়ে গেল! তিনি জবাব দিলেন না, চোখ বুজে রইলেন। রবিকা এই যে ঋতুতে ঋতুতে উৎসব করতেন, তাঁর মনের মধ্যে ঋতু অনুযায়ী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ঠিক রূপটি ধরা পড়ত। শান্তিনিকেতনেও যে সব অনুষ্ঠান হ'ত, তার সমস্ত আয়োজন তাঁর ব্যবস্থামত হ'ত। কার পর কি হবে, কোথায় কি থাকবে, কে কোথায় বসবে, আগে থাকতে সব ছ'কে দিতেন। একবার কলকাতাতে তাঁর জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষে ওরয়েণ্টাল আর্ট সোসাইটির শিল্পীরা ওঁকে সম্বর্দ্ধনা করেছিল। উৎসবের একটা ভাল রকম ব্যবস্থার জন্যে আমি ওঁকেই গিয়ে ধরলুম। সমস্ত অনুষ্ঠানের এমন একটা রূপ দিয়ে দিলেন যে, বিস্মিত হতে হ'ল। এই আমাকেই চেলীর জোড় পরিয়ে ক্ষিতিমোহন-বাবুর বাছাই করা বৈদিকমন্ত্র পড়িয়ে তবে ছাড়লেন। আমি নিজে শিল্পী হয়ে তাঁর শিল্প ও সুষমা বোধের পরিচয় পেয়ে অবাক না হয়ে পারলুম না। এখন বুঝতে পারি, এই সব অনুষ্ঠান ঠিক ঠিক করবার জন্যে কর্ত্তার যে শক্তি দরকার, তা তাঁর মধ্যে ছিল। তাঁর বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে সে শক্তিও বিদায় নিয়েছে। আমার মনে হচ্ছে, বাংলা দেশ থেকে অনুষ্ঠান জিনিসটাও বিদায় নেবে।

রবিকা কোন জিনিস এলোমেলো অগোছালো ভাবে হওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না—এই শিক্ষা তিনি পুরানো যুগের আবহাওয়া থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। কোন অনুষ্ঠানে পান থেকে চুন খসবার জো ছিল না। সব ঠিক ঠিক হতেই হ'ত।

রবিকার সঙ্গে সঙ্গে এই সব অনুষ্ঠান, পুরানো যুগের সব স্মৃতি বিদায় নিলে। রবিকা বলতেন, "দেখ, আমরা চলতে বলতে এক ভাবে শিখেছিলুম, তাই এ যুগের লোকের সঙ্গে আর তাল মেলাতে পারি না।" তিনি মুখে এ কথা বললেও নতুন আবহাওয়া সৃষ্টি করার ক্ষমতাও তাঁর ছিল এবং তাঁর জীবনে তাল না-মেলবার দুঃখ তাঁকে পেতে হয় নি। পুরানো আনুষ্ঠানিক আবহাওয়া তিনি যথাযথ বজায় রেখেছিলেন তাঁর সব অনুষ্ঠানের মধ্যে। নিজের জোরে নতুনের সঙ্গে পুরাতনকে মিলিয়ে নিয়েছিলেন।

['শনিবারের চিঠি' স্মৃতি-সংখ্যা ১৩৪৮ হইতে পুনর্মুদ্রিত।]

রবীন্দ্রনাটকের ধারা

(ঐতিহাসিক আলোচনা)

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রতি খণ্ডে চারটে করে ভাগ— কবিতা, নাটক, গল্প-উপন্যাস ও প্রবন্ধ। ছাব্বিশ খণ্ড রচনাবলীতে নাটক-প্রহসন বিভাগে ৪৬খানি গ্রন্থ ধরা হয়েছে; অচলিত খণ্ডে আরও দুটো অথবা ছটাও ধরা যেতে পারে। এই সংখ্যার তারতম্যের কারণ একটু পরেই বোঝা যাবে। রচনাবলীর দ্বিতীয় ভাগে নাটক, নাটিকা, গীতনাট্য, গীতিনাট্য, নাট্যকাব্য, প্রহসন, কৌতুকনাট্য, ঋতুনাট্য, নৃত্যনাট্য প্রভৃতি কালানুক্রমে সাজিয়ে খণ্ডে খণ্ডে ছাপা হয়েছে।

প্রথমেই আমরা অচলিত খণ্ডের তিনটি কাব্যের কথা পাড়ব। 'বনফুল', 'কবিকাহিনী' ও 'ভগ্নহৃদয়' কোনটিই নাটক নয়, অথচ সবকটিতে পাত্রপাত্রী আছে। 'বনফুল' কবির চোদ্দ বৎসর বয়সের, 'কবিকাহিনী' ষোলো-সতেরো ও 'ভগ্নহৃদয়' উনিশ বৎসর বয়সের রচনা। প্রথম দুটি বিলাত যাবার আগে লেখা; তৃতীয়টি বিলাতে শুরু ও দেশে এসে শেষ করা। 'ভগ্নহৃদয়ে'র ভূমিকায় কবি লেখেন, "এই কাব্যটিকে কেহ যেন নাটক মনে না করেন। নাটক ফুলের গাছ। তাহাতে ফুল ফুটে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র, এমনকি কাঁটাটি পর্যন্ত থাকা চাই। বর্তমান কাব্যটি ফুলের মালা, ইহাতে ফুলগুলি মাত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে। বলাবাহুল্য যে, দৃষ্টান্তস্বরূপেই ফুলের উল্লেখ করা হইল।"

'ভগ্নহৃদয়'কে নাটক বলতে পারি না, অথচ গ্রন্থে 'কাব্যের পাত্রগণে'র দীর্ঘ তালিকা—যথা কবি, অনিল, মুরলা, ললিতা, নলিনী, চপলা, লীলা, সুরুচি, মাধবী, প্রভৃতি; এ ছাড়া সুরেশ, বিজয়, বিনোদ প্রভৃতি যুবকের ভিড়—সকলেই ভগ্নহৃদয়ের জ্বালায় ছটফট করে বেড়াচ্ছে। ৩৪টি ভাগে এই সুবৃহৎ শিথিল-গ্রথিত কাব্য সংলাপ বিলাপ প্রলাপে পূর্ণ, তবুও একে নাটক আখ্যা দিতে পারা যাবে না। 'বনফুল', 'কবিকাহিনী', 'ভগ্নহৃদয়' নাটকীয় সংলাপাদি থাকলেও নাটক বলে ধরা যায় না—সেই জন্য নাটকের সংখ্যা ৪৬ দাঁড়ায়।

আমাদের এখন বিচার করতে হবে এই সংখ্যার মধ্যে কখানা মৌলিক; 'মৌলিক' শব্দ আমরা কি অর্থে ব্যবহার করছি, তা আমাদের আলোচনার মধ্যে প্রকাশ পাবে। রবীন্দ্র-রচনাবলীতে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'কে কবির প্রথম নাট্য বলে ধরা হয়। এটা কবি লেখেন বিলাত থেকে ফেরবার প্রায় এক বৎসর পরে। বিদেশে যুবক রবি নাচ-গানের পার্টিতে যেতেন, থিয়েটর প্রভৃতিও দেখতেন। সুতরাং সেখানকার ব্যালে অপেরা প্রভৃতির প্রভাব বেশ স্পষ্টভাবেই পড়ল 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র উপর। বিষয় হল ভারতের আদিকবি বাল্মীকির প্রতিভাবিকাশ-কাহিনী—তার প্রকাশমাধ্যম হল বাংলার বিচিত্র রাগরাগিণীযুক্ত সংগীত এবং পাশ্চাত্ত্য সংগীতের সুর-সংযোজনায়। ঘটনাটি প্রতীকমূলক মনে হয়—প্রাচীন পূর্ব ও আধুনিক পশ্চিম রূপ ও সুর পেল তরুণ বাঙালী কবির লেখনী থেকে।

১৮৮১ সনের গোড়ায় 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র যে সংস্করণ প্রকাশিত ও অভিনীত হয় তা আমরা দেখতে পাই নে; সেটি আছে অচলিত খণ্ডে। রচনাবলীর খণ্ডে 'বাল্মিকী-প্রতিভা'র যে রূপটি পাই সেটি কয় বৎসর পরের রচনা।

'বাল্মিকী-প্রতিভা' মুদ্রণের (১৮৮১ মার্চ) তিন মাস পরে 'ভগ্নহৃদয়' ও 'রুদ্রচণ্ড' ছাপা হয় একই মাসে (১৮৮১ জুন)। 'রুদ্রচণ্ড' কবির প্রথম নাটক, অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা—যে ছন্দ সাহিত্যে মাইকেল প্রবর্তন করেছেন বিশ বৎসর পূর্বে। তবে এর ভাষা সরল দুবোধ্য বা অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের আড়ম্বরে ভারাক্রান্ত নয়। কাঁচা লেখা হলেও এরই মধ্যে সর্বপ্রথম নাটকীয়তার সমারোহ দেখা গেল। আমাদের মতে 'রুদ্রচণ্ড' বালক কবির লুপ্ত

'পৃথ্বীরাজ পরাজয়ে'র রূপান্তরণ। 'জীবনস্মৃতি' যখন লেখেন তখন 'পৃথ্বীরাজ পরাজয়ে'র খসড়া হারিয়ে গিয়েছে—কিন্তু বিশ বৎসর বয়সে যখন 'রুদ্রচণ্ড' লেখেন, তখন সেটা তাঁর সামনে ছিল বলেই আমাদের ধারণা।

'বাল্মীকি-প্রতিভা' সাফল্যের সঙ্গে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে কয়েকবারই অভিনীত হয়। এর সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে এবার কবি লিখলেন 'কালমৃগয়া'। অভিনয়ও হল বাড়িতে (১৮৮২ ডিসেম্বর)। এই ক্ষুদ্র গীতিনাট্যের মধ্যে নাটকীয় উপাদান যথেষ্ট আছে। কিন্তু কালে এই নাটিকার অনেক কিছু নিয়ে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র মধ্যে বসিয়ে দিলেন—'বাল্মীকি-প্রতিভা' পেল তার আধুনিক রূপ, আর 'কালমৃগয়া' হয়ে গেল 'অচলিত'। বহুকাল পরে শিশুমহলে এর অভিনয় সমাদর লাভ করেছে।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর অচলিত খণ্ডে "নলিনী" নামে গদ্য-নাটক আছে; এটি কবির প্রথম গদ্য-নাটক (১৮৮৪ মে)। আসলে একটা নাটক বাড়ির সকলে মিলে বারোয়ারিভাবে লেখার কল্পনা হয়। কিন্তু পরিবারমধ্যে কয়েকটি মৃত্যু-শোকের জন্য সেটা হয়ে উঠল না, রবীন্দ্রনাথকেই কোনরকমে সেটা শেষ করতে হয়েছিল। এর আট বৎসর পর (১৮৯২) 'গোড়ায় গলদ' তাঁর প্রথম গদ্য-প্রহসন লিখিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনটা ছিল চলার উপর—কোন জায়গায় দীর্ঘকাল থাকেন নি, তা থাকতে পারতেন না বলেই সদাই ঠাঁই বদল করতেন। একবার গেলেন কারোয়ার—আরব সাগরের তীরের শহর। এখন এটা মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত—ছিল বোম্বাইয়ের মধ্যে।

এই কারোয়ার বাসকালে লিখলেন তাঁর নাট্যকাব্য 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১৮৮৪ এপ্রিল)। এই নাট্যকাব্য সম্বন্ধে কবি 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে বহুবিস্তারে আলোচনা করেছেন, কারণ দার্শনিক মতবাদের প্রথম কাব্যময় প্রকাশ হয় এই নাট্যকাব্যে। এতে ১৬টি দৃশ্য আছে, এটি অভিনেয় নাটক নয়, এবং কখনও মঞ্চিত হয়েছিল বলেও শুনি নি। তবে এর মধ্যে অভিনয়ের খোরাক যথেষ্ট আছে, একটু পাকা হাতের স্পর্শে, এটা বেশ ভাল অভিনেয়-নাটক হতে পারবে।

'বাল্মীকি-প্রতিভা' (১৮৮১ ফেব্রুয়ারি), 'কালমৃগয়া' (১৮৮২ ডিসেম্বর) লেখার পর কবিকে উপন্যাস লিখতে দেখি 'বউঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি'। এর মধ্যে 'বউ-ঠাকুরাণীর হাট' ভেঙে করলেন 'প্রায়শ্চিত্ত', 'রাজর্ষি' হল 'বিসর্জন'। 'মায়ার খেলা' নামে একটা গীতিনাট্য ইতিমধ্যে লিখলেন (১৮৮৮)—সেটার নাট্য মুখ্য নহে, গীতই মুখ্য। 'বাল্মীকি-প্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া' যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, 'মায়ার খেলা' তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনাস্রোতের 'পরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ। কেবলমাত্র মেয়েদের দ্বারা অভিনীত হবার ফরমাইশে এটা লেখা। আমরা পূর্বেই বলেছি "নলিনী"র ছায়া এর উপর পড়েছে। এই নাটকে কয়েকটি 'বেচারা' পুরুষ আছে—হৃদয়ের জ্বালা নিয়ে ঘুরে মরছে—অভিনয়ে মেয়েরা তাদের ভূমিকায় সহজেই নামতে পারে—পুরুষদের পৌরুষ এদের স্পর্শ করে নি। 'মায়ার খেলা'র উপর নলিনীর ছায়া অনেকখানি পড়েছে।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যেসব নাটকের কথা আলোচনা করলাম, তার মধ্যে কোনটিই রঙ্গালয়ে অভিনীত হবার মত নয়। কোন্ যুগের আদর্শ অনুসারে নাটক লেখার রীতি হয় পঞ্চাঙ্কে—নানা দৃশ্যে বিভক্ত; সেই ফর্মুলার মাপে কবির প্রথম পঞ্চাঙ্ক নাটক 'রাজা ও রাণী'। সেটাও লিখলেন পশ্চিম ভারতে সোলাপুরে বসে।

'রাজা ও রাণী' নিজেদের বাড়িতে অভিনীত তো হয়ই, পাব্লিক রঙ্গমঞ্চে বেশ সাফল্যের সঙ্গে চলেছিল। চল্লিশ বৎসর পরে এর ক্ষীণধারা ধরে লিখলেন 'তপতী' নামে গদ্যনাটক (১৯২৯)। 'রাজা ও রাণী' সত্যকার মৌলিক রচনা—এর মূল উপাদান কোথা থেকে সংগৃহীত, তা জানা যায় নি। কিন্তু 'বিসর্জন' নামে যে নাটক এবার লিখলেন, সেটার মূল সংগ্রহ করলেন 'রাজর্ষি' উপন্যাস থেকে। প্রথম সংস্করণে 'রাজর্ষি'র প্রভাব আরও স্পষ্ট ছিল—এখন যে রূপে আমরা 'বিসর্জন' পাই, তা নাটকের সংস্কৃতরূপ। উপন্যাসের অধিকাংশ ঘটনা নাটকে বাদ দিলেও উভয়ের ভাষা ও ভাবের মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে। 'রাজর্ষি'র গদ্য 'বিসর্জনে' কাব্য হয়ে উঠেছে,

একটা তুলনামূলক উদাহরণ উদ্ধৃত করছি। রঘুপতি জয়সিংহকে বলছেন, "শোনো বৎস, তোমাকে তবে আর এক শিক্ষা দিই। পাপপুণ্য কিছুই নাই। কেই বা পিতা, কেই বা ভ্রাতা, কেই বা কে। হত্যা যদি পাপ হয় তো সকল হত্যাই সমান। কিন্তু কে বলে হত্যা পাপ। হত্যা তো প্রতিদিনই হইতেছে। কেহ বা মাথায় এক খণ্ড পাথর পড়িয়া হত হইতেছে, কেহ বা বন্যায় ভাসিয়া গিয়া হত হইতেছে,... কেহ বা মনুষ্যের ছুরিকাঘাতে হত হইতেছে। কত পিপীলিকা আমরা প্রত্যহ পদতলে দলন করিয়া যাইতেছি, আমরা তাহাদের অপেক্ষা এমনই কি বড়ো। এই সকল ক্ষুদ্র প্রাণীদের জীবন-মৃত্যু খেলা বই তো নয়—মহাশক্তির মায়া বই তো নয়। কালরূপিণী মহামায়ার নিকটে প্রতিদিন এমন কত লক্ষ কোটি প্রাণীর বলিদান হইতেছে—জগতের চতুর্দিক হইতে জীব-শোণিতের স্রোত তাঁহার মহাখর্পরে আসিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে—আমিই না হয় সেই স্রোতে আর একটি কণা যোগ করিয়া দিলাম।" ইহার সহিত তুলনীয় 'বিসর্জনে'র সুপরিচিত অংশ—

"তবে এস বৎস, আর এক শিক্ষা দিই।
পাপপুণ্য কিছু নাই। কে বা ভ্রাতা, কে বা
আত্মপর? কে বলিল হত্যাকাণ্ড পাপ?
এ জগৎ মহা হত্যাশালা। জান নাকি
প্রত্যেক পলকপাতে লক্ষকোটি প্রাণী
চির আঁখি মুদিতেছে। সে কাহার খেলা?
হত্যায় খচিত এই ধরণীর ধূলি।
প্রতিপদে চরণে দলিত শত কীট;
তাহারা কি জীব নহে?...
মহাকালী কালস্বরূপিণী রয়েছেন
দাঁড়াইয়া তৃষাতীক্ষ্ণ লোলজিহ্বা মেলি"...ইত্যাদি

এইরূপ আরও অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারত—বিশেষতঃ 'বিসর্জ'নের প্রথম সংস্করণের পাঠের সঙ্গে।

'রাজা ও রাণী' এবং 'বিসর্জনে'র ন্যায় পঞ্চাঙ্ক কাব্যময় নাটক কবি আর লেখেন নি। তবে এর পর কবিকে অমিল প্রবহমান ছন্দে ক্ষুদ্র নাটিকা বা reading drama বা শ্রাব্য নাটক কয়েকটি লিখতে দেখি—যেমন 'চিত্রাঙ্গদা' (১৮৯১), 'বিদায় অভিশাপ' (১৮৯৩), 'মালিনী' (১৮৯৬) ও 'কাহিনী'র নাট্যকাব্যগুলি (১৯০০)। এসব কবিতা কখনও অমিত্রাক্ষর বা মাইকেলী ছন্দে, কখনও সমিল প্রবহমানতা রক্ষা করে রচিত হয়। সম্পূর্ণ ভিন্ন ছন্দে 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' লেখেন—একেবারে বাংলার পয়ার ছন্দেও নাটক লেখা যায় সেটা দেখাসেন। মেয়েদের স্কুলে এ নাটকটি বেশ সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয় বলে শুনেছি। কবি বৃদ্ধ বয়সে ভেবেছিলেন 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'কে নৃত্যছন্দে ঢেলে সাজাবেন—কিন্তু পেরে ওঠেন নি। তবে পূর্বোল্লিখিত কাব্যনাট্যের মধ্যে 'চিত্রাঙ্গদা'কে নৃত্যনাট্যে রূপ দিয়ে যান এবং বিশ্বভারতীর শিক্ষক ছাত্রছাত্রীরা এটা অভিনয় করে বিশ্বভারতীর জন্য অনেক টাকা উপার্জন করে এনে দিয়েছিল।

'চিত্রাঙ্গদা'র পর কবির প্রথম গদ্য-প্রহসন 'গোড়ায় গলদ' বের হয়; প্রহসন বা রঙ্গচিত্র উপন্যাসের ঢঙে অথবা নাটকের ঢঙে লেখা হতে পারে। প্রহসনবর্গের 'গোড়ায় গলদ' (১৮৯২), 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৮৯৭) ও 'চিরকুমার সভা' (ভারতী, ১৯০০)। 'গোড়ায় গলদ' পঞ্চমাংক নাটক; 'বৈকুণ্ঠের খাতা'য় তিনটি দৃশ্য। কিন্তু 'চিরকুমার সভা' উপন্যাসের ঢঙে লেখা, কিন্তু সংলাপপূর্ণ। ১৯০৪ সনে এই প্রহসনটি কবির হিতবাদী কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 'গ্রন্থাবলী'তে রঙ্গচিত্র বিভাগে ছোটগল্পের মধ্যে প্রণীত হয়। ১৯০৮ সনে পৃথক পুস্তকাকারে মুদ্রণের সময় নামকরণ হয় 'প্রজাপতির নির্বন্ধ'। তার আঠারো বৎসর পর 'চিরকুমার সভা' নামে পুরোপুরি নাটকাকারে ওটা লেখা ও ছাপা হয়। মোট কথা, এই তিনটি প্রহসন বাংলা রঙ্গমঞ্চে খুব সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে।

কাব্য-নাট্যগুলি লেখবার পূর্বে কবি লেখেন পঞ্চাঙ্ক কাব্যনাটক 'রাজা ও রাণী' আর 'বিসর্জন'। আর প্রহসনগুলি লেখবার পর লিখলেন হাস্যকৌতুক ও ব্যঙ্গকৌতুক। পুস্তকাকারে এই বই দুটো বের হয় ১৯০৭ সনে—গদ্য-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গতরূপে। আসলে এগুলি 'বালক' ও 'ভারতী'তে অনেক বছর পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল।

এই হাস্যকৌতুক ও ব্যঙ্গকৌতুকের চাহিদা ছিল তাঁরই বিদ্যালয়ে—ছাত্রেরা প্রায়ই অভিনয় করত পত্রিকার মধ্যে থেকে খুঁজেপেতে এনে। এগুলি লেখা বিদ্যালয় পরিকল্পনার অনেক আগে।"

শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মনে রেখে তাঁর প্রথম ঋতু-উৎসবের নাটক 'শারদোৎসব' লিখিত হল ১৯০৮ সনে। তখন আশ্রমে কেবল ছাত্রেরাই ছিল, তাই এ নাটকে নারীচরিত্র নেই। এটি মৌলিক সৃষ্টি, পূর্বের কোনও রচনার ছায়া এতে নেই। কবির ঋতু-উৎসবের অন্য নাটকগুলিও মৌলিক—যেমন, 'রাজা' (১৯১০), 'অচলায়তন' (১৯১২), 'ফাল্গুনী' (১৯১৬)। 'ডাকঘর' (১৯১২) ঋতু-উৎসবের নাটক নয়—যদিও প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হবার জন্যই অমলের ভিতরে ভিতরে দুর্দমনীয় টান। 'শারদোৎসবে' যেমন শরৎকালের বন্দনা গীত হয়েছে, 'রাজা' ও 'ফাল্গুনী' বসন্তের আবাহনে মুখরিত ; আর বর্ষার ঝরঝর বারিধারা অচলায়তনের প্রান্তরে এনেছে বিপ্লবের বাণী। এই চারটি নাটককে কবির জীবনদর্শনের কাব্যও বলা যেতে পারে।

বিদ্যালয়ের প্রয়োজনে ১৯০৮ সনে 'মুকুট' নাটক লিখলেন ; এটি 'বালক' পত্রিকার পুরাতন গল্প (১৮৮৬)। এ নাটক অত্যন্ত সাদাসিধে ঐতিহাসিক নাটক—ত্রিপুরা রাজপরিবারের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এ নাটকও নারীচরিত্রবর্জিত। মূল গল্পের একটি নারীচরিত্র আছে—সেটির স্থান নাটকে হয় নি।

ঐতিহাসিক নাটক 'মুকুট' লেখবার পরে কবি তাঁর 'বউঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসের ছায়ায় 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকটি লিখলেন (১৯০৯)। মূল উপন্যাসও যেমন তৎকালীন রচনারীতির পথ অনুসরণ করেছিল, এই নাটকও ক্লাসিকাল পদ্ধতি অনুসারে রচিত হল। তবে এই নাটকের মধ্যে ধনঞ্জয় বৈরাগীর যে চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে, তাকে তাঁর এই যুগের অব্যবহিত পরে লিখিত রূপকাত্মক নাটিকাগুলির 'ঠাকুর্দা,' 'গুরু' প্রভৃতির অগ্রদূত বলা যেতে পারে। অহিংসা ও অসহযোগ নীতির প্রথম বাণী শোনা গেল সাহিত্যের মধ্যে।

পরবৎসর থেকে যে কটি নাটিকা রচিত হতে দেখা যায় সেগুলি রূপকাত্মক, বনিয়াদী নাটক রচনা-পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। 'রাজা' (১৯১০) নাটক একটি বৌদ্ধ উপাখ্যানের ছায়া নিয়ে লেখা, তবে বসন্ত-উৎসব রয়েছে এর পটভূমে— যেমন 'শারদোৎসবে' রয়েছে শরৎকালের আবাহন। 'শারদোৎসবে' রাজা ছদ্মবেশে বের হয়েছেন সকলের সঙ্গে মেলবার জন্য ; 'রাজা' নাটকে বসন্তোৎসবে লোকে দেখবে তাদের অদৃশ্য রাজাকে।

দশ বৎসর পরে 'রাজা' ভেঙে লিখলেন (১৯২০) 'অরূপরতন' ; পরবৎসরে 'রাজা'র দ্বিতীয় সংস্করণে কিছু অদলবদল হয়। কিন্তু আরও কয়েক বৎসর পরে 'অরূপরতনে'র যে পরিবর্তন করলেন সেটা নানারকমের। 'রাজা'র দুটো সংস্করণ ও 'অরূপরতনে'র দুটো সংস্করণ এবং 'শাপমোচন' নিয়ে একটা ভাল রকম আলোচনার ক্ষেত্র রয়েছে। মৌলিক সৃষ্টি-প্রেরণার অভাবে একই বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করে চলেছেন। অথবা পুরাতনকে নতুনের সাজে সাজিয়ে দেখতে চাইছেন।

'রাজা' নাটক রচনার পর লেখেন 'ডাকঘর' ও 'অচলায়তন' (১৯১২), কয়েক মাসের ব্যবধানে রচিত দুটি নাটকের সুর সম্পূর্ণ দুই জগতের। 'ডাকঘর' একটি আধ্যাত্মিক সংগ্রামের রূপকাত্মক নাটিকা, আর 'অচলায়তন' সামাজিক তথা ধর্মীয় অন্ধতার উপর কশাঘাতপূর্ণ অত্যন্ত প্রকট বা স্পষ্ট কথায় পূর্ণ নাটক। 'রাজা' ও 'ডাকঘর' নাটক দুটোর জাত নেই অর্থাৎ বিশেষ কোনও দেশের কালের সংস্কৃতি বা বিশ্বাসের দ্বারা এরা আচ্ছন্ন নয়। তাই য়ুরোপে কবির এই দুটি নাটকই লোকে গ্রহণ করেছে। 'অচলায়তন' ভেঙে 'গুরু' লেখেন, 'ডাকঘর'ও ভেঙে নতুন করে লেখবার ইচ্ছা বোধ হয় ছিল ; কবির সুপরিচিত গান "সম্মুখে শান্তি পারাবার" এই নাটকের জন্যই লেখেন।

রূপকাত্মক নাটিকার শেষ রচনা 'ফাল্গুনী' (১৯১৬)। শান্তিনিকেতনে এর প্রথম অভিনয় হয়। কলকাতায় অভিনয়ের সময়ে 'সূচনা' নামে একটা উপ-নাটক জুড়ে দেন। কবি তাঁর নিজের রচনার মল্লিনাথ হয়ে তাঁর

বক্তব্যের ব্যাখ্যান করলেন। এখন থেকে কবি তাঁর গানেরও ব্যাখ্যাতা হতে চললেন।

'ফাল্গুনী'র পর দীর্ঘকাল কবিকে আর নতুন নাটক লিখতে দেখি না। এই পর্বে লেখেন 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬), 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬)। নাটক লিখছেন পুরাতন ভেঙে 'গুরু' (১৯১৮), 'অরূপরতন' (১৯২০), 'ঋণশোধ' (১৯২১)। আরও কিছুকাল পরে 'মুক্তধারা' বলে যে নাটক লিখলেন, সেও এক হিসাবে পুরাতনই ভেঙে—'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের সূত্র ধরে তা শুরু হয়—যদিও শেষ পর্যন্ত নতুন আদর্শবাদে তাকে পৌঁছে দিয়েছেন।

এই পুরাতনকে নিয়ে নাড়াচড়া চলে বহুকাল; পাবলিক রঙ্গমঞ্চের জন্য 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' (১৯০০) উপন্যাসকে নাটকের রূপ দিলেন 'চিরকুমার সভা'য় (১৯২৫)। অহীন্দ্র চৌধুরী সেটা মঞ্চিত করেন, কবি একদিন সেটা দেখতেও আসেন। গল্পগুচ্ছের 'শেষের রাত্রি' (১৯১৪) অবলম্বন করে লিখলেন, 'গৃহপ্রবেশ' (১৯২৫); কুন্তলীন পুরস্কারের গল্প 'কর্মফল' (১৯০৩) নিয়ে লিখলেন 'শোধবোধ' (১৯২৬), 'গোড়ায় গলদ' ও 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক ভেঙে গড়লেন 'শেষরক্ষা' (১৯২৬) ও 'পরিত্রাণ' (১৯২৯)। এইসব তথ্য থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, নতুন লেখবার মত বিষয় পাচ্ছেন না বলে পুরাতন নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন।

ইতিমধ্যে লিখেছেন 'রক্তকরবী' (১৯২৫-২৬); কিন্তু এখানেও 'মুক্তধারা'র দূর প্রতিধ্বনি শোনা যায়—'মুক্তধারার' যন্ত্রযুগের নিন্দা, 'রক্তকরবী'তে যন্ত্রদানবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে রূপান্তরিত হয়েছে। এখানে 'রাজা' অদৃশ্য শক্তি; 'রাজা'র অদৃশ্য রাজা অদৃশ্য প্রেমের অভিষেকের জন্য অপেক্ষা করেছে, কিন্তু 'রক্তকরবী'র রাজা শক্তির দেবতা—তার ধৈর্য নেই, ক্ষমা নেই অথচ এতটুক স্নেহের জন্য সে লালায়িত। এই নৈর্ব্যক্তিক, অবচ্ছিন্ন শক্তিদানবের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছেন নন্দিনীকে; অভিজিৎ যেমন ভেসে গেল যন্ত্রদানবকে আঘাত করতে গিয়ে, রঞ্জনও চূর্ণ হয়ে পড়ে গেল এই অন্ধশক্তির সঙ্গে লড়তে গিয়ে। অদ্ভুত সৃষ্টি হল এই নন্দিনী—যে শেষকালে সকলকে পথে বের করল যন্ত্রদানবকে ধ্বংস করবার জন্য—জয় হল আনন্দময়ী শক্তির।

নিজের পুরাতন রচনা কাটছাঁট করে নতুন সৃষ্টির চেষ্টা চলছে, আবার তাঁর রচনা অপরে যখন রূপ দিতে যায়, তাও পছন্দ হয় না বলে নতুন করে লিখতে শুরু করে দেন। একবার শান্তিনিকেতনে এসে দেখেন তাঁর জন্মোৎসবের জন্য মেয়েরা 'পূজারিণী' কবিতার মূক-অভিনয়ের আয়োজন করছে, তার খসড়া প্রস্তুত। তখনই লেগে গেলেন তার সংস্কারে, লিখলেন 'নটীর পূজা'। এতে কোন পুরুষ চরিত্র রইল না, কারণ মেয়েরা অভিনয়ের উদ্যোক্তা। অসহযোগ আন্দোলনের শেষদিকে হিন্দুমুসলমানের প্রেমের সাঁকোয় ফাটল ধরেছে, কলকাতায় দাঙ্গা দেখে গেছেন স্বচক্ষে। সেই অভিঘাতে 'পূজারিণী' নতুন রূপ পেল 'নটীর পূজা'য়।

ঠিক এই রকমের অভিঘাতেই 'তপতী' লিখলেন (১৯২৯)। কলকাতায় জোড়াসাঁকোয় 'রাজা ও রাণী' অভিনয়ের আয়োজন হয়; 'ভৈরবের বলি' নাম দিয়ে 'রাজা ও রাণী'র একটা খসড়াও করেন। কিন্তু দেখলেন কিছুতেই ঠিক সুরটি বাজছে না। তখন 'রাজা ও রাণী'কে ঢেলে সাজালেন—যা ছিল ব্ল্যাঙ্কভার্সের নাটক, তাকে গদ্যরূপে লিখলেন। 'পুনশ্চ' কাব্যখণ্ডে এই নিয়ে একটা লেখা আছে—

বিষয়টা হচ্ছে আমার নাটক।
বন্ধুদের ফরমাশ, ভাষা হওয়া চাই অমিত্রাক্ষর।
আমি লিখেছি গদ্যে।
পদ্য হল সমুদ্র,
সাহিত্যের আদিযুগের সৃষ্টি।
তার বৈচিত্র্য ছন্দতরঙ্গে,
কলকল্লোলে।
গদ্য এল অনেক পরে।
বাঁধা-ছন্দের বাইরে জমাল আসর।

কবি ভাল করেই জানেন যে, গৈরিশী ছন্দে বা অমিল প্রবহমান পয়ার ছন্দে নাটক লেখবার যুগের অবসান হয়ে গেছে। গদ্যে 'তপতী' সত্যিই নতুন রূপ পেয়েছে।

ক্ষুদ্রনাটক 'কালের যাত্রা' (১৯৩২) পুরাতন 'রথের রশি'র নতুন রূপ ; তবে তাও মৌলিক নয়, কারণ এর মূল আইডিয়াটা পেয়েছিলেন 'শ্রীমান্ প্রমথনাথ বিশীর কোন রচনা হইতে।' সুতরাং 'কালের যাত্রা'কে ঠিক নতুন সৃষ্টির আসন দেওয়া যায় না।

এর পরে লেখেন 'চণ্ডালিকা' ও 'তাসের দেশ'। 'চণ্ডালিকা' (১৯৩৩) নাটক লেখবার পূর্বে এই কাহিনীটির আভাস দেন "জলপাত্র" কবিতায়—এটি 'পরিশেষের' অন্তর্গত গদ্য-কবিতা। চণ্ডালিকা বা মাতঙ্গীর বৌদ্ধ আখ্যান নিয়ে নাটক লেখবার ইচ্ছা বোধ হয় পূর্বেও হয়েছিল। ১৯০৩ সনে তরুণ কবি-সাহিত্যিক শান্তিনিকেতনের শিক্ষক সতীশ রায়কে তিনি এক পত্রে 'চণ্ডালী' গল্পটাকে কেন্দ্র করে নাটক লেখবার জন্য বলেছিলেন। এতকাল পরে কবি সেটি নিজেই করলেন। 'চণ্ডালিকা'র উপাখ্যানের মধ্যে একটা ভাল নাটকের উপাদান ছিল, কিন্তু কবি নতুন টেক্‌নিকে তাকে রূপদান করলেন।

কিছুকাল পরে 'চণ্ডালিকা'কে যখন নৃত্যনাট্যে রূপায়িত করলেন তখন গদ্যসংলাপগুলিকে গানের ছন্দে ফেললেন। 'রাজর্ষি' ও 'বিসর্জনে'র রূপ পরিবর্তন হয়েছিল গদ্য থেকে ছন্দে ; এবার হল গদ্য থেকে গানে।

'তাসের দেশ' নাটকের মূল 'সাধনা'র যুগের গল্প, "একটি আষাঢ়ে গল্প" (১৮৯২)। চল্লিশ বৎসর পরে সেই ছোট গল্পটিকে কেন্দ্র করে 'তাসের দেশে'র জন্ম হল। এ-নাটকটির অভিনয় যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা স্বীকার করবেনই যে এ রচনা সার্থক হয়েছে। পাঁচ বৎসর পরে 'মুক্তির উপায়' (১৯৩৮) নাটক লেখা এও 'সাধনা'যুগের ছোটগল্প আশ্রয় করেই রচিত।

'তাসের দেশ' ও 'মুক্তির উপায়ে'র মাঝে লেখেন 'বাঁশরী' (১৯৩৩)—কবির শেষ মৌলিক নাটক, অর্থাৎ এ কাহিনীর পিছনে কোন পুরনো রচনা নেই। কিন্তু 'বাঁশরী' নাটকরূপে না লিখে যে ভাবে 'দুইবোন', 'মালঞ্চ' লিখেছিলেন সেইভাবেই লিখলে বোধ হয় ভাল হত ; তত্ত্ব হিসাবে এর মধ্যে অনেক কথা আছে, গল্প হিসাবেও হয়তো সার্থক হতে পারত, কিন্তু নাটক হিসাবে নয়।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর নাটক-বিভাগে যে বইগুলি ধরা হয়েছে, তার মধ্যে আছে 'বসন্ত' (১৯২৩), 'শেষবর্ষণ' (১৯২৬), 'নটরাজ' (১৯২৭), 'নবীন' (১৯৩১), 'শ্রাবণগাথা' (১৯৩৪) প্রভৃতি। এগুলিকে ঠিক নাটক বলা যায় না। ঋতুসংগীত বা বিচিত্র সংগীতের সঙ্গে সংলাপ যোজনা করে সুখশ্রাব্য করাই উদ্দেশ্য, কিন্তু মূল অভিপ্রায় কবির জীবনদর্শনের ব্যাখ্যান।

সংগীত ও ব্যাখ্যাপ্রধান এই রচনাগুলির মধ্যে নাটকীয় রূপ ফোটে নি ; তার প্রথম নাটকীয় আভাস পাওয়া গেল 'শাপমোচনে' ; এটাও পুরনোকে ভেঙে নতুন করে গড়া। যে বৌদ্ধ আখ্যান অবলম্বন করে 'রাজা' নাটক রচিত, তারই আভাসে 'শাপমোচন' কথিকাটি রচিত হল (১৯৩১)। কাহিনীর অভাবে 'বসন্ত'-প্রমুখ রচনাগুলি নাটকীয় হয় নি, 'শাপমোচনে' সেই অভাবটা দূর হয়েছিল।

সংগীত অর্থাৎ গান ও নৃত্যের সঙ্গে শুধু সংলাপ নয়, কাহিনীর সংযোগে গড়ে উঠল নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' (১৯৩৬), নৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকা' (১৯৩৮) ও 'শ্যামা' (১৯৩৯)। 'শ্যামা', 'কথা ও কাহিনী'র "পরিশোধ" কবিতার রূপান্তর। 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'শ্যামা'র নৃত্যনাট্যরূপ বিপুল সমাদর লাভ করেছে।

কবির নাটক নাটিকা প্রহসন নৃত্যনাট্যগুলি কিভাবে ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয়েছে, তার একটা মোটামুটি ছক আমরা এখানে দিলাম, এ নিয়ে গবেষণার বিস্তারিত ক্ষেত্র পড়ে আছে। আশা করি কোন উৎসাহী পাঠক এ সব নাটকের উৎস গতি ও শেষরূপ নিয়ে কাজ করবেন।

সবুজকবি রবীন্দ্রনাথ

অসিতকুমার হালদার

যৌবনই জীবনের নববসন্তের কিশলয়-উদ্গমের কাল। মহাকবিরা সেইপ্রকার মধুকালের নবীন সৃষ্টি-অঙ্কুর সারাজীবনব্যাপী রক্ষা করে চলেন। কবির যৌবন এক্ষেত্রে স্থির—শম্ভুরই মতন। কিন্তু এই চিরযৌবনের যজ্ঞে পূজারীর অভাব খুবই বেশী। সাধারণ মানুষ দিনগত-পাপক্ষয় করে দৈনিক ভারবাহী জীবন নিয়ে দেখতে দেখতে যৌবনেই অকালপক্ক হয় এবং বার্ধক্যের দ্বারে অতিশীঘ্রই পৌঁছয়। কবিরা এ বিষয়ে অসাধারণ।

যৌবনই প্রগতি—সময় কাল ও কৃষ্টির সঙ্গে পা ফেলে এগিয়ে চলে ; কিন্তু যে বুড়ো হয়ে যায় তার পক্ষে নতুনকে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। সংস্কারের বেড়ি তাকে এগোতে দেয় না। সে যা জেনে বসে আছে ঠিক বলে, তার আর ব্যতিক্রম হবার জো নেই। অশান্তি আনে তাদের মনে ; অপরকেও সুখী করতে পারে না। অন্যদিকে, কালিদাস সেক্সপিয়ার গ্যেটে রবীন্দ্রনাথ শারীরিক অনিবার্য-পরিণতি ক্ষেত্রে অন্য সকলের মত শৈশব-যৌবন-বার্ধক্যের তিনটি দ্বার দেখে থাকলেও তাঁদের মানস-শরীর তেজদীপ্ত কষায়কোকিলনাদিত—দ্বিরেফ-গুঞ্জন মুখরিত বসন্তের উত্তপ্ত যৌবনকে ধারণ করে রাখতে পেরেছে তাঁদের রম্যরচনাবলীর মধ্যে। এই উজ্জ্বল মানস-যৌবনই সৃষ্টির গুণ। তাই কবিদের কাজ বাধাবিহীন, প্রগতিশীল। সময়-কাল-পরিস্থিতি উত্তীর্ণ হয়ে যায় তাঁদের সৃষ্টিধারা ; চিরসম্পদ বলে গণ্য হয়েছে সকল দেশে সকল কালে—ভৌগোলিক সীমাবদ্ধ নেই।

হিন্দীতে একটা কথা আছে, "চন্দিন্‌কা দুনিয়া এক-দিনকা যৌবন।" যৌন-যৌবন ক্ষণিক ; কবির সৃষ্টি-যৌবন অটল। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ 'সবুজপত্রে' আহ্বান করেছিলেন "ওরে সবুজ ওরে আমার কাঁচা—ঘা দিয়ে তুই আধ্‌মরাদের বাঁচা।" সৃষ্টি-যৌবনহীন আধ্‌মরাদের প্রতি কবির শাশ্বত উক্তি। মানুষের বার্ধক্য তার দৈনিক জীবিকানির্বাহকর্মে নিয়তই প্রকাশ পায়। যে যৌবনে দৃপ্তভাবে চলে, বলে, কাজ করে, ক্রমশঃ বার্ধক্যে সে যায় শিথিল-মন্থর হয়ে। কিন্তু কবি যদি শতায়ু পান তবুও আমরণ যৌবনদৃপ্ত মানস-শক্তির পরিচয় দিয়ে যান।

বয়স হলে সাধারণ কর্মজীবনে অবসর নিয়ে বাকি জীবন কাটানো হয় ভার। একমাত্র শীতের অনুদার জড়তার দুর্ভাগ্যের সঙ্গেই তার তুলনা হয়। কবির বিরাট প্রতিভার এই একটি মাত্র দিকের প্রতি লক্ষ্য করলে আমরা বুঝতে পারি আজও কি তাঁকে আমরা সত্যি করে বুঝতে পেরেছি ? তাঁর জন্মকাল থেকে অশীতিবৎসর কাল কেটে গিয়েছিল ; আমরা তাঁর সেই বার্ধক্যনত দেহকেই শেষে দেখেছি, কিন্তু বুঝি নি যে তিনি শাশ্বত যৌবনের অধিকারী সৃষ্টিযজ্ঞের একজন পুরোহিত—ক্ষণজন্মা নরচন্দ্র।

আজকাল দেখি 'সবুজপত্রে' মহাকবি যে সবুজকে আহ্বান করেছিলেন তার নিরর্থক সংস্করণ নানাস্থানে গজিয়ে উঠেছে। কবির সৃষ্টি-যৌবনকে যুবক-সমাজ একচেটিয়া বস্তু মনে করবেন এবং 'সবুজ-দল' 'সবুজ সমাজ' প্রভৃতি সব্ ক্রিয়াবগুলিকে তাস-পাশা খেলা এবং কপটচারী অহংকারের পীঠস্থানে পরিণত করা হচ্ছে। আজ মহাকবির শতবার্ষিকীতে এই একটি কথাই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে তাঁর কাঁচানবীন হৃদয়ের পরিচয় আগে তাঁর সৃষ্টির ভিতর থেকে তাঁরা গ্রহণ করুন এবং সেই সঙ্গে নিরহংকারী হয়ে অপর সবাইকে পথ ছেড়ে দিতে শ্রদ্ধা করতে শিখুন।

আশার আশোয়ারী বাজে
তরুণ-সজ্ঘ দলে—
ভাব্‌টা,—কিছু করবে খাড়া
এবার সদল-বলে!
দল গড়া আর দলাদলির
আমরা যারা রাজা

বাঙালীদের ধ্বজা এরা
বাজা ডঙ্কা বাজা !
কবি বলেন, ওরে তরুণ
'করুণ' হবি যবে
মানুষটারে মানুষ ব'লে
চিন্‌বি তোরা তবে।
তোদের কবি রবীন্দ্রনাথ
নাম দিয়েছেন 'কাঁচা',
পথের মোড়ে ভিড় না ক'রে
পথ-চলাদের বাঁচা !
তোরা খুঁজে বেড়াস যত
রজত-পটের তারা
আলোচনায় মত্ত তাদের
হোস্ যে আত্মহারা ;
রিক্‌শাওলা, মোটর-চালক
পথ পায় না যেতে
তোদের ভয়ে, দাঁড়াস রুখে
নেয় তা মাথা পেতে।
ভাবিস না যে হতে পারে
ওদের যেতে ত্বরা
বদ্যি ওষুধ মরণ-বাঁচন
মাথায় ভাবনা ভরা !
কুকুর সে পথ আগলে থাকে
কেড়ে খাবার তরে
দেখিস, যেন গরীব এরা
পালায় নাক ডরে।
তোরা সবুজ বুদ্ধি কাঁচা
ভাবতে পারিস না যে
এমনি করে করিস ক্ষতি
দিস্ যে বাধা কাজে।
সবুজ তোরা এগিয়ে যাবি
কাঁচা রক্ততেজে
চিত্ত তোদের উঠবে যবে
সবার দুঃখে বেজে।
রবীন্দ্রনাথ ধন্য হবেন
নাম দিয়ে তোর সবুজ
সেই কথাটা ভুলিস নারে
হোস নে ওরে অবুঝ।
'সিভিক্স' পড়ে কলেজেতে
শিখলি যা তুই যত
কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা
বিদ্যাবুদ্ধি গত।
তরুণ যে তুই অরুণ আলো
জ্বালিয়ে দেখা সবে ;
মীটিং করে সঙ্ঘ গড়ে
ফিরিস কলরবে।
নবীন হলেই হয় না নবীন
নূতনতর কাজে
লাগ না তোরা গড় না জীবন
ঘুরে ফিরিস বাজে।
প্রাচীনেরে না-মানাটা
নবীন হল বুঝি ?
অভিজ্ঞতার রুদ্ধ দুয়ার
থাকলি চক্ষু বুজি।
প্রাচীন যখন তরুণ ছিল
ভুল করেছে কত
না জেনে তার কথা আবার
আনবি বিপদ শত।
মান্ যদি কেউ দেয় কাহারে
মান্ সে পেতে পারে,
অপমানে নইলে যে পায়
আঘাত বারে বারে।
সবুজ তোরা কেবল বলি
পথ ছাড়তে শিখে
সবুজ নামের তরুণ কথা
রাখ্ তোরা সব লিখে।

রবীন্দ্র-স্মৃতিকথা

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

মানুষ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে সব বিশেষ বিশেষ ঘটনা বা বিষয় আজও স্মৃতিরূপে মনের মধ্যে গেঁথে আছে, আজকের এই স্মৃতিকথায় তাদের কয়েকটির উল্লেখ করছি। বিষয়গুলির মধ্যে ধারাবাহিকতা নেই, আছে খণ্ড খণ্ড রূপ। কেন না, সন সাল তারিখ দিয়ে বিষয়গুলি নোট করে রাখি নি, কারণ তখন নোট করে রাখবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করি নি। এখন বুঝতে পারছি নোট করে রাখলে ভালই হত। ব্যাপারটা হয়েছে "চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে" কথার মত। কিন্তু যা করা উচিত ছিল অথচ করা হয় নি সে কথা বলে আক্ষেপ করলে আক্ষেপ করাই সার হবে, লাভ কিছু হবে না। তবু সন সাল মাস এবং তারিখের ভিত্তিতে ইতিহাসময় স্মৃতিকথা না লিখতে পারলেও স্মৃতি-দর্পণে যে সব বিষয় ফুটে ওঠে তাদের একটা মূল্য যে আছে সেটা বুঝতে পেরেছি ইতিপূর্বে 'দেশ,' 'প্রবাসী', 'যুগান্তর' ও 'শনিবারের চিঠি'তে যে সব ছোট ছোট স্মৃতিকথা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখেছি সেগুলি পাঠ করে যাঁরা আনন্দ পেয়েছেন তাঁদের কাছ থেকে পত্র পেয়ে। সেই ভরসাতেই আজকের এই স্মৃতিকথা লিখছি।

শান্তিনিকেতন আশ্রমে একসময় ছিলেন দুজন দিকপাল। আশ্রমের দক্ষিণাংশে "নীচু বাঙলা"য় থাকতেন তত্ত্বজ্ঞানী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আর উত্তর দিকে "নতুন বাড়ী"তে থাকতেন পুত্র-কন্যাদিসহ রবীন্দ্রনাথ। সে আজ অনেকদিনের কথা। তখন আমি আশ্রমের ছাত্র। রবীন্দ্রনাথকে তো আমরা আমাদের গুরুদেব জেনে ভয় ভক্তি যথেষ্টই করতুম, আর ভাবতুম এখানে উনিই সর্বেসর্বা, ওঁর কাছে সকলেই নত, ওঁর ভয়ে সকলেই নম্র। কাজেই যখন তাঁর "বড়দা" দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর কাছে যেতেন বা তিনি "বড়দা"র কাছে যেতেন তখন তাঁদের দুজনের এক জায়গায় একত্রিত হবার দৃশ্য দেখে আমাদের ধারণা অদ্ভুত একটা আনন্দে পালটে যেত। রবীন্দ্রনাথের কাঁচা-পাকা দাড়ি আর দ্বিজেন্দ্রনাথের মাথার চুল আর দাড়ি একদম পাকা। আমাদের চোখে দুজনেই বুড়ো। কিন্তু কী দেখতাম আনন্দে অবাক হয়ে? দ্বিজেন্দ্রনাথ বসে আছেন তাঁর চেয়ারে (সেকেলে ধরনে চশমার দুই ডাঁটিতে তুলো জড়ানো) চশমা পরে আর পাশেই মোড়ায় বসেছেন রবীন্দ্রনাথ বড় ভাইয়ের কাছে শ্রদ্ধাভরে নম্রভাবে। আলোচনা প্রসঙ্গে হয়তো বড়দা উত্তেজিত হয়ে জোর গলায় কতকটা বকুনির ধরনে রবীন্দ্রনাথের মতের বিরুদ্ধেই নিজের মত প্রকাশ করছেন। সেই সময় দেখতাম রবীন্দ্রনাথ শান্তভাবে চুপ করে শুনেই যেতেন বড়দার কথা। বড়দার কথার তোড় প্রশমিত হলে রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করতেন নম্রভাবে নিজের বক্তব্য বলবার, তাও যেন ভয়ে ভয়ে। একবারের ঘটনা বেশ মনে আছে। সেদিন রবীন্দ্রনাথকে বড়দার বকুনি নিঃশব্দে হজম করতে হয়েছিল। বড়দার কথার বিরুদ্ধে একটি কথাও ভাল করে বড়দাকে বুঝিয়ে বলবার ফাঁক পান নি। মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ মহাত্মাজীর সঙ্গে একমত হতে পারেন নি শুধু নয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিবাদ লিখেও প্রকাশ করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের সে প্রতিবাদ মোটেই মনঃপূত হয় নি। দ্বিজেন্দ্রনাথ গান্ধীর মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতির মূর্তিমান রূপ। মহাত্মাজীও যখনই শান্তিনিকেতনে দ্বিজেন্দ্র-দর্শনে যেতেন—গিয়ে বসতেন দ্বিজেন্দ্রের পায়ের কাছে ভক্তিভরে নম্র হয়ে—শুনেই যেতেন দ্বিজেন্দ্রনাথের কথা, মাঝে মাঝে বলতেন নিজের কথা। সেদিন দ্বিজেন্দ্র-নাথ তাঁর চেয়ারে বসে কপালে চশমাজোড়া তুলে বলতে লাগলেন, "রবি, তুমি গান্ধীকে ভুল বুঝেছ। উনি যা বলছেন, যা করছেন সব ঠিক। আমার আর দুঃখ নেই, আমি যেন হারিয়ে যাওয়া ভারতবর্ষকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। গান্ধী খাঁটি ভারতীয়। আমার বয়স যদি কুড়ি বছর আরও কম হত, আমি তোমার প্রতিবাদের উত্তর দিতাম। যা বোঝ না, তা নিয়ে এমন করে মত

প্রকাশ কর কেন।"* আরও কত বকুনি। রবীন্দ্রনাথ চুপ, একেবারে সুবোধ বেচারা বালকটির মতন, সব শুনে গেলেন, টুঁ শব্দটি করলেন না। আমি তখন কাছেই ছিলাম। খুব আনন্দ হচ্ছিল এই দেখে যে আমাদের হর্তাকর্তা গুরুদেব হলে কি হবে, ওঁর উপরেও কর্তা আছেন। ওঁকেও বকুনি দেবার লোক আছে এবং উনিও এই শান্তিনিকেতনেই একজনের কাছে জব্দ থাকেন। আমার সৌভাগ্যবশতঃ এই দুজনেরই আমি স্নেহের পাত্র ছিলাম। আমার সব রকমের ধৃষ্টতা এবং আবদার দুজনেই সহ্য করতেন। "নীচু বাঙলা" থেকে ফেরবার পর রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কেন তিনি বড়দার কাছে নিজের বক্তব্য বিষয়টা ভাল করে বললেন না। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, বড়দাকে এখনও চিনিস নি, রোজ তো যাস ওখানে—মাঝে মাঝে সঙ্গে খাবারও খাস। আমি ওঁর কথার উপর কথা বললে আরও উত্তেজিত হয়ে উঠতেন। আমি হেসে বললাম, আমাদের কিন্তু মজা লাগছিল, আপনি আমাদের বকেন, আপনাকেও বকবার লোক আছে এই দেখে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন, অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে এবং বিপক্ষে শান্তিনিকেতন আশ্রমবাসীদের মধ্যে দ্বিমত ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশ্রম-বিদ্যালয়ে কোন রকমের পলিটিক্স সক্রিয় উঠুক এটা পছন্দ করতেন না। কিন্তু দেখা গেল শুধু ছাত্রদের মধ্যে নয়, কয়েকজন শিক্ষকের মধ্যেই ওই অসহযোগ পলিটিক্সের চিন্তা সক্রিয় হয়ে উঠেছে অথচ তখন আশ্রম-বিদ্যালয় সরকারী ভাণ্ডার থেকে কানাকড়িও সাহায্য পেত না কিংবা নিত না। নিত না বলাই ঠিক, কারণ রবীন্দ্রনাথ আর্থিক দারুণ দুর্দিনেও সরকারী সাহায্য কোন দিনও প্রার্থনা করেন নি। প্রার্থনা করলে যে সাহায্য না পেতেন তা নয়। কাজেই তাঁর আশ্রম-বিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষকদের মনে শিক্ষাগ্রহণ এবং শিক্ষাদানের ব্রতে শৈথিল্য এসে পড়েছে পলিটিক্সের হাওয়ায় জেনে তিনি ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পলিটিক্সকে যে দুচক্ষে দেখতে পারতেন না এ কথা সত্য নয়। কিন্তু আশ্রম-বিদ্যালয়ে তার অনুপ্রবেশ হোক একেবারেই পছন্দ করতেন না। সেইজন্য দেখেছি, ফ্রন্টিয়ার গান্ধী শ্রদ্ধেয় খান আব্দুল গফুর খাঁ, সুভাষচন্দ্র বসু, জহরলাল নেহরু এবং সরোজিনী নাইডুর মত ব্যক্তিরা এখানে এসে ছাত্রছাত্রীদের, শিক্ষকদের সভায় ভাষণ দিয়েও এমন কোন কথা বলতেন না, যার মধ্যে পলিটিক্স থাকে। রবীন্দ্রনাথের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার জন্য এবং আশ্রম-বিদ্যালয়ের মর্মগত আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধার জন্যই তাঁরা তাঁদের বক্তৃতায় পলিটিক্সের কোন ছোঁয়াচ লাগাতেন না।

ছোট ভাই বড়ভাইয়ের আর একদিনের ঘটনা। একদিন আশ্রমের তৎকালের "নাট্য গৃহে"* ছাত্র-শিক্ষকদের সভায় আশ্রমের সকলের দৈনন্দিন আচরণ কি রকমের হওয়া উচিত আলোচনায় রত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ একটি আসনে বসেছিলেন নাট্যগৃহের মধ্যে পশ্চিমদিকের মঞ্চে। মঞ্চ মানে মেঝে থেকে ফুটখানেক উঁচু জায়গায়—যে জায়গায় তখন মাঝে মাঝে নাট্যাভিনয় হত। ঘরের পূর্ব দিকেও ওই ধরনের নাতিবৃহৎ মঞ্চ ছিল। ঘরভর্তি লোক। সকলেই রবীন্দ্রনাথের দিকে মুখ করে তাঁর কথা শুনছি, এমন সময় দেখা গেল রবীন্দ্রনাথ শশব্যস্ত হয়ে আসন থেকে নেমে মঞ্চেই সিমেণ্টের ফ্লোরে বসলেন এবং কথা বন্ধ করে সামনের দিকে কাকে যেন তাকিয়ে দেখছেন। আমরাও পেছন ফিরে দেখলাম ব্যাপার কি! কোন্ ফাঁকে পুবদিকের দরজা দিয়ে ঢুকে পুবদিকের মঞ্চের একধারে বসে আছেন নাট্যগৃহে দ্বিজেন্দ্রনাথ। তাঁকে দেখামাত্র সকলেই ব্যস্ত হয়ে অনুরোধ করলেন সকলের সামনে এসে বসতে। তিনি সকলের ব্যস্তভাব দেখে আর বসলেন না। চলে গেলেন "নীচু বাঙলা"র দিকে তাঁর রিকৃশয়। মানুষ দিয়ে টানা রিকৃশয়। তখন এ রাজ্যে

* দ্বিজেন্দ্রনাথের কথাগুলো নিশ্চয়ই হুবহু নয়। যতটা পেরেছি মনে করে লিখেছি। তাঁর কথা বা রবীন্দ্রনাথের সব কথা তো টেপ রেকর্ড করে রাখি নি। তবে বক্তব্য বিষয়ে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি নেই।

* এখন আর সে নাট্যগৃহ নেই। আছে তার জরাজীর্ণ চাতাল। পুরনো আমলের ছাত্র-শিক্ষকদের মনে আশ্রমের সেকালের অনেক কথা যেন স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য।

ওই একটি রিক্‌শা ব্যতীত আর কোন রকমেরই রিক্‌শা ছিল না। তিনি এসেছিলেন কি একটা কাজে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে। তখন রবীন্দ্রনাথ কিছুদিনের জন্য আশ্রম-মন্দিরের দক্ষিণ দিকের দ্বিতল "শান্তিনিকেতন-বাটিকা"র দোতলায়। যাবার সময় দ্বিজেন্দ্রনাথ জগদানন্দবাবুকে বলে গেলেন যে তিনি রবির সঙ্গে কিছু কাজের কথা বলতে এসেছিলেন। যাক এখন তো রবি ব্যস্ত, পরে দেখা করব। বলা বাহুল্য, সভার আলোচনা আর বেশীক্ষণ হল না। সভাশেষে রবীন্দ্রনাথ সোজা চললেন বড়দার কাছে। তখন আমরা কিন্তু "বড়বাবু"কে (আশ্রমবাসী আমরা সকলেই রবীন্দ্রনাথের "বড়দা"কে "বড়বাবু" বলেই সম্বোধন করতাম, শিক্ষক-ছাত্র, চাকরবাকর সকলেই) অনেকটা চিনে ফেলেছি। তিনি যখন কোন বিষয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠতেন তখন সেই ব্যস্ততার তাল সামলানো কঠিন হত আশেপাশে যাঁরা থাকতেন তাঁদের পক্ষে। তিনি ছিলেন স্বভাবে যাকে বলে একেবারে 'শিশু ভোলানাথ'। সামান্য রাগ হলেই দপ করে জ্বলে উঠতেন, আবার কিছুক্ষণ পরেই পট করে নিভে যেত সেই রাগ। যখন বুঝতে পারতেন সামান্য বাজে কারণে অত দাপাদাপি করাটা ঠিক হয় নি, তার প্রতিক্রিয়া হত জবর অট্টহাসিতে গোঁফে চাড়া দিয়ে দাড়ি নেড়ে। সে এক মজার দৃশ্য হত। প্রায়ই এরকম হত। কাজেই রবীন্দ্রনাথ প্রাণের দায়ে চললেন "নীচু বাঙলা"র দিকে, পাছে দ্বিজেন্দ্রনাথ আবার এসে না হাজির হন তাঁর কাছে, অথবা দ্বিজেন্দ্রনাথ ফিরে গিয়েই চাকর-মারফত নিজের বক্তব্যবিষয়কে চিরকুটে পদ্যে কিংবা গদ্যে লিখে না পাঠিয়ে দেন। সবকিছু তড়িঘড়ি হওয়া চাই দ্বিজেন্দ্রনাথের—নইলে ফ্যাসাদ। তাঁদের অন্য আর সব ভাইদের মেজাজ কি রকম ছিল জানি না। তবে তড়িঘড়ি সব হয়ে যাক এই রোগ রবীন্দ্রনাথেরও বড় কম ছিল না। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল তাঁর "শ্যামলী" মাটির বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ যখন থাকতেন তখনকার একদিনের কথা। সজনীকান্ত দাস আসবেন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথেরই আমন্ত্রণে। আমি তখন রবীন্দ্রনাথের কাছেই থাকি—প্রায় সর্বক্ষণ বললেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, সজনীদের থাকবার ব্যবস্থা কোথায় হয়েছে ? সহজ প্রশ্নের সহজ জবাব দিলাম, গেস্টহাউসের উপরের এক নম্বর ঘরে (তখন গেস্টহাউস ছিল আশ্রম-মন্দিরের কাছের দোতলা বড় বাড়িটা), ঘরটা বেশ বড়, সুনীতিবাবু (ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়) সঙ্গে এলেও তাঁদের আরামে থাকবার ব্যবস্থা সেখানে ভালই আছে। আমার কথা তাঁর ভাল লাগল না। মতলবটা সজনীবাবুকে তাঁর সাধের "শ্যামলী"র একটা ঘরে এনে রাখা এবং প্রয়োজনমতে যখন ইচ্ছে কাছে বসিয়ে গল্প-টল্প করা। বললেন, এক নম্বর ঘরে অনেকদিন অনেকবার থেকেছি। তার বর্ণনা আমার কাছে নাই বা করলি। সজনীকে রাখব এই "শ্যামলী"তে। সেই ব্যবস্থা যাতে হয় গাঙ্গুলীকে (শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র গাঙ্গুলী) বলে দে। তখন যতদূর মনে পড়ছে, সস্ত্রীক সুনীতিবাবুরও আসবার সম্ভাবনা ছিল। আর "শ্যামলী" আগাগোড়া ছাদসমেত প্রায় সবই মাটি দিয়ে তৈরি, বর্ষায় তার অনেকাংশ জখম, মেরামতি কাজ চলছে। গাঙ্গুলীমশায় কর্মাধ্যক্ষ, সুব্যবস্থা করে কাজ করা তাঁর মজ্জাগত স্বভাব। কোন কাজের বিষয় কেউ খামখেয়ালী করলে তাঁর মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠত। এমনিতে মানুষটি কিন্তু বেশ মেজাজ-সরিফ মাইডিয়ার ছিলেন। "শ্যামলী"তে সজনীবাবুদের রাখবার প্রস্তাব শুনে তিনি তো তেলেবেগুনে চটে উঠলেন। আত্মীয়তার সূত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথকে সম্বোধন করতেন "রবিদা"। আমার কাছে ওই প্রস্তাবের কথা শুনে তো একচোট আমাকেই বকলেন, তারপর সোজা রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে বললেন, দেখ রবিদা, ভগবান করুন তুমি দীর্ঘায়ু হও, তোমার কোন অমঙ্গল না হোক। মাটির বাড়ি—বর্ষায় এদিক ভেঙেছে, ওদিক ভেঙেছে। ধর যদি কিছু দুর্দৈব ঘটেই তো একাই স্বর্গে যাও না কেন, সঙ্গে সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে যাবার মতলব কেন ? "পুনশ্চ"তে থাকবার ব্যবস্থা করে দেব, "শ্যামলী"তে হবে না। রবীন্দ্রনাথ কি আর করেন, তাতেই রাজী হলেন, কারণ গাঙ্গুলীমশায়ের সঙ্গে এঁটে ওঠা দায়, তবে সত্যিই তখন "শ্যামলী"র সব কামরা বাসযোগ্য ছিল না আর "পুনশ্চ"ও, তো "শ্যামলী"র একেবারে গা-লাগা। তারপর ব্যস্ত রবীন্দ্রনাথ বারবার খোঁজ নিতে লাগলেন, থাকার ব্যবস্থা কেমন হচ্ছে, আহারাদির ব্যবস্থা কেমন হচ্ছে ইত্যাদি। থেকে থেকে খোঁজ নেওয়ার পাল্লা চলল। "ছোটবাবু" "বড়বাবু"র ভাই-ই বটে। রবীন্দ্রনাথকে আশ্রমে চার রকমে সম্বোধন করা হত, জমিদারী থেকে আগত শিক্ষকগণ যেমন ৺হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺জগদানন্দ রায়, ৺হরেন্দ্র কবিরঞ্জন, ৺পুণ্য বাগচী মহাশয়ের সম্বোধন করতেন তাঁকে "বাবুমশায়" বলে। পারিবারিক মহলে চাকরবাকর এবং দু-একজন স্টেট-কর্মচারীরা বলতেন "ছোটবাবু", ছেলেমেয়েরা আর পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী এঁরা বলতেন "বাবামশায়"। চাকর-বাকরদের মধ্যে যারা সব সময় তাঁর কাজে থাকত তারাও বলত "বাবামশায়"। আশ্রমের অধিকাংশ বাদবাকি সকলেই বলতাম "গুরুদেব"—কতকটা একাংশ চারি অংশে

নারায়ণের প্রকাশের মত। যাঁরা একটু ভাল করে মানুষ রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন, উপযুক্ত চারিটি ভিন্ন ভিন্ন নামের মধ্যে কিন্তু ওই সব নামানুযায়ী রবীন্দ্রনাথের ভিন্ন ভিন্ন সত্তাও সচেতন ছিল।

ছাত্রদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর স্নেহ ছিল। মনে পড়ে একবার এখানে ছাত্রদের সাহিত্য-সভায় সভাপতি হয়েছিলেন বনফুল। বনফুল উচিত কথা বলায় সহজে সঙ্কোচ অনুভব করেন না, তাই রবীন্দ্রনাথের ভয় হল পাছে ছাত্রদের হালকা রকমের কোন সাহিত্যোক্তিকে কেন্দ্র করে বনফুল ছাত্রদের কিছু উপদেশ-মূলক কড়া কথা না বলে বসেন। আমাকে বলে পাঠালেন যাতে বনফুল তেমন কিছু না বলেন, সেই কথা বনফুলকে বলে দিতে।

সাহিত্যিক যাঁরা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধেও আলোচনা করতেন তাঁদের মধ্যে যাঁদের সত্যিকার সাহিত্য-প্রতিভা আছে, তাঁদের কাছ থেকে নিজের সম্বন্ধে নিন্দাবাক্য শুনেও তিনি তাঁদের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। মনে পড়ে সেদিনকার কথা, যখন রবীন্দ্রনাথের জীবন-প্রদীপ নিবে যাবার আর মাত্র দু-তিন দিন বাকি আছে, অবস্থা তখন তাঁর অর্ধ-অচৈতন্যপ্রায়, একটু জ্ঞান হচ্ছে আবার একটু পরে অচৈতন্য হয়ে পড়ছেন। সেই সময় সকালের দিকে সজনীবাবু আমাকে ফোনে জিজ্ঞাসা করলেন, কবি কেমন আছেন। জানালাম অবস্থা ক্রমাগতই খারাপের দিকে চলেছে, যদি শেষ দেখা দেখতে চান—আসুন, কোন্ মুহূর্তে কি ঘটে বলা শক্ত। সজনীবাবু অনতিবিলম্বে চলে এলেন। শায়িত কবিকে প্রণাম করলেন যথোচিত গম্ভীর ভাবে। হঠাৎ তখন কিছুক্ষণের জন্য রবীন্দ্রনাথের চৈতন্য ফিরেছিল। তিনি সজনীবাবুর দিকে তাকিয়ে জড়ানো স্বরে ক্ষীণকণ্ঠে শুধু বললেন, "আমি তো চললাম। বঙ্গসাহিত্যের মান-মর্যাদা তোমাদের হাতে। তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখ, এই আমার অনুরোধ।" সজনীবাবুর চোখ ছলছল করে উঠল, উত্তর দিলেন জড়িত কণ্ঠে—কি বলেছিলেন মনে নেই।

মৃত্যুর কয়েক বছর আগে থেকেই সজনীকান্ত দাস, বুদ্ধদেব বসু, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, মোহিতলাল মজুমদার এইসব প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের প্রতি তাঁর স্নেহমিশ্রিত শ্রদ্ধা বেড়ে গিয়েছিল। প্রায়ই এঁদের সম্বন্ধে প্রশংসাসূচক মন্তব্য প্রকাশ করতেন। বেশ মনে পড়ে, সজনীবাবু যখন 'অলকা'র সম্পাদক—সেই সময় 'অলকা' রবীন্দ্রনাথের কাছে দিতাম। রবীন্দ্রনাথ তখন 'মুক্তির উপায়' নাটক লিখেছেন, অভিনয়ের রিহার্সাল চলছে 'উত্তরায়ণে'। তখনও নাটকটি পাণ্ডুলিপি আকারেই আছে, কোথাও ছাপা হয় নি। সজনীবাবু রবীন্দ্রনাথের কাছে অনুরোধ জানালেন ওটা 'অলকা'য় দিতে হবে। 'অলকা'র তেমন পসার তখনও হয় নি, পাঠকসংখ্যাও 'প্রবাসী' ইত্যাদি পত্রিকার তুলনায় যথেষ্ট কম। তবু রবীন্দ্রনাথ 'অলকা'য় ওটি দেবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন—যেহেতু সজনীবাবু চেয়েছেন। আমি কিন্তু ওটা এমন কাগজে দেবার পক্ষপাতী ছিলাম, যার পাঠক এবং গ্রাহকসংখ্যা অনেক বেশী। রবীন্দ্রনাথ আমার যুক্তি গ্রাহ্য করলেও মনে মনে ইচ্ছে ওটা 'অলকা'তেই যাক। আমার অজ্ঞাতসারেই সজনীবাবুকে তিনি জানালেন যে ওটা 'অলকা'য় পাঠাবার তাঁর ইচ্ছে থাকলেও, সুধাকান্তের (অর্থাৎ আমার) আপত্তি আছে। হঠাৎ সজনীবাবু আমাকে পত্রাঘাত করলেন, সুধাকান্তদা তাঁর মুক্তির উপায়ে কেন বাধ সাধছেন। বাধসাধা আর হল না। শেষ পর্যন্ত ওটা 'অলকা'তেই ছাপানো হল। সৌজন্যে ক্ষমায় স্নেহে এই তিন গুণে রবীন্দ্রনাথ যে কী পর্যন্ত গুণান্বিত ছিলেন বহু ঘটনায় তার প্রমাণ পেয়েছি। বেশী প্রমাণ পেয়েছি ওইসব গুণের, আমার প্রতি তাঁর অল্প স্নেহের বহু আচরণে। সে সব কথার স্মৃতি আমার অন্তরেই শুধু যে জড়ো হয়ে আছে তা নয়, আমাকে লিখিত তাঁর বহু চিঠিতে আর চিরকুটেও। সে সব কথা আজকের এই স্মৃতিকথার আলোচ্য বিষয় করব না, কেন না তা হলে এই স্মৃতিকথার আয়তন বড় হয়ে যাবে। ভাই-ভাইয়ের মধুর সম্পর্কের আর একটা কথা বলেই আজকের কথা শেষ করি।

আমাদের ছাত্রাবস্থায় এখানে আসতেন মাঝে মাঝে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়—রবীন্দ্রনাথের মেজদা। ছোট ভাই রবির 'কথা ও কাহিনী'র কবিতাগুলি থেকে (যথা "প্রার্থনাতীত দান" "বন্দীবীর" "নকলগড়") বেছে বেছে সোৎসাহে হাত নেড়ে আবৃত্তি করে শোনাতেন, তখন আমরা তাঁর দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। ছোট ভাইয়ের কবিতার আবৃত্তি করে বড়ভাইয়ের কি আনন্দ, কি উৎসাহ। ছোটভাইয়ের প্রতি বড়ভাইয়ের সরল স্নেহময় আকর্ষণ, বড়ভাইদের প্রতি ছোটভাই রবীন্দ্রনাথের ওই বুড়ো বয়সেও কী গভীর ভক্তি শ্রদ্ধা আর তার কী সুন্দর নম্র প্রকাশ-ভঙ্গী। আজ মনে ভাবি ওঁরাও ছিলেন রবীন্দ্রনাথের আশ্রম বিদ্যালয়ের আদর্শ রক্ষার সহায়-সম্বল। দিন যতই যাচ্ছে ততই বুঝতে পারছি, তখনকার (আমাদের ছাত্রাবস্থার আশ্রম) আশ্রমের যদিও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রাণকেন্দ্র, তবুও সেই কেন্দ্রকে ঘিরে বড়ভাইদের স্নেহ মমতা করেছিল আদর্শকে যেন প্রস্ফুটিত পদ্মের মত। এ কথা তখন বোঝবার মত বয়স ছিল না।

অ-কবি রবীন্দ্রনাথ

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

রচনার শিরোনামা দেখে অনেকেই ভাববেন অ-কবি রবীন্দ্রনাথ, সে আবার কেমন কথা! যিনি শুধু কবি নন, কবিসত্তম, কবি হিসেবে যাঁর নাম শুধু ভারতবর্ষের ইতিহাসে নয়, জগতের ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে, তিনি অ-কবি, সে আবার কেমনতর কথা? সেইজন্য প্রথমেই কথাটা একটু বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন আছে।

রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল বেঁচেছিলেন, অনেকগুলি যুগের মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনধারা প্রসারিত, বহু ঘটনা তাঁর জীবনে ছায়া ফেলেছে। তা ছাড়া আরও একটা খুব বড় কথা এই যে, রবীন্দ্র-সাহিত্যে এতবার পালাবদল হয়েছে, তিনি নিজেকে এতবার বিস্ময়কর নতুনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে জিনিস খুব কম কবির রচনাতেই দেখা যায়। এ কথা অবশ্য সত্য, গুটিকয়েক মৌলিক বিশ্বাস অবশ্য রবীন্দ্রনাথ কখনই পরিত্যাগ করেন নি, বস্তুতঃ তা করা সম্ভব নয়। যেমন মানুষের প্রতি সুগভীর বিশ্বাস হারিয়ে রবীন্দ্রনাথ যদি মনুষ্যত্বকে ব্যঙ্গ করতে শুরু করতেন তা হলে রবীন্দ্রনাথ আর রবীন্দ্রনাথ থাকতেন না, অন্য কেউ হতেন। কিন্তু সে কথা থাক। কথাটা হচ্ছে, কবি তাঁর দীর্ঘজীবনের মোড়ে মোড়ে নানা বিস্ময়কর পালাবদল ঘটিয়েছেন। 'গীতাঞ্জলি'র পর যেমন 'বলাকা'।

রবীন্দ্রকাব্যের এই পালাবদল নিয়ে সেইরকম কিছু লোক আলোচনা করে থাকেন বা করতে পারেন যাঁরা রবীন্দ্রকাব্য সামগ্রিকভাবে পাঠ করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, কজনই বা পড়েছেন? আমার এক বন্ধু প্রশ্ন করেছেন, রবীন্দ্রনাথ যদি আর দশ-বারো বছর আগে দেহত্যাগ করতেন—অর্থাৎ যখন নৃত্যনাট্যগুলি লেখা হয় নি, 'কৃষাণের মজুরের শরিক যে জন' এই লাইনটি লেখা হয় নি, 'সভ্যতার সংকট' রচিত হয় নি, তা হলে আজকে পাড়ায় পাড়ায় যাঁরা রবীন্দ্র-উৎসব করে থাকেন তাঁদের অনেকেরই কিছু উপজীব্য থাকত কি? কথাটা অপ্রিয় হলেও ভাববার কথা। রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' 'কল্পনা' প্রভৃতি বইয়ের সেইসব কবিতা—যা 'সঞ্চয়িতা'য় নেই—আজকালকার তরুণ সমাজ খুব বেশী পড়েছেন কি? অথবা রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষা'? এমন কি শিক্ষকসমাজেও কি এর খুব বেশী প্রচলন আছে? জনশ্রুতি এই যে, এই বই যে পরিমাণ বিক্রি হয় তা থেকে ধারণা করা বোধ হয় সঙ্গত হবে না যে পঠনব্রতী এবং পাঠনব্রতীদের মধ্যে বইটির ব্যাপক প্রচলন আছে। 'বাংলা ভাষা পরিচয়ে'র কথা তো ছেড়েই দিলাম। কিন্তু অমন অনবদ্য ও অপূর্ব সৃষ্টি 'খাপছাড়া' বা 'সে'—তাদের সঙ্গেই বা কটা লোকের পরিচয় আছে? এ কথা কি অপ্রিয় হলেও সত্য নয়, যেখানেই রবীন্দ্র-উৎসব হয় সেখানেই ঘুরেফিরে আসে কয়েকটি নৃত্যনাট্য এবং কয়েকটি গান। তারাই আসর দখল করে রেখেছে।

অথচ আমাদের অদ্ভুত সৌভাগ্যক্রমে এই দেশের মাটিতে এমন একজন কবি জন্মেছিলেন যাঁর দান মহাসাগরের মত, যাঁর প্রতিভা সামগ্রিক, জীবনের এমন কোনও কোণ নেই যা তাঁর রচনার দীপ্তিতে উদ্ভাসিত, আজ সেই সামগ্রিক প্রতিভার মহত্ত্ব যদি আমরা উপলব্ধি করতে না পারি তা হলে রবীন্দ্র-প্রতিভার মহৎ অমর্যাদা করা হবে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্য-উপন্যাসগুলিই কেবল সামগ্রিকভাবে পড়া হোক, শুধু এই কথাটাই আমার বক্তব্য নয়। রবীন্দ্রনাথ কবি, অতএব খুব স্বাভাবিক-ভাবেই রবীন্দ্র-রচনা আলোচনার সময় তাঁর কাব্যের উপর ঝোঁক পড়বে এ খুব আশ্চর্য কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখে গিয়েছেন—

> "গল্প নাটক কবিতা নিয়ে বাংলা সাহিত্যের পনেরো আনা আয়োজন। অর্থাৎ ভোজের আয়োজন, শক্তির আয়োজন নয়। পাশ্চাত্য দেশের চিত্তোৎকর্ষ বিচিত্র চিত্তশক্তির প্রবল সমবায় নিয়ে। মনুষ্যত্ব

সেখানে দেহ মন প্রাণের সকল দিকেই ব্যাপৃত। তাই সেখানে যদি ক্রটি থাকে তো পূর্তিও আছে। বটগাছের কোনও ডাল বা ঝড়ে ভাঙল, কোনও ডাল বা পোকায় ছিদ্র করেছে, কোনও বৎসর বা বৃষ্টির কার্পণ্য, কিন্তু সবশুদ্ধ জড়িয়ে বনস্পতি জমিয়ে রেখেছে আপন স্বাস্থ্য, আপন বলিষ্ঠতা। তেমনি পাশ্চাত্ত্য দেশের মনকে ক্রিয়াবান্ করে রেখেছে তার বিদ্যা, তার শিক্ষা, তার সাহিত্য সমস্ত মিলে; তার কর্মশক্তির গুরুতর উৎকর্ষ ঘটিয়েছে এই-সমস্তের উৎকর্ষ।

আমাদের সাহিত্যে রসেরই প্রাধান্য। সেইজন্যে যখন কোনও অসংযম কোনও চিত্তবিকার অনুকরণের নালা বেয়ে এই সাহিত্যে প্রবেশ করে তখন সেটাই একান্ত হয়ে ওঠে, কল্পনাকে রুগ্ন বিলাসিতার দিকে গাঁজিয়ে তোলে। প্রবল প্রাণশক্তি জাগ্রত না থাকলে দেহের ক্ষুদ্র বিকার কথায় কথায় বিষফোড়া হয়ে রাঙিয়ে ওঠে। আমাদের দেশে সেই আশঙ্কা। এ নিয়ে দোষ দিলে আমরা নজির দেখাই পাশ্চাত্ত্য সমাজের, বলি এইটেই তো সভ্যতার আধুনিকতম পরিণতি। কিন্তু সেইসঙ্গে সকল দিকে আধুনিক সভ্যতার যে সচিন্ত সচল প্রবল বৃহৎ সমগ্রতা আছে সেটার কথা চাপা রাখি।"

—'শিক্ষা,' ২১৯-২০ পৃষ্ঠা

বাঙালী বরাবরই ভোজের আয়োজনে মত্ত, শক্তির আয়োজনে নয়। সেই ধারা বরং আরও প্রবলতর হতে চলেছে। আর কিভাবে হতে চলেছে? ক্রমেই তার লঘুতা সীমাহীন হয়ে যাচ্ছে, তার রুচিভ্রষ্টতা অসহনীয় হয়ে উঠছে।

রবীন্দ্রনাথ এমন একজন মহত্তম স্রষ্টা যে তিনি বাঙালীর জন্য শুধু ভোজেরই আয়োজন করে যান নি, শক্তির আয়োজনও যথেষ্ট করে গিয়েছেন। তাঁর রচনার একটি অতি বৃহৎ অংশ কাব্য ব্যতীত অন্য বিষয়ে—তার মধ্যে রাজনীতি আছে, সমাজনীতি আছে, রাষ্ট্রনীতি আছে, শিক্ষানীতি আছে, ইতিহাসের ব্যাখ্যা আছে। এগুলি তাঁর রচনার কম অংশ নয়। রবীন্দ্রনাথের এই কাব্য-ব্যতিরিক্ত রচনাগুলি না পড়ে যদি আমরা শুধুই তাঁর কবিতা পড়ি এবং তাও মাত্র গুটিকয়েক বেছে বেছে নিয়ে পড়ি, তা হলে রবীন্দ্রনাথ যে বিরাট চিন্তা, অপূর্ব বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যতের দিগ্‌নির্দেশ আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন তার কোনও পরিচয়ই আমরা পাব না। এবং সেটা একটা নিদারুণ ট্র্যাজিডি ছাড়া আর কিছু নয়।

কথাটা আর একটু বিস্তারিত করে বলা যাক। রবীন্দ্রনাথ এসব বিষয়ে যা লিখেছেন তা অত্যন্ত গভীর এবং দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। তিনি যখন এসব বিষয়ে লিখেছিলেন তখন অনেকেই সে কথায় কর্ণপাত করেন নি, ভেবেছিলেন হয়তো বা কবির উচ্ছ্বাস। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে ততই দেখা যাচ্ছে তাঁর দৃষ্টি ইতিহাস ও সমাজের গভীর বিশ্লেষণ হতে উদ্ভূত—সেই কারণে তার মর্মান্তিক সত্যতা ক্রমেই পরিস্ফুট হচ্ছে।

এই প্রবন্ধে এর বিস্তারিত আলোচনা অসম্ভব, কাজেই দু-একটা উদাহরণ দিয়েই বক্তব্য শেষ করতে হবে। যেমন ধরুন আমাদের রাজনীতির কথা। প্রাচীনকালে রাজনীতি যখন আবেদন-নিবেদনের থালা নিয়ে ইংরেজের দরবারে ঘোরাফেরা করছিল, তখন তার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ করেন রবীন্দ্রনাথই। বলেছিলেন, দেশের মাটিতে মূল না থাকলে কিছু হবে না। সে কথা তখন কেউ শোনে নি, কিন্তু সে কথা যে কত সত্য তা প্রমাণ করবার জন্য গান্ধিজীর প্রয়োজন হল। কিন্তু গান্ধিজী যখন ভারতবর্ষকে ডাক দিলেন, সেই ডাকে ভারতবর্ষ উত্তাল হয়ে উঠল, জনসমুদ্রের সেই কূল-হারানো জোয়ারের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ একটি লাল আলো জেলে ধরেছিলেন "সত্যের আহ্বান" এবং অন্যান্য প্রবন্ধে। তাঁর বক্তব্য ছিল, এক বছরে স্বরাজ পাব, এ তো প্রায় দৈবশক্তিতে বিশ্বাস করা, সন্ন্যাসীর সোনা তৈরির মন্ত্রের কাছে আত্মবিসর্জনের মত। আসল স্বারাজ্য হচ্ছে চিন্তার স্বারাজ্য—সকল লোকে যদি সজ্ঞানে চিন্তা না করে কেবল দৈবশক্তিতে বিশ্বাস করে এই কর্মসূচী গ্রহণ করে তা হলে সে সাধনা প্রকৃত স্বরাজ সাধনা হল না। তিনি সেইসঙ্গে

আরও বলেছিলেন, "দেশকে জয় করে নিতে হবে পরের হাত থেকে নয়, নিজের নৈষ্কর্ম থেকে, ঔদাসীন্য থেকে, দেশের যে-কোন উন্নতিসাধনের জন্যে যে উপলক্ষে আমরা ইংরেজ-রাজসরকারের দ্বারস্থ হয়েছি সেই উপলক্ষেই আমাদের নৈষ্কর্ম্যকে নিবিড়তর করে তুলেছি মাত্র।" আজ যখন রাজপুরুষদের মুখে অহরহ বক্তৃতা শুনি, সব কাজের জন্যই সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে থেক না, স্বাবলম্বী হও, উদ্যমী হও, তখন কি রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে? রবীন্দ্রনাথ বহুকাল পূর্বে লিখেছিলেন, "কারণ যাই হোক, প্রদেশে প্রদেশে জোড় মেলে নি। ···যে জীর্ণ গাড়ির চাকাগুলো বিশ্লিষ্ট, মড়মড় ঢলঢল করে যার কোচবাক্স, জোয়ালটা খসে পড়বার মুখে, তাকে যতক্ষণ দড়ি দিয়ে বেঁধেসেধে আস্তাবলে রাখা হয় ততক্ষণ তার অংশপ্রত্যংশের মধ্যে ঐক্য কল্পনা করে সন্তোষ প্রকাশ করতে পারি, কিন্তু যেই ঘোড়া যুতে তাকে রাস্তায় বের করা হয় অমনি তার আত্মবিদ্রোহ মুখর হয়ে ওঠে।" যতক্ষণ ইংরেজ বিতাড়নের দড়ি দিয়ে আমাদের ঐক্য আস্তাবলে বাঁধা ছিল তখন আমরা অনৈক্যের সম্ভাবনাকে খুব জোরে অস্বীকার করেছি, কিন্তু আজ স্বাধীনতার ঘোড়া যুতে যেই সেই রথকে রাস্তায় বের করা হয়েছে অমনি তার আত্মবিদ্রোহ কি মুখর হয়ে ওঠে নি? ভাষা-ভিত্তিক রাজ্যগঠন আন্দোলনের সময়, অন্য প্রদেশে বাঙালী উদ্বাস্তুদের অনাদরে, আসামে হাতী দিয়ে বাঙালী উদ্বাস্তুদের ঘর ভেঙে উচ্ছেদ করায়, বিহারে বাঙালীর শিক্ষা-নিয়োগ ইত্যাদি ব্যাপারে কি কথা মনে হয়? রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "ধর্মমত ও রাজনীতির সম্বন্ধে হিন্দু-মুসলমানে শুধু প্রভেদ নয়, বিরুদ্ধতা আছে, একথা মানতেই হবে। অতএব আমাদের সাধনার বিষয় হচ্ছে, তৎসত্ত্বেও ভালোরকম করে মেলা চাই। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ আমাদের না হলে নয়।" এই সিদ্ধিলাভের অভাবে কি ফল ঘটেছে তা রবীন্দ্রনাথ লেখবার বহু বহু বছর পরে আমরা এখন বুঝতে পারছি। গান্ধিজী এর জন্য 'খেলাফত' আন্দোলন করেছিলেন, কিন্তু সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "একদা খিলাফতের সমর্থন করে মহাত্মাজি মিলনের সেতু নির্মাণ করতে পারবেন মনে করেছিলেন। কিন্তু এহ বাহ্য। এটা গোড়াকার কথা নয়।" বস্তুতঃ সেটা যে কত বাহ্য তা আজ অতি কঠোরভাবে প্রমাণিত হয়েছে। বস্তুতঃ আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের চেহারা ছিল আধুনিক, তার মুখ ফেরানো ছিল ভবিষ্যতের দিকে, আর খিলাফত ছিল অচল ধর্মরাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা, তার মুখ ফেরানো ছিল সুদূরতম অতীতের দিকে—এ দুয়ে জোড়াতালি দিয়ে কি করে সত্যকারের মিলন হতে পারে এ কথা রবীন্দ্রনাথই ইঙ্গিত করেছিলেন—দেশ তখন তা বোঝে নি।

তেমনি স্বরাজসাধন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "আমি মনে করি, দেশকে যদি স্বরাজসাধনায় সত্যভাবে দীক্ষিত করতে চাই তা হলে সেই স্বরাজের সমগ্র মূর্তি প্রত্যক্ষগোচর করে তোলবার চেষ্টা করতে হবে।··· স্বদেশের সাধনা ছোট ছোট আকারে দেশের নানা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করা আমি অত্যাবশ্যক মনে করি।··· বিশেষ বিশেষ লোকালয়ে সাধারণের কল্যাণসাধনের দায়িত্ব প্রত্যেকে কোন না কোন আকারে গ্রহণ করে একটি সুস্থ জ্ঞানবান শ্রীসম্পন্ন সম্মিলিত প্রাণযাত্রার রূপকে জাগিয়ে তুলেছে, এমন-সকল দৃষ্টান্ত চোখের সামনে ধরা দরকার। নইলে স্বরাজ কাকে বলে সে আমরা সুতো কেটে, খদ্দর পরে, কথার উপদেশ শুনে কিছুতেই বোঝাতে পারব না। যে জিনিসটাকে সমস্ত ভারতবর্ষে পেতে চাই ভারতবর্ষের কোন একটা ক্ষুদ্র অংশে তাকে যদি স্পষ্ট করে দেখা যায়, তা হলে সার্থকতার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জন্মাবে। ···ভারতবর্ষের একটি মাত্র গ্রামের লোকও যদি আত্মশক্তির দ্বারা সমস্ত গ্রামকে সম্পূর্ণ আপন করতে পারে তা হলেই স্বদেশকে স্বদেশরূপে লাভ করবার কাজ সেইখানেই আরম্ভ হবে।" স্বাধীনতা লাভের পর এক যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে, এতদিনে এই সব কথার সত্যতা ও তাৎপর্য আমরা কিছু কিছু অনুভব করতে আরম্ভ করেছি। আমরা এতকাল ধরে সুতো কেটেছি, খদ্দর পরেছি, দেশের লোককে অনেক উপদেশ শুনিয়েছি, কিন্তু সকল মানুষকে এক করতে পারি নি, তাদের চিত্তের উদ্বোধন হয় নি, তারা সম্মিলিত

আত্মকর্তৃত্বের চর্চায় প্রবৃত্ত হয় নি। আর তা হয় নি বলেই, আজ এক প্রান্তে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীকে পর্যন্ত গোটা ভারতবর্ষ ঘুরে এই কথা শোনাতে হচ্ছে, অপর প্রান্তে মাইনে-করা গ্রামসেবক রেখে গ্রামকে উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা (হয়তো বা বৃথা চেষ্টাই !) করতে হচ্ছে। গ্রামে সেই দলাদলি বেড়েছে বই কমে নি, মিলনের বদলে বিভেদের পথ আরও প্রশস্ত হয়েছে, দেশের উন্নতির আকাঙ্ক্ষা দেশের আত্মা হতে স্বয়ংসম্ভূত হচ্ছে না, তাই সেখানে টেনে আনতে হচ্ছে সরকারী শাসনযন্ত্রকে। ভুলে যাচ্ছি যে সরকারী শাসনযন্ত্রের প্রতাপে কিছু হাসপাতাল টিউবওয়েল হতে পারে, চাই কি তার জন্য চাঁদাও মিলতে পারে, টেস্টরিলিফ মারফত ক্ষুধার তাড়নার নিবৃত্তি হতে পারে, কিছু রাস্তাঘাটের সংস্কারও হতে পারে, কিন্তু এ জিনিস আসল স্বরাজ নয় এবং তা নয় বলেই আজ আমাদের স্বরাজ পদে-পদে হোঁচট খাচ্ছে, তার নৌকো চলছে পাল তুলে তরতর করে নয়, লগি ঠেলে ঠেলে। আসল স্বরাজ হল মানুষের মনে, স্বরাজের উপযোগী মন না গড়ে উঠলে দেশময় সত্যকারের স্বরাজ গড়ে ওঠে না। এই কথাই সেদিনর বীন্দ্রনাথ বলেছিলেন কিন্তু সেদিন তাঁর এই অত্যন্ত গভীর কথার মর্ম কেউ অনুধাবন করবার চেষ্টা করে নি।

এরকম উদাহরণ অজস্র দেওয়া যায় এবং দেওয়া যায় বলেই রবীন্দ্রনাথের এইসব রচনাগুলিও বেশী করে পড়া দরকার এবং চিন্তা করা দরকার। মানুষের কথা ভবিষ্যৎকালে তখনই ফলে যখন তার কথা গভীর সামাজিক বিশ্লেষণ ও সঠিক ইতিহাসবোধ থেকে উদ্ভূত। বস্তুতঃ এই বিষয়ে এত চিন্তা করার অবকাশ রয়েছে, অথচ এ বিষয়ে চিন্তা হয়েছে বলে আমার জানা নেই, এমন কি একখানি ডি. ফিল্-এর থীসিস পর্যন্ত রচিত হয় নি। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, ইতিহাসকে কিভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে তাই নিয়ে তর্কের অন্ত নেই। একদিকে রয়েছে মার্কসীয় ব্যাখ্যা—যা ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা করে। অন্যদিকে এক এক ধুরন্ধর নতুন নতুন পথ কাটতে চেয়েছেন—যেমন স্পেঙলার, টয়েনবী, সোরোকিন প্রভৃতি। কার ব্যাখ্যা প্রকৃত ? রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা কোন্ পথ ধরে চলেছে ? কেন তিনি সমাজের উপর এত জোর দিয়েছিলেন ? ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক বিবর্তনে তা কতদূর প্রয়োজন ? সমাজের কী রূপ তিনি দেখেছিলেন, কী কী সমস্যা তাঁর চোখে পড়েছিল, সমাধানের কী পথ তিনি নির্দেশ করেছিলেন ? ইতিহাসের পথে চলতে চলতে আমরা যে জায়গায় এসে পৌছেছি তাতে সেই সমাধান এখনও সম্পূর্ণ ঠিক আছে, অথবা তার কিছু পরিবর্তনের প্রয়োজন ? এ সব কথা গভীর আলোচনার অপেক্ষা রাখে, কারণ রবীন্দ্রনাথ কবি হিসেবে যত বড়, এদিকেও ততই বড় এবং সমগ্রভাবে এই প্রতিভাকে বিচার না করতে পারলে তার মহত্ত্বের সম্পূর্ণ উপলব্ধি আমাদের হবে না।

অতএব কবি রবীন্দ্রনাথকে যেমন পড়ুন, অ-কবি রবীন্দ্রনাথকেও তেমনি পড়ুন, বরং আরও গভীরভাবে পড়ুন—এইটে আমার আজকের মোদ্দা কথা।

তালধ্বজ ও রবীন্দ্র-শতাব্দী উৎসব

মৈত্রেয়ী দেবী

শান্তিনিকেতনে আশ্রমের প্রধান তোরণ—যেখানে উপনিষদের মন্ত্রটি লেখা, তার ঠিক পাশেই আছে ছোট একটি কুটীর। উন্নতচূড় ঋজু একটি তালগাছকে ঘিরে খড়ে ছাওয়া তালধ্বজ গৃহ—সেই বলিষ্ঠ তালতরু "ঠিক তার মাথাতে গোল গোল পাতাতে" কবির যে ইচ্ছাটি মেলে আছে, আজ নিতান্ত প্রয়োজনে পড়ে সে কথাটি এখানে আলোচনা করব।

কবির বিষয়ে, বিশেষতঃ ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে আজকাল কিছু লিখতে দ্বিধা আসে, কারণ দুঃখের সঙ্গে দেখছি এ নিয়ে একটা 'র‍্যাকেট' চলছে (র‍্যাকেট কথার উপযুক্ত বাংলা প্রতিশব্দ খুঁজে পাই না)। রবীন্দ্রনাথের জীবিত কালে তাঁরই জবানীতে একটি ভ্রমাত্মক কাহিনী প্রচার হওয়ায় তিনি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন—অনেক অমূলক খবরের মূল উৎপত্তি আমাকে নিয়ে, এও তার মধ্যে একটি। এইজন্য মরতে আমার সঙ্কোচ হয়। তখন বাঁধভাঙা বন্যার মত গুজবের স্রোত প্রবেশ করবে আমার জীবনীতে তাকে আটকাবে কে ?" (৯।৭।৩৯) আজ এ কথার সত্যতা কিছু পরিমাণে বোঝা যাচ্ছে। তাঁকে অবলম্বন করে শ্রুত অশ্রুত, বিস্মৃত অর্ধবিস্মৃত নানা কাহিনী বিচিত্র ভাষায় কোটেশন-মার্কে ইতস্ততঃ উদ্ধৃত হচ্ছে, তার মধ্যে সত্য-মিথ্যা ভুল-নির্ভুল যাচাই করা যায় কোন্ পন্থায় ? একটি মাত্র উপায় আছে—internal evidence, কিন্তু সে সাক্ষ্যই বা মিলিয়ে দেখে কে ? কোন্ ভাষা, কোন্ আচরণ, কোন্ ভঙ্গী—সর্বোপরি কোন্ ভাব রবীন্দ্র-চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গত তা বুঝতে হলে রবীন্দ্রসাহিত্য ও জীবন সম্বন্ধে সবিশেষ ধারণা থাকা চাই। বর্তমানকালে বা ভবিষ্যতে তেমন মানুষের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে ও আসবে। রবীন্দ্র-সান্নিধ্যে, তাঁর সঙ্গসুধা পান করে দীর্ঘদিন যাঁরা সৌভাগ্যলালিত হয়েছেন এমন মানুষ আজও অনেকেই বেঁচে আছেন—ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে অনুমান করতে পারি সেই স্মৃতিচারণে তাঁদের কত আনন্দ, কত মাধুর্য বিকীরণ, তবুও এ কথা জোর করেই বলা যায় যে তাঁর মৃত্যুর বিশ বৎসর পরে আমরা কেউই তাঁর কথা আজ আর কোটেশন চিহ্নে উদ্ধৃত করবার অধিকারী নই। সেই স্বর্ণঝংকৃত ভাষা আমাদের দুর্বল স্মৃতি থেকে অবশ্যই ভ্রষ্ট হয়ে গেছে, যা পড়ে আছে তা তার কঙ্কাল মাত্র—কঙ্কালও দেহের অংশ বটে তবু সেখানে লাবণ্যময়ীকে খোঁজা যেমন মিথ্যা, বর্তমানের অনেক স্মৃতিকথাই তেমনি মিথ্যা। স্মৃতির যাথার্থ্যই রচনার পূর্ণতা দেয় না—তথ্য যেমন অনেক সময়ই সত্য দিতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, কিছুদিন পূর্বে একটি রচনা পড়েছিলাম, কোনও একটি ঘটনার বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক লিখছেন—"রবীন্দ্রনাথ চীৎকার করে উঠলেন—" আর একজন রবীন্দ্রনাথের অতি-পরিচিত ব্যক্তি লিখছেন—"কবি 'খিল্‌খিল্' করে হেসে উঠলেন।" এই দুটি প্রসঙ্গেই তেমন ভুল কিছু নেই, অসৎ উদ্দেশ্য তো নেই-ই। স্বাভাবিকের চেয়ে স্বর স্বল্প উত্তেজিত হলে তাকে চিৎকার করা হয়তো বলা চলে—আর 'খিল্‌খিল্' করা হচ্ছে ব্যাকরণ অনুযায়ী ধ্বন্যাত্মক দ্বৈত শব্দ—মনের আবেগ প্রকাশ করতে তার ব্যবহার হয়ে থাকে। অতএব হাসিকে যদি কেউ খিল্‌খিল্ বলে বর্ণনা করে, তার মধ্যে তথ্যের কিছু ভুল নেই। তবু ভুল আছে, মারাত্মক ভুল। শোভন আচরণ রবীন্দ্রনাথের জীবনশিল্প—সেই ভুলের ত্রিশূলে ছিন্নভিন্ন হয়ে ভবিষ্যৎ মানুষের চোখে ঘটাবে সৌন্দর্যের চিরঅবলুপ্তি।

দেশে বিদেশে, ঘরে ও বাহিরে বিচিত্র জনসমাগমে কবির কত বিচিত্র রূপ, আলোকিত মনোময় ভাষার বর্ণচ্ছটা তাঁর সঙ্গীদের মন প্রাণ সর্বদা ভরে রেখেছিল, আজ তা ধ্বনির তরঙ্গের মত সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর বলয়ে তাঁদের জীবন পরিক্রমা করে করে দূর থেকে দূরান্তরে অসীম শূন্যতার দিকে চলেছে। যা হারাবার যোগ্য ছিল না তা হারিয়ে গেল, কিন্তু বিধির বিধানে সেই তো জীবনধর্ম। বিধাতার এক পরম শিল্পরচনা আমাদের লুব্ধ মুষ্টির বন্ধন এড়িয়ে ভ্রষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু তাকে পুনর্বার সৃষ্টি করার ক্ষমতা আজ আর কারুরই নেই। বিশ পঁচিশ ত্রিশ চল্লিশ বছর আগের শোনা কথায়, দেখা দৃশ্যে স্মৃতির ক্ষেত্রে

লাঙল চালিয়ে অপটু ভঙ্গীতে অসংস্কৃত ভাষায় কবিবাক্য বলে নানা স্খলিত বচন কোটেশন-মার্কে উদ্ধৃত করা নিরর্থক। আজ কবির পরম আত্মীয়ও যদি সে চেষ্টা করেন তবে বলতে হয় 'একদিন যে সম্পদে করেছ বঞ্চিত সে আর ফিরায়ে দেওয়া তব সাধ্যাতীত।'

মনস্তত্ত্বের যে ঘোরপ্যাঁচে পড়ে এই অসাধ্যসাধন প্রচেষ্টা হয়, তারই চূড়ান্ত পরিণতি বেশ কিছুদিন আগে একটি মাসিক পত্রিকায় পড়েছিলাম, সেখানে লেখক মিডিয়ামের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাক্যালাপ করেছেন। বিদেহী রবীন্দ্রনাথ মিডিয়ামের মুখে তাঁর সঙ্গে রঙ্গরহস্য তো করেছেনই, এমন কি কবিতা ডিক্টেট করেছেন—সে কবিতাও ছাপা হয়েছে এবং লেখকের ধারণা ওই কবিতা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কেউ লিখতে পারে না।

যে কথায় শুরু করেছিলাম তার থেকে দূরে চলে এসেছি, তবুও তা একেবারে সূত্রচ্ছিন্ন নয়। কবির উক্ত বহু ছোটখাট কথা আজও কানে ভেসে আসে, বহু কথার অর্থ আজ বুঝতে পারি, অল্প বয়সের অনভিজ্ঞতায় যার তাৎপর্য তখন বুঝতে পারি নি। কিন্তু উপরোক্ত কারণে সেগুলি লিখতে ভরসা পাই না, বলতে সাহস হয় না। শুধু অশ্রুক্ষরিত বেদনায় মনে হয় কাছে থেকেও তিনি আমাদের থেকে কত দূরে ছিলেন আর আজ দূরে গিয়েও সেই কাছে থাকার নির্বাসন পার হল না!

তাই বহু দ্বিধাভরে ব্যক্তিগত পরিচয়ে একটি বিষয় মনে যেমন বুঝেছিলাম তা বলবার চেষ্টা করব। তাঁর মুখের ভাষা ব্যবহার করব না, দু-একটি শব্দমাত্র যা কানে আছে তাই শুধু আমার বক্তব্যকে প্রকাশ করবে। আর আমার বক্তব্যের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য—তা যাঁরা আশ্রমবাসী আজও তাঁকে স্মরণ রেখেছেন তাঁরা মিলিয়ে বুঝবেন এ ভাবনা তাঁর ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গত কি না।

রবীন্দ্র-জন্ম-শতাব্দী উৎসব এগিয়ে আসছে, দেশব্যাপী ধূমধামের আয়োজন শুরু হয়েছে, দামামা বাজতে শুরু করেছে, নানা লোক নানা উদ্দেশ্যে জড়ো হয়ে একটা কিছু কাণ্ড করে তুলবেই—সে কাণ্ডটা কেমন হবে সভয়ে সশঙ্কচিত্তে অপেক্ষা করে আছি। কবির নিজেরও বোধ হয় কম সন্দেহ ছিল না, তাই লিখেছিলেন—

"ভারতে ছিল না কভু হেন প্রথা খেয়ালের
কবি পরে ছিল ভার নিজ মেমরিয়ালের।"

তিনি নিজের যে মেমোরিয়াল গড়ে গিয়েছেন, তাকে ধ্বংস না করে মানবচিত্তে তার প্রতিষ্ঠাই তো সর্বোত্তম প্রচেষ্টা হওয়া দরকার!

রবীন্দ্রনাথ গাছতলায় তাঁর আশ্রম গড়েছিলেন। বলা যেতে পারে 'গ্রাণ্টস কমিশন'ও ছিল না, টাকাও ছিল না—তাই গাছতলাতেই আশ্রয়। কিন্তু শুধু কি তাই? এই অভাব কি তাঁর ভাবনায় অপরূপ ভাবমূর্তি নেয় নি? বস্তুকে বড় হয়ে উঠতে দিলে, আকাঙ্ক্ষার অতিকায় মূর্তিকে ক্রমাগতই আসন ছেড়ে দিলে মনুষ্যত্বের যে বিপদ ঘটে, সে কথা কত ভাবেই তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন। যাঁরা আশ্রমে তাঁর জীবনযাত্রা দেখেছেন, যাঁরা তার ভাবধারার মূল কথাটি বুঝেছিলেন, তাঁরা জানেন তিনি আসবাবের প্রাবল্য বাড়িঘরের আতিশয্য ভালবাসতেন না। নিরাভরণ ছোট ঘরে সামান্য আসবাব নিয়ে তাঁর দিন কেটেছে সরল সুখে। উপকরণের বাহুল্য, বস্তুর মোহ কখনও তাঁর চিত্তকে আক্রমণ করতে পারে নি। দেশবিদেশের কত মানুষ এই বিশ্ববিখ্যাত কবির "দেহলী"র ছোট ঘরখানির বর্ণনা লিখেছে, দেখেছে সপ্রশংস মনে আড়ম্বরশূন্য জীবনে চিত্তশক্তির মোহমুক্তি। এ তাঁর বৈরাগ্যসাধন নয়—মোহ আছে—তবে মনের বস্তুতেই তাঁর মোহ, জড়বস্তুতে নয়। 'বাহিরে পাঠায় বিশ্ব, কত গন্ধ গান দৃশ্য'—কবির মন সাড়া দেয় তাতে কিন্তু চৌকি টেবিল দরজা জানলা ইটকাঠে নয়। শান্তিনিকেতনের এই তপোবন এই আশ্রম যতদিন তাঁর আয়ত্তে ছিল, নানা বাড়িতে খড়ে ছাওয়া মাটির ঘরে জেগেছে সুরধ্বনিত আশ্রম-জীবনের আনন্দ। তখন প্রাসাদ তাঁকে মাটির সামীপ্য থেকে দূরে নিয়ে যেতে পারে নি।

ইদানীং কালে অর্থাৎ মৃত্যুর আঠারো-কুড়ি বছর পূর্ব থেকে উত্তরায়ণের প্রাঙ্গণে ছোট ছোট বাড়িতে দিন কাটিয়েছেন। আমাদের মনে পড়ে একটি দিনের কথা, তখন

'বিচিত্রা' মাসিক পত্রিকা সমারোহে প্রকাশিত হবে। কবি তারই জন্য ঋতুকাব্য লিখছেন 'নটরাজ'। তখন উত্তরায়ণে "উদয়ণ" গৃহ এমন প্রাসাদোপম হয়ে ওঠে নি। একটি বড় ঘর ও দুটি ছোট ঘর সম্বল—সেখানে শিশুকন্যা পুপেকে নিয়ে পুত্র-পুত্রবধূ বাস করেন। আর এক কোণে 'কোনার্ক', ছোট ছোট নিতান্ত অপরিসর দু-তিনখানি ঘর, ছাত নীচু—কবি বাস করেন সেখানে। সামনের শিমূল তরু তখনও এমন বনস্পতির আকার নেয় নি। আর গৃহপাশের 'নীলমণি' লতা হয়তো ছিল তরুণী-পল্লবিনী। বাঁ দিকের ছোট্ট ঘরটি জুড়ে টেবিল পাতা, কবি একাগ্রমনে লিখছেন আর গুনগুন করে গান করছেন, 'মধ্য দিনে যবে গান বন্ধ করে পাখি, হে রাখাল বেণু তব বাজাও একাকী'—আমি এসে নীরবে পিছনে দাঁড়িয়েছি, অমিয়বাবু সামনে এসে কোনও অতিথির আগমন-সংবাদ দিলেন। কবি কলম বন্ধ করে বারান্দায় যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন—সবিস্ময়ে দেখলাম ঘরের ছাত প্রায় মাথা ছুঁয়ে আছে। আমরা কলকাতাবাসী এত নীচু ছাত কখনও দেখি নি। কিন্তু তাঁর উপস্থিতিই এমন অপূর্ব যে ওই অতি ছোট অপরিসর সাধারণ শানবাঁধানো মেঝের ঘরটি কী সুন্দরই মনে হয়েছিল। এই রুক্ষ মরুপ্রান্তরে জলবিরল তপ্তভূমিতে ওই রকম নীচু চেপে-ধরা ছাতের নীচে গ্রীষ্মতপ্ত দিন কাটানো কত কষ্টকর হতে পারে সে কথা তখন মনে আসে নি। তিনি যেখানে যে মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকেন তার চারপাশ সুন্দর হয়ে ওঠে, তিনি যে আকাশে নিঃশ্বাস নেন সে আকাশ তাঁর স্নেহাকাঙ্ক্ষীজনের নয়ন-মনের উপর জ্যোৎস্না মেলে থাকে—বারবার মনে হতে লাগল নীচু ছাত কি সুন্দর, সবাই কেন করে না!

কবি যে ছোট বাড়ি ছোট ঘর ভালবাসতেন সে কথা সকলেই শুনেছেন, কিন্তু অনেকেই হয়তো জানেন না যে কবি বড় বাড়ি ভালবাসতেন না। বিশেষতঃ আশ্রমে বড় বাড়ি তাঁর পরিকল্পনা নয়, তিনি তার বিরোধী। ঠিক যতটুকু নিতান্ত প্রয়োজন তার চেয়ে বেশী দেওয়াল তাঁর দরকার ছিল না। ঘরের চেয়ে বাহির, ছাতের চেয়ে আকাশই তাঁর প্রিয়—এ কথা যেমন তাঁর কাব্যে তেমনি তাঁর জীবনে ছিল সত্য। এবং এই সত্যেই আশ্রম-জীবনের মূল আছে। খোলা প্রান্তরে, গাছের ছায়ায়, মাটির ঘরে খড়ের চালের নীচে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহাশ্রয়ে তৈরি হচ্ছিল সেই আশ্রয় 'যত্র বিশ্বভবত্যেকনীড়ম্'। সে কি শুধু অভাবে? তা নয়, সেই তার ভাব এবং সেখানেই তার মূলশক্তি—যে শক্তি অর্থের চেয়ে সম্পদকে, বস্তুর চেয়ে চিত্তকে বড় করে তুলতে চায়। সন্তোষই পরম সম্পদ, শান্তির উৎস আর সৌন্দর্যের মূল্যতেই মানুষের চরম সার্থকতা। তাই তাঁর সৃষ্ট আশ্রমের ছোটখাট ঘরবাড়ি প্রাঙ্গণ ও অঙ্গন, আচার অনুষ্ঠান, ব্রত নিয়ম সমস্তই সৌন্দর্যের মূল্য দিয়ে পরম মূল্যবান করে তুলছিলেন কবি, যাতে তালধ্বজ গৃহের সুন্দর সন্তোষ আকাঙ্ক্ষাক্ষুব্ধ স্কাইস্ক্রেপারের কাছে লজ্জিত না হয়। শুষ্ক বৈরাগ্য নয়, সুন্দরের ঐশ্বর্য।

এই সৌন্দর্যবাণী, সন্তোষের নির্মলতা ধুয়ে দেবে আশ্রমবাসী বালক-বালিকার জীবন, ঈর্ষামুখর দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ শহর-জীবনের গ্লানি, ছোট-বড়র বোধ—যা কিছু বিরোধে বিচ্ছেদে কুশ্রী করে তোলে মন, তা সরিয়ে দিয়ে মানুষে মানুষে হবে পরিচর্য।

অনেকেই নিশ্চয় শুনেছেন যে তিনি বলতেন, মাটির ঘরে থাকতে আবার কষ্ট কি। ভারতবর্ষে শতকরা নব্বই জন মানুষই তো মাটির ঘরে বাস করে। আশ্রমে বড় বাড়ি তৈরি হলে তাকে বলতেন 'Impertinence'। শুনেছি উত্তরায়ণের প্রতিস্পর্ধী কোন বড় বাড়ি হলে বলেছিলেন 'প্রত্যুত্তরায়ণ'। "উদয়ন" প্রাসাদ তৈরি হলেও তাই "শ্যামলী"ই তাঁর প্রিয় ছিল, প্রিয় ছিল একমাত্র কামরাযুক্ত "উদীচি" গৃহ। এই ঘরবদল কবির খেয়াল শুধু নয়, কেবলই নয় পরিবর্তনের শখ, প্রধানতঃই এর মূল সেই দুঃখে—যে আশ্রমে তাঁর আপন ঘরটি হারিয়ে যাচ্ছিল। সে ঘর কোথায়? সে তো ওই পথের ধারে তালগাছের ছায়াহীন তলে খড়ে-ছাওয়া মাটির স্নিগ্ধতায়—তার পিছনে ওঠে মন্দিরের সৌরভ, লুব্ধ-ক্ষুব্ধ আকাঙ্ক্ষা-চঞ্চল মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় ভারতবর্ষের চিরকালের বাণী, বলে সংসারের সমস্ত ঘাতপ্রতিঘাত

কাড়াকাড়ি মারামারি যাতে উত্তপ্ত হয়ে না ওঠে সেজন্য অন্ততঃ এক জায়গায় শান্তম্‌শিবম্‌অদ্বৈতমের শুদ্ধ ভাব জাগিয়ে রাখবার জন্য এই তপোবনে কবির আশ্রয় গড়ে উঠছে সেই বিশেষ বাণীটি প্রকাশ করে—বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতি এ দুয়ের সঙ্গমে পূর্ণতার উপলব্ধি জাগিয়েছে।

কবি তাই তালধ্বজের দিকে তাকিয়ে বলছেন—

"যা কিছু আসে যায় মাটির পরে
পরশ লাগে তারি তোমার ঘরে—
ঘাসের কাঁপা লাগে পাতার দোলা
শরতে কাশবনে তুফান-তোলা।..."

মানুষের এই গৃহাশ্রয় তাকে প্রকৃতির সঙ্গ থেকে আকাশের আনন্দ থেকে আড়াল করে আনে না।

"তোমার বাসাখানি আঁটিয়া মুঠি
চাহে না আঁকড়িতে কালের ঝুঁটি
দেখি যে পথিকের মতই তাকে
থাকা ও না-থাকার সীমায় থাকে।
ফুলের মতো ও যে পাতার মতো,
যখন রেখে যাবে যাবে না ক্ষত!"

কিন্তু তপোবনের অপস্রিয়মান মূর্তির দিকে চেয়ে কবি ভাবেন এই পথে ও ঘরে মেশামেশি করে যে সহজ জীবন তিনি গড়তে চেয়েছিলেন তা হচ্ছে কই? পরিতাপের সঙ্গে তাই লিখেছেন—"যেখানে আশ্রয় নেবার ইচ্ছা থাকে সেখানে হয়ত যোগ্যতা থাকে না।"

"কীর্তি জালে ঘেরা আমি তো ভাবি—
তোমার ঘরে ছিল আমারো দাবী;
হারায়ে ফেলেছি সে ঘূর্ণিবায়ে
অনেক কাজে আর অনেক দায়ে।"

নিউইয়র্কে ইট-কাঠের স্তূপ দেখিয়ে কবি বলেছিলেন—"ও-গুলো কি? মানুষের ঘর? তবে ঈশ্বরের আলো বাতাসকে বিশ্বপ্রকৃতিকে এমন আড়াল করছ কেন, আমাদের অতবড় বাড়ির দরকার কি? আমরা তো দৈত্য নই।"

আজ এতদিন পরে মুখের কথার সাক্ষ্য কানে শোনার সাক্ষ্য উদ্ধৃত করতে পারি না, কিন্তু কাব্যের সাক্ষ্য আছে চিরস্থির। আর নানা পত্রে প্রবন্ধে আলোচনায় তাঁর বাণী শব্দহীন ভাষায় আজও ঘোষিত—যদিও তা কেউ শোনে কেউ শোনে না। আজ রবীন্দ্র-শতাব্দীর উৎসবের আয়োজনে দেশ জুড়ে যে ব্যাপার চলেছে, তাতে কবির সেই লাইন দুটির সত্যতাই প্রমাণ হচ্ছে—

"ভুলিব না ভুলিব না এই বলে চীৎকার
বিধি না শোনেন কভু বল তাহে হিত কার?"

ভোলা তো শুরু হয়েছে, শুনছি কানে বিসর্জনেরই ঢাক-ঢোল, দামামা হাতে নিয়েছেন লাখপতিরা, স্মরণোৎসবের বাঁশি বাজবে জীবনসাধনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে নয়, শেয়ারের বাজার ঘেঁষে পসার-প্রতিপত্তির হাঁকেডাকে।

যদি সত্যিই স্মরণোৎসবের রাগিণী বাজাতে হয়, তবে তাকে বাজানো চাই জীবনে। তাঁর বাক্য, তাঁর মনন ও তাঁর নির্দিষ্ট শিক্ষাকে একটু স্থান দিতে হয় জীবনের ব্যবহারে কর্মে—তা না হলে এ খেলা কেন? তাঁর নাম করে এই নিরন্ন দুর্দশাগ্রস্ত দেশের লক্ষ লক্ষ টাকার ভেলকিবাজি কেন? যদি একটি একটি করে খতিয়ে দেখা যায়—মনে হয় না স্মৃতি-সভার, বা স্মৃতি-রক্ষার কোনও জায়গাতেই তিনি আজ জীবিত থাকলে তাঁর প্রসন্ন দৃষ্টি পড়তে পারত। তবে একটা কথাও মনে রাখতেই হয় যে তিনি তো জীবিত নেই। সেইটেই যারা ভুলে যায় তারা দুঃখ পায়, নয়তো যে সব রাজনৈতিক দলের মুখপাত্র, সরকারী-বেসরকারী কর্মচারি, সরকারের পোষক পরিপোষক পরিতোষক মিলে শতাব্দী-সংঘ গঠন করেছেন, তাঁরা তাঁদের পাকা মাথায় একথা নিশ্চয় স্মরণ রেখেছেন যে রবীন্দ্রনাথ জীবিত নেই।

বড় বড় কথা ছেড়ে দিয়ে এখানে শুধু দু-একটি মাত্র বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাক। কে না জানে আজকাল কয়েকটি প্রধান নর্দমা তৈরি হয়েছে—যে সব পথ দিয়ে দরিদ্র-জনসাধারণের মধ্যবিত্ত অর্থ অনায়াসে সাধারণ থেকে অসাধারণের খাতে পৌছতে পারে—তার মধ্যে প্রধান একটি হচ্ছে সরকারী কর্মে দেশ-বিদেশ চষা, সমারোহে নানা দ্রষ্টব্য দেখে বেড়ানো। ধরুন না কেন একই কটেজ ইণ্ডাস্ট্রি দেখতে দল বেঁধে কয়েকবার জাপান ঘুরে আসা। বেতের টুকরি বোনা দেখে আসবে মন্ত্রী উপমন্ত্রী, তা নিয়ে ক্রমাগত দেশ-বিদেশে মন্ত্রণা করে বেড়াবে। সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকা বিদেশের এই সব দরকারী ভ্রমণে খরচ হবে। অথচ দেশে ওষুধ আসবে না, শিশুখাদ্যের উপর কর বসবে, এক্সরে ছবি তোলবার ফিল্ম পর্যন্ত দুর্মূল্য হয়ে যাবে। সরকারী তহবিল উৎখাত না করে ব্যক্তিগত কারণে নিতান্ত প্রয়োজনেও কেউ বিদেশে যেতে পারবে না। লৌহ-যবনিকার অনুকরণের ব্যর্থপ্রয়াসে সাধারণ মানুষের পদচারণার স্বাধীনতাও থাকবে না।

সরকারী অর্থকে অনর্থকরণের আর একটি পথ—কার্যক্রম স্থির হবার পূর্বেই আশ্রিতজনের সুব্যবস্থা করে উচ্চ-মহিমায় কর্মচারী নিয়োগ। আর তৃতীয় একটি খাত বাড়ি তৈরি—ইট সিমেণ্ট লোহা কংক্রিটের খাত বয়ে কোটি কোটি টাকা চলেছে দেশের বৈতরণীর দিকে।

বড় বড় নতুন তৈরি বাড়ির দেওয়ালে দেখেছি ফাটল। ফাটল স্বচক্ষে দেখেছি ভুবনেশ্বরের নব-নির্মিত প্রাসাদোপম গেস্টহাউসের দেওয়ালে, ফাটল দেখেছি আকাশবাণীর কলকাতার সৌন্দর্য-মূর্তিভবনের ভিতরের দেওয়ালে, সেই ফাটল ভাকরা-নাঙ্গালের দুর্গপ্রাচীর ভেদ করে দেশের মর্ম ছিন্ন-ভিন্ন করে দিল। তবু প্রাসাদ চাই। তলার পরে তলা—লোহায় গাঁথা কংক্রিটের যন্ত্রপুরী না হলে কোনও কর্মই সিদ্ধ হবে না। এমন কি যদি বাড়ি থাকে তবে তা ভেঙে ফেলে আবার নতুন করে বাড়ি খাড়া করতে হবে, তবে অন্য কাজ।

এখন রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের সমস্ত গঠনমূলক কার্যের আরম্ভে এই কটি ছিদ্রই খোলা হয়ে গেছে। সরকারী কর্মচারী দেশ-বিদেশ পরিভ্রমণ করে এসেছেন, শুনছি সেখানে কমিটী তৈরি করে এসেছেন। বলা বাহুল্য, বিদেশে রবীন্দ্রসাহিত্য প্রচারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের কোনও সন্দেহ নেই, এমন কি এ কাজ এতদিন কিছুই হয় নি বলেই আমাদের অনুতাপ। বিশ্বমানবের উদ্দেশ্যে উৎসারিত তাঁর বাণীর অমৃতে সকল মানুষের পূর্ণ অধিকার। আমাদের কর্তব্য সেই সম্পদ বিশ্বের সামনে বারবার নৈবেদ্যরূপে উপস্থিত করা। কিন্তু দু-এক-জন মানুষ গলাবন্ধ কোট পরে দেশবিদেশ চক্কর দিয়ে টোকিওতে দু রাত্রির, প্যারিসে তিন ও নিউইয়র্কে পাদস্পর্শ করে এলেই তা সফল হয়ে উঠবে না। তাতে যা খরচ তার দাম পোষায় না, অন্ততঃ এই দারিদ্র্যহত ভারতবর্ষের সে শক্তি নেই। যদি রবীন্দ্রনাথের জীবন-সাধনাকে আমরা কোনও মূল্য দিই, নিশ্চয়ই দিই, কারণ, নইলে তো জন্মোৎসবের কোনও অর্থই হয় না, তাহলে দেশে এবং বিদেশে তাঁর সেই জীবন-সম্পদের উদ্ঘাটন করাই প্রকৃত কৃত্য, জাঁকজমকের আড়ালে তাকে আবৃত করা নয়।

আমাদের বিদেশের অভিজ্ঞতা আমরা অন্যত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছি। দেখেছি পশ্চিম ইয়োরোপ তাঁকে একেবারে বিস্মৃত হয়েছে। অধ্যাপক অমিয় চক্রবর্তী আমাদের জানিয়েছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অজ্ঞতা-প্রসূত নিরুৎসাহের জন্য সেখানে রবীন্দ্র-শতাব্দী-উৎসবের কমিটীর স্ট্যাম্পের টাকা জোটাও ভার। ওই কমিটীর সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত মুখার্জীও সেই রকম কথা আমাদের লিখেছিলেন ইংলণ্ডেও আমাদের অভিজ্ঞতা অনুরূপ। আমাদের উৎসাহ ছাড়াই, এমন কি আমাদের সন্দিগ্ধ দৃষ্টির সামনে রাশিয়া আট ভল্যুম রবীন্দ্ররচনা-সংগ্রহ বাংলা থেকে সরাসারি নিজ ভাষায় অনুবাদ করেছে। কেউ কেউ বলেন এ আসলে কাব্যানুরাগ নয়—চালাকি, পলিটিক্স ইত্যাদি। তবে সেরকম চালাকি পৃথিবীর অন্য কোনও দেশ তো নয়ই, ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশও আজ পর্যন্ত করে উঠতে পারে নি। এ প্রসঙ্গে আমাদের যা করা উচিত ছিল তা হচ্ছে এই যে ওই অনুবাদগুলি যথাযথ হয়েছে কিনা, ভ্রমপূর্ণ কিনা তা মিলিয়ে দেখা। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউই সে কাজ করতে এগিয়ে এল না। যে কাজে পরিশ্রম ধৈর্য ও অনুশীলন প্রয়োজন সে কাজে কারও উৎসাহ নেই—ব্যক্তিগতভাবেও নয়, প্রতিষ্ঠানগত ভাবে তো নয়ই। বিশেষতঃ কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলি তো তার মূর্তিমান বাধা। যে রবীন্দ্রসদনের জন্য প্রথমেই বহু অর্থব্যয়ে (শুনেছি পাঁচলক্ষ টাকা) এখনই আর একটি বাড়ি তৈরি হবে, সেখানে জ্ঞানের যে অমূল্য ভাণ্ডার আছে তার দিকে দৃষ্টিপাত করবার সাধ্য স্থানীয় দু চারজন কর্মচারী ছাড়া আর কারও নেই। সেই জ্ঞানমন্দিরের দরজায় কড়া পাহারা বসে সরস্বতীকে গ্ল্যামার গার্ল সাজিয়ে রেখেছে। সেখানে রবীন্দ্র-চিন্তা-অনুশীলনকারীর কোনও স্থান হতে পারে না। রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রচার, তাঁর চিন্তার পুনঃপ্রকাশ করতে হলে তাঁর জীবনসাধনার গভীরতম সত্যগুলি উপলব্ধি করে নিতে হয়। কিন্তু সে দিকে কারও চেষ্টাই নেই। রবীন্দ্রনাথের মিশনারি কি অমনি হবে? তার জন্য দেশ-বিদেশ যাওয়া প্রয়োজন বইকি। কিন্তু সম্পদ নিয়ে যেতে হবে, শুধু ট্রাভেলার্স চেকবই নয়।

কেবল একটিমাত্র কাজে এদেশের মনীষীবৃন্দ পরিশ্রম করতে উৎসাহ পান—বাড়ি তৈরি করা। নিশ্চয়ই এর কোন গভীর সদুদ্দেশ্য আছে যা আমরা জানি না, তবে আমরা এও জানি না যে বাড়ি কি করে রবীন্দ্রোৎসবের প্রধান ব্যয়ের ছিদ্র হল। বস্তু কি করে ভাবের চেয়ে বড় হল—অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথকে উপলক্ষ করে? শুনেছি কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়িও তের লক্ষ টাকায় কেনা হবে। অপব্যয়ের তো কতই সুন্দর সুন্দর ব্যবস্থা আছে, ছোটখাট এটা-ওটা থেকে দণ্ডকারণ্য পর্যন্ত। আবার রবীন্দ্রনাথের নাম করে কেন—যাতে রূঢ়তম রসনাও সসম্ভ্রমে চুপ করে থাকে। জাতীয় উৎসবের এই কি আকৃতি যাতে ক্ষুদ্রতম অধিকারও উচ্চতম স্বরে পাউণ্ড অফ ফ্লেশ দাবি করবে? যার কাছে যেটুকু সম্পত্তি আছে তারই জন্য নীলামের ডাক চড়তে থাকবে। দুঃখের কথা এই যে আজ সমাজের কোন স্তরের কোন ব্যক্তিই সরকারী টাকাকে সাধারণের সম্পত্তি বলে মনে করে না—সরকারী তহবিল থেকে যা আদায় করে নেওয়া যায় তা নিংড়ে নিতে স্ট্রাইকওলা

বিধাতার দাক্ষিণ্য, কবির স্মরণলিপি

হরপ্রসাদ মিত্র

'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র প্রথম খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের লেখা যে "অবতরণিকা"টি ছাপা হয়েছে, সেটি পড়তে গেলে প্রতিবারই মনের মধ্যে গভীর উপলব্ধির ধাক্কা লাগে। নিজের জীবনব্যাপী সাহিত্য-চর্চার কথা মাত্র কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যে প্রকাশ করতে গিয়ে, সে-প্রবন্ধে তিনি নিজের জীবনকে দেখেছিলেন সামগ্রিকভাবে—তাঁর নিজের কথায়—'সমগ্রলক্ষ্যবদ্ধভাবে'। এই বিশেষ দৃষ্টি আর বিশেষ অনুভূতির সঙ্গে তাঁর 'রোগশয্যা' এবং 'আরোগ্য' বই-দুখানির বক্তব্যের মিল আছে।

মূলে 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র এই "অবতরণিকা"-টি ছিল তাঁর সপ্ততিতম জয়ন্তী উপলক্ষে ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনার উত্তরে তাঁর প্রতিভাষণ। তাতে তিনি অন্যান্য কথার মধ্যে এই কথাটি বিশেষ জোরের সঙ্গে ব্যক্ত করেছিলেন যে, তিনি কখনোই 'জীর্ণ জগতে' জন্মগ্রহণ করেন নি! রবীন্দ্রনাথের জন্ম-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি-পর্বে আজ সে কথা প্রণিধানযোগ্য। সত্তর বছর বয়সে প্রৌঢ় কবি লিখেছিলেন, "আশা করি, যাঁরা আমাকে জানবার কিছু মাত্র চেষ্টা করেছেন এতদিনে অন্তত তাঁরা একথা জেনেছেন যে আমি জীর্ণ জগতে জন্মগ্রহণ করিনি। আমি চোখ মেলে যা দেখলুম চোখ আমার কখনো তাতে ক্লান্ত হল না। বিস্ময়ের অন্ত পাইনি। চরাচরকে বেষ্টন করে অনাদি কালের যে অনাহত বাণী অনন্তকালের অভিমুখে ধ্বনিত তাকে আমার মন প্রাণ সাড়া দিয়েছে, মনে হয়েছে যুগে যুগে এই বিশ্ববাণী শুনে এলুম।"

থেকে শুরু করে সংস্কৃতিওলা পর্যন্ত কারও দ্বিধা নেই। এ বিষয়ে দক্ষিণ ও বামের সমভাব। সংশয় আসে আজ এদেশের শিক্ষিত সমাজ মনে করে বসে আছেন যে রবীন্দ্র শতবার্ষিকীও একটা 'প্রজেক্ট', একটা 'প্ল্যান'—যা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিষ্পন্ন হয়ে দেশের ভাগ্য উতরে দেবে! নইলে জাতীয় উৎসবের এই কি রূপ? ব্যবসায়ীর মুনাফার উচ্ছিষ্টভাগী হবার জন্য তাঁদের পরিচালনার কেন্দ্রে স্থান দিতে হবে, সরকারী তাঁবেদারীতে এই সংগঠনমূলক মহোৎসব পরিচালিত হবে। সংগঠনটা করবে কে? টাকা থাকলে বা টাকা দিলেই কি এসব কাজের অধিকারী হওয়া যায়? রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশ্রম গঠনের জন্য ধনী রাজা-মহারাজার দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি পেতেছিলেন, তাই বলে ক্ষিতিমোহন সেন বা বিধুশেখর শাস্ত্রীর মাথার উপর ছড়ি ঘোরাতে কোনও রাজা-মহারাজা আসতে পারেন নি। অর্থবান বিত্তবানেরা দেশের সৎকর্মে অর্থদান করবেন নিশ্চয়ই, কিন্তু তাঁরাই যদি সেজন্য কর্মচালনারও ভার নেন তা হলে সে সৎকর্মের আকৃতি-প্রকৃতি কোন্‌দিকে যাবে তা বলা বাহুল্য। সব কাজেরই অধিকারীভেদ আছে।

দেশের সাহিত্যিক, চিন্তাশীল, শিল্পী, সমাজকর্মী-বিশেষে যাঁরা রবীন্দ্র-চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত এমন বহু মানুষের সচেষ্ট সকর্মক উৎসাহ ব্যতীত রবীন্দ্র-শতাব্দী-উৎসব একটি জাতীয় উৎসবের প্যারডি হয়ে দাঁড়াবে। বিশেষ করে আমরা আশা করেছিলাম উৎসাহী তরুণেরাই এ কাজে এগিয়ে আসবেন, হাল ধরবেন। যে কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম সেই কথা দিয়ে শেষ করি। রবীন্দ্র-চিন্তাধারার সঙ্গে আত্মিক অপরিচয় বা তার প্রতি গূঢ় মূল অবিশ্বাস থাকলে বা স্বার্থসাধনের মাহিনা অর্জনের উপায়রূপে এ কাজ কখনও সার্থক হতে পারে না। কজন লোক আজ দেশে রবীন্দ্রসাহিত্য অনুশীলনের উৎসাহ পাচ্ছে? কজন লোক চেষ্টা করছে তাঁর চিন্তাধারার প্রাণদায়িনী রস দেশে দেশে নতুন করে পৌঁছে দিতে? এমন কি জন্মদিবসকে জাতীয় উৎসবের দিনরূপে ছুটি দিতেও এখনও সকলে একমত হতে পারে নি। কিন্তু সৌধ গঠনের দিকেই ঝোঁকটা পড়েছে প্রবল হয়ে। যে সৌধ সাজানো থাকবে রূপকথার রাজ্য হয়ে, ভবিষ্যৎ বংশের বিভ্রম ঘটিয়ে। তাদের দেখিয়ে বেড়াবে শৌখিন সজ্জাঘর—দিল্লীর প্রাসাদে যেমন সাজাহানের স্নানের ঘর দেখানো হয়। আশ্রমবাসী কে না জানে যে রবীন্দ্রনাথের সম্রাটোচিত আকৃতি, রাজবৎ উন্নতধ্বনি ও রাজকীয় ভঙ্গীর মধ্যে অতি সরল সাধারণ বিলাসশূন্য জীবন নির্মল আনন্দে পূর্ণ ছিল। যে আশ্রমে সানন্দে তিনি মাটির ঘরে বাস করেছেন সে আশ্রমে কোন প্রাসাদ তাঁর যথার্থ স্মৃতি বহন করতে পারবে না, শুধু তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে।

আমরা ভারতবাসী চিরকাল প্রতীকে বিশ্বাসী। আমাদের জীবনে যুগ যুগ ধরে বড় বড় সত্য জীবন থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পুতুল হয়ে ওঠে। আবার সেই ফেটিশ তৈরি করি না কেন! রবীন্দ্রনাথ কি বলেছিলেন তার প্রতীকই তৈরি করি এবং আমরা—তাঁর ভক্তরা সেখানে শঙ্খঘণ্টা বাজিয়ে দেশের ঐতিহ্য রক্ষা করি।

নিজের লেখার প্রাচুর্য সম্বন্ধে উল্লেখ করে তিনি জানিয়েছিলেন, "আমার লেখার মধ্যে বাহুল্য এবং বর্জনীয় জিনিস ভূরি ভূরি আছে তাতে সন্দেহ নেই। এ সমস্ত আবর্জনা বাদ দিয়ে বাকি যা থাকে আশা করি তার মধ্যে এই ঘোষণাটি স্পষ্ট যে, আমি ভালোবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেছি মহৎকে, আমি কামনা করেছি মুক্তিকে, যে মুক্তি পরম পুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে, আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য সেই মহামানবের মধ্যে যিনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।"

সর্বদেশ, সর্বজাতি এবং সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে যে 'নরদেবতা'র অধিষ্ঠান, সেই বিরাটের সামনে তাঁর আত্মশোধনের নিরন্তর সাধনাকেই তিনি তাঁর কবি-জীবনের পরমার্থ বলে জানিয়ে গেছেন।

সত্যিকার বড় কবির যথার্থ পরিচয় কী, সে-বিষয়ে এই লেখাটির মধ্যেই তিনি জানিয়েছিলেন, "সেই কবিকেই মানুষ বড় বলে, যে এমন সকল বিষয়ে মানুষের চিত্তকে আশ্লিষ্ট করেছে যার মধ্যে নিত্যতা আছে, মহিমা আছে, মুক্তি আছে, যা ব্যাপক এবং গভীর।" এবং নিজের সাধনা সম্বন্ধে পুনরপি তিনি লিখেছিলেন, "প্রতিদিন উষাকালে অন্ধকার রাত্রির প্রান্তে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছি এই কথাটি উপলব্ধি করবার জন্যে যে, যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি। আমি সেই বিরাট সত্তাকে আমার অনুভবে স্পর্শ করতে চেয়েছি যিনি সকল সত্তার আত্মীয়-সম্বন্ধের ঐক্যতত্ত্ব, যাঁর খুশিতেই নিরন্তর অসংখ্যরূপের প্রকাশে বিচিত্রভাবে আমার প্রাণ খুশি হয়ে উঠছে···।"

'রোগশয্যা' ১৩৪৭ সালের পৌষ মাসে, এবং 'আরোগ্য' সেই বছরেরই ফাল্গুনে প্রথম ছাপা হয়। ১৯৪০ সনের ১৯শে সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে কালিম্পঙ যাত্রা করেন। সেখানে ২৬শে সেপ্টেম্বর তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ২৯শে তাঁকে অচেতন অবস্থায় কলকাতায় আনা হয়।

এ-সব খবর 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র পঞ্চবিংশ খণ্ডের 'গ্রন্থপরিচয়' থেকেই পাওয়া যাবে। অন্যান্য রবীন্দ্র-আলোচনার মধ্যেও তাঁর জীবনের শেষ পর্বের এই প্রায়-অন্তিম ঘটনাগুলির উল্লেখ আছে। তাঁর সত্তর-সমাপ্তির প্রতিভাষণের মধ্যে নিজের সাধনা সম্বন্ধে তিনি যেসব উপলব্ধির উল্লেখ করেছিলেন, সেই সূত্রেই 'আরোগ্য' বইখানির ২৯-সংখ্যক কবিতার কটি লাইন এখানে মনে এল :

"জীবনের বিধাতার যে দাক্ষিণ্য পেয়েছি জীবনে
তাহারি স্মরণলিপি রাখিলাম সকৃতজ্ঞ মনে।"

১৯৪১ সনে ২৮শে জানুয়ারি বিকেলে তিনি এটি লিখেছিলেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যে-জগতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে-জগৎ যে জীর্ণ হয়ে যায় নি, সে-কথা তিনি সত্তর সমাপ্তিতেই বলেছিলেন। এখানে 'বিধাতার দাক্ষিণ্য' কথাটির মধ্যে তারই স্বীকৃতি দেখা গেল পুনর্বার। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য যে সেই দাক্ষিণ্যের স্মরণলিপি, তাতেই বা সন্দেহের অবকাশ কোথায়? 'রোগশয্যা'র ২৯-সংখ্যক কবিতায় তিনি মানব-জীবনের দুঃখ-ভাগ্যের কথা-প্রসঙ্গে লিখেছিলেন :

"এ কথা যখন জানি,
মানবচিত্তের সাধনায়
গূঢ় আছে যে সত্যের রূপ
সেই সত্য সুখ দুঃখ সবের অতীত,
তখন বুঝিতে পারি,
আপন আত্মায় যারা
ফলবান করে তারে
তারাই চরম লক্ষ্য মানবসৃষ্টির···।"

নিজের কীর্তি সম্বন্ধে আগেকার সেই গদ্য-নিবন্ধের মধ্যে তিনি যেমন বারবার মূল্যায়নের তাগিদ বোধ করেছিলেন, 'রোগশয্যা'র কয়েকটি লেখার মধ্যে প্রায় একই সুরে একই মর্জিতে তিনি অনুরূপ কথাই বলে গেছেন। ২৬-সংখ্যক কবিতাটি এ দিক থেকে স্মরণীয়। তার প্রথম দিকে তিনি বলেছিলেন :

"আমার কীর্তিরে আমি করি না বিশ্বাস।
জানি, কালসিন্ধু তারে
নিয়ত তরঙ্গঘাতে
দিনে দিনে দিবে লুপ্ত করি।
আমার বিশ্বাস আপনারে।"

অর্থাৎ নিজের কীর্তির চেয়ে সত্তাকে তিনি বৃহত্তর, ব্যাপকতর এবং অধিক নির্ভরযোগ্য বলে মেনেছিলেন। রচনার মধ্যে যদিই বা কখনও সাময়িক সংকীর্ণ জীবন-পরিবেশের কলঙ্ক বর্তে থাকে, তাঁর সত্তার মধ্যে কখনোই সে-রকম মালিন্য ঘেঁষতে দেন নি তিনি—এই ছিল রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য। এই কবিতার শেষ চার লাইনে সে-কথা আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছিল :

"এ বিশ্বেরে ভালবাসিয়াছি
এ ভালবাসাই সত্য, এ জন্মের দান।
বিদায় নেবার কালে
এ সত্য অম্লান হয়ে মৃত্যুরে করিবে অস্বীকার।"

১৯৪০ সনের ২৮শে নভেম্বর শান্তিনিকেতনের "উদয়নে" তাঁর এই আত্মকথা লেখা হয়।

তাঁর শেষ পর্বের এই প্রত্যয়ের সঙ্গে ১২৯১ সালের 'ভারতী'তে প্রকাশিত তাঁর একটি প্রবন্ধের বক্তব্য বিস্ময়জনক সংগতির সূত্রে জড়িত। সে লেখাটির নাম "একটি পুরাতন কথা"। বৃহতের উপলব্ধি তাঁর কাছে কেন যে সমাদরণীয় বলে বোধ হয়েছিল, তারই ব্যাখ্যা ছিল সেই লেখাটিতে। মানুষের সংসারে কৃতী প্র্যাকটিকাল মানুষই সাধারণতঃ বেশী সমাদর পেয়ে থাকেন। যাঁরা অন্যপন্থী, তাঁদের প্রত্যয় সাধনা ব্যাকুলতা ইত্যাদি ব্যাপার এই প্র্যাকটিকাল-শ্রেণীর কাছে ঠিক বোধগম্য হয় না। তাঁর নিজের কথায়—"যাহারা বলে সত্য কথা বলিতেই হইবে তাহারা sentimental লোক, কেতাব পড়িয়া তাহারা বিগড়াইয়া গিয়াছে, আর যাহারা আবশ্যকমত দুই একটা মিথ্যা কথা বলে ও সেই সামান্য উপায়ে সহজে কার্যসাধন করিয়া লয় তাহারা practical লোক।" এইভাবে শ্রেণী-বিভাগটি দেখিয়ে দিয়ে তিনি বলেছিলেন যে, প্র্যাকটিকাল লোক আর প্রেমিক লোক এক নয়। প্র্যাকটিকাল লোকের স্বরূপ সম্বন্ধে আরও একটু ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন, "সে অতি সাবধান সহকারে হাতটি মাত্র বাড়াইয়া ফল পাইতে চায়—কিন্তু ইহারা প্রায়ই বেঁটে লোক হয়—সুতরাং 'প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ' হইয়া পড়ে।"

রবীন্দ্রনাথের ঋজু উন্নত শরীরের দীপ্তি এইসব উক্তির মধ্য দিয়ে হঠাৎ মনের পটে ঝিলিক দিয়ে যায়। তিনি সেই পুরাতন কথাই সে প্রবন্ধে বিশেষভাবে জানিয়েছিলেন যে—"বিশ্বাসহীনেরাই সাবধানী হয়, সঙ্কুচিত হয়, বিজ্ঞ হয়, আর বিশ্বাসীরাই সাহসিক হয়, উদার হয়, উৎসাহী হয়।" সেই সুদূর নবযৌবনকালেই তিনি লিখেছিলেন, "মানুষের প্রধান বল আধ্যাত্মিক বল। মানুষের প্রধান মনুষ্যত্ব আধ্যাত্মিকতা।" এই আধ্যাত্মিকতার স্বরূপ কী, সে প্রশ্নেরও জবাব দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর কবিতায় 'বিধাতার দাক্ষিণ্য' সম্বন্ধে যে মন্তব্যটি বারবার দেখা দিয়েছিল, সেই সূত্রে আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে তাঁর সে-মন্তব্যও স্মরণীয়। তিনি বলেছিলেন, "শারীরিকতা বা মানসিকতা দেশ কাল পাত্র আশ্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা অনন্তকে আশ্রয় করিয়া থাকে। অনন্ত দেশ ও অনন্ত কালের সহিত আমাদের যে যোগ আছে, আমরা যে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র নহি, ইহাই অনুভব করা আধ্যাত্মিকতার একটি লক্ষণ।" এই কারণেই প্রবৃত্তির চেয়ে বিবেককে তিনি বেশী সমাদরযোগ্য বলে মেনেছিলেন, আত্মহিতের চেয়ে লোকহিতকে। 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র সেই "অবতরণিকা"-র মধ্যে তিনি তাঁর আবির্ভাবকালের মানব-জগৎকে জীর্ণতার অধিকারভুক্ত বলে মানেন নি; "একটি পুরাতন কথা"তে তিনি তাঁর শেষ বয়সের সেই মন্তব্যই অন্যভাবে বলেছিলেন, "আমাদের জাতি নূতন হাঁটিতে শিখিতেছে, এ সময়ে বৃদ্ধ জাতির দৃষ্টান্ত দেখিয়া ভাবের প্রতি ইহার অবিশ্বাস জন্মাইয়া দেওয়া কোন মতেই কর্তব্য বোধ হয় না।"

তাঁর এই ভাবুকতা এবং আধ্যাত্মিকতা রাতারাতি বুঝে ফেলবার জিনিস নয়। খ্যাতি-অখ্যাতির নিক্তি ধরে এ তত্ত্বের মূল্যায়নও সম্ভব নয়। প্রীতি, ভালবাসা, বিশ্বাস বা শান্ত উপলব্ধি সারা জীবনের সত্যনিষ্ঠার গুণেই মানুষের অধিকারে ধরা দেয়। 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে'র প্রসঙ্গে ১৯৩৬ সনে তাঁর বন্ধু চারুচন্দ্র দত্তের কাছে লেখা একখানি চিঠিতে তিনি সেই কথাই আর একভাবে বলেছিলেন, "নিন্দানৈপুণ্যের প্রাগর্ভ ও চাতুর্যকে আমি সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি। ভালো লাগবার শক্তিই বিধাতার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার মানবজীবনে। সাহিত্যে কুৎসাবিলাসীদের ভোজের দাদন আমি নিইনি, আর কিছু না হ'ক, এই পরিচয়টুকু আমি রেখে যেতে চাই।"

বলাকা-প্রসঙ্গে কবিগুরুর গান

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

কবিগুরুর 'বলাকা'-কাব্যের জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখেও সত্যকার আনন্দ আমি অনুভব করি নে এই কারণে যে, এ কাব্যের তত্ত্বসৌন্দর্য ও গীতিরস সম্বন্ধে আমরা আজও তেমন সচেতন হতে পারি নি অথবা চাই নি। 'বলাকা'-রচনার পূর্বে কবি 'গীতাঞ্জলি' ও 'গীতিমাল্য' এবং প্রায় সমসময়েই 'গীতালি'—এই তিনখানি বিখ্যাত গীতিগ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। পণ্ডিতদের ধারণা—গানের যুগে কবি ছিলেন ব্রহ্মসাধনার তুরীয় মার্গে, এবং 'বলাকা'র যুগে নেমেছিলেন ধূলিলিপ্ত ধরণীর শতবন্ধন-ঘেরা সংসারজীবনে। পণ্ডিতেরা লক্ষ্য করেছেন, গীতির সঙ্গে গতিকাব্যের এতই গভীর পার্থক্য যে, গীতিকারই যে গতির কাব্য রচনা করেছেন—সে বিষয়ে সন্দেহ জাগে। মনে হয়—গীতির কবি যদি দক্ষিণে যান, গতির কবি তবে উত্তরে চলেন অমিত আনন্দে। অর্থাৎ ভাবটা এই—গীতিভাবই যদি রবীন্দ্রনাথের স্বভাবসত্তা, গতিভাবাপন্ন 'বলাকা'-কাব্য তবে তাঁর জীবনে নিতান্তই "আকস্মিক"। অথবা গতিরাগই যদি তাঁর স্বভাবসত্য, তবে 'গীতাঞ্জলি' তাঁর প্রতিভাধারার স্বাভাবিক "শাখা" নয়, "উপশাখা" মাত্র।

আসলে রবীন্দ্রনাথের গানের তত্ত্বে এবং গতির চেতনায় যে মৌল পার্থক্য আদৌ নেই, বরং তাঁর গীতিজীবনই যে গতিজীবনের উদ্‌গাতা—এ-সত্য আমাদের মধ্যে অনেকেই অনুধাবন করি নি।·· 'বলাকা'-কাব্যকে ইউরোপীয় রাজনীতি ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখতে গিয়ে মনগড়া একটা অপব্যাখ্যাই আমরা খাড়া করেছি। আমাদের মধ্যে অনেকেরই মনে হয়েছে, 'বলাকা'র যুগে ইউরোপ থেকে ফিরে ভারতীয় জীবনতত্ত্বে কবির বিশ্বাস তেমন আর ছিল না। গানের জীবনে তিনি যে অধ্যাত্ম তত্ত্বমাহাত্ম্যে আস্থা স্থাপন করেছিলেন, 'বলাকা'র যুগে তা নাকি একেবারে শিথিল হয়ে গিয়েছিল। সত্য শিব ও সুন্দরের কল্পনায় পূর্বের মত তিনি তেমন রোমাঞ্চ আর অনুভব করছিলেন না। অধ্যাত্মমহিমায় বিশ্বাস হারিয়ে যাওয়ার ফলে কবি নাকি বস্তুতান্ত্রিক যুক্তিবিশ্বে যুগ-ভাবনার প্রচারক হওয়াটাকেই শ্রেয় মনে করেছিলেন!

এইসব মনগড়া কথায় ও ব্যাখ্যায় 'বলাকা'র জীবনতত্ত্ব স্বচ্ছ হবে কি—আচ্ছন্নই হয়েছিল। 'বলাকা'-কাব্যের দু-একটি কবিতায় সাম্প্রতিক জীবনের বিপ্লবেচ্ছার ধ্বনি থাকলেও মূলতঃ এবং মর্মতঃ তা যে অন্তর্মুখী মহাজীবনের অভিমুখে প্রেমের সাধনায় গতিধর্মী, এবং এই কারণে গানের মতই এ কাব্য অধিজীবনের আনন্দঘন রসকাব্য—এ তথ্য আজ নতুন করে চিন্তা করার ও বিশ্লেষ করার প্রয়োজন আছে কি না—নবীন রসিকেরা ভেবে দেখবেন।

'বলাকা'-কাব্য পড়ে আমার তো মনে হয়েছে—এ কাব্য 'গীতাঞ্জলি'-'গীতিমাল্যে'র যেমন শিল্প-পরিণতি, 'পলাতকা'-'পূরবী'র তেমনি ভাব-ভূমিকা।

অহং-বিকার থেকে উত্থিত হয়ে আত্মার আনন্দপথে যে বাসনা আত্মগত সুরের ভাষায় 'গানে' প্রমুদিত হয়েছে, 'বলাকা'য় সেই দিব্য বাসনাই যৌবনদীপ্ত রসশিল্পের বাণী-বিন্যাসে হয়েছে উদ্বেজিত। আজ আছি, কাল নেই এমন যে আমি—তার কথা গীতিমূর্ছনাতে তো নেই-ই, গতিকাব্যেও নেই। 'আপনারে শুধু' ঘিরে ঘিরে 'পলে পলে' যে-আমি 'ঘুরে' মরছি, সেই তুচ্ছ আমি নয়, 'মৃত্যুসাগর মথন করে অমৃতরস' আহরণ করার ব্যগ্র সাধনায় যে-আমি নিত্যগতি—সেই উচ্চ আমির রূপস্বপ্ন রবীন্দ্রগীতিতে যেমন সুরশোভন, কবীন্দ্রগতিতে তেমনি শিল্পসুন্দর।

ব্যক্তি হিসাবে আজ আছি, সাম্প্রতিক নতুন রূপে আছি, কাল থাকব না, চলে যাব। ফুরিয়ে যাব। কিন্তু কবির বিশ্বাস: আমির মধ্যে যে-বিশ্বশক্তি চিরন্তন নবীন শক্তি, তা কোনকালে ফুরোবার নয়। জীবনে জীবনে দান দিতে দিতে প্রাণ হতে প্রাণে, গান হতে

গানে তা চলবে। সৃষ্টি যতদিন থাকবে, এ চলাও সুখে-দুঃখে উত্থানে-পতনে আশায়-নৈরাশ্যে অব্যাহত থাকবে ততদিন। 'জীবনে যত পূজা সারা' হল না, 'হারা' হবে না তাও। নতুন ঝরলেও নবীনে ভরবে পৃথিবী, এইজন্যে 'যে-ফুল না ফুটিতে' ঝরে গেল, তাও নবীন রসে জাগবে নবরূপে, গন্ধদানের আনন্দ বিলিয়ে সার্থক করবে ইহজীবন। জীবনে ক্ষয় আছে, ক্ষতি আছে—তবু 'মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত' সন্ধানের পিপাসা থাকবে: নবীনের নিত্যযাত্রা বাধাবন্ধহীন থাকবে চিরকাল।... অতএব নূতনের, সাম্প্রতিকের, অহংকারে আত্মবিক্রয় না করে নবীনের কিনা চিরন্তনের সাধনায় যদি জাগি, প্রাণ হতে প্রাণে যাব, জাগাব সাড়া। গান হতে গানে যাব, একেবারে ভেতর থেকে দেব নাড়িয়ে। জীবনের জড়ত্ব-মোচনে আমি নবীনসত্তা, মৃত্যুর সাধনায় আমি মৃত্যুহীন।

'বলাকা'-কাব্যে ভাবে ও আনন্দে মৃত্যুহীন এই নবীনতত্ত্ব—বলতে পারেন প্রেমতত্ত্বও। এ তত্ত্ব পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে হলে রবীন্দ্রনাথের মানসমৌনে, তাঁর ধ্যানের মহিমায় প্রবেশ করতে হয়। গানের মধ্যে অধ্যাত্ম-জীবনের যে স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পেয়েছে তা জানতে হয়। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, বিশেষ কোন দর্শনশাখার গতানুগতিক অনুস্মৃতি রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতায় নেই। স্বর্গীয় অজিতকুমার তাঁর 'কাব্য পরিক্রমা' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। ঔপনিষদ ঋষিদের জ্ঞানদর্শন ও বৈষ্ণবদের রসসাধনা রবীন্দ্রমনোজীবনকে প্রভাবিত করেছে সত্য, কিন্তু জীবনের চলতিপথে বিশেষ কোন ধর্ম বা দর্শন নৈষ্ঠিকভাবে তিনি কখনো পালন করতে যান নি। স্বভাবকে স্বভাবের দ্বারাই তিনি উত্তীর্ণ হতে চেয়েছেন, অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান এবং প্রতিভাদীপ্ত রসবোধের আনন্দে উত্তীর্ণও হয়েছেন, ফলে তাঁর ধ্যানে সহজজীবনের এমন একটি লীলাসৌন্দর্য প্রমুদিত হয়েছে যা ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন-তত্ত্বের জীবনানুগ এক নতুন ব্যাখ্যারূপে পেয়েছে প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের ধর্ম জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো তত্ত্ববিষয় নয় এবং ঠিক কথা বলতে গেলে, ধর্ম এবং জীবন রবীন্দ্রনাথের কাছে এক এবং অদ্বয় তত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথের ধর্ম হচ্ছে শ্রেয়োবোধের আনন্দ আর জীবনও হচ্ছে অহং থেকে আত্মানন্দে দিব্যগতি। ধর্ম ধরে আছে গোটা জীবনটাকেই—এই জন্যে জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামকামনা, প্রেমবৈরাগ্য প্রভৃতি সকলবিধ ভাবানুভাব ও অনুভূতি ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে সর্বজীবনগত ধর্মের শ্রেয়স্বরূপেই গতি নিতে চাইছে—নেওয়ার ব্যাকুলতা প্রকাশ করছে। ব্যাকুলতা যত বাড়ছে—অধিজীবন ততই প্রস্তুত হয়ে উঠছে বৃহতের অভিসারে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ও গানে অধিজীবনের প্রস্তুতি, গতি ও পরিণতি বিচিত্র শিল্পলীলার সৌন্দর্যে চলচ্চিত্রের মতই আজ উদ্ভাসিত। বস্তুবিশ্ব বা বিষয়কে এড়িয়ে নয়, পেরিয়ে চলার স্বভাবতত্ত্বটি জীবন দিয়েই তিনি উপলব্ধি করেছেন। তাঁর অধ্যাত্মতত্ত্ব বা ধর্মতত্ত্ব অন্তর্জীবনের জড়ত্বমোচনের নবীনতত্ত্ব, জীবনকে নিত্যনতুন রাগে রঞ্জিত রাখার যৌবনতত্ত্ব—সোজাকথায় জীবনের গতিতত্ত্ব।

অহং-মোহে, বাহুল্য হলেও পুনর্বার বলা প্রয়োজন যে, জীবন বেশিক্ষণ নতুন থাকে না; যা পেয়ে আছে তা ছাড়তে পারে না বলে বাড়তে পারে না। জীবন দিয়েই কবি এ তত্ত্ব বুঝলেন। বৃহতে গতির বাসনা জীবন থেকেই সহজচেতনার বেদনায় সমুৎসারিত হল। যখন হল, 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' হল শুরু। গতিময় নবীন জীবনই তাঁর পক্ষে তখন সত্য হল, স্বাভাবিক হল। সাধারণের পক্ষে যেটি সাধন-জীবন, তাঁর পক্ষে সেটিই হল সহজ-জীবনের আনন্দ। এই আনন্দই রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও গানের ব্যঞ্জনা।

রবীন্দ্রনাথের সকল কাব্যেই—স্পষ্টতঃ 'বলাকা'য়, নিত্য গতির অর্থাৎ নিত্য নবীন হওয়ার আনন্দ। এই আনন্দের সুরময় সহজ রূপটি গানের যুগেই কবি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করেছেন। গানের যুগ বলতে আমি 'খেয়া-গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-'গীতালি'র যুগকেই নির্দেশ করছি। 'খেয়া'-কে গীতিগ্রন্থ বলতে আপনার আপত্তি হতে পারে। আঙ্গিক-

বিচারে এখানি কাব্যগ্রন্থই বটে, কিন্তু উপলব্ধির আনন্দে ও রসের ব্যঞ্জনায় তা গানের মতই নিঃসঙ্গ মনের মৌন-মূর্ছনায় সমাহিত। 'ঘুমের দেশে'র স্বপ্নময় সুরকুঞ্জের সন্ধান 'খেয়া'-কাব্যে কবি পেয়েছেন। এর আগেও যে কবি সুর ধরেন নি, গান লেখেন নি—তা বলিনে, কিন্তু সেগুলি হয় মানবিক প্রেমের মোহৌজ্জ্বল্যে সাধারণ, কিংবা গতানুগতিক বাগ্‌বিন্যাসে চিরাচরিত, নয় প্রচলিত ধর্মতত্ত্বের বিধি-বিধানের ভারে অবনত। ঘুমের দেশের স্বপ্নসুরে আকাশচারী হওয়ার নবীনবেগ সেগুলিতে ছিল না বললেই ঠিক কথা বলা হয়।

'খেয়া'-কাব্যে অন্তর্গূঢ় গোপনজীবনের অরূপ সৌন্দর্য কবি আবিষ্কার করলেন। মোহ-বাসনায় ঘুমিয়ে পড়ে 'নিরুদ্যম' হলে তবেই প্রেমবাসনা যে স্ফূর্তি পাবে, জীবনের ভূমিকায় গুহাহিত যত অনাবিষ্কৃত রহস্যরশ্মি হবে উদ্‌ঘাটিত, 'আকাশ'-বাণীর তত্ত্ব হবে স্পষ্ট, আকাশের আলোককে 'মাটি'তে এনে পৃথিবীকে স্বর্গ করা হবে সম্ভব, এ উপলব্ধি 'খেয়া'-কবিতায় ছন্দে ছন্দে হল অভিনন্দিত।

এ-উপলব্ধি কেমন করে—কোন্ সাধনায় সম্ভব হল, 'গীতাঞ্জলি'র একাধিক গানে তা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। বলা হয়েছে, ব্যক্তি-আমিটাকে যখন প্রবলবেগে প্রকাশ করতে, জাহির করতে চেয়েছি, 'নিজেরে কেবলি' 'অপমানই' তখন করেছি। 'আমি'-কে তাই ত্যাগ করতে হয় বৃহৎ জীবনের সাধনায়। 'আমাকে আড়াল' করে, আমার 'ছোটো আমি'টাকে আড়াল করে বড় আমিটি যেই প্রকাশ পায় আমার কর্মে ও ধর্মচর্যায়, জীবন তখন শ্রেয়কে, প্রেয়কে জানে।

প্রেমের জন্যে অহং-ত্যাগের মন্ত্র 'গীতাঞ্জলি'তে নিশ্চয়ই শুনেছেন। মলিন বস্ত্রের মত এই 'মলিন অহংকার' ছাড়ার বাণী নিশ্চয়ই আপনার মনে পড়ছে। মনে পড়ছে কবির উপদেশ: স্নান করে নবীন হয়ে 'প্রেমের বসন' করতে হবে পরিধান। তা না হলে জীবন ব্যর্থ। বস্তুসম্পদে 'ভরা গৃহ'-ও হবে শূন্য।…

বস্তুবাসনায় বিহ্বল হয়ে প্রাণপণে আমরা কত কী চাই। প্রাকৃত জীবনে সব সময় বাসনা যে পূর্ণ হয় না, বঞ্চিত যে হতে হয়, তাতে দুঃখ করার কিছু নেই, কেন না তাতে পরিণামে মঙ্গলই হয়, অশান্ত চিত্ত ক্রমশ সংযমকে জানে, শমদম ও ধৈর্যের মাহাত্ম্য বোঝে। ফলে অন্তর্জীবনের বিকাশ ঘটে। তখন বোঝা যায় ব্যক্তিইচ্ছার প্রাবল্যকে অর্থাৎ মোহবাসনার আতিশয্যকে, সংযত করতে পারলেই বিশ্বইচ্ছার আনন্দোপলব্ধি সম্ভব।…বিশ্বইচ্ছার আনন্দই প্রেম। প্রেম হলেই আত্মপর সকলে সমান। তখন 'জীবনে মরণে নিখিল ভুবনে' যেখানেই থাকি না কেন, নিঃশঙ্কচিত্তে অনুভব করি তাঁর মহিমা, যিনি 'দূরকে নিকট' করেন, 'পরকে' করেন আপন 'ভাই'।

প্রেমে বিশ্বাসই আত্মশক্তি। ইহজীবনে দুঃখ আছে, দারিদ্র্য আছে, দৈন্য আছে, বিপদ-আপদ আছে, অজস্র সহস্রবিধ সমস্যাও আছে, কিন্তু আত্মশক্তিতে যখন প্রতিষ্ঠিত থাকি, তখন 'দুখের রাতে নিখিল ধরা বঞ্চনা' করলেও ভেঙে পড়ি না, অনন্ত দুঃখের বোঝা স্কন্ধে তুলেই গন্তব্যপথে চলি এগিয়ে। যুক্ত হতে চলি 'সবার সঙ্গে'—প্রেমের 'শান্ত ছন্দ' সঞ্চার করি 'সকল কর্মে'।

'গীতাঞ্জলি'র গানে জীবনসাধনার এই তত্ত্ব। এই তত্ত্বই কবিকে আত্মপ্রস্তুতির পথে এনেছে, গতিপথে টেনেছে, পরিণতির পথে গেছে নিয়ে। 'প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে' কবির 'চেতনা কল্যাণ-রস-সরসে' শতদলের মত 'পরম হরষে' হয়েছে প্রস্ফুটিত। ছোট 'আমির আবরণ' গেছে সরে।

তখন মোহমুক্ত প্রেমের দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবনের স্বরূপ হয়েছে উন্মোচিত। প্রকৃতির বিচিত্র রূপে, সমাজের সর্ববিধ কর্মে, হৃদয়ের সর্ববিধ ভাবানুভাবে, সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক 'সব কর্মে' এমন কি 'কর্মের অবসানেও' ভূমার আনন্দ হয়েছে প্রত্যক্ষ। তখন নতুন বেগে নবতর বেদনা উঠেছে জেগে: 'জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান' যে অহরহ বাজছে—তা অনুভবে এসেছে। প্রশ্ন জেগেছে—জগতে যে আনন্দ সত্য, জীবনে তা কি সহজ হবে না: 'পরাণ দিয়ে প্রেমের দীপ' কি জ্বালা হবে না?

প্রেম আছে, এটা তো জেনেছি; প্রেমের পথেই চলেছি, এটাও তো মেনেছি; কিন্তু জানা ও মানাই কি পূর্ণভাবে 'হওয়া'? হয়ে কি উঠেছি পূর্ণানন্দে? একেবারে হয়ে উঠতে না পারলে প্রেম কি সহজ হবে ইহজীবনে?

এই প্রশ্নের ব্যাকুলতা ও বেদনা 'গীতাঞ্জলি'তে। বলা হল: যদি হয়ে উঠতে না পারি, মনে যেন থাকে যে, হয়ে উঠি নি—

যতই উঠে হাসি
ঘরে যতই বাজে বাঁশি,
ওগো যতই গৃহ সাজাই আয়োজনে,
যেন তোমায় ঘরে হয় নি আনা
সে-কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে॥—[২৪ নং]

সংসারে সুখ হয়তো পেয়েছি, সমাজে পেয়েছি মর্যাদা, কর্মস্থলে স্নেহসম্মান, জীবনে যশঃপ্রতিষ্ঠা—কিন্তু তাতেই যেন অহং-এর বশবর্তী হয়ে না উঠি। যেন মনে থাকে—সাংসারিক সুখশান্তি যশমান প্রতিষ্ঠা কিছুই না—যদি সে-সবের মূলে বড়-আমিটির চেতনা না থাকে অর্থাৎ প্রেম না থাকে। কিছু নাম পেয়েছি, ধাম পেয়েছি, মেডেল পেয়েছি, মর্যাদা বেড়েছে—সুতরাং আমি কেউ-কেটা হয়েছি ভেবে বিশ্বজনকে অবজ্ঞা করব, মানী-ব্যক্তিকে মান দেব না, গুরু ব্যক্তিকে প্রণাম দেব না, বয়ঃকনিষ্ঠদের দেব না স্নেহপ্রীতি—এই যদি হয়, তবে বুঝতে হবে আমার প্রাপ্ত বস্তু বা বিষয়ের মূলে লীলা করছে অহং, প্রেম নয়। সুতরাং বিষয়ের বন্ধন থেকে আমার মুক্তি হবে না। সাধারণ মানুষের বাড়ি-গাড়ি-ধনদৌলত-লোক-লস্কর প্রভৃতির মূলে থাকে অহং, থাকে অহংকার। তাই সে তুচ্ছ আমি-টাকেই কেন্দ্র করে ঘুরে মরে, 'এই করেছি, সেই করেছি, এই আছে আমার সেই আছে' বলে আমিটাকে জাহির করে লজ্জাহীন ঔদ্ধত্যে। 'গীতাঞ্জলি'র মন্ত্রবাণীর ব্যঞ্জনা এই—সকল কিছু প্রাপ্তির মূলে রাখব অহং নয়, আত্মা অর্থাৎ প্রেম, তবেই কোনও প্রাপ্তি আমাকে বাঁধবে না। মানুষ মনের গোপনে জড়বৎ হয়ে থাকে বস্তুমোহে, বস্তুর চেয়ে জীবন বড়—এ-তত্ত্ববোধ তার চেতনাকে স্পর্শ করা মাত্র যাত্রা তার শুরু হয়।

যাত্রা—কোথা থেকে কোথায় যাত্রা? না, মোহ থেকে প্রেমে যাত্রা, আমি থেকে আত্মায় যাত্রা, মলিনা বাসনা থেকে বিশুদ্ধা বাসনায় যাত্রা, অপূর্ণ এই জড়বোধ থেকে পূর্ণচেতনার আনন্দে যাত্রা।...অন্তর্মুখী এই নবীন যাত্রার আমি যাত্রী—

যাত্রী আমি ওরে
পারবে না কেউ রাখতে আমায় ধরে।
দুঃখসুখের বাঁধন সবই মিছে,
বাঁধা এ-ঘর রইবে কোথায় পিছে,
বিষয় বোঝা টানে আমায় নিচে,
ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে যাবে পড়ে।—[১১৭ নং]

অধিজীবনের রহস্যগভীরে আলোকসন্ধানে কবি এখানে ধ্যানপ্রসন্ন। তাৎপর্য এই—'দেহদুর্গের' 'সকল দ্বার' খুলে ফেলে, 'বাসনার' 'শিকল' করে ছিন্ন, বস্তুজীবনের সকল কিছু 'ভালোমন্দের' বেড়াজাল হয়ে পার—অন্তর্মুখী তিনি 'দূরের' উপাসক! আমি-র মধ্য দিয়ে আমিরই স্বরূপসন্ধানে জীবনযাত্রী।

বিশেষ এই দেহী-আমি যদি সীমা, অপূর্ণ—আমি-র মধ্যে সংগুপ্ত বিশ্ব-আমি তবে অসীম, নিত্যপূর্ণ।...জীবনের অন্তর্নিহিত এই পূর্ণ আমিটিকেই 'গীতাঞ্জলিতে', এবং পরে দেখা যাবে 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি'তে এবং 'বলাকা'তেও কখন 'তুমি', কখন 'প্রিয়', কখন 'প্রভু', কখন 'স্বামী', কখন 'নাথ', কখনও বা 'অন্তর্যামী' নামে সম্বোধন করেছেন। ধর্মসঙ্গীতের এই আঙ্গিকরীতি ও ভাষাবিন্যাসে বিভ্রান্ত হয়েই দেশীবিদেশী পণ্ডিতেরা কবির গানগুলিকে মধ্যযুগীয় সাম্প্রদায়িক ভক্তকবিদের গানের সঙ্গে তুলনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রেমের কবি, সেইহেতু তাঁকে ভক্তির কবি বলেও অভিহিত করতে পারি। কিন্তু পূর্বেই বলেছি—বিশেষ কোন দর্শনশাখার বাঁধাবাঁধি ভক্তিমন্ত্র বা তন্ত্র তাঁর ধাতে সয় না। স্বাভাবিক জীবনের সহজ উপলব্ধির আলোয় তিনি যা দেখেছেন, গানের ছন্দে

তাই-ই ধরেছেন, ধরায় আনন্দে উত্তেজিত হয়েছেন। তাঁর গীতিসাধনায় এই সত্যই দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়েছে যে, অধ্যাত্মজীবনও জীবন, এবং অনুভবে সেটা সমায়ত হলেই বোঝা যায় বাস্তবজীবনের মত সে-জীবনও সত্য এবং সহজ। বিশেষ কোন আনুষ্ঠানিক নিয়মচর্যার দ্বারাই সে-জীবন পেতে হয়, তা নয়, বুদ্ধি ও বোধের সাধনায় সাংসারিক তুচ্ছতা ও বৈষয়িক উগ্রতাকে অতিক্রম করতে পারলেই মানবিক মহিমার এই সুপ্ত পরিচয়টি চেতনার পথে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে জীবনপ্রেমের কান্ত-সংগীত না বলে ভক্তি-সংগীত বলেই আনন্দ পেতে চান পান, তবু মনে রাখতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথের ভক্তি সন্ন্যাসীর নয়—মানুষের, যে-মানুষ যুগে যুগে, দেশে দেশে, নব নব রূপে ও চেতনায়, অন্তর থেকে বাহির, বাহির থেকে অন্তরে পূর্ণ-হয়ে-ওঠার বেদনায় নিত্যযাত্রী—'বলাকা'র ভাষায় যৌবনপথিক, 'জন্মদিনে'র ভাষায় 'দূরের আমি'। আমি-জীবনেরই সূক্ষ্ম চেতনার 'অতল আঁধারে' যে-আমি আছে সংগুপ্ত, প্রেম-সাধনার আনন্দে সেই 'প্রিয়-আমি'র অভিসারে আমি—এই স্বীয় আমি, চলেছি অনাদ্যন্তকাল—

> জানি জানি কোন্ আদিকাল হতে
> ভাসালে আমারে জীবনের স্রোতে,
> সহসা হে প্রিয় কত গৃহে পথে
> রেখে গেছ প্রাণে কত হরষন।—[২১ নং]

আমি তাই এই আজকের বিশেষ আমিটুকু মাত্র না। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের, বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতের ধারা-প্রবাহে নিত্যভাসমান দিব্য আমি—

> ঝরনা যেমন বাহিরে যায়,
> জানে না সে কাহারে চায়
> তেমনি করে ধেয়ে এলেম
> জীবনধারা বেয়ে—
> সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।—[৬৫ নং]

অনাদিকালের আমি জীবনযাত্রী। থাকতে আসি নি, 'হওয়া'র জন্যে শুধু 'যেতে' এসেছি। ব্যক্তি-আমির কিছুই থাকবে না—এই জেনে বিশ্ব-আমির সত্যে, প্রেমের সত্যে অগ্রসর হওয়াই পুরুষার্থ। চলার আনন্দই প্রেমজীবনের আনন্দ। কেন? না—

> সেই আনন্দ-চরণপাতে
> ছয় ঋতু যে নৃত্যে মাতে,
> প্লাবন বহে যায় ধরাতে
> বরন গীতে গন্ধে রে
> ফেলে দেবার ছেড়ে দেবার
> মরবারই আনন্দে রে।—[৩৬ নং]

প্রকৃতির বিচিত্র রূপচিত্রে অহরহ 'ছাড়া'র আনন্দ-লীলা—এক ঋতু যায় তো আর ঋতু আসে। অর্থাৎ যায় বলেই, যেতে পারে বলেই নতুন হয়ে ফেরে। 'বলাকা'র নবীনতত্ত্ব ও নটরাজের নৃত্যলীলা 'গীতাঞ্জলি'র এই সুরমন্ত্রে সূচিত হয়েছে। প্রকৃতি কবিকে বাঁধছে না, বরং মুক্তির চেতনা জাগাচ্ছে এই কারণে যে, মোহমুক্ত মনের আলোকে প্রকৃতিরূপ তিনি আস্বাদ করলেন: রূপে রূপে, বর্ণে বর্ণে, গন্ধে গন্ধে নবজীবনের সাধনোল্লাস করলেন অনুভব। অহংয়ের অমাবসানে আত্মার প্রভাতকাল হল সমায়াত—

> নিশার স্বপন ছুটল রে এই
> ছুটল রে।
> টুটল বাঁধন টুটল রে।
> রইল না আর আড়াল প্রাণে,
> বেরিয়ে এলেম জগৎপানে,
> হৃদয় শতদলের সকল
> দলগুলি এই ফুটল রে, এই
> ফুটল রে।—[৩৭ নং]

'হৃদয়-শতদলের দলগুলি' অমারাতের অন্ধকারে (বলব কি অহংকারে?) ছিল আচ্ছন্ন, প্রভাতে হল প্রস্ফুটিত। প্রভাতের আলোয় শতদলবিহারী চেতনময় আমিকে দেখা গেল—

> আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে
> দেখতে আমি পাই নি।
> বাহিরপানে চোখ মেলেছি
> হৃদয়পানেই চাই নি।

আমার সকল ভালোবাসায়
সকল আঘাত সকল আশায়
তুমি ছিলে আমার কাছে,
তোমার কাছে যাই নি।—

[গীতিমাল্য, ৯২ নং]

যতক্ষণ বহির্মুখী মন ততক্ষণই তুমি দূরে, অন্তর্মুখী সাধনার আনন্দে যে মুহূর্তে স্বরূপোপলব্ধি, সেই মুহূর্তেই তুমি আর দূরের নও, তুমি অন্তিকে, তুমি আমারই আমি, তুমি 'অন্তরের ধন'।

এই অন্তরকে, অন্তরতরকে জানাই আত্মাকে জানা, তুমিকে কি না প্রেমকে জানা। এই জানার শেষ নেই, প্রেমকে চেনারও শেষ নেই—

আপনাকে এই জানা আমার
ফুরাবে না।
এই জানারি সঙ্গে সঙ্গে
তোমায় চেনা।—[৮৪ নং]

আমির মধ্যেই তুমি। হয়ে উঠলেই তুমি, আমি। তাই হতে হবে। প্রেমকে পূর্ণভাবে চেনার জন্যে কত জন্ম নেব, কত মরণ পাব, সহস্র জন্ম ও মরণের আনন্দে অপূর্ণ এই আমিটাকে সমর্পণ করব পূর্ণের সাধনায়, যত করব, ততই হব, ততই আরও হওয়ার আনন্দ বাড়বে, 'দেনা' বাড়বে, শোধ দিতে তাই আরও প্রস্তুত হব। হতে হতে মরব, মরতে মরতে করব, করতে করতে হব। এই হওয়া 'আমার ফুরাবে না'।

'গীতিমাল্যে' অন্তরতর হৃদয়পানে, মানবিক মাহাত্ম্যের আনন্দ-গভীরে চাওয়া হল শুরু। 'রয়েছ তুমি' এ সত্য 'জীবন মাঝে' সহজ হল। 'কোথায় আলো' বলে যে কান্না, তা থেমে গেল। 'না হয় আমার না-ই সাধনা' বলে ব্যাকুলতা আর প্রকাশ পেল না। 'অরূপরতন আশা' করা নয়, এবার অরূপরতনকে অন্তর্লোকে দেখা হল। রাত্রি এসে যেখানে উষালোককে ছুঁই ছুঁই করছে, আসন্ন প্রভাতের বন্দনা গাইছে, সেখানে মোহরাত্রির অবসানে প্রেমের উষাভাসে, তাকে দেখা হল। পূর্ণ প্রভাত এলে স্পষ্ট হবে তার মুখচ্ছবি। এখন অস্পষ্ট আভাসে তাকে দেখছি—

মুখের পানে তাকাতে যাই
দেখি দেখি দেখতে না পাই,
স্বপন সাথে জড়িয়ে জাগা
কাঁদি আকুল ধারে।—[১ নং]

'গীতাঞ্জলি'র 'কোথায় আলো' বলে কান্না আর 'গীতিমাল্যে'র 'দেখতে না পাই' বলে কান্না—একস্তরের তত্ত্ব নয়। 'গীতাঞ্জলি'র কান্না সাধনবেগের কান্না, 'গীতিমাল্যে'র কান্না সিদ্ধি পেয়েও মনের মত করে না-পাওয়ার কান্না। পূর্ণ প্রভাতের অভিমুখে গতিবাসনা এই কান্নার ধ্বনি। বক্তব্য এই—স্পষ্ট দেখছি না বটে, কিন্তু কিছুটা তো দেখছি, আর তাই দ্বন্দ্ব নয়, নয় সংশয়। সব ফেলে এবার চাব তাকেই। 'শূন্য হাতে' 'ব্যাকুল অন্তরটুকু' নিয়ে যাব তার অভিসারে। 'যাবার বেলা'য় তোরা সব আনন্দে জয়ধ্বনি কর্ এই ভেবে যে, এতদিন পরে গন্তব্যের সন্ধান আমি পেয়েছি—

এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে
সবাই জয়ধ্বনি কর্।
ভোরের আকাশ রাঙা হল রে
আমার পথ হল সুন্দর।—

ভোরের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি পথ। ঘর ছেড়ে নামব পথে—'পথিকসজ্জা' ফেলে ধরব অভিসারিকা শ্রীরাধার বেশ—

মালা পরে যাব মিলন বেশে
আমার পথিক সজ্জা নয়।
বাধা বিপদ আছে মাঝের দেশে
মনে রাখি নে সেই ভয়।—[২১ নং]

এই আমি আর সেই আমি—'মাঝের দেশে' হয়তো গতিপথে পাব 'বাধা বিপদ': 'পথে পথে গুপ্ত সর্প গূঢ়ফণা' দেবে হানা, তবু ভয় করি নে এইজন্যে যে, তাতেই যখন আত্মসমর্পণ করেছি, তখন সে ছাড়া আর সত্যতর প্রিয়তর কিছুই নেই জীবনে।

তাকে পেতেই, স্পষ্ট ভাষায়, 'আমি'-কে পূর্ণের আনন্দে আবিষ্কার করতেই যুগে যুগে আসা, লক্ষ মরণের মধ্য দিয়ে চলা আর চলা আর চলা।...আমার পূর্ণ-

আমিটি-ই আমার গন্তব্য, আমার ইষ্টদেব, আমার প্রেম। সেই আমার পূর্ণপ্রেমের উপযুক্ত হয়ে উঠতে চাই, তাই অপূর্ণ আমির নিত্যসাধনা—প্রেমসাধনা। আমি তাই 'মিলনবেশে' প্রেমের বেশে 'মালা হাতে চলি অভিসারে'—শতবিধ 'বাধা বিপদ' অতিক্রম করে আমি-সুন্দরের প্রেমাভিসারে।…আমির কর্মে-ধর্মে, ত্যাগে-প্রেমে, জ্ঞানে-ধ্যানে, সমাজে-রাষ্ট্রে আমির অন্তরতম শ্রেয়-সুন্দরকে যত জাগাই, ততই 'পুণ্য হয় অঙ্গ'—'ধন্য হয় অন্তর'। যা ছিলাম তা আর থাকি নে, প্রেমের 'পরশরাগে চিত্ত রঞ্জিত' হয়ে ওঠে বলে দৃষ্টি যায় খুলে—'আলোকে চক্ষুদুটি' মুগ্ধ হয়ে দেখতে থাকে রূপে রূপে বিশ্বপ্রেমের নৃত্যলীলা—

আকাশে　দুই হাতে প্রেম বিলায় ও কে ?
সে সুধা　গড়িয়ে গেল লোকে লোকে।
গাছেরা　ভরে নিল সবুজ পাতায়,
ধরণী　ধরে নিলো আপন মাথায়।—[১০৮ নং]

অন্তরতমের দৃষ্টিতে প্রেম সর্বত্র লীলায়িত, সর্বজগদ্‌গত। 'মায়ের বুকে' এই প্রেম। 'ছেলের মুখে' এই প্রেম। 'দুঃখশিখায়' এই প্রেমই দীপ্যমান, 'অশ্রুধারায়' এই প্রেমই তোলে তরঙ্গ। এই প্রেমই—

……　বিদীর্ণ বীর-হৃদয় হ'তে
বহিল　মরণ-রূপী জীবনস্রোতে।
সে যে ঐ　ভাঙাগড়ার তালে তালে
নেচে যায়　দেশে দেশে কালে কালে।—[১০৮ নং]

সর্বদেশ ও সর্বকালগত নিত্যনবায়মান এই পূর্ণপ্রেমকে আমির মধ্য দিয়ে ধ্যানে ধরি-ধরি করি, জ্ঞানে জানি-জানি করি, রসে পাই-পাই ভাবি। যতটুকু ধরি, যতখানি জানি, যতটুকু পাই—ততটুকুই আমার ইহজীবনের পরিচয়। কিন্তু এতে কি সাধ মেটে? কিছু পাই, পেয়ে কিছুটা হইও, তাই আশা বাড়ে, চাইতে-চাওয়ার বেদনা বাড়ে, যা পেয়েছি তারও চেয়ে মহত্তর পরিচয় আমার আছে জেনে মন আর থামতে চায় না—'হেথা নয় অন্য কোনখানে' বলে আনন্দে। গানের ভাষায়—

তোমার মাঝে এমনি করে
নবীন করি লও যে মোরে,
এই জনমে ঘটালে মোর,
জন্ম-জনমান্তর,
সুন্দর, হে সুন্দর।—[১০২ নং]

প্রেমের 'পরশরাগে' কেবলই নতুন হই, রূপে রূপে ভাবে ভাবে কর্মে কর্মে হই নিত্যনতুন। যা হই, হয়ে বুঝতে পারি তারও চেয়ে আমার আশা বড়, চেতনা বড়, প্রেম বড়—তাই থামি না, আরও হতে চলি। চলার আনন্দে ইহজন্মেই, ছাড়তে ছাড়তে বাড়তে বাড়তে নব নব জন্ম ও জন্মান্তের অভিজ্ঞতা করি লাভ। বুঝতে পারি—'নবীন' হওয়ার অর্থই হল নিত্যগতি।

'তোমার মাঝে' হে সুন্দর, আমিটিকে তুমি করে নাও, 'নবীন' করে নাও—প্রেম, তুমি প্রেম কর আমিকে, এই ধ্বনি।

'গীতিমাল্যে' প্রেমের গলায় মাল্য দিয়ে প্রেম হওয়ার আনন্দটি কবি উপলব্ধি করলেন। এই আনন্দ উপলব্ধ হলেই সুখ আর নয়, শান্তিও নয়, শুধু গতি। গতিপথে, বলাই বাহুল্য, বহু কষ্ট বহু বাধাবিপত্তি বহু যন্ত্রণা বহু দুঃখ। 'খেয়া' কাব্যে কবি গেয়েছেন 'দুখের বেশে এসেছ বলে তোমাকে' যে ভয় করব, তা নয়। 'গীতিমাল্যে' 'প্রেম' হওয়ার আনন্দটি জেনে 'গীতালি'তে গাইলেন—

সুখের বাধা ভেঙে ফেলে
তবে আমার প্রাণে এলে,
বারে বারে মরার মুখে
অনেক দুখে নিলেম চিনে।—[৯ নং]

প্রেম হয়েছে বলে পার্থিব পথের বাধাবিপত্তি দুঃখ ব্যথা আর কিছুই না। বরং এই বোধই তখন সত্য যে, ওগুলি না হলে এবং অতিক্রম না করলে প্রেমই হবে না। প্রেমের দান বড় কঠিন। এর কাছে 'আরাম চেয়ে' লজ্জাই পেতে হবে। অজস্র সহস্র মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নবীন জন্ম লাভ করতে হয় অমৃতের—কি না প্রেমের, সন্ধানে—

সামান্য নয় তব প্রেমের দান
বড় কঠিন ব্যথা এ যে
বড় কঠিন টান।

মরণ-স্নানে ডুবিয়ে শেষে
সাজাও তবে মিলন-বেশে
সকল বাধা ঘুচিয়ে ফেলে
বাঁধো বাহুর ডোরে।—[৬৮ নং]

অন্য একটি গানে এই ভাবই ভিন্ন একটি রূপকল্পে প্রকাশ করেছেন। বলেছেন, প্রেমাগুনের 'পরশমণি' প্রাণে যদি ছোঁয়া দিল, 'দগ্ধ' হল তবে হৃদয়ের যাবতীয় তুচ্ছ বিকার, 'ধন্য' হল 'জীবন'। "ভাষা ও ছন্দ" নামক বিখ্যাত কবিতায় বাল্মীকি-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন, নিজের সম্বন্ধেও এবার তা সত্য হল, প্রযোজ্য হল। 'অলৌকিক আনন্দের ভার' কি না প্রেমের ভার, পেয়ে 'অপার বেদনা'র অধিকারী হলেন কবি। 'অগ্নিসম দেবতার দান ঊর্ধ্বশিখা জ্বালি চিত্তে অহোরাত্র' তাঁরও প্রাণ করল দগ্ধ। কিন্তু এই দগ্ধ হয়েই তো আনন্দ। 'গীতালি'তে কবি গাইলেন :

আমার এই দেহখানি তুলে ধরো,
তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো,
নিশিদিন আলোক-শিখা জ্বলুক গানে।...
ব্যথা মোর উঠবে জ্বলে ঊর্ধ্বপানে।—[১৮ নং]

এই ব্যথার মধ্যেই ভূমাজীবনের উন্মেষ। কবির ভাষায়—

তোমার আঁখি চাইবে না কি
আমার বেদনাতে॥—[১২ নং]

'বেদনাতে' অর্থাৎ 'নব জীবনের' নতুন উপলব্ধির চেতনায়। তখন 'সর্বনেশের হাতে সব সমর্পণ করে' পবিত্র হওয়ার আনন্দ—

লও গো আমার নিশীথ রাতি

'নিশীথ রাতি' শেষ হোক আমার জীবনে। কেন না, গতানুগতিক মোহ-জীবনের অবসানে আজ প্রেম-প্রভাতের সূর্যসাধনায়, জ্যোতির্ময়ের দিব্য সাধনায়, আমি উদ্দীপ্ত—

লও গো আমার ঘরের বাতি

'ঘরের বাতি' যাক নিভে—'শয়নশিয়রে' নিভে যাক 'প্রদীপ', 'গৃহ আঁধার' হয় হোক, ভয় করি নে, কেন না পথের দীপ্ত আলোকের আমি সন্ধানী, 'আপন করে' নিয়েছি 'পথটাকে'—

লও গো আমার সকল শক্তি,
সকল অভিমান।—[৬৭ নং]

কারণ 'অহং'কে প্রশ্রয় দিয়ে যে জীবন 'আপনারে শুধু ঘিরে ঘিরে পলে পলে' ঘুরেছে, তার অকিঞ্চনত্ব করেছি উপলব্ধি। এবার 'আমি'র ওপর 'তুমি'র—অর্থাৎ প্রেমের হোক জয়। অহং-এর 'দুয়ার' ভেঙে এসেছ হে প্রেম, জয় হোক তোমার—

ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়,
তোমারি হউক জয়।
তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়।—[১০১ নং]

তাৎপর্য এই : ব্যক্তি-আমিটার অহংকার প্রকাশ করার প্রবৃত্তি এবার মরল—মোহের 'আবরণ' সব সরল। এবার আমির মধ্যে বিশ্বআমির প্রকাশ তবে পূর্ণ হবে—'দেহমন', কেউ জানবে না, 'ভূমানন্দময় হবে' গোপনে—

চোখে আমার মায়ার ছায়া টুটবে গো,
বিশ্বকমল প্রাণে আমার ফুটবে গো,
এ জীবনে তোমারি নাথ জয় হবে।—[৭১ নং]

অর্থাৎ এবার আমার কর্মে ধর্মে ধ্যানে জ্ঞানে বাক্যে ব্যবহারে প্রকাশিত হবে, জয়যুক্ত হবে—নবজীবনের চেতনোল্লাস।

আপন জীবন থেকেই কবি এ সত্য আবিষ্কার করলেন যে, মানবিক মাহাত্ম্যের উদ্বোধনে জীবনের তাৎপর্য যায় পরিবর্তিত হয়ে। পৃথিবী, প্রকৃতি, মানুষ, দেশ, সমাজ, সংসার—নবজাতকের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নতুন রূপে হয় প্রতিভাত। তখন মানুষ যে জীবনবোধ বা চেতনা লাভ করে, রবীন্দ্রনাথ তাকেই বলেছেন দ্বিজত্ব—দ্বিতীয় জন্ম বা নবজন্ম। দ্বিজত্বের দীক্ষায় দীপ্ত হয়ে পথচলার সাধনাই—রবীন্দ্রবিচারে, মানুষের সাধনা—মানুষের ধর্ম। অহং-ঘোরে পথ চলা আর প্রেমে উদ্দীপ্ত হয়ে পথ চলা এক জিনিস—এক তত্ত্ব নয়। 'গীতাঞ্জলি'তে পথের সাধনা, 'গীতিমাল্যে' ঠিকানা প্রাপ্তি, এবং 'গীতালি'তে নবীনাবেশে দুঃখ কষ্ট শোক তাপ বাধাবিপত্তি প্রভৃতি নানা 'মৃত্যুর' মধ্য দিয়ে নানা 'ঝড়ের' মধ্য দিয়ে গন্তব্যমুখে অগ্রগতি।...'কাঁটার

পথে আঁধার রাতে' নিত্য 'যাত্রা' এই জন্যে যে, ধ্যানে যা তিনি উপলব্ধি করেছেন, বাস্তবে তা তিনি প্রতিভাত করতে চান। সংসারে 'স্বর্গ রচার' মহোৎসাহে নবীন যৌবন তিনি অমিতবীর্য। বস্তুতঃ চেতনায় জন্মলাভ করে তিনি দ্বিজ হয়েছেন—তাঁর কাছে প্রেমের মত সত্য তত্ত্ব বাস্তব তত্ত্ব আর কিছু নয়। প্রেমের দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবনের যে স্বরূপ তিনি দেখেন, বস্তুরূপের চেয়েও তা সত্যতর—সেই হেতু মহত্তর। তিনি দেখেন, ধরণী 'মন্দির প্রাঙ্গণ'—মানুষ 'দেবতা'। 'সবারে প্রণাম' করার আনন্দে, সকলকে স্বীকার করার যৌবনবেগে, তাঁর বিশ্বাস এই—অদ্বৈতের পূজা হয় সার্থক। পূর্ণের দৃষ্টিতে 'কিছুই যাবে না ফেলা'—জাগে সান্ত্বনা। জীবনে জীবনে প্রাণ হতে প্রাণে নির্ভয়ে চলা তাই হয় শুরু।

এই চলার কথা 'বলাকা'-কাব্যে। কেবলই চলি—কবি বলছেন, তাই নবীন থাকি অন্তরে—

পুণ্য হই সে-চলার স্নানে,
চলার অমৃতপানে
নবীন যৌবন
বিকশিয়া ওঠে প্রতিক্ষণ।—[১৮ নং]

মোহ বিষয়ে আসক্ত হলে, বলাই বাহুল্য, নবীন থাকা সম্ভব নয়। গানের যুগে প্রেমের সাধনায় কবি নবীনের যে তত্ত্বসত্য উপলব্ধি করেছেন, জীবনের যে নিত্যনূতন রূপসত্যের ও বৈচিত্রের আনন্দ করেছেন আস্বাদ, 'বলাকা'-কাব্যের যৌবনগতি ও প্রেমধর্মের তাই-ই প্রাণশক্তি।··· বলাকাগতি—একটু ধ্যান করলেই দেখবেন, হেরাক্লিটাসীয় বা বার্গসীঁয় এমন কি হেগেলীয়গতি নয়, অধিজীবনের অনন্তে তা চেতনগতি—শাস্ত্রের ভাষায়, দেবযানগতি। 'মর্ত্যসীমা' চূর্ণ করে দেবত্ব যে অর্জন করা যায়, 'মৃত্যুর অন্তরে' প্রবেশ করে অমৃতকে যে জানা যায়, মানা যায়, আনা যায়—অর্থাৎ ত্যাগের সাধনায়, প্রেমের সাধনায় মৃত্যুর চেয়েও সত্যতর অমৃতজীবনে নবীনটি হওয়া যায়—এই বিশ্বাসে গতি। গানের যুগে কবির মন—

ফেলে দেবার ছেড়ে দেবার
মরবারই আনন্দে

যেমন ভাবমগ্ন, 'বলাকা'কাব্যে সেই আনন্দেরই পরিণতি—

জীবন এবার মাতল মরণ-বিহারে

অহংয়ের মরণ এলে তবেই বেঁচে উঠব প্রেমে—নবজীবনে। এ উপলব্ধি গানে যেমন, কাব্যেও তেমনি। গানে—

মরে গিয়ে বাঁচব আমি তবে
আমার মাঝে তোমার লীলা হবে।

এবং কাব্যে—

মৃত্যুসাগর মথন করে
অমৃত রস আনব হরে
ওরা জীবন আঁকড়ে ধরে
মরণসাধন সাধবে।

'জীবন' এখানে তথাকথিত মোহোন্মত্ত জড়জীবন। এটি ভেদ করতে পারলেই অমৃত হয় প্রকাশিত।···মাটির জীবনে অপূর্ণতা, দীনতা। কিন্তু মৃত্যু ভেদ করতে পারলেই দীন জীবনের শূন্যতা ভরে ওঠে 'গানে প্রাণে আলোকে পুলকে'। গানে—

মৃত্যু ভেদ করি
অমৃত পড়ে ঝরি
অতল দীনতার
শূন্য ওঠে ভরি।

অতএব 'বাঁচি আর মরি' অপূর্ণ জীবনের দৈন্য ও শূন্যতা দূর করার জন্যে মৃত্যু ভেদ করতে হবে—মোহের তীরে নোঙর ফেলে পড়ে থাকলে চলবে না। বলাকায়—

মৃত্যু ভেদ করি
দুলিয়া চলেছে তরী।···
বাঁচি আর মরি
বাহিয়া চলিতে হবে তরী।
এসেছে আদেশ—
বন্দরের কাল হল শেষ॥

মানুষের সন্তান হয়ে জন্মেছি, অমৃতের বার্তা জেনেছি জীবনের সাধনায়, আদিম প্রবৃত্তির গতানুগতিক পশুত্বে বন্দর বেঁধে আর থাকব না। প্রত্যাদেশ পেয়েছি, মানুষের যুগার্জিত পাশব পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হব অগ্রসর—'একমনে' পার হব 'প্রলয়-পারাবার'।

ঝড় উঠবে, তুফান জাগবে, 'বজ্রবাণ' হবে ধ্বনিত, তবু মানব না বাধা।···গানে—

ঝড়কে আমি করব মিতে
ডরব না তার ভ্রূকুটিতে
দাও ছেড়ে দাও ওগো, আমি
তুফান পেলে বাঁচি।

কাব্যে এই কথাই প্রকাশ পেয়েছে ভিন্ন ভাষায়, ভিন্ন ছন্দে—

উঠিয়াছে জাগি
ঝটিকার কণ্ঠে কণ্ঠে শূন্যে শূন্যে প্রচণ্ড আহ্বান।
মরণের গান
উঠেছে ধ্বনিয়া পথে নবজীবনের অভিসারে
ঘোর অন্ধকারে।

প্রবল মানুষ দুর্বল মানুষকে আজ বঞ্চিত করছে, শোষণ করছে নানা কৌশলে, অপকৌশলে। বঞ্চিত যারা, গোপনে 'চিত্তক্ষোভ' নিয়ে মৌনের মধ্যে পোষণ করছে বিপ্লবেচ্ছা। প্রেম আজ অপমানিত হচ্ছে মানুষের জীবনে। স্বার্থে স্বার্থে বাধছে সংঘাত। জাতিতে জাতিতে অবিশ্বাস। ঘরে ঘরে অসন্তোষ, অভাব। আত্মাবমাননা। আদিম লুণ্ঠনেচ্ছার প্রবল ঝটিকা মানুষকে পশুজীবনে দিচ্ছে ঠেলে। 'মৃত্যুর গর্জন' শোনা যাচ্ছে সর্বত্র। সাগর হয়ে দোলাচ্ছে মন, মনন, বুদ্ধি, বিদ্যা। এরই মধ্যে পাড়ি দিতে হবে 'নবজীবনের অভিসারে'। এরই মধ্যে প্রেমসাধককে পথ কেটে যেতে হবে সর্বতোভদ্র মহাপৃথিবী রচনার সংকল্পে। 'ঝড় এসেছে'—ভয় সে করবে না। কবির গানে—

ঝড় এসেছে ওরে এবার
ঝড়কে পেলেম সাথি
আকাশ কোণে সর্বনেশে
ক্ষণে ক্ষণে উঠছে হেসে
প্রলয় আমার কেশে কেশে
করছে মাতামাতি।

এবং কাব্যে:

রক্তমেঘে ঝিলিক মারে
বজ্র বাজে গহনপারে
কোন পাগল ঐ বারে বারে
উঠছে অট্টহেসে গো
এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো॥

অবশ্যম্ভাবী সত্যের রুদ্ররূপ হয়েছে আবির্ভূত। বিশ্বমঙ্গলে যদি সংগ্রাম ও সাধনা করতে হয় তবে ব্যক্তিসুখ ব্যক্তিমোহ ত্যাগ করে রুদ্রসত্যে আত্মসমর্পণ কর, এই ধ্বনি।·· বিশ্বজীবনে টান দেবে বলে সঞ্চিত বিত্তরাশি কেড়ে নিতে এসেছে সর্বনাশকারী প্রলয়ঙ্কর রুদ্রপাগল, বিশ্বপাগল। নিয়তসত্যের প্রতীক এই 'পাগল'। একে মানি তো বাঁচি, না মানি তো হাহাকার করে মরি। 'গানে' বলা হয়েছে যে, ছাড়তে চাই বা না চাই প্রলয়-পাগল আমাদের সবকিছু ছাড়িয়ে তবে ছাড়বে—

ছাড়িয়ে গৃহ ছাড়িয়ে আরাম
ছাড়িয়ে আপনারে
সাথে করে নিল আমায়
জন্ম-মরণ-পারে

জন্ম এবং মৃত্যুপারে যে পূর্ণ সত্য, তাই জীবনের গন্তব্য। যুগে যুগে তারই উদ্দেশ্যে জীবনগতি। বলাকায়—

যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে
প্রাণ হতে প্রাণে।

বলাকার এই গতি—পূর্বেই বলেছি—অন্ধ গতি নয়, প্রেমে গতি। প্রেমই পূর্ণ। প্রেমে পূর্ণতা। প্রেমই সত্য, শিব, সুন্দর। প্রেমই তিনি। এই তিনি, রবীন্দ্র-বিচারে, আমির মধ্যেই আছেন নিহিত। তিনি চান, তাঁর যোগ্য হয়ে উঠে এই আমিরই পূর্ণ প্রকাশে তাঁকে প্রকাশিত করি। কিন্তু জীব হিসাবে আমি নিতান্তই অপূর্ণ বলে তাঁর ইচ্ছা আমির চেতনায় ঈষৎ আলোই

মাত্র বিকিরিত করে। ঈষৎ আলোয় ঘুম যদি ভাঙে, অল্পে ভরে না মন—কর্মে, জ্ঞানে, ধর্মাচরণে, ভক্তিসাধনায়, বিজ্ঞানাবিষ্কারে চরমে কি না পূর্ণে, শাস্ত্রের ভাষায়, ভূমায়, রবীন্দ্রতত্ত্বে প্রেমে, তখন অগ্রগতি। এই প্রেম এক হিসাবে আমি-ই বটে। জীবাত্মা হিসাবে আমি অপূর্ণ প্রেমে প্রকাশিত, কিন্তু অন্তরাত্মা হিসাবে আমি-ই সে-ই। রবীন্দ্রশাস্ত্রে দ্বৈত যেমন গ্রাহ্য, অদ্বৈত তেমনি মান্য। শিল্পে দ্বৈতবাদী, তত্ত্বে অদ্বৈতবাদী তিনি কবিদার্শনিক। তিনি গানে প্রকাশ করেন দ্বৈতবেদনার সুরোল্লাস, কিন্তু গানের তত্ত্বে ব্যঞ্জিত করেন অদ্বৈতচেতনার আনন্দ। অন্তরতর সেই অদ্বৈতের সন্ধানে, বিশ্ব-আমির সন্ধানে অর্থাৎ আমি যে 'যুক্ত' হয়ে আছি 'সবার সঙ্গে'—এই তত্ত্বের উন্মোচনেই কবি সুরকার। গাইছেন—

সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি
সেই তো আমার তুমি।

সর্বলোকগত এই 'আমার তুমি'কে আমিতে রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই জীবমানবরূপে আমার জন্ম। এই চেতনবোধের পূর্ণাস্বাদনেই জন্ম থেকে জন্মান্তরে 'যুগে যুগে এসেছি চলিয়া' এক আমি সর্বজগদ্‌গত, আর আমি রক্তমাংসবিভাবিত অতিসাধারণ জীবমানব। কিন্তু স্বরূপ আমার অনন্যসাধারণ বলে—অল্পে সুখ নেই। যা পাই তাকে উপেক্ষা না করেও সময়মত পেরিয়ে চলেছি স্বরূপসন্ধানে: আমি-ই চলেছি আমিকে আবিষ্কার করতে, প্রকাশ করতে। এই প্রকাশের পথে বাধা ঘটে যখন জীব আমিটাকে 'বহু বাসনায় প্রাণপণে' প্রবল করে তুলি। তাই গানের প্রার্থনা এই—

আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও
হৃদয় পদ্মদলে

—আমিকে, জীবা'মকে, পশ্চাতে সরিয়ে রেখে, হে আমার বিশ্বামি, প্রকাশিত হও আমার হৃদয়ে, আমার প্রেমে।

'গীতাঞ্জলি'র এই প্রার্থনা 'গীতিমাল্যে' অধিকতর প্রত্যয়দীপ্ত সুরচ্ছন্দে হয়েছে প্রকাশিত—

আমি হাল ছাড়লে তবে
তুমি হাল ধরবে জানি

—অহংয়ের জারিজুরি ত্যাগ করলে তবেই প্রেম, তুমি আবির্ভূত হবে আমির জীবনে।

অহং-প্রেম নয়, তুমি প্রেম জীবনে প্রতিভাত করে নবযৌবনের আনন্দে 'ধরণী'কে ভালবাসার কথা ঝংকৃত হয়েছে 'গীতালি'তে—

নূতন প্রেমে ভালোবাসি
আবার ধরণীরে।

বিশ্ববোধে দীক্ষিত এই 'নূতন প্রেমে'র ধ্বনিই বলাকা কাব্যে :

লবে তুমি, মোরে তুমি লবে, তুমি লবে
এ প্রার্থনা পুরাইবে কবে।

আমার অহং তো তুমি 'লবে' না, আমার প্রেমই তুমি 'লবে'। কবে প্রেম হয়ে উঠব—আমি তুমি হয়ে উঠব, হে প্রেম ?

'গীতাঞ্জলি'তে বলা হল :

প্রেমের হাতে ধরা দেব
তাই রয়েছি বসে।

'গীতিমাল্যে'—

এই জীবনের আলোকেতে
পারি তোমায় দেখে যেতে,
পরিয়ে যেতে পারি তোমায়
আমার গলার মালা।

'বলাকা'য় ঠিক এই-ই সুর। ভিন্ন ছন্দে—

প্রতীক্ষার দীপ মোর
নিমেষে নিবায়ে
নিশীথের বায়ে
আমার কণ্ঠের মালা তোমার গলায় পরে
লবে মোরে, লবে মোরে
তোমার দানের স্তূপ হতে
তব রিক্ত আকাশের অন্তহীন নির্মল আলোতে॥

বস্তুর উপকরণ বাড়িয়ে তোমাকে যে পাওয়া যায় না, এটা বুঝেছি। তাতে অহং-ই বাড়ে। অহংকে আর সইতে পারি না। সইতে পারি না 'এ ভিক্ষুক হৃদয়ের অক্ষয় প্রত্যাশা'।

আজ সব ছেড়ে তুমিটির যোগ্য হয়ে উঠতে চাই। জীবনের কর্মে ধর্মে জ্ঞানে আলাপে ও আচরণে হয়ে উঠতে চাই তোমারই হ্লাদিনী। 'আমার কণ্ঠের মালা' তোমার গলার যোগ্য হোক—এই প্রার্থনা। প্রেমের সাধনায় আমি তুমি হয়ে উঠব, আমির জীবনে প্রমুদিত হবে তুমির ইচ্ছা, অদৃশ্য তুমি আবির্ভূত হবে আমি-জীবনের আলোকে, এই ধ্বনি।

আমাকে তবে হয়ে উঠতে হবে—প্রেমবিধাতার এই নির্দেশ। দেবত্বের মহিমা প্রকাশে যত হব, ততই 'আমার কণ্ঠের মালা' তাঁর কণ্ঠের যোগ্য হবে। প্রেমের আমি হচ্ছি বিশেষ লীলারূপ, বিশ্বপ্রেমের আমি বিশেষপ্রেম। বিশ্বাভিমুখী গতির সাধনায় যতটুকু হব, ততটুকু গ্রহণ করেই তাঁর আনন্দ। 'গীতিমাল্যে' বলা হয়েছে—'অসীম ধন তো' তাঁর আছে, কিসের অভাব তাঁর, কেন তাঁর 'সাধ' মেটে না অসীম ধনেও ? না, অসীম যে নিত্য পূর্ণ, এক—অদ্বিতীয়। রসের আস্বাদ একে নয় সম্ভব। বিশেষ এই আমিটিকে তাই প্রয়োজন। আমি আসি, প্রেমের সাধনায় বিশেষ আমি, ইহজীবনেই অশেষ মহিমা করি প্রকাশ, আমির মধ্যে তাঁর ঘুম ভাঙে। তখনও কি তিনি দূরে, অসীমের রথে, থাকবেন গুহাহিত ? না।

তুমি রইবে না ঐ রথে
নামবে ধূলাপথে
যুগযুগান্ত আমার সাথে
চলবে হেঁটে হেঁটে॥

'বলাকা'র প্রেমেও এই তত্ত্বসৌন্দর্য—

আমি যাহা দিতে পারি আপনার প্রেমে
সিংহাসন হতে নেমে
হাসিমুখে বক্ষে তুলে নাও।

অর্থাৎ মোহে নয়, দম্ভে নয়, ঈর্ষায় নয়, ব্যক্তিগত

বা দলগত স্বার্থে নয়, বৃহতে রত হয়ে প্রেমে প্রমুদিত হয়ে যা দিই, যা প্রকাশ করি—তার মধ্যে অসীমের লীলানন্দ হয় প্রকটিত। মানুষ জীবনসাধনায় যখন ব্যক্তিসীমা অতিক্রম করে, তখনই 'দেবতার অমর মহিমা' ইহজীবনের আলোকেই হয় প্রকাশিত।

ব্যক্তিসীমার বন্ধন ত্যাগ করার বাণীসাধনা গানে যেমন, 'বলাকা'-কাব্যে-ও তেমনি। 'বলাকা'-কাব্যের পুনর্বিচার তাই প্রয়োজন। সুস্পষ্টভাবে অনুভব করার প্রয়োজন যে, গানের মন্ত্রগুলিই 'বলাকা'র গতিচ্ছন্দে কখনও যুগোচিত ভাষায় কখনও ধ্বনিগর্ভ ভাবের আনন্দে প্রকাশ-লাভ করেছে। গানের অন্তর্মুখী গতিই 'বলাকা'গতির প্রাণস্পন্দ। গানের আনন্দে কবি যদি 'কথারে ভাবের স্বর্গে' তুলে থাকেন, কাব্যের ব্যঞ্জনায় মানুষকে 'দেবপীঠস্থানে' তুলেছেন। গানের কথাগুলিকে ভাগবতী কথা মনে করে এতকাল আমরা আমাদের জীবন থেকে দূরে রেখেছিলুম, বুঝতে চাই নি যে, কবিগুরুর কাব্যগুলির মত এগুলিও মানবিক মহত্ত্বধ্যানেরই আনন্দশিল্প। কথাটা হাল-আমলে কিছুটা নতুন শোনালেও খুবই পুরাতন কথা, যে কবির গানগুলির মানবিক তাৎপর্য না বুঝলে তাঁর কাব্যসমূহের সুবিচার অতিবড় বুদ্ধিমান সমালোচকের পক্ষেও সম্ভব নয়।

'বলাকা'-কাব্যে যুগের কথা আছে, বাস্তব সমস্যার কথা আছে, কেউ কেউ বলেন, সমাজ-চেতনার প্রচারধর্মও নাকি আছে। যদি থাকেও তবু বলব, 'বলাকা'-কাব্যের এসব 'অসম্পূর্ণ রিয়াল'—'পরিপূর্ণ আইডিয়াল' বিরাজ করছে অন্যত্র। আসল কথা, গানের বেগেই 'বলাকা'-গতি। গানের মতই তা অন্তর্মুখী গতি-জীবনের অপ্রতিহত যৌবনোল্লাস। গানের প্রেমই এ-কাব্যের কেন্দ্রশক্তি।

গানে কবি স্বভাবসাধনায় যা পেয়েছেন, 'বলাকা'য় তা মানবসাধনায় আনতে চাইছেন। বলছেন, ওরে নবীন, ওরে জীবনগতির নিত্য উপাসক, ভোগান্ধ যারা 'চলতে চায় না'—সারা জীবন 'অচল আসনখানা মেলে' বসে আছে 'উচ্চ বাঁশের মাচায়'—চালাও তাদের। তোমরা তো 'সমুখ পানে' চলছ, 'সাগরগিরি' করছ 'জয়', 'মৃত্যুসাগর মথন করে অমৃতরস' আনবে বলে করছ পণ, কিন্তু কি হবে ওদের—যারা অহং-বিকারে অন্ধ হয়ে বেঁচে থেকেও আছে মরে, মোহের শিকলে বদ্ধ হয়ে গতানুগতিক তুচ্ছ জীবন করছে যাপন, অথচ ভাবছে ওরাই 'পরম পাকা', ওরাই 'প্রবীণ'?

জীবনসাধনায় দীপ্ত হয়ে তুমি তাদের আলো পার না দেখতে? 'শিকলদেবীর পূজাবেদীটা' মানুষের মনে ও মননে, জীবনে ও হৃদয়ে 'চিরকাল কি রইবে খাড়া'? নবীনের হে যৌবন, জীবন দিয়ে আমি জেনেছি, যুগে যুগে কালে কালে তুমি আসো। 'মরণবনের গহন কাঁটাপথে' জীবন-সাধনায় তোমাকে যেতে হয়। নও তুমি সংকীর্ণ গণ্ডীতে বন্দী। 'বয়সের এই মায়াজালের বাঁধনখানা' খণ্ডন করতে হয় তোমাকে। 'খড়্গসম তোমার দীপ্ত শিখা জরার কুজ্‌ঝটিকা' করে ছিন্ন।

তিমিরনাশী মহান সূর্যের তুমি উপমা। ঠিক বলা হল না—তুমিই সূর্য। প্রতিদিন তুমি নতুন—যুগে যুগে নতুন। আকাশে যে-তুমি সূর্য, মাটিতে সেই তুমি নবীনযৌবন :

সূর্য তোমার মুখে নয়ন মেলে
দেখে আপন ছবি।

সূর্যসুন্দর এই তুমি, জাগ্রত হও নবোদিত জীবনের ছন্দে। মোহোন্মত্ত 'জীবন আঁকড়ে ধরে মরণসাধন যারা' সাধছে, ত্যাগের মন্ত্রে ডাক দাও তাদের। 'শয়ন ছেড়ে' 'ঘুমের থেকে জেগে' ছুটে আসুক তারা। সংগ্রামে সংঘাতে অচল জীবনটা তাদের নাড়া পাক। প্রশংসা হয়তো পাবে না, কিন্তু নিন্দা প্রশংসায় কী এসে যায়! 'অমৃতের অধিকার' চেয়েছ, চাও নি তো সুখ, শান্তি, আরাম, বিশ্রাম। নূতনা পৃথিবী এবং নূতন মানুষের সন্ধানে 'রাত্রির তপস্যা' তোমার। এ-জীবনে যদি জয় নাও পাও, নবীনবেগে আবার এস নবরূপে, নতুন ধ্যান নিয়ে। প্রেম যদি জেনেছ, জীবন দিতে তা 'হতে' হবে, মৃত্যু দিয়ে 'করতে' হবে।

গানে বলা হল—

না বাঁচাবে আমায় যদি
মারবে কেন তবে?
কিসের তরে এই আয়োজন
এমন কলরবে?

এবং কাব্যে—

বীরের এ রক্তস্রোত মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা
স্বর্গ কি হবে না কেনা?

না—নবীনকে জীবন দিয়ে 'স্বর্গটি' রচনা করতে হবে। 'বলাকায়' নবীনের বাণীটি এই—

দিয়েছ আমার পরে ভার
তোমার স্বর্গটি রচিবার॥

সঙ্গীতস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে তাঁর সাহিত্য যদি লোকে ভুলে যায় তা হলেও তাঁর গান কখনও ভুলবে না। তাঁর গানকে তিনি সবচেয়ে ভালবাসতেন এবং শেষ-জীবনেও মনে রেখেছিলেন তাঁর কৈশোরের যৌবনের গানগুলি। সেগুলি তিনি সযত্নে রক্ষা করেছিলেন তাঁর স্মৃতির ভাণ্ডারে। এই যে দীর্ঘজীবনের অজস্র সঙ্গীত, তার সঙ্গে বহু চিন্তা জড়িত রয়েছে। আজ সেগুলি বিশ্লেষণ করে দেখবার সময় এসেছে।

রবীন্দ্রনাথ বাংলার সঙ্গীত, হিন্দুস্থানী সঙ্গীত, এমন কি ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত বিবিধ সঙ্গীত থেকে নানা বস্তু আহরণ করেছিলেন, কিন্তু কোথাও অনুকরণ করেন নি। হিন্দুস্থানী গানের ছকেই বাংলা শব্দ বসিয়ে গেছেন, কিন্তু তবুও তা হিন্দুস্থানী গানের "কার্বন কপি" হয় নি—রবীন্দ্রসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে বর্তমান। তাঁর সঙ্গীত-চিন্তার বৈশিষ্ট্যও এইখানেই। পরকে তিনি আপনার করে নিয়েছেন কিন্তু আপনাকে অপরের প্রভাবে হারিয়ে ফেলেন নি।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বেও একদা বাংলায় এই সঙ্গীত-চিন্তার প্রমাণ মেলে। উত্তরভারতে প্রচলিত টপ্পা থেকেই বাংলা টপ্পার উদ্ভব, কিন্তু হিন্দী টপ্পা আর বাংলা টপ্পায় তফাত অনেকখানি। হিন্দী টপ্পার রূপবন্ধ বাঙালীরা নিয়েছেন, কিন্তু যে জিনিসটা তাঁরা তৈরি করেছেন তা বাংলার কাব্য-সঙ্গীত। রবীন্দ্রনাথ এই পুরাতন বাংলা গানের সারল্য এবং অল্প কথার মধ্যে ব্যাপকতার রীতিকে গ্রহণ করলেন। এইখানেই তাঁর চিন্তার বিশেষত্ব। এ সম্বন্ধে তাঁর নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল বলে তাঁর ভাষা আধুনিক এবং বিশেষ পরিমার্জিত। তাঁর এই ধরনের গানের মধ্যে পুরাতনকে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁর স্বকীয়ত্বকে কোন ক্ষেত্রেই অস্বীকার করা যায় না।

> নয়ন মেলে দেখি আমায় বাঁধন বেঁধেছে
> গোপনে কে এমন করে এ ফাঁদ ফেঁদেছে
> বসন্ত রজনী শেষে বিদায় নিতে গেলেম হেসে
> যাবার বেলায় বঁধু আমায় কাঁদিয়ে কেঁদেছে।

এ গানের কাঠামো এবং ভঙ্গির সঙ্গে পুরাতন বাংলা গানের মিল খুব বেশী কিন্তু এ গান শুনলে এ যে রবীন্দ্রনাথের রচনা সেটা বুঝতে ভুল হয় না। এই ধরনের পুরাতন বাংলা গানের ঐতিহ্যকে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন কিন্তু প্রকাশভঙ্গির মধ্যে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করে গেছেন। আরও অনেক গানের উল্লেখ করা যায়, যেমন—"ও যে মানে না মানা", "ওগো শোন কে বাজায়", "বঁধু তোমায় করব রাজা তরুতলে" ইত্যাদি। প্রত্যেকটির মধ্যে পুরাতন গানের ঐতিহ্য রয়েছে অথচ প্রত্যেকটিই বিশেষভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত। "মরি লো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে" এটি রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত গান। একদিন এক প্রবীণ গায়কের সঙ্গে আলাপ উপলক্ষে এই গানটির কথা উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথের সুর শুনে তিনি বললেন, "এক সময় আমরা ওই গানটা খুব গাইতুম কিন্তু ওরকম সাদামাটা সুরে নয়—আমাদের ধরণ ছিল অন্যরকম।" তাঁর কাছে গানটি শুনলুম, একেবারে খাঁটি টপ্পা। শুনতে ভালই লাগল। জমজমা, বোলতান সমেত আসর জমানো গান, কিন্তু তাতে রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে পাওয়া গেল না। অথচ রবীন্দ্রনাথের সুরের খানিকটা

যে এই গানের মধ্যে ছিল না এমন নয়। আসলে রবীন্দ্রনাথের যে সঙ্গীতচিন্তা ছিল সেটি এই সুর এবং ঢঙের মধ্যে ছিল না। গানটি শুনে আমার উপকার হয়েছিল, প্রচলিত রীতি এবং রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ভঙ্গির মধ্যে কোথায় পার্থক্য সেটি ভাল করে বোঝবার অবকাশ পেয়েছিলাম।

"না বলে যায় পাছে সে আঁখি মোর ঘুম না জানে" অথবা "আমি যে আর সইতে পারি নে"—এই ধরনের গানের সঙ্গে পুরাতন বাংলার আড়-খেমটার নিবিড় সম্বন্ধ রয়েছে, কিন্তু তারই মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব প্রকাশভঙ্গিটি এমন বিশিষ্টভাবে স্থাপন করেছেন যে পুরাতন গানের ধরনের সঙ্গে এসব গানকে কোনক্রমেই মিলিয়ে দেবার উপায় নেই।

ভারতীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সুগভীর শ্রদ্ধা ছিল। স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী এবং আভোগ—এই চারটি কলিতে যে গানের একটি সম্পূর্ণ রূপ প্রকাশ পায় সেটি তাঁর মত খুব কম সুরকারই উপলব্ধি করেছেন। তাঁর আধুনিক কালের কয়েকটি আধুনিক রীতিতে রচিত গানেও এই ঐতিহ্য সুরক্ষিত হয়েছে। "শ্রাবণের পবনে আকুল বিষণ্ণ সন্ধ্যায়"—গানটি সব দিক দিয়ে আধুনিক, কিন্তু এর সংগঠনরীতি সম্পূর্ণ ধ্রুপদী ঢঙের। এই রকম এক একটি গানে ঐতিহ্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ দেড়শোরও বেশী হিন্দী গান ভেঙে বাংলা গান রচনা করেছেন। এ প্রচেষ্টা বাংলা গানকে জাতে ওঠাবার জন্য নয়, তাঁর সঙ্গীতচিন্তাকে রূপায়িত করবার জন্য। সেসব গানকেই তিনি বেছে নিয়েছিলেন যার মধ্যে কাব্যগুণ বর্তমান, যার সুর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। "রুমঝুম চরণে"—এ গানের কারুণ্য তাঁকে "শূন্য হাতে ফিরি হে" গানটি রচনায় উদ্বুদ্ধ করে।

"মুরলী ধ্বনি শুনি" গানটির মনোহারিত্বে মুগ্ধ হয়ে তিনি "চরণ ধ্বনি শুনি তব নাথ" গানটি রচনা করেন। এই যে হিন্দী গানের সুর তিনি আহরণ করেছেন, এর প্রত্যেকটির প্রকাশভঙ্গিতে একটি বৈশিষ্ট্য বর্তমান যা রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছে এবং তিনি সেই সুরটি তাঁর কাব্যে সংযোজন করে তাকে নতুনভাবে রূপায়িত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের মন চিরকালই বৈচিত্র্যপ্রয়াসী। বিবিধ সুরের আহরণের মধ্যে যেমন তিনি বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছিলেন তেমনি তাঁর নিজস্ব সুরেও নতুন চিন্তার বৈশিষ্ট্য বর্তমান। রবীন্দ্রনাথের শেষ যুগের গানে তানকর্তব বা বিস্তারের সুযোগ নেই। ভারতীয় সঙ্গীতে তান-বিস্তারের অবকাশ নেই—এটা ভাবা শক্ত। অপর প্রদেশের লোকেরা হয়তো এটা কল্পনাও করতে পারবেন না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে তান-বিস্তারের অপেক্ষা না রেখেও তাকে নানা বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ করে গেছেন। এইখানে তাঁর সঙ্গীতচিন্তার আর একটি আশ্চর্য পরিচয় পাওয়া যায়। তান-বিস্তারের অভাব তিনি মিটিয়েছেন কাব্যকে সুরের নানা অলঙ্কারে সাজিয়ে। কোন গানেই সুর শব্দকে ছাড়িয়ে যায় নি বিস্তারের ধরনে, কিন্তু শব্দের মধ্যে অতি শোভনভাবে আপনাকে মিলিয়ে দিয়েছে। ফলে কাব্য এবং সুরের এমন এক গভীর মিলন সাধিত হয়েছে যা একান্তভাবে রাবীন্দ্রিক। তাঁর ভাবধারা, তাঁর কল্পনা ছোট ছোট কাব্যাংশকে ঘিরে ছোট ছোট বিচিত্র অলঙ্কারে মূর্ত হয়ে উঠেছে। হিন্দী গানের পদ্ধতি নিজের গানে প্রয়োগ করতে তিনি কার্পণ্য করেন নি, কিন্তু হিন্দী গানের তান-বিস্তারের আবশ্যিকতাকে মেনে না নিয়েও যে গানে অজস্র বৈচিত্র্য প্রদর্শন করা সম্ভব সেইটাও তিনি অতি প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। এইখানেই তাঁর চিন্তার স্বকীয়তা।

ছন্দ এবং তালের দিক থেকেও রবীন্দ্রনাথ বিলক্ষণ চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। প্রচলিত নানা তালে তিনি গান রচনা করেছেন, কিন্তু প্রচলিত তালের ব্যতিক্রমের পরিকল্পনাও তিনি করেছেন। কাব্যের ছন্দকে স্বীকার করেও যে সঙ্গীত রচনা করা সম্ভব সেটা রবীন্দ্রনাথ হাতে-কলমে দেখিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর "সঙ্গীতের মুক্তি" প্রবন্ধ পাঠের সময়। বহুশত বৎসর পূর্বে যখন সংস্কৃত এবং প্রাকৃত গান গাওয়া হত তখন সঙ্গীতে তালের পরিবর্তে প্রচলিত ছন্দকেও স্বীকার করা হত। কত ছন্দ তো তালেই পরিণত হয়েছিল—যেমন তোটক্ পজ্ঝাটিকা, আর্যা প্রভৃতি। সে যুগে কেউ যদি কোন নির্ধারিত তাল না গ্রহণ করে মন্দাক্রান্তা ছন্দে মেঘদূত গাইতেন তা হলে সেইটাও বিদগ্ধ সঙ্গীত-সমাজে স্বীকৃত হত। সঙ্গীতশাস্ত্রে এই রীতির পরিচয় পাওয়া যায় এবং এ যুগে রবীন্দ্রনাথ দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করলেন যে বাংলা গানেও কাব্যের ছন্দকে বজায় রেখে সঙ্গীত সৃষ্টি করা সম্ভব। অবশ্য সংস্কৃতের সঙ্গে তুলনা করে রবীন্দ্রনাথ এ আলোচনা করেন নি, তিনি স্বাধীনভাবে চিন্তা করেই এ কথা বলেছিলেন কিন্তু তাঁর আগে বাংলায় এ কথা বলতে কেউ সাহস পান নি।

বহু দৃষ্টান্ত থেকেই সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় চিন্তার পরিচয় আমাদের বিস্মিত করে। আমাদের সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অসাধারণ এবং এই ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর সুনিবিড় পরিচয় ছিল বলেই তিনি গতানুগতিকতাকে অতিক্রম করবার নানা পন্থা উদ্ভাবন করতে পেরেছিলেন। মূলহারা নূতনত্বের উদ্ভাবনায় চিন্তার পরিচয় নেই; স্বাভাবিক বস্তুকে এক বিশেষ-পরিপ্রেক্ষিতে পর্যবেক্ষণ করে তাকে বৈচিত্র্যপ্রদান করাই হল চিন্তার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তা ছিল।

এক সন্ধ্যায়

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

[নিমতলা স্ট্রীটে বিহারীলাল চক্রবর্তীর বাড়ির ছাত। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ত্রয়োদশী কিংবা চতুর্দশী তিথি—প্রায় সম্পূর্ণ চাঁদ দেখা দিয়েছে আকাশে—জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে ছাতটি। দুখানি শীতলপাটি পাতা রয়েছে—একটির উপর মোটা তাকিয়ায় আধশোয়া ভাবে বসে আছেন বিহারীলাল; দাড়িগোঁফ কামানো পরিপুষ্ট নধর শরীর—বছর বিয়াল্লিশ বয়েস হবে। খালি গা—সাদা মোটা পৈতাটি বুকের ওপর জ্যোৎস্নায় ঝকঝক করে জ্বলছে। তাকিয়ার পাশে দু-গাছা বেলফুলের মালা।

আর একখানা শীতলপাটির উপর গুটিতিনেক অল্পবয়েসী ছেলে বসে আছে। এরা সবাই সংস্কৃত কলেজের ছাত্র]

বিহারীলাল

(মুগ্ধভাবে আবৃত্তি করছেন)

যশ্চাপ্সরোবিভ্রমমণ্ডনানাং
সম্পাদয়িত্রীং শিখরৈর্বিভর্তি।
বলাহকচ্ছেদবিভক্তরাগাম্
অকাল-সন্ধ্যামিব ধাতুমত্তাম্
আমেখলং সঞ্চরতাং ঘনানাং
ছায়ামধঃসানুগতাং নিষেব্য।
উদ্বেজিতা বৃষ্টিভিরাশ্রয়ন্তে
শৃঙ্গাণি যস্যাতপবন্তি সিদ্ধাঃ॥

একটি ছাত্র

হিমালয় আপনার খুব ভাল লাগে—না ?

বিহারীলাল

আশ্চর্য মনে হয়। যেন বিশাল জটা মেলে দিয়ে শঙ্কর ধ্যানে বসে আছেন। উপবীতের মত নেমে আসছে জাহ্নবীর ধারা—মাথার ওপর দিয়ে মেঘেরা ভেসে চলেছে দেবধূপের মত। অনন্তকাল ধরে মহাসমাধিতে মগ্ন হয়ে আছেন দেবাদিদেব—অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধান্নিবাত-নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্ !

দ্বিতীয় ছাত্র

কিন্তু আমাদের পণ্ডিতমশাই সেদিন বলছিলেন, কেবল অষ্টম-নবম-দশম সর্গই নয়—সমগ্র 'কুমারসম্ভব' কাব্যই রুচিহীন। এমন কি উমার রূপ বর্ণনাতেও মহাকবি কালিদাস সংযম রক্ষা করতে পারেন নি। বিশ্বনাথ যে বলেছেন—

বিহারীলাল

(ভ্রূকুটি করলেন) তোমাদের মল্লিনাথ-বিশ্বনাথের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। কাব্যের পণ্ডিতী ব্যাখ্যা আমার বোধগম্য হয় না। তত্ত্বকথা শিখতে চাও—'যোগবাশিষ্ঠ' পড় গে। আবার কাব্যের ছলে যদি

ব্যাকরণ শেখার ইচ্ছে থাকে—তা হলে সেজন্যে তো 'ভট্টি' রয়েছে। ও-সব আমার কাছে কেন ?

দ্বিতীয় ছাত্র

(অপ্রতিভ ভাবে) না—না, তা বলি নি। আমরা আপনার কাছে কাব্যের রসাস্বাদন করতেই আসি, পণ্ডিতী ব্যাখ্যা শুনতে নয়। কথাটা আমার মনে হল, তাই—

বিহারীলাল

হাসপাতালে ছাত্রেরা মড়া কাটে—জান তো ?

তৃতীয় ছাত্র

(ঘৃণায় নাসাকুঞ্চন করে) জানি। বৈদ্যবংশের ছেলে হয়ে মধু গুপ্ত—

বিহারীলাল

(বাধা দিয়ে) মধু গুপ্তের কথা থাক্। ভাল করেছে কি মন্দ করেছে সে আলোচনা আমাদের নয়। আমি বলছিলুম, মড়া কেটে অনেক জ্ঞানই হয়তো লাভ হয়—কিন্তু একটি মানুষ যে সুন্দর সেটা বোঝবার জন্যে চিরে-ফেড়ে একাকার করবার দরকার হয় না। রূপ দেখবার মত চোখ থাকলেই যথেষ্ট। আমি সেই রূপের দৃষ্টি দিয়েই কাব্যকে দেখি।

প্রথম ছাত্র

সেই জন্যেই তো আপনার কাব্যপাঠ আমাদের এত ভাল লাগে। ব্যাখ্যার চোটে হাঁপিয়ে উঠে আপনার কাছে ছুটে আসি।

বিহারীলাল

শ্রুতবোধ পড়েছ ?

দ্বিতীয় ছাত্র

পড়েছি।

বিহারীলাল

ওই বই থেকে ছন্দের তত্ত্ব শিখতে চাও শেখ—কিন্তু আর একটা জিনিস লক্ষ্য করতে বলি। ওর প্রত্যেক শ্লোকে প্রেয়সী নারীকে যে সম্বোধনটি করা হয়েছে—আমার মনে হয় রসিক পাঠকের দৃষ্টি সেদিকেই পড়া উচিত। উপেন্দ্রবজ্রা-হরিণীপ্লুতার তত্ত্বের চাইতে ওগুলো অনেক বেশী মূল্যবান।

[ষোল বছরের তরুণ রবীন্দ্রনাথ সিঁড়ির দিক থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন। নবীন শালতরুর মত দীর্ঘ দীপ্ত কান্তি, গায়ে জরির কাজকরা কামিজ, পরনে পাজামা, পায়ে সাদা কটকী চটিজুতো। কাছাকাছি এসে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন—উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় মনে হল গ্রীক ভাস্করের হাতে গড়া একটি শ্বেতপাথরের মূর্তি যেন। বিহারীলাল অন্যমনস্ক ছিলেন—আগন্তুককে দেখে সহসা যেন চকিত হয়ে উঠলেন]

বিহারীলাল

কে ?

রবীন্দ্রনাথ

আমি রবি।

বিহারীলাল

আরে এসো—এসো—বোসো।

[ছাত্রেরা উঠে দাঁড়াল]

প্রথম ছাত্র

আমরা তবে আজ আসি। অনেকক্ষণ বিরক্ত করলুম আপনাকে।

বিহারীলাল

না—না, সে কিছু নয়। তোমরা এলে তো আমি খুশীই হই।

[ছাত্রেরা প্রণাম করে বিদায় নিল। রবীন্দ্রনাথ তখনও দাঁড়িয়ে আছেন]

দাঁড়িয়ে কেন রবি ? বোসো—বোসো।

[রবীন্দ্রনাথ সামনের পাটিতে বসলেন]

রবীন্দ্রনাথ

দাদা আমাকে পাঠালেন।

বিহারীলাল

কে—জ্যোতি? আচ্ছা, সে পরে হবে। তার আগে—(গলা চড়িয়ে ডাকলেন) ওগো, কোথায় গেলে? ওগো—শুনছ?

[বিহারীলাল-গৃহিণী কাদম্বরী দেবী ঘোমটায় মুখ ঢেকে সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়ালেন]

আরে, লজ্জা কিসের? এ তো ঘরের ছেলে—ঠাকুরবাড়ির রবি। বেশ করে একগ্লাস সরবৎ নিয়ে এস দেখি ওর জন্যে।

রবীন্দ্রনাথ

না না—মানে আমার জন্যে—

বিহারীলাল

তোমার জন্যেই তো। এমন সুন্দর জ্যোৎস্না—এই হাওয়া—এর সঙ্গে একগ্লাস ভাল সরবৎ না হলে জমবে কেন? (গৃহিণীকে) আচ্ছা, তা হলে আমার জন্যেও আন।

[কাদম্বরী দেবী বেরিয়ে গেলেন]

তারপর, খবর কী বল।

রবীন্দ্রনাথ

দাদা 'ভারতী'র জন্যে লেখা চেয়েছেন। আর নতুন বৌঠান মনে করিয়ে দিয়েছেন আপনি অনেকদিন আমাদের ওদিকে আসছেন না।

বিহারীলাল

তোমার নতুন বৌঠানের তৈরী খাবার বহুদিন আমারও খাওয়া হয় নি—সেজন্যে শীগগিরই যেতে হবে বইকি। কিন্তু 'ভারতী'র লেখা এ মাসে বোধ হয় দিতে পারব না।

রবীন্দ্রনাথ

দাদা বিশেষ করে বলে দিয়েছেন।

বিহারীলাল

চেষ্টা করে দেখব। কিন্তু কথাটা কি জান? লেখার মেজাজ না এলে আমি শত চেষ্টাতেও কিছুতেই লিখতে পারি না।

রবীন্দ্রনাথ

বাংলাদেশের পাঠকেরা আরও বেশী করে আপনার কাছ থেকে পেতে চায়।

বিহারীলাল

চায়? (হাসলেন) তা হবে। কিন্তু পাঠকদের জন্যে তো আমি লিখি না। আমি নিজের কাছে নিজের কথা বলি। সে কথা যদি আর কারও ভাল লাগে—খুশী হই। ভাল না লাগলেও আমার দুঃখ নেই। (ধীরে ধীরে আবৃত্তি করলেন)

"বিচিত্র এ মত্তদশা
ভাবভরে যোগে বসা
অন্তরে জ্বলিছে আলো, বাহিরে আঁধার—"

[কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। তারপর]

অন্তরে সেই আলোর শিখাটি জ্বলে না উঠলে কিছুতেই লিখতে পারি না। একটা লাইনও নয়।

রবীন্দ্রনাথ

আপনার 'সারদামঙ্গল' আমার আশ্চর্য মনে হয়েছে। বৈষ্ণবসাহিত্যের পরে এমন কবিতা আমি আর পড়ি নি।

বিহারীলাল

বল কী! (হাসলেন) অনেকে তো বলেন আমার কবিতা পাগলের লেখা—পাগলামি! তা ছাড়া ভারতচন্দ্র আছেন, মধুসূদন রয়েছেন—

রবীন্দ্রনাথ

আমাকে মাপ করবেন। রাজসভার কবি ভারতচন্দ্রকে না হয় ক্ষমা করা যায়, কিন্তু মধুসূদন—

বিহারীলাল

(আশ্চর্য হয়ে) মধুসূদন তোমার ভাল লাগে না! 'মেঘনাদ বধ' ?

রবীন্দ্রনাথ

'মেঘনাদ বধ' সম্পর্কেই সব চাইতে বেশী আপত্তি আমার।

বিহারীলাল

সে কি! কেন?

রবীন্দ্রনাথ

আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারব কিনা জানি না। 'মেঘনাদ বধে' কল্পনার ঐশ্বর্য আছে, ভাষার সমারোহ আছে, আবেগেরও অভাব নেই। কিন্তু সব মিলিয়ে আমি কেমন তৃপ্তি পাই না। মনে হয় বড় নাটকীয়, বড় উচ্ছ্বাস-প্রধান। যতটা চকিত করে ততখানি আকুল করে না। চক্ষু-কর্ণের বিস্ময় জাগায় কিন্তু অনুভূতির গভীরে নিয়ে দোলা দেয় না।

বিহারীলাল

এ তোমার ব্যক্তিগত রুচির প্রশ্ন। বাঁশির সুর তোমার মন ভোলায়, তাই মৃদঙ্গের ধ্বনিতে তুমি খুশী হতে পার না। 'মেঘনাদ বধে'র মূল্য পরে তুমি একদিন বুঝবে।

রবীন্দ্রনাথ

তা হতে পারে। কিন্তু আপাততঃ—

[দ্বিধাভরে নীরব হয়ে রইলেন; কাদম্বরী দেবী একখানা রুপোর থালায় বসিয়ে দুটি শ্বেতপাথরের গ্লাস নিয়ে উপস্থিত হলেন। দুজনের সামনে গ্লাস দুটি নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন]

বিহারীলাল

(গ্লাস তুলে নিয়ে চুমুক দিয়ে) নাও হে, নাও, লজ্জা ক'রো না।

[রবীন্দ্রনাথও একটি গ্লাস নিলেন, আলগাভাবে ঠোঁটে ছোঁয়ালেন]

বিহারীলাল

তুমি কি লেখাপড়া একেবারে ছেড়েই দিলে?

রবীন্দ্রনাথ

(হাত থেকে গ্লাস নামিয়ে লজ্জিতভাবে) কী জানি! স্কুলের বাঁধা গণ্ডীতে আমার কিছুতেই মন বসে না। প্রাণ ছটফট করতে থাকে। শুনছিলুম, বাবামশাই আমাকে লণ্ডন ইউনিভার্সিটিতে পড়তে পাঠাবার কথা ভাবছেন। কিন্তু তাতেও আমার যে খুব সুবিধে হবে—তা মনে হয় না।

বিহারীলাল

(সশব্দে হেসে উঠলেন) তোমারও দেখছি আমার দশা। তুমি তো তবু ভাল ছেলে—শান্তশিষ্ট মানুষ, আমি ছিলুম যেমন ঘর-পালানো, তেমনি ডানপিটে। সংস্কৃত কলেজে দিনকয়েক আসা-যাওয়া—তারপরে ব্যাকরণের ভয়ে সোজা চম্পট!

রবীন্দ্রনাথ

কিন্তু সংস্কৃত কাব্যে আপনার এত অধিকার—ইংরেজি সাহিত্যে এমন অনুরাগ—

বিহারীলাল

কিছু না—কিছু না। অধিকার কোত্থেকে আসবে? নীলাম্বরবাবুর বুড়ো বাপের পাল্লায় পড়েছিলুম। সংস্কৃত কাব্যর রসে মাতাল—সেই বুড়োই আমায় নেশা ধরিয়ে দিলেন। আর ইংরেজি? সে তো নাছোড়বান্দা কৃষ্ণকমল হাতে ধরে যা দু-চার পাতা পড়িয়েছিল। কানাকড়ি নিয়েই কারবার করি—বিদ্যের পুঁজি বলতে কিছুই নেই আমার।

রবীন্দ্রনাথ

বি. এ., এম.এ. পাস তো আজকাল অনেকেই করছেন। কিন্তু আপনার মত এমন কবিতা তো কেউই লিখতে পারেন না।

বিহারীলাল

কী সর্বনাশ, শেষকালে তুমি আমার শিষ্য হতে যাচ্ছ নাকি? না না, ও সব কথা ভুলেও ভেবো না।

লেখাপড়া কর, পণ্ডিত হও—তোমাদের বাড়ির সবাই অনেক আশা রাখেন তোমার ওপর।

রবীন্দ্রনাথ

মিথ্যে আশা রাখেন ওঁরা। মেজদার মত আই-সি-এস আমি কোনদিন হতে পারব না। আমি আপনার মত কবিতা লিখতে চাই। কী আশ্চর্য কবিতা আপনার!

[আবৃত্তি করলেন]

"সহসা ললাট ভাগে
জ্যোতির্ময়ী কন্যা জাগে,
জাগিল বিজলী যেন নীল নবঘনে।
কিরণে কিরণময়
বিচিত্র আলোকোদয়
ম্রিয়মাণ রবিছবি, ভুবন উজলে।
চন্দ্র নয়, সূর্য নয়,
সমুজ্জ্বল শান্তিময়
ঋষির ললাটে আজি না জানি কী জলে!"

অপূর্ব!

[কিছুক্ষণ চুপ। বিহারীলাল উঠে দাঁড়ালেন। সরবতের গ্লাস পড়ে রইল। স্বপ্নাতুরের মত পায়চারি করতে লাগলেন। তারপর :]

বিহারীলাল

"ব্রহ্মার মানসসরে
ফুটে ঢল ঢল করে
নীলজলে মনোহর স্বর্ণ নলিনী"—

[বলতে বলতে ছাদের রেলিঙের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। শূন্যে আচ্ছন্ন দৃষ্টি ছড়িয়ে বলে চললেন]

"পাদপদ্ম রাখি তায়
হাসি হাসি ভাসি যায়
ষোড়শী রূপসী বালা পূর্ণিমা যামিনী॥"

[মন্ত্রমুগ্ধের মত কিশোর রবীন্দ্রনাথও তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। বিহারীলালের আবৃত্তি শেষ হলে]

রবীন্দ্রনাথ

এই তো Spirit of Beauty! এর কথাই তো শেলী বলেছিলেন।

বিহারীলাল

শুধু শেলীই নন। এই সৌন্দর্যলক্ষ্মীর স্পর্শ একবার যে পেয়েছে, এই অপরূপার দ্যুতিতে একবার যার দৃষ্টি আলো হয়ে গেছে—তার আর মুক্তি নেই। বুকের ভেতর দুঃখের প্রদীপ জেলে তার অনন্ত আরতি। সংসার, স্বার্থ, চাওয়া-পাওয়া সব মিথ্যে হয়ে যায় তার কাছে। "হাসিয়ে পাগল বলে পাগল সকল!" (একবার থামলেন—যেন নিজের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন) থাক্—আমার কথা ছেড়ে দাও। এমন জ্যোৎস্না রাত—গান শোনাও দেখি একটা।

রবীন্দ্রনাথ

(কিছু কুণ্ঠিতভাবে) এখন ?

বিহারীলাল

গান তো তোমার গলায় সব সময় রয়েছে। লজ্জা কেন ? শোনাও।

রবীন্দ্রনাথ

কী গাইব ?

বিহারীলাল

যা খুশি। তোমার নিজের লেখা।

[রবীন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ গুনগুন করলেন, তারপর আস্তে আস্তে ধরলেন :

"গোলাপফুল ফুটিয়ে আছে, মধুপ হোথা যাস্‌নে।
ফুলের মধু লুটিতে গিয়ে, কাঁটার ঘা খাস্‌নে—"]

বিহারীলাল

পিলু ? বাঃ!

রবীন্দ্রনাথ

[উৎসাহিত হয়ে গলা খুলে গান ধরলেন। তীক্ষ্ণ মধুর কণ্ঠের গানে জ্যোৎস্না রাত্রিটি যেন বিভোর বিহ্বল হয়ে উঠল]

"হোথায় বেলা, হোথায় চাঁপা শেফালী হোথা ফুটিয়ে
ওদের কাছে মনের ব্যথা বল্‌রে মুখ ফুটিয়ে—"

[গানের সুরে আকৃষ্ট হয়ে কাদম্বরী দেবী ফিরে এলেন। একটু দূরে রেলিঙ ধরে তিনিও দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলেন গান]

"ভ্রমর কহে হোথায় বেলা কোথাও আছে নলিনী
ওদের কাছে বলিব নাকো আজিও যাহা বলিনি।
মরমে যাহা গোপন আছে গোপনে তাহা বলিব,
বলিতে যদি জ্বলিতে হয় কাঁটারি ঘায়ে জ্বলিব।"

[গান শেষ হল। সুধাকণ্ঠের অপূর্ব গানটি যেন মূর্ছিত হয়ে রইল আকাশে বাতাসে। বিহারীলাল কিছুক্ষণ মগ্নদৃষ্টি মেলে রাখলেন আকাশের দিকে]

বিহারীলাল

(স্বগতোক্তির মত) ঠিক। এই হল কবির কথা। "বলিতে যদি জ্বলিতে হয় কাঁটারি ঘায়ে জ্বলিব।" যন্ত্রণা না থাকলে কবিতার জন্ম হয় না। আঘাত না পড়লে গান ওঠে না বীণায়।

রবীন্দ্রনাথ

আপনার ভাল লাগল গান ?

বিহারীলাল

কী বলছ ? হ্যাঁ, মন্দ লাগল না। তবে তোমার গলা এখনও জ্যোতির মত পরিষ্কার হয় নি। আর ভাবের দিক থেকে দ্বিজেন্দ্রবাবুর মত হতে আরও কিছুদিন সময় লাগবে।

[দূরে দাঁড়িয়ে একটু অস্বস্তি বোধ করলেন কাদম্বরী দেবী ; উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় দেখা গেল রবীন্দ্রনাথের দীপ্ত মুখের ওপর বিষণ্ণ নৈরাশ্যের ছায়া পড়েছে। ঠিক এইটে যেন তিনি প্রত্যাশা করেন নি]

বিহারীলাল

কী, রাগ করলে ?

রবীন্দ্রনাথ

(ম্লান হাসলেন) না না, রাগ করব কেন ? নতুন বৌঠানও এ কথা বলেন। বলেন, আপনার মত ভাব না আনতে পারলে আমি কোনদিন ভাল গান গাইতে পারব না—বড় কবিও হতে পারব না।

বিহারীলাল

আমি নই—আমি নই। যদি বড় হতে চাও—দ্বিজেন্দ্রবাবুকে বুঝতে চেষ্টা ক'রো।

রবীন্দ্রনাথ

(মৃদু নিঃশ্বাস ফেলে) আচ্ছা। (একটু দ্বিধা করে) 'ভারতী'তে আমার "কবিকাহিনী" দেখছেন আপনি ?

বিহারীলাল

(মৃদু হেসে) দেখছি।

রবীন্দ্রনাথ

যদিও সংকোচ হয়, তবু আপনার মতামত যদি একটু জানতে পারি—(দ্বিধাভরে থামলেন)

বিহারীলাল

[মুখের ওপর হাসিটি টেনে রেখে আবৃত্তি করলেন]

"মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিত্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশু-লভ্যে ফলে লোভাৎ উদ্বাহুরিব বামনঃ"—

জান তো শ্লোকটা ?

রবীন্দ্রনাথ

(বিবর্ণ মুখে) জানি। অর্থটাও মনে আছে।

বিহারীলাল

মহাকবি কালিদাস পর্যন্ত এ কথা বলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। তুমি ছেলেমানুষ—এখনি এত ব্যাকুল হচ্ছ কেন ? অপেক্ষা কর—অপেক্ষা কর।

[কাদম্বরী দেবী আবার অস্বস্তিতে নড়ে উঠলেন। রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে রইলেন মাথা নীচু করে, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন]

রবীন্দ্রনাথ

আজ আসি তা হলে। কিন্তু লেখার কথা দাদাকে কী বলব ?

বিহারীলাল

ব'লো, পরশু আমি যাব তাঁর সাহিত্যবৈঠকে। আর নতুন বৌঠানকে জানিয়ো পেটুক কবির জন্যে যেন কিছু ভাল খাবার-দাবার তৈরি করে রাখেন।

রবীন্দ্রনাথ

আচ্ছা।

[ধীরে ধীরে চললেন সিঁড়ির দিকে—তারপর অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কাদম্বরী দেবী স্বামীর কাছে এগিয়ে এলেন]

কাদম্বরী

এ কিন্তু তোমার ভারী অন্যায়।

বিহারীলাল

(অন্যমনস্কভাবে) কিসের অন্যায় ?

কাদম্বরী

এত চমৎকার গাইলে—এমন সুন্দর ভাব, সুন্দর ভাষা—তুমি মন খুলে একটু প্রশংসা করতে পারলে না ? বেচারী মুখ কালো করে চলে গেল।

বিহারীলাল

(হেসে) দাঁড়িয়ে শুনলে বুঝি ?

কাদম্বরী

শুনলুম বইকি। আর ওর "কবিকাহিনী"কে তো কী সব সংস্কৃত বলে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিলে।

বিহারীলাল

উড়িয়ে দিলুম ? "কবিকাহিনীকে" ? কী শক্তি ওর "কবিকাহিনী"তে—কী তার ভাব, কী তার গভীরতা ! আমি তাকে উড়িয়ে দিতে পারি ? নিজের কবিতার চেয়েও যে ওর লেখা আমার বেশী ভাল লাগে—বারবার পড়তে পড়তে কণ্ঠস্থ হয়ে যায় (আবৃত্তি করতে লাগলেন :)

"মানুষের মন চায় মানুষেরি মন—
গম্ভীর সে নিশীথিনী, সুন্দর সে উষাকাল
বিষণ্ণ সে সায়াহ্নের ম্লান মুখচ্ছবি,
বিস্তৃত সে অম্বুনিধি, সমুচ্চ সে গিরিবর,
আঁধার সে পর্বতের গহ্বর বিশাল···
···পারে না পূরিতে তারা, বিশাল মানুষ-হৃদি,
মানুষের মন চায় মানুষেরি মন—"

কাদম্বরী

আচ্ছা, এতই যদি ভালবাস ওর কবিতা, তবে মুখ ফুটে সেটা ওকে একটুখানিও বলতে পারলে না। শুধু কষ্টই দিলে ?

বিহারীলাল

কষ্ট তো দিই নি—একটু আঘাত দিলুম। সে আঘাতে ওর বীণায় আরও বেশী করে সুর বাজবে। ও সাধারণ নয়—'সারদামঙ্গলে' যে বাল্মীকিকে আমি ধ্যানের মধ্যে দেখেছি—বাস্তবে সেই রূপ প্রত্যক্ষ করছি ওর ভেতর। "যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে" ওরই ললাটে আসন বিছিয়েছেন—সে আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। দেখছি সারা দেশ নতুন বাল্মীকির জন্যে অপেক্ষা করে আছে। তাই তো দুঃখ দিয়ে ওর শক্তিকে জাগাতে চাই—বলি, "জাগৃহি ত্বং—জাগৃহি ত্বং" ! আজ নয়—একদিন সে-কথা ও বুঝবে !

[বিহারীলাল নীরব হলেন—দৃষ্টি মেলে দিলেন আকাশের দিকে। আর কাদম্বরী দেবী দুটি আয়ত বিশ্বস্ত চোখ মেলে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন]

রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক মন

শিবনারায়ণ রায়

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর গত উনিশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে পঁচিশে বৈশাখের পূজা-অনুষ্ঠান আড়ম্বরে এবং সংখ্যাধিক্যে দুর্গাপূজাকেও প্রায় হার মানাতে বসেছে। কলকাতার তো কথাই নেই—এখানে পার্কে, মাঠে, অলিগলিতে "সর্বজনীন" রবীন্দ্রোৎসবের ঘটা। সম্প্রতি মফস্বলেও এই রৌদ্রদগ্ধ এবং লবণাক্ত মাসের বিরূপতাকে অগ্রাহ্য করে উৎসাহী নাগরিকরা নাচগান-থিয়েটারের মারফত কবির জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনে অতিশয় ব্যস্ত। প্রাচীন অথবা অর্বাচীন কোনও পত্রপত্রিকার পক্ষেই এ উপলক্ষে বিশেষ রবীন্দ্রসংখ্যা বার না করে উপায় নেই। ফলে রবীন্দ্রপূজার যাঁরা সনদপ্রাপ্ত পুরোহিত (তাঁদের মধ্যে কেউ-বা বক্তা, কেউ-বা লেখক, কেউ হয়তো অভিনেতা কি গাইয়ে, অর্থাৎ উদ্যোক্তাদের ভাষায় "আর্টিস্ট"), তাঁদের বাজার সম্প্রতি সরগরম।

এ থেকে মনে হতে পারে যে বাংলাদেশের "জনগণে"র উপরে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব গত দু-দশক ধরে বুঝি-বা বেড়ে চলেছে। কিন্তু শাঁখ ঘণ্টা বাজিয়ে কোনও ব্যক্তির প্রতিকৃতিতে মালা ঝোলানো আর তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার উত্তরাধিকারে নিজেকে সমৃদ্ধ করা ঠিক এক ব্যাপার নয়। বুদ্ধদেব তাঁর মৃত্যুকালে সমাগত বিমর্ষ শিষ্যপ্রশিষ্যদের শেষবারের মত স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে প্রকৃত বৌদ্ধ তাঁকেই বলা যায় যিনি নিজের অন্তর্নিহিত অগ্নিশিখার আলোকে পথ চলতে সক্ষম, তিনি পথনির্দেশের জন্য অন্যের উপরে নির্ভর করেন না। প্রকৃত বৌদ্ধের পক্ষে বুদ্ধকে উপাসনা করা শুধু নিষ্প্রয়োজন নয়, তার দ্বারা বুদ্ধের আজীবন প্রয়াসকে ব্যর্থ প্রতিপন্ন করা হয়। এই সতর্কবাণী সত্ত্বেও বুদ্ধভক্তদের একটি প্রধান অংশ উক্ত নির্বাণসাধক জ্ঞানীপুরুষকে দেবতায় পর্যবসিত করতে দ্বিধা বোধ করে নি। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমাদের দেশে সেই একই ট্রাজেডির পুনরাবৃত্তি দেখা যাচ্ছে।

আমার এই অভিযোগের মধ্যে যে কিছুমাত্র অতিশয়োক্তি নেই, রাবীন্দ্রিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে রবীন্দ্রজন্মোৎসব অনুষ্ঠানগুলির একটু তুলনা করলেই সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না। যিনি সারাজীবন সৌন্দর্য এবং শুচিতার সাধনা করে গেলেন তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে গিয়ে উদ্যোক্তারা নিজেদের যে রুচিকে প্রকটিত করেন তাতে সুষমা দূরের কথা, পরিচ্ছন্নতাবোধের আভাস পর্যন্ত দুর্লভ। বিরাট প্যাণ্ডেলের নীচে হৈহুল্লোড়-লোভী জনতার ঘর্মাক্ত সমাবেশ; "তারকাদে"র ভাড়া করার জন্য বেহায়া প্রতিযোগিতা; লাউডস্পীকারের প্রচণ্ড উচ্চনাদ; মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, নিদেনপক্ষে লক্ষ্মীমন্ত ব্যবসায়ী অথবা শক্তিমান দলীয় মাতব্বরদের (যাঁরা জীবনেও 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র পাতা উলটে দেখেছেন কিনা সন্দেহ) পৃষ্ঠপোষণা পাবার জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম; অনুষ্ঠানের বিবরণ (সম্ভব হলে ছবিসমেত) কাগজে বার করার জন্য দৈনিক সংবাদপত্রের কর্তৃপক্ষের পায়ে অপর্যাপ্ত তৈলনিষেক—রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিকে অপমান করার জন্য এর চাইতে বেশী আর কি ব্যবস্থা করা চলত, তা তো আমি জানি নে। যে মহাশিল্পীর অমিত কল্পনা দীর্ঘ প্রায় ত্রিপাদশতাব্দী কাল ধরে নিত্যনূতন রূপের জন্ম দিয়েছিল, তাঁকে স্মরণ করতে গিয়ে ভক্তরা বছরের পর বছর গতানুগতিক একই কর্মসূচী অনুসরণ করা ছাড়া উপায় খুঁজে পান না। যিনি সত্যনিষ্ঠার প্রয়োজনে গান্ধীজির বিজ্ঞানবিমুখ আদর্শবাদের প্রখর সমালোচনা করে একদা এদেশে প্রচুর অপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে অথবা লিখতে গেলে এখনকার ব্যাখ্যাতারা শুরু থেকেই ভক্তিতে গদগদ হয়ে ওঠেন। যিনি এদেশে বিশ্বনাগরিকতার প্রধান প্রবক্তা এবং প্রতিভূ, তাঁকে আমরা হ্রস্বকায়, স্বাজাত্যাভিমানী, কর্তাভজা, উচ্ছ্বাসপ্রবণ বাঙালীর ছাঁচে ফেলে নিজেদের বাঙালীত্ব নিয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠি। "স্ত্রীর পত্র" থেকে "নামঞ্জুর গল্প" এবং "ল্যাবরেটরী"র প্রোজ্জ্বল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লেখককে আমরা ঘষেমেজে মসৃণ ডিম্বাকৃতি শালগ্রামশিলায় রূপান্তরিত করে নিয়েছি। এখন বুঝি-বা চরণামৃত পানে মোক্ষপ্রাপ্তি আমাদের একমাত্র কাম্য।

দুই

ফলতঃ বাঙালী জনসাধারণের উপরে গত দুই দশকে রাবীন্দ্রিক সাধনার বিশেষ প্রভাব পড়েছে, এ কথা কোন ক্রমেই মানা চলে না। বরং উলটে বলা যায় যে তাঁকে নিয়ে যুথবদ্ধ অনুষ্ঠানের ঘটা যত বাড়ছে, বাঙালী ততই তাঁর মানসলোকের সান্নিধ্য থেকে চ্যুত হচ্ছে। এতে রবীন্দ্রনাথের অবশ্য কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হবার আশঙ্কা নেই। অতীতের আরও অনেক মহাপ্রতিভার মত তাঁকেও হয়তো অন্যদেশ এবং অন্যকালের অন্বিষ্ট পাঠকপাঠিকারা নতুন করে আবিষ্কার করবেন। লোকসান একান্তভাবেই আমাদের। জার্মানী যেমন গোয়েটের উত্তরাধিকারকে বিসর্জন দিয়ে শেষ পর্যন্ত হিট্‌লার নামে এক অর্ধোন্মাদের প্ররোচনায় সাবিক বিনাশের পথ অবলম্বন করেছিল, আমাদের ক্ষেত্রেও তেমন আশঙ্কা হয়তো একেবারে কষ্ট-কল্পনা নয়। অন্ততঃ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কালে আমাদের যে রেকর্ড, তা তো এই ধরনের ভয়াবহ ভবিষ্যতেরই ইঙ্গিত করে।

যাই হোক বাংলার জনগণের উপরে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের ব্যর্থতা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। আমার ধারণা যে বাংলাদেশে রবীন্দ্রোত্তর যুগের যাঁরা প্রধান মনীষী এবং শিল্পী, তাঁদের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের ব্যবধান গত বিশ বছরে অনেক বেশী বিস্তৃত এবং সেকারণে প্রকট হয়ে উঠেছে। হুজুগবাজ রবীন্দ্রপূজারীদের বিরুদ্ধে যে তামসিক স্থূলতা এবং মূঢ়তার অভিযোগ আমি করেছি, এঁদের সম্পর্কে তেমন কোনো অভিযোগ অকল্পনীয়। এঁদের মধ্যে অনেকে রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় তিরিশের দশকে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। প্রতিভার দিক থেকে অবশ্য এঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা করা চলে না। তা সত্ত্বেও এঁরা প্রত্যেকেই শক্তিমান এবং স্বাতন্ত্র্যসমন্বিত লেখক ও ভাবুক। এঁদের রচনার মধ্যে যে মনোজগৎ প্রকাশ লাভ করেছে তা একান্তভাবে আধুনিক এবং সে মতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ। সত্য বটে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর অপূর্ব উদ্ভাবনা এবং জীবনব্যাপী অধ্যবসায়ের দ্বারা বাংলা ভাষার যে সমৃদ্ধিসাধন করে গেছেন, তার উপস্থিতি ব্যতিরেকে এঁদের পক্ষে আত্মপ্রকাশ অসম্ভব হত। কিন্তু সেই ভাষার মাধ্যমে এঁরা যে ভাব এবং ভাবনাকে রূপ দিয়েছেন, 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র মধ্যে তার কোনও সূত্র মেলে না।

রবীন্দ্রনাথ দুটি সম্পন্ন ঐতিহ্যের মধ্যে মিলন ঘটিয়েছিলেন। তার প্রথমটি হল ভারতবর্ষের ঔপনিষদিক ঐতিহ্য। ঋষিদের মত তিনিও অনুভব করেছিলেন যে এই বিশ্বজগৎ কোনও কল্যাণময় উপস্থিতির বিচিত্র বহিঃপ্রকাশ মাত্র, যে সংসারের সমস্ত দুঃখ, সংঘাত, ভাঙাচোরার অন্তরালে এমন কোন চৈতন্যময় পুরুষ বর্তমান যিনি সবকিছুতেই নিয়ত সুষমা এবং সংগতি দান করছেন। সুতরাং যে ফুল না ফুটে ঝরে যায় সেও নাকি ব্যর্থ নয়; যে মানুষ অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করে অকালে মারা গেল, তার জীবনেও নাকি কোন মহৎ উদ্দেশ্য গোপনে সার্থকতা লাভ করেছে। বলা বাহুল্য, এ জাতীয় বিশ্বাসের যাথার্থ্য যুক্তি দিয়ে প্রমাণ্ করা যায় না। তবে যাঁরা আন্তরিকভাবে এই তত্ত্বে বিশ্বাসী তাঁদের পক্ষে একদিকে যেমন জগৎকে মধুময় বলে কল্পনা করা সহজ, অন্যদিকে তেমনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধর্মরূপে কল্পিত এই সুমিতি এবং কল্যাণবোধকে ব্যক্তির জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তোলার চেষ্টা স্বাভাবিক। তাঁদের এই বিশ্বাসের দার্শনিক ভিত্তি বিশেষ মজবুত নয় বটে; তা সত্ত্বেও এ কথা স্বীকার্য যে এই বিশ্বাস অনেকের মনে প্রকৃতি-প্রেম, করুণা, ধৈর্য, প্রীতি, সৌন্দর্যচেতনা, নির্ভীকতা ইত্যাদি নানা মানবীয় সদ্‌গুণের বিকাশে সাহায্য করে। রবীন্দ্রনাথের গান এবং কবিতার একটা বড় অংশ সুস্পষ্ট ভাবে এই বিশ্বাসের দ্বারা উদ্বুদ্ধ; তাঁর গল্প, উপন্যাস, নাটক এবং বহু প্রবন্ধের মধ্যেও এই ঔপনিষদিক ঐতিহ্যের ফলপ্রসূ প্রভাব লক্ষণীয়।

রবীন্দ্রপ্রতিভার মধ্যে অপর যে মহৎ ঐতিহ্যের স্বীকরণ ঘটেছিল সেটি হল রেনেসাঁস-উত্তর পশ্চিমের মানবতন্ত্রী ঐতিহ্য। মানবতন্ত্রীরা জড়জগতের পিছনে কোন ঐশ্বরিক অস্তিত্বের কল্পনা ছাড়াই একদিকে ইন্দ্রিয়-

গ্রাহ্য প্রকৃতি সম্বন্ধে গভীরভাবে কৌতূহলী, এবং অপরদিকে মনুষ্যত্বের বিচিত্র সম্ভাবনা আবিষ্কার করে উৎফুল্ল। এঁরা প্রতিটি মানুষের অনন্যতা এবং স্বতঃসিদ্ধ মূল্যে বিশ্বাসী; এঁদের উপলব্ধিতে মানুষমাত্রই সৃজনক্ষম এবং সেকারণে আপন ভাগ্যবিধাতা; এবং মানুষের মধ্যে যে বিচারশক্তি বর্তমান তারই বিকাশের দ্বারা সত্যমিথ্যা, সুন্দর-অসুন্দর, উচিত-অনুচিতের পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভবপর। মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ এঁদের কাম্য; এবং তার জন্য এঁরা যেমন একদিকে ব্যক্তির চরিত্রে নানা পরস্পরবিরোধী বৃত্তির মধ্যে সৌষম্য অর্জনে উদ্যোগী, অপর দিকে তেমনি বিভিন্ন ব্যক্তির ভাবনা, কামনা এবং ব্যবহারের মধ্যে সহযোগিতা এবং সহনশীলতার ভিত্তিতে বহুবাচনিক ঐক্য রচনায় সচেষ্ট। এই ব্যক্তিজীবনের সুষমা এবং সর্বমানবীয় সঙ্গতি গড়ে তোলার জন্য এঁদের প্রধান নির্ভর হল শিক্ষা। শিক্ষার ফলে মানুষের যুক্তি-সামর্থ্য বিকশিত হয়, সৃষ্টির ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, অনুভূতি সূক্ষ্মতা লাভ করে, বিবেকবোধ বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে, হৃদয়বৃত্তি পরিপুষ্ট এবং মার্জিত হয়। এই মানবতন্ত্রী জীবনদর্শন রেনেসাঁসের সময়ে পশ্চিম ইয়োরোপের বহু মনীষীর জীবনে, চিন্তায় এবং ক্রিয়াকলাপের মধ্যে প্রকাশ লাভ করে, এবং পরবর্তীকালে মুখ্যতঃ এরই প্রেরণায় প্রথমে ইয়োরোপে এবং পরে অন্যান্য দেশেও উদারতন্ত্রী সমাজ-সংস্কৃতি বিকশিত হয়ে ওঠে। উনিশ শতকে ইংরেজী শিক্ষার মারফত এই জীবনদর্শনের সঙ্গে বাঙালী-ভাবুকদের পরিচয় ঘটে এবং তার ফলে এদেশে মনস্বিতা, কল্পনা এবং বিবেকবোধের নৈসর্গিক পুনরুন্মেষ দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় এই দুই ধারা পরস্পরে যুক্ত হয়েছিল। তাঁর অধিকাংশ গানে এবং দার্শনিক রচনার মধ্যে ঔপনিষদিক ধারার প্রভাব বেশী স্পষ্ট। তাঁর গল্প, উপন্যাস, নাটক, সামাজিক প্রবন্ধাদিতে রেনেসাঁসী মানবতন্ত্রের বীজ আশ্চর্য ফসলে সার্থকতা লাভ করেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবনকালের শেষ পঁচিশ বছরের মধ্যে পৃথিবীর মানস ইতিহাসে এক নৈসর্গিক বিপর্যয় ঘটে। একদিকে দুই মহাযুদ্ধ এবং বিভিন্ন দেশে সাবিক ডিক্টেটরশিপের অভিজ্ঞতা, অন্যদিকে মানবচরিত্রের আত্মঘাতী-প্রবণতা বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞান চিন্তাশীল মানুষদের মনেও শুভনাস্তিক্যের ভাবকে প্রবল করে তোলে। গত তিরিশ চল্লিশ বছরের মধ্যে পৃথিবীর নানা দেশে শিল্প, সাহিত্য অথবা দর্শনের ক্ষেত্রে যাঁরা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তাঁদের লেখায় এই বিপর্যয়ের চেতনা প্রবল-ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বিশ্বজগৎ কোনও মঙ্গলময় ঈশ্বরের দ্বারা সৃজিত এবং পরিচালিত, এ কথায় বিশ্বাস রাখেন এমন ভাবুক অথবা লেখক আজকের দিনে নিতান্ত দুর্লভ। অপরপক্ষে সুষমার সাধনা যে মানবপ্রকৃতির সামান্য-লক্ষণ, নিজের চেষ্টায় নিজেকে গড়ে তোলা যে প্রতিটি মানুষেরই সাধ্যায়ত্ত, লুবিয়াঙ্কা, বেল্‌সেন কিংবা হিরোশিমার অভিজ্ঞতার পর এবংবিধ মানবতন্ত্রী প্রত্যয়ে অবিচলিত থাকা আজ সুকঠিন। ফলতঃ আধুনিক মন উপনিষদ এবং রেনেসাঁসী মানবতন্ত্র—উভয় ঐতিহ্য থেকেই বিযুক্ত। এবং এই আর্ত, দ্বিধাগ্রস্ত, নৈরাশ্যবাদী মনের প্রভাব আজ শুধু পশ্চিমে আবদ্ধ নেই, বাংলা দেশের নব্য ভাবুক এবং লেখকদের উপরেও তার প্রভাব দ্রুতবর্ধমান।

তিন

ফলে যদিও রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর এখনও বিশ বছর অতিক্রান্ত হয় নি, তবু তাঁর মানসলোকের সঙ্গে আমাদের যোগ আজ অত্যন্ত দুর্বল। আমরা যারা দুই মহাযুদ্ধের মাঝখানে বড় হয়েছি, তাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ গোয়েটের মতই দূরলোকের অনাত্মীয় নক্ষত্র। বলতে কি, গোয়েটের চাইতেও তিনি দূরবর্তী। কারণ আউফ্‌ক্লেরুঙের ওই মহাকবির কল্পনায় আমাদের আর্তির কিছুটা অন্ততঃ আভাস দেখা দিয়েছিল। উনিশ শতকের মধ্যভাগে বোদ্‌লেয়র কি ডস্টয়েভস্কি থেকে শুরু করে বর্তমান কালে হাক্সলি, এলিয়ট, সার্ত্র প্রমুখ সমকালীনদের রচনায় রেনেসাঁসী সংস্কৃতির যে আত্মক্ষয়-চেতনা ক্রমে প্রখর হয়ে উঠেছে, "ফাউস্ট" মহাকাব্যে তার নিগূঢ় ইঙ্গিত চোখে পড়ে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গোয়েটের মেফিস্টোফেলেস-তত্ত্বে পারদর্শী ছিলেন না। তাঁর শেষ বয়সের কোনও কোনও

সমসাময়িকদের প্রতি তিনি সকৌতুক স্নেহে স্বাগত জানিয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁদের অন্তর্মুখী সাধনার স্বরূপটি তিনি অনুমান করতে পারেন নি। আসলে আন্তঃসামরিক আধুনিকদের সঙ্গে তাঁর শুধু বয়সের নয়, মেজাজের অলঙ্ঘ্য ব্যবধান ছিল। এঁদের মধ্যে যাঁরা শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে বিশেষ পরিচয়-সম্বন্ধের সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁরাও এ ব্যবধান পেরিয়ে তাঁর ঐতিহ্যের অংশভাক্ হতে পারেন নি। আধুনিকদের কাছে রবীন্দ্রনাথ তাই মহাকাব্যের নায়কের মতই অনাত্মীয়, প্রায় গৌরীশঙ্কর চূড়ার মতই অনারোহ। শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে মাথা নত হয়, কিন্তু মন সঙ্গ পায় না।

শুধু একটি ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। সে হল চিত্রকলার মাধ্যমে ওঁর শেষ বয়েসের পরীক্ষা-নিরীক্ষায়। সত্তার অস্বীকৃত অন্ধকারলোক থেকে এ ছবিগুলির জন্ম। এদের জগতের সঙ্গে আধুনিক মেজাজের যে আত্মীয়তা আছে, রবীন্দ্রনাথের অন্য কোনও রচনার সঙ্গেই সে আত্মীয়তা নেই। এখানে মহাকবি অজ্ঞাতে স্বধর্মদ্রোহিতা করেছেন। ফলে এখানে শুধু যে তাঁর শিল্পের হাতই অপটু তা নয়, তাঁর কল্পনায় ধ্যানের ঐকান্তিকতাও অবর্তমান। অথচ এদের মধ্যে এমন একটা বিক্ষুব্ধ প্রাণ-শক্তি আছে যে এদের কিছুতেই অবহেলা করা যায় না। কিন্তু কবি তাঁর এই বিক্ষোভকে ভাষার আত্মচেতন সুরে পরিণতি পেতে দিলেন না। যদি দিতেন, অন্ততঃ যদি চেষ্টাও করতেন, তবে হয়তো তাঁর পরিপূর্ণতা আর আমাদের আর্তির মাঝখানে মনজানাজানির এক সেতুবন্ধ গড়ে উঠত। মধ্যযুগ আর রেনেসাঁসের মাঝখানে সেই সেতুবন্ধ গড়েছিলেন দান্তে, রেনেসাঁস আর আমাদের কালের মাঝখানে সেতুর কিছুটা গড়ে গেছেন গোয়েটে। তাঁরা শুধু আপনকালের কবি নন, এমন কি শুধু নিত্যকালের কবি নন—তাঁরা যুগান্তরের কবি। রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতাব্দীর সবচাইতে প্রতিভাবান কবি হয়েও "ডিভাইন কমেডি" বা "ফাউস্ট"-এর মত কোনও মহাকাব্য রচনা করেন নি। সব সৎকাব্যের মত তাঁর কাব্যেও নিত্যকালের আবেদন আছে। কিন্তু আমাদের এই বিশেষকালের রূপটি তাঁর সৃষ্টিতে ধরা পড়ল না।

চার

আর ঠিক এই কারণেই এমন অতুল ঐশ্বর্য, অমিত উদ্ভাবনাশক্তি, দুর্লভ চিৎপ্রকর্ষ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে আজ অগমদেশের বার্তাবহ আগন্তুক। তাঁর সৃষ্টিকে আমরা জানি, কিন্তু স্রষ্টা শেষ পযন্ত রয়ে গেলেন আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। জীবনের যে-সব অন্ধকার রাতে আত্মোদ্‌ঘাটনের আতঙ্কিত নীল বিদ্যুতে মুখশ্রীর অন্তরালকার সযত্ন-আচ্ছাদিত আত্মা আর্ত বিস্ফোরণে প্রকাশিত হয়, তাঁর জীবনে তেমনতর রাত কি কখনো আসে নি? নিটোল, নিটোল, আশ্চর্য অক্ষত তাঁর কল্পনার কৌমার্য, হাইনের ভাষায় বলতে হয়: So hold und schoen und rein (এত মধুর আর সুন্দর আর নিষ্কলঙ্ক)। হয়তো সব সময়ে মধুর নয়, কিন্তু সব সময়েই সুন্দর, সব সময়েই নিষ্কলঙ্ক। অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁকে জীবনশিল্পী বলেছেন। আমরাও সেকথা মানি। ধ্রুপদী, প্রায় নৈর্ব্যক্তিক সে শিল্প, কোথাও সুমিতির সীমা লঙ্ঘন করে না। অলঙ্কারশাস্ত্রে যাকে ব্রহ্মাস্বাদ বলেছে, এ শতাব্দীর কোনও কবির সৃষ্টিতে যদি তার সন্ধান করতে হয় তবে সে কবি নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথ।

কিন্তু আজকের দিনের যাঁরা অনুভূতিশীল লেখক এবং পাঠক, যাঁদের মন দুই যুদ্ধের মাঝখানে গড়ে উঠেছে, তাঁদের জীবনে ব্রহ্মের কি আর কোন অর্থ আছে? আমি শুধু ধর্মে অবিশ্বাসের কথা বলছি না—এ নাস্তিক্য সর্বগ্রাসী। এ-যুগের পরিণত মনে ব্রহ্মপ্রত্যয় নিতান্তই প্রাক্তন স্মৃতি। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালের যাঁরা নব্য ভাবুক তাঁরা শুধু স্বর্গ-সান্ত্বনা থেকেই বঞ্চিত নন; কোন মূল্যবিচারের ক্ষেত্রে শাশ্বত, চিরন্তন, সর্বমানবীয় এসব বিশেষণ প্রয়োগে পর্যন্ত তাঁদের অনীহা আত্যন্তিক। এক কথায় এ যুগের বিদগ্ধ-সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী আপেক্ষিকতা-নির্ভর। অভ্যাসাশ্রয়ী মনের পক্ষে এই অনতিক্রম্য আপেক্ষিকতা-বোধ যে কী দুঃসহ যন্ত্রণা তা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই জানেন। যে সব নৈতিক নির্দেশকে বিনা বিতর্কে শ্রেয় বলে জেনে মানুষের বিবেক এতকাল আশ্রয় পেয়ে এসেছে, আজ নৃতত্ত্ব, তুলনামূলক সমাজতত্ত্ব

এবং সব থেকে বেশী মনোবিকলনতত্ত্বের আঘাতে শিক্ষিত জীবনে তারা শিথিলমূল। ফলে এ যুগের চিন্তায়, ব্যবহারে, শিল্পকল্পনায় যে ব্যাপক শুভনাস্তিক্য দেখা দিয়েছে, তাতে দুঃখ পেলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যে কার্তেসীয় আত্মপ্রত্যয়ের ভিত্তির ওপরে উদারতন্ত্রের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, আজ সেখানে পর্যন্ত ভাঙন প্রকট হয়ে উঠেছে। আমরা আতঙ্কে নিজেদের প্রশ্ন করছি, আত্মার ঐক্যও কি ব্রহ্মকল্পনার মত একটা ব্যবহারিক অভ্যাস ছাড়া আর কিছু নয়? নবলব্ধ জ্ঞানের আগুনে পুড়ে আমাদের আর কি অবশিষ্ট রইল? একরাশ প্রাণহীন যন্ত্রের স্তূপ, নির্বোধদের জন্য দীর্ঘদিনের সঞ্চিত মিথ্যা সংস্কার আর অভ্যাস, সকলের জন্যে কতকগুলি আদিম অন্ধ বৃত্তি—আর প্রাজ্ঞজনের জন্য নিশ্চিতির স্বর্গ থেকে নির্বাসনের নিষ্ঠুর চেতনা?

এই-যে বিশিষ্টভাবে আন্তঃসামরিক মেজাজ, এরই প্রতিনিধি হল এলিয়টের সুঈনি আর টাইরেসিয়াস, হাক্সলির থিয়োডোর গম্‌ব্রিল আর সার্তর-এর অধ্যাপক ম্যাথিউ। এরই পূর্বাভাস বোদ্‌লেয়রের কাব্যে, ডস্টয়েভস্কির উপন্যাসে। রিল্কের পুতুলেরা এরই অন্ধকার গর্ভের ভ্রূণ। প্রুস্ত্‌ এবং জয়েসের উপন্যাস বিভিন্ন দিক থেকে এই মেজাজেরই কাহিনী। প্রাচীন ভারতের ঔপনিষদিক উপলব্ধি অথবা পশ্চিম ইয়োরোপের রেনেসাঁস কিংবা আউফ্‌ক্লেরুঙ্গের ঐতিহ্যে একে বোঝা যাবে না। এখানে এক আশ্চর্য যুগের সমাপ্তি—(তার বেশী কি বলতে পারি!) হয়তো বা অভিনব কোন ভবিষ্যৎ যুগের ভূমিকা।

পাঁচ

এই রূপান্তরের অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে আলোড়িত করে নি। তার মানে অবশ্য এ নয় যে তাঁর মনে কখনও সন্দেহ আসে নি অথবা অনিশ্চিতি কখনও তাঁর চেতনায় ছায়া ফেলে নি। কিন্তু তাঁর মনের প্রত্যয়ী সমগ্রতাকে তিনি সব সংশয় শঙ্কার উর্ধ্বে রাখতে পেরেছিলেন। শ্রীমতী বোভোয়া যাকে বলেছেন "অস্তিত্বের মৌলিক অস্পষ্টতা", যার ফলে নাকি আমাদের কোনও জ্ঞান, বিচার, সিদ্ধান্তই আপেক্ষিক যাথার্থ্যের বেশী কিছু দাবি করতে পারে না, তার খবর তিনি রাখতেন না। ব্রহ্মসত্য এবং বিশ্বমানবিকতায় তাঁর অটুট আস্থা ছিল। সৎ-অসৎ, সত্য-মিথ্যা, সুন্দর-কুৎসিতের সুস্পষ্ট পার্থক্যে তিনি বিশ্বাস করতেন। এ পার্থক্যবোধ তাঁর কাব্যের আলো-আঁধারিতেও এতটুকু শিথিলমূল হয় নি। এই নিঃসঙ্কোচ আত্মপ্রত্যয় ছিল বলেই তাঁর প্রকাশ প্রচারের মাত্রাচ্যুতি থেকে মুক্ত, তাঁর লিরিক-প্রেরণা বিতর্ক-বিড়ম্বিত নয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই ড্যানিশ দার্শনিক কীর্কেগার্ড যে অসমাধেয় বিকল্প-সমস্যাকে সব দর্শনের মূল উপজীব্য বলে উপস্থিত করেছিলেন, যার সুকঠিন চেতনার পীড়াতে তাঁর জন্মের প্রায় একশো বছর পরে আন্তঃসামরিক মনের বয়ঃসন্ধি ঘটেছে, যার ছাপ বিশিষ্টভাবে এ যুগের সমস্ত চিন্তায়, শিল্পে, সমাজ-জীবনে—রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ জীবনের সব রচনায় আঁতিপাতি করে খুঁজলেও তার আভাস মিলবে না। রিল্কের জর্নালের পাতায় পাতায় যে গ্লানির স্বাক্ষর, সার্তর-এর উপন্যাসে যে ন্যক্কারপীড়ার কাহিনী, জয়েস্‌-হাক্স্‌লীর নায়কদের যে অনতিক্রম্য নৈঃসঙ্গ্য—আশ্চর্য, এঁদের সমসাময়িক মহাকবির কল্পনাতে তার সামান্যতম ছায়াটুকুও পড়ে নি।

এ রূপান্তর ইয়োরোপের সাহিত্যে প্রথম মহাযুদ্ধের পরই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যে এর সূচনা ঘটেছে আরও বছর দশেক পরে—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে প্রভৃতির কবিতায়, ধূর্জটি মুখোপাধ্যায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির উপন্যাসে। রবীন্দ্রনাথের তুলনায় এঁদের শিল্পপ্রতিভা অনেক সীমাবদ্ধ; তবু নিতান্ত নির্বোধ ছাড়া বোধ হয় সকলেই স্বীকার করবেন যে এঁদের জগৎ তাঁর জগৎ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বাংলা সাহিত্যের আধুনিকদের মধ্যে অনেকের প্রেরণা এখন অবসিত—হয়তো বা যুগান্তরের মনকে শিল্পে প্রকাশ করার সামর্থ্য তাঁদের ছিল না বলেই এত দ্রুত তাঁরা ফুরিয়ে গেলেন। কিন্তু জ্ঞানবৃক্ষের ফল আমরা খেয়েছি, প্রাক্তনস্বর্গের নিষ্পাপ নিশ্চিতিতে আর আমাদের ফেরার উপায় নেই।

যাঁরা বুদ্ধিমান এবং নিজেদের অসামর্থ্য বিষয়ে সচেতন, সুধীন্দ্রনাথের মত তাঁরা অনেকে মৌন অবলম্বন করেছেন। কেউ কেউবা মার্ক্সবাদের আস্তিক্য আঁকড়ে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু সে আস্তিক্যে আস্ফালন বেশী, প্রত্যয়ের স্থমিতি এবং লাবণ্য কচিৎ চোখে পড়ে।

হয়তো তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথও এই রূপান্তরকে অস্পষ্টভাবে অনুভব করেছিলেন। তাঁর এই যুগের কবিতায় মাঝে মাঝে একটা নিরাভরণ কাঠিন্য অপ্রত্যাশিতভাবে মনে ঘা মারে। কখনও কখনও কোনও কোনও গল্পে এবং প্রবন্ধেও একটা অনভ্যস্ত সংশয়ের ছায়া পড়েছে। আমার বিশ্বাস, এই অস্পষ্ট অনুভূতি থেকেই তাঁর কিম্ভূতকিমাকার স্কেচ এবং ছবিগুলির জন্ম। কিন্তু কবি তাঁর এই অনুভূতিকে কখনও সুস্পষ্ট চেতনার স্তরে তুলে তার মুখোমুখি হলেন না। হয়তো সেটা তাঁর প্রাজ্ঞতারই পরিচয়। অনভ্যস্ত অনুভূতির অনুসরণ করে সাধ্যের সীমানা তিনি লঙ্ঘন করেন নি। উত্তর-পুরুষের দুঃসহ আত্মগ্লানির হাত থেকে তিনি তাঁর কল্পনাকে মুক্ত রেখেছিলেন, আর নিজের সামর্থ্যের স্থমিতি মেনে যে চলতে পারে, সেই তো প্রাজ্ঞ।

ছয়

প্রশ্ন ওঠে তবে কি আধুনিক পাঠকপাঠিকার কাছে রবীন্দ্রনাথের আবেদন ক্রমে আরও ক্ষীণ হয়ে আসবে? বঙ্গদেশীয় স্থূলবুদ্ধি উপাসকগোষ্ঠি তাঁর লেখা না পড়ে, অথবা না বুঝে দলবেঁধে হৈচৈ করার প্রয়োজনে তাঁর স্মৃতিকে কাজে লাগাতে থাকবে? আর অনুভূতিশীল নব্য লেখক এবং পাঠক তাঁর রচনাবলীর মধ্যে নিজেদের সুগভীর নৈরাশ্যের আভাসমাত্র না খুঁজে পেয়ে অন্যত্র সংবেদনার সন্ধান করবে? আমার অন্ততঃ তা মনে হয় না। কেন মনে হয় না, তার দুটি প্রধান কারণ উল্লেখ করে এই আলোচনায় আপাততঃ যতি টানব।

প্রথমতঃ, প্রত্যয়গত মিল ছাড়াও সাহিত্যের আবেদনের আরও অনেকগুলি সূত্র আছে। টমাস আকুইনাসের দর্শন আমার বিচারে গ্রহণযোগ্য না ঠেকলেও দান্তের মহাকাব্য আমার বিশেষ প্রিয়। বৈষ্ণবসাধনা আমাকে কিছুমাত্র আকৃষ্ট করে না, কিন্তু চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতির পদাবলীর আমি গভীর অনুরাগী। কম্যুনিজমের আমি তীব্র সমালোচক; অথচ ব্রেখ্ট-এর নাটক এবং এলুয়ার-এর কবিতা আমার অত্যন্ত ভাল লাগে। ছন্দ, শব্দচিত্র, অলঙ্কার, ব্যঞ্জনা এমন কি কাহিনী এবং কল্পিত পাত্রপাত্রীর যে আবেদন, তা তো লেখক এবং পাঠকের মধ্যে প্রত্যয়গত ঐক্যের উপরে নির্ভর করে না। তা ছাড়া যে সমস্ত স্থায়ীভাব বিভাব, অনুভাব এবং সঞ্চারী-ভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রস উৎপন্ন করে, তারা সর্বপ্রাণি-সাধারণ। জগতের কেন্দ্রে কোনও কল্যাণময় পুরুষের অস্তিত্ব থাক্ বা না থাক্, সত্য-মিথ্যা ন্যায়-অন্যায়ের কোনও স্থায়ী মানদণ্ড আবিষ্কৃত হোক বা না হোক, ভালবাসা, করুণা, ভয়, ক্রোধ, ঘৃণা, বিস্ময় ইত্যাদি চিত্তবৃত্তি আমাদের সকলের মনেই আবেগ সঞ্চার করে থাকে। এদের অবলম্বন করে সাহিত্যে রসের সঞ্চার হয়। এখন সাহিত্যের এইসব সম্পদে রবীন্দ্র-রচনাবলী অসামান্য রকমে সমৃদ্ধ; শুধু বাংলায় কেন অন্য ভাষাতেও তাঁর তুল্য সম্পন্ন কল্পনা দুর্লভ। ফলে যে কারণে আমরা অন্য দেশ-কালের ভিন্ন ঐতিহ্যাবলম্বী শক্তিমান সাহিত্যিকের রচনা উপভোগ করি, সেই কারণেই রাবীন্দ্রিক জীবন-দর্শনে অংশভাক্ না হয়েও তাঁর শিল্পসৃষ্টি থেকে আনন্দের স্বাদ পাওয়া আমাদের সাধ্যায়ত্ত। সাহিত্যের বোধ যদি পৃথিবী থেকে লোপ না পায়, তা হলে মেজাজের গভীর পার্থক্য সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের বিদগ্ধ সম্ভোক্তা এদেশে এবং অন্য দেশে চিরদিন জুটবে।

দ্বিতীয়ত, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে শূন্যতাকে মানুষ শেষ কথা বলে বেশীদিন মেনে নিতে পারে না। আমাদের যুগের নিরাশ্বাস, দ্বন্দ্ব বা গ্লানিকে পাশ কাটিয়ে নয়, তারই অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ হয়ে আমরা অথবা আমাদের পরবর্তী কালের মানুষ নূতন করে আবার নিজের সৃজনসামর্থ্য আবিষ্কার করবে। বিশ্বজগতের অন্য কোথাও যদি অর্থের সন্ধান না মেলে, তবু মানুষের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার এবং ব্যক্তির অপরোক্ষানুভূতির মধ্যে সেই সন্ধানের সমর্থন পাওয়া যাবে। এবং এ আশা যদি অসঙ্গত না হয়, তবে মানবীয় মূল্যবোধের সেই পুনরুজ্জীবনের কালে রবীন্দ্রনাথকে শুধু শিল্পীরূপে নয়, ভাবুক রূপেও আমরা আবার নূতন করে আবিষ্কার করব। তাঁর জীবনদর্শনের অনেকটাই হয়তো টিঁকবে না, কিন্তু যেটুকু টিঁকবে, আমার ধারণা, তার মূল্যও নিতান্ত অল্প নয়।

কবির ছবি

চিন্তামণি কর

বাস্তব ও কল্পনার চেতনা আমাদের মনে ঢেউ তুলে জাগায় কত চিন্তা, স্বপ্ন ও অনুভূতির ঘাত-প্রতিঘাত। মনের জালে বাঁধা পড়া সে সবের উপলব্ধির খণ্ডগুলিকে সাজিয়ে জুড়ে যুগ যুগ ধরে মানুষ করে চলেছে কত রকমের অভিব্যক্তি। এরই প্রেরণায় গায় সে গান, করে সে নৃত্য, লেখে কবিতা ও কাহিনী, আঁকে ছবি, গড়ে প্রতিমা। এই নাচা, গাওয়া, লেখা, আঁকা ও গড়ার মূল ও কারণ হতে পারে একই প্রেরণা ও বিষয়বস্তু কিন্তু তাকে প্রকাশ করতে এই বিভিন্ন ভাবাভিব্যক্তির উপায়ে তাকে ধরা যায় না একইভাবে পরিপূর্ণ করে। যে উপলব্ধির উন্মাদনায় গায়ক গাইল গান তার মনে করা অস্বাভাবিক নয় যে গেয়ে যদি তার আবেগ পূর্ণমাত্রায় পরিতৃপ্ত হল না তা হলে নৃত্যে সে উদ্বৃত্ত আবেগকে পরিপূর্ণতা দেওয়া যাক। এমনি ভাবেই সঙ্গীত-নাট্য-শিল্প-সাহিত্যজগতে ভাবপ্রকাশের উপাদান নিয়ে কিছুটা ওলট-পালট হতে দেখা যায়। মানুষের নিজেকে ব্যক্ত করবার আবিষ্কৃত উপায়গুলি যুগে যুগে বিবর্তিত ও মার্জিত হয়ে নানা রীতি পদ্ধতি ও শৈলীর প্রবর্তন করেছে। এরই উচ্চমানের মাপকাঠি দিয়ে সাধারণতঃ শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্যের সর্বক্ষেত্রে উৎকর্ষের মান নির্ণয় করা হয়ে থাকে। সেই মানের মর্যাদা পেতে শিল্পী, সাহিত্যিক, সুরকার ও নর্তকদের নিজেদের সৃষ্টিকে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচিত রীতি পদ্ধতি ও শৈলীর কষ্টিপাথরে মেজে-ঘষে তার মূল্য কতখানি প্রমাণ করে দিতে হয়। এই ঘষা-মাজা পেয়ে তাদের সৃষ্টির যেটুকু পলিতে পড়ে যায় তারই স্তর উঠে তৈরি করে ঐতিহ্যকে।

মানুষ কেবল জানা চেনা ধারণা ও দৃষ্টিকে নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকে না। তার বাইরের ও অন্তরের দৃষ্টির পরিসরে অনুসন্ধান চলে নতুনের সন্ধানে। অনুভূত ও উপলব্ধ নতুনের সাক্ষাতে তার যে নানা আবেগ উথলে ওঠে তাকে ফিরে পাবার ও চিরন্তন করার উপায় সে খোঁজে। আহরণ করা নতুন সম্পদে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে আর পাঁচজনকে তার অংশ দিতে সে ব্যগ্র হয়ে পড়ে। আবার এমনও ঘটে যায় যে নিজের আবিষ্কারে মাতোয়ারা সে উদ্দাম চলে এগিয়ে আরও নতুন পাবার লালসায়। আর কেউ তা দেখল কি পেল সে দেখবার আগ্রহ বা অবসর তার থাকে না।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কাব্য, সাহিত্য ও সঙ্গীত-জগতে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ আজ হয়েছে ভারতীয় ঐতিহ্যের এক মহাসম্পদ। কবি একাধারে সাহিত্যিক, নাট্যকার এবং সঙ্গীতজ্ঞ ও সুরকার ছিলেন তো বটেই, তিনি আবার চিত্রকর হিসাবে প্রায় আড়াই হাজার ছবির স্রষ্টা। যে সময়ে ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যগত চিত্রণ ও ভাস্কর্যকে পুনর্জীবিত করবার আয়াসে এক বিশিষ্ট শিল্পরূপের জন্ম ও প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তার অতি নিকট সান্নিধ্যে থেকেও কবিবর সৃজন করেছিলেন এমন চিত্ররূপের যা অভিনবত্বে ও ভাবব্যঞ্জনায় সম্পূর্ণরূপে অদৃষ্টপূর্ব মৌলিক রচনা। তাঁর ছবিকে সাধারণ চিত্রশিল্পীর রচনার সংজ্ঞায় কোন পর্যায়ে ফেলা যায় কিনা তা নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে এবং হচ্ছে। এটা ঠিক যে তিনি চিত্রকরদের মত শিল্পবিদ্যার অনুশীলনে কোন শিক্ষানবিসি করেন নি এবং সে সুযোগ না পাওয়ার জন্য আপন শিল্পনৈপুণ্য সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ প্রকাশ পেয়েছে বহু উক্তিতে। কিন্তু তার জন্য তাঁর চিত্ররচনার জোয়ারে কোনদিন ভাটা পড়ে নি। কবি চিত্রকর হয়ে বলেছেন, "মদগর্বিতা যুবতী যেমন তার অনেকগুলি প্রণয়ীকে নিয়ে কোনটিকেই হাতছাড়া করতে চায় না, আমারও কতকটা যেন সেই দশা হয়েছে। মিউজদের মধ্যে আমি কোনটিকেই নিরাশ করতে চাইনে।...লজ্জার মাথা খেয়ে সত্যি কথা যদি বলতে হয়, তবে এটা স্বীকার করতে বলতে হয় যে, ঐ চিত্রবিদ্যা বলে একটা বিদ্যা আছে, তার প্রতিও আমি সর্বদা হতাশ প্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টিপাত করে থাকি—কিন্তু আর পাবার আশা নেই; সাধনা করবার বয়েস চলে গেছে। অন্যান্য বিদ্যার মত তাকেও সহজে পাবার জো নেই—তাঁর একেবারে ধনুকভাঙা পণ—তুলি টেনে টেনে একেবারে হয়রান না হলে তাঁর প্রসন্নতা লাভ করা যায় না।"

চিত্রকলাকে পেশাদারী চিত্রকরদের মত সাধনা করবার বয়স না থাকলেও কবির চিত্ররচনার রাস্তা খাটো হয়ে যায় নি। কবি, সাহিত্যিক ও সঙ্গীতকার হিসাবে প্রচলিত ও পরিচিত নিয়ম ধারা ও ঐতিহ্যকে একেবারে পরিত্যাগ করেন নি কিন্তু ছবি আঁকতে গিয়ে তিনি নিজেকে এ সব থেকে সম্পূর্ণ বন্ধনমুক্ত করে বেপরোয়া ও উদ্দামভাবে এগিয়ে গিয়েছেন। ভারতীয়দের জীবনাদর্শের ঐতিহ্যে দেখা যায় প্রাচীনকাল থেকে এদেশীয় চিন্তাশীলেরা বাস্তবের দৃষ্টি ও অন্তরদর্শনে দাঁড়ি কেটে তফাত করেন নি। এর ফলেই প্রাচীন ভারতীয় শিল্পে মনোজগতে দেখা দৃশ্যের সঙ্গে বহির্জগতের দ্রষ্টব্য মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। এই দৃষ্টির কতকটা আভাস ও হদিশ পেয়ে পাশ্চাত্ত্য জগতের শিল্পীরা আজ কল্পনা-জগৎ থেকে বাস্তবে ও বাস্তব-জগৎ থেকে কল্পনায় ছুটোছুটি করে হিমশিম খাচ্ছেন। বর্তমান ভারতের অনেক শিল্পী সে উত্তরাধিকার হারিয়ে আজ পাশ্চাত্ত্য জগতের এই ছুটোছুটি ও হুল্লোড়ের পিছু ধাওয়া আরম্ভ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ শিল্পশাস্ত্রানুযায়ী হাত মক্‌শ করবার সময় পান নি বটে কিন্তু তাঁর শিল্পসৃজনের দৃষ্টি ও পন্থা রয়ে গেছে ভারতীয়ভাবে শাশ্বত। তাঁর ছবি বাস্তবের ছবি তো নয়ই, এমন কি বাস্তব থেকে চয়ন করা উপাদানের অভিনব রূপও নয়। তাঁর রচনাকে চিত্রের সংজ্ঞা দিতে বলতে হবে প্রধানতঃ কবির ছবি। তাঁর মনের একটা আবেশ বা আমেজ যার আভা ও উচ্ছ্বাস কবিতা ও কাহিনীর রচনার কূল ছাপিয়ে উপচে উঠেছিল তারই ছাপ রূপায়িত হয়েছে ছবিতে। তাঁর ছবির সূচনা যে লেখনীকে উপলক্ষ করে হয়েছে তা তিনি বহু বার বলে গেছেন। এবং কিভাবে তাঁর ছবি রূপ পরিগ্রহ করল তার সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "কবিতার বিষয়টা অস্পষ্টভাবেও গোড়াতেই মাথায় আসে, তারপরে শিবের জটা থেকে গোমুখী বেয়ে যেমন গঙ্গা নামে তেমনি করে কাব্যের ঝরণা কলমের তট রচনা করে ছন্দে প্রবাহিত হতে থাকে। আমি যে সব ছবি আঁকার চেষ্টা করি, তাতে ঠিক তার উল্টো প্রণালী—রেখার আমেজ প্রথমে দেখা দেয় কলমের মুখে, তারপরে যতই আকার ধারণ করে ততই সেটা পৌঁছতে থাকে মাথায়। এই রূপসৃষ্টির বিস্ময়ে মন মেতে ওঠে। আমি যদি পাকা আর্টিস্ট হতুম, তা হলে গোড়াতেই সংকল্প করে ছবি আঁকতুম, মনের জিনিস বাইরে খাড়া হত—তাতেও আনন্দ আছে। কিন্তু নিজের বহির্বর্তী রচনায় মনকে যখন আবিষ্ট করে তখন তাতে আরও যেন বেশী নেশা। ফল হয়েছে এই যে, বাইরের আর সমস্ত দরজার বাইরে এসে উঁকি মেরে হাল ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। যদি সেকালের মত কর্মদায় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতুম, তা হলে পদ্মার তীরে বসে কালের সোনার তরীর জন্যে কেবলি ছবির ফসল ফলাতুম।"

কবির ছবির কোন জানা স্কুল বা স্টাইলের কোঠায় নামকরণ করা যায় না। তাঁর রচনাকে শিল্পশাস্ত্রের মাপজোখে বা শিল্পসমালোচকের এক্সারসাইজ করা মন নিয়ে দেখতে গেলে একটা ফানুসে ঢাকা বাতির আভাকে আরও নিবিড়ভাবে উপভোগ করতে তার আবরণকে ভেঙে দেখার মত ব্যাপার হবে। কবির ছবিতে বনপ্রান্তর, ফুলপাতা, পাখি চোখে ধরা দৃশ্য নয় বা যা চোখ দেখেছিল তাকে কল্পনায় দেখবার চেষ্টা নয়। অহেতুক বাস্তবে অজানা অদেখা বন, বৃক্ষ, ফুল, পাতা, পাখী ও জীব কল্পনার ওপার থেকে গোপন হাতছানিতে ডেকে মিলিয়ে যায়। তাদের উপর চিন্তার জাল ফেলে ধরা যায় কি না যায় তারই এ এক খেলা। এর পিছনে কারণ নেই, যুক্তি বা বিচার নেই, আছে কেবল একলার সংশয়, বিস্ময়, আনন্দ ও উল্লাসের পাঁচমিশালী "পাঞ্চ"-এর এক নেশা। কবি বলছেন, "বসন্তে পলাশ ফুটে উঠল, কালোয় রাঙায় একটা রূপ। কিসের গরজ? কে জানে? মানে কি জিজ্ঞাসা কর, তার উত্তর কে দেবে? আপনা আপনি সৃষ্টিকর্তার তুলির মুখ থেকে বেরিয়ে পড়েছে। আবার বেলফুল আর এক মূর্তি ধরে বসল কেন? অজানার স্বপ্ন-উৎস থেকে বিচিত্র রূপ উৎসারিত—এ সম্বন্ধে বিশ্বকর্মার কোনও কৈফিয়ৎ নেই। আমার ছবিও তাই, রূপের নিগূঢ় আনন্দ নানারূপে লীলা করছে সম্পূর্ণ নিরর্থক। এই আনন্দ দর্শকের মনেও যদি সঞ্চারিত হয় তো ভাল—নইলে কারও কোন ক্ষতি নেই।"

চরিতশিল্পী রবীন্দ্রনাথ

বিনয় ঘোষ

ইতিহাস যেমন, মানুষের জীবনও তেমনি কেবল রাশীকৃত ঘটনার গ্রন্থন নয়। অথচ যে কোন বড় জীবন একটা বিচিত্র যুগের ইতিহাসের মতন ঘটনাবহুল। কিন্তু ঘটনাপ্রবাহের অন্তর্লীন যে সুর ও ছন্দ থাকে, প্রকৃত ইতিহাসকার সন্ধান করে তাকেই আবিষ্কার করেন। চরিতকারেরও লক্ষ্য তাই। একজন ব্যক্তির জীবনের বহুবিচিত্রমুখী ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর থেকে তার মূল রাগিণীটিকে খুঁজে বার করে প্রকাশ করার চেষ্টা করেন চরিতশিল্পী। রবীন্দ্রনাথ কোন বৃত্তান্তপ্রধান পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত লেখেন নি, বিভিন্ন যুগের কয়েকজন বিশিষ্ট মহাপুরুষের জীবনের ঐতিহাসিক ও মানবিক তাৎপর্য প্রকাশ করেছেন মাত্র। মানুষের সমাজের প্রত্যেক মানুষের জীবনের ক্রম প্রকাশের যে বিশিষ্ট ধারা ও উদ্দেশ্য আছে তা ধরতে না পারলে চরিতরচনা ও জীবন ব্যাখ্যা যে অনেকখানি ব্যর্থ হয়ে যায়, রবীন্দ্রনাথের চরিতসাহিত্যে তার নির্দেশ পাওয়া যায়।

ইউরোপীয় চরিতসাহিত্যের ঐতিহ্য দীর্ঘকালের। প্রথম শতাব্দীর প্লুটার্ক (Plutarch) থেকে আরম্ভ করে বিংশ শতাব্দীর লিটন স্ট্র্যাচি পর্যন্ত এই ধারা প্রবাহিত। এই ইউরোপীয় ধারা ও তার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন: "য়ুরোপে ক্ষমতাশালী লোকের জীবনচরিত লেখার একটা নিরতিশয় উদ্যম আছে। য়ুরোপকে চরিতবায়ুগ্রস্ত বলা যাইতে পারে। কোনোমতে একটা যে কোন-প্রকারের বড়লোকত্বের সুদূর গন্ধটুকু পাইলেই তাহার সমস্ত চিঠিপত্র, গল্পগুজব, প্রাত্যহিক ঘটনার সমস্ত আবর্জনা সংগ্রহ করিয়া মোটা দুই ভল্যুমে লিখিত জীবনচরিতের জন্য লোক হাঁ করিয়া বসিয়া থাকে। যে নাচে, তাহার জীবনচরিত, যে গান করে, তাহার জীবনচরিত, যে হাসাইতে পারে, তাহার জীবনচরিত—জীবন যাহার যেমনই হোক, যে লোক কিছু-একটা পারে, তাহারই জীবনচরিত। কিন্তু যে মহাত্মা জীবনযাত্রার আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাঁহারই জীবনচরিত সার্থক; যাঁহারা সমস্ত জীবনের দ্বারা কোন কাজ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই জীবন আলোচ্য। যিনি কবিতা লিখিয়াছেন, গান তৈরি করিয়াছেন, তিনি কবিতা এবং গানই দান করিয়া গেছেন, তিনি জীবন দান করিয়া যান নাই, তাঁহার জীবনচরিতে কাহার কী প্রয়োজন।" (চারিত্রপূজা)

রবীন্দ্রনাথের এই কথায় আমাদের অনেকেরই মন সায় দিতে চাইবে না। যে কবি কবিতা লেখেন বা গান রচনা করেন, তিনি কি 'সমস্ত জীবনের দ্বারা' সেই 'কাজ' করেন না, অথবা তার মধ্যে কি তিনি তাঁর জীবন দান করে যান না? আমাদের প্রশ্ন হল, জীবনচরিত কি কেবল রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের মতন মানুষেরই লেখা প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথের মতন কবির জীবনীর কোনই প্রয়োজন নেই? টেনিসন প্রসঙ্গে তিনি যা বলেছেন, সেই ভাষাতে তাঁর সম্বন্ধেও আমরা বলতে পারি, "রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়িয়া আমরা রবীন্দ্রনাথকে যত বড় করিয়া জানিয়াছি, তাঁহার জীবনচরিত পড়িয়া তাঁহাকে তাহা অপেক্ষা অনেক ছোট করিয়া জানিয়াছি মাত্র।" কিন্তু তা বললেও, চরিতরচনার আবশ্যকতা অস্বীকার করা যায় না। প্রশ্নটা রবীন্দ্রনাথের নিজের 'জীবনস্মৃতি' রচনা প্রসঙ্গে উঠেছিল। তিনি লিখেছিলেন: "যাঁহারা সাধু এবং যাঁহারা কর্মবীর তাঁহাদের জীবনের ঘটনা ইতিহাসের অভাবে নষ্ট হইলে আক্ষেপের কারণ হয়—কেন না, তাঁহাদের জীবনটাই তাঁহাদের সর্বপ্রধান রচনা। কবির সর্বপ্রধান রচনা কাব্য, তাহা তো সাধারণের অবজ্ঞা বা আদর পাইবার জন্য প্রকাশিত হইয়াই আছে—আবার জীবনের কথা কেন।"

এ প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই শেষে খুঁজে পেয়েছেন। নিজের জীবনী রচনার খানিকটা আবশ্যকতাও তাঁর মনে জেগেছে। তিনি লিখেছেন:

"এই কথা মনে মনে আলোচনা করিয়া আমি অনেকের অনুরোধসত্ত্বে নিজের জীবনী লিখিতে কোনোদিন উৎসাহ বোধ করি নাই। কিন্তু সম্প্রতি নিজের জীবনটা এমন একটা জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যখন পিছন ফিরিয়া তাকাইবার অবকাশ পাওয়া গেছে—দর্শকভাবে নিজেকে আগাগোড়া দেখিবার যেন সুযোগ পাইয়াছি।

"ইহাতে এইটে চোখে পড়িয়াছে যে, কাব্যরচনা ও জীবনরচনা ও দুটা একই বৃহৎ রচনার অঙ্গ। জীবনটা যে কাব্যেই আপনার ফুল ফুটাইয়াছে আর কিছুতে নয়, তাহার তত্ত্ব সমগ্র জীবনের অন্তর্গত।

"কর্মবীরদের জীবন কর্মকে জন্ম দেয়, আবার সেই কর্ম তাঁহাদের জীবনকে গঠিত করে। আমি ইহা আজ বেশ করিয়া জানিয়াছি যে, কবির জীবন যেমন কাব্যকে প্রকাশ করে, কাব্যও তেমনি কবির জীবনকে রচনা করিয়া চলে।" [রবীন্দ্র সদনে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি থেকে উদ্ধৃত—'জীবনস্মৃতি' (গ্রন্থপরিচয়)]

জীবনচরিত সম্বন্ধে কবির ধারণা এই উক্তির মধ্যে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। কেবল কর্মবীর ও ধর্মবীরদের জীবন নয়, কবিশিল্পীর জীবনও যে রচনার যোগ্য, তা তিনি উপলব্ধি করেছেন। কারণ কর্মবীরদের জীবন যেমন নব নব কর্মের প্রেরণা সঞ্চার করে, এবং সেই কর্মের প্রবাহে তাঁদের নিজেদের জীবন নতুন রূপ ধারণ করতে থাকে, তেমনি কবির ও শিল্পীর জীবনও তাঁদের কাব্য ও শিল্পের ভিতর দিয়ে নব নব রূপে আত্মপ্রকাশ করে। জীবনচরিত সকলেরই রচনা করা যায়, কিন্তু তা সার্থক রচনা কি না, তা নির্ভর করে রচয়িতার দৃষ্টিকোণের উপর। সেই দৃষ্টিকোণের গোড়ার কথা হল, 'দর্শকভাবে' ব্যক্তিজীবন ও ব্যক্তিচরিত্রকে দেখা বা বিচার করা। তা করতে হলে চরিতশিল্পীর একটি নিরাসক্ত মন থাকা দরকার! অন্ধ আসক্তি ও ভক্তি এবং বিচারশীল অনুরাগ ও শ্রদ্ধা এক জিনিস নিশ্চয় নয়। একজন কর্মবীর বা কবির প্রতি কোন চরিত-শিল্পীর প্রগাঢ় অনুরাগ ও শ্রদ্ধা থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে তিনি তাঁর লৌকিক জীবন রচনা করতে গিয়েও কথায় কথায় অলৌকিকত্ব আরোপ করবেন, অথবা রক্তমাংসের মানুষের চিন্তাভাবনার ও কাজকর্মের সীমাবদ্ধতার কথা ভুলে গিয়ে পদেপদে তার আধিভৌতিক ও ঐশ্বরিক ব্যাখ্যানের যোগান দেবেন, এমন কোন বাধ্যতা তাঁর থাকতে পারে না। থাকা উচিতও নয়। মহৎ চরিত্রের মহত্ত্বকে তিনি তাঁর লেখনীর নানারঙের আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলবেন, তার বিশিষ্টতা ও স্বকীয়তা প্রকাশ করবেন বিচার-বিশ্লেষণ করে, ইতিহাসের প্রবহমান পটভূমিতে, কিন্তু বিচারহীন ভক্তিগদগদ-চিত্তে স্তব করবেন না। আধুনিক চরিতসাহিত্যের এইটাই প্রথম ও প্রধান কথা, এবং আমাদের দেশে এই মানবিক দৃষ্টিসমন্বিত আধুনিক চরিত-সাহিত্যের পথপ্রদর্শক রবীন্দ্রনাথ।

ইউরোপে খ্রীষ্টধর্মের অভ্যুদয়ের পর সাধু সন্তদের এক ধরণের চরিতরচনার প্রবর্তন হয়, তাকে, 'hagiology' বলে। Hagiology হল 'the record of the lives of saints, written for purposes of edification.' আমাদের দেশ ধর্মকাতর দেশ, ধর্মান্ধতা আমাদের জাতীয় জীবনের ও চরিত্রের বড় বৈশিষ্ট্য। আজ পর্যন্ত, বিংশ-শতাব্দীর মধ্যকাল পার হয়েও, আমরা সেই ধর্মান্ধতা বর্জন করতে পারি নি। এমন কি, একটু চোখ মেলে চাইলেই দেখা যায় যে মধ্যযুগের ধর্মের যা-কিছু বিকার-বৈচিত্র্য, সবই যেন ক্রমে আমাদের জীবন ও সমাজকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। মানুষের জীবনের দৈন্য, হতাশা, অনিশ্চয়তা, অশান্তি দিনে দিনে যত বাড়ছে, তত যেন মানুষ বুদ্ধির গণ্ডি পার হয়ে, 'বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না' এমন সব অলৌকিক বিষয় ও বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। তার জন্যই দেখা যায়, আজও আমাদের সাম্প্রতিক বাংলা চরিত-সাহিত্যে পর্যন্ত 'hagiology'-র অখণ্ড প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রয়েছে, এবং সত্যিকার চরিতকথা শোনার চেয়ে ভক্তিকথা ও লীলাকাহিনী শোনার আগ্রহ মানুষের অনেক বেশী, 'শিক্ষিত' মানুষের আগ্রহ সবচেয়ে বেশী বললেও অত্যুক্তি হয় না।

'Biography' যদি চরিতসাহিত্য হয়, তাহলে

'hagiology'কে বলা যায় 'ভক্তিসাহিত্য' বা 'লীলা-সাহিত্য'। ভারতীয় সাহিত্যে এই ভক্তি-লীলাসাহিত্যের ইতিহাস বহুদূরবিস্তৃত। এই ভক্তিপ্রধান জীবনচরিত্রের শুরু মহাভারতের যুগ থেকে। যেমন কৃষ্ণচরিতকথা। খ্রীষ্টপূর্ব যুগের ঐতিহাসিক পুরুষ কৃষ্ণ বাসুদেবের জীবন-কথা মহাভারতে একরকম, হরিবংশে একরকম এবং বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন রকমের রূপ ধারণ করেছে। কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে যুগে যুগে ভারতের ও বাংলাদেশের ভক্তি-লীলাসাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে। কৃষ্ণ হয়েছেন দেবতা এবং তাঁর চরিতকথা হয়েছে অপূর্ব লীলাকাহিনী। তাই বঙ্কিমচন্দ্র যখন আধুনিক দৃষ্টিতে কৃষ্ণচরিত ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন, তখন তিনি পাঠকদের জানান: "আমার নিজের যাহা বিশ্বাস, পাঠককে তাহা গ্রহণ করিতে বলি না, এবং কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব সংস্থাপন করাও আমার উদ্দেশ্য নহে। এ গ্রন্থে আমি তাঁহার কেবল মানবচরিত্রেরই সমালোচনা করিব।" আমাদের দেশের কৃষ্ণভক্তদের কানে আজও একথা বিধর্মী পাষণ্ডের কটুবাক্য বলে মনে হবে; বঙ্কিমচন্দ্রও তা বিলক্ষণ জানতেন। তবু তিনি সংকীর্ণ hagiology-র গণ্ডি থেকে চরিতসাহিত্যকে মুক্ত করতে অনেকটা সফল হয়েছিলেন। তাঁর পরে রবীন্দ্রনাথও এই দুরূহ দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হয়েছিলেন।

বাংলা সাহিত্যে এই hagiology-র চরম বিকাশ হয় ষোড়শ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে, শ্রীচৈতন্যের জীবন কেন্দ্র করে। চৈতন্যচরিত বাদ দিলে বাংলা চরিতসাহিত্যের আর উল্লেখনীয় কিছু থাকে বলে মনে হয় না। বাংলা সাহিত্যের এই hagiology-র ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েই রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট থেকে আরম্ভ করে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, গান্ধী পর্যন্ত প্রত্যেক ঐতিহাসিক পুরুষের ধর্ম কর্ম ও জীবনের তাৎপর্য প্রকাশ করেছেন। মানুষের মানবত্বটাই যে বড় কথা, তার উপর সংস্থাপিত দেবত্বটা নয়, এইটাই তাঁর প্রধান বক্তব্য। যিনি ধর্ম প্রচারে বড় হয়েছেন, তাঁর ধর্ম কি, যিনি কর্ম প্রচারে বড় হয়েছেন তাঁর কর্ম কি, এবং সেই ধর্ম ও কর্ম কিভাবে তাঁদের জীবনকে গড়ে তুলেছে, তাই রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, গান্ধী প্রসঙ্গে বলতে চেয়েছেন।*

মানুষ যে বিশাল সমষ্টির মধ্যে একটি ব্যক্তিত্বহীন পিণ্ডাকার পদার্থ নয়, অথবা অতিমানুষ বা দেবতা নয়, এ কথা রেনেসাঁসের চিন্তাবিপ্লবের পর থেকে মানুষ ধীরে ধীরে বুঝতে আরম্ভ করেছে। আমাদের দেশে চিন্তার ক্ষেত্রে—উনিশ শতকের প্রবল আলোড়ন সত্ত্বেও মানুষের জীবন সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পরিবর্তন তেমন হয় নি। একেবারেই যে হয় নি তা নয়, কিন্তু তা এত সামান্য যে বাংলা চরিতসাহিত্যে তার ছাপ পড়ে নি। তাই দেখতে পাই, বিদ্যাসাগরের মতন সমাজকর্মীর জীবন আলোচনা করতে গিয়েও চরিতকাররা গোড়াতেই তাঁর জন্মবৃত্তান্তের মধ্যে অলৌকিকতার সন্ধান করেছেন। আর ধর্মসংস্কারক যাঁরা তাঁরা তো মানুষই নন, দেবতা—জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সবটাই তাঁদের ঐশী লীলার বিচিত্র প্রকাশ। এরকম চরিতগ্রন্থের অভাব নেই বাংলা সাহিত্যে। বাংলা সাহিত্য যেদিক থেকে যতই সমৃদ্ধ হোক না কেন, আজও তার বিচারশীল 'biography' হাতে গোনা যায়, এবং ভক্তিপ্রধান 'hagiology' এত বেশী যে গুণে শেষ করা যায় না। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের এই ছোট ছোট জীবনীগ্রন্থগুলি, বৃত্তান্তবহুল না হলেও, প্রকৃত চরিতসাহিত্যের নিদর্শন।

বৃত্তান্তবহুল না হবার কারণ হল, আগে থেকে

* বহুদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের এই রচনাগুলি চারিদিকে ছড়িয়ে ছিল, জীবনীগ্রন্থাকারে সংকলিত হয় নি। 'চারিত্রপূজা' গ্রন্থে রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনকথা একত্রে সংকলিত হলেও তার মধ্যে কবির সমস্ত উক্তি স্থান পায় নি। সম্প্রতি "বুদ্ধদেব", "খৃষ্ট", "ভারতপথিক রামমোহন রায়", "বিদ্যাসাগরচরিত", "মহাত্মা গান্ধী" নামে রবীন্দ্রনাথের বিক্ষিপ্ত রচনাগুলি সংকলন করে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন 'বিশ্বভারতী'। সংকলক ও সম্পাদক শ্রীপুলিনবিহারী সেন। চরিতসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান বিচার করতে হলে এই সংকলনগুলি অবশ্যপাঠ্য ও অপরিহার্য। সংকলকের প্রখর সন্ধানী দৃষ্টিতে পূর্বোক্ত কোন 'ব্যক্তি' সম্বন্ধে কবির কোন 'উক্তি' বাদ পড়ে নি। এই রচনাগুলি এইভাবে স্বতন্ত্র জীবনীগ্রন্থাকারে সংকলিত করে বিশ্বভারতী বহুদিনের একটি বড় অভাব দূর করেছেন।

রবীন্দ্র-নাটকে তত্ত্ব

অচ্যুত গোস্বামী

আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক গবেষণার যুগে কোন ব্যক্তিকেই একটি একক নিরবচ্ছিন্ন সত্তা বলে গণ্য করা হয় না। মানুষের মধ্যে যে একাধিক প্রবণতা কাজ করে মানুষ নিজেও তা অনেক সময় সচেতনভাবে বা অর্ধ-চেতনভাবে অনুভব করে থাকে। তবু মানুষ কর্মক্ষেত্রে নিজেকে এক ও অভিন্ন সত্তা হিসাবে প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট। যিনি লেখেন, তিনি তাঁর লেখার মধ্যেও যথাসাধ্য নিজের এক অবিভাজ্য পোশাকী ব্যক্তিত্বকেই উপস্থাপিত করতে যত্নবান; তেমনি সমালোচক এবং পাঠকও কোন লেখকের রচনাবৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যসূত্র আবিষ্কার করতে পারলে পরম পুলকিত হয়ে ওঠেন।

এটা আসলে আমাদের বুদ্ধির একটা আভাস মাত্র। বিশৃঙ্খলাকে আমরা পছন্দ করি না। বিশৃঙ্খলামাত্রকেই আপাতবিশৃঙ্খলা বলে ধরে নিয়ে আমরা তার মধ্যে সামঞ্জস্য আবিষ্কারে তৎপর হই। সামঞ্জস্য না থাকলে সামঞ্জস্য আরোপ করতেও ইতস্ততঃ করি না। ইদানীং-কালে বহুবিচিত্র রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে যে আলোচনার প্রাচুর্য দেখা যাচ্ছে তার মধ্যেও এই ঐক্য আবিষ্কারের নেশা লক্ষ্য করা যায়। তার ফলে অনেক সরলীকরণ, অনেক গোঁজামিলের আশ্রয় নিতে আমরা ইতস্ততঃ করি না। সত্যি বলতে কি, রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করে গিয়েছেন। তিনি নিজেও অনেক সময় নিজের সরল ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করে সরল ব্যাখ্যা দেওয়াটা যে সহজ এই কথাটা বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।

কিন্তু বহুবিচিত্ররূপী রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ঐক্য আবিষ্কারের আগ্রহ স্বাভাবিক এবং সঙ্গত এ কথা স্বীকার করেও এই আগ্রহের আত্যন্তিকতা আমি সন্দেহের চোখে না দেখে পারি না। রবীন্দ্রনাথকে তাঁর সামগ্রিকতার মধ্যে দেখতে চেষ্টা করতে গিয়ে আমরা যে তাঁর ধারাবাহিকতাকে উপেক্ষা করতে পারি এ আশঙ্কা অমূলক নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্টিপ্রয়াসের প্রথমদিনেই একটা পুরোপুরি দার্শনিক ভিত্তি ঠিক করে নিয়েছিলেন এ কথা বলা হাস্যকর। কিন্তু কোন সমালোচক যখন তাঁর প্রথম যুগের কোন রচনার মধ্যে পরবর্তী যুগের কোন ভাবকে আবিষ্কার করতে যান তখন সেই প্রয়াসই কি কম হাস্যকর! অথচ এ ধরনের প্রচেষ্টার অভাব নেই বাংলা-দেশে।

এ কথা ঠিক, রবীন্দ্র-দর্শনের সঙ্গে কিছুটা পরিচিত না

তোড়জোড় করে রবীন্দ্রনাথ কারও জীবনচরিত লিখতে বসেন নি। যখন যে মহাপুরুষের কথা তিনি চিন্তা করেছেন এবং তাঁর জীবনের সত্য যেমন ভাবে তাঁর কবিচিত্তে প্রতিভাত হয়েছে, তাই তিনি প্রকাশ করেছেন সাধারণের কাছে। প্রধানতঃ তাই জীবনের বৃত্তান্ত বর্ণনার পথ ছেড়ে তিনি তার মহত্ত্ব, মাধুর্য ও বিশেষত্ব প্রকাশের পথ বেছে নিয়েছেন, এবং সে পথের সামনে ভক্তির ও গোঁড়ামির আতিশয্যে কোন অস্পষ্ট কুয়াশা রচনা করেন নি। বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের জীবনের মহত্ত্ব কোথায়, রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও গান্ধীর জীবনের চরম সার্থকতা কোথায়, তাই তিনি তাঁদের কথা ও কাজের মধ্যে নির্দেশ করেছেন। এঁদের বাল্যজীবন ও কর্মজীবন প্রসঙ্গত যেটুকু আলোচনা করেছেন, তার মধ্যে অলৌকিকত্বের স্পর্শ নেই কোথাও। বুদ্ধদেব প্রসঙ্গে 'ভগবান বুদ্ধ' কথা এবং অন্যত্র 'মহাপুরুষ' 'মহামানব' ইত্যাদি কথাও তিনি অনেকবার ব্যবহার করেছেন, কিন্তু সেজন্য তাঁর বিচারবুদ্ধির বা দৃষ্টিভঙ্গির সেখানে কোন পরিবর্তন হয় নি। ভক্তিবাদ বা অবতারবাদ তাঁর দৃষ্টিকে কোথাও ঝাপসা করে নি। চরিত্রগুলি কালের পরিপ্রেক্ষিতে তারার মতন উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে তাঁর মনের নির্মল আকাশে। তাঁদের ধর্ম, নীতি, আদর্শ ও কর্মের গভীর তাৎপর্য, মানবিক জাগতিক ও ঐতিহাসিক, তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। বাংলা চরিতসাহিত্যে এই মানবিক ধারার প্রবর্তক রূপেই রবীন্দ্রনাথ স্মরণীয়। অলৌকিক ভক্তি-লীলাকাহিনী ও অবতারবাদের স্তর থেকে তিনি চরিত-সাহিত্যকে মর্ত্যের মানবিক স্তরে উন্নীত করেছেন। চরিতশিল্পী রবীন্দ্রনাথের এইটিই শ্রেষ্ঠ দান।

হতে পারলে রবীন্দ্র সাহিত্যের সম্পূর্ণ তাৎপর্য নির্ধারণ করা শক্ত। কিন্তু এই দর্শন প্রধানতঃ বোধির কাজ হলেও বুদ্ধি সেখানে অনুপস্থিত ছিল না। কাজেই রবীন্দ্র-দর্শনের মধ্যে যে নিটোল সম্পূর্ণতা আছে, তারই আলোকে তাঁর সমগ্র সাহিত্যকে গ্রথিত করার চেষ্টা কতখানি সঙ্গত সেটা চিন্তার বিষয়। তাঁর সাহিত্যের বিভিন্ন অংশ একই ফুলের বিভিন্ন পাপড়িমাত্র—এ কথা কল্পনা করায় আত্মপ্রসাদ আছে। কিন্তু তার মধ্যে তাঁর অফুরান প্রাচুর্য আর বৈচিত্র্যের সমারোহ যদি হারিয়ে যায়?

রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তার মধ্যে ক্রম-পরিবর্তন এবং স্ব-বিরোধ দেখা দিয়েছিল কি না সেটা এখনও গবেষণার বিষয়। একসময়ে বসে তিনি কখনও একটি সমগ্র দার্শনিক তত্ত্ব রচনা করেন নি। বিভিন্ন সময়ে তিনি যেসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দার্শনিক নিবন্ধ রচনা করেছেন সেগুলোকে একসঙ্গে করে সমীকরণের সাহায্যে আমরা একটি নিটোল সামগ্রিক তত্ত্বে পৌছতে পারি। ঐক্য আবিষ্কারের নেশায় বিভিন্ন নিবন্ধের মধ্যে যদি ছোটখাট অসামঞ্জস্য থেকেও থাকে তাকে আমরা সহজেই উপেক্ষা করতে পারি। এইভাবে আমরা যে দার্শনিক তত্ত্বে উপনীত হতে পারি তা এক সমন্বয়ের দর্শন। সাধন ভট্টাচার্যের ভাষায়: "বাস্তবিক রবীন্দ্র-দর্শনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ব্রহ্মতত্ত্বের এবং (বৈজ্ঞানিক) বিশ্বতত্ত্বের মধ্যে সমন্বয় করার চেষ্টা।" আবার: "রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবাদের মধ্যে এই বিবর্তনবাদকে আত্মসাৎ করে নিয়েছেন।" সাধনবাবু কিছু অন্যায় কথা বলেন নি। 'শান্তিনিকেতন', 'মানুষের ধর্ম', 'ধর্ম' প্রভৃতি বইগুলিকে একসঙ্গে করে পড়লে এই রকমের একটি সিদ্ধান্তে খুব যুক্তিসঙ্গতভাবে পৌছানো যায়।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে প্রাচ্য আর পাশ্চাত্ত্যের মিলন-সাধনের প্রয়াস ছিল তা অনেকে স্বীকার করবেন না। ডক্টর রাধাকৃষ্ণন তো রবীন্দ্রনাথকে পুরোপুরি বৈদান্তিক বানিয়ে ছেড়েছেন। অনেকে আবার রবীন্দ্র-নাথের মধ্যে ব্রহ্মতত্ত্ব এবং গতিতত্ত্বের যুগপৎ সমাবেশ দেখে তাঁর দর্শনকে হেগেলীয় দর্শনের কাছাকাছি বলে দাবি করতে পারেন। বস্তুতঃ রবীন্দ্র-দর্শন যে হেগেলীয় দর্শনের সঙ্গে তুলনীয় এ কথা অনেকের মনে এলেও কেউ যে কথাটা খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করেন নি তার কারণ রবীন্দ্রনাথের ভারতীয়ত্বের মর্যাদাহানির আশঙ্কা।

কাজেই অধিকাংশ সমালোচকই যে রবীন্দ্রনাথের ঔপনিষদীয় মহিমাকীর্তনে ব্যস্ত এ কথা বললে বোধ করি খুব ভুল বলা হবে না। উপনিষদের ছাপ রবীন্দ্রনাথের সারা গায়ে আঁকা—অস্বীকার করার উপায় কি? কিন্তু একটা কথা বোধ করি জোর করেই বলা যায়—রবীন্দ্রনাথ কোনক্রমেই বৈদান্তিক ছিলেন না। বিশ্বজগৎকে তিনি মায়াবলে উড়িয়ে দেন নি। রবীন্দ্রনাথের কাছে সীমার জগৎ অসীমের লীলাজগৎ। তিনি বলছেন: "যেখানেই হোক বিশিষ্টতা বলে একটা পদার্থ এসেছে। মিথ্যাই বলি, মায়াই বলি, তার একটা মস্ত জোর আছে। এই জোর সে পায় কোথা থেকে? ব্রহ্ম ছাড়া আর কোন শক্তি (তাকে শয়তান বল বা আর কোন নাম দাও) কি বাইরে থেকে জোর করে এই মায়াকে আরোপ করে? সে তো ভাবতেও পারি নে। ব্রহ্মের আনন্দ থেকে এ সমস্ত যা-কিছু হচ্ছে। এ তাঁর ইচ্ছা।" কাজেই ব্রহ্মের ইচ্ছায় যার উৎপত্তি তাকে কবি মিথ্যা বলবেন কী করে?

"পৃথিবী" নামক কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বিবর্তন-বাদকে স্বীকার করে নিয়েছেন।

আমি এ-সব কথা বলছি রবীন্দ্রনাথের দার্শনিকতা সম্পর্কে কোন বিতর্ক উত্থাপন করার জন্য নয়। আমার প্রশ্ন এই যে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটি দার্শনিকতত্ত্ব ছিল এবং সেই তত্ত্বের দ্বারা তাঁর সমস্ত সাহিত্য আলোকিত এ কথা অনুমান করার প্রয়োজন কি? রবীন্দ্র-সাহিত্যে আমরা যে বিভিন্ন তত্ত্বের সাক্ষাৎ লাভ করি—ব্রহ্মতত্ত্ব, গতিতত্ত্ব, বিবর্তন-তত্ত্ব—তিনি নিজেই অবশ্য তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে এ সবের একটি সমন্বিত রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে তিনি নিজের যে সুসমঞ্জস রূপটি দিতে চেষ্টা করেছেন, তাঁর সাহিত্য বাধ্য মেষশাবকের মত তাকেই অনুসরণ করে চলেছে এ কথা আমরা কেন স্বীকার করে নেব?

বিষয়টাকে আর একটু পরিষ্কার করে বলি। 'গীতাঞ্জলি'র মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মের সান্নিধ্য কামনা করেছেন, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলন আকাঙ্ক্ষা করেছেন। এখানে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবাদী। কিন্তু 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের "চঞ্চলা" কবিতায় কবি যে গতিমুখর কালের চিত্র দিয়েছেন, সে-কাল জড়জগতের সঙ্গে আপেক্ষিকতার সম্পর্কে যুক্ত বলেই গতিশীল। উপনিষদের মতে জড়-জগৎ অনিত্য বলেই মিথ্যা; রবীন্দ্রনাথের কাছে জড়জগৎ অনিত্য বলেই চির-নূতন, চির-সুন্দর—অর্থাৎ সত্য। "চঞ্চলা"র গতি হেগেলীয় আইডিয়ার বা প্রাণের গতি নয়, জড়জগতের গতি। কাজেই 'গীতাঞ্জলি'র তত্ত্ব আর 'বলাকা'র তত্ত্বকে উপমার ভাষায় সমন্বিত করা সম্ভব হলেও দার্শনিকের ভাষায় সমন্বিত করা যায় কিনা বিবেচনার বিষয়।

আমার প্রশ্ন হল, এইরকম সমন্বয়ের চেষ্টার প্রয়োজন কি? রবীন্দ্রনাথের কবিমানসে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলব্ধি সত্য বলে প্রতিভাত হয়েছে এবং তিনি তাকে কাব্যরূপ দিয়েছেন। পরস্পর বিপরীত তত্ত্ব তাঁর মনে আত্মীয়তাস্থাপন করে অবস্থান করছিল। তাঁর গল্পে উপন্যাসে তাই বাস্তববাদ এবং রোমান্টিসিজমের যুগপৎ সমাবেশ। তাঁর কাব্যে তাই আইডিয়ালও যতখানি সত্য, রিয়ালও ততখানি সত্য। এই দুই বিরুদ্ধ অনুভূতির মধ্যে টানাপোড়েনও কম ছিল না। ছিল বলেই রবীন্দ্র-সাহিত্যে এত বৈচিত্র্য, এত সমৃদ্ধি। শুধু তাই নয়—এত জটিলতা, এত দুর্বোদ্ধতা, এত কথার মারপ্যাঁচ।

দর্শনের দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্বার্থের একটুখানি মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ওয়ার্ডস্বার্থ জার্মানীর ভাববাদকে আত্মসাৎ করে নিতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি প্রকৃতিসান্নিধ্যজাত ইন্দ্রিয়জ রূপ-রসময় অনুভূতিগুলিকেই আপন ভাববাদী ইমারতের ভিত্তিভূমি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। প্রকৃতির উপর এই নির্ভরশীলতা ভাববাদী চিন্তাধারার বিরোধী; কারণ ভাববাদীর কাছে মানুষের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির জন্য যা কিছু দরকার হয় মন থেকেই তার যোগান পাওয়া যায়, মিথ্যা মায়ার জগৎ থেকে নয়। ওয়ার্ডস্বার্থের মধ্যে আমরা যে বস্তুনির্ভরতা পাই, ঠিক তেমনি বস্তুনির্ভরতার পরিচয় মেলে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। রূপ-রস-শব্দ-গন্ধময় প্রকৃতি-জগৎ রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রেরণার উৎস। ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতির রূপান্তর নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কত কাব্য, গান, নাটক রচনা করেছেন। মানুষের ভাল-মন্দ, মানুষের স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক রবীন্দ্র-মানসে সত্য এবং বাস্তব। প্রকৃতির সঙ্গে সান্নিধ্য, মানুষের সঙ্গে মানবীয় সম্পর্ক স্থাপন, রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধনার পক্ষে অপরিহার্য। প্রকৃতির সঙ্গে শারীরিক সান্নিধ্য যেমন ওয়ার্ডস্বার্থের অধ্যাত্ম-সাধনার কাছে অপরিহার্য। ওয়ার্ডস্বার্থের ক্ষেত্রে যেমন, রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও তেমনি এই বাস্তব-চেতনা তাঁর তত্ত্ব-চিন্তার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট। সৃষ্টির মধ্যে যে আনন্দের অভিব্যক্তি ঘটছে তার মধ্যে স্রষ্টার আনন্দই প্রতিভাত, তাই সৃষ্টির আনন্দের মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করে দিয়ে তবেই ব্রহ্মসাধনা সম্ভব—এইটেই রবীন্দ্রনাথের বাণী। দার্শনিকের যুক্তিতে এই তত্ত্বকে স্বীকার করা যায় কিনা সন্দেহ। কিন্তু কবির উপলব্ধিতে স্রষ্টা এবং সৃষ্ট-জগৎ দুই-ই সমান সত্য বলে গৃহীত হয়েছে। কবির কাছে তাই ব্যক্তি-চৈতন্য জগৎকে অস্বীকার করে আপন চৈতন্যের মধ্যে বিশ্ব-চৈতন্যের সান্নিধ্যলাভে অক্ষম। ব্যক্তি-চৈতন্য যদি জগৎ ও জীবনের সান্নিধ্য থেকে বিচ্যুত হয় তবে নিয়মিত রস-সরবরাহের অভাবে দারুণ বিপর্যয় দেখা দেবে, এই বিশ্বাস ছিল কবি-চৈতন্যের অত্যন্ত গভীরে। বলা বাহুল্য এই বস্তুনির্ভরতা ভাববাদী দর্শনের সম্পূর্ণ বিরোধী।

পক্ষান্তরে রিয়াল শরীরী প্রেম সহজেই ক্লান্তি এবং অবসাদের জন্ম দেয় বলে এবং ক্ষণস্থায়ী বলে কবি গগন-মার্গে স্থাপিত আইডিয়াল প্রেমকে অধিকতর বরণীয় বলে মনে করেছেন। 'নষ্টনীড়' এবং 'চোখের বালির' রিয়াল প্রেমকে 'শেষের কবিতা'য় আইডিয়ালের সুরে নিয়ে আসতে পেরে তিনি স্বস্তিলাভ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই দুই বিপরীত প্রবণতার কথা জানতেন বলে তিনি তাঁর তত্ত্বের মধ্যে ভাবতন্ত্রের

প্রাধান্যের মধ্যে ভাব এবং বস্তুকে যুগপৎ স্বীকৃতি দান করেছেন। অসামঞ্জস্যের লজ্জা থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য রবীন্দ্রনাথের এই সমন্বয়ের প্রয়াসকে আমরা অনর্থক গুরুত্ব দিতে যাব কেন? যদি বলি, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দুই বিভিন্ন সত্তা দুই বিভিন্ন প্রবণতাকে আশ্রয় করে বেড়ে উঠেছে তাতে ক্ষতি কি? এই দুই বিপরীত প্রবণতার মধ্যে যেমন দ্বন্দ্ব ছিল, তেমনই অবিচ্ছেদ্যতাও ছিল। একটি অসম্ভব দর্শনকে মেনে নেওয়ার বদলে রবীন্দ্রনাথের দ্বৈতসত্তার বাস্তবতাকে স্বীকার করায় দোষ কি?

আমার বিশ্বাস প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ভাব এবং বস্তুর এই দ্বন্দ্ব আছে। ভাববাদের উৎস মানুষের হৃদয়, যা নিজে মনোময় বলে বিশ্বজগৎকে মনোময় বলে দেখতে চায়। আর বস্তুবাদের উৎস মানুষের মস্তিষ্ক, যা যুক্তি আর বিজ্ঞানের সাহায্যে বস্তুকে রূপান্তরিত করতে পারে বলে বস্তুর সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে। ভাষা আমাদের যে বিশুদ্ধীকরণের শক্তি দিয়েছে, তার সাহায্যে আমরা বিশুদ্ধ ভাববাদী অথবা বিশুদ্ধ বস্তুবাদী বলে সমাজে নিজেদের পরিচয় দিতে চাই। কিন্তু আমাদের সাধারণ মানুষদের পক্ষে নিজেদের আংশিকভাবে গোপন করা সম্ভব; কবির পক্ষে তা খুব দুরূহ কাজ। তিনি যে তাঁর কাব্যের মধ্যে নিজের সমগ্র সত্ত্বাকে উদ্‌ঘাটিত করেন।

বলা চলতে পারে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাবতন্ত্রকে ভারতীয় ঐতিহ্য থেকে এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বলতর বস্তুবাদী-প্রবণতাকে যুরোপীয় বিজ্ঞানবাদের প্রভাব থেকে লাভ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের উপর এবং রবীন্দ্রযুগের উপর পাশ্চাত্যের প্রভাব উপেক্ষা বা অস্বীকার করার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। কিন্তু যখন দেখি পাশ্চাত্য-প্রভাবের অনেক আগে বৈষ্ণবকবিগণ মানবীয় প্রেমের অত্যন্ত রিয়াল নিখুঁত এবং শরীরী বিবরণের ভিতর দিয়ে অধ্যাত্ম-সাধনা করেছিলেন, ভারতচন্দ্র মাতৃসাধনা করতে গিয়ে নরনারীর স্থূল জৈব-প্রেমের রসকে রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করেছিলেন; তখন বাস্তবতার ভিত্তি আমাদের দেশের মাটিতেই ছিল না এ কথা বলি কী করে?

রবীন্দ্রদর্শনের এই দুই বিপরীতমুখী প্রবণতা কী করে তাঁর নাটকের মধ্যে প্রকাশলাভ করেছে এই প্রবন্ধে আমি তাই আলোচনা করব।

'রাজা' নাটকেই রবীন্দ্রনাথের ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গী সর্বাধিক প্রকাশলাভ করেছে। অরূপকে রূপের মধ্যে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাই রাণী সুদর্শনার মনের একান্ত অভিলাষ। এবং অরূপকে মনের বাইরের জগতে রূপের মধ্যে পাওয়া যায় না, অন্তরের উপলব্ধিতে অরূপ হিসাবেই তাকে পেতে হবে, এই হচ্ছে এ-নাটকের প্রতিপাদ্য। রূপের মধ্যে অরূপের খণ্ড প্রকাশ ঘটে বটে, কিন্তু খণ্ডের মধ্যে সমগ্র হারিয়ে যায়। রূপের মধ্যে অরূপকে পেতে হলে সুন্দর-অসুন্দরের ইন্দ্রিয়জ মোহ আমাদের বিভ্রান্ত করে। এই প্রতিপাদ্য থেকে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে অরূপের সাধনা করতে হলে জীবন-জগৎ থেকে নিজেকে গুটিয়ে এনে অন্তরসাধনায় মগ্ন হতে হবে।

কিন্তু জীবন-জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার যে কী ফল তা 'অচলায়তনে'র মধ্যে দেখানো হয়েছে। বহির্জগৎ থেকে যদি নিয়মিত প্রাণরসের যোগান না পাওয়া যায়, তবে নতুন উপাদানের অভাবে মানুষের মন একই পৌনঃপুনিক নিয়মচক্রের দাস হয়ে পড়ে। 'অচলায়তনে'র সমাজ রুদ্ধদ্বার কূপমণ্ডূক সমাজ; নিয়ম এবং অনুশাসনের শৃঙ্খলে সে সমাজ প্রাণের সাধনা করতে গিয়ে জড়ত্বের মধ্যে ডুবে গিয়েছে। আভ্যন্তরীণ সংশয় এবং বাইরের আঘাত, এ দুয়ের যুগপৎ সমন্বয় না ঘটলে এ সমাজের মুক্তি নেই। 'অচলায়তনে'র উপর সে আঘাত আসছে নিম্নতর সমাজের মানুষদের থেকে, যাদের জীবন প্রধানতঃ শরীর-কেন্দ্রিক, উচ্চতর আধ্যাত্মিক সাধনার যারা কিছুই বোঝে না। কাজেই এ নাটকের প্রতিপাদ্য—জীবন-জগৎ থেকে, অর্থাৎ বাস্তব-নির্ভরশীল হয়েই, রস-সঞ্চয় করেই অধ্যাত্ম-সাধনা সজীব হয়ে উঠতে পারে। এ কথা 'রাজা' নাটকের প্রতিপাদ্যের বিপরীত।

সংসারের ভিতর দিয়েও ঈশ্বরকে লাভ করা যায়, হিন্দুধর্মে এ বিধান আছে বটে। কিন্তু এ বিধান দুর্বলতরদের জন্য। জীবনকে বর্জন করে যে আধ্যাত্মিক সাধনা—জ্ঞান-মার্গের সাধনা—ভারতীয় ঐতিহ্যে তারই জয়জয়কার। 'রাজা' নাটকে ছাড়া অন্যত্র বারবার রবীন্দ্রনাথ এই সাধনাকে ধিক্কার দিয়েছেন।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকে কী করে এক জ্ঞানপন্থী সাধকের নিষ্কাম মনকে এক ক্ষুদ্র বালিকা অপহরণ করল, কী করে সেই বালিকার অভাবে সাধকের চোখে অশ্রুর বন্যা নামল, তারই কাহিনী বিবৃত হয়েছে। বস্তুতঃ জীবন-বিচ্ছিন্নতা যে এক দারুণ অভিশাপ, বিচ্ছিন্ন মন যে অধ্যাত্মসাধনার পক্ষে একান্ত অনুপযোগী, রবীন্দ্রনাথ বার-বার তাই উপস্থিত করেছেন। সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশ রয়েছে; সীমা আর অসীমের মধ্যে নিত্য যাওয়া-আসা। তাই সীমাকে বাদ দিয়ে অসীমের সাধনা নিরর্থক। এ জিনিস ভাববাদ বটে—কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ তার আবশ্যিক ভিত্তি।

মালিনীর মধ্যে সুপ্রিয়র মুখ দিয়ে কবি বলছেন, ধর্মমতের বিভিন্নতায় কী আসে যায়?—বিভিন্ন ধর্মমত পাশাপাশি সহাবস্থান করতে পারে। কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ সম্পর্কগুলির স্বীকৃতি সমস্ত ধর্মমতের ভিত্তি হওয়া উচিত। মালিনীর প্রতি সুপ্রিয়ের জৈব আকর্ষণের জন্য সে লজ্জিত নয়। মানবীয় সম্পর্কই মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সুপ্রিয়র কাছে নবধর্মের আকর্ষণ এই যে প্রীতি তার ভিত্তি। মালিনীর বিশ্বপ্রেম সার্থক হল সুপ্রিয়র ব্যক্তিপ্রেম লাভ করে।

ভাব আর জড়ের দ্বন্দ্বে রবীন্দ্রনাথ কখনও একটিকে কখনও অপরটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। 'রাজা ও রাণী' নাটকে বিক্রমদেব কামপ্রধান প্রেমের মধ্যে উচ্চতর আদর্শ ভুলে গিয়ে মগ্ন হয়ে থাকতে চাইছে। রাণী সুমিত্রা কিন্তু রাজার রাজধর্মের উচ্চতর আদর্শকেই অবলম্বন করতে চাইছে। এই নিয়ে দ্বন্দ্ব, এবং বিক্রমদেবের ভ্রান্তির দরুন এই দ্বন্দ্বের পরিণতি বিয়োগান্ত ঘটনায়। এই নাটকে সামাজিকতার সঙ্গে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে এ ব্যাখ্যা দেওয়া চলে। আবার আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে ইন্দ্রিয়াসক্তির বিরোধ চিত্রিত হয়েছে এ ব্যাখ্যাও অসমীচীন নয়। কাজেই ইন্দ্রিয়জগৎ এখানে ধিকৃত হয়েছে। বস্তুতঃ, রবীন্দ্রনাথকে অনেক সময়েই মধ্যপন্থী বলে মনে হবে—ইন্দ্রিয়জগৎ আর মনোজগতের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের তিনি পক্ষপাতী।

ভাববাদ মনের স্বাধীন ইচ্ছা 'ফ্রি উইল' স্বীকার করে। বস্তুবাদ তা করে না। 'রাজা' নাটকে ব্যক্তির স্ব-ইচ্ছার স্বীকৃতি আছে। কিন্তু 'মুক্তধারা' বা 'রক্তকরবী'তে ব্যক্তিসত্তা সমাজব্যবস্থার অধীন। 'রক্তকরবী'র রাজা যে জীবন-বিচ্ছিন্ন, যে বিচ্ছিন্নতাকে জালের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে, তা তাঁরই হাতের তৈরি সমাজ-ব্যবস্থার ফল। 'রক্তকরবী'র সমাজচিত্র পুরোপুরি যন্ত্রনির্ভর ধনিক সমাজের চিত্র। সর্দারের দল হল বুরোক্র্যাসী, পুরোহিত হল ধর্মনামক অহিফেন সেবন করানোর যন্ত্র, তা ছাড়া আছে মহাজন, আছে দমনের অস্ত্র সৈন্যদল। এই সমাজ রাজার মনে যে বন্ধন চাপিয়েছে তার হাত থেকে তাঁর নিজের মুক্ত হওয়ার শক্তি নেই। নন্দিনীর প্রাণশক্তি এসে রাজার জড়ত্বের জাল ছিন্ন করছে। কিন্তু নন্দিনী কে? শ্রমিকশক্তির প্রতিনিধি রঞ্জন, নন্দিনী তার প্রণয়িনী। কাজেই নন্দিনী শ্রমিক-শক্তির শক্তিস্বরূপিনী। এই জাগ্রত শ্রমিক-শক্তিই রাজার অন্তরের অর্গল ভাঙতে পারে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য মনে করছেন অনড় সমাজব্যবস্থা ভাঙার জন্য শুধু শ্রমিক-শক্তিই নয়, রাজার অর্থাৎ শোষকেরও অন্তরের পরিবর্তন প্রয়োজনীয়। 'রক্তকরবী'র বিদ্রোহ আসলে অন্তরের বিদ্রোহ—প্রজাদের ক্ষেত্রেও, রাজার ক্ষেত্রেও। বহির্বিদ্রোহের চিত্রটিকে আন্তবিদ্রোহের রূপক হিসাবে গ্রহণ করাই সঙ্গত। রবীন্দ্রনাথের মতে অন্তরশুদ্ধি ছাড়া জড়ের পরিবর্তন ঘটে না।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি নাটকের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাতে এ কথা হয়তো স্পষ্ট হয়েছে যে, ওয়ার্ড-স্বার্থের মত জড়ের ভিত্তির ওপর রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাববাদের ইমারত গড়ে তুলতে চেয়েছেন। জড় এবং ভাবের দুই বিভিন্নমুখী প্রবণতা রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সাহিত্যে নানা-ভাবে প্রকাশলাভ করেছে। তাঁর নাট্য-সাহিত্য প্রধানতঃ তত্ত্বাশ্রয়ী বলে এই দুই বিপরীতের মধ্যে সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা খুব স্পষ্ট করে চোখে পড়ে। কিন্তু পড়লেও এই দুই প্রবণতাকে তাদের স্বাতন্ত্র্য এবং বৈপরীত্যের মধ্যে চিনে নিতে আমাদের কোন কষ্ট হয় না। রবীন্দ্রনাথের এই দ্বৈত সত্তাকে স্বীকার করে নিতে না পারলে আমরা অনেক সময় রবীন্দ্র-সাহিত্যকে অনুধাবন করতে গিয়ে কানাগলির মধ্যে ঢুকে পড়ব। পথ হারিয়ে গেলে অপরের বাড়ির ছাদের উপর দিয়ে পথ গিয়েছে বলে চিৎকার করতে থাকব।

রবীন্দ্রনাথের এই দ্বন্দ্বই রবীন্দ্র সাহিত্যের জটিলতার কারণ। এই দ্বন্দ্ব তাঁর সাহিত্যকে আশ্চর্য সৌন্দর্যেও মণ্ডিত করেছে। তাঁর রূপক এবং সাঙ্কেতিক নাটকগুলির বিশেষত্ব কিসে? বিশেষত্ব আশ্চর্য কল্পনা-কুশলতার মধ্যে। যা সম্পূর্ণ বাস্তব তাকে অপূর্ব কল্পনার সাহায্যে এক অসম্ভব কল্পলোকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। মেটারলিঙ্ক বা স্ট্রীণ্ডবার্গের থেকে তাঁর পার্থক্য এই যে তিনি সব জায়গাতেই প্রতীক ব্যবহার করেন নি। প্রতীকের পাশাপাশি বাস্তবের অবস্থানের ফলে তাঁর কল্পনার রাজ্য থেকে রক্তমাংসের সজীবতা একেবারে বিদূরিত হয় নি। সেইজন্যই এত দুরূহতা সত্ত্বেও রবীন্দ্র-নাটক মানুষকে আকৃষ্ট করে। মঞ্চসাফল্যই তার প্রমাণ।

রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী

শ্রীপুলিনবিহারী সেন-সংকলিত

রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা-সংবলিত গ্রন্থ

রবীন্দ্রনাথ সুদীর্ঘ সাহিত্যজীবনে প্রায় পঞ্চাশখানি বাংলা গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছিলেন। নিম্নে তাহার একটি প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করা গেল। এইসকল ভূমিকার কোন-কোনটি আশীর্বচন বা সংক্ষিপ্ত প্রশস্তি মাত্র; অনেকগুলি রচনা গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় বা গ্রন্থ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা, এজন্য বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। এগুলির মধ্যে, দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'রামায়ণী কথা'র ভূমিকা পাঠকসমাজে সবিশেষ পরিচিত; বর্তমান তালিকা হইতে এইরূপ আরও কতকগুলি প্রবন্ধের কথা সকলের গোচর হইবে।

কোন বই বা রচনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের পত্র বা মন্তব্য, অনেকে গ্রন্থারম্ভে মুদ্রিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে প্রকাশিত এইরূপ মন্তব্যও ভূমিকারূপে এই তালিকায় গৃহীত হইয়াছে; পরবর্তীকালে প্রকাশিত এইরূপ মন্তব্যের সূচী অন্য সূত্রে মুদ্রিত হইবে।

তিনটি গ্রন্থের ক্ষেত্রে বিশেষ কারণে ইহার ব্যতিক্রম করা হইয়াছে—প্রমথ চৌধুরীর 'গল্পসংগ্রহ', অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঘরোয়া', এবং জগদীশচন্দ্র বসুর 'পত্রাবলী'। প্রমথ চৌধুরীর জয়ন্তী উপলক্ষ্যে তাঁহার গল্পসংগ্রহ প্রকাশের প্রস্তাব স্মরণ করিয়াই রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে এই ভূমিকা রচনা করেন; গ্রন্থখানি কবির জীবিতকালে প্রকাশিত হইতে পারে নাই। 'ঘরোয়া' রচনায় 'শ্রুতিধরী' শ্রীমতী রানী চন্দকে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে উৎসাহিত করিয়াছিলেন; এ গ্রন্থও রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অল্পকাল পরে প্রকাশিত হইয়াছিল; রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থের কতক অংশ পাঠ করিয়া অবনীন্দ্রনাথকে যে দুইখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন (২৭ ও ২৯ জুন ১৯৪১) তাহা ১৩৪৮ কার্তিক সংখ্যা প্রবাসী পত্রে মুদ্রিত হয়। এই সময় অবনীন্দ্রনাথের জয়ন্তীর প্রস্তাবে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানবাণী (১৩ জুলাই ১৯৪১) গ্রন্থের ভূমিকাস্বরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশচন্দ্রের পত্রাবলী ১৩৩৩ সালে প্রবাসীতে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়; রবীন্দ্রনাথ-লিখিত 'পত্র-পরিচয়' দ্বারা এই পত্রাবলী প্রকাশের সূচনা হইয়াছিল; বত্রিশ বৎসর পরে চিঠিগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় সেই 'পত্র-পরিচয়'ই ভূমিকারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের কোনও কোনও প্রবন্ধ পরবর্তীকালে কেহ কেহ গ্রন্থের মুখবন্ধরূপে ব্যবহার করিয়াছেন; যেমন শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য-সম্পাদিত সংস্করণ (১৩৫৪) ত্রৈলোক্যনাথের 'কঙ্কাবতী' গ্রন্থের সূচনায় রবীন্দ্রনাথের কঙ্কাবতী-সমালোচনা মুদ্রিত হইয়াছে, পরে মিত্র ও ঘোষ কোম্পানিও এই রচনাযুক্ত 'কঙ্কাবতী'র একটি সংস্করণ (১৩৬৪) প্রকাশ করিয়াছেন। এইসকল পুস্তক এই তালিকাভুক্ত হয় নাই।

এই তালিকায় কোনও-কোনও গ্রন্থের নাম বাদ পড়িয়াছে বলিয়া আমাদের অনুমান। অনুগ্রহপূর্বক পাঠকেরা সে বিষয় আমাদের গোচর করিলে বিশেষ কৃতজ্ঞ হইব; ভবিষ্যতে একটি অনুবৃত্তি-তালিকা প্রকাশ করিয়া বর্তমান তালিকা সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা করা যাইবে।

রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা-সংবলিত কতকগুলি গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই বলিয়া তালিকামধ্যে সেগুলির উল্লেখ করা যায় নাই—যথা দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, 'ঠাকুরমার ঝুলি'; শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত, 'বেড়াল ঠাকুরঝি'; সুকুমার রায়, 'পাগলা দাশু'। প্রথম দুইখানি গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণেও ভূমিকা মুদ্রিত আছে। কিরণচাঁদ দরবেশ-প্রণীত 'মন্দির' গ্রন্থেও রবীন্দ্রনাথ-লিখিত একটি প্রশস্তি মুদ্রিত আছে। পাঠকদের কাহারও সংগ্রহে এই পুস্তকগুলির প্রথম সংস্করণ থাকিলে সে কথা আমাদের জানাইলে কৃতজ্ঞ হইব।

রবীন্দ্রনাথ স্বীয় গ্রন্থসমূহের যে ভূমিকা লিখিয়াছিলেন তাহা এই তালিকার অন্তর্গত নহে; রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জীতে সেসকল ভূমিকার বিষয় উল্লেখ থাকিবে। রবীন্দ্রনাথ অপরের রচিত কতকগুলি গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং তাহার কোন-কোনটির ভূমিকাও লিখিয়াছিলেন; বর্তমান তালিকায় সেগুলি উল্লিখিত হইল না—রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত গ্রন্থসমূহের একটি স্বতন্ত্র সূচীতে ঐসকল ভূমিকারও উল্লেখ থাকিবে।

রবীন্দ্রনাথ যেসকল গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহারও একটি সূচী প্রস্তুত করা হইবে। ভূমিকা ব্যতীত, রবীন্দ্রনাথের রচনা-সংবলিত অপরের সম্পাদিত বা লিখিত বাংলা গ্রন্থের একটি তালিকাও সংকলিত হইতেছে।

এই তালিকায় উল্লিখিত গ্রন্থের অনেকগুলি শান্তি-নিকেতন-বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে রক্ষিত। শ্রীক্ষিতীশ রায় 'মেয়েলি ব্রত' পুস্তকের বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। সৈয়দ মুজতবা আলী 'হারামণি' গ্রন্থ দেখিতে দিয়াছেন। কলিকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরি হইতে কয়েকখানি পুস্তকের বিবরণ শ্রীপার্থ বসু সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। শান্তিনিকেতন-রবীন্দ্রসদনের শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় কতকগুলি পুস্তক আমার লক্ষ্যগোচর করেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারে 'রামায়ণী কথা'র এবং 'মেয়েলি ব্রত ও কথা'র প্রথম সংস্করণ দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। শ্রীরামেশ্বর দে সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর "ইন্দ্রধনু" দেখিতে দিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই সংকলয়িতার কৃতজ্ঞতাভাজন।

মেয়েলি ব্রত। / (স্ত্রীসমাজে প্রচলিত কতিপয় / বারব্রতের বিবরণ।) / 'ভক্তচরিতামৃত' ও 'শ্রীহরিদাস ঠাকুর' / প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা / শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় / সঙ্কলিত / কলিকাতা / ১৪ নং ডফ ষ্ট্রীট হইতে / সুর এণ্ড কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত / ১৩০৩ / All Rights Reserved] [মূল্য ।৵০ পাঁচ আনা

পৃ. ॥০, ৬৮।

রবীন্দ্রনাথের ভূমিকার তারিখ কার্সিয়ং ৭ কার্তিক ১৩০৩।

রামায়ণী কথা। / শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি. এ. / প্রণীত। / (দুইখানি হাফটোন ছবি এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত / ভূমিকার সহিত) / "যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে। / তাবদ্রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি॥" / কলিকাতা / ২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারত-মিহির যন্ত্রে, / সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা / মুদ্রিত ও প্রকাশিত। / ১৩১১। / মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র।

পৃ. [৮], ৸৵০, ২২১।

রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ৴০-৸০, তারিখ ৫ই পৌষ ১৩১০।

'গ্রন্থকারের নিবেদনে'র তারিখ ১২ই বৈশাখ ১৩১১।

গুরুদক্ষিণা। / সতীশচন্দ্র রায় প্রণীত। / মজুমদার লাইব্রেরি হইতে / এস্, সি, মজুমদার কর্তৃক / প্রকাশিত। / কলিকাতা। / ২০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট দিনময়ী প্রেসে / শ্রীঅনুকূলচন্দ্র পারিহাল দ্বারা / মুদ্রিত।

পৃ. [২], ১৵০, ৩৪।

"বোলপুর শান্তিনিকেতন, ব্রহ্মচর্যাশ্রম গ্রন্থাবলী।"

রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ৵০-১৵০। তারিখ ১৩১১।

এই প্রবন্ধ বিচিত্র প্রবন্ধ (১৩১৪ বৈশাখ) গ্রন্থে প্রকাশিত। অপিচ দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "গুরুদক্ষিণা" (সমালোচনা), বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১৩১১।

শিক্ষার আন্দোলন।[১] / (শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত / ভূমিকা সহিত) / শ্রীকেদারনাথ দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক / প্রকাশিত।

পৃ. [৪], ।৵০, ৩২, [দ্বিতীয় অংশ] ক-ল। / [১৩১২] সালে প্রকাশিত।

রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ৵০-।৵০।

এই ভূমিকা রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত।

যুগলাঞ্জলি / বিচিত্র গল্প। / শ্রীস্নেহলতা সেন রচিত। / Garland of Fancies. / শ্রীললিতা গুপ্ত রচিত

পৃ. [॥০], ২৩৯, [vi], 16

'দুহিতৃসমা' শ্রীমতী স্নেহলতা সেন ও শ্রীমতী ললিতা গুপ্তকে এই "যুগলাঞ্জলি" সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের পত্র এই গ্রন্থে মুদ্রিত ([পৃ. ৶০])।

পত্রের তারিখ শান্তিনিকেতন, ২১শে আষাঢ় ১৩১৩।

সরল / কৃত্তিবাস / অর্থাৎ / কৃত্তিবাস-প্রণীত সপ্তকাণ্ড রামায়ণ। / মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত-প্রণেতা / শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু বি. এ. / সম্পাদিত। / অমৃত-মধুর এই সীতা-রাম-লীলা। / শুনিলে পাষাণ গলে, জলে ভাসে শিলা॥ / ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌স্‌, / ৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পৃ. [২], ১৵০, ২২০, পরিশিষ্ট ৭।

প্রকাশ ১৩১৪।

রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা পৃ. ।৵০-।৵০, তারিখ ৩০ শ্রাবণ ১৩১৪।

মেয়েলি ব্রত ও কথা, / অর্থাৎ / পূর্ববঙ্গের যোষিৎ-প্রচলিত কতিপয় ব্রতের / বিবরণ. / শ্রীপরমেশ-প্রসন্ন রায়, বি. এ. / সঙ্কলিত. / প্রকাশক / শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বেঙ্গল মেডিকাল লাইব্রেরী, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা. / All Rights Reserved. মূল্য ।০ আনা মাত্র.

পৃ. [৪], ॥০, ১০৮।

সংকলয়িতার মুখবন্ধের তারিখ, ভাদ্র ১৩১৫।

মুখবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'মুদ্রিতাংশ প্রাপ্ত হইয়া' যে অভিমত জ্ঞাপন করেন তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে (পৃ. ৵০-৶০)।

শিবাজী ও মারাঠাজাতি। / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত ভূমিকাসহ। / শ্রীশরৎকুমার রায় প্রণীত। / মূল্য আট আনা

পৃ. [।০], [৫], ৮৫

রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা, [১]-[৫]।

লেখকের 'নিবেদনে'র তারিখ ২৭এ শ্রাবণ, ১৩১৬।

এই ভূমিকা রবীন্দ্রনাথের 'ইতিহাস' (১৩৬২) গ্রন্থে "শিবাজী ও মারাঠা জাতি" নামে পুনর্মুদ্রিত।

কাদম্বরী / পণ্ডিত তারাশঙ্কর তর্করত্ন প্রণীত / গ্রন্থ অবলম্বনে / শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,... / ও / শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় / কর্তৃক / সংস্কৃত মূলানুযায়ী করিয়া সম্পাদিত / ...ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস / ২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট / কলিকাতা / ১৯০৯ /...

পৃ. [২], ৵০, ১৷, ১৪৭, ৯

"কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার "কাদম্বরী চিত্র" নামক পরম উপাদেয় সন্দর্ভ স্বয়ং পরিবর্ত্তিত করিয়া এই সংস্করণের ভূমিকাস্বরূপে ব্যবহার করিতে অনুমতি দিয়াছেন।"—'সম্পাদকের নিবেদন'।

ভূমিকার পৃষ্ঠাসংখ্যা ৵০-৸৵০।

শিখগুরু ও শিখজাতি / শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত / ভূমিকা সম্বলিত / শ্রীশরৎকুমার রায় প্রণীত /

১ আখ্যাপত্রে উল্লিখিত নাম। গ্রন্থারম্ভে ও পৃষ্ঠাশীর্ষে 'শিক্ষা' নামে উল্লিখিত।

বোলপুর শান্তিনিকেতন / ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম / এলাহাবাদ :— ইণ্ডিয়ান প্রেস / কলিকাতা :—ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস / হইতে প্রকাশিত / ১৯১০ / মূল্য এক টাকা মাত্র

পৃ. [২], ক-ঢ, [৵৹], (২), ১৫৩, ৵৹

গ্রন্থকারের নিবেদনের তারিখ ১ বৈশাখ ১৩১৭।

রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা পৃ. ক-ঢ।

রচনাটি চৈত্র ১৩১৬ সংখ্যা প্রবাসী পত্রে "শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ" নামে মুদ্রিত হইয়াছিল; ভূমিকারূপে পরিবর্ধিত সম্পূর্ণ রচনাটি রবীন্দ্রনাথের 'ইতিহাস' (১৩৬২) পুস্তকে "শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ" নামে গ্রন্থভুক্ত হইয়াছে।

শান্তিনিকেতন / **খৃষ্ট** / শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী / প্রণীত / ও / শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত / ভূমিকা সম্বলিত / মূল্য চার আনা

পৃ. [২], ১।৴৹, ৬৩।

রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ৴০-১।৴০।

'যিশুচরিত' নামে এই রচনা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (ভাদ্র ১৮৩৩ শক, ১৩১৮) প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের 'খৃষ্ট' গ্রন্থের (পৌষ, ১৩৬৬) অন্তর্ভুক্ত।

বসন্ত-প্রয়াণ। / শ্রীসরযূবালা দাস গুপ্তা প্রণীত। / (শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-লিখিত / ভূমিকা সম্বলিত) /...

পৃ. [২], ১॥৹, ৵৹, [৬], ১৪৫।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা পৃ. ৴০-১॥০। ভূমিকার তারিখ ৮ চৈত্র ১৩২০।

দ্বিজেন্দ্রলাল / জীবন / শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী- / প্রণীত / ১৩২৪

পৃ. ১॥০, ৭৬৯, [২]

রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়া যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা গ্রন্থকারের ভূমিকায় উদ্ধৃত হইয়াছে (পৃ. ॥৴০-।৵০)।

গ্রন্থকারের ভূমিকার তারিখ ১২ই ভাদ্র ১৩২৪

বাঘগুহা / ও / রামগড় / শ্রীঅসিতকুমার হালদার / ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড্ / এলাহাবাদ / ১৩২৮

পৃ. [।০], ক-[জ], ৮০।

রবীন্দ্রনাথ-লিখিত 'পরিচয়' পৃ. ক-গ। তারিখ ১৫ই ভাদ্র ১৩২৮।

হৃষীকেশ সিরিজ,—নং ৪ / **কান্তকবি রজনীকান্ত** / শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

পৃ. [১৲], ৪০৫, [২]।

প্রকাশক বেঙ্গল বুক কোম্পানী।

প্রকাশ-সাল ১৩২৮। লেখকের নিবেদনের তারিখ মহাবিষুবসংক্রান্তি ১৩২৮।

রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা পৃ. [।৵০]।

রামেন্দ্রসুন্দর / জীবন-কথা / শ্রীআশুতোষ বাজপেয়ী / গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ / ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা / চৈত্র—১৩৩০ / মূল্য তিন টাকা মাত্র

পৃ. [৵০], (১৬), ২৲, ৩৮৪।

রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা পৃ. [(৫)-(৬)]

কাঠের কাজ / শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ / হস্তশিল্পশিক্ষক, শান্তিনিকেতন। / বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয় / ২১৭ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পৃ. ৮০, ৯৬।

রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা, পৃ. ।৵০-॥

ভূমিকার তারিখ ৯ই অগ্রহায়ণ ১৩৩২।

সরোজ-নলিনী ৺সরোজ-নলিনী দত্ত, এম, বি, ই র / সংক্ষিপ্ত জীবনী। / তাঁহার স্বামী / শ্রীগুরুসদয় দত্ত, আই, সি, এস / প্রণীত। / (কবিবর রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা-সম্বলিত) / প্রকাশক :— / দি বুক কোম্পানি, লিমিটেড্। / ৪।৪এ, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। / মূল্য ॥০ আট আনা।

'নিবেদন'-রচনায় তারিখ ২৩ ডিসেম্বর ১৯২৫। ন্যাশনাল লাইব্রেরি-রক্ষিত পুস্তকের এই কপি অসম্পূর্ণ প্রথম সংস্করণ (১৯২৬) বলিয়া অনুমিত।

রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা (২০ অগ্রহায়ণ ১৩৩২) তাঁহার হস্তাক্ষরে স্বতন্ত্র মুদ্রিত কাগজের দুই পৃষ্ঠায় মুদ্রিত।

ইন্দ্রধনু / শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী / গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, / ২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা / এক টাকা

পৃ. ৭৯।

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের "নিবেদনে" রবীন্দ্রনাথের "আশীর্ব্বচন" (২৮শে মাঘ ১৩৩৪) মুদ্রিত হইয়াছে (পৃ. ৪)।

উদিতা / শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

পৃ. [৬], ৵০, ১৪৪।

প্রকাশক চক্রবর্ত্তী চাটার্জি এণ্ড কোং কলিকাতা।

রবীন্দ্রনাথ-লিখিত 'আশংসিকা', পৃ. [৩-৪], তারিখ ২৬শে নভেম্বর ১৯২৯।

বাতায়ন / উমাদেবী / ১লা বৈশাখ ১৩৩৭

প্রাপ্তিস্থান রায় এম. সি. সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্স কলিকাতা।

পৃ. ।৵০, ৪২

উমা দেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র ভূমিকারূপে ব্যবহৃত পৃ. [।/০-।৵০]

সরল কৃষি শিক্ষা / শ্রীসন্তোষবিহারী বসু / ... / মূল্য ১।০ টাকা

পৃ. ৮০, ১৮৬।

রবীন্দ্রনাথ-লিখিত 'মুখপত্র', পৃ. ৵০-।/০, তারিখ ৪ঠা বৈশাখ ১৩৩৪।

লেখকের 'নিবেদনে'র তারিখ ১ বৈশাখ ১৩৩৭।

রবীন্দ্রনাথের রচনাটি "কৃষিবিৎ সন্তোষবিহারী বসু" নামে ১৩৩৫ পৌষ সংখ্যা প্রবাসীতে মুদ্রিত হইয়াছিল।

ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা / (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের 'অধর মুখার্জি' লেকচর) / [কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় লিখিত ভূমিকা সহ] / শ্রীক্ষিতিমোহন সেন, / অধ্যাপক, বিদ্যাভবন, বিশ্বভারতী / কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে / প্রকাশিত / ১৯৩০

পৃ. ১৵, ১২১।

রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা পৃ. ৸৵০-১৵।

হারামণি / ডক্টর শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডি, লিট, মহাশয়ের / ভূমিকা সম্বলিত / ডক্টর শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডি, লিট, সি, আই, ই / অঙ্কিত প্রচ্ছদপট ভূষিত / সংগৃহীত ও সম্পাদিত / মৌলবী মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, এম-এ / ... প্রাপ্তিস্থান / প্রবাসী কার্য্যালয় / ১২০।২ আপার সার্কুলার রোড / কলিকাতা।

পৃ. [২], [১।০], ৮০, ১৩০।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আশীর্ব্বাদ' [/০-।৵০]।

প্রথম সংস্করণ বৈশাখ ১৩৩৭।

এই ভূমিকা "বাউল-গান" (পৌষ-সংক্রান্তি ১৩৩৪) নামে চৈত্র ১৩৩৪ সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরে মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন সম্পাদিত বর্ধিতায়তন লোকসংগীত সংগ্রহ 'হারামণি' নামে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও এই 'আশীর্বাদ' মুদ্রিত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, 'হারামণি' নামে প্রবাসীতে (১৩২২) রবীন্দ্রনাথ 'নিরক্ষর বা স্বল্পাক্ষর গ্রাম্য কবির' গান ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন।

জাতীয় ভিত্তি / (পল্লী-সংস্কার সমস্যার আলোচনা) / অধ্যাপক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় / (বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-লিখিত ভূমিকা সহ) / প্রকাশক—প্রফুল্ল রায় / পি ৪৯, লেক রোড, কলিকাতা। / ১৩৩৮

পৃ. [৪], ৵০, ।০, ৬৬।

রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা /০-।০।

রবীন্দ্রনাথের 'সমবায়নীতি' (১৩৬০) গ্রন্থে "সমবায় ২" নামে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

রচনাটি ফাল্গুন ১৩২৯ সংখ্যা বঙ্গবাণী মাসিক পত্রে 'সমবায়' নামে মুদ্রিত হইয়াছিল।

কালিদাসের গল্প / শ্রীরঘুনাথ মল্লিক এম, এ / বিরচিত / প্রবাসী প্রেস / ১২০।২ আপার সার্কুলার রোড / কলিকাতা / ১৩৩৮

পৃ. [৬], ৮০, ২৭৬।

রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা, ৵০-৵৹০। তারিখ ১৪ ভাদ্র ১৩৩৮।

লেখকের 'নিবেদনে'র তারিখ ১৮ ভাদ্র ১৩৩৮।

শিশু-ভারতী। সম্পাদক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রথম খণ্ড। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা পৃ [২], ক-ঘ, ৪০০।

ঘ পৃষ্ঠার পর স্বতন্ত্র মুদ্রিত কাগজে রবীন্দ্রনাথের শুভকামনা তাঁহার হস্তাক্ষরে মুদ্রিত। তারিখ ৭ই আশ্বিন ১৩৩৯।

জাতীয় সাহিত্য / সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় / কলিকাতা / ১৯৩২

পৃ. ১৵০, ১৪৬।

প্রকাশক শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ৭৭ আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলিকাতা।

রবীন্দ্রনাথের [ভূমিকা], পৃ. [৵০]।

প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি / স্বর্গীয় প্রিয়নাথ সেন বিরচিত / শ্রীপ্রমোদনাথ সেন সম্পাদিত / মূল্য ২৷৷০ টাকা

পৃ. ৸৵০, ৩২৫।

প্রকাশ ১৩৪০।

রবীন্দ্রনাথের 'মুখবন্ধ' পৃ. ।৵০-৷৷০, তারিখ ২৯ আষাঢ় ১৩৪০

বঙ্গীয় শব্দকোষ /…শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সঙ্কলিত / ও প্রকাশিত। / প্রথম ভাগ—অ, আ / কলিকাতা / ৯ নং বিশ্বকোষ লেনে / "বিশ্বকোষ" প্রেসে / শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সেন কর্তৃক মুদ্রিত। / ১৩৪১ / মূল্য ৭৷৷০ সাত টাকা আট আনা /

এই গ্রন্থের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ-লিখিত 'পরিচয়পত্র' মুদ্রিত আছে, তারিখ ৮ই আশ্বিন ১৩৩৯

বঙ্গ-বীণা / শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় / ও / শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় [সম্পাদিত] / প্রকাশক / ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড / এলাহাবাদ / ১৯৩৭

পৃ. [৪], ।৵০, ক-ফ, ৫৫৮।

রবীন্দ্রনাথ-লিখিত 'পরিচয়', পৃ. ৵০-৶০।

দাদূ / শ্রীক্ষিতিমোহন সেন / বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় / ২১০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পৃ. [৪], ৷৷৵০, ৬৭৫।

প্রকাশ বৈশাখ ১৩৪২।

রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা পৃ. ১-১০।

রচনাটি ১৩৩২ ভাদ্র সংখ্যা প্রবাসীতে "মরমিয়া" নামে প্রকাশিত হয়।

Visva-Bharati Studies No. 6 / **হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ** / [বিশ্বভারতীতে প্রদত্ত নিজাম বক্তৃতা, ১৯৩৫] / কাজী আবদুল ওদুদ। লেকচারার, ঢাকা ইনটারমিডিয়েট কলেজ। / বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় / ২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পৃ. [৷৷৵০] ৬২, ৷৷৵০।

প্রকাশ মাঘ ১৩৪২।

রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা পৃ. [।৵০]। ভূমিকার তারিখ ২১ মাঘ ১৩৪২।

দিনেন্দ্র রচনাবলী / ৺দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর / প্রণীত / মূল্য—১৷৷০

পৃ. [।৵০], ১২৪।

দিনেন্দ্রনাথের সহধর্মিণী কমলা দেবী কর্তৃক প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।

প্রকাশ ১৩৪৩।

রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা পৃ. [৶০], তারিখ ১লা ভাদ্র ১৩৪৩।

গল্প-সঞ্চয় / পরিচয়-পত্র লিখিয়াছেন / রবীন্দ্রনাথ / সম্পাদক / যোগীন্দ্রনাথ সরকার / সিটি বুক সোসাইটি /

৬৪ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা / নূতন সংস্করণ] [মূল্য ৩৲ টাকা

পৃ. ।৵৹, ২১৬।

রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা (পৃ. ।৴৹) তাঁহার হস্তাক্ষরে মুদ্রিত, তারিখ ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬।

সম্পাদকের কৃতজ্ঞতাস্বীকারপত্রের তারিখ, আশ্বিন ১৩৪৩। এই 'নূতন সংস্করণ' ও 'আশ্বিন ১৩৪৩' সংস্করণ এক কি না, বলিতে পারি না।

ভারতীয় ব্যাধি / ও / আধুনিক চিকিৎসা / (প্রথম খণ্ড) / শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য ডি. টি. এম্. / সঙ্কলিত / প্রকাশক / দি বুক কোম্পানী লিমিটেড্ / ৪।৩বি কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। / মূল্য ৬৲ টাকা

পৃ. ॥৵৹, ১, ৭২৭, [১৬], বিজ্ঞাপন ৬ পৃষ্ঠা।

রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা, পৃ. ৶৹-॥৵৹

এই গ্রন্থ ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত, লেখক মহাশয় এইরূপ জানাইয়াছেন।

সপ্তপর্ণ / রাখালচন্দ্র সেন / বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় / ২১০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পৃ. [॥৵৹], ২২৩।

প্রকাশ আশ্বিন ১৩৪৪।

রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা তাঁহার হস্তাক্ষরে স্বতন্ত্র কাগজে মুদ্রিত, পৃ. [।৵৹] পর যুক্ত।

প্রেমাঞ্জলি। / (Love-Offerings) / পিতৃব্য / বিশ্ববন্দ্য কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের / আশীর্ব্বাণী সহ। / 'যক্ষাঙ্গনা' কাব্যরচয়িতা / শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি-এল্, / ব্যারিষ্টার-এ্যাট্‌ল। / …প্রথম সংস্করণ। / ১৩৩৫। / …

পৃ. [৵৹], ৫৭।

শোভনা দেবী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কবিতা, পৃ. ৩।

চম্পা / ও / পাটল / প্রিয়ম্বদা দেবী

প্রকাশক প্রসন্নময়ী দেবী, ৪৬ ঝাউতলা রোড কলিকাতা।

পৃ. ৵৹, [২], ৩৮।

রবীন্দ্রনাথের [ভূমিকা], তাঁহার হস্তাক্ষরে মুদ্রিত, পৃ. [১]।

দেহলি / শ্রীহেমলতা দেবী / বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয় / ২১০ নং কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

পৃ. [॥৹], ১৩৫।

প্রকাশ আশ্বিন ১৩৪৬।

রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে মুদ্রিত পত্র (৮ চৈত্র ১৩৪৫) ভূমিকারূপে ব্যবহৃত, পৃ. [।৴৹]।

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা-২ / প্রাচীন হিন্দুস্থান / শ্রীপ্রমথ চৌধুরী / বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় / ২১০, কর্নওআলিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পৃ. [৪], ।৹, ১১৭।

প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৪৬।

রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা পৃ. ৴৹-৵৹[১]।

জ্ঞানভারতী / বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও গ্রন্থাগারিক / প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় / সম্পাদিত / দি / ন্যাসন্তাল লিটারেচার / কোং

পৃ. ১২, ৭৭৯।

ইহা গ্রন্থের প্রথম খণ্ড। প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৪৭

প্রথম পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য তাঁহার হস্তাক্ষরে মুদ্রিত। তারিখ ২৫ আষাঢ় ১৩৪৭।

পৃথ্বী-পরিচয় / প্রমথনাথ সেনগুপ্ত / বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় / ২১০, কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পৃ [২], ॥৴৹, ৯২।

প্রকাশ ভাদ্র ১৩৪৭। বিশ্বভারতী লোকশিক্ষামালার তৃতীয় গ্রন্থ।

রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা পৃ. ৶৹-।৹।

---

১ লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার অন্য কয়েকটি পুস্তকে পরে এই ভূমিকা বা General Introduction ব্যবহৃত হইয়াছে; সেই পুস্তকগুলি স্বতন্ত্র উল্লিখিত হইল না।

দ্বীপময় ভারত / কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক / শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় / প্রণীত / বুক-কোম্পানি লিমিটেড···কলিকাতা / আশ্বিন ১৩৪৭-সেপ্টেম্বর ১৯৪০

পৃ. ॥০, ৩৬৯।

রবীন্দ্রনাথের 'অভিমত' শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত দুইখানি পত্র হইতে কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত— রবীন্দ্রনাথের 'যাত্রী' গ্রন্থ হইতেও অংশতঃ উদ্ধৃত হইয়াছে।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস / আদি হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত / শ্রীসুকুমার সেন, এম্‌-এ, পিএইচ-ডি / অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / মডার্ন বুক এজেন্সী / ১০, কলেজ স্কোয়ার / কলিকাতা

পৃ. ২॥০, ১১১১

প্রকাশ ১৩৪৭ সাল, ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত ৪/৫/[১৯]৪০ তারিখের পত্র এই গ্রন্থের 'শিরোভূষণ' রূপে প্রকাশিত।

আহার ও আহার্য / শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য / বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় / ২১০, কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা

পৃ. [॥০], ১৩৬।

প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৪৭

বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার চতুর্থ গ্রন্থ।

গ্রন্থকারকে লিখিত একখানি পত্র (৬৷১। [১৯] ৪১) 'ভূমিকা'রূপে ব্যবহৃত।

গল্পসংগ্রহ / প্রমথ চৌধুরী / ১৩৪৮

পৃ. ॥০, ৫০৭।

প্রকাশ ২০শে ভাদ্র ১৩৪৮।

প্রমথ চৌধুরী সংবর্ধনা সমিতির পক্ষে শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন কর্তৃক প্রকাশিত।

রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা পৃ. ।/০-।৵০

ঘরোয়া / শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর / শ্রীরানী চন্দ / বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় / ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

পৃ. [৮], ॥/, ১৭১।

প্রকাশ আশ্বিন ১৩৪৮

অবনীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জয়ন্তী অনুষ্ঠানের প্রস্তাব উপলক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছিলেন (১৩ জুলাই ১৯৪১), এই গ্রন্থের সূচনায় তাহা মুদ্রিত হইয়াছে।

পত্রাবলী / জগদীশচন্দ্র বসু / আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু শতবার্ষিকী সমিতি / ৯৩৷১ আপার সার্কুলার রোড। কলিকাতা

পৃ. [১৬], ২৩১।

প্রকাশ ৩০ নভেম্বর ১৯৫৮।

প্রবাসীতে ১৩৩৩ সালে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশচন্দ্রের পত্রাবলী প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথ যে 'পত্রপরিচয়' (২২ চৈত্র ১৩৩২) লিখিয়া দিয়াছিলেন এই গ্রন্থের সূচনায় তাহা মুদ্রিত হইয়াছে।

শুভ ২৫শে বৈশাখ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

এমনি প্রভাতে, বাংলার রবি
হে রবি সমুজ্জ্বল,—
উদিলে আলোকি' অর্ধেক নয়—
গোটা এ ভূমণ্ডল।
লাবণ্যে তুমি ভরে দিলে নিজ ভাষা,
বাড়ালে জাতির শত আকাঙ্ক্ষা আশা।
দেশের কিরীট সোনা করে দিলে
মহিমায় ঝলমল।

২

বাংলার তুমি, ভারতের তুমি,—
বিশ্বের তুমি কবি,
বসুন্ধরা যে ধনী হল পুনঃ
তব অবদান লভি।
তোমার জ্যোতিঃপ্রপাতে করি সিনান,
ধরণী লভিল দিব্যদেহ ও প্রাণ
শুচিসুন্দর করে দিলে সব
নমো নমো নমো রবি।

৩

আর নহি দীন, আর নহি হীন
আর নই ক্ষীণক্ষয়ী,
তুমি আমাদিকে চিরদিনতরে
করে দিলে কালজয়ী।
দেশ-জাতি-কাল মিশেছে তোমার সাথ,
চিরদিবসের তুমি রবীন্দ্রনাথ,
অনির্বাপিত তব তপস্যা
যুগ যুগ যাবে বহি।

৪

হে মহামানব, তোমারে জানাই
প্রণিপাত বারবার,
তোমাকে দেখেছি, আমরা তোমার,
এই যে অহঙ্কার।
তোমার পুণ্য পরশন আজও স্মরি,
বিশাল ভারত পদ্মে দিয়াছ ভরি,—
তুমি দিয়ে গেলে অফুরন্ত হে—
কি দিব্য উপচার!

৫

সারা এ ভুবন লভিছে লভিবে
তোমাব তপঃ ফল,
দুবল জাতি যেথানে যে আছে
হবে উর্জস্বল
তুমি অমৃত তুমি লাবণ্যময়,
ধন্য, ধন্য, জয় জয়, তব জয়,
স্বর্গ হইতে যে ধারা নামালে
হয়ে রবে অক্ষয়।

জয়ন্তীসভায়

শ্রীকালিদাস রায়

তোমারে স্মরিব কবি এ তো নয় ঠাঁই
নগরের এ যে সভাপ্রাঙ্গণ।
এখানে তোমার সাথে কোন যোগ নাই,
এ তো নয় চৈত্রের শালবন।
আজি তুমি ভাষাহারা, হেথা কোলাহল
এখানে তাপিত হাওয়া লাগে গায়।
ভাষাহারাদের মাঝে সেখানে কেবল
হৃদয়ে তোমারে কবি, পাওয়া যায়।
যাহাদের ডাকে তুমি এলে বারবার
নেই হেথা তাহাদের কোন জন।

ঝরা জুঁইয়ে নেই পাতা আসন তোমার।
এ তো নহে চৈত্রের শালবন।
হেথা নেই নব শাল-মঞ্জরী গন্ধ,
হেথা নেই ঘন ছায়া সুশীতল,
নেই বনলতাদের সুরভি আনন্দ,
ব্যজন করে না পল্লবদল।
হেথা নেই নামহারা বিহগপতঙ্গ
ক্ষণিকের সাথী আর জ্ঞাতিগণ,
কেউ নেই চাও তুমি যাহাদের সঙ্গ—
এ তো নয় চৈত্রের শালবন।

●

প্রণাম

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গের মানসরাজ্যে তুঙ্গশীর্ষ ব্যাপ্ত দিগন্তর
হে কবি নগাধিরাজ, দেবতাত্মা নমো নমো নমঃ
মাটির প্রাণের অর্ঘ্য পদতলে প্রগাঢ় সুন্দর
শ্যামায়িত বনরাজ ; মেঘ-স্বপ্ন উত্তরীয় সম
শোভিত বিশাল বক্ষে ইন্দ্রধনু বর্ণ সুষমায় ;
অম্বরচুম্বিত ভাল, উদাসীন অনন্ত সন্ধানী,
হিমানীচন্দনলিপ্ত, শোন নিত্য প্রভাত সন্ধ্যায়
আকাশগঙ্গার পারে সূর্য চন্দ্র তারকার বাণী ;
কাব্যে গানে মধুস্যন্দ সে বাণীর সুধারসধারা
জীবনের অন্ধ ভূমিগর্ভে যেন স্বর্গের আহ্বান
আমাদের শুনায়েছ ; অনাগত অঙ্কুরের সাড়া
মূর্ছিত বীজের বক্ষে—প্রাণের বিস্মিত অভিযান।
প্রাচ্য-প্রতীচ্যের চিৎ-রসসিন্ধুতীর্থে স্নান করি
অভয় আনন্দ লয়ে কালের দিগন্ত আছ ভরি।

●

তোমায় নমস্কার

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

আকাশগাঙে রঙের খেলা কেমন চমৎকার—
সোনার রবি স্বপন ছবি, নাই তুলনা যার,
কখন সে যে নীলের রথে ধরার বুকে নেমে
রঙ্গভরা বঙ্গভূমির অঙ্কে গেল থেমে!
গৌরতনু, পলাশলোচন, অঙ্গশোভা আর
অন্তরেতে সুন্দরেরই নিত্য অভিসার।
ঠাকুরকুলের ঠাকুর হয়ে জন্ম নিল যবে,
নিখিল ভুবন উঠল দুলে তাহারই গৌরবে।
সপ্তদ্বীপা এই ধরণীর সে যে গলার হার—
দেশের কবি, দশের কবি, তোমায় নমস্কার!

ভালবাসার মানিক তুমি, বজ্র তোমার বুকে,
কাঁদাও তুমি, হাসাও তুমি, সবার দুঃখসুখে।
জাতির প্রাণে জাগিয়ে দিলে মানুষ কারে কয়,
ভারত-সাগরতীর্থে আসি সব মানুষের জয়।
কণ্ঠে তোমার অভয় বাণী উদাত্ত মধুর—
মর্মে জ্বলে ধ্যানের আলো, সঙ্গীতেরই সুর।
কোন্ অতীতের ঋষি তুমি নূতন জন্ম নিলে,
নূতন উপনিষদ্ মন্ত্র এই নিখিলে দিলে।
জগৎ-কবি-সভায় তোমার তুঙ্গ অধিকার—
দেশের কবি, দশের কবি, তোমায় নমস্কার।

গীতাঞ্জলির অর্ঘ্যে তুমি করলে বিশ্বজয়,
গীতালি নৈবেদ্য মাঝে তোমার পরিচয়,
শিশু ভোলানাথের শিশু তোমার খেলাঘরে,
'খেয়া' পারের খেই ধরেছ কোন্ বিধাতার বরে!
স্বদেশ সমাজ সাহিত্য আর জীবন-স্মৃতির পাতা,
পঞ্চভূতের পাঁচমিশেলি আলোচনায় গাঁথা।
রক্তকরবীতে ফোটাও মনের রঙীন ছবি,
রঘুবীরের ভূমিকাতে বিসর্জনের কবি।
ছন্দে তোমার নৃত্য দোলা জীবন-অভিসার,
দেশের কবি, দশের কবি, তোমায় নমস্কার!

রুদ্র-বীণে অগ্নি জ্বলে দুঃখদহন মাঝে
একতারাটি বাজিয়ে কভু বেড়াও বাউল সাজে—
সুরের রাজা, রূপের রাজা, রেখার রাজা তুমি—
ধন্য হ'ল তোমায় পেয়ে নিখিল ভারতভূমি।
সীমার মাঝে অসীম যিনি, তাঁর করুণা লভি'
প্রাচীর-বুকে ফুল ফোটাল বিশ্বকবি রবি।
শতেক বছর ছুঁল এবার পঁচিশে বৈশাখ
পৌঁছে দিল চিরনূতন জন্মদিনের ডাক।
বাংলা মায়ের মাথার মণি, জাতির অলঙ্কার
দেশের কবি, দশের কবি, তোমায় নমস্কার।

সাগর-ঘেরা ভারত ভূমির শীর্ষে হিমালয়—
—শৃঙ্গ হতে কুমারিকা গাহে তোমার জয়!
সিন্ধু গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র গোদাবরীর কূলে,
কাবেরী, নর্মদা, কৃষ্ণা বুকে তুফান তুলে
আবির্ভাবের মন্ত্রে জাগে চির-অমর প্রাণ,
নব-আরণ্যকের ছন্দে গাহি' নূতন গান;
মর্মভেদী চোখের কোণে যুগান্তরের ভাষা,
অতীন্দ্রিয় স্বপ্নছবি সেথায় বাঁধে বাসা—
মাটির বুকে গড়লে তুমি সত্যের বিহার,
দেশের কবি, দশের কবি, তোমায় নমস্কার।

ভিন্ন ধারা যুক্ত করি' পশ্চিমে ও পূবে,
রত্নভরা প্রেমের সাগর-অতল-তলে ডুবে,

মুক্ত করি, মনের আগল উদার নিমন্ত্রণে
জগৎজনে ডাক দিয়েছ আনন্দ-বন্ধনে।
যজ্ঞশালার দরজা খোলা, তোমার কৃপায় কবি,
ভারত ভাগ্যাকাশে তুমি শতাব্দীরই রবি।
হাজার বছর ফুরিয়ে যাবে, তবুও অম্লান
রইবে তব জয়ের মাল্য, যশের পরিমাণ।
অনেক পুণ্যফলে মোদের এমন পুরস্কার—
দেশের কবি, দশের কবি, তোমায় নমস্কার।

নিদাঘেরই তাপস তুমি, বর্ষারাতের প্রিয়,
শারদ প্রাতে শিউলি ফুলে তুমিই বরণীয় ;
হেমন্তিক ধানের ক্ষেতে তুলিয়া হিল্লোল,
শীতান্তে ম্লান ধরায় কর ফাগুন উতরোল।
বনের বাঁশী তোমার নিশাস-ব্যাকুল বায়ুভরে,
বর্ষ-আবাহনের মাঝে নিত্য পরে ঝরে।
তরঙ্গিণী নদীর জলে উজান বেয়ে যাও—
প্রেম-যমুনার উজান টানে অন্তর উধাও।
চোখের জলে ডুবিয়ে দিলে সকল অহঙ্কার,—
দেশের কবি, দশের কবি, তোমায় নমস্কার।

পথের মাঝে শুকনো ধূলায় ক্লান্ত পথিক যারা,
মরুর পথে যে-নদী হায় হারায় আপন ধারা—
ঝরে পড়া শুকনো কলির কাতর আবেদন,
সবার মাঝেই বেড়াও খুঁজে অনন্ত জীবন !
মজুর, চাষা, কুলীকামিন, সবাই তোমার পাশে
আশায় ভরা বুকটি নিয়ে দাঁড়ায় মহোল্লাসে।

তুমিই যে গো বন্ধু, সবার ভার নিয়েছ তুলে,
সবার কাছে গোপন মনের দ্বার দিয়েছ খুলে !
ভালবাসায় ধ্বংস কর অন্ধ-অত্যাচার,—
দেশের কবি, দশের কবি, তোমায় নমস্কার।

মানুষেরই দুঃখতাপে অশ্রু-সমাকুল,
প্রশ্নভরা দৃষ্টি তব, সন্ধানে ব্যাকুল,
অহমিকার আঁধি-শেষে কোথায় আলোর দেশ,
বাধা নিষেধ গ্লানির যেথা নেইকো অবশেষ ;
দীপ্ত তোমার অন্তরেরই উদার উদ্দীপনা
উজাড় করে ছাড়য়ে দিলে ; রবির রশ্মিকণা
নিমেষ মাঝে রঙ ধরাল মনের দিগঙ্গনে,
পূর্বাচলের ঘুম ভাঙাতে প্রাণের কমল-বনে।
আত্মজ্ঞানের কবি তুমি, ধ্যানের মূলাধার—
দেশের কবি, দশের কবি, তোমায় নমস্কার।

জীবন-স্রোতে ঝিকিমিকি প্রাণের চঞ্চলতা,
মৌন তুমি, উদাস কভু, ক্ষান্ত-অধীরতা ;
মুখর কবির অধীর আঁখি কিসের অন্বেষণে
বেড়ায় ভেসে শূন্যে কোথায়, সে কোন্ নিরজনে,
যেথায় বাণী শেষ হয়ে যায় ভাবের দিশা পেয়ে,
আকাশবীণায় যে সুর সেথা নামে গগন বেয়ে,
বদ্ধমনের ছন্দ যেথা মুক্তি খুঁজে পায়—
সেই অসীমের কবি রবির চরণ-বন্দনায়
ভক্তিভরে নুইয়ে মাথা, নামাই মনের ভার—
দেশের কবি, দশের কবি, তোমায় নমস্কার।

●

স্মরণ

শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য

নরম মাটির বুকে ঢলে পড়া গন্ধমধুর স্বর
শতাব্দীপারে নাড়া দেয় ছোট বাতায়ন-কারাগার,
বিস্মৃতি-কালো ম্লান কুয়াসায় চারদিক ভরপুর
খরতাপে গলে ঝরে পড়ে, মোরা সাড়া দিই বারবার!
আমরা পাই নি উদার আকাশ মেঘে জরি-টানা পাড়—
পাই নি আমরা ধ্রুবতারকার দিশারী মশাল লাল,
একফালি ছোট আকাশের নীলে টানি জীবনের দাঁড়
অক্ষম কথা গেঁথে রচি ফাঁপা ফানুসের মায়াজাল!
আমাদের ভাল অবিরাম চলা ঘাটে ঘাটে তরী বাঁধা—
আমাদের ভাল অপরের সুরে আপনার গলা সাধা।

পাই নি তোমার জীবন-ধেয়ান, স্বপ্নজাগর-চোখ,
তোমার স্বপ্ন আমরা দেখেছি নাগালের সীমানায়।
ভিন্ন জগৎ-বৃত্তকক্ষে মোদের স্বর্গলোক
আহ্নিক আর বার্ষিক পথে চিরদিন আসে যায়।
তোমার বিজয়ে আঁকা আছে কবি আমাদের পরাজয়,
জীবন-পণ্যে আমরা ভেজাল বেসাতির বাজিকর!
জানি আমরাও আমাদের এই অক্ষম পরিচয়—
ভাগ্যের হাতে মার খেয়ে মরি আমরা জীবনভর!
আমাদের ছোট ধ্যানে সাধনায় সত্য যেটুকু আছে
যুগ-জীবনের উদয়-প্রভাতে সে সত্য যেন বাঁচে!

ক্ষীণ দৃষ্টির পুরু কাঁচ পরা পশ্চিমে হেলা দিন
গোধূলি আলোয় হাতড়িয়ে ফিরে দিশেহারা মনোরথ,
কক্ষচ্যুত হাজার তারার আকুতি অবধিহীন
অন্য গ্রহের চাঁদের আলোয় খুঁজে নিজ গতিপথ।
বহ্নিবলয় সন্ধ্যাসূর্য-তাপে পিপাসার বান
অতিথিবাণীর পূজামন্দির দুই চোখ ঝলসায়,
গ্রহান্তরের হৃৎস্পন্দন শুনি পাতি' দুই কান,
অন্য লোকের কথা কই সারি আরেক ধরার দায়!
ধ্রুবতারা যদি ডুবে গিয়ে থাকে মিছে তারে খুঁজে মরা,
নিবু নিবু যদি প্রদীপের আলো বৃথা তার হাত ধরা!

দিগ্বিজয়ীর বিজয়মুকুটে আলো পড়ে ঝলমল
আলো ঠিকরনো হীরামুক্তায় পদ্মরাগের লাল,
দেশবিদেশের গুণিজন আর বাণীর পূজারীদল
শতবার্ষিকী যজ্ঞের ভেট ভরে তোলে থাল থাল।
চমকে তাকাই, জগৎ দিতেছে বাণীসাধনার দাম—
সোনার কাঠির স্পর্শ লেগেছে জগতের চেতনায়,
বিশ্বের প্রাণ-কেন্দ্রে যে কথা বয়ে চলে অবিরাম
সাড়া তার লাগে বিশ্বভুবনে—তাহারে কি ভোলা যায়?
কবির ধ্যানের পরশ অথবা গানের পরশ লাগি'
বিস্ময়ভরা চোখে চেয়ে দেখি বিশ্ব উঠেছে জাগি'!

কবিগুরুর স্মরণে

গোপাল ভৌমিক

অশান্তির আর্তি নিয়ে
ঘর করি রোজ ;
চোখের সামনে তুমি
আনন্দের ভোজ
যদিও ধরেছ মেলে
কেন যেন দেখেও দেখি না।
দেয়ালে তোমার ছবি,
ধুলোভরা ঘরের আঙিনা।

প্রাণের মানুষ নয়
গানের ফানুস
বুঝি না বলেই হাতে
তুলে নিই মুঠো মুঠো তুষ।

তারপর পটে-আঁকা
ছবিটির দিকে
তাকিয়ে রোদন করি
জীবনের রঙ কেন ফিকে !

তোমাকে সামনে রেখে
মাঝে মাঝে মাতি মহোৎসবে
হৃদয়ের ফাঁকি ঢেকে
স্মরণের পরম বিভবে।
প্রকৃতিস্থ হলে বুঝি
অকারণে হুহু করে মন,
ছাতিম ছায়ায় ঢাকা
বহুদূর শান্তিনিকেতন।

●

রবি-প্রয়াণ-ক্ষণে

(২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮)

শ্রীশান্তি পাল

হে রবি, আজিকে দাঁড়াও ক্ষণেক
অস্ত-অচলোপরি,
আমি বনফুল দূর হ'তে তোমা'
বারেক প্রণাম করি।
এখনো হয় নি দিবা অবসান,
এখনো গোধূলি হয়নিকো ম্লান,
এখনো বিহগ তন্দ্রার গান
তোলে নি কানন ভরি ;
বসুধা বিকল আঁখি ছলছল্
বিদায়ের কথা স্মরি' !

দূর দিগন্তে হাসে দিগ্‌বধূ
তোমার মিলন লাগি,
দিনের চিতার লালিমা আড়ালে
রয়েছে প্রহর জাগি।
আকাশে হাসিছে দেবতার দল,
হেথায় সায়রে শুকায় কমল ;
বিদায় ব্যথায় মুরছায় যত—
আলোকের অনুরাগী।
তিমির নিশার তপস্যা তরে
তোমার করুণা মাগি !

●

পঁচিশে বৈশাখ

দক্ষিণারঞ্জন বসু

দেয়ালে টাঙানো ফটো,
দেরাজে পুস্তক ;
অন্তরে কথার ফুলে আঁকা যত
কবিতার ছক।
মহুয়া-মাতাল সন্ধ্যা কিংবা
কোনো সহাস্য সকাল,
হাসির প্রাখযে ক্রমে যেই দিন
হয়ে ওঠে ভীষণ ভয়াল ;
খরতাপ-দগ্ধ তবু ভাল লাগে
বৈশাখী দুপুর,
আরো ভাল অকস্মাৎ শুনি যদি
বৃষ্টির নূপুর।
একটি অক্ষয় ক্ষণ কালের যাত্রায়
অত্যুজ্জ্বল পঁচিশে বৈশাখ ;
সেদিন স্মরণে—
পৃথিবীর মানুষের নত নমস্কার
যুগে যুগে জমা হয়ে থাক্।

●

কবিকে জিজ্ঞাসা

বাণী রায়

বৈশাখে বালার্ক যদি খুললো দু'চোখ
মনের কিংশুকতীরে ; অশোকের তীরে
বিদ্ধ কোন বৃদ্ধসত্তা ; জরতীর জরা
ঝরে গেল, খসে গেল,—বিচ্যুত পল্লব।
দিনান্তের শব
দেখলো তপনশৃঙ্গে সেই খোলা চোখ।
গভীর আয়াসমগ্ন জটিল হৃদয়
এখনও কবোষ্ণ কাঁপে !
সেই বা কি পেল ?
শুক্রাচার্যশাপে
যযাতির ক্ষিন্ন জরা খসে যদি গেল,
—কি বা সে দেখল, বল ?
দেখল অনন্ত—
অন্ত হল অবসান।
বিষাদবিকীর্ণ এমন মনের বোঝা
নেবে না কি, কবি ?
অবক্ষয়-চূর্ণকরা গানেতে তোমার,
আমার আশ্রয় আছে ?

●

রবীন্দ্রভাবনা ঃ উত্তরতিরিশ

অসিতকুমার

দিনগুলি ঝরে যায় বৈশাখের সন্ন্যাসী হাওয়ায়
মানুষ হারিয়ে যায় মানুষের ভিড়ে
প্রত্যয়ের তারা যত কায়াময় কালের তিমিরে
জলেজলে পথ খোঁজে গূঢ়তর আত্মচেতনায়।
স্রোতের শবের মত দেখি এক তীরে আর নীরে
এবং নিজেকে বলি আমি আর তাকাব না ফিরে,
এ মাটিতে কি আসে কি যায়—
প্রশ্ন প্রেম প্রার্থনার পাখি যত আকাশে হারায়,
ছায়া ভাসে মাটির শরীরে।
হয়তো স্বপ্নেরা সব মানুষের নিঃসঙ্গ দুরাশা।
সময় শিকারী হাসে। প্রেম শুধু মুগ্ধ প্রতিভাস।
বিকার বিবেক এক। ছলনায় নিপুণ আকাশ
আনে আলো অন্ধকার। একবার বুঝি কাছে আসা,
—তারপর কুয়াশায় পথ খোঁজে ক্লান্ত ইতিহাস।
এখন তোমার থেকে কতদূর এসেছি যে তাই
মনে আসে, মন মেলে কোনদিন দেখব তোমাকে
জরার্ত রোদের আলো ম্রিয়মাণ গাছের শাখায়
সূর্য ওঠে পঁচিশে বৈশাখে।
উজ্জ্বল জীবনগঙ্গা ঢেউগুলি আনন্দে উত্তাল
দু-হাতে মাটিকে ডাকে। শেষ নেই কালের সকাল
সময়ের সব মাঠ ভরে দিয়ে তবু চেয়ে থাকে—
আমরা কি পাব আর? কোনোদিন পেয়েছি তোমাকে?
দূরের মেঘের মত ছায়া আনে নির্জন বিশাল
ভরে দেয় আত্মচেতনাকে।

●

স্মরণে

শিবদাস চক্রবর্তী

মারমুখী দু'শিবিরে ভাগ হয়ে গেছে এ দুনিয়া,
বহ্নিগর্ভ বিদ্বেষের বিস্ফোরণে বিষাক্ত বাতাস।
যে যার প্রাধান্য আজ প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে মরিয়া,
'শান্তির ললিত বাণী' মনে হয় 'ব্যর্থ পরিহাস'।
প্রীতি নেই, নীতি আছে, মানবতা—দলীয় মুখোশ,
ক্ষমতার কারাগারে মমতার হয়েছে মরণ;
'শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি' ভরা চাপা অসন্তোষ
বুকে নিয়ে অহরহ দিন যাপে জনসাধারণ।
সভ্যতার এ সঙ্কটে,—দ্বন্দ্বযুদ্ধে মত ও পথের
বিভ্রান্ত এ বিশ্ববাসী অনুভব করে প্রয়োজন
অঙ্গুলি-নির্দেশ কোনো ক্রান্তদর্শী মহামানবের;
সমস্ত জগৎ জুড়ে আজ তাই এ মহা-স্মরণ।
হে বরেণ্য বিশ্বকবি, তোমার অমৃতময়ী বাণী
হোক্ চির সত্যশিবসুন্দরের পথের সন্ধানী।

●

আবির্ভাব

শান্তশীল দাশ

তৃপ্ত মন আমার হঠাৎ অকারণে,
কেন যে এত খুশী, বুঝি না কী কারণ ?
খুশীর হাওয়া বয় মনের চারিধারে,
খুশীর আলো জলে যেদিকে দু'নয়ন।

মনের কোণে ক্ষোভ নেইকো এতটুকু,
কোথায় গেল সব ? নিমেষে নিঃশেষ !
কত যে ছিল ব্যথা, কত না অভিযোগ ;
আজ যে কিছু তার নেইকো অবশেষ।

যেদিকে চোখ মেলি : খুশিতে ভরপুর।
কোথাও নেই গ্লানি, কোথাও নেই কালো ;
যে জন কাছে আছে, দেখি যে হাসিমুখ,
কেন যে বুঝি নাকো, সবারে লাগে ভালো !

সবারে মনে হয় বড় সে প্রিয়জন,
যা দেখি, সবই ভাল, সকলই সুন্দর ;
যে সুর শুনি কানে, লাগে কী সুমধুর,
স্পর্শে, ঘ্রাণে, রূপে—সবই যে মনোহর !

এ আলো কোথা ছিল, কে দিল ঢেলে আজ,
এ খুশী দিকে দিকে ছড়াল কেন, কে সে ?
সমুখে চেয়ে দেখি, তোমার মুখে হাসি,
মহিমময় রূপে দাঁড়িয়ে আছ এসে।

●

পঁচিশে বৈশাখ

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

সমগ্র আকাশ ঘিরে অন্ধকার নামে যদি, আসে মৃত্যুভয়,
তুমি বুকে দিয়ে গেছ ইস্পাতের কঠিন প্রত্যয়
মুখোমুখি দাঁড়াবার, এই উত্তরাধিকার অন্তহীন ঋণ ;
আজ তার বারবার অকৃপণ স্বীকৃতির দিন।

জীবনের চারপাশে আবর্জনা জমে ওঠে ; আঘাতে আঘাতে
সব তার ছিঁড়ে যায়, বৈশাখের রোদে ও ছায়াতে
বাজে না নতুন করে আলোকের মন্ত্র কোনো, প্রার্থনার সুর,
সব পথ তরুহীন, তৃণহীন পাথুরে বন্ধুর।

তবু ক্ষমা, আশীর্বাদ বাজে যেন দূর হ'তে, পাঠাও আশ্বাস
রাত্রির তমিস্রা ভেঙে জ্যোতির্ময় সূর্যের আভাস
যন্ত্রণায় ঘনকালো শতাব্দীর কলঙ্কিত নির্জন আকাশে
সর্বশেষ সংগ্রামের বিজয়ের বার্তা নিয়ে আসে।

অন্ধকার ভরে এলে পরাজিত মানুষেরা আজো জড়ো হয়
ছোট এ উঠোন কোণে, যেখানে বিছালে তুমি
আলোর আশ্রয়

●

রবীন্দ্রনাথের একখানি উপন্যাস

রথীন্দ্রনাথ রায়

'গোরা' রচনার পর ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ নতুন জগতে পদক্ষেপ করেছেন। পরবর্তী উপন্যাসগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আংশিকতার লক্ষণাক্রান্ত। ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের উপরে কবি রবীন্দ্রনাথের গভীর প্রভাব এই পর্বে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। কবি ও কথকের যে উভচরবৃত্তি 'গোরা' উপন্যাসে একটি তৃপ্তিদায়ক ভারসাম্যে প্রতিষ্ঠিত, শেষ জীবনের উপন্যাসে তার অভাব ঘটেছে। তার অনিবার্য পরিণাম হয়েছে এই যে, কবির অপ্রতিহত প্রভাবের কাছে ঔপন্যাসিকের দাসখত লিখে দিতে হয়েছে। নতুন রূপরচনার দিকে কবির আগ্রহ এত বেশী তীব্র যে, উপন্যাসের সমগ্রতার দিকে যেন তাঁর দৃষ্টিই পড়ে নি। সঙ্কেত-ব্যঞ্জনার চকিত দীপ্তি, কবিকল্পনার অপরিমিত ঐশ্বর্য, গদ্যরীতির অসামান্যতা ও প্রসাধনকলার চাতুর্য বিস্মিত করে, কিন্তু 'খাঁটি উপন্যাসে'র লক্ষণ এদের মধ্যে কতটা আছে, এ বিষয় সংশয় জাগে।

এই সংশয়ের কতকগুলি কারণও আছে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই সংশয়ের একমাত্র ব্যতিক্রম 'যোগাযোগ'। শুধু উপন্যাস হিসেবে বিচার করলে দেখা যাবে যে, 'গোরা'র পরে এমন তৃপ্তিকর উপন্যাস কবি আর লেখেন নি। শোনা যায় 'যোগাযোগে'র আর এক খণ্ড নাকি কবি লিখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা ঘটে ওঠে নি। এর ফলে বাংলা সাহিত্যের এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল। বর্তমান অবস্থায় 'যোগাযোগ' উপন্যাসের যে অংশ প্রচলিত আছে, তাকে এক বৃহত্তর অলিখিত উপন্যাসের প্রথমার্ধ বলা যায়। তাই কোন কোন সমালোচক এই উপন্যাসের 'আরম্ভ ও শেষ উভয়ের মধ্যেই একটা অতর্কিত আকস্মিকতা' লক্ষ্য করেছেন।[১]

'যোগাযোগ' যে একটি বৃহত্তর উপন্যাসের অংশবিশেষ, তা এর রচনারীতির মধ্যেই পরিস্ফুট হয়েছে। ঔপন্যাসিক বিবৃতির সর্বপ্রধান লক্ষণ হল এর মন্থরতা। অতি দীর্ঘ ও মন্থর বিবৃতি দিয়ে উপন্যাসের আরম্ভ। কবি যে ভাবে কাহিনীজাল বিস্তৃত করেছেন, তাতে মনে হয় কবির অনুমিত ক্ষেত্র দীর্ঘে ও প্রশস্ততায় অনেক বড় ছিল। তাই উপন্যাসের আরম্ভ ও শেষ, দুয়ের মধ্যেই আকস্মিকতার স্পর্শ আছে। তবু রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের উপন্যাস-গুলির মধ্যে 'যোগাযোগ' সবচেয়ে বেশী উপন্যাস-লক্ষণাক্রান্ত। শেষ জীবনের উপন্যাসসমূহে কবির হাতে কথকের যে অনিবার্য পরাজয় ঘটেছে, এখানে তার কোন চিহ্নই নেই। কবি ও কথক এখানে নির্বিবাদে হাত মিলিয়েছেন। এখানে প্লট আছে, কিন্তু তাকে সর্বগ্রাসী করে তুলে বক্তব্যকে বিদায় দেওয়া হয় নি। যেটুকু প্লট আছে, তা কবির বক্তব্যের জন্য প্রয়োজন। এ বিষয়ে দু-একটি ক্ষেত্রে, যা আতিশয্য আছে, তার ক্ষতিপূরণ করে উপন্যাসটির বিশ্লেষণী কলাকৌশল। উপন্যাসের

---

১ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (২য় সং), পৃ. ১৫৪ : শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

ত্রুটিবিচ্যুতি আলোচনা হলে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, লিখিত 'যোগাযোগ' ও অলিখিত 'যোগাযোগ' মিলেই উপন্যাসটির সম্পূর্ণতা। অবশ্য অলিখিত 'যোগাযোগ' নিয়ে অনুমান করেও কোন লাভ নেই। ওর রচনারীতির মধ্যেই এমন একটি লক্ষণ আছে, যা কোন বৃহত্তর উপন্যাসের একটি অংশের মধ্যেই থাকা সম্ভব।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বিচিত্রা' পত্রিকায় যখন উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে (আশ্বিন ১৩৩৪—চৈত্র ১৩৩৫) প্রকাশিত হয়, তখন প্রথম দু' সংখ্যায় এর নাম ছিল 'তিনপুরুষ'। কিন্তু তৃতীয় বারে কবি 'তিনপুরুষ' নাম পরিবর্তন করে উপন্যাসের নতুন নামকরণ করলেন 'যোগাযোগ'। এই পরিবর্তন সম্পর্কে কবি 'নামান্তর' নামে একটি কৈফিয়ত লিখেছিলেন ('বিচিত্রা' : অগ্রহায়ণ ১৩৩৪)। গল্পের নামকরণ প্রসঙ্গে কবির কৈফিয়ত শোনা যাক :

··"আমি তাই বলি গল্পের এমন নাম দেওয়া উচিত নয় যেটা সংজ্ঞা, অর্থাৎ যেটাতে রূপের চেয়ে বস্তুটাই নির্দিষ্ট। বিষবৃক্ষ নামটাতে আমি আপত্তি করি। কৃষ্ণ-কান্তের উইল নামে দোষ নেই। কেননা ও-নামে গল্পের কোন ব্যাখ্যাই করা হয় নি। * * কর্তা বলেন, তিন-পুরুষের তিন-তোরণওআলা রাস্তা দিয়ে গল্পটা চলে আসবে এই আমার একটা খেয়ালমাত্র ছিল। এ চলাটা কিছুই প্রমাণ করবার জন্যে নয়, নিছক ভ্রমণ করবার জন্যেই। সুতরাং এই নামটা ত্যাগ করলে আমার গল্পের কোনো স্বত্বের দলিল কাঁচবে না। * * আর একটা নাম ঠাউরেছি। সেটা এতই নিবিশেষ যে গল্পমাত্রেই নির্বিচারে খাটতে পারে।···গল্প নিজেই নিজের পরিচয় দেবার সাহস রাখে যেন,—নামকে যেন জোরগলায় আগে আগে নকিবগিরি করতে না পাঠায়।"

বলা বাহুল্য 'তিনপুরুষ' থেকে 'যোগাযোগ' নাম পরিবর্তনের মধ্যে গল্পের বস্তুর চেয়ে রূপের আকর্ষণটিই প্রবল হয়েছিল। বস্তুনির্দেশক 'তিনপুরুষ'কে কবি আইডিয়ার দিক থেকে যেন ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। অবিনাশ ঘোষালের জন্মদিনে 'অভিনন্দনের টেলিগ্রাম, আর ফুলের তোড়া' রাশীকৃত হয়ে উঠেছে। কিন্তু কবি যে কাহিনী শুনিয়েছেন, তার সঙ্গে অবিনাশ ঘোষালের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। উপন্যাসে তাঁর পিতামাতার বিরোধ ও দ্বন্দ্বের সুদীর্ঘ ইতিহাসই বিবৃত হয়েছে। এই বিরোধের কোন মীমাংসা হয়েছে কিনা অথবা অবিনাশ ঘোষাল এই বিরুদ্ধ প্রকৃতির নারীপুরুষের মধ্যে কোন স্থায়ী যোগসূত্র সৃষ্টি করেছে কিনা, এ প্রশ্নের সামান্যতম ইঙ্গিতও উপন্যাসটির মধ্যে নেই। উপন্যাসের শেষে দুটি কৌতূহলজিজ্ঞাসা কাঁটার মত জেগে থাকে : প্রথমতঃ, পিতৃগৃহে ফিরে আসার পর কুমুদিনীর মনে নারীর স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে যে প্রশ্নের উদয় হয়েছিল, তার পরিণাম কি হল? স্বামীগৃহে ফিরে যাওয়ার পর তার স্থান কোথায় নির্দিষ্ট হল - শ্যামা-মধুসূদনের ভোগসর্বস্ব জীবনের একপাশে সে নিতান্ত অনাদৃত হয়ে রইল অথবা সন্তানের জননী হিসেবে উচ্চতর সম্মানের অধিকারিণী হল? দ্বিতীয়তঃ, এই সন্তান বিরুদ্ধ চরিত্রের পিতামাতার মনে কি কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল—তার ফলে কুমুদিনী-মধুসূদনের দাম্পত্যজীবনের মধ্যে কোনও পরিবর্তন ঘটেছিল কি না? বলা বাহুল্য এই দুটি প্রশ্ন উপন্যাসে অমীমাংসিতই আছে। পরিণামের আকস্মিকতা তাই রসচেতনাকে পীড়িত করে।

২

'যোগাযোগ' অসমাপ্ত অসম্পূর্ণ, কিন্তু ওর অন্তঃপ্রকৃতি উপন্যাসেরই, কাব্যের নয়। উপন্যাসের পটভূমি কল্পনারঞ্জিত লঘু বায়বীয় জগৎ নয়। 'যোগাযোগ'কে দাম্পত্যসম্পর্কের সমস্যামূলক উপন্যাস বলা যায়। কবি এই সমস্যাটিকে নিয়ে কবিজনোচিত তত্ত্বরহস্যের অবতারণা করেন নি। তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা ও বলিষ্ঠ বিশ্লেষণের দ্বারা কবি এই সমস্যাটির স্বরূপে প্রবেশ করেছেন। 'ঘরে বাইরে' রচনার দীর্ঘ তেরো বছর পরে কবি যখন এই উপন্যাসটি রচনা করতে আরম্ভ করলেন, তখন কবির চিন্তাধারার

মধ্যে সমাজ ও নরনারীর সম্পর্কঘটিত নানা প্রশ্ন জেগেছিল। এই সময় কবি কাউন্ট কাইজারলিঙের অনুরোধে 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই প্রবন্ধটির ইংরেজি অনুবাদ করে জার্মানিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।[১] এই প্রবন্ধের মধ্যে কবি বলেছেন : "কুমারকে আনতে গেলে কামনার উদ্দামবেগকে নিরস্ত করে দিয়ে নিবৃত্তিপূত সাধনাকে আশ্রয় করতে হবে। সিদ্ধির সেই কঠোর রূপই যথার্থ সুন্দর ; শিব রূপবান নন বলে যখন উমার কাছে তাঁর নিন্দা করা হয়েছিল, তখন উমা এই ভাবেই উত্তর করেছিল।"

কুমুও ব্যক্তি-মধুসূদনের ভিতর থেকে একজন ইম্পার্সোন্যাল স্বামীকে আবিষ্কার করে তার কাছেই আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছিল : "মধুসূদন ব্যক্তিটির দোষ থাকতে পারে, কিন্তু স্বামীনামক ভাবপদার্থটি নির্বিকার নিরঞ্জন। সেই ব্যক্তিকতাহীন ধ্যানরূপের কাছে কুমুদিনী একমনা হয়ে নিজেকে সমর্পণ করে দিলে।" কিন্তু ধ্যানরূপ ও ব্যক্তিরূপের মধ্যে সূচনাতেই বিরোধ দেখা দিল। বণিকবুদ্ধি বস্তুলোভী মধুসূদনের কাছে কুমুদিনী তার নিত্যব্যবহার্য আসবাবপত্রের মত। ঐশ্বর্যমদমত্ত মধুসূদন কুমুদিনীকে পত্নী হিসেবে চেয়েছে শুধু তার বংশগৌরবকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য। সেখানে হৃদয়বৃত্তির কোনও আলোড়ন বা উচ্ছ্বাস ছিল না, শুধু ছিল উদ্ধত প্রভুত্বস্পৃহা। স্বামী সম্পর্কে কুমুদিনী বাল্যকাল থেকে যে ধারণা পোষণ করে এসেছে, হৃদয়ের গোপন মন্দিরে যে ধ্যানমূর্তির প্রতিষ্ঠা করে সঙ্গীতে ও সুরের মূর্ছনায় যে অর্ঘ নিবেদন করেছে, তার সঙ্গে মধুসূদনের আচার-আচরণের কোনও মিলই ছিল না। কুমুদিনীর সঙ্গে মধুসূদনের বিরোধের প্রকৃত ইতিহাস এইখানে।

উপন্যাসের কেন্দ্রগত বিষয় হল মধুসূদন ও কুমুদিনীর এই অন্তর্দ্বন্দ্ব। দুই বিরুদ্ধ প্রকৃতির নরনারীর চরিত্র-বৈপরীত্য ও অন্তর্বিরোধকে রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ কৌশলে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাদের দুজনের জগৎ সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী—এমন কোনও সঙ্কীর্ণতম ভূখণ্ড ছিল না যেখানে তারা নির্বিচারে মিলতে পারে। কুমুদিনী তার হৃদয়ের অর্ঘ রচনা করেছে তার নম্র-সুন্দর স্বপ্ন-কামনা দিয়ে। আত্মনিবেদনের জন্য উদাস ও উন্মুখ হৃদয় সুরের মধ্য দিয়ে দেবতাকে রচনা করেছিল। বিবাহ-পূর্ববর্তী জীবনে তার এই কাব্যময় অশরীরী কামনাকে কবি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন :

"যাকে রূপে দেখবে এমনি করে কতদিন থেকে তাকে সুরে দেখতে পাচ্ছিল। নিগূঢ় আনন্দ-বেদনার পরিপূর্ণতার দিনে যদি মনের মতো কাউকে দৈবাৎ সে কাছে পেত তা হলে অন্তরের সমস্ত গুঞ্জরিত গানগুলি তখনই প্রাণ পেত রূপে। কোনো পথিক ওর দ্বারে এসে দাঁড়াল না।··· তাই এতদিন শ্যামসুন্দরের পায়ের কাছে ওর নিরুদ্ধ ভালোবাসা পূজার ফুল আকারে আপন নিরুদ্দিষ্ট দয়িতের উদ্দেশ খুঁজেছে। সেইজন্য ঘটক যখন বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এল কুমু তখন তার ঠাকুরেরই হুকুম চাইলে—জিজ্ঞাসা করলে, 'এইবার তোমাকেই তো পাব?' অপরাজিতার ফুল বললে, 'এই তো পেয়েইছ।'"

এই হল কুমুর জগৎ। পাঁজি দেখে, ব্রাহ্মণভোজন করিয়ে দৈবসঙ্কেতের নির্দেশ মেনে তার আত্মসমর্পণের স্পৃহাকে আরও নমনীয় ও মধুর করে তুলেছিল। উন্মুখ হৃদয়ের ব্যাকুল প্রত্যাশা নিয়ে সে তার দয়িতের শুভাগমন প্রতীক্ষা করেছিল। তাই তার দাদার দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও তার মনে দ্বিধার লেশমাত্র ছিল না। তাই সে নির্বিচারে এই বিবাহে সম্মতি দিয়েছে—কোনও সংশয়ই তাকে বিচলিত করতে পারে নি। মধুসূদন কুমুদিনীকে বিয়ে করতে চেয়েছে তার রূপের জন্য বা স্বভাবের জন্য নয়। অতীতকালে নূরনগরের চাটুজ্যেদের হাতে বজবপুরের ঘোষালদের পরাজয়-কাহিনী তার স্মৃতিপটে উজ্জ্বল। তাই সে প্রতিজ্ঞা করে বসেছে যে, চাটুজ্যেদের মেয়েকেই বিয়ে করতে হবে। সংক্ষিপ্ত ও সূচীতীক্ষ্ণ উপমায় কবি অবস্থাটি বুঝিয়ে দিয়েছেন : "ঘা-খাওয়া বংশ, ঘা-খাওয়া নেকড়ে বাঘের মতো, বড়ো ভয়ংকর।"

---

১ রবীন্দ্রজীবনী (তৃতীয় খণ্ড) পৃ. ২৪৯ : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

বংশগৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার দুর্জয় সঙ্কল্প, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার নির্মম ক্রূরতা, বিত্তমদমত্ততা ও প্রভুত্ব বিস্তারের লোলুপতা মধুসূদনের চরিত্রকে অন্য উপাদানে তৈরি করেছিল। সে উদ্যোগী পুরুষ, আপন ক্ষমতাবলে লক্ষ্মীর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। জীবনের সাফল্য এসেছে এক একটি অভাবনীয় ক্ষেত্র থেকে। সামান্য অবস্থা থেকে ঐশ্বর্যের চূড়ান্ত শীর্ষে আরোহণ করে মধুসূদনের মেজাজ ও রুচি হয়ে উঠল স্বতন্ত্র ধরনের। তার অহঙ্কৃত মদোদ্ধত প্রকৃতিতে প্রতিবাদের অসহিষ্ণুতা ও প্রভুত্ব বিস্তারের লোলুপতা বদ্ধমূল। এমন কি স্ত্রী-জাতির প্রতি তার ধারণাটির মধ্যেও লেশমাত্র মোহ ছিল না, নিতান্ত বৈষয়িকতার দৃষ্টিতেই সে স্ত্রীজাতিকে দেখতে অভ্যস্ত। কবি নিপুণভাবে মধুসূদন চরিত্রের এই বিশেষ দিকটিকে আলোচনা করেছেন :

"মধুসূদন মেয়েদের অতি সংক্ষেপে দেখেছে ঘরের বৌঝিদের মধ্যে। তারা ঘরকন্নার কাজ করে, কোঁদল করে, কানাকানি করে, অতি তুচ্ছ কারণে কান্নাকাটিও করে থাকে। মধুসূদনের জীবনে এদের সংস্রব নিতান্তই যৎসামান্য। ওর স্ত্রীও যে জগতের এই অকিঞ্চিৎকর বিভাগে স্থান পাবে, এবং দৈনিক গার্হস্থ্যের তুচ্ছতায় ছায়াচ্ছন্ন হয়ে প্রাচীরের আড়ালে কর্তাদের কটাক্ষচালিত মেয়েলি জীবনযাত্রা অতিবাহিত করবে এর বেশি সে কিছুই ভাবে নি। স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহার করবারও যে একটা কলানৈপুণ্য, তার মধ্যেও যে পাওয়ার বা হারাবার একটা কঠিন সমস্যা থাকতে পারে এ কথা তার হিসাবদক্ষ সতর্ক মস্তিষ্কের এক কোণেও স্থান পায় নি ; বনস্পতির নিজের পক্ষে প্রজাপতি যেমন বাহুল্য, অথচ প্রজাপতির সংসর্গ যেমন তাকে মেনে নিতে হয়, ভাবী স্ত্রীকেও মধুসূদন তেমনি করেই ভেবেছিল।"

মধুসূদনের এই চরিত্র-বিশ্লেষণের মধ্যেই বিবাহোত্তর জীবনের বিপর্যয়কাহিনীর বীজ খুঁজে পাওয়া যায়। কুমু চরিত্রের সৌকুমার্য ও তার মাধুর্যমণ্ডিত ধ্যানলোক এক জ্যোতির্ময় ভাবসত্যে প্রতিষ্ঠিত, বাইরের যে কোনও রূঢ়তা সেই সুষমাকে আঘাত করতে পারে। মধুসূদনের মন অতিমাত্রায় প্র্যাকটিক্যাল, নারীমনকে জয় করতে হলেও যে সাধ্যসাধনার প্রয়োজন সে কথা কোনোদিন সে ব্যবসায়ী মেজাজ দিয়ে বুঝতে পারে নি। কুমুদিনী ব্যক্তিকে বুঝতে চেয়েছে আইডিয়া নিয়ে, আর মধুসূদনের কাছে আইডিয়ার কোনও দাম নেই—যেটুকুর উপর প্রভুত্ব করা যায়, যতটুকু স্থূলভাবে ভোগ করা যায়, সেইটুকুই তার সত্য—অত্যন্ত বাস্তব, স্থূল ও প্রত্যক্ষ।

৩

বিবাহোত্তর জীবনে দুজনের সংগ্রাম শুরু হল। একদিকে তর্জন-গর্জন ও প্রতাপ-প্রভুত্বের রক্তচক্ষু শাসন, আর একদিকে নীরব অসহযোগ, কঠিন সহিষ্ণুতা ও অবিচলিত অনাসক্তি। নারীপুরুষঘটিত জীবন-নাট্যের এমন দ্বন্দ্বমথিত ও নিষ্ঠুর কাহিনী বাংলা সাহিত্যে আর নেই। কবি এই সংগ্রামের প্রতিটি অধ্যায়কে নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। মধুসূদন ও কুমুদিনীর সূক্ষ্মতর পরিবর্তনলীলার আলোছায়াসঙ্কেতগুলিকেও কবি অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে রূপ দিয়েছেন।

মধুসূদন প্রথম থেকেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—তাই কুমু ও তার পিতৃগৃহসম্পর্কে দুর্ব্যবহার করতে গিয়ে সে সামান্যতম ছলনার আশ্রয়ও গ্রহণ করে নি, মৌখিক সৌজন্য ও শিষ্টাচারের কথাও কখনও তার মনে হয় নি। মধুসূদনের আক্রমণ যেমন ক্রূর, তেমনি অনাবৃত। স্ত্রীর পিতৃগৃহের শিক্ষা-সংস্কৃতিকে সে 'নুরনগরি চাল' বলে পরিহাস করেছে। বিপ্রদাসের স্নেহের দান নীলার আংটিকে সে চুরি করে কুমুদিনীর মনকে আরও বিষাক্ত করে তুলেছে। এই রূঢ় আঘাত কুমুর মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, তার প্রকাশ হয়েছে কয়েকটি মৌন প্রতিবাদে ও নীরব অসহযোগে। কুমুর এই নীরব প্রতিক্রিয়া মধুসূদনের অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে কিছু পরিবর্তনের সৃষ্টি করেছিল। কুমুর রূপ, চরিত্রের সৌকুমার্য ও নির্লিপ্ততা মধুসূদনের পাষাণকঠিন বস্তুনিষ্ঠ মনের মধ্যেও আলোড়নের সৃষ্টি

করেছিল। তিনটি মূল্যবান আংটি নিয়ে এসে সে তার অপটু ভাষায়• নতুনভাবে প্রেমনিবেদন করার চেষ্টাও করেছে। সাঁইত্রিশ পরিচ্ছেদে মধুসূদন ও কুমুদিনীর দাম্পত্যসঙ্কট চূড়ান্ত শীর্ষে আরোহণ করেছে। মধুসূদনের পাষাণহৃদয় বিগলিত হয়ে দীর্ঘশ্বাস পড়েছে: "আমি তোমার অযোগ্য, কিন্তু আমাকে কি দয়া করবে না?"

মধুসূদনের এই আকস্মিক পরিবর্তন কুমুর কাছে এক অগ্নিপরীক্ষা। কারণ "কুমু হঠাৎ দেখতে পেলে মধুসূদন যখন উদ্ধত ছিল তখন তার সঙ্গে ব্যবহার অপ্রিয় হোক তবুও তো সহজ ছিল; কিন্তু মধুসূদন যখন নম্র হয়েছে তখন তার সঙ্গে ব্যবহার কুমুর পক্ষে বড়ো শক্ত হয়ে উঠল। এখন তার ক্ষুব্ধ অভিমানের আড়াল থাকে না; তার সেই ফরাশখানার আশ্রয় চলে যায়, এখন দেবতার কাছে হাত-জোড় করবার কোনো মানে নেই।" জীবনের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে কুমুদিনী ইচ্ছার বিরুদ্ধে মধুসূদনের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু এই অনিচ্ছাকৃত আত্মসমর্পণ তার দীর্ঘকালের সযত্নলালিত সতীত্বসংস্কারকে কঠিন আঘাত করেছে। এ আঘাত তার পক্ষে অসহ্য, কারণ তার সমগ্র সত্তার সঙ্গে যে আদর্শ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, তার ভিত্তিমূলকে পর্যন্ত এ আঘাত নাড়া দিয়েছে। সমস্ত দেহেমনে সেই অশুচি স্পর্শ তাকে ঘৃণায় সঙ্কুচিত করে তুলেছে: "যে-আহ্বানকে সে দৈব বলে মেনেছিল, সে কি এই অশুচিতার মধ্যে, এই আন্তারক অসতীত্বে? ঠাকুর নারীবলি চান বলেই শিকার ভুলিয়ে এনেছেন নাকি;—যে-শরীরটার মধ্যে মন নেই সেই মাংসপিণ্ডকে করবেন নৈবেদ্য? আজ কিছুতে ভক্তি জাগল না।"

অন্যদিকে মধুসূদনের এই ক্ষণকালীন মোহ দাম্পত্য-সমস্যার কোনও স্থায়ী সমাধান করতে পারে নি। হাবলুর রুমাল ও এলাচদানার কাহিনী থেকে মধুসূদনের বিচিত্র মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তার প্রভুত্বগর্ব আবার প্রবল বিক্রমে মাথা তুলে দাঁড়াল। নবীনের কৌশলে মধুসূদন বেঙ্কটশাস্ত্রীর মিথ্যা ভাগ্যগণনায় বিশ্বাস করেছে। কুমুদিনীই যে মধুসূদনের সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এ কথা বেঙ্কটশাস্ত্রীর কাছে জানতে পেরে মধুসূদনের মন আবার পরিবর্তিত হয়েছে। সে তার ভাগ্যলক্ষ্মীর কাছে অর্ঘ্য নিয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু বেয়ারার জন্য সামান্য শীতবস্ত্রের প্রার্থনায় তার এই শ্রদ্ধার পুষ্পপাত্র ধূলিসাৎ হয়েছে। এর পরে দাম্পত্যসঙ্কটের আর একটি পর্ব শুরু হল।

কুমুদিনীর পিতৃগৃহে প্রত্যাগমনের পর মধুসূদন চরিত্রের আর একটি নতুন দিক উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। কুমুদিনীর প্রতি নিষ্ফল আক্রোশ ও তার অনুপস্থিতিতে শূন্যতাবোধ মধুসূদনকে শ্যামার স্থূল ভোগলালসার দিকে অনিবার্যভাবে ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু এই স্বল্পপ্রসারিত অধ্যায়টির মধ্যে মধুসূদন ও শ্যামার স্থূল ইন্দ্রিয়লালসা ছাড়া নতুন কোনও সম্ভাবনা যুক্ত হয় নি। এই অধ্যায়টিতে মধুসূদনের চরিত্র আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সে কোনোদিন শ্যামাকে তার প্রেয়সীর আসনে বসাতে চায় নি, সে চেয়েছে তার উপর সর্বগ্রাসী প্রভুত্ব বিস্তার করতে। কুমুদিনীর প্রত্যাখ্যানের প্রতিক্রিয়াস্বরূপই যে মধুসূদন শ্যামাকে নির্লজ্জভাবে ভোগ করতে চেয়েছে, তার মধ্যে যে লেশমাত্র প্রেমাবেশ ছিল না, এই সত্যটিকে কবি নিপুণ বিশ্লেষণের সঙ্গে ফুটিয়েছেন। কুমুদিনীর নীরব প্রত্যাখ্যানের পর শ্যামাকে শয্যাসঙ্গিনী করার মধ্যে প্রভুত্বগর্বিত মধুসূদনের যেমন একদিকে নিষ্ঠুর আত্মপ্রসাদ ছিল, তেমনি হয়তো পিতৃগৃহবাসিনী স্ত্রীকে চরমভাবে অসম্মানিত করার নির্মম উল্লাসও ছিল। শ্যামা ও মধুসূদন একই ধাতুতে গড়া। তাই শ্যামাও তার কতকগুলি স্থূল দাবি নিয়েই পরিতৃপ্ত ছিল।

পিতৃগৃহে কুমুদিনী বিপ্রদাসের সাহচর্যে ও শিক্ষায় মনের মধ্যে যে নতুন বল সঞ্চয় করে তুলেছিল, নারীর স্বাতন্ত্র্যবোধ ও অধিকার সম্পর্কে যখন স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছিল—উপন্যাসটির মধ্যে যখন একটি শ্বাসরোধকারী থমথমে আবহাওয়া, সেই সময় তার সন্তান-সম্ভাবনার অবস্থাটি ধরা পড়ল। পিতৃগৃহ থেকে স্বামীগৃহে ফিরে যাওয়ার পরই আকস্মিকভাবে কাহিনীর উপর যবনিকা পড়েছে। কতকগুলি অমীমাংসিত জিজ্ঞাসা

এই অতর্কিত পরিসমাপ্তির মধ্যে চিরকালের জন্য রয়ে গেল।

৪

'যোগাযোগে'র কেন্দ্রীয় চরিত্র কুমু। কুমু চরিত্রটিকে কবি কয়েকটি লঘুস্পর্শ সূক্ষ্মরেখায় অঙ্কিত করেছেন। কুমুর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে হেমনলিনী ও সুচরিতার কিছু আত্মিক সম্পর্ক আছে। তবুও মনে হয় কুমুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য নারীচরিত্রের যেন কোনও মিলই নেই—এমন কি বরনায়িকা লাবণ্যের সঙ্গেও নয়। কুমু যেন কবিতার সূক্ষ্মসার ও জ্যোতির্ময় ভাবলোকের রচনা—রক্তমাংসের মানবী হয়েও সে যেন 'নির্জন তুষার-শিখরের উপরে নির্মল উষা।'—পার্থিব জগতের গ্লানি-মালিন্যের বহু ঊর্ধ্বে তার অপার্থিব জ্যোতির্লোক। হেমনলিনী ও সুচরিতা চরিত্রেও মাধুর্য ও কোমলতার অভাব নেই, কিন্তু কুমুর মাধুর্য ভিন্নজাতীয়। সে যেন একটি মূর্তিমতী কবিস্বপ্ন, আত্মতন্ময় ধ্যানলোকের অধিশ্বরী—তার চারদিকে যে অপার্থিব সৌন্দর্য-পরিমণ্ডল, সে যেন তার শেলীর 'স্কাইলার্কে'র মত 'Like a poet hidden in the light of thought.' তার সমগ্র সত্তার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার একটি নিগূঢ় ব্যঞ্জনা আছে। রবীন্দ্রনাথের নায়িকা-চরিত্রদের মধ্যে কুমুই সবচেয়ে কাব্যময়ী। এই প্রসঙ্গে লাবণ্যের কথাও মনে হতে পারে। কিন্তু লাবণ্যের সৌন্দর্যের বার-আনাই অমিতের রচনা। অমিত না থাকলে লাবণ্যের আসল স্বরূপ কেমন হত, তা অনুমান করতেও বেদনাবোধ হয়। তাই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ লাবণ্যের বিবাহোত্তর জীবনের কোনও পরিচয় দেন নি। কুমুদিনীর বিবাহ-পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় জীবনেরই চিত্র আছে, কিন্তু কোথাও তার যথার্থ পরিচয় ক্ষুণ্ণ হয় নি। কুমুদিনী নিজেই নিজের রচনা, তার সৌন্দর্য ও সৌকুমার্য পুরুষের মুগ্ধদৃষ্টির প্রত্যাশা রাখে না। অথচ কুমুদিনীকে অবাস্তব চরিত্র বা অশরীরী আইডিয়া বলাও সম্ভব নয়। এই জাতীয় কোমল-সুন্দর নারীচরিত্রে যখন স্থূল হাতের স্পর্শ লাগে, তখন মনের মধ্যে একটি প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

কিন্তু ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে কৃতিত্ব হল মধুসূদনের চরিত্ররচনা। এই চরিত্রের প্রতিটি অলিগলির উপর কবি তাঁর সন্ধানী দৃষ্টির আলোকপাত করেছেন। তার স্থূলরুচি, তীক্ষ্ণ বাস্তববুদ্ধি, বংশগৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্পর্ধিত উদ্যম, ধনগৌরবের উদ্ধত ঘোষণা, প্রভুত্বস্পৃহা, কুমুদিনীকে অবলম্বন করে চরিত্রের বিচিত্র আন্দোলন প্রভৃতি অংশকে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণদক্ষতার সঙ্গে বিচার করেছেন। মধুসূদনের চরিত্র কবির রচনা নয়, ঔপন্যাসিকেরই রচনা।

'যোগাযোগ'কে খাঁটি মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস বলা যায়। কবি মধুসূদন ও কুমুদিনীর সম্পর্কবিশ্লেষণে খাঁটি মনস্তত্ত্বমূলক পদ্ধতিই ব্যবহার করেছেন। কুমুর রুচি ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল দাদা বিপ্রদাসের আদর্শেই। সুতরাং সেই আদর্শের পথ বেয়েই তার স্বামীর মূর্তি রচিত হয়েছিল। অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে এই মূর্তির অনেকখানিই বিপ্রদাসের আদর্শে তৈরি! কুমু ও মধুসূদনের বিরোধকে এক হিসেবে বিপ্রদাস ও মধুসূদনের বিরোধও বলা যায়। মধুসূদনের প্রবল ঈর্ষা ছিল বিপ্রদাসের উপর। তার মূলে বংশগত বিরোধ থাকলেও, কুমুদিনী ও তার মাঝখানে যে বিপ্রদাসের ভাবমূর্তি দাঁড়িয়ে আছে, এই নির্মম সত্যটিই তাকে সবচেয়ে পীড়িত করেছিল। মধুসূদনের এই ঈর্ষা-কুটিল সন্দিগ্ধ মনের অবস্থাকে কবি মনস্তত্ত্বের দিক থেকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। "ঈর্ষায় মধুসূদনের মন ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল। দাঁতে দাঁতে লাগিয়ে বিপ্রদাসকে মনে-মনে লোপ করে দিলে। সেই লুপ্তির দিন একদা আসবে ও নিশ্চয় জানে—অল্প অল্প করে স্ক্রু আঁটতে হবে; কিন্তু কুমুদিনীর যে-উনিশটা বছর মধুসূদনের আয়ত্তের বাইরে, সেইটে বিপ্রদাসের হাত থেকে এই মুহূর্তেই ছিনিয়ে নিতে পারলে তবেই ও মনে শান্তি পায়। আর-কোনো রাস্তা জানে না জবরদস্তি ছাড়া।"

বিপ্রদাস চরিত্রের আসল প্রয়োজন এইখানে। সে নিজের বিদ্যাবুদ্ধি, সংস্কৃতি ও রুচিজ্ঞান দিয়ে কুমুদিনীকে রচনা করেছে। কুমুদিনী আসলে দাদার সেই রুচিজ্ঞান ও বিদগ্ধ মানসকে ভালবেসেছে। কিন্তু মধুসূদনের লুব্ধহস্ত বিপ্রদাসের ভাবসর্গে অচল-প্রতিষ্ঠ কুমুদিনীকে ছিনিয়ে আনতে চায়। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের উপন্যাসে মনস্তত্ত্বের প্রতি গভীর আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়।

নবীন ও মোতির মা চরিত্র দুটি এই জটিল পরিস্থিতির মধ্যে কৌতুকোজ্জ্বল সহজ আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে। এই দুটি চরিত্র না থাকলে উপন্যাসটিকে কল্পনাই করা যায় না। মধুসূদন-কুমুদিনী যে সমস্যার সমাধান করতে পারে নি, এই দুটি দম্পতি তাদের অভিজ্ঞতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের দ্বারা তা অনায়াসে সমাধান করেছে। নবীনের কৌতুকদীপ্ত মন্তব্য ও মোতির মায়ের উপস্থিত-বুদ্ধি বিচিত্র দাম্পত্য-গ্রন্থিকে মোচন করেছে। রবীন্দ্রসাহিত্যের অপ্রধান চরিত্রের মধ্যে এই দুটি চরিত্র অমর হয়ে থাকবে।

'যোগাযোগ' উপন্যাসের আর একটি দিক সমালোচকের বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। রবীন্দ্রনাথ এখানে তীক্ষ্ণভাবে সমাজবিশ্লেষণ করেছেন। নুরনগরের চাটুজ্যে পরিবার এককালে অর্থ-প্রতিপত্তির চূড়ান্ত শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আজ তাদের পতনোন্মুখ অবস্থা—অর্থ প্রতিপত্তি না থাকলেও উন্নত রুচিবোধ ও চারিত্রিক আভিজাত্যের কোন অভাব ছিল না। গ্রন্থের প্রথমেই নুরনগরের পরিবেশের যে দীর্ঘ বর্ণনা আছে, তার একটি মহিমা-সুগম্ভীর করুণ সুন্দর দিক আছে। একদিকে যেমন পতনোন্মুখ প্রাচীন জমিদারীর বর্ণনা আছে, তেমনি আর একদিকে আছে বাণিজ্যলক্ষ্মীর অকৃপণ আশীর্বাদে সদ্য ফেঁপে-ওঠা আর এক সম্প্রদায়ের কাহিনী। মধুসূদন এই শেষোক্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি—সে রজবপুরের আড়তদারের মুহুরীর ছেলে। নুরনগরের প্রাচীন প্রাসাদ-শিখরে অস্তসূর্যের ম্লান আলো পড়েছে, কিন্তু মধুসূদনের জীবনে সূর্যোদয়ের সেই প্রথম লগ্ন। সমাজজীবনের এই সন্ধিলগ্নটিকে কবি উজ্জ্বল রেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন। 'যোগাযোগে'র কোন চরিত্রই 'আধুনিক' বা 'অতি আধুনিক' নয়। প্রাচীন ও আধুনিক যুগের সন্ধিলগ্নেই এর পটভূমি। সেখানে প্রাচীনের বুকে ফাটল ধরেছে, কিন্তু নবীনের আসন তখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের উপন্যাসে বাংলাদেশের সমাজজীবনের ছাপ মোটেই সুস্পষ্ট নয়। 'যোগাযোগ' উপন্যাসই এর একমাত্র ব্যতিক্রম। চরিত্রগুলি বিশিষ্ট সমাজজীবনেরই আদর্শে গড়ে উঠেছে। কবি সমাজ-জীবনের ঘনিষ্ঠ রূপটিকেই পর্যবেক্ষণ করেছেন। 'যোগাযোগ' উপন্যাসের অতর্কিত পরিসমাপ্তি পাঠক-চিত্তকে পীড়িত করে। তার কারণ, এত বেশী সম্ভাবনা-দীপ্ত উপন্যাস রবীন্দ্রনাথ আর লেখেন নি। চরিত্রসৃষ্টিতে, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে, সামাজিক রূপ উদ্‌ঘাটনে কবি এখানে অভ্রান্ত নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাই অপূর্ণতার বেদনা ও অভিনব প্রতিশ্রুতির উল্লাস—এই মিশ্র-অনুভূতির আন্দোলনই উপন্যাসপাঠের অনিবার্য ফলশ্রুতি।

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসজনীকান্ত দাস

হিমালয়—
আপনার তেজে আপনি উৎসারিত,
আপনি বিরাট, আপনি সমুজ্জ্বল,
শিখর, গুহা ও অরণ্য-সমাকুল,
যুগ যুগ ধরি সঞ্চিত কত তমিস্রা অনাহত,
পুষ্পস্তবকে বিনম্র তরু, বিচিত্র কত ওষধি গন্ধময়,
ব্যাঘ্র হস্তী বরাহ বন্য, ভীষণ সরীসৃপ,
পুঞ্জিত কত মেঘলোক তার শিখরবিলম্বিত,
হিমালয় তবু হিমে ঢাকা, হায়, তুষারে অসাড় শির।
ভয় করি তায়, বিস্ময় মনে জাগে—
মহিমা বিরাট, শ্রদ্ধায় করি মস্তক অবনত—
ভালবাসিবারে যত যাই, তত সভয়ে ফিরিয়া আসি।

হিমালয়—
নিজ সাধনায় প্রান্তর ত্যজি চুম্বিয়া নীলাকাশ,
অসীম শূন্যে হিমে ঢাকি শির একেলা প্রহর যাপে,
আপনার প্রেমে তিলে তিলে হিম হয়েছে বুকের তাপ-
মাটির উপরে দাঁড়ায়ে রয়েছে, সে কথা গিয়েছে ভুলে।
অতল নিম্নে গুহা-অরণ্যে শ্বাপদ ভ্রমিয়া ফিরে,
সাপেরা চলিছে বুকে পেটে করি ভর,
বিচিত্র কত নরনারী, আর পোষ-মানা পশু কত—
ঘোড়া ও কুকুর, ছাগল, ভেড়ার পাল—
তারই আশ্রয়ে রয়েছে, তবুও তাহা হতে কত দূর!
ভয় করি আর শ্রদ্ধায় করি মস্তক অবনত,
ভালবাসিবারে যত যাই, তত সভয়ে ফিরিয়া আসি।

হিমালয়—
রৌদ্র-আলোকে তুষার-শিখর সাদা ধবধব করে,
নিম্নে গুহায় কুহেলী-অন্ধকার;
ঊর্ধ্ব শিখরে ধুধু করে হিম-মরু,
নাহিক পাদপ, নাহি পল্লব-ছায়া—
নীচে অরণ্য, রৌদ্রকিরণ পশে না ছিদ্রপথে,
ঘননিবিষ্ট তরু ও গুল্ম মেলেছে অযুত বাহু—
নাহি মানুষের পায়ের চিহ্নে আঁকা ক্ষীণ পথরেখা,

সারা বনভূমি রবিকরলেশহীন।
দূর হতে আসি, হিমে-ঢাকা শির চকিতে ঝলসি উঠে,
অনাদিকালের বৃদ্ধ যেন রে ব'সে আছে পাকা চুলে—
ঝলসে তুষার, যেন বৃদ্ধের হা-হা-হা অট্টহাসি ;
ব্যাকুল হৃদয় আজিও পেল না নরম মাটির ছোঁয়া—
তুষারাবরণে আহত হইয়া ফিরি—
ক্ষোভে কেঁদে ফেলি, শ্রদ্ধায় করি মস্তক অবনত,
ভালবাসিবারে যত যাই, তত সভয়ে ফিরিয়া আসি।

হিমালয়—
চিনিতে চেয়েছি, বুকেতে চেয়েছি, ধরিতে চেয়েছি তারে,
আজিও তাহার পাই নাই পরিচয়।
হতাশ হইয়া বসেছি আমার গৃহ-অঙ্গন-ছায়ে—
সুমুখে আমার সবজির ক্ষেত, তাহারি আড়াল দিয়া
হিমালয় হতে ঝরনা নামিয়া উপল-চপল পায়ে
ঝিরিঝিরি আর কুলুকুলু রবে ছুটেছে গাঁয়ের মেয়ে।
কোথা হিমালয় হিমেতে রয়েছে ঢাকা,
পাহাড় গলিয়া নৃত্যচপল এসেছে গাঁয়ের মেয়ে,
বিস্ময় মানি তারি পানে চেয়ে চেয়ে,
ঢেউ গনি আর শুনি কুলুকুলু রব,
ভুলি হিমালয়, ভালবাসি নদীটিরে—
তত ভালবাসি যত কাছে যাই, পুলকে ফিরিয়া আসি।

হিমালয়—
তুমি হিমে ঢাকা থাক, নদীরে ক'রো না হিম।
আমার কুটীর আঙিনা ছুঁইয়া তোমার চপল মেয়ে
সবুজ করিয়া যুগে যুগে মোর ছোট সে সবজি-ক্ষেত
বহিয়া চলুক, তুমি থাক, নাহি থাক—
হিসাব তাহার আমি তো রাখিব নাকো ;
আমি ছুটিব না বিস্ময়ে ভয়ে তোমার পরশ খুঁজি,
যুগে যুগে আমি স্নান সমাপন করিব ও নদীজলে—
কোথায় উৎস, কোন্ সমুদ্রে লীন,
ইতিকথা তার যে পারে রাখুক লিখে।
নদীজলে আমি স্নান করি আর তরণী বাহিয়া চলি—
যত ভালবাসি তত কাছে পাই, পুলকে ফিরিয়া আসি।

['শনিবারের চিঠি' জয়ন্তী-সংখ্যা ১৩৩৮ হইতে পুনর্মুদ্রিত]

পাগলা-গারদের কবিতা

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

আমি ও রবীন্দ্রনাথ

খোকা মাকে শুধায় ডেকে "এলেম আমি কোথা থেকে,
কোনখানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে ?"
মা শুনে কয় হেসে কেঁদে খোকারে তার বুকে বেঁধে
"ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে।"

তোমার এই মা তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে নি,
রবীন্দ্রনাথ।
এ তো প্রশ্নের উত্তর নয়, প্রশ্নের পাশ কাটানো।
কিন্তু খোকা বুঝলে না মা'র এই উত্তর এড়িয়ে যাওয়া ;
ইচ্ছা হয়ে সে কত রকমে মা'র মনের মাঝারে লুকিয়ে ছিল,
মা'র মুখে তার রঙিন ফিরিস্তি শুনেই সে খুশী,
সেই খুশীতে ভুলে গেল প্রশ্ন করেছিল, পায় নি উত্তর।

* * *

তারপর রবীন্দ্রনাথ,
মনে করো সেই তারায় ভরা চৈত্রমাসের রাতের কথা,
যখন তুমি ছিলে ছাতে,
আর ছোট্ট তোমার মেয়ে
সঙ্গিনীদের ডাক শুনতে পেয়ে
সিঁড়ি দিয়ে নীচের তলায় নেমে যাচ্ছিল
হাতে প্রদীপ নিয়ে।
এবার তোমারই ভাষায় (শুধু উত্তমকে মধ্যম করে) বলি :
"হঠাৎ মেয়ের কান্না শুনে উঠে
দেখতে গেলে ছুটে।
সিঁড়ির মধ্যে যেতে যেতে
প্রদীপটা তার নিভে গেছে বাতাসেতে।
শুধাও তারে 'কী হয়েছে বামী ?'
সে কেঁদে কয় নিচে থেকে 'হারিয়ে গেছি আমি।'..."

ছোট্ট তোমার মেয়ের ঐ ছোট্ট 'আমি'-টুকু
বিরাট হয়ে প্রতিধ্বনিত, প্রতিচ্ছবিত হলো
তোমার বুকে আর তারায় ভরা চৈত্ররাতের আকাশে।

* * *

আর তোমার সেই ন বছরের মেয়ে
ব্যর্থ বাইশ বছর বধূগিরির শেষে
মরণের মোহানায় এসে জীবনের প্রথম বসন্তে প্রথম বুঝলে
"আমি নারী, আমি মহিয়সী,
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্নাবীণায় নিদ্রাবিহীন
শশী।
আমি নইলে মিথ্যা হতো সন্ধ্যাতারা ওঠা,
মিথ্যা হতো কাননে ফুল ফোটা।"

তোমার এই মেয়ের সুরে সুর মিলিয়ে পরে তুমিও বলেছিলে
"আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হতো যে মিছে।"
আর বলেছিলে
"আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললেম আকাশে,
জলে উঠল আলো পুবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললেম, সুন্দর—
সুন্দর হল সে।"
মানে, এদের সবার মাধুরীর মূলে তোমার সেই 'আমি',
তুমি যার ডেফিনিশান দিলে
মানুষের সীমানায় স্বয়ং অসীমের সাধনা বলে।
কিন্তু এও তো ডেফিনিশান নয়, বর্ণনা মাত্র—
উত্তর নয়, উত্তর এড়িয়ে যাওয়া।

আর শোনো, কবিগুরু,
ত্রিযামা যামিনী একা বসে যে গান গায় তোমার ভ্রষ্টলগ্না
বিরহিণী :
"হতাশ পথিক, সে যে আমি, সেই আমি।"
যদি সেই গান শুনে ফিরে আসে তরুণ পথিক,
প্রশ্ন করে "কে তুমি ?"
পাবে কি উত্তর ?

* * *

আবার তোমার ভাষায় মনে পড়ে, কবিগুরু,
"প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—
কে তুমি ?
মেলে নি উত্তর।
বৎসর বৎসর চলে গেল।
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগর-তীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি ?
পেলে না উত্তর।"

অর্থাৎ মৃত্যুর মহাসমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে
সেই প্রথম প্রশ্ন আবার শেষ প্রশ্ন হয়ে
জাগল তোমার মনে "কে আমি ?"
পেলে না উত্তর।

এ প্রশ্নের উত্তর কেউ পায় না—
তুমিও পাও নি, রবীন্দ্রনাথ ॥

শেষের কবিতা

যাবার আগে শেষ কবিতাটি বলে যেতে পার নি, কবিগুরু !
যখন সম্মুখে শান্তি-পারাবার,
অসীমে তরণী ভাসাতে উদ্যত কর্ণধার,
এপারের যোগসূত্র ছিন্নপ্রায় ওপারের ডাকে,
তখন সহসা শেষ কবিতা এলো তোমার মনে—
তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম, অনির্বচনীয়তম, চরমতম,
পরমতম কবিতা।

তখন সমস্ত ইন্দ্রিয় তোমার বশের বাইরে,
জেগে আছে শুধু উদগ্র চেতনা,
নিবে যাবার আগে জ্বলে-ওঠা দীপশিখার মত।
জীবনের আদি শ্লোক উন্মত্ত করেছিল আদিকবি
বাল্মীকিকে,
জীবনের শেষ কবিতা তেমনি তোমাকে পাগল করল,
কবিগুরু !

তুমি চিরবিদায়ের আগে পৃথিবীকে দিয়ে যেতে চাইলে
তোমার কবি-জীবনের সেরা দান, শেষ দান, এই শেষের
কবিতা।

ভাবলে মুখে বলে যাবে তুমি, আর লিখে নেবে কেউ ;
সে ঘরে ছিল অনেক কাগজ পেনসিল, শুনে লিখবার
অনেক লোক।

প্রাণপণে বলতে চাইলে তুমি, খুলল না মুখ ;
অচল রইল জিহ্বা, শুধু হয়তো ঈষৎ কেঁপে উঠল ঠোঁট।
কেউ বুঝলে না, কবিগুরু,
সে শুধু তোমার ঠোঁটের অচেতন থরথর কম্পন নয়,
ঐ কাঁপা ঠোঁটে—শুনে কেউ লিখে রাখবে, এই আশায়—
তুমি যাবার আগে বলে যেতে চেয়েছিলে
তোমার শেষের কবিতা।
কিন্তু পারলে না।
তোমার সেই অলিখিত শেষের কবিতার বেতার-তরঙ্গ,
সে কি ধরা দেবে কোনো কবি-মানসের বেতার যন্ত্রে,
না সে অনন্ত শূন্যে হাহাকার করে বেড়াবে অনন্তকাল
তোমারই জন্যে, কবিগুরু ?

সবার কবি রবীন্দ্রনাথ

সন্তোষকুমার দে

কবিগুরুর রচনা নিয়ে ভাবগম্ভীর তত্ত্ব আলোচনা অনেক হয়েছে, আরও হবে। রবীন্দ্র-সাহিত্য মহাসাগর-সদৃশ, তার গভীরে ডুব দিলে যে কত মণিমুক্তা মিলবে তার ইয়ত্তা নেই। আবার সাগরের বেলাভূমিতে ছড়িয়ে আছে রঙ-বেরঙের ঝিনুক, তারা হালকা হলেও তুচ্ছ নয়, বরং তাদের বাহার আপামর জনসাধারণ সকলকেই মুগ্ধ করে। রবীন্দ্ররচনার এই দিকটির যৎসামান্য পরিচয় আমরা এখানে দিতে চেষ্টা করছি। বিস্তারিত গবেষণা করলে এই দিকেও মহাকবির অজস্র দানে বিস্ময় জাগবে।

কবি কলকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন সময়ে একটি কবিতা পাঠিয়েছিলেন, বেতার-জগতের রজতজয়ন্তী উৎসব পালনের সময় সেই কবিতাটি তাঁরা পুনর্মুদ্রণ করেন। কবিতাটির প্রথমাংশ এইরূপ—

"ধরার আঙিনা হতে শোন ঐ
উঠিল আকাশবাণী
স্বর্গলোকের মহিমা দিল যে
মর্ত্যলোকেরে আনি—"

কবিলেখনীপ্রসূত ওই 'আকাশবাণী' অভিধাটি এখন 'অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও' কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, তাঁরা নিজেরাও ওই নামটিই ব্যবহার করছেন।

শান্তিনিকেতনে 'উত্তরায়ণ', 'শ্যামলী', 'উদীচী', 'দেহলী' প্রভৃতি বাসগৃহের নাম এখন সবাই জানেন। গৃহের নাম দেওয়ায় কবি কখনই কুণ্ঠিত হতেন না। প্রশান্ত-মহলানবিশের গৃহের নাম—'আম্রপালি', নলিনীরঞ্জন সরকারের গৃহ—'রঞ্জনী', নিবারণচন্দ্র ঘোষের গৃহের নাম—'নিরঞ্জনা', কবির স্মৃতি বহন করছে। উত্তর কলকাতার বিখ্যাত একটি চিত্রগৃহের নামকরণ উপলক্ষ্য করে কবি 'রূপবাণী' নামে একটি নাতিদীর্ঘ কবিতাই লিখে দিয়েছিলেন। ওই কবিতাটি 'রূপবাণী' চিত্রগৃহে বাঁধিয়ে রাখা ছিল।

কবির জন্মদিন—'পঁচিশে বৈশাখ' আর মৃত্যুদিন 'বাইশে শ্রাবণ'। এই নামেই দুখানি গ্রন্থ আছে—কবি সজনীকান্ত দাসের কাব্য 'পঁচিশে বৈশাখ' কবির স্মৃতিতে উৎসর্গিত। আর শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশের স্মৃতিকথা 'বাইশে শ্রাবণ' কবির শেষ অবস্থার প্রাণবন্ত বিবরণ। আরও একখানি কাব্য আছে—'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ'।

কবির কাব্য হতে বহু গ্রন্থের নাম সংগৃহীত হয়েছে—যেমন 'কিনু গোয়ালার গলি', 'সব পেয়েছির দেশে', 'বকুল গন্ধে বন্যা এলো', 'যেদিন ফুটলো কমল', 'দেশে দেশে মোর ঘর আছে' ইত্যাদি।

এক সময়ে বর্ণাঢ্য চিত্রের পরিচয় গ্রহণ করা হত রবীন্দ্র-কাব্য হতে, যেমন চারু রায়ের সন্ধ্যার ছবিতে পরিচয়—

"নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা সোনার আঁচল খসা
হাতে দীপশিখা।"

সোনার দাঁড়ে ময়ূর বসিয়ে অলকাপুরীর পুরস্ত্রী তাকে নাচাচ্ছে—এই ছবির পরিচয়—

"তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া
ভবন-শিখীরে নাচাও গনিয়া গনিয়া।

বাসবদত্তার একখানি চমৎকার তৈলচিত্রের পরিচয়—

"নগরীর নটী চলে অভিসারে যৌবনমদে মত্তা
সন্ন্যাসী পদে লাগিতে চরণ থামিল বাসবদত্তা।"

শুধু বই বাড়ি আর ছবির নামে নয়, ছেলেমেয়েদের নামকরণে যখন আমরা অতীন এলাদের স্মরণ করি তখন হয়তো সব সময় মনেও থাকে না তারা 'চার অধ্যায়ে'র কেউ। কবি নিজেও অনেক নবজাতকের নামকরণ করেছেন। কবিদম্পতী নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবীর একমাত্র কন্যার নাম যেমন কবি রেখেছিলেন—নবনীতা।

বিয়ের উপহার আর নাম সই করবার খাতায় ছোট ছোট কবিতা যে কত লিখেছেন সেগুলি সংগ্রহ করলে পৃথক একখানি বই হয়। উপহারের মধ্যে উচ্চাঙ্গের রঙ্গরসেরও অভাব নেই, যেমন—

"তোমাদের বিয়ে হল ফাগুনের চৌঠা
অক্ষয় হয়ে থাক্ সিঁদুরের কৌটা"

* * *

"পাক-প্রণালীর মতে কোরো তুমি রন্ধন
জেনো ইহা পতিদের সবসেরা বন্ধন
চামড়ার মত যেন না দেখায় লুচিটা
স্বরচিত বলে দাবি নাহি করে মুচিটা
পাতে বসে পতি যেন না করেন ক্রন্দন।"

বিজ্ঞাপন লিখতে বসে রবীন্দ্রকাব্য হতে যেভাবে দু-হাতে আমরা লুট করেছি তাও কম বিস্ময়ের নয়। বিজ্ঞাপনদাতা নিজের অজ্ঞাতসারেও অনেক কথা ব্যবহার করেন যা আদতে রবীন্দ্র-রচনা, কিন্তু দীর্ঘদিনের ব্যবহারে তার লোকায়ত রূপই প্রাধান্য লাভ করেছে। যেমন—

আনন্দময়ীর আগমনে—নতুন বেনারসী শাড়ি!

শারদীয়া পূজার প্রাক্‌কালে ইত্যাকার বিজ্ঞাপন শুধু শাড়ি নয়, জুতো, জামা, বাসন এমন কি পানের জর্দার বিজ্ঞাপনেও ওই ভাষা ব্যবহার হতে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

"আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে
হের ঐ ধনীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া কাঙ্গালিনী মেয়ে।"
..... ইত্যাদি।

পূজার বাজারে ব্যবহৃত আর দু-একটি কবিতাংশের নমুনা—

"শরতে আজ কোন্ অতিথি
এলো প্রাণের দ্বারে..."

কিংবা—

"আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ
আমরা এনেছি শেফালি মালা..."

অলঙ্কার এবং প্রসাধন সামগ্রীর বিজ্ঞাপনে বুঝি রবীন্দ্র-কাব্যই একমাত্র ভরসা—

"কেতকী কেশরে কেশপাশ কর সুরভি
ক্ষীণ কটিতটে বাঁধি লয়ে পর করবী;
কদম্ব রেণু বিছাইয়া ফুলশয়নে
অঞ্জন আঁকো নয়নে।"

কিংবা—

"কুরুবকের পরত চূড়া কালো কেশের মাঝে
লীলাকমল রইত হাতে কী জানি কোন্ কাজে।
অলক সাজত কুন্দফুলে শিরীষ পরত কর্ণমূলে
মেখলাতে জড়িয়ে দিত নবনীপের মালা।
ধারাযন্ত্রে স্নানের শেষে ধূপের ধোঁয়া দিত কেশে
লোধ্রফুলের শুভ্র রেণু মাখত মুখে বালা।"

এবার নববর্ষের দিন একটি বাঙালী ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান তাঁদের শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন এই কথা বলে—

"সহস্র দিনের মাঝে আজিকার এই দিনখানি
হয়েছে স্বতন্ত্র চিরন্তন।
তুচ্ছতার বেড়া হতে মুক্তি তারে কে দিয়েছে আনি
প্রত্যহের ছিঁড়েছে বন্ধন॥"

চায়ের বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত বিখ্যাত গানটিও মনে পড়ে—

"চা-স্পৃহা চঞ্চল চাতকদল চল হে চল হে"

আর ইস্পাতের বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত—

"নমো যন্ত্র নমো যন্ত্র নমো যন্ত্র"
তব লৌহ গলন শৈল দলন অচল চলন মন্ত্র"—ইত্যাদি।

বাহুল্যভয়ে আরও অধিক উদাহরণ দিলাম না। লেখকেরা যেমন রবীন্দ্র-সাহিত্য-ভাণ্ডার হতে বিবিধ বস্তু আহরণ করে ব্যবহার করেন, সাধারণ মানুষও সেই একই উৎসমুখে তাদের ঘট ভরে নেয় এবং নিঃসন্দেহে তাতে আমাদের দৈনন্দিন জীবন এবং ব্যবহারিক জগৎ আরও শিল্পমণ্ডিত এবং সুন্দর হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ও কুমুদিনী

রমেন্দ্রনাথ দাস

(কল্পিত কথোপকথন)

কুমুদিনী। কবিবর, আজ শততম জন্মদিনে আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

রবীন্দ্রনাথ চোখ মেললেন। কে তুমি?

আমাকে চিনতে পারছেন না?

ভাল করে তাকালেন রবীন্দ্রনাথ। মেয়েটি দেখতে সুন্দরী, লম্বা ছিপছিপে—প্রস্ফুটিত রজনীগন্ধার মত। চোখ নিবিড় কালো, নাকটি নিখুঁত রেখায় ফুলের পাপড়ি দিয়ে যেন তৈরি। রং শাঁখের মত চিকণ গৌর। একটু হেসে সস্নেহে বললেন, পেরেছি।

কু। পারবেনই তো। আপনি তো আধুনিক লেখক নন।

র। আধুনিক লেখকরা বুঝি পারে না?

কু। কি করে পারবে? পথ চলতে চলতে চরিত্রকে এক ঝলক দেখে তারা জনতায়। সেই বাস্তব ভিত্তির ওপর নির্ভর করে রং-মসলা না মিশিয়েই সৃষ্টি করে চরিত্র। নিজেরাই ভুলে যায় সৃষ্টিকে। আপনার মত কজন···

র। হ্যাঁ, আমার মত মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় রুদ্ধ করে সৃষ্টি করে না কেউ। মেঘের গায়ে অস্ত যাওয়া সূর্যের রঙের খেলার দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে, বিনিদ্র তারার সঙ্গে রাতের পর রাত জেগে, প্রভাতের চঞ্চল নবীন আলোকে বন্দী করে আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদের।

কু। ভালই হল, কথাটা উঠল। এইজন্যই আজ এসেছিলাম। আমার সম্বোধন কি লক্ষ্য করেন নি।

র। কি সম্বোধন?

কু। আমি বললাম, কবিবর। আমি আপনার উপন্যাসের চরিত্র—আপনাকে কবি বলে কেন সম্বোধন করলুম।

র। কেন?

কু। আপনি কবি। মনে-প্রাণে কবি। তাই আপনার উপন্যাসের চরিত্র ব্যর্থ। বিশেষতঃ আমি।

র। তুমি? তোমাকেই যে আমি···

কু। মনের মাধুরী মিশায়ে রচনা করেছেন—তাই না। কিন্তু কবিবর, আকাশ আর আলো নিয়ে উপন্যাস হয় না। তাতে চাই ধুলো, মাটি, নোনাজল। আজ আমাকে কেউ চেনে না। কজন পড়ে কুমুদিনীর কাহিনী, কজন মনে রাখে তাকে।

(দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন রবীন্দ্রনাথ)

কু। কোন জিনিষেরই অতি ভাল নয়—অতি কবিত্বই পদে পদে আপনার চরিত্রসৃষ্টিকে ব্যাহত করেছে। সব চরিত্রের ভাষায় এনে দিয়েছে এক সুর। ভাষণ দিয়ে ভাষ্যকারকে চেনা যায় না।

র। অর্থাৎ···

কু। মোতির মা ও কুমুদিনী দুজনে দুই ভিন্ন জগতের অধিবাসিনী। কিন্তু একজনের কথা অপরের নামে স্বচ্ছন্দে চালানো যায়। মধুসূদন, নবীন, বিপ্রদাসের কথার মধ্যে কোন তফাত নেই। কারণ, সকলের মুখ দিয়েই আপনি কথা বলছেন। যাক্ সে কথা। সে কথা বলতে আমি আসি নি। আমার অভিযোগ ভিন্ন।

র। বল।

কু। এত অসম্পূর্ণ করে আমাকে সৃষ্টি করলেন কেন আপনি। এত অপমান কেন আমাকে করলেন?

র। অসম্পূর্ণতা? অপমান?

কু। নয়? বেশ তো ধীরে ধীরে আমাকে সৃষ্টি করে চলছিলেন, যদিও মনে হচ্ছিল আমি যেন শরীরী নই,

একটা ভাবমূর্তি—মীরার ভজনের সুরে আপনার ধ্যান-তন্ময়তায় জন্মেছি—তবু সুন্দর—অতি সুন্দর সেই সৃষ্টি। কিন্তু বিয়ের পর কি সংঘাত দেখাতে চেয়েছিলেন ?

র। তুমিই বল।

কু। স্বামীভক্তি ও সৌন্দর্যবোধের বিরোধ—কেমন, তাই না ?

র। হঁ্যা।

কু। তাঁর রুচি স্থূল, আমার সূক্ষ্ম। কিন্তু তিনি আমাকে মনে-প্রাণে ভালবাসেন—এত ভালবাসা যে তিনি নিজেকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। তবুও যদি আমি তাঁকে ভালবাসতে না পারি—তবে আমার মনের ভক্তি কোথায় ?

র। ঠিক তোমার সঙ্গে বিরোধ আমি দেখাতে চাই নি—তোমার মধ্যে বিপ্রদাসের শিক্ষার যে পলিটুকু পড়েছিল তার সঙ্গে বিরোধের চিত্রই এঁকেছি আমি।

কু। ভাইয়ের সঙ্গে স্বামীর, পিতৃগৃহের সঙ্গে পতিগৃহের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে এ তো চিরন্তন বিরোধ গুরুদেব। এজন্য কোন স্ত্রী স্বামীকে গ্রহণ করতে পারে না ?

র। হঁ্যা...

কু। আপনি রাগ করবেন না। আপনার সৃষ্টি অনুপম। অপরের রচনা দূরে থাক, আপনার নিজেরই রচিত সব চরিত্র থেকে আমি অনন্যা। শুধু কমলার সঙ্গে কিছুটা তুলনা হয় আমার। কিন্তু এখন আমার সময় কম ; তাই শুধু অভিযোগগুলিই জানাচ্ছি।

র। বল।

কু। বিয়ের পূর্বেই ঠাকুরের নির্দেশ মেনেছি আমি, এমন কি স্বামীর স্পর্শকে অশুচিজ্ঞান করেও চরমতম গভীরে নেমে গিয়েছি ঠাকুরের নির্দেশে। কিন্তু বিশ্বাসের দীপ্তি কোথায় আমার মনে। কোথায় কপালকুণ্ডলার মত স্থির উজ্জ্বল, বলিষ্ঠ বিশ্বাস।

র। তুমি যে একালিনী মেয়ে—রোমাণ্টিক, তাই তোমার পদে পদে দ্বিধা। কপালকুণ্ডলা সেকালিনী ক্ল্যাসিকাল চরিত্র—তাই ও অত সহজ, সরল, তীক্ষ্ণ। যাক্ এ সব কথা। তুমি 'অসম্পূর্ণতা', 'অপমান' কি সব বলছিলে ?

কু। হঁ্যা। অপমান। একনিষ্ঠ প্রেমিক, পূজারী মধুসূদনকে যে সহ্য করতে পারল না সেই কুমুদিনী ফিরে এল শ্যামা কর্তৃক উচ্ছিষ্ট মধুসূদনের কাছে। এ কি অপমান নয় ?

র। মাতৃত্বের কাছে নারীত্বের অপমান।

কু। নারীত্বের সেই অপমানের ছবি আপনি আঁকেন নি। কুমুদিনী বিপ্রদাসকে বলল, আমাকে তুমি ফিরিয়ে নিও, ততদিন তাদের ছেলেকে তাদের কাছে ফিরিয়ে দেব। ছেলেকে ফিরিয়ে দেওয়াই যদি চরম কথা হত, তবে পিতৃগৃহে ছেলেকে জন্ম দিয়ে কিছুদিন পালন করে স্বামীর কাছে দিয়ে দিতে পারত কুমুদিনী। কিন্তু তা না করে সে ফিরে যাচ্ছে পতিগৃহে। অর্থাৎ, ওটা একটা কথার কথা। ভ্রাতৃগৃহে সে ফিরে আসে নি, পতিগৃহেই বাস করেছে। যেখানে প্রকৃত উপন্যাস শুরু হল—সেখানেই নীরব হয়ে গেলেন আপনি। একটানে অবিনাশ ঘোষালের বত্রিশতম জন্মদিনে রাশি রাশি অভিনন্দন দিয়ে দিলেন। একবারও জানালেন না অবিনাশ কার মত হল—পিতা না মাতা ! কি করে কুমুদিনী এই দিনগুলি কাটাল ! সে কি ধীরে ধীরে স্বামীর মত স্থূল রুচিসম্পন্ন হল, না তিলে তিলে আত্মহত্যা করল।

র। পারি নি, লিখতে পারি নি। জানি তুমি অসম্পূর্ণ, কিন্তু তোমার সেই রক্তাক্ত হৃদয়ের ছবি আঁকতে পারি নি আমি। নিষ্ঠুর, নিরাসক্ত মন দিয়ে তোমাদের বিচার করতে পারি নি বলেই আমি আজ বড় ঔপন্যাসিক নই, শুধু এক হৃদয়বেত্তা মানব।

রোলাঁ ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রায় সাতচল্লিশ বছর পূর্বে কিছুটা আকস্মিকভাবে রবীন্দ্রনাথ যেদিন নোবেল প্রাইজ পেলেন সেদিন ইউরোপ-আমেরিকার খবরের কাগজওয়ালারা যে খুব ধীরচিত্তেই এই খবরটি পরিপাক করে নিয়েছিলেন তা মনে হয় না। বিশ্বসাহিত্যের দরবারে, জগৎকবির সভায় নতুন নায়ক এল এ খবরটা যেমনি জব্বর তেমনি মুখরোচক, জল্পনাকল্পনারও খোরাক জুগিয়েছিল। রাগ-অনুরাগ, মান-অভিমান, অহঙ্কার-প্রত্যাশার স্ফুলিঙ্গ তো ছিলই, বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ, ক্রোধ-উত্তেজনারও কমতি ছিল না। কে এই রবীন্দ্রনাথ টাগোর—ইহুদী বংশের রাব্বীনাথান্ নাকি! তাঁর লেখার কী এমন গুণ, চিন্তায় চেতনায় কী এমন সরস প্রসাদ, যে এই কালার দেশের লোককে ধলার দেশের প্রাইজ দিয়ে মাথায় করে নাচতে হবে। কেউ কেউ লিখলেন, নামটা যখন আমরা কাগজে পড়লাম তখন সেটাকে অবাস্তব বলেই মনে হয়েছিল। কজনই বা তাঁকে চেনে জানে, বিশেষ করে যখন টলস্টয়, জোলা, স্ট্রীণ্ডবার্গের জীবদ্দশায় নোবেল কমিটী তাঁদের এই পুরস্কার দেবার অবকাশ পেলেন না, যখন টমাস হার্ডী, আনাতোল ফ্রান্সের মত লেখকরা এখনও পারিতোষিক পান নি। ওরই ভেতর যাঁরা একটু স্থিরধীর, বুদ্ধিবিবেচনাসম্পন্ন, যাঁরা উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ বলতে অভ্যস্ত নন্ তাঁরা ভাবতে বসে গেলেন, কেউ কেউ বা বইও পড়তে লেগে গেলেন। শেষ পর্যন্ত দু-চারজন জ্ঞানীগুণী, যাঁদের কাঁধে কর্তার ভূত চেপে বসে আছেন, তাঁরা বললেন, হাঁা, ধরেছি, এর ভিতরে আছে ইংরেজকে কোণঠাসা করবার একটা চেষ্টাও, রাজনীতির প্যাচনীতি, তা না হলে ইংলণ্ডেরই ছত্রছায়ায় আশ্রিত একটা দেশের কালা লোককে এই সম্মান দেওয়া হয়! আর সুইডেনের রাজবংশের প্রিন্স উইলিয়াম সম্প্রতি ভারত-ভ্রমণে গিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতেও এসেছিলেন এবং কবির সঙ্গে আলাপে আপ্যায়নে বেশ কিছুটা সময় কাটিয়ে মুগ্ধ হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন। তিনি নাকি বলেছিলেন যে ঠাকুর-বাড়ির মনস্বীদের চোখে তিনি আগুনের শিখা দেখেছিলেন। আগুন সংহত হলেই হয় আলো, আরও সংহত হলে হয় তেজ।

অবশ্য কিছুদিন থেকেই রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে খাস ইংলণ্ডে কিছু গণ্ডগোল ও কলরোল উঠছিল। ইয়েট্স, রোদেনস্টাইন, এজরা পাউণ্ড, স্টপফোর্ড ব্রুক, এণ্ড্রুজ, লুইস ডিকিনসন প্রভৃতি মনীষিরা তাঁর সম্বন্ধে সশ্রদ্ধভাবে মন্তব্য করছিলেন, ম্যাকমিলানরা বইও ছাপিয়েছিল। রক্ষণশীল ইংরাজ-মনও একটু সচকিত হয়ে উঠেছিল। তা ছাড়া ভদ্রলোকের চেহারাটাই ছিল একটা মস্ত পাসপোর্ট, 'মিস্টিক ইস্টে'র সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। সেদিনও ম্যালকম ম্যাকডোনাল্ড সেই কথাই বললেন। তিনি তখন বালক—রবীন্দ্রনাথ গেছেন তাঁর পিতা রামজে ম্যাকডোনাল্ডের (পরে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী) সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। লাইব্রেরিতে বসে তাঁরা কথা কইছেন। তাঁর নিজের কথাই উদ্ধৃত করে দিই (মেরিডিয়ান বুকসের প্রকাশিত একটি পুস্তকের মুখবন্ধে):

"This is Rabindranath Tagore I heard.

To my unaccustomed infant Western ears it sounded like a strange poem with an echo of music.

*　　*　　*

At first I thought that he was one of the prophets from the Old Testament.

*　　*　　*

But what struck me most—and has remained in my memory ever since was his face. It had a Christ-like nobility, gentleness, sadness and lovingness."

সত্যিই তাঁর কথা শুনলে মনে হত যেন একটা গানের সুর তরঙ্গিত হয়ে চলেছে—তাঁকে দেখলে মনে হত যেন

ওল্ডটেস্টামেণ্টের এক পরমপ্রাজ্ঞ পরম কারুণিক ভাগবত এসে নেমেছেন।' ইউরোপে এই প্রতিক্রিয়া বহু দেশে বহু স্থানে ঘটেছে। এণ্ড্রুজের লেখায় পড়ি রবীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতাপাঠ শুনে সারারাত্রি তিনি হ্যাম্পস্টেড হীথের মাঠে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন।

রোলাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলাপ ঠিক এই শুভলগ্নে নয়। আরও পরে এবং সেই আত্মিক পরিচয় হয় এক বিচিত্র সমাবেশের মধ্যে। ১৯১৪ সনের মে মাস থেকেই কবির মনে ঘনিয়ে উঠছে এক অজ্ঞাত আশঙ্কা, এক আসন্ন অমঙ্গলের আবাহন। 'বলাকা'য় তিনি গাইছেন :

এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো।
বেদনায় যে বান ডেকেছে
রোদনে যায় ভেসে গো।
রক্তমেঘে ঝিলিক মারে
বজ্রবাজে গহিন পারে
কোন পাগল ঐ বারে বারে
উঠছে অট্টহেসে গো
এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো।

কবি দূরদৃষ্টিতে দেখছেন—ব্যাঘাত আসছে নব নব, আসছে প্রলয়ঝঞ্ঝা, মূর্ছিত বিহ্বল করা মরণে মরণে আলিঙ্গন ; লক্ষ বক্ষ হতে মুক্তরক্তের কল্লোল, ক্রন্দনের কলরোল :

দূর হতে শুনিস কি মৃত্যুর গর্জন—

মৃত্যুসাগর মথন করে কবি অমৃতরস আনতে চান :

তব নৃত্য মন্দাকিনী নিত্য ঝরিঝরি
তুলিতেছে শুচি করি
মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন

তাই :

পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা
আর চলিবে না।

ইউরোপের রণতাণ্ডবের পরিপ্রেক্ষিতে কবির মনে যে দ্বন্দ্বদোলা লাগছে তারই তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে কবির আহ্বান এল চীন ও জাপানে যাবার জন্য। ১৯১৬ সনের গ্রীষ্মকালে কবি বেরিয়ে পড়লেন প্রশান্ত মহাসাগরের তীর বেয়ে। জাপানে তখন ঐশ্বর্যের বাহুল্য, স্বাদেশিকতার মত্ততা। তিনি যেন হঠাৎ ন্যাশনালিজমের ভূতকে দেখে চমকে উঠলেন—এই মদমত্ত স্বাজাত্য যে অপদেবতার সামিল—প্রশ্রয় দেয়, আশ্রয় দেয় না। কবি বক্তৃতা দিলেন টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কিওগিজুকু শিক্ষায়তনে (Message of India to Japan ও The Spirit of Japan)। এক রাত্রেই কবি হয়ে উঠলেন অপাংক্তেয়।

এই বক্তৃতার অংশবিশেষই তাঁর 'ন্যাশনালিজম' পুস্তকে প্রকাশিত হয় এবং একেই সূত্র করে দুই মনীষির আলাপ ও পরে ঘনিষ্ঠতা। এবং এই বই নিয়েই কবিকে বহু বিরুদ্ধ সমালোচনা শুনতে হয়েছে। কবির ন্যাশনালিজমের সম্বন্ধে মন্তব্য রোলাঁকে সচকিত করে তোলে ; এই বাণীই তো তিনি খুঁজছিলেন, অনুবাদ করে ছড়িয়ে দিলেন রণক্লান্ত ইউরোপের যুদ্ধপ্রাঙ্গণে, ট্রেঞ্চে ট্রেঞ্চে। প্রভাত মুখোপাধ্যায় মশাই তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনী'তে লিখেছেন একজন শিক্ষিত সৈনিকের কথা—Max Plowman তাঁর নাম, যিনি রবীন্দ্রনাথের কথা পড়ে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন—ততঃ কিম্,—What to do, when the personal application of such words came home to me, I did not know, but what not to do was plain as a pike staff and in the moment of that recognition I had ceased from organised war for ever.

রোলাঁ তখন ইউরোপের একজন বিখ্যাত মনীষী টলস্টয়ের প্রিয় শিষ্য, মোজার্ট, বীঠোভেন্ তাঁর সুরগুরু, শেক্সপিয়র গ্যেটে তাঁর কল্পনার আদর্শ লেখক। ইনিই সেই অজাতশ্মশ্রু তরুণ যাঁর চিঠির উত্তরে টলস্টয়, আটত্রিশ পাতা জবাব দিয়ে তাঁর শিল্পস্বীকৃতির ধারাকে বুঝিয়ে দেন। ইনিই সেই রোলাঁ যিনি আঠারো বৎসর বয়সে ইউরোপের এক বিখ্যাত মহিলার সাহচর্য পেয়েছিলেন। সত্তর বছর বয়সের এই বৃদ্ধা ব্যারনেস ম্যালভিডা ভন্ ম্যাজেনবার্গ ইউরোপের তদানীন্তন রসিকসমাজের মক্ষীরাণী ছিলেন। তাঁর "স্যালোনে" ম্যাজিনি, লিস্ট,

লাইফবয় যেখানে
স্বাস্থ্যও সেখানে!
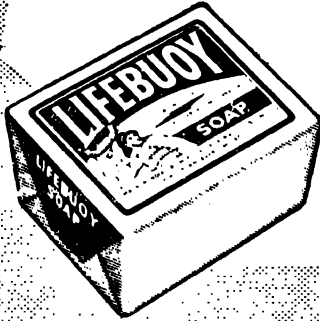
গ্যারিবল্ডী, ইবসেন্‌ ওয়াগনার, নীটশে কত সুরকার শিল্পীসাহিত্যিকের সমাবেশ হত। তিনি রোলাঁকে ললিতকলার আসরে আপন করে নিয়েছিলেন—সচিব, সখা, মিতা, প্রিয়শিষ্যরূপে, বলেছিলেন :

আমার এ ঘরে আপনার করে গৃহদীপখানি জ্বালো।

উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সংস্কৃতি তখন জ্ঞানবিজ্ঞান-শিল্পকলার মাধ্যমে এক বিচিত্র ঘননিবিড়রসসমৃদ্ধ উৎকর্ষে পৌঁছেছে—জনসাধারণ এমনও মনে করছে যে এই বুঝি সভ্যতার শেষ কথা। কিন্তু যাঁদের দৃষ্টি ছিল অন্তর্মুখী তাঁরা বহিরঙ্গের বৈচিত্র্য থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে অন্তরের গভীর নিভৃতির দিকেও দৃষ্টি দিয়েছিলেন। রোলাঁ ছিলেন সেই লোকোত্তরদের একজন এবং এইখানে রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় মনীষা ও ধ্যানমহিমার প্রতি তাঁর ছিল অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা। কি রবীন্দ্রনাথ, কি রোলাঁ আকাশের দিকে চেয়ে দেখছিলেন যে জাগছে একটি কালো মেঘের রেখা—দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে সমস্ত অম্বর ছেয়ে ফেলছে, এমনি এক কালো দিনের মাঝেই তাঁদের আত্মিক পরিচয়—ইউরোপে তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ লেগেছে। স্বাজাত্যাভিমানে ভরা সেই যুদ্ধক্লান্ত আন্তর্জাতিক উত্তেজনার দিনে, ইংলণ্ডের বার্ট্রাণ্ড রাসেল, রাশিয়ার গর্কী, ফ্রান্সের রোলাঁ ও জোরে, জার্মানীতে নিকোলাই ও আইনস্টাইন, ভারতের রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেক চিন্তাবীরই বিশ্বের মুক্তপ্রাঙ্গণে অনাদৃত অবহেলিত এমন কি নির্যাতিতও হয়েছিলেন। রোলাঁ হাউপ্টম্যানকে চিঠি লিখলেন, মারতে হয় মানুষ মার, কিন্তু ওই অমূল্য শিল্পনিদর্শনগুলি—সমগ্র মানবজাতির যা উত্তরাধিকার, পবিত্র সম্পদ—সেগুলি যেন রক্ষা পায়। রোলাঁ আমেরিকাকে বললেন, জর্জ ওয়াশিংটন, আব্রাহাম লিঙ্কনের মহৎ উত্তরাধিকারী তোমরা—শুধু একটা দলের, একটা জাতির কথা ভেব না—সারা বিশ্বের মানুষকে ডাক তোমাদের বৈঠকে, কথা বল সকলের সঙ্গে (Summon the representatives of the peoples to the Congress of Mankind—speak, speak to all)। দেশের দেশান্তরের পাঁচিল ভেঙে দাও, জাতিবর্ণনির্বিশেষে এমন কথা বল যার জন্য তৃষিত হয়ে বসে আছে মানুষ।

১৯১৯ সনের ১০ই এপ্রিল রবীন্দ্রনাথকে রোলাঁ প্রথম চিঠি লিখলেন যে তাঁরা কয়েকজন চিন্তাশীল বন্ধুতে মিলে একটি 'Declaration of Independence of the Spirit' বলে এক ইস্তাহার জারি করতে চান, যাতে পৃথিবীর মনীষীরা যোগ দিতে পারেন। ভারতের রবীন্দ্রনাথ ও আনন্দকুমারস্বামী সানন্দে তাতে সহি দেন। আমেরিকার জেন এডামস্‌, ফ্রান্সের আঁরি বারবুসে, চ্যাটুব্র্যাণ্ড, জর্জেস ডুমাহেল, জুলেস রোমানেজ, রাশিয়ার পল বিরুকফ, নিকোলাস রুবাকিন, ইতালীর বেনেদাতো ক্রোচে, জার্মানীর আইনস্টাইন, হারমান্‌ হেস, ইংলণ্ডের বার্ট্রাণ্ড রাসেল, সুইডেনের সেলমা লেগারলফ, অষ্ট্রিয়ার ষ্টিফান জাইগ প্রভৃতি বহু মনীষী এতে যোগ দেন। রোলাঁ রবীন্দ্রনাথ ও অন্যরা মানবিকতার এক মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বললেন......The spirit is the servant of none. It is we who are servants of the spirit. Amongst these passions of pride and mutual destruction, we shall choose none ; we shall reject all. We save Truth alone which is free, with no frontiers, with no limits, with no prejudices of race or caste....We do not recognise nations. We recognise the people—one and universal, the people who suffer, who struggle, who fall and rise again, and who ever march forward on the rough road, drenched with their sweat and their blood—the people comprising all men, all equally our brothers. এঁরাই বলতে পারেন—এ কুৎসিত তাণ্ডব যবে অবসান হবে :

মানব তপস্বীবেশে
চিতাভস্ম শয্যাতলে এসে
স্থান লবে নিরাসক্ত মনে,
ধ্যানের আসনে।

আজ স্মরণ হচ্ছে কবির বিখ্যাত 'আফ্রিকা' কবিতার কথা :

হায় ছায়াবৃতা,
কালো ঘোমটার নিচে
অপরিচিত ছিল তোমার মানবরূপ
উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে
সভ্যের বর্বর লোভ।
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।

মানহারা মানবীকে ডেকে তিনি বলছেন, ক্ষমা কর—এই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী। জানি আজকের বুদ্ধিজীবী মহলে এই ধরনের ইমোশনপুষ্ট মানবতাবাদকে এক ধরনের রোমান্টিক রম্য ভাবুকতা বলেই উপহাস করা হয়, তবু রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ বলিষ্ঠ নয়, মানবমুখীন নয়, শুধু উপনিষদের মরমীদের জীবনবেদে জারিত এক ভাসা-ভাসা Divinity of Humanity, Humanity of Divinity-বাদ—একথাও সত্য নয়। রোলাঁর মানবতাবাদ তো নয়ই।

ভারতবর্ষ ও তার চিন্তার বাহক ও ধারকদের সম্বন্ধে রোঁলার মনে এক বিশেষ শ্রদ্ধার আসন ছিল। শুধু রবীন্দ্রনাথ নয়, মহাত্মা গান্ধী, শ্রীঅরবিন্দ, জগদীশচন্দ্র, উনবিংশ শতাব্দীর লোকনায়কেরা, যেমন রামমোহন, কেশবচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, দয়ানন্দ সকলেই তাঁর চিত্তকে নাড়া দিয়েছেন এবং আরও প্রচণ্ডভাবে দিয়েছেন পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁরই মানসপুত্র বিবেকানন্দ যার ফলে সারা পৃথিবী এই দুই মহামানবের এক অপূর্ব ছবি পেয়েছে তাঁর কাছ থেকে।

এরনসন রোলাঁর জীবনীকে একটি বিবেকের গল্প (The story of a conscience) বলে অভিহিত করেছেন। মনে হয় তাঁর প্রজ্ঞা-উজ্জ্বল জীবনে শুধু বিবেকের ছাপই পড়ে নি, একটি দীর্ঘ ধ্যানময় সত্তার স্পর্শও রয়েছে, একটি জাগ্রত আত্মার যাত্রার কাহিনীও,—যার মধ্যে সুপ্ত আছে বিশ্বাতীত ইতিহাসের পদক্ষেপ, যুগযুগান্ত ধরে লেহনলীলার বিরুদ্ধে শাশ্বত মানবমনের অনন্ত অভিযানও। তাঁরই নিজের কথা—A long meditative life is a great adventure. ইউরোপের সাহিত্যিক-ইতিহাসে ১৯১০ সন পর্যন্ত রোঁলা ছিলেন স্বল্প পরিচিত। ১৯১২ সনের মধ্যেই কিন্তু 'জ্যাঁ ক্রিস্তফে'র লেখক সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠেছেন। ১৯১৫ সনে তিনি বিশ্ববিজয়ী নোবেল প্রাইজধারী।

পূর্বেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথের জাপানে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি রোলাঁকে অভিভূত করে এবং তারই মধ্যে এক সমধর্মিতার ও সহমর্মিতার স্বাক্ষর পেয়ে তিনি কবির একজন নীরব অনুরাগী হয়ে ওঠেন। রোলাঁ-ভগিনীই ওইগুলির অনুবাদ করেন। তখনও এঁরা রবীন্দ্রনাথকে ব্যক্তিগত ভাবে চেনেন না, জানেন না। 'জ্যাঁ ক্রিস্তফে' আমরা বহুবার ভারতবর্ষের উল্লেখ পেয়েছি। তবু ক্রিস্তফের মন ইউরোপীয় মন, সে খুঁজছে তার ধ্যানের ইউরোপকে—তাই রোলাঁও খুঁজছেন, গান্ধীর মধ্যে সেণ্ট ফ্রান্সিসকে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নিজেকে, রামকৃষ্ণের মধ্যে খ্রীষ্টকে, বিবেকানন্দের মধ্যে সেণ্টপলকে। তাঁর ক্রিস্তফে বলছে, রেখে দাও তোমার প্রাচ্যের কথা, প্রতীচি এখনও মরে নি, আমার এখনও অনেক কিছু দেবার আছে, আমি মুনি অতীত নই, তপস্বী ভবিষ্যৎও। ১৯১৯ সনের আগস্ট মাসে এক চিঠিতে রোলাঁ রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন—ইউরোপ একা নিজেকে বাঁচাতে পারবে না (Europe alone cannot save herself)—এশিয়ার চিন্তা, তার মনন, তার মানসিকতার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সংযোগ দরকার। ব্রেণের একদিকে পক্ষাঘাত হলে সমস্ত দেহেই পচন ধরে।

১৯২১ সনে প্যারিসে তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎ। সেই সময় হতে আমৃত্যু কবির সঙ্গে তাঁর এক নিবিড় সখ্য ও শ্রদ্ধা-প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ১৯২৬ সালের পর থেকে পত্রালাপের বহর কিছু ক্ষীণ হলেও আগ্রহ ও আন্তরিকতা কম নয়। ১৯২২ সনের একটি চিঠিতে (বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুস্তকে দ্রষ্টব্য) দেখি—I could no longer bear the moral and material atmosphere of Paris, the perennial trepidation of streets and souls. I had to live there a long time but only by enveloping myself in

my own music and my own dreams. I believe I have now earned the right to withdraw from the vortex of men in order to be near the heart of Man. Here I have silence, the murmur of trees and of waves breaking on the sands, the breath of prairies and of pure white glaciers. তিনি কবিকে লিখছেন যে আমার আর প্যারিসে থাকা হয়ে উঠল না—তার নৈতিক ও বৈষয়িক আবহাওয়া—তার জনপথের, তার জনগণের বুকের চিরকালের কাঁপন আর আমার সহ্য হচ্ছে না। সেই লোকারণ্যে আমায় অনেকদিন থাকতে হয়েছে এ কথা ঠিক, কিন্তু আমি নিজেকে ঘিরে রেখেছি আমার সুরের মধ্যে, গানের মধ্যে, স্বপ্নের মধ্যে। আমি বিশ্বাস করি যে জনতামহারাজের কলকোলাহল থেকে বেরিয়ে আসবার দাবি আমার আছে, যাতে আমি সেই নিত্যসত্য মানুষের মনের অতি কাছাকাছি থাকতে পারি। এখানে আমি পেয়েছি নৈঃশব্দ্যের স্তব্ধতাকে, বৃক্ষপত্ররাজির নিগূঢ় মর্মরকে, বালিতে আছাড় খাওয়া তরঙ্গভ্রূভঙ্গীর বিভাসকে, এখানে আছে উন্মুক্ত প্রান্তরের মুক্ত নিঃশ্বাস আর শ্বেতশুভ্র বরফের হিমবাহস্তর।

তারপরে রোলাঁ লিখছেন—বন্ধু, তোমার দিনগুলি স্নিগ্ধতায় সৌষম্যে ভরে উঠুক, তোমার প্রতি আমার যে সুনিষ্ঠ গভীর প্রীতি আছে তা জেনে তোমার মন আনন্দে বিভাসিত হোক।

বিশ বছর পরে আর এক তাণ্ডবের ঘূর্ণীবাত্যার দিনে রোলাঁর শেষ চিঠি (২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪০) হলো—বন্ধু, আজ আমি আবার নতুন করে স্মরণ করছি আমার অতীতকে, আমার কৈশোরকে, যৌবনকে—I re—live and try to fix on paper my memories of the past century—the days of my youth and the first struggles, before 1900. এই ধ্যানধারণার কথাই ব্যক্ত হয়েছে তাঁর অপূর্ব বই 'Journey Within'এ। রুসোর, অগাষ্টিনের, গোটের আত্মস্মৃতির সমধর্মী এই পুস্তক—তাঁর ধ্যানের স্বপ্নের মননের সহচর এক বৃদ্ধ বনস্পতিকে উৎসর্গীকৃত।

Liebe, Liebe	Um eneh Verbreilat Leibe
Love—Love	Around you diffuse love

ভালবাস, ভালবাস—তোমার আশেপাশে ছড়িয়ে দাও এই প্রেমকে। রোলাঁর প্রায় শেষ কথা—Amore, Pace, ভালবাসা—শান্তি।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে অসহযোগ আন্দোলনের তীব্রতম দিনে কবির সঙ্গে মহাত্মাজীর যখন ভাবগত সংঘাত লেগেছে, যেদিন কবি শুধু পেয়েছিলেন অনেক দেশবাসীর কাছে জীবনভীরু দার্শনিক বলে উপহাস, সেদিন রোলাঁ সকলকে ডেকে বলেছিলেন, মহাত্মা নমস্য, কিন্তু আমি বুঝতে পারি, কবির কোথায় ব্যথা। আমি কবির দলে (I am with Tagore), সেদিন কবির বক্তব্য ছিল সর্বমানবের মিলনের পরিপ্রেক্ষিতেই মানবসত্তার অনন্ত বিকাশ—কবির অন্তরের গভীরতম প্রার্থনা, ভারতবর্ষ যেন সেই মিলনের পথই বেছে নেয়। গান্ধীজী উত্তর দিয়েছিলেন—কবির গান আগামী কালের জন্য, আজ কিন্তু আমার বাড়িতে আগুন লেগেছে, লোকে না খেয়ে মরছে, আজ আমার কর্তব্য নিরন্নকে অন্নদান, ভারতের নীলাকাশের নীচে যে মানুষ পাখি উড়ছে সে যে দিনে দিনে দুর্বল হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ লোক আজ যখন অনন্ত অপেক্ষায় অনন্ত নিদ্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে তখন কবীরের গান শুনিয়ে সেই ক্লিষ্ট মানুষকে আমি সান্ত্বনা দিতে পারি না। অত্যন্ত প্র্যাক্‌টিকাল ও দরদীর কথা, কিন্তু কবির জবাবও অপূর্ব—ভারতের ভবিষ্যৎ নারায়ণে, নারায়ণী-সেনায় নয়। স্বাধীনতা স্বরাজ আমাদের সত্যকার লক্ষ্য নয়। আমাদের যুদ্ধ আধ্যাত্মিক যুদ্ধ—আসল মানুষের জন্য—নিজের চারপাশে নিজের হাতে স্বাজাত্যের শৃঙ্খল যে গেঁথে তুলেছে। প্রজাপতিকে বলতে হবে গুটির ভিতরে না ঢুকে আকাশের উদার আতিথ্যকে গ্রহণ কর। রবীন্দ্রনাথের কথাগুলি পড়ে রোঁলা বলেছিলেন—Brave words.

১৯২৬ সনে ফ্যাসিস্ট রাজ্য ইতালীতে গিয়ে যখন রবীন্দ্রনাথ মুসোলিনীর সঙ্গে কিছুটা দহরম-মহরম করেন তখনও রোলাঁ রবীন্দ্রনাথকে বন্ধুর মত সতর্ক করেছেন—

আপনার রূপ লাবণ্য
আপনারই হাতে!
মুখশ্রীকে অকারণ রোদে—ধূলোয় কালো
বা নষ্ট হতে দেন কেন? চেহারার লাবণ্যতা রক্ষার
ভার হিমালয় বুকে স্নোর ওপরই ছেড়ে দিন—
তারপর দেখুন চেহারার চমক। একটু খানি
হিমালয় বুকে স্নো ঘষে দেখুন, হারানো কান্তি
ধীরে ধীরে আবার কেমন ফিরে আসছে!
শুষ্ক ত্বক সজীব হয়ে উঠেছে!
হিমালয় বুকে স্নো আপনার মুখে কখনও ব্রণ
বা দাগ পড়তে দেবে না। নিজের চেহারায়
দেখুন · লাবণ্যতা এনে ধরেছে···
হিমালয় বুকে স্নো!
Erasmic
হিমালয় বুকে স্নো
HIMALAYA BOUQUET SNOW

আমি চাই না, ইতিহাসের অমলধবল পাতায় তোমার পুণ্যপবিত্র নাম নিয়ে দুর্বৃত্তরা কালির আঁচড় টানে, অন্যায় ভাবে ব্যবহার করে—বন্ধু, আমায় ক্ষমা কর, যদি আমার খবরদারিতে তোমায় নিদ্রাহীন রাত কাটাতে হয়ে থাকে, কিন্তু অনাগত দিনই বলবে যে আমি তোমার বিশ্বস্ত ও সদাজাগ্রত পথপ্রদর্শকেরই কাজ করেছি।

রবীন্দ্রনাথ ও রোলাঁর মতে শিল্পমানসের কি কারুকৃতি হওয়া উচিত সেই সম্পর্কে দু-একটি কথা বলেই এই প্রবন্ধ শেষ করি। ১৯২৬ সনের ২৪শে জুন ভিলেনিউভের একটি সাক্ষাৎকারে কবি রোলাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে আর্টের উদ্দেশ্য কী—'ইমোশন'কে প্রকাশ করা, না, সেই ভাবের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পীমন নতুন একটা বিশেষ কিছু সৃষ্টি করুক এইটেই কাম্য। নিজের বক্তব্যকে পরিস্ফুট করবার জন্য কবি বলেন যে, 'গ্রীসিয়ান আর্ন' সম্বন্ধে কবিতাটি কি কোন বিশিষ্ট ভাবের দ্যোতক, না শিল্পী-মানসের এক নতুনভঙ্গীর প্রকাশ। তারপর তিনি রোলাঁকে বলেন—এই দেখুন না আপনাদের সংগীত—সুরসৃষ্টি—সে একটা বিশেষ ভাবকেই রূপ দিতে চায়, না তাকে আশ্রয় করে আর একটা নতুন সৃষ্টি গড়ে ওঠে? আমাদের সংগীতশাস্ত্র কিন্তু শিল্পীকে সেই মুক্তি দিয়েছে। রোলাঁ বলেন যে ইউরোপীয় সংগীতের মধ্যে সে দোষ আছে বটে কিন্তু প্রকৃত সংগীতকারের হাতে ইমোশন ও তার বহিরঙ্গে প্রকাশের ধারা একটা অচ্ছেদ্য সৌষম্য গড়ে তোলে—যাতে একটা পূর্ণ শিল্পমূর্তি ফোটে।

এ প্রশ্ন স্বাভাবিক যে বর্ষা-সংগীতে বা কাব্যে—

কুলিশ পাতন শব্দ ঝন ঝন, পবন খরতর বলগই

বা :

তালীষু তারং বিটপেষু মন্দ্রম শিলাসু রুক্ষং সলিলেষু চণ্ডম
সংগীত বীণা ইব তাড্যমানাস্তালানুসারেন পতন্তি

এই শব্দক্রিয়াই বড়, না তার অন্তর্নিহিত অলক্ষ্যরূপের সংবেদনই কাম্য—যেমন রবীন্দ্রনাথের :

ঝর ঝর ঝর ভাদর বাদর
বিরহকাতর শর্বরী
ফিরিছে এ কোন অসীম রোদন
কানন কানন মর্মরি।

যেন কোন শ্যামকান্তিময়ী স্বপ্নমায়া রক্তঅলক্তকপায়ে ধারাসিক্ত বায়ে বনময় ঘুরে বেড়াচ্ছে তারই ছবি পেলাম। গানেও তাই হওয়া উচিত।

রবীন্দ্রনাথের শিল্পরসবোধের সীমানা তিনি নিজেই নির্দেশ করে দিয়ে গেছেন তাঁর এক অপূর্ব কবিতায় :

আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললাম আকাশে
জ্বলে উঠলো আলো
পূবে পশ্চিমে
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম—সুন্দর
সুন্দর হল সে
মানুষের অহংকার পটেই
বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প।
... ...
সেই আমির গহনে, আলো-আঁধারের ঘটল সংগম
দেখা দিল রূপ, জেগে উঠল রস,
রেখায় রঙে সুখে দুঃখে।

তবু কবির স্পষ্টবোধ আছে তাঁর সুরের অপূর্ণতার :

আমার কবিতা জানি আমি
গেলেও বিচিত্রপথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।

কারণ,

সবচেয়ে দুর্গম যে-মানুষ আপন অন্তরালে
তার কোনো পরিমাপ নাই বাহিরের দেশেকালে।
সে অন্তরময়
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।

এই মানব-অভ্যুদয়কেই অভ্যর্থনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ ও রোঁলা তাই জন্মদিনে :

আমি বারংবার
তোমারে করিব নমস্কার।

আমিয়েলের ছিন্ন জর্নালের আলোকে রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের প্রতি ক্ষেত্রে জয়যাত্রার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। সে স্বাক্ষর কেবল সচেতন সাহিত্যকর্মে নয়, অর্ধমনস্ক বা অন্যমনস্ক সৃষ্টিতেও রয়েছে। পত্র রচনায় কবি যে অসামান্য শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়েছেন, তাই যথেষ্ট নয়; এর মধ্যে একটি অসাধারণ মনের অন্তরঙ্গ পরিচয় ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্র-পত্রসাহিত্য নিতান্ত কম নয়। তার মধ্যে যথার্থ পত্র-সাহিত্যের গৌরব দাবি করতে পারে: 'ছিন্নপত্র', 'ভানুসিংহের পত্রাবলী', 'চিঠিপত্র'। 'পত্রধারা'—উপদেশাবলীর সংকলন মাত্র। আর 'য়ুরোপের চিঠি', 'রাশিয়ার চিঠি', 'জাপানযাত্রী', 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়েরি', 'পথে ও পথের প্রান্তে'—পত্রাকারে ভ্রমণ-সাহিত্য এবং চিন্তাপ্রধান রচনাসংগ্রহ মাত্র; এগুলিতে সচেতন সজাগ দৃষ্টি, প্রত্যক্ষ সৃষ্টিচেতনা, সতর্ক পোশাকিয়ানা ও নৈর্ব্যক্তিকতা বর্তমান। তাই শেষোক্ত গ্রন্থনিচয় পত্র-সাহিত্যের মূল ধর্ম থেকে বিচ্যুত।

'ছিন্নপত্র', 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' ও 'চিঠিপত্র' (ছয় খণ্ড) যথার্থ পত্রসাহিত্য। খাঁটি পত্রে অন্তরঙ্গতা ও নিভৃতি, ঘরোয়া পরিবেশ ও সহজ সুর থাকা একান্তই প্রয়োজন। তা এই তিনটি সংকলনে আছে, বাকিগুলিতে নেই। আর এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'ছিন্নপত্র'। 'চিঠিপত্রে' পারিবারিক রবীন্দ্রনাথকে তাঁর আত্মীয়বন্ধুস্বজনের মধ্যে আমরা চিনে নিতে পারি। কৌতুকে, হাস্যপরিহাসে, সাংসারিক আসক্তি ও দুর্বলতার প্রকাশে, সাহিত্য-চিন্তা ও চর্চায়, বুদ্ধির দীপ্তিতে ও স্নেহের জ্যোতিতে এই সঙ্কলনটি উজ্জ্বল হয়ে আছে।

'ছিন্নপত্র' পারিবারিক হয়েও তার বাইরে চলে গেছে, ঘরোয়া হয়েও তা নির্বিশেষ, ব্যক্তিগত হয়েও তা বিশ্বগত। 'ছিন্নপত্রে' প্রবন্ধোচিত গাম্ভীর্য ও সতর্কসচেতনতা নেই—অনায়াস লঘুতা আছে, ব্যক্তিমানুষের পরিচয় আছে, পত্রলেখক ও প্রাপকের মধ্যে একটি সংযোগ ও উত্তাপের স্বাক্ষর আছে। কিন্তু এই-ই সব নয়। এ ছাড়াও কিছু আছে। রবীন্দ্রনাথের অন্তর্গূঢ় সাহিত্য-জীবনের মহত্তর পরিচয় 'ছিন্নপত্রে' বিধৃত হয়েছে; এখানেই তার গৌরব।

এই পত্রগুচ্ছ গদ্যসৌন্দর্যে স্বাদ-বৈচিত্র্যে কবিমানসের অন্তরঙ্গ সত্য পরিচয়-প্রকাশে মূল্যবান। 'ছিন্নপত্রে'র কালপরিধি দশ বৎসর বিস্তৃত—১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর থেকে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই দশ বৎসরে তরুণ যৌবনের বাউল-কবির শ্রেষ্ঠ সাহিত্যফসল অমরতার ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়েছে। এই পর্বে 'কড়ি ও কোমল', 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'চৈতালি', 'চিত্রাঙ্গদা', 'মায়ার খেলা', 'গোড়ায় গলদ', 'রাজা ও রাণী', 'মন্ত্রী-অভিষেক', 'গল্পগুচ্ছ' এবং অজস্র প্রবন্ধ ও 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়েরি' রচিত হয়েছে। এ সময়ে কবি 'হিতবাদী' ও 'সাধনা' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন।

'ছিন্নপত্রে' মোট ১৫২টি পত্র আছে। তার মধ্যে প্রথম তেরটি পাঁচ বৎসরের মধ্যে রচিত, বাকিগুলি চার বৎসরে লিখিত। ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা ও বন্ধুবর শ্রীশচন্দ্র মজুমদার পত্রপ্রাপক। উপরে উদ্ধৃত গ্রন্থগুলির সঙ্গে 'ছিন্নপত্রে'র সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। 'গল্পগুচ্ছ' ও 'সোনার তরী' 'চিত্রা'-'চৈতালী'র বহু কবিতা-গল্পের উৎস উপাদান ও পটভূমি 'ছিন্নপত্র'। 'ছিন্নপত্রে' সংসার-অভিজ্ঞ বিষয়ী হাস্যরসিক ঘরোয়া পরিবারকেন্দ্রিক স্নেহাসক্ত বন্ধুবৎসল রবীন্দ্রনাথের পরিচয় আছে। এহ বাহ্য। 'ছিন্নপত্রে'র এই বহিরঙ্গ বিবরণে তার মূল্য নির্ভর করে না, কবিমানসের অন্তরঙ্গ প্রকাশেই এর মূল্য।

২

'ছিন্নপত্রে'র প্রধান মূল্য এইখানে যে, তা রবীন্দ্রমানসের অন্তরঙ্গ পরিচয়টিকে উদ্‌ঘাটিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ

ব্যক্তিগত ব্যাপারে ও শিল্পসৃষ্টি ব্যাপারে সহজে কিছু বলতে চাইতেন না, এ কথা বিদগ্ধ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। শিল্পসৃষ্টির রঙ্গমঞ্চের অন্তরালে যে সাজঘর আছে, তার পট সরিয়ে ফেলে মূল উৎস বা উপাদানের পরিচয় দিতে রবীন্দ্রনাথের ছিল একান্ত অনীহা। কাব্যের মধ্যেই কবির শ্রেষ্ঠ পরিচয়; জীবনচরিতে, বাইরের ঘটনায় কবি-পরিচয়সন্ধান মূঢ়তা—এই ছিল তাঁর অভিমত। কবিজীবনের যেটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পর্ব—তরুণ যৌবনের কবির জীবনের পঁচিশ থেকে চল্লিশ বৎসর বয়সের পর্ব—সেটির কথা রবীন্দ্রনাথ বলতে চান নি। 'জীবনস্মৃতি' কবি রচনা করেছেন পঞ্চাশে উপনীত হয়ে, কিন্তু জীবনের প্রথম পঁচিশ বৎসরের কথা বলেই তিনি লেখনীর মুখ চেপে ধরেছেন, যৌবনের সিংহদ্বারে পাঠককে পৌঁছে দিয়ে সরে গেছেন। কবির এই আকস্মিক অন্তর্ধানে পাঠক যত বিস্মিত হয়, তার চেয়ে বেশী হয় তাদের আপসোস। 'কড়ি ও কোমলে'র রচয়িতা যে তরুণ যুবক কবি, তাঁর ব্যক্তিগত ও অন্তরঙ্গ জীবনের কোন কথাই রবীন্দ্রনাথ কবুল করেন নি। বায়রন বা গেটের পত্রাবলী ও আত্মজীবনীতে যে অন্তরঙ্গ গোপন কাহিনী ব্যক্ত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ তা কিছুই বলেন নি, 'জীবনস্মৃতি'তে যা অনুদ্ঘাটিত, তা 'ছিন্নপত্রে' উদ্ঘাটিত হয়েছে। পঁচিশ থেকে চৌত্রিশ বৎসর বয়সের রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ পরিচয় এখানে ছড়িয়ে আছে। সেদিক থেকে 'ছিন্নপত্রে'র একটি অনন্যসাধারণ গুরুত্ব আছে। কাব্যে যা অসম্পূর্ণ, আভাসে-ইঙ্গিতে ব্যক্ত, তা এখানে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হয়েছে। 'ছিন্নপত্রে'র মধ্যে এমন অনেক ইঙ্গিত আছে যা থেকে মধ্যযৌবনে উপনীত রবীন্দ্রনাথের মুখে অনেক কনফেশন শোনা যায়—যা আর কোথাও পাওয়া যায় না। অবশ্য 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথ নির্মমভাবে অনেক ছাঁটকাট করেছেন।

'ছিন্নপত্রে' যে রবীন্দ্রনাথকে পাই, তিনি সর্বদা সামাজিকতা রক্ষা করে চলেন নি। সভ্যতা, শিষ্টতা, সমাজ-সংস্কার, তত্ত্ব-প্রচার, ধর্ম-ব্যাখ্যান—এ সবই বাইরের, কবির আন্তরতৃপ্তি এসবের দ্বারা ঘটে না। 'হিতবাদী' ও 'সাধনা' সম্পাদনা বা মাসের পর মাস লেখা যুগিয়ে যাওয়া—কিছুই না, ব্যর্থ পরিশ্রম, অথবা বিষয়-কর্ম—নিতান্ত অসারকর্ম। এই ধরনের চিন্তা 'ছিন্নপত্রে' মাঝে মাঝে আকস্মিকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ৮, ১৩, ১৫, ২২, ৫১, ৫২, ৬৯, ৮৪, ৮৫, ৯২, ৯৬, ১০৩, ১০৪, ১১০, ১৩৫, ১৩৬, ১৫০-সংখ্যক পত্র তার পরিচয়স্থল।

কয়েকটি যদৃচ্ছা-উদ্ধৃত মন্তব্য এর পোষকতা করবে:

(ক) ইচ্ছা করছে, শীতটা ঘুচে গিয়ে প্রাণ খুলে বসন্তের বাতাস দেয়—আচকানের বোতামগুলো খুলে একবার খোলা জালিবোটের উপর পা ছড়িয়ে দিই এবং কর্তব্যের রাস্তা ছেড়ে দিনকতক সম্পূর্ণ অকেজো কাজে মন দিই। বছরের ছ মাস আমি এবং ছ মাস আর কেউ যদি সাধনার সম্পাদক থাকে তা হলেই ঠিক সুবিধামত বন্দোবস্ত হয়। কারণ, সম্বৎসর খেপামি করবার ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই এবং সম্বৎসর অপ্রমত্ততা বজায় রেখে চলা আমার মতো লোকের দুঃসাধ্য। (১৩৫-সং পত্র)

(খ) আমার দিনগুলিকে রথীর কাগজের নৌকার মতো একটি একটি করে ভাসিয়ে দিচ্ছি। কেবল মাঝে মাঝে একটি-আধটি গান তৈরি করছি এবং শরৎকালের প্রহরগুলির মধ্যে কুণ্ডলায়িত হয়ে পড়ে আছি। এই অপর্যাপ্ত জ্যোতির্ময় নীলাকাশ আমার হৃদয়ের মধ্যে অবনত হয়ে পড়েছে, আলোক রক্তের মধ্যে প্রবেশ করছে, সর্বব্যাপী শুভ্রতা আমার বক্ষকে দুই হাতে বেষ্টন করে ধরেছে, একটি সকরুণ শান্তি আমার ললাটের উপর চুম্বন করছে।...এর পরে কর্ম যখন আবার আমাকে একবার হাতে পাবেন তখন টুটি চেপে ধরবেন; তখন আমার এই ঘরের লোকটি, আমার এই ছুটির কর্ত্রী কোথায় থাকবেন তাঁর আর উদ্দেশ পাওয়া যাবে না। প্রায় মাঝে মাঝে মনে করি সাধনার লেখার ঝুড়ি পদ্মার জলে ভাসিয়ে দেব; কিন্তু জানি, ভাসিয়ে দিলেও সে আমাকে তার পিছন পিছন টেনে নিয়ে চলবে। (১৫০-সং পত্র)।

(গ) কলকাতাটা বড় ভদ্র এবং বড় ভারী, গবর্মেণ্টের আপিসের মত। জীবনের প্রত্যেক দিনটাই যেন একই আকারে একই ছাপ নিয়ে টাঁকশাল থেকে তক্‌তকে

হয়ে কেটে কেটে বেরিয়ে আসছে—নীরস মৃত দিন, কিন্তু খুব ভদ্র এবং সমান ওজনের। এখানে [পতিসর] প্রত্যেক দিন আমার নিজের দিন—নিত্যনিয়মিত-দম-দেওয়া কলের সঙ্গে কোনো যোগ নেই। আমার আপনার মনের ভাবনাগুলি এবং অখণ্ড অবসরটিকে হাতে করে নিয়ে মাঠের মধ্যে বেড়াতে যাই—সময় কিম্বা স্থানের মধ্যে কোনো বাধা নেই। সন্ধেটা জলে স্থলে আকাশে ঘনিয়ে আসতে থাকে—আমি মাথাটি নিচু করে আস্তে আস্তে বেড়াতে থাকি। (৯৮-সং পত্র)

এই তিনটি উদ্ধৃতি থেকেই বন্ধন-অসহিষ্ণু প্রকৃতিপ্রেমী সামাজিকতা-বিরোধী কবিকে চিনে নিতে পারি। এই ধরনের স্বীকৃতি আর কোথাও পাওয়া যাবে না। তরুণ যৌবনের উদাসী বাউল এখানে বিরল মুহূর্তে নিজেকে প্রকাশ করেছেন।

'ছিন্নপত্রে'র মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যে পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে, তা আত্মসন্ধানী প্রকৃতিপ্রেমী রবীন্দ্রনাথের পরিচয়। কবির আত্ম-জিজ্ঞাসা ও নিসর্গ-জিজ্ঞাসা—'ছিন্নপত্রে'র এই দুটি মূল সুর। সাহিত্যজীবনে কবি যে নতুন জগতে প্রবেশ করছেন, যেখানে 'সোনার তরী'-'চিত্রা'-'চৈতালী'-'গল্পগুচ্ছে'র নিবিশেষ সৌন্দর্য-সন্ধান ও সবিশেষ মর্তমমতা অপূর্ব রূপলাবণ্যে আবিষ্কারের আনন্দে ও বিষয়ে পরিপূর্ণ নবতর সৌন্দর্যলোক রচনা করেছে, 'ছিন্নপত্রে' তারই স্পষ্ট স্বাক্ষর মুদ্রিত হয়েছে।

কবির আত্মপরিচয় এখানে প্রকট। তিনি বলেছেন, "সাধনাই লিখি আর জমিদারিই দেখি, যেমনি কবিতা লিখতে আরম্ভ করি অমনি আমার চিরকালের যথার্থ আপনার মধ্যে প্রবেশ করি—আমি বেশ বুঝতে পারি এই আমার স্থান। জীবনে জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে অনেক মিথ্যাচরণ করা যায়, কিন্তু কবিতায় কখনও মিথ্যা কথা বলি নে—সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থান।" (৮০-সং পত্র)

'ছিন্নপত্র' এই আত্মস্বীকৃতির আলোকে উজ্জ্বল হয়ে আছে, রবীন্দ্রমানসের মর্মকোষের পরিচয় এখানে উদ্ঘাটিত হয়েছে।

৩

'ছিন্নপত্রে'র শতকরা আশিটি পত্রের রচনাস্থল পদ্মাবক্ষ। কবি তখন জমিদারি পরিদর্শন উপলক্ষে মধ্যবঙ্গের হৃদয়দেশে পদ্মা ও তার শাখানদীগুলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। গত শতকের শেষ দশকে রবীন্দ্রনাথ পদ্মাপ্রকৃতি থেকেই নিরুদ্দেশ সৌন্দর্য ও মানবিক সত্যের প্রেরণা গ্রহণ করেছিলেন। পদ্মা, যমুনা, আত্রেয়ী, নাগর, বড়ল, গোরাই ও ইছামতী নদীর কলধ্বনি সেদিনের গল্পে-কবিতায়-গানে শোনা যায়। পদ্মার জন্য কেবল ব্যাকুলতা নয়, তীব্র ভালবাসা ও সেই সঙ্গে আশঙ্কামিশ্রিত আকর্ষণও কবি অনুভব করেছেন। তা 'ছিন্নপত্র'পাঠে অনুভব করা যায়। আর এর মধ্যেই তিনি কাব্যজীবনের নবতর অভিজ্ঞতালোকে পদার্পণ করেছেন। 'সোনার তরী' 'চিত্রা'র যে প্রকৃতিপ্রেম, তা বাংলা কাব্যে ও রবীন্দ্রকাব্যে অনাস্বাদিত প্রেম। এই প্রেমে বাংলা কাব্যের নবজন্ম হয়েছে। 'ছিন্নপত্র' এই প্রেমের প্রাথমিক খসড়া।

নিঃসঙ্গ রবীন্দ্রনাথকে সেদিন সঙ্গ দিয়েছে চঞ্চলা পদ্মা—সুখদুঃখভরা গ্রামগুলি, নির্জন বালুচর, সুনীল আকাশ, রহস্যময় মধ্যাহ্ন ও মোহিনী সন্ধ্যা। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সেই মন্তব্যটি অনিবার্যরূপে মনে পড়ে, সেটি উদ্ধার করার লোভ সংবরণ করা দুঃসাধ্য। "আমি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা মানি নি, কতবার সমস্ত বৎসর ধরে পদ্মার আতিথ্য নিয়েছি—বৈশাখের খররৌদ্রতাপে, শ্রাবণের মুষলধারাবর্ষণে। পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামশ্রী, এপারে ছিল বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ জনহীনতা, মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানাবর্ণের আলোছায়ার তুলি। এইখানে নির্জনসজনের নিত্যসংগম চলেছিল আমার জীবনে।" (রচনাবলী সংস্করণ, 'সোনার তরী'র ভূমিকা)

পদ্মাপ্রকৃতিই এ সময়ে কবির নিত্যসঙ্গী, প্রেরণাদায়িনী, মানসী। সেইসঙ্গে যে-কটি গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের নিত্যসঙ্গী ছিল, তার মধ্যে প্রধান হল 'আমিয়েলের জর্নাল'। 'ছিন্নপত্রে' কবি স্বীকার করেছেন, "আমার একটি নির্জনের প্রিয়বন্ধু জুটেছে—আমি লোকেনের ওখান থেকে তার একখানা

Amiel's Journal ধার করে এনেছি, যখনই সময় পাই সেই বইটা উল্টে-পাল্টে দেখি ; ঠিক মনে হয়, তার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে কথা কচ্ছি ; এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু আর খুব অল্প ছাপার বইয়ে পেয়েছি। অনেক বই এর চেয়ে ভাল লেখা আছে এবং এই বইয়ের অনেক দোষ থাকতে পারে। কিন্তু এই বইটি আমার মনের মত। অনেক সময় আসে যখন সব বই ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফেলে দিতে হয়, কোনটা ঠিক আরামের বোধ হয় না—যেমন রোগের সময় অনেক সময় ঠিক আরামের অবস্থাটি পাওয়া যায় না, নানা রকমে পাশ ফিরে দেখতে ইচ্ছে করে ; কখনও বালিশের উপর বালিশ চাপাই, কখনও বালিশ ফেলে দিই—সেই রকম মানসিক অবস্থায় আমিয়েলের যেখানেই খুলি সেখানেই মাথাটি ঠিক গিয়ে পড়ে, শরীরটা ঠিক বিশ্রাম পায়।" (১০১-সং পত্র)

আমিয়েলকে কবি বলেছেন 'নির্জনের প্রিয় বন্ধু', 'অন্তরঙ্গ বন্ধু'। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সাক্ষ্য দিয়েছেন, "এই গ্রন্থখানি কবির খুব ভাল লাগে, বহুবার ইহার কথা তাঁহার মুখে শুনিয়াছি।" ('রবীন্দ্রজীবনী,' ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃ. ৩০০) জেনিভাবাসী কবি-দার্শনিক-অধ্যাপক আঁরি ফ্রেডরিক আমিয়েল (১৮২১-১৮৮১) তাঁর 'জর্নাল ইন্‌টাইম' গ্রন্থের দ্বারা পদ্মাবিহারী রবীন্দ্রনাথের উপর কী গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তা আলোচনার যোগ্য। এই জর্নালের আলোকে 'ছিন্নপত্র' পাঠ করলে আমরা নতুন করে 'ছিন্নপত্র' ও পত্ররচয়িতা—উভয়কেই চিনে নিতে পারি।

আমিয়েল ব্যক্তিগত জীবনে ও সাহিত্যজীবনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। জেনিভার এই বিদগ্ধ অধ্যাপক সৌন্দর্য-দর্শন সম্পর্কে ভাষণমালা ও কিছু কবিতা রচনা করেন। কিন্তু তা থেকে তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন নি। মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধু মঁসিঅ শেরার তাঁর ডায়েরি সম্পাদনা করে Journal Intime ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে জেনিভাতে প্রকাশ করেন। ১৮৪৮ থেকে ১৮৮১—এই চৌত্রিশ বৎসরের দিনলিপি থেকে নির্বাচিত অংশ এই গ্রন্থ। সুইজারল্যাণ্ড ও জার্মানি—এই দুই দেশে রচিত দিনলিপিতে একটি বিদগ্ধ প্রকৃতিপ্রেমী সংস্কৃতিবান মনের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় ; অনুবাদিকা মিসেস্ হামফ্রি ওয়র্ড। দ্বিতীয় বর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে। লোকেন্দ্রনাথ পালিত এই সংস্করণটি রবীন্দ্রনাথকে দেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থ সম্পর্কে উপরোক্ত স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। ১৮৯১ থেকে ১৯০০—এই দশ বৎসর কবি মধ্যবঙ্গে বাস করেন, তারপর পত্নীর আপত্তিতে শিলাইদহের বাস উঠিয়ে বোলপুরে চলে যান। এই পর্বে 'আমিয়েলের জর্নাল' রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী ছিল। 'ঘরেবাইরে' উপন্যাসে (১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে সবুজপত্রে প্রথম প্রকাশিত) 'আমিয়েলের জর্নালে'র দুবার উল্লেখ আছে ; নিখিলেশ বইটির ভক্ত ছিলেন।

আমিয়েলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও সাহিত্যকর্মে অনেক মিল আছে, বহুতর অমিলও আছে। উভয়ের জীবনে কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। উভয়েই কবি-দার্শনিক, উভয়েই অন্তর্মুখী, উভয়েই প্রকৃতিপ্রেমী। সমাজ ও দেশের আহ্বানে, রাজনীতিতে ও দর্শনালোচনায় উভয়েই সাড়া দিয়েছেন, কিন্তু তার থেকে সরে গিয়ে উভয়েই হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন। বাল্যকালে উভয়েই নির্জনতাপ্রিয় রোমান্টিক কিশোর ছিলেন। যৌবনে উভয়েই বিষাদ ও বৈরাগ্য, ঔদাস্য ও রোমান্টিক ব্যাকুলতার কবলে পড়েছেন এবং তার থেকেই মহৎ সাহিত্যকর্মের জন্ম হয়েছে। উভয়েই পত্ররচনায় নিপুণ ছিলেন ; ভ্রমণে ও প্রকৃতি-সঙ্গে উভয়েরই প্রবল আসক্তি ছিল। উভয়েই বারবার হতাশা ও নিষ্ফলতার দ্বারা পিষ্ট হয়েছেন এবং প্রকৃতি-সঙ্গে নবজীবন ও নবীন আশায় উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করেছেন। উভয়েরই কবিতা ও দিনলিপি-পত্রে ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। জ্ঞানের নানাক্ষেত্রে উভয়েরই স্বচ্ছন্দ বিচরণ ছিল।

অমিল এইখানে যে, আমিয়েল ষাট বৎসরের জীবনে বিশেষ কিছুই লিখতে পারেন নি, রবীন্দ্রনাথ আশী বৎসরের জীবনে অজস্র সহস্রবিধ রচনায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। আমিয়েল নিষ্ফলতা ও আলস্যের সহস্র সঞ্চয় নিয়ে গত হয়েছেন, সাহিত্যিক বন্ধ্যাদশায় রাহুগ্রস্ত হয়েছেন, নিঃসঙ্গ

কৌমার্যের দুঃসহ ভার ও বেদনা বহন করেছেন, মঁসিঅ শেরারের কথায়—"আমরা ঠিক বুঝতে পারি না এত শক্তিসম্পন্ন লেখকের পক্ষে তুচ্ছ অথবা কিছুই সৃষ্টি করা সম্ভব হল না কেন ?" অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথ সংসারে ও সমাজে কর্মীরূপে দেখা দিয়েছেন, জীবনের সর্বক্ষেত্রে সহস্র কর্মের বন্ধনে ধরা দিয়েছেন, আবার এই বন্ধনকে মুহূর্তেই অস্বীকার করে সাহিত্যক্ষেত্রে স্বর্ণপ্রসবী লেখনী নিরন্তর চালনা করেছেন, সমস্ত পৃথিবী পর্যটন করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত সকল দুঃখ হতাশা ও ঔদাস্যের উপরে তাঁর মানবপ্রেম ও প্রকৃতিপ্রেম জয়লাভ করেছে। 'আমিয়েলের জর্নাল' তাঁর সাতাশ বৎসর থেকে ষাট বৎসর বয়স (মৃত্যুকাল) পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রচিত গোপন দিনলিপির নির্বাচিত সংকলন এবং মৃত্যুর পর প্রকাশিত; জীবদ্দশায় এগুলির প্রকাশ আমিয়েলের অভিপ্রেত ছিল না। অপরপক্ষে 'ছিন্নপত্র' রবীন্দ্রনাথের চব্বিশ থেকে চৌত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত দশ বৎসরের কাল-পরিধির মধ্যে লিখিত, আত্মীয় ও বন্ধুদের উদ্দেশে প্রেরিত, সামাজিক-পারিবারিক পরিবেশের প্রতি সচেতন থেকে রচিত এবং লেখকের জীবদ্দশায় ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। 'জর্নাল ইন্‌টাইম'-এ একটি অনুভূতিপ্রবণ অতিসচেতন বিদগ্ধ মানসের তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব ও দর্শনজিজ্ঞাসার পরিচয়ই প্রধান; 'ছিন্নপত্রে' একটি তরুণ কবিমানসের আত্মজিজ্ঞাসা ও নিসর্গজিজ্ঞাসা রয়েছে, কিন্তু এখানে প্রাধান্য পেয়েছে প্রকৃতিপ্রেমী মনের নির্বিশেষ সৌন্দর্যসন্ধান ও সবিশেষ মর্তমমতা।

৪

'ছিন্নপত্রে' দেখি নির্জনসজনের নিত্যসংগমে জাত প্রকৃতিপ্রেম—তার একদিকে পদ্মা, অপরদিকে পদ্মাতীরের জনপদ; একদিকে নির্বিশেষ সৌন্দর্যসন্ধান—'সোনার তরী' 'চিত্রা,' অপরদিকে সবিশেষ মর্তমমতা—'গল্পগুচ্ছ'। 'জর্নাল ইনটাইম'-এ একটি মহৎ প্রতিশ্রুতিসমৃদ্ধ কবি-মানসের অপমৃত্যু; অস্তিত্বের জিজ্ঞাসায় পীড়িত মানবাত্মার আর্তনাদ। এখানেই 'ছিন্নপত্র' 'আমিয়েলের জর্নাল' থেকে ভিন্নতর। জর্নালে আমিয়েলের খ্রীষ্টীয় ধর্মবোধ অতি প্রবল, 'ছিন্নপত্রে' ধর্মবোধ কখনই প্রকট নয়।

জর্নাল পড়লে মনে হয় একজন স্বর্গভ্রষ্ট দেবকুমারের আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছি: "যে মুহূর্তে একটি বস্তু আমাকে আকর্ষণ করে, আমি সে মুহূর্তে তা থেকে সরে যাই, কেন-না অপেক্ষাকৃত-ভাল দ্বিতীয়ে আমার মন ওঠে না; আমার আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিদায়ক কিছু আমি আবিষ্কার করতে পারি না। বাস্তব আমাকে হতাশ করে, আর আদর্শকে খুঁজে পাই না।" আদর্শ সৌন্দর্য-সন্ধানে এই বেদনা ও বাস্তবের কঠিন আঘাতে মোহভঙ্গ প্রত্যেক মহৎ শিল্পীরই কথা। সংসার, প্রেম, বিবাহ, জীবনসঙ্গিনী—এ সবই আমিয়েলকে আকর্ষণ করেছে, কিন্তু হায়, সে সাধ কখনও পূরণ হয় নি, তাই জর্নালে ধ্বনিত হয়েছে এই ক্রন্দন: "বাস্তব, বর্তমান, অপ্রতিকার্য পরিস্থিতি ও প্রয়োজন আমাকে প্রতিনিবৃত্ত এমন কি ভীত করে তোলে। কল্পনা, বিবেকবুদ্ধি ও সূক্ষ্মবুদ্ধি আমার প্রচুর পরিমাণে আছে। কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ চরিত্রবলের অভাব আছে। কেবল চিন্তাসমৃদ্ধ জীবনই আমার কাছে স্থিতিস্থাপকতা ও অসীমতায় পূর্ণ বলে মনে হয়—এর দ্বারা আমি অপ্রতিকার্য অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করি। বাস্তব জীবন আমাকে ভীত করে তোলে। অহং জীবন ও সুখকে আমি আমারই কারণে বিশ্বাস করি না। আদর্শ আমার সকল অসম্পূর্ণ অধিকারকে বিনষ্ট করে এবং আমি সকল মূল্যহীন দুঃখ ও অনুতাপকে ঘৃণা করি।" (৬ এপ্রিল, ১৮৫১ সনের দিনলিপি, জেনিভা) এখানেই আমিয়েলের ট্রাজেডি। এই অশান্ত আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মবিশ্বাসের শোচনীয় অভাব ও বাস্তবের অপূর্ণতার গভীর বেদনা আমিয়েলের সমস্ত প্রতিশ্রুতিকে বিনষ্ট করেছে এবং শেষ পর্যন্ত বিশেষ কিছুই তিনি সৃষ্টি করে যেতে পারেন নি। 'আমিয়েলের জর্নালে' খ্রীষ্টীয় নীতি-বোধ, মায়া, ব্রহ্ম, কর্ম, পাপ, পুণ্য সম্পর্কে গুরু আলোচনা মনের ওপর দুঃসহ ভারের মত চেপে বসে।

আমাদের অশেষ সৌভাগ্য যে, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই দুঃখকর ট্রাজেডি ঘটে নি। বাস্তবের অপূর্ণতায়

তিনিও বেদনা পেয়েছেন, নিরুদ্দেশ সৌন্দর্য-সন্ধানে ব্যাকুল হয়েছেন, আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে যোগসাধনের ব্যর্থতায় পীড়িত হয়েছেন, কিন্তু সুগভীর মানবপ্রেম তাঁকে রক্ষা করেছে। ৮৪, ৮৮, ৯৬, ১০৩, ১০৪, ১১০, ১১৫, ১১৭, ১২৩, ১২৪, ১৩৮-সংখ্যক পত্রে এই আশঙ্কা ব্যর্থতা ও অশান্তির পরিচয় পাই। কিন্তু তা স্থায়ী হয়ে কবিমনে মুদ্রিত হয়ে যায় নি, তার প্রমাণ পাই ২৬, ৮৫, ১১২, ১১৬, ১২০, ১২২, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৯-সংখ্যক পত্রে। শেষোক্ত পত্রগুলিতে আশ্বাস ও সান্ত্বনা পাই। অস্তিত্ব-সম্পর্কিত গুরু আলোচনা এখানে 'আমিয়েলের জর্নালে'র মত সৌন্দর্যসম্ভোগের পথে বাধা উপস্থিত করে নি।

'ছিন্নপত্রে'র একদিকে হতাশা ও নিষ্ফলতার বেদনা ধ্বনিত হয়ে ওঠে, অপর দিকে সুগভীর ধরণীপ্রীতি ও মানবপ্রেম বড় হয়ে ওঠে।

কী আশ্চর্য আত্মস্বীকৃতি:

(ক) যখন মনে করি, জীবনের পথ সুদীর্ঘ, দুঃখকষ্টের কারণ অসংখ্য এবং অবশ্যম্ভাবী, তখন এক-এক সময় মনের বল রক্ষা করা প্রাণপণ কঠিন হয়ে পড়ে।...জীবনে একটা প্যারাডক্স প্রায়ই দেখা যায় যে, বড় দুঃখের চেয়ে ছোট দুঃখ যেন বেশী দুঃখকর। তার কারণ, বড় দুঃখে হৃদয়ের যেখানটা বিদীর্ণ হয়ে যায় সেইখান থেকেই একটা সান্ত্বনার উৎস উঠতে থাকে; মনের সমস্ত দলবল, সমস্ত ধৈর্যবীর্য এক হয়ে আপনার কাজ করতে থাকে; তখন দুঃখের মাহাত্ম্য দ্বারাই তার সহ্য করবার শক্তি বেড়ে যায়।...ছোট দুঃখের কাছে আমরা কাপুরুষ কিন্তু বড় দুঃখ আমাদের বীর করে তোলে, আমাদের যথার্থ মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করে দেয়। তার ভিতরে একটা সুখ আছে। (১০৩-সং পত্র)

(খ) আমার বিশ্বাস, আমাদের প্রীতিমাত্রই রহস্যময়ের পূজা; কেবল সেটা আমরা অচেতনভাবে করি। ভালবাসা মাত্রই আমাদের ভিতর দিয়ে বিশ্বের অন্তরতম একটি শক্তির সজাগ আবির্ভাব, যে নিত্য আনন্দ নিখিল জগতের মূলে সেই আনন্দের ক্ষণিক উপলব্ধি। নইলে ওর কোনও অর্থই থাকে না। (১১৫-সং পত্র)

(গ) [বেদান্ত বলেন] সৃষ্টি একেবারেই নেই, আমরাও নেই, আছেন কেবল ব্রহ্ম, আর মনে হচ্ছে যেন আমরা আছি। আশ্চর্য এই, মানুষ মনে একথা স্থান দিতে পারি। আরও আশ্চর্য এই, কথাটা শুনতে যত অসঙ্গত আসলে তা নয়—বস্তুত কিছুই যে আছে সেইটে প্রমাণ করাই শক্ত। যাই হোক, আজকাল সন্ধ্যাবেলায় যখন জ্যোৎস্না ওঠে এবং আমি যখন অর্ধনিমীলিত চোখে বোটের বাইরে কেদারায় পা ছড়িয়ে বসি, স্নিগ্ধ সমীরণ আমার চিন্তাক্লান্ত তপ্ত ললাট স্পর্শ করতে থাকে, তখন এই জল স্থল আকাশ, এই নদীকল্লোল, ডাঙার উপর দিয়ে কদাচিৎ এক-আধজন পথিক ও জলের উপর দিয়ে কদাচিৎ এক-আধখানা জেলেডিঙির গতায়াত, জ্যোৎস্না-লোকে অপরিস্ফুট মাঠের প্রান্ত, দূরে অন্ধকারজড়িত বনবেষ্টিত সুপ্তপ্রায় গ্রাম—সমস্তই ছায়ারই মতো, মায়ারই মতো বোধ হয়, অথচ সে মায়া সত্যের চেয়ে বেশী সত্য হয়ে জীবনমনকে জড়িয়ে ধরে, এবং এই মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়াই যে মুক্তি একথা কিছুতেই মনে হয় না। (১১৭-সং পত্র)

(ঘ) আমি অনেক সময় ভেবে দেখেছি, সুখী হলুম কি দুঃখী হলুম সেইটে আমার পক্ষে শেষ কথা নয়। আমাদের অন্তরতম প্রকৃতি সমস্ত সুখদুঃখের ভিতরে নিজের একটা প্রসার অনুভব করতে থাকে।...আমাদের ক্ষণিক জীবনই সুখদুঃখ ভোগ করে; আমাদের চিরজীবন সেই সুখ-দুঃখ নেয় না, তার থেকে একটা তেজ সঞ্চয় করে। (১২৩-সং পত্র)

(ঙ) নিজের সেই সুগভীর স্বপ্নাবিষ্ট বাল্যকালের উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনার কথা মনে পড়ছে—খুব বেশী দিনের কথা বলে তো মনে হচ্ছে না—অথচ এবারকার মানবজন্মের অর্ধেক দিন তো চলে গেছেই। আমরা প্রত্যেক মুহূর্ত মাড়িয়ে মাড়িয়ে জীবনটা সম্পূর্ণ করি। কিন্তু মোটের উপরে সবটা খুবই ছোট; দুটি ঘণ্টা কালের নির্জন চিন্তার মধ্যে সমস্তটাকে ধারণ করা যেতে পারে।...আজকের আমার এই একলা বোটের দুপুরবেলাকার মনের ভার এই একটা দিনের কুঁড়েমি সেই কয়েকখানা পাতার মধ্যে

কোথায় বিলুপ্ত হয়ে থাকবে। এই নিস্তরঙ্গ পদ্মাতীরের নিস্তব্ধ বালুচরের উপরকার নির্জন মধ্যাহ্নটি আমার অনন্ত অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যতের মধ্যে কি কোথাও একটি ক্ষুদ্র সোনালি রেখার চিহ্ন রেখে দেবে! (১৩৮-সং পত্র)

(চ) যতক্ষণ অপূর্ণতা ততক্ষণ অভাব, ততক্ষণ দুঃখ থাকবেই। জগৎ যদি জগৎ না হয়ে ঈশ্বর হত তা হলেই কোথাও কোনো খুঁত থাকত না—কিন্তু ততটা দূর পর্যন্ত দরবার করতে সাহস হয় না। ভেবে দেখলে সকল কথাই গোড়ায় গিয়ে ঠেকে যে, সৃষ্টি হল কেন—কিন্তু সেটা সম্বন্ধে কোনও আপত্তি যদি না করা যায়, তা হলে জগতে দুঃখ রইল কেন এ নালিশ উত্থাপন করা মিথ্যা। সেই জন্যে বৌদ্ধেরা একেবারে গোড়া ঘেঁষে কোপ মারতে চায়; তারা বলে যতক্ষণ অস্তিত্ব আছে ততক্ষণ দুঃখের সংশোধন হতে পারে না, একেবারে নির্বাণ চাই। খ্রীষ্টানরা বলে দুঃখটা খুব উচ্চ জিনিস, ঈশ্বর স্বয়ং মানুষ হয়ে আমাদের জন্য দুঃখ বহন করছেন। কিন্তু নৈতিক দুঃখ এক, আর পাকা ধান ডুবে যাওয়ার দুঃখ আর। আমি বলি, যা হয়েছে বেশ হয়েছে; এই-যে আমি হয়েছি এবং আশ্চর্য জগৎ হয়েছে, বড় তোফা হয়েছে—এমন জিনিসটা নষ্ট না হলেই ভাল। বুদ্ধদেব তদুত্তরে বলেন, এ জিনিসটা যদি রক্ষা করতে চাও তা হলে দুঃখ সইতে হবে। আমি নরাধম তদুত্তরে বলি, ভাল জিনিস এবং প্রিয় জিনিস রক্ষা করতে যদি দুঃখ সইতে হয় তা হলে দুঃখ সব—তা আমি থাকি আর আমার জগৎটি থাকুক; মাঝে মাঝে অন্নবস্ত্রের কষ্ট, মনঃক্ষোভ, নৈরাশ্য বহন করতে হবে, কিন্তু সে দুঃখের চেয়ে যখন অস্তিত্ব ভালবাসি এবং অস্তিত্বের জন্যই সে দুঃখ বহন করি তখন তো আর কোনো কথা বলা শোভা পায় না। (৮৮-সং পত্র)

(ছ) যত বিচিত্র রকমের কাজ হাতে নিচ্ছি ততই কাজ জিনিসটার 'পরে আমার শ্রদ্ধা বাড়ছে। কর্ম যে অতি উৎকৃষ্ট পদার্থ সেটা কেবল পুঁথির উপদেশরূপেই জানতুম। এখন জীবনেই অনুভব করছি কাজের মধ্যেই পুরুষের যথার্থ চরিতার্থতা; কাজের মধ্য দিয়েই জিনিস চিনি, মানুষ চিনি, বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে সত্যের সঙ্গে মুখামুখি পরিচয় ঘটে।...কঠিন কর্মক্ষেত্রে মর্মান্তিক শোকেরও অবসর নেই। অবসর নিয়েই বা ফল কী। কর্ম যদি মানুষকে বৃথা অনুশোচনার বন্ধন থেকে মুক্ত করে সম্মুখের পথে প্রবাহিত করে নিয়ে যেতে পারে, তবে ভালই তো। যে মেয়ে মরে গেছে তার জন্যে শোক ছাড়া আর কিছুই করতে পারি নে, যে ছেলে বেঁচে আছে তার জন্যে ছোট বড় সব কাজই তাকিয়ে আছে। কাজের সংসারের দিকে চেয়ে দেখি, কেউ চাকরি করছে, কেউ ব্যবসা করছে, কেউ চাষ করছে, কেউ মজুরি করছে; অথচ এই প্রকাণ্ড কর্মক্ষেত্রের ঠিক নীচে দিয়েই প্রত্যহ কত মৃত্যু, কত দুঃখ গোপনে অন্তঃশীলা বহে যাচ্ছে, তার আবরু নষ্ট হতে পারছে না—যদি সে অসংযত হয়ে বেরিয়ে আসত তা হলে কর্মচক্র একেবারেই বন্ধ হয়ে যেত। ব্যক্তিগত শোকদুঃখটা নীচে দিয়ে ছোটে, আর উপরে অত্যন্ত কঠিন পাথরের ব্রিজ বাঁধা, সেই ব্রিজের উপর দিয়ে লক্ষলোকপূর্ণ কর্মের রেলগাড়ি আপন লৌহপথে হুহুঃ-শব্দে চলে যায়, নির্দিষ্ট স্টেশনটি ছাড়া আর কোথাও কারো খাতিরে মুহূর্তের জন্যে থামে না। কর্মের এই নিষ্ঠুরতায় মানুষের কঠোর সান্ত্বনা। (১৪৭-সং পত্র)

আমিয়েল যেখানে বাস্তবের অপূর্ণতা ও দুঃখে বেদনার্ত হয়েছেন, বলেছেন, "বাস্তব, বর্তমান, অপ্রতিকার্য পরিস্থিতি ও প্রয়োজন আমাকে প্রতিনিবৃত্ত এমন কি ভীত করে তোলে" সেখানে রবীন্দ্রনাথের এই মহৎ কঠোর পবিত্র সান্ত্বনা আমাদের আশ্বস্ত করে। 'আমিয়েলের জর্নালে' এ ধরনের দিনলিপি পড়ে আমাদের মন ক্লিষ্ট হয়, 'ছিন্নপত্র' আমাদের সান্ত্বনা দেয়, সংসারের কঠিন কর্তব্যের মুখোমুখি হতে বল দান করে।

৫

'আমিয়েলের জর্নাল' তাঁর জীবনব্যাপী ব্যর্থতা দুর্বলতা পরাজয়ের ট্রাজিক ইতিহাস। 'ছিন্নপত্র' সেক্ষেত্রে মর্ত-মমতা ও জীবনপ্রীতির টেস্টামেণ্ট। আমিয়েল পরিবেশের কাছে হার মেনেছেন, রবীন্দ্রনাথ তার ওপর জয়লাভ করেছেন। আমিয়েলের সকল ব্যর্থতা ও দুর্বলতা

দূর হয়ে গেছে সেই মুহূর্তে যখন তিনি প্রকৃতিপ্রেমে উজ্জীবিত হয়েছেন। মধ্য ইয়োরোপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যরস আমিয়েল দু হাতে অঞ্জলি ভরে আকণ্ঠ পান করেছেন, আর সেখানেই তিনি রবীন্দ্রনাথের সমধর্মী। বোধ করি এ কারণেই রবীন্দ্রনাথ আমিয়েলকে তাঁর 'নিত্যসঙ্গী', 'অন্তরঙ্গ বন্ধু' বলে অভিহিত করেছেন। উভয়েই প্রকৃতির প্রতি আলিঙ্গনের ব্যগ্র বাহু বিস্তার করেছেন এবং ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনে তাকে বেঁধেছেন। প্রকৃতির মধ্যে একটি লাবণ্যময়ী দিব্যসত্তার উপস্থিতি উভয়েই অনুভব করেছেন। এখানেই উভয়েই প্রকৃতির অন্তরসত্তাকে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করেছেন।

সুইজারল্যাণ্ডের নীল আকাশ, আল্পস্ হিমাদ্রি এবং শান্ত 'লেক'সমূহ আমিয়েলের মনোহরণ করেছে, তপ্ত-মধুর এপ্রিলের বাসন্তী দিনগুলি সুধায় ভরে তাঁর কাছে এসেছে, তিনি আকণ্ঠ সে সুধা পান করেছেন। কী গভীর আনন্দ এই সব রঙিন দিনগুলি বহন করে এনেছে, তার পরিচয় জর্নালের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। জেনিভাতে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ এপ্রিলের দিনলিপিতে আমিয়েল লিখছেন: "আমি আজ সকালে মনের উপর আবহাওয়ার আশ্চর্য প্রতিক্রিয়া অনুভব করেছি। নিজেকে ইতালীয়ান বা স্পেনীয় বলে মনে হল। এই নীল স্বচ্ছ আকাশে দক্ষিণায়নের সূর্যালোকে প্রাচীরগুলি তোমার দিকে তাকিয়ে হাসছে বলে মনে হবে। চেস্টনাট গাছগুলি উৎসব-সাজে সেজেছে। তাদের শাখাপ্রান্তে দ্যুতিমান কুঁড়িগুলি ছোট ছোট আলোকশিখার মত দীপ্তি বিকিরণ করছে, মনে হয় তারা যেন অনন্ত প্রকৃতির বসন্ত-উৎসবের উজ্জ্বল দীপাবলী। সব কিছুই কত নবীন, কত কোমল, কত করুণাময়!—ঘাসের শিশিরস্নাত সতেজভাব, আঙিনার স্বচ্ছ ছায়া, পুরনো গীর্জা-চূড়াগুলির মহান শক্তি, পথের সাদা প্রান্ত—সবই সুন্দর! নিজেকে শিশুর মত প্রাণোচ্ছল মনে হল; আমার ধমনীতে জীবনীরস পুনঃপ্রবাহিত হল যেমনভাবে তা লতায় প্রবাহিত হয়। বিশুদ্ধ আনন্দ সম্ভোগের ক্রিয়াটি কত মধুর!"

অপরদিকে পদ্মানদী, বালুচর, ধূসর তীররেখা, সুনীল আকাশ রবীন্দ্রনাথকে কত গভীরভাবে আকর্ষণ করেছে, তার পরিচয় 'ছিন্নপত্রে' বিকীর্ণ হয়ে আছে। আলোয় আকাশভরা বাংলার শরৎ-প্রকৃতির সকল রূপ কবিদৃষ্টির সামনে উদ্ঘাটিত হয়েছে। 'ছিন্নপত্রে'র ১৪৫-সং পত্রটির সঙ্গে সমুদ্ধৃত দিনলিপির সাদৃশ্য কত গভীর, তা সহজেই অনুভববেদ্য। আলো আর আকাশ উদার আমন্ত্রণে আমিয়েলের মত রবীন্দ্রনাথও সমস্ত হৃদয় দিয়ে সাড়া দিয়েছেন: "কাজ করতে করতে কোনো একদিকে মুখ ফেরালেই দেখতে পাই, নীল আকাশের সঙ্গে মিশ্রিত সবুজ পৃথিবীর একটা অংশ একেবারে আমাদের ঘরের লাগাও হাজির—যেন প্রকৃতিসুন্দরী কুতূহলী পাড়াগেঁয়ে মেয়ের মত আমার জানলা-দরজার কাছে উঁকি মারছে; আমার ঘরের এবং মনের, আমার কাজের এবং অবসরের চারিদিকে নবীন ও সুন্দর হয়ে আছে। এই বর্ষণমুক্ত আকাশের আলোকে এই গ্রাম এবং জলের রেখা, এপার এবং ওপার, খোলা মাঠ এবং ভাঙা রাস্তা একটা স্বর্গীয় কবিতায় এপলোদেবের স্বর্ণবীণাধ্বনিতে ঝংকৃত হয়ে উঠেছে। আমি আকাশ এবং আলো এত অন্তরের সঙ্গে ভালবাসি! আকাশ আমার সাকি, নীল স্ফটিকের স্বচ্ছ পেয়ালা উপুড় করে ধরেছে—সোনার আলো মদের মত আমার রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়ে আমাকে দেবতাদের সমান করে দিচ্ছে। যেখানে আমার এই সাকির মুখ প্রসন্ন এবং উন্মুক্ত, যেখানে আমার এই সোনার মদ সবচেয়ে সোনালি ও স্বচ্ছ, সেইখানে আমি কবি; সেইখানে আমি রাজা; সেইখানে আমার সঙ্গে বরাবর ওই সুনীল নির্মল জ্যোতির্ময় অসীমতার এই রকম প্রত্যক্ষ অব্যবহিত যোগ থাকবে।" [সাজাদপুর, ২ জুলাই, ১৮৯৫]

জেনিভা ও সাজাদপুরে দুস্তর ভৌগোলিক ব্যবধান, সময়ের ব্যবধানও আছে—১৮৫৫ ও ১৮৯৫, কিন্তু প্রকৃতি সৌন্দর্য-উপভোগের অসহ্য উল্লাস একই। এই তীব্র উল্লাসে রবীন্দ্রনাথ ও আমিয়েল একই সৌন্দর্যলোকের দুই দেবকুমার!

আমিয়েল যেখানে বলছেন: "আবহাওয়া আশ্চর্যরকম উজ্জ্বল, উষ্ণ এবং পরিষ্কার। দিন পাখীর গানে মুখরিত,

শর্বরী তারাশোভিত—প্রকৃতি যেন করুণার প্রতিমা—করুণা ও দ্যুতিতে মিশে তা উজ্জ্বল হয়েছে। এই ঐশ্বর্যসমৃদ্ধ দৃশ্যের ভাবনায় প্রায় ঘণ্টা দুয়েকের জন্য আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম।" [জেনিভা, ১৭ এপ্রিল, ১৮৫৫], সেখানে রবীন্দ্রনাথ বলছেন : "অনেককাল বোটের মধ্যে বাস করে হঠাৎ সাজাদপুরের বাড়িতে এসে উত্তীর্ণ হলে বড় ভাল লাগে। বড় বড় জানলা দরজা, চারিদিক থেকে আলো বাতাস আসছে, যেদিকে চেয়ে দেখি সেই দিকেই গাছের সবুজ ডালপালা চোখে পড়ে এবং পাখীর ডাক শুনতে পাই, দক্ষিণের বারান্দায় কেবলমাত্র কামিনী ফুলের গন্ধে মস্তিষ্কের সমস্ত রন্ধ্র পূর্ণ হয়ে ওঠে। হঠাৎ বুঝতে পারি, এতদিন বৃহৎ আকাশের জন্যে ভিতরে ভিতরে একটা ক্ষুধা ছিল, সেটা এখানে এসে পেটভরে পূর্ণ করে নেওয়া গেল।...এখানকার দুপুরবেলাকার মধ্যে একটা নিবিড় মোহ আছে। রৌদ্রের উত্তাপ, নিস্তব্ধতা, নির্জনতা, পাখীদের বিশেষত কাকের ডাক, এবং সুন্দর সুদীর্ঘ অবসর—সবশুদ্ধ আমাকে উদাস করে দেয়। কেন জানি নে মনে হয়, এই রকম সোনালি রৌদ্রে ভরা দুপুরবেলা দিয়ে আরব্য উপন্যাস তৈরি হয়েছে।" [সাজাদপুর, ৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩। ১১৯-সং পত্র]

জেনিভার উষ্ণমধুর প্রসঙ্গ মধ্যাহ্ন আর পদ্মাতীরের সাজাদপুরের নির্জন সুন্দর সুদীর্ঘ অবসরস্নিগ্ধ মধ্যাহ্ন—দুজনকেই একই সৌন্দর্যের জগতে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'বৃহৎ আকাশের ক্ষুধা'র সঙ্গে উক্ত পত্রে আমিয়েলের অনুভূতির কী আশ্চর্য মিল, "এই সুনীল (আকাশ) সাগরে পৃথিবী ভাসছে বলে আমার মনে হল। এই গভীর শান্ত আনন্দানুভূতি একটি সম্পূর্ণ মানুষকে অভিষিক্ত করে, তাকে শুদ্ধ ও মহৎ করে তোলে। আমি নিজেকে এর হাতে সঁপে দিলাম, কৃতজ্ঞতা ও বশ্যতায় নিজেকে হারিয়ে ফেললাম।"

বাংলাদেশের শরৎ-প্রসন্ন প্রভাতের সঙ্গে সুইজারল্যাণ্ডের হেমন্তের হেমকান্ত নীলিম আকাশতলের প্রভাতের একটি সুন্দর সাদৃশ্য আছে। ভাদ্র-আশ্বিনের সকাল পূববাংলায় পদ্মাবক্ষে যে মোহ বিস্তার করে, অক্টোবরের সকাল আল্পস্-আশ্রিত সুইস 'লেক্' অঞ্চলে হয়তো সেরূপ মোহ বিস্তার করে। 'আমিয়েলের জর্নালে' এরূপ একটি সকালের উল্লেখ আছে। দিনলিপির তারিখ ২৭ অক্টোবর ১৮৬৪, রঙ্গভূমি—Promenade de la Treille। আমিয়েল মুগ্ধ হয়ে লিখেছেন—"এই প্রভাতে বাতাস এত স্বচ্ছ ও পরিষ্কার যে ভোয়াশ নদীতে মানুষকে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। সূর্যের প্রসন্ন উজ্জ্বল কিরণধারা শরতের সকল রঙের আগুন জ্বালিয়েছে—সেখানে স্ফটিক-হলুদ, জাফরাণ, সোনালী, গন্ধক-হলুদ, গিরিমাটি-হলুদ, কমলা, লাল, তামা, সাগর-নীল, পারিজাত-নীল রঙ কুঞ্জের ঝরানো ও ঝরে-যাওয়া পাতায় পাতায় উজ্জ্বল রঙের উৎসব লাগিয়ে দিয়েছে। এ অতি তৃপ্তিকর দৃশ্য। আমাদের দুই সামরিক দলের পদধ্বনি, বন্দুকের শিস, শিঙাধ্বনি, ঘরবাড়ীর তীক্ষ্ণ স্পষ্ট রেখাগুলি—যা এখন পর্যন্ত প্রভাতী শিশিরসিক্ত, ছায়ার স্বচ্ছ শীতলতা—সব খুঁটিনাটি দৃশ্য এই সকালে গভীর সম্পূর্ণ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।"

অনুরূপ মুগ্ধ দৃষ্টির পরিচয় পাই 'ছিন্নপত্রে'র ৫৫-সংখ্যক পত্রে (শিলাইদহ, ৩ ভাদ্র, ১৮৯২)। এখানে রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখেছেন : "এমন সুন্দর শরতের সকালবেলা চোখের উপর যে কী সুধাবর্ষণ করছে সে আর কী বলব। তেমনি সুন্দর বাতাস দিচ্ছে এবং পাখি ডাকছে। এই ভরা নদীর ধারে, বর্ষার জলে প্রফুল্ল নবীন পৃথিবীর উপর, শরতের সোনালি আলো দেখে মনে হয় যেন আমাদের এই নবযৌবনা ধরণীসুন্দরীর সঙ্গে কোন্ এক জ্যোতির্ময় দেবতার ভালোবাসাবাসি চলছে, তাই এই আলো এবং এই বাতাস, এই অর্ধ-উদাস অর্ধ-সুখের ভার গাছের পাতা এবং ধানের খেতের মধ্যে এই অবিশ্রাম স্পন্দন—জলের মধ্যে এমন অগাধ পরিপূর্ণতা, স্থলের মধ্যে এমন শ্যামশ্রী, আকাশে এমন নির্মল নীলিমা।...আমার সমস্ত মনটাকে কে যেন তুলিতে করে তুলে নিয়ে এই রঙিন শরৎপ্রকৃতির উপর আর-এক পোঁচ রঙের মতো মাখিয়ে দিচ্ছে, তাতে করে এই সমস্ত নীল সবুজ এবং সোনার উপর আর একটা যেন নেশার রঙ লেগে গেছে।"

রঙের ঘোর ও নেশার রঙ, উভয়েই প্রবল। শরৎ-সুন্দরীর মোহিনী আকর্ষণে উভয়েই ধরা দিয়েছেন এবং এই উল্লাস তারই স্বীকৃতি। রহস্যময়ী চঞ্চলা পদ্মা, এবং ধ্যানগম্ভীর আল্পস্ এই দুই কবিমনকে মহত্তর সৌন্দর্যলোকের পথে আকর্ষণ করেছে। এখানেই আমিয়েল এবং রবীন্দ্রনাথের সমধর্মিতা।

৬

আমিয়েল আগে দার্শনিক, পরে কবি। রবীন্দ্রনাথ আগে কবি, পরে দার্শনিক। আমিয়েলের অশান্ত আত্মজিজ্ঞাসা, দর্শনচিন্তা ও আত্ম-অবিশ্বাস তাঁকে ব্যর্থতার পথে টেনে নিয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের আত্মবিশ্বাস ও সুগভীর মানবিকতা তাঁকে শুষ্ক দর্শনচিন্তার পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে মহত্তর সফলতার স্তরে উত্তীর্ণ করেছে। এখানেই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আর এখানেই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব। আমিয়েল মোহনীয় প্রকৃতির সৌন্দর্য সুধাপানে

উন্মত্ত হয়ে বলেছেন : "বেঁচে থাকা, অনুভব করা, প্রকাশ করার একটি প্রগাঢ় আকাঙ্ক্ষা আমার হৃদয়ের অন্তস্তলকে আলোড়িত করেছে।" (৬ এপ্রিল, ১৮৬৯) ঠিক তার পরই বিষণ্ণকণ্ঠে বলেছেন: "দুঃখ ও অসতের সমস্যা চিরকাল জীবনের প্রধান প্রহেলিকা হয়ে আছে ও থাকবে—জীবনের অস্তিত্বের পরেই এর স্থান।" (২৪ এপ্রিল ১৮৬৯) রবীন্দ্রনাথ এই চিন্তাসঙ্কট থেকে মুক্ত ছিলেন তাঁর ধরণীপ্রীতি তথা মানবপ্রীতির জোরে। 'ছিন্নপত্র' পড়লে মনে হয়, পদ্মা একদিকে মানবসংসার, অপরদিকে বিশ্বলোক, একদিকে নির্বিশেষ সৌন্দর্যসাধনা, অপরদিকে সবিশেষ মর্তমমতা—এ দুয়ের মধ্যে যোগসাধন করেছে। তাই রবীন্দ্রনাথের বিপদ রোমান্টিক বিষাদ, তাঁর বৈরাগ্য ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির বৈরাগ্য। অস্তিত্বের চিন্তায় কোন আত্মসঙ্কটের আবর্তে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে আমিয়েলের মত নিঃশেষিত করেন নি। 'ছিন্নপত্রে' তথা 'গল্পগুচ্ছে' ধ্বনিত হয়েছে 'মানবতার করুণ গীতধ্বনি', তরুণ যৌবনের উদাসী বাউল কবির বিষাদ যা 'সোনার তরী'-'চিত্রা'র মর্মমূলে বর্তমান—তার মূল সুগভীর প্রকৃতিপ্রীতি, 'ছিন্নপত্রে'র ১৪, ১৮, ২৭, ৩৫, ৫৭, ৬৬, ১৫২-সংখ্যক পত্রগুচ্ছ তার পরিচয়স্থল। আর প্রকৃতিপ্রীতির অপরদিক সংসারপ্রীতি—সংসারবিরাগ নয়।

এই ভাবটি খুব সুন্দরভাবে কবি নিজেই ব্যক্ত করেছেন ১৪-সংখ্যক পত্রে: "এমন মনে করা যেতে পারে—মা পৃথিবী লোকালয়ের মধ্যে আপন ছেলেপুলে এবং কোলাহল এবং ঘরকন্নার কাজ নিয়ে থাকে; যেখানে একটু ফাঁকা, একটু নিস্তব্ধতা, একটু খোলা আকাশ, সেইখানেই তার বিশাল হৃদয়ের অন্তর্নিহিত বৈরাগ্য এবং বিষাদ ফুটে ওঠে, সেইখানেই তার গভীর দীর্ঘনিশ্বাস শোনা যায়। ভারতবর্ষে যেমন বাধাহীন পরিষ্কার আকাশ, বহুদূরবিস্তৃত সমতলভূমি আছে, এমন য়ুরোপের কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। এই জন্য আমাদের জাতি যেন বৃহৎ পৃথিবীর সেই অসীম বৈরাগ্য আবিষ্কার করতে পেরেছে: এই জন্য আমাদের পূরবীতে কিম্বা টোড়িতে সমস্ত বিশাল জগতের অন্তরের হা-হা ধ্বনি যেন ব্যক্ত করছে, কারও ঘরের কথা নয়। পৃথিবীর একটি অংশ আছে যেটি কর্মপটু, স্নেহশীল, সীমাবদ্ধ, তার ভাবটা আমাদের মনে তেমন প্রভাব বিস্তার করবার অবসর পায় নি। পৃথিবীর যে ভাবটা নির্জন, বিরল, অসীম, সেই আমাদের উদাসীন করে দিয়েছে। তাই সেতারে যখন ভৈরবীর মিড় টানে আমাদের ভারতবর্ষীয় হৃদয়ে একটা টান পড়ে। কাল সন্ধ্যের সময় নির্জন মাঠের মধ্যে পূরবী বাজছিল, পাঁচ-ছ ক্রোশের মধ্যে কেবল আমি একটি প্রাণী বেড়াচ্ছিলুম।"

'ছিন্নপত্রে'র শ্রেষ্ঠত্ব এইখানে যে, কবির মনোজীবনের অভিলাষ, কাব্যসাধনা ও প্রেরণার কথা এতে প্রকাশিত হয়েছে। যে রোমান্টিক বিষাদ ও বৈরাগ্য এ-পর্বের রবীন্দ্র-সাহিত্যকে আশ্রয় করেছিল, তা যে অমূল তরু নয়, পদ্মাবাসী কবির জীবনে তা যে বাস্তব অপেক্ষা সত্য, উদাস বিষণ্ণ অবনতমুখী সন্ধ্যার চিত্রে তার সমর্থন পাই। সন্ধ্যার ব্যাকুল হৃদ্‌স্পন্দন কবিহৃদয়ের স্পন্দনের সঙ্গে মিলে গেছে। 'ছিন্নপত্রে' সন্ধ্যার বর্ণনা বারবারই এসেছে—সর্বত্রই এক সুর—দিগন্তের শেষ প্রান্তে 'নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা'—তার যাত্রাপথে কোথাও আশ্বাস নেই, অসীম কারুণ্যে গভীর বিষাদে ছেয়ে আছে সে পথ। কবির স্বীকৃতি 'ছিন্নপত্রে' পাই "আর কতবার বলব—এই নদীর উপরে, মাঠের উপরে, গ্রামের উপরে সন্ধ্যেটা কী চমৎকার, কী প্রকাণ্ড, কী প্রশান্ত, কী অগাধ! সে কেবল স্তব্ধ হয়ে অনুভব করা যায়, কিন্তু ব্যক্ত করতে গেলেই চঞ্চল হয়ে উঠতে হয়।" (২৩-সং পত্র)

অবনতমুখী সন্ধ্যার বর্ণনায় কবি-লেখনী কখনও ক্লান্ত হয় নি। বোধ করি সন্ধ্যার সঙ্গে কবি এই পর্বে মনোজীবনের সাধর্ম্য অনুভব করেছিলেন, সন্ধ্যার আসনে যে বিষাদ, বৈরাগ্য ও কারুণ্য দেখেছিলেন, তা সেদিনের কাব্যসাধনায় ধরা পড়েছিল। মনোজীবনের মুক্তি কবি পেয়েছিলেন সন্ধ্যার অভিসারে; রাত্রির অভিমুখে সন্ধ্যার অভিসার তার মুক্তি ও সার্থকতার অভিসার। 'ছিন্নপত্রে'র শেষ (১৫২-সং) পত্রে এই সত্যটি অপরূপ সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে: "কেবল নীল আকাশ এবং ধূসর পৃথিবী—আর তারই মাঝখানে একটি সঙ্গীহীন গৃহহীন অসীম সন্ধ্যা, মনে হয় যেন একটি সোনার চেলি-পরা বধূ অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোমটা টেনে একলা চলেছে; ধীরে ধীরে কত শতসহস্র গ্রাম নদী প্রান্তর পর্বত নগর বনের উপর দিয়ে যুগযুগান্তরকাল সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলকে একাকিনী ম্লান নেত্রে মৌনমুখে শ্রান্তপদে প্রদক্ষিণ করে আসছে। তার বর যদি কোথাও নেই তবে তাকে এমন সোনার বিবাহবেশে কে সাজিয়ে দিলে! কোন্ অন্তহীন পশ্চিমের দিকে তার পিতৃগৃহ!"

এখানে যে নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যযাত্রার কথা বলা হয়েছে, 'সোনার তরী'-'চিত্রা'য় তারই কাব্যরূপ পাই। 'ছিন্নপত্র' তাই রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাষ্য এবং জীবনভাষ্য সাধারণ পত্র-সংকলন নয়, কবিমানসের অন্তরঙ্গ পরিচয়লাভের চাবিকাঠি।

শতবর্ষের ভাবনা

সুশীল রায়

রবীন্দ্রজন্মোৎসব পালন করবে, এই জন্যে কার্ড ছাপিয়ে কয়েকটি ছেলে সেদিন এসেছিল চাঁদা চাইতে। একটা কার্ড দিয়ে চাঁদা চাইল। জিজ্ঞাসা করলাম, কি তাদের উদ্দেশ্য এবং কেন এই জন্মোৎসব-পালন? তারা এ কথার উত্তর দিতে পারল না। জানাল, সেদিন তারা রবীন্দ্রসংগীতের আয়োজন করেছে।

এ কিছু নতুন কাজ নয়। এ-উৎসব পাড়ায় পাড়ায় সাড়ম্বরে পালন করা হয়ে আসছে। কিন্তু এদের একটা ব্যাপার নতুন লাগল। আমার হাতে যে কার্ডটি তারা দিল, উলটে দেখলাম, পিছনে লেখা আছে—'প্রতী টিকিটে একজন'।

তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, রবীন্দ্রনাথ কোন্ দেশের কবি?

তারা বলল, বিশ্বকবি।

জিজ্ঞাসা করলাম, কোন্ ভাষায় তিনি লিখেছেন?

তারা বলল, বাংলা ভাষায়।

জিজ্ঞাসা করলাম, আমাদের ভাষা কি?

তারা বলল, বাংলা ভাষা।

একটু থেমে জিজ্ঞাসা করলাম, এই কার্ডের পিছনের এই হাতের লেখাটি কার?

ওদের মধ্যের একজন এগিয়ে এসে বলল, আমার।

এবার বললাম, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি অবশ্যই, কিন্তু তিনি বাংলাদেশের কবি। তাঁর মাতৃভাষা আর আমাদের মাতৃভাষা এক— বাংলা। তাঁর জন্মতিথিতে আমাদের তবে অন্ততঃ একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

উৎসাহিত হয়ে একটি ছেলে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, কি সার্?

তার রকম দেখে হাসি পেল, বললাম, সারকথা এই যে, এই দিনে আমাদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে—আমরা নির্ভুল বানানে বাংলা লিখব।

তারা উৎসাহ দেখাল।

'প্রতী টিকিটে একজন'-এর মধ্যে তারা বানান ভুল করেছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় তারা সঠিক উত্তর দিতে পারল না।

চাঁদা দিতে পারি নি। কিন্তু সুযোগ পেয়ে তাদের প্রতি অনেক উপদেশ বর্ষণ করেছি।

আসল কথাই এখানে। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এই মাতামাতির হেতু কী? অন্ততঃ শতকরা নিরানব্বইটি ক্ষেত্রে? এতে যে পরিমাণ শক্তি ও স্বাস্থ্য নষ্ট হয় সেটাকে আমরা বলব জাতীয় ক্ষতি।

রবীন্দ্রসাহিত্যের কথা এ ব্যাপারে তুলে লাভ নেই। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার চর্চা করেছেন, ভাষার পুষ্টিসাধন করেছেন, সেই বাংলা ভাষার উপর আমাদের মমতা যদি না হল, সেই ভাষার বানানে, ণত্ব-ষত্ব দূরের কথা, হ্রস্ব-দীর্ঘ-জ্ঞান যদি আমাদের না হল, তা হলে বৃথাই এই রবীন্দ্রপূজা।

আমরা আক্ষেপ করি এবং জেনে ক্ষুব্ধ হই যে, বিদেশে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ধীরে ধীরে কমে আসছে। কিন্তু এর জন্যে দায়ী কে, তা হয়তো ভেবে দেখি নে। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যদি বিদেশে কমে গিয়ে থাকে তা হলে সেজন্যে রবীন্দ্রনাথের কোন ত্রুটি নেই, রবীন্দ্রসাহিত্যও সেজন্যে দায়ী নয়। সে দায়িত্ব আমাদেরই। আমরাই বিদেশীদের মনে রবীন্দ্রনাথকে স্থায়ী করতে অপারগ হয়েছি। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর অনেক বৎসর গত হয়েছে— যে পুরস্কার তাঁকে বিশ্বখ্যাতি দিয়েছিল। খ্যাতি জিনিসটা সহজ জিনিস নয়, সেটা অর্জন করা দুরূহ, কিন্তু রক্ষা করা হয়তো দুরূহতর। যে সময়ে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের দরবারে সার্থক কবি বলে স্বীকৃতি পেলেন, তার পরে বিশ্বের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। সে আমলের যে-মানুষেরা এই বিশ্বকবির পরিচয় পেয়েছিলেন, তাঁরা এখন

নেই, এখন সেখানে এসেছেন নতুন মানুষের দল নতুন মন নিয়ে, নতুন মেজাজ নিয়ে। দু-দুটো যুদ্ধের ধাক্কায় নানাভাবে বিপর্যস্ত হয়েছেন সেই মানুষের দল। পৃথিবীর ভূগোল হয়তো ঠিক আছে, কিন্তু পৃথিবীর চেহারা গিয়েছে বদলে। এই যে বিরাট পরিবর্তন, এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমরা রবীন্দ্রপ্রতিভার স্বাক্ষর তাঁদের চোখের সামনে তুলে ধরতে পারি নি বলেই— যদি বিদেশে রবীন্দ্রপ্রভাব কমে গিয়ে থেকে থাকে, তা হলে— কমেছে।

এর জন্যে বিদেশীদের উপর ক্ষুণ্ণ হয়ে লাভ নেই। তার আগে সম্পূর্ণ অবস্থাটা আমাদের ভেবে দেখা উচিত। একটি পরাধীন ও পদদলিত দেশের একজন কবি স্বাধীনতাহীনতার যাবতীয় জঞ্জাল দূরে নিক্ষেপ করে নিজ প্রতিভার ছটা নিক্ষেপ করতে পারলেন পৃথিবীর সর্বত্র, কিন্তু সেই দেশ যখন অর্জন করল স্বাধীনতা, দূরে নিক্ষিপ্ত হল তার হীনতা, এবং সেই কবির রচিত গান এই নতুন দেশের জাতীয়-সংগীতরূপে গৃহীত হল এবং দেশে-দেশে নগরে-বন্দরে গীত হতে লাগল—তবু সেই কবির প্রভাব যদি এখন দেশে-দেশে নগরে-বন্দরে স্তিমিত হয়ে এসে থাকে তা হলে দোষ দেব কাকে?

আসল কথা, আমরা রবীন্দ্রনাথের নাম নিয়ে হৈ-চৈ করি, রবীন্দ্রপূজার জন্যে মণ্ডপ নির্মাণও করি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কেন রবীন্দ্রনাথ – তা জানার আগ্রহ আমাদের কম। নিজেদের দেশের মধ্যেই যাঁর ধ্যান-ধারণা ও সাধনার বিষয় প্রচারে আমরা সক্ষম হই নি, সাতসমুদ্র তেরো নদীর ওপারে তাঁর কথা জানাতে আমরা কী করে পারব।

বিদেশে রবীন্দ্রনাথের প্রচার যদি করতে হয় তা হলে তাঁর রচনার বহুল অনুবাদ করা দরকার– বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষায়। কথাটা খুব সহজ, কিন্তু কাজটা বুঝি তেমন সোজা নয়। বিষয়টা একটু আলোচনা করে দেখা যেতে পারে। অনুবাদ দিয়ে কারও প্রতিভার সম্যক্ প্রকাশ সম্ভব নয়। ইংরেজ যদি এ দেশে না আসত, এ দেশে এতদিন ধরে যদি ইংরেজের আধিপত্য না থাকত, এবং আরও একটা কথা, ইংরেজি ভাষাটা যদি আন্তর্জাতিক ভাষা রূপে গণ্য না হত—তা হলে সে দেশের শেক্সপীয়র শেলী বাইরন ও অন্যান্য কবিদের সঙ্গে আমাদের এতটা নিবিড় পরিচয় হয়তো সম্ভব হত না। আমরা সরাসরি ওই সব কবির নিজস্ব ভাষায় তাঁদের রচনা পাঠ করতে পেরেছি বলেই তাঁদের আমরা চিনতে হয়তো পেরেছি। কিন্তু এ দেশে যে ঘটনাচক্রে ইংরেজের অধিকার বিস্তৃত হল, সেই ঘটনাচক্রেই দিনেমার ফরাসি বা ওলন্দাজদের অধিকার বিস্তৃত হতে পারত। তা যদি হত তা হলে আজ আমরা চসার শেক্সপীয়ার শেলী বায়রন কীট্‌স্-এর নামের সঙ্গেই হয়তো বা পরিচিত হতে পারতাম, তাঁদের রচনার সঙ্গে নয়। তা হলে তাঁদের রচনার সঙ্গে পরিচিত হতে হলে তাঁদের রচনা অনুবাদ করে নিতে হত সেই ভাষায়, যাকে আমরা বলি—

> মোদের গরব, মোদের আশা,
> আ মরি বাংলা ভাষা।

তা হলে আমরা মূল রচনার পুরো তাৎপর্য বুঝতে নিশ্চয় পারতাম না। তা হলে—

> My heart aches, and a drowsy numbness
> pains my sense

পড়ে কবির যে বেদনার বোধটি উপলব্ধি করি, তা নিশ্চয় তর্জমার চাপে চাপা পড়ে যেত। শেক্সপীয়র কীট্‌স্ শেলী তা হলে আমাদের কাছে অন্য ধরনের কবিরূপে পরিচিত হতেন; তাঁদের আসল পরিচয় আমরা পেতাম না। এখন যেমন আমরা গ্যেটে শিলারকে জানি, হয়তো সেই ভাবেই জানতে হত ওই ইংরেজ কবিদের। গ্যেটে শিলারকে আমরা অনুবাদের মধ্যে দিয়ে জেনেছি, সে জানা পুরো জানা নয়। তাঁরা যে বৃহৎ কবি ও মহৎ স্রষ্টা, অকপটেই বলতে হবে, তা জেনেছি তাঁদের সম্বন্ধে আলোচনা পাঠ করে—তাঁদের রচনা পাঠ করে নয়।

এ কথা যদি অভ্রান্ত হয়, তা হলে রবীন্দ্রনাথকেও বিভিন্ন দেশের ভাষায় অনুবাদ করে তাঁর খ্যাতি অটুট রাখার চেষ্টা বৃথা। একটা দীর্ঘ জীবন ধরে যে মানুষটি বিবিধ বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করেছেন এবং সেই

চিন্তা ব্যক্ত করেছেন ভাষায়—তাঁর সেই চিন্তার কথা ও চেষ্টার কথা জানাতে হবে বিশ্ববাসীর কাছে।

যাঁরা রবীন্দ্ররচনা ধারাবাহিক ভাবে পাঠ করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের সাধনার ধারা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, যাঁরা রবীন্দ্রনাথের জীবনের কর্ম ও কর্মের জীবন সম্বন্ধে কিছু খোঁজ রাখেন তাঁরা স্বীকার করবেন যে, রবীন্দ্রনাথ স্বরচিত কবি। তিনি নিজেকে নিজে নির্মাণ করেছেন। পাথর ঘষে ঘষে যেমন ইস্পাত পালিশ ও শাণিত করা হয়, অবিকল সেইভাবে কর্মশালায় নিজেকে নিযুক্ত রেখে তিনি নিজেকে শাণিত করেছেন। এবং নিজেকে নিত্য-নতুন ভাবে নির্মাণ করতে করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। আর তারই ফলে তিনি সাধনার দ্বারা শোধন করে তুলেছেন নিজেকে। ফল তিনি কামনা করেছিলেন কি না জানি নে। কিন্তু ফল তিনি লাভ করেছেন। বাংলা দেশের কবি বিশ্বকবি রূপে নন্দিত হয়েছেন।

সেই বিশ্বকবিকে আমরা যদি বিশ্বকর্মার পূজার মত পূজা করি, তা হলে কবির উপযুক্ত পূজা হল না।

বিশ্বকবির রচনা বিশ্বময় ছড়িয়ে যাবে, এ কামনা হয়তো রবীন্দ্রনাথেরও ছিল। এ কামনা আমাদেরও আছে। কিন্তু সে কাজের দ্বারা যে কাজের কাজ হবে না—এ আলোচনা আমরা করেছি। অতএব বিশ্বময় ছড়াবার আগে বাংলাময় ছড়ানো যায় কি না সেটা ভেবে দেখা দরকার। তা যদি যায় তা হলেই কাজের কাজ হবে। কিন্তু এইভাবে ছড়িয়ে দেওয়া সত্ত্বেও যদি সেই রচনা 'মেহাগিনির মঞ্চ' জুড়ে কেবল ভাগ্যমন্তদের প্রাসাদের কোণে আশ্রয় পায় তা হলে অবশ্য কাজ নেই তেমন ছড়ানোয়। দেশের সাধারণ মানুষ যেন রবীন্দ্র-রচনার স্বাদ পায়, সেই চেষ্টা করা প্রথম দরকার। এর দ্বারা অবশ্য এমন প্রস্তাব করছি নে যে, দেশের ঘরে ঘরে সারাদিন কেবল রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করা হোক। রবীন্দ্রনাথ কবি, কিন্তু তিনি যে কেবলই কবি ছিলেন না—এ কথা প্রত্যেকের ভাল করে জানার জন্যে তাঁর বিবিধ রচনার সঙ্গে সকলের পরিচয় হোক—এই ইচ্ছাই কেবল প্রকাশ করছি। তা যদি সম্ভব হয়, তবেই জানতে পারা যাবে আমাদের দেশের এই ঐশ্বর্যটির প্রকৃত পরিচয়।

রবীন্দ্রনাথের নাম উচ্চারণমাত্র উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন, আবার ওই নাম উচ্চারণমাত্র নানারূপ কটূক্তি করেন—এই রকম দু জাতের মানুষের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ আমাদের হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, এঁদের কেউই রবীন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গে পরিচিত নন। ও-রকম উচ্ছ্বাস দিয়েও যেমন রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয় দেওয়া যায় না, কটুভাষণের দ্বারাও তেমনি যে প্রতিভা নস্যাৎ করা সম্ভব নয়। 'মেহাগিনির মঞ্চ' জুড়ে থাকাও বরঞ্চ ভাল, কিন্তু এঁদের সংস্পর্শে আসা ঠিক নয়। রবীন্দ্র-প্রতিভা হৃদয়ঙ্গম করার উপযুক্ত মনের গড়ন এঁদের নয়। প্রশংসা করতে হয় বলে করা, কটূক্তি করলে মন্দ কি বলে ওরূপ করা।

এসব বাঁচিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে যাতে রবীন্দ্রনাথকে পৌঁছে দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করলে দেশের কল্যাণ হবে। অনেকের ধারণা যে, উচ্চশিক্ষিত একটি সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যেই রবীন্দ্রচর্চা সম্ভব। উচ্চশিক্ষিত কথাটির অর্থ আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। যারা এই দেশের মাটির ও আকাশবাতাসের সঙ্গে পরিচিত, এ দেশের মঙ্গল যার কাছে নিজের কল্যাণ বলে স্বীকৃত, যার বর্ণপরিচয় হয়েছে—আমাদের ধারণায় শিক্ষিত তারাই, এর মধ্যে উচ্চনীচ বলে কিছু নেই।

রবীন্দ্রচর্চা করতে তারা যাতে উৎসাহিত হয়, সেই চেষ্টা যদি করা যায় তা হলেই রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত জন্মতিথি-উৎসব উদ্‌যাপন করা হবে। তিনি অভিজাত-বংশের সন্তান, এইজন্যে তাঁর রচনাও যে অভিজাতমণ্ডলীর জন্যেই রচিত এ ধারণা যদি কারও থেকে থাকে তা হলে সে ভুল ভাঙা আবশ্যক। যাঁরা এ ধারণা করেছেন, রবীন্দ্র-নাথের রচনার কথা দূরে থাক্, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের মনের পরিচয়ও পান নি।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ছে। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ত্রিশ, ঠাকুরবংশের একজন নবযুবক তখন তিনি, জমিদারি-তদারক করার ভার তখন তাঁর উপর ন্যস্ত।

সে আমলের বাংলা দেশের একজন যুবক-জমিদারের কথা আমরা মনে মনে কল্পনা করে নিতে পারি। প্রজাপীড়ন করাই তার নেশা, এবং পেশাও। সেই রকম এক যুবক-জমিদার লিখছেন—

> বেলা দশটার সময় হঠাৎ রাজকার্য উপস্থিত হল—প্রধানমন্ত্রী এসে মৃদুস্বরে বললেন, একবার রাজসভায় আসতে হচ্ছে।...প্রজারা যখন সসম্ভ্রম কাতরভাবে দরবার করে, এবং আমলারা বিনীত করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন আমার মনে হয় এদের চেয়ে এমনি আমি কি মস্ত লোক যে আমি একটু ইঙ্গিত করলেই এদের জীবনরক্ষা এবং আমি একটু বিমুখ হলেই এদের সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। আমি যে এই চৌকিটার উপর বসে বসে ভাণ করছি যেন এই সমস্ত মানুষের থেকে আমি একটা স্বতন্ত্র সৃষ্টি, আমি এদের হর্তাকর্তাবিধাতা, এর চেয়ে অদ্ভুত আর কি হতে পারে? অন্তরের মধ্যে আমিও যে এদেরই মত দরিদ্র সুখদুঃখকাতর মানুষ, পৃথিবীতে আমারও কত ছোট ছোট বিষয়ে দরবার, কত সামান্য কারণে মর্মান্তিক কান্না, কত লোকের প্রসন্নতার উপরে জীবনের নির্ভর! এই সমস্ত ছেলেপিলে গরু-লাঙল-ঘরকন্নাওয়ালা সরলহৃদয় চাষাভুষোরা আমাকে কি ভুলই জানে। আমাকে এদের সমজাতি মানুষ বলেই জানে না।

চিঠিটা জমিদারি সেরেস্তা সাজাদপুর থেকে লেখা, চিঠির তারিখ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১। পুরো চিঠিটা 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র তৃতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় মুদ্রিত আছে।

সত্তর বছর আগে, ত্রিশ বৎসরের যুবক রবীন্দ্রনাথ যে আক্ষেপ করে গিয়েছেন "সরলহৃদয় চাষাভুষোরা আমাকে কি ভুলই জানে। আমাকে এদের সমজাতি মানুষ বলেই জানে না"—এখনও এ আক্ষেপের অবসান ঘটে নি।

রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি-পালন করছেন সকলেই। বক্তৃতার ব্যবস্থাও থাকছে, কিন্তু বক্তৃতা শুনতে কেউ আসছেন না—আসছেন নাচগানের টানে। ব্যাপার এমন দাঁড়িয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথকে উপলক্ষ করে চারদিকে হচ্ছে জলসা; কিন্তু ব্যাপারটা যে জলসা নয় এইরকম ধারণা সৃষ্টির জন্যে কাউকে ধরে নিয়ে গিয়ে সভাপতি করা হচ্ছে, প্রধান-অতিথি করা হচ্ছে। কিন্তু এঁদের কারোই কোনও ফাংশান নেই। আসল ফাংশান দেখতে যাঁরা এসেছেন তাঁরা নাচ দেখছেন, গান শুনছেন। রবীন্দ্রনাথের কথাই মনে পড়ে, "এরা আমাকে কি ভুলই জানে"।

অনেক হয়েছে। আমাদের ইচ্ছে, ওসব এখন বন্ধ হোক। রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে শতবার্ষিক উৎসব এসে পড়েছে। এই সময়ে ভুল ভাঙার ব্রত নিয়ে কাজে নামার উদ্যোগ করা যায় কি না, ভেবে দেখা যেতে পারে। দেশের সর্বত্র রবীন্দ্রপাঠচক্র স্থাপন করে রবীন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গে দেশের মানুষের পরিচয়সাধন করার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। যাদের বর্ণপরিচয় হয় নি তাদের রবীন্দ্ররচনা পাঠ করে শোনানো যেতে পারে। গ্রামের মানুষের পক্ষে এটা কঠিন কাজ নয়, তারা ধৈর্য ধরে শোনার মত শিক্ষা নিয়েই জীবনযাপন করছে। কথকতা শোনায় তারা অভ্যস্ত। যদি সহজ ও সরল ভঙ্গিতে তাদের কাছে রবীন্দ্রনাথকে উপস্থিত করা যায় তা হলে তারা বুঝবে "অন্তরের মধ্যে আমিও যে এদেরই মত দরিদ্র সুখদুঃখকাতর মানুষ"।

এ কাজ কঠিন কাজ বলে মনে হয় না। যারা কার্ড ছেপে তার পিছনে 'প্রতী কার্ডে একজন' লিখে নিয়ে আসতে পারে, তারা যদি উপযুক্ত পরিচালক পায় তা হলে তারাই বানানও শুদ্ধ করে নেবার সুযোগ পাবে, এবং কেবল 'রবীন্দ্রসংগীতের আয়োজন' করেছে বলে তারা ক্ষান্ত হবে না। তারা তার চেয়েও বেশী-কিছু চাইবে। চাইবে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য।

রবীন্দ্র-তিরস্কার

শ্রীদীপেন্দ্রকুমার সান্যাল

পঁচিশে বৈশাখ যাঁর জ্যোতির্ময় আবির্ভাব এই মর্ত্যলোকের পূর্বদিগন্ত অপূর্ব আলোকে উদ্ভাসিত করে, আমরা তাঁর জীবনকালে যেমন কখনই তাঁর যথেষ্ট তিরস্কারের যোগ্য হতে পারি নি তেমনই আবার বাইশে শ্রাবণ অপূর্বতর আলোকে দিনান্তের দিগদিগন্ত পরিব্যাপ্ত করে যাঁর বিস্ময়কর প্রত্যাবর্তন অমর্ত্যলোকে, মানুষের সেই মহত্তম কবির তিরোভাবের পর তাঁর স্মৃতি-লাঞ্ছিত রবীন্দ্র-পুরস্কারের আজ যে আমরা সম্পূর্ণ অযোগ্য, এই অপ্রিয় সত্য উচ্চারণের মধ্যে দিয়েই এই শতাব্দীর যিনি অধীশ্বর তাঁর নবনবতি জন্মজয়ন্তীনাট্যের উত্তোলিত হোক যবনিকা। যাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের কারণে আমরা এখানে আজ সমবেত হয়েছি ছোটবড় সবাই, তাঁর ক্ষেত্রে প্রিয় অসত্যের চেয়ে অপ্রিয় সত্য উচ্চারণের দাবি অনেক গুরুভার দায়িত্ব যে তা জানি; কিন্তু সেই সঙ্গে আরও সুনিশ্চিত যা জানি তা হচ্ছে এই গুরুদায়িত্ব পালনে অপারগ হলে বাঙালীর জীবনে পঁচিশে বৈশাখ মিথ্যা এবং বাইশে শ্রাবণ অবধারিত ব্যর্থ হবে।

'রবীন্দ্রনাথ শুধু বিশ্বকবি নন; তিনি বিশ্বকবিরও বিস্ময়'—কবিগুরুর সম্বন্ধে তাঁর কালের এবং তাঁর দেশের এই প্রশস্তি তাঁর ক্ষেত্রে যেমন সত্য এমন আর কোন্ কালের আর কোন্ কবির ক্ষেত্রে সত্য? রবীন্দ্রনাথ যতখানি পূর্ব-দিগন্তের, ততখানিই চরাচরের। রবীন্দ্রনাথ যতটুকু বিশ্বপ্রকৃতির, মানবপ্রকৃতির তার চেয়ে এতটুকু কম নন। মানুষের তিনি মহত্তম কবি—উপনিষদের মর্মোদ্গাতা। তিনি গতিরাগের কবি; জ্যোতিরাগের তিনি চিত্রকর। জ্ঞানের এবং বিজ্ঞানের মৃত্তিকা এবং আকাশবিহারী উভচর—এই শতাব্দীর অধীশ্বর রবীন্দ্রনাথ। তিনি গেটে অথবা শেলী নন, যেমন নন ব্যাস কিংবা বাল্মীকি। বাংলার সবচেয়ে বাঙালী লেখক তিনি—এই তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয়, সবচেয়ে প্রিয় নাম।

বাংলা যার মাতৃভাষা নয় সে বুঝবে না রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর কি এবং কে—এ যেমন সত্য তেমনই এর চেয়ে অনেক নিশ্চিত সত্য যা তা হচ্ছে বাংলা যার মাতৃভাষা আজ সে-ই সর্বাগ্রে সবচেয়ে বেশী বুঝতে অক্ষম রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর কি এবং কে? বাংলার সবচেয়ে বাঙালী কবির নামে সরোবরে অথবা ভবনে নয়, তাঁর স্মৃতি-লাঞ্ছিত পুরস্কারে নয়; রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথের সত্য মূল্যায়নেই একমাত্র রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের মহৎ উদ্দেশ্য সার্থক হওয়া সম্ভব। শতবর্ষপূর্তির প্রস্তুতিপর্বে তার কোনও প্রচেষ্টা আমরা কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। পাচ্ছি না বলেই এই প্রবন্ধের প্রস্তাবনা আজ অনিবার্য হয়ে পড়েছে।

মধুসূদন দত্ত দাতব্য চিকিৎসালয়ে ইহলোক সম্বরণ করেন, তাঁর স্বজাতির গণ্ডে এই কারণে দুরপনেয় কলঙ্কের কালিমা কোনও দিন যদি না ঘোচবার হয় তা হলে মধুসূদনের সাহিত্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিস্মৃতি বাঙালীর কত বড় লজ্জা একথা আমরা কদাচ উপলব্ধি করি। মাইকেল মধুসূদন সম্পর্কে অর্বাচীন উক্তি; পাঠ্যপুস্তক মাধ্যমে শ্রদ্ধাহীন ছাত্রদের পরীক্ষার নামে বিভীষিকার বৈতরণী পার করানোর কারণেই মেড-ইজির মধু দিয়ে ক্ল্যাসিকের কুইনিন গলাধঃকরণের অবিমৃষ্যকারিতা; অথবা বৎসরান্তে একদিন 'দাঁড়াও পথিকবর'-খোদিত স্মৃতি-ফলকের সামনে কুম্ভীরাশ্রুবর্জন—এ লজ্জা কিন্তু বাঙালীর কাছে যথেষ্ট লজ্জাকর মনে হয় না আজও। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম-বিস্মৃতি 'আত্মবিস্মৃত বাঙালী জাতি'র যে কত বড় অগৌরবের একথা অনুধাবন করবার মত মানসিক স্থৈর্য পর্যন্ত আজ লুপ্ত। এমন কি ভিন্-দেশের রাষ্ট্রনায়ককে কলকাতার নাগরিকদের মানপত্র নিবেদনের মুহূর্তে আমরা রবীন্দ্রনাথের বাংলা, বিবেকানন্দের বাংলা পর্যন্ত বলেই অনেক বলা হয়ে গেল বলে পরম আত্মতৃপ্ত, এবং বিদ্যাসাগরের বাংলা বলতে তাই নির্লজ্জ ভাবে বিস্মৃত।

কিন্তু এ বাংলা আজ যেমন রামমোহন, মধুসূদন, বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দের নয়—তেমনই এ বাংলা নয় বাংলার সবচেয়ে বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রনাথ নন বাঙালীর প্রাণপুরুষ আজ। পঁচিশে বৈশাখ আজ প্রবীণে-অর্বাচীনে মিলে অর্থহীন হুজুগে

মাত্তার একটা তারিখ মাত্র। রবীন্দ্র-জয়ন্তী আজ রবীন্দ্র-জলসায় পরিণত, শতবার্ষিকী-উৎসব রবীন্দ্র-ব্যবসায়ীদের সাংঘাতিক মওকা মাত্র। এ সব এবং সর্বোপরি যা আজ তীব্র রবীন্দ্র-তিরস্কারের যোগ্যতা হচ্ছে রবীন্দ্র-স্মৃতি-পুরস্কার। মাইকেলের মৃত্যুর অকুস্থল জাতির লজ্জার কারণ; কিন্তু মনে রাখতে হবে অমিতপ্রতিভা মাইকেল মিতব্যয়ী ছিলেন না। এবং বিদ্যাসাগর অথবা তাঁর প্রিয়বান্ধবেরা তাঁর জন্যে যথেষ্টেরও অতিরিক্ত করেছেন, একথা কবুল না করলে যা করা হবে তা সত্যের অপলাপ। কিন্তু মধুসূদনের দুঃখ যদি কেবল অর্থের কারণে হত, তা হলে মাইকেল হতেন না সেই মহৎ কবি, যাঁর সম্বন্ধে বঙ্কিমের এই অবিস্মরণীয় উক্তি: '...সুপবন বহিতেছে দেখিয়া, জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও—তাহাতে নাম লেখ, "শ্রীমধুসূদন।"'

মধুসূদনের হাহাকার অর্থের অভাবে নয়, পরমার্থের অভাবে। নিজের বুকে বয়ে বয়ে যে বেদনায় বিস্ফারিত হয়েছেন মহাকবি, কেঁদে উঠেছেন: 'রেখো মা দাসেরে মনে' বলে সে-দাস অর্থের অথবা সামর্থ্যের ব্যাপারে চরম উদাস। দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন যদি রাজশয্যায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতেন তবুও আমরা যারা আজ মাইকেলের জীবন নিয়ে হাস্যকর নাটক মঞ্চে উপস্থিত করে তাঁর নাট্য-জীবনের ওপর নতুন কোনও আলোকপাতে এতটুকু সচেষ্ট নই, অথবা তাঁর জীবন-মহাকাব্য নিয়ে যতদূর উচ্ছ্বাসে বেসামাল তার তুলনায় তাঁর মহাকবি-জীবন নিয়ে কখনও অর্থহীন পাণ্ডিত্যের কখনও পাণ্ডিত্যহীন অর্বাচীন উক্তির প্রতিবাদে নই আজ এতটুকু সরব—সেই আমাদের সেক্ষেত্রেও লজ্জা রাখবার তিলমাত্র স্থান ছিল কোথায় সুবিপুল এই বসুন্ধরায়? মহাকবি, মহৎ কর্মীদের নামে বিদ্যালয়, রাস্তাঘাট অথবা পুরস্কার ঘোষণায় নেই জাতির লজ্জা-স্খালনের প্রমাণ। তাঁদের কাব্যের এবং জীবন-মহাকাব্যের বারংবার পুনর্মূল্যায়নের মধ্যেই আছে তার প্রদীপ্ত পরিচয়। মহৎ কর্মীর চরিত্রের এবং আদর্শের প্রভাব যদি আমাদের যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার চেয়ে আর একটু ঊর্ধ্বে নিয়ে না যায় তা হলে আমাদের মধ্যে তাঁদের জন্ম বৃথা, কর্ম বৃথা এবং তাঁদের জন্যে আমাদের বৃথা বংশখ্যাতি। রাজা রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ থেকে সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত কীর্তিমান পুরুষদের নিয়ে আমাদের যত অন্তহীন হোক জন্মোৎসব পালনের প্লাবন, আমাদের জাতীয় চরিত্রের কোথাও পড়ে নি তাঁদের ব্যক্তিত্বের সুমহান প্রভাব। আমরা কেবলমাত্র মুখে বিদ্যাসাগরের নাম না নিয়ে, দেশের অথবা বিদেশের বিন্দুমাত্র অন্যায় দেখলে রুখে দাঁড়াতে পারতাম যদি মুহূর্তের জন্যে তা হলেও বর্তমান দুঃসময় শিক্ষার আকাশ অন্ধকার ঘনঘটা করে দেখা দিত না; কারণ, 'সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে'! ঊনবিংশ শতাব্দীর বরেণ্য বঙ্গজেরা একসঙ্গে সংখ্যায় এতজন দেখা দিয়েছিলেন যে পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে যে কোনও কালেই তা দুর্লভতম অঘটন। কিন্তু সেই সঙ্গে এতগুলি স্মরণীয় মানুষের এত অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্বও সাধারণ বাঙালীর মধ্যে পারে নি যা সঞ্চার করতে মানুষের সেই মহত্তম বৃত্তির নামই পুরুষচৈতন্য। এবং সমস্ত প্রাতঃস্মরণীয় বঙ্গপুরুষদের মধ্যে যাঁর বীর্যের শৌর্যের সৌজন্যের এবং বিশ্বমুখীনতা সত্ত্বেও সুবিপুল স্বাজাত্যবোধের বিন্দুমাত্র গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছি আমরা, বাংলার সবচেয়ে বাঙালী সেই লেখকের বিশ্বব্যাপ্ত নামই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়; জীবনের এমন কোনও ক্ষেত্র আজ নেই যেখানে বাঙালী রবীন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত কোনও পুরস্কারের যোগ্য বলে বিবেচিত হবার দাবি রাখে। দাবি রাখে না যে তার প্রধান কারণ বাঙালী রামমোহন থেকে সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত কাউকেই সঠিক গ্রহণ করতে পারে নি তার রক্তে মাংসে মজ্জায়। ঠিক; কিন্তু সবচেয়ে ভুল বুঝেছে যাঁকে সে – তিনিই বাংলার সবচেয়ে বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথ। সেই বাঙালীর অন্তরের অন্তঃপুর থেকে চিরনির্বাসিত রবীন্দ্রনাথ; তিনি বাঙালীর চিন্তা ধ্যান ও কর্মকাণ্ড থেকে আজ যত দূরে এত দূরে নয় মানবলোক থেকে চন্দ্রলোক। এবং রবীন্দ্রনাথকে নির্বাসন দিয়েই আজ বাঙালীর কোথাও দাঁড়াবার মত পায়ের

তলায় নেই মাটি এবং আগামীকালের জন্তে আশা করবার মত নীলাকাশ নেই মাথার ওপর। দেশভাগের দুর্দৈবে পূর্ববঙ্গবাসীরই কেবল পুনর্বাসনের প্রয়োজন নয় আজ; পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মানুষদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, ধ্যান, ধারণা, জ্ঞান, কর্ম, নীতি এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে পুনর্বাসনের প্রয়োজনেই আমাদের উপলব্ধি করা দরকার রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর কি এবং কে। রবীন্দ্রনাথ যে শুধু কবি নন, ছোটগল্পকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, গীত-রচয়িতা, চিত্রকর অথবা সুরস্রষ্টা মাত্র নন; চিরন্তন ভারতবর্ষের বহু জীবনের বহু সাধনার প্রথম প্রত্যক্ষ ফল যে রবীন্দ্রনাথ একথা আত্মস্থ করবার মত সময় কি এখনও আসে নি, তাঁর আবির্ভাব-দিবসের শতবর্ষপূর্তি অত্যাসন্ন হবার মুহূর্তেও?

দুই

নিজের দেশে এবং নিজের কালে সবচেয়ে নিজের জনকে যথাযোগ্য সম্মান দিতে না পারার ঘটনা পৃথিবীর সব দেশে সব কালেই এতবার ঘটে গেছে যে তাকে আর দুর্ঘটনা বলা জীবন-অসঙ্গত উক্তি হবে। একালেই নয় কেবল, স্মরণাতীত সুদূর অতীতেও যে এমন অভিজ্ঞতা অনুপস্থিত ছিল না তার প্রমাণ পাই যখন সংস্কৃত কবিতায় সান্ত্বনাবাক্য উচ্চারিত হতে দেখি নিরবধি কাল এবং বিপুলা পৃথ্বীর নামে। অর্থাৎ যেহেতু কাল নিরবধি এবং বসুন্ধরা বিপুল সেই হেতু আজ যার ঠাঁই হল না খ্যাতির খেয়ায়, কোনও এক কালে তারও সম্ভাবনা রইল স্থান পাবার স্বীকৃতির সোনার তরীতে। মধুসূদন এবং বঙ্কিমের কাব্য এবং কথাসাহিত্যের জগতে অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের পরেও সাহিত্যের প্রায় সর্বক্ষেত্রে রবীন্দ্র-প্রতিভার বিস্ময়কর এবং অত্যুজ্জ্বল প্রকাশের জন্তে প্রস্তুত ছিল না সেদিনকার পাঠক এবং সমালোচক। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্যই এর উল্লেখযোগ্যতম ব্যতিক্রম; বালকবিস্ময় রবীন্দ্রনাথকে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন নি সেদিন যে সাহিত্যসম্রাট তার কারণ বঙ্কিম ছিলেন সাহিত্যের সব্যসাচী; তিনি কেবল সৃষ্টির রহস্যই অবগত ছিলেন যে তাই নয়—কোন্‌টা সৃষ্টি আর কোন্‌টা অনাসৃষ্টি তা বিচারের তৃতীয় দৃষ্টি তিনি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন বঙ্গভারতীর মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ-মুহূর্তে।

কিন্তু বঙ্কিমের স্বতঃস্ফূর্ত সানন্দ এবং সোচ্চার আশীর্বাণী উচ্চারণ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের রাজকীয় প্রবেশ পূর্ণ মর্যাদার পরিবর্তে ঈর্ষামিশ্রিত অপব্যাখ্যার অসম্মান গায়ে মেখেই নিজের জন্তে নতুন পথ কাটার আনন্দে সেদিন গতানুগতিকতার গড্ডলিকাস্রোতে গা ভাসানোর পরম নিশ্চিন্ততার 'পাথেয় করেছে হেলা' চরম ঔদাস্তে। সেদিনকার সেই রবীন্দ্র-নিন্দা এবং তার নায়ক-উপনায়ক সবাই যে বঙ্গসাহিত্যের আজ অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে সেই বঙ্গসাহিত্যের অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠ এবং স্বতন্ত্র এক পরিচ্ছেদেরই নাম রবীন্দ্রনাথ। এই ইতিহাসের দিকে অঙ্গুলীসংকেত করে আমরা যখন বলি যে সেদিনকার বঙ্গসাহিত্যের লেখক পাঠক এবং সমালোচক রবীন্দ্রনাথকে পারে নি বুঝতে তাহলে ইতিহাস ইতিহাস-বধির না হলে আমাদের কান তৎক্ষণাৎ যা শুনতে পেত আমাদের উক্তির প্রত্যুত্তর বলে তা হচ্ছে: একালের বঙ্গসাহিত্যের পাঠক, লেখক এবং সমালোচকই কি বুঝতে পেরেছে রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর কি এবং কে?

না; কেবলমাত্র সাহিত্যকর্মীর কথা বলছি না; জীবনকর্মী রবীন্দ্রনাথের কথা বলছি। এই প্রবন্ধের উপলক্ষ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যধর্ম; কিন্তু এই প্রবন্ধের আসল লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথের জীবনধর্ম। এবং জগতে আজ পর্যন্ত যত সাহিত্যসাধকের আবির্ভাব ঘটেছে তাঁদের সমবেত উপস্থিতির মধ্যেও উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্যে যেখানে রবীন্দ্রনাথ বিশিষ্ট ব্যতিক্রম এবং প্রায় একক তা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের জীবনে গঙ্গাযমুনার মত মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনা এবং জীবনতপস্যা। সাহিত্য-ধর্মে এবং জীবনধর্মে রবীন্দ্রনাথ অভিন্ন। সাহিত্যধ্যানে এবং জীবনদেবতার সন্ধানে রবীন্দ্রনাথের যাত্রা 'আজি এ প্রভাতে রবির কর, কেমনে পশিল প্রাণের পর'-এর বিস্ময় থেকে 'সমুখে শান্তি পারাবার'-এর বিমুগ্ধ অবসান পর্যন্ত একই 'সোনার তরী'তে অব্যাহত ছিল চিরকাল। অন্যায় যে করে তার চেয়ে অনেক বেশী অন্যায় সে করে সহ্য করে

সেই অন্যায়কে—এই বাণীর মধ্যেই এসে মিলেছে রবীন্দ্রনাথের জীবন-কর্মের এবং সাহিত্য-কর্মের মর্মবাণী। এবং এই বাণী বিস্মৃত হয়েই বাঙালী আজ কেবল সাহিত্য-ক্ষেত্রেই পতিত নয়, জীবন-কুরুক্ষেত্রেও চরম অধঃপতিত। এই বাণীর আলোকেই কেন রবীন্দ্রনাথের জীবনকালে আমরা তাঁর যথেষ্ট তিরস্কারের যোগ্য হতে পারি নি কখনই এবং রবীন্দ্রনাথের তিরোভাবের পর আজ কেন আমরা তাঁর স্মৃতি-লাঞ্ছিত 'রবীন্দ্র-পুরস্কারে'র সম্পূর্ণ অযোগ্য—অতঃপর সেই বিচারে আমাদের প্রবৃত্ত হতেই হবে। কারণ তাই হচ্ছে এই প্রবন্ধের একমাত্র প্রতিপাদ্য।

তিন

জালিয়ানওয়ালাবাগে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে 'নাইটহুড' ত্যাগ করেন রবীন্দ্রনাথ—বাঙালী মাত্র এইটুকুই জেনে আত্মতৃপ্ত। অথবা মিস র‍্যাথবোনকে লেখা তাঁর প্রতিবাদ-পত্রের কথা পর্যন্ত জেনেই বড়জোর। কিন্তু সামান্য 'নাইটহুডে'র চেয়ে যে রবীন্দ্রনাথের জীবনে কতবার কি অসামান্য ত্যাগে মহিমান্বিত হয়েছে তাঁর মাথায় কবিত্বের নয় কেবল মনুষ্যত্বের মুকুট—এ কথা 'বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি' বলেই তার পক্ষে বিস্মরণ সম্ভব হয়েছে। না হলে অন্তত যে কোনও মহাকাব্যের চেয়েও বিশালকায় রবীন্দ্র-জীবনকাব্যের একটি কীর্তি অন্তত বাঙালীর পক্ষেও ভোলা অসম্ভব হত। নোবেল প্রাইজ পাবার পর শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের কাছে যে সম্বর্ধনা উপস্থিত হয়েছিল কলকাতা থেকে, তাকে বিক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ জানাতে ভোলেন নি যে: "···এতদিন আমি আপনাদের তুষ্ট করতে পারি নি; নোবেল পুরস্কার পাবার পর হঠাৎ সকলের প্রিয় হয়ে উঠলাম কি করে? গিল্টিকরা পাত্রে আমাকে আপনারা বিদেশী মদ পান করতে বলছেন। আমি তা পারব না; ক্ষমা করবেন।"

আর যে কোনও লোক যে পরিস্থিতিতে আপোস করত, 'যাক যা হয়ে গেছে, আসুন আমরা উভয়েই ভুলে যাই'—বলে বাড়িয়ে দিত কম্প্রমাইজের কর, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত কাব্যকীর্তির চেয়ে অনেক মহৎ, অনেক বৃহৎ, অনেক বিশালপ্রাণ ছিলেন বলেই এই হীনমন্য সম্বর্ধনাকে অধর পর্যন্ত তুলেছিলেন কিন্তু গ্রহণ করেন নি। বিদ্যাসাগর যখন তাঁর জীবদ্দশাতেই কিংবদন্তীর নায়ক, তাঁর খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা এবং লোকমান্যতার শীর্ষে পৌছেচেন তখনই তিনি বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে সর্বস্ব পণ করে খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা এবং লোকমান্যের কি হবে তার জন্যে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন সমাজ-সংগ্রামে। এই জন্যেই যেমন বিদ্যাসাগর বড় তেমনই নোবেল প্রাইজ পাবার পর দেশের মানীগুণীরা যখন জয়মাল্য হাতে রবীন্দ্রসমীপে উপস্থিত তখন রবীন্দ্রনাথ সেদিন যে উক্তি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ না হলে সেদিন সে উক্তি তিনি করতে পারতেন না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কেবল এই কারণেই বড় নন।

নোবেল প্রাইজ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্মানিত হন নি; পুরস্কার গ্রহণ করে অ্যাল্‌ফ্রেড নোবেলের স্মৃতিকেই তিনি যে ধন্য করেছেন একথা নির্দ্বিধায় বলতে আজ আমরা সবাই সোচ্চার। সেদিনও রবীন্দ্রবিরোধী বলে অন্যায়-অভিযুক্ত মনীষী বিপিনচন্দ্রের উপলব্ধি করতে দেরি হয় নি এ কথা যে: "পুরস্কার পেয়ে রবীন্দ্রনাথের মর্যাদা বৃদ্ধি হয় নি। কারণ, নোবেল কমিটি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতা পড়বার সুযোগ পান নি। গীতাঞ্জলি শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলন নয়। উর্বশী, চিত্রাঙ্গদা, পতিতা, সোনার তরী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি গীতাঞ্জলিতে নেই।"—['বিপিনচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ'—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়]

রবীন্দ্রনাথ যে জগদীশচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে উপস্থিত অভিনন্দনের ডালিও প্রত্যাখ্যান করেন তার কারণ কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যা প্রাপ্য তা থেকে তাঁর দেশবাসী তাঁকে এতদিন বঞ্চিত রেখেছিলেন বলে নয়; এই সঙ্কীর্ণ অভিমানের অনেক উর্ধ্বলোকে ছিল রবীন্দ্রনাথের রাজকীয় অবস্থান। দেশের লোক যে সেদিন স্বদেশের ঠাকুরের চেয়ে বিদেশের যে কাউকে অনেক বেশী মান্যজ্ঞান করত—এই বেদনাই তাঁকে গভীরভাবে বেজেছিল। রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ যদি নাই পেতেন তা হলেও কি রবীন্দ্রনাথ জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিকীর্তি নন? নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির গৌরব যদি রবীন্দ্রনাথের একমাত্র গৌরব

হয় তা হলে সূর্যের একমাত্র পরিচয় হয় যে সূর্য পূবে ওঠে এবং পশ্চিমে অস্ত যায়। কিন্তু সূর্যের পরিচয় অতটুকু মাত্র হলে পৃথিবী কি তাকে প্রণতি জানাত—ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্ন প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্—এই মন্ত্র উচ্চারণ করে?

আমরা সেদিনও বুঝি নি আজও বুঝতে চাইছি না যে রবীন্দ্রনাথ কেবল কবি নন—রবীন্দ্রনাথ একটি পূর্ণ ও মহৎ মানবচরিত্র। পূর্ণের দিকে সর্বাধিক অগ্রসর রবীন্দ্রনাথ এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে সম্পূর্ণ-মানুষের জ্যোতির্দীপ্ত নাম। রবীন্দ্রনাথকে না বুঝতে পারার প্রধান কারণ অবশ্যই বাঙালী-চরিত্রের অপবৈশিষ্ট্য। বাঙালীর মনে খুব দগদগে রঙে কিছু আঁকা না হলে ধরে না। লেখক অথবা শিল্পী কিংবা নট অতিনাটকীয় জীবন যাপন না করলে তাঁর জীবন থেকে কিছু গ্রহণ করতে আমাদের সুপ্রবল অনীহা। অর্জুনের চেয়ে কর্ণ; যুধিষ্ঠিরের চেয়ে দুর্যোধন; এবং নীলোৎপলনয়ন রামচন্দ্রের চেয়ে স্বর্ণলঙ্কার অধীশ্বর দশানন আমাদের পাশ্চাত্ত্য প্রভাবান্বিত দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক বেশী বীরপূজার পাত্র। এ-দৃষ্টিকোণ কিন্তু ভারতীয় দৃষ্টিকোণ নয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রতীচ্যের নবজাগরণের ঢেউ লেগে জেগে ওঠা বাঙালীর চোখেই কেবল রাঘব ভিখারী। প্রাচীন ভারতের জীবনদর্পণে নবদূর্বাদলশ্যাম রাম সেই মহত্তম মানবচরিত্র, যাঁর সম্বন্ধে গুরুকবি বাল্মীকি থেকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত শেষ নেই বিস্ময়বিচিত্র বন্দনার: 'কে পেয়েছে সবচেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক'!

কোনও কবি, কোনও শিল্পী, কোনও অভিনেতা অথবা জীবনের যে কোনও কুরুক্ষেত্রের নেতা বিশৃঙ্খল উন্মাদনায় উন্মত্ত এবং শেষ কর্পদক উড়িয়ে দিয়ে নিঃস্ব হয়ে ধুলোয় গড়াগড়ি না দেওয়া পর্যন্ত তার জীবন সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় না যথেষ্ট। যে ছন্দে জগতে সূর্যোদয়ে হয় দিবারম্ভ আবার দিবান্তে হয় তারার দেওয়ালি; যে নিয়মে বর্ষা গেলে অফুরন্ত শিউলীর সুরভি সর্বাঙ্গে মেখে নিরুপম নীলাঙ্গনে আসন পাতে শরৎ; যে শৃঙ্খলায় আবর্তিত হয় অহোরাত্র সমুদ্রসন্তান বসুন্ধরা, রবীন্দ্রনাথের জীবন প্রভাত থেকে প্রদোষ পর্যন্ত সেই সুকঠিন নিয়মানুবর্তিতায় আবদ্ধ ছিল। নিয়মের শৃঙ্খল সৃষ্টির শৃঙ্খলায় যাঁর জীবনে ছন্দায়িত, আশি বৎসরেরও অধিক কথার পর কথা গেঁথেই কেবল যান নি সেই কবি, নিজের জীবনকে পাপড়ির পর পাপড়িতে, দলের পর দল মেলে বিকশিত শতদলের মত চরম পূজার থালে নিবেদনের পরম মুহূর্তে স্মরণীয় করেছেন অবিস্মরণীয় এই বাণীতে:

"সাঙ্গ যবে হবে ধরার পালা
যেন আমার গানের শেষে থামতে পারি সমে এসে,
ছয়টি ঋতুর ফুলে ফলে ভরতে পারি ডালা।
এই জীবনের আলোকেতে পারি তোমায় দেখে যেতে,
পরিয়ে যেতে পারি তোমায় আমার গলার মালা
সাঙ্গ যবে হবে ধরার পালা॥"

এই রবীন্দ্রনাথকে বহুদূর থেকে বিশ্বকবি-জ্ঞানে প্রণাম করেছি বটে কিন্তু কাছ থেকে কখনও দেখবার চেষ্টা করি নি সম্পূর্ণ মানুষ রবীন্দ্রনাথকে। তাঁর জীবন নিয়ে যে মহৎ নাট্যরচনা সম্ভব ভাবি নি কখনও। বরং রবীন্দ্রনাথের জীবনে ঘটনার ঘনঘটার অভাব এই কারণে—রবীন্দ্রনাথ কেবল কবি—অতিনাটকীয়তাপ্রবণ বাঙালীর দৃষ্টিতে এই তাঁর একমাত্র বিশেষণ, একমাত্র পরিচয়। যুধিষ্ঠির আমাদের কাছে ধর্মভীরু মাত্র, কারণ, ধর্ম কি আর অধর্ম কোনটা এই কাণ্ডজ্ঞান পর্যন্ত অবলুপ্ত আজ আমাদের; না হলে আমরা জানতাম সবার উপরে মানুষ সত্য নয়; সবার উপরে যা সত্য—তা মনুষ্যত্ব। মানুষের ধর্মই মনুষ্যত্ব; মনুষ্যত্বকে ধরে থাকতে পেরেই যুধিষ্ঠির ধর্মরাজ একথা যদি আমরা ক্ষণকালের জন্যেও অনুভব করতে পারতাম তবেই আমাদের উপলব্ধির দর্পণে প্রতিবিম্বিত হত Religeon of Man-এর প্রবক্তা রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ মানব-প্রতিকৃতি। এবং মাত্র তখনই আমরা পরিজ্ঞাত হতাম যে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যধর্ম এবং জীবনধর্ম এক এবং অভিন্ন: 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।'

দেশের অন্যায়ে এবং বিদেশের ন্যায়বর্জনে রবীন্দ্রনাথ সমান প্রতিবাদমুখর। জাপানী কবি নোগুচীর সঙ্গে প্রতিবাদ-পত্রালাপ আর ব্রহ্মবান্ধবের খেদোক্তি-সম্বলিত

'চার অধ্যায়ে'র অপ্রিয় এবং পরবর্তীকালে পরিত্যক্ত ভূমিকা ছাড়াও নিজের অতীত ত্রুটির মার্জনাও তাঁর চরিত্রকে লোকোত্তর মহিমায় মণ্ডিত করেছে বারংবার। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র যে অবিস্মরণীয় ধ্বংসাত্মক সমালোচনা তিনি করেন এবং সেই মন্তব্য প্রত্যাহার করে যে উক্তি তিনি করেন তা এক তাঁরই যোগ্য।

এই প্রতিবাদপ্রদীপ্ত রবীন্দ্রনাথ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন নি যে সে তাঁর প্রতিবাদশক্তির অভাবে নয়, আমাদেরই দৃষ্টিশক্তির অভাবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যজীবনে এবং জীবনকাব্যে কখনও শালীনতার সীমা অতিক্রম করা দূরে থাক্ একটিও অভদ্র উক্তিতে কখনও কলঙ্কিত করেন নি নিজের কলম অথবা কথা। তাঁর প্রতিবাদে কখনও যথেষ্ট প্রীতিবাদের অভাব হয় নি। প্রতিপক্ষ মাত্রাহীন উষ্মার পরিচয় দিলে সবিনয়ে সহাস্য জিজ্ঞাসা তাঁর 'নিন্দুকের প্রতি নিবেদনে': তোমার এমন শাণিত বচন তাই কি অমর হবে? অন্য কেউ দৃষ্টি আকর্ষণ করলে অল্পজলের সফরীর উল্লম্ফনের অপরুচির দিকে রাজকীয় উপেক্ষায় রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন যে যাঁদের প্রশংসা করতে তিনি সক্ষম নন তাঁদের নিন্দা করতেও তিনি সমান অক্ষম।

এই রবীন্দ্রনাথের রঙ বাঙালীর মনে অথবা তার ধ্যানে, তার জ্ঞানে, তার চিন্তায়, তার কর্মে লাগে নি। তাঁকে এতদূর পর্যন্ত ভুল বোঝা সম্ভব হয়েছে বাঙালীর সাময়িক বিকৃতবুদ্ধির মহিমায় যে 'জনগনমন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা' বলতে রবীন্দ্রনাথ সেদিনকার ভারতসম্রাট পঞ্চম জর্জকে স্মরণ করেছেন একথা উচ্চারণ করতেও আটকায় নি। যে গানে রবীন্দ্রনাথ 'পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা, যুগ-যুগ-ধাবিত যাত্রী, হে চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি' বলে উদাত্তকণ্ঠ হয়েছেন সে গানের ভারতভাগ্যবিধাতা কোনও মানুষের পক্ষে হওয়া যে সম্ভব নয়—একথা ব্যাখ্যা করে বোঝাবার মত দুর্বহ দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে? রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী-সঙ্গীতেও প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে কোথাও রক্ত অথবা বিপ্লবের বাড়াবাড়ি নেই, সেখানেও রয়েছে তার পরিবর্তে:

অয়ি ভুবনমনোমোহিনী,
অয়ি নির্মলসূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী জনকজননীজননী!

আর কোন্ দেশের কোন্ কবি এমন করে দেশের মাটির পায়ে মাথা ঠেকিয়েছেন বারবার, জানি না।

চার

জীবনে এবং সাহিত্যে সমান সংযত শালীন এবং শোভন রবীন্দ্রনাথকে যে অসংখ্য কোটি সাধারণ মানুষ বিশ্বকবি জ্ঞানে বিপুল শ্রদ্ধা করার পরেও যতখানি গ্রহণ করার তা করতে পারে নি তার অনেকখানি দায়িত্ব কিন্তু রবীন্দ্র জীবন এবং সাহিত্যের যাঁরা অসাধারণ পাঠক, একান্তভাবে তাঁদেরই। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে যারা বিশেষ অজ্ঞ তাদের ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য ব্যাপারে যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাঁরা প্রায়ই উদাসীন যে কেবল তাই নয়—তাঁদের কেউ কেউ আরও ভীতি উৎপাদনে তৎপর এবং এই বলে যে: আমরা লিখি তোমাদের জন্যে; আর রবীন্দ্রনাথ লেখেন আমাদের জন্যে। রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে এমন অলীক এবং অযৌক্তিক উক্তি কদাচ অন্য কোনও দেশে অন্য কোন কবিকর্ম সম্পর্কে শ্রুত হয়। অসাধারণ রবীন্দ্রনাথকে সর্বসাধারণের, বিদ্বজ্জনের রবীন্দ্র-সাহিত্যকে সর্বজনের জন্যে অবারিত করাই পঁচিশে বৈশাখ উদ্‌যাপনের একমাত্র কারণ ও কর্তব্য হওয়া উচিত। সাধারণ লোক রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যত ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে তার অনেকটাই অধ্যাপকদের দুঃসহ কাব্য-বিশ্লেষণজাত। আর খানিকটা রবীন্দ্রনাথের রাজকীয় পরিবেশে জন্মগ্রহণ এবং অতিনাটকীয়তা এবং ভাবালুতা মুক্তির কারণে। রবীন্দ্রনাথ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র অতএব বাংলা দেশের চাষী-মজুরদের কথা, গ্রামের কথা, নিম্নবিত্ত নীচের মহলের কথা তাঁর জানবার নয়—এই মিথ্যা দূর করবার কাজে ব্রতী হওয়াই শতবর্ষ-পূর্তি উৎসবের একমাত্র উপলক্ষ হওয়া সঙ্গত। রবীন্দ্রনাথ যে কেবলমাত্র কবি নন, বিশ্বের সবশ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকারদের একজন নন, প্রথমজন—একথা সাধারণ বাঙালী পাঠক এখনও জানে না তার কারণ কোনও অসাধারণ পাঠক তাকে কখনই এ কথা বোঝবার অবকাশ দেয় নি যে মানবজীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনী কেবল কাঁদাবার জন্যে লেখা হয় না। মানবজীবনের গভীর আনন্দের এবং সুগভীর বেদনার প্রকাশ যে গল্পে সে ছোট হয়েও আসলে বড় কারণ তা মানুষকে বাইরে ঠেলে দেয় না, অন্তর্মুখী করে। যে মহৎ দুঃখে মানুষ ক্রন্দন করে না চিৎকার করে; সীমাহীন শূন্যতার সামনে দাঁড়িয়ে মুহূর্তে বাচাল হয় মূক; যে গভীর সুখে মানুষ সোল্লাসধ্বনি করে না; বসন্তের দিন চলে যাওয়ার আগে সূর্যালোকে মধুকরগুঞ্জরণে যেমন কাঁপে ছায়াতল তেমনই অব্যক্ত আনন্দের যে স্রোত শিরায় শিরায় রিমঝিম করে, সেই মহৎ দুঃখ-সুখের পৌষ-ফাগুনের

পালাই রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে ছোট গল্পকেও মানবজীবনের সবচেয়ে বড় গল্পে উত্তীর্ণ করেছে মুহূর্তে।

রবীন্দ্রনাথকে কেবল গভীর তত্ত্বের কঠিন কবি বলে পাঠক ভুল না করলে তার মনে পড়ত :

"এই গেল এক, আর এক দুঃখের বেদনা আমার মনে বেজেছিল। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, সমস্ত দিনের কাজ শেষ করে চাষীরা ফিরেচে ঘরে। একদিকে বিস্তৃত মাঠের উপর নিস্তব্ধ অন্ধকার, আর একদিকে বাঁশঝাড়ের মধ্যে এক একটি গ্রাম যেন রাত্রির বন্যার মধ্যে জেগে আছে ঘনতর অন্ধকারের দ্বীপের মত। সেই দিক্ থেকে শোনা যায় খোলের শব্দ, আর তারি সঙ্গে একটানা সুরে কীর্তনের কোন একটা পদের হাজারবার তারস্বরে আবৃত্তি। শুনে মনে হত এখানেও চিত্ত-জলাশয়ের জল তলায় এসে পড়েচে। তাপ বাড়চে, কিন্তু ঠাণ্ডা করবার উপায় কতটুকুই বা। বছরের পর বছর যে অবস্থাদৈন্যের মধ্যে দিন কাটে তাতে কী করে প্রাণ বাঁচবে যদি মাঝে মাঝে এটা অনুভব না করা যায় যে হাড়ভাঙা মজুরীর উপরেও মন ব'লে মানুষের একটা কিছু আছে যেখানে তার অপমানের উপশম, দুর্ভাগ্যের দাসত্ব এড়িয়ে যেখানে হাঁফ ছাড়বার জায়গা পাওয়া যায়। তাকে সেই তৃপ্তি দেবার জন্যে একদিন সমস্ত সমাজ প্রভূত আয়োজন করেছিল। তার কারণ, সমাজ এই বিপুল জনসাধারণকে স্বীকার করে নিয়েছিল আপন লোক ব'লে। জানত, এরা নেমে গেলে সমস্ত দেশ যায় নেমে। আজ মনের উপবাস ঘোচাবার জন্যে কেউ তাদের কিছুমাত্র সাহায্য করে না। তাদের আত্মীয় নেই, তারা নিজে নিজেই আগেকার দিনের তলানি নিয়ে কোনোমতে একটু সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করে। আর কিছুদিন পরে এটুকুও যাবে শেষ হয়ে; সমস্ত দিনের দুঃখধন্দার রিক্তপ্রান্তে নিরানন্দ ঘরে আলো জ্বলবে না, সেখানে গান উঠবে না আকাশে। ঝিল্লী ডাকবে বাঁশবনে, ঝোপঝাড়ের মধ্য থেকে শেয়ালের ডাক উঠবে প্রহরে প্রহরে, আর সেই সময়ে শহরে শিক্ষাভিমানীর দল বৈদ্যুত আলোয় সিনেমা দেখতে ভিড় করবে।"

রবীন্দ্রনাথকে গভীর তত্ত্বের কঠিন কবি বলে পাঠক ভুল না করলে তার মনে পড়ত যে এ কণ্ঠস্বর বাংলা দেশের কোনও তথাকথিত নীচুতলার প্রবক্তাদের কারুর নয়; এ কণ্ঠস্বর প্রিন্স দ্বারকানাথের পৌত্র এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র রবীন্দ্রনাথেরই নিঃসংশয়ে। যাঁর সম্বন্ধে অসংখ্য স্বদেশবাসীর আজও এই শোচনীয় অলীক এবং অবাস্তব ধারণা যে মাটির সঙ্গে সংযোগবিহীন কল্পনার চূড়ায় বসে নীল আলো জ্বেলে রবীন্দ্রসংগীত রচনাই তাঁর একমাত্র কবিকর্ম।

পাঁচ

ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সাহিত্য-ব্যক্তিত্ব যদি বিন্দুমাত্র স্পর্শ করত আজ বাঙালীচিত্তকে ক্ষণকালের জন্যেও তা হলে সে এই মানবসত্য সুনিশ্চিত জানত যে মানুষের সামর্থ্যের অভাব ঘটেছে অর্থের অভাবে নয়, প্রতিবাদশক্তির অভাবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করার মত অন্যায় তা হলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাঙালীকে আজ শতধিক্কারের ব্যর্থতায় পদে পদে পরাজিত করত না; জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন তেমনই পঁচিশে বৈশাখকে উপলক্ষ করে রবীন্দ্রনাথের নামে যে অর্থহীন জলসায় অজস্র অর্থ, কর্মশক্তি এবং সময়ের অপব্যয় হচ্ছে তার বিরুদ্ধে সে একবার উঠে দাঁড়ালে, রুখে দাঁড়ালে একবার রবীন্দ্রনাথের নাম ভাঙিয়ে যারা পঁচিশে বৈশাখের ব্যবসায় অধুনা লিপ্ত, রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যের যারা কেউ নয় মুহূর্তে নীরব হত তারা। এবং তার পরিবর্তে শ্রুত হত সেই অপরাজিত কণ্ঠস্বর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের। মৃত্যুর পর এই অর্বাচীন এবং স্বার্থান্বেষীদের রবীন্দ্র-জলসার অবশ্যম্ভাবী সূচনা জীবদ্দশাতেই অনুমান করতে পেরে উচ্চারণ করেছিলেন যে সতর্কবাণী তাই ঘোষণা করতে সে ভয় পেত না :

'সভাপতি থাকুন বাসায়
কাটান সময় তাসে-পাশায়
নাইবা হল নানা ভাষায়
আহা, উহু, ওহো!'

মানুষের মহত্তম কবি রবীন্দ্রনাথ; শতাব্দীর অধীশ্বর রবীন্দ্রনাথ; বাংলার সবচেয়ে বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এই যে আহা-উহু-ওহোর সাময়িক দুর্যোগ সাহিত্যাকাশ জুড়ে দেখা দিয়েছে এ যতই ঘনঘোর করে তুলুক নির্মল আর নিরুপম নীলকে তবুও চিরস্থায়ী হবে না এই বিকার কিছুতেই কারণ 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।' সেই মেঘের বিকার কেটে গিয়ে সুস্থ, এবং স্বাভাবিক শ্রী ফিরে আসবে আকাশের—এই প্রত্য[illegible] আজ পুনরাবৃত্তি করি যে মন্ত্রে রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে তাঁর স্বদেশবাসী করেছিল সুর্ঘপ্রণাম

"প্রকৃতির কাছে হাত পাতিয়া আমরা লইয়া[illegible] অনেক; আবার তোমার হাত দিয়া তাহাকে দিয়ু[illegible] অনেক।"

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : ৫৬-১১৮৫৮

৩২শ বর্ষ,
৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭
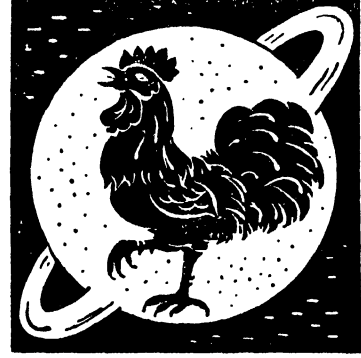
সংবাদ-সাহিত্য

রাজশেখর বসু

বিগত ১৪ই বৈশাখ, ২৭ এপ্রিল ১৯৬০ দিবাদ্বিপ্রহরে বাংলাসাহিত্যের পরশুরাম ও বাংলাদেশের প্রবীণ মনীষী রাজশেখর বসুর মৃত্যু হইয়াছে। তিরোধান, তিরোভাব, পরলোকগমন, নশ্বর দেহত্যাগ, পঞ্চভূতে বিলীন ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত অধিক সম্ভ্রমাত্মক ভাষা তাঁহার বেলায় প্রয়োগ করিলাম না, কারণ, তিনি অন্ততঃ বাহিরে মৃত্যুকে নিঃশেষ সমাপ্তি হিসাবেই দেখিতেন, তাঁহার একান্ত বৈজ্ঞানিক মনে মৃত্যুপরপারের কোন মোহ প্রকাশ্যতঃ স্থান পাইত না।

গত ১৬ই মার্চ তিনি জীবনের আশি বর্ষ পূর্ণ করিয়া একাশিতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তখনই তাঁহার দেহ অপটু হইয়া আসিয়াছিল কিন্তু মন ছিল সজাগ। বাঁচিবার কোনও আকর্ষণ তাঁহার ছিল না, সেই কথাই বারংবার চিঠিতে ও মুখে প্রকাশ করিতেন। আমরা যাহাকে সিদ্ধ সাধু পুরুষের মৃত্যু বলি তাঁহার প্রাণ সেইরূপ সহজ শান্ত নিরুদ্বেগ অবস্থার মধ্যেই জীর্ণ দেহ ছাড়িয়া গিয়াছে। নিজ পরিবারের (কন্যা ও সহধর্মিণী) একান্ত নিজস্ব প্রায় ইচ্ছামৃত্যুর সৌভাগ্য হইতে তিনিও বঞ্চিত হন নাই।

রবীন্দ্রনাথের তিরোভাবের পর বাংলাসাহিত্য, ভাষা, শিক্ষা ও সমাজের ভালমন্দের উপর একমাত্র তাঁহারই তীক্ষ্ণ ও সজাগ দৃষ্টি ছিল। কোথাও কোনও অনাচার দেখিলে তিনি সহজ অথচ অপূর্ব ভঙ্গিতে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিতেন। তাঁহার বিয়োগে হিতৈষীর খবরদারির সুযোগ বাংলা দেশ হারাইল।

'শনিবারের চিঠি'র সহিত তাঁহার সম্পর্ক বহু দিনের। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে (১৯২৭ খ্রীঃ) যখন মাসিকরূপে ইহার প্রকাশ আরম্ভ হয়, পরশুরামের রচনা তখন হইতেই ইহাকে গৌরবান্বিত করিতে থাকে। গত মাসের বিশেষ 'রবীন্দ্রসংখ্যা'য় তাঁহার একটি রচনা প্রার্থনা করিলে ৯ই এপ্রিল, ১৯৬০ তারিখে স্বহস্তলিখিত একটি পত্রে আমাদের লেখেন—

"প্রীতিভাজনেষু,

আপনার ৬।৪এর চিঠি। কয়েক মাস যাবৎ আমি পীড়িত, লেখবার শক্তি নেই, সেকারণে আপনার অনুরোধ রাখা আমার অসাধ্য। সম্প্রতি যা ছাপা হয়েছে তা অসুখের আগে লেখা।

শুভার্থী—রাজশেখর বসু"

ঠিক আঠার দিন পরে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এই শেষ রচনাটুকু পত্রস্থ করাতে 'শনিবারের চিঠি'র

সহিত তাঁহার চৌত্রিশ বৎসরের সম্পর্ক ঘটিল। বাংলা-সাহিত্যের পরশুরামের সর্বপ্রথম সচিত্র জীবনী প্রকাশের গৌরবও 'শনিবারের চিঠি' দাবি করিতে পারে। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যার ৪৫৭-৪৬৬ পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় "পরশুরাম" প্রবন্ধ বাহির হয়। সেই প্রবন্ধে আমরা তাঁহার পিতা চন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের কীর্তি গোড়ায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাজশেখর বসুর জন্ম, বাল্যপরিবেশ, স্কুল-কলেজের শিক্ষা ও কর্মজীবনের পরিচয় দিয়া শেষে লিখিয়াছিলাম:

"যে কারণে রাজশেখরের জীবনী আমাদের আলোচনার বিষয় হইয়াছে, এবারে তাহার কথাই বলিব। সে ইতিহাসও অতিশয় সংক্ষিপ্ত এবং তাঁহার মন্ত্রগুপ্তির জন্য অসম্পূর্ণ। সাহিত্যের আকর্ষণ তাঁহার কর্মজীবনের আকর্ষণ হইতে কখনই প্রবলতর হয় নাই; অত্যন্ত লঘু-ভাবেই তিনি এই গুরু কার্য করিয়াছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকেই বাংলা দেশে সাহিত্য-চর্চা সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তখন জীবিত এবং রবীন্দ্রনাথ প্রায় মধ্যগগনে উঠিয়া প্রখর তাপ বিকিরণ করিতেছেন। হাম-বসন্তের মত কবিতা লেখাটাও সে যুগের বাঙালীর বালব্যাধিতে দাঁড়াইয়াছিল। এই ব্যাধির প্রকোপে রাজশেখরও কিছুদিন ভুগিয়াছিলেন। তিনি 'সিন্‌থেটিক' কবিতা লেখা অভ্যাস করিতেছিলেন। তাঁহার মধ্যে যে ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যান মানুষটি বাস করেন, তিনি কবিতা রচনা ব্যাপারটাকেও একটা যান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে ফেলিবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু ১৬ বৎসর বয়সে এই হামরোগ তাঁহাকে ছাড়িয়া যায়। পরবর্তী কালে 'প্রবাসী' পত্রিকায় একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন, কাব্য-মার্গে তাঁহার সাধনার ইহাই একমাত্র মুদ্রিত পরিচয়।

সাহিত্য-রচনার ওজুহাতে যে ভাবের আবেগের উল্লেখ সাহিত্যিক মাত্রই করিয়া থাকেন, রাজশেখরে তাহার একান্ত অভাব; তিনি বাহিরেও যেমন গম্ভীর প্রকৃতির মুখচোরা লোক, ভিতরেও তেমনই সর্বপ্রকার আতিশয্য এড়াইয়া চলেন। সেরূপ লোকের পক্ষে সাহিত্যসৃষ্টি একটা অভাবনীয় ব্যাপার। তাঁহার দ্বারা এই অঘটন কি করিয়া সংঘটিত হইল, তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর গিরীন্দ্রশেখর হয়তো চেষ্টা করিলে তাহা নির্ণয় করিতে পারিবেন। আমরা দেখিয়াছি, তিনি নির্বাক শ্রোতা হিসাবে আড্ডায় বসিয়া আছেন; "হাঁ"ও বলিতেছেন না, "না"ও বলিতেছেন না; ঠোঁটের হাসি দরিদ্রের মনোরথের মত একটুখানি চমক দিয়াই মিলাইয়া যাইতেছে। কিন্তু আমাদের অজ্ঞাতসারে তাঁহার শিল্পী মন যে সেই অবসরে সাহিত্যের রসদ সংগ্রহ করিয়া বেড়াইয়াছে, হঠাৎ এক একটা "লম্বকর্ণ," "বিরিঞ্চি-বাবা" অথবা "কচি-সংসদে" তাহার পরিচয় পাইয়া চমকাইয়া উঠিয়াছি। ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যানও যে সর্বোচ্চ শ্রেণীর শিল্পী হইতে পারেন, পরশুরাম-রূপী রাজশেখর বসু তাহার প্রমাণ।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে এই শুদ্ধ শান্ত নিরীহদর্শন বিসুবিয়সে প্রথম অগ্ন্যুৎপাত দৃষ্ট হয়; তিনি "শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড" গঠন করিয়া বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে এক নূতন সম্ভাবনার কথা জ্ঞাপন করেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মাত্র দশ বৎসরে আমরা এই সম্ভাবনার যে পরিণতি দেখিয়াছি, তাহাকে অত্যাশ্চর্য বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এই দশ বৎসরেই তাঁহার সাহিত্য-জীবনের পূর্ণ বিকাশ; অতি অল্প আয়োজনে কোনও প্রকার উদগ্রতা অথবা বাহুল্যের সাহায্য না লইয়া তিনি বাংলা সাহিত্যে আপনার আসনখানি দখল করিয়া বসিয়াছেন; তাঁহার এই বিজয় তাঁহার স্বভাবের অনুযায়ীই হইয়াছে।

১৯৩২ সালের পর তাঁহার সাহিত্য-সাধনার ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। 'চলন্তিকা' তৎপূর্বেই বাহির হইয়াছে, তিনি উহার পরবর্তী সংস্করণ প্রস্তুতে মনোনিবেশ করিয়াছেন; 'হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি গল্প' যদিও ১৯৩৭ সালে বাহির হইয়াছে, গল্পগুলির প্রত্যেকটিই কিন্তু ১৯৩২ সালের পূর্বের রচনা। 'লঘুগুরু'র শেষ তিনটি ছাড়া বাকি সবগুলি প্রবন্ধই ১৯৩২ সালের পূর্বের রচনা। অর্থাৎ বিসুবিয়স আবার শান্ত হইয়াছে। তাঁহাকে দেখিলে আর বুঝিবার জো নাই যে, একদিন 'গড্ডলিকা' 'কজ্জলী'র লাভাস্রোত এখান হইতেই উদ্গত হইয়াছিল।

ইহাতে আমাদের দুঃখ নাই। দাতা যখন আত্ম-গোপন করিয়া দান করেন, তখন পরিমাণের দিকে আমরা লক্ষ্যই করি না; কারণ জানি, বিনিময়ে যশ-সম্ভারের প্রতি তাঁহার মোটেই আগ্রহ নাই। কিন্তু পরিমাণে অল্প হইলেও পরশুরামের দান যে ওজনে বেশী, তাহাও তো প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। সারা বাংলা দেশের চিত্ত তিনি অধিকার করিতে পারিয়াছেন—স্ত্রী-পুরুষ উচ্চ-নীচ নির্ব্বিশেষে। হালকা রসের পরিবেশন করিয়া এমনটি বাংলা দেশের আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। ইহার জন্য দায়ী পরশুরামের ভাষা, পরশুরামের সর্বমানবীয়তা। পরশুরামের বর্ণিত ঘটনা নিত্য বর্ত্তমান—ইহাই পরশুরামের পরশুরামত্ব।"

১৩৪৬ পৌষের প্রায় চৌদ্দ বৎসর পরে ১৩৬০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণে আমরা সাহিত্যশিল্পী পরশুরামকে বাদ দিয়া সাহিত্যকর্মী রাজশেখর বসুর কীর্তিকথা আলোচনা করিয়া লিখিয়াছিলাম :

"শ্রীরাজশেখর বসু অতখানি সৌভাগ্য অর্জন করেন নাই, চলন্তিকার সাতটি সংস্করণ হওয়া সত্ত্বেও। তাঁহার খ্যাতি বিদগ্ধজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। 'চলন্তিকা' যে কত বড় একটা "অ্যাচিভমেণ্ট" তাহা বুঝিতে হইলে বাংলা ভাষার পূর্বাপর ইতিহাসের সহিত পরিচয় আবশ্যক। রামকমল-গিরিশ-যোগেশ-জ্ঞানেন্দ্রমোহনকে তিনি যে প্রতিভাবলে অতিক্রম করিয়াছেন তাহা ধরা সহজসাধ্য নহে। তবে ফলেন পরিচীয়তে; ফল অতি স্পষ্ট। আজ 'চলন্তিকা' ভাষা, বানান ও পরিভাষার সংশয় সমাধানে আমাদের একমাত্র অবলম্বন হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের অর্থাৎ সাধারণ লেখক সম্প্রদায়ের মাত্র সাড়ে ছয় টাকাতেই সর্ববিধ কাজ হইতেছে। শব্দ নির্বাচনে এবং ক্রমিক শব্দার্থ-নির্ধারণে যে বিবেচনা ও বিচক্ষণতার পরিচয় 'চলন্তিকা'য় আমরা পাই তাহা সম্পূর্ণ অভিনব। এইখানেই শ্রীরাজশেখর বসুর কৃতিত্ব। এইখানেই তিনি বৈজ্ঞানিক অভিধানকার। ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তিনি বাংলা ভাষার বৈজ্ঞানিক গোড়াপত্তন করিয়াছেন এবং বাঙালীর ঢিলাঢালা এলোমেলো প্রকৃতিতে একটা বাঁধন আনিয়া দিয়াছেন। অথচ এই বাঁধনে কষ্ট নাই, অপমান নাই। 'চলন্তিকা' মারফৎ আমরা আমাদের অজ্ঞাতসারেই ভাষার শৃঙ্খলা শিখিতেছি। সাহিত্যকর্মী রাজশেখরের ইহা একটি বিপুল কীর্তি।

তাঁহার দ্বিতীয় কীর্তি রামায়ণ-মহাভারতের সারানুবাদে। 'লঘুগুরু'র আলোচনা বাদ দিতেছি শুধু এই কারণে যে ইহা সমস্যাসমাকুল। আমাদের সমাজে, আমাদের ভাষায়, আমাদের সাহিত্যে নানা দিক দিয়া যেসকল সমস্যার উদ্ভব প্রতিনিয়ত হইতেছে বসু মহাশয় তাঁহার নিজের মত ও ধারণা অনুযায়ী তাহার সমাধান দিতে চেষ্টা করিয়াছেন; বিতর্কের অবকাশ আছে, ইহা সর্ববাদিসম্মত নয়। ইহাতে জিজ্ঞাসুজনের প্রশ্নের জবাব আছে, সর্বসাধারণের উপভোগ্য রস নাই। রামায়ণ-মহাভারতের সারানুবাদে যাহা পরিবেষিত হইয়াছে তাহা সর্বজনগ্রাহ্য, বাঙালীমাত্রেরই অবশ্যগ্রাহ্য। রামায়ণের হেমপণ্ডিতকৃত অনুবাদ আছে, বর্ধমান রাজবাটী ও পঞ্চানন তর্করত্নের অনুবাদ আছে, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বর্ধমান রাজবাটী এবং পঞ্চানন-কৃত মহাভারতেরও অনুবাদ আছে, কিন্তু এইগুলি আয়তনের বিপুলতায় ও ভাষার দুরূহতায় সাধারণ বাঙালীর অন্তঃপুরে ও অন্তঃকরণে প্রবেশলাভ করে নাই; বহির্বাটীর পুস্তকাধারেই সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। অমরেশ্বর ঠাকুরের রামায়ণ এবং মহামহো-পাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের মহাভারত আরও বিপুলকায়; শেষেরটি এখনও অসম্পূর্ণ। লঘু রামায়ণ, লঘু মহাভারত সংস্কৃতে আছে কিন্তু বাংলা অনুবাদ পাওয়া যায় না। শ্রীরাজশেখর বসু প্রত্যেক ভারতীয়ের অবশ্যপাঠ্য এই দুই মহাগ্রন্থের সার বাঙালীদের জন্য প্রস্তুত ও পরিবেষণ করিয়া ভারতবর্ষের ঐতিহ্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের সুযোগ তাহাদের দিয়াছেন। নির্যাস বাহির করিতে তাঁহাকে যে কি পরিমাণ বিচার ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছে যাঁহারা মূলের সহিত মিলাইয়া পড়িবেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। তিনি নিজে সুরসিক ও সুসাহিত্যিক বলিয়া খণ্ডিত অবস্থাতেও কাহিনীর ধারাবাহিকতা ও বর্ণনার রস বজায় রাখিতে পারিয়াছেন, চিরন্তন

উক্তিগুলির কোনটিই বাদ দেন নাই। মূলের সৌন্দর্য বজায় রাখিতে তৎসম শব্দ বহুল ব্যবহৃত হইয়াছে কিন্তু অর্থগ্রহণের পক্ষে সেগুলি বিশেষ বাধার সৃষ্টি করে না। এই সারানুবাদ-দুইটি বাঙালীর জ্ঞানভাণ্ডারে চিরদিনের সঞ্চয় হইয়া রহিল। বাঙালী ছেলেদের ভাষাশিক্ষার জন্য রবীন্দ্রনাথ ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথের মহাভারতের অনুবাদকে 'কুরু-পাণ্ডব' নামে মার্জিত করিয়া পরিবেষণ করিয়াছিলেন। রাজশেখরের সারানুবাদ-দুইটি সমগ্র বাঙালীজাতির শুধু জ্ঞানার্জনের নয়, ভাষা-শিক্ষারও বাহন হইবে।

'মেঘদূতে'র অনুবাদও কেবলমাত্র সাহিত্যকর্ম নয়, স্থানে স্থানে সাহিত্যসৃষ্টির পর্যায়ে উঠিয়াছে; ব্যাখ্যার সাহায্যে মূলের রসগ্রহণের এমন সুযোগ অন্য কোনও মেঘদূতের সংস্করণে পাওয়া যায় না, অথচ রাজশেখরের সংস্করণ কত সংক্ষিপ্ত ও নিরাভরণ! তাঁহার কৃত 'গীতা'র অনুবাদও আমরা দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি, এমন সংস্কারবাহুল্যবর্জিত অথচ সরল অনুবাদ আর হইতে পারে না। দুঃখের বিষয় তাঁহার 'গীতা' তিনি প্রকাশ করিতে নারাজ।

'কুটিরশিল্প' ও 'ভারতের খনিজ' বই দুইখানির বিষয়বস্তু নামেই প্রকাশ; এগুলি সাহিত্যকর্ম না হইলেও অতিশয় প্রয়োজনীয় কর্ম বলিয়া বিবেচিত হইবে।

'হিতোপদেশের গল্প' শিশুদের জন্য লিখিত। হিতোপদেশের অতিপ্রসিদ্ধ শ্লোকগুলির বাংলা কাব্যানুবাদে তাঁহার কবিপ্রতিভার নিদর্শন আছে। অবশ্য অন্য কবিতা যে তিনি একেবারেই রচনা করেন নাই তাহা নহে তবে তাঁহার গদ্যকীর্তির সঙ্গে তাহা তুলনীয় নহে।"

তাহার পর বিগত সাত বৎসরে তাঁহার কয়েকটি গল্পের বই ও দুইটি প্রবন্ধ-পুস্তক বাহির হইয়াছে। তন্মধ্যে মিত্র ও ঘোষ প্রকাশিত 'চলচ্চিন্তা' এখনও দেখিবার সুযোগ হয় নাই। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রকাশিত 'বিচিন্তা'য় তাঁহার শেষ জীবনের সামাজিক ও সাহিত্যিক চিন্তাধারা ১৯টি প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। "বৈজ্ঞানিকবুদ্ধি" প্রবন্ধে তাঁহার যুক্তিপ্রবণ বৈজ্ঞানিক মনের পরিচয় পাই; যে মনের শেষ কথা:

"যিনি বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সেবক তিনি ধীরভাবে ভ্রমপ্রমাদ যথাসাধ্য পরিহার ক'রে সত্যের সন্ধান করেন, প্রবাদকে প্রমাণ মনে করেন না, প্রচুর প্রমাণ না পেলে কোনও নূতন সিদ্ধান্ত মানেন না, অন্য বিজ্ঞানীর ভিন্ন মত থাকলে অসহিষ্ণু হন না, এবং সুপ্রচলিত মতও অন্ধভাবে আঁকড়ে থাকেন না, উপযুক্ত প্রমাণ পেলেই বিনা দ্বিধায় মত বদলাতে পারেন। জগতের শিক্ষিত জন যদি সকল ক্ষেত্রে এইপ্রকার উদার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি প্রয়োগ করতে শেখেন তবে কেবল সাধারণ ভ্রান্ত সংস্কার দূর হবে না, ধর্মান্ধতা ও রাজনীতিক সংঘর্ষেরও অবসান হবে।"

এই গ্রন্থে "সাহিত্যিকের ব্রত" প্রবন্ধে তিনি বাংলা-দেশের সাহিত্যিকদের যে চরম নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন তাহা স্মরণে রাখিলে দেশের কল্যাণ হইবে। তিনি বলিয়াছেন:

"ব্যক্তিগত রাজনীতিক মত যাই থাকুক, আমাদের সকল লেখকই তাঁদের রচনা দ্বারা দেশব্যাপী মোহ আলস্য আর দুষ্প্রবৃত্তি দূর করার চেষ্টা করতে পারেন। এর চেয়ে বড় ব্রত এখন আর কিছু নেই। জনকতক রাজনীতি নিয়ে বিতণ্ডা করুন, কিন্তু রাজনীতির চেয়ে মনুষ্যত্ব আর সমাজধর্ম বড়। দেশের সাহিত্যিকরা সামাজিক কর্তব্যবুদ্ধি জাগরিত করার চেষ্টা করুন। আমাদের প্রয়োজন—হ্যারিয়েট বীচার স্টো এবং দীনবন্ধু মিত্রের ন্যায় শক্তিশালী বহু লেখক—যাঁরা সামাজিক পাপের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উত্তেজিত করতে পারবেন।"

তেত্রিশ বৎসর পূর্বে ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে 'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে পর পর যে দুইটি প্রবন্ধের দ্বারা তাঁহার যোগসূত্র স্থাপিত হয় সেই প্রবন্ধ দুইটি আজও গ্রন্থাকারে অমুদ্রিত আছে। ইহার পূর্বে তিনি মাত্র তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন—১৩৩১-এ "নামতত্ত্ব", ও "ডাক্তারি ও কবিরাজি" এবং ১৩৩২-এ "ভদ্রজীবিকা"। গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত তাঁহার চতুর্থ ও পঞ্চম প্রবন্ধ দুইটি পুরাতন 'শনিবারের চিঠি' হইতে আধুনিক কালের পাঠকদের উপহার দিয়া পরশুরাম-প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি:

সাহিত্য-সংস্কার

সব দিকে শুভলক্ষণ দেখা যাইতেছে। হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ মিটিয়াছে, মিস মেয়ো অনুতাপে দগ্ধ হইতেছেন, ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ বর্জ্জন ও ইংলিশম্যানের অর্জ্জন জোরে চলিতেছে, রিফর্ম কমিশনও নিশ্চয় বয়কট হইবে। কিন্তু আসল কাজই বাকি রহিয়াছে,—খুড়ার গঙ্গাযাত্রা।

সজ্ঞানে তীরস্থ করার উপযোগী খুড়া পাওয়া দুর্লভ। কিন্তু বিস্তর লেখক আছেন, ছোট বড় মাঝারি,—তাঁদের দুরস্ত করাই এখন মস্ত কাজ। লেখকগণের নিজের চরিত্র সংশোধনের কথা বলিতেছি না। কিন্তু তাঁদের সৃষ্ট নায়ক-নায়িকার চরিত্র, তারা কি বলে কি করে, তাহা উপেক্ষার বিষয় নয়।

গীতায় ভগবান একটি খাঁটি কথা বলিয়া গেছেন—কিং কর্ম কিং অকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ—অর্থাৎ, কি কর্ম আর কি অকর্ম সে বিষয়ে কবিদের কাণ্ডজ্ঞান নাই। এই কাণ্ড-জ্ঞানের অভাবে যে সব অনর্থ ঘটিয়াছে বা ঘটিতে পারে তার প্রতিকার আবশ্যক। আমাদের

প্রথম কর্ত্তব্য—বড় বড় লেখকগণ যা লিখিয়া ফেলিয়াছেন তার একটা গতি করা। দ্বিতীয় কর্ত্তব্য—ভবিষ্যতে যাঁরা লিখিবেন তাঁদের জন্য একটা আদর্শ-নির্দ্দেশ।

ছোটো-খাটো লেখকগণ ধর্ত্তব্য নন, কারণ তাঁদের লেখা কালক্রমে আপনিই মুছিয়া যাইবে। কিন্তু যাঁরা সম্রাট, তাঁদের লেখা আবশ্যক মত সংস্কার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। শুনিয়াছি রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখা দূরে থাক তাঁর গানের সুরেও কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দিতে চান না। যদি সত্য হয় তবে দুঃখের বিষয়। ষ্টিফেনসন প্রথমে যে রেলগাড়ীর এঞ্জিন সৃষ্টি করেন তার চিম্‌নি ছিল চার হাত, হেলিয়া দুলিয়া কোনো গতিকে গজেন্দ্র-গমনে ঘণ্টায় পাঁচ-দশ মাইল চলিত। আর এখনকার পঞ্জাব বম্বে মেলের এঞ্জিন দেখ, কি পরিবর্ত্তন। কিন্তু ষ্টিফেনসনের মর্য্যাদা কিছুই কমে নাই। যদি রবীন্দ্রনাথের বাউলের সুর ওস্তাদ-পরম্পরায় সংস্কৃত হইয়া বাগেশ্রী-চৌতালে পরিণত হয়, তবে তাঁর ক্ষুণ্ণ হওয়া অনুচিত, কারণ ক্রমোন্নতিই জগতের নিয়ম। যদি কোন দক্ষ ব্যক্তি গোরার উন্নত সংস্করণে পরেশ বাবুর বড় মেয়ে লাবণ্যর সঙ্গে পানুবাবুর বিবাহ দেয়, তবে দেখিতে শুনিতে ভালই হয়। অধিকন্তু, যদি রেল-লাইনের উপরেই সানাই বাজাইয়া মোটর চালানো যায়, অর্থাৎ নরেশচন্দ্রের কমলের সঙ্গে যদি শরৎচন্দ্রের কিরণময়ীর শুভবিবাহ সংঘটিত হয় এবং তদুপলক্ষে যতীন্দ্র সিংহ মহাশয়ের চকার-ভর্ত্তি সাহেব সঙ্গীত রচনা করেন, তবে মস্ত একটা সামাজিক সমস্যার সমাধান হইয়া যায়। এই উপায়ে প্রবীণ নবীন সমস্ত বড় বড় লেখকদের রচনা অদল বদল করিয়া ছাঁটিয়া তালি দিয়া নির্দ্দোষ চিরস্থায়ী সাহিত্যে পরিণত করা যাইতে পারে।

আমাদের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য—ভবিষ্যতের জন্য আদর্শ নির্দ্দেশ। এই আদর্শ এমন হওয়া চাই যাতে আর্ট ও সমাজ দু-ই বজায় থাকে।

আর্ট কি? এক কথায় বলা যাইতে পারে—যা ভাল লাগে তাই আর্টের অঙ্গ বা রস-বস্তু, এবং তা ভদ্র-জনের মুখরোচক করিয়া পরিবেশন করাই আর্ট। অবশ্য একই বস্তু সকলের ভাল না লাগিতে পারে, অতএব আর্টের সৃষ্টি ও উপভোগ কতকটা ব্যক্তিগত। কিন্তু এমন জিনিষ অনেক আছে যা অনেকেরই ভাল লাগে কেবল মাত্রার তারতম্য লইয়াই বিবাদ। সকলেই বলে—দুধ অতি উপাদেয় বস্তু, কিন্তু কেউ ঢক্‌ঢক্‌ করিয়া খায়, কেউ একটু-আধটু খায়। পেঁয়াজের দুর্গন্ধ প্রসিদ্ধ, অথচ মাত্রা-ভেদে ভদ্র-অভদ্র অনেকেরই রুচিকর। অতএব দুধ ও পেঁয়াজ দু-ই অপরিহার্য্য রসবস্তু। তথাপি, সমাজ মনে করে—দুধ যত খাওয়া যায় ততই বলবৃদ্ধি হয়, কিন্তু পেঁয়াজ বেশি মাত্রায় বিকট। তাই আমরা গতানুগতিক ভাবে দুধ-খোরকে বলি সাত্ত্বিক, পেঁয়াজ-খোরকে বলি নেড়ে। ইহা অন্ধ সমাজের কথা, আমাদের অন্তরের কথা নয়। দয়া দাক্ষিণ্য ভক্তি প্রীতির কথা শুনিতে আমাদের বেশ ভাল লাগে তা অবশ্য মানি; কিন্তু কেচ্ছা কেলেঙ্কারি, খুনোখুনি ব্যভিচার, নরমাংস নারীমাংস—এ সকলও উপযুক্ত অনুপানের সহিত কম উপভোগ্য নয়।

সর্ব্বভুক্ পাঠক হাঁ করিয়া আছে, ওস্তাদ রসস্রষ্টা কাহাকেও বঞ্চিত করিতে, কিছুই বাদ দিতে পারেন না। তিনি শান্ত করুণ রসের স্রোত বহাইবেন, আবার ষড়রিপুর বিচিত্র খেলা দেখাইয়াও তাক্ লাগাইয়া দিবেন। কিন্তু নিন্দুকের মুখ বন্ধ করিবেন কোন্ উপায়ে? পূর্ব্বাচার্য্যগণ তাহা দেখাইয়া গেছেন। ভারতচন্দ্র পায়সান্ন পরিবেশনের সঙ্গে কালীনামের গরম মশলা দিয়া সুঁটকী মাছ চালাইয়াছিলেন। কিন্তু এ যুগে তাহা চলিবে না, কারণ উক্ত মাছের নূতনত্ব নাই, কালীনামেরও আর তেমন হজম করাইবার ক্ষমতা নাই। মনীষী রেনল্ড্‌স্ ও তাঁর ভারতীয় শিষ্যগণ উৎকৃষ্টতর উপায় অবলম্বন করিয়াছেন,—তাঁরা যথাসাধ্য আর্টের কেরামতি করিয়া অবশেষে দেখাইয়াছেন ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয়। ইহাই নিন্দুকের প্রকৃষ্ট প্রত্যুত্তর। এখন আর্টের সীমা আরো বর্দ্ধিত হইয়াছে, প্রাচীন লেখকগণ যা স্বপ্নেও ভাবেন নাই এমন নব নব রসবস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে,—আলকাতারা হইতে স্যাকারিন্, বানরের অঙ্গে নব যৌবনের গ্রন্থি, ছাগলের মনের গোপন কোণে উদ্দাম প্রেমের আদিধারা। কিছুই বাদ দিবার দরকার নাই, যা কিছু ব্যাপার হইয়া থাকে বা ঘটিতে পারে তা-ই আর্টের গণ্ডীতে পড়ে। কিন্তু শেষ রক্ষা চাই। যত ইচ্ছা নরক মন্থন করিয়া রত্ন উদ্ধার কর, কিন্তু উপসংহারে সমস্ত পাপাত্মার নাক কাটিয়া দাও।

একটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিব, কিন্তু প্লট মনে আসিতেছে না। অপরের প্লট যে আত্মসাৎ করিব তার যো নাই,—আজকালকার ছোকরারা অতি চালাক, রুশিয়া হইতে চুরি করিলেও ধরিয়া ফেলিবে। অতএব ঋণ স্বীকার করিয়াই চন্দ্রশেখর হইতে দু-একটি চরিত্র লইব। বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীকে মন্দ আঁকেন নাই, তবে প্রায়শ্চিত্তটা বেশী হইয়াছে,—আজকাল অত না হইলেও চলে। কিন্তু আধুনিক আর্টের ব্যাপ্তি না জানায় প্রতাপকে তিনি একেবারে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছেন। এই প্রতাপের চরিত্র আমূল সংশোধিত করিয়া কিঞ্চিৎ নমুনা দেখাইতেছি।—

প্রতাপ রায় মরে নাই। ঘা সারিবামাত্র সে চন্দ্রশেখরের বাড়ি আসিয়া হাঁকিল—ভটচায, ও ভটচায।

চন্দ্রশেখর নামাবলী গায়ে খড়ম পায়ে আসিয়া বলিলেন—কে ও, প্রতাপ যে। বেশ সেরেচো বাবা?

প্রতাপ একটি তাড়ি-রঙের ধুতির উপর তাড়ির ভাঁড়ের রঙের মেরজাই পরিয়া আসিয়াছে। তার চোখ লাল, দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। টলিতে টলিতে বলিল—শৈবলিনীকে ডেকে দিন।

চন্দ্রশেখর মাথা নীচু করিয়া একটু ভাবিয়া বলিলেন—নাই বা দেখা করলে।

—দেখা করতে আমি আসিনি, একেবারে নিয়ে যেতে এসেচি। ডাকুন শীগ্‌গির।

—সে কি প্রতাপ? তিনি যে কুল-বধূ।

—হলেনই বা, এক কুল ছেড়ে অন্য কুলে যাবেন, আমি ত আর লরেন্স ফষ্টর নই। সব ঠিক করেচি, তোকি খাঁ প্রস্তুত, আজই শৈবলিনীকে মোছলমান বানিয়ে দেবে,—তারপর আপনাকে তাল্লাক, আমার সঙ্গে নিকে। আমার নাম এখন আফ্‌তাব্‌ খাঁ। ভয় নেই ঠাকুর, জাত যাবে না, কালই আবার রামানন্দ স্বামীকে ধ'রে দুজনে শুদ্ধি নিয়ে নেব।

চন্দ্রশেখর বসিয়া পড়িয়া বলিলেন—তুমি কি জাল-প্রতাপ?

প্রতাপ বজ্র-নিনাদে বলিল—আমি জাল! মূর্খ ব্রাহ্মণ, কাহার সম্পত্তি তুমি ভোগ করিতে চাও? এক বৃন্তে দুটি ফুল, কে ছিঁড়িয়াছিল? (মূল গ্রন্থ দেখ) ভণ্ড জ্যোতিষি, শৈবলিনীর অন্তরের কথা বিবাহের পূর্ব্বে গণিয়া দেখ নাই?

চন্দ্রশেখর কাতর কণ্ঠে কহিলেন—খুবই অন্যায় হ'য়ে গেছে বাবা। স্ত্রী-চরিত্র ত জ্যোতিষে গণা যায় না। এই কলিকালে যে বিবাহের পূর্ব্বে প্রেম হ'তে পারে তা জানতুমই না। যেতে দাও বাবা, যেতে দাও,—যা হবার হ'য়ে গেছে। বেচারী এখন শান্তিতে আছে, সংসারধর্ম্ম করচে, পুরাণো কথা সব ভুলেচে। আহা, আর তাকে উদ্‌ব্যস্ত কোরো না।

প্রতাপ উন্মত্তের ন্যায় হাসিয়া বলিল—এই বিদ্যে নিয়ে তুমি পণ্ডিতী কর? যে অন্তরে অন্তরে আমারই, তাকে তুমি কোন্ অধিকারে আট্‌কে রাখ্‌বে? বল ব্রাহ্মণ, বল বল। যে আমার শৈশব-সঙ্গিনী, সে আজু কাঁহা মেরী হৃদয়কী-ঈ ঈ—(ষ্টার থিয়েটার দেখ)।

চন্দ্রশেখর ভীত হইয়া বলিলেন—একটু ঠাণ্ডা হও বাবা। আমি বুঝিয়ে দিচ্চি।—পাপের স্পর্শ হ'তে কেউ রক্ষা পায় না, শৈবলিনীও ছেলেবেলায় পাপে পড়েছিলেন—

—অ্যাঁ! পূর্ব্বরাগ পাপ?

—সর্ব্বত্র পাপ নয় বাবা। কিন্তু যেখানে স্বাধীন বিবাহ চলিত নেই, সেখানে পূর্ব্বরাগের ফলে পরে শান্তিভঙ্গ হ'তে পারে সেজন্যই পাপ।

—তবে পাপিয়সীকে ছেড়ে দাও না ঠাকুর।

—খাপ্‌পা হয়ো না বাবা। পাপ হ'লই বা—ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথিনি,—অমন একটু আধটু পাপ আমরা সবাই ক'রে থাকি। কিন্তু সেটা নির্মূল করাও যায়। শৈবলিনী মন্ত্রলাভ করেচেন, যে মন্ত্রবলে চিরপ্রবাহিত নদী অন্য খাতে চালানো যায়—(মূল গ্রন্থ দেখ)

—বুঝেচি বুঝেচি, বুজরুকি ক'রে তাকে আট্‌কে রাখ্‌তে চান! ও চলবে না ঠাকুর, তুমি তাকে আট্‌কাবার কে? আমার শৈবলিনীকে চাই, এক্ষুনি এক্ষুনি। উচাটন মন যারে ধরিবারে ধায়, তারে কেন-ক্যানও-কেন নাহি পায়! (ষ্টার থিয়েটার দেখ)

চন্দ্রশেখর খাড়া হইয়া উঠিয়া বলিলেন—ক্যানও নাহি পায় তা আমি বুঝিয়ে দিচ্চি। রামচরণ অ রামচরণ—

রামচরণ এখন ভট্‌চায-বাড়িতেই কাজ করে। সাড়া দিল—আজ্ঞে।

—ওরে নিয়ে আয় ত আমার ছড়িটা, সেই বেতের লিক্‌লিকে ছড়ি। বাঁশের লাঠিটা নয়, বুঝেচিস্?

প্রতাপ বলিল, ছড়ি কি হবে, ভট্‌চায?

—তোমায় লাগাব। দু-এক ঘা খেলেই বুদ্ধি সাফ হ'য়ে যাবে। রামচরণ, জল্‌দি—

প্রতাপ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—অ্যাঁ, মারবে? প্রতাপ রায়ের গায়ে হাত! তবে রে পাজি, শুয়ার—

—অ রামচরণ, বেতের ছড়িতে হবে না রে, বাঁশের লাঠিটাই আন্—

প্রতাপ সদর্পে পলায়ন করিল। আর্ট ও সমাজধর্ম্ম দু-ই বজায় রহিল, অথচ লাঠি ভাঙিল না। [অগ্রহায়ণ ১৩৩৪]

তামাক ও বড়-তামাক

মানুষ ও জন্তুর মধ্যে প্রধান প্রভেদ এই, যে মানুষ নেশা করিতে শিখিয়াছে, জন্তু শেখে নাই। বিড়াল দুধ মাছ খায়, অভাবে পড়িলে হাঁড়ি খায়, ঔষধার্থে ঘাস খায়, কিন্তু তাকে তামাকের পাতা বা গাঁজার জটা চিবাইতে কেউ দেখে নাই। মানুষ অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করে, ঘর-সংসার পাতে, জীবন-ধারণের জন্য যা-কিছু আবশ্যক সমস্তই সাধ্যমত সংগ্রহ করে, কিন্তু এতেই তার তৃপ্তি হয় না—সে একটু নেশাও চায়। অবশ্য, গম্ভীর-প্রকৃতি হিসাবী লোকের কথা আলাদা। তাঁদের কাছে নেশা মাত্রই অনাবশ্যক; কারণ, তাতে দেহের পুষ্টি হয় না, জ্ঞানেরও বৃদ্ধি হয় না, বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে অপকারই হয়। তথাপি বহু লোক কোনো অজ্ঞাত অভাব মিটাইবার জন্য নেশার শরণাপন্ন হয়।

নেশা বহু প্রকার, যথা তামাক গাঁজা মদ সঙ্গীত কাব্য উপন্যাস প্রভৃতি। সকলগুলির চর্চ্চার স্থান এই ক্ষুদ্র পত্রিকায় নাই, সুতরাং তামাক ও গাঁজা সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক।

তামাক আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই তার নিন্দুক জুটিয়াছে। তামাক খাইলে ক্ষুধা নষ্ট হয়, বুদ্ধি জড় হয়, হৃৎপিণ্ড দূষিত হয়, ইত্যাদি। কিন্তু কে গ্রাহ্য করে? জগতের আবাল-বৃদ্ধ তামাকের সেবক, বনিতারাও হইয়া উঠিতেছেন। তামাকের বিরুদ্ধে যে-সব ভীষণ অভিযোগ শোনা যায়, তামাক-খোর তার খণ্ডনের কোনো প্রয়াসই করে না, শুধু একটু হাসে ও নির্ব্বিকার-চিত্তে টানে। কিন্তু তাদের অন্তরে যে জবাব অস্ফুট হইয়া আছে, আমরা তার কতকটা আন্দাজ করিতে পারি।—মশায়, তামাক জিনিষটা স্বাস্থ্যের অনুকূল না হইতে পারে, কিন্তু স্বাস্থ্যই কি সব চেয়ে বড়? একটু না হয় ক্ষুধা কমিল, চেহারায় পাক ধরিল, হৃৎপিণ্ড ধড়ফড় করিল,—কিন্তু আনন্দটা কি কিছুই নয়? মোটের উপর লাভটাই আমাদের বেশি। লোকসানের মাত্রা যদি বেশি হইত, তবে আপনিই আমরা ছাড়িয়া দিতাম, উপদেশের অপেক্ষা রাখিতাম না। আমাদের শরীর মন বেশ ভালই আছে, ভদ্র-সমাজে কেউ আমাদের অবজ্ঞা করে না। হাঁ, কোনো কোনো অর্ব্বাচীনের তামাক খাইলে মাথা ঘোরে তা মানি; কিন্তু দু-এক জনের দুর্ব্বলতার জন্য আমরা এত লোক কেন এই আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইব?

এই সময় গঞ্জিকাসেবীর বাজখাঁই গলার আওয়াজ শোনা গেল—ভায়া, আমরাও আছি। আমাদের তরফেও কিছু বল।

তামাক-খোর ধমক দিয়া বলেন—দূর হ লক্ষ্মীছাড়া গেঁজেল! তোদের সঙ্গে আমাদের তুলনা?

গাঁজা-খোর ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন—সে কি দাদা? তোমাতে আমাতে ত কেবল মাত্রার তফাৎ। তুমি খাও তামাক, আমি খাই বড়-তামাক। তোমরা সৌখিন বড়লোক, তাই বিস্তর আড়ম্বর,—রূপার ফরসি, জরিদার সটকা, সোনার সিগারেট-কেস, কলের চকমকি। আমরা গরীব, তাই তুচ্ছ সরঞ্জামের বড়-বড় নাম রাখিয়াই সখ মিটাই। গাঁজা কাটিবার ছুরিকে বলি রতন-কাটারি, কাঠের পিঁড়িকে বলি প্রেম-তক্তি, ধোঁয়া ছাঁকিবার ভিজা ন্যাতাকে বলি জামিয়ার, গাঁজা ডলিবার সময় মন্ত্র বলি—বোম্ শঙ্কর কঙ্কড় কি ভোলা! আমাদের নেশার আয়োজনেই কত কাব্য-রস,—তোমরা ত পরের প্রস্তুত জিনিষ টানিয়াই খালাস। আর, আনন্দের কথা যদি ধর, তবে তোমরা বহু পশ্চাতে। যমিতানন্দ জানো? আমরা তাই উপভোগ করি। স্বাস্থ্য? তার জবাব ত তোমরা নিজেরাই দিয়াছ। আমরা স্বাস্থ্যের উপর একটু বেশি অত্যাচার করি বটে, কিন্তু আনন্দটি কেমন? না হয় গলাটা একটু কর্কশ হইল, চোখ একটু লাল হইল, চেহারাটা একটু চোয়াড়ে হইল, কিন্তু মোটের উপর শরীর মন ঠিকই আছে।

হিসাবী সমাজ-হিতৈষী দুই তরফের কথা শুনিয়া বলিলেন—তোমাদের বচসা মিটানো বড়ই শক্ত কাজ। আমি বলি কি—তোমরা দু-দলই বদ অভ্যাস ত্যাগ কর। সরবৎ খাও, ভাল ভাল জিনিষ খাও—যাতে গায়ে গত্তি লাগে, যথা লুচি-মণ্ডা। প্রকৃত আনন্দ তাতেই আছে।

তামাক-খোর বলিলেন—সরবৎ খুব স্নিগ্ধ, লুচি-মণ্ডাও খুব পুষ্টিকর, সুবিধা পাইলেই আমরা তা খাই। কিন্তু এ সব জিনিষে আত্মা তৃপ্ত হয় না, আড্ডা জমে না। কিঞ্চিৎ নেশার চর্চ্চা না করিলে মানুষে মানুষে ভাবের বিনিময় অসম্ভব। তামাক অবশ্য চাই, এইটিই নিরীহ প্রকাশ্য নেশা, আর সব নেশা অপ্রকাশ্য।

গাঁজা-খোর বলিলেন—ঠিক কথা। নেশা চাই বই কি, কিন্তু গাঁজাই পরাকাষ্ঠা। তোমাদের পাঁচ জনের উৎসাহ পাইলেই আমরা ভদ্র সমাজে চালাইয়া দিতে পারি।

সমাজ-হিতৈষী চিন্তিত হইয়া বলিলেন—তাই ত, বড় মুস্কিলের কথা। দেখিতেছি তোমরা কেউ-ই ধোঁয়া না টানিলে বাঁচিবে না। আচ্ছা, অক্সিজেন শুঁকিলে চলে না?

তামাক-খোর গাঁজা-খোর অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া সমস্বরে কহিলেন—আজ্ঞে, ওটা অন্তিম কালে, হরিনামের সঙ্গে সঙ্গে। আপাতত কিছু সাকার সুগন্ধি সুস্বাদ মনোহারী ধোঁয়ার ফরমাস করুন।

হিতৈষী নাচার হইয়া বলিলেন—তবে ঐ তামাক অবধি বরাদ্দ রহিল। তার উপর আর উঠিও না, ঐখানেই গণ্ডি টানিলাম।

গাঁজা-খোর অট্টহাস্যে বলিলেন—খুব বুদ্ধি আপনার! নেশার তত্ত্ব আপনি কিছুই বোঝেন না। ঐ তামাকই ত একটু একটু করিয়া বেমালুম ভাবে গাঁজায় পরিণত হইয়াছে—তামাক-তামা-তাজা-গাঁজা। 'মৌচাক'এর শিশু পাঠকরাও এই তত্ত্ব জানে। কোথায় গণ্ডি টানিবেন?

সমাজ-হিতৈষী মহাশয় হতাশ হইয়া বলিলেন—তবে মর তোমরা পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা। দিন কতক যাক, তারপর বুঝিব কার পরমায়ু কত কাল। [পৌষ ১৩৩৪]

স্বতঃসিদ্ধ সত্য

গোপালদা লিখিয়াছেন,

"ভায়া হে, চীন অভিযাত্রীদলের এভারেস্ট-বিজয় সংবাদে আজ তোমরা চমৎকৃত ও পুলকিত হইতেছ, কেহ

কেহ আবার সন্দিগ্ধচিত্তে সন্দেহও প্রকাশ করিতেছে কিন্তু ইহা যে একটা স্বতঃসিদ্ধ অবশ্যম্ভাবী সত্য ঘটনা তাহা যেদিন স্বর্ণকিরীটী রংবাক মন্দির চীনারা দখল করে সেই দিনই আমি ঘোষণা করিয়াছিলাম। উত্তর কলের (North Col) পথে এভারেস্ট আয়ত্ত করিতে গেলে শেষ মনুষ্যাবাস এই মন্দিরটি। এই স্থানের মনুষ্যদের সম্পূর্ণ নিজস্বীকৃত না করিতে পারিলে এভারেস্ট-বিজয় খণ্ডিত হইবার সম্ভাবনা। চীনারা বুদ্ধিমান, আটঘাট বাঁধিয়াই কাজ করে। যে মৃতদেহটি এই অভিযাত্রীদল এভারেস্টশৃঙ্গে আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা যে বেচারা ম্যালরির (Malory) তাহাও তাঁহারা অচিরাৎ প্রমাণ করিবেন এবং তোমরা একটু ধৈর্য ধরিয়া থাকিলেই শুনিতে পাইবে এই অভিযাত্রীদল হিমালয়চূড়া হইতে একটি আস্ত জীবন্ত ইয়েতিকেও কায়দা ও কব্‌জা করিয়া সঙ্গে আনিয়াছেন। ভায়া হে, শনৈঃ পন্থাঃ। গোয়েবেল্‌সের এইখানেই ভুল হইয়াছিল, আক্রমণ-প্রণালী হিসাবে ব্লিৎজক্রীগ ভাল কিন্তু প্রচার-পদ্ধতি হিসাবে নয়। এখানে স্লো অ্যাণ্ড স্টেডি থাকাই বিধেয়। বাবা হিমালয়ের যখন আর শিরে পদাহত হইলে লাঞ্ছনার ভয় নাই তখন তোমরা ইহা লইয়া বিচলিত হইও না।

কৈলাস ও মানসসরোবর তীর্থযাত্রার প্রতিবন্ধকতার কথাও ভাবিও না বৎস। মহাকাল স্বয়ং যখন সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, মনে রাখিও ইহার পিছনেও তাঁহার কোন মতলব আছে। কৈলাস-মানসসরোবর তো তিব্বতেই, সুদূর দক্ষিণ তামিলনাদ হইতেও যে চীনারা নিমন্ত্রিত হইয়াছেন সে খবর কি রাখ? তোমাদের আক্রাম খাঁ সাহেবের সুযোগ্য পুত্র খয়রুল আনাম খাঁ সাহেবের কলিকাতা হইতে প্রকাশিত 'পয়গাম' অর্ধ সাপ্তাহিকের গত ১১ই নবেম্বর তারিখের সংখ্যায় সুকৌশলে প্রচারিত এই সংবাদটি কি তোমাদের কর্তারা দেখিয়াছেন?

"আমাদের দুর্ভাগ্য হইল এই যে, চীনারা এখনও পর্য্যন্ত তামিলনাদে প্রবেশ করে নাই। আমি [কাজাগাম-নেতা ই. ভি. রামস্বামী] চাই যে চীনারা তামিলনাদ দখল করুক। তাহারা এখানে আসিলে জাতিভেদ দূর হইয়া যাইবে এবং আমরা সকলে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিব।"

সুতরাং ভায়া হে, এভারেস্ট, কৈলাস, মানসসরোবর লইয়া এখন আর বৃথা মাথা ঘামাইও না, কন্যাকুমারী সামলাও।"

মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ

বিগত ১০ই জুন কলিকাতার সংস্কৃতি পরিষদ্ ভারতীয় শাস্ত্রে ও সাহিত্যে পারঙ্গম মহাভারত-বিজয়ী সব্যসাচী সিদ্ধান্তবাগীশ মহোদয়কে সম্বর্ধিত করিয়া সমগ্র দেশের পক্ষে একান্ত কর্তব্য পালন করিয়াছেন। ভারত-সরকার ইতিপূর্বেই তাঁহাকে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন। তাঁহার সমগ্র জীবনের সাধনার ফল, মহাভারত—মূল টীকা ও অনুবাদ, তিনি দেশবাসীর হস্তে সমর্পণ করিয়া গেলেন, তাঁহার প্রতি জাতির কৃতজ্ঞতার অবধি নাই। দেশের কল্যাণার্থ তিনি শতায়ু হউন, আমাদেরও সেই প্রার্থনা।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

এই বৎসরে অক্ষয়কুমার বড়াল ও জলধর সেন—বাংলাদেশের একজন কবি ও একজন কথাসাহিত্যিকের শতবার্ষিক জন্মদিবসোৎসব হইয়া গেল। আগামী ১৯৬১ সন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিক উৎসবে আমরা ব্যাপৃত ও মত্ত থাকিব। কিন্তু যে মহাপ্রাণ বাঙালী সন্ন্যাসী সর্বপ্রথম বাংলার রবীন্দ্রনাথকে "বিশ্বকবি" বলিয়া অভিনন্দিত করেন, যিনি 'সন্ধ্যা'র সাহায্যে ভারতের প্রভাত আনিবার প্রয়াস করেন, সেই ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ১৮৬১ সনের ১১ই ফেব্রুয়ারি হুগলী খন্যানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার কথা আমরা যেন হট্টগোলে বিস্মৃত না হই।

এনার (ENAR) স্টোভ

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বাংলাদেশকে মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান-সচেতন করিতে চাহিয়াছিলেন। নিজে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নে প্রভূত তত্ত্বগত পাণ্ডিত্যসত্ত্বেও ব্যবহারিক বিজ্ঞানে যে কিছু আবিষ্কার করেন নাই সেজন্য তাঁহার ক্ষোভ ছিল। তাঁহার দৌহিত্র শ্রীনির্মলকুমার রায় দাদামহাশয়ের সেই ক্ষোভ এতদিনে নিবারণ করিয়া এদেশের গৃহস্থদের জ্বালানির জ্বালা প্রশমনার্থ এই স্টোভ আবিষ্কার ও নির্মাণ করিয়া দেশবাসীর হাতে সমর্পণ করিয়াছেন। অবশ্য এই জ্বালানির মূল উপাদান বিদ্যুৎ। যেখানে বিদ্যুৎ-সরবরাহ আছে সেখানকার মানুষ সহজেই উনান ধরাইবার হাঙ্গামা ও কয়লা ও কাঠের ধোঁয়ার হাত হইতে যে বাঁচিতে পারিবেন 'এনার স্টোভ' ব্যবহার করিয়া আমরা সে সাক্ষ্য দিতেছি। এই ইলেকট্রিক হীটারের সর্বাধিক সুবিধা এই যে গরম বা ঠাণ্ডা কোনও অবস্থাতেই প্রয়োজন ঘটিলে তার (Element) বদলের কোনও অসুবিধা বা বিপদ নাই। এ. সি. ও ডি. সি. দুই এলাকার পক্ষেই এ কথা খাটে।

তরুণ বুদ্ধিজীবীদের সমস্যা

পবিত্রকুমার ঘোষ

প্রথমেই একটি সুস্পষ্ট অভিযোগ দিয়ে আমি শুরু করব। এমন সময় ছিল যখন বাংলা ভাষায় কোন রচনাই পুরুষরা পড়ত না। স্ত্রীপাঠ্যতাই তখন বাংলা ভাষায় যে কোনো লেখার পাঠ্যতার একমাত্র মাপকাঠি ছিল। বাংলাদেশে তখনও মহিলা সাহিত্যিকরা কলম ধরেন নি এত বেশী, কিন্তু মহিলাদের কাছেই শুধু ছিল বাংলা সাহিত্যের সমাদর। আমার বিশ্বাস, সে যুগ আজ আর নেই। কিন্তু সম্প্রতি হুজুগ উঠেছে—লেখায় বিষয়বস্তু বক্তব্য তথ্য ও বিশ্লেষণের সমৃদ্ধি কিংবা উপলব্ধির ঐশ্বর্য এ সমস্তই অপ্রয়োজনীয়, লেখার রমণীয়তাই লেখার সারাৎসার, তাতে আর কিছু থাকাই অবান্তর। এবং রমণীয়তা ও রমণীপ্রিয়তা নাকি সমার্থক এ কথাও শুনছি। আজকের এলোমেলো আবহাওয়ার সুযোগে সাহিত্যক্ষেত্রে যে বেনোজল ঢুকে পড়েছে তার ধাক্কায় যদি সত্যিই রমণীপ্রিয়তাই হয়ে ওঠে সাহিত্যের সার্থকতার শেষ কথা, তবে সেই বেনোজলের বিরুদ্ধেই আমি প্রথম বিক্ষুব্ধ হব। বাংলা ভাষার প্রধান প্রধান সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকাগুলি এদেশে একশ্রেণীর টেডি বয়দের প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে—সাহিত্যের আসরে যত দুরাচার ও বিকৃতরুচি আমদানির উল্লাসে তারা মেতে উঠেছে জানি। আজকাল সরকার রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে কতকগুলি সাহিত্য-পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছেন। আকাদমী, রবীন্দ্রপুরস্কার ছাড়াও আরও বহু সুযোগ-সুবিধা ক্রমেই বেশী করে দিতে উদ্যত হয়েছেন তাঁরা। এবং সরকারের তরফ থেকে সাহিত্য-বিচার ও পুরস্কার দানের যে নমুনা আজ দেখা যাচ্ছে তাতে তদ্বিরের জোরে সাহিত্যের টেডি বয়রাই হয়তো পুরস্কৃত হবে আসন্ন ভবিষ্যতে। কিন্তু তাকেও সাহিত্যের শেষ বিচার বা চরম সার্থকতা বলে মানবে না কেউ। সংবাদপত্রের রবিবাসরীয়-সাময়িকী-সম্পাদক এবং বার্তা-সম্পাদকের ঘরে বসে দিনের পর দিন চাটুকারিতার সাধনায় নিমগ্ন হয়ে আজ যারা সাহিত্যের আসরে ছাড়পত্র পায়, কফিহাউসে কফির কাপে ঝড় তুলেই তারা ক্ষান্ত হবে না, মন্ত্রী বা মন্ত্রীর আত্মীয়ের বাড়ি পর্যন্ত তারা ছুটবে। ধরে নেওয়া যাক তাতে বিড়ালের ভাগ্যে শিকেও ছিঁড়বে। কিন্তু তারপর? সম্ভবতঃ আর কোন 'তারপরে' এরা বিশ্বাসই করে না। কিন্তু বিশ্বাসের চেয়ে বাস্তব বড়। সেই বাস্তবে আমি আস্থা রাখি। আজ চাটুকারিতার অপরিচ্ছন্নতায় যারা জন্মলাভ করছে, আমি

কামনা করি তারা পদ্মের মত হেসে উঠুক, সূর্যের পানে মুখ ফেরাক ; সুনিশ্চিত বিনষ্টির পথ থেকে তারা ফিরে আসুক। এ কালের টেডি বয়দের মুখে যিনি ভাষা দিয়েছেন, তাদের হৃদয়যন্ত্রণা যিনি আবিষ্কার করতে পেরেছেন সেই জন অসবোর্নের নাটকেও দেখছি এই বিকৃতি এবং নষ্টামিও ওদের মুখোশমাত্র, এর আড়ালে গুমরে গুমরে কাঁদছে ওদের আসল মানবসত্তা। 'লুক ব্যাক ইন অ্যাংগার' নাটকে অসবোর্ন জিমি পোর্টারের চরিত্র এঁকেছেন। পৃথিবীর কোন-কিছুতেই তার কিছু এসে যায় না। প্রেম সৌন্দর্য সততা এ সব কোন-কিছুতেই তার বিশ্বাস নেই, এ সমস্তকেই সে উপহাস করে। মিথ্যা জোচ্চুরি বদমায়েশি, নারীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, নিজের সন্তানদের প্রতি চরম ক্রূরতা—কোন-কিছুতেই তার অতৃপ্তি নেই। জীবন নয়, জীবন সম্পর্কে তার যে কুৎসিত ধারণা তাই ছিল তার কাছে বড় আর তাতেই মাথা গুঁজে যত পাপ সে করে গিয়েছে উৎফুল্ল চিত্তে। নাটকের শেষে সেই জিমি পোর্টারের সামনে এসে দাঁড়াল জীবন সম্পর্কে তার বানানো সব ধারণাকে চুরমার করে দিয়ে স্বয়ং জীবন। রুক্ষ বাস্তব এক মীমাংসা-অসম্ভব প্রশ্ন নিয়ে এগিয়ে এল তার কাছে তার বিতাড়িত স্ত্রী অ্যালিসনের রূপে। অ্যালিসন জিমিকে ভালবেসেছিল পাগলের মত, তার জন্য অপমান, আঘাত যন্ত্রণা দারিদ্র্য গ্লানি সব কিছুই সয়েছে সে এতদিন। তার গর্ভে যখন সন্তান এল তখন অসহ্য দুঃখ মাথায় নিয়ে সে বিতাড়িত হয়ে জিমির ঘর থেকে বেরিয়ে পিতৃগৃহে চলে গিয়েছিল। পিতৃগৃহে সে শুনেছে জিমি হেলেনার সঙ্গে ঘর করছে। কিন্তু তাতে ক্ষুব্ধ হবার অবস্থা থেকে অনেকদিন আগেই সে পার পেয়ে গেছে। অবশেষে একদিন অভিযোগহীন চিত্তে শুধু কৌতূহল-বশবর্তিনী হয়ে সে জিমির ঘরে এসে পৌঁছল। সদ্যসন্তান-বিয়োগবেদনাবিধুর রুগ্ন পাণ্ডুর অ্যালিসন—পৃথিবীর সব আশা বিশ্বাস তাকে ছেড়ে গিয়েছে। সে শুধু, বলতে হয়, একখণ্ড নগ্ন বাস্তব। তার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে, কোন সংঘর্ষ ছাড়াই, হেলেনা পালিয়ে গেল। এবং তার মুখোমুখি হতে হল জিমিকে। অ্যালিসনের নয়—জিমিরই জীবনের চরমতম সঙ্কটময় মুহূর্ত তখন ঘনিয়ে এল।

অ্যালিসন বলছে :

তুমি কি বোঝ না? সে চলে গেছে! সে গেছে! সেই—সেই অসহায় মানবসত্তাটি যে ছিল লুকিয়ে আমার শরীরের ভিতরে। আমি ভেবেছিলাম সে নিরাপদে আর নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে আছে সেখানটায়। কেউই তাকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না আমার কাছ থেকে। সে ছিল আমার, আমারই দায়িত্বে গড়া। কিন্তু সে হারিয়ে গেল। [মেঝের টেবিলের পায়ার কাছে সে বসে পড়ে] আমি শুধু চেয়েছিলাম মরতে, আমি কখনও জানতুম না যে সে কী অবস্থা! আমি যন্ত্রণায় ডুবে গিয়েছিলাম এবং শুধু ভাবতে পারতুম তোমাকেই, আর ভাবতুম কী আমি হারিয়েছি। [সে প্রায় কথা বলতে পারছে না] আমি ভেবেছিলাম, যদি শুধু—যদি শুধু এখন সে আমাকে দেখতে পেত, এই নির্বোধ কুৎসিত হাস্যকর আমাকে। আমি এ রকম অবস্থায় পড়ি এই তো সে এতদিন চেয়েছে। এই দেখেই মজায় মেতে উঠতে চেয়েছে সে এতদিন। আমি আগুনে পুড়েছি, আমি জলে যাচ্ছি, এবং আমি এখন চাই শুধু মরে যেতে! আমাকে এ অবস্থায় ফেলার জন্য তাকে হারাতে হল তার একটি সন্তান এবং আরও যে সব শিশু আমার গর্ভে আসতে পারত তাদেরও সে হারাল! কিন্তু কী এসে যায় তাতে—সে তো আমার কাছ থেকে এই চেয়েছিল!

[অ্যালিসন তার মুখ জিমির দিকে তুলে ধরে]
তুমি কী দেখতে পাচ্ছ না! আমি যে শেষ পর্যন্ত কাদার মধ্যে পড়েছি! আমি কাদায় গড়াগড়ি খাচ্ছি! আমি হামাগুড়ি দিচ্ছি! হায়, ভগবান—

[অ্যালিসন জিমির পায়ের কাছে ভেঙে পড়ে। জিমি দাঁড়িয়ে থাকে, এক মুহূর্তের জন্য সে যেন বরফ হয়ে গিয়েছে; তারপর সে নত হয় এবং অ্যালিসনের

কম্পিত শরীরটাকে নিজের দু বাহুর মধ্যে তুলে নেয়। সে মাথাটা নাড়ায় এবং ফিসফিস করে বলে :]

জিমি : আর বল না, লক্ষ্মীটি আর বল না……আমি পারছি না—

এর পরের অংশ আপাততঃ উদ্ধৃত করার দরকার নেই। নাটকের এই শেষ অংশে আমরা লক্ষ্য করি বিকৃত বীভৎস একটি যুবকচরিত্রের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল এক শাশ্বত মানুষ, এক সুন্দর প্রেমিক।

আমি আধুনিক যুগের তরুণ আঁতেলেকচুয়েল, বিশ্বাস ও বাস্তব সম্পর্কে বলেছি। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে এই তরুণ আঁতেলেকচুয়েলদের মধ্যে দুটি প্রবণতা অতীব প্রকট হয়ে উঠেছে। প্রথমতঃ, এরা কোনও মহান্ আদর্শের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হতে ভুলে গেছে। দেশপ্রেম, দরিদ্র মানুষের দুঃখ দূর করার বাসনা, সমাজ-সংস্কার বা রাজনৈতিক বিপ্লব এসব আদর্শ দু-দশক আগেও, এমন কি এক-দশক আগেও যেভাবে তরুণ বুদ্ধিজীবীদের আলোড়িত করত, বহুজন এই সব আদর্শ অনুসরণ করার জন্য জীবনের সর্বস্ব পণ করে বসত— আজ অবস্থা ঠিক তার বিপরীত, আজ এসব আদর্শ নেহাতই হাসির ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কফিহাউসের চার দেয়ালের মধ্যে এই তরুণ বুদ্ধিজীবীদের মনোযোগের জগৎ সীমিত হয়ে এসেছে এ কথা যদি নাও বলি, তবু দেশের জন্য সমাজের জন্য চিন্তিত হওয়া, নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে এই সব স্বীকৃত মানবাদর্শের জন্য কিছু করতে যাওয়া আজ তাদের কাছে উপহাসের বিষয়। এবং যদি কেউ এখনও এসব আদর্শে বিশ্বাস করে, এমন কি বিশ্বাস করে প্রেমিক বা প্রেমিকার প্রতি প্রেমের একনিষ্ঠতায়, তা হলে তাকেও তারা গ্রাম্য মফস্বলের লোক বলে ঠাট্টা-তামাশা করে। কিন্তু এই সব সনাতন স্বীকৃত আদর্শ বাদ দিয়ে আর কোন্ আদর্শে বিশ্বাস করে তরুণ বুদ্ধিজীবীরা? কোন আদর্শেই তাদের আস্থা নেই, সব বিশ্বাসই প্রায় তাদের মন থেকে মুছে গেছে। অসবোর্নের জিমি পোর্টার বলছে : কেউ ভাবে না, কেউ কিছু নিয়েই মাথা ঘামায় না। কোন বিশ্বাস নেই, কোন আদর্শ নেই, এতটুকু উৎসাহ নেই।

জিমির আর একটি কথায় আরও বিশদ হয়েছে আধুনিক তরুণদের মনোভাব :

> I suppose people of our generation aren't able to die for good causes any longer. We had all that done for us, in the thirties and the forties, when we were still kids. ...There aren't any good, brave causes left. If the big bang does come, and we all get killed off, it won't be in aid of the old-fashioned, grand design. It'll just be for the Brave New-nothing-very-much-thank-you. About as pointless and inglorious as stepping in front of a bus.
>
> (Look Back in Anger, pp. 84-85)

বিশ্বাস ও আদর্শ হারানো আজকের দিনের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক অবশ্য। আমাদের দেশের তরুণ বুদ্ধিজীবীরা চোখের সামনে দেশের জনসাধারণের বহু দুঃখ দেখছে— তাদের নিজেদের অবস্থাও প্রায়ই ভাল নয়। ইংরেজ আমলে কল্পনা করা যেত যে সব দুঃখদুর্দশার মূল এক সাধারণ শত্রু—ইংরেজ। দেশে ধানের চাষ ভাল না হলে এমন কি অতিবৃষ্টি বা স্বল্পবৃষ্টি হলে সেজন্যও দায়ী করা হত ইংরেজকে, চোর-পকেটমারের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্যও দায়ী ইংরেজ, বেকারসংখ্যা বাড়ার সব দায়িত্বও ইংরেজের। সত্য মিথ্যা বিচারের দরকারও হত না, আমাদের সমস্ত দুঃখ কষ্ট অভাব ও বাস্তব জীবনের যা কিছু তিক্ততার জন্য ইংরেজকে দায়ী করে খুশী থাকা সম্ভবপর ছিল। এই ইংরেজ ঘরের লোক ছিল না। সে দূরের মানুষ, তাকে আমরা চিনি না, অপরিচয়ের বেড়া দিয়ে সে ঘেরা। ইংরেজের প্রতি আমাদের ক্রোধ ছিল তীব্র, অথচ মনের গোপন কোণে আমরা তাকে ঈর্ষা করতুম, তার অজস্র গুণে মুগ্ধ হতুম, তাকে অজানন্তেই

অনুকরণ পর্যন্ত করতুম। ভারত শাসনের দায়িত্ব নিয়ে যেসব ইংরেজ আসত ভারতে তাদের প্রতি যেমন অসম্ভব তীক্ষ্ণ বিদ্বেষ ছিল আমাদের, তেমনি সাগরপারে তাদের স্বদেশেই যে ইংরেজ বাস করে তার সাহিত্য তার সংস্কৃতি তার বিশ্ববিদ্যালয়, অজানা অদেখাকে আয়ত্ত করার তার তীব্র নেশা, আবার সঙ্গে সঙ্গে গভীর বাস্তববোধ ও সংযম আমাদের মুগ্ধ করেছে। এই মুগ্ধতা প্রকাশ করতেও আমাদের কোনও লজ্জা বা কুণ্ঠা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ছোট ইংরেজ ও বড় ইংরেজের কথা বলেছেন ও এদেশে আগত ছোট ইংরেজদের প্রতি তাঁর বিমুখতার সঙ্গে সঙ্গে ওদেশের বড় ইংরেজদের তিনি তাঁর মনের সকল শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। একই সঙ্গে আমরা এইভাবে তীব্র ঘৃণা ও গভীর আকর্ষণ অনুভব করেছি ইংরেজের প্রতি। এবং তার ফলে যে ইংরেজ ছিল আদতেই আমাদের অচেনা, যার রীতিনীতি সভ্যতা সংস্কার প্রথা বিশ্বাস, যার সমাজ রাজনীতি সবই আমাদের থেকে ভিন্ন বলে সে দূরের মানুষ, যে অসীম ক্ষমতার অধীশ্বর বলে আমাদের কাছে প্রতীত অথচ যে আমাদের চিরন্তন শত্রু বলে ঘৃণিত—তাকে ঘিরে তার চারদিকে একটি রহস্যের পরিমণ্ডল গড়ে উঠবেই। এইভাবে ইংরেজের চারপাশে একটি বাস্তব-অতিশায়ী রহস্যময় জগৎ সৃষ্টি হয়েছে এবং তার ফলে আমাদের মনের রোমান্টিক প্রবণতা ও মোহকাতরতা অবাধ স্ফুরণের সুযোগ পেয়েছে।

আঁতেলেকচুয়েলদের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে রোমান্টিক যন্ত্রণা; তারা বাস্তব-অতিশায়ী কল্পিত রহস্যময় জগতে ডুবে থাকতেই ভালবাসে। তারা অস্থির, সাদামাঠা তথ্যের চেয়ে রঙিন কল্পনাকে ঝপ করে বিশ্বাস করতে তাদের ভাল লাগে—রোমান্টিক বিষাদ, নিঃসঙ্গতাবোধ, রহস্যের প্রতি উন্মুখতা ছাড়া কে কবে প্রকাশের সমস্যা নিয়ে বিচলিত হয়েছে? জীবনে যখন কেরিয়ার তৈরির পথ এত খোলা তখন কে নিজের বক্তব্য অনুভূতি বা উপলব্ধি সর্বজনীন ভাষায় প্রকাশের যন্ত্রণায় বিদ্ধ হতে রাজী হয়? টাকা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন বা হয়তো খবরের কাগজে নাম ছাপার ব্যবস্থা করার মত বুদ্ধি যার আছে, যে মানসিক ক্ষমতায় গড়পড়তা মানুষের চেয়ে বেশ উপরে—সেই লোক সেসব বিবেচনা গৌণ করে রেখে কেন আত্মপ্রকাশের তাগিদে নিজের মর্মকোষ পর্যন্ত কুরে কুরে খেতে রাজী হয়? রোমান্টিকতা, রহস্যের প্রতি দুর্বার টান, সাদা বাস্তবের প্রতি বিমুখতা ও অতৃপ্ত অন্তর্বেদনা যার আছে সেই কেবল পারে শুধু এই প্রকাশের সমস্যা নিয়ে মগ্ন হতে এবং তাই আমি বলেছি আঁতেলেকচুয়েল মাত্রই রোমান্টিক। বিশেষতঃ তারা যখন তরুণ, জীবনের ব্যর্থতাবোধ যখন তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলে নি, যখন তারা রঙিন সমুদ্রে উথাল-পাথাল করে অবগাহন করতে পারার অসীম আনন্দে আর সবকিছু সম্পর্কেই অবুঝ থাকতে ভালবাসে—তখন সেই রোমান্টিকতার স্ফূর্তি যেখানে অসম্ভব সেখানে তাদের মাথা ঘামাবার অবকাশ কোথায়?

পরাধীনতার আমলে ইংরেজকে ঘিরে রোমান্টিক পরিবেশ গড়ে উঠেছিল, ইংরেজকে নিয়ে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের তাই চিন্তার শেষ ছিল না। কী করে এই ইংরেজকে নাজেহাল করা যায়, তাকে অস্বীকার করা যায়, তার সঙ্গে সমানে সমানে পাঞ্জা লড়া যায়, এসব কথা ১৯৪৭ সনের আগে পর্যন্ত ভাবা যেত, আর ইংরেজই যখন আমাদের যাবতীয় দুঃখের মূল রূপে প্রতীত হয়েছিল তখন ইংরেজকে এদেশ থেকে দূর করা, সমস্ত বিশ্বে ইংরেজের যে সাম্রাজ্য ছিল প্রসারিত তা ভেঙে চুরমার করা এই ছিল এমন এক চরম আদর্শ যা সহজেই বরণ করা যেত ও তার জন্য এমন কি জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দেওয়া যেত।

রোমান্টিকতা ও ইংরেজ তাড়ানোর আদর্শ ওতঃপ্রোত ভাবে মিশেছিল এবং যেহেতু রোমান্টিকতা সৃষ্টিশীল তরুণদের স্বাভাবিক প্রবণতা, আর ইংরেজ তাড়ানোর ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করে এই প্রবণতাটিই উদ্দাম হয়ে উঠতে পেরেছিল অতএব একটি জলন্ত আদর্শ খুঁজে পেতে ১৯৪৭ সনের আগে পর্যন্ত ভারতীয় তরুণদের কোনও অসুবিধা হয় নি।

আজও আমাদের দেশে মানুষের দুঃখের শেষ নেই,

বরং মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা ও নিষ্ঠুরতা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। লাঞ্ছিত বিতাড়িত লক্ষ লক্ষ মানুষের মর্মন্তুদ কাহিনী আমাদের অন্তরকে নিশ্চয়ই আলোড়িত করেছে; রাজনৈতিক দুরাচার, অর্থনৈতিক সঙ্কট আমাদের উদ্বিগ্ন করেছে, বহির্বিশ্বে দুই মহাশক্তির লড়াই, সুয়েজ, হাঙ্গেরি, তিব্বত, দ্য'গলের ও আয়ুবের আবির্ভাব, স্পুটনিক লুনিক এ সবই আমাদের সত্তাকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেছে। এ সমস্ত আলোড়নকারী ঘটনার প্রতি আমরা সচেতনতা ও অনুভূতিকাতরতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছি। কিন্তু তবু কোনও মহান্ কর্তব্য, আদর্শ বা উদ্দেশ্য আমরা আজ আর খুঁজে পাচ্ছি না। এত গ্লানি ও ধ্বংস যখন চতুর্দিকে তখনও সত্যিই যেন আমাদের করণীয় কিছু আছে বলে ভাবতেও পারছি না।

তার কারণ আছে। দেশের ভিতরে তাকিয়ে দেখুন। আমাদের সব দুঃখের মূল কংগ্রেস, কংগ্রেসকে তাড়ালেই সব সমস্যার সমাধান হবে বা কংগ্রেসই আমাদের প্রধান শত্রু—এ রকম কোনও সরলীকৃত বিশ্বাস রাখা আজ আর সম্ভবপর নয়। কংগ্রেস সম্পর্কেও যেমন, আর সব রাজনৈতিক দল সম্পর্কেও তেমনি মানুষ আস্থা হারিয়েছে। রাজনীতিতেই আধুনিক তরুণদের আর বিশ্বাস নেই। তা ছাড়া, কংগ্রেসের লোকরা আমাদের অপরিচিত নয়, তারা আমাদেরই সমাজের আপন জন—তাদের চারপাশে রহস্যের পরিমণ্ডল গড়ে উঠতে পারে না। আজ যাঁরা কংগ্রেসের প্রধান স্তম্ভ—তাঁদের ঘিরে মায়াময় মোহময় আধো-চেনা আধো-অচেনা রোমাঞ্চকর পরিবেশ সৃষ্টি কিছুতেই হতে পারে না। তরুণদের রোমান্টিক প্রবণতা এ রকম ঠাণ্ডা সাদা অনুজ্জ্বল পরিবেশে তৃপ্ত হবে কেমন করে? বহির্জগতে মহামতি স্তালিনকে কেন্দ্র করে আমরা বহু স্বপ্ন দেখতুম, বহু আশা বিশ্বাস খুঁজে পেতুম—এ যুগের সবচেয়ে রহস্যময় পুরুষ ছিলেন স্তালিন, তাঁকে আমরা কেউ দেখি নি জানি নি, অথচ কত সব অসম্ভব অবাস্তব কথা তাঁর সম্পর্কে শুনেছি, বিশ্বাস করেছি। অনুভূতিকাতর যুবকরা সহজেই স্তালিনের ব্যক্তিত্বের আশ্রয়ে রোমান্টিক বাসনাগুলিকে মেলে দিতে পেরেছিল। গত দশকের প্রথমেই নিষ্ঠুর ক্রুশ্চভ এক আঘাতে আমাদের সেই আশ্রয়টুকুও ভেঙে দিলেন, আমরা জানতে বাধ্য হলুম স্তালিন ছিলেন একজন পাকা বদমায়েশ। এবং সঙ্গে সঙ্গে রহস্যময় রাশিয়াও দেখা গেল এক ব্যুরোক্রেসী-শাসিত ভারীশিল্প-প্রধান আদর্শচ্যুত দেশ মাত্র। এইসব সাদা নিরেট খুনী তথ্যও যেন যথেষ্ট হচ্ছিল না, বিধাতা আর একটু বিদ্রূপভরা হাসি হাসলেন। গত দশকের শেষ দিকে দেখা গেল কমিউনিজম ও গণতন্ত্রের যে বিরোধ নিয়ে আমরা উত্তেজিত চঞ্চল ও কল্পনাপ্রবণ হতে পারছিলুম সে বিরোধও যেন শেষ হয়ে এল—ক্রুশ্চভ ও আইশেনহাওয়ারের মিলনদৃশ্যও অভিনীত হয়ে গেল। বরং আরও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি আমরা এই দেখে যে কমিউনিস্ট শিবিরে ফাটল ধরেছে, চীন ও রাশিয়ার মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছে (ভারত-সীমান্তের ব্যাপার একটি দৃষ্টান্ত), হাঙ্গেরি ও রাশিয়ার মধ্যে গোলমাল বেধেছিল, তেমনি গণতন্ত্রের শিবিরেও ফাটল কুৎসিতভাবে বেরিয়ে পড়েছে, ইংরেজরা আমেরিকানদের মুরুব্বীয়ানা সহ্য করতে পারছে না, অ্যাডেনয়ার ও দ্য'গলের মধ্যে মিল নেই, 'নাটো'র বন্ধুদের সঙ্গে কোনরকম পরামর্শ না করেই ম্যাকমিলান রাশিয়ায় আলাপ-আলোচনা করে এসেছিলেন, আইশেনহাওয়ার ঘোষণা করেছেন আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বাধে গবর্ণমেণ্ট যারা দখল করে আছে তারাই তা দখল করে থাকতে চায় বলে, এর সঙ্গে কমিউনিজম ও গণতন্ত্রের সংঘাত বা আদর্শগত বিরোধের প্রশ্ন আদৌ জড়িত নয়। আমাদের উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের পরিচিত সব উৎস এইভাবে নিঃশেষ হয়ে আসছে—রোমান্টিকতার উৎসবের দিনও তাই ফুরিয়ে এল।

আমাদের তরুণ বুদ্ধিজীবীরা এখন তাই কল্পনাপ্রবণতা, আদর্শবাদ, ভাবুকতা বাদ দিয়ে কেরিয়ার তৈরি করা বা বৈষয়িক উন্নতিলাভের চেষ্টাই একমাত্র কাম্য মনে করছে। বৈষয়িক উন্নতি অর্থাৎ আর্থিক উপার্জন বাড়ানো ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করা একান্ত দরকারও হয়ে

পড়েছে। কেন না, অল্প বয়সেই তারা প্রেমিকা বা গৃহিণীদের দ্বারা অধিকৃত হয়ে পড়ছে। প্রেমে পড়া ও ঘর বাঁধার সুযোগ এখন অনেক বেশী—ঠিক এক দশক আগেও এ সুযোগ এত ছিল না। প্রেম অথবা দাম্পত্যসুখ উভয়ই নির্ভর করে—কে না জানে, অর্থোপার্জনের ক্ষমতার ওপর। রোমান্টিক অতৃপ্তি নিয়ে জীবনের দুই প্রান্তকে জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে সৃষ্টির উল্লাসে মেতে থাকবার সময় কোথায় আজকের যুবকের? রোমান্টিকতার অবক্ষয় যে আমাদের জীবনে ধ্রুব হয়ে উঠেছে সে বিষয়ে কারও মনে সংশয় নেই। তাই আদর্শ ও মহৎ বিশ্বাস নিয়ে মাথা ঘামাতেও আমরা ক্রমেই বিরক্তবোধ করছি।

কিন্তু আমি এ কথা বলি নি যে আধুনিক তরুণরা খুব শান্তিপ্রিয়, পরিতৃপ্ত বা অবসাদগ্রস্ত জীবন যাপন করছে। মোটেই তা নয়—বরং অবস্থা তার বিপরীত। তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করছে না, কেন না, কোনও মহৎ আদর্শে বিশ্বাস ছাড়া বিদ্রোহী হওয়া যায় না। কিন্তু প্রচলিত পরিস্থিতি, রীতিপ্রথা আচার-নীতি মূল্যবোধ সবকিছুতে তারা বিক্ষুব্ধ অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছে। কোনও কিছুই তাদের ভাল লাগছে না। পরাধীনতার আমলে তখনকার তরুণরা ব্রিটিশরাজকে তাড়িয়ে স্বদেশী রাজপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মহারা চিত্তে যোগ দিত, কিন্তু আজ এক ব্যবস্থাকে পালটে আর এক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তরুণরা মোটেই আসতে চায় না। তারা সামাজিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক বা দার্শনিক কোন ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যবস্থাকে ভেঙে নতুন ব্যবস্থা আনার কথা আন্তরিকভাবে ভাবছে না। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই প্রচলিত ব্যবস্থায় তারা সন্তুষ্টও থাকতে পারছে না। কফিহাউসে রেস্তরাঁয় পার্কে ট্রামে বাসে সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকার পাতায় কেবলই শুনছি ও পড়ছি—"ভাল নয়, ভাল নয়, কোন কিছুই ভাল নয়, সমস্তই corrupted হয়ে গেছে, পচন ধরেছে। দক্ষিণ ও বাম—কোন পন্থী রাজনৈতিক পার্টিই ভাল নয়, এই পরিকল্পনা, মূল্যবৃদ্ধি, করভার, পুঁজিপতিদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিল্পপ্রসার, এসব কোনটাই ভাল নয়, জনগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, শিক্ষার খাতে সরকারের স্বল্প খরচ, মানুষের জনতাধর্মিতা, অসামাজিক নিঃসঙ্গ মানুষ এ সবই খারাপ, বিজ্ঞানে অতিরিক্ত বিশ্বাস, বিজ্ঞানের বদলে ধর্মে বিশ্বাস এ সবও নিন্দনীয়। এক কথায়, আমাদের সমস্ত পরিবেশটিই হয়ে উঠেছে কুশ্রী, অশ্লীল, ভালগার। সমারসেট মম তৃতীয় শ্রেণীর লেখক, আলবের কামু নীরক্ত প্রাণহীন বাজে রচনা লিখতেন, সার্ত্র অস্থির-মস্তিষ্ক, অপরিণত। রবীন্দ্রনাথ জীবন-সম্পর্কিত কোন গভীর উপলব্ধিতে পৌঁছন নি র‍্যাঁবোর মত, রিল্‌কের মত। জওহরলাল নেহরু ভাল সাহিত্যিক হয়তো হতে পারতেন কিন্তু রাজনীতি তিনি কিছুই বোঝেন না। হিউম্যানিজম নিয়ে অনেক নাচানাচি করা গেছে কিন্তু এ রকম অন্তঃসারশূন্য দর্শন আর দুটি নেই। আজকের তরুণদের মুখে যে-সব কথা সততই উচ্চারিত হয় আমি বেছে বেছে তার কয়েকটি তুলে দিলাম। এতেই স্পষ্ট হবে যে যুদ্ধোত্তর যুগের বা গত এক দশকের তরুণরা সমস্ত কিছু সম্পর্কে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে।

তরুণ চিন্তাশীল ও লেখকদের কথা হচ্ছিল। এরা অধিকাংশই সাধারণ পরিবারের ছেলে—দারিদ্র্যের সঙ্গেও যথেষ্ট পরিচয় তাদের আছে। কিন্তু দারিদ্র্যকে তারা ঘৃণা করে, সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র পিতামাতাকেও। আমাদের রাষ্ট্রীয় স্থায়িত্ব, শান্তি, নিরাপত্তা অব্যাহত আছে; রাষ্ট্র আমাদের দিয়েছে গণতান্ত্রিক অধিকার। তার ফলে স্বাধীন চিন্তা ও নির্ভীক সমালোচনার সুযোগ তরুণরা পেয়েছে। কিন্তু সেজন্য রাষ্ট্রের প্রতি কোনও কৃতজ্ঞতাবোধ তাদের নেই। তারা মনে করে রাষ্ট্র অন্যায়ভাবে তাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা সঙ্কুচিত করে আনছে। তারা এমনও মনে করে যে রাষ্ট্র আমাদের জীবনে যে সমৃদ্ধি এনে দেবে বলে প্রত্যাশা করা গিয়েছিল রাষ্ট্র তা আনে নি, বরং আমাদের দরিদ্রতর করে দিয়েছে।

তরুণ চিন্তাশীলদের ক্ষোভ ক্রোধ ও অস্থিরতার একটি কারণ হয়তো এই। আমাদের দেশে শিক্ষার বিস্তার

আগের চেয়ে বেশীমাত্রায় হচ্ছে, পাঠকের সংখ্যাও বাড়ছে। কিন্তু ঠিক সেই পরিমাণে বাড়ছে না, অথবা শিক্ষার মান বা পাঠকদের উৎকর্ষও সেই পরিমাণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না যা হলে আমাদের তরুণ লেখকরা খুশী হতে পারত। তারা প্রকাশ করতে চায় তাদের মনের সব ক্ষোভ, জ্বালা, যত জটিল চিন্তা—কিন্তু তারা জানে তা প্রকাশ করলে বোঝবার মত, গুণগ্রাহী হবার মত লোকের সংখ্যা এদেশে এত কম যে সারাজীবন অজ্ঞাত বা অবজ্ঞাত থেকে যেতে হবে। তাই আত্মপ্রকাশের সততা এই তরুণ চিন্তাশীলরা প্রায় বিসর্জন দিয়েছে। তারা বুঝে নিয়েছে তারা যদি মনের কথা মনের মত করে লেখে তবে দৈনিক সংবাদপত্রের বার্তাসম্পাদক ও রবিবাসরীয় সম্পাদক তাদের লেখা ছাপবেন না, এবং কোনও প্রকাশক যদি তাদের বই প্রকাশও করেন তা হলেও বই বিক্রি হবার আশা নেই। অথচ বাস্তব সাফল্যের দরকার—যে বাস্তব সাফল্যের একমাত্র মাপকাঠি হচ্ছে টাকা। প্রচুর টাকার দরকার, কিন্তু বার্তা ও রবিবাসরীয় সম্পাদক বা দেশের সাধারণ লোক বা পাঠকরা কত টাকা দেয় লেখককে? সেই টাকার পরিমাণ এত কম—প্রয়োজনের তুলনায় তা এত কম যে সেকথা ভাবলে লেখকদের হাসি পায়, গ্লানি ও লজ্জা অনুভব করে তারা। আজকের চিন্তাশীল লেখকরা তাই সিনিক হয়ে ওঠে। জনপ্রিয়তা ও টাকার আশায় তারা তাদের লেখাকে যতদূর সম্ভব জটিলতা-বর্জিত রমণীয় বা রমণীপ্রিয় করে তোলবার চেষ্টা করে—এবং এই চেষ্টায় তারা নিজেরাই আহত হয় সবচেয়ে বেশী। তারা তাদের স্বরূপ অক্ষুণ্ণ রেখে কোনও মূল্য পায় না বাজারে, স্বরূপকে বিকৃত ও বীভৎস করে তুলে যে মূল্য পায় তাও কত সামান্য! দেশের মানুষরা কেউ যে কোনও গভীর সৎ জটিল চিন্তাধারা বোঝে এ কথা আমাদের লেখকরা কোনদিন ভাবতেই পারে না—জনসাধারণের থেকে নিজেদের বিচ্ছেদ তারা তাই অনুভব করে অত্যন্ত তীব্রভাবে। তারা নিজেদের তাই বাস্তব-ভিত্তিচ্যুত, বিশ্বাসরিক্ত, অসহায় মনে করে—এবং তার ফলে আরও বেশী তিক্ত ক্রুদ্ধ ও রুক্ষ হয়ে ওঠে। সমাজপ্রবাহে যেন তাদের কোনও স্থান নেই, এদেশে ও এযুগে জন্মে তারা যেন ভুল করেছে। ধনী ও রাজনৈতিক প্রভুদের মত তারা উদ্ধত হতে পারে না; কফিহাউসের গোষ্ঠীগুলির সঙ্গেও তাদের পুরোপুরি বনিবনা করে নেবার মত প্রবৃত্তি নেই। তারা যে তাদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পরিবেশকে, আপন যুগ ও দেশকে মেনে নিতে পারে নি এজন্য অন্তরে অন্তরে তারা গ্লানি অনুভব করে, অপরাধ-বোধ তাদের পীড়া দেয়—অথচ তাদের কেন্দ্র করে তাদের নিজেদের পারিবারিক প্রত্যাশা যা গড়ে ওঠে সেই সব প্রত্যাশা ও তাদের ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়স্বজনদের চিন্তা-ভাবনাকে তারা ঘৃণা না করে পারে না।

এ রকম বৈষম্যপূর্ণ স্ববিরোধী ও দ্বন্দ্বজটিল অবস্থার চাপে আমাদের তরুণ চিন্তাশীলরা ক্রমেই ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হবে সেটা স্বাভাবিক।

কিন্তু এত ক্রোধ এত ক্ষোভ এত অভিমান এত অবিশ্বাস আমাদের বাস্তব পরিবেশ আমাদের যুগ ও আমাদের সমাজ সম্পর্কে পোষণ করা সত্ত্বেও যুদ্ধোত্তর যুগের তরুণরা বর্তমানকালের প্রধান ও আসল সমস্যাগুলি, সেই সব সঙ্কট যা সমাজের অন্তস্তলে থেকে আমাদের সমস্ত জীবনপ্রবাহকেই বিষাক্ত পঙ্কিল ও দুর্গন্ধময় করে তুলছে সেসব সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব, চিন্তা করতেও পরাঙ্মুখ, তাদের অস্তিত্ব আছে বলেই মনে করতে নারাজ। বিশ্বযুদ্ধ আমাদের দেশের ওপর ততটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে নি যতটা পড়েছিল পশ্চিমী দেশগুলি, জাপান বা চীনের ওপর। কিন্তু যুদ্ধের আগুন আমাদের অনেক কিছুই পুড়িয়ে দিয়ে গেছে। যুদ্ধ কালোবাজার, ভেজাল ও অবাঞ্ছিত কাঁচা টাকাই বাজারে চালু করে নি শুধু, নারীমেধযজ্ঞ সেই যে তখন শুরু হল তা আর থামল না। এবং শুধু তাই নয়—আমাদের সমস্ত সনাতন ব্যবস্থা, প্রচলিত মূল্যবোধ, বিশ্বাস সবই ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল যুদ্ধের ধাক্কায়। চুরমার তারা হতই একদিন, কিন্তু ভাঙন যদি আসত ধীর পায়ে তা হলে আমরা নতুন

ব্যবস্থা, নতুন মূল্যবোধ বা বিশ্বাসের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠতে পারতুম, সেসব আবিষ্কার করে নেবার অবকাশ আমাদের মিলত। যুদ্ধ আমাদের সেই স্বাভাবিক অবকাশ থেকে বঞ্চিত করেছে। যুদ্ধের ফলাফল যখন আমাদের বিমূঢ় করে তুলেছে সেই সময়ই এল দাঙ্গা এবং তার অব্যবহিত পরেই দেশবিভাগ ও স্বাধীনতা। স্বাধীনতা এমন এক করুণ ও পাপ-কলঙ্কিত পটভূমিকায় এল যে আমরা এই স্বাধীনতাকে বিশ্বাসই করে উঠতে পারি নি। তাই ১৯৫০-৫১ সন পর্যন্ত কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় মিছিল বেরিয়েছে আওয়াজ কণ্ঠে নিয়ে: ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়। জনমানসেও এরকম একটা বোধ তীব্র হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তারপর বিভ্রান্তি একটু যেন কাটল, আমরা বুঝলাম দেশ এখন আমাদেরই—এই দেশই এখন আমাদের সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে হবে, এই দেশের ওপর সাধারণ মানুষের অধিকার প্রসারিত করতে হবে এবং সর্বব্যাপক ভাঙনের মধ্যে আবার নতুন করে নবজীবনের রূপ সৃষ্টি করতে হবে, সমাজের সৃজনী-শক্তিগুলিকে অবাধ বিকাশের সুযোগ দিতে হবে।

ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন দেশ, বাংলাদেশের বয়সও কম হল না। কিন্তু ঠিক এরকম অপূর্ব নতুন অথচ অতি কঠিন পরিস্থিতি এদেশের ইতিহাসে ইতিপূর্বে আর কখনও আসে নি—আমাদের সমস্যার প্রতিরূপ অতীতের ইতিবৃত্তে খুঁজলে মিলবে না। এবং এই অজ্ঞাতপূর্ব বিস্ময়কর পরিস্থিতির জন্য আমরা কোনদিন প্রস্তুতও ছিলাম না। ইংরেজের আমলে আমাদের সব দুর্দশার মূল রূপে ইংরেজকেই নির্দেশ করতুম—সে যখন গেল তখন দেখলাম, রাতারাতি তো কিছু ভাল হল না, রাতারাতি কিছু ভাল হবারও নয়। কেন না, গলদ অনেক গভীর ও ব্যাপক, সমস্যা অনেক বেশী জটিল আর কর্তব্যও অনেক কঠিন, ভারী ও দীর্ঘস্থায়ী। গত দশকের গোড়াতেই এসব বোধ ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করে। কিন্তু তখন ভাল করে সব বুঝে নেবার আগেই আবার বিশ্বের আকাশে তৃতীয় যুদ্ধের আশঙ্কা ঘনিয়ে এল, মারাত্মক যুদ্ধাস্ত্র আবিষ্কার পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলল। চীনে মাও সে তুঙ ক্ষমতায় আসার পর মনে হতে লাগল কমিউনিজম বুঝি অপ্রতিরোধ্য, সমস্ত এশিয়া-আফ্রিকা কমিউনিজমের গ্রাসে পড়বেই এবং এ ছাড়া প্রগতির আর কোন পথও নেই, কমিউনিজম-বিরোধিতা মানেই বুঝি ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদারি করা। এদিকে আমাদের ঘরে অভাব-অনটন নোংরা ভাবে দেখা দিতে লাগল, বেকার ও ছদ্মবেশী বেকার ও কোনমতেই-সংসার-চলে-না গোছের মানুষে দেশ ছেয়ে গেল, আমাদের বাঙালীদের মনে হতে লাগল আমরা কেন্দ্রীয় সরকার ও অন্যান্য প্রদেশের কাছ থেকে অবিচার ও অন্যায় পাচ্ছি, আর অন্যান্য প্রদেশ ও কেন্দ্রীয় সরকারও বলতে লাগল যে বাঙালীরা বড় বেশী প্রাদেশিক, সঙ্কীর্ণচেতা ও চতুরতাপূর্ণ। পাকিস্তান শুধু লক্ষ লক্ষ মানুষকেই এদেশে পাঠাল না, তার সব দরজাও আমাদের কাছে বন্ধ করে দিল। এমন সময় যাদের দিকে আমরা স্বভাবতঃই প্রত্যাশার চোখে তাকালুম সেই কংগ্রেস ও বামপন্থীরা আমাদের সব আশাকেই বিনষ্ট করেছে ও প্রমাণ করেছে যে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতেও তারা অক্ষম, এই পরিস্থিতির যোগ্যও তারা নয়—তাই শুধু গরম কথা, ফাঁকা আওয়াজ ও পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করেই জনতার দৃষ্টি নিজেদের দিকে টানতে চায় আর সুযোগ পেলেই বিবেকের বালাই না রেখে দু পয়সা আয় করতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। রাজনীতিকদের ওপর আমাদের সব আস্থাই গেল টুটে।

এবং সঙ্গে সঙ্গে এও দেখলাম যে মানুষ চিন্তা করা ছেড়ে দিচ্ছে, ক্রমেই সে জনতার মধ্যে মিশে গিয়ে জনতার মধ্যেই জীবনের সব ব্যর্থতাবোধের শান্তি খুঁজে পেতে চাইছে ও নিজস্ব ভাল-মন্দ বোধ পর্যন্ত গড়ে তুলতে বিমুখ হচ্ছে। ব্যক্তি, তার বিকাশ, তার অনন্যতার সাধনা সবই প্রায় শেষ হয়ে এল, সংবাদপত্র রেডিও রাজনৈতিক পার্টি কারখানা ও অফিস ব্যক্তিকে কবর দিয়ে তার ওপর জনতার বর্বর নৃত্য-উৎসব লেলিয়ে দিল। এবং বিমূঢ় দিশাহারা আত্মপ্রত্যয়হীন বিবেকবিরহিত জনতা একবার

সাধুসন্ত বাবাজীদের পায়ে, একবার চিত্রতারকাদের পিছনে, একবার যুক্তিহীন সর্বনাশা বিক্ষোভে এবং সবশেষে চরম নিষ্ক্রিয়তায় ঢলে পড়ছে। যে অভিনব চ্যালেঞ্জ এসেছে তাদের সামনে, তা বোঝবার ক্ষমতাও তাদের নেই, প্রবৃত্তিও নেই।

তরুণ বুদ্ধিজীবীরা এসব নিয়ে ভাবল না শুধু তাই নয়, তারা রায় দিল এসব ব্যাপারে কৌতূহল দেখাবার অর্থ আঁতেলেকচুয়েল হিসাবে ছোট হয়ে যাওয়া। আঁতেলেকচুয়েল হতে হলে কামু সার্তর বোভোয়া, আধুনিক চিত্রকলা কাব্য, আধুনিক যত ইডিওলজি ও আইডিয়া তাই নিয়েই আলোচনা করতে হবে। অসুবিধা শুধু এই যে আমরা ফরাসী নই, নেহাতই বাঙালী; য়ুরোপ বা আমেরিকা আমাদের অচেনা দেশ। তাই যে সমাজ ও সংস্কৃতি আমাদের অপরিচিত জগৎ, তারই আবহাওয়ায় পুষ্ট কামু সার্তরদের আমরা ঠিক বুঝিও না। অতএব এই অসুবিধার ক্ষতিপূরণ করা যাক শুধু নিত্য-নূতন আঁতেলেকচুয়েল ফ্যাশন আমদানি করে, বুলি মুখস্ত করে ও রোজই বুলি বদলিয়ে। তরুণ বুদ্ধিজীবীরা তাদের চারপাশের বাস্তব পরিস্থিতি থেকে মুখ লুকিয়ে বুলির জগতে আশ্রয় নিয়েছে। বুলির দুর্গ কফিহাউস ও রেস্তরাঁ—আমাদের তরুণ বুদ্ধিজীবীরা সেখানেই সবচেয়ে স্বস্তি নিরাপত্তা ও আরাম বোধ করে। কফিহাউসে যে না যায় সে নাকি গ্রাম্যই রয়ে যায়, আঁতেলেকচুয়েল মহলে তার পাত্তা মেলে না। কফি বা চায়ের কাপ যাদের প্রেরণার একমাত্র উৎস, একখানা টেবিলের চারপাশে জমায়েত চারজন বন্ধু যাদের কাছে একমাত্র গণনার যোগ্য মানুষ—জীবন সম্পর্কে তারা বাক্যের ফুলঝুরি ঝরাবে, জীবনের কথা নিয়ে তারা বিলাসিতা করবে কিন্তু জীবনকে চিনবে না কোনদিন—জীবনের সর্ববিধ সমস্যার প্রতি বিমুখ থেকে কফির কাপে ঝড় তুলে নিজেদের উত্তেজনা নিজেরাই উপভোগ করে সন্তুষ্ট থাকবে এ তো স্বাভাবিক।

তবু তারা ক্রুদ্ধ, কেন না, বর্তমান পরিবেশে তাদের অধিকাংশ প্রত্যাশাই অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে, তারা ব্যর্থতা ও হতাশার দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। তাদের এই ক্রোধের স্বরূপ সম্পর্কে কেনেথ অ্যালসপ বলছেন :

> Their anger is a sort of neurological masturbation, deriving from the very problems they cannot bring themselves to confront. It is a textbook psychotic situation : the emotinal deadlock in a person caused by a general conviction that certain major man-made problems that man is .facing are beyond the capacity of man to solve....They are angry at having nothing they dare to be angry about.
>
> —The Angry Decade. p. 20

আগেই বলেছি রবীন্দ্র ও আকাদমি পুরস্কার ছাড়াও আরও নানা সুযোগ-সুবিধা সরকার সাহিত্যিকদের দিচ্ছেন। তাঁরা যে সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এই সুবিধাগুলি দিয়ে থাকেন তা নয়, সমাজে যাঁদের কণ্ঠ সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করে তাঁদের আনুগত্য রাষ্ট্রীয় স্বার্থে সরকার পেতে চান। সোভিয়েট রাশিয়ায় সরকার লেখকদের যে কী উচ্চমূল্য দিয়ে থাকেন ও কেন দেন তা সবাই এখন জানে। আমাদের দেশে সোভিয়েট রীতিরই আমদানি হচ্ছে।

আকাদমি ও রবীন্দ্রপুরস্কার, বিধানসভা ও রাজ্যসভায় আসন, বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ-সুবিধা, রেডিওয় স্ফীত বেতনের চাকরি, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগ-প্রধান হবার সম্মান ও আর্থিক সমৃদ্ধি, আমেরিকায় লেকচারারশিপ নিয়ে ঘুরে আসার ব্যবস্থা, সরকারী চাকরি থেকে অবসরগ্রহণের পর পুনরায় উচ্চ সরকারী পদে নিয়োগ—এ সমস্তই লেখকদের শান্ত ও খুশী রাখার প্রকরণ। পুরস্কারের এই ছড়াছড়ির সুযোগ নিতে সেইসব লেখকরাই

কুণ্ঠিত হন নি যাঁরা একদিন লিখেছিলেন মানুষের সংগ্রামের কাহিনী, ক্রন্দনমথিত বাস্তব একদিন যাঁদের বেদনাহত করেছিল, এবং আজও সম্ভবতঃ যাঁরা বাস্তবের অভিঘাতে চঞ্চল, অতৃপ্ত। তবু পুরস্কার নিতে এঁদের দ্বিধা দূরের কথা, বরং তদ্বিরে এঁরা সদা ব্যস্ত। বাংলাদেশে এঁরা একদা বিদ্রোহের প্রতীক রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন; বিদ্রোহ ও পুরস্কার গ্রহণ যে একই সঙ্গে চলে না এ বোধ পর্যন্ত আজ তাঁদের অবলুপ্ত।

যুদ্ধোত্তর যুগে বা পঞ্চাশ দশকে যে তরুণরা আত্মপ্রকাশ করেছে তারা এসব দেখেছে। তারা এখন থেকেই হিসাব করছে, উন্মুখচিত্তে প্রতীক্ষা করছে কবে সরকারপ্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা তাদের ভাগ্যেও জুটবে। রেডিও, অধ্যাপনা, আকাদমির প্রকাশনা বিভাগ ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় চাকরির মাধ্যমে সরকার এদের কাউকে কাউকে এখনই সেসব সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছেনও। যারা তা পায় নি তাদের এ একটা প্রচণ্ড মনঃক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেক তরুণ বুদ্ধিজীবীই ভাবে—ভাবাটাও স্বাভাবিক যে, যোগ্যতায় সে-ই সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং অন্যদের প্রাপ্তিযোগ ঘটলে ও নিজের সে তুলনায় কম ঘটলে বা না ঘটলে মর্মপীড়া অনুভব করা তরুণ বুদ্ধিজীবীর পক্ষে অবশ্যম্ভাবী।

গত এক দশকের তরুণ বুদ্ধিজীবীদের মনোভাব সম্পর্কে আমি আলোচনা করেছি। এরা এদের পরিবেশে ক্ষুব্ধ, অসন্তুষ্ট; কিন্তু সামগ্রিকভাবে এই পরিবেশকে যাচাই করে দেখা ও মূল মানবিক সমস্যাগুলির মুখোমুখি হওয়ার কোন প্রবৃত্তি এদের নেই। এদের ক্রোধের যথেষ্ট কারণ আছে, কিন্তু সে কারণ সাধারণতঃ ব্যক্তিগত ব্যর্থতা-বোধ ও তিক্ততা-অনুভবের মধ্যেই নিহিত। হয়তো পারিবারিক তিক্ত স্মৃতি অথবা কোন শিক্ষক বা সহপাঠীর দুর্ব্যবহারও এই ব্যর্থতাবোধের পিছনে থাকতে পারে—সামাজিক জীবনে দৈনন্দিন ব্যর্থতাবোধগুলি তো আছেই। এই ক্রোধে তীব্রতা আছে, কিন্তু তা ব্যক্তিক বলেই তার তাৎপর্য কম। আজকের তরুণরা আদর্শ খুঁজে পায় নি বলে তাদের ক্রোধ বিদ্রোহে রূপান্তরিতও হতে পারে নি। তারা তাই দুরাচার ও টেডি-বয়সুলভ অশিষ্ট রুক্ষ বিরক্তি প্রকাশেও মেতে উঠতে কুণ্ঠিত হচ্ছে না প্রায়ই। তাদের ক্রোধ হয়তো সমাজের অতলশায়ী কোনও দুষ্টশক্তির অস্তিত্বকে প্রমাণ করে, কিন্তু সে বিষয়ে তারা নিজেরা সচেতন হতেও ভয় পায়। বাস্তব পরিস্থিতির প্রতি তারা দ্রুত সাড়া দেয়, কিন্তু সেই সাড়া যুক্তিশোধিত ও প্রত্যয়ে গভীর নয়। তা অনেকটাই সহজাত প্রবৃত্তিসঞ্জাত মাত্র। এই ক্রোধ এই অসন্তোষ এই তীব্র ব্যর্থতাবোধ নতুন সৃষ্টির উৎস হয়ে উঠবে কোনোদিন এ আশা আপাততঃ করার কোনও কারণ তাই নেই।

আগামী সংখ্যা (আষাঢ়, ১৩৬৭) হইতে শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী রচিত বহুখ্যাত ভ্রমণ-কাহিনী 'রম্যাণি বীক্ষ্যে'র "মধ্যভারত পর্ব" ধারাবাহিকভাবে 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হইবে।

"রবির পূর্ণ উদয়"

শ্রীসজনীকান্ত দাস

নিতান্ত শৈশবকাল হইতেই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-প্রতিভা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। তাঁহার খ্যাতি পারিবারিক গণ্ডী ছাড়াইয়া ধীরে ধীরে বাহিরে বিস্তার লাভ করে। ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যা 'প্রবাসী'তে (পৃ. ৪৭৪) "পিতৃস্মৃতি" প্রবন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা রবীন্দ্রনাথের বড়দিদি সৌদামিনী দেবী লিখিয়াছেন: "রবির গান শুনিতে তিনি [মহর্ষি] ভালবাসিতেন। বলিতেন রবি আমাদের বাঙ্গালাদেশের বুলবুল।" এই বুলবুলকে ১২৯৩ সালে পঁচিশ বৎসর বয়সে সেই বৎসর মাঘোৎসব উপলক্ষে রচিত ও গীত "নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে" প্রভৃতি গানের জন্য মহর্ষি কি ভাবে পাঁচ শত টাকার একটি চেক দিয়া পুরস্কৃত করেন সে কথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'জীবন-স্মৃতি'তে লিখিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত ও সাহিত্যের আদর বুঝিত, তবে কবিকে তো তাহারা পুরস্কার দিত। রাজার দিক হইতে যখন তাহার কোনো সম্ভাবনা নাই তখন আমাকেই সে-কাজ করিতে হইবে।"

বাহিরের খ্যাতি তখনই কবি রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করিয়াছে। উপরোক্ত ঘটনার সাড়ে চার বৎসর পূর্বেই ১২৮৯ সালের শ্রাবণ মাসে (১৮৮২ জুলাই) ভূতত্ত্ববিদ্ প্রমথনাথ বসুর সহিত রমেশচন্দ্র দত্তের জ্যেষ্ঠা কন্যা কমলার বিবাহ-সভায় 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র কবিকে বঙ্কিমচন্দ্র-কর্তৃক নিজের গলার মালা দিয়া স্বীকৃতিদানের ঐতিহাসিক ঘটনাটি ঘটিয়া গিয়াছে। সঙ্গীতের জন্য রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'বাল্মীকি-প্রতিভা' রচনা ও অভিনয়ের জন্য গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি রাজকৃষ্ণ রায় ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অযাচিত অকুণ্ঠ প্রশংসাও কবি লাভ করিয়াছেন। কালীপ্রসন্ন ঘোষ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতিও বালক ও কিশোর রবীন্দ্রনাথ রচিত কাব্যগ্রন্থ ও কবিতা লইয়া কবিকে কম প্রশংসা করেন নাই।

১২৯০ সালের ২৪ অগ্রহায়ণ রবিবার (৯ ডিসেম্বর ১৮৮৩) মহর্ষির এস্টেটের কর্মচারী খুলনা দক্ষিণডিহির বেণীমাধব রায়চৌধুরীর দশ বর্ষীয়া কন্যা ভবতারিণীর সহিত বাইশ বৎসর সাত মাস বয়স্ক রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। কন্যার নাম পালটাইয়া মৃণালিনী করা হয়। এই বিবাহ-সম্বন্ধ যে অন্ততঃ আট মাস পূর্বে স্থির হইয়াছিল ১২৯০ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'ভারতী'তে (পৃ. ৪৯-৬৪) প্রকাশিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "যৌতুক কি কৌতুক" কবিতার পরিশিষ্ট "ছদ্ম-বেশধারী উৎসর্গ—এক কথায়—উপসর্গ"ই তাহার প্রমাণ। পরিশিষ্টটি এই—

> "শর্বরী গিয়াছে চলি'! দ্বিজ-রাজ শূন্যে একা পড়ি
> প্রতীক্ষিছে রবির পূর্ণ উদয়।
> গন্ধহীন দু-চারি রজনীগন্ধা লয়ে তড়িঘড়ি
> মালা এক গাঁথিয়া সে অসময়
> সঁপিছে রবির শিরে এই আজ আশিষিয়া তারে
> 'অনিন্দিতা স্বর্ণমৃণালিনী হোক্
> সুবর্ণ তুলির তব পুরস্কার! মত্রজার কারে
> যে পড়ে সে পড়ুক খাইয়া চোক।'"

এই আশীর্বাদী কবিতায় রবীন্দ্র-ভবতারিণী-বিবাহে কেহ যে বাদ সাধিয়াছিলেন তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। আমার আলোচনা সে প্রসঙ্গে নয়। বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ পূর্ণ বাইশ বর্ষ বয়স্ক কনিষ্ঠ ভ্রাতা রবির পূর্ণ উদয় প্রতীক্ষা করিতেছেন, শর্বরী অতিক্রান্ত হইয়াছে—এই অধ্যায়ে সেই আলোচনাই করিব।

ঠিক এই কালে "রবির পূর্ণ উদয়" একটা প্রচণ্ড আলোড়ন ও আঘাতের অপেক্ষায় ছিল। বিবাহের মাত্র সাড়ে চার মাস পরেই ১২৯১ সালের ৮ই বৈশাখ তারিখে অতর্কিতে সেই "দুঃসহ আঘাত" আসিল—নতুন বৌঠান

কাদম্বরী দেবীর আকস্মিক আত্মঘাতে। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন :

"জীবনের মধ্যে কোথাও যে কিছুমাত্র ফাঁক আছে, তাহা তখন জানিতাম না ; সমস্তই হাসিকান্নায় একেবারে নিরেট করিয়া বোনা।...এমন সময় কোথা হইতে মৃত্যু আসিয়া এই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ জীবনটার একটা প্রান্ত যখন এক মুহূর্তের মধ্যে ফাঁক করিয়া দিল, তখন মনটার মধ্যে সে কী ধাঁধাই লাগিয়া গেল। চারিদিকে গাছপালা মাটিজল চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা তেমনই নিশ্চিত সত্যেরই মতো বিরাজ করিতেছে, অথচ তাহাদেরই মাঝখানে তাহাদেরই মতো যাহা নিশ্চিত সত্য ছিল—এমন কি, দেহ প্রাণ হৃদয় মনের সহস্রবিধ স্পর্শের দ্বারা যাহাকে তাহাদের সকলের চেয়েই বেশি সত্য করিয়া অনুভব করিতাম সেই নিকটের মানুষ যখন এত সহজে এক নিমিষে স্বপ্নের মতো মিলাইয়া গেল* তখন সমস্ত জগতের দিকে চাহিয়া মনে হইতে লাগিল, এ কী অদ্ভুত আত্মখণ্ডন !...

জীবনের এই রন্ধ্রটির ভিতর দিয়া যে একটা অতলস্পর্শ অন্ধকার প্রকাশিত হইয়া পড়িল, তাহাই আমাকে দিন রাত্রি আকর্ষণ করিতে লাগিল...কিন্তু সেই অন্ধকারকে অতিক্রম করিবার পথ যখন দেখা যায় না তখন তাহার মতো দুঃখ আর কী আছে। তবু এই দুঃখের ভিতর দিয়া আমার মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে একটা আকস্মিক আনন্দের হাওয়া বহিতে লাগিল, তাহাতে আমি নিজেই আশ্চর্য হইতাম।... জগৎকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্য যে দূরত্বের প্রয়োজন মৃত্যু সেই দূরত্ব ঘটাইয়া দিয়াছিল। আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম তাহা বড়ো মনোহর।"

এই আলোড়ন-আঘাতের পরেই মেঘমুক্ত রবির বিস্ময়কর প্রকাশ। ওই ১২৯১ সালেরই চৈত্র সংখ্যা 'ভারতী'তে "বিদায়" ('কড়ি ও কোমলে' কবিতাটির নাম হয় "পুরাতন") কবিতায় কবির নিজের প্রশ্ন—

"উঠেছে প্রভাত রবি, বারেক যে চলে যায়,
আঁকিছে সোনার ছবি, তারে ত কেহ না চায়,
তুমি কেন ফেল তাহে ছায়া! তবু তার কেন এত মায়া!"

ধীরে ধীরে নিজের মনেই মিলাইয়া যায়। কবি ঘোষণা করেন—

"আমার কবিতা এখন মানুষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।... শানাইয়ের বাঁশিতে ভৈরবীর তান দূর প্রাসাদের সিংহদ্বার হইতে কানে আসিয়া পৌঁছে।... জীবনের নির্ঝরধারা মুখরিত উচ্ছ্বাসে হাসিকান্নায় ফেনাইয়া উঠিয়া নৃত্য করিতে থাকে।......

'কড়ি ও কোমল' মানুষের জীবননিকেতনের সেই সম্মুখের রাস্তাটায় দাঁড়াইয়া গান। সেই রহস্যসভার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আসন পাইবার জন্য দরবার।

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"

"বিশ্বজীবনের কাছে ক্ষুদ্রজীবনের এই আত্মনিবেদন" দুঃসহ মৃত্যুশোকের আঘাতেই আরব্ধ হইয়া যায়।

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কিছুকাল পূর্বেই হইয়াছিল। কিন্তু প্রবাহ একটা দুরন্ত ঘূর্ণির মধ্যে পড়িয়া যে আবর্তের সৃষ্টি করিয়াছিল প্রিয়জনবিরহের এই বেদনা-আলোড়ন সাময়িক স্তম্ভিত ভাব কাটাইয়া তাহাকে মুক্ত করিয়া সাগরমুখী করিল ; "নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল।" ১২৯১ হইতে ১৩০০ সাল, এই নয় বৎসরে রবীন্দ্র-প্রতিভার বিচিত্র স্ফুরণ বিস্ময়কর। কবি যেন সহসা আপনাকে আবিষ্কার করিলেন। যাহা একান্ত নিজের কথা ছিল তাহাই সম্পূর্ণ নিজের ভাষায় সকলের কথা হইয়া উঠিল। কাব্যে, গানে, ছোটগল্পে, চিন্তাশ্রয়ী প্রবন্ধে, হেঁয়ালিনাট্যে, ব্যঙ্গ-হাসি-কৌতুকে, নাটকে, প্রহসনে, উপন্যাসে এমন কি বক্তৃতায় ও বিতর্কে রবীন্দ্র-প্রবাহ কূল ছাপাইয়া উদ্বেল হইয়া উঠিল। এই নয় বৎসর কালের মধ্যেই 'ভারতী',

* 'বলাকা' কাব্যের "তুমি কি কেবল ছবি" কবিতা দ্রষ্টব্য। এই কবিতার লক্ষ্য কে সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নাই।

'বালক', 'হিতবাদী' ও 'সাধনা'য় "রবির পূর্ণ উদয়ে"র সকল লক্ষণ ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইতে লাগিল।

১৩০০ বঙ্গাব্দের প্রায় সমাপ্তি মুখে ছাব্বিশে চৈত্রের সায়াহ্নে বঙ্গসাহিত্যাকাশ হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোভাব ঘটিল, এবং ঠিক এক মাস ১৫ দিন পরে ১৩০১, ১১ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী ইহলোক হইতে বিদায় লইলেন। বাংলা-সাহিত্য-সাধনায় এই দুই জনই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধেয়—সাহিত্যগুরু ও "কাব্যগুরু"। এই দুইজনের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসাহিত্য-সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার একা রবীন্দ্রনাথে বর্তাইল। এগার বৎসর পরে দ্বিজ-রাজ দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতীক্ষা সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিল—"রবির পূর্ণ উদয়" ঘটিল।

উত্তরাধিকারসূত্রে উভয়ের শ্রাদ্ধ যথোচিত শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত একা রবীন্দ্রনাথ সম্পন্ন করিলেন। ১৩০১ বৈশাখের গোড়ায় চৈতন্য লাইব্রেরির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত শোকসভায় সুবিখ্যাত "বঙ্কিমচন্দ্র" ('আধুনিক সাহিত্য' প্রথম প্রবন্ধ) পাঠ এবং আষাঢ়ের 'সাধনা'য় সুপরিচিত "বিহারীলাল" ('আধুনিক সাহিত্য' দ্বিতীয় প্রবন্ধ) প্রকাশের দ্বারা তিনি উত্তরাধিকার কায়েম করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে লিখিলেন :

"বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃদ্‌পদ্ম সেই প্রথম উদ্‌ঘাটিত হইল। পূর্বে কী ছিল এবং পরে কী পাইলাম তাহা দুইকালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি,...কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সংগীত, এত বৈচিত্র্য।...বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।"

"বিহারীলাল" প্রবন্ধে লিখিলেন :

"বিহারীলালের কণ্ঠ সাধারণের নিকট তেমন সুপরিচিত ছিল না...কিন্তু যাহারা দৈবক্রমে এই বিজনবাসী ভাবনিমগ্ন কবির সঙ্গীত-কাকলীতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার কাছে আসিয়াছিল তাহাদের নিকটে আদরের অভাব ছিল না। তাহারা তাঁহাকে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া জানিত।...'বঙ্গদর্শন'কে যদি আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের প্রভাতসূর্য বলা যায় তবে ক্ষুদ্রায়তন [বিহারীলালের] 'অবোধ বন্ধু'কে প্রত্যূষের শুকতারা বলা যাইতে পারে। সে প্রত্যূষে অধিক লোক জাগে নাই এবং সাহিত্যকুঞ্জে বিচিত্র কলগীত কূজিত হইয়া উঠে নাই। সেই উষালোকে কেবল একটি ভোরের পাখি সুমিষ্ট সুন্দর সুরে গান ধরিয়াছিল। সে সুর তাহার নিজের। ঠিক ইতিহাসের কথা বলিতে পারি না—কিন্তু আমি সেই প্রথম বাংলা কবিতায় কবির নিজের সুর শুনিলাম।"

রবীন্দ্রনাথে এই দুই শক্তি—বঙ্কিমচন্দ্র ও বিহারীলাল—একাধারে একত্র সংহত হইয়াছে। বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' বঙ্গ-সাহিত্যকে যেমন বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত করিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা' তেমনই তাহাকে পূর্ণ যৌবনে উত্তীর্ণ করিয়া দিল। আধুনিক বঙ্গ-কাব্য-সাহিত্যের প্রত্যূষে বিহারীলাল নিজের অস্ফুট ভাষায় কাকলী তুলিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ দিনের প্রহরে প্রহরে স্বকীয় প্রদীপ্ত কণ্ঠে ছয়রাগ ছত্রিশরাগিণীর লহর তুলিয়া বিশ্বভুবন পরিপ্লাবিত করিয়া দিলেন। যে 'সোনার কাঠি'র আভাসমাত্র বিহারীলালে দেখা গিয়াছিল রবীন্দ্রনাথের হাতে তাহারই জাগ্রত "স্পর্শে নিখিল প্রকৃতির অন্তরাত্মা সজীব ও সজাগ হইয়া আমাদিগকে নিবিড় প্রেমপাশে আবদ্ধ" করিয়াছে।

অর্থাৎ "রবির পূর্ণ উদয়" ঘটিল। ইতিপূর্বে 'মানসী', 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'সোনার তরী' প্রকাশিত হইয়াছে। কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, "সাহিত্য-সেবক" নিত্যকৃষ্ণ বসু, বন্ধু প্রিয়নাথ সেন প্রভৃতি এই সকল কাব্য লইয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্র-প্রতিভার অকুণ্ঠিত স্বীকৃতি সর্বপ্রথম দেখিতে পাই সেকালে বাংলাসাহিত্যের দিক্‌পাল চন্দ্রনাথ বসুর একটি পত্রে। সামাজিক আচার-বিচার-ব্যবহার লইয়া তাঁহার সহিত রবীন্দ্রনাথের বিরোধ সর্বজনবিদিত। তৎসত্ত্বেও এই বৃদ্ধ সাহিত্যিক অনুজ রবীন্দ্রনাথকে যে স্বীকৃতি দান করিয়াছিলেন তাহাকে বাংলাসাহিত্যে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বলা চলে। ১৩০২ ফাল্গুনে 'চিত্রা' বাহির হইয়াছে। 'কণিকা' বাহির হইল ৪ অগ্রহায়ণ ১৩০৬ এবং তাহার পর, পরে পরে 'কথা'—১লা মাঘ ১৩০৬, 'কাহিনী'—২৪ ফাল্গুন ১৩০৬, 'কল্পনা'—২৩ বৈশাখ ১৩০৭ এবং 'ক্ষণিকা'—শ্রাবণ, ১৩০৭ বাহির হইলে প্রবীণ চন্দ্রনাথ বসু সেগুলি পাঠ করিয়া কতখানি বিস্ময়বিমুগ্ধ হইলেন নিম্নলিখিত পত্রখানি তাহার সাক্ষ্য হইয়া আছে। পত্রটি অংশত উদ্ধৃত করিতেছি :

কলিকাতা
৫নং রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট।
৩০এ শ্রাবণ, ১৩০৭

রবীন্দ্রনাথ

তোমার সহিত পথ চলিবার সামর্থ্য আমার নাই—তোমার গতি এতই দ্রুত, এতই বিদ্যুৎবৎ। তোমার প্রতিভার পরিমাপ নাই—উহার বৈচিত্র্যও যেমন, প্রভাও

তেমনি। আমি তোমার প্রতিভার নিকট অভিভূত। 'কণিকা', 'কথা', 'কল্পনা', 'ক্ষণিকা'—বলিতে গেলে চারিমাসের মধ্যে চারিখানা—পারিয়া উঠিব কেন? প্রকৃতপক্ষেই পারি নাই। 'কণিকা' ছাড়িতে না ছাড়িতে 'কথা' আসিল—'কথা' দিয়া তুমি আমার হইতে 'কণিকা' কাড়িয়া লইলে—'কণিকা'র ভোগ ত আমাকে পূর্ণ করিতে দিলে না। এমনি করিয়া 'কল্পনা' দিয়া 'কথা' কাড়িয়া লইয়াছিলে আমার ভোগে আবার বাধা দিয়াছিলে! এবার 'ক্ষণিকা'য় চমকিত করিয়াছ। আবার ভোগে বিবাদী হইয়াছ। আমি ক্ষুদ্র—সুতরাং আমার গতি বড় ধীর—আমি তোমার সঙ্গে পারিয়া উঠিতেছি না। পিছাইয়া পড়িতেছি—কিন্তু তোমার গতি দেখিয়া চমৎকৃত হইতেছি—ও গতি যথার্থই বিদ্যুতের গতি,—যেমন দ্রুত, তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি সুন্দর। ও গতি এখানকার নয়, উর্দ্ধদেশের—মহাকাশের। রবীন্দ্রনাথ, তোমার পরিমাণ করিতে পারি, যথার্থই এমন শক্তি আমার নাই।

ইতি

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু

এই অপূর্ব উদার প্রশস্তি উনবিংশ শতকের শেষ বৎসর অর্থাৎ ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই আগস্ট তারিখের ঘটনা। পুরাতন শতাব্দী সমাপ্ত হইবার ঠিক চার মাস পূর্বে অর্থাৎ ওই ১৯০০ সনেরই ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে বঙ্গের আর এক মনীষী সন্তান, রবীন্দ্রনাথেরই সমবয়সী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিশ্বভাষায় অর্থাৎ ইংরেজীতে সর্বপ্রথম বাংলার কবিকে বিশ্বকবি বলিয়া সম্বর্ধিত করেন। উপাধ্যায়-সম্পাদিত অধুনা দুষ্প্রাপ্য ইংরেজী সাপ্তাহিক *Sophia*র ১লা সেপ্টেম্বর ১৯০০ সংখ্যায় "The World-Poet of Bengal" শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তিনি লেখেন:

Rabindra Nath is the youngest son of the Brahma patriarch, Devendranath Thakur. He is about forty years old, but he looks as youthful as a fresh-blown *champa*. His raven locks, lotus-petalled eyes, pencilled eyebrows, chiselled nose, swan-like neck, and the majesty of his tall figure illumined by a marigold complexion, would make a subject worthy of the canvas of a Raphæl or an Angelo.

But his poetry is greater, better and immeasurably higher than his person. In his youth he warbled, like a sweet little birdie, strains of love inspired by the sensuous beauty of nature. He soared with the dewy lark to bathe in the flood-light of the morning sun; he flew with the *chatak* to drink of the rain-clouds; he revelled with the *chakor* in the moonbeam overflowing the earth with molten silver. He wandered in bowers of roses resonant with the pipings of feathery songsters; played with the shiny shingles of the brook and gazed and gazed at the eddying rainbows formed in its bosom by the golden darts of the sun. In fact there was no beauty in nature which he did not woo and win over to his youthful self.

But in all his revellings on rose-banks and wallo-wings in beds of lilies there is a spirit of sadness which restrains the extravagance of joy, chastens the coarseness of the senses, and stands as a shade obscuring, yet beautifying, the exuberance of light which informs his passionate lyrics. He sings; his voice pierces the mid-sky and smites the very vault of heaven, but falls down, at last, on the earth like a shower of bewailing, tremulous tear-drops. His song is more like the cooing of a dove pouring out its heart to one that is absent than the self-sufficient strain of the cuckoo filling the woodlands with its luxurious richness.

This sadness about him has made him a master in the art of portraying human passions. Who has read his description of a *sannyasi's* struggle ['প্রকৃতির প্রতিশোধ'] to put out the flame of paternal affection towards an orphan girl, and not shed hot tears? Who is there so hardhearted as not to melt in pity at the sight of his picture of a burly *Cabuli* fruit-seller ["কাবুলিওয়ালা"] transformed into tenderness itself by the majestic charms of the blossom of a Bengali girl? And one would not mind to be disengaged from Tennyson's "In Memoriam" and Shelly's "Epipsychidion" to sympathise and grieve with him in his outbursts of pain—the excruciating pain of an unrequited love.

Rabindra is not only a poet of nature and love but he is a witnes to the unseen. Revelation apart, Kant, Tennyson and Newman are considered to be three modern witnesses to the invisible world. Poor Bengal has produced another and it is Rabindra Nath.

When we were young, full of ardour love and warmth, we were one day reading his "World-Current." ["স্রোত" —'প্রভাত সঙ্গীত'*] We were carried on and on by the "current" till we felt ourselves lost in a shoreless ocean of beauty and love. Tedious time with its painful divisions appeared to us but a speck, in the colorless bosom of eternity. Our individuality lost its isolatedness and was joined to the all. We could not live apart. We were obliged to live as a part of the whole. We were made partakers of the symphonies of the spheres. We hovered from flower to flower with the honey-sipping bee. We sang with the happy and wept with the sorrowing. We drank of the mother's heart and ran after children in love. We realised that we were living with all but not with ourself. And this "World-Current" is but a small poem written at random. Whenever he sing, whether it be of beauty that pervades the world, or of love that makes man semidivine, he takes us to the region of the infinite. The heavens with their luminous orbs, the earth with its flora and fauna, man with his reason and love, have been transformed by his magic wand into ripples of an eternal beauty that lies outstretched beyond space, unruffled and serene. He is verily a mystic beholder of the invisible regions.

If ever the Bengali language is studied by foreigners it will be for the sake of Rabindra. He is a world-poet. He is like the Devadaru which has its roots deep down, down the lowlands but which threatens to pierce the sky—such is its loftiness. He will be ranked amongst those seers who have come to know the essence of beauty through pain and auguish.

ইতিমধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর সূর্য রক্তমেঘের মাঝে অস্তাচলে গিয়া বাংলার রবিকে মধ্যাহ্ন-দীপ্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল। নূতন শতাব্দীর প্রথম বৎসরের মাঝামাঝি জুন-জুলাই ১৯০১, 'নৈবেদ্যে'র প্রকাশ বিশ্বের দরবারে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠাকে আর এক ধাপ অগ্রসর করিল। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তৎসম্পাদিত *The Twentieth Century* মাসিকপত্রের ৩১ জুলাইয়ের সংখ্যায় নরহরি দাস ছদ্মনামে 'নৈবেদ্যে'র এক দীর্ঘ প্রশস্তিমূলক পরিচয় লিখিয়া বাঙালী কবিকে ভারতের অন্যত্র এবং বিদেশে পরিচিত করিলেন। তিনি লিখিলেন :

> "*Naivedya* is the essence of *Bhakti* made compatible with the knowledge of the transcendent Reality before whose splendour the shadow of relationship is changed into light. The sonnets are like so many brilliant pearls illuminated with Divine grace."

বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর নির্মম উক্তি সম্পূর্ণ ফলিতে বিলম্ব হইল না। ঠিক এক বৎসর তিন মাস ২৩ দিন পরে ১৯০২ সনের ২৩ নবেম্বর ৭ই অগ্রহায়ণ ১৩০৯ তারিখে রবিমণ্ডলের নিকটতম স্নেহঘন ছায়াটি অপসারিত হইল। প্রচণ্ড দীপ্তিতে বিশ্বভুবন পরিপ্লাবিত করিবার জন্য মধ্যাহ্ন গগন হইতে প্রতীচীর পথে নিঃসঙ্গ রবির জয়যাত্রা আরম্ভ হইল।

---

* কবিতাটির শেষাংশ এই :—

"জগৎ হয়ে রব আমি একেলা রহিব না।
মরিয়া যাব একা হলে একটি জলকণা।
আমার নাহি সুখ দুখ পরের পানে চাই,
যাহার পানে চেয়ে দেখি তাহাই হয়ে যাই।
তপন ভাসে, তারা ভাসে, আমিও যাই ভেসে
তাদের গানে আমার গান, যেতেছি এক দেশে।
প্রভাত সাথে গাহি গান সাঁঝের সাথে গাই,
তারার সাথে উঠি আমি তারার সাথে যাই।
ফুলের সাথে ফুটি আমি, লতার সাথে নাচি,
বায়ুর সাথে ঘুরি শুধু ফুলের কাছাকাছি।
মায়ের প্রাণে স্নেহ হয়ে শিশুর পানে ধাই।
দুখীর সাথে কাঁদি আমি সুখীর সাথে গাই।
সবার সাথে আছি আমি আমার-সাথে নাই।
জগৎ-স্রোতে দিবানিশি ভাসিয়া চলে যাই।"

উইলিয়ম হিকি (৬)

তখনকার কালের কলকাতার সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের ব্যক্তিগত স্বভাবচরিত্রের কথা কিছু বলব। (আজকের দিনের বিচারকদের কাছে তো বটেই, সাধারণ নাগরিকদের কাছেও তা নানাদিক দিয়ে উপভোগ্য হবে—বি.)

সার্ রবার্ট চেম্বার্স

সেসন্সের বিচার আরম্ভ হল গ্রীষ্মকালে, জুন মাসে। তারিখ পড়ল ১০ জুন (১৭৮৪ সন)। সকাল ৮টায় কোর্ট বসবে, জুরিদেরও তাই জানানো হয়েছে। অন্যান্য বিচারকরা ও জুরিরা সকলেই সময়মত কোর্টে এসেছেন, কেবল সার্ রবার্ট আসেন নি। সব ব্যাপারেই তিনি অত্যন্ত ঢিমেতালে চলেন, এবং দু-চার ঘণ্টা পর্যন্ত দেরি হওয়া তাঁর পক্ষে আদৌ অস্বাভাবিক নয়। বেলা ১টা নাগাদ তিনি এসে পৌছলেন, নির্দিষ্ট সময়ের পাঁচ ঘণ্টা পরে। জুরিদের শপথ করিয়ে তাঁদের মামলা বুঝিয়ে দিতে বেলা তিনটে বেজে গেল। তারপর আর বিচার আরম্ভ করা যায় না বলে সেদিনের মতন শুনানি মুলতুবী রইল।

পরদিন সকাল ৯টার সময় হাইড ও জোন্স কোর্টে উপস্থিত হলেন, এবং জুরিদের শপথ গ্রহণের কাজ শেষ করে আসামীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে রেখে, চেম্বার্সের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। কারণ, রীতি হল, চীফ বা সিনিয়র জজ উপস্থিত না থাকলে বিচারের কাজ আরম্ভ হতে পারে না। জাস্টিস হাইড ও উইলিয়ম জোন্স চুপ করে চেয়ারে বসে হাত কচলাতে লাগলেন। বেলা যখন ১১টা বেজে গেল তখন হাইড রীতিমত বিচলিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে রবার্টের কাছে চিঠি লিখতে বসলেন। তিনি লিখলেন, "আমি ও জোন্স সাহেব বেলা ৯টা থেকে কোর্টে এসে বসে আছি, বেলা ১১টা পর্যন্ত আপনার দেখা নেই। অনুগ্রহ করে জানান, কোর্টে আসা আপনার পক্ষে আদৌ সম্ভব হবে কি না।" চাপরাসী দিয়ে সার্ রবার্টের বাড়ি পাঠাবেন বলে চিঠিখানা যখন তিনি ভাঁজ করছিলেন, ঠিক সেই সময় রবার্ট এসে উপস্থিত হলেন। হাইডের হাতে ভাঁজ-করা চিঠিখানা দেখে রবার্ট একগাল হেসে বললেন, "ব্রাদার হাইড, আমি যখন এসেই পড়েছি তখন অতদূরে কষ্ট করে চিঠি পাঠাবার আর দরকার নেই। ওটা এবারে ছিঁড়ে ফেলুন।" হাইড গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন, "ছিঁড়ে লাভ কি বলুন; আবার তো কালকেই দরকার হবে।"

চেয়ারে উপবেশন করে সার্ রবার্ট প্রথমে তাঁর প্রাইভেট মিনিট-বুকে জুরিদের নাম লিখতে লাগলেন।

নামের তালিকা করতে একঘণ্টা কেটে গেল। তারপর কাঠগড়ার আসামীর দিকে চেয়ে তিনি বললেন যে আজ তার বিচারের দিন নয়, অন্য একজন সিঁদেল চোরের বিচারের দিন। অবশেষে সেই চোরটিকে এনে হাজির করা হল। এতেও বেশ কিছুক্ষণ সময় কেটে গেল। তারপর যা শুরু হল তা আরও চমৎকার। আসামীর নাম জিজ্ঞাসা করাতে সে বেশ কায়দা করে উচ্চারণ করে বলল 'পিটার কার্ল'। আসামী জাতিতে আইরিশম্যান শুনে রবার্ট তার নামের ভাষাতাত্ত্বিক রহস্য সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে উঠলেন, এবং এ বিষয়ে উইলিয়ম জোন্সকে কাছে পেয়ে নানারকম প্রশ্ন করে উত্ত্যক্ত করে তুললেন।

রবার্ট। "আচ্ছা মিঃ জোন্স, নামের বানানটা কি তা হলে 'K' দিয়ে হবে, না 'C' দিয়ে হবে?"

জোন্স। "'K' দিয়ে কেন হবে বুঝতে পারছি না, 'C' দিয়েই তো হওয়া উচিত।"

রবার্ট। "উচ্চারণ তা হলে কি হবে?"

জোন্স। "C A R L L—সার্ল।"

রবার্ট। "আপনি তো আইরিশ ভাষা জানেন?"

জোন্স। "আজ্ঞে হ্যাঁ জানি।"

রবার্ট। "বেশ, বেশ! তা হলে অনুগ্রহ করে বলুন, এ নামের অর্থ কি?"

জোন্স। "অর্থ আর কি? নামের অর্থ নাম; অর্থাৎ কার্ল মানে কার্ল। এ ছাড়া আর কি অর্থ হতে পারে বুঝতে পারছি না।"

দুই বিচারকের এই প্রশ্নোত্তরে আদালত-গৃহের লোকজন সকলে হো-হো করে হেসে উঠলেন। সার্ রবার্ট কিন্তু তাতে আদৌ বিচলিত হলেন না। হাইডের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে তিনি বললেন, "আজ ১৬ জুন, ওয়েস্টমিনিস্টার ও ইংলণ্ডের অন্যান্য পাবলিক স্কুল আজকের তারিখ থেকে গ্রীষ্মের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। সেই পুরনো স্মৃতি আমার মনে পড়ছে।"

হাইড। "তাই না কি? আপনার স্মৃতিশক্তির তারিফ না করে পারা যায় না।" হাইডের কথার সঙ্গে একটু বিরক্তি ও বিদ্রূপের সুর মেশানো ছিল।

সার্ রবার্টের মতন একজন বিচক্ষণ বিচারক যে আদালতে বসে এ রকম অবিবেচকের মতন আচরণ করতে পারেন—সামনের কাঠগড়ায় আসামীকে দাঁড় করিয়ে রেখে—তা কল্পনাই করা যায় না। তাঁর মতন একজন অসাধারণ পণ্ডিতের চরিত্রে এই বালসুলভ চাপল্য মোটেই খাপ খেত না। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত স্কলার ও ভাইনেরিয়ান প্রফেসর ছিলেন। খামখেয়ালী হলেও, সমস্ত ছোটখাট কাজ এত নিখুঁতভাবে তিনি করতেন, যার সঙ্গে কোন তুলনা হয় না। সামান্য কিছু একটা লিখতে হলে তিনি প্রত্যেকটি কথার অর্থ যাচাই করে ব্যবহার করতেন। একই অর্থবোধক বিভিন্ন শব্দ লিখে নিয়ে, জনসন ও অন্যান্যদের অভিধান দেখে বিচার করে, তার মধ্যে একটিমাত্র শব্দ তিনি নির্বাচন করতেন। এটা তাঁর একরকমের বাতিক ছিল—যে-কোন ভাব-প্রকাশের জন্য সঠিক শব্দ প্রয়োগের বাতিক। তাঁর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু এইজন্য সার্ রবার্টের কথা উঠলে তাঁকে পাণ্ডিত্যের দিক দিয়ে অভিধানের সঙ্গে তুলনা করে বলতেন, অভিধান বটে, কিন্তু পাতাগুলি এলোমেলো করে সাজানো এবং অক্ষরবিন্যাসেও গণ্ডগোল। অর্থাৎ এমন অভিধান যার অবিন্যস্ত পৃষ্ঠা ও অক্ষরের ভিতর দিয়ে কোন শব্দের বা তার অর্থের হদিশ পাওয়া কঠিন। সার্ রবার্ট চেম্বার্স সম্বন্ধে সত্যিই এ কথা বলা চলে। চরিত্রের দৃঢ়তা ও চিন্তার সংযমের অভাবে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য সমুদ্রের মতন গভীর না মনে হয়ে, গহন অরণ্যের মতন পথশূন্য মনে হত।

জাস্টিস হাইড

সার্ রবার্টের চরিত্রের এত দোষত্রুটি সত্ত্বেও জাস্টিস হাইড তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর প্রতি গভীর অনুরাগও ছিল হাইডের, যা অবশ্য সকলের ছিল না। চেম্বার্সের মতন হাইডের চরিত্রেও অনেক অসঙ্গতি ছিল। হাইড ছিলেন উদারপ্রকৃতির হৃদয়বান্ ব্যক্তি, কিন্তু এমন কতকগুলি চারিত্রিক দুর্বলতা তাঁরও ছিল যার জন্য তিনি অনেকবার বিপদে পড়েছেন। অত্যন্ত

বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ হওয়া সত্ত্বেও মধ্যে মধ্যে ঝোঁকের মাথায় এমন সব কাজ তিনি করে বসতেন যার মধ্যে কোন বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যেত না। তাঁর গৃহের দ্বার সর্বদাই সকলের পানভোজনের জন্য উন্মুক্ত থাকত। পানের জন্য নানারকমের দামী মদ, এবং ভোজনের জন্য উপাদেয় সব খাদ্যদ্রব্যও মজুত থাকত তাঁর ঘরে। স্বভাবতঃই তার আকর্ষণে অতিথি ও বন্ধুবান্ধবদেরও ভিড় হত খুব তাঁর বাড়িতে। বিনা পয়সায় সুরাপানের সুযোগ এবং তার সঙ্গে বিবিধ চর্বচোষ্য আহারের সুবিধা, কে না গ্রহণ করতে চাইবে বলুন? সপ্তাহে দু-তিনদিন করে এমন সব লোক আসতেন, যাঁদের ভাগ্যে বছরে একটি ডিনারের নিমন্ত্রণও জোটার কথা নয়। হাইডের উদার আতিথেয়তার অপব্যবহার করতেন এইভাবে সকলে। কত লোককে যে তিনি মাসিক ভাতা দিতেন তার হিসেব নেই। প্রতি মাসে ১০০৲ টাকা থেকে ২৲ টাকা, ৩৲ টাকা পর্যন্ত মাসহারা পায়, এ রকম অভাবগ্রস্ত লোকের সংখ্যা যে তাঁর তালিকায় কত হয়েছিল তা বলা যায় না। যে যে-রকম লোক তার সে-রকম মাসহারার ব্যবস্থা ছিল। এইজন্য বছরে ৮০০০ পাউণ্ড স্টার্লিং তাঁর বেতন বা আয় হওয়া সত্ত্বেও, তিনি টাকায় কুলোতে পারতেন না। টাকার টানাটানি তাঁর সর্বদাই লেগে থাকত। দশ বছর ভারতবর্ষে বাস ও চাকরি করার পর তিনি দেখলেন যে দেনায় তিনি ডুবে গিয়েছেন। এত দেনা তাঁর হয়েছিল যে তা শোধ করার জন্য বিলেতের পৈতৃক সম্পত্তি বেচে তাঁকে প্রায় ১২,৫০০ পাউণ্ড স্টার্লিং, অর্থাৎ প্রায় একলক্ষ সিক্কা টাকা নিয়ে আসতে হয়। এইরকম তাঁর দয়াদাক্ষিণ্যের বহর ছিল। বাস্তবিকই জাস্টিস হাইডের মতন হৃদয়বান্ ব্যক্তি তখনকার কালের কলকাতা শহরে খুবই দুর্লভ ছিল।

এবারে তাঁর উদারতার ও হঠকারিতার কয়েকটি কাহিনী উল্লেখ করব। টমাস মট (Thomas Motte) নামে একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী ছিলেন। শোনা যায়, সারা এশিয়ার মধ্যে, তাঁর মতন বড় ব্যবসায়ী দু-চারজন ছিলেন কিনা সন্দেহ। একবার একটি বড় কারবারে অনেক টাকা নিয়োগ করে তাঁর লোকসান হয়ে যায়। টাকার দায়ে এবং জেল খাটার ভয়ে তিনি ব্রিটিশ এলাকা ছেড়ে ফ্রেডারিক নগরে (শ্রীরামপুর) ড্যানিশদের অধীনে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। আর্থিক দুরবস্থাও তাঁর এমন চরমে পৌঁছয় যে বন্ধুবান্ধবদের সাহায্য ছাড়া তাঁর পক্ষে বাঁচাই মুশকিল হয়ে ওঠে। একজন ধনিক ব্যবসায়ীর হঠাৎ এই ভাগ্যবিপর্যয়ে পরিচিত সকলেই তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠেন। তাঁরা প্রস্তাব করেন যে কয়েকজন বন্ধু মিলে চাঁদা তুলে মটকে মাসিক অর্থ-সাহায্য করা হোক। প্রস্তাবকারীদের মধ্যে জাস্টিস হাইডও একজন ছিলেন। তাঁরই ইচ্ছায়, মটের শ্যালক পিটার টুচেট প্রস্তাবটি কাজে পরিণত করার ভার নেন। তিনি ঠিক করেন যে মাসিক ৬০০৲ টাকা হলেই চলবে এবং তার জন্য ছজন বন্ধুর কাছ থেকে ১০০৲ টাকা করে তিনি চাইবেন। প্রথমে নিজের নামের পাশে ১০০৲ টাকা তিনি লিখে রাখেন। দ্বিতীয় বন্ধু জন হলডেনও তাই করেন। তারপর চাঁদার খাতা যখন হাইডসাহেবের কাছে যায়, তিনি তাঁর নামের পাশে ২০০৲ টাকা লিখে দেন। চতুর্থ ব্যক্তি পিটার স্পীকের কাছে যখন চাঁদার জন্য যাওয়া হয় তখন তিনি হাইডের টাকার অঙ্ক দেখে তার পাশে লিখে মন্তব্য করেন: "ছজন বন্ধু যখন সমান-ভাবে সাহায্য করবেন ঠিক হয়েছে, তখন হাইডসাহেবের বেশী টাকা দেওয়া অর্থহীন।" ব্যাপার হল, পিটার স্পীকেরও তখন দানধ্যানে খ্যাতি ছিল যথেষ্ট। হাইড তাঁর উপর টেক্কা দিয়ে যাবেন, এ বোধ হয় তাঁর সহ্য হল না। যাই হোক, মন্তব্যসহ যখন চাঁদার খাতা পুনর্বার হাইডসাহেবের কাছে নিয়ে যাওয়া হল, তখন তিনি তা দেখে রীতিমত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। যার উপর তিনি ক্রুদ্ধ হতেন, তাকেই 'গর্দভ' বলা তাঁর অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্পীকের মন্তব্য দেখেও তাই বললেন তিনি। তারপর যে-ব্যক্তি খাতা নিয়ে এসেছিল তাকে বললেন, "আপনি ফিরে গিয়ে মিঃ স্পীককে বলবেন যে অন্যের টাকার ব্যাপার নিয়ে অকারণে তাঁর মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। আমার টাকা যে-ভাবে

খুশি খরচ করার স্বাধীনতা আমার আছে, তাতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার স্পীক পেলেন কোথা থেকে? তাঁর টাকা তিনি গঙ্গায় ফেলে দিন বা যাই করুন, আমি যেমন তা নিয়ে মাথা ঘামাই নি, তেমনি তিনিও আমার টাকা সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা করবেন না। আমি যাকে ইচ্ছা যত টাকাই দিই না কেন, তাতে তাঁর কিছু আসে যায় না।" এই কথা বলে হাইডসাহেব চাঁদার খাতাটা খুলে তাঁর নামের পাশে ২০০৲ টাকার অঙ্কটি কেটে ৩০০৲ টাকা লিখে দিলেন। সেই মাসিক ৩০০৲ টাকা করেই সারাজীবন তিনি টমাস মটকে সাহায্য করেছেন।

হাইডের অনেক সদ্‌গুণ থাকা সত্ত্বেও, এই আত্মাভিমান, জিদ ও একগুঁয়েমির জন্য তিনি মধ্যে মধ্যে খুবই বিসদৃশ অবস্থার মধ্যে পড়েছেন। এমনিতে লোকজনের প্রতি তিনি যথেষ্ট ভদ্র ব্যবহার করতেন, কিন্তু তাঁর বিচারকের কাজকর্মের ব্যাপারে যদি কেউ কখনও তাঁর কাছে আসতেন, তা হলে আত্মীয়-বন্ধুনির্বিশেষে তিনি তাঁর প্রতি অত্যন্ত 'ফর্মাল' ব্যবহার করতেন, এমন কি রীতিমত রূঢ় হতেও কুণ্ঠিত হতেন না। একবার তাঁর একজন বিশেষ পরিচিত কমাণ্ডার 'এফিডেভিট' করার জন্য তাঁর কাছে আসেন। হাইড যখন তাঁর আবেদনপত্র পড়ছিলেন তখন কমাণ্ডার ভদ্রলোক তাঁর সামনের একটি চেয়ারে বেশ আরামে বসে পড়েন। হাইডের সঙ্গে সত্যিই তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। কিন্তু তিনি চেয়ারে বসা মাত্রই হাইড তাঁর দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললেন, "উঠে দাঁড়ান! কে আপনাকে বসতে বলেছে?" কমাণ্ডার তাঁর দরখাস্ততে নাম লিখেছিলেন 'জে. প্রাইস' (J. Price)। হাইড বিরক্ত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, "J—টা কি? জেকব, জেমস, জেরিমিয়া, জন, না আর কিছু? নামটা যে এইভাবে লিখেছেন, লোকে কি আপনার নাম নিয়ে গবেষণা করবে?"

কমাণ্ডার ভদ্রলোক হঠাৎ হাইডের এই বিস্ফোরণে ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, "আমার নাম স্যর্—জন প্রাইস, তবে বরাবরই আমি এইভাবে আমার নাম লিখে থাকি।"

হাইড আরও বিরক্ত হয়ে উত্তর দিলেন, "তা যদি লিখে থাকেন তা হলে নিরেট বোকার মতন কাজ করেছেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই বদভ্যাসটি ছাড়ুন।"

কথাবার্তার সময় তিনি নিজেই একটি দলিলের নীচে 'জে. হাইড' বলে নাম সই করে দেন। তাই দেখে কমাণ্ডার ভদ্রলোক বলেন, "আপনিও তো স্যর্ জে. হাইড লিখলেন। লোকে কি করে জানবে আপনার পুরো নাম কি?"

এই কথা শোনা মাত্রই হাইড ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে কমাণ্ডারকে তৎক্ষণাৎ তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন। যাবার সময় তাঁকে ডেকে শুনিয়ে দিলেন, "মনে রাখবেন, আপনি একজন জাহাজের ক্যাপ্টেন, সমাজের লোকের কাছে সুপ্রিমকোর্টের বিচারকের সঙ্গে আপনার নামের ও তাঁর মর্যাদার পার্থক্য কি, তা আপনার জানা উচিত।"

কোন লোককে লাল রঙের কোট পরতে দেখলে (সেনাবিভাগের লোক ছাড়া) হাইড তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতেন। কোন অ্যাটর্নির এক পর্তুগীজ ক্লার্ক আদালতে তাঁর কাছে একটা সাধারণ কাজের জন্য এসেছিল। হাইডের সামনে দাঁড়িয়ে, তিনি কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই, সে 'যে-আজ্ঞে হুজুর' বলতে লাগল। দাঁতে দাঁত চেপে, তার দিকে চেয়ে হাইড বিড়বিড় করে বললেন, "যে-আজ্ঞে হুজুর—গর্দভ কোথাকার!" পর্তুগীজ ক্লার্কটি হাইডের গজরানির উত্তরে আবার বলল, "যে-আজ্ঞে হুজুর!"

"এবারে বলুন তো যে-আজ্ঞে হুজুর, আপনার কি কাজ?" হাইড জিজ্ঞাসা করলেন।

"যে-আজ্ঞে হুজুর"—ক্লার্কটি উত্তর দিল।

"আপনি কি কেবল যে-আজ্ঞে হুজুর বলতেই এসেছেন, এটাই কি আপনার কাজ?" হাইড আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

"যে-আজ্ঞে হুজুর"—পর্তুগীজ ক্লার্কটি আবার জবাব দিল।

এফিডেভিটের কাগজখানা রেগে তার মুখের উপর

ছুঁড়ে মেরে আরদালিকে ডাক দিয়ে হাইড সাহেব বললেন, "ওই যে-আজ্ঞে হুজুর গর্দভটাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে কোর্টের বাইরে বার করে দিয়ে এস।"

কলকাতা শহরে যখন পুলিস ছিল না তখন একজন বিচারক নিয়মিত চেম্বারে বসতেন, শহরের দৈনন্দিন অভিযোগ, বিবাদ-বিসংবাদ ইত্যাদি নিষ্পত্তির জন্য। চেম্বার ছিল লালবাজারের কাছে। একবার দুজন হিন্দু ভদ্রলোক সামান্য একখণ্ড জমির মালিকানা নিয়ে বিবাদ করে হাইডের চেম্বারে নিষ্পত্তির জন্য আসেন। হাইড দুজনের অভিযোগ শুনে সালিসির দ্বারা ব্যাপারটা মিটমাট করে নিতে বলেন। প্রস্তাবে একজন রাজী হলেন, অন্যজন হলেন না। হাইড বারবার তাঁকে অনুরোধ করলেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি তা শুনলেন না। তিনি হাইডকেই বিচার করে দিতে বললেন। কিন্তু হাইডও নাছোড়বান্দা, এবং তাঁর জিদ হল, যেহেতু তিনি নিজে প্রস্তাব করেছেন, সেই হেতু তা মানতেই হবে। হিন্দু ভদ্রলোকটিও কম জেদী ছিলেন না। তিনি সাফ বলে দিলেন, "সালিসি আমি মানব না, বিচার আপনাকেই করতে হবে।" হাইড বললেন, "কি করতে হবে না-হবে তা আমি বুঝব, আপনাকে উপদেশ দিতে হবে না। পাঁচ মিনিট আপনাকে ভাববার সময় দিলাম—ভেবে বলুন সালিসি মানবেন কিনা!" হিন্দু ভদ্রলোকটি একই ভাষায় উত্তর দিলেন, "এক মিনিটও ভাববার প্রয়োজন নেই, আপনাকে আমি পরিষ্কার বলে দিয়েছি যে সালিসি আমি মানব না।"

"বেশ, ভাল কথা, আপনার একগুঁয়েমিকে কি করে শায়েস্তা করতে হয় তা আমি জানি।" এই কথা বলে হাইডসাহেব একজন ক্লার্ককে ডেকে সেই হিন্দু ভদ্রলোকটিকে জেলখানায় নিয়ে গিয়ে আটকে রাখতে বললেন।

এই হুকুম দিয়ে যখন তিনি শমন লিখতে আরম্ভ করলেন, তখন সেই হিন্দু ভদ্রলোকের কোন একটি ভৃত্য দৌড়ে গিয়ে তাঁর অ্যাটর্নিকে খবর দিল। অ্যাটর্নি কাছেই থাকতেন, খবর পেয়ে তিনি ছুটে এলেন হাইডের চেম্বারে। অ্যাটর্নিকে দেখে হাইডের মেজাজ আরও খারাপ হয়ে গেল। পারতপক্ষে কাজের সময় তিনি কৌতূহলী লোকের উপস্থিতি সহ্য করতে পারতেন না। অ্যাটর্নিদের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা ছিল সবচেয়ে বেশী। সুতরাং তাঁকে দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কি চান আপনি? হঠাৎ কি কারণে সন্ধ্যার সময় এখানে আপনার আসার প্রয়োজন হল?"

অ্যাটর্নি বললেন, "হুজুর, আমার নিজের ইচ্ছাতেই আমি এখানে এসেছি, সেজন্য মাফ করবেন। আমার একজন বিশিষ্ট মক্কেলের ভৃত্যের মুখে খবর পেলাম যে বিনা অপরাধে আপনি তাঁকে জেলখানায় বন্দী করে রাখার হুকুম দিয়েছেন। সে সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে বলে আমি এসেছি।" হাইড বেশ ধমকানির সুরে বললেন, "আপনার ইচ্ছা হল বলেই আপনি সোজা এখানে ওকালতি করতে চলে এলেন, এতটা স্বেচ্ছাধীন আপনি হলেন কি করে? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনি আমার চেম্বার ছেড়ে চলে যান, তা না হলে মুশকিলে পড়বেন।"

অ্যাটর্নি বললেন, "আমার মক্কেল কলকাতা শহরের একজন বিশিষ্ট নাগরিক। অর্থ ও প্রতিপত্তি দুদিক থেকেই তাঁর সমকক্ষ লোক খুব অল্পই আছেন। জাতিতে তিনি হিন্দু, এবং হিন্দুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বর্ণের লোক, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ। জেলখানায় হীন বর্ণের নানা জাতের লোকের সঙ্গে থাকলে তিনি জাতিচ্যুত হবেন, এবং তাঁর সামাজিক মর্যাদাহানি হবে। যত টাকারই হোক, আমি তাঁর জন্য জামিন হতে রাজী আছি। আমার আবেদন, আপনি তাঁকে জামিনে মুক্তি দিন।"

এই কথার উত্তরে হাইড বললেন, "আমি আপনার জামিন বা প্রশংসা কোনটারই ধার ধারি না। আপনার মক্কেলের কত টাকা আছে, বা জাতিতে তিনি কত উচ্চস্তরের লোক, এসব সার্টিফিকেট দেবার জন্য আপনাকে এখানে ডেকে আনা হয় নি। অতএব আপনি আপনার নিজের কাজে যান, এখানে ঝামেলা করবেন না।"

অ্যাটর্নি সাহেব বেশ একটু মেজাজ দেখিয়ে বললেন, "আমার মক্কেলের অ্যাটর্নি হিসেবে আমাকে যা করতে হবে তা আপনাকে জানাচ্ছি। বাধ্য হয়ে আমাকে অন্য

বিচারকের কাছে হেবিয়াস কর্পাসের আবেদন করতে হবে।”

অ্যাটর্নির এই উদ্ধত উক্তিতে হাইড ক্ষিপ্ত হয়ে গর্জন করে উঠলেন : “এতবড় স্পর্ধা আপনার যে আইনের হুমকি দিয়ে আমাকে কাজ করাতে চান? আপনি এখনই এখান থেকে বেরিয়ে যান, তা না হলে আপনার সম্ভ্রান্ত হিন্দু মক্কেলের মতন আপনারও অবস্থা হবে, এবং কেবল মক্কেলের জন্য নয়, আপনার নিজের জন্যও হেবিয়াস কর্পাসের আবেদন করতে হবে।”

এই কথা শোনার পর অ্যাটর্নি হাইডের চেম্বার থেকে বিদায় নিলেন। হাইডও বুঝতে পারলেন যে কাজটা তাঁর আদৌ আইনসঙ্গত হচ্ছে না। সুতরাং অ্যাটর্নির প্রস্থানের পর তিনি তাড়াতাড়ি একজন হরকরা পাঠিয়ে দিলেন জেলখানায়, হিন্দু ভদ্রলোকটির মুক্তির আদেশ দিয়ে।

আর একটি ছোট্ট ঘটনার কথা আমি জানি প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে। ঘটনাটি এই : একদিন সন্ধ্যাবেলা বিশেষ কাজের জন্য হাইডের চেম্বারে বসে ছিলাম, এমন সময় হ্যামিল্টন নামে একজন অ্যাটর্নি, হাগিন্স নামে তাঁর একজন মক্কেলকে নিয়ে হাইডের কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁর মৃত পিতৃব্যের বিপুল সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক হয়েছেন, এবং তা যথারীতি দখল করে দেখাশুনা করার জন্য কোর্টের অনুমতিপত্র নিতে এসেছেন। হ্যামিল্টনের মক্কেল হাগিন্স মোটেই প্রকৃতিস্থ ছিলেন না। অত্যধিক মদ্যপান করার ফলে তাঁর অর্ধেক চেতনা প্রায় লোপ পেয়ে গিয়েছিল। বিষয়টি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বলে জাস্টিস হাইড চার্টার ও পার্লামেণ্ট অ্যাক্ট পাঠ করে দেখছিলেন, বিষয়টি তাঁর কোর্টের এক্তিয়ারভুক্ত কি না। হাইড যখন বইপত্র ঘেঁটে দেখছিলেন তখন হ্যামিল্টনের মাতাল মক্কেল টলতে টলতে তাঁর সামনে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “আপনি এইসব বড় বড় অপাঠ্য আইনের বই ঘাঁটবেন, আর আমি কি আপনার সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকব?”

ভদ্রলোক যে মাতাল তা হাইড এতক্ষণ বুঝতে পারেন নি। কথাগুলি শুনে তাঁর খেয়াল হল, তিনি তাকিয়ে দেখলেন যে মক্কেলের অবস্থা একেবারে কাহিল। সুতরাং তিনি অ্যাটর্নিকে বললেন, “আপনার মক্কেল তো দেখছি একটি আস্ত জানোয়ার, ওকে এখনই কোর্ট থেকে বার করে নিয়ে যান।” অ্যাটর্নি অনেক কষ্টে তাই করলেন, টানতে টানতে মক্কেলকে আদালতের বাইরে নিয়ে গেলেন।

কয়েকদিন পরে আবার একদিন অ্যাটর্নি ও মক্কেল দুজনেই এলেন। সেদিন অবশ্য মক্কেল প্রকৃতিস্থ ছিলেন। হাইড সাহেব তাঁকে অনুমতিপত্রটি দিয়ে বললেন, “আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে, আপনি এই বিপুল সম্পত্তি তদারক করতে পারবেন কি না। তা ছাড়া, আপনার যা মতিগতি দেখছি, এবং যে মাত্রায় আপনি মদ্যপান করেন, তাতে ভরসা হয় না যে আপনি আপনার কাকার নাবালক ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা করবেন।”

হাইডের চরিত্রের এই মানবিক মাধুর্যই সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল। অনেক সময় আইনের দিক দিয়ে তিনি অপরাধীদের যোগ্য শাস্তি দিতে পারতেন না বলে, এবং বহু অপরাধের সুবিচার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না বলে, তিনি দুঃখ প্রকাশ করতেন। বলতেন, “যদি বিচারকের আইন-প্রণয়নেরও ক্ষমতা থাকত, তা হলে বহু অন্যায়ের ন্যায্য প্রতিকার আমি করতে পারতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার সে ক্ষমতা নেই, তাই জেনেশুনেও সব সময় সব অন্যায়ের সুবিচার করা আমার দ্বারা সম্ভব হয় না।”

এই ধরনের একটি বিচারের সমস্যার কথা আমি উল্লেখ করব। শেরিফ নামে কলকাতা ট্রেজারির একজন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ক্লার্ক ছিলেন। তিনি একটি অনাথ বালিকার সঙ্গে অবৈধ প্রেম করে শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মতন বসবাস করতেও আরম্ভ করেন। যথাকালে তাঁর কয়েকটি পুত্রকন্যাও হয়। কিন্তু কিছুকাল পরেই দেখা যায়, আর একজন স্ত্রীলোকের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছেন, এবং বিবাহ না করলে স্ত্রীলোকটি তাঁর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ স্থাপন করতে রাজী নয় বলে, তিনি

তাঁকে বিবাহ করতেও সম্মত হয়েছেন। কিন্তু তার জন্য তিনি তাঁর পূর্বের স্ত্রী সেই অনাথ মহিলা ও তার ছেলেমেয়েদের ভরণপোষণের ব্যাপারে কিছু করতে একেবারেই ইচ্ছুক ছিলেন না। অসহায় অবস্থায় তাদের পরিত্যাগ করে তিনি নতুন স্ত্রী নিয়ে ঘর করবেন মনস্থ করেন। শুধু তাই নয়, ভদ্রলোক এত নিষ্ঠুর ও বদমায়েশ ছিলেন যে অনাথ স্ত্রীর সামান্য যা গয়নাগাঁটি ও জিনিসপত্তর ছিল, তাও ভয় দেখিয়ে কেড়ে নিয়ে চলে যান। সেই অনাথ মহিলা অবশেষে একেবারে নিরুপায় হয়ে জাস্টিস হাইডের শরণাপন্ন হন। শেরিফের কাছে মাসিক ভাতা ও ক্ষতিপূরণ দাবি করে তিনি হাইডের কাছে আবেদন করেন।

হাইডের মতন একজন মহানুভব বিচারক এ রকম অমানুষিক আচরণের কথা শুনে যে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হবেন, তা স্বাভাবিক। কিন্তু সেই সময়কার আইন এমন ছিল যে তার জোরে শেরিফের মতন একজন নিষ্ঠুর পাষণ্ডকে বিশেষ কিছুই দণ্ড দেওয়া যায় না। তবু সেই অনাথ মহিলার আবেদনে তিনি এতদূর বিচলিত হলেন যে আইনের বলে কিছু করা যায় না জেনেও তিনি ঠিক করলেন যে শেরিফকে আদালতে ডেকে, সকলের সামনে, নির্মম ভাষায় গালাগাল করবেন। মানুষ হয়েও শেরিফ যে কত জঘন্য পশুর মতন আচরণ করেছেন একজন অসহায় মহিলার প্রতি, এ কথা প্রকাশ্য আদালতে বললে, হাইড ভাবলেন, হয়তো তার সুপ্ত মানবতাবোধ জাগতে পারে। কিন্তু তা হল না। তিনি অবশ্য শমন জারি করে শেরিফকে কোর্টে ডেকে পাঠালেন। তারপর প্রকাশ্য আদালতে হাইড ও শেরিফের মধ্যে যে বাক্য-বিনিময় হল তা এই :

হাইড। "শেরিফ সাহেব, আপনি আপনার স্ত্রীর প্রতি যে আচরণ করেছেন, তাতে কি আপনি মনে করেন যে মনুষ্যসমাজে আপনি ভদ্রলোক বলে গণ্য হবার যোগ্য !"

শেরিফ। "আমার ধারণা আমি এমন কিছু করি নি, যাতে সে যোগ্যতা আমার ক্ষুণ্ণ হয়েছে।"

হাইড। "আপনি মানুষ নন, চোর ডাকাত ও জানোয়ারদের চেয়েও অধম। একটি অনাথ বালিকার নারীত্বের অপমান করে আপনি কাপুরুষের মতন আজ অন্য নারীর সঙ্গসুখ উপভোগ করার জন্য উদ্‌গ্রীব। যত সহজে ও নিশ্চিন্তে, এবং নির্বিবেক জীবের মতন, কেবল টাকার জোরে আপনি এই জঘন্য কাজ করছেন, বনের কোন জানোয়ারও তা করতে পারত না। আবার ওই মুখ দিয়ে উচ্চারণ করছেন যে সমাজে আপনি ভদ্রলোক বলে গণ্য হবার যোগ্য।"

শেরিফ। "মানুষ হিসেবে, এবং নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমার কি করা উচিত বা অনুচিত, আশা করি তার একমাত্র বিচারক আমি। আমার এই ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারও আছে বলে আমি মনে করি না।"

হাইড। "তা অবশ্য নেই, ঠিক কথা। তবে একথাও ঠিক যে সভ্য মানবসমাজে বাস করে আপনি যা ইচ্ছে তাই করতে পারবেন না। তবে বর্তমানে আইনের অবস্থা এমন যে তার জোরে আমারও ক্ষমতা নেই আপনার অন্যায়ের বিচার করার। কিন্তু আমি অবাক হয়ে যাই ভেবে যে কোন্ গুণের জন্য, বা কিসের জোরে, আপনি নিজেকে ভদ্রলোক বলে জাহির করছেন ? আপনি পায়ে জুতো পরে এসেছেন সেজন্য ? আশ্চর্য ! এই দেশে দেখতে পাই, জুতো পরলেই মানুষ 'ভদ্রলোক' হয়ে যায়। আর কি ? নিশ্চয় আপনার বিলক্ষণ টাকার জোরও আছে ? তাই নয় কি ?"

শেরিফ। "নিশ্চয়ই, টাকার জোর তো আছেই।"

হাইড। "কত টাকা আছে আপনার ?"

শেরিফ। "গুণে দেখি নি, তবে দু লক্ষেরও বেশী।"

হাইড। "তা হলে, হে দু লক্ষ্য টাকার ভদ্রলোক ! আপনাকে সবিনয়ে প্রশ্ন করতে পারি কি—এক লক্ষ টাকায় ভদ্রলোক হওয়া যায় না ? অর্ধেক টাকা আপনি যদি আপনার অসহায় পরিত্যক্তা স্ত্রীকে দিয়ে দেন, তা হলে কি সমাজের ভদ্রলোকের স্তর থেকে আপনার পতন হবে।"

শেরিফ। "আপনার এ কথার জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করি না।"

হাইড দুঃখে ও ক্ষোভে প্রায় মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলেন, এবং সম্বিৎহারার মতন চিৎকার করে উঠলেন শেরিফের দিকে চেয়ে। বললেন, "পাষণ্ড জানোয়ার কোথাকার, বেরিয়ে যাও কোর্ট থেকে, বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও বলছি।"

[ক্রমশ]

লোকে যা বলে বলুক, ভুল বুঝুক সুরজিৎকে, ভাবুক তাকে দাম্ভিক, তবু সে কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না নাটক করার নামে এই প্রহসনকে। সুরজিৎ নাট্যকার—নাম-না-জানা নাট্যকার। ছেলেবেলা থেকে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে তার মন প্রতিবাদ করেছে, প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে নিষ্ফল মাথা কুটে সে ক্ষান্ত হয় নি। তাই একা রক্ত ঝরাতে না পেরে যৌবনের সবটুকু শক্তি দিয়ে লিখে গেছে এ রক্তলেখা—এক একটা নাটক।

অথচ এসব নাটকের কোন দাম নেই সুরজিৎ তা ভাল করেই জানে। কাঁচা হাতের লেখা তৃতীয় শ্রেণীর সস্তা রোমান্সভরা গল্প-উপন্যাসেরও দাম আছে পত্রিকার দপ্তরে, কারণ এ দেশের পাঠকরা নাকি তাই পড়তে চায়। পড়তে না চাইলেও যা সম্পাদকরা সাগ্রহে চেয়ে নিয়ে দেরাজে ভরে রাখেন তা হল কবিতা, প্রয়োজনমত বিনামূল্যের পাদপূরণ হিসাবে ব্যবহার করার জন্যে। কিন্তু যা দেখলেই কাগজের সম্পাদক থেকে মুদ্রাকর পর্যন্ত 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই' বলে চিৎকার করে ওঠেন তা হল নাটক।

এই দুর্ভাগা দেশের হতভাগ্য নাট্যকার সুরজিৎ সেনগুপ্ত। কবিতা সে লিখতে পারে না, গল্প তার মাথায় আসে না। যা তার হাত দিয়ে বেরোয় তা হল নাটক, স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ তার গতি, কোথাও কৃত্রিমতার লেশ নেই। অন্ধকারের মধ্যে ফুল দেখা না গেলেও তার গন্ধ চাপা থাকে না, ছড়িয়ে পড়ে। ছাপার অক্ষরে না বেরলেও সুরজিতের নাটকের খ্যাতি ক্রমে প্রকাশ পেল বন্ধুবান্ধব মহলে। অভিনীত হল বিভিন্ন ক্লাবে, এমন কি নামজাদা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও। গেঁয়ো যোগী হয়েও সুরজিৎ ভিক্ষা পেল। অর্থাৎ তার অফিসের সহকর্মীরা স্থির করল এবারের প্রীতিসম্মেলনে তারা সুরজিতের নাটক মঞ্চস্থ করবে। অফিসে নাট্যকার হিসেবে স্বীকৃতি পেল সুরজিৎ।

প্রথম প্রথম সকলেরই ভাল লাগছিল এই নতুন ধরনের নাটক রিহার্সাল দিতে। এতদিন 'বঙ্গেবর্গী' আর 'শাজাহান' করে এ এক রকম মুখ বদলানো আর কি। অফিস ছুটি হবার পর ঘণ্টা দু-তিন রিহার্সাল চলে তিনতলার কোণের ঘরে। অপর্যাপ্ত চা, পান, সিগারেট, সেই সঙ্গে জলখাবার হিসাবে কচুরী-সিঙাড়ার ব্যবস্থা। রিহার্সালের সময় মেয়েদের পার্ট প্রক্সী দিয়ে চালাতে হয়, কারণ পেশাদার অভিনেত্রীরা দুটোর বেশী রিহার্সাল দিতে নারাজ। এঁদের মধ্যে যাঁরা আবার একটু নামকরা তাঁরা রিহার্সালে আসেন না বললেই হয়—যেমন এ নাটকের নায়িকা মন্দিরা গুহ।

কিন্তু এ ভাল লাগা বেশীদিন টিকল না। সুরজিতের নাট্যপরিচালনার রীতিতে মাস্টারি গন্ধ যেন বড় উগ্র বলে মনে হল সকলের কাছে। পার্ট সকলকে মুখস্থ করতে হবে, প্রত্যেকদিন সময়মত রিহার্সালে আসা চাই, আগের দিন যা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, রিহার্সালের সময়

তার ব্যতিক্রম হলে সুরজিৎ চেঁচিয়ে ওঠে—এ সবই যেন একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। থিয়েটারের ব্যাপারে সুরজিৎ এতখানি কড়া মেজাজের লোক তা আগে জানলে এ নাটক মঞ্চস্থ করতে এরা চাইত না। সারা বছর খেটে খানিকটা রঙ্গরস করার জন্যে এখানে অভিনয় করা। তা যদি ইস্কুলের পড়া তৈরি করার মত শক্ত কাজ হয়ে দাঁড়ায়, তা হলে আর কার ভাল লাগে।

সুরজিৎ কিন্তু কারুর কথা শোনবার লোক নয়। হেলাফেলা করে সে তার নাটক নামাতে দেবে না। তার কথার মাত্রাই হল, হয় আমি যেরকম বলছি সেইরকম করে খেটে নাটক নামাও, না হয় বন্ধ করে দাও।

এতদূর এগিয়ে বন্ধ করা সম্ভব নয় বলেই সকলকে মুখ বুজে সুরজিতের কথা শুনতে হয়। এমন কি মেয়েদেরও সুরজিৎ ছেড়ে কথা বলে না। পর পর দুদিন রিহার্সালে আসব বলে না এসে তৃতীয় দিন এতটুকু অপ্রতিভ না হয়ে হাসতে হাসতে মন্দিরা গুহ অফিস-ক্লাবের সেক্রেটারির সঙ্গে ঘরে ঢুকতেই সুরজিৎ বিরক্ত হয়ে বলে, এ ভাবে নাটক করা যায় না। বন্ধ করে দাও।

সেক্রেটারি কাছে এসে নীচু গলায় বুঝিয়ে বলে, উনি তো এসে গেছেন, তবে আর মিছিমিছি চেঁচাচ্ছিস কেন?

কি পেয়েছ তোমরা, এ কি ছেলেখেলা যে উনি একদিন রিহার্সাল করে স্টেজে নামবেন?

সুরজিৎ বেশ জোরে জোরেই কথা বলছিল যাতে মন্দিরা গুহর কানে কথাগুলো ঠিকমতই পৌঁছয়। আশ্চর্য, এ ধরনের কথাবার্তাতেও মন্দিরা রাগ করল না। সুরজিতের কাছে এগিয়ে গিয়ে হেসে বলে, ভয় নেই, আপনার নাটক আমি ডোবাব না। পার্টটা বাড়িতে বেশ ভাল করে পড়ে রেখেছি। রিহার্সাল দিয়ে দেখুন না।

সুরজিৎ কোনরকম আগ্রহ প্রকাশ করে না, নীরস গলায় বলে, নিন, আবার রিহার্সাল শুরু করুন, আপনাদের হিরোইন এসে গেছেন।

সেদিন রিহার্সাল চলল অনেকক্ষণ। বিশেষ করে মন্দিরার সব সিনগুলোই করানো হল। আবার কবে হিরোইনকে পাওয়া যাবে কে জানে!

মন্দিরা গুহর চেহারা ভাল নয়। দৈর্ঘ্যের তুলনায় প্রস্থ বেশী। অনেক কষ্টেও কোমরের রেখা খুঁজে পাওয়া যায় না। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ রঙ। চোখ দুটো বড় হলেও নাকটা কেমন যেন বেমানান। ক্যামেরায় এ চেহারা ভল আসে না বলেই সিনেমার দর্শকের কাছে মন্দিরা গুহ সম্পূর্ণ অপরিচিতা। কিন্তু মঞ্চে তার নাম আছে। সামাজিক ঐতিহাসিক যে কোন নাটকে অভিনয় করার মত কণ্ঠস্বরই তার প্রধান সম্পদ। সেইজন্যেই শ্যামবাজারের নামকরা পেশাদারি মঞ্চে সে একজন প্রধান চরিত্রাভিনেত্রী।

আজকের রিহার্সালে তার অভিনয় দেখে সুরজিৎও এ কথা স্বীকার করল মনে মনে। এতদিন ধরে সবাইকে শিখিয়েও যা সে করতে পারে নি, মন্দিরার অভিনয়গুণে নাটক যেন সত্যিই জমে উঠল।

রিহার্সাল শেষ হতেই মন্দিরা কাছে এসে আগের মতই হেসে বলল, কি, অভিনয় পছন্দ হল? যদি না হয় নিঃসঙ্কোচে বলুন। যে টাকা আপনাদের কাছ থেকে নিয়েছি ফেরত দিয়ে চলে যাব।

সুরজিৎ গম্ভীর গলায় বলে, না, অভিনয় আপনি ভাল করেন। আমার চরিত্রটা বুঝতে পেরেছেন।

সুরজিৎ যে এ কথা বলবে তা যেন মন্দিরা জানত। সত্যি কথা বলতে কি, বেশীর ভাগ অ্যামেচার ক্লাবে এত খারাপ অভিনয় হয় যে কাজ করে আনন্দ পাই না। শুধু টাকার জন্যে অভিনয় করি।

তা আমি জানি।

আপনাদের এখানেও রিহার্সালে আসবার ইচ্ছে ছিল না, ভেবেছিলাম একেবারে স্টেজ-রিহার্সাল দিয়ে দেব। তবু কেন এলাম জানেন?

কেন?

আপনার নাটকটা পড়ে—বেশ ভাল লিখেছেন।

সহজে কারুর প্রশংসায় সুরজিৎ কান দেয় না। অভ্যাসমত বাঁ দিকের ভুরুটা তুলে বলল, আশ্চর্য, এ ধরনের

নাটক আপনার ভাল লেগেছে! একে কাটা-কাটা সংলাপ, তার ওপর নিতান্ত মামুলী জীবনের ছবি। অভি-অভিনয়ের কোন সুযোগই নেই—

মন্দিরা থামিয়ে দিয়ে বলে, আমার কিন্তু খুব ভাল লেগেছে। অনেকদিন বাদে এত মন দিয়ে পার্ট করলাম। এ নাটক আর কোথাও হয়েছে?

না।

আমাদের থিয়েটারের মালিককে একবার শোনাবেন? ওঁরা নতুন নাটক খুঁজছেন।

সুরজিৎ হাসে: নাটক খুঁজলেও, এ নাটক নয়।

বলা যায় না। আসুন না আমাদের বোর্ডে, সকালের দিকে—এই নটা নাগাদ। উনি তখন একলা থাকেন। আমি আলাপ করিয়ে দেব।

আপনাকে পাব কোথায়?

সাড়ে আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত রোজ আমি ওখানেই থাকি, বাড়ি আমার খুব কাছেই।

সুরজিৎ কি ভাবে কথাটা নিল তা বুঝতে না পেরে মন্দিরা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেয়: সারাদিনই তো কাজে ব্যস্ত থাকি—স্টুডিও, থিয়েটার-রিহার্সাল, তাই বাড়িতে কেউ ধরতে পারে না। তাই সবাইকে বলা আছে সকালের দিকে বোর্ডে ফোন করতে।

কবে যাব?

কাল—না, কাল থাক্। আমি ওঁকে বলে রাখব, আপনি বরং পরশুদিন আসবেন।

বেশ, তাই যাব।

বুকিং-অফিসে আমার খোঁজ করবেন।

রুবী থিয়েটার।

শ্যামবাজারের আর পাঁচটা থিয়েটারের মতই নামকরা নাট্যশালা। শিশিরকুমারের গৌরবময় যুগ থেকে এ রঙ্গালয় চালু হয়েছে। তখন ছিল অভিনেতা-প্রধান যুগ। সম্মিলিত রজনীতে কত নামজাদা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সুরজিৎ এ মঞ্চে অভিনয় করতে দেখেছে। সে দেখেছে শিশিরকুমারের অননুকরণীয় যোগেশ, দুর্গাদাসের আওরঙ্গজেব, দেখেছে বাণীবিনোদের ভাস্কর পণ্ডিত, প্রভাবতীর উদিপুরী। সুরজিৎ তখন স্কুলের উঁচু ক্লাশের ছাত্র। কিন্তু এ ধরনের বিশেষ রজনীর অভিনয় দেখার লোভ সামলাতে পারত না। তারই মত নাটকপাগল এক বন্ধুর সঙ্গে আসত থিয়েটার দেখতে, কম-দামী টিকিট কাটবার জন্যে চারঘন্টা আগে এসে প্রেক্ষাগৃহে ঢোকার আগে পর্যন্ত রাস্তায় পায়চারি করত।

তখন অবশ্য এ মঞ্চের নাম রুবী থিয়েটার ছিল না। দীর্ঘ ত্রিশ বছরের মধ্যে অন্যূন সাতবার এ থিয়েটারের মালিক বদলেছে। নতুন ব্যবস্থাপনায়, নতুন নামে কাজ শুরু হয়েছে মাত্র দু বছর। কিন্তু সুরজিৎ দেখল বাইরের চেহারার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি। থিয়েটারে ঢোকবার মুখেই পানওয়ালার দোকান এখনও বিরাজমান। তার পাশেই সারি সারি রেস্তোঁরা, আর মনোহারী স্টোর্স। এখনও সেই আগের মত কাঠের হরফে ছাপা দু-রঙা বড় বড় পোস্টার—চল্‌তি নাটকের বিজ্ঞাপন।

বক্স-অফিসের সামনে গিয়ে মন্দিরা গুহের আর খোঁজ করতে হল না সুরজিৎকে। টিকিট-ঘরের ছোট্ট কাঁচের জানলার ভিতর দিয়ে দেখতে পেল মন্দিরা গুহ একটা টুলে বসে খবরের কাগজ পড়ছে। পড়ার দিকে তার কতটা মন ছিল বলা শক্ত। বাইরে পায়ের শব্দ শুনেই সে মুখ তুলে তাকাল। সুরজিৎকে দেখতে পেয়ে খুশী হয়ে হেসে বলল, ভেতরে আসুন।

সুরজিৎ বুকিং-অফিস থেকে সরে যেতেই টিকিটবাবু জিজ্ঞেস করলেন, উনি কে?

রহস্যভরা গলায় মন্দিরা বলল, আমার একজন ফ্যান।

ঘর থেকে বেরিয়ে মন্দিরা দেখল সুরজিৎ লবীতে দাঁড়িয়ে বাইরে টাঙানো নাটকের ছবিগুলো দেখছে। কাছে গিয়ে মন্দিরা বিনা ভূমিকায় জিজ্ঞেস করে, নাটকটা দেখেছেন নাকি?

না।

ভালই করেছেন। সময় পয়সা দুটোই নষ্ট হত। যেমনি বিশ্রী গল্প তেমনি অ্যাক্টিং।

মন্দিরার মুখের দিকে তাকিয়ে সুরজিৎ হাসে : আপনি তো খুব স্পষ্ট কথা বলেন।

ওইটেই আমার বদঅভ্যাস। তাই তো জীবনে কিছু করতে পারলাম না। চলুন ওপরে যাওয়া যাক্। হৃষীকেশবাবুকে আপনার কথা বলে রেখেছি।

চলুন।

দুজনে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে থাকে। লবী থেকে পাক খেয়ে সিঁড়ি উঠেছে ড্রেস সার্কেলে। সেখান থেকে আবার তিনতলায়। ওইখানেই হৃষীবাবুর অফিস।

অফিস-ঘর কিছু বড় নয়। হৃষীবাবুর চেয়ার টেবিল ছাড়া খানপাঁচেক চেয়ার দেয়ালের গায়ে লাগানো রয়েছে। সাধারণ মামুলী অফিস বলতে যা বোঝায় এ তাই। রুবী থিয়েটারের একমাত্র মালিককে সুরজিৎ এই ধরনের অফিসে দেখতে পাবে আশা করে নি। মন্দিরা শুধু স্বচ্ছন্দে ঘরের মধ্যে ঢুকে গিয়ে সুরজিতের পরিচয় দিয়ে বলে, ইনিই সুরজিৎবাবু— যাঁর কথা আপনাকে বলেছিলাম।

হৃষীকেশবাবু সামনের চেয়ার দেখিয়ে বললেন, বসুন।

হৃষীকেশ দত্তর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। গৌর-বর্ণ রঙ, প্রশস্ত কপাল। পাতলা চুলের ভিতর দিয়ে টাক ফুটে বেরয়। সারা চেয়ারজোড়া শরীর, দেখলেই বোঝা যায় এ ননী খাওয়া মাংসের ঢিবি নয়, রীতিমত পালোয়ানী কাঠামো। তবে সব সময় মাথাটা বাঁ দিকে হেলিয়ে রাখেন, মনে হয় ডান কাঁধের শিরে অকারণ টান পড়ায় গলা তার স্বচ্ছন্দগতি হারিয়েছে।

হাতের কাজ শেষ করে, চোখ থেকে চাল্‌শের চশমা সরিয়ে, হৃষীকেশবাবু সুরজিতের দিকে মন দিলেন। ভাল করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, বয়েস তো বেশী নয়।

উত্তর দিল মন্দিরা : কিন্তু এরই মধ্যে পাঁচ-সাতখানা নাটক লিখেছেন—

তাই নাকি! কি থীম? হিস্টোরিকাল, না সোশ্যাল?

সুরজিৎ মৃদু হেসে বলে, আমি সামাজিক নাটকই বেশী লিখি।

আমরাও তাই চাই। আজকাল আর হিস্টোরিকাল নাটক চলে না। যা ড্রেসের খরচা! ওসব নাটক দু-তিনটে নামালে কোম্পানি উঠে যাবে। সামাজিক নাটকই ভাল— ড্রেসের ঝামেলা নেই, সেটও দু-একটা মামুলী হলেই চলে, আর ফার্নিচার আমাদের আছেই, একটু রঙ করে নিলেই ঝকঝক করবে। তা নাটকটার কি নাম দেওয়া হয়েছে?

নূতন যুগের ভোরে।

কি বললেন?—হৃষীকেশবাবু চোখ দুটো বড় বড় করেন।

এবার মন্দিরা নামটা শুনিয়ে দেয় : নূতন যুগের ভোরে।

হ্যাঁ, নামটা ভালই, বেশ চমক আছে। কিন্তু বিষয়-বস্তুটা কী? কোন ইজম্-টিজম্ নেই তো?

সুরজিৎ একটু যেন বিরক্তই হয় : পড়েই দেখুন না।

হৃষীকেশবাবু পান চিবুতে চিবুতে বলেন, পড়ব বইকি, তবে আগে থেকে একটু সাবধান হয়ে নেওয়া ভাল। এখানে মশাই ডজন দরে নাট্যকার আসে, যা-তা ছাই-পাশ লিখে এনে বলবে নাটক লিখেছে। মশাই, ইজম্-টিজম্ নাটকে চলে না, ওসব গড়ের মাঠে ভাল। তবে মন্দিরার যখন ভাল লেগেছে ও-রকম কিছু নয় নিশ্চয়। তা এটা ট্রাজিডি, না কমিডি?

সুরজিৎ ইতস্তত করে বলে, আজকালকার নাটককে কি আর ওভাবে শ্রেণীভাগ করা যায়?

তা নয়, আমি বলছি নাটক দেখবার পর দর্শকরা হাসতে হাসতে বাড়ি যাবে, না কাঁদতে কাঁদতে।

সুরজিৎ হাসি চাপতে পারে না : সে নির্ভর করবে অভিনয়ের উপর। হাসির নাটক দেখতে এসে পয়সা দিয়ে টিকিট কাটার শোকে দর্শককে চোখ মুছতে মুছতে বাড়ি যেতেও তো দেখেছি।

এ ধরনের ঠাট্টায় পাছে হৃষীকেশবাবু বিরক্ত হন তাই মাঝখান থেকে মন্দিরাই কথা বলে, এটা ঠিক মামুলী নাটক নয়, মাঝখানে নায়ক নায়িকার বিচ্ছেদ হলেও শেষের দিকে কিন্তু তাদের মিল হয়ে গেছে। বেশ সেন্টিমেণ্ট আছে। একদিন সুরজিৎবাবুকে পড়তে বলুন না। মনে হয় আপনাদের ভাল লাগবে। এ একেবারে পাবলিক বোর্ডেরই নাটক।

হৃষীকেশবাবু খাদের নীচু পর্দায় কথা বলেন : বেশ তো, সামনের সপ্তাহে একদিন নাটক পড়া যাক। রতীবাবু আমাদের ডিরেক্টার, ওঁকেও শুনতে বলব।

সুরজিৎ জিজ্ঞেস করে, আপনি কি আমায় খবর দেবেন, তা হলে ঠিকানাটা—

তার দরকার নেই। এক কাজ করুন, সামনের শনি-রবিবার একদিন সময় করে এসে আমাদের নাটকটা দেখুন, এ বোর্ডের কে কি রকম আর্টিস্ট তার একটা আন্দাজ পাবেন। যখন আপনার নাটক পড়া হবে, তখন আপনি সাজেস্ট করতে পারেন, কে কোন্ রোল করতে পারবে।

হৃষীকেশবাবুকে নমস্কার করে বেরিয়ে এল সুরজিৎ। নীচে নামতে নামতে মন্দিরাকে বলল, ভদ্রলোক নাটক সম্বন্ধে কিছু বোঝেন বলে তো মনে হল না।

মন্দিরা শুহ সবজান্তার হাসি হাসে : কিন্তু মানুষটা ভাল।

আমার নাটক এরা নেবে না।

বলা যায় না, হয়তো একটু অদল-বদল করে নিতেও পারে।

আমি একটি লাইনও বদলাতে দেব না।

মন্দিরা একদৃষ্টে সুরজিতের দিকে তাকায় : প্রথম থেকেই অত মেজাজ গরম করতে নেই। একটা নাটক পাবলিক বোর্ডে হোক, নামটা হয়ে যাক, তারপর—

সেইদিনকার কথামত রবিবার সন্ধ্যের শোতে রুবী থিয়েটারের স্টেজ-বক্সে বসে সুরজিৎ নাটক দেখছিল। দোতলায় বিশেষ লোক ছিল না। তবে নীচের দামী আসনগুলো প্রায় ভর্তি। ক্রমশঃ পিছনের দিকের সিট ফাঁকা পড়ে রয়েছে। প্রেক্ষাগৃহের চেহারা খুব বেশী বদলায় নি। পনের বছর আগে যা ছিল এখনও প্রায় তাই। নড়বড়ে বসবার সিট, পা রাখার জায়গা নেই বললেই চলে। কিঞ্চিৎ স্থূল শরীরের কোন দর্শক বসলে পাশের লোকের বিলক্ষণ অসুবিধা হয়। সেদিনকার মত আজও মঞ্চ ঘোরে। সুরজিতের মনে হয় কলুর চোখ-বাঁধা বলদের মতই এর ঘোরা। তাই এতদিনে এক পাও বোধ হয় এগুতে পারে নি। সেই মান্ধাতার আমলের সিন। সামঞ্জস্যহীন আসবাবপত্র, তার চেয়েও পুরনো ধরনের অভিনয়। এই মরচে-পড়া নাটক দেখতে কেন যে মানুষ আসে তা সত্যিই ভেবে পাওয়া মুশকিল।

তবে পরিবর্তন যে কিছুই হয় নি তা নয়, এখন আর বিরামের সময় প্রেক্ষাগৃহ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে রূপান্তরিত হয় না। সুরজিতের বেশ স্পষ্ট মনে আছে, ক বছর আগেও নাট্যাচার্য বা নটসূর্যদের অভিনয় দেখতে এসে যখন সে মুগ্ধ হয়ে যেত, ভেসে যেত অভিনীত চরিত্রের সুখদুঃখের ভার নিতে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে, ভুলে যেত নিজের অস্তিত্ব, ঠিক সেই সময় অঙ্কশেষের যবনিকা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফেরিওয়ালাদের চা-গরম আর পান-বিড়ি-সিগারেটের হাঁকে তার মনটা বিরক্ত হয়ে উঠত। এতক্ষণের ভাল-লাগা চকিতের মধ্যে বিলীন হয়ে যেত। আজকাল আর তা হয় না।

আর একটা জিনিসের পরিবর্তন হয়েছে, তা হল যবনিকা। আগেকার দিনে সামনের পর্দায় আঁকা থাকত নানারকমের বিজ্ঞাপন, দাদের মলম আর অর্শের মহৌষধ। সেই দৃষ্টিকটু যবনিকা এখন বিদায় নিয়েছে। তার জায়গায় ঝোলে খুব একটা উঁচু দরের না হলেও এক রঙের পর্দা।

অন্ধকারের মধ্যেই এক সময় সুরজিতের পাশে এসে বসলেন রমেনবাবু, ইনি এই রুবী থিয়েটারের ম্যানেজার। আজকেই সুরজিতের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছে। ভদ্রলোক রোগা কিন্তু শৌখীন চেহারা। পুরু কাঁচের চশমার ভেতর থেকে চোখ দুটো লাল মাছের মত বড় বড় দেখায়। মাথার সাদা-কালো-ডুরে চুল দেখে বয়স চল্লিশের ওপর ধরা গেলেও আঁটসাট শরীর দেখে তা মনে হয় না।

পাশে বসেই নীচুগলায় মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন লাগছে ?

সুরজিতের গোড়া থেকেই এ ভদ্রলোকটিকে ভাল লাগে নি। তার ওপর এই বিরক্তিকর নাটক দেখা।

তাই মনের ভাব গোপন করার চেষ্টা না করেই স্পষ্ট বলল, ভাল না।.

এ ধরনের উত্তর রমেন চৌধুরী আশা করে নি, তবু বলল, গল্পটা একটু পুরনো ধরনের বটে তবে অ্যাক্‌টিং ভালই হচ্ছে—কি বলুন।

সুরজিতের আবার কাঠখোট্টা উত্তর: কিছু একটা ভাল হচ্ছে নিশ্চয়, তা না হলে আর এত লোক আসছে কেন?

কই আর লোক আসছে? দেড়শো নাইট না যেতেই তো হাউসের এই অবস্থা।

সুরজিৎ মুখ বাড়িয়ে নীচেটা দেখে নিয়ে বলে, নীচে তো অনেক লোক রয়েছে।

রমেন চৌধুরী নীরস গলায় বলে, ওসব পাস। দেখছেন না নীচু দামের টিকিটগুলো ফাঁকা পড়ে রয়েছে! সত্যিকারের দর্শক এলে আগে ওই সিটগুলো ভরে যায়।

তবু সুরজিতের বিস্ময় কাটে না: এত লোক সবাই পাসে এসেছে বলছেন?

এ ছাড়া উপায় কি? টিকিট তো বিক্রি হয়েছে মাত্র দুশো টাকার। তারা যদি ফাঁকা হল দেখে যায়, বাইরে গিয়ে কি রকম ব্যাড পাব্লিসিটি করবে বলুন তো। যে রকম করে হোক কিছু লোক ঢোকাতেই হবে—শো-বিজনেসের মোদ্দা কথাই এই।

একটু থেমে নিজে থেকেই আবার বলে, নাটক দেখতে যদি ভাল না লাগে, চলুন, বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাওয়া যাক।

চলুন।

দুজনে বেরিয়ে এসে পাশের সরু বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। থিয়েটারের আঙিনা পেরলেই একটা মাঝারি আকারের বস্তি। তার পেছনে পাকা বাড়ি শুরু হয়েছে। কাছাকাছির মধ্যে খুব উঁচু বাড়ি না থাকায় এই থিয়েটারের বারান্দায় দাঁড়ালে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। একটা সাদা তিনতলা বাড়ির ছাদের ওপর যেখানে লাল কৃষ্ণচূড়ার গাছ এসে পড়েছে তারই পেছন থেকে উঠেছে যেন আকাশ। অনেকটা রুবী থিয়েটারের মঞ্চের জন্যে আঁকা কোন একটা দৃশ্যপটের মতই দেখায়।

দক্ষিণের ঝিরঝিরে মিষ্টি হাওয়া আসছিল। সিগারেটে টান দিয়ে রমেন চৌধুরী আগের কথার জের টেনে বলে, এ নাটকের ধরতাই কিন্তু ভাল ছিল। প্রথম পঁচিশ নাইট রোজই হাউসফুল। তারপর পঞ্চাশ অবধি রোববারের দুটো হাউসই ফুল টেনেছে। কিন্তু সত্তরের পর কেমন যেন মুখ থুবড়ে পড়ল। আর কিছুতেই সেল উঠল না।

সুরজিৎ বিরক্ত স্বরেই বলে, যাই বলুন, নাটকটা কিন্তু বড্ড খারাপ।

সেকথা ছেড়ে দিন। নাটক ভাল কি মন্দ তাতে কী এসে যায়, আসল কথা হল বক্স-অফিস—সেল ভাল হলেই নাটক ভাল, খারাপ হলেই নাটক খারাপ।

তাই বলে নাটকের ভালমন্দ কিছু থাকবে না? তার গল্প, তার অভিনয়—

রমেন চৌধুরী অভিজ্ঞ ম্যানেজারের হাসি হাসেন: বড়বাবুর থিয়েটারে তো সবই ছিল—মানে আমি শিশির-বাবুর কথা বলছি। 'দুঃখীর ইমান' 'পরিচয়', লোকে তেমন নিলে কই, তাই তো 'শ্রীরঙ্গম' উঠে গেল।

সে আমাদের দুর্ভাগ্য।

সুরজিৎ মনে মনে ভাববার চেষ্টা করে, সত্যি কী চমৎকার নাটক, কী প্রাণবন্ত অভিনয়—তবু দেশের লোক নিল না।

রমেন চৌধুরী থামতে চায় না: তখন যে থিয়েটার চলে নি তা তো নয়, তারা ভিড় করে দেখতে গেছে অন্য থিয়েটারে, যেখানে হয়তো চলছে—

সুরজিৎ পাদপূরণ করে দেয়: নাটকের নামে যাত্রা, অভিনয়ের নামে চীৎকার, রোমান্সের নামে বস্তাপচা নোংরামি।

রমেন চৌধুরী এবার হেসে ফেলে: না, আপনি দেখছি একেবারেই অ্যামেচার থিয়েটারের লোক। পেশাদার মঞ্চে এসব চলে না। লোকে যা চায় আমাদের তাই দিতে হবে।

সুরজিৎ রেগেই বলে, তার মানে আপনি বলছেন দর্শক যদি বোম্বাই ছবির মত নক্কারজনক আনন্দরস চায় আমাদের তাই দিতে হবে। নাটকের মাধ্যমে সমাজকে সচেতন করবার কোন চেষ্টাই আমরা করব না?

তা করবেন না কেন, করুন—একশো বার করুন। তবে দর্শক আশা করবেন না—মানে পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে কেউ দেখতে আসবে না। সাধ করে কেউ ওযুধ খায়? বক্তৃতা শুনতে হলে ময়দানে মনুমেন্টের তলায় গেলেই তো হয়।

কি জানি মশায়, আপনাদের সঙ্গে আমার মতে মিলবে না।

রমেন চৌধুরী টেনে টেনে হাসে: ঘাবড়াবার কিছু নেই। কিছুদিন প্রফেসন্যাল বোর্ডে থাকলেই বুঝে ফেলবেন। ক্রাউড্ ড্রস্ ক্রাউড্। যে রকম করে হোক লোক ঢোকাতে হবে। নাথিং লাইক্ সাক্সেস্। এবং সবের মূল কথা হচ্ছে বক্স-অফিস।

সুরজিৎ কৃত্রিম কৃতজ্ঞতার সুরে বলে, আপনার উপদেশের কথা স্মরণ রাখতে চেষ্টা করব।

রমেন চৌধুরী এবার গলাটা নামিয়ে বলে, একটা কথা আপনাকে বলে রাখি, শুনছি আপনার নাটকই এর পর এই বোর্ডে হবে।

সুরজিৎ কৌতূহলী হয়: তাই নাকি! কে বলল আপনাকে?

কর্তাই বলছিলেন। মন্দিরার নাকি খুব পছন্দ হয়েছে আপনার নাটক।

মুখটা সুরজিতের কানের কাছে এনে ফিসফিস করে বলে, আজকাল তো ওই মেয়েটার কথাতে থিয়েটারচলছে। অবশ্য এ কথা কাউকে বলবেন না, আমি আপনার ওয়েল উইশার বলে—বলে গেলাম। তবে যদি আপনার নাটক হয় তা হলে একটি মেয়েকে আপনার চান্স দিতে হবে।

সুরজিৎ সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করে, সে আবার কি?

আগে থেকে বলে রাখলাম। এখন দেখবেন অনেকে এসে আপনাকে ধরাধরি করবে। আমার দাবি কিন্তু সবচেয়ে আগে। সুন্দর দেখতে, গরীবের মেয়ে—এ লাইনে একটা চান্স চাইছে। আপনাকে সাহায্য করতেই হবে।

রমেন চৌধুরী সুরজিতের হাতটা চেপে ধরে। হয়তো উনি আরও কিছু বলতেন, কিন্তু প্রেক্ষাগৃহে আলো জ্বলে ওঠায় থেমে গেলেন। দ্বিতীয় অঙ্কের পর বিরতি। দর্শকরা ঘর থেকে বেরিয়ে নীচের ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাচ্ছে। সেইদিকে তাকিয়ে সুরজিৎ জিজ্ঞেস করে, কতক্ষণের জন্যে ইণ্টারভ্যাল?

সাত মিনিট।

এখন একবার স্টেজের মধ্যে যাওয়া যাবে? তা হলে মন্দিরা দেবীর সঙ্গে দেখা করে নিতাম। শো শেষ হবার পর দেখা করতে গেলে অনেক দেরি হয়ে যাবে।

বেশ তো, চলুন।—রমেন চৌধুরী সুরজিৎকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে যেতে বলে, কিন্তু আমার কথাটা ভুলবেন না, মেয়েটির জন্যে একটি ভাল পার্ট চাই।

সুরজিৎ সত্যিই না হেসে পারে না। এ যে গাছে কাঁটাল, গোঁফে তেলের ব্যবস্থা। আগে নাটকটা তো এঁরা পছন্দ করুন।

দোতলার বারান্দা দিয়ে পূবদিকে খানিকটা এগিয়ে দু ধাপ উঠলেই স্টেজের ভেতরে যাবার এক পাল্লার ছোট দরজা। রমেন চৌধুরীর পিছুপিছু সুরজিৎ এসে দাঁড়ায় দরজা পেরিয়ে রেলিঙ-ঘেরা স্টেজের সরু বারান্দায়। যার ডান দিকে এক সারিতে তিনখানা ছেলেদের সাজঘর। বাঁ দিকে তাকালে দেখা যায় অনেকগুলো দৃশ্যপটের মাথা। আলো ফেলবার সুবিধের জন্যে স্টেজের সামনের দেয়াল ঘেঁষে কাঠের নড়বড়ে তক্তাপাতা যে সেতু কোনরকমে ব্র্যাকেটের ওপর ঝুলছে, তারও খানিকটা অংশ এখান থেকে দেখা যায়। মনে হয় একরাশ ভাঙা পরিত্যক্ত আসবাবের বাধা অগ্রাহ্য করে কৌশলে জায়গা করে নিতে পারলে এই বারান্দা থেকেও দেখতে পাওয়া যায় মঞ্চের অভিনয়—অবশ্য যদি অভিনেতারা সামনের দিকে থাকে।

রমেন চৌধুরী বুঝিয়ে দিয়ে বলে, এই তিনখানা

গ্রীনরুম—ছেলেদের মধ্যে যাঁরা মেন রোল করেন তাঁদের জন্যে।

তিনতলায় ছেলে-ছোকরাদের জন্যে আলাদা সাজঘর আছে, আর মেয়েদের ব্যবস্থা নীচে—স্টেজের পাশে।

রমেন চৌধুরীর বোধ হয় ইচ্ছে ছিল কয়েকজন শিল্পীর সঙ্গে সুরজিতের পরিচয় করিয়ে দেবার, কিন্তু পর্দা সরিয়ে কাউকেই ঘরে দেখতে পেলেন না। নীচে থেকে কাদের যেন চেঁচামেচি আগে থেকেই শোনা যাচ্ছিল। একতলায় নামবার সিঁড়ির কাছে এগুতেই তা যেন আরও প্রকট হয়ে উঠল। এ মঞ্চের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক প্রদীপ মুখার্জি সিঁড়িতে উঠতে উঠতেই চিৎকার করে নীচে দাঁড়িয়ে-থাকা অন্য শিল্পীদের ধমকাচ্ছে: ইয়ারকি করার তোমরা জায়গা পাও নি, সিনের মধ্যে দাঁড়িয়ে হাসাহাসি করছ? ঘুষি মেরে দাঁত ভেঙে দিলে তবে আমার রাগ যায়।

নীচে থেকে কে যেন প্রতিবাদ করে বলে ওঠে, আমাকে বকছেন কেন? আমি যদি হেসে থাকি—সিনিয়ার আর্টিস্টরা হাসিয়ে দিয়েছে বলে, তাঁদের বকুন না।

প্রদীপ মুখার্জী আরও চটে যায়: কোথা থেকে সব এই হতভাগাগুলোকে এনে জুটিয়েছে। স্টেজের ওপর দাঁড়াতে জানে না, তারা সব অ্যাক্টর হয়েছে। আর হবে নাই বা কেন, থিয়েটারের আর কি সেই বনেদী দিন আছে—যে-সে এখন থিয়েটার চালাচ্ছে।

কথাগুলো বিশেষ করে যেন রমেন চৌধুরীকেই শোনানো হল। প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই প্রদীপ মুখার্জী সুরজিৎদের পাশ দিয়ে হনহন করে নিজের সাজঘরে চলে গেল।

চারদিক তাকিয়ে নিয়ে রমেন চৌধুরী সভয়ে বলে, আমি আর এগুচ্ছি না মশাই।

সুরজিৎ চোখ তুলে তাকায়: কেন, কি হল?

নিশ্চয় কোন গোলমাল হয়েছে, এখুনি সবাই এসে আমাকে ধরে সালিশী মানবে। তার চেয়ে বাইরে চলে যাওয়াই ভাল।

তা হলে আমি?

আপনার ভয় কি, সিঁড়ি দিয়ে নীচে চলে যান যাকে বলবেন মন্দিরাকে ডেকে দেবে।

সুরজিতের পিঠে একটা চাপড় মেরে তাকে সিঁড়ির দিকে একটু এগিয়ে দিয়ে রমেন চৌধুরী দ্রুত পায়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে ক ধাপ নামতেই সুরজিৎ দেখে নীচে দাঁড়িয়ে একদল লোক চেঁচামেচি করছে। তার মধ্যে যার গলা সবচেয়ে বেশী শোনা যাচ্ছে, হাত পা ছুঁড়ে নিজের বক্তব্যকে সদম্ভে বোঝাবার চেষ্টা করছে, সে আর কেউ নয়—এ মঞ্চের সুদর্শন নট বাসুদেব মজুমদার। বাসুদেব যুবক, রোমান্টিক হিরোর রোলে সে এরই মধ্যে নাম করেছে। শুধু মঞ্চে নয়, ছবিতেও। তার ন্যাকামী-ভরা প্রেমের জোলো অভিনয় দেখতে লোকে নিশ্চয় চায়, তা না হলে ক্রমশঃ তার চাহিদা বাড়ছে কেন?

বাসুদেব নাক ফুলিয়ে বলছিল, ওসব ফুটুনী করলেই তো চলবে না, কত বড় অ্যাক্টার সব জানা আছে। যত মেজাজ এই রুবী থিয়েটারে—কোন স্টুডিওতে আর ঢুকতে হচ্ছে না।

কৌতুক অভিনেতা রসময় চেঁচিয়ে ওঠে, এ কিন্তু তোর উচিত হচ্ছে না বাসু। প্রদীপদা কতদিনের একটা সিনিয়র আর্টিস্ট, তার নামে এ রকম করে যা-তা বলছিস?

উনিই বা আমাকে পাঁচজনের সামনে ওইরকম ভাবে যাচ্ছেতাই করলেন কেন?

উনি যাই বলুন, তোর খুব অন্যায় হয়েছে। এখুনি গিয়ে ওঁর কাছে মাপ চাওয়া উচিত।

বয়ে গেছে মাপ চাইতে। আমি এখুনি ডেকে পাঠাচ্ছি রমেনবাবুকে, দরকার হলে এ থিয়েটার আমি ছেড়ে দেব। আজই—এখুনি।

রাগে গরগর করতে করতে বাসুদেবও ওপরে উঠে গেল। রসময় ওর চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে থেকে দাঁতে দাঁত ঘষে তেতো গলায় বলে, বেটা রাঙা মুলো, তার মুখে আবার চ্যাটাং চ্যাটাং কথা। প্রদীপদা তো ঠিকই বলেছে—স্টেজে দাঁড়াতে জানে না, সব অ্যাক্টর হয়েছে।

সুরজিৎবাবু, আমি এদিকে।—ভিড়ের ভিতর থেকে মন্দিরা গুহ হাত নেড়ে সুরজিৎকে ডাকে।

সুরজিৎ ভিড় ঠেলে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে: আমি তো ভাবছিলাম এই গণ্ডগোলের মধ্যে কোথায় আপনাকে খুঁজে পাব।

মন্দিরা গুহ হাসে: সব কটা পাগল। চলুন, একটু ফাঁকায় গিয়ে বসা যাক।

সুরজিৎ মন্দিরার পিছুপিছু মঞ্চের পেছন দিকে মাথাঢাকা এক টুকরো ফাঁকা উঠোনে এসে বসে।

সুরজিৎ নিজে থেকেই জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছিল, এত গণ্ডগোল কেন?

বললাম তো, যত সব পাগলের কাণ্ড। দ্বিতীয় অঙ্কের পর্দা পড়ার আগে ক্লাইম্যাক্স সিনে বাসুদেব হেসে ফেলেছে, কে বুঝি তাকে হাসিয়ে দিয়েছে, তাইতে প্রদীপদা খেপে অস্থির। এখন পর্দা উঠলে হয়।

সুরজিৎ চোখ বড় করে বলে, সে কি, দর্শকরা বসে থাকবে যে!

মন্দিরা খিলখিল করে হাসে: এ রকম তো হামেশাই হয়। আর্টিস্টরা বড্ড মুডি। রেগে গেলেই হল।

আপনিও রেগে যান নাকি?

কি মনে হয়?

দেখলে কিন্তু আপনাকে রাগী বলে মনে হয় না।

মন্দিরা ঠোঁট উলটিয়ে হাসে: সবাই তাই ভাবে, কিন্তু রাগ আমার শরীরে আছে। এক এক সময় একেবারে খেপে যাই। কিন্তু তাই বলে এদের মত সিন আটকে রাখি না। তাই তো এদের সঙ্গে আমার মেলে না। আমার সঙ্গে এদের তফাতটা কোথায় জানেন?

সুরজিৎ কোন কথা না বলে চোখ তুলে তাকায়।

মন্দিরা বলে যায়, এদের মধ্যে বেশীর ভাগই থিয়েটার করতে আসে টাকার জন্যে, আবার অনেকের কাছে এটা নিছক শখ। কিন্তু আমি টাকার জন্যে অভিনয় করি না, শখের জন্যেও করি না। থিয়েটার আমি ভালবাসি। অভিনয় আমার রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে রয়েছে।

মন্দিরা কথা শেষ করতে পারল না। হন্তদন্ত হয়ে এসে রসময় জানাল, ব্যাপার শুনেছ? রাঙামুলো রাগ করে মেক্-আপ তুলে ফেলে ঘরে বসেছিল। রমেন চৌধুরী এতক্ষণ ধরে তার মান ভাঙিয়েছে। তাই এখন পনেরো মিনিট দেরিতে পর্দা উঠছে। ঘেন্না ধরে গেল এ লাইনে। দুটো ছবিতে নেমেই এই মেজাজ?

মন্দিরা একটা ভুরু তুলে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, হবে না কেন? সবাই তো আর ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো মন্দিরা গুহ নয় যে মুখ বুজে কাজ করে যাবে! ঠিক হয়েছে, প্রদীপদা এবার বুঝবেন। ওঁর চেয়েও বাসুদেবের খাতির এখন বেশী এ কোম্পানিতে।

রসময়ের মুখ বিরক্তিতে কুঁচকে যায়: তোরাই তো ছোঁড়াটার মাথা খেলি, ব্যাঙাচির ল্যাজ খসতে শুরু করেছে। কদিন বাদে তো কেউ গ্রাহ্য করবে না।

মন্দিরা আবার শব্দ করে হাসে: সে ভয় নেই, ও যে আমার ছেলে।

ও-রকম অনেক মা-ছেলে এ লাইনে দেখলাম, তোমাদেরটাই বাকি আছে। আর আড্ডা মেরো না, রেডি হয়ে নাও—সিন উঠবে।

রসময় চলে যেতে মন্দিরা সুরজিৎকে বলে, ভাবতে আশ্চর্য লাগে, এই লোকটা রাতের পর রাত ভাঁড়ামী করে লোক হাসায়, অথচ নিজের ভেতরটা জিলিপির প্যাঁচে ভরা। ওর অভিনয় আপনার কি রকম লাগে?

ভালই। তবে মাঝে মাঝে একটু যেন বাড়াবাড়ি মনে হয়।

দর্শক তাই চায়। সত্যি সুরজিৎবাবু, ভাল জিনিস আমাদের দেশের দর্শক নিতে পারে না, এক এক সময় বড় খারাপ লাগে।

যদিও কথাগুলো শুনতে সুরজিতের ভাল লাগছিল তবু মনে করিয়ে দেবার জন্যে বলল, আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে না তো।

মন্দিরা গুহ অন্যমনস্ক স্বরে বলে, হ্যাঁ, যাই। আপনাকে বলতে ভুলে গেছি, মঙ্গলবার দিন সন্ধ্যেবেলা আপনার নাটকটা পড়া হবে। সাড়ে ছটার সময় আসবেন, ওপরে ওই হৃষীবাবুর অফিসে।

সুরজিৎ সকৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলে, আপনি আমার জন্যে অনেক কিছু করলেন।

সেটা নিজেরই স্বার্থে, একটা ভাল পার্ট পাবার আশায়। সত্যি, নাটকটা আপনি ভাল লিখেছেন। সেই লাইনটা, যেখানে তনিমা বলছে—"একে একে যখন রাস্তার আলোগুলো নিভে যায়, আমি একলা নির্জন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবি আবার কখন সূর্য উঠবে।"

কথাগুলো বলতে বলতে মন্দিরার চোখে জল ভরে আসে। সুরজিৎ বোঝে তার নাটকের তনিমাকে মন্দিরা সত্যিই ভালবেসেছে, তা না হলে এতখানি প্রাণ দিয়ে সে কথাগুলো উচ্চারণ করতে পারত না।

মন্দিরা উঠে পড়ে : তা হলে মঙ্গলবার দেখা হবে।

নাটক শেষ হয়ে যাবার পর একে একে শিল্পীরা সবাই চলে গেলেও মন্দিরার সাজঘর থেকে বেরতে দেরি হয়। শেষ যবনিকা পড়ার সময় পর্যন্ত তাকে স্টেজে থাকতে হয় প্রদীপ মুখার্জীর সঙ্গে, তাই সাজঘরে গিয়ে আয়নার সামনে বসে ক্রীম দিয়ে মুখের রঙ তুলে আবার বাইরে বেরবার জন্যে মুখে পাউডার ঘষে ভব্য হয়ে বেরতে অন্যদের চেয়ে তার দেরি হয় বইকি। তবে কারুরই তাতে এসে যায় না। কারণ অন্য মেয়েরা থিয়েটারের গাড়ি করে যে যার বাড়ি চলে যায়। মন্দিরা সে গাড়িতে ওঠে না, অভিনয়ের শেষে একটা রিক্‌শা চেপে টুংটুং শব্দ শুনতে শুনতে সে বাড়ি ফেরে। রিক্‌শার ভাড়া অবশ্য থিয়েটার কোম্পানিই দেয়। বেশীর ভাগ রাত্রেই মন্দিরার সঙ্গে একই রিক্‌শায় বাড়ি ফেরে মুকুল নন্দী—স্টেজ ম্যানেজার। তার বাড়ি যদিও আরও একটু ভিতরের দিকে, তবে কোম্পানির দেওয়া ওই একই ভাড়ায় রিক্‌শা তার বাড়ি পর্যন্ত যায় বলে মন্দিরার সঙ্গ সে ছাড়ে না। যেদিন মন্দিরা শোয়ের পর রিহার্সাল দিতে চলে যায় অন্য জায়গায় তখনই হয় মুকুল নন্দীর মুশকিল—বেচারীকে একলা হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরতে হয়।

অন্য দিনের মত আজও মুকুল নন্দী মেয়েদের সাজঘরের ভেতরে ঢুকে জিজ্ঞেস করে, হল তোমার মনো? রিক্‌শা এসে গেছে।

মন্দিরা আয়নায় দেখে দেখে খোঁপায় কাঁটা গুঁজছিল, হেসে বলে, এই যে হয়ে গেছে।

মুকুল নন্দী হাত পাতে : দুটো পান দাও।

মন্দিরা ভ্যানিটি ব্যাগের ভেতর থেকে পান বার করে দেয়।

জর্দা?

ফুরিয়ে গেছে।

মুকুল নন্দী ফিক করে হাসে : আজ বুঝি হবীবাবুর কাছ থেকে চেয়ে আনা হয় নি?

এনেছিলাম, মেয়েগুলো বোধ হয় খেয়ে ফেলেছে। ওদের কাছ থেকে কি কিছু লুকিয়ে রাখার উপায় আছে? চল, যাই—

আয়নায় নিজের চেহারাটা ভাল করে আর একবার দেখে নিয়ে মন্দিরা উঠে পড়ে : বল, কাউকে ব্যাগটা নিয়ে যেতে।

মুকুল নন্দীর আর দেরি সয় না, নিজেই ব্যাগটা তুলে নেয় : চল, আমি নিয়ে যাচ্ছি।

স্টেজের ফ্ল্যাটগুলো খুলে ফেলে সিফটাররা যথাস্থানে রেখে দিয়েছে। এতক্ষণ যে মঞ্চ দৃশ্যে, আলোয়, অভিনয়ে, জমজমাট ছিল এখন তা ফাঁকা, অন্ধকারে ঝিমিয়ে পড়েছে। প্রেক্ষাগৃহের আলোও নিভে গেছে, সামনের লবীতে বারান্দার নীচে শুধু একটা আলো জ্বলছে। কোলাপ্‌সিবল দরজা আর্ধেকটা টানা। বক্স-অফিস বন্ধ। দু-একজন দরোয়ান পানওয়ালার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল। নিঃশব্দে এগিয়ে এসে মন্দিরা আর মুকুল নন্দী পাশাপাশি উঠে বসল অপেক্ষমান রিক্‌শায়।

রিক্‌শা এগিয়ে চলেছে অতিপরিচিত রাস্তায়। কোন্ বাড়ির পর কোন্ দোকান আসবে, কিভাবে কোন্ মোড়ে লোকেরা দাঁড়িয়ে থাকবে, তাও যেন এদের মুখস্থ। হয়তো হঠাৎ কানে ভেসে আসে, "ওই যে মন্দিরা গুহ যাচ্ছে, রুবী থিয়েটারের মন্দিরা গুহ।" শুনতে ওদের

ভাল লাগে, তবে তা নিয়ে কোন কথা বলে না। যদি বা মুকুল নন্দী বলে, তোমার তো আজকাল ফ্যান অনেক দেখছি।

মন্দিরা ঠোঁট উলটিয়ে উত্তর দেয়, যা গরম, বাড়িতে একটা লাগাতে পারলে বাঁচি।—একটু থেমে জিজ্ঞেস করে, তোমার ছেলে কেমন আছে?

ডাক্তার তো ওষুধ দিচ্ছে, এখনও জ্বর ছাড়ে নি।

বউদি কি রকম?

বলছে তো বাপের বাড়ি যাবে, তারা তো কই খোঁজ নেয় না। সেদিন টেলিফোনে ওর দাদাকে বললাম। বললে আসব, আজও তো আসে নি। এ সময় ওর বাপের বাড়িতে থাকাই ভাল।

বাড়ির কাছে রিকৃশা থামিয়ে মন্দিরা নেমে পড়ল। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল, কড়া নাড়তে নাড়তেই বলল, ঠিক আছে, তুমি চলে যাও মুকুলদা।

রিকৃশা চলে গেল।

একটু পরেই ভেতর থেকে দরজা খুলল গোবিন্দর মা। কাঠকয়লার মত রঙ, চিমড়ে বুড়ী, সাদা থানপরা, এ বাড়ির পুরনো ঝি। কানে দুটো সোনার মাকড়ী, মন্দিরার মা তাকে বকশিশ দিয়েছিলেন।

মন্দিরা বাড়ির মধ্যে ঢুকতে ঢুকতেই জিজ্ঞেস করে, খুকী ঘুমিয়েছে?

এই তো শুল।

জামাইবাবু?

খাওয়া-দাওয়া করে কোথায় বাইরে গেলেন, বলে গেছেন ফিরতে রাত হবে।

কর্তাবাবু?

এখনও খায় নি। তোমার জন্যে বসে আছে।—গোবিন্দর মা গলাটা নামিয়ে নিয়ে বলে, আজ একেবারে বেহুঁশ। তুমি গিয়ে একটু বোঝাও।

মন্দিরা অযথা চেঁচিয়ে ওঠে: জ্বালা আমার, সারাদিন খেটে বাড়ি ফিরব, কারুর যদি সেদিকে একটু খেয়াল থাকে। একজন গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াতে গেলেন, আর একজন মাতাল।

গজগজ করতে করতে মন্দিরা নিজের ঘরে ঢুকে ব্যাগটা একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। জুতোটা শব্দ করে খোলে, কলঘরে গিয়ে মুখ হাত পা ধুয়ে এসে একটা আটপৌরে শাড়ি পরে নেয়।

মন্দিরাদের এ বাড়িটা পুরনো। আরও বেশী পুরনো দেখায় বহুদিন মেরামত করা হয় নি বলে। আঁকাবাঁকা সরু গলির মধ্যে অত্যন্ত ঘিঞ্জি পল্লীতে চারদিকের খোলার চাল আর বস্তীর মাঝে এই একখানাই তিনতলা পাকা বাড়ি। এ বাড়ির মালিক ছিলেন মন্দিরার মা—করুণাময়ী। তিনিও মঞ্চের অভিনেত্রী। অভিনয় করার তাঁর স্বাভাবিক প্রতিভা ছিল। তাই সহজেই মঞ্চে নেমে তিনি পেলেন সুনাম, দর্শকের কাছে হাততালি বাহবা, আর রোজগার করলেন টাকা। তার চেয়েও বেশী যা পেলেন, তা বোধ হয় ভালবাসা। অভিজাত হালদার-বংশের মেজকর্তা সোমনাথপুরের জমিদার করুণাময়ীর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ভালবেসে নিয়ে আসেন এই বাড়িতে। তখন অবশ্য এ বাড়ির চেহারা ছিল অন্য রকম। ইচ্ছে করে বাড়ির রঙ করিয়েছিলেন নীল, তখনকার দিনে এ ধরনের রঙ সহজে চোখে পড়ত না বলে, পাড়ার লোকে এ বাড়ির নাম দিয়েছিল নীলকুঠি। তখন চারদিকের বস্তী এত ঘন হয়ে ওঠে নি, বাড়ির চারপাশেও ছিল বেশ খানিকটা জমি, যা পরে দুদিনের সময় করুণাময়ী নিজেই একদিন বিক্রি করে দিয়েছেন। হালদারবাবুর আমলে বাড়ির দেউড়িতে থাকত দরোয়ান, অন্দরমহলে ঝি-চাকর। সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকত প্রত্যেকটি ঘর, আর সেখানকার সৌখীন আসবাবপত্র। হালদারবাবু ভালবেসেছিলেন শুধু করুণাময়ীকেই নয়, তাঁর অভিনয়কেও। তাই সোনার খাঁচার মধ্যে ভরলেও তাঁর অভিনয় করা উনি বন্ধ করেন নি। প্রায় প্রত্যেক রাত্রেই তিনি যেতেন থিয়েটারে, রিজার্ভ করা বক্সে বসে দেখতেন নাটকের অভিনয় এবং সেই নিয়ে রাত্রে করুণাময়ীর সঙ্গে আলাপও

করতেন—কোন্‌দিন কোন্‌ জায়গাটা অপেক্ষাকৃত ভাল হয়েছে।

বাইরের লোক বড় একটা কেউ এ বাড়িতে আসত না, তবে যাঁকে মাঝে মাঝে এখানে দেখা যেত তিনি দুর্গাশঙ্কর। দুর্গাশঙ্কর হালদারবাবুর স্কুল-জীবনের সহপাঠী, যৌবনের সুহৃদ এবং উত্তরকালের এক গেলাসের বন্ধু। লেখাপড়ায় সুবিধে করতে না পেরে দুর্গাশঙ্করও মঞ্চে ঢুকেছিলেন অভিনয় করার জন্যে। চেহারা ভাল ছিল বলে কয়েকটা নাটকে ভাল পার্টও পেয়েছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত দুর্বল অভিনয়ের জন্যে অভিনেতা হিসেবে নাম করতে পারেন নি মোটেই। হালদারবাবু কিন্তু তাঁকে ভালবাসতেন। দুঃসময়ে সাহায্য করতেন, আনন্দ দেবার জন্যে নিয়ে আসতেন এই নীলকুঠিতে, কত রাত পর্যন্ত দুই বন্ধুতে বসে করুণাময়ীর গান শুনতে শুনতে পান করতেন বিলিতী পানীয়।

প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে, করুণাময়ী যখন খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে, হালদারবাবু অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে হৃদ্‌রোগে মারা গেলেন এই নীলকুঠিরই দোতলার ঘরে। মৃত্যুর পূর্বে শোকাতুরা করুণাময়ীর হাতে দিয়ে গেলেন এই বাড়ির দলিল। আর দুর্গাশঙ্করকে অনুরোধ করলেন সে যেন করুণাময়ীর দেখাশুনো করে। দুর্গাশঙ্কর বন্ধুর সে অন্তিম অনুরোধ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। নিজের সন্তানের মতই মানুষ করেছেন হালদারবাবুর ঔরসজাত করুণাময়ীর জ্যেষ্ঠা কন্যা ও পুত্রকে। এই পরিবারের দেখাশোনা করতে গিয়ে নিজে ঘর বাঁধার কোনদিন সুযোগ পেলেন না। শুধু তাই নয়, মঞ্চে অভিনয় করে যা নিজে রোজগার করতেন তাও ক্রমশঃ বন্ধ হয়ে গেল, কারণ সব সময় ব্যস্ত থাকতেন নীলকুঠির সংসার নিয়ে যাতে না বাড়ির কথা ভাবতে গিয়ে করুণাময়ীর শিল্পীজীবন বাধাপ্রাপ্ত হয়।

মন্দিরা করুণাময়ীর কনিষ্ঠা কন্যা। পিতা দুর্গাশঙ্কর। ছেলেবেলা থেকেই সে ছিল মায়ের সবচেয়ে বেশী আদুরে। তাই করুণাময়ী যেখানে অভিনয় করতে যেতেন সঙ্গে নিয়ে যেতেন ছোটমেয়েকে। সেই মঞ্চের আবহাওয়ার মধ্যেই মন্দিরা বড় হয়েছে। মা বাবা যখন মঞ্চে অভিনয় করতেন ও তখন হয়তো সিফটারদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলত মঞ্চের পেছনের ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত দৃশ্যপট আর আসবাবপত্রের মধ্যে। যে সময়ে করুণাময়ী রিহার্সাল দিতেন—সকালে কি দুপুরের দিকে, ক্রকপরা মন্দিরা থিয়েটারের ছাদে উঠে ঘুড়ি ওড়াত। ছেলেবেলা থেকেই সে ভালবাসত অভিনয়—দেখতে এবং করতে। অবসর সময়ে মায়ের কাছে বসে বসে ছোটখাটো পার্ট শিখত। আট-ন বছর বয়স থেকেই সে নামতে লাগল মঞ্চে। 'শাজাহানে' সিপার, 'চন্দ্রগুপ্তে' আত্রেয়ী, 'বিজয়া'য় পরেশ। তারপর খুব অল্প দিনের মধ্যেই বড়দের চরিত্রেও সে সুযোগ পেল পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করার। অর্থাৎ নায়কের বোন, মুখরা নাতনী এমন কি বাল-বিধবার চরিত্রেও। বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে তার নামও হল, করুণাময়ীর সঙ্গে সে একই মঞ্চে অভিনয় করল, যে নাটকে মন্দিরা নায়িকা, করুণাময়ী তার মা। সকলেই বলল মন্দিরা তার মায়ের অনেক গুণই পেয়েছে। উত্তরকালে সে তাঁরই মত নাম করবে।

তাদের কথা হয়তো সত্যি হত, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মন্দিরা প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী হিসেবে খ্যাতি পেত যদি না হঠাৎ করুণাময়ী এ জগতের রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে চলে যেতেন। করুণাময়ীর জন্যে শোকপ্রকাশ করল সকলেই, পরিচিত বন্ধুবান্ধব, রঙ্গজগতের শিল্পীবৃন্দ, দর্শক সমাজ, এমন কি মঞ্চ-মালিকরাও। কিন্তু যে এ শোক কিছুতেই ভুলতে পারল না সে মন্দিরা। এতদিন স্নেহময়ী মাতার আড়ালে থেকে সে নিজেরই খেয়াল-খুশীতে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছিল, এখন সে আড়াল গেল সরে, ঈর্ষার প্রচণ্ড ঝড়-ঝাপটার মধ্যে দিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সংসারের কথা তাকে ভাবতে হয় না। করুণাময়ী আগে থেকেই নীলকুঠি তিন ভাগ করে দিয়ে গেছেন। তিনতলা আর দোতলায় থাকে বড়মেয়ে, বড়ছেলে। নীচের তলায় দুখানা ঘর বেশী বলে তা দিয়ে গেছেন মন্দিরার নামে। শুধু তাই নয়, তিনি বুঝেই ছিলেন তাঁর এই আদরিণী কন্যাটি সবদিক সামলে একলা কিছুতেই

থাকতে পারবে না। তাই নিতান্ত অল্প বয়েসেই তার বিয়ে দিয়েছিলেন মন্দিরারই এক গুণগ্রাহী দর্শক কলকাতার গুহ পরিবারের সুদর্শন ছেলে অসীমের সঙ্গে। বিয়ের পর অসীমকে বাড়ি থেকে চলে আসতে হয়েছে। অবশ্য সেজন্যে তার কোন অসুবিধা হয় নি, কারণ করুণাময়ী বরাবরই তাকে পরম আদরে নিজের কাছেই রেখেছেন।

অসীম গুহ বড়লোকের খামখেয়ালী ছেলে। কিছুতেই সে মন দিয়ে কোন চাকরি করতে পারে না। মাস কয়েক কাজ করে বেশ কিছুদিন চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকে। এক রকম বলতে গেলে সংসারের সমস্ত ভারই টানতে হয় মন্দিরাকে। রুবী থিয়েটার, অ্যামেচার ক্লাব, তার ওপর ফিল্মের টুকরো পার্ট, সপ্তাহে একদিনও তার নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই। কিন্তু খাটুনি অনুপাতে যে রোজগার হয় তা নয়, প্রত্যেক মাসেই ধার থেকে যায় অনেকের কাছে। শুধু তো নিজের সংসার নয়, পিতা দুর্গাশঙ্করের যে সব খরচ তাকেই চালাতে হয়। করুণাময়ীর মৃত্যুর পর দুর্গাশঙ্কর যেন হঠাৎ বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। আগের সেই উজ্জ্বল গৌরবর্ণ এখন আর নেই, রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। দীর্ঘ ঋজু দেহ অকালবার্ধক্যের চাপে নুয়ে পড়েছে। করুণাময়ীর মৃত্যুর পর থেকে বড় একটা মঞ্চের দিকে তিনি যান নি। সারাদিন কোথায় যে ঘুরে বেড়ান কে তার খবর রাখে। রাত্রে বাড়ি ফেরেন বটে, তবে সময়ের ঠিক থাকে না। নেশার মাত্রা বেড়ে গেছে অনেক, এক এক দিন তো সম্পূর্ণ বেসামাল হয়ে যান। তবু মন্দিরা ছাড়ে না। জোর করে তাঁকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। প্রথম প্রথম বাবার জন্যে তার করুণা হত, মায়ের শোকেই যে তিনি এই ধরনের অস্বাভাবিক জীবন শুরু করেছেন, তা বুঝতে পেরে চোখে জল আসত। কিন্তু এখন আর তার ভাল লাগে না। সে বোঝে একদিন শোক ভুলতে দুর্গাশঙ্কর মদ ধরলেও এখন মদই তাঁকে ধরেছে। এ থেকে বোধ হয় কারুরই মুক্তি নেই।

আজ গোবিন্দর মার কাছে দুর্গাশঙ্করের অবস্থার কথা শুনে মন্দিরা বেশ রাগতে রাগতেই ঢোকে। আলোটা নেভানো ছিল, মন্দিরা সুইচ টিপে দেয়, দেখে মেঝের ওপর মাদুর বিছিয়ে দুর্গাশঙ্কর উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন।

মন্দিরা কর্কশস্বরে ডাকে, বাবা, বাবা।

দুর্গাশঙ্কর জড়ানো গলায় উত্তর দেন, কে মনো, এলি।

তোমার কি লজ্জা বলে কিছু নেই, মাকে তো জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরেছ, আমারও সর্বনাশ না করেই কি তোমার মন ভরছে না?

কথাটা দুর্গাশঙ্করের কানে যায়, আস্তে আস্তে উঠে বসার চেষ্টা করেন, তুইও এ কথা বলতে পারলি মনো?

মন্দিরা ঝাঁজের সঙ্গেই বলে, তোমরা আমাকে কি মনে কর, কাঠের পুতুল? সাধ আহ্লাদ আমার কিছু থাকতে নেই? সারাজীবন শুধু তোমাদের জন্যে রোজগার করে যাব? দেখবে, যেদিন গলায় দড়ি দেব সেদিন বুঝবে।

দুর্গাশঙ্কর দু হাতের ওপর ভর দিয়ে কোনরকমে উঠে বসে স্থির দৃষ্টিতে মন্দিরার দিকে তাকান, কিন্তু বোধ হয় কিছু দেখতে পান না, দু চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে আসে: আমারই মরা উচিত, কিন্তু মরছি কই। তুই ঠিকই বলেছিস রে, তোর মাকে আমি জ্বালিয়ে-পুড়িয়েই মেরেছি। সে ছিল আমার মমতাজ, কিন্তু আমি তাকে কি দিলাম। শাজাহান তার জন্যে তাজমহল করে দিয়েছিল। আর আমি—

দুর্গাশঙ্করের এ ধরনের উচ্ছ্বাস শুনলেই মন্দিরার মন আপনা থেকেই নরম হয়ে আসে। বলে, আঃ বাবা, কি আবোলতাবোল বকছ।

দুর্গাশঙ্করের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে ওঠে: আমার বড় সাধ একবার শাজাহানের পার্ট করি। বৃদ্ধ শাজাহান, আওরঙ্গজেব তাকে বন্দী করে রেখেছে, দূরে তাকিয়ে দেখছে তার স্ফটিকস্বচ্ছ মমতাজ-মহল। আর কাছটিতে রয়েছে জাহানারা, তার মেয়ে।

মন্দিরা বাবার কাছে এসে বসে, তাঁর কেশবিরল মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে দেয়। ডাকে, বাবা।

দুর্গাশঙ্করের উচ্ছ্বাস বেড়ে যায়: তুই আমার জাহানারা মা। এই নিষ্ঠুর সংসারে ঔরঙ্গজেব, আমাকে এই একখানা ঘরে বন্দী করে রেখেছে। এখানে আলো নেই, হাওয়া নেই, কিছু নেই। আমি আশীর্বাদ করছি তুই বড় হবি মা, তোর মায়ের মত নাম করবি। আর তখনও যদি তোর এই বুড়ো বাপ বেঁচে থাকে, একবার আমাকে হাত ধরে এখান থেকে বার করে নিয়ে গিয়ে মঞ্চের ওপরে দাঁড় করাস। আমি তখন শেষ অভিনয় করব—শাজাহান, সম্রাট শাজাহান, প্রেমিক শাজাহান।

মন্দিরাও আর নিজেকে সামলাতে পারে না, চোখের জলের বাঁধ ভেঙে যায়। সাশ্রুকণ্ঠে বলে, অনেক রাত হল, চল বাবা, যা পারবে দুটো খেয়ে নাও।

বৃদ্ধ শাজাহান জাহানারার কাঁধে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

[ক্রমশ]

বিশ্বসাহিত্যের সূচীপত্র

শ্রীদীপেন্দ্রকুমার সান্যাল

॥ প্রথম খণ্ড : উপন্যাস ॥

'মাদাম বোভারী' (৩)

"Madame Bovary,—C'est moi."
—Gustave Flaubert.

পথের শেষ কোথায়, কী আছে শেষে? মানব-জীবনের এই একমাত্র মহৎ জিজ্ঞাসাই দেশে-দেশে কালে-কালে মহাকাব্যের বুকে বারবার বেজেছে। মহাকাব্যের ফুলে-কাঁটায়, তার আলো-ছায়ার জোয়ার-ভাঁটায়, তার দুঃখে-সুখে-শঙ্কাতে কালের মন্দিরা বেজেছে এই সুরে। শুধু কালের খাতায়, পুঁথির পাতাতেই নয়—নিজের জীবনকে যাঁরা মহাকাব্যের বিশালতা দিয়েছেন, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কর্মে ও কথায় ফুলের মত ফুটিয়েছেন দলের পর দলে শতদলের মত, আকাশে বাতাসে মেলে দিয়েছেন গানের সুরের পাখা, মধুময় করেছেন পৃথিবীর ধূলিকে, মানবজীবনের চেয়েও মহত্তর আরও কোনও পালায় ডাক পড়লে যাঁরা চলে গেলে, তখনও পশ্চিমাকাশে আঁকা থেকেছে একটি নীলাঞ্জনরেখা, সেই যাঁরা স্মরণীয়, যাঁরা বরণীয়, তাঁদেরই একজন, রাজসিংহাসন ত্যাগ করে মানবপ্রেমী যিনি পথের ধারে পেতেছিলেন নিজের আসন তিনিও জানতে চেয়েছিলেন, জানাতে চেয়েছিলেন ওই—পথের শেষ কোথায়, কী আছে শেষে?

সংখ্যা গণনার অতীত প্রত্যুষ থেকে মানবেতিহাসে ভগবানের দূত যাঁরা অন্তর থেকে বিদ্বেষের বিষকে নির্বাসন দিয়ে মানুষের প্রতি বিশ্বাস আর ভালবাসার অমৃতসিঞ্চনের করুণাধারা এনেছেন বহন করে কেবল তাঁরাও নন; যে অমিতবীর্য দুঃশাসন, রুদ্রের ভয়ঙ্কর অভিশাপে যে হতভাগ্য মানবপুত্রকে করেছে লাঞ্ছিত, শৃঙ্খলাকে যে অস্বীকার করেছে, শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে চেয়েছে চন্দ্র-সূর্যগ্রহতারাকে, রণোন্মাদ যে ধন্যধান্যপুষ্পভরা মানুষের এই বসুন্ধরাকে যুগে যুগে রঞ্জিত করেছে সংখ্যাহীন নিহত শিশু এবং নরনারীর রক্তে, বিশ্বাসের যে টলাতে চেয়েছে ভিত, নিদারুণ দুঃখরাতে আত্মঘাতে যে মানুষ চেয়েছে মর্ত্যসীমা চূর্ণ করে কলুষস্পর্শে ক্ষুণ্ণ করতে দেবতার অমর মহিমা, সেই কালাপাহাড়ের বিক্ষুব্ধ অন্তরও হাহাকার করে উঠেছে হত্যার শেষে আত্মহত্যার মুহূর্তে—পথের শেষ কোথায়, কী আছে শেষে?

আর ধ্যানী-প্রেমিক কিছুতেই না হতে পেরে জ্ঞানী-বৈজ্ঞানিক যে সৃষ্টিরহস্যের জটিল গ্রন্থি উন্মোচনে বেছে নিল বিচার আর বিশ্লেষণের রৌদ্ররুক্ষ পথকে, পাথেয় করল যে চরমের পরম উদ্দেশ-অজ্ঞাত জীবনে বিশুদ্ধ জ্ঞানকে, পরিশুদ্ধ বিজ্ঞানকে করল একমাত্র সম্বল, অবাঙমানসগোচরকে যে চাইল প্রত্যক্ষ করতে, জ্ঞানের কঠিন কণ্টক-আসনে বসে বিশুষ্ক বিজ্ঞানের নিদিধ্যাসনে নিরন্তর যুক্ত যার কণ্ঠে উচ্চারিত হল না এই মন্ত্র: বুঝেছি কি বুঝি নাই বা সে তর্কে কাজ নাই; ভাল লেগেছিল মনে রইল এই কথাই,—তর্ক সংশয়, অবিদ্যা এবং অবিশ্বাসের পথ যার ক্রমে ক্রমে লক্ষ্য থেকে অনেকদূরে গেল বেঁকে সেই যে সৃষ্টির রঙমহলের দরজার পর দরজা খুলতে খুলতে ঠেকে গেল যেখানে সব দরজা খুলে যায় যে চাবিতে, সে সংকেতও ব্যর্থ হল যখন বদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করতে করতে তখন অবারিত ফেলে আসা পথের আর অতিক্রম করে আসা অতীতের দিকে তাকিয়ে

তার সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন হল নিরুত্তর যে জিজ্ঞাসায় তাও এই পথের শেষ কোথায়, কী আছে শেষে?

গুস্তেভ ফ্লবেয়ারের এমা বোভারীও নিজের জীবন দিয়ে জবাব খুঁজেছিল এই জীবনজিজ্ঞাসার: পথের শেষ কোথায়, কী আছে শেষে? তার এই জীবনজিজ্ঞাসারই আর এক নাম: জীবনতৃষ্ণা।

অর্থের, সামর্থ্যের অথবা কামনার এই জীবনতৃষ্ণার শেষ নেই। মানুষ যার জন্যে ছুটে বেরিয়েছে চিরকাল; ভেবেছে আর একবার ডুব দিলেই অর্থের, সামর্থ্যের অথবা কামনার কালো জলে মিটে যাবে তার পিপাসা; অবগাহন স্নানান্তে সেই মানুষের অন্তরে অশান্তির জ্বলেছে অনির্বান অগ্নিশিখা। সবুজ পোকার মত সুনিশ্চিত মৃত্যু সেই আগুনে প্রত্যক্ষ করেও সামলাতে পারে নি তাতে ঝাঁপ দেওয়ার দুনিবার ঝোঁক। যুগে যুগে দেশে দেশে ভগবানের দূতেরা উচ্চারণ করেছেন সতর্কবাণী। অর্থ, সামর্থ্য অথবা দেহের জন্যে দেহের অন্তহীন লালসার হাত থেকে মুক্তির সঙ্কেত নেই আরও অর্থে, আরও সামর্থ্যে অথবা আরও দেহসম্ভোগে। মানুষ সে কথায় কোনওদিন করে নি কর্ণপাত। এমা বোভারীর মতই হয় হত্যা নয় আত্মহত্যার অন্ধকারে নিজের হাতে নিভিয়ে দিতে হয়েছে জীবনদীপ। লোভ থেকে পাপে, পাপ থেকে মৃত্যুতে অবশ্যম্ভাবী হয়েছে এমা বোভারীর পদক্ষেপ; এবং যাবার বেলায় আলোকিত হয়েছে ফেলে আসা অতীত। কথা কয়ে উঠেছে ব্যর্থতার ধিক্কারে আচ্ছাদিত বোভারীর বর্তমানও সেই মুহূর্তে: বুঝি তৃষ্ণার শেষ নেই…

এমা বোভারীর জীবনের সন্ধ্যা যখন অন্ধকার করে আসছে যৌবনের স্বপ্নে তখনও ছেয়ে আছে মৃত্যুর পটভূমিকায় উজ্জ্বল বিশ্বের আকাশ:

"Suddenly on the pavement was heard a loud noise of clogs and the clattering of a stick; and a voice rose—a raucous voice—that sang—

'Maids in the warmth of a summer day
Dream of love and of love away.'

Emma raised herself like a galvanised corpse, her hair undone, her eyes fixed, staring.

'Where the sickle blades have been,
Nannette, gathering ears of corn,
Passes bending down, my Queen,
To the earth where they were born'.

'The blind man!' she cried. And Emma began to laugh, an atrocious, frantic despairing laugh, thinking she saw the hideous face of the poor wretch that stood out against the eternal night like a menace.

'The wind is strong this summer day,
Her petticoat has flown away.'

She fell back upon the mattress in a convulsion. They all drew near. She was dead."

[Translated from the French by
Eleanor Marx-Aveling]

শেষ পারানির কড়ি জীবনের পাশাখেলায় উড়িয়ে দিয়ে যাবার সময় হয়েছে যখন এমা বোভারীর তখন মনে থাকে না যে সব কিছুর জন্যেই দায়ী সে একা। সকল পাঠকের সহানুভূতি তার শেষ যাত্রার সহযাত্রী হতে চেয়েছে তখন মুহূর্তে। রিয়ালিজমের মহিমায় নয়, নয় জীবনতৃষ্ণার নিখুঁত রূপায়ণে—পাঠকের মনে সহানুভূতি সঞ্চারের গৌরবেই 'মাদাম বোভারী' মহৎ সৃষ্টি। বোভারীর Saddest Thoughtsকে Sweetest Song করতে পেরেছেন ফ্লবেয়ার যে গুণে মহৎ সাহিত্যসৃষ্টির সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান তা-ই—সহানুভূতি। তীব্র ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপের তীক্ষ্ণবাণে নয়, হাসির ঘায়ে পাঠকের মূর্ছা যাবার কৃতিত্বেও কিছুতেই নয়। মানবজীবনের মহত্তম কথা গভীর আনন্দের মধ্যেও সুগভীর বেদনার কথা। তীর থেকে বিচ্ছিন্ন—"বহুদূর সমুদ্রের বিষণ্ণ নাবিকের গানের" সুরই জীবনের সুর। মাদাম বোভারীর জীবনের প্রদোষালোকে এই সুরই বাজিয়েছেন ফ্লবেয়ার। এ সুর বুদ্ধি দিয়ে বোঝবার নয়, হৃদয়ে বাজবার। পাঠকের হৃদয়ে যে মুহূর্তে ধ্বনিত হয়েছে এই সুর সেই মুহূর্তেই জয় হয়েছে 'মাদাম বোভারী'র স্রষ্টার। 'মাদাম বোভারী' শ্লীল কি অশ্লীল সেই মামলায় নয় কেবল—'মাদাম

বোভারী'র লেখক রিয়ালিস্ট না রোমান্টিক সেই ব্যাকরণ-সর্বস্ব বিচারেই নয় শুধু, জয় হয়েছে ফ্লবেয়ারের কালের বিচারে। কালোত্তীর্ণ মহিমার মুকুট সেই মুহূর্তেই জয়যুক্ত করেছে 'মাদাম বোভারী'কে।

অল্প ক্ষমতার অধিকারী কারুর কলমে যা হতে পারত নিছক পর্ণগ্রাফী, গুস্তেভ ফ্লবেয়ারের হাতে তাই হয়েছে ক্ষণিকের আনন্দে উচ্ছল চিরন্তন বেদনার পূর্ণিমা।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'মাদাম বোভারী'র পাণ্ডুলিপিতে শেষ দাঁড়ি টানেন ফ্লবেয়ার। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর গুস্তেভ ফ্লবেয়ারের সমস্ত সত্তা অধিকার করে ছিল যে নারী দেলামেয়ারের দ্বিতীয় পক্ষ তার উপলক্ষ মাত্র। মাদাম বোভারীর উপস্থিতির মধ্যে অনুপস্থিত লুইসি কোলেকেও আগাগোড়া ছোঁয়া যায় রক্তমাংসের মানুষকে দুহাত দিয়ে স্পর্শ করা যায় যেমন সহজে। কিন্তু মাদাম বোভারী আসলে কে? এ জিজ্ঞাসা যখনই যে কারণেই উঠেছে তখনই এর একমাত্র যে উত্তরে ফ্লবেয়ার ক্ষান্ত করেছেন পরিচিত-অপরিচিত শত্রু-মিত্র পাঠক-সমালোচককে তা হচ্ছে ফ্লবেয়ারের ওই ইতিমধ্যেই বহুবিশ্রুত উক্তি: 'Madame Bovary,—C'est moi.' ['Madame Bovary is me']। এই উক্তি কেবলমাত্র প্রশ্নবাণে উত্ত্যক্ত ফ্লবেয়ার অব্যাহতির আশায় করেন নি। এ উক্তির মধ্যেই অবধারিত বিধৃত ফ্লবেয়ারের চরিত্রের অপ্রকৃতিস্থতার রহস্য। এবং এই উক্তির যথার্থ তাৎপর্য ফ্লবেয়ারের চেয়েও যিনি বেশী উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তিনিও কবিকর্মে এবং জীবনযাপনে এক দলছাড়া, গোত্রহারা মানুষ। সমগ্র ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাসে বিচিত্র, বিশিষ্ট, অনন্য এই কবির পরবর্তীকালে বিশ্বখ্যাত নাম হচ্ছে বোদলেয়ার।

১৮৫৭ সালের ১৮ই অক্টোবর L'Artiste-এ প্রকাশিত হয় বোদলেয়ারের ক্রিটিসিজম্। বোদলেয়ার তখন কবিতার বইয়ের জন্য 'মাদাম বোভারী'র কারণে ফ্লবেয়ারের মতই অশ্লীলতার দায়ে আদালতে অভিযুক্ত হয়েছেন। 'মাদাম বোভারী'র এই সমালোচনা স্বয়ং ফ্লবেয়ারকে নাড়া দিয়েছে সবচেয়ে বেশী। বোদলেয়ার 'মাদাম বোভারী'র চরিত্রের মর্মমূল উদ্ঘাটিত করেছেন শল্যচিকিৎসকের ক্ষতস্থান অনাবৃত করার মত নিঃসংশয়ে, নির্দ্বিধায়:

"To accomplish the tour de force in its entirety, it remained for the author only to divest himself (as much as possible) of his sex, and to become a woman. The result is a marvel; for despite all his zeal as an actor he was unable to keep from infusing his male blood into the veins of his creation and Madame Bovary in the most forceful and ambitious sides of her charactor, and also the most pensive, remained a man."

'মাদাম বোভারী'র মধ্যে ফ্লবেয়ারকে এবং গুস্তেভ ফ্লবেয়ারের মধ্যে এমাকে এমনভাবে সম্ভবত স্বয়ং বোভারীর স্রষ্টাও নিরীক্ষণ করতে সক্ষম হন নি।

সন্তান জন্মদানের কষ্টের এবং আনন্দের সঙ্গেই কেবল তুলনা চলে তার যার নাম work of art। শিল্পসৃষ্টির রহস্য জন্মরহস্যের মতই একই সঙ্গে চরম কষ্ট এবং পরম গৌরবের মহিমায় রোমাঞ্চকর। সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেন জননী দশমাস; মাদাম বোভারীকে সম্পূর্ণ চিন্তার জঠরমুক্ত করতে গুস্তেভ ফ্লবেয়ারের লেগেছিল পঞ্চান্ন মাস। কোনও কোনও সময়ে মনে হয়েছে তাঁর থেমে গেছে বুঝি প্রাণের স্পন্দন। মাদাম বোভারী যখন বিষ খেয়েছে তখন তার স্রষ্টার সত্যসত্যই বমনোদ্রেক হয়েছে শোনা যায়। এবং সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার এমন একাত্মতার কথা বিশ্বসাহিত্যের বিচিত্র ইতিহাসে দু একবারের বেশী শোনা যায় না। কিন্তু মাদাম বোভারী দিনের আলো দেখার সঙ্গে সঙ্গেই দুর্ভাগ্য শেষ হয় না তার introvert রচয়িতার। নির্জনতার খোলস ত্যাগ করে বেরিয়ে আসতে হয় শিল্পীকে আদালতের প্রকাশ্য অশালীনতার অভদ্রালোকে। আদালতের মামলা শেষ হয় না এক সময়ে; শেষ হয় না প্যারীর মুখে মুখে 'মাদাম বোভারী' আর তার স্রষ্টাকে নিয়ে কুৎসিত আলোচনার খই ফোটার।

একটি চিঠিতে সেই সময়ে ফ্লবেয়ার নিজেকে খুলে ধরেন 'মাদাম বোভারী'-প্রসঙ্গে ; এই পত্র একমাত্র ফ্লবেয়ারের পক্ষেই লেখা সম্ভব ছিল :

"Only the ladies consider me a 'dreadful man'. They think I am too true to life. That is the basis of their indignation. I think that I am very moral....My novel teaches a very clear lesson, and if, 'no mother could think of allowing her daughter to read it'—as I have heard stated—I think that husbands would do very well to give it to their wives. But all this leaves me completely indifferent. The morality of art consists in its beauty, and I value style even above truth. I think that into my picture of bourgeois life and my exposition of the character of a woman who is naturally corrupt, I have part as much literature and as much decorum as the subject allows. I have no desire to repeat this work. Vulgar society disgusts me, and it was because it disgusts me that I chose to depict the society in Bovary, which is so ultra-vulgar, so ultra-repugnant."

যে একখানা বই তিরিশ বছর বয়সে এসে প্রকাশ করামাত্র ফরাসী সাহিত্যের আকাশ জুড়ে শ্লীল কি অশ্লীল, রিয়ালিষ্টিক কি রোমান্টিক এই নিয়ে তর্ক-বিতর্কের, বিচার-বিশ্লেষণের, দীর্ঘস্থায়ী ঝড় উঠেছিল সেই বইও যে সমাজের দর্পণ সে সমাজ ফ্লবেয়ারের দৃষ্টিকোণ থেকে vulgar এবং তা 'disgusts me'! বস্তুত 'মাদাম বোভারী'র দুর্জনপ্রিয়তায় শেষ পর্যন্ত তিনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন এবং একখানি বইয়ের লেখক [one Book-author] হয়ে বেঁচে থাকা তাঁর কাছে গৌরবের চেয়ে অনেক বেশী অগৌরবের ছিল এ চিঠিতেও তার স্পষ্ট খোঁজ পাওয়া যায়। কিন্তু ফ্লবেয়ারের এই পত্র যে স্মরণীয় তা এ কারণে নয়, বরং 'and I value style even above truth'—এই মন্তব্যের জন্য। Style-এর জন্যে এমন প্যাশনের দৃষ্টান্ত সাহিত্যের ইতিবৃত্তে দ্বিতীয়-রহিত। শুধু তাঁর নিজের কাছেই যে এই বস্তু মূল্যবান ছিল তা নয় ; 'মাদাম বোভারী' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে ফরাসী ভাষার শ্রেষ্ঠ মালাকর—এই সুনিশ্চিত দাবির স্বীকৃতি পান প্রায় সমস্ত স্বীকৃত সমালোচকের কাছেই। আজও তা অস্বীকার করবার মত কোনও কারণ পাওয়া যায় নি ["With Madame Bovary he made himself one of the greatest stylists in France".]

মাদাম বোভারীর আমলে ফরাসী সমালোচকদের প্রথম সারির প্রথম সশ্রদ্ধ নাম যাঁর তিনি হলেন : Sainte-Beuve। প্রথমে রাজনৈতিক কারণে 'মাদাম বোভারী'র আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে অক্ষম হলেও সম্ভবত ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে Moniteur-এ Madame Bovary-র Sainte-Beuve সমালোচনা আত্মপ্রকাশ করে শেষ পর্যন্ত। এই সমালোচনা ভালমন্দের আলোচনায় তুল্যমূল্য হলেও ফ্লবেয়ারের style-এর স্বীকৃতিতে সোচ্চার :

"One precious quality distinguishes Gustave Flaubert from the other more or less exact observers who in our time pride themselves on frankly reducing the only reality and who occasionally succeed ; he has style."

এবং সমাজের নিখুঁত রূপ দক্ষতার সঙ্গে চিত্রণের কারণে রূপদক্ষ ফ্লবেয়ারের সম্পর্কে উক্তি :

"Pictures which if they were painted with the brush as they are written would be worthy of hanging in a gallery beside the best genre paintings."...এবং তারপর আবার :

"Son and brother of eminent doctors, M. Gustave Flaubert holds the pen as others hold the scalpel."—এই উক্তি করার পরও বলতে বিস্মৃত হন নি যে :

"There is no goodness in the book. Not a character represents it."

ফ্লবেয়ারের 'মাদাম বোভারী' আত্মপ্রকাশ করার প্রায় একশো বছর বাদে বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বিস্ময়কর

ছোটগল্পের স্রষ্টা সমারসেট মম উপরে উদ্ধৃত বক্তব্যের প্রায় প্রতিধ্বনি করেই বলছেন :

"We are introduced to many persons in the course of the novel's five hundred pages, and with the exception of Dr. Lariviere, a minor character, not one has a redeeming feature. They are base, mean, stupid, trivial and vulgar. A great many people are, but not all; and it is inconceivable that in a town, however small, there should not be found one person at least, if not two or three, who was sensible, kindly and helpful."

মমের মতে এর কারণ ফ্লবেয়ারের পার্সোন্যালিটি :

"He flung himself into the sordid story of Madame Bovary with the zest of a man revenging himself on life by wallowing in the gutter, because life has not met the demands of his passion for the ideal."

কিন্তু এই তর্ক-বিতর্ক, বিচার-বিশ্লেষণ, নিন্দা-স্তুতির মধ্যে যার উত্তর নেই 'মাদাম বোভারী'র সম্পর্কে আমাদের সেই একটিমাত্র কথা হচ্ছে তবে 'মাদাম বোভারী' বিশ্বসাহিত্য কিসের দাবিতে? স্টাইলের জন্যে? রিয়্যালিজমের কারণে? শ্লীল কি অশ্লীল আজও বলা শক্ত এই দ্বন্দ্বের উৎস বলে? না। আকাশের গায়ে বৃষ্টির জলে সূর্যের রঙে রামধনু আঁকা হলে মাটির মানুষের মনেও কেন তা সাতরঙা ছায়া ফেলে, ভোরের আকাশ ভরে দিলে আলোর গানে কেন মধুকর গুঞ্জরণে মনের বনের ছায়াতল কাঁপে, মধ্য দিনে যখন গান বন্ধ করে পাখি তখনও কেন রাখাল বালক বাঁশী বাজায় একাকী তার কোনও ব্যাখ্যা জ্ঞানে অথবা এই 'কেন'র উত্তর নেই বিজ্ঞানে। বুদ্ধির তা-ই অনধিকার চর্চা—হৃদয়ের যা চিরকালের ধন।

'মাদাম বোভারী' কোনও একজনের কথা নয়; কোনও একজন অতৃপ্তকাম নারীর কাহিনীও নয়—'মাদাম বোভারী' সকল যুগের সমস্ত দেশের মানুষের আত্মকথা। যে মানুষ চেয়ে পেয়েছে তার আত্মতৃপ্ত জীবনী নয়, পেয়ে চাওয়া ফুরোয় নি যার কোনওদিন সেই মানুষের চিরন্তন কান্নার গান। দেলামেয়ারের দ্বিতীয় পক্ষকে উপলক্ষ করে ফ্লবেয়ার যে লক্ষ্যে উপনীত হতে চেয়েছেন মহৎ সাহিত্যের তাই একমাত্র লক্ষণ। মিডিওকার মনোবৃত্তির স্বামী, একঘেয়ে পরিবেশের ক্লান্তি থেকে মুক্তি চেয়েছিল মাদাম বোভারী। উপলক্ষ্য থেকে লক্ষ্যে পৌঁছবার পথ পর্যন্ত ফ্লবেয়ারের লিখননৈপুণ্য অবশ্যই 'মাদাম বোভারী'র ক্ষেত্রে স্বতর্ব্য। বালজাকের অথবা তলস্তয়ের কিংবা দস্তয়ভস্কির মত কেবল 'Ends' দিয়ে সবকিছুকে justify করবার কলম ছিল না ফ্লবেয়ারের; 'Ends'-এর মত 'Means'-এর দিকেও তাঁর লক্ষ্য ছিল। ডিটেল্‌সের কাজে তাঁর জুড়ি বিশ্বসাহিত্যেই বিরল। ডিকেন্সেও ডিটেলসের কাজ নেই যে তা নয়—কিন্তু ফ্লবেয়ারের ভাষার জাদু, craft-এর কায়দা নেই আর কোথাও। তিনি ভাষার মণিকার তো বটেই, তাঁর 'মাদাম বোভারী' আদ্যন্ত সুখপাঠ্য। 'মাদাম বোভারী'র বোরডামকে ফুটিয়ে তুলছেন যেখানে সেখানেও রচনাকে একঘেয়ে হতে দেন নি ফ্লবেয়ার। মহৎ উপন্যাস সুখপাঠ্য নয় প্রায়ই; সুখপাঠ্য রচনা মহত্ত্বের স্বীকৃতি পেয়েছে কদাচ। 'মাদাম বোভারী' একই সঙ্গে মহৎ এবং সুখপাঠ্য; গভীর কথা বলতে গিয়ে একথা কখনও বিস্মৃত হন নি ফ্লবেয়ার যে তাঁর মাধ্যম প্রবন্ধ নয়—উপন্যাস। 'মাদাম বোভারী' উপন্যাসের বিগিনিং, মিডল এবং এণ্ড আছে।

'মাদাম বোভারী' রচনার সময়ে মপাসাঁর গুরু জানতেন যে : "A work of fiction is an arrangement of incidents devised to display a number of characters in action and to interest the reader. It is not a copy of life as it is lived."

এবং জানতেন বলেই :

"Flaubert has succeeded. Madame Bovary gives an impression of intense reality, and this, I think, arises not only because his characters are eminently life-like, but because with his peculiar acuity of observation, he has described every detail essential to this purpose with extraordinary accuracy. The book is very well constructed."

'মাদাম বোভারী' যে 'Well Constructed' তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই বইয়ের 'Setting'। এক বিবাহিত নারীর, পোশাকের পর পোশাক পালটানোর চেয়েও দ্রুত প্রেমিকের পর প্রেমিক পালটানোর উত্তেজক চিত্র, এই বইয়ের একমাত্র উপজীব্য হলে ফ্লবেয়ার বই আরম্ভ করার কয়েক পাতার মধ্যেই সেই রুদ্ধশ্বাস ঘটনার আবর্তে নিয়ে যেতেন পাঠককে। তিনি তা করেন নি। চার্লস বোভারীর প্রথম জীবন, প্রথম বিবাহে আরম্ভ করে এমা বোভারীর মৃত্যুতে বই শেষ করেন নি ফ্লবেয়ার, চার্লসের মৃত্যু পর্যন্ত গিয়ে তবে থেমেছেন। এই কারণেঃ "Some critics have found it a fault that though Emma is the central character it begins with a description of Bovary's early youth and first marriage and finishes with his disintegration and death." এই সমালোচনার জবাব ফ্লবেয়ারের হয়ে একজন সমালোচক সাম্প্রতিক কালে দিয়েছেন: "I think Flaubert's idea was to enclose the story of Emma within the story of her husband as you enclose a painting in a frame. He must have felt, I believe, that so he rounded off his narrative and gave it the unity of a work of art."

ফ্লবেয়ারের আসল লক্ষ্য মাদাম বোভারীর বিবাহ-পরবর্তী জীবনের প্যাসানের নির্লজ্জ চিত্র উপস্থিত করা ছিল না। মাদাম বোভারীর এই অসামাজিক প্রণয়কে উপলক্ষ্য করে যে লক্ষ্যভেদ করেছেন তিনি তা হচ্ছে তাঁর নিজেরই কথায়: "Vulgar society disgusts me, and it was because it disgusts me that I chose to depict the society in Bovary, which is so ultra-vulgar, so ultra-repugnant."

এবং এই লক্ষ্যে পৌঁছতে যার আশ্রয় নিতে হয়েছে তাঁকে তাই-ই বিশ্বসাহিত্যের স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব করেছে 'মাদাম বোভারী'র স্রষ্টাকে—Style।

'মাদাম বোভারী' তাঁর প্রথম প্রধান প্রকাশিত রচনা। এই রচনারম্ভের যে একটি বিষয়ে তিনি সুনিশ্চিত ছিলেন তা হচ্ছে: "Flaubert was conscious that in setting out to write a novel about common place people he ran the risk of writing a very dull one. He was determined to produce a work of art and he felt that he could surmount the difficulties presented by the sordid nature of his subject and the vulgarity of his characters only by means of beauty of style."

কেবলমাত্র 'মাদাম বোভারী' পড়লেই ফ্লবেয়ারের style-consciousness সম্পর্কে ধারণা সম্পূর্ণ হয় না; কোনও লেখকেরই একখানা বই পড়ে তাঁর সম্বন্ধে শেষ রায় দেওয়া শক্ত; কোনও লেখকের সর্বশ্রেষ্ঠ একখানা বই পড়েও শক্ত। যে-কোনও লেখককে অস্থিমজ্জায় অবগত হবার জন্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা ছাড়াও আরও একখানা বই পড়া দরকার। ফ্লবেয়ারের আর একখানি বই Education Sentimentale পড়ে প্রুস্ত ফ্লবেয়ারের style-এর বিশ্লেষণ করে বলেছেন: "...as of the monotonous perpetual movement of a moving staircase."

ফ্লবেয়ারের এই Style এবং Craft সম্পর্কে এত কথা না বলে 'মাদাম বোভারী' থেকে একটুকরো নমুনা এখানে তুলে ধরলে পাঠকের পক্ষে আমাদের বক্তব্য অনুধাবন করা অনেক সহজ হবে। মাদাম বোভারীর বিবাহিত জীবনে অসামাজিক প্রণয়ের প্রচ্ছদে যার প্রথম প্রবেশ তার নাম: Rodolphe Boulanger (এর আগে Leon দেখা দিয়েছিল বটে কিন্তু তখনও এমার সর্বনাশের সূত্রপাত হয় নি)। তার কাছে আত্মসমর্পণের আগে পাঠককে কেমনভাবে তৈরি করেছেন ফ্লবেয়ার নাট্যের চরম দৃশ্যকে বিশ্বাসযোগ্য করতে এই একটুকরো তারই নির্মম প্রমাণ।

Rodolphe তখনও এসে পৌঁছয় নি এমার বিবাহিত জীবনে। স্বামীসঙ্গে বিরক্ত মাদাম বোভারী: "...was

left broken, breathless, inert, sobbing in a low voice, with flowing tears." অন্য যে-কোনও লেখক হলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই Rodolphe-কে আনত; ফ্লবেয়ার তার বদলে এনেছেন বোভারীর ভৃত্যকে: "'Why don't you tell master?' The servant asked her when she came in during these crisis."

"'It is the nerves', said Emma. 'Do not speak to him of it; it would worry him'." তার উত্তরে বোভারীর ভৃত্য Felicite একটি অবিবাহিত মেয়ের অনুরূপ কান্নার কথা মনে পড়ায় বলল: "When she was taken too bad she went off quite alone to the sea-shore, so that the customs officer, going his rounds, often found her lying flat on her face, crying on the shingle. Then, after her marraige, it went off, they say."

এর পর মাদাম বোভারীর মুখ দিয়ে ফ্লবেয়ার যে কথা বলিয়েছেন তারই মধ্যে রয়েছে মাদাম বোভারীর নিজের জীবন দিয়ে রোপিত বিষবৃক্ষের প্রথম বীজ:

"'But with me,' replied Emma, 'it was after marriage that it began.'"

'মাদাম বোভারী' বিশ্বসাহিত্য স্টাইল অথবা ক্র্যাফ্‌টের জন্তে নয়। বিবাহিত রমণীর পদস্খলনের উত্তেজক ইতিবৃত্ত উপভোগের কারণে যারা 'মাদাম বোভারী' পড়বে তারা বিশ্বসাহিত্যের পাঠক নয় কোনও দিন। 'মাদাম বোভারী' উপলব্ধির বিষয়, নিছক উপভোগের বস্তু নয়। ক্র্যাফ্‌ট্‌, স্টাইল, বিগিনিং, মিড্‌ল্‌, এণ্ড অতিক্রম করে এই উপন্যাস মানবজীবনের চরম সত্যকে উদ্‌ঘাটনের মহিমাতেই চিরায়ত সাহিত্য। সে সত্য হচ্ছে মানুষ যা চেয়েছে তা পায় নি; যা পেয়েছে তা চায় নি। চেয়ে না পাবার বেদনা, পেয়ে না চাওয়ার চিরন্তন ব্যর্থতাই মাদাম বোভারীর মুখে তুলে দিয়েছে জীবনের সুধা বলে যাকে সে মনে করেছিল, আসলে যা মৃত্যুর গরল। 'মাদাম বোভারী' মানবজীবনের মধুযামিনী নয়; তার চিরন্তন বিরহের অমানিশি।

মাদাম বোভারী যাকে বিবাহ করেছিল তাকেও সে চেয়েছিল কিন্তু পেয়েছিল যখন তখন আর চায় নি:

"But the moment after marraige, she returns to her restless dreams. For Bovary represents the commonplace Here, and Emma is always yearning for that glorious Elsewhere."

ঠিক এই সময়ে Leon এসে পৌঁছয় এমার জীবনে: "A brief moment of ecstasy, a peep into the heaven beyond the horizon, and then he leaves her."

আবার মাদাম বোভারী ফিরে যায় বিবশ দিনের বিরস কাজে। "Reality once more—heavier, duller, more oppressive than ever."

তারপর শুরু হয় নতুন প্রেম; প্রথম সমর্পণ: "A new dream, with her new lover (Rodolphe)." স্বপ্নভঙ্গ হয় অনতিবিলম্বেই। এবং তখন: "Her actual world is unbearable, her romantic world is shattered, and there is nothing left but forgetfulness. She seeks this forgetfulness in a frenzy of sensual excitement."

এবং তারই ফলে "And thus she falls from degradation to degradation.···She has even stopped dreaming. Her life has become a confused, desperate and panicky escape."

যবনিকা পতনের মুহূর্তে: "And then, the final choice between the gutter and the grave. Emma choses the grave. For the gutter would be but another relapse into reality. But death is that fearful, hopeful journey beyond the horizon. The last great excursion into the land of Romance.

Emma Bovary is romantic to the end."

গুস্তেভ ফ্লবেয়ারের 'মাদাম বোভারী' পড়ে আমরা আর একবার জানতে পারি এই চরম সত্য যে মানুষের স্বপ্ন কোনও দিন সত্য হয় না; কিন্তু মানবজীবনের একমাত্র সত্য—মানুষের স্বপ্ন।

[ক্রমশ]

জলছবি

জগদীশ মোদক

মান্ধাতার আমলের বড় কাঠের সিন্দুকটায় এবং দুটো ভাঙা তোরঙ্গে অনেকদিন থেকে কিছু বই পড়েছিল। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে বইগুলো জমেছে। আমাদের আট ভাইবোনের এবং আমাদের পরবর্তী বংশধরদের বই মিলে ওজনে প্রায় মণ-দুই হবে। দীর্ঘকাল ধরে বইগুলো এইভাবে পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছিল। তাই বিক্রি করে দেওয়ার জন্যে সেদিন একটা কাগজওয়ালাকে বাড়িতে ডেকে এনেছিলুম।

বড়দা কাগজওয়ালার দিকে বইগুলো এগিয়ে দিচ্ছিল, মেজদা পাল্লার হিসেব রাখছিল। আর আমি একপাশে বসে স্তূপীকৃত বইগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলুম। এইভাবে নাড়াচাড়া করতে করতে সেই স্তূপীকৃত বইয়ের ভেতর হঠাৎ একটা বই চোখে পড়ামাত্র টেনে নিলুম।

যদিও জীর্ণ হয়ে গেছে, মলাটের রঙটা হয়ে গেছে বিবর্ণ, তবু দেখামাত্র চিনতে পারলুম—আমার ছেলেবেলায় পড়া বইটি। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে পড়ে গেল—পাঠশালায় ক্লাস থ্রীতে আমরা বইটা পড়েছিলুম।

কেমন যেন একটা কৌতূহলে বইটার পাতা ওলটাচ্ছিলুম। ওলটাতে ওলটাতে মনে হচ্ছিল যেন আমার সেই শৈশবেরই এক একটি দিনের আবরণ উন্মোচন করছি।

এইভাবে পাতা ওলটাতে ওলটাতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে চোখ দুটো থমকে গেল। বইটার শেষ পৃষ্ঠায় একটা জলছবি আর তার নীচে গোটা গোটা হরফে আমার নাম ঠিকানা লেখা।

অপলকে সেই জলছবি এবং লেখাটির দিকে তাকিয়ে রইলুম। তাকিয়ে থাকতে থাকতে কি জানি কেন বুকটা বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠল।

এতদিন পরে হঠাৎ আজ খোকনের কথা মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল—কি আন্তরিকতায় ও একদিন আমার বইয়ে এই জলছবিটা লাগিয়ে দিয়েছিল। আর ছবিটা পেয়ে আমার মনটাও কত না খুশীতে ভরে উঠেছিল।

খুশী শুধু জলছবিটার জন্যেই নয়, খুশী হয়েছিলুম অমন একটি ছেলের অন্তরঙ্গ হতে পেরে—যে ছেলেটি ক্লাসের ইতিহাস বইটার প্রথম থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত গড়গড় করে মুখস্থ বলতে পারে, বড় বড় জটিল অঙ্কগুলো এক নিমেষে করে দেয়, হাতের লেখায় যে অনেক বয়স্ক লোককেও হার মানায়, যার সম্পর্কে মাস্টারমশায়রা কত আশা পোষণ করেন—কত স্নেহ করেন।

হ্যাঁ, সেদিন খোকনের অন্তরঙ্গ হতে পারাটা ছিল পাঠশালার সেই ছেলেগুলোর কাছে গর্বের বিষয়। শুধু ক্লাসের সেরা ছেলে বলেই নয়, আসলে ওর চেহারায় এমন একটা কোমল মাধুর্য ছিল যা আমাদের নিয়ত কাছে টানত। কিন্তু ওর শামুক-প্রকৃতিই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মিতবাক লাজুক ছেলেটির সঙ্গে কিছুতেই যেন সহজ-অন্তরঙ্গতায় মিশতে পারতুম না।

সেই খোকন যেদিন আমার সঙ্গে যেচে আলাপ করল, সেদিন কি খুশীই না হয়েছিলুম।

তারপর কি করে যেন সেই লাজুক মিতবাক ছেলেটির সঙ্গে আমার হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল। হ্যাঁ, একমাত্র আমারই সঙ্গে। টিফিনের সময় আমরা যা কিনতুম পরস্পরকে না দিয়ে খেতুম না। ও হয়তো বাড়ি থেকে কোনদিন কুলের আচার নিয়ে আসত, আমি নিয়ে যেতাম গাছের জামরুল। তারপর টিফিনের সময় নন্দীদের পুকুরপাড়ে জামগাছের ছায়ায় বসে দুজনে ভাগাভাগি করে খেতাম।

দুপুরে পুকুরের শান্ত জলে গাছের ছায়া কাঁপত। ঘুঘুর করুণ ডাক বাতাসের পরতে পরতে কাঁপন তুলে ছড়িয়ে পড়ত। নীল আকাশে হালকা ডানা মেলে চিল

ওর এই ডাক, এই গায়ে পড়ে আলাপ করার ভঙ্গীটা তখন আমি এড়িয়ে চলতে চেয়েছি। কারণ, ছেলেবেলার সে উচ্ছলতা তখন আর নেই। বয়স এবং শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভেতর মান-অপমান এবং শালীনতাবোধটা জেগেছে। তাই ওকে যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলেছি।

তবু ওর প্রতি মনের কোণে কোথায় যেন একটু সহানুভূতি ছিল। বাইরে নতুন বন্ধু-বান্ধবদের কাছে সম্ভ্রম বজায় রাখার জন্যে ওকে এড়িয়ে চললেও অন্তরে ওর প্রতি সহানুভূতি ছিল। ভাবতুম, ও যাই হোক, ওর জীবনের অর্থকরী দিকটা তো সচ্ছল হয়েছে।

কিন্তু এই সচ্ছলতাও ওকে বেশীদিন ভোগ করতে হল না।

দীর্ঘদিন অদর্শনের পর হঠাৎ একদিন রেলস্টেশনে অদ্ভুত চেহারায় অদ্ভুত বেশবাসে ওকে ঘোরাফেরা করতে দেখে জিজ্ঞেস করলুম, কি ব্যাপার! হঠাৎ আবার এই অবস্থা কেন! ক্যাম্পে আর কাজ করিস না?

না, সে চাকরি গেছে।

কেন, কি হয়েছিল?

প্রথমটায় বলতে ও একটু ইতস্ততঃ করছিল। তারপর সবকিছু একে একে বলল। কি একটা চুরির ব্যাপারে নাকি ওর চাকরি চলে যায়। তিন মাসের জেলও হয়। কিছুদিন আগে জেল থেকে বেরিয়েছে।

ও আমার সঙ্গে যখন কথা বলছিল তখন পেছন থেকে একটা লোক এসে ওর পিঠে একটা চাপড় মেরে বলল, কি রে বেটা, তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস, আর আমি যে চক্কর মেরে তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। চল্ তাড়াতাড়ি।—বলে লোকটা টানতে টানতে ওকে স্টেশনের বাইরে নিয়ে গেল।

ব্যাপারটা দেখে আমি কেমন যেন একটু হকচকিয়ে গেলাম। লোকটাকে আমি বিলক্ষণ চিনি। চিনি অর্থাৎ ওর কার্যকলাপের কথা জানি। লোকটা এ অঞ্চলের কুখ্যাত দাগী। চুরি-ডাকাতির ব্যাপারে বেশ কয়েকবার ধরা পড়েছে। তাই ওর সঙ্গে খোকনের হৃদ্যতা দেখে অবাক হলুম। বেদনা অনুভব করলুম, ওর পরিণতিতে। ছেলেবেলায় দেখে মুগ্ধ হয়ে যাওয়া সেই বুদ্ধিমান মেধাবী মধুর চরিত্রের ছেলেটির চেহারা বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল।

তারপর পথেঘাটে খোকনকে ওই দাগী লোকটার সঙ্গে এবং ওই রকম চরিত্রেরই আরও কয়েকজনের সঙ্গে প্রায় ঘোরাফেরা করতে, বসে আড্ডা দিতে দেখেছি। ক্রমে ওর সম্পর্কে অনেক কিছুই শোনা যেতে লাগল। ইতিমধ্যে দু-চারবার জেল এবং হাজতবাসও হয়ে গেছে, এবং তাইতে পুলিসের সঙ্গে ওর বেশ একটা চেনা-জানার সম্পর্কও গড়ে উঠেছে। অনেকদিন দেখেছি কোনও পুলিসকে নিয়ে কোনও খাবারের দোকানে বা চায়ের দোকানে বসে খাচ্ছে বা তার সঙ্গে মস্করা করছে। তিন-চারটে বছর ওর জীবনটা এইভাবেই কাটল।

এই সব দেখে চোখ দুটো অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। আর অবাক হতাম না। বেদনাবোধটাও মন থেকে উবে গিয়েছিল। পথেঘাটে ওকে পুরোপুরি এড়িয়েই চলতাম।

তারপর দীর্ঘদিন—বোধ হয় বছরখানেক ওকে আর দেখি নি। ভেবেছিলুম, আবার বুঝি ও জেলে গেছে। কিন্তু না, কার মুখে একদিন যেন শুনলুম, ও আর এখানে থাকে না। চুরি-ডাকাতি ছেড়ে দিয়ে কোথায় যেন ছোটখাটো একটা দোকান করেছে। একটি মেয়েকে বিয়েও করেছে। মা আর বউকে নিয়ে বেশ সুখেই ঘর-সংসার করছে।

কথাটা শুনে সেদিন বড় খুশী হয়েছিলুম। তারপর ওর সঙ্গে একদিন হঠাৎ দেখাও হয়ে গিয়েছিল। বারোয়ারি পুজোর মণ্ডপে মুখোমুখি দেখা।

দীর্ঘদিন পরে আমাকে দেখে ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ আমার হাতটা চেপে ধরল। জিজ্ঞেস করল, কি রে, কেমন আছিস?

ভাল। তুই কেমন?

ভিড়ের মধ্যে প্রথমটায় বুঝতে পারি নি। পরে বুঝলুম, মাথায় সামান্য ঘোমটা-টানা যে যুবতী মেয়েটি একটু তফাতে দাঁড়িয়ে লাজুক চোখে আড়ে আড়ে

আমাদের দিকে তাকাচ্ছে সে খোকনেরই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কে—তোর বউ নাকি?

হ্যাঁ।—বলে খোকন একটু হাসল।

বাঃ, বেশ তো মেয়েটি!

হঠাৎ আমার মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে গেল। হাসতে হাসতে বললুম, তা ওকে অত দূরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিস কেন। ডাক না।

খোকন ওর নাম ধরে ডাকল। ওর 'শ্যামা' নামটি এবং খোকনের ডাকটি আমার কাছে যেন বড় ভাল লাগল। মেয়েটিকে মুগ্ধ চোখে দেখতে দেখতে নামটি আমি মনে মনে কয়েকবার উচ্চারণ করলাম।

শ্যামা ধীর পায়ে নম্র নত চোখে কাছে এসে দাঁড়াল।

খোকন বলল, শ্যামা, এ আমার ছেলেবেলার সেই বন্ধু পরমেশ—যার কথা মা তোমায় একদিন বলছিলেন।

শ্যামা তার লাজনম্র চোখ দুটি তুলে আমার দিকে একবার তাকাল। বড় ভাল লাগল ওর চাউনিটুকু। ওর আবেশ-জড়ানো চোখ দুটির দিকে আমি অপলকে তাকিয়ে থেকে বললাম, আমার কথা মাসীমার এখনও মনে আছে! আশ্চর্য তো!

খোকন বলল, আশ্চর্যই বটে। মা সহজে কিছু ভোলেন না। তুই ছেলেবেলায় আমাদের বাড়িতে গিয়ে কি কি করতিস সে-সব কথা তাঁর এখনও বেশ মনে আছে। প্রায়ই তো সে-সব কথা বলেন।

খোকনের মায়ের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় মনটা হঠাৎ যেন কেমন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। আমার মন থেকে তাঁর স্মৃতি তো প্রায় মুছেই গেছে, অথচ তাঁর মনের মণিকোঠায় আমার স্মৃতি তো আজও অক্ষয় হয়ে আছে! আশ্চর্য মায়েদের মন!

ভদ্রমহিলার জন্যে কি জানি কেন মনে একটা বেদনা অনুভব করলুম। অনেকক্ষণ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে চুপ করে থেকে একসময় বললুম, কতদিন মাসীমাকে দেখি নি। কেমন আছেন রে?

ওই এক রকম আছেন আর কি।—খোকন বলল, একদিন আমাদের বাড়িতে চল্ না। তোকে দেখলে মা কত খুশী হবে।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে খোকন আবার বলল, একটা ছুটির দিন দেখে চল্। ওখানেই খাওয়া-দাওয়া করবি।

এতক্ষণ অন্যদিকে ফিরে ছিলুম, জবাব দিতে গিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ল শ্যামাও আমার দিকে সাগ্রহদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। লাজুক মেয়েটির এই নীরবতা অথচ অন্তরের আগ্রহ দেখে আমার মনে হঠাৎ যেন একটা কৌতুকবোধ জেগে উঠল। ওর মুখের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে হাসতে হাসতে খোকনকে বললুম, তা না হয় বুঝলুম, কিন্তু এখন তোর মায়ের খুশী-অখুশী হওয়ার প্রশ্নটাই তো বড় নয়, এখন তোর সংসারে যে নতুন কর্ত্রীটি এসেছেন তাঁর মতামতটাও যে একবার জানা দরকার। তিনি যদি আবার আমার যাওয়াটা উপদ্রব বলে মনে করেন তা হলেই তো মুশকিল।

কথাটায় কাজ হল। আমার কথায় হেসে ফেলে শ্যামা এবার জবাব দিল, ও মা, তাই আবার কেউ ভাবে নাকি! আপনি যাবেন সে তো আমাদের সৌভাগ্য।

সৌভাগ্যটা কার তা এখন কি করে বলি। আপনার হাতের রান্না খাওয়াটাও তো কম সৌভাগ্যের কথা নয়।

শ্যামা এবার লজ্জা পেয়ে হাসতে লাগল। খানিকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে আমি খোকনকে বললুম, চল, হাঁটতে হাঁটতে কথা বলা যাক।

সেদিন হাঁটতে হাঁটতে আরও অনেক কথা হল। সেই কথাবার্তায় জানতে পারলুম, খোকন কাছেই একটা গ্রামে পাঁচ কাঠা জমি কিনে ঘর তুলেছে। গ্রামের হাটতলায় একটা ছোটখাটো দোকান করেছে। তাইতেই কোনওরকমে চলে যায়। সেদিন ওর কথাবার্তায় বুঝতে পারলুম, ওর স্বভাবটা পুরোমাত্রায় শুধরে গেছে।

কিন্তু এমন তো সাধারণতঃ হয় না। বড় অবাক হয়ে গিয়েছিলুম। এমন অভাবনীয় ব্যাপারটা যে কী করে সম্ভব হল তা আমি সেদিন বুঝতে পারি নি।

জেনেছিলুম কয়েকদিন পরে—খোকনদের বাড়ি গিয়ে ওর মায়ের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা শুনে।

হ্যাঁ, খোকনদের বাড়িতে শেষ পর্যন্ত একদিন গিয়েছিলুম। না গিয়ে উপায় ছিল না। খোকনকে উপেক্ষা করা যদি বা সম্ভব ছিল কিন্তু ওই নম্র মিষ্টি স্বভাবের মেয়েটির অনুনয়ভরা চোখ দুটিকে উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। সেদিন বিদায় নেওয়ার আগে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ও বারবার অনুরোধ করেছিল, যাবেন, অতি অবশ্য যাবেন কিন্তু, গেলে খুব খুশী হব।

তাই এক ছুটির দিনে কিছু মিষ্টি হাতে নিয়ে ওদের বাড়িতে গেলুম। খোকন বাড়িতে ছিল না। শ্যামা কোমরে আঁচল জড়িয়ে উঠোন পরিষ্কার করছিল। আমাকে দেখে খুশীতে ওর মুখটা ভরে উঠল। আহ্লাদে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, মা দেখবেন আসুন, কে এসেছে!

কে?—বলে ঘর থেকে যিনি বেরিয়ে এলেন তাঁকে দেখে আমি চমকে উঠলুম। রোগে শোকে অশান্তিতে বার্ধক্যে চেহারার এত পরিবর্তন হয়েছে যে দেখে মোটেই চেনবার উপায় নেই। ওঁরও বুঝি আমার মত অবস্থা। ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে পরে শ্যামার দিকে জিজ্ঞাসুচোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, কে?

শ্যামার চোখেমুখে কৌতুকের ছটা। হাসতে হাসতে বলল, চিনতে পারলেন না তো?—একটু থেমে শ্যামা আবার বলল, উনি আপনার ছেলের বন্ধু—সেই পরমেশবাবু।

ও মা, তাই নাকি!—বলতে বলতে বৃদ্ধার মুখ খুশীতে ভরে উঠল। তিনি এগিয়ে আসার আগেই আমি কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম। আমার পিঠে হাত রেখে তিনি বললেন, বেঁচে থাক বাবা। তা এতদিন পরে তোমার অভাগিনী মাসীমাকে মনে পড়ল।

মাসীমার এই অনুযোগে বড় লজ্জা পেলুম। কোন জবাব দিতে পারলুম না। মাসীমা বললেন, চল, ঘরের ভেতর বসবে চল। কতদিন পরে দেখা বল তো!

আমি বললুম, ঘরে নয়, বাইরেই একটা কিছু পেতে দিন। এইখানে বেশ হাওয়া আছে।

শ্যামা এতক্ষণ উঠোনে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসছিল। এবার সে দ্রুত পায়ে ঘরের ভেতর গিয়ে একটা মাদুর এনে দাওয়ায় বিছিয়ে দিল। আমি তার হাতে মিষ্টির ঠোঙাটা দিয়ে বললুম, এটা রেখে দিন।

মাসীমা বললেন, ও মা, তুমি আবার ওর সঙ্গে 'আপনি আজ্ঞে' করে কথা বলছ কেন। ও তোমার চেয়ে কত ছোট, ওর নাম ধরেই তুমি ডাকবে।

কথাটা শুনে শ্যামা যেতে যেতে চট করে ফিরে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বলল, তা হলে তো আমাকেও একটা সম্পর্ক পাতাতে হয়।

হ্যাঁ নিশ্চয়।—মাসীমা বললেন, তুমি ওকে দাদা বলে ডাকবে।

আমি খানিকক্ষণ অবাকচোখে শ্যামার দিকে তাকিয়ে রইলাম। রাস্তায় যে মেয়েটিকে দেখে অতি লাজুক অতি অসহায় বলে মনে হয়েছিল, দেখলুম নিজের সংসারের গণ্ডীর ভেতর সে রীতিমত তরঙ্গময়ী। এই ছোট্ট সংসারে তারই জীবনের তরঙ্গটা যেন বেশী করে অনুভব করলুম। দেখলুম মাসীমাও শ্যামাকে বড় ভালবাসেন। শ্যামার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। শ্যামা যখন পুকুরে চান করতে গেল তখন মাসীমা আমাকে একে একে অনেক কথাই বললেন, জান পরমেশ, ওই মেয়েটিই আমার সংসারের লক্ষ্মী। ও না থাকলে আমি জীবনের শেষ বয়েসে এই সামান্য সুখটুকুরও মুখ দেখে যেতে পারতাম না। আর খোকনকেও এমনই করে ফিরে পেতাম না।

আমি মাসীমার কথায় সায় দিয়ে বললুম, সত্যিই মেয়েটি খুব ভাল। ওকে আপনি পেলেন কেমন করে?

আমার কথা শুনে মাসীমা একটু হাসলেন। হেসে বললেন, আমি পাই নি বাবা। ওরা নিজেরাই—মানে আর কি, বিয়ের আগেই ওদের ভেতর ভাবসাব হয়েছিল।

তাই নাকি!—মাসীমার কথা শুনে আমি একটু অবাক হলুম। বললুম, বাঃ, বেশ ব্যাপারটা তো!

মাসীমা হাসতে হাসতে বললেন, হ্যাঁ, ওই আজকালকার ছেলেমেয়েদের যা হচ্ছে আর কি।

মাসীমা যা ভাবছিলেন আমার চিন্তা সে খাতে বইছিল না। আমি ভাবছিলুম শ্যামার কথা। আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না যে এ যুগেও কোন মেয়ের প্রেমে পড়ে একটি পুরুষের চরিত্র শুধরে যেতে পারে। অথচ ব্যাপারটা যে ঘটেছে তাতে তো কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই শ্যামার চারিত্রিক মাধুর্যের ওপর আমার মুগ্ধতা আরও বেড়ে গেল।

সেদিন সারাটা দিনই ওদের বাড়িতে থাকলুম। আমার আসার খবরটা শ্যামা কাকে দিয়ে যেন হাটতলায় খোকনের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল। আমি যাওয়ার খানিক পরেই খোকন দোকান বন্ধ করে বাড়িতে এসেছিল। তাই সারাটা দিন খাওয়াদাওয়া হৈ-হল্লা করে বেশ আনন্দেই কাটল। দেখলুম, শ্যামার সঙ্গে খোকনের সম্পর্কটা বড় অদ্ভুত। কথায় কথায় ওদের ভেতর খুনসুটি লেগেই আছে। খোকন নানা কথা বলে শ্যামাকে রাগিয়ে দেয়। কখনও বা পেছন থেকে টেনে ওর খোঁপাটা খুলে দেয়। শ্যামাও কম যায় না। তারও

আছে কপট ক্রোধ, মান অভিমান, ভেংচি কাটা, কখনও বা সুযোগ বুঝে খোকনের পিঠে গুম করে একটা কিল বসিয়ে দিয়ে পালিয়ে যাওয়া।

সারাদিন বসে বসে ওদের এই খুনসুটি দেখতে মন্দ লাগছিল না। মাসীমাকেও ওদের এই ছেলেমানুষী বেশ উপভোগ করতে দেখেছিলুম। তিনি মাঝে মাঝে কৃত্রিম অনুযোগের সুরে বলছিলেন—তোদের এই বাঁদরামী কি কোনদিন বন্ধ হবে না! চিরকাল কি এই রকম ছেলেমানুষী করবি!

মাসীমার কথাবার্তা হাবভাব দেখে বুঝেছিলুম যে ছেলে-বউ নিয়ে তিনি বেশ সুখেই আছেন। তাই সেদিন আমার মনটা যেন কেমন একটা তৃপ্তিতে ভরে উঠেছিল—সেই সাজানোগুছনো ছোট্ট সংসারটায় কটি আনন্দ-উচ্ছল প্রাণ দেখে।

কিন্তু কে জানতো যে সেই সংসারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মেয়াদ এত অল্প!

তারপর বোধ হয় চার পাঁচটা মাসও কাটে নি। একদিন হঠাৎ খবরের কাগজের এক কোণে ছোট্ট একটা খবর দেখে চমকে উঠেছিলুম। একজন কনস্টেবলকে নৃশংসভাবে হত্যা করে খোকন ধরা পড়েছে।

খবরটা দেখে প্রথমে কেমন যেন একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলুম। ছাপার অক্ষরে বারবার নামধাম দেখেও ব্যাপারটা যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলুম না। এ কী করে সম্ভব হল এবং কেনই বা খোকন আবার এমন একটা কাজ করতে গেল!

খবরটা কেমন যেন হেঁয়ালির মত মনে হয়েছিল। বারবার সমস্তটা পড়েও ভেতরের রহস্যটা ধরতে পারি নি। আর সঠিক ব্যাপারটা যে খোঁজখবর নিয়ে জানব তারও উপায় ছিল না। দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে তখন আমি হাসপাতালে পড়ে ছিলুম। হাসপাতালে যে সব বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনরা যেত তাদের মুখেও প্রকৃত ব্যাপারটা জানতে পারি নি।

জেনেছিলুম অনেকদিন পরে—একজন কুখ্যাত লোকের মুখে।

লোকটা এককালে খোকনের সঙ্গে খুব মেলামেশা করত। তাই ওর মুখেই প্রকৃত ব্যাপারটা জানতে পারব আশা করে ওকে ডেকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলুম। ও কপাল চাপড়ে দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিল—সবই নসীবের ফের বাবু। না হলে এমন হবে কেন। বিয়ে শাদি করে খোকন তো এইসব খারাপ কাজ ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর আমরা কত বলেছি, কিন্তু ও কখনও রাজী হয় নি। ওই মেয়েটার চোখের জাদুতেই ও এমন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নসীবের ফের, তাই ভাল হয়েও এমন হাল হয়ে গেল।

খোকনের জন্যে খানিকক্ষণ এমনি হা-হুতাশ করে লোকটা তারপর সব কথা একে একে জানিয়েছিল। জানিয়েছিল, ওরা, যারা এইসব চুরি-ডাকাতি করে তাদের অনেকের সঙ্গে পুলিসের একটা মাসিক বরাদ্দ থাকে। খোকন যখন এইসব কাজ করত তখন নিয়মিত এই বরাদ্দের টাকা পুলিসকে দিয়ে যেত। তারপর বিয়ে করে এই সব বৃত্তি যখন ছেড়ে দিয়েছিল তখনও পুলিস তার কাছে যেত। তাকে রেহাই দেওয়ার জন্যে সে অনেক অনুনয়-বিনয় করেছে কিন্তু পুলিস সে কথায় কান দেয় নি। ওর কাছে প্রতি মাসেই কিছু না কিছু আদায় করে নিয়ে গেছে। এইভাবে কয়েক মাস পুলিসের জুলুমের সঙ্গে যুঝতে গিয়ে ও রীতিমত বিরক্ত হয়ে পড়েছিল। তারপর একদিন এই দেনা-পাওনা নিয়ে পুলিসের সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে রাগের মাথায় ডাব-কাটা ধারাল দা-টা পুলিসের পেটে বসিয়ে দেয়।

এই হল আসল ব্যাপার। কিন্তু হাসপাতালে বিছানায় পড়ে থেকে এত খবর জানতে পারি নি। খুন করেছে—শুধু এই খবরটাই কাগজে বেরিয়েছিল। পরে মাঝে মাঝে কাগজে আইন-আদালতের কলমে মামলার খবরটা বেরুত। বড় উদ্বেগ নিয়ে সে খবর পড়তুম।

তারপর একদিন কাগজেই ওর প্রাণদণ্ডাদেশের খবরটা বেরুল। খবরটা পড়ে আমি কয়েকটা দিন ভালভাবে আহার নিদ্রা করতে পারি নি। অহরহ মাসীমা আর শ্যামার কথা মনে পড়েছে। তাদের মনের অবস্থাটা উপলব্ধি করে যন্ত্রণাকাতর মন নিয়ে ছটফট করেছি।

পরে সেই দাগী লোকটার মুখে শুনেছিলুম, মামলায় খোকনকে বাঁচাতে মাসীমা এবং শ্যামা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল, এবং সব চেষ্টায় বিফল হয়ে শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের উচ্চতম মহলে তারা বড় করুণ আকুতি জানিয়ে প্রাণভিক্ষা চেয়েছিল, কিন্তু বুড়ী মা এবং অসহায়া মেয়েটির সে ভিক্ষাও মঞ্জুর হয় নি। খোকনের ফাঁসী হয়ে যায়।

লোকটার মুখে শুনেছিলুম, এর পর শোকে দুঃখে মাসীমা এবং শ্যামা একেবারে ভেঙে পড়েছিল। মাসীমা শয্যা নিয়েছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে এত বড় শোকের ধাক্কাটা তিনি সামলাতে পারেন নি। তিন-চার মাস ভুগে মারা যান।

শ্যামার তখন বড় দুঃসহ অবস্থা। শোকে-তাপে অভাব-অনটনে সে যেন একেবারে ভেঙে পড়েছিল। সংসারে যে সর্বক্ষণ হাসিখুশী আর উচ্ছলতা নিয়ে মেতে

থাকত সে যেন একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছিল। কারুর সঙ্গে ভালভাবে কথা বলতে পারত না।

ইতিমধ্যে ওর আবার একটা ছেলে হয়েছিল। তার জন্যেও ভাবনা। ভাবনা—কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। সংসারে কোথাও ওর মাথা গুঁজে থাকার মত ঠাঁই ছিল না। ছেলেবেলায় মা-বাপ হারিয়ে মাতাল এক মামার সংসারে অনেক দুঃখেকষ্টে লাঞ্ছনায়-গঞ্জনায় মানুষ হয়েছিল, সেখানে ফিরে যেতে তার একেবারেই ইচ্ছে ছিল না।

তবে কোথায় যে শেষ পর্যন্ত গেল তাও কেউ জানত না। বাড়িটা বেচে যা অল্প টাকা পেয়েছিল তাতে ধার-দেনা মিটিয়ে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে একদিন পথে বেরিয়ে পড়েছিল। তারপর আর কেউ ওর খবর রাখত না।

তারপর দীর্ঘকাল পরে হঠাৎ একদিন অদ্ভুতভাবে শ্যামার দেখা পেয়েছিলুম। দেখে চমকে উঠেছিলুম।

একটা দেশী কোম্পানির ওষুধ প্রচারের কাজে আমাকে নানান জায়গায় ঘুরতে হয়। বছর দুই আগে এই কাজে সেদিন রানাঘাটে গিয়েছিলুম। সেখানে একটা বড় ডাক্তারখানায় বসে ডাক্তারের সঙ্গে যখন আলাপ করছিলুম ঠিক সেই সময় কতকগুলো লোক ধরাধরি করে একটা আট-ন বছরের ছেলেকে এনে ডাক্তারখানার বেঞ্চটায় শুইয়ে দিয়ে বলল, ডাক্তারবাবু, একে একটু দেখুন।

ডাক্তার শশব্যস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন, কি ব্যাপার—জ্ঞান হারাল কি করে?

মার খেয়ে।—লোকগুলো বলল।

ডাক্তারবাবু বিস্মিত গলায় বললেন, সে কি! এইটুকু ছেলেকে কে এমন মারল!

ডাক্তারবাবুর প্রশ্নে লোকগুলো যা বলল তার সারমর্ম এই—ছেলেটা একটা চায়ের দোকানে কাজ করে। ভোর পাঁচটায় এসে বেলা দুটোয় খেতে যাওয়ার ছুটি পায়। ওইটুকু ছেলে অতখানি বেলা পর্যন্ত না খেয়ে থাকতে পারে না। তাই বুঝি খিদের জ্বালায় দোকানের বয়াম থেকে লুকিয়ে একটা কেক তুলে নিয়ে খেয়েছিল। দোকানের মালিক পরে কি করে যেন তা টের পেয়ে ওকে ধরে মার দেয়। মালিকের হাতের দুটো চড়েই ছেলেটা অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। তাইতে মালিক ভাবে, ছেলেটা বুঝি ভান করে পড়ে আছে। এই ভেবে সে ছেলেটার চাতুরি পরীক্ষা করার জন্যে কোত্থেকে কিছু বিছুটি পাতা এনে ওর সারা গায়ে ঘষে দেয়।

সমস্ত ব্যাপারটা শুনে ডাক্তারবাবু বললেন, তা সেই কসাই বেটাকে তোমরা কি করলে?

কি আর করব বাবু, সে বেটা লোকজন জমতে দেখেই পালিয়েছে।

ডাক্তারবাবু লোকগুলোকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে ছেলেটার জ্ঞান ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছিলেন। ডাক্তারের সঙ্গে আমার কাজ মিটে গিয়েছিল। অ্যাটাচিটা গুছিয়ে আমি উঠব উঠব করছিলুম, ঠিক সেই সময় ভিড় ঠেলে ছেঁড়া ময়লা বেশবাসে রুগ্ন ম্লান চেহারার যে মেয়েটি উদ্‌ভ্রান্তের মত কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ঢুকেছিল—তাকে দেখে আমি চমকে উঠেছিলুম।

শ্যামা!

চিনতে এতটুকু কষ্ট হয় নি। তবু যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলুম না। ওর চেহারা এবং বেশবাসের দিকে তাকিয়ে চোখ দুটো কেমন যেন থমকে গিয়েছিল। বুকটা বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠছিল। হাসিখুশী আনন্দ উচ্ছলতায় ভরা অতীতের সেই শ্যামাকে ওই অবস্থায় দেখে সহ্য করতে পারছিলুম না। অথচ ওকে দেখে কেমন যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত হয়ে পড়েছিলুম। কী করা উচিত ভেবে ঠিক করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত নিজের অ্যাটাচিটা তুলে নিয়ে সেখান থেকে চলে এসেছি।

ভাগ্য ভাল যে শ্যামা আমায় দেখে নি। কাউকে লক্ষ্য করার মত তখন ওর মনের অবস্থা ছিল না।

পরে এই পলায়নী মনোবৃত্তির জন্য নিজেকে অনেকদিন ধিক্কার দিয়েছি। আবার অনেক সময় ভেবেছি—আমার কী এমন সামর্থ্য আছে যা দিয়ে আমি শ্যামার দুঃখ দৈন্য দূর করতে পারি। বরঞ্চ এই ভাল করেছি। ওর সঙ্গে সেদিন কথাবার্তা হলে ওকে এড়িয়ে চলা খুব মুশকিল হত।

শ্যামার সঙ্গে সেই দেখা হওয়ার পর কয়েকটা দিন মনটা এমনই টানাপোড়েনে কেটেছিল। তারপর সংসারের সুখদুঃখের তরঙ্গে শ্যামার স্মৃতিটা মন থেকে প্রায় মুছেই গিয়েছিল। মুছে গিয়েছিল আরও অনেক স্মৃতি।

আজ সেই শৈশবে পড়া বইটি ঘাঁটতে ঘাঁটতে এবং বইয়ের ভেতর খোকনের দেওয়া সেই জলছবিটা আর তার হাতের লেখাটা দেখতে দেখতে খোকনের কথা এবং তার সঙ্গে আরও অনেকের কথা মনে পড়ে গেল।

কাগজওয়ালার সমস্ত বই ওজন করা হয়ে গিয়েছিল। আমার হাতের বইটা দেখে বড়দা বলল, ওটা আবার রেখে দিলি কেন? দিয়ে দে। জঞ্জাল সব সাফ করে দে।

না, থাক্ এটা।—বলে বইটার ধুলো ঝেড়ে আমি সযত্নে রেখে দিলাম।

শিল্পসৃষ্টির মনস্তত্ত্ব

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রকর রঙের তুলির আঁচড় কেটে ছবি আঁকেন, পটুয়া বিভিন্ন রঙের ও ঢঙের মাটির পুতুল গড়েন, ভাস্কর কাঠ, পাথর বা ধাতু খোদাই করে মূর্তি নির্মাণ করেন। কবি ও সাহিত্যিক কথার বুননে কাব্য ও সাহিত্য সৃষ্টি করেন। আমরা বলি, এঁরা শিল্পী, এঁরা বিশেষ সম্মানীয়, কারণ, এঁরা স্রষ্টা। আমরা ইতরজন শিল্পীদের সম্মান করি, কারণ, আমরা নিজেরা সৃষ্টি করতে পারি না অথচ ওঁদের সৃষ্টিতে প্রচুর আনন্দ পাই। শিল্পী তাঁর শিল্পের মাধ্যমে আমাদের আনন্দ পরিবেশন করেন—আমরা কৃতজ্ঞতায় তাই শিল্পীকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাই। এই সম্মান ও শ্রদ্ধার পিছনে কিছু বিস্ময়বোধও থাকে। কারণ, শিল্পী কথার বুননে, তুলির আঁচড়ে, বাটালির আঘাতে অপরূপ শিল্পকলার সৃষ্টি করেন কি করে! আমরা তো পারি না! কাজেই শিল্পীর এই রহস্যময় ক্ষমতা সম্বন্ধে সাধারণ লোকের এক বিস্ময়বোধ জাগে, এবং শিল্পসৃষ্টির এই দুর্জ্ঞেয় রহস্যও শিল্পীকে আমাদের কাছে আরও বরেণ্য ও শ্রদ্ধেয় করে তোলে।

শিল্পসৃষ্টিকে আমরা সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপকরণরূপে গণ্য করে থাকি। সভ্যতার অগ্রগতি মানুষের মনে শিল্পরুচি ও শিল্পসমাদর প্রবৃত্তিকে যেমন তীক্ষ্ণ করে, নানারূপ শিল্পসৃষ্টির স্পৃহাকেও তেমনি সজাগ করে। তাই সভ্যতার পথে যতই একটি-দুটি করে পা ফেলেছি, ততই দেখি নব নব শিল্পসৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু যদিও সভ্যতা ও সংস্কৃতি শিল্পসৃষ্টির সহায়ক তবু এ কথা ঠিক নয় যে, সভ্যতার আলো নতুন করে মনে শিল্পসৃষ্টির স্পৃহা তৈরি করে। আসলে এই স্পৃহা মনে সহজভাবেই থাকে এবং সভ্যতা সেই স্পৃহাকে নতুন পথে চালিত করতে সহায়ক হতে পারে। শিল্পসৃষ্টি করি কেন? শিল্পসৃষ্টির আনন্দে। শিল্পীর প্রাণে প্রেরণা জাগে এবং সেই প্রেরণার তাগিদেই শিল্পসৃষ্টি হয়ে থাকে। শিল্পকে বুঝতে গেলে তাই শিল্পসৃষ্টির পেছনের প্রেরণা ও সেই সৃষ্টির আনন্দবোধের স্বরূপকে বোঝা দরকার।

প্রেরণা বা 'inspiration' একটি মানসিক ব্যাপার। তাই প্রেরণাকে বুঝতে হলে আমাদের শিল্পীমানসকেই বুঝতে হয়। কিন্তু শিল্পী আর দশজন মানুষের মতই মানুষ। তাই অন্য মানুষের মনের গঠন যেরূপ, শিল্পীর মনের গঠনও অনেকাংশে তেমনই হবে। তবু, যেহেতু শিল্পীই শিল্পসৃষ্টি করতে পারেন এবং আর দশজনে তা পারেন না, তাই আর দশজনের মনের গঠনের সঙ্গে শিল্পীমনের গঠনের সাধারণ সমতা থাকলেও তার বিশেষত্ব কিছু থাকবেই। তাই শিল্পীমানসকে বুঝতে গেলে মনের সাধারণ গঠন ও শিল্পীর মনের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের স্বরূপটুকু জানতে হয়।

জীববিজ্ঞানীদের মতে দেহের দিক থেকে মানুষ উভলৈঙ্গিক। স্ত্রীদেহে পুরুষচিহ্ন বর্তমান, আবার পুরুষ-দেহেও স্ত্রীচিহ্নের উপস্থিতি আছে। দেহের দিক থেকে মানুষ যেমন উভলৈঙ্গিক, আধুনিক মনোবিজ্ঞানের অনুসন্ধানের ফলে মানুষের মনেও অনুরূপ স্ত্রী ও পুরুষ-প্রবৃত্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। মনের দিক থেকেও তাই প্রতি মানুষই উভকামী (Bisexual)। প্রতি পুরুষের মধ্যে এক অজ্ঞাত নারী রয়েছে, আর প্রতি নারীর মধ্যেও এক অজ্ঞাত পুরুষ রয়েছে। এই দুই সত্তার সংমিশ্রণে প্রাতিটি মানবমন গঠিত। দুই সত্তার সংমিশ্রণ যেখানে সুষ্ঠু হয় সেখানেই মনের সুস্থতা ও স্বাভাবিকতা দেখা যায়। তেমনি এই দুই বৃত্তির মধ্যে অসামঞ্জস্য দেখা দিলে ব্যক্তিত্বের সুস্থতা ও সুস্থিতি বিঘ্নিত হয়ে থাকে।

প্রতি মানুষের মধ্যেই যখন নারী ও পুরুষ—এই দুই সত্তা বর্তমান, তখন প্রতি মানুষের মধ্যে পুরুষ ও নারীর চাহিদা অর্থাৎ তাদের কামনা-বাসনাগুলি থাকা উচিত। আছেও তাই। পুরুষের মধ্যে নারীর কামনা-বাসনা

আছে, আবার নারীর মধ্যেও পুরুষের কামনা-বাসনা আছে। হয়তো কারও কাছে বিপরীত চাহিদাটি ধরা পড়ে, আবার কারও কাছে ধরা পড়ে না। সেটি নিজ্ঞ্যানেই থেকে যায়। পুরুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি—নারীকে সক্রিয়ভাবে ভোগ করা, তাকে আদর করা, সন্তান দেওয়া, তার সৌন্দর্যের তারিফ করা ইত্যাদি। নারীর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি—ভোগ পাওয়া, সন্তান পাওয়া, প্রসব করা ও লালন-পালন করা, পুরুষের কাছে নিজের সৌন্দর্য বিলসন ও তার স্তুতি পাওয়া ইত্যাদি। প্রশ্ন উঠবে, পুরুষের মধ্যেও যদি নারীবৃত্তি থাকে তা হলে তো পুরুষের নারীর ওই চাহিদাগুলির তৃপ্তি খোঁজা উচিত, কিন্তু তা তো পুরুষ খোঁজে না? মনোবিজ্ঞানের মতে কিন্তু পুরুষ নারীর চাহিদা মেটাতে চায় না বা নারী পুরুষের ইচ্ছা মেটাতে চায় না—এর কোনওটাই ঠিক নয়। বরং উভয়েই উভয়েরটা খোঁজে এবং তৃপ্তি পেয়ে থাকে। কিন্তু এই তৃপ্তি পাওয়ার একটা বিশেষ পদ্ধতি আছে, তার নাম 'identification' বা একাত্মতা। ওই নারীটি দেহবিলসনের দ্বারা কেমন আত্মপ্রসাদ ভোগ করছে, দৈহিক মিলনে কেমন সুখ পাচ্ছে বা সন্তান পেয়ে কেমন খুশী হচ্ছে—এগুলি পুরুষ নিজের গোচরে বা অগোচরে যখন-তখন কল্পনা (Phantasy) করে ওই নারীটির সুখের কল্পনার মাধ্যমে নিজের নারী-প্রবৃত্তিরই তৃপ্তি পেয়ে থাকে। ওই নারীটি কেমন সুখ পাচ্ছে তা পুরুষ বুঝবে কি করে যদি তার মধ্যেও নারীর সুখানুভূতির ক্ষমতা না থাকে? কাজেই নারীর সুখ বা পুলকবোধের কল্পনা যখন পুরুষ করে থাকে তখন সে সাময়িকভাবে ওই নারীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে নারীই হয়ে যায় এবং তার ভোগটা মিটিয়ে নেয়। নারীর পুরুষমনের চাহিদাও ঠিক এমনি করেই মিটে থাকে। পুরুষ অবস্থাবিশেষে কেমন সুখ পাচ্ছে নারী তা সহজভাবেই কল্পনা করে। নারী যখনই কল্পনা করল যে পুরুষ এমনি চাচ্ছে বা পাচ্ছে, তখনই নারী মানসিকভাবে পুরুষ হয়ে যাচ্ছে এবং তার নিজের পুরুষ-চাহিদা মিটিয়ে নিচ্ছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে আইডেন্টিফিকেশনের সাহায্যে মানুষ তার বিপরীত ইচ্ছাগুলি তৃপ্ত করছে। এবং এই তৃপ্তির জন্যেই মানুষের চিত্তসাম্য বজায় থাকছে। যেখানে এই একাত্ম হওয়ার ক্ষমতা ব্যাহত হয় সেখানে মানসিক বিপর্যয় দেখা দেয়।

মনের এই যে দ্বৈত প্রকৃতি, একেই শিল্পসৃষ্টির মূল ভিত্তি বলা যেতে পারে। আসলে মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে শিল্পীর শিল্পসৃষ্টি এবং নারীর সন্তানলাভ—একই প্রবৃত্তির দ্বিবিধ প্রকাশ। শিল্পী তাঁর শিল্পকে সৃষ্টি করে যে আনন্দ পান, সে আনন্দ নারীর সন্তানলাভের আনন্দেরই শোধিত রূপ। ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের মতে শিল্পসৃষ্টির ব্যাপারটা, অর্থাৎ আর্ট প্রোডাকসনের কাজটুকু মানসিকভাবে চাইল্ড ডেলিভারি ব্যাপারেরই একটা রকমফের। যে প্রেরণা বা বৃত্তি থেকে নারী সন্তান চায়, শিল্পীও সেই প্রবৃত্তির চাহিদাতেই শিল্পসৃষ্টি করে থাকে। কাজেই শিল্পসৃষ্টির ব্যাপারে শিল্পী বাস্তবে পুরুষদেহধারী হলেও, মানসিকভাবে নারীরূপই পরিগ্রহ করেন। শিল্পীর কাজকে শিল্প'সৃষ্টি' বলা হয়। শিল্প'তৈরী', 'আবিষ্কার' বা অন্য কিছু না বলে এখানে 'সৃষ্টি' কথাটির প্রয়োগ বিশেষ অর্থপূর্ণ। ইংরেজীতেও তেমনি এ ব্যাপারকে বলা হয় আর্ট ক্রিয়েশন, এবং উচ্চস্তরের শিল্পকে বলা হয় ক্রিয়েটিভ আর্ট। এখানেও ক্রিয়েশন বা 'সৃষ্টি' কথারই প্রয়োগ এবং যথার্থ শিল্প হতে হলে তাকে ক্রিয়েটিভ হতে হবে।. লক্ষণীয় যে এ প্রসঙ্গে 'Made', 'Discovered' 'Constructed' বা অন্য কোন কথা ব্যবহার করা হয় নি। কারণ, 'Made' বা ওই জাতীয় অন্য কথা শিল্প-সৃষ্টির ব্যাপারে প্রয়োগ করলে প্রয়োগকার বা পাঠক কারও মনই তৃপ্ত হত না বা হবে না। এরও কারণ, 'Made' বা ওই জাতীয় অন্য শব্দ শিল্পের স্বরূপের অন্তর্নিহিত অর্থ টুকু অভিব্যক্ত করে না। যেহেতু শিল্পসৃষ্টি মনের নারীবৃত্তি তথা সন্তান প্রসবের সঙ্গে জড়িত, তাই সন্তান যেমন 'সৃষ্ট' হয়—এক দেহমধ্যে রূপায়িত ও পুষ্ট হয়ে নিজ সত্তা নিয়ে নতুনভাবে মাতৃজঠর থেকে আবির্ভূত হয়—তেমনি শিল্পীর শিল্পরূপায়ণের ব্যাপারের সঙ্গেও এই গর্ভধারণ ও প্রসবের অনুষঙ্গ (association) মনে জড়িত

থাকার দরুনই এ প্রসঙ্গে 'সৃষ্টি' বা 'creation' কথা ব্যবহার করে আমরা যে তৃপ্তি পাই, এবং মনে করি যে এই কথাটিই ব্যাপারটিকে যথাযথভাবে প্রকাশ করল, তা অন্য কথায় হতে পারে না। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথও অনুরূপ মত পোষণ করেন। 'সাহিত্যের সামগ্রী' আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন: "যাহা আমাদের হৃদয়ের দ্বারা সৃষ্ট না হইয়া উঠিলে অন্য হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না, তাহাই সাহিত্যের সামগ্রী।... তাহা মানুষের একান্ত আপনার—তাহা আবিষ্কার নহে, অনুকরণ নহে, তাহা সৃষ্টি।"

আপনার ভিতর থেকে এক নতুনকে অস্তিত্ব দেওয়া—সৃষ্টির এই যে কাজ, জীবজগতে এ কাজ নারীই সম্পন্ন করে। জীবকোষকে আপন অভ্যন্তরে আশ্রয় দিয়ে, আপন দেহ থেকে তাকে পুষ্টি দিয়ে, নতুন রূপে তাকে যে প্রকাশ করা—এ তো নারীরই কাজ। নারী তাই জীবজগতে স্রষ্টৃ। মনোরাজ্যেও তেমনি সমস্ত সৃষ্টি-ব্যাপারে মনের মধ্যে যে নারী রয়েছে—সেই নারীই সমস্ত মানস-সৃষ্টির ব্যাপার সম্পন্ন করছে, শিল্প তাই শিল্পীর নারীসত্তার সন্তান-প্রসব। শিল্পীর নারীসত্তা শিল্পসৃষ্টি করে তার নারী প্রবৃত্তিকেই চরিতার্থ করে। সুপ্রসিদ্ধা মনঃসমীক্ষিকা শ্রীমতী জোয়ান রিভিয়েরা মনের গঠন-কৌশল সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "Men's desire for female functions comes openly to expressions in painters and writers, who feel they give birth to their works like a woman in labour after long pregnancy. All artists, in whatever medium, in fact, work largely through the feminine side of their personalities; this is because work of art are essentially formed and created inside the mind of the maker, and are hardly at all dependent on external circumstances. In contrast, the practical man working in a practical world on matters external, more independent of his own imaginings, is typically expressing a more masculine function." (Love, Hate and Reparation, পৃ. ৩২)

উপযুক্ত শক্তি নিয়ে কোনও ভাব শিল্পীমনে উদিত হলে যতক্ষণ না সেই ভাবকে রূপ দিতে পারছেন, শিল্পী ততক্ষণ অস্বস্তি বোধ করেন। ভাবটি শিল্পীমনে গুমরাতে থাকে, দানা বাঁধতে থাকে, এবং মনে যতক্ষণ তার অবস্থিতি ততক্ষণ শিল্পীর একটি অতৃপ্তি অস্বস্তি ও অস্থিরতা। কিন্তু যে মুহূর্তেই ভাব রূপপরিগ্রহ করে প্রকাশ পায় তখনই শিল্পীর মনে আনন্দবোধ জাগে এবং তিনি নিজেকে সার্থক ভাবেন। শিল্পের দিকে তাকিয়ে তাঁর মমতায় মন ভরে যায়। এই অবস্থাগুলির সঙ্গে নারীর গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসবের অবস্থাগুলির বিশেষ মিল আছে। শিশু যখন নারীর দেহমধ্যে ভ্রূণরূপে অবস্থান করে, তখন একটা শারীরিক অস্বস্তিবোধ অনেক সময় দেখা যায়। কিন্তু সন্তান প্রাপ্তির আশায় এ কষ্ট নারী নীরবে সহ্য করে। যখন প্রসব করে সন্তানের দিকে তাকায় নারীর তখন সন্তানপ্রীতি ও মমতায় মন ভরে ওঠে। নারী সন্তানকে জন্ম দিতে পেরে নিজেকে সার্থক ভেবে আনন্দ পায়। তাই শিল্পকার্য ও সন্তান প্রসবের মধ্যে যে অনেকাংশে মানসিক মিল আছে তা সুস্পষ্ট বোঝা যায়।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের এই মতবাদের সমর্থন শিল্প-সম্পর্কিত নানা ব্যাপারে পাওয়া যায়। সাহিত্যের প্রাণ হল রস। প্রাচীন আলঙ্কারিক অভিনবগুপ্তের মতে রসানুভূতি 'সন্তানবৃত্তি'বিশিষ্ট। অর্থাৎ রসের ধর্মই হল বিস্তার লাভ। ভাব যখন ব্যক্তিকেন্দ্রচ্যুত হয়ে বহুর মধ্যে সঞ্চারিত হয় এবং সাধারণীভূত হয়, তখন এক রসসত্তার আবির্ভাব হয়—তাই হল শিল্প বা সাহিত্য। শিল্পী তাই শিল্পকর্মের মাধ্যমে আপন গণ্ডী ডিঙিয়ে অপর হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করেন এবং সেখানে আপন সত্তার নতুনতর সার্থকতা লাভ করেন। শিল্পের মাধ্যমে শিল্পী তাঁর ব্যাপকতর প্রতিষ্ঠা পান।

সন্তানসৃষ্টির মাধ্যমেও মানুষ ওই একই সার্থকতা লাভ করে। সন্তানের মধ্যেও সে নিজের সত্তার নতুনতর ও ব্যাপকতর স্থিতি লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়: "পুত্র আমার অভাব দূর করে—তার মানে, আমি পুত্রের

মধ্যে আমাকে আরও পাই। তাহার মধ্যে আমি যেন আমিতর হইয়া উঠি। এইজন্য সে আমার আত্মীয়; আমার আত্মাকে আমার বাহিরেও সে সত্য করিয়া তুলিয়াছে।" (সাহিত্য, পৃ. ২৬)

কাজেই দেখা যায় যে শিল্পকর্মের সঙ্গে সন্তানের এ বিষয়ে বিশেষ মিল আছে। শিল্পরসের মাধ্যমে শিল্পী আপন ভাবকে সাধারণের মধ্যে বিস্তারিত করে আপন আত্মার ব্যাপকতর স্থিতি পান। পুত্র জন্ম দিয়েও মানুষ তেমনি পুত্রের মাধ্যমে আপনাকে 'আমার' বাহিরেও সত্য করে তোলে। অতএব বলা যেতে পারে যে শিল্পসৃষ্টি ও সন্তান লাভের মধ্যে একটি গভীর সমতা থাকার দরুনই প্রাচীন আলঙ্কারিকের পক্ষে রস সম্পর্কে 'সন্তানবৃত্তি' কথাটি ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে। তিনি হয়তো এ কথা ব্যবহারের অন্তর্নিহিত মনস্তাত্ত্বিক কারণটি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না—কারণ, কারণটি গভীর অবচেতন মনে অবস্থিত। তবু সেই গভীর সত্যটি তাঁর অজ্ঞাতেই স্ব-প্রকাশিত হয়ে উঠেছে। সাহিত্য-শিল্পের প্রকৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে তাই অভিনবগুপ্তের 'সন্তানবৃত্তি' কথাটির ব্যবহার অর্থহীন বা অ্যাক্সিডেণ্টাল নয়। এটি গভীর বৈজ্ঞানিক সত্যের সমর্থক।

মনের চাহিদার দিক থেকে শিল্প এবং সন্তান যে সমগোত্রীয় তা আরও স্পষ্ট হবে শিল্পীর শিল্পের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় থেকে। সাহিত্যে সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "…সেক্সপীয়রের অনেকগুলি সাহিত্য-সন্তানের এক একটি ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হয়েছে বলে যে তাদের মধ্যে সেক্সপীয়রের আত্মপ্রকৃতির কোন অংশ নেই তা আমি স্বীকার করতে পারিনে।" (সাহিত্যের পথে, পৃঃ ১৬৩)

এখানে সাহিত্যের প্রতি কবির দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষণীয়। কবির দৃষ্টিতে সাহিত্য সন্তানতুল্য। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গী, যা ভাষাতে প্রকাশ পেয়েছে—তা অন্তরের সত্য। ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের মতে কোনও কথারই ব্যবহার অ্যাক্সিডেণ্টাল নয়। প্রতিটি কথা বিশেষ অনুভূতি পর্যায় (feeling tone) থেকে ভেসে আসে এবং তা ব্যক্তির অন্তরের অনুভূতিরই পরিচয় দেয়। এই বৈজ্ঞানিক সত্যকে অনুসরণ করে তা হলে সহজেই বলা যেতে পারে যে 'সাহিত্য-সন্তান' কথাটি ব্যবহারের মধ্যে সাহিত্য সন্তানের সমগোত্রীয়—কবির এই অনুভূতিই প্রকাশ পেয়েছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, পুরুষের নারীবৃত্তি না হয় শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমে তৃপ্ত হল, কিন্তু নারী তো সোজাসুজিই সন্তান প্রসব করে তার চাহিদা মেটাচ্ছে, তবু নারী আবার শিল্পসৃষ্টি করে কেন? তার কারণ, বাসনা অপরিমেয়। বাসনা পূর্ণ হলে তা কখনও নিঃশেষ হয়ে যায় না। যেটুকু মিটল তার জন্যে মন ক্ষণিক তৃপ্ত হল, কিন্তু আবার সে বাসনা দেখা দেয় এবং আবার তার তৃপ্তির প্রয়োজন হয়। কিন্তু সমস্ত বাসনাটুকুর তৃপ্তি সহজ ও স্বাভাবিক পথে সম্ভব হয় না, তাই নারী যদিও বাস্তবে সন্তান প্রসব করে তার বাসনা চরিতার্থ করে, তবু তার সন্তান প্রসবের চাহিদা সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায় না। এই ইচ্ছার অনেকটাই অতৃপ্ত থেকে যায়, সেই অতৃপ্ত ইচ্ছাই নারীর মধ্যে উদ্গতি (sublimation) লাভ করে শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমে আবার তৃপ্ত হতে পারে। শিল্পের জন্ম এই অতিরিক্ততায়—শিল্প আমাদের 'উপরি পাওনা'। রবীন্দ্রনাথের কথায় শিল্পের উৎস হল—the surplus in man। তাই নারীর শিল্পী হওয়ার কোনও অসঙ্গতি নেই।

এ ছাড়া আরও প্রশ্ন উঠতে পারে, সকল মানুষের মধ্যেই তো নারীত্ব রয়েছে এবং তা তৃপ্তি চাইছে। আর শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমেই যদি নারীপ্রবৃত্তির তৃপ্তি হয় তা হলে সকলেই শিল্পী হয় না কেন? এখানে শিল্পীমনের যে বিশেষত্ব সেই বিশেষত্বের ব্যাখ্যা প্রয়োজন। শিল্পের উৎস অতৃপ্ত বাসনা—এ কথা ঠিক। কিন্তু বাসনার তৃপ্তি নানাভাবেই হতে পারে—যেমন প্রকাশ্য সহজ পথে, অসামাজিক ক্রিয়াকলাপে, মানসিক রোগের (neurosis) মাধ্যমে অথবা শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমে। মনের চাহিদা যেখানে সহজ প্রকাশ পায় না সেখানে চাহিদা পূরণের জন্য মানুষ অনেক অসামাজিক ও অন্যায় কাজ করে তার ইচ্ছার তৃপ্তিসাধন করে। যেমন আক্রম-ইচ্ছা

(aggressiveness) যদি প্রবল হয়, তা হলে ব্যক্তি হত্যা পর্যন্ত করেও সেই ইচ্ছা মেটাতে পারে। তখন সে ক্রিমিন্যাল ও অসামাজিক। আবার মনের এই আক্রম-ইচ্ছা প্রবল অথচ তা প্রকাশে মানসিক বাধাও প্রবল—এমনি ইচ্ছার দ্বন্দ্ব বাধলে সেখানে মানসিক রোগের সৃষ্টি হয় এবং এই রোগের লক্ষণের (symptoms) মাধ্যমে রোগী নিজের অজ্ঞাতে তার ইচ্ছা পূরণ করে থাকে। এরূপ রোগী আক্রম-ইচ্ছাকে বাইরের বস্তুর উপর প্রয়োগ করতে না পেরে নিজের উপরেই প্রয়োগ করে এবং ফলে নানা শারীরিক ও মানসিক পীড়ন ভোগ করে।

আবার অতৃপ্ত ইচ্ছা যেখানে সমাজবিরোধী কাজ না করে বা অসুস্থতার পথে না গিয়ে সমাজসমথিত এক উচ্চতর পথে প্রকাশ খুঁজে পায় তখন সেই উদ্গত বিশেষ প্রকারের প্রকাশকে বলা হয়—শিল্প, এবং ইচ্ছার এই উচ্চতর পথে চলাকে বলা হয়—উদ্গতি বা 'sublimation'। আক্রম-ইচ্ছার উদ্গতি হলে শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যক্তি সমালোচক ব্যঙ্গকবি বা স্যাটায়ারিস্ট হয়ে উঠতে পারেন। এইসব রূপের মাধ্যমেও তিনি অপরকে আক্রমণ করেই ইচ্ছা পূরণ করছেন এবং তৃপ্তি পাচ্ছেন, কিন্তু তা সমাজসমথিত ও শোধিতরূপে। তাই দেখা যায় যে, কেবল অতৃপ্ত ইচ্ছার দরুনই শিল্পী হওয়া যায় না। উদ্গতির বিশেষ ক্ষমতাই ব্যক্তিকে শিল্পী করে তোলে। কিন্তু উদ্গতির এই ক্ষমতা শিল্পীর ইচ্ছাধীন নয়। এ হচ্ছে নির্জ্ঞান মনের ক্রিয়া। তাই তাঁর অতৃপ্ত ইচ্ছা কেমন করে একটি বিশেষ শিল্পপথ বেছে নেবে এবং অন্যটি নেবে না এর মীমাংসা শিল্পী ইচ্ছানুসারে করতে পারেন না। তবু তিনি এই ক্ষমতার দরুনই শিল্পী। এই উদ্গতির ক্ষমতা, শিল্পীর বিশেষ মানস-ক্ষমতা, যা সাধারণ মনে থাকে না। শিল্পীর এই ক্ষমতার মাত্রারও আবার তারতম্য আছে। ফ্রয়েড বলেছেন: "The capacity for sublimation is subject to the greatest individual variations"। এই উদ্গতি-ক্ষমতার মাত্রানুযায়ীই শিল্পীর মান বা স্থান নির্ণয় হয়ে থাকে।

এ ছাড়া আরও কতকগুলি বিষয়ে সাধারণ মানুষের চিত্ত এবং শিল্পীচিত্তে প্রভেদ দেখা যায়। সেগুলি হল: (১) অনুভূতির তীক্ষ্ণতা ও সূক্ষ্মতা (intensity & subtlety of feeling), (২) ব্যক্তিত্বের প্রসারশীলতা (elasticity of personality) এবং (৩) কল্পনার ঐশ্বর্য (richness of imagination)। এই উপাদানগুলির উপস্থিতির দরুন শিল্পীচিত্তে ও সাধারণ মানুষের চিত্তে যেমন প্রভেদ, তেমনই তাদের মাত্রার তারতম্যের দরুন শিল্পীদের মধ্যেও সাধারণ-অসাধারণের প্রভেদ দেখা দেয়। সাধারণ মানুষের অনুভূতি শিল্পীর অনুভূতির মত তীক্ষ্ণ নয়, এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রাজ্যে তা বিচরণ করতেও পারে না। শিল্পীর মন যেন সদা সজাগ, সদা উন্মুখ—কোথাও অতি সূক্ষ্ম কম্পন স্পন্দন বা রণন হলে তাকে ধরবার জন্য ব্যাকুল। সাধারণ মানুষের চোখ বা কানকে যা এড়িয়ে যায়, শিল্পীর চেতনাকে তা ফাঁকি দিতে পারে না। আবার সব শিল্পীর পক্ষেও সকল সূক্ষ্ম ভাবকে অনুধাবন করা সম্ভব হয় না। রবীন্দ্রনাথ যেমন বহুবিচিত্র এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবরাজ্যে প্রবেশ করে সেই ভাবকে স্বচ্ছন্দে উদ্ধার করে তার সার্থক রূপমূর্তি গড়েছেন—অবনীন্দ্রনাথ, র‍্যাফায়েল, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি বা বিঠোফেনের শিল্পকার্যে যে সূক্ষ্ম অনুভূতির ছোঁয়াচ পাওয়া যায়, শিল্পীনামধারী অনেক ব্যক্তির মধ্যে তা বিরল।

শিল্পীচিত্তের দ্বিতীয় উপাদান, তার প্রসারশীলতা। চিত্তের প্রসারশীলতা হচ্ছে, অহম্‌কে ছেড়ে অপরের মধ্যে নিজেকে ব্যাপ্ত করবার ক্ষমতা। আসলে এই প্রসারশীলতা হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন বা একাত্মতার ক্ষমতা। আগেই দেখেছি, এই একাত্মতার ক্ষমতা সকল মানুষের মধ্যেই আছে। তাই এখানে এটিকে শিল্পীর বিশেষ মানস-ক্ষমতা বলা ঠিক নয়। কিন্তু বললেও ভুল হয় না, কারণ, শিল্পীর যে আইডেন্টিফিকেশনের ক্ষমতা তা সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক গুণ বেশী। সাধারণ মানুষ এই ক্ষমতা দিয়ে অহম্‌কে ডিঙিয়ে অপর-রাজ্যের (other) একটা খণ্ড বিচ্ছিন্ন অংশের সঙ্গেই একাত্ম হয়ে তাকে বুঝে থাকে। কিন্তু শিল্পীমন—বিশেষ করে উঁচুদরের শিল্পীর

এই প্রসারশীলতা অসীম। কবির ভাষাকেই একটু বদলে নিয়ে বলতে পারা যায়—

কোথাও তাহার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা,
মনে মনে।

এই প্রসারশীলতার দরুনই রবীন্দ্রনাথ সমগ্র বিশ্বের গ্রহতারা, নক্ষত্র, সূর্য, চন্দ্র, মেঘ, হাওয়া, জীবজন্তু, পশুপক্ষী, ফুলফল, কীটপতঙ্গ, বালি-মাটি-পাহাড়—সমস্ত কিছুর সঙ্গে একাত্মবোধ করতে পারেন এবং সেই সমস্ত জিনিসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি তাঁর কাব্যে প্রকাশ করতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ গাছ ও জন্তুর কথা বোঝেন, হাওয়ার বাণী শোনেন, ফুলের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন, আবার জল-মাটি-পাহাড়ের হাতছানিও দেখতে পান—

"বিশাল বিশ্বে চারিদিক হতে প্রতি কণা মোরে টানিছে।
আমার দুয়ারে নিখিল জগৎ শতকোটি কর হানিছে।
ওরে মাটি, তুই আমারে কি চাস।
মোর তরে জল দু হাত বাড়াস?
নিশ্বাসে বুকে পশিয়া বাতাস চির-আহ্বান আনিছে।
পর ভাবি যারে তারা বারে বারে সবাই আমারে টানিছে।"

কবির কেউ পর নয়। দেশে-দেশে তাঁর ঘর। সকলেই তাঁর পরমাত্মীয়। এই যে বিরাট বিশ্বানুভূতি বা সমগ্রতাবোধ, তা কবির অসাধারণ একাত্ম হওয়ার ক্ষমতারই পরিচায়ক। আর এমনই নিবিড় ও ব্যাপকভাবে একাত্ম হতে পারেন বলেই তিনি সকল বস্তুর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আবেদন-নিবেদন বুঝতে পারেন। কাজেই শিল্পী-চিত্তের দ্বিতীয় উপাদান—প্রসারশীলতা বা একাত্ম হওয়ার ক্ষমতার উপর প্রথম উপাদানটি, অর্থাৎ অনুভূতির সূক্ষ্মতা ও তীক্ষ্ণতা নির্ভরশীল বলা চলে।

শিল্পী-চিত্তের তৃতীয় উপাদান বলেছি, 'richness of imagination' বা কল্পনার ঐশ্বর্য। শিল্পীর এই কল্পনাশক্তি সম্বন্ধে ফ্রয়েড বলেছেন: "He is not the only one who has a life of phantasy; the intermediate world of phantasy is sanctioned by general human consent, and every hungry soul looks to it for comfort and consolation. But to those who are not artists the gratification that can be drawn from the springs of phantasy is very limited. Their inexorable repressions prevent the enjoyment of all but the meagre day-dreams which can become conscious. A true artist has more at his disposal." (A General Intr. to Psychoanalysis, পৃ. ৩২৭-২৮)

শিল্পসৃষ্টির সমস্ত ব্যাপারটাই ঘটছে মানসলোকে। সেখানে সৃষ্টিবাসনার উদয় হলে তা প্রথমতঃ কল্পনাতেই রূপ পরিগ্রহ করে এবং পরে তা চিত্র কাব্য ভাস্কর্য বা উপন্যাস হিসাবে রূপায়িত হতে পারে। শিল্পীমনের বাইরে শিল্পকার্য, কথার বুনন, রঙের পোঁচ বা মাটির ছাঁচের মধ্যে রূপ নেয়। কিন্তু যতক্ষণ সে শিল্পীমনের মধ্যে রয়েছে ততক্ষণ তো তাকে কল্পনা এবং কল্পনাগড়া নানা প্রতীকের উপরই নির্ভর করে থাকতে হয়। যেহেতু শিল্পের প্রাথমিক রূপটি শিল্পীর কল্পলোকেই মোটামুটি তৈরি হয়ে যায়, তাই শিল্পীর কল্পনাশক্তিকে ঐশ্বর্যময়, সাবলীল, স্বচ্ছন্দ ও গহনচারী হতে হয়। সাধারণ মানুষ বা মিডিওকার শিল্পীর কল্পনার এই ঐশ্বর্য বা স্বচ্ছন্দ-বিচরণ থাকে না। সেখানে কল্পনা খোঁটায়-বাঁধা ঘাসজল খাচ্ছে গরুর মত। দড়ির দীর্ঘতার মধ্যে সে বিচরণ করতে পারে, কিন্তু বহুদূরের গভীর অরণ্যানীর জমাট সবুজের মধ্যে অথবা অসীম আকাশের অতলান্ত নীলে নিলীন হতে পারে না। কল্পনার এই লঘুপক্ষ স্বচ্ছন্দ বিচরণ, অজস্র বর্ণাঢ্যতা ও অপরিমেয় চিত্রসম্পদ যে শিল্পী-মানসে থাকে, তিনিই ভাবকে সার্থক রূপ দিতে পারেন।

এ প্রবন্ধে বিশেষভাবে মনঃসমীক্ষণের (Psychoanalysis) দৃষ্টিতে শিল্পচেতনাকে বিশ্লেষণ করে তার স্বরূপ বুঝতে চেষ্টা করা হয়েছে। তা করতে গিয়ে দেখেছি, শিল্পীর শিল্পসৃষ্টির ব্যাপার—'act of production' বা 'creation'—সেটা মনের নারীসত্তার চাহিদার সঙ্গে জড়িত। মনের দিক থেকে তাই শিল্পসৃষ্টি সন্তান প্রসবের প্রতিকল্প। কাজেই এই নারীবৃত্তির চাহিদাকে শিল্পসৃষ্টির মূল প্রেরণা বলেছি। এই মূল প্রেরণা যখন উদ্‌গতির পথে প্রকাশিত হয়, তখনই শিল্পের জন্ম হয়। এ ছাড়াও যে উপাদানগুলি শিল্পচেতনায় পাওয়া যায় তা হচ্ছে—(১) অনুভূতির সূক্ষ্মতা ও তীক্ষ্ণতা (২) ব্যক্তিত্বের প্রসারশীলতা ও (৩) কল্পনার ঐশ্বর্য। শিল্পচেতনার এইসব উপাদানগুলি সুষ্ঠুভাবে সমন্বিত হলে তবেই শিল্পী সার্থক শিল্পসৃষ্টি করতে পারেন এবং দেশ ও কালকে উত্তীর্ণ হয়ে শিল্পাচার্য, মহাকবি ও বিশ্বকবিরূপে জগতে বরেণ্য হয়ে থাকেন। ।

[পূর্বানুবৃত্তি]

সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমার ঘরে বসে বসে এই কথাগুলোই ভাবছিলাম। আমার ঘরে যথারীতি আর দশজন মেয়ে বসে। বালক যন্ত্র-ভৃত্য পানীয় সরবরাহ করছে।

একটি মেয়ে আদেশ করল, এবারে চুয়িং গাম নিয়ে এস।

এমন সময় ঝড়ের বেগে মন্‌সোনা আমার ঘরে এসে ঢুকল। আরক্ত চোখে চারদিকের মেয়েদের উপর একবার দৃষ্টিপাত করে ওদের সামনে তার পরিচয়-জ্ঞাপক চাকতি দেখিয়ে বলল, আমি পার্লামেণ্টের সভ্যা।

অমনি সেই দশজন মহিলা ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল।

মন্‌সোনা আবার বলল, তোমরা এক্ষুনি এ-ঘর ছেড়ে চলে যাও। আজ রাত্রে এখানে তোমাদের সুবিধে হবে না।

একজন পার্লামেণ্টের সভ্যার কারও ব্যক্তিগত জীবনের উপর এ-ভাবে আদেশ দেওয়ার অধিকার আছে কিনা জানতাম না। কিন্তু ওরা খাঁটি গণতান্ত্রিক জাত, অর্থাৎ সভ্য। কাজেই মহিলারা অধিকারের কোন প্রশ্ন না তুলেই দিব্বি সুড়সুড় করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তারপর মন্‌সোনা আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি এ-সব কী আরম্ভ করেছ বল দেখি?

বোকার মত পালটা প্রশ্ন করলাম, কী আরম্ভ করেছি?

মন্‌সোনা একটু হতাশার ভঙ্গী করে একটা সোফার উপর এত জোরে বসে পড়ল যে স্প্রিংয়ের প্রতিঘাতে তাকে আবার পলকের জন্য শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হতে হল। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে একবারে পুরো এক মিনিট ধরে ধোঁয়া টানল। সেই ধোঁয়া যখন ছাড়ল সারা ঘর অন্ধকার হয়ে গেল।

আমি সোল্লাসে হাততালি দিয়ে বলে উঠলাম, কী চমৎকার!

সে কথায় একটুও কান না দিয়ে মন্‌সোনা বলে উঠল, যন্ত্র-পুলিসের কাছে রিপোর্ট পেলাম তুমি নাকি জাদুবলে সমস্ত মেয়ের হৃদয় জয় করেছ। তা ছাড়া আমি তো নিজের চোখেই দেখলাম তুমি দশজন মেয়েকে নিয়ে রাত্রি-যাপন করছ। জান, এ সমস্ত কাজই সম্পূর্ণভাবে গঠনতন্ত্র-বিরোধী? এর জন্য তোমাকে শাস্তি পেতে হবে?

এই রকমের একটা অভিযোগই আশঙ্কা করছিলাম। একটু ভয়-ভয় করতে লাগল। এই আজগুবী দেশ সম্পর্কে আমি তো আসলে কিছুই জানি না। কিসের থেকে কী হয়ে যাবে কে জানে? আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কাতর কণ্ঠে বললাম, বিশ্বাস কর মন্‌সোনা, এ-সব কাজ আমি মোটেই শখ করে করছি না। কোন মেয়ের প্রতি আমার একটুও টান নেই বা কোন জাদুবিদ্যাও আমি জানি না। কেন যে মেয়েগুলো আমার জন্য খেপে উঠেছে তা আমার কাছেও একটা রহস্য। বোধ হয় এটা

নেহাতই একটা চোখের মোহ—আমার চেহারা দেখে ওদের মনে নেশা চেপেছে। কিন্তু তুমি তো জান, আমার মন-প্রাণ তোমার কাছে গচ্ছিত। তোমাকে ভালবাসার পরে আর কোন মেয়ে আমার চোখেই লাগে না।

আমার প্রতি মন্‌সোনার একটু টান আছে বলেই এই শেষের কথাগুলো বললাম। না হলে, সত্যি বলতে কি, বিগত কয়েকদিনের মধ্যে মন্‌সোনার নাম আমার একবারও মনে পড়ে নি।

মন্‌সোনা বলে উঠল, আবার আর একটা বে-আইনী কথা বলছ? জান না, কোন একজন মেয়েকে একদিনের বেশী ভালবাসা সভ্য সমাজে অপরাধ? প্রাগৈতিহাসিক যুগে এক মেয়ে আর এক পুরুষ আজীবন একসঙ্গে থাকলে সেটা খুব প্রশংসার ব্যাপার ছিল। গুহাবাসীদের মধ্যে এখনও নাকি এ রকম প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু আমরা সভ্যতার শীর্ষদেশে অবস্থিত। এ-সব বর্বর রীতি আমাদের কাছে সাংঘাতিক পাপ। প্রেসিডেণ্ট আমাকে যে রোজ রাত্রে তাঁর বাড়িতে ডেকে নেন এর জন্য আমি যে কী ভয়ে ভয়ে থাকি! কবে যে যন্ত্র-বিচারক জেনে যাবে আর বিপত্তি ঘটবে! তবু প্রেসিডেণ্ট বলেই অনেক কিছু সয়। তোমার আমার ব্যাপার হলে এতটা সইত না।

এ-কথা জিজ্ঞেস করলাম না যে যেখানে সকলেরই সমান সুবিধা পাওয়ার কথা সেখানে প্রেসিডেণ্টের এ-সব বিশেষ সুবিধা কেন। এতদিনে জেনেছিলাম যে সভ্য-সমাজের একটা অলিখিত বিধান হল সব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে নেই। কাজেই গলার স্বর যথাসাধ্য করুণ করে বললাম, সবই বুঝি মন্‌সোনা, কিন্তু আমার মন মানে না। আমার হৃদয়ে তুমি ছাড়া আর কোন মেয়ের স্থান নেই।

বলে ঐকান্তিকতার প্রমাণ হিসাবে ঝট করে এগিয়ে গিয়ে তাকে একটি চুম্বন করলাম। এবং নিজের ক্ষিপ্রতা দেখে নিজেই চমৎকৃত বোধ করলাম।

মন্‌সোনা কিন্তু আরও গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, এসব খুব খারাপ। ফ্যাক্টরিতে দশ বছরের শিক্ষাটা তোমার নেওয়া হয় নি বলেই বোধ হয় এমন বিপর্যয় সম্ভব হচ্ছে। তোমার মন যথেষ্ট নিয়মানুগ নয়। অবশ্য তোমার কাছে স্বীকার করতে বাধা নেই যে তোমার প্রতি আমার তীব্র আকর্ষণটাকেও আমি কিছুতেই এড়াতে পারছি না। আমাদের পৃথিবীতে সাদা রঙ নেই। তোমার ত্বকের সাদা রঙ আমার মনে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। তোমার কাছে একবার এলেই আমি আর নিজেকে সামলাতে পারব না এই ভয়ে আমি তোমার কাছে আসি না। অথচ এইজন্য আমার মনে এতটুকু সুখ নেই। চির-সুখের রাজ্যে আমি চির-দুঃখী। এই আমার বিধিলিপি। তোমাকে গোপনে বলি, আসলে আমি একটু অস্বাভাবিক। কিন্তু এ কথা যদি কেউ জানে তবে আর আমার এ রাজ্যে থাকা চলবে না।

আমি অবাক হয়ে বললাম, সে কি! তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি অস্বাভাবিকই বা কিসে আর অস্বাভাবিক হলেই বা তাতে তোমার দোষ কি?

মন্‌সোনা খানিকক্ষণ চুপ করে বসে কী ভাবল। তারপর ধীরে ধীরে বলে চলল, এ-সব কথা তোমাকে ভালভাবে বোঝাতে হলে আমাদের মহান্ সভ্যতার একটু ইতিহাস তোমাকে বলা দরকার। তা হলে তুমি যে কাজ করেছ তা যে কতখানি গর্হিত অপরাধ তাও বুঝতে পারবে। বেশ, তবে তাই সংক্ষেপে একটুখানি বলছি। ইতিহাস বা বিজ্ঞান বা দর্শন—যে কোন বিষয়ের বিদ্যা আমাদের কোন না কোন যন্ত্র-শিক্ষকের মধ্যে নিহিত আছে। সুইচ টিপে দিলেই যে কেউ শুনতে এবং জানতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ এ-সব ব্যাপার নিয়ে কেউই মাথা ঘামাতে চেষ্টা করে না। কেন করবে? সর্ব-সুখ যাদের করায়ত্ত তারা কেন জ্ঞানার্জনের দুঃখকে স্বীকার করবে? কিন্তু আমি গিয়েছিলাম আমাদের সভ্যতার ইতিহাস শিখতে। তার কারণ আমি একটু অস্বাভাবিক। দশ বছরের কারখানার শিক্ষা সত্ত্বেও আমি ঠিক এ সমাজের প্রাণের সঙ্গে মিশে যেতে পারি নি। কখন এ সত্যটা লোকের কাছে ধরা পড়ে যায়, সব সময় আমি সেই ভয়ে থাকি।

দেখলাম, ইতিহাস বলতে গিয়ে মন্‌সোনা আবার তার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে ফিরে এসেছে। কিন্তু বাধা দিলাম না। আমি জানতাম, ও যত কথা বলবে তত আমি এ দেশ সম্পর্কে জানতে পারব। বললাম, কিন্তু তোমার ধারণা তো সম্পূর্ণ অমূলক হতে পারে। আমার তো মনে হয় শীর্ষ-সভ্যতায় কোন মানুষই অস্বাভাবিক হয় না।

মন্‌সোনা ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল: তুমি যা মনে করছ তা ঠিক হলেও সর্বাংশে ঠিক নয়। মানুষ যেদিন ভগবান হল, এবং ভগবানের রচিত অসুন্দর অসম্পূর্ণ জীবজগৎকে নতুন করে গড়ার সুযোগ পেল, তখন সে সব-কিছুকেই সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ এবং শ্রেষ্ঠ করেই গড়ে তুলতে চেয়েছিল। ক্রমোসমের মধ্যে জীন্‌সের পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে এবং অবাঞ্ছিত জীনস্‌সমূহকে সযত্নে বর্জন করে, তারা আশ্চর্য সুন্দর উদ্ভিদজগৎ প্রাণীজগৎ মানুষ সৃষ্টি করেছিল। সব মানুষ যাতে চেহারায় এবং প্রকৃতিতে এক রকমের হয় সর্বথা সেই চেষ্টাই করা হয়েছিল। পূর্ণ গণতন্ত্রের জন্য এইটেই দরকার। আমাদের সব মানুষই সামাজিক আরামপ্রিয়, সুখবাদী এবং নিয়মানুবর্তী। শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং সামাজিক পরিবেশও এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছিল যাতে মানুষের এ রকম না হয়ে উপায় থাকে না। প্রথম পাঁচ বছর হত্যা-বিভীষিকার মধ্যে কাটিয়ে এবং তার পর দশ বছর ফ্যাক্টরীর শিক্ষা গ্রহণ করে মানুষ তার জন্মগত সামান্যতম উন্মার্গগামী প্রবণতাকেও বর্জন করতে বাধ্য হয়। সামাজিক জীবন এমনভাবে তৈরি যাতে মানুষের সমস্ত কামনা চরিতার্থ হয়। কিন্তু তবু ব্যতিক্রম ঘটে। এক একজন মানুষ এমন হয় যাদের অস্বাভাবিক কামনা কিছুতেই পরিতৃপ্ত হতে পারে না। তারা এই আশ্চর্য কর্মহীনতায় সুখ পায় না, কাজ খুঁজে বেড়ায়। প্রতিদিন নতুন নতুন প্রেমের বৈচিত্র্যের ফলে একজনের প্রেম কামনা করে দুঃখ পায়। আমি নিজের মধ্যে এইসব প্রবণতাগুলো লক্ষ্য করে ভয়ে শিউরে উঠি।

এই কথায় এ সমাজের মানুষের জন্ম-বৃত্তান্তের খানিকটা পরিচয় পেয়ে আমার কৌতূহল দুর্বার হয়ে উঠেছিল। কাজেই মন্‌সোনার ব্যক্তিগত কথায় কান না দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা মন্‌সোনা, তোমাদের রাজ্যে মানুষ জন্মায় কী করে?

মন্‌সোনা হাসল। বলল, তোমার দেখছি জানার আগ্রহ খুব বেশী। পূর্ণতাপ্রাপ্ত সমাজে জানার আগ্রহ খুব ভাল নয়। যাই হোক, তোমাকে যখন বলতে বসেছি যতদূর আমি জানি বলব। অবশ্য বিজ্ঞানের বিষয়ে আমি জানি খুব কম। তোমাকে শুধু ভাসা-ভাসা ভাবে কিছু বলব। প্রাগৈতিহাসিক সমাজে পচা গোবরের মধ্যে গুব্‌রে পোকা জন্মাত। গুব্‌রে পোকার বীজ বাতাসে ভেসে আসত। কাজেই তখন নিম্নতর প্রাণীর মধ্যে জীবদেহের বাইরে প্রাণ সৃষ্টি হত। কিন্তু মানুষ এবং উচ্চতর প্রাণীর বেলায় প্রাণ সৃষ্টি হত নারীর গর্ভকোষে। বৈজ্ঞানিকরা দীর্ঘকাল ধরে মানুষকে এই বর্বরতার হাত থেকে মুক্তি দিতে চেষ্টা করেছেন। এক সময়ে তাঁরা আবিষ্কার করলেন এমন একজাতীয় পচা কাদা যার মধ্যে মানুষের পুং-বীজ আর স্ত্রী-বীজ ছড়িয়ে দিলে তারা আপনা-আপনি মিলিত হয়ে মানুষ সৃষ্টি করতে পারল। কোষ-বৃদ্ধির স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী এই বীজ-কোষগুলি মিলিত হওয়ার আগে সংখ্যায় বাড়তে লাগল। ফলে বারবার আর বীজ ছড়ানোর দরকার হল না। একবার সুনির্বাচিত জীন্‌স-সম্বলিত কতকগুলি বীজ-কোষ ছড়িয়ে দেওয়ার পরেই যে প্রক্রিয়াটা শুরু হয়েছে তা আজও চলছে। আরও একটা সুবিধা হল। এই প্রক্রিয়ায় যে নারী সৃষ্টি হল তার আর গর্ভ ধারণ করার ক্ষমতা রইল না। প্রক্রিয়াটার একটিমাত্র অসুবিধা— অগুনতি মানুষ সৃষ্টি হয়। সেইজন্য যন্ত্র-সৈনিকদের শহরের বাইরে গিয়ে হাজার হাজার শিশু মানুষকে হত্যা করতে হয় যাতে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা নির্দিষ্ট সীমার উর্ধ্বে না ওঠে।

বলে উঠলাম, কিন্তু এর মধ্যে যে একটা দারুণ নিষ্ঠুরতা আছে তা কি তোমার চোখে পড়ে না মন্‌সোনা?

মন্‌সোনা কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, যেন আমার কথাটা সে বুঝতে পারছে না। তারপর বুঝতে পেরে হো হো করে হেসে উঠল। বলল,

লাউনিৎসেন, তুমি যে এমন এক গ্রহ থেকে এসেছ যেখানে প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার অনুরূপ সভ্যতা এখনও বিরাজমান তা প্রায়ই আমি ভুলে যাই। প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই সব ধারণা ছিল বটে—মানবতা ভাল, নিষ্ঠুরতা খারাপ। এই সব অর্বাচীন চিন্তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। আমরা পূর্ণতাপ্রাপ্ত সমাজে বাস করি। আমরা জানি যে পূর্ণতার জন্য যা করণীয় তা করতে হবে। যেটা নিয়ম তার তো অন্যথা করা যায় না। আমাদের সমাজ ষোল-আনা যান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। এই ব্যবস্থা একটা নির্দিষ্ট-সংখ্যক মানুষের ভারের চেয়ে বেশী ভার বইতে অক্ষম। কাজেই বাড়তি মানুষদের মেরে ফেলতেই হবে। এর মধ্যে কোমলতা বা নির্দয়তার কোন প্রশ্ন নেই। যে মানুষ অস্বাভাবিক, সমাজের প্রয়োজনে তাকে নিকেশ করতে হবে। এর মধ্যে নির্দয়তার কোন প্রশ্ন ওঠে না।

আবেগভরে বলে উঠলাম, বাস্তবিক, মন্‌সোনা, তোমাদের এই আশ্চর্য সভ্যতার কথা যত শুনছি ততই মুগ্ধ হচ্ছি। এই সভ্যতায় আমি একজন নাগরিক হতে পারছি বলে নিজেকে গর্বিত বোধ করছি।

আমার এই কথায় কাজ হল। মন্‌সোনার মুখে আত্মপ্রসাদের হাসি ফুটে উঠল। আমি সঙ্গে সঙ্গে ধরিয়ে দিলাম, তুমি তোমাদের ইতিহাস বলবে বলেছিলে মন্‌সোনা। আমি শোনার জন্য তৈরি হয়ে আছি।

মন্‌সোনা বলল, অত শোনার আগ্রহ ভাল নয়। অবশ্য আমি যখন বলব বলেছি তখন নিশ্চয়ই তা বলব। শোন, আমাদের এই সভ্যতার বয়স পাঁচ শো বছর। তারও পাঁচ শো বছর আগে বিংশ শতাব্দীতে এই পৃথিবী বর্বরদের বাসভূমি ছিল। তারা যুদ্ধবিগ্রহ করতে খুব ভালবাসত। কিছু বৈজ্ঞানিক উন্নতি করেছিল বলে তারা অহঙ্কারে ডগমগ ছিল; এবং বিজ্ঞানকে ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করতে লাগল। তার ফলে যা হওয়া স্বাভাবিক ওই শতাব্দীর শেষের দিকে এক ভয়াবহ আণবিক যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে পৃথিবীর শতকরা আশি ভাগ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং সমস্ত বাড়িঘর কলকারখানা খনি ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হয়। এইভাবে প্রাক্‌সভ্যতার যুগের বহু বিজ্ঞাপিত মানবতাবাদী চিন্তার পরিসমাপ্তি ঘোষিত হয়। যে সামান্য কিছু মানুষ বেঁচেছিল তাদেরও অধিকাংশ আণবিক যুদ্ধের পরিণামে যে সব রোগ দেখা দেয় তার আক্রমণে মারা গেল। যারা বেঁচে ছিল তাদেরও অনেকে বেঁচে থাকার মত উপযুক্ত জীবিকা খুঁজে পেল না। যারা কৃষিকাজ জানত তারা হয়তো দেখল তাদের জমি আণবিক অস্ত্রের আঘাতে পুড়ে অঙ্গার হয়ে চাষের অনুপযোগী হয়ে গিয়েছে। যারা সামনে ভাল চাষের উপযোগী জমি দেখতে পেল তারা হয়তো আজীবন কল-কারখানায় কাজ করেছে, চাষবাসের কিছু জানে না। কাজেই এই সব লোকেরও অধিকাংশ শেষ পর্যন্ত মরে গেল। এইভাবে যুদ্ধের পঁচিশ বছর পরে সারা পৃথিবীতে পনের কুড়ি হাজারের বেশী মানুষ আর রইল না। কিন্তু এদের মধ্যে ছিলেন দুই বৈজ্ঞানিক আইজেনসেন আর গল্‌সেন। তাঁদের নামের শেষ অংশটুকু আমাদের নামের শেষে আমরা গ্রহণ করেছি। এই দুই বিজ্ঞানী অনুসন্ধান করতে করতে এক জায়গায় ভূগর্ভের মধ্যে কতকগুলি বই আর যন্ত্রপাতি পেলেন। সেই সময় পর্যন্ত বিজ্ঞানের যত জ্ঞান আহরিত হয়েছিল তা সবই সেখানে সংরক্ষিত ছিল। সেই সব পুঁথি-পুস্তক এবং যন্ত্রপাতির সাহায্যে তাঁরা বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু করলেন। অনেক খোঁজাখুঁজি করে তাঁরা কিছু কয়লা এবং কিছু লোহা ইত্যাদি ধাতুর সন্ধান পেলেন। তা দিয়ে পৃথিবী পুনর্গঠন সম্ভব ছিল না, কিন্তু গবেষণার কাজ চলতে লাগল। সমস্ত মানুষ আদিম পশু-শিকার, পশু-পালন আর কৃষি-কর্মের মধ্যে ফিরে গেল। আর একদিকে তিন শো বছর ধরে বংশানুক্রমে বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞান-সাধনা করে চললেন। বিজ্ঞানের এত উন্নতি হল যে সেই জ্ঞান আয়ত্ত করে বিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিয়ে বেরিয়ে আসতে শিক্ষার্থীর চল্লিশ বছর বয়স হয়ে যেত। তারপর বিয়ে-থা করে তারা আর বেশীদিন বাঁচত না। তখন শুরু হল পুনর্গঠনের কাজ। প্রথমেই একটি আণবিক শক্তি-উৎপাদনের স্বয়ং পুনরাবর্তনশীল কারখানা স্থাপন করা

হল। সূর্যে যেমন আণবিক বিস্ফোরণ হওয়ার পর আবার আপনা-আপনি বিস্ফোরক উপাদান তৈরি হয়ে যায় তেমনি প্রক্রিয়া। তার ফলে সেই যে একবার কারখানা চালিয়ে দেওয়া হয়েছে তা আজও চলছে এবং চলবে অনির্দিষ্ট কাল ধরে। কোন খনিজ পদার্থ ছিল না; কিন্তু মৌলিক পদার্থের অ্যাটমিক সংখ্যা ইচ্ছামত পরিবর্তন করার ক্ষমতা লাভ করে বিজ্ঞানীরা এমন সব ধাতু তৈরি করলেন আগে যার কোন অস্তিত্ব ছিল না। এসব ধাতু যেমন কাজের উপযোগী, তেমনি ক্ষয়নিরোধক। যে বাড়িতে আমরা বসে আছি সেটা পাঁচ শো বছর আগে তৈরি, কিন্তু আজও সেটা নতুনের মত। এই সব নতুন নতুন মৌলিক পদার্থ দিয়ে নতুন স্বয়ংক্রিয় স্বয়ং-পুনরাবর্তনশীল যন্ত্র-জগৎ তৈরি করা হল। সমস্ত যন্ত্র যন্ত্র-মস্তিষ্কের দ্বারা চালিত হয়। মানুষ যে সুইচ টিপে কোন যন্ত্রকে সচল করে দেয় তারও যথাযোগ্য নির্দেশ সে যন্ত্রের থেকেই লাভ করে। ক্বচিৎ কোন যন্ত্রে গোলমাল দেখা দিলে নির্দিষ্ট স্থানে পাঠিয়ে দিলে যান্ত্রিক ইঞ্জিনিয়াররা সেগুলোকে সারিয়ে দেয়। শুধু কি তাই? সমাজে মানুষেরা কী করবে না করবে তার নির্দেশও যন্ত্রের থেকেই আসে। এই যন্ত্রের জগতে মানুষ যন্ত্রের দয়ার উপর নির্ভর করে বেঁচে আছে মাত্র।

আমি বললাম, বুঝেছি, তোমাদের শাসক যন্ত্র, বিচারক যন্ত্র, সৈনিক পুলিসও যন্ত্র। তবে এই পার্লামেণ্টটা কী জন্য?

প্রশ্নটা বেশ বুদ্ধিমানের মতই করেছ। আমাদের ঋষি-পূর্বপুরুষেরা যাঁরা এই যন্ত্র-জগৎ স্থাপন করেছিলেন তাঁদের আশ্চর্য ভবিষ্যৎদৃষ্টির ক্ষমতা ছিল। তাঁরা নানারকমের যন্ত্র-মস্তিষ্ক তৈরি করেছিলেন; প্রত্যেকেরই কার্যক্ষমতা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ। যে যন্ত্র-মস্তিষ্ক গাড়ি চালায় সে শুধু গাড়ি চালাতেই পারে, যে বিচারক সে শুধু বিচারই করে। সে শুধু কতকগুলো পূর্ব-নির্দিষ্ট সূত্র অনুসারেই বিচার করতে পারে। কিন্তু আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা জানতেন কালে কালে এমন কিছু কিছু ঘটনা ঘটবে যা এই সব নির্দিষ্ট সূত্রের মধ্যে ধরা পড়বে না। যন্ত্র সেখানে কোন নির্দেশ দিতে পারবে না। এই সব সমস্যার সমাধানের জন্য পার্লামেণ্টের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। যেমন ধর, আমাদের উপন্যাস লেখার যন্ত্র-মস্তিষ্ক কতকগুলো নির্দিষ্ট উপাদানকেই নানারকমের যোগ-বিয়োগ করে উপন্যাস লেখে। কিন্তু এই যোগ-বিয়োগের ফলেই এক এক সময় এমন অদ্ভুত বই লেখা হয় যা এই সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। পার্লামেণ্টের কোন কোন সভ্য আছেন যাঁরা সব বই পড়েন। এবং প্রয়োজন-মত অবাঞ্ছিত বইকে পার্লামেণ্টের বিবেচনার জন্য উপস্থিত করেন। পার্লামেণ্ট সে বইয়ের প্রচার নিষিদ্ধ করে দেন। তোমাকে তো আগেই অস্বাভাবিক মানুষদের কথা বলেছি। তাদের সম্পর্কেও পার্লামেণ্টকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। তুমি যে গ্রহান্তর থেকে আসবে তা আমাদের পূর্বপুরুষেরা আগে অনুমান করতে পারেন নি। কাজেই পার্লামেণ্টকে তোমার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছে

অভিভূত হয়ে বললাম, তোমাদের সভ্যতার বিস্ময়কর কৃতিত্ব এইখানে যে কর্মের বন্ধন থেকে তোমরা মানুষকে মুক্তি দিয়েছ।

মনসোনা বলল, আমরা মানুষের কামনার সর্বোচ্চ সীমাকে আয়ত্ত করেছি।

তারপর যন্ত্র-বালক-ভৃত্যকে ডেকে রাত্রের খাবার এবং পানীয় দিতে আদেশ করলাম। খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে আমি মনসোনাকে আবার একটি চুম্বন ঘুষ দিয়ে তার প্রতি আমার প্রেমের একাগ্রতা প্রমাণ করতে চেষ্টা করলাম।

মনসোনা কিন্তু একপাত্রের বেশী পানীয় গ্রহণ করল না। বলল, কাজেই তুমি এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ লাউনিৎসেন, যে তোমার কাজটা কতখানি গর্হিত হয়েছে। এখানে যন্ত্রের জগতে মানুষ বাস করছে। যন্ত্রের আইন প্রকৃতির আইনের মতই অমোঘ। আইন মেনে চল, সমস্ত সুখ তোমার। আইন অমান্য কর, এখানে তোমার স্থান নেই। জান, আজকে যে এক হাজার পুরুষ শোভাযাত্রা করে পার্লামেণ্টে গিয়েছিল তাদের কী হয়েছে? তারা আর নেই।

আমি একটা সহানুভূতিসূচক ধ্বনি করে বললাম, তোমাদের সভ্যতা বড় নিষ্ঠুর। কিন্তু আমি কী করতে পারি বল তো? এই যে সব মেয়ে আমার পেছনে পেছনে ছুটছে, এদের একজনের জন্যও আমার কোন আকর্ষণ নেই। তবু তারা আমার পিছনে জোঁকের মত লেগে রয়েছে। তোমাদের দেশের মেয়েদের যদি এতটুকু আত্ম-সংযমের ক্ষমতাও না থাকে তো সে অপরাধ কি আমার?

এই অভিযোগে মন্‌সোনা রাগে আগুন হয়ে গেল। চেঁচিয়ে বলল, যা তোমার বুদ্ধির অতীত তা নিয়ে কথা বলো না লাউনিৎসেন। প্রাক্‌-সভ্যতার যুগের কতকগুলি ভ্যাপ্‌সা চিন্তায় তোমার মন ধাঁধিয়ে আছে; আমাদের সভ্যতার মূল্য তুমি বুঝবে কী করে? আত্ম-সংযম সমস্ত দুঃখের মূল; আমাদের চিরসুখের সমাজে লোকে আত্ম-সংযম করতে যাবে কেন? তুমি বোকা অকৃতজ্ঞ, তাই এমন কথা বলতে পারলে।

আমার বিগত কয়েকদিনের অভিজ্ঞতার ফলে এই সভ্যতা সম্পর্কে ভয়ের মনোভাবটা হ্রাস পেয়েছিল। কিন্তু মন্‌সোনার কথাবার্তার ধরন শুনে ভয়টা আবার মাথা-চাড়া দিয়ে উঠছিল। কাজেই মন্‌সোনার কথায় খুব যে অনুতপ্ত হয়েছি এমন একটা ভাব দেখিয়ে বললাম, মন্‌সোনা, লক্ষ্মীটি, আমার কথায় কি অমন করে দোষ ধরে? কী বলতে কী বলে ফেলেছি। আমি এ রাজ্যে একমাত্র তোমাকেই ভালবেসেছি এবং তোমাকেই আমার সুহৃদ বলে মনে করি। তুমি যেমন করে হোক আমাকে বাঁচানোর চেষ্টা কর।

বলে তার স্বচ্ছ নীল মোলায়েম দেহটা আর একবার জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু সে আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলল, তুমি যা অপরাধ করেছ তারপরও তোমাকে কী করে বাঁচানো যায় আমি জানি না। আমি অবশ্য একটা ব্যবস্থা করতে পারি। তোমার জন্য একখানা স্পুটনিকের টিকিটের ব্যবস্থা করে দিতে পারি। তুমি আর কোন গ্রহে পালিয়ে গেলে হয়তো কোন গোলমাল হবে না।

আমি কাতরভাবে বললাম, তুমি আমাকে এমন প্রস্তাব দিতে পারলে মন্‌সোনা! অন্য গ্রহে যাওয়া মানে তো তোমার সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হওয়া। তোমাকে ছেড়ে আমিই বা বাঁচব কী করে, আর আমাকে ছেড়ে তুমিই বা বাঁচবে কী করে?

মন্‌সোনা খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। আবেগে তার ঠোঁট একটু কাঁপল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, আমি তোমাকে খুবই ভালবাসি এ কথা ঠিক, লাউনিৎসেন। কিন্তু নিজের মনকে আমার সংবরণ করতেই হবে। এ সমাজে একজন মানুষকে স্থায়ীভাবে ভালবাসা পাপ। তোমাকে যা বললাম তা করা ছাড়া তোমার পরিত্রাণের আর কোন পথ নেই। তোমাকে ভালবাসি বলেই আমি এই উপদেশ দিচ্ছি।

কিন্তু স্পুটনিকের বিভীষিকা আমার মনে তখনও জ্বলজ্বল করছিল। স্পুটনিকের আতঙ্কে আমি বিপ্লববাদী হয়ে উঠলাম। ফিরে গিয়ে আমার সোফায় ঋজু হয়ে বসে সোজা মাথা আকাশে ঠেকিয়ে বললাম, মন্‌সোনা, আমি ভীরু নই। তোমাদের অনড় অচল সমাজে আমি যে সামান্য একটু বুদ্‌বুদ সৃষ্টি করতে পেরেছি তার শেষ না দেখে আমি এখান থেকে নড়ছি না। তোমার উপদেশ মানতে পারলাম না বলে আমি দুঃখিত।

সকালবেলা যখন মন্‌সোনা বিফল-মনোরথ হয়ে সজল চোখে বিদায় নিল, তখন সেই সর্বপ্রথম অনুভব করলাম যে মন্‌সোনাকে আমি হয়তো সত্যিসত্যি ভালবেসে ফেলেছি।

সেইদিন দুপুরবেলা পার্লামেণ্টে আমার প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। যা-যা ঘটেছিল তার আনুপূর্বিক বিবরণ আমি পরে জানতে পেরেছিলাম। এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

প্রথমেই মন্‌সোনা সভার সামনে প্রস্তাব উত্থাপন করে যে প্রতি রাত্রে দশজন মেয়েকে নিয়ে রাত্রি-যাপন করার অপরাধে আমাকে স্পুটনিকযোগে গ্রহান্তরে পাঠানো হোক। আর তাতে যদি আমি গররাজী হই তো আমার জীবনাবসানের ব্যবস্থা করা হোক।

সেদিন মন্‌সোনার প্রস্তাব পাস হলে আমার আর এই এমন বৃত্তান্ত লেখার অবকাশ জুটত না। ভাগ্যক্রমে সেদিন প্রেসিডেণ্ট আমার প্রতি অনুকূল মনোভাবাপন্ন ছিলেন। কদিন আগে তাঁকে যে আড়াই শো মেয়ের বুড়ো আঙুলের ছাপসম্বলিত প্রশস্তিপত্রটি পাঠিয়েছিলাম তার ফলে তাঁর ধারণা হয়েছিল যে তাঁর জনপ্রিয়তা-বৃদ্ধির জন্য আমি প্রচার করছি। কাজেই তিনি আমার সপক্ষে অনেক কথা বললেন এবং তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যান্য অনুগত সদস্যরাও আমার পক্ষে বললেন।

কিন্তু মন্‌সোনা নাছোড়বান্দা। তার প্রস্তাবটা পাস করার জন্য সে বারবার ওজস্বিনী ভাষায় জিদ্ করতে লাগল। প্রেসিডেণ্ট একটু মুশকিলে পড়ে গেলেন। মন্‌সোনা তাঁর প্রতিদিনকার নৈশসঙ্গিনী। তাকে তিনি চটাতে পারেন না। প্রস্তাবটা ভোটে দিলে বাতিল হয়ে যাবে বুঝতে পেরেও তিনি সেটা ভোটে দিলেন না—পাছে মন্‌সোনা অসন্তুষ্ট হয়। তার বদলে তিনি যন্ত্র-মহাধর্মাধিকরণের কাছে ব্যাপারটা উত্থাপন করলেন। আমার ভাগ্য আবার অনিশ্চয়তায় দুলতে লাগল।

কিন্তু যন্ত্র-মহাধর্মাধিকরণ কোন সিদ্ধান্ত জানাল না। এ দেশের নীতিশাস্ত্রে একজন মেয়েকে নিয়ে পর পর দু রাত্রি যাপন করা নিষিদ্ধ; কিন্তু এক রাত্রে দশজন মেয়েকে নিয়ে রাত্রি যাপন করার সপক্ষে বা বিপক্ষে কোন নির্দেশ নেই।

কাজেই সেদিন আমার সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত না নিয়েই পার্লামেণ্টের সভা ভঙ্গ হল।

তার খানিকক্ষণ পরে বিকেলের দিকে মন্‌সোনা আত্মহত্যা করল।

এ-সব খবর আমি পেলাম সন্ধ্যেবেলা পার্লামেণ্টের আর এক সভ্যা মিনিউৎসোনার মারফত। শুনে নিজের জন্য দুশ্চিন্তা খানিকটা লাঘব হলেও মন্‌সোনার জন্য মনটা ভারি হয়ে রইল। বারবার ভাবতে লাগলাম, কেন সে অমন করে আমার বিরুদ্ধাচরণ করল, আর কেনই বা পরে আত্মহত্যা করল? এর কারণ কি এই যে তার সমাজের প্রতি আনুগত্যবশতঃ সে আমার বিরুদ্ধাচরণ করেছিল, আর আমার প্রতি ভালবাসাটা মন থেকে কিছুতেই তাড়াতে না পেরে আত্মহত্যা করেছিল? অথবা, কারণ কি এই যে আমার প্রতি তার অতৃপ্ত ভালবাসা বিদ্বেষে রূপান্তরিত হয়েছিল? বিদ্বেষবশতঃ সে পার্লামেণ্টে আমার বিরুদ্ধতা করেছিল এবং তাতে বিফল হয়ে মনের জ্বালায় আত্মহত্যা করেছিল?

মন্‌সোনার মনে কী যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছিল তার সঠিক ইতিহাস কোনদিনই অনুমান করা যাবে না—একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে এই কথা ভাবলাম।

সেদিন মিনিউৎসোনা আমার ঘরে রাত্রিযাপন করল। কিন্তু সারারাত আমি আমার মানস-চক্ষে মন্‌সোনাকে দেখতে লাগলাম।

পরদিন সারাটা সময় আমি মিনিউৎসোনার সঙ্গে অফিস কামাই করে শহরের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ালাম। পানাহারের জন্য কয়েকটি ক্লাবেও হানা দিলাম। যেখানেই আমি মাটিতে পা দিলাম সেখানেই অগুনতি মেয়েরা আমাকে দেখার জন্য ভিড় করে দাঁড়াল। এমন কি পুরুষেরা পর্যন্ত আমার প্রতি কৌতূহলী হয়ে পড়েছে। জানতে পারলাম এই কদিনের মধ্যে দাবানলের মত আমার খবর সারা শহরে ছড়িয়ে পড়েছে। আমাকে দেখার জন্য, আমার কথা শোনার জন্য লোকের আগ্রহের শেষ নেই। এক জায়গায় দর্শনার্থীদের এত ভিড় হল যে তিনজন মেয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

সেই রাত্রে আমি সারাদিনের ক্লান্তির পর মিনিউৎসোনার ঘরে রাত্রিযাপন করলাম।

পরদিন ভোরবেলা একজন বৃহদাকারের যন্ত্র-পুলিস পর পর দু রাত্রি একজন মেয়ের সঙ্গে রাত্রি-যাপন করার অপরাধে আমাকে গ্রেপ্তার করল। এদেশে রাস্তাঘাটে সাধারণতঃ যে-সব যন্ত্র-পুলিস ঘোরাফেরা করে তারা এ-দেশের নাগরিকদের আয়ত্তে আনার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু তারা আমার কাছে ঘেঁষতে পারে না। দেখলাম, আমাকে আয়ত্ত করতে পারে এমন বড় সাইজের পুলিসও এদের আছে।

পার্লামেণ্টের সভায় মিনিউৎসোনা আমাকে বাঁচানোর জন্য অনেক চেষ্টা করল।

প্রেসিডেণ্ট কিন্তু আমার উপর ভীষণ বিরূপ হয়ে উঠলেন। বললেন, তুমি বুঝতে পারছ না মিনিউৎসোনা, যে লাউনিৎসেন একজন মেয়েকে নিয়ে দু রাত্রি যাপন করায় সোজাসুজি বিচারাধীন কয়েদী হয়ে পড়েছে। যন্ত্র-বিচারক তার বিচার করে মৃত্যুদণ্ড দেবেন এ অবধারিত। এতে হস্তক্ষেপ করার কোন এক্তিয়ার পার্লামেণ্টের নেই। তুমি পার্লামেণ্টের সভ্যা না হলে তোমারও সাধারণ কয়েদী হিসাবে বিচার হত। কাজেই লাউনিৎসেনের বিষয়টা পার্লামেণ্টে উত্থাপন করা চলবে না।

কিন্তু আমাকে সমর্থন করতে গিয়ে মিনিউৎসোনা খুব দৃঢ়তার পরিচয় দিল। সে বলল, প্রেসিডেণ্টকে যথোচিত বিনয়ের সঙ্গে এ কথাটা স্মরণ রাখতে বলি যে লাউনিৎসেনকে সাধারণ অপরাধী হিসাবে গণ্য করা যায় না। সে গ্রহান্তর থেকে এসেছে। তার অমন গৌরবর্ণ এবং দীর্ঘ দেহ আমাদের কাছে বিস্ময়। আমাদের রাজ্যে এই প্রথম আমরা সাদা রঙ দেখতে পেলাম। তার মৃত্যুদণ্ড বিধান করলে কোন অজানা শক্তি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবে না এ নিশ্চয়তা কে দেবে? কাজেই আমি প্রস্তাব করি যে লাউনিৎসেনকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ বলে একটি ঐতিহাসিক বিস্ময় হিসাবে সংরক্ষিত করা হোক।

নারী সদস্যারা চিরদিনই আমার প্রতি দয়ালু। অনেকে আমার সপক্ষে বললেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে কোন কোন পুরুষ সদস্যও আমার সপক্ষে বললেন। তাঁদের এই আকস্মিক পক্ষপাতের কারণ আমি অনুমান করতে পেরেছিলাম। নারীমহলে আমার অসাধারণ জনপ্রিয়তা দেখে পুরুষেরা আমার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েছিল। কাজেই আমি মেয়েদের নাগালের বাইরে একটা দর্শনীয় বস্তু হয়ে থাকব এ কল্পনাটা তাদের কাছে খুব মজার বলে বোধ হয়েছিল।

সভার মত এতখানি তাঁর বিপক্ষে দেখে প্রেসিডেণ্ট একটু নরম হলেন। মনে মনে দাঁতে দাঁত চেপে ভাবলেন, আগামী নির্বাচনে আমি দেখব তোমাদের মধ্যে কতজন পার্লামেণ্টের সদস্য হিসাবে বহাল থাকতে পার। তিনি অবশ্য সহজে হার মানলেন না। গঠনতান্ত্রিক প্রশ্ন তুললেন। আমাকে ঐতিহাসিক বিস্ময় হিসাবে সংরক্ষিত করা গঠনতন্ত্রবিরোধী কিনা এ প্রশ্নের জবাবে যন্ত্র-গঠনতন্ত্র থেকে উত্তর পাওয়া গেল—বিরোধী নয়।

তারপর আর মিনিউৎসোনার প্রস্তাবটা পাস হয়ে যেতে কোন অসুবিধা হল না।

সন্ধ্যেবেলা মিনিউৎসোনা আমাকে খবরটা দিতে এল। আর বলা বাহুল্য জেলখানার ঘরেই সে আমার সঙ্গে রাত্রি-যাপন করল। আমি তাকে সস্নেহ আদর করে অনুরোধ করলাম, দেখ মিনি, বরাবরই দেখেছি প্রেসিডেণ্ট আমার প্রতি খুব সদয় ছিলেন। হঠাৎ তিনি কেন আমার প্রতি এমন বিরূপ হয়ে উঠলেন তার কারণটা তোমাকে জেনে আসতে হবে।

পরদিন মিনিউৎসোনা যে রিপোর্ট নিয়ে এল তার থেকেই কারণটা বুঝতে পারলাম। যন্ত্র-পুলিসের কাছ থেকে প্রেসিডেণ্ট নাকি রিপোর্ট নিয়ে জেনেছিলেন যে আমি মাত্র একদিন তাঁর হয়ে প্রচার করেছি। পরে দিনের পর দিন আমি নাকি শুধু নিজের জনপ্রিয়তাই বাড়িয়ে চলেছি। ফলে যে শহরে খুব কম লোকই প্রেসিডেণ্টের নাম জানে সেই শহরে প্রায় সবাই আমার নাম শুনে পাগল হয়ে ওঠে।

বুঝতে পারলাম, এমন খবর পাওয়ার পর প্রেসিডেণ্ট রাগ না করলেই বিস্ময়ের বিষয় হত।

আমাকে সংরক্ষণ করার ব্যাপারটার কিন্তু সহজে মীমাংসা হল না।

প্রথমে অনুরোধ করা হয়েছিল জাদুঘরকে। জাদুঘর-কর্তৃপক্ষ তাদের যান্ত্রিক নির্দেশকের সঙ্গে পরামর্শ করে জানাল যে আমার আকারের মত একটি খড়ের মানুষ তৈরি করে তাকে আমার গায়ের চামড়া দিয়ে জড়িয়ে দিলে তারা সংরক্ষণের দায়িত্ব নিতে পারে। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক বিস্ময় হলেও জীবন্ত কোন কিছুকে স্থান দেওয়া তাদের গঠনতন্ত্রের বিরোধী।

তারপর অনুরোধ করা হল চিড়িয়াখানাকে।

চিড়িয়াখানা জানাল যে বিস্ময়কর হলেও আমাকে মানুষ না বলে উপায় নেই। আমি দু পায়ে হাঁটি, মানবীর সঙ্গে প্রেম করি, এই সবই নিঃসন্দেহে মনুষ্যত্বজ্ঞাপক। অথচ তারা শুধুমাত্র মনুষ্যেতর জীবদেরই জায়গা দেওয়ার অধিকারী।

মিনিউৎসোনা আমাকে এসে জানাল, কলকাতার চিড়িয়াখানাও তোমাকে জায়গা দিতে রাজী হল না।

কিন্তু সবগুলো কথা আমার কানে গেল না। কলকাতা নামটা শুনেই আমার শরীরের সমস্ত রক্ত মাথায় উঠে গেল। এ কোন্ কলকাতা।

জিজ্ঞেস করলাম, মিনিসোনা, তুমি কলকাতার নাম বললে না?

হ্যাঁ। যে শহরে আমরা বাস করি তার নাম তো কলকাতা। কেন, তুমি জানতে না?

কলকাতা কোথায়?

ভারতবর্ষে।

ভারতবর্ষ কোথায়?

এসিয়ায়।

সব পরিচয়ই তো মিলে যাচ্ছে। কিন্তু এই রূপকথার কলকাতার মধ্যে আমার সেই চেনা কলকাতা কোথায়? এই তো মাত্র দিনকতক আগে স্পুটনিক-যোগে আমি কলকাতা ছেড়ে বাইরে গিয়েছিলাম। না হয় মেনে নিলাম কোন অজ্ঞাত কারণে স্পুটনিক মহাকাশ পরিভ্রমণ করে আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। কিন্তু আমার সেই চেনা কলকাতা কোথায়? মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই তো কলকাতা শহর এমন করে পাল্‌টিয়ে যেতে পারে না। অথবা এটা কি আসলে আমাদের চেনা কলকাতা শহরের প্লেটনিক আইডিয়া?

অধীর বিস্ময়ে মন হাতড়িয়ে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ আইনস্টাইনের তত্ত্ব মনে পড়ে গেল। ঠিক তো! আইনস্টাইন তো বলেছিলেন যে আলোর বেগের কাছাকাছি বেগে ভ্রমণ করলে সময়ের হিসাব হ্রাস পাবে। কাজেই মহাকাশে যে সময়টা আমার কাছে দিনদশেক মাত্র বলে বোধ হয়েছিল সেই সময়ের মধ্যে পৃথিবীতে

এক হাজার বছর কেটে গিয়েছে। এবং এই বিজ্ঞানের যুগে এক হাজার বছরে যে কী বিপুল পরিবর্তন সাধিত হতে পারে এই কলকাতাই তার প্রমাণ।

মনে পড়ল মন্‌সোনা কথায় কথায় কয়েকবার পৃথিবী কথাটা উচ্চারণ করেছিল। তখন ভেবেছিলাম কথাটা সে রূপক অর্থে ব্যবহার করছে।

কিন্তু হায়! আমার সেই কলকাতা শহরে আমি আজ বিদেশী, প্রাগৈতিহাসিক বিস্ময়? জাদুঘর এবং চিড়িয়াখানায় আমার জন্য জায়গার অনুসন্ধান করা হয়!

মনে মনে নিজের হালফিল অবস্থাটা চিন্তা করে নিজের প্রতি অনুকম্পায় মন ভরে গেল। এখানে নিঃসঙ্গ আমি কারাগারে বন্দী। আমার জন্য চিন্তা করবার, আমার দুঃখে দুঃখ করবার কেউ নেই। এখানে আমার যে জনপ্রিয়তা হয়েছিল তা কত মেকী! এ কদিনের মধ্যেই এই চির-সুখের রাজ্যের বাসিন্দারা আমার কথা ভুলে গিয়ে যার যার আনন্দে মগ্ন হয়ে গিয়েছে। এমন কি প্রেসিডেণ্টও হয়তো আমার জন্য রাগ পুষে রাখার কথা ভুলে গিয়েছেন।

একমাত্র মিনিউৎসোনা আমার কাছে আসে বাইরের পৃথিবীর এক ঝলক বাতাসের মত। কিন্তু তার মনের থেকে আমার মন কত দূরে! সে তো আমার কাছে আসে শুধু তার কতকগুলো শারীরিক দাবি মেটাতে।

অনেক ভেবেচিন্তে মিনিউৎসোনাকেই একদিন বললাম, মিনিউৎসোনা, তুমি আমাকে ভালবাস। তাই তোমাকে একটা অনুরোধ করতে চাই।

কি অনুরোধ বল।

আমার পালিয়ে যাওয়ার একটা ব্যবস্থা করে দাও।

মনে মনে ধরে নিয়েছিলাম মিনিউৎসোনা এ প্রস্তাবে রাজী হতে পারে না। আমি পালিয়ে গেলে সে আমার সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হবে। অথচ তার কাছে আমার শারীরিক সংসর্গ ছাড়া আমার ভালবাসার আর কী অর্থ থাকতে পারে?

কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে সে বলল, ঠিকই। পালিয়ে যাওয়া ছাড়া তোমার পরিত্রাণের আর কোন পথ দেখছি না।

সে পার্লামেণ্টের সভ্যা বলে অনেক ক্ষমতার অধিকারী ছিল। আমাকে পাহারা দেওয়ার জন্য যে-সব বৃহদাকার যন্ত্র-সৈনিক মোতায়েন ছিল গুপ্ত সঙ্কেতের সাহায্যে সে তাদের সরিয়ে দিল। তারপর যে মানুষ-পাহারাদারটি ছিল সে তার কাছে গিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে গালে একটা চুমু খেল। লোকটি কৃতার্থ হয়ে গেল। হেসে যেন গলে পড়তে চাইল। তারপর ডিউটির কথা ভুলে গিয়ে মিনিউৎসোনার নির্দেশিত পথে চলে গেল।

আমার সামনে খোলা গেট এবং মিনিউৎসোনার গাড়ি। গাড়িতে চেপে বসে আমি তাকে উত্তর-সীমান্ত অতিক্রম করে যাওয়ার নির্দেশ দিলাম।

শহরের উত্তর-সীমান্তে এসেই গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল। বুঝতে পারলাম গাড়ির যন্ত্র-মস্তিষ্ক সীমান্ত অতিক্রম করে কখনও যাবে না। গাড়ি থেকে নেমে তাকে নীচু থেকে আগের জায়গায় ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে আমি দৌড়তে লাগলাম। পিছনে কেউ তাড়া করছিল না; তবু দৌড়লাম।

আমার সামনে পাহাড়ের পর পাহাড়। নগাধিরাজ হিমালয়কে চিনতে পারলাম। পাহাড়ের একটি গুহায় আশ্রয় নিলাম। তারপর থেকে বর্বর গুহাবাসীদের সঙ্গেই বাস করছি।

এখানকার জীবন খুব কষ্টের। তবু শহরের সেই আরামের দিনগুলোর কথা ভেবে একটুও আপসোস বোধ করি না। দুঃখ বোধ হয় যখন মন্‌সোনার অতৃপ্ত ভালবাসার কথা মনে পড়ে। আর মিনিউৎসোনার সহানুভূতিশীল হৃদয়ের কথা। আমাকে মুক্তি দেওয়ায় মিনিউৎসোনার কোন বিপদ ঘটে নি তো?

সমাপ্ত

গল্প

শান্তনুর জন্যে

ঝরনা সেন

একদিন আমি হেসে বলেছিলাম, তোমাকে নিয়ে এবার আমি একটা গল্প লিখব। ও প্রশ্ন করেছিল, রাস্তাঘাটে, ট্রামে-বাসে তোমার নায়কের তো ছড়াছড়ি, হঠাৎ আমাকে নিয়ে পড়লে কেন?

আমি বলেছিলাম, কারণ, তোমাকে এত কম জানি— কাল রাতে এই কথাটি যেন নতুন করে বুঝলাম।

ও হেসে বলল, কি রকম?

আমি বললাম, দেখ, কাল রাতে তুমি যখন আমাকে বাসে তুলে দিয়ে চলে গেলে, আমি যখন একা একা ফিরে আসছিলাম, তখন আমার এই কথাটিই হঠাৎ মনে হল যে, তোমায় আমি বড্ড কম জানি, আর এই কম জানাটা আমার পক্ষে অনুচিত হয়েছে। এই ছ-সাত বছর ধরে যাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছি, যাদের সঙ্গে একত্রে নিঃশ্বাস নিয়েছি, তাদের সঙ্গে তুমিও তো ছিলে, অথচ এই তাদের সম্পর্কে আমি এত বেশী জানি যে, তারা আমার মনে আর কোন উৎসাহের সৃষ্টি করতে পারে না। আর তোমার সম্বন্ধে জানা আমার কত কম। আমি এতদিন তোমাকে দেখেছি তোমার আর আমার পরিচিত আরও অনেকের বন্ধু হিসেবে— এর বন্ধু, ওর বন্ধু, আমারও বন্ধু হিসেবে। কিন্তু বন্ধুত্বের সীমানার বাইরেও যে তোমার একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, সেটা আমার কাল রাতেই প্রথম অনুভব হল। আর সেইজন্যই তোমাকে নিয়ে আমি একটা গল্প লিখব।

ও বলল, ভাল কথা, কিন্তু গল্পটা কি করে শুরু করবে শুনি?

যেমন করে তোমায় এসে বললাম ঠিক তেমনি করেই।

শুনে ও বিচলিত হয়ে বলেছিল, সর্বনাশ, অমন কাজটিও করো না, লোকে কি না কি ভাববে। ঠিক আমাকে চিনে ফেলবে আমি বলেই।

শান্তনুর এত ভয় সত্ত্বেও, শান্তনুকে নিয়ে গল্প লেখা আমার হয়ে ওঠে নি শেষ পর্যন্ত।

এর মধ্যে আমি চলে গেলাম উত্তরবঙ্গের এক বেসরকারী কলেজে মাস্টারী করতে আর শান্তনু পড়ে রইল এখানে এক সরকারী অফিসের দপ্তরখানায়। মাঝে মাঝে পত্রাবলীর আদানপ্রদান হত বটে কিন্তু সে নিতান্তই কুশলপত্র। মাঝে শুধু আমি একবার লিখেছিলাম, শান্তনু, হাতে প্রচণ্ড অবসর, আলসেমির সব রকম অনুপানেও ফুরোচ্ছে না, মনে হচ্ছে এবার তোমার গল্পটা লিখতে পারব। কিন্তু মুশকিল এই যে তুমি বড্ড ঠাণ্ডা। যদি সামান্যও প্রচণ্ড হতে তা হলে এতদিনে তোমাকে দিয়ে নায়কজনোচিত অনেক দুর্ধর্ষ কাজ সমাপ্ত করিয়ে নায়িকার পায়ে আত্মসমর্পণ করাতাম।

উত্তরে শান্তনু লিখেছিল, আমার চরিত্র সম্পর্কে তোমার ধারণা নিতান্তই কম, বোধ হয় সেইজন্যই তুমি আমাকে নিয়ে আজও গল্প লিখতে পারলে না। এর পর আমি চেঁচিয়ে, ঝগড়া করে (হায় সেটা আমি কত সহজেই পারি!) প্রমাণ করে দেব যে তোমার গল্পের নায়ক হবার সবকটি গুণই আমার আছে।

চিঠিটা পড়ে আমি খুব হেসেছিলাম ঠিকই, কিন্তু তবু গল্পটা লিখতে পারি নি। কারণ শান্তনুর মত আমারও একটা ভয় ছিল, পাছে লোকে আমাকে চিনে ফেলে, কেন না সে গল্প তো শুধুমাত্র শান্তনুর গল্পই নয়—সে যে আমারও গল্প।

আমার গল্প আর শান্তনুর গল্প যে কি করে এক হয়ে গেল তা বলার আগে নিরুপমের কথাটা বলা প্রয়োজন।

একসময় নিরুপমের সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ ছিল, সহজ ভাষায় বলতে গেলে তা প্রেম ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু কোন এক সুপ্রভাতে দেখলাম নিরুপম বাণী নামে

অন্য এক পরিচিতার কণ্ঠলগ্ন হয়ে সুখে কালাতিপাত করছে। আমার জীবনটাও অকস্মাৎ তাই বাঁধা ঘাটের মোহ কাটিয়ে ফুটো নৌকোয় ভেসে পড়ল। ভাসতে ভাসতে যেখানে এসে ঠেকল সেখানে ভরাডুবি হবার আশঙ্কা যথেষ্টই ছিল। এমন কি অরক্ষণীয়া বলে আশে-পাশে যারা ভিড় করে এল, তারা অবলাবান্ধব হতে পারেন, কিন্তু 'রাজদ্বারে শ্মশানে চ' বলে চাণক্য যাঁদের নির্দেশ করে গেছেন, এঁরা তাঁরা নন নিঃসন্দেহে। কিন্তু আমার ভয় ছিল না তাতে। একবার বিশ্বাসভঙ্গের সুবিধেই এই যে দ্বিতীয়বার আর কাউকে বিশ্বাস করে ঠকার ভয় থাকে না। নিরুপম আমাকে 'বোধোদয়ে'র সেই সহজপাঠ দিয়ে গিয়েছিল। অবশ্য গুরুদক্ষিণা হিসেবে আমার চোখের জল খরচা হয়েছে অনেক, অনেক দীর্ঘশ্বাসের ঝড় বয়ে গেছে, কিন্তু এ সবেরই একটা শেষ আছে। সময় অতিবাহনের সঙ্গে সঙ্গে আমি আবার নতুন করে বিশ্বাস করে ঠকলাম না বটে, কিন্তু আমার পুরনো ক্ষতের ওপর প্রলেপ পড়ল। আমি নিরুপমের কথা ভুলে গেলাম। নিরুপমের গল্পটা এইটুকুই। শান্তনু সেই নিরুপমেরই বন্ধু—সম্পর্কে আমারও।

শান্তনু আর আমি একসঙ্গে পোস্টগ্রাজুয়েট ক্লাশে পড়েছি, আড্ডা মেরেছি কফিহাউসে, এমন কি একসঙ্গে বাড়িও ফিরেছি কতদিন—তবু চিরটাকাল আমি ওকে নিরুপমের বন্ধু হিসেবেই দেখেছি। নিরুপমের বন্ধু—এই পরিচিতির বাইরে ওর যে অস্তিত্ব ছিল সেটা আমার নজরে আসে নি।

নজরে পড়বার মত তেমন কিছু দেবদুর্লভ চেহারাও ছিল না শান্তনুর। রোগা মাঝারি লম্বা, নিতান্তই সাধারণ চেহারা। কথা বলার চাইতে কথা শুনত বেশী। তর্ক করলেও সেটা এত মৃদু স্বরে হত যে মনে হত ক্ষমাভিক্ষা করছে। নিজেকে প্রতিভাশালী বলে মনে করার বা জগৎসংসারে যাবতীয় কিছু জেনে ফেলার মত বিদগ্ধতার, কোন কিছুরই প্রয়াস বা ভাণ ছিল না শান্তনুর। দশজনের মধ্যে থাকলে ও যে আছে এই কথাটিই কারও কখনও মনে থাকত না।

শান্তনুর সঙ্গে কলেজি যুগে ভাবটা আমার নিতান্তই আপেক্ষিক ছিল। ক্লাশ থেকে নিরুপমকে ডেকে দেবার, নিরুপমের বাড়িতে আমার জরুরী খবর পৌঁছে দেবার, আমার আর নিরুপমের ঝগড়া মেটাবার অন্যতম উপায় ছিল শান্তনু। কাজেই নিরুপমের প্রয়োজন যেদিন আমার মিটে গেল, সেদিন শান্তনুও আমার কাছে মূল্যহীন হয়ে গেল।

শান্তনুকে আমি প্রথম ভাল করে জানলাম যখন আমাদের কলেজি দিনগুলির স্বপ্ন বহুদিন হল বাস্তব-জীবনের মধ্যাহ্ন-আকাশে মিলিয়ে গেছে, যখন চাকরির ধান্দায় ঘুরে ঘুরে মনের কোণে কণামাত্র রোমান্সের অবশিষ্ট নেই, যখন আমরা সকলেই বছর দেড়েক-দুয়ের ঘা খেয়ে অত্যন্ত বাস্তব হয়ে উঠেছি, ট্রামের পয়সা ফাঁকি দিতে পারলে মনে ভাবি বিশ্বজয় করলাম, উপরওয়ালার নিন্দার মত মুখরোচক অন্য কোন আলাপ নেই।

তখনই প্রায় বছর দুই পরে শান্তনুর সঙ্গে আমার দেখা এক সরকারী অফিসে। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ থেকে আমাদের কয়েকজনকে পাঠিয়েছিল এ অফিসে ইণ্টারভিউ দিতে। একটা ছোট্ট ঘরে আমরা জনতিরিশেক ছেলেমেয়ে বসে বসে গলদঘর্ম হচ্ছিলাম; একটু হাওয়ার আশায় আমি বাইরের করিডোরে বেরিয়ে এলাম। লম্বা করিডোর, মস্ত অফিস, একপাশে সারি সারি ঘর, ফাইলের স্তূপ আলো হাওয়ার গতি রুদ্ধ করেছে।

সেদিকে তাকিয়ে আমার মনটা হঠাৎ বিষণ্ন হয়ে গেল। বাইরে বৈশাখ মাসের উজ্জ্বল তাতানো আকাশ, রোদে গনগন করছে। ঘরের ভেতর এতটুকু রোদের আভাসমাত্র নেই, আলো নেই। সারি সারি ধূলিমলিন ফাইলচাপা টেবিল, উপুড় হয়ে আছে কেরানীর দল। ইণ্টারভিউ লিস্টে আমার নাম শেষের দিকে ছিল। কাজেই আমি বারান্দার থামের গায়ে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার মনে নানাকথা গুঞ্জন করে ফিরতে লাগল। আমার ভবিষ্যৎকে যেন ওই বাইরের রোদতপ্ত অ্যাসফল্টের রাস্তায় নিহত হয়ে পড়ে থাকতে দেখলাম। আমার মনে পড়ে গেল আরও উনত্রিশটা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের
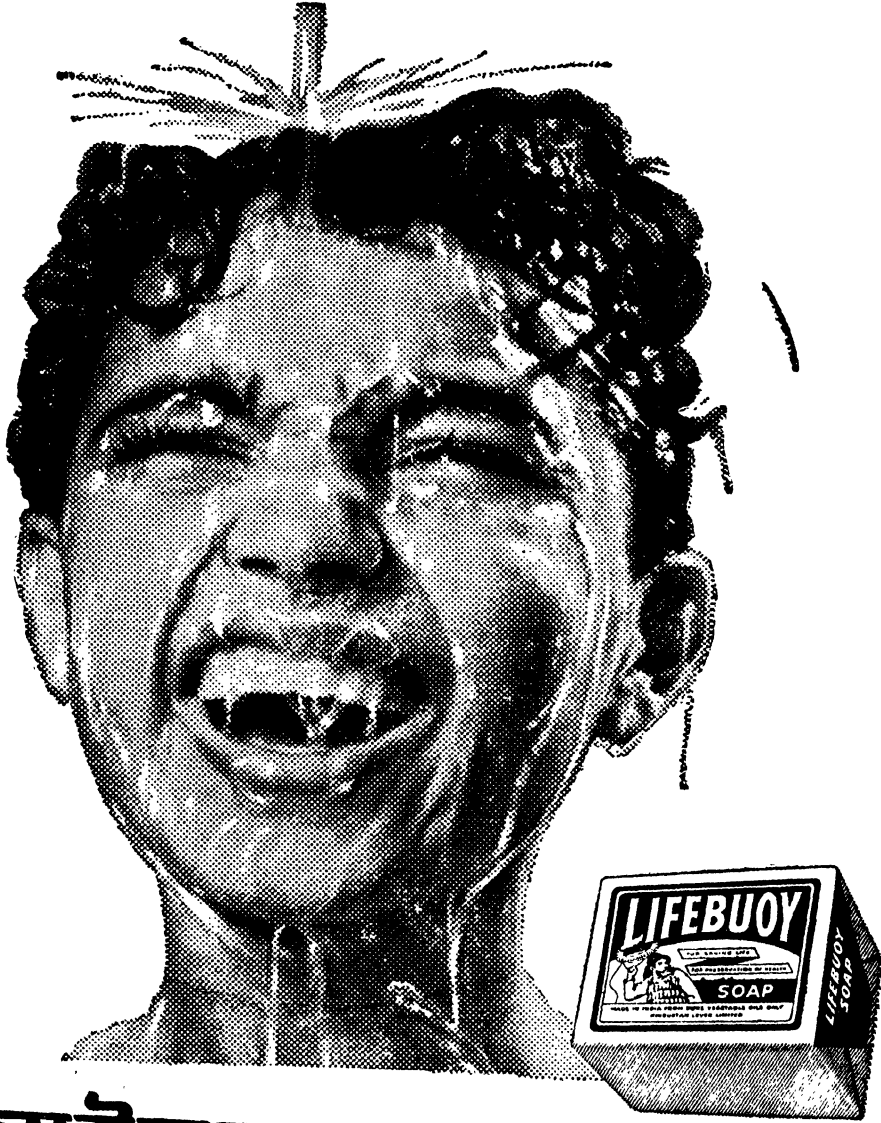
কথা—যে ভবিষ্যৎগুলি আমার সঙ্গেই সমান উৎকণ্ঠায় বিবর্ণ হয়ে অপেক্ষা করছে। সবকিছুই আমার কাছে বিষম ফাঁকি বলে মনে হতে লাগল। হয়তো আরও অনেকক্ষণ আমি ভাবনায় মগ্ন থাকতাম, যদি না আমার কানের কাছে পরিচিত কণ্ঠ শুনতাম—আরে, তুমি এখানে!

ফিরে তাকিয়ে দেখি, শান্তনু। কুশল প্রশ্ন বিনিময়ের পর জানলাম শান্তনু এখানেই চাকরি করে বছর দেড়েক হল।

দু-একটা কথার পর আপনা থেকেই কথা আমাদের ফুরিয়ে গেল। হঠাৎ-দেখার বিস্ময় কেটে গেছে। দুজনের মনেই তখন ধীরে ধীরে পুরনো দিনের কথা মনে পড়ছে। আমি আর শান্তনু দুজনেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। হঠাৎ শান্তনু গলার স্বরটাকে অত্যন্ত নামিয়ে যেন একটা জরুরী কথা মনে পড়ে গেছে এমনিভাবে বলল, জান, আজ নিরুপমের জন্মদিন, বাণীরও।

আমি ছোট্ট করে উত্তর দিলাম, তাই নাকি? কিন্তু মন আমার অনেকখানি ভেবে ফেলল সঙ্গে সঙ্গে। আমি মুহূর্তে মনটাকে গুটিয়ে এনে শান্তনুর দিকে তাকিয়ে হেসে বললাম, আচ্ছা, আমি এবার যাই।

আবার সেই গুমোট করা গরম ঘরে এসে বসলাম। তখনও জনদশেক বাকি। হাফডোর দেওয়া ঘরের কাছে যে লাল উর্দি পরা লোকটা বসেছিল, তার চকচকে পিতলের বোতামের ওপর ঘূর্ণায়মান ফ্যানের ছায়ার দিকে আমি চুপচাপ তাকিয়ে রইলাম। আমার মনে আবার শান্তনুর কথাটা ফিরে এল একটি নীল মাছির মত ডানা ভনভন করতে করতে—আজ নিরুপমের জন্মদিন, বাণীরও। শেষেরটুকু আমার জানা খবর নয়, কিন্তু প্রথমটা? আমি কি জানি নে যে আজ নিরুপমের জন্মদিন—এই জানাটাই কি আজ সকাল থেকে বারংবার আমাকে অন্যমনস্ক করে দেয় নি? ইণ্টারভিউয়ের তাড়া, শেষমুহূর্তে ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট ঠিক আছে কিনা দেখে নেওয়া, নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছবার তাগাদা, এই প্রত্যাশায় বসে থাকার ক্লান্তি, আর সর্বোপরি একটি অনতিক্রম্য হতাশা—সব কিছুকে ছাপিয়েই কি সারাক্ষণ একটি কথাই গুঞ্জন করে নি—আজ নিরুপমের জন্মদিন! আজ নিরুপমের জন্মদিন! শান্তনু কি সব ভুলে গেছে? এ কথাটা কেন আবার ও আমায় মনে করিয়ে দিল? শান্তনুর ওপর কেমন রাগ হল। মনে হল, এ অফিসে চাকরি না হলেই ভাল হয়। হলে তো আবার রোজ শান্তনুর সঙ্গে আমার দেখা হবে, আর ওর প্রতি কথা, ব্যবহার আমাকে বারবার নিরুপমের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। যে কথা আমি ভুলে গিয়েছি, কেন আবার তাকে স্মরণ করে কষ্ট পাওয়া। তার চাইতে এ চাকরি না হলেই ভাল হয়।

আমার আকাঙ্ক্ষা হয়তো আন্তরিক ছিল না। কেন না, চাকরিটা আমার শেষ পর্যন্ত হল, এবং এখানেই হল। এখন মনে হয় ভালই হয়েছিল, নয়তো শান্তনুকে আমার পূর্ণাঙ্গ করে জানা হত না। এর ওর তার বন্ধুত্বের বাইরেও যে শান্তনুর অস্তিত্ব আছে এ কথা আমি কখনও জানতে পারতাম না।

শান্তনু আমায় বলে দিয়েছিল, যেদিন জয়েন করবে আমার সঙ্গে দেখা করো। এই সিঁড়িটা দিয়ে উঠে তেতলায় হাতের বাঁ দিকে যে ঘরটা, সেটাই আমার সেকশান। কিন্তু জয়েন করার পর প্রায় দিন তিন-চার কেটে গেল, আমি শান্তনুর সেকশানে গেলাম না, যাওয়ার ইচ্ছাও ছিল না, মনেও ছিল না।

দিন কয়েক পর শান্তনু এল। বলল, কি ব্যাপার, আমি তো ভাবলাম তুমি জয়েনই কর নি। চল, চা খেয়ে আসি।

তখন দুপুরবেলা, ঘড়িতে দেড়টা বেজে কয়েক মিনিট। বাইরে ঝাঁঝাঁ করছে বৈশাখী রোদ। অফিস থেকে বেরিয়ে আমি আর শান্তনু হাইকোর্টের পাশ দিয়ে একটু এগিয়ে একটা ছোট্ট চায়ের দোকানে ঢুকলাম। ভাঙা নড়বড়ে চেয়ার, নোংরা, মাছি ভনভন করছে। বয়গুলি হাফপ্যাণ্টের ওপর ময়লা গেঞ্জি পরে কোমরে লাল গামছা বেঁধে খদ্দেরের তদারক করছে। চেয়ার টেনে

নিয়ে আমরা বসলাম। অর্ডারমাফিক বয় এসে দু কাপ চা দিয়ে গেল। শান্তনু চামচ দিয়ে চাটা নাড়তে নাড়তে বলল, অনেক দিন পরে আবার তোমার সঙ্গে রেস্তোরাঁয় বসে চা খাচ্ছি—না ?

বললাম, হ্যাঁ।

শান্তনু প্রশ্ন করল, এখানে এলে কেন ?

বললাম, এটা কি একটা প্রশ্ন ? তুমি কি জান না, কেন বছর দুই বেকার ঘোরার পর ছেলেমেয়েরা এসে এখানে ঢোকে ? তা যদি না জেনে থাক তা হলে বলব এখনও কলেজি বইপড়া রোমান্স তোমার চোখে।

শান্তনু হেসে বলল, আর তুমি বুঝি সবকিছু ধুয়ে-মুছে শুকনো খটখটে হয়ে বসেছ।

তাই বোধ হয়।

শান্তনু আর প্রশ্ন করল না, কেন না, ও বোধ হয় বুঝতে পারল কথার সুর কোন্‌দিকে মোড় নিচ্ছে।

তারপর আরও মিনিট পনেরো ধরে আমি আর শান্তনু অফিস সংক্রান্ত নানা গল্প করলাম। এ অফিসের নানা খুঁটিনাটি সম্পর্কে শান্তনু আমাকে ওয়াকিবহাল করল, আর সবচাইতে শেষে হেসে সাবধান করে দিল, খবরদার, অফিসের বারান্দায় করিডোরে দেখা হলে আমাকে বেশী ডেকো না, এখানকার নীতিবোধ কিন্তু এখনও সেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঁধা।

শান্তনু সাবধান করে দিলেও আমার সঙ্গে ওর প্রায়ই দেখা হতে লাগল অফিসের করিডোরে অথবা সিঁড়িতে অথবা ছাদের টিফিনক্লাবে। এবং না চিনে চলে যাবার ভান আমরা কেউই করতে পারলাম না। আমাদের অবস্থাটা ছিল দূর প্রবাসে পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হবার মত। ছাত্রজীবনে যার সঙ্গে জানাশোনা ছিল প্রচুর, অনেকদিন পর আবার এই অফিসের অপরিচিত পরিবেশে তার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াটাই মস্ত একটা লাভের মত মনে হল।

হয়তো বেলা দশটার সময় ঊর্ধ্বশ্বাসে অফিসে আসতে আসতে গেটের কাছে দেখা হয়ে গেল শান্তনুর সঙ্গে। দুজনেই তখন একটু না থেমে পারতাম না। তারপর হাজিরার খাতায় লাল দাগ পড়ার ভয় থাকা সত্ত্বেও, আমরা ধীর পায়ে তিনতলার সিঁড়ি ভেঙে উঠতাম, আর আমার মনে হত, যেন আবার আমরা আমাদের কলেজের সিঁড়ি ভেঙে উঠছি। তিনতলায় উঠলে অফিসারদের ঘরনির্দেশক বিরাট বোর্ডটা দেখতে পাব না, দেখব আমাদের কলেজের সেই বিরাট চকচকে পিতলের ঘণ্টাটা, আর ঘণ্টার পাশে অবধারিত ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে সে—যাকে দেখে শান্তনু আমার দিকে তাকিয়ে একটু অর্থপূর্ণ হাসি হেসে চলে যাবে ওর ইকনমিক্স সেমিনারের দিকে।

আসলে শান্তনুর উপস্থিতিটাই আমার কাছে বিরাট অর্থবহন করে আনত। ও যে আছে, এ উপলব্ধির সঙ্গে আমি যেন নতুন করে আমার সমস্ত অতীতের অস্তিত্ব অনুভব করতাম। ওর কথা বলা, গল্প করা, পুরনো দিনের মত কোন কথার বিশেষ অর্থের ওপর জোর দিয়ে দুষ্টুমির হাসি হাসা, সব কিছুই ওর সঙ্গে সঙ্গে যারা আজ আর আমার কাছে নেই, যাদের সঙ্গে যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে গেছে, তাদের ছায়া বহন করে আনত। আমি আবার পুরনো দিনের স্বাদ পেতাম।

ভাগ্যক্রমে আমার সেকশানটা তিনতলায় শান্তনুর সেকশানের কাছাকাছিই ছিল। মাঝে শুধু একটি বারান্দার ব্যবধান। প্রায়ই ঘড়ির কাঁটা বারোটা ছুঁয়ে গেলে শান্তনু এসে বলত, চল, চা খেয়ে আসি। তারপর আমরা কোনদিন ছাদে টিফিনক্লাবের পাশের সংকীর্ণ ছায়ায় দু কাপ চা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করতাম, কখনও বা রোদতপ্ত পীচের রাস্তা পার হয়ে সেই নোংরা নড়বড়ে চেয়ারসম্বলিত রেস্তোরাঁটাতে চা খেতে যেতাম। আসলে চা খাওয়াটা ছিল ছল। আমরা দুজনেই কিছুক্ষণের জন্যে অফিসের ওই শ্বাসরোধকারী ফাইলের একঘেয়েমির হাত থেকে বাঁচবার জন্যেই যেতাম। তেমনই অফিস ছুটির পর যেদিন সিঁড়িতে নামবার পথে দেখা হত, দুজনের বাড়ি দুমুখো হলেও আমরা একসঙ্গে অ্যাসেম্‌ব্লীর পাশ দিয়ে হেঁটে হেঁটে অফিস-ফিরতি বিরাট জনতার জোয়ার ঠেলে এসপ্ল্যানেডে আসতাম, তারপর

হয়তো এখানে-ওখানে কিছু খেয়ে নিয়ে এ রাস্তা ও রাস্তা ঘুরে, যে যার বাড়ি ফিরে যেতাম কাল দেখা হবে এই আশ্বাস নিয়ে। রোজই যে এমন হত তা নয়, তবে প্রায়ই এমনটি হত।

আমার আর শান্তনুর জীবনটা তখন একসুরে বাঁধা পড়েছিল। আমাদের বন্ধুবান্ধবের মধ্যে যারা কর্মক্ষেত্রে কৃতী হয়েছে, তারা পেশার কৃতিত্বে কখনও নিঃসঙ্গ বোধ করে নি। কিংবা একটি নিষ্ফল হতাশা তাদের সমস্ত ধ্যানের জগৎকে গুঁড়িয়ে দেয় নি। কিন্তু আমার আর শান্তনুর দুজনের জীবনেই সেই নিষ্ফলতা ক্রমেই মাথা উঁচিয়ে উঠছিল। আমরা দুজনেই ছাত্রজীবনে নিতান্ত অবজ্ঞাত ছিলাম না। আমরাও কবিতা পড়েছি, তর্ক করেছি, সমস্ত মানবজীবনের সামগ্রিক মুক্তি চেয়েছি। সেদিন আমাদের চিন্তাধারা পৃথিবীর কোন মনীষীর চিন্তাধারা থেকেই খর্ব ছিল না। তবু কর্মজীবনে সামগ্রিক মানবসমাজ দূরে থাক্, নিজেদেরই মুক্তি খুঁজে পাই নি। দু বছর বেকার থাকার পর আমি বুঝেছি, ধ্যানের জগতের সঙ্গে বাস্তবের কত অমিল, দু বছর কেরাণীগিরি করে শান্তনু জেনেছে ধ্যানের জগতের সঙ্গে বাস্তবের কত তফাত।

বহুদিন পর দেখা হওয়ায় আমরা তাই পরস্পরকে আঁকড়ে ধরেছিলাম একটি প্রাক্তন মমতায়। অফিসের ওই আধো অন্ধকার রৌদ্র-বাতাসবিরহিত ঘরগুলি, স্তূপীকৃত বিবর্ণ হলদে ভাউচার, ধূলিমলিন ফাইলের গাদা, আর নির্জীব একদল সহকর্মী ও সহকর্মিণী। এদের মধ্যে ছুটি যদি কোথাও থাকত, স্বাদ বদলাতে যদি হত, তবে দেড়টা দুটো আর পাঁচটার অবসরে আমার আর শান্তনুর পরস্পরের সঙ্গে দেখা করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

আমাদের পুরনো বন্ধুরা এ ওখানে হারিয়ে গিয়েছিল, নতুন বন্ধুদের সঙ্গে যথেষ্ট হৃদ্যতা গড়ে ওঠে নি। শান্তনু আর আমার আলাপ তাই প্রায়শঃই পুরনো গণ্ডীগুলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেত।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে, এক পা থেকে শরীরের ভার অন্য পায়ে চালান দিতে দিতে শান্তনু বলত, সুব্রতর খবর শুনেছ, বিলেত যাচ্ছে।

আমি বলতাম, জান শান্তনু, সেই যে প্রকাশ ছিল, সেই যে ফরসামতন বেঁটে, ও না, সন্ন্যাসী হয়ে গেছে, রামকৃষ্ণ মিশনের খাতায় নাম লিখিয়েছে।

শান্তনু হাসত, আমিও হাসতাম। সন্ন্যাসী হয়ে যাবার মধ্যে যে কতখানি এসকেপিজম লুকনো আছে তাই নিয়ে গবেষণা করতাম, দুজনেই একমত হতাম। মতবিরোধ যে হত না তা নয়, হত। যখন শান্তনু পুরনো দিনের মত কথাপ্রসঙ্গে আধুনিক কবিতার প্রশংসা করতে যেত, অথবা আমি যখন কোনও কবির রাজকীয়তা বর্ণনা করতে যেতাম, তখনি আবার তর্কের সূত্রপাত হত। কিন্তু বলা বাহুল্য, আগের মত এ তর্ক নিরবচ্ছিন্ন হত না। সময়ের সংক্ষেপতায় বাধ্য হয়ে যে যার সেকশানে ফিরে যেতাম।

তারপর সারাটা দিন ধরে হিসাবের খাতার ওপর উপুড় হয়ে থাকা। গভর্মেন্টের রাজস্বের খাতে কোথায় কত ব্যয় হল, কোথায় কোন্ ফুটো দিয়ে কত লক্ষ টাকা তলিয়ে গেল তারই অনুধাবন করা, আর ঘড়ির ছোট কাঁটাটি পাঁচটায় না পৌছনো পর্যন্ত শুধু যোগ আর বিয়োগ, বিয়োগ আর যোগ।

কোন কোনদিন পাঁচটা না বাজার আগেই এসে উপস্থিত হত শান্তনু। বলত, উঃ, যোগ করে করে মাথা ধরে গেছে, চল এবার।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে একটা টুল ঠেলে দিয়ে বলতাম, বস, এখনও পাঁচটা বাজে নি, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট চটবেন রোজ রোজ আগে পালালে।

শান্তনু টুলটা টেনে নিয়ে বসে বলত, কি করছ?

হুগলীর কালেক্টরকে চিঠি লিখছি।

ও বাবাঃ, কিন্তু কেন?

আর বলো না, পাঁচশালা পরিকল্পনায় যাদের জমি গেছে তারা ক্ষতিপূরণ পেল কিনা জানতে।

আমি দ্রুত হাতে বাঁধা গতে ড্রাফ্‌ট লিখতাম। শান্তনু পেপারওয়েটটা লুফতে লুফতে বলত, তুমি কলেজে

দিনে
দিনে
দিনে
দি...
রেক্সোনা সাবানে 'ক্যাড্‌ল' বলে একটি বিশেষ ধরনের তেল মেশানো হয়, যাতে ত্বক আরও কোমল, আরও সুন্দর, আরও লাবণ্যময়ী হয়...। সুবাস ভরা রেক্সোনার পরশ সারাদিন আপনাকে সজীব আর সতেজ রাখে। সৌন্দর্য্য সাধনায় সর্ব্বদা রেক্সোনা ব্যবহার করুন!
Rexona
BLENDED WITH
রেক্সোনা সাবানে আপনার ত্বককে আরও লাবণ্যময়ী করে।
রেক্সোনা প্রোপাইটরী লিঃ অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে ভারতে
হিন্দুস্থান লিভার লিঃ তৈরী।
RP. 164-50 BG

চেষ্টা কর না কেন? চারপাশে তো কত মেয়েদের নতুন কলেজ হচ্ছে, অ্যাপ্লাই করলেই পার।

আরে দূর, ও অ্যাপ্লাই করাই সার!

লেগেও যেতে পারে। দেখ না চেষ্টা করে।

লেগে অবশ্য শেষ পর্যন্ত গেল, এবং আমিও একসময় ওল্ড পোস্ট-অফিস স্ট্রীটের সেই পুরনো লাল বাড়িটার অনেক হিসাবনিকাশের মায়া কাটিয়ে, কলকাতা থেকে অনেক দূরে তিস্তা নদীর পারে এই শহরটাতে এসে বাসা বাঁধলাম। এখানকার উদার আকাশ, দিগন্তবিস্তৃত পটভূমি, দূর নীলাভ পাহাড়ের সারি, সবকিছুই কলকাতার রৌদ্রদাহিত নিষ্ফল দিনগুলির থেকে অনেক পৃথক ছিল, এবং সকালবেলার নিরুত্তাপ রোদে পিঠ দিয়ে বসে লেকচার-নোট তৈরি করার ফাঁকে ফাঁকে অনেকবারই মনে হয়েছে শান্তনুর গল্পটা এবার বোধ হয় লিখতে পারি। তবুও যে কেন লেখা হল না, সে কথা বলতে বলা প্রয়োজন সেই সব দিনগুলির কথা, যখন আমি এই বেসরকারী কলেজটাতে লেকচারারশিপ জোটাতে পারি নি, যখন সরকারী অফিসের হিসেব পরীক্ষা করে আমার দিন কাটছে।

তখনি একদিন শান্তনুকে ডাকতে গিয়েছি ওর সেকশানে। শান্তনু নীচু হয়ে ভাউচারের ওপর ঝুঁকে ছিল; আমি দু-একবার বারান্দা দিয়ে যাতায়াত করলাম, ইতস্তত: করছিলাম ডাকব কি ডাকব না। এমন সময় শান্তনু উঠে এল বাইরে, হেসে বলল, কতক্ষণ এসেছ?

কেন বল তো।—আমি বললাম।

আমার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডেকে দিয়ে বললেন, যান, আপনার বান্ধবী অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন।

আমরা দুজনেই হাসলাম। শান্তনু বলল, কাল আমাদের সিনিয়র ক্লার্ক পরেশবাবু কি বলেছেন জান? কাল তুমি যখন আমার নাম ধরে ডাকলে, উনি শুনতে পেয়েছিলেন। পরে আমাকে সেকশানের সবাইকে শুনিয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ও মশাই, ওই মহিলাটি আপনার কে হয়, অ্যাঁ?

ক্লাসফ্রেণ্ড।

অ, কেলাশ ফ্রেণ্ড!—পরেশবাবু সশব্দে নাকের নস্যি ঝেড়ে বলেছিলেন, তা, আপনাদের কলেজে বুঝি নাম ধরে ডাকাডাকির ব্যাপার ছিল, কোন্ কলেজে পড়তেন, অ্যাঁ?

আমি হেসে বললাম, তা তুমি কি উত্তর দিলে?

কিছুই উত্তর দিই নি, বড্ড রাগ হয়ে গিয়েছিল।—শান্তনু গম্ভীরমুখে বলল।

সাময়িক রাগ হলেও শান্তনু জানত এবং আমিও জানতাম যে এ রকম একটা জনশ্রুতির সম্মুখীন একদিন না একদিন আমাদের হতেই হবে। কিন্তু এর অন্য দিকটা আমাদের জানা ছিল না।

শীতের বিকেলে আমি আর শান্তনু হাঁটতে হাঁটতে এসপ্ল্যানেডে এলাম। শান্তনু বলল, চল, বসি কোথাও।

তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে সমস্ত এসপ্ল্যানেডের ওপর। অন্ধকারে কুয়াশা ঠেলে আমরা দুজনে গিয়ে সুরেন্দ্রনাথের মূর্তির নীচের ধাপগুলির একটায় বসলাম। আমি আলোয়ানটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিলাম, শান্তনু পাশে বসে পকেট থেকে চিনেবাদামের ঠোঙা বার করে বলল, নাও, খাও।

ধরতে-টরতে পারব না, ভেঙে দিলে খাই।

শান্তনু হেসে ফেলল। তারপর চিনেবাদামের খোসা ভেঙে একটা দানা আমার হাতে আর একটা নিজের মুখে পুরতে লাগল।

এ কথা সে-কথার পর আমি বললাম, জান, কাল সুখেন্দুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, ও এমন রহস্যপূর্ণভাবে তোমার কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করল যে আমি অবাক হলাম।

শান্তনু মুখ নীচু করে চিনেবাদামের খোসা ভাঙতে ভাঙতে বলল, এমনি যে রোজ কতজন তোমার কথা আমাকে রহস্যপূর্ণভাবে জিজ্ঞাসা করে, তার ঠিকঠিকানা নেই।

তার মানে ?

তার মানে এই, তোমার আমার সম্বন্ধটা যে অত্যন্ত রহস্যময়, গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে।

আমি একটু হাসতে চেষ্টা করলাম; তারপর দূরে নিয়ন আলোর জ্বলা-নেভা বিজ্ঞাপনটার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম, তোমার কিছু মনে হচ্ছে না এতে ?

আমি অত্যন্ত গর্বিত বোধ করছি।—শান্তনু বলল।

কেন বল তো ?

বাঃ, তোমার মতন একজন কলাবতীর সঙ্গে যদি আমার কোন প্রণয়সম্বন্ধ ঘটেই থাকে তা সে সত্যি হোক মিথ্যে হোক, আমি তো নিজেকে অত্যন্ত লাভবান বলে মনে করব।

আমি রাগ করে বললাম, যাঃ, কি ঠাট্টা করো।—তারপর গলার স্বরকে গভীর করে বললাম, আচ্ছা শান্তনু, তোমার কি মনে হয় না, আমরা এতদিন ধরে পরস্পরের সঙ্গে মিশছি, তবু কত কম জানি পরস্পরকে।

কি রকম ?

এই দেখ, আজ ছ-সাত বছর তোমার সঙ্গে আলাপ, তবুও তোমার সম্বন্ধে আমি কত কম জানি। তোমার মা-বাবা আছেন কিনা, ক ভাইবোন তোমরা, তোমাদের বাড়ি রক্ষণশীল কিনা, পারিবারিক আয় কত—

শান্তনু এবার জোরে হেসে ফেলে বলল, তোমার মতলবটা কি বল তো ?

মতলব কিছুই নেই, আস্তিনের তলা ফাঁকা। মতলব এই, আমি তোমায় নিয়ে একটা গল্প লিখব।

শান্তনু কারণ জানতে চাইল, তখন আমি ওকে সেইসব কথা বললাম। বললাম, কেমন করে ওকে আমি শুধুমাত্র নিরুপমের বন্ধু বলে চেনার গণ্ডীর বাইরে ফেলে রেখেছিলাম, আর নিরুপম—যার জন্য আমি একসময় আমার সবকিছু বিলিয়ে দিতে পারতাম তার জন্য আজ মনের কোণে এক অপরিসীম বিতৃষ্ণা ছাড়া অন্য কোন অনুভূতি বর্তমান নেই। শান্তনুও কি করে একসময় আমার সেই বিতৃষ্ণার পাত্র হয়েছিল সে শুধু নিরুপমের বন্ধু বলেই।

অন্ধকারে শান্তনু দেখতে পেল না, না হলে দেখত, নিরুপমের নামের শুধুমাত্র উচ্চারণ আজও আমার চোখ ছলছলিয়ে তোলে।

শান্তনু সিগারেট ধরিয়ে বলল, তুমি নিরুপমকে যে এত ভালবাসতে সে কথা আমি আগে জানি নি, জেনেছি অনেক পরে।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, থাক শান্তনু, সে ভালবাসা আর বেঁচে নেই, শুধু তার ঘৃণা আর বিদ্বেষের গ্লানি আমার হৃদয়কে চিরকালের মত পঙ্গু করে দিয়ে গেছে।

কিন্তু তোমার কি মনে হয় না: কিছুক্ষণ চুপচাপ সিগারেট টানার পর শান্তনু বলল, এইসব ছোটখাটো ব্যর্থতার চাইতে জীবন অনেক বড়। আর তা ছাড়া হয়তো অদূরভবিষ্যতে তুমি আর কাউকে ভালবাসতে পাবে, তখন আর এই ব্যর্থতাবোধ তোমার থাকবে না।

কিন্তু আমি আর ভালবাসতে চাই না। জীবনের ওই দিকটার ওপর আমার আর আকাঙ্ক্ষা নেই। তার চাইতে ছোটখাটো বন্ধুত্ব, সামান্য স্নেহের প্রীতির সম্পর্ক—জীবনের ফাঁক ভরে দিতে এরাই পারবে।

তারপর আমি শান্তনুর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললাম, দেখ শান্তনু, তুমি আমার বন্ধু, এই ক মাসে আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছ। আজ তোমাকে আমাক নিয়ে জনশ্রুতি রটেছে। তবু আমি তোমাকে অনুরোধ করব, যদি কোনদিন আমার প্রতি তোমার মনোভাব বদলে যায়—আমি জানি তা হবে না, তবুও তুমি কোনদিন সে-কথা আমাকে বলো না। আমাকে কখনও জানতেও দিয়ো না। আজ যে রকম নিঃসঙ্কোচ সম্পর্কে দুজন দুজনের পাশে বসে চিনেবাদাম খাচ্ছি, এমনি সম্পর্কই যেন চিরকাল থাকে।

শান্তনু কথাটা শুনে কিছুক্ষণ নিঃশব্দ থেকে ওর স্বভাববিরুদ্ধ জোরে হেসে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কি মুশকিল, আমি যে তোমাকে বলতেই এসেছিলাম। দেখ দেখি এমন সুন্দর সন্ধ্যা বিফলে গেল।

সব সময় ঠাট্টা ভাল লাগে না।—বলে আমিও উঠে দাঁড়ালাম। তারপর দুজনে খুশী মনে রাস্তা পার হয়ে

বাস স্টপেজে এলাম। শান্তনু আমাকে বাসে তুলে দিতে গিয়ে বলল, দেখ, গল্পের নায়কত্ব থেকে আমাকে আবার খারিজ করো না কিন্তু।

নায়ক হবার খুব শখ যে।—বলতে বলতে বলতে আমি বাসে উঠে গেলাম।

ভীষণ ভিড়ে ঠেলাঠেলি করে অনেক মন্তব্য শুনে যখন এক কোণে জানলার পাশে বসলাম, তখন আবার শান্তনুর ভাবনা আমার মনে ফিরে এল। শীতের রাত্রির কুয়াশার ফাঁক দিয়ে দু-একটা তারা মিটমিট করছে। চৌরঙ্গীর বড় বড় বাড়িগুলি দ্রুত সরে যাচ্ছে দৃষ্টিসীমানা থেকে। পেছনে সহযাত্রীদের নানা টুকরো কথার গুঞ্জন। সবকিছুর সঙ্গে জড়িয়ে বারবার শান্তনুর কথাই আমার মনে পড়তে লাগল। মনে পড়ল অনেক বছর আগের আমাদের সেই থার্ডইয়ার ফোর্থইয়ারের দিনগুলির কথা—যখন আমরা সকলেই ছেলেমানুষ ছিলাম, সবকিছুকেই হেসে উড়িয়ে দেবার ক্ষমতা ছিল, যখন আমি শান্তনু নিরুপম দিনের পর দিন গল্প করে আড্ডা মেরে তর্ক করে কাটিয়েছি। বাসের চাকার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে একটি বিষণ্ণ সুর বাজতে লাগল, আমি যেন আবার নতুন করে বুঝতে পারলাম, কাউকে ধরে রাখা বৃথা, কারুর জন্য আকাঙ্ক্ষা করা বৃথা, জীবনের এক চলিষ্ণু স্রোতে আবার সবাই ভেসে যাচ্ছি এ ঘাট থেকে ও ঘাটে।

এরপর মাসখানেকের তুচ্ছতা অনায়াসেই বাদ দেওয়া যায়। আমাদের গতানুগতিক জীবনযাত্রায় কোন ব্যতিক্রম ঘটল না। তবু এরই মাঝে শীতকাল যখন তার কুয়াশার চাদর গুটিয়ে নিতে শুরু করেছে, প্রথম ফাল্গুনের সূচনা হিসেবে দেবদারুর ডালে দু একটি নতুন পাতার মঞ্জরী দেখা দিয়েছে, সেই সময়েই একদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরে দেখি আমার জন্যে একটা নতুন খবর অপেক্ষা করছে লম্বা হলদেটে খামের ভেতর অনেকগুলি স্ট্যাম্পের ছাপ বুকে নিয়ে। মাস দেড়েক আগে একটা ইণ্টারভিউ দিয়েছিলাম—তারই ফলাফল।

অফিসে খবরটা রটতে বেশী দেরি হল না। আমিই দু-একজনকে বলে থাকব।

ছুটির কিছু আগে শান্তনু এসে উপস্থিত: তুমি নাকি চলে যাচ্ছ?

সোজাসুজি বলতে পারলাম না, হ্যাঁ। বললাম, কার কাছ থেকে শুনলে?

শুনলাম, কিন্তু তুমি তো আমাকে বল নি।

আমি চুপ করে রইলাম। কি করে বলব? আমি কলেজে কাজ পেয়ে যাচ্ছি, এটা নিঃসন্দেহে সুখবর কিন্তু শান্তনুর কাছে বলবার মত সুখবর এ নয়। শান্তনু জানে না কিন্তু আমি তো জানি, পুরনো বন্ধুত্বের নতুন করে গড়ে তোলা সম্বন্ধ এবার আবার ভাঙতে শুরু করবে, আবার এমন দিন আসবে যেদিন আমার বা শান্তনুর কারুরই পরস্পরকে মনে থাকবে না। এই ন-দশ মাসে পরস্পরের সান্নিধ্যে যেটুকু অভ্যাসের সৃষ্টি হয়েছিল সেটুকু ভুলতে ন-দশ দিনও লাগবে না। এ নিয়ে হা-হুতাশ করা বৃথা, এ ব্যর্থতাবোধও অন্তর্লীন নয়; তবু যখন চলে যেতে হবে, তখন শান্তনুকে ছেড়ে যেতে হবে ভেবেই আমার সবচাইতে কষ্ট হতে লাগল।

হাতে সময় ছিল কম। কলকাতা ছেড়ে যাবার শেষকটা দিন তাই দোকানপাট-কেনাকাটা করতেই কাটল। যাবার আগের দিন শান্তনু বলল, চল, তোমাকে একটা বই কিনে দিই।

কি বই দেবে?

যা চাইবে।

'ওয়েস্টল্যাণ্ড'?

তাই দেব, চল।

শেষ বিকেলটাও আমাদের ঘুরে ঘুরেই কাটল। উদ্দেশ্যহীন ভাবে এ রাস্তা ও রাস্তা ঘুরে কলেজ স্ট্রীটে বই কিনে, কফিহাউসে কফি খেয়ে, গল্প করে যখন অবশেষে আমরা বাড়ি ফিরে যাবার জন্য রাস্তায় নামলাম, তখন ত্রয়োদশীর চাঁদ আমাদের কলেজের মস্ত দেবদারু গাছগুলির পাতার ঝিলমিলানির ফাঁকে দেখা যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে আমরা দুজনেই বিষণ্ণ হয়ে গেলাম।

নতুনের অভি…

দিকে দিকে আজ নতুনের অভিযান—নবীন
শিশুর আত্মপ্রকাশের ক্রন্দন বয়ে নিয়ে আসে নতুনের সংকেত,
সাড়া জাগে লক্ষ মানুষের প্রাণে, তারা জেগে ওঠে, চেষ্টা
দিয়ে, কর্ম্ম দিয়ে জাতিকে তারা নতুন করে গড়বেই.....মহৎ
কাজের প্রচেষ্টা থেকেই একদিন শ্রান্তিময়,
ক্লান্তিময় পৃথিবীতে আনন্দ আর সুখ উৎসারিত হবে।
বৈচিত্র আর অভিনবত্ব জীবনকে করে তুলবে সুন্দরতর।
কালের জড়তা ভুলে অতীতের এক মহান
জাতিও আজ তাই জেগেছে, পেয়েছে সে নতুনের আহ্বান......

আজ সমৃদ্ধির গৌরবে আমাদের পণ্যদ্রব্য এ দেশের সমগ্র পারিবারিক পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন, সুস্থ ও সুখী করে রেখেছে। তবুও আমাদের প্রচেষ্টা এগিয়ে চলেছে আগামীর পথে—সুন্দরতর জীবন মানের প্রয়োজনে মানুষের চেষ্টার সাথে সাথে চাহিদাও বেড়ে যাবে। সে দিনের সে বিরাট চাহিদা মেটাতে আমরাও সদাই প্রস্তুত রয়েছি আমাদের নতুন মত, নতুন পথ আর নতুন পণ্য নিয়ে।

আজও আগামীতেও...দশের সেবায় হিন্দুস্থান লিভার

PR 2-X52 BG

কতদিন, কত খুশীভরা দিন আমরা এখানে কাটিয়েছি, সেদিন আর ফিরে আসবে না। আমাদের দুজনেরই প্রায় একসঙ্গে মনে পড়ল, আজও যে অপরাহ্ণ কাটিয়ে এলাম—ত্রয়োদশীর চাঁদ ওঠা, ফাল্গুনের উষ্ণ বাতাস দেওয়া এই অপরাহ্ণও আর কখনও আমাদের জীবনে ফিরে আসবে না। এর পর হয়তো আমরা আরও অনেক বিকেল অন্যভাবে কাটাব, কিন্তু আমাতে শান্তনুতে এমনি ভাবে কাটাব না, তখন শান্তনুর পাশে আমি থাকব না, আর যদিই বা ফিরে আসি, It will be another yarrow।

স্টেশনে তুলে দিতে এসেছিল শান্তনু। ট্রেনের জানলার ওপর হাত রেখে বলল, চিঠি লিখো, আর—

আর কি ?

আর গল্পটা এবার শেষ করে ফেলো।

আমি হেসে বললাম, আচ্ছা।

শান্তনু বলল, তোমার এ গল্পের নায়ককে বাঁচিয়ে রাখবে তো ?

তুমি কি ওই ভাবে অমর হতে চাও ?

কি আর করব, অন্যভাবে তো কোন পথ নেই, যদি তোমার গল্পের নায়ক হয়ে বাঁচা যায়।

তা হলে বলব, বাংলাদেশের শতকরা নিরানব্বইটা নায়কের মত এ নায়কও স্বল্পপ্রাণ, ক্ষীণজীবী।

শান্তনু প্রত্যুত্তরে একটুকরো ম্লান হাসি ফিরিয়ে দিল।

বাইরে প্ল্যাটফর্মের কোলাহল, ভেণ্ডারদের হাঁকডাক, কুলীদের চিৎকার, যাত্রীদের ব্যস্ততা, এরই মাঝে সবুজ নিশান উড়িয়ে দিল গার্ডসাহেব। ট্রেন ছেড়ে দিল।

ট্রেনের সঙ্গে দু-এক পা এগিয়ে যেতে যেতে শান্তনু আমার চোখে চোখ রাখল, তারপর অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলল, না হয় না গেলেই পারতে, কি হল এত দূরে গিয়ে, শুধু শুধু আমাকে—

ট্রেনের চাকার শব্দে শেষ কথাটা আর শোনা গেল না।

শান্তনুকে কথা দিয়ে এসেছিলাম কিন্তু তারপর এক এক করে দশটা বছর কেটে গেছে। শান্তনুর গল্প লেখা আর হয়নি। আজ শান্তনুর সঙ্গে আর কোন যোগাযোগ নেই আমার। আরও অনেক পুরনো স্মৃতির মত শান্তনুও বিস্মৃতি হয়ে গেছে।

অনুমান করতে পারি আজও হয়তো শান্তনু দশটা-পাঁচটা সেই লাল বাড়িটার গর্ভে নিহিত থেকে সরকারী গণনার খাতায় নতমুখে অঙ্কপাত করে। আজও ছুটির শেষে ভিড় ঠেলে ট্রামেবাসে ঝুলতে ঝুলতে বাড়ি ফেরে, তবে আজ আর বারোটা দুটো পাঁচটার স্বাদ বদলানোর জন্য কোন বান্ধবীর প্রয়োজন নেই, কারুর গল্পের নায়ক হবারও কোন বাসনা নেই।

এদিকে আমারও রুপোলী চুলের দু-একটি আভাস আয়নার সামনে চিকচিকিয়ে ওঠে। গালের রেখাগুলি গোপনসাধ্য নয়। তবু এখনও ছাত্রীদের লেকচারের নোট তৈরির ফাঁকে জানলা দিয়ে সুখী মেঘ আর নীলাভ পাহাড় দেখতে দেখতে শান্তনুর অলিখিত গল্পটির কথা মনে পড়ে যায়। লেখবার সাধও জাগে। তবু লেখা হয় না।

কেন না, শান্তনুর গল্প সে তো শুধুমাত্র শান্তনুরই গল্প নয়, সে যে আমারও গল্প—আমাদেরই আর একটি বেহিসেবী ভুলের গল্প। সেদিন মুখে স্বীকার না করলেও আমরা কি জানতাম না যে আমরা দুজনেই দুজনকে কতখানি—

কিন্তু সে কথা থাক্।

ওদের পথের দিকে

কুমুদ ভট্টাচার্য

ওদের পথের দিকে
অনেকক্ষণ তাকিয়েছিলাম।
ওরা—যারা গেছে সংখ্যাতীত
আমি এসে পৌছবার আগে।
আর, গেল
চোখের সমুখ দিয়ে যারা।

দেখলাম
কেউ ফিরল না।

কত দীর্ঘ পথ?
কত দিনে ফেরা যায়?

অবশ্য, এখানে
সকলেই বলেছিল,
ওরা ফিরবে না।
ওরা শুধু যায়—আর যায়।

অনিকেত ভাবনার অগাধসমুদ্রসঞ্চরণ!
কূলে উঠে আসি নে কখনও।
খুশী হয়ে বলতে পারি না—
আছে আছে তল আছে অতলে কোথাও।

তথাপি কি নেই কোনখানে
বেদনাক্ত প্রারম্ভের কোন পরিপূর্ণ পরিণতি?

●

দেয়া

শ্রীকৃতান্তনাথ বাগচী

মেঘের ছায়ায় ঘনিয়ে আসে নিবিড় ঘুমঘোর
সে কোন্ দূরে স্বপনপুরে হল নীরব ভোর!
অবাক হয়ে চেয়ে থাকি
কোন্‌টা আসল, কোন্‌টা ফাঁকি,
দোসর কে সে গোপন প্রাণে পরায় সুরের ডোর!
মেঘের ছায়ায় ঘনিয়ে আসে নিবিড় ঘুমঘোর।

মরণনীল আঁচলতলে সোনার দীপ নিয়া
বেরিয়ে এলো দুয়ার খুলি কতকালের প্রিয়া।
ক্ষণে ক্ষণে মুখের পানে
কালো চোখের চমক হানে,
পড়ায় মনে অভিমানের অশ্রুফোঁটা দিয়া।
মরণনীল আঁচলতলে সোনার দীপ নিয়া।

না-বোঝা যত বেদনাভার বহিতে নাহি পারি,
কে তুমি নিলে উদাস মন সহসা মোর কাড়ি!
ঘুচিয়া যাক মুখের বাস,
মুক্তি পাক মাটির ঘাস,
পুবালিবায়ে হৃদয় দেয় জানার পারে পাড়ি।
না-বোঝা যত বেদনাভার বহিতে নাহি পারি।

কাঁটার বনে বুলায়ে দাও বিলোল মায়া-আঁখি,
ফুটুক কেয়া, জলের গানে পাগল হোক পাখি।
রোদের রঙ দাও গো ধুয়ে,
শ্যামল খুশী পড়ুক নুয়ে,
বাউল বেশে দাঁড়াবে এসে উদ্দাম বৈশাখী,
ভুঁইচাঁপাতে কৃষ্ণচূড়ার শেষ কথাটি রাখি।

●

বালুমন

বীরেশ্বর বসু

কখন যে বালুমন—
ডুবে যায় সাগরের জলে,
যেখানে অসংখ্য ঢেউ
সাদা সাদা অন্তহীন ফেনা।
জল হাসে মাছ হাসে
তার সাথে বিচিত্র ঝিনুক ;
অনেক অনেক ছবি—
সুখ দুঃখ বেদনা অতীত !

ওপারেতে সূর্য ওঠে,
সোনামন সোহাগী রূপসী—
রাতের কুয়াশা কাটে, অন্ধকার ভয়,
নুলাদের ছোট ডিঙি এপারেতে ভিড়ে
বিচিত্র লোকের ভিড়—
অভিনব নতুন সংলাপ,
মনের অতল জলে বিস্মৃত বিস্ময়
এর মাঝে ঘণ্টা বাজে পুরীর মন্দিরে
স্বর্গদ্বারে ভিড় জমে শব্দ ঝাউবনে !

দুপুরেতে বালু ওড়ে—
বিড়ম্বিত উত্তপ্ত বাতাস
ঘরের কপাট বন্ধ নিরর্থ জীবন
কানে বাজে ঝিঁঝি শব্দ—
অবসন্ন রুগ্ন এই মন !
পৃথিবীর অনুরূপ সমুদ্র ভীষণ
নিতান্ত নির্মম সব—
একা অসহায় !

বিকেলে আরেক স্বাদ—
অন্যমন, অনন্য সংবাদ
এমনিতর রূপ তার সমুদ্র-সফেন,
অনেক ঝিনুক আর
বিকেলের শান্ত স্নিগ্ধ রোদ,
ফেনা হয়ে ভেসে যাই—
কোন দেশে অতলে অসীমে —
কোথায় বালুর মাঠ
বিলীন অস্তিমে !
তারপর বিকেল গড়ায়
ধূপছায়া অন্ধকার—
আকাশে মেঘেরা হাসে—
সূর্য ডোবে সমুদ্র কোথায় !
চোখের সহজ তীরে—
ধুধু মাঠ, বালুর পাহাড় !

●

প্রথমা

সনৎকুমার মিত্র

পায়ে-হাঁটা পথ ধরে গ্রাম, গঞ্জ, শহরের পর
রাজধানী দূরে রেখে সাগরেও বেহালার ছড়
টেনে টেনে পৌঁছেছি দ্বীপ থেকে এই মহাদ্বীপে ;
কি আশ্চর্য, সব ঠেলে তবু আজ মনের সমীপে
ভাঁটফুল, বুনোঝাউ, বালিহাস উড়ে উড়ে আসে।
সব ছবি মুছে যায় এক মাঠ সবুজাভ ঘাসে ॥

গগনচুম্বী চূড়া, বিজলী-উজ্জ্বল নাচঘরে
সফেন রঙিন গ্লাসে সাত-রঙ রামধনু ঝরে—
কি আশ্চর্য, সেখানেও সব ছবি মুছে যায়, আর
চোখের আকাশ জুড়ে প্রেরণার প্রচুর সম্ভার
একটি সলজ্জ হাসি নিজেকে উজ্জ্বল করে রাখে।
একটি ফুলের নামে যার নাম, সে আমাকে ডাকে ॥

●

নির্মোক

সন্তোষকুমার অধিকারী

আলোর সুতীব্র দীপ্তি আমায় দিয়েছে ক্লান্তি,বহু বিড়ম্বনা।
উচ্চাশা আকাঙ্ক্ষা লোভে শহরের বহুতর জান্তব যন্ত্রণা,
বিষাক্ত মৃত্যুর মত। পেয়েছি প্রচুর সুখ খ্যাতি অর্থ যশ
জনারণ্য···জীবনের ঈপ্সিত আলোকসজ্জা। হৃদয় বিবশ
চায় এক নির্জন মুহূর্তমাত্র, অনুদ্বেগ অপরাহ্ণকাল ;
বিজন স্বগতচিন্তা, শহর-সংশ্রবহীন অখণ্ড আড়াল।

তাই তো বলেছি আমি,—থাক্ পড়ে জীবনের সম্ভাবনাময়
উজ্জ্বল মুহূর্তগুলো। হিতৈষণা অহেতুক শুভার্থীজনের
অথবা অবাক্ মুগ্ধ উচ্চকিত কলরোল,—আমি পাই ভয়।
জীবন ক্ষীণায়ু স্বল্প, আরও ক্ষুদ্র খ্যাতির জীবন ; প্রত্যহের
মুহূর্ত মৌসুমীফুল। গন্ধহীন অপরাহ্ণে লুপ্তির আঁধার
আমি যে প্রত্যক্ষ জানি। তাই এ যশের মাল্য
সমারোহভার
আমার যন্ত্রণামাত্র। জীবনের যে প্রকাশে জেগেছে আলোক,
আমি তার জেনেছি স্বরূপ, তাই ছিঁড়ে যেতে চাই এ
নির্মোক ॥

স্মৃতিরজনী

চুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায়

এক রজনীর মধুর কাহিনী লেখা মরমের মাঝে :
আজও মোর কানে বাজে ;
আকাশ-বাতাস পাগল-করানো মনোমাতনের সুর,
সেই রাত ছিল উতলা প্রাণের উল্লাসে ভরপুর।
একটি নিশির তরে
সাধের বাসর ঘরে
কাটিয়েছিলাম অতি আনন্দে আমি গো জীবনযাত্রী
বিফলতা-ভরা সারাজীবনের সে এক সফল রাত্রি।

চারিদিকে মোরে ঘিরিয়া অনেকে ছিলো যে অনুক্ষণ,
তবু তার মাঝে কাহারে যেন গো খুঁজেছিল দু নয়ন—
মনে আজও পড়ে যায়
কাঙাল প্রাণের সবটুকু মমতায়।
চোরা-চোখ মোর দেখেছিল তারে বারেক বাঁকায়ে আঁখি,
অর্থ তাহার সেও বুঝেছিল নাকি ?
তাই কি আমাকে পুলক-বিভোল প্রাণে
দরদী দৃষ্টি দিয়েছিল প্রতিদানে
তারপরে যবে গিয়েছিল সবে আপন-আপন কাজে,
সেই নিরালায় কয়েছিনু তারে ঢেকো না বয়ান লাজে।
ঘোমটাখানিরে ধীরে ধীরে তুলে ধরে
মুখপানে মোর চেয়ে চেয়ে লাজভরে
বলেছিল বালা আজি হতে আজীবন
তোমার আমার মধু-মিলনের এক-দেহ এক-মন।

সেই থেকে হায় কত রাত এল কতদিন গেল চলে
কখনও খুশীতে কখনও নয়ন-জলে,
কেটে গেল মোর কত না রাত্রি-দিন
দুঃখ-সুখের নানান রাগিণী বাজাল বক্ষোবীণ।
তবু মাঝে মাঝে আজিও যে অকারণে
একান্ত একা মনে
সুমধুর সেই হারানো রজনী স্মরণে আনিতে চাই
স্মৃতি ছাড়া যার অবশেষ কিছু নাই।

পিছে-ফেলে-আসা একদা নিশার সেই যে একটিক্ষণ
নিল বারবার অনেক বারের আমার অনেকক্ষণ।
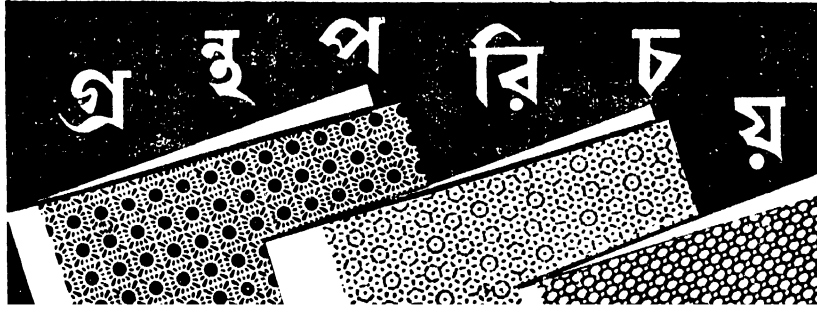
শৃঙ্খলিতা : প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। রীডার্স কর্ণার, ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬। সাড়ে তিন টাকা।

জব চার্ণকের বিবি : প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। অর্চনা পাবলিশার্স, কলিকাতা। পাঁচ টাকা।

ইদানীং দেখিতেছি ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাসের একটা মরসুম বাংলাসাহিত্যে চলিতেছে। প্রমথনাথ বিশী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য এই বিভাগে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন, প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রও এই দুইখানি উপন্যাসে স্থায়ী কীর্তি অর্জন করিলেন। দুইখানি উপন্যাসের একটা কালগত সম্পর্ক আছে, দুইটিই ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধের ঘটনা অবলম্বনে রচিত—মহারাষ্ট্র-নায়ক শিবাজী ও মোগল সম্রাট ঔরংজেবের সংঘর্ষের কাল। 'শৃঙ্খলিতা' পশ্চিম-ভারতের গোয়াকে কেন্দ্র করিয়া, 'জব চার্ণকের বিবি'র ঘটনাস্থল তদানীন্তন বাংলাদেশ, পাটনা-বহরমপুর-হুগলী হইয়া কলিকাতা। প্রথমটির দুই নায়ক পর্তুগীজ ডোম ম্যাহুয়েল ডা কোস্টা আর ভারতীয় শিবমূর্তি, দ্বিতীয়টির নায়ক একা জব চার্নক। প্রথমটির নায়িকা গোয়ার উপনিবেশ পত্তনকারীদের অন্যতম প্রধান সেবাস্টিন ফার্নাণ্ডিজের কন্যা, ডা কোস্টার পত্নী ক্যাথারিনা আর বাজারের বারাঙ্গনা গুলাল বাঈ ; দ্বিতীয়টির নায়িকাও দুইজন—সতীর চিতাপ্রত্যাবৃত্ত ব্রাহ্মণী "এঞ্জেলা" এবং বাজারের বেশ্যা মোতিয়া। দুইটিতেই আর একটি করিয়া অপূর্ব নারীচরিত্র আছে—'শৃঙ্খলিতা'য় অম্মু এবং 'চার্নকে' মেরি অ্যান।

'শৃঙ্খলিতা'র কাহিনী—উত্থান-পতন সংঘর্ষ-সংগ্রামে রোমাঞ্চকর ; ষড়যন্ত্র - গুপ্তহত্যা - ব্যভিচার - নৃশংসতায় ইতিহাস একসঙ্গে হইয়া উঠিয়াছে ভীষণ ও চমকপ্রদ। কিন্তু ইহার মধ্যে দুই স্বদেশপ্রেমিক বীরের—বেলভেলকার ও শিবনাথের—পর্তুগীজ দস্যু-বিতাড়ন-ব্যর্থতার ট্র্যাজেডি একটা সকরুণ বিষাদের প্রলেপ দিয়া সমস্ত কাহিনীকে আশাতীত মর্যাদা দান করিয়াছে ; অম্মুর বিচিত্র চরিত্র, তাহার সরল বিশ্বাস ও নির্ভীক আত্মত্যাগ উপন্যাসটিকে স্মরণীয় করিয়া তুলিয়াছে।

'জব চার্ণকের বিবি'র নায়ক চার্ণকের উত্থান-পতনের ইতিহাস পাঠককে অভিভূত করে। তাঁহার জীবনে যে দুইজন ভারতীয় নারী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল জব চার্ণক কর্তৃক কলিকাতানগরীর পত্তনের মূলে তাহারাই। কিন্তু তাহারা স্ব স্ব মহিমায় যতখানি ফুটিয়া উঠিয়াছে লেখক চার্ণককে ততখানি মহৎ ও মর্যাদাসম্পন্ন করেন নাই। ইতিহাস যাহাই বলুক এই উপন্যাসে চার্ণকের সমস্ত জীবন অনুধাবন করিয়া আমাদের ইহাই মনে হইয়াছে লেখক চার্ণকের প্রতি সুবিচার করেন নাই। তাঁহার শেষ জীবন ত্যাগে ও বৈরাগ্যে মহত্তর হইলে উপন্যাসটি আরও সার্থক হইত।

চরৈবেতি : মৈনাক চট্টোপাধ্যায়। ডি. এম. লাইব্রেরি, ৫২, কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। আড়াই টাকা।

এই সংগ্রহে ১৩৫৩ হইতে ১৩৬৫ সালের মধ্যে লেখা ছয়টি গল্প সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আশ্চর্য ঠেকিতেছে ইহাই যে এমন সহৃদয়, এমন মননশীল শিল্পীর পরিচয় ইতিপূর্বে আমি পাই নাই। 'চরৈবেতি' পড়িয়া নিঃসংশয়ে ঘোষণা করিতে পারি বাংলা কথা-সাহিত্যে মৈনাক চট্টোপাধ্যায় উপেক্ষিত হইবার নাম নয়।

"চরৈবেতি" ও "জাতিস্মর" গল্পে লেখক নারীজীবনের

শাশুড়ীর শিক্ষা

ভাই বকুলফুল,

বউ কেমন হয়েছে জিজ্ঞেস করেছ। কথাটার সোজা-সুজি উত্তর আমি দেবো না। একটা ঘটনা লিখছি তার থেকেই বিচার করো বউ ভাল না মন্দ।

তপু তো কি কাণ্ড করে বিয়ে করলো তা শুনেইছো। কাউকে জানানো নেই কিছু না, হঠাৎ সাদাসিধে বিয়ে করে বসলো আমার উপর রাগ করে। আমার কত সাধ ছিল ব্যাগপাইপ বাজিয়ে তপু ঘোড়ায় চ'ড়ে বউ আনবে। উনি তো আমায় জুড়িগাড়ী চেপে, ব্যাণ্ড বাজিয়ে বিয়ে করেছিলেন। তাতে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছিল শুনি? ছেলে বেঁকে বসলো ও ভাবে বিয়ে সে করবে না—আমরা নাকি সেকেলে। সেকেলে বৈকি! আটান্ন বছর বয়সে কি একেলে থাকবো নাকি?

যাই হোক, বউ দেখে আমি সেকেলে মানুষ, কি রকম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলুম। দেখলুম বউ আমার ওপর এক বিঘৎ ঢ্যাঙা (আজকাল ঢ্যাঙা হওয়া নাকি সুন্দরের লক্ষণ) ময়লা রঙ (এটাও আজকাল চলে), একটু রোগাটে—যাকে আধুনিকারা 'সিলিম' না কি বলে ইংরিজিতে—ভাই। গলার স্বর অবশ্যি বলতে বাধ্য হচ্ছি, বেশ মিষ্টি। গান-টানগুলো বাবা মা খুব চর্চ্চা করিয়েছে নিশ্চয়ই।

উনি অসুখ থেকে তখন সবে সেরে উঠছিলেন। খাওয়া নিয়ে সারাক্ষণ খিটমিট করেন। সব খাবার দাবারই ওঁর পানসে লাগে! আমি একেবারে তিতো বিরক্ত হয়ে ঝালের ঝোল রেঁধেছিলুম—আজ খান খাবেন নয়তো এবার থেকে রান্না করাই ছেড়ে দেবো।

বউমারা প্রণাম করে দাঁড়িয়ে রইল আর আমি ওঁর খাবার থালাটা ধরে দিলুম বিছানার পাশের টেবিলে। উনি ঝোল মুখে দিয়েই ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। ছি, ছি, কি লজ্জা বলতো ভাই বকুলফুল নতুন বউমার সামনে। উনি আরও কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—"পঁয়ত্রিশ বছর বিয়ে হয়েছে, এখনও রুগীর পথ্য রাঁধতে শিখলে না?"

আমি চোখের জল ফেললুম। পাশের ঘরে গিয়ে বউমাকে বললুম—'কি রকম খিটখিটে মানুষটি দেখেছ তো? পারবে তো ঘর করতে মা?' বউমা হাসল। তারপর কাচু মাচু মুখ করে বললো, 'একটা কথা বলবো?'

'বলো'

'কাল আমি রাঁধবো বাবার তরকারী?'

আমি একেবারে আকাশ থেকে পড়লুম—

'বলো কি বউমা, রান্নাবান্না জানো কিছু?'

'হুঁ, আমার মা তো অনেক রকম রান্না আমায় শিখিয়েছেন।'

পরদিন আমি গেলুম কালীঘাটে পুজো দিতে আর বউমা কোমর বেঁধে রাঁধতে বসলো। তপুকে লিষ্টি করে দিল বাজার থেকে কি সব আনতে। বাড়ি ফিরে দেখি এলাহি কাণ্ড, রান্না ঘরের ভোলই পালটে গেছে—সব সাজানো গুছানো। উনুনের পাশে একটা নতুন কেরোসিন ষ্টোভ। এর মধ্যেই পাঁচখানা তরকারী সারা, উনুনে ভাত ফুটছে। তরকারীর রং দেখে জিজ্ঞেস করলুম—বাঃ এমন রং বার করলে কি করে বৌমা?' বউমা কিছুটি না বলে মিটিমিটি হাসতে লাগলো। বুঝলুম মার কাছে শেখা গুপ্ত মন্তর আছে, বলবে না।

ওঁকে প্রথমে ঝোল ভাত দেওয়া হ'ল কি বলেন দেখার জন্য। প্রথম গ্রাসেই মুখে হাসি ফুটলো—'বাঃ, আজ রান্নাটা যেন অন্য রকম লাগছে।' বউমা একে একে পাঁচটা তরকারী ধরে দিল। উনি চেঁছে-পুঁছে সব খেয়ে আরামের ঢেকুর তুলে বললেন 'এত খেয়ে ফেললাম—একটু জোয়ানের আরক দাওতো গো।'

বউমা বাধা দিল—'না না ও সব খাওয়ার দরকার নেই। আমার বাবা তো আপনার চাইতেও বড়, কিন্তু বাবাকে ও সব খেতে হয় না। আমার মা বাবার সব রান্নাই একটু হাল্‌কা করে 'ডাল্‌ডা' বনস্পতিতে রাঁধেন। আমাদের বাড়ীর সব রান্নাই 'ডাল্‌ডা'য় হয়।

'কি বললে বাছা?' আমি উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম—'ডাল্‌ডা' বনস্পতি? তা' আমাদের লুচি-টুচি তো বনস্পতিতে ভাজি আজকাল। ডিমের আমলেটও ওতেই হয়। আর কি বলে—সুজির হালুয়াও।'

'শুধু জল খাবারই কেন মা, আজকাল তো অনেক বাড়িতেই সব কিছু 'ডাল্‌ডা'য় রান্না হয়। আজ যে পাঁচটা তরকারীই 'ডাল্‌ডা'য় রেঁধেছি, তাতে কি স্বাদ খারাপ হয়েছে?'

উনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'না, না, বরং খুব ভাল হয়েছে। বউমার কাছে থেকে 'ডাল্‌ডা'র তাক্‌বাগ্‌গুলো জেনে নাওতো গো।'

বউমার গুপ্ত মন্তরটি জেনে নিয়ে খাসা রান্না করছি আজকাল, উনি সেরে উঠেছেন। খেতেও পারছেন প্রচুর। বউমা যে শুধু শ্বশুরকে বশ করছে তা-ই নয়, চিরকেলে খুঁৎ কাড়া শাশুড়ীও বশ মেনেছে! কি বল ভাই, বউ মন্দ না ভাল?

হ্যাঁ, আর মাথা খাও ভাই বকুলফুল, তোমার ঐ খিটখিটে বুড়োকে আমার বউমার 'ডাল্‌ডা' বনস্পতিতে রাঁধা রান্না খাইয়ে দেখ একবার—হাতে নাতে ফল পাবে।

তোমার বকুলফুল-সই

দুইটি গুরুতর সমস্যার যে সার্থক সমাধান দেখাইয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে শুধু শিল্পী বলিয়াই অভিনন্দিত করিতেছি না, সমাজ-সংস্কারের যে সহজ ইঙ্গিত তিনি দিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে একজন সমাজ-সচেতন সংস্কারক বলিয়াও প্রশংসা করিতেছি। "চোর" গল্পটিও আশ্চর্য দরদ দিয়া লেখা, ইহাকে একটি আদর্শ ছোটগল্প বলিতে পারি। ভাষার উপর লেখকের অসাধারণ দখল। তাঁহার গল্প আরও দেখিতে চাই।

লণ্ডনের পাড়ায় পাড়ায়: হিমানীশ গোস্বামী। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। তিন টাকা।

লণ্ডন লইয়া বাংলাভাষায় ভ্রমণকাহিনী লেখা হইতেছে উনবিংশ শতকের শেষপাদ হইতে। গিরিশচন্দ্র বসু, রমেশচন্দ্র দত্ত, রবীন্দ্রনাথ, চন্দ্রশেখর সেন, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় দিয়া আরম্ভ। বিংশ শতাব্দীর তালিকা দেওয়া অসম্ভব। তবু লণ্ডন সম্বন্ধে অনেক জানিবার কথা বাকি ছিল শ্রীমান্ হিমানীশের বই পড়িয়া তাহা বলিতে বাধ্য হইতেছি। চমৎকার লেখা, পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন চলচ্চিত্র দেখিতেছি। লেখকের ফটোগ্রাফারের চোখ, দ্রষ্টব্য বা জ্ঞাতব্য সবেরই উপর তিনি ফোকাস করিয়াছেন এবং কথার গাঁথুনিতে ছবি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই সঙ্গে লণ্ডনের পাড়ায় পাড়ায় আলোকচিত্র সংযুক্ত হইলে বইখানি আরও মনোরম হইত।

অমৃত-মন্থন: অজিত মুখোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা-১২। চার টাকা।

লেখক প্রচলিত যাবতীয় কিংবদন্তী ও কাহিনী মন্থন করিয়া কালীক্ষেত্রে কালীমূর্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠার যে ইতিহাস রূপকথার ঢঙে বলিয়াছেন তাহা নিছক অমৃতই নয়। স্বার্থ-লালসা-ত্যাগ-মহত্ত্ব অর্থাৎ সুধা ও গরলে মিশিয়া এই কাহিনী অপরূপ হইয়াছে। মানুষেরই কাহিনী কিন্তু পটভূমিকায় করালবদনী কালী তাঁহার সর্বগ্রাসী লেলিহান জিহ্বা ও অনন্ত বরাভয় লইয়া সর্বদা বর্তমান আছেন। ভাষার দোষ মাঝে মাঝে পীড়াদায়ক হইলেও কাহিনীর আকর্ষণ আছে। কাহিনী এখনও অসমাপ্ত, পরবর্তী খণ্ডের প্রতীক্ষায় আছি।

স.

চেনা-অচেনা: মায়া বসু। সাহিত্য সদন, এ-১২৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। তিন টাকা।

এই বইতে লেখিকার ষোলটি গল্প সংকলিত হয়েছে। সবগুলি গল্পই 'শনিবারের চিঠি' ও নানা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত, সুতরাং লেখিকার গল্প-রীতির সঙ্গে বাঙালী পাঠকের মোটামুটি একটা পরিচয় ইতিমধ্যেই ঘটেছে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন কথাশিল্পীর তুলনায় মায়া বসু কথাসাহিত্যক্ষেত্রে অবশ্যই নবাগতা, কিন্তু গল্পরচনার ভঙ্গিতে তাঁর কোথাও নবাগতার দ্বিধা নেই। বরঞ্চ অসাধারণ সাহসের পরিচয় আছে। সাহস এবং আত্মবিশ্বাস তাঁর কুণ্ঠাহীন।

মানুষকে তিনি সত্যদৃষ্টিতে দেখেছেন। এবং যে 'মুড'-এর মাধ্যমে দেখেছেন, তা—লেখিকা কবি হওয়া সত্ত্বেও—কখনও কল্পরাজ্যের বিলাসের মধ্যে হারিয়ে যায় নি, তিনি নরনারীর জীবনাংশ চিত্রণে রূঢ় বাস্তবকেই অনুসরণ করেছেন। বঞ্চিত এবং অসহায় মানুষের প্রতি তাঁর সহজ এবং গভীর সংবেদন পাঠকমনে তাঁর প্রতি অনুরূপ শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলে। "পলি ব্যানার্জি", "আশ্রয়", "পুতুলওয়ালী", "বিচিত্র এক মন", "উত্তরঙ্গ", "অতিথি", "হাওয়া", "স্পেশাল ওয়ার্ড" প্রভৃতি গল্পে প্লটের বৈচিত্র্য, দৃষ্টির স্বচ্ছতা, এবং মানুষের প্রতি অসামান্য মমত্ববোধ মনে বিস্ময় জাগায়। লেখিকার শিল্পনিষ্ঠা অব্যাহত থাকলে কথাশিল্পের ক্ষেত্রে তিনি অদূরভবিষ্যতে একটা বড় আসন লাভ করবেন এমন আশা মনে জাগে।

পরিমল গোস্বামী

প্রণয়ীপঞ্চক: সুশীল রায়। নতুন প্রকাশক, ১৩।১ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। সাড়ে তিন টাকা।

মহাভারত থেকে পাঁচজন নায়িকা বেছে নিয়ে কবি সুশীল রায় নতুন করে তাদের কাহিনী লিখেছেন—সুলভা, সুভদ্রা, মাধবী, শ্রুবাবতী এবং উর্বশী। মহাভারতের মহারণ্যের মধ্যে বহু ছোটখাটো কাহিনীর অঙ্কুর পাঠকের কৌতূহলী দৃষ্টি এড়িয়ে আছে। তাদের কথা আমরা আলাদা করে স্মরণে আনি না, ধর্মযুদ্ধের মহৎ আদর্শের উচ্চ কলরবে এইসব নায়িকাহৃদয়ের করুণ বিলাপ যায় হারিয়ে। মহাকবি এদের কথা বলতে কালহরণ করেন নি। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের বীরনায়কদের মূল কাহিনী অনুসরণ করতে গিয়ে প্রসঙ্গতঃ এরা এসে গিয়েছিল। কবি কোনওরকমে তাদের কথা সেরে নিয়েছেন।

প্রাচীন মহাকাব্যের এটাই ছিল রীতি। উঁচু সুরে বাঁধা আদর্শ অথবা কতকগুলি ঋজু প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বসংঘাতই সেকালের কল্পনার বৈশিষ্ট্য ছিল। অশরীরী ভাবের বাষ্পমণ্ডল সৃষ্টি করায় তাঁদের না ছিল প্রবণতা, না ছিল পটুতা। এই নির্বিকার বর্ণনারীতির মধ্যে আধুনিক কবিরা কত নাটকীয় সম্ভাবনাপূর্ণ মুহূর্ত, কত লিরিক সৌন্দর্যের নিটোল ক্ষণ, কত বজ্রগর্ভ মনস্তাত্ত্বিক সঙ্কেত খুঁজে পেয়েছেন। কবি মধুসূদনই সর্বপ্রথম আধুনিক কবিদের কাছে এর সূচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ

প্রাচীন উপাদান নিয়ে কয়েকটি কবিতা লিখেছিলেন। যতীন্দ্রমোহন বাগচী 'মহাভারতী'তে এই রীতিতে কতকগুলি চমৎকার কবিতা রচনা করেছিলেন। আধুনিক কালে সুশীল রায়ই বোধ হয় একমাত্র কবি যিনি তাঁর প্রতিভাকে এইদিকে সম্পূর্ণ ব্যাপৃত রেখেছেন। আখ্যায়িকা কাব্যের ধারা উনবিংশ শতাব্দীতেই শেষ হয়েছে এবং পরের যুগের কবিরা প্রধানতঃ লিরিক রচনার দিকেই ঝুঁকেছেন—এটা ঐতিহাসিক তথ্য হলেও এই কাব্যধারার পুনঃপ্রবর্তনের নতুন ঐতিহাসিক তথ্যের সৃষ্টি করায় দোষ কি ?

নবত্বকামী পাঠক আশঙ্কা করবেন এটা ঠিক যুগানুকূল হবে না। সুশীল রায়ের 'প্রণয়ীপঞ্চক' পড়লেই তার উত্তর পাওয়া যাবে। যে মুগ্ধা নারী প্রেমাস্পদের প্রসন্ন হাসিটুকুর প্রত্যাশায় তার গুরু-ঋণ পরিশোধের জন্য পর পর তিনজন রাজার সাময়িক পত্নীত্ব স্বীকার করেছিল এবং সবশেষে ঋণমোচন সম্পূর্ণ করবার জন্য বিশ্বামিত্রের করপদ্মে সমর্পিতা হয়েছিল, প্রেমের দুঃসহ পরীক্ষার শেষে স্তম্ভিত বিস্ময়ে সে যখন দেখল ঋণমুক্ত গালব তাকে পরিত্যাগ করে তপস্যার জন্য প্রস্থান করল—সেই প্রণয়িনী মাধবীর ক্রূর কাহিনী আশ্চর্য রকম মডার্ন, তার দাহ চিরন্তন মানবহৃদয়কে স্পর্শ করেছে। ঠিক এরই বিপরীত কাহিনী সুভ্রার। দীর্ঘ তপস্যায় যৌবনকে ক্ষয় করে জরতী সুভ্রা যখন শুনল কুমারীর অধিকার নেই স্বর্গলাভের, তখন জরাভারগ্রস্ত দেহকেই আবার সাজিয়ে তোলবার চেষ্টা করল নয়নলোভন করবার জন্য। উপযাচিকা দ্বারে দ্বারে পরিহাসই লাভ করল। তখন ঋষিকুমার শৃঙ্গবান্ একটি রাত্রির জন্য মাত্র তাকে গ্রহণ করতে স্বীকৃত হল। তারপর মিলনরজনী শেষে সুভ্রা যখন অভীষ্ট স্বর্গকামনায় বিদায় প্রার্থনা করল, ঋষিকুমার শৃঙ্গবানের হৃদয় তখন বাঁধা পড়েছে।

আর সেই নারী— যে কর্তব্যপরায়ণ তত্ত্বজ্ঞানী রাজাকে প্রলুব্ধ করে প্রমোদনিশি যাপন করল, সেই বিজয়িনী সুলভার সৌভাগ্য তিমিরাচ্ছন্ন করল দুর্ভাগিনী মহিষী মালতীকে।

স্মিত হেসে অবশেষে ধর্মধ্বজ জানাল সম্মতি।
অন্তঃপুরে প্রতীক্ষায় রাত্রি যাপে মহিষী মালতী॥

আর আশ্চর্য প্রণয়িনী শ্রুবাবতী। দীর্ঘ তপস্যায় ইন্দ্রকে জয় করে ছলনানিপুণ স্তম্ভিত ইন্দ্রকে অবহেলাভরে প্রত্যাখ্যান করে ফিরে এল পরিহাসরসিকা সখীদের মধ্যে। বহুপরিচিত অর্জুন-উর্বশীর কাহিনীতেও নায়িকা চরিত্রটি নতুন রসে সমুজ্জ্বল।

কবি সুশীল রায় মহাভারতের এই প্রায় অলক্ষ্যগোচর কাহিনীগুলির মধ্যে কল্পনার শাণিত আলো ফেলে খুঁজে পেয়েছেন অপ্রত্যাশিত নাটকীয় চমক, নিয়তির অট্টপরিহাস, তীব্র দুঃখের জ্বালা, উন্মাদ প্রবৃত্তির শিখানল। মহাকবি এই কাহিনীগুলি বর্ণনা করেছিলেন সংবাদ-পরিবেশনের মত করে ; এ যুগের কবি পল্লবিত অপরূপ বর্ণনায় তাতে যোজনা করেছেন নতুন অর্থ। মহাকাব্যের এই নায়িকারা যেন সময়ের সীমায় বন্দিনী নয়। মহাকাব্যের কল্পনারীতি এই উদ্ধত নারী-আত্মাগুলিকে অবস্থাবৈচিত্র্যে দুর্জ্ঞেয় করে তুলেছে। আর এ যুগে কল্পনাধর্ম প্রকাশ পায় জীবনের অর্থনির্ণয়ে। কবি সুশীল রায় রসিকের অধিকারভেদকে স্বেচ্ছায় অস্বীকার করে প্রাচীন ও অর্বাচীন রুচির সব পাঠকের পানপাত্রকেই রসে পূর্ণ করে দিয়েছেন। নায়িকাদের বিচিত্র কাহিনীর বর্ণনায় কবি আশ্চর্যভাবে নির্লিপ্ত, যদিও ভাষার রূপ রঙ রেখায় কবি একটি নিজস্ব স্টাইলকে সৃষ্টি করে তুলেছেন।

ওদিকে ঘনায় সন্ধ্যা গোধূলির লগ্ন গতপ্রায়
মুমূর্ষু সিন্দুর সন্ধ্যা দিনান্তের অন্তিম শয্যায়
ম্রিয়মান হয়ে এল।

অথবা

সূর্য নেমে যায় পাটে　　দিগন্তে সোনার ঘাটে
বসে সন্ধ্যা গোধূলি বাসরে,
সীমন্তে সিন্দুর এঁকে　　বিবাহ বৃত্তান্ত লেখে
যেন নিজ রক্তের অক্ষরে।

ভাষার তরঙ্গধ্বনি এই রেখাচিত্রকেও সুরময় করেছে। এ রকম দৃষ্টান্ত কাব্যের যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে। শব্দচয়নে কবি অত্যন্ত শুচি ও সুতর্ক। শুচিতার অভাবে কল্পনার আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হয়। অথচ চিত্ররসসমৃদ্ধ এই ভাষায় একটি অপ্রচলিত দুরুচ্চার্য শব্দ চোখে পড়ে না। আঠারো মাত্রার দীর্ঘ প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত পংক্তিগুলি এমন একটি শ্বাসভারাতুর গম্ভীর বিষণ্ণক্লান্ত পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে তোলে যে পাঠককে অজ্ঞাতসারেই সম্মোহিত হয়ে যেতে হয়। আমাদের সেই বনেদী ত্রিপদী আর পয়ারের প্রাণশক্তি যে কত অফুরন্ত, সুশীল রায় তা আর একবার প্রমাণ করলেন।

পূর্বসূরী মধুসূদনের সঙ্গে অনেক দিক দিয়ে এই কবির মিল আছে। মধুসূদন তাঁর নায়িকাদের বলেছেন বীরাঙ্গনা, এদেরও বীরাঙ্গনা বলতে দোষ কি ? তবু 'বীরাঙ্গনা কাব্য' ছিল একক নায়িকাদের স্বগতোক্তি, 'প্রণয়ীপঞ্চক' গল্পাভাসপ্রধান কাব্য, তাই এর বহিরঙ্গ সংঘাত তীব্রতর। বীরাঙ্গনার নায়িকারা অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ। কী নাটকীয়

মুহূর্ত সৃষ্টি করে সুশীল রায়কে কাহিনীর কাঠামোটি কল্পনা করতে হয়েছে, সহজেই অনুমেয়। এ যুগের চিন্তাসর্বস্ব কবিতার যুগে এরকম আবেগমুখর কথাকাব্য আনন্দিত বিস্ময়ের সৃষ্টি করল। শ্রীভবতোষ দত্ত

দাঁড়ের ময়না ঃ পূর্ণেন্দু পত্রী। সাহিত্য, ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। সাড়ে তিন টাকা।

কৃষি-জীবনের পটভূমিকায় লেখা এই বইটি আসলে বৃহত্তর মানবিক সমস্যাকেই উপস্থাপিত করতে চেয়েছে। কৃষক-জীবনের বিশেষ অর্থনৈতিক সমস্যা বা কৃষক-পরিবারের পরিচয়-জ্ঞাপক চিত্রের প্রতি লেখক যে অবহেলা দেখিয়েছেন তা নয়। কিন্তু এ সবের ভিতর দিয়েই লেখক মানবিক সম্পর্কের, সমাজ-চিন্তার এবং মানুষের ভাগ্যের ব্যাপকতর সর্বজনীন তাৎপর্য অনুসন্ধান করেছেন। বিষয়বস্তুর এই বৈশিষ্ট্য লেখকের চিন্তাশীলতার পরিচায়ক।

কাহিনীর নায়ক রঞ্জনী তিন ভাইয়ের মধ্যে ছোট ভাই। ছোট বলে তার উপর সংসারের দায়িত্ব কম, দায়িত্ব-বোধও কম। একটু লেখা-পড়া শিখেছে বলে আর পাঁচজনের থেকে তার একটু স্বাতন্ত্র্য-বোধ রয়েছে। সুঠাম অঙ্গসৌষ্ঠবের জন্য কন্যার পিতাদের লুব্ধ দৃষ্টি এবং সমবয়সীদের ঈর্ষাকাতর দৃষ্টি লাভ করে। সর্বোপরি একটি পতিতা-নারীর সঙ্গে সে এক সমাজ-বিরোধী প্রেমের অংশীদার। সবকিছু মিলিয়ে সে হয়ে উঠেছে বিশিষ্ট এবং স্বতন্ত্র। কাজেই তার চিন্তার সূত্র গতানুগতিক চিন্তার স্রোতকে অতিক্রম করে যেতে চায়। সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা রঞ্জনীর চরিত্রকে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছে। রঞ্জনীর চোখ দিয়ে লেখক একফালি জীবনের বিশ্লেষণ করে জীবন সম্পর্কে কতকগুলি সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে চাইছেন।

রঞ্জনীর সিদ্ধান্ত এই যে ব্যক্তি মানুষ তার সচেতন ইচ্ছা অনুযায়ী জীবনকে পরিণতি দান করতে পারে না। সেইজন্যই জীবনে এত অন্তর্দ্বন্দ্ব। চারুবালার সঙ্গে প্রেমের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছা না থাকলেও সে তার যৌবনের আবেদনকে অস্বীকার করতে পারে নি। চারুকে সে না পারে সামাজিকভাবে স্বীকার করতে, না পারে তাকে অস্বীকার করে বিয়ে করে সংসারী হতে। অথচ এমন একটি অযৌক্তিক অবস্থাকে সে মনে মনে কখনই কামনা করে নি। আবার নিজের মনের মমতা-বোধের সম্পর্কে সে সচেতন বলে কৃষক-সমাজের উপর উপরতলার অত্যাচারকে সে সহজভাবে মেনে নিতে পারে না। কিন্তু একটি প্রতিবাদ-মিছিলে যোগ দিয়ে তার মনের সেই মমতাবোধই একটা দারুণ আঘাত পেল। পুলিসের গুলিতে একজন কৃষককে নিহত হতে দেখে সে সমস্ত আন্দোলনের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠল। কৃষকের প্রতি প্রেম যে আন্দোলনের উৎস সে আন্দোলন কেন কৃষককে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে—জীবনের এই প্যারাডক্সকে সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না। কারণ সে জীবনের একটা লজিকাল ব্যাখ্যা চাইছে। এবং জীবনকে লজিক দিয়ে বোঝা যায় না।

একটি ছোট উপন্যাসের মধ্যে কাহিনীকে একটি নির্দিষ্ট পরিণতি দান করতে পারার কৃতিত্ব কম নয়। লেখকের বক্তব্যকে পাঠক গ্রহণ করতে পারছেন কিনা সাহিত্য বিচারে তা বড় কথা নয়, পাঠক লেখকের বক্তব্যের যুক্তিযুক্ততা হৃদয়ঙ্গম করছেন কিনা সেইটেই আসল কথা। সেদিক দিয়ে পূর্ণেন্দুবাবু কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। কিন্তু লেখক তার চেয়েও বড় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন চরিত্রাঙ্কনে। তিন ভাই এবং দুই বউ মিলে রঞ্জনীদের সংসারের প্রতিটি চরিত্র এবং প্রতিটি ঘটনা অত্যন্ত জীবন্ত। বস্তুতঃ সমগ্র কাহিনীর মধ্যে এই সাংসারিক চিত্রটিই সবচেয়ে উপভোগ্য। সুরেন এবং রমণীকে কৃষক বলে চিনতে ভুল হয় না, তবু তারা এক একটি সর্বজনীন মানবপ্রকৃতির প্রতিরূপ। তুলনায় চারুবালা অনেক নিষ্প্রভ। তার প্রেমের গভীরতা এবং ঐকান্তিকতা বা রহস্যময়তা পাঠকের কাছে ধরা পড়ে কিনা সন্দেহ।

লেখকের দুর্বলতা এই যে, যে বিষয়বস্তুকে লেখক গ্রহণ করেছেন তাকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার ভাষা এবং আঙ্গিক লেখক এখনও আয়ত্ত করতে পারেন নি। চরিত্রসৃষ্টিতে লেখকের মুনশীয়ানার পরিচয় আছে। কিন্তু চরিত্রগুলির অন্তর্নিহিত নাটকীয়তাকে পরিস্ফুট করার জন্য কাহিনীকে আরও অনেক বিস্তৃত করার আবশ্যকতা ছিল। ঘটনার মধ্যে উৎকণ্ঠা সৃষ্টির দিকে আর একটু মনোযোগ দিলে ভাল হত।

বইখানি লেখকের প্রথম উপন্যাস। কাজেই বইটি কী হয়ে উঠেছে এ প্রশ্নের চেয়ে বড় কথা হল বইটি কী হয়ে উঠতে পারত। আমার মনে হয় একটি মহৎ উপন্যাস হওয়ার উপাদান বইটিতে ছিল। এ কথার অর্থ এই যে লেখক তাঁর মনের ব্যর্থতা-বোধকে অতিক্রম করে যদি আবার চেষ্টা করেন তা হলে তিনি কালক্রমে মহৎ উপন্যাস লিখতে পারবেন। অচ্যুত গোস্বামী

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : ৫৬-২৮৩৮

৩২শ বর্ষ,
৯ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৬৭
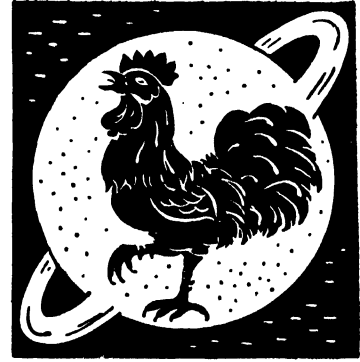
সংবাদ-সাহিত্য

সংবাদপত্রে কয়েকদিন ধরিয়া বিশ্বাস-অবিশ্বাস দুই দিক বজায় রাখিয়া সংবাদ ও মন্তব্য বাহির হইয়াছিল—জনৈক ইতালীয় মরমী সাধু ঘোষণা করিয়াছেন, এই জুলাইয়ের ১৪ই তারিখে পৃথিবীতে মহাপ্রলয় সংঘটিত হইবে। আমরা বহু ব্যয়ে অর্জিত বৈজ্ঞানিক শিক্ষার ফলে বাহ্যতঃ সন্দিগ্ধচিত্ত হইলেও আমাদেরই সমসাময়িক-কালের আনন্দময়ী মা, বালক ব্রহ্মচারী, অনুকূল ঠাকুর, মোহনানন্দ স্বামী, ওঙ্কারবাবাজীদের প্রত্যক্ষ প্রভাবে অন্তরে অন্তরে সাধুসন্তদের কথায় বিশ্বাস রাখি। তাহার উপর যখন শুনিতে পাইলাম, রোমক সাধু আসন্ন প্রলয়ের আভাসমাত্র দিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই—উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য এবং উপাদেয় (পরম !) পানীয়সহ বাইবেলপ্রোক্ত বৃদ্ধ নোয়ার মত স্বয়ং সদলবলে এ যুগের আরারত-পর্বতের শিখর-আশ্রয় করিয়াছেন তখন আর দুর্মূল্য সাদা কাগজের উপর বৃথা কালির আঁচড় কাটিয়া হিজিবিজি "সংবাদ-সাহিত্যে"র ফক্কুড়ি করিতে প্রবৃত্তি হয় নাই। দেবীচৌধুরাণীর মহামান্য শ্বশুর হরবল্লভ রায়ের মত মনে হইয়াছিল, মরিয়াই যখন গিয়াছি তখন আর দুর্গানাম জপ করিয়া কী হইবে।

তথাপি, মানুষ হইয়া যখন জন্মিয়াছি, মৃত্যু প্রত্যক্ষ জানিয়াও মমতার বাণ্ডিলটিকে বৈতরণীর এপারে ফেলিয়া যাইতে মন সরে না। শুনিয়াছি, ফাঁসীর আসামী অকুতোভয়ে ফাঁসীমঞ্চে আরোহণ করিতে করিতে মাথায় টেরিটি বিপর্যস্ত হইয়াছে কি না হাত বুলাইয়া দেখিয়া লয়। প্রলয়ের মুখে দাঁড়াইয়া আমরাও গত কয়েকদিন টেরি বাগাইবার কাজে নিজেদের ভুলাইয়া রাখিয়াছিলাম। নববর্ষাগমে লাইব্রেরি-কক্ষে শতধারায় উই-আবির্ভাবের মরসুম শুরু হইয়াছিল। ইঁদুরেরাও নিষ্ক্রিয় ছিল না। শৈশবে-পড়া কবিতার নির্দেশ মানিয়া উই আর ইঁদুরের ব্যবহার দেখিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে ডি. ডি. টি. অভিযান চালাইতেছিলাম। ১৪ই জুলাই রাত্রিটা মৃত্যু-হাশিসের নেশায় বুঁদ হইয়া কাটাইয়া দিলাম। আজ ১৫ই তারিখের ভোরে দীর্ঘকালের অভ্যাসবশে ডেস্ক-ক্যালেণ্ডারের তারিখ পালটাইতে গিয়া সহসা হুঁশ হইল! তাই তো, বাঁচিয়াই তো আছি! আশেপাশে চারিদিকে তাকাইয়া পুরাতন পচা মামুলী গতানুগতিক পৃথিবীর সেই পরিচিত দুর্গন্ধ নাকে আসিয়া লাগিল, কোমরটা মরদ্-কি-বাত এবং নিউটন চাচার মাধ্যাকর্ষণের টানে কনকন করিয়া উঠিল, অনুভব হইল আবার সেই বাস-ট্রাম-ধাকাধাকি-ঠেলাঠেলি-ধোঁয়া-লাউডস্পীকার ভেদ করিয়া শনৈঃশনৈঃ যমের

দক্ষিণদুয়ারপথে অগ্রসর হইতে হইবে। এক নিদারুণ বিতৃষ্ণা ও হতাশার মধ্যে "দুত্তোর" বলিয়া আবার সেই পুরাতন কলমটাই বাগাইয়া বসিতে হইল।

* * *

কিন্তু লিখি কি লইয়া! গত দুই সপ্তাহ মৃত্যুর আতিথ্যলাভের ভরসায় মনটাকে কঠোপনিষদের নচিকেতার মত কঠোর করিয়া আনিয়াছিলাম, ১৫ই জুলাইয়ের যথারীতি আগমন-দুর্ঘটনায় সেটা জ্যামুক্ত বাণের মত ছুটিতে চাহিল, কিন্তু লক্ষ্য কোথায়? হিতৈষী বন্ধুরা সৎপরামর্শ দিয়াছিলেন—আসামী খালাস না হইলে বা শান্তিলাভ না করিলে সাবজুডিস কেস লইয়া লিখিলেই বিপদ। হাটে ঘট ভাঙিবার পূর্বে তাহা লইয়া ঘাঁটাঘাঁটিও নিরাপদ নয়। কাজেই সরাসরি চিলেকোঠার ছাদে উঠিয়া গম্ভীর ঔদাস্যের সঙ্গে একবার পরিচিত জগৎটাকে দেখিব স্থির করিলাম। টঙে উঠিয়াই মাথার মধ্যে কেমন বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। মনে হইল—

"জগৎ সম্মুখে মোর সমুদ্রের মত
আমি তীরে বসে আছি পর্বতশিখরে,
তরঙ্গেতে গ্রহতারা হতেছে আকুল
ভাসিতেছে কোটি প্রাণী জীর্ণ কাষ্ঠ ধরি।
আমি শুধু শুনিতেছি কলধ্বনি তার,
আমি শুধু দেখিতেছি তরঙ্গের খেলা।
কিরণ-কুন্তলজাল এলায়ে চৌদিকে
রুদ্র তালে নৃত্য করে এ মহাপ্রকৃতি।
আলোক, আঁধার, ছায়া, জীবন, মরণ,
রাত্রি, দিন, আশা, ভয়, উত্থান, পতন,
এ কেবল তালে তালে পদক্ষেপ তার।
শত গ্রহ, শত তারা, শত কোটি প্রাণী
প্রতি পদক্ষেপে তার জন্মিছে মরিছে।
আমি তো তাদের মাঝে কেহ নই আর
তবে কেন এই নৃত্য দেখি না বসিয়া।"

* * *

চিলেকোঠার ন্যাড়া ছাদে বসিয়া বসিয়া নৃত্য দেখিতে লাগিলাম। মাথার ঠিক আধ হাত উপর দিয়া একটা চৌরঙা ঘুড়ি লাটাই-সুতার বন্ধন কাটিয়া প্রভাতী পুবালি হাওয়ায় দুলিতে দুলিতে চলিয়া গেল। আশেপাশের ছাদ এবং নীচের রাজপথ হইতে বালখিল্য ঋষিদের উলঙ্গ নৃত্যের সঙ্গে "আমাকে দিন" "আমাকে দিন" প্রার্থনা কানে শুনিয়াও গ্রাহ্য করিলাম না। নির্লিপ্ত উদাসীন চিত্তে ভারতব্যাপী সরকারী কর্মচারীদের ধর্মাঘাত এবং ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে স্বজন-হননের মর্মাঘাত উন্মাদিনী প্রকৃতিরই তাণ্ডব-নৃত্য বলিয়া বোধ হইল। মহামান্য সীজার-নীরোর কথা মনে থাকিলে একটা বেহালা যোগাড় করিয়া তবে চিলেকোঠার ছাদে উঠিতাম এবং কাচিৎ মধুর করুণ রাগিণী বাজাইতেও পারিতাম। কিন্তু বিশ্বসঙ্গীতের ততখানি উচ্চমার্গে উঠিবার পূর্বেই আটত্রিশ বৎসরের পুরাতন প্রেয়সীর সাদর আহ্বান মনের ভারসাম্য বিচলিত করিয়া কাঞ্চনজঙ্ঘার সুখকর আশ্রয় হইতে শ্বাপদ-ম্যালেরিয়া-সঙ্কুল তরাইয়ের যন্ত্রণাদায়ক কটুগন্ধ গহ্বরে সন্ন্যাসীকে নিক্ষেপ করিল।—"আগামী কল্য সর্বাত্মক হরতাল। পাড়ার আবালবৃদ্ধশিশু বাজারে গিয়া হানা দিয়াছে, আর বৃদ্ধ মনুষ্য খোকা সাজিয়া কিনা ঘুড়ি ধরিবার তালে আছেন! এত বেলায় ছাইভস্ম আর কি কিছু মিলিবে!" প্রবল রূঢ় ধাক্কায় সচকিত হইয়া যেন হুমড়ি খাইয়াই নামিয়া আসিলাম। এতক্ষণে রোমীয় সাধুর উপর ভয়ানক রাগ হইল। একটা নূতন কিছু করিবার খেয়ালে পাহাড়ের উচ্চ চূড়ায় চড়িয়া ভাল মদ্য পান করিবার শখই যদি হইয়াছিল, সারা পৃথিবীকে বিজ্ঞাপিত করিয়া পৃথিবীর সকল মানুষকে ধাপ্পা দিয়া এরূপ করা সাধুসন্ন্যাসীর পক্ষেও মর্মান্তিক নিষ্ঠুরতা। যাহা হউক, বাজারে ছুটিতে হইল এবং সেখানে গিয়া প্রায় গলাধাক্কা খাইলাম। একটা মধ্যবিত্ত-গৃহস্থ-ফুটবলের ব্লাডার যথেচ্ছ ফুলাইলেও যে ফাঁসিয়া যায় না এই বিস্ময়কর সত্য পুনর্বার প্রত্যক্ষ করিয়া তাজ্জবও বনিয়া গেলাম। যখন চালের মণ পাঁচ, ধুতির জোড়া তিন, এবং সরিষার তেলের সের আধ টাকা তখনও যাহাদের সংসার প্রায় অচল ছিল—চালের চল্লিশ, ধুতিজোড়ার বারো এবং সরিষার তেলের আড়াইয়ে

তাহাদের সংসার যে আজও চলিতেছে—এমন বিচিত্র প্যারাডক্স মিশর-পিরামিডের স্ফিংক্সও কল্পনা করিতে পারে নাই। গৃহিণীর তাড়ায় হরতাল সামলাইবার জন্য কাঁচা বাজারে প্রবেশ করিয়া হতচকিত হইয়া দেখিলাম, ইনফ্লেটারের হাওয়ায় ব্লাডার আরও খানিকটা ফুলিয়াছে। ফাঁসিয়া ফাটিয়া ফুটা হইয়া চোপসানো দূরে থাক্, চাষী এবং ফড়ে বিক্রেতাদের হাতে ম্যাজিক রবার টং টং করিয়া বাজিতেছে। আমাদের অর্থাৎ পত্রিকা সম্পাদকদের ব্লাডার সেই আশ্চর্য উপাদানে প্রস্তুত নয়, কাজেই কপালে করাঘাত করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। পূর্ণ সহানুভূতিসত্ত্বেও মনে মনে স্বীকার করিতে হইল, ধর্মঘট সকল ঘটেই একান্ত ধর্মাত্মক নয়। ধর্মের নামে কালো-বাজারের সঙ্গে এই ঘটকালি আমাদের মত অতীব নিরীহ সাধারণ মানুষের মনে ঘট ভাঙিবার ব্যাকুলতাই জাগ্রত করে।

*　　　*　　　*

লেখনীমুখে চিন্তা করিতে যদ্যপি আরম্ভ করিয়াছি, আত্মমর্মাঘাত সম্পর্কেও কিঞ্চিৎ দুশ্চিন্তা প্রকাশ না করিয়া পারিলাম না। মহাপ্রলয়ের প্রণয়সম্ভাষণ যখন এমন যাচ্ছে-তাই রকম বিফল হইয়া গেল, তখন যথা পূর্বং তথা পরং আগড়ম-বাগড়ম চিন্তা না করিয়া আর করিবই বা কী! এখন একদিন অন্তর একদিন হরতাল নামধেয় নিরবচ্ছিন্ন অবকাশ-ব্যাধি সমগ্র জাতিকে পালাজ্বরের মত আক্রমণ করিতেছে। কতকাল যে এই মুহুর্মুহু ধর্মঘট-হরতালের প্রকোপে ভুগিতে হইবে রুদ্রের বামমুখই তাহা জানেন!

গিবন সাহেবের 'রোমান সাম্রাজ্যের অবনতি ও পতন' এবং আচার্য যদুনাথের 'মোগল সাম্রাজ্যের পতন' চারখণ্ড যাঁহাদের পড়া আছে তাঁহারা জানেন কেন্দ্রের শাসন যখন শিথিল, অথবা আরও সাংঘাতিক, একদেশদর্শী হয় তখনই সাম্রাজ্যের ডিসইন্টিগ্রেশন বা ভাঙন শুরু হয়। বিভিন্ন রাজ্যের প্রজাদের মধ্যে তখনই ধর্ম, ভাষা, সীমানা লইয়া কলহ হইতে থাকে। যখন অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপালন না হইয়া শাসন পক্ষপাতদুষ্ট হইয়া পড়ে, একদল অকারণ প্রশ্রয়ে প্রচুর সুখসুবিধা ও অবাধ শোষণের সুযোগ পাইতেছে অন্য দল যখন এইরূপ ভাবিবার সুযোগ পায়, তখনই স্ব স্ব রাজ্যের সীমানা, ভাষা ধর্ম প্রভৃতি লইয়া মানুষ স্পর্শকাতর ও সচেতন হইয়া উঠে এবং নিজের কোট বজায় রাখিয়া অন্যকে উৎখাত করিতে সচেষ্ট হয়। প্রধানতঃ হৃদ্‌কেন্দ্রের অব্যবস্থাতেই হাত-পা-মুখ-মাথা-ঘাড়ের পরস্পর বিরূপতা গজাইয়া উঠে। বিবাদের মূল কারণ সর্বত্রই প্রায় পুষ্টিগত অর্থাৎ অর্থনৈতিক। নিছক অর্থনীতি অন্য সকল নীতিকে পদদলিত করিয়া মানুষকে হিংস্র শ্বাপদে পরিণত করিতে পারে, মানুষের চেতনাকে সুপ্ত বা লুপ্ত করিয়া তাহাকে জড় যন্ত্রমাত্রে পরিণত করিতে পারে—বর্তমান পৃথিবীতে তাহার অনেক দৃষ্টান্তই আমরা দেখিতে পাইতেছি। এইরূপ আত্মঘাতের পরিণাম যে কী ভয়ঙ্কর, সাম্প্রতিক কালের মধ্যে—১৯৪৬ সন হইতে আজ পর্যন্ত গত ১৪ বৎসরের মধ্যে আমরা আমাদের দেশেই একাধিকবার দেখিয়াছি। আধুনিকতম ঘটনাটি সবচাইতে শোচনীয় এই কারণে যে এখানে—যে বিবাদ সর্বাধিক হিংসাত্মক সেই ধর্মের বিবাদ নাই। এখানে বিবাদ ভাষা লইয়া এবং ভাষাগত এই কলহ সম্পূর্ণ নিরর্থক। আসল কারণ চাকুরি বা ব্যবসাগত অর্থাৎ অর্থনৈতিক। যতক্ষণ বিবিধ রাজ্যগুলি এক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত আছে, ডিসইন্টিগ্রেটেড হইয়া ভাঙিয়া না পড়িতেছে ততক্ষণ অন্ততঃ চাকুরিতে প্রত্যেক রাজ্যকেই ভিন্নরাজ্যের অনুপ্রবেশ মানিয়া লইতেই হইবে। এই মানিয়া লওয়াইবার কাজ কেন্দ্রের। কেন্দ্রে শৈথিল্য না ঘটিলে বা কেন্দ্রের প্রশ্রয় না পাইলে এই পরস্পর রাজ্যবিরোধী সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না।

সাম্রাজ্যের শত্রুরা ঠিক শিয়রে উদ্যত হইয়া আছে, পায়ের দিকটাও যথেষ্ট নিরাপদ নহে। ঘরে অন্তর্ঘাতী বিভীষণেরও অভাব নাই। এই অবস্থায় এই ব্যাপক উচ্ছেদের সুচিন্তিত প্রয়াস যেমন শোচনীয় তেমনই ভয়াবহ। এই সর্বনাশা খাণ্ডবদাহন কেন্দ্র যদি অচিরাৎ বন্ধ করিতে না পারে, তাহা হইলে সাম্রাজ্যের ভাঙন এবং পতন অনিবার্য। রোম এবং দিল্লীর ইতিহাস আমাদিগকে সেই শিক্ষাই দিয়াছে।

আজ আমাদের একান্ত দুর্ভাগ্য যে মহাত্মা গান্ধীর মত সুবিবেচক, মানবপ্রেমিক এবং সাহসী নেতা, এই পরিকল্পিত হাঙ্গামা প্রশমনের জন্য বিপন্নদের মধ্যে দীর্ঘদিন বাস করিয়া শঙ্কিত ভীতসন্ত্রস্ত মানুষদের মনে সাহস ও বিশ্বাস ফিরাইয়া আনিতে কেহই নাই। বিনোবা ভাবে-জী আছেন কিন্তু পদব্রজে ভ্রমণের পণ ত্যাগ না করিলে অকুস্থানে পৌঁছিতে তাঁহার বহু বিলম্ব ঘটিবে। রাষ্ট্রীয় পরিচালকেরা যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া ভয়ার্তের ভয় দূর করুন কিন্তু তাহাদের মনে সাহস ও বিশ্বাস ফিরাইবার জন্য মহাত্মাশ্রেণীর মানুষ প্রয়োজন। বিপন্ন সাধারণ মানুষকে ত্রাণ করিবার মহৎ ব্রতে সকল অসুবিধা সত্ত্বেও তাঁহারা অগ্রসর হউন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

—

বর্তমানের চিন্তা মানুষকে যখন কূল-কিনারায় উত্তীর্ণ করিয়া দিতে পারে না তখন তাহা দিগ্‌ভ্রান্তের মত সর্বত্র হাতড়াইয়া ফেরে; অতীতে প্রবেশ করিয়া নজির খোঁজে, ভবিষ্যতে পাড়ি দিয়া আশা ও আশ্বাসের সন্ধান করে। এলোমেলো চিন্তার মধ্যে অনুভব হইল আমাদের এই জেনারেশনের (পুরুষের) ভাগ্য কী অদ্ভুত। বিড়ম্বিতও বলা যাইতে পারে, আবার বিচিত্র ভাবে সার্থকও বলিতে পারি। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধিকালে যে বুওর-বিগ্রহ, তাহার উত্তেজনাময় পরিবেশে আমাদের জন্ম। দুই দুইটা বিশ্বমহাযুদ্ধের ঝড় আমাদের উপর দিয়া নির্মম ভাবে বহিয়া গেল। তরল বিশ্বাস সংশয় ও যুক্তিবাদের মধ্য হইতে আমরা নিরেট কঠিন জড়বাদ ও বিজ্ঞানবাদে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। কামান-মেশিনগান হইতে অ্যাটম বোমায়, জেপেলিন হইতে জেটবিমানে এবং বেলুন হইতে ভি. টু রকেটে আমরা অনন্ত মহাকাশের শান্তি বিঘ্নিত করিতে শিখিয়াছি। কাইজার উইলহেল্মের বিসমার্ক-প্রশ্রয়-প্রাপ্ত আকাশচুম্বী দম্ভ আমরা যেমন দেখিয়াছি, তেমনই দেখিয়াছি কলির বিশ্বামিত্র সন্ন্যাসী হিট্‌লারের নব আর্যস্থান রচনার স্বপ্ন। কালের গদাঘাতে কাইজারের দম্ভ এবং হিটলারের স্বপ্ন দুই-ই চুরমার হইয়া ভাঙিয়া পড়িতে আমরাই দেখিলাম। আত্মবিস্মৃত সাহিত্যিক মুসোলিনীকে দুদিনের জন্য ডিক্টেটর 'ডুচে'র ভূমিকায় মিলিটারী বুট পায়ে রোমের রাজপথ প্রকম্পিত করিতে দেখিয়া যেমন বিস্ময়বোধ করিয়াছিলাম, সেই বজ্রকণ্ঠ পুরুষকে সেই রোমের রাজপথেই স্তব্ধ ও নিগৃহীত দেখিয়া কম আশ্চর্য হই নাই। প্রবল প্রতাপান্বিত জারের শোষণ-অত্যাচারে একেবারে লোয়ার ডেপ্‌থস—নীচু তলায় পতিত রুশিয়াকে ১৯০৫ ও ১৯১৭ সনে বৈপ্লবিক গা-ঝাড়া দিয়া ধীরে ধীরে স্কাই-স্ক্র্যাপারেরও ঊর্ধ্বতলায় উঠিতে আমরাই দেখিলাম। ইংরেজের গোলার মুখে গেলানো আফিমের নেশায় আত্মবিস্মৃত মহাচীনকে শেষ পর্যন্ত রুশ-ভড্‌কার জোরে প্রমত্ত ও ভয়ঙ্কর হইতে দেখিয়াছি, তাহাদের শেষ পরিণতি কী হইবে দেখিবার প্রতীক্ষায় আছি। লেনিন ট্রট্‌স্কি স্টালিন সানইয়াৎসেন চিয়াংকাইশেক তোজো ইহারা সকলেই আমাদের দেখ্‌তা লোক। কালের সমুদ্রবেলায় বসিয়া তরঙ্গাভিঘাতে ইহাদের উত্থান পতন যশ অপযশ খ্যাতি বিড়ম্বনা প্রতিপত্তি লাঞ্ছনা আমরা অবিরত অবলোকন করিয়াছি। ক্রুক্‌স্‌-আইনস্টাইন, ফোর্ড-নর্থক্লিফ, চ্যাপলিন-গ্রেটাগার্বো, ইসাডোরা-পাবলোভা, গালিকুর্চি-শালিয়াপীন, ব্যাটিং-বেস্ট-ম্যাকলাউড, পিয়ের ও মার্জা কুরি-প্যাবলভ এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ-গান্ধীকে আমাদেরই খণ্ডকালের পৃথিবীকে জ্ঞানসমৃদ্ধ, সুস্থ, স্বচ্ছ, সুন্দর, মনোহর ও মহৎ করিবার জন্য নিরন্তর সাধনা করিতে দেখিলাম। কিন্তু পরিণাম কী হইল।

আমরা বর্তমানে এই বাংলাদেশে যে শোচনীয় অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি, এতদিনের এত জ্ঞান, এত শিক্ষা এত আত্মত্যাগ সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত যে পঙ্কিল কর্দমের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি তাহাতে আশা বা বিশ্বাস আর এতটুকু অবশিষ্ট নাই। কে আমাদের এই সর্বনাশ ঘটাইল? কেন আমরা এমন উদ্যমহীন অবসন্ন মৃতপ্রায় হইয়া স্বদেশেই ধীরে ধীরে প্রবাসী হইয়া পড়িয়াছি? জীবনের সর্বক্ষেত্রে কেন আমাদের পরাজয় ঘটিতেছে? আমাদের

অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, বাসস্থান নাই, কাজ নাই। আমাদের জমিতে অপরে চাষ করিতেছে, আমাদের ভিটায় অপরে বাস করিতেছে, আমাদের বাজারে অপরে ব্যবসা করিতেছে। আমাদের ধন মান প্রাণ সকলই যদি অপরের হস্তে তুলিয়া দিতে হইল তাহা হইলে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পাশ্চাত্ত্য মেটিরিয়ালিষ্টিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া আমরা কী করিলাম। এত যে মহাপুরুষ উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে জন্মিলেন এবং আমাদের সেবা করিয়া প্রাণ দিলেন—তাঁহাদের আবির্ভাব-তিরোভাবে একুনে ফল কী হইল! আমরা কি কেবল সরকারী দলিল-দস্তাবেজ, সংবাদপত্র ও পুথি ঘাঁটিয়া পুরাতনের জাবর কাটিতে থাকিব? নূতন ইতিহাস কই? নূতন মহৎ মানুষ কই? আত্মপ্রতিষ্ঠ জাতি কই? ঘানা-কঙ্গোও স্বাধীন হইয়াছে, আমাদের স্বাধীনতার বিশেষ মূল্য কী! আজ হইতে সাতাশ বৎসর পূর্বে পরাধীনতার নীরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যেই অপরিসীম গ্লানির বশে লিখিয়াছিলাম:

এর চেয়ে মৃত্যু ভাল

এর চেয়ে মৃত্যু ভাল, জানি জানি তাও আমি জানি,—
নিরাশার অন্ধকারে প'ড়ে থাকা চিরদিনমান,
ম'রে যাওয়া ভাল তার চেয়ে।
প'ড়ে প'ড়ে মার খাওয়া—ম'রে যাওয়া ভাল তার চেয়ে—
এ কথা জেনেছি কবে, তবু আজো মরিতে পারি না।
মৃত্যুরে কি করি ভয়, জীবনেরে ভালবাসি এত?
আঘাতে আঘাতে আর নিঃসংশয় অপমান মাঝে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে বুকে আশা-আনন্দের বন্যাস্রোত?
কি যেন রয়েছে বাকি বিধিলিপি আমার ললাটে,
পীড়নের দাবদাহ উত্তরিয়া পাব একদিন
ধবলরজতকান্তি আরামের সুখশয্যাখানি,
সোনার অরুণ-আলো হয়তো বা সহসা একদা
বেদনা-শিথিল মোর মৃত্যুমুগ্ধ শীতল ললাটে
অন্ধকার-নিশিশেষে হানি যাবে উত্তপ্ত পরশ—
বেঁচে আছি তারি প্রতীক্ষায়?
মরিতে পারি না ব'লে বাঁচিয়া রয়েছি এতদিন;

আমার ক্ষুধার অন্ন বুকে ল'য়ে জননী বসুধা
নিশিদিন জেগে আছে মোর মুখে নির্বাক চাহিয়া।
স্তন্যদুগ্ধ ক্ষরিতেছে নদীর প্রবাহে,
অন্নভারে ফাটিতেছে মাটি,
স্বর্ণ রৌপ্য লৌহ আর বহ্নির ইন্ধন,
গতির ইন্ধন যত, মাতা বসুমতী
রেখেছে সঞ্চয় করি নিজ বক্ষতলে—
মোর প্রয়োজন লাগি জননীর আত্মসমর্পণ।

জননীর বক্ষতল নিষ্পেষিয়া ক'রে যায় খালি,
চক্ষে তাঁর বাষ্পোচ্ছ্বাস জাগে।
একে লইতেছে কাড়ি অন্যের আশ্রয়,
করিছে সংগ্রহ একে, মুঠি ভরি আপন খেয়ালে
দু হাতে উড়ায় অন্যে নিতান্ত উল্লাস-অপচয়ে।
নিপীড়িত অন্নহীন চেয়ে আছি বিমূঢ় বিস্ময়ে,
আতঙ্ক-কম্পিত কর বারম্বার হানিয়া ললাটে
ডাকিতেছি—মৃত্যু, এস, মরিতে পারি না একেবারে।
মায়ের বুকের স্তন্য তাও নারি করিবারে পান,
আপনি যা দেন মাতা মুখে তাও পারি না তুলিতে।
আপনার দৈন্যভারে দুর্ভিক্ষের দ্বারদেশে বসি
ঈর্ষাক্ষুব্ধ বক্ষে জাগে বঞ্চিতের অক্ষম কামনা—
মারিয়া মরিতে চাহি, শীর্ণবাহু পারি না মারিতে,
লোলুপ জীবন ল'য়ে মরিতেও নাহি পারি হায়।

এর চেয়ে মৃত্যু ভাল, বেঁচে থাকা নহে স্বাভাবিক।
চলেছে চঞ্চলগতি নবযুগ ব্যাধির প্রকোপে,
জরগ্রস্ত পীড়িতের যন্ত্রণার বিকৃত বিকারে—
বিকার-ব্যসন আনে অসংখ্য উন্মাদ উত্তেজনা।
তারাও বাঁচিয়া আছে মরিবার উদ্দাম আগ্রহে।
বেঁচে থাকা নহে স্বাভাবিক।
দুর্ভিক্ষ মৃত্যুরে আনে প্রাচুর্য মৃত্যুরে দেয় ডাক,

প্রবল, প্রবল দম্ভে মহাশূন্যে মরিছে ফাটিয়া,
কর্দমে দলিত মোরা মরিতেছি তাহাদের চাপে।

সবার ক্ষুধার অন্ন বুকে ল'য়ে জননী বসুধা
করুণ নয়ন তুলি চেয়ে আছে সন্তানের মুখে ;
অন্নাভাবে মরে কেহ, পচা অন্ন মদ হয়ে ওঠে,
টলিছে সফেন মদ্য অতি স্বচ্ছ কাচের গেলাসে,
ধরণীর ক্লেদপঙ্কে মদ্যপ দিতেছে গড়াগড়ি।
বিষাক্ত হয়েছে বিশ্ব স্বর্ণ আর রৌপ্যের বিকারে,
শাণিত লৌহের অস্ত্র তুলিতেছে মানুষের শিরে,
দিকে দিকে শোনা যায় যন্ত্র-দানবের আস্ফালন।
বহ্নির ইন্ধন আজ কুণ্ডে কুণ্ডে জ্বলে দাউদাউ,
সে আগুনে লক্ষ লক্ষ মানুষ পুড়িয়া হ'ল ছাই।
সম্মুখে পড়িয়া আছে দিগন্তপ্রসারী রাজপথ,
সে পথে চলে না কেহ, গতির ইন্ধন পোড়ে শুধু,
মানুষ ঘুরিয়া মরে আপনার চক্রব্যূহ-পথে।

এর চেয়ে মৃত্যু ভাল, জীবনের মিথ্যা জয়ধ্বনি
সবে মিলি তুলিতেছি নবযুগ-ব্যাধির প্রকোপে।
মেঘ-ছোঁয়া দম্ভে আজ জীবনের বীভৎস বিকার—
জীবনের স্বরূপ এ নহে।
প্রাণের মুখোশ পরি মৃত্যু আসি দ্বারে দেয় হানা,
লাঞ্ছিত দলিত পিষ্ট যারা আমাদের মত ক্লীব,
ঘৃণায় মরিতে চাহে দিবসের প্রভাতে সন্ধ্যায়,
তিলে তিলে চলিয়াছি অতি হীন মৃত্যু-অভিযানে,
বিকল অক্ষম মোরা।
একই লক্ষ্য উহাদের, আসিতেছে বিপরীত পথে,
জ্বলিছে তাদের শিরে দম্ভের মশাল পৈশাচিক—
বাজিছে শ্মশানবাদ্য। মশালের স্ফুলিঙ্গের মত
তারাও নিবিয়া যাবে অন্ধকার অলক্ষিত পথে।

অসহায় মানবের লাগি—
বুদ্ধ, জরথুস্ত্র, খ্রীষ্ট যুগে যুগে কেঁদে হবে খুন।

আজ তের বৎসরের স্বাধীনতা, দুইটি সফল পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, চিত্তরঞ্জন-দুর্গাপুর-যাদবপুর-হরিণঘাটা-কল্যাণীর পরেও কি এই কবিতার ভাব ও ভাষা পরিবর্তন করিতে পারিব? বাংলাদেশের সেন্সাস ও স্ট্যাটিসটিকস কি বাঙালীর বাঁচার কথা ঘোষণা করিতেছে—না মৃত্যুর? বাংলাদেশের অলিতে-গলিতে ব্যাঙের ছাতার মত গুরু গজাইয়া লক্ষ লক্ষ শিশুদের খোলা চোখে জ্ঞানাঞ্জনশলাকা বিদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণ অন্ধ করিয়া দেয় নাই তো! অথবা তাহারা রূঢ় কঠিন বাস্তব হইতে পলায়ন করিবার জন্যই গুরুর চরণ-ধূলিতে খরগোশের মত মুখ গুঁজিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছে! এই যে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘানিতে প্রবেশ করিয়া তেল হইয়া বাহির হইতেছে তাহারা কি সকলেই সরগুজা আর শেয়াল-কাঁটার বীজ? সরিষা কি বাংলাদেশে একেবারেই জন্মায় না। "ভারত ছাড়" আন্দোলনের এবং পরে স্বাধীনতা লাভের আবহাওয়ায় ১৯৪২ সন হইতে আজ পর্যন্ত যে লক্ষ লক্ষ শিশু বাংলাদেশে জন্মিয়াছে তাহারা তো অনেকেই যুবকের পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে ; পচা মূলার বস্তায় ঢুকিয়া তাহারা ইহারই মধ্যে ছোঁয়াচ লাগিয়া পচিয়া দুর্গন্ধ ছাড়িতেছে। নবযুগের নূতন শিক্ষা ইহাদিগকে যদি মানুষের মত মানুষ করিয়া তুলিতে পারিত তাহা হইলে তাহার পরিচয় আমরা দেশের সর্বত্র দেখিতে পাইতাম—সুগন্ধ নাকে লাগিত, আনন্দে মন ভরিয়া উঠিত।

চিন্তাশীল মানুষের মনে প্রতিকারের চিন্তা স্বভাবতঃই জাগ্রত হয়। প্রতিকার ধর্মঘট-হরতালে, প্রতিবাদ-শোভাযাত্রায়, সংঘবদ্ধ গুণ্ডামিতে বা আত্মীয়-প্রতিবেশী-নিধনের মধ্যে নাই। প্রতিকার আছে কুসংস্কারবিদারী জ্ঞানবিস্তার এবং যথার্থ শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্যে। বর্তমান বাংলাদেশে শিক্ষকেরা পতিত হওয়াতে শিক্ষা রসাতলে গিয়াছে। আবার নূতন করিয়া গোড়াপত্তন করিতে হইবে, পরীক্ষা-পাসের শিক্ষা রদ করিয়া জ্ঞান-লাভের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, জাল নোটের মত মেড-ইজি নোট-বই পুলিসের ধরপাকড়ের আওতায়

ফেলিতে হইবে, কলেজের অধ্যাপকদের চাইতে ইস্কুলের শিক্ষকদের বেতন বাড়াইয়া প্রাইভেট কোচিং নোট মেকিং এবং বই বিক্রয়ের দালালির জড় মারিয়া দিতে হইবে। তাঁহারা কেবল ছাত্রদের শিক্ষা লইয়া থাকিবেন, প্রত্যেক ছাত্রকে ব্যক্তিগতভাবে চিনিয়া তাহাদের প্রতিভা ও বুদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত করিবেন। তাঁহাদের স্মরণ রাখিতে হইবে তাঁহারা কামার এবং ছাত্রেরা চোর নহে—দিনের আলোকে পরস্পর মেলামেশা ও সাক্ষাৎ একান্ত প্রয়োজন। অর্থনৈতিক কারণে বাড়ির আবহাওয়া যদি সঙ্কীর্ণ ও দূষিত হয় স্টেট হইতে সর্বত্র আবাসিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা সর্বাগ্রে করিতে হইবে। শিক্ষকদের হাতেই ছাত্রদিগকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিতে হইবে। মানুষের মনুষ্যত্ব ধ্বংস করিয়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার নামে ইমারতের পর ইমারত গড়ার উৎকোচ-মধুর খেলা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে হইবে।

আমরা বাংলাদেশে পাঁচ দশটা ইউনিভারসিটি চাই না—হাজার হাজার আদর্শ শিক্ষালয় চাই। কিশলয়দের লইয়া ব্যবসা চাই না; বর্ণ-পরিচয় বোধোদয় কথামালা আখ্যানমঞ্জরী চরিতকথা শিশুশিক্ষা পদ্যপাঠ আর চারুপাঠ চাই। জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে নীতি শিক্ষা চাই। বাংলা-দেশ ভয়াবহ নিষ্ক্রিয় পলায়নীমনোবৃত্তিব্যাধিতে ভুগিতেছে এবং আজ আমাদের সকল সর্বনাশের মূল ইহাই। এই ব্যাধিবশেই আমরা গুরু ও রাজনৈতিক নেতাদের ক্রীতদাস হইয়া মরিতে বসিয়াছি। প্রতিকারের প্রথম ধাপ হইবে নিজ নিজ বুদ্ধির উপর আস্থা স্থাপনের শিক্ষা, আত্ম-নির্ভরতা শিক্ষা। প্রদোষান্ধকারে বাদুড়চামচিকা-উইচিংড়ির প্রাদুর্ভাব ঘটে, অন্ধকার দূর করিতে পারিলেই তাহারাও দূর হয়। কুসংস্কার ও অজ্ঞানতাই মানুষকে পরমুখাপেক্ষী করিয়া তোলে। জ্ঞান ও শিক্ষার প্রতি যদি আমাদের আস্থা থাকিত তবে আইন করিয়া দেশ হইতে গুরু গণৎকার নোট বুক কোচিং ক্লাস উৎখাত করা যাইত এবং তাহা করিতে পারিলেই বাঙালী জাতি অর্ধেক আত্মস্থ হইত। তাহা যখন হইতেছে না—যাহারা পচিয়া গিয়াছে বা যাহাদের মধ্যে পচ্ ধরিয়াছে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়া নূতন ফসল লালনে ও সংরক্ষণে মনোনিবেশ করাই একমাত্র পথ। এই কারণেই সর্বপ্রথম দেশের শিশু ও তরুণদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি কড়াকড় নজর রাখিয়াই নূতন জীবনের জয়যাত্রার অভিযান পরিচালনা করিতে হইবে। খুন-খারাপি, আবেদন-নিবেদন, ক্রন্দন-চিৎকার, আস্ফালন-উল্লম্ফন বাঙালীর বাঁচিবার পথ নয়। শান্তসমাহিত চিত্তে দেশের যাহারা পরবর্তী ভবিষ্যৎ পুরুষ তাহাদিগকে সযত্নে বাঁচাইয়া ধীর স্থির ভাবে অগ্রসর হইতে হইবে। পরিত্রাণ রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ-সুভাষচন্দ্রের স্মৃতিরোমন্থনে নাই, একক বিধানচন্দ্রের আশ্বাসের মধ্যে নাই, সাধুসন্ন্যাসীদের শ্রীচরণে নাই—বাঙালীর পরিত্রাণ নবশিক্ষায় শিক্ষিত সর্ববিধ কুসংস্কারমুক্ত আত্মবিশ্বাসী দেশপ্রেমিক তরুণ সম্প্রদায়ের হাতে। তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ কর, জাগ্রত কর, কাজ করিতে শিখাও তবেই বাঙালী বাঁচিবে।

নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

—

সংবাদপত্রে ইদানীং "রবীন্দ্র-সরোবর" নাম দেখিতে পাইতেছি। রবীন্দ্র-শতবার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে ঢাকুরিয়া লেকের অথবা তাহার অংশবিশেষের এই নাম হইয়া থাকিবে। ভালই। জীবনে বীতস্পৃহ কোনও রবীন্দ্রভক্ত এখানে ডুবিয়া মরিয়াও সান্ত্বনা লাভ করিবে। আমরা পূর্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, একটা রাস্তা, পার্ক অথবা পুকুরের নামের সহিত যুক্ত হইয়া ধন্য হইবেন, রবীন্দ্রনাথ সে জাতীয় পাড়ার বড়লোক বা কাউন্সিলার শ্রেণীর মনুষ্য নহেন। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে অক্ষয় হইয়া আছে এবং চিরকাল থাকিবে। বর্তমানে কাগজ-ছাপাই-বাঁধাইয়ের দুর্মূল্যতার জন্য 'রচনাবলী'র বা দাম সকলের পক্ষে ইচ্ছা থাকিলেও সেগুলি সংগ্রহ করিয়া পড়া সম্ভবপর নয়। যদি জনসাধারণের চাঁদায় অথবা সরকারের বদান্যতায় এই রচনাবলীর মূল্য যথেষ্ট হ্রাস করিয়া বিক্রয় করা হয় তাহা হইলে দেশবাসীর চিত্তে চিরজাগ্রত থাকিবার সুযোগ

রবীন্দ্রনাথ পাইবেন। তিনি যদি অপঠিত থাকিতে আরম্ভ করেন তাহা হইলে অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই দেখা যাইবে ঢাকুরিয়া-পাড়ার তখনকার অধিবাসীরা রবীন্দ্র-সরোবর কোন্ রবীন্দ্রনাথের নামে তাহা লইয়া গবেষণা করিতেছেন। হয়তো ততদিনে স্থানীয় চালকলের বড়লোক মালিক একজন রবীন্দ্রনাথ অথবা চলচ্চিত্র-নক্ষত্র একজন রবীন্দ্রকুমার গজাইয়া উঠিবেন। এইরূপ যে ঘটিবে তাহার প্রত্যক্ষপ্রমাণ আমরা পাই প্রিন্সেপ স্ট্রীটের বেলায়। যিনি ব্রাহ্মীলিপির পাঠোদ্ধার কৌশল আবিষ্কার করিয়া প্রাচীন ভারতবর্ষের মর্মস্থলে আমাদিগকে প্রবেশাধিকার দিয়াছেন তাঁহার নাম আমরা শহরের মানচিত্র হইতে মুছিয়া ফেলিতে এতটুকু দ্বিধাগ্রস্ত বা লজ্জিত হই নাই। সরোবরকে রবীন্দ্রনামাঙ্কিত করাতে রবীন্দ্র-সরোবরকে একদিন কায়কোবাদ-সরোবর করিবার সম্ভাবনাও তো রহিয়া গেল।

রবীন্দ্র-স্মৃতিরক্ষা সমিতির কর্মকর্তাদের কাছে আমাদের নিবেদন এই যে, যদি সমগ্র রচনাবলী স্বল্পমূল্যে দেওয়া সম্ভব না হয় তাঁহার গদ্য (নাটক গল্প বাদ দিয়া) রচনাবলী একত্র করিয়া দশ টাকা মূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করিলে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার সঙ্গে বাঙালী জাতিকে আত্মস্থ করা, তাহার মেরুদণ্ড ঋজু ও দৃঢ় করার কাজও হইবে। লঘু সঙ্গীত, লঘু চিন্তা, পরদাই ছবি এবং হাওয়াই জামা বাঙালীকে স্পুটনিক করিয়া শূন্যমার্গ-অভিযানে প্রেরণ করিতেছে। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাপূর্ণ ভারী ভারী প্রবন্ধের মর্মগ্রহণ করিলে সমস্ত জাতির নিঃশেষ লোকান্তর প্রাপ্তির প্রবাহ রুদ্ধ হইবে এবং ভবিষ্যৎ বাঙালী কৃতজ্ঞতার সহিত রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি অন্তরে বহন করিবে। প্রবন্ধের বইগুলির দ্বারা বিশ্বভারতী খুব বেশী লাভবান হন না বলিয়াই আমাদের ধারণা। সুতরাং এই প্রবন্ধ-দানছত্রে তাঁহারা বিশেষ আপত্তি করিবেন না।

—

রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিক উপলক্ষে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় সম্প্রতি নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশ করিয়াছেন—এই সিরিজের নাম দেওয়া হইয়াছে "রবীন্দ্র-শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা"। ইহার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখ্য 'জীবনস্মৃতি'র সংস্করণটি। গগনেন্দ্রনাথের চিত্রগুলি প্রথম সংস্করণ 'জীবনস্মৃতি'র সম্পদ ছিল। এই সংস্করণে প্রথম সংস্করণের চব্বিশখানি চিত্রই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মূল বই ১৫২ পৃষ্ঠার সঙ্গে ১২২ পৃষ্ঠা গ্রন্থ-পরিচয়, টীকাটিপ্পনী, তথ্যপঞ্জী, উল্লেখপঞ্জী যুক্ত হওয়াতে রবীন্দ্রজীবনের প্রথম পঁচিশ বৎসরের কাহিনী সম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তোলা হইয়াছে। পাঠককে আর আনুষঙ্গিক তথ্যের জন্য এখানে-ওখানে হাতড়াইয়া মরিতে হইবে না। প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেনকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। এই সিরিজে 'চিঠিপত্র' সপ্তম খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। রায় এম. সি. সরকার বাহাদুরের কন্যা কাদম্বিনী দেবী ও পৌত্রী নির্ঝরিণী দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলি এই হিসাবে মূল্যবান যে এইগুলিতে আমাদের সাধারণ গৃহস্থ জীবনের বহু সমস্যা ও প্রশ্নের সহৃদয় সমাধান ও সহজ উত্তর আছে। রবীন্দ্রনাথ যে কতবড় মানব-প্রেমিক, সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কীয়াদের কাছে এই পত্রগুলি তাহার সাক্ষ্য হইয়া রহিল। জীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত রবীন্দ্রজীবনী 'রবীন্দ্রজীবনকথা' সহজ চলতি ভাষায় লিখিত—ঠিক গল্পের মত সুখপাঠ্য। অথচ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অত্যাবশ্যক খবরগুলি স্বল্পপরিসরের মধ্যে সম্পূর্ণ দেওয়া হইয়াছে। এই গ্রন্থ পড়িলে কবি, কর্মী ও মানুষ রবীন্দ্রনাথের একটা সমগ্র পরিচয় মিলিবে।

—

রবীন্দ্রকাব্যে প্রথম প্রিয়া-সম্ভাষণ

শ্রীসজনীকান্ত দাস

কলিকাতার তৎকালীন অভিজাত-পরিবারের রীতি-অনুযায়ী শৈশবে রবীন্দ্রনাথ অন্তঃপুরের স্নেহচ্ছায়ায় লালিত হইবার সুযোগ লাভ করেন নাই। তখন বালকেরা মাতা ভগিনী বৌদিদিদের সান্নিধ্য কদাচিৎ পাইত। দাসী, ভৃত্য ও গৃহশিক্ষকদের অনুগ্রহের উপরেই তাহাদের নিদ্রা-আহার-বিহার ও শিক্ষা নির্ভর করিত। রবীন্দ্রনাথের যখন সাত বৎসর বয়স তখন কাদম্বিনী দেবী (বয়স আট-নয়) কাদম্বরী দেবী হইয়া বাড়ির "নোতুন" ছেলে জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের নববধূরূপে দেবেন্দ্রনাথের পরিবারে প্রবেশ করেন এবং পুরাতন পারিবারিক রীতি ভাঙিয়া স্নেহ-কাঙাল ছোট দেবরকে ধীরে ধীরে একরকম কোলে টানিয়া লন। রবীন্দ্রনাথের চৌদ্দ বৎসর পূর্ণ হইবার দুই মাস আগে মাতৃবিয়োগ হইলে ষোড়শী কাদম্বরী দেবীই তাঁহার মায়ের স্থান পূর্ণ করেন। কাজেই বৌঠান ও দেবরের মধ্যে একটি নিবিড় স্নেহপ্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। বালক-কবিকে উৎসাহ ও প্রশ্রয় দিয়া প্রকৃতপক্ষে কাদম্বরী দেবীই আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ় ভূমিতে প্রতিষ্ঠা দান করেন। এই কাজে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীরও যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল। কাদম্বিনী অর্থে মেঘ, কাদম্বরী অর্থে সরস্বতী। নোতুন বৌঠান সত্য সত্যই রবীন্দ্র-কাব্যজীবনে সরস্বতীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া নূতন নামটিকে সার্থক করিয়াছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথও গোপনে ও প্রকাশ্যে 'ভগ্নহৃদয়' (২৩-এ জুন ১৮৮১), 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' (৫ই জুলাই ১৮৮২), 'বিবিধ প্রসঙ্গ' (আগস্ট ১৮৮৩), 'ছবি ও গান' (ফেব্রুয়ারি ১৮৮৪), 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (২৯এ এপ্রিল ১৮৮৪), 'শৈশবসঙ্গীত' (২৯এ মে ১৮৮৪) ও 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' (১লা জুলাই ১৮৮৪) তাঁহাকে উৎসর্গ করিয়া অথবা তাঁহার স্মরণে নিবেদন করিয়া কবিহৃদয়ের কৃতজ্ঞতার স্বাক্ষর "কালের প্রস্তরপটে" লিখিয়া রাখেন।

এদেশের পাঠশালা-ইস্কুলের শিক্ষা রবীন্দ্রনাথের ধাতে সহিল না দেখিয়া মহর্ষির অনুমতিক্রমে দাদারা তাঁহাকে ব্যারিস্টার করিবার জন্য ইংলণ্ড পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। সুতরাং আঠারো বৎসরে পদার্পণ করিয়াই মেজদা সত্যেন্দ্র-নাথের কর্মস্থল আমেদাবাদ এবং সেখান হইতে বোম্বাইয়ে ইংরেজী ভাষার কিঞ্চিৎ তালিম লইয়া ১৮৭৮ সনের ২০এ সেপ্টেম্বর তিনি সর্বপ্রথম সমুদ্রপারের যাত্রী হইলেন। এই তালিমের ব্যাপারে বোম্বাইয়ের পাণ্ডুরং-দুহিতা অ্যানা তাঁহাকে সাহায্য করিতে করিতে তাঁহার অনুরাগিণী হইয়া উঠেন। সে অনুরাগ কিশোর রবীন্দ্রনাথকেও স্পর্শ করে এবং তিনি নিজের নামসামঞ্জস্যে অ্যানার "নলিনী" নামকরণ করিয়া জীবনের প্রথম প্রেম-গীতি "শুন, নলিনী খোল গো আঁখি" ('শৈশবসঙ্গীত') রচনা করেন। অব্যবহিত পরে অ্যানার অকালমৃত্যুতে এই কৈশোর-প্রেম স্মৃতিমাত্রে পর্যবসিত হয়। 'জীবন-স্মৃতি' রচনার কালে কবির চিত্তে এই বিষয়ে বোধ হয় বিস্মৃতি ঘটিয়াছিল।

বিলাতে স্কট-দুহিতাদের সঙ্গে 'দুদিনে'র ('ভারতী' ১২৮৭, জ্যৈষ্ঠ পৃ. ৫৯-৬০) প্রেম পরবর্তী বিলাত যাত্রায় ঠিকানা হারাইয়া আর স্ফূর্তি পায় নাই। প্রথমবার বিলাতের অসমাপ্ত পাঠ সাঙ্গ করিয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্তন-কালে দেখিতে পাই কবি অসম্পূর্ণ 'ভগ্নহৃদয়' চিরারাধ্যা নোতুন বৌঠানের জন্য এই "উপহার"সহ সঙ্গে আনিয়াছেন :

"তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হবনাক' পথহারা।
যেথা আমি যাইনাকো, তুমি প্রকাশিত থাকো
আকুল এ আঁখি 'পরে ঢাল' গো আলোকধারা।
ও মুখানি সদা মনে, জাগিতেছে সঙ্গোপনে
আঁধার হৃদয় মাঝে দেবীর প্রতিমা পারা।

কখনো বিপথে যদি, ভ্রমিতে চায় এ হৃদি
অমনি ও মুখ হেরি সরমে সে হয় সারা।
চরণে দিনু গো আনি—এ ভগ্ন-হৃদয় খানি
চরণ রঞ্জিবে তব এ হৃদি-শোণিত ধারা।"

—ভারতী, ১২৮৭ কার্তিক, পৃ. ৩৩৭

ইহাই কবির প্রথম মানসী-সম্ভাষণ। ১২৮৬ বঙ্গাব্দের শেষের দিকে স্বদেশ-ও-স্বজন-মিলন-ব্যাকুল "বিপথ"গামী কবি কাদম্বরী দেবীর স্নেহচ্ছায়ায় ফিরিয়া আসেন। ১২৮৭ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসের 'ভারতী'তে উপরে মুদ্রিত "উপহার"সহ 'ভগ্নহৃদয়ে'র প্রকাশ আরম্ভ হয়। জীবনীকার প্রভাতকুমার লিখিয়াছেন :

"দেশে ফিরিবার পর সবচেয়ে আদর আপ্যায়ন পাইলেন তাঁহার নূতন বৌঠাকুরাণীর কাছ হইতে। কাদম্বরী দেবীর বয়স এখন প্রায় একুশ বৎসর; তিনি নিঃসন্তান। তাঁহার নিরুদ্ধ নারীহৃদয়ের সমস্ত স্নেহ, প্রেম, প্রীতি ছিল 'রবি'কে ঘিরিয়া। নয় বৎসর বয়সে বালিকা বধূরূপে তিনি যখন এই গৃহে প্রবেশ করেন, তখন সাত বৎসরের বালক 'রবি' ছিল তাঁহার খেলার সাথী, গল্পের সঙ্গী; চৌদ্দ বৎসর তাঁহাকে নিরন্তর পাইয়াছিলেন। স্বভাবকোমল নারীহৃদয়ের সকল আকাঙ্ক্ষা 'রবি'কে ঘিরিয়া সার্থক হইয়াছিল। তিনি তাঁহার নিঃসঙ্গ স্নেহাতুর জীবনের মধ্যে রবিকে পুনরায় ফিরিয়া পাইয়া যে নিরতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা কল্পনা করিতে পারি। রবীন্দ্রনাথও যে সুখী হইলেন তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন; বিলাতে থাকিতে তাঁহারই কথা সব চেয়ে বেশি করিয়া মনে পড়িত। তাঁহারই স্নেহময় আঁখি ধ্রুবতারার ন্যায় সর্বদা তাঁহার সম্মুখে বিরাজ করিত।" —'রবীন্দ্রজীবনী' ২য় সং ১ম খণ্ড, পৃ ৮২।

১৮৮৪ সনের ১৯এ এপ্রিল—৮ই বৈশাখ ১২৯১ কাদম্বরী দেবী স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করেন। ঠিক সাড়ে চার মাস পূর্বে ১৮৮৩ সনের ৯ই ডিসেম্বর—২৪এ অগ্রহায়ণ ১২৯০ ভবতারিণী দেবীর সহিত রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। কন্যার নাম পালটাইয়া মৃণালিনী রাখা হয়।

শ্রীমান্ জগদীশ ভট্টাচার্য রবীন্দ্রকাব্যজীবনের বিকাশে কাদম্বরী দেবীর যথার্থ স্থান 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত (অগ্রহায়ণ ১৩৬৪ হইতে আষাঢ় ১৩৬৬) ধারাবাহিক প্রবন্ধ "কবিমানসী"তে চমৎকারভাবে নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহারই অদ্যাপি অসমাপ্ত প্রবন্ধের পরিপূরক হিসাবে আমি সম্প্রতি কাদম্বরী দেবী প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে দুই-চারিটি রচনার সন্ধান পাইয়াছি তাহার পরিচয় দিয়া, এই প্রবন্ধের 'শিরোনামায় লিখিত প্রসঙ্গের অবতারণা করিব।

কাদম্বরী দেবী যে জীবনে বীতস্পৃহ হইয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাহা তাঁহার "অদ্ভুত আত্মঘাতনে"র* কিছু পূর্বেই জানিতে বা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং নানা কবিতা ও প্রবন্ধের সাহায্যে তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ ও সুস্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। মৌখিক কোনও আলোচনা তিনি বৌঠানের সঙ্গে করিয়াছিলেন কিনা আমরা জানি না। কবিতা ও প্রবন্ধগুলি সমসাময়িককালে মুদ্রিতও হইয়াছিল। ১২৯০ সালের চৈত্র সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রকাশিত "ধর্ম্ম" প্রবন্ধটি এই রচনার অন্যতম। তাহা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :

"বিশ্ব-জগতের মধ্য দিয়া আমাদের মধ্যে যে দৃঢ়সূত্র প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে ইহাই ছিন্ন করিয়া ফেলা মুক্তি, এইরূপ কথা শুনা যায়। কিন্তু ছিন্ন করে কাহার সাধ্য! আমি আর জগৎ কি স্বতন্ত্র? কেবল একটা ঘরগড়া বাঁধনে বাঁধা? সেইটে ছিঁড়িয়া ফেলিলেই আমি বাহির হইয়া যাইব? আমি ত জগৎ-ছাড়া নই, জগৎ আমা-ছাড়া নয়। আমরা সকলেই জগৎকে গণনা করিবার সময়, আমাকে ছাড়া আর সকলকেই জগতের মধ্যে গণ্য করি, কিন্তু জগৎ ত সে গণনা মানে না।

জগৎ দিনরাত্রি অনন্তের দিকে ধাবমান হইতেছে কিন্তু তথাপি অনন্ত হইতে অত্যন্ত দূরে। তাহাই দেখিয়া অধীর হইয়া আমি যদি মনে করি, জগতের হাত এড়াইতে পারিলেই আমি অনন্ত লাভ করিব, তাহা হয়ত ভ্রম হইতে পারে। অনন্তের উপরে লাফ দেওয়া ত চলে না।

* 'জীবনস্মৃতি', ১৩৬৬ সং, পৃ. ১৪৪

আমাদের সমস্ত লম্ফঝম্ফ এখানেই। এই জগতের উপরেই লাফাইতেছি, এই জগতের উপরেই পড়িতেছি। আর, এই জগতের হাত হইতে অব্যাহতিই বা পাই কি করিয়া? ক'ড়ে আঙুলটা হঠাৎ যদি একদিন এমনতর স্থির করে যে, অসুস্থ শরীরের প্রান্তে বাস করিয়া আমিও অসুস্থ হইয়া পড়িতেছি, অতএব এ শরীরটা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আমি আলাদা ঘরকন্না করিগে—সে কিরূপ ছেলেমানুষের মত কথাটা হয়! সে যতই বাঁকিতে থাকুক, যতই গা-মোড়া দিক, খানিকটা পর্যন্ত তাহার স্বাধীনতা আছে, কিন্তু তাই বলিয়া একেবারে বিচ্ছিন্ন হইবার ক্ষমতা তাহার হাতে নাই। সমস্ত শরীরের স্বাস্থ্য তাহার সহিত লিপ্ত, এবং তাহার স্বাস্থ্য সমস্ত শরীরের সহিত লিপ্ত। জগতের এই পরমাণুরাশি হইতে একটি পরমাণু যদি কেহ সরাইতে পারিত তবে আর এ জগৎ কোথায় থাকিত! তেমনি এক জনের খেয়ালের উপরে মাত্র নির্ভর করিয়া জগতের হিসাবে একটি জীবাত্মা কম পড়িতে পারে এমন সম্ভাবনা যদি থাকে, তাহা হইলে সমস্ত জগৎটা 'ফেল্' হইয়া যায়। কিন্তু জগতের খাতায় এরূপ বিশৃঙ্খলা এরূপ ভুল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব আমাদের বুঝা উচিত জগতের বিরোধী হওয়াও যা, নিজের বিরোধী হওয়াও তা, জগতের সহিত আমাদের এতই ঐক্য!

> যে পথে তপন শশী আলো ধ'রে আছে,
> সে পথ করিয়া তুচ্ছ, সে আলো ত্যজিয়া,
> ক্ষুদ্র এই আপনার খদ্যোত আলোকে
> কেন অন্ধকারে মরি পথ খুঁজে খুঁজে!
>
> * * *
>
> পাখী যবে উড়ে যায় আকাশের পানে,
> সেও ভাবে এনু বুঝি পৃথিবী ত্যজিয়া।
> যত ওড়ে, যত ওড়ে, যত ঊর্ধ্বে যায়
> কিছুতে পৃথিবী তবু পারে না ত্যজিতে
> অবশেষে শ্রান্ত দেহে নীড়ে ফিরে আসে।...

জগতের একটি প্রধান ধর্ম পরার্থপরতা। স্বার্থপরতা জগতের ধর্ম-বিরুদ্ধ। এই নিমিত্ত জগতের কোথাও স্বার্থপর নাই। পরের জন্য কাজ করিতেই হইবে তা ইচ্ছা কর আর না কর। জগতের প্রত্যেক পরমাণু তাহার পরবর্তী ও তাহার নিকটবর্তীর জন্য, তাহার নিজের মধ্যে তাহার বিরাম নাই। তাহার প্রত্যেক কার্য অনন্ত জগতের লক্ষকোটি স্নায়ুর মধ্যে তরঙ্গিত হইতেছে। একটি বালুকণা যদি কেহ ধ্বংস করিতে পারে তবে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের পরিবর্তন হইয়া যায়। তুমি স্বার্থপরভাবে বিদ্যা উপার্জন ও মনের উন্নতি সাধন করিলে, কিন্তু জানিতেও পারিলে না, সে বিদ্যার ও সে উন্নতির লক্ষকোটি উত্তরাধিকারী আছে। তুমি দাও না-দাও তোমার সন্তানশ্রেণীর* মধ্যে সে উন্নতি প্রবাহিত হইবে। তোমার আশেপাশে চারিদিকে সে উন্নতির ঢেউ লাগিবে। তুমি ত দুই দিনে পৃথিবী হইতে সরিয়া পড়িবে, কিন্তু তোমার জীবনের সমস্তটাই পৃথিবীর জন্য রাখিয়া যাইতে হইবে—তুমি গেলে বলিয়া তোমার জীবনের এক মুহূর্ত হইতে ধরণীকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না, প্রকৃতির আইন এমনি কড়াক্কড়।...

নিতান্ত ঘৃণা করিয়া আর কাহাকেও একেবারে পর মনে করা শোভা পায় না। সকলেরই মধ্যে এত ঐক্য আছে। ঘুঁটে মহাশয় মস্ত লোক হইতে পারেন তাই বলিয়া যে গোবরের সঙ্গে সমস্ত আদান প্রদান একেবারেই বন্ধ করিয়া দিবেন ইহা তাঁহার মত উন্নতিশীলের নিতান্ত অনুপযুক্ত কাজ!...

অনেক লোক আছেন, তাঁহারা জগতের সর্বত্রই অমঙ্গল দেখেন। তাঁহাদের মুখে জগতের অবস্থা যেরূপ শুনা যায়, তাহাতে তাহার আর এক মুহূর্ত টিঁকিয়া থাকিবার কথা নহে। সর্বত্রই যে শোক তাপ দুঃখ-যন্ত্রণা দেখিতেছি এ কথা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু তবুও ত জগতের সঙ্গীত থামে নাই! তাহার কারণ, জগতের প্রাণের মধ্যে গভীর আনন্দ বিরাজ করিতেছে। সে আনন্দ-আলোক কিছুতেই আচ্ছন্ন করিতে পারিতেছে না, বরঞ্চ যত কিছু শোক তাপ সেই দীপ্ত আনন্দে বিলীন হইয়া

* "সন্তানশ্রেণীর মধ্যে" কথাটি লক্ষ্য করিবার মত। স্বাভাবিকভাবে লেখা উচিত ছিল "সন্তানদের মধ্যে"। কাদম্বরী দেবী নিঃসন্তান ছিলেন।

যাইতেছে। শিবের সহিত জগতের তুলনা হয়। অসীম অন্ধকার-দিক্-বসন পরিয়া ভূতনাথ-পশুপতি জগৎ কোটি কোটি ভূত লইয়া অনন্ত তাণ্ডবে উন্মত্ত! কণ্ঠের মধ্যে বিষ পূর্ণ রহিয়াছে, তবু নৃত্য। বিষধর সর্প তাঁহার অঙ্গের ভূষণ হইয়া রহিয়াছে, তবু নৃত্য। মরণের রঙ্গভূমি শ্মশানের মধ্যে তাঁহার বাস, তবু নৃত্য। মৃত্যুস্বরূপিণী কালী তাঁহার বক্ষের উপরে সর্বদা বিচরণ করিতেছেন, তবু তাঁহার আনন্দের বিরাম নাই। যাঁহার প্রাণের মধ্যে অমৃত ও আনন্দের অনন্ত প্রস্রবণ, এত হলাহল এত অমঙ্গল তিনিই যদি ধারণ করিতে না পারিবেন তবে আর কে পারিবে! সর্পের ফণা, হলাহলের নীলদ্যুতি বাহির হইতে দেখিয়া আমরা শিবকে দুঃখী মনে করিতেছি, কিন্তু তাঁহার জটাজালের মধ্যে প্রচ্ছন্ন চির-স্রোত অমৃত-নিস্যন্দিনী পুণ্য ভাগীরথীর আনন্দ-কল্লোল কি শুনা যাইতেছে না? নিজের ডমরুধ্বনিতে, নিজের অস্ফুট হর্ষগানে উন্মত্ত হইয়া নিজে যে অবিশ্রাম নৃত্য করিতেছেন, তাহার গভীর কারণ কি দেখিতে পাইতেছি? বাহিরের লোকে তাঁহাকে দরিদ্র বলিয়া মনে করে বটে, কিন্তু তাঁহার গৃহের মধ্যে দেখ দেখি, অন্নপূর্ণা চিরদিন অধিষ্ঠান করিতেছেন। আর ঐ যে মলিনতা দেখিতেছ, শ্মশানের ভস্ম দেখিতেছ, মৃত্যুর চিহ্ন দেখিতেছ, ও কেবল উপরে—ঐ শ্মশান-ভস্মের মধ্যে আচ্ছন্ন রজত-গিরি-নিভ চারু চন্দ্রাবতংস অতি সুন্দর অমর বপু দেখিতেছ না কি? উনি যে মৃত্যুঞ্জয়; আর মৃত্যুকে কি আমরা চিনি? আমরা মৃত্যুকে বিকট করাল-দশনা লোল-রসনা মূর্তিতে দেখিতেছি, কিন্তু ঐ মৃত্যুই ইঁহার প্রিয়তমা, ঐ মৃত্যুকে বক্ষে ধরিয়া ইনি আনন্দে বিহ্বল হইয়া আছেন। কালীর যথার্থ স্বরূপ আমাদের জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই, আমাদের চক্ষে তিনি মৃত্যু আকারে প্রতিভাত হইতেছেন, কিন্তু ভক্তেরা জানেন কালীও যা গৌরীও তাই, আমরা তাঁহার করালমূর্তি দেখিতেছি, কিন্তু তাঁহার মোহিনীমূর্তি কেহ কেহ বা দেখিয়া থাকিবেন। শিবকে সকলে যোগী বলে। ইনি কাহার যোগে নিমগ্ন রহিয়াছেন?

যোগী হে, কে তুমি হৃদি-আসনে,
বিভূতিভূষিত শুভ্রদেহ, নাচিছ দিক্‌বসনে!
মহা আনন্দে পুলক কায়,
গঙ্গা উথলি উছলি যায়,
ভালে শিশু শশী হাসিয়া চায়,
জটাজুট ছায় গগনে।"

পূর্বেই বলিয়াছি 'ভারতী'তে ১২৯০ চৈত্র সংখ্যায় উদ্ধৃত "প্রসঙ্গ"টি বাহির হয় এবং ১২৯১-এর বৈশাখ সংখ্যাও সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রিত হইতে থাকে। কিন্তু কাজ বেশি দূর অগ্রসর হইতে না হইতে ৮ই বৈশাখ তারিখে কাদম্বরী দেবীর স্বেচ্ছামৃত্যু ঘটিলে পত্রিকাপ্রকাশ স্থগিত থাকে। শুধু সাময়িক স্থগিত থাকা নয় সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ এই দুর্ঘটনায় এমন বিচলিত হইয়া পড়েন যে 'ভারতী'র প্রকাশ একেবারে বন্ধ করিতে মনস্থ করেন। এই মর্মে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় একটি বিজ্ঞাপনও বাহির হয় এবং 'ভারতী'তে তাঁহার ধারাবাহিক "স্থান-মান" প্রবন্ধ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ১২৯১ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা হইতে পুনর্মুদ্রিত হইতে থাকে। কিন্তু স্বর্ণকুমারী দেবী নিজের স্কন্ধে সমস্ত সম্পাদকীয় দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া 'ভারতী' পুনঃপ্রকাশে ব্রতী হন। কাজেই জ্যৈষ্ঠ মাসেই বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা একত্র বাহির হয়। যুগ্মসংখ্যার প্রথম ৪০ পৃষ্ঠা বৈশাখ এবং পরবর্তী ৪৮ পৃষ্ঠা জ্যৈষ্ঠ মাসাঙ্কিত হয়। এই বিভাগ যে নিতান্তই অর্থহীন তাহার প্রমাণ মেলে "লীলা" উপন্যাসের ধারাবাহিক কিস্তির শিরোনামার মাসের নাম ও পৃষ্ঠার সংখ্যায়। এই যুগ্মমাসের কিস্তির খানিকটা বৈশাখ ও খানিকটা জ্যৈষ্ঠের ভাগে পড়িয়াছে। বৈশাখ-ভাগে ১৮ হইতে ২৯ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের "ডুব দেওয়া" প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে। মনে হয়, ইহার উপসংহার-ভাগ "প্রেমের শিক্ষা" ৮ই বৈশাখের অব্যবহিত পরেই প্রবন্ধ-শেষে যোজিত হইয়াছে, এবং এই অংশটুকুই "মৃত্যু-শোকে"র প্রথম প্রকাশ। নিম্নের উদ্ধৃতিতে আমার অনুমানের কারণ নিহিত আছে:

"জগৎকে কখন মিথ্যা মনে করিতে পারি না, যখন জগৎকে ভালবাসি। একজন যে-সে লোক মরিয়া গেলে আমরা সহজেই মনে করিতে পারি যে, এ লোকটা

একেবারে ধ্বংস হইয়া গেল, কারণ সে আমার নিকট এত ক্ষুদ্র! কিন্তু একজন প্রিয় ব্যক্তির মরণে আমাদের মনে হয় এ কখনো মরিতে পারে না। কারণ তাহার মধ্যে আমরা অসীমতা দেখিতে পাইয়াছি। যাহাকে এত বেশী ভাল বাসিয়াছি সে কি একেবারে 'নাই' হইয়া যাইতে পারে!...এতখানি বিশালতার একমুহূর্ত্তের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে অন্তর্ধান এ কখনো সম্ভবপর নহে। প্রেম আমাদের হৃদয়ের ভিতর হইতে এই কথা বলিতেছে, তর্ক যাহা বলে বলুক।...যাহা হউক পথ দেখিতে পাইলাম, আশা জন্মিতেছে ক্রমে তাহাকে পাইতেও পারি।"

১২৯১ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'ভারতী'তে "সৌন্দর্য্য ও প্রেম" বাহির হইল*। সৌন্দর্য-ও-প্রেমতত্ত্ব বিষয়ক এই প্রবন্ধের শেষে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ও অনাবশ্যক ভাবে দুইটি অবান্তর প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া, প্রিয়জনবিরহের বিহ্বল মুহূর্তে আত্মপ্রকাশের কোন সুষ্ঠু পথ না পাইয়া যেন নিরুপায় কবি পরের জবানিতে আত্মনিবেদন করিয়াছেন—ইহার মধ্যে ছেলেমানুষী আত্মগোপনতার যে প্রয়াস আছে, যে কোনও তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের কাছে তাহা ধরা পড়িতে পারে এ বোধও শোকবিধুর কবি হারাইয়াছেন। এই কালেই রবীন্দ্রনাথ "পুষ্পাঞ্জলি" রচনা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা প্রকাশ করিবার মত সাহস সঞ্চয় করিতে তাঁহার আরও প্রায় একবৎসরকাল সময় লাগিয়াছিল—"পুষ্পাঞ্জলি" ১২৯২ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'ভারতী'তে বাহির হয়। "সৌন্দর্য্য ও প্রেমে"র শেষ অবান্তর অংশটুকু এই :

"একজন ইংরাজ স্ত্রীকবি এই সম্বন্ধে [পূর্ববর্তী প্রসঙ্গের সহিত এই কবিতার কোনই যোগ নাই!] যাহা বলিতেছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

INCLUSIONS

Oh, wilt thou have my hand, Dear,
to lie along in thine?
As a little stone in a running stream,
it seems to lie and pine!
Now drop the poor pale hand, Dear...
unfit to plight with thine.

Oh, wilt thou have my cheek, Dear,
drawn closer to thine own?
My cheek is white, my cheek is worn,
by many a tear run down.
Now leave a little space, Dear,...lest it
should wet thine own.

Oh, must thou have my soul, Dear,
commingled with thy soul?—
Red grows the cheek, and warm the
hand,...the part is in the whole!...
Nor hands nor cheek keep separate,
when soul is joined to soul.

Mrs. Browning."

ইহার পরেই "সত্যং শিবং সুন্দরং" শিরোনামায় খানিকটা দার্শনিক চিন্তা এবং তাহার পরেই "লক্ষ্মী"-বন্দনার ছলে সদ্যমৃতার চরণে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন :

"লক্ষ্মী, তুমি শ্রী, তুমি সৌন্দর্য্য, আইস, তুমি আমাদের হৃদয়-কমলাসনে অধিষ্ঠান কর।...

"তুমি বিষ্ণুর গেহিনী। জগতের সর্ব্বত্র তোমার মাতৃস্নেহ। তুমি এই জগতের শীর্ণ কঠিন কঙ্কাল প্রফুল্ল কোমল সৌন্দর্য্যের দ্বারা আচ্ছন্ন করিতেছ। তোমার মধুর করুণ বাণীর দ্বারা জগৎ-পরিবারের বিরোধ বিদ্বেষ দূর করিতেছ। তুমি জননী কি না, তাই তুমি শাসন হিংসা ঈর্ষ্যা দেখিতে পার না। তুমি বিশ্বচরাচরকে তোমার বিকশিত কমলদলের মধ্যে আচ্ছন্ন করিয়া অনুপম সুগন্ধে মগ্ন করিয়া রাখিতে চাও। সেই সুগন্ধ এখনি পাইতেছি; অশ্রুপূর্ণনেত্রে বলিতেছি, 'কোথায় গো! সেই রাঙা চরণ দুখানি আমার হৃদয়ের মধ্যে একবার স্থাপন কর, তোমার স্নেহহস্তের কোমল স্পর্শে আমার হৃদয়ের পাষাণ-কঠিনতা দূর কর।' তোমার চরণ-রেণুর সুগন্ধে সুবাসিত হইয়া আমার হৃদয়ের পুষ্পগুলি তোমার জগতে তোমার সুগন্ধ দান করিতে থাকুক!"

* "ধর্ম্ম", "ডুব দেওয়া" ও "সৌন্দর্য্য ও প্রেম" তিনটিই ১৮৮৫ সনের ১৫ই এপ্রিল প্রকাশিত 'আলোচনা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র অচলিত সংগ্রহের ২য় খণ্ডে এই গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

এই কবি-"হৃদয়ের পুষ্পগুলি"ই সত্ত সত্ত স্থূলভাবে "পুষ্পাঞ্জলি" রূপে এবং দীর্ঘ আটত্রিশ বৎসর পরে সূক্ষ্মভাবে 'লিপিকা' রূপে "তোমার জগতে তোমার সুগন্ধ দান করিতে"ছে।

শ্রাবণের (১২৯১) 'ভারতী'তে "কথাবার্তা (সন্ধ্যাবেলায়)" নিবন্ধে* দুইজনের কথাবার্তায় দুঃসহ শোকের মধ্যেও যে কবি সান্ত্বনা পাইতেছেন তাহার আভাস এইভাবে পাই :

"এই যে অতি কোমল বাতাস বহিতেছে এই যে আমার চোখের সমুখে গঙ্গার ছোট ছোট তরঙ্গগুলি মৃদু মৃদু শব্দ করিতে করিতে তটের উপরে মুহুর্মুহু লুটাইয়া পড়িতেছে ইহারা আমার হৃদয়ের এই অতি তীব্র শোক অহরহ শান্ত করিতেছে। জগতের চতুর্দ্দিক হইতে আমার উপর অবিশ্রাম সান্ত্বনা বর্ষিত হইতেছে অথচ আমি জানিতে পারিতেছি না, অথচ কেহই একটি সান্ত্বনার বাক্য বলিতেছে না। কেবল অলক্ষ্যে অদৃশ্যে আমার আহত হৃদয়ের উপরে তাহাদের মন্ত্রপূত হাত বুলাইয়া যাইতেছে, আহা-উহুটুকুও বলিতেছে না।"

শ্রাবণের 'ভারতী'তেই "বিদেশী ফুলের গুচ্ছ" শিরোনামায় পাশ্চাত্ত্য কয়েকজন কবির শোকগাথা-অনুবাদের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ প্রিয়-বিরহে নিজের হৃদয়-বেদনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। ভাদ্রে "হায়" শীর্ষক একটি গানে "তোদের" পক্ষে "ওদের" নির্ম্মমতার জন্য আক্ষেপ। শেষ পংক্তি চারিটি এই :

"[তোরা] পরাণ ভেঙ্গে মধু দিবি
অশ্রু ছাঁকা হাসি হেসে,
বুক ফেটে কথা না ক'য়ে
শুকায়ে পড়িবি শেষে।"

বিগত বৎসর ২৪শে অগ্রহায়ণ বিবাহের পর হইতে এখন পর্যন্ত আমরা রবীন্দ্র-কাব্যে নববধূ মৃণালিনীকে একবারও উঁকি মারিতে দেখি নাই। এইকালে কাদম্বরী দেবী যেন কুমারী জীবনের নামমাহাত্ম্যে ফিরিয়া গিয়া কাদম্বিনীরূপে রবিকে আচ্ছন্ন করিয়া ছিলেন। ভাদ্রে সর্বপ্রথম কবি-প্রিয়াকে ভীরু পায়ে কবির কাব্যে প্রবেশ করিতে দেখা গেল—তাহাও অতি সঙ্গোপনে। কবি এখানে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত একটি নামাক্ষরের আবরণে প্রিয়ার এই প্রথম প্রকাশকে জগতের দৃষ্টির আড়ালে রাখিবার প্রয়াস করিয়াছেন এবং তাঁহার সে প্রয়াস যে সফল হইয়াছে তাহার প্রমাণ, এখন পর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্যানুরাগীরা কেহই এই ক্ষুদ্র কবিতাটির প্রতি নজর দেন নাই। কবিতাটির নাম দিয়াছিলেন "তোমাকে"। কবিতা-শেষে লেখকের নামের স্থলে একটি "উ" অক্ষর ছিল। কবির সহিত সকল সম্পর্ক বিরহিত এই অতি নিরীহ "উ" অক্ষরটিই তাঁহার উৎকট ছলনার উত্তম সহায় হইয়াছিল। "তোমাকে" কবিতার প্রস্তাবনাস্বরূপ নামস্বাক্ষরহীন আর একটি কবিতা যোজিত হইয়াছে, তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে "নীরব নিশীথে"। দুটি কবিতাই নিম্নে পর পর সর্বপ্রথম পুনর্মুদ্রিত হইল :

নীরব নিশীথে

১

ঘুমায় নীরব ধরা,
তারকা আকাশ-ভরা,
চৌদিকে বিষম নীরবতা!
সুদূর শ্মশান হ'তে
সমীর আনিছে ব'য়ে
জগতের মরণ-বারতা।

২

পাশরি মায়ার খেলা,
চেতনা জাগিছে প্রাণে,
মহাযোগে যোগী নিমগন ;
অনিমেষ দুনয়ানে,
চাহিয়া গগন পানে,
নিরখেন মহান্ স্বপন।

৩

পবিত্র জাহ্নবী-জল,
নিষ্কম্প পাদপ দল,
যামিনী ফেলিছে মৃদু শ্বাস ;

* "কথাবার্তা"ও 'আলোচনা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

নীরব নিস্তব্ধ সব,
উঠিছে ঝিল্লীর রব,
প্রাণ যেন উদাস-উদাস !

৪

শ্মশানের মহামায়া,
প্রাণেতে ফেলেছে ছায়া ;
আবরি রেখেছে প্রাণ মোর—
শ্মশানের সেই চিতা
শ্মশানের সেই আলো
বিজন আঁধার অতি ঘোর !

৫

জগৎ দেখিতে কিগো
এসেছি জগতী তলে,
আর কিছু নাই দেখিবার ?
এ ক্ষুদ্র জীবন ল'য়ে
চোলেছি অনন্ত পথে,
পার হোতে মহা পারাবার !

৬

আসিবে কি কোন দিন
ভাঙ্গাতে ঘুমের ঘোর,
চিরকাল রবে কি আঁধার !
এ মায়া কাহার্ মায়া,
বুঝিতে না পারে হিয়া
প্রাণ বলে—"এযে কারাগার" !

তোমাকে

১

নীরব তটিনী বুকে,
মৃদু বায়ু মন সুখে
ধীরি ধীরি করে বিচরণ ;
চম্পক চামেলি বেলা,
ফুটেছে মালতী মেলা,
সৌরভে পুলকে ত্রিভুবন !

২

ওই বুকে রাখি মাথা,
ওই মুখ পানে চেয়ে,
প্রাণ মোর ঘুমাইতে চায় ;
দূরে দূরে হাসে ফুল,
দূরে দূরে নাচে লতা,
দূরে দূরে পাখী গান গায়।

৩

তটিনী জ্যোৎস্না মাখা,
আকাশ তারকাময়,
দশদিশি হাসিছে কেমন !
এহেন সময় প্রিয়ে
কেন লো কিসের দুখে
ম্লানমুখ, নত দুনয়ন !

৪

অয়ি সোহাগিনী লতা,
কে বল দিয়েছে ব্যথা,
কেন বল এত অভিমান !
সে মধুর হাসিখানি,
দেখাও আমায় রাণি,
কেন হেরি বিরস বয়ান !

৫

আমরা দুটিতে মিলি,
আছি হেথা নিরিবিলি,
এস সখি মন কথা কই ;
গেছে চলে কত কাল,
আরো বল কত কাল,
দুজনে দুজন মোরা রই !

৬

জগতের প্রান্ত দেশে,
ওই আকাশের শেষে,
যেথায় তারারা চেয়ে আছে ;
সুধামুখী মেয়েগুলি,
কাননে কুসুম তুলি
বেড়ায় মন্দার গাছে গাছে !

৭

ওই দেখ হাত তুলে,
হেসে হেসে দুলে দুলে,
ওই ওরা ডাকিছে তোমায় ;

আকাশ খুলেছে দ্বার,
কোন বাধা নাহি আর,
আয় সখি আয় তবে আয়!

উ—

['ভারতী' ১২৯১, ভাদ্র পৃ. ২০৬-২০৮]

এই কবিতা ছুটি যে রবীন্দ্রনাথের রচনা, কবিতা দুইটির কয়েকটি পংক্তি ও কয়েকটি শব্দপ্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। 'ছবি ও গানে'র "যোগী" কবিতা এবং এই প্রবন্ধের মধ্যে উদ্ধৃত "ধর্ম্ম" প্রবন্ধের শেষ অংশে "নীরব নিশীথে"র আভাস মিলিবে। 'ছবি ও গানে'র "স্মৃতি-প্রতিমা" "মাতাল" প্রভৃতি কবিতার মধ্যে "তোমাকে"র কোনও কোনও বাক্যাংশ লক্ষণীয়। তাহা ছাড়া সবচাইতে বড় প্রমাণ এই যে ১২৯১ বঙ্গাব্দের 'ভারতী'র লেখকবৃন্দের মধ্যে এই জাতীয় ছন্দ ও ভাব প্রকাশের ক্ষমতা দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তির ছিল না। যে কোনও অনুসন্ধিৎসু পাঠক পরবর্তীকালে রচিত 'কড়ি ও কোমলে'র গোড়ার দিকের এবং 'মানসী'র শেষের দিকের কবিতাগুলি যত্ন করিয়া পাঠ করিলে উদ্ধৃত কবিতা দুইটি যে রবীন্দ্রনাথের সে বিষয়ে নিঃসংশয় হইবেন।

এই "নীরব নিশীথে" ও "তোমাকে" কবিতা দুইটিকে অন্য নাম দিলে ইহাদের মর্ম পরিস্ফুটতর হইবে। "নীরব নিশীথে"=পুরাতন, অন্ধকার, মরণ বা কাদম্বরী দেবী এবং "তোমাকে"=নূতন, জ্যোৎস্না, জীবন বা মৃণালিনী দেবী।

বেনামের আড়ালে অভিমানিনী প্রিয়ার প্রতি প্রথম প্রেম নিবেদন করিয়া রবীন্দ্রনাথ "যোগিয়া" কার্ত্তিক ১২৯১, "শরতের শুকতারা" অগ্রহায়ণ ১২৯১, "কোথায়" পৌষ ১২৯১, "বিদায়" ('কড়ি ও কোমলে' নাম "পুরাতন") চৈত্র ১২৯১ এবং "নূতন" বৈশাখ ১২৯২, "শান্তি" শ্রাবণ ১২৯২ প্রভৃতি কবিতায় ('ভারতী'তে) বিবিধ যুক্তি প্রয়োগে পুরাতনকে সান্ত্বনাদানে বিদায় করিয়া নূতনকে বরণের আয়োজন করিলেন। এই সকল যুক্তির সারমর্ম "নূতন" কবিতার শেষাংশে এইভাবে প্রকাশ পাইয়াছে:

নহে নহে, সে কি হয়! সংসার জীবনময়,
নাহি হেথা মরণের স্থান।
আয়রে, নূতন, আয়, সঙ্গে করে নিয়ে আয়,
তোর সুখ, তোর হাসি গান।
ফোটা' নব ফুলচয়, ওঠা' নব কিশলয়,
নবীন বসন্ত আয় নিয়ে।
যে যায় সে চলে যাক্, সব তার নিয়ে যাক্,
নাম তার যাক্ মুছে দিয়ে।
এ কি ঢেউ-খেলা হায়, এক আসে, আর যায়,
কাঁদিতে কাঁদিতে আসে হাসি,
বিলাপের শেষ তান না হইতে অবসান
কোথা হতে বেজে ওঠে বাঁশি।
আয়রে কাঁদিয়া লই, শুকাবে দু দিন বই
এ পবিত্র অশ্রুবারি ধারা।
সংসারে ফিরিব ভুলি, ছোট ছোট সুখগুলি
রচি দিবে আনন্দের কারা।
না রে, করিব না শোক, এসেছে নূতন লোক,
তারে কে করিবে অবহেলা।
সেও চলে যাবে কবে, গীত গান সাঙ্গ হবে,
ফুরাইবে দুদিনের খেলা।

তবে ১৩০৯ বঙ্গাব্দের ৭ই অগ্রহায়ণ "সে"ও চলিয়া গিয়াছে, "দুদিনের খেলা" হয়তো ফুরাইয়াছে কিন্তু "গীতগান সাঙ্গ" হয় নাই।

শ্রীমান্ জগদীশ ভট্টাচার্য তাঁহার "কবিমানসী"তে বহু প্রমাণ প্রয়োগে দেখাইয়াছেন "পুরাতন"কে বিদায় দিবার এই চেষ্টা নিষ্ফল চেষ্টা মাত্র হইয়াছে। স্থূল সূক্ষ্ম হইয়া, দেহ দেহাতীত হইয়া কবির সমগ্র ভবিষ্যৎ-জীবনকে প্রভাবিত করিয়াছে।

কিন্তু কবি যে ১২৯১ সালেই মানসীকে বিদায় দিয়া প্রেয়সীকে বাস্তব জীবনে সাদরে বরণ করিয়াছিলেন, "তোমাকে" কবিতার মধ্যে তাহার চিরন্তন সাক্ষ্য রহিয়া গিয়াছে। এই কবিতাটিই তাঁহার প্রথম প্রিয়া-সম্ভাষণ, মৃণালিনীর চিত্ত-শতদলে রবির প্রথম কিরণ-সম্পাত। রবীন্দ্র-কাব্যসাহিত্যে বিশিষ্ট স্থানের দাবি এই কবিতাটি রাখে।

পাথর

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

বাসুদেব তার অতীত দিনের কথা ভাবে। আঃ, কি সুখেই না দিন কেটেছে।

মোটর গাড়ি মেরামতের কাজ করত। আজ এ-কারখানায়, কাল ও-কারখানায়, কাজের অভাব ছিল না। কালিঝুলি মেখে কাজ করতে হত বটে, কি শীত, কি গ্রীষ্ম, বাড়ি ফিরে সাবান মেখে ফরসা কাপড়জামা না পরলে মানুষ বলে মনেই হত না। কিন্তু তা হোক, কাজের সুখ ছিল অনেক। মাইনে তো একটা ছিলই, তার ওপর গাড়ির একটা পার্টস্ সরাতে পারলেই দুম করে কিছু উপ্‌রি রোজগার হয়ে যেত। তা ছাড়া, এটা-ওটা-সেটা ছোটখাট পার্টসে বাড়ি একেবারে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। গাড়ির পুরনো কলকব্জার দরকার হলে সবাই বলত—বাসু-মিস্ত্রির কাছে দেখো। মল্লিকবাজারে যাবার আগে অনেকে আসত বাসু-মিস্ত্রির বাড়িতে।

স্ত্রী বলত, এত সব কলকব্জা তুমি পাও কোথায়? চুরিটুরি কর না তো?

বাসুদেব হাসত। বলত, চুরি করে না কোন্ শালা? আমি করি ছোটখাট চুরি, আর আমার কারখানার মালিক যিনি, তিনি করেন বড় বড় চুরি। গাড়িকে গাড়ি ফাঁক করে দেন।

স্ত্রী রাগ করত। বলত, এগুলো ভাল নয়।

বাসুদেব বলত, যা জান না তা নিয়ে কথা বল না। একে চুরি বলে না। এর নাম—বিজিনেস্।

একটা ছেলে আর একটা মেয়ে। এতটুকু অভাব ছিল না সংসারে।

আর আজ!

দিনকাল গেছে বদলে। জিনিসপত্রের দাম যেন হুহু করে বেড়ে চলেছে দিন-দিন। বাজারের থলি হাতে নিয়ে বাসুদেব বাজার করতে গিয়ে ভাবে, এ হল কি! মোটরের কারখানায় কাজ সে এখনও করে। আগে যে-জিনিসটা বেচত দু টাকায়, এখন সেটা সে দশ টাকার কমে ছাড়ে না, তবু তার সংসার অচল।

ছেলেটা ঘড়ি মেরামতের কাজ জানে। বাপের মত কালিঝুলি মাখতে সে রাজী হয় নি, তাই মোটরের কাজ না শিখে ঘড়ির কাজ শিখেছে।

বাসুদেব বলে, বাবু সেজে মর্ এবার ব্যাটা, কি খাবি খা। ঘড়িকে-ঘড়ি সরালেও তো পেট ভরবে না।

ছেলে সে কথায় কান দেয় না। কাপড়ের কোঁচাটা পকেটে পুরে একটা সিগারেট ধরিয়ে হনহন করে বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে।

স্ত্রী বলে, লিলির দিকে আর তাকানো যায় না। এবার যদি ওর বিয়ের ব্যবস্থা না কর তো কোন্‌দিন কী বিপদ ঘটিয়ে বসবে কে জানে।

বাসুদেব জানে সে কথা। এই সেদিন যে মেয়ে ফ্রক পরত, আজ তার রঙিন শাড়ি না হলে চলে না।

লিলির একখানা শাড়ি কিনতে গিয়ে সেদিন জিব বেরিয়ে পড়েছিল বাসুদেবের। মেয়ের বিয়ে সে দেবে কেমন করে?

তার চেয়ে—

বাসুদেব বলে, সায়েবদের কেমন বাপ-মাকে ও-সব ঝক্কি-ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয় না। মেয়ে নিজেই নিজের ব্যবস্থা করে নেয়।

স্ত্রী বলে, আমরা তো সায়েব নই।

বাসুদেব বলে, সায়েব হতে আর দেরি নেই।

মুখে বলে বটে, কিন্তু বাপ হয়ে চুপ করেই বা থাকে কেমন করে।

তিন-চারটে কারখানার প্রায় সব মিস্ত্রিদের সে বলে রেখেছিল—মেয়ে আমার দেখতে শুনতে খুবই ভাল।

কায়েতের ঘরের মেয়ে—কত আর খারাপ হবে? ভাল একটি পাত্তর যদি পাও তো ভাই আমাকে খবর দিও।

খবর দু-একটা যে আসে না তা নয়, কিন্তু টাকার খাঁকতি বড় বেশী। শুধু মেয়ে দেখে বিয়ে করতে কেউ রাজী হয় না।

খিদিরপুরের পাঁচু মিস্ত্রি একদিন খবর পাঠাল—পিয়ারসন গ্যারেজে এসে বাসুদেব যেন আমার সঙ্গে একবার দেখা করে।

ডাক্‌সাইটে মাতাল এই পাঁচু মিস্ত্রি। হলে কি হবে, গাড়ির আওয়াজ শুনে দোষ ধরে দেয়। সাহেব-পাড়ার গ্যারেজে তার যেমন রোজগার, তেমনি খাতির।

বাসুদেব গেল তার সঙ্গে দেখা করতে।

পাঁচু বলল, তোমার ছেলের বিয়ে দেবে?

বাসুদেব বলল, ছেলের বিয়ের জন্যে তো ভাবছি না রে ভাই, আমার মেয়ের বিয়ের ভাবনাটাই আগে।

পাঁচু বলল, মেয়ের বিয়ে দেবার টাকা আছে?

না ভাই, টাকাকড়ি কিচ্ছু নেই।

পাঁচু বলল, জানি, আমাদের চুরির পয়সা থাকে না। তবে মদ-ভাঙ তো খাও না, কিছু তো থাকা উচিত।

বাসুদেব বলল, না ভাই, কিচ্ছু নেই।

তা হলে এক কাজ কর।—পাঁচু পরামর্শ দিল, ছেলের বিয়ে দিয়ে যা পাবে, তাই দিয়ে মেয়েটার বিয়ে দাও।

বাসুদেব বলল, মন্দ বল নি।

মন্দ আমি কখনও বলি না।

বলেই পাঁচু তার হাত পেতে বসল। বলল, এই ঘটকালির জন্যে আমাকে কি দেবে বল?

আগে কি পাব তাই ঠিক হোক, তারপর তো ঘটক বিদায়।

এই বলে বাসুদেব হো হো করে হাসতে লাগল। সে ভেবেছিল পাঁচু বুঝি রসিকতা করছে।

কিন্তু না, রসিকতা সে করে না আজকাল। এমনি করেই দু-দশ টাকা তাকে রোজগার করতে হয়। পুরনো গাড়ির দালালি করতে হয়। বিয়ের ঘটকালি করতে হয়।

পাঁচু বলল, তা হলে শোন বাসুদেব, কথাটা তোমাকে খুলেই বলি। মেয়েটি কালো, তবে বডি একেবারে ওল্ড মডেলের গাড়ির মত—রোল্‌স্ রয়েস্!

বাসুদেব বলল, আমার ছেলে কিন্তু খুব সুন্দর। কালো মেয়ে সে বিয়ে করতে চাইবে না।

পাঁচু বলল, মামার মস্ত গয়নার দোকান। সোনায় মুড়ে দেবে মেয়েকে।

সোনা নিয়ে কি করব?

পাঁচু বলল, সেই সোনা দিয়ে মেয়ে পার করবে।

বাসুদেব বলল, মেয়ে যদি না দিতে চায়?

পাঁচু বলল, ওর বাপ দেবে।

তারপর যদি কান্নাকাটি করে?

পাঁচু বলল, ঘাড় ধরে বিদেয় করে দেবে।

বাসুদেব এতক্ষণে যেন আশ্বস্ত হল। বলল, তা যদি বল তো বিয়ে দিতে পারি। কিন্তু নগদ টাকা কিছু দিতে হবে। বউ-ভাতের খরচ আছে।

বউ-ভাত না ঘেঁচু! নগদ পাঁচশো পাঁচশো করছে। বলে-কয়ে আমি ওকে এক হাজারে তুলতে পারি—তুমি যদি আমাকে আড়াইশো টাকা দাও।

বাসুদেব বলল, আড়াইশো নয়, দুশো দেব।

পাঁচু বলল, বাস্, তা হলে এই কথা রইল তোমার সঙ্গে। সায়েব-কোম্পানিতে কাজ করি, বেশী কথা বলতে ভালবাসি না। মেয়ে কবে দেখবে বল?

বাসুদেব বলল, চুপিচুপি একদিন দেখে আসব ছেলেকে না জানিয়ে। আগে তা হলে মেয়ের জন্যে একটি ছেলে ঠিক করি।

পাঁচু চোখ বুজে রইল। চোখ বুজে বলতে লাগল, ছেলে, ছেলে, ছেলে—

স্মৃতিসমুদ্র মন্থন করে দেখতে লাগল, যদি পাওয়া যায় কোনও ছেলের সন্ধান।

হঠাৎ একসময় সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল: পেয়েছি। তোমার মেয়ের বয়েস কত?

বাসুদেব বলল, মুখে বলি আঠারো, কিন্তু আসলে হল গিয়ে কুড়ি-একুশ।

পাঁচু বলল, বাস্ হয়ে গেছে। ছেলের বয়েস পঁচিশ-তিরিশ। বিয়ে একটা করেছিল, বউ মরে গেছে। বাপের একটি ছেলে। বাপ বহুত টাকা করে গেছে ব্ল্যাক মার্কেটে। বাপ মরে যাবার পর সেই সব টাকা এসে পড়েছে ছেলের হাতে। ছেলে দু হাতে টাকা ওড়াচ্ছে। এই রকম একটা জামাই পেলে তোমার হিল্লে হয়ে যাবে।

এই রকমটিই তো চাইছে বাসুদেব! মনে হল, বিয়েটা যদি এক্ষুনি হয়ে যায় তো ভাল হয়। কিন্তু একটা ভয় শুধু মনের মধ্যে খচখচ করতে লাগল। মিস্ত্রিরা কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না। গাড়ি মেরামতের কাজ শিখতে গিয়ে ছেলেবেলা থেকে দুটো জিনিস তাদের অভ্যেস করতে হয়। গাড়ির ভাল পার্টস্ খুলে নিয়ে তার জায়গায় তাপ্পিতুপ্পি দিয়ে গাড়ি চালানো, আর মিছে কথা বলে আনাড়ী খদ্দেরের চোখে ধুলো দেওয়া।

বাসুদেব পাকা মিস্ত্রি হলে কি হবে, আনাড়ী বাপ তো! পাঁচু তার সঙ্গে চালাকি করছে কি না তাই বা কে জানে!

বাসুদেব বলল, চল, তা হলে কালই দেখে আসি।

পাঁচু বলল, চল।

বলেই সে আবার সাবধান করে দিল বাসুদেবকে: দু জায়গা থেকেই আমি কিছু কিছু মারব। সোজা সত্যি কথা বলে রাখছি তোমাকে।

পাঁচুকে সঙ্গে নিয়ে বাসুদেব মেয়েও দেখে এলো, ছেলেও দেখে এলো। পাঁচু মিথ্যা বলে নি। জামাই যে হবে—ছোকরাটা দেখতে যেন একটু কেমন-কেমন। প্রচুর পান খায়, অথচ দাঁত মাজে না। মাথার চুলে 'উত্তমকুমারী' ছাঁট। পরনে লম্বা পা-জামা, আর গায়ে জন্তুজানোয়ারের ছাপমারা বুশসার্ট। তা হোক, আজকালকার বড়লোকের ছেলেরা অমনই হয়।

বউমাকে কিন্তু ছেলের পছন্দ হবে না। পাঁচু বলছিল, পুরনো মডেলের গাড়ির মতন মজবুত, আর রোল্স্ রয়েসের মতন দামী। তা হয়তো সত্যি, কিন্তু গায়ের রঙটি ঠিক হুঁকোর মতন।

অনন্তর যদি পছন্দ না হয় তো তখন পাঁচু যা পরামর্শ দিয়েছে, শেষ পর্যন্ত সেই ব্যবস্থা করলেই চলে যাবে। গয়নাগুলো লিলিকে পরিয়ে তাড়িয়ে দিলেই হবে।

সোনার গয়না আর টাকা—একই কথা।

জামাইয়ের মাও রাজী হয়ে গেছে—টাকা চাই না, মেয়েকে সাজিয়ে দিলেই চলবে।

বাসুদেবের স্ত্রী শুনল। ছেলে শুনল। মেয়ে শুনল।

লিলি মুখ বুজে চুপ করে রইল। অনন্ত কিন্তু তার মাকে গিয়ে বলল, মেয়ে দেখালে না। না দেখেই বিয়ে করছি। খারাপ যদি হয় তো বাপের নাম ভুলিয়ে দেব।

অনন্তর বিয়ে আগে। লিলির বিয়ে পরে।

অনন্তর বিয়ের দিন বাসুদেব ভেবেছিল পাঁচুকে এক বোতল মদ দিয়ে ভুলিয়ে রাখবে। তারপর তার পাওনা মেটাবে লিলির বিয়ের পর।

কিন্তু মদ্যপান না করালে পাঁচু বোধ করি ভুলে থাকতে পারত। মদটুকু পেটে পড়বার পরই জ্ঞানবুদ্ধি তার টনটনে হয়ে উঠল। ক্রমাগত চেঁচাতে লাগল, বেসো, আমার টাকা দে।

অগত্যা টাকা বাসুদেবকে দিতেই হল, আর দিতে হল গুনে গুনে করকরে কুড়িখানি দশ টাকার নোট। বাসুদেবের মনে হল—সে যেন তার পাঁজরার হাড় কখানি গুনে গুনে পাঁচুর হাতে তুলে দিল।

কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই।

পাঁচু থাকে থাকে আর তড়পে তড়পে ওঠে: বেসো, আমার টাকা?

বাসুদেব বলে, দিলাম যে।

পাঁচু বলে, ও, দিলি নাকি?

বার-পাঁচেক টাকা টাকা করবার পর, বাসুদেব তাকে ধমকে দিল। বলল, আচ্ছা মাতালের পাল্লায় পড়লাম তো। লোকজন সব রয়েছে, তারা ভাববে কি?

তখন সে অন্য ধুয়ো ধরল। বলল, ছেলেকে জিজ্ঞাসা কর্—বউ পছন্দ হল?

বাসুদেব বলল, না, পছন্দ হয় নি। চেঁচামেচি করছে আর বলছে—পালিয়ে যাবে বাড়ি থেকে।

পাঁচু জিজ্ঞাসা করল, ছেলের মা কি বলছে ?

কাঁদছে বসে বসে।

পাঁচু বলল, কাঁদুক। তোর হাতে পড়ে তো সারা জীবন কাঁদল, এখনও কান্নার সাধ মিটল না ? টাকাগুলো রেখেছিস তো ভাল করে ?

বাসুদেব বলল, রেখেছি।

বিয়ে তো চুকে গেছে ?

হ্যাঁ।

পাঁচু বলল, বাস্। এইবার মেয়ের বিয়েটা সেরে দিয়ে চল্ একবার কাশী থেকে ঘুরে আসি। পুণ্যি হবে।

বাসুদেব বলল, তোমার পায়ে ধরছি, তুমি চুপ কর পাঁচুদা।

আর একটা বোতল না দিলে আমি চুপ করব না।

এই বলে সে আবার চেঁচাতে লাগল।

বেসো!

কি বলছ ?

মদ দে। নইলে আমি সব ফাঁস করে দেব।

ফাঁস অবশ্য সে করল না। মেয়ের বিয়েটাও চুকে গেল।

এক-গা গয়না পরে লিলি যখন বরের সঙ্গে গাড়িতে গিয়ে উঠল, বাসুদেব তখন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এক গ্লাস জল খেল।

স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল, বলবামাত্র গয়নাগুলো খুলে দিলে ? বউমা কিছু বলল না ?

লিলির মা বলল, না।

বাসুদেব চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করল, অনন্ত কোথায় ?

লিলির মা বলল, মনের দুঃখে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বউমার দিকে একবার মুখ তুলে দেখছে না পর্যন্ত।

বাসুদেব বলল, এইবার তা হলে ওদের বলি—মেয়েটাকে ওরা নিয়ে যাক।

গয়নার জন্যে যদি হাঙ্গামা করে ?

বাসুদেব বলল, পুলিস ডাকব।

যা ভাল বোঝ তাই কর বাপু, আমার আর ভাল লাগছে না।

বাড়িতে রাত্রিবাস করছে না অনন্ত। কোথায় কোন্ বন্ধুর বাড়িতে দুদিন কাটিয়ে সেদিন রাত্রে সে বাড়ি ফিরতেই মা বলল, কাল বউমাকে আমরা বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেব ঠিক করেছি। তোর বাবা ওদের বলে এসেছে। সকালেই গাড়ি আসবে।

অনন্ত গম্ভীরভাবে বলল, ভাল।

বলেই সে তার মার খাটের ওপর শুয়ে পড়ছিল। মা বলল, খেয়ে এসেছিস নাকি ?

অনন্ত বলল, হ্যাঁ।

মা বলল, তোকে একটি কাজ করতে হবে বাবা।

কি কাজ ?

বউমাকে জানিয়ে দিয়ে আসতে হবে কথাটা।

তুমি যাও। আমি ওর সঙ্গে কথা বলব না।

আমি যেতে পারছি না বাবা। ওর গায়ের গয়নাগুলো খুলে নিয়ে লিলিকে পরিয়ে দিয়েছি। বলেছি, লিলি ফিরে আসুক শ্বশুরবাড়ি থেকে, তারপর তোমার গয়না তোমাকেই ফিরিয়ে দেব বউমা।

অনন্ত চিৎকার করে উঠে বসল : বউমা বউমা করছ কেন ? কে তোমার বউমা ?

মা বলল, ছেলের বউ, তাই বউমা বলছি।

অনন্ত বলল, না, ও তোমার ছেলের বউ নয়। ও তোমার কেউ নয়। এই কথাটা আর বলে আসতে পারছ না যে, এখানে তোমার থাকা চলবে না।

মা বসল তার পাশে। বলল, মা হয়ে কেমন করে বলব রে ? আমার কথাটা তুই বুঝছিস না অনন্ত। আমার লজ্জা করছে।

বেশ, তবে লজ্জাশরম যার নেই তাকেই পাঠিয়ে দাও গে।

অনন্ত কাকে ইঙ্গিত করছে, মার বুঝতে বাকি রইল না। বলল, তোর বুড়ো বাপকে আর এর ভেতর টানিস নি বাবা।

না, টানবে না! বাবা কেন এর ভেতর আমাকে টানল ?

মা বলল, কেন টানল কে জানে বাবা। লিলির বিয়ে এখন না হয় না হত। এর চেয়ে সে অনেক ভাল ছিল। আমি বারণ করেছিলাম অনন্ত। এ পাপ, এ অন্যায়। নিজের মেয়েটিকে পার করলাম, কিন্তু পরের মেয়েটির সর্বনাশ করা কেন ? তুই যে বাড়িতে থাকছিস না, নইলে আমার ইচ্ছে ছিল, লিলি ফিরে এলে ওর গয়নাগুলো ওকে ফিরিয়ে দিয়ে—

অনন্ত উঠে দাঁড়াল। কথাটা তার শেষ হল না।

মা বলল, যা বাবা যা। নইলে আমিই তো ওর কাছে শুই। বলবে, শাশুড়ী কিছু বললে না।

আমি ফিরে এসে এইখানে শোব।

বলেই অনন্ত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল অনন্ত। আলো জ্বলছে। মেয়েটা বোধ করি ঘুমিয়ে পড়েছে। লিলির ঘর এটা। মা আর লিলি থাকত এই ঘরে। ঘর না ছাই! বাঁশের বেঁকারির ওপর কাদালেপা দেয়াল আর খোলার খাপরার চাল। ঘরপিছু তিন টাকা করে নিয়ে বাড়ির মালিক ইলেকট্রিকের লাইন টেনে দিয়েছে।

কিন্তু ঘুমন্ত মেয়েটার সঙ্গে কথা বলবে কেমন করে?

কপাটটা ভেজিয়ে দিয়ে ফিরে যাচ্ছিল অনন্ত। লোহার শিকল দেওয়া দরজায় ঝনঝন করে আওয়াজ হল। আওয়াজ শুনেই ধড়মড় করে উঠে বসল মেয়েটি। খসখসে সিল্কের শাড়ির আঁচলটা লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে। তাড়াতাড়ি সেটা তুলে নিয়ে গায়ে জড়াতে জড়াতে খাট থেকে নীচে নেমে দাঁড়াল সে।

দোরের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবই দেখল অনন্ত।

ঘরে ঢুকে খাটের ওপর গিয়ে বসল। কি বলে কথাটা আরম্ভ করবে বুঝতে পারছে না। আড়চোখে তাকিয়ে একবার আপাদমস্তক দেখে নিল তাকে। মেয়েটিও বোধ করি দেখবার চেষ্টা করছিল। চুরি করে দেখতে গিয়ে হঠাৎ চোখে চোখ পড়ে গেল।

চোখ দুটো মন্দ নয়। শুভদৃষ্টির সময় সেটা সে লক্ষ্য করেছে। তারপর আর ভাল করে দেখে নি একবারও। গায়ের রঙটা কিন্তু ভয়ানক কালো। মাথার চুলে আর গায়ের রঙে যেন এক হয়ে গেছে।

অনন্ত জিজ্ঞাসা করল, তোমার নাম কি?

মেয়েটি চুপ করে রইল। এক হাত দিয়ে শাড়ির আঁচলটা চেপে ধরে আর এক হাত দিয়ে টানতে লাগল শাড়ির পাড়টা।

অনন্ত আবার বলল, কথা কইছ না যে?

কালো চোখের তারা দুটো চোখের কোণে এসে যেন থরথর করে কাঁপতে লাগল। ঠোঁট দুটি একটুখানি ফাঁক করে কি যেন বলতে চাইল। কিছু বলতে চাইল, না মুখ টিপে হাসল তাই বা কে জানে!

অনন্ত বলল, আমার সঙ্গে কথা বলবে না বুঝি?

এতক্ষণে সে কথা বলল।

আপনি জানেন না বুঝি আমার নাম?

অনন্ত বলল, না।

মিথ্যে কথা। বিয়ের মন্ত্রের সঙ্গে বহুবার উচ্চারণ করেছে যে নাম, সে নাম সে ভোলে নি। এটা শুধু কথা বলবার ছুতো।

মেয়েটি বলল, আমার নাম মিনতি।

অনন্ত বলল, দেখ মিনতি, এখানে তোমার থাকা হবে না। তুমি গিয়ে তোমার মাকে বলো।

মিনতি বলল, আমার মা তো নেই।

কে আছে তা হলে? সেই যাকে তুমি মা বলছিলে, উনি কে?

আমার সৎমা।

তোমার ভাইবোন কেউ নেই?

না। আমি একা।

অনন্ত জিজ্ঞাসা করল, সেই লোকটা কে? সেই যে বিয়ের সময় বাবার হাতে টাকা দিল?

মিনতি বলল, টাকা দেওয়া আমি দেখি নি। বোধ হয় আমার মামা—সৎমায়ের ভাই। উনিই সব দেখাশুনো করেন। আমার বাবা তো হাঁপানীর রুগী।

কথা বলতে বলতে মিনতি কখন যে তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল, অনন্ত বুঝতে পারে নি। হঠাৎ মিনতির একটা হাতে অনন্তর হাতটা ঠেকে গেল। অনন্ত সরিয়ে নিল তার হাতটা। চোখ তুলে একবার তাকাল তার দিকে। মিনতির চোখের কোণটা চিকচিক করছে।

মিনতি বলল, আমি জানি, আমাকে আপনার পছন্দ হয় নি।

অনন্ত বলল, হ্যাঁ, সেকথা সবাই জানে।

মিনতি বলল, বিয়ে আপনি করলেন কেন?

অনন্ত বলল, আমি কি জানি ছাই! আমার বাবা, আর সেই পাঁচু মিস্ত্রি।

মিনতি বলল, আর আমার ওই মামা—সৎমায়ের ভাই।

হ্যাঁ, এরা ষড়যন্ত্র করে গয়না আর টাকার লোভে এই কাণ্ডটি করলে।

মিনতি বলল, আমার জন্যে বাড়িতে আপনি বাস করেন না—মা বলছিল।

অনন্ত কথার কোনও জবাব দিতে পারল না। শুধু আর একবার চেয়ে দেখল মিনতিকে।

মিনতি বলল, আপনি বাড়িতে এসে থাকুন। আমি চলে যাই।

শেষের কথাটা কেমন যেন বেসুরো শোনাল অনন্তর কানে।

হ্যাঁ, সেই ভাল। আমি চললাম।

অনন্ত উঠে চলে যাচ্ছিল। খোলা দরজাটা ভেজিয়ে দেবার জন্যে যেই পেছন ফিরে তাকিয়েছে, দেখল সোজা তার দিকে তাকিয়ে আছে মিনতি, আর তার দু চোখে নেমেছে জলের ধারা।

হঠাৎ কেমন যেন মনে হল অনন্তর। ফিরবে না ফিরবে না করেও আবার ফিরে এল। ফিরে এসে বসল ঠিক যেখান থেকে উঠে গিয়েছিল সেই জায়গাটিতে। বলল, কাঁদছ কেন? নিজের মুখেই তো বললে যাবে।

কোনও জবাব এল না মিনতির কাছ থেকে। টপটপ করে চোখের জল পড়তে লাগল তার সিল্কের শাড়ির ওপর।

ঠোঁট দুটো তার থরথর করে কাঁপছে। নীচেকার ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে চেপে আছে জোর করে। কান্না আর থামে না কিছুতেই।

অনন্ত বলল, ধেৎ! ভাল লাগে না।—কাঁদছ কেন?

হাত বাড়িয়ে অনন্ত তাকে টেনে আনল নিজের কাছে।

দাঁড়িয়ে আছে মিনতি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে।

অনন্ত তার কোমরটা জড়িয়ে ধরে বসিয়ে দিল নিজের পাশে।

তবু তার কান্না থামে না।

তখন বাধ্য হয়ে অনন্ত এক হাত দিয়ে মিনতির মুখখানি একটু কাত করে তারই বুকের আঁচলটা তুলে নিয়ে সারা মুখটা ভাল করে মুছতে মুছতে নিজের মুখখানা তার মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে চুপিচুপি ডাকল, মিনতি!

মিনতি তার চোখ দুটি তুলে অনন্তর চোখের ওপর চোখ রেখে বলল, উঁ!

মার ডাক শুনে অনন্তর ঘুম ভেঙে গেল। পাশের ঘর থেকে মা ডাকল, অনু!

ধড়মড় করে উঠে বসল অনন্ত। অনেক বেলা হয়ে গেছে। দোর খোলা—মিনতি নেই।

মুখে জল দিয়ে মুখটা মুছতে মুছতে অনন্ত পাশের ঘরে এসে দেখল মোড়ার ওপর দশ-বারো বছরের একটি ছেলে বসে আছে।

মা বলল, বউমার মামাতো ভাই।

তারপর চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করল, কি হবে রে? বউমাকে নিতে এসেছে।

অনন্ত বলল, বলে দাও—মিনতি এখন যাবে না।

পাঁচটা দিন তখনও পার হয় নি, বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল বাসুদেবের বাড়ির দরজায়। ট্যাক্সিটা লিলিকে নামিয়ে দিয়েই চলে গেল।

চামড়ার বড় ব্যাগটা নিজেই হাতে করে ঝুলিয়ে নিয়ে লিলি তার মার কাছে এসে দাঁড়াল।

মেয়ে এসেছে শ্বশুরবাড়ি থেকে। মার খুশী হবার কথাই। হাসতে হাসতে মা বলল, আয় মা, আয়।

কিন্তু তার সঙ্গে কেউ নেই। মুখখানি শুকনো। মা জিজ্ঞাসা করল, একাই এলি নাকি? কে দিয়ে গেল?

ওদের সরকার মশাই।

বলতে গিয়ে লিলি ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

ওদিকে রান্না করতে করতে মিনতি এসে দাঁড়িয়েছে। অবাক হয়ে গেছে সবাই।

মা বলল, কি হয়েছে? কাঁদছিস কেন? গয়নাগুলো কি হল?

তেমনই কাঁদতে কাঁদতে লিলি তার ব্যাগটা খুলে ফেলল। ব্যাগের ভেতর থেকে কাপড়ে বাঁধা একটা পুঁটলি বের করে তার মার পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে বলল, সব গিলটির গয়না। শাশুড়ি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

অনন্তও শুনল সে কথা। ডাকল, মিনু!

মিনতিকে আজকাল সে মিনু বলে ডাকে।

আঁটসাঁট করে শাড়িটাকে গাছ-কোমর বেঁধে পরে মিনতি রান্না করছিল। আঁচলটাকে কোমর থেকে খুলে মাথায় দিতে দিতে পাশের ঘরে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, কি বলছ?

অনন্ত বলল, তোমার গয়না সব গিলটির গয়না?

মিনতি বলল, তা হবে।

তা হবে মানে—তুমি জানতে?

মিনতি বলল, আমার সন্দেহ হয়েছিল।

অনন্ত বলল, তবে যে শুনলাম তোমাদের গয়নার দোকান?

ওই তো, ওই গয়নার দোকান। আমার মামাটি তো ওই কারবারই করে।

অনন্ত দাঁতে দাঁত চেপে বলল, ভাল।

বাসুদেব কোথায় যেন বেরিয়েছিল, বাড়ি ফিরেই দেখল এই কাণ্ড। ঘরের ভেতর আর ঢুকতে পারল না। দোরের কাছে উবু হয়ে বসে একটা বিড়ি ধরিয়ে টানতে লাগল।

লিলির মা তাকে দেখতে পেয়েই বলে উঠল, এদিকে দেখেছ কি কাণ্ড হল? যে-মেয়ের বিয়ের জন্যে এত কাণ্ড করলে সেই মেয়ে আবার বাড়িতে ফিরে এল!

কথার কোনও জবাব দিল না বাসুদেব। বিড়ি টানছে তো টানছেই।

বলি আমার কথাগুলো শুনছ?

বাসুদেব চিবিয়ে চিবিয়ে টেনে টেনে বলল, শুনছি, শুনছি।

মনে হল সে যেন পাথর হয়ে গেছে। তার যেন কিছুই আর বলবার নেই।

The loving sage beholds that Mysterious Existence
Wherein the universe comes to have one home :
Therein unites and therefrom issues the whole :
The Lord is warp and woof in created beings.

Yajurveda, XXXII-8.

এক

শৈশবে এক সাধুর সাক্ষাৎ পেয়েছিলুম। মাথায় জটা নেই, গায়ে ভস্ম নেই, গলায় নেই রুদ্রাক্ষের মালা। একখানা বাঘছাল, কি একটা কমণ্ডলুও সঙ্গে নেই। আমি বলেছিলুম: এ কেমন সাধু?

পরনে এক খণ্ড সাদা কাপড়, গলায় পইতে। গাছের ছায়ায় বসে সাধু রামায়ণ পাঠ করছিলেন মনে মনে। আমার দিকে চেয়ে একটুখানি হেসেছিলেন।

কাছে গিয়ে আমি বলেছিলুম: হাসলেন যে?

আমি তো সাধু নই, ভণ্ডও নই। সাধু সাজলে ভণ্ডামি হত।

তবে সাধুর মত ঘুরে বেড়ান কেন?

সাধু হেসে বলেছিলেন: ঘুরে বেড়াতে যে ভাল লাগে।

পরদিন সকালে এসে সাধুকে আর দেখতে পাই নি। গাছের নীচে লোক জমবার আগেই তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন।

তারপর অনেকদিন সেই সাধুর কথা ভেবেছি। ঘুরে বেড়াবার শখে তিনি সাধু হয়েছিলেন। আমাদেরও শখ আছে, কিন্তু সাধু হই নি। সংসারে থেকে পথের ডাক শুনি। সে ডাক সমুদ্রের গর্জনের মত নয়, বাঁশির সুরের মতও নয়। সে ডাক ফুলের সৌরভের মত বাতাসে বয়ে আসে। আফিঙের নেশার মত মন আচ্ছন্ন করে, অস্থির করে। সে ডাকে সাড়া না দিয়ে কে থাকতে পারে জানি নে। যে পারে, তার কানে নিশ্চয়ই পথের ডাক পৌঁছয় না।

হিমালয়ের কথা শুনেছি। হিমালয় ভোলা যায় না একবার দেখলে। এক সন্ন্যাসী নাকি একবার বলেছিলেন, জন্মান্তরেও তার স্মৃতি জেগে থাকে, আকর্ষণ করে চুম্বকের মত। ভগবান কোথায়? কে দেখেছে ভগবান? হিমালয়ের টানেই তো মানুষ সন্ন্যাসী হয়। নয়তো এই ঘোর বস্তুবাদের দিনেও এত সন্ন্যাসী কেন হিমালয়ের বুকে! সেখানে ত্যাগ কোথায়? প্রাণ ভরে সেখানে সবাই সৌন্দর্য ভোগ করছে।

পথের যে টান আছে, দিনে দিনে এ কথা আমার বিশ্বাসে পরিণত হচ্ছে। তা না হলে বেড়াবার জন্যে এই পাগলামি কেন প্রতিদিন বাড়ছে! শুধু একটু প্রশ্রয়ের

প্রতীক্ষা, শুধু একটা ডাক। অনিশ্চিতের পথে বেরিয়ে পড়তে এতটুকু দ্বিধা জাগে না। জাগলে কি এমন করে খাণ্ডয়ায় নেমে পড়তুম!

সোমনাথ থেকে সোজা দিল্লী ফিরতে মামা রাজী হলেন না, বললেন: সৌরাষ্ট্র দেখলুম, মহারাষ্ট্র দেখব না!

আমি আমার চাকরির কথা স্মরণ করিয়ে বলেছিলুম: আর দেরি করলে আমার চাকরিটা যাবে।

গম্ভীরভাবে মামা বলেছিলেন: গেলে বাঁচি।

এটা শুধু তাঁর রাগের কথা নয়, মনের কথাও। তাঁর ধারণা, কেরানীগিরিতে আমি আমার ক্ষমতার অপব্যয় করছি। আমার মধ্যে ক্ষমতার কী পরিচয় পেয়েছেন তিনিই জানেন, কিন্তু দিনে দিনে এ ধারণা তাঁর বদ্ধমূল হয়েছে। মামা আমার আপন মামা নন, পাতানো মামা। আমি পাতাই নি, মামাও না। দু-পুরুষ আগে পাতানো হয়েছিল। যোগাযোগের অভাবে সম্বন্ধটা শেষ হয়ে যাচ্ছিল, এই ভ্রমণ উপলক্ষেই আবার ধীরে ধীরে বেঁচে উঠছে।

মামা আমাকে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। দেশের আইনে তাঁর জমিদারী গেছে, কিন্তু ব্যবসা উঠছে ফেঁপে। বৃটিশ আমলে জমিদার অঘোর গোস্বামী রায়সাহেব খেতাব পেয়েছিলেন, আজ স্বাধীন ভারতে এম. পি. অঘোর গোস্বামী ইচ্ছামত বাণিজ্যের লাইসেন্স বার করছেন। এই মামার প্রস্তাবে যে আন্তরিকতা ছিল, তাতে আমার সন্দেহ হয় নি। সেই দিনটির কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। ত্রিবেন্দ্রামের আলো-অন্ধকারে, বৃষ্টিতে আর রোদে, চড়াই আর উৎরাইয়ে, ছায়ায় ও মায়ায় তখন নেশা ধরেছে মনের গভীরে। মামা বললেন: তোমাকে আর ছেড়ে দেব না গোপাল। ভাবছি, আমার কাজকর্ম দেখাশোনার ভার তোমাকেই দেব।—একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন: সরলাদির স্নেহের ঋণ আমার শোধ হয় নি।

মনে হল, এই মুহূর্তে যেন মামার অন্তরটা আমি দেখতে পেলুম স্বচ্ছভাবে। এইটে তাঁর সত্যকার রূপ। এতদিন যা দেখেছি আর যা শুনেছি, সেটা তাঁর অভিমান। কথার জাল দিয়ে স্নেহের উৎস আটকাবার চেষ্টার মত।

মামার প্রস্তাবে আমি রাজি হতে পারি নি। আপত্তি যে শুধু নিজের মন থেকেই উঠেছে তা নয়, তার চেয়েও বড় অন্তরায় ছিল স্বাতির অনুরোধ। কন্যাকুমারীর সমুদ্র-তটে বসে সবকিছু আমরা ভুলে যেতে চেয়েছিলুম। আকাশে চতুর্দশীর চাঁদকে ঘিরে বসেছিল নক্ষত্রের নৃত্যসভা। পায়ের নীচে আছড়ে পড়ছে ঢেউয়ের পর ঢেউ। একটানা গর্জন উঠছে দুরন্ত সমুদ্রের। বাতাসে স্বাতির আঁচল উড়ছে, আর আকাশে আলোর প্লাবন। কিন্তু অত জল অত আলো অমন অসীম উদার পরিবেশেও স্বাতি নিজেকে হারাতে পারে নি। বলেছিল; গোপালদা, একটা অনুরোধ আছে তোমার কাছে। দেশে ফিরে বাবার অনুগ্রহ নিয়ে নিজেকে ছোট করো না।

স্বাতির কাছে অঙ্গীকার করেছি নিঃশব্দে। তার মনের কথা যে আমি বুঝেছিলুম। যে সুযোগের অভাবে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে আছে, সে সুযোগ আমি চেয়ে নেব না, কেড়ে নেব। আদর্শ থাকবে না শুধু কথায়, জীবনটাই আমার আদর্শ হয়ে উঠুক। পার্থিব সুখের বদলে স্বাতি আত্মিক তৃপ্তি চায়। সেই আশা থেকে তাকে বঞ্চিত করলে সে আমায় ক্ষমা করবে না। মামার প্রস্তাবে তাই আমি রাজি হতে পারি নি।

দিল্লীতে মামা বলেছিলেন: আমার কাছে মাথা নোয়ালে না। নোয়াবে পরের কাছে। জগতের রীতিই এই। যত আপন, তার সঙ্গে তত লুকোচুরি। সংসারের অভাব-অভিযোগ দুনিয়ার লোকে দেখে যাক, তাতে বাধা নেই। আত্মীয়-বন্ধুতে দেখলেই যেন মহাভারত অশুদ্ধ হল।

স্বাতি বলেছিল: বাবা তোমাকে সবই দিতে পারতেন, দিতেনও। প্রত্যাখ্যান করে তুমি যে ধাক্কা দিয়েছিলে, তাতে আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম তোমার মর্যাদাজ্ঞান দেখে।

তারপর?

তারপর স্বাতির সঙ্গে নতুন কোন সম্বন্ধ গড়ে উঠল না। উঠতে পারে না। সামাজিক বাধা বড় দুস্তর।

সেই বাধা অতিক্রম করতে যে মনের প্রয়োজন, তা কি আমাদের আছে! মামার ধারণা, আমার এই কেরানীর চাকরিই সবচেয়ে বড় বাধা। এই চাকরি ছাড়লে আমাদের সামাজিক ব্যবধান দূর হবে। তাই তিনি আমার চাকরি যাবার ভয়ের কথা শুনে বলেছিলেন: গেলে বাঁচি।

আমি বাঁচি না। আমাকে স্বাধীনভাবেই বাঁচতে হবে। তবু আমাকে হার স্বীকার করতে হল। সোমনাথ থেকে আসতে হল বোম্বে। বোম্বে থেকে কলকাতায় ফিরব।

ভেরাবল থেকে সোমনাথ মেল ছাড়ে দুপুর বারোটায়। সকাল আটটায় আমেদাবাদ আসে। আমেদাবাদ থেকে বরোদা সুরত হয়ে বোম্বে। ভেবেছিলুম স্টেশন থেকেই কলকাতার গাড়ি ধরব, কিন্তু তা হল না। কেন হল না, স্বাতি সেকথা জানে। কয়েকটা দিন বোম্বেতে কাটিয়ে কলকাতার মেল ধরলুম।

স্বাতিরা আরও কয়েকটা দিন বোম্বেতে থাকবে। বোম্বে সকলের ভাল লেগেছে। পার্লামেণ্টের সেসন শুরু হবার আগে দিল্লী পৌঁছলেই তাঁদের চলবে। তাই তাঁরা নিশ্চিন্ত মনে আমাকে কলকাতার গাড়িতে তুলে দিয়ে গেলেন।

কলকাতার টিকিট কেটে আমি খাণ্ডেয়ায় কেন নামলুম সেই কথা বলি।

ট্রেন ছাড়বার পর আমি একটা কোণায় এসে বসেছিলুম। ভেবেছিলুম, কিছুদিনের মত বুঝি ছুটোছুটির শেষ হল। এবারে চাকরিতে যোগ দিতে পারব নিশ্চিন্ত মনে। কিন্তু আমার বিধাতা অদৃশ্যে বসে হাসেন। অন্তরালে থেকে যেন দাবা খেলছেন আমার সঙ্গে। অনেক ভেবেচিন্তে একটা চাল দিয়ে দেখেছি, ওধারের খেলোয়াড়ের বুদ্ধি অনেক বেশী। নিমেষে আমার চালকে বেচাল করে দিয়েছেন; হয় সামনে এগোবার পথ নেই, নয় একটা মূল্য দিয়ে যাও। আমি থেমে থাকতে রাজি হই নি, আমি মূল্য দিয়ে এগোচ্ছি। কিন্তু পারানির কড়ি যে শেষ হয়ে এল।

একটি বছর ছয়েকের ফুটফুটে ছেলে কাছে এসে আমার ঝোলাটা পরীক্ষা করছিল। একসময় বলে উঠল: এর ভেতর কী আছে?

আমি চমকে উঠেছিলুম। ছেলেটিকে টেনে নেবার আগে একবার চারধারটা দেখে নিলুম। একজোড়া সুন্দর চোখ ছেলেটিকে নজরে রেখেছে। বড় সতর্ক দৃষ্টি। প্রসন্নও বটে। তাড়াতাড়ি আমি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে দু হাতে ছেলেটিকে কাছে টেনে নিলুম। ঝোলার ভিতরটা দেখিয়ে বললুম: কী নাম তোমার?

জানো না বুঝি? সবাই তো জানে, বাবা জানে, মা জানে—

তবে আমিও জানি। তোমার নাম খোকন।

ছেলেটি হেসে উঠল।

তাড়াতাড়ি বললুম: মনে পড়েছে। খোকা তোমার নাম।

মাথা দুলিয়ে খোকা বলল: এখন আর ও নাম নেই। এখন আমার নতুন নাম। কি নাম বল তো?

আমি তাকে আমার পাশে বসিয়ে নিয়েছিলুম। খানিকটা তফাতে এক ভদ্রলোক বিছানা বিছিয়ে বসেছিলেন, বললেন: সবাইকে তুমি বলতে নেই, আপনি বল।

খোকার মাকে আগেই চিনেছিলুম, এবারে তার বাবাকেও দেখতে পেলুম। ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে সিগারেট টানছিলেন। একটু অপ্রসন্ন ভাব। মনে মনে যে বিরক্ত হয়ে আছেন, তা তাঁর ধরন দেখেই বোঝা যাচ্ছে। আমি খোকাকে উত্তর দিলুম: তা হলে তোমার নতুন নাম হল—মনোজিৎ।

খোকা হাততালি দিয়ে উঠল: হল না।

বললুম: তা হলে পূর্ণেন্দু।

খোকা এবারে খিলখিল করে হেসে উঠল।

এবারে আমি জোর করে বললুম: তোমার খোকা নাম, আমি খোকা বলেই ডাকব।

মা তা হলে রাগ করবে।

কেন?

বিজ্ঞের মতো খোকা বলল: আমার খোকা নাম তা হলে কোনদিন ঘুচবে না। ছেলেও বাপকে খোকা বলে ডাকবে।

এ যে মায়ের কথা, তা বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না। মহিলা তাঁর মুখ ফিরিয়ে নিলেন। বোধ হয় হাসি লুকোচ্ছেন। আমি বললুম: কোথায় যাচ্ছ এখন?

আমরা? আমরা তো মাণ্ডু যাচ্ছি।

সে আবার কোথায়?

মাণ্ডু জানো না?

না।

ধারা থেকে মাণ্ডু—যার কাছে বই আছে, পড়বে?

না না, বই থাক্। আমি তোমার সঙ্গে একটু গল্প করি। তোমার ঘুম পাচ্ছে না?

রাত আটটায় গাড়ি ছেড়েছে। বোম্বে শহরের বুক চিরে ছুটে চলেছে। ধোঁয়া নেই, ধুলো নেই, পথের দু ধারে অন্ধকারও নেই ঘন হয়ে থিতিয়ে। গাড়ির ভিতরে ঝকঝকে আলো। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জীবনে আলো না থাক্, গাড়ির এ আলো নিববে না। এই কৃত্রিম আলোই বাইরের জমাট অন্ধকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। বোম্বে শহরের সীমানা পেরলেই সেই আলো এই গাড়ির ভিতর হুমড়ি খেয়ে পড়বে। তাইতেই ঘুমের কথা মনে এল।

খোকা বলল: আমি কি আর কচি খোকাটি আছি যে সন্ধ্যেবেলাতেই ঘুমিয়ে পড়ব!

এও নিশ্চয়ই তার মায়ের কথা। বললুম: তা তো বটে।

খোকা আর একজন যাত্রীর সামনে গেল। সে ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে জানলার বাইরে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বোধ হয় সাহস পেল না। আমার কাছেই ফিরে এল। বলল: তোমার বিছানা কোথায়?

আঙুল দিয়ে আমার চাদর-জড়ানো বালিশটা দেখিয়ে দিলুম। শোবার জায়গা নেই।

নিজের বিছানা দেখিয়ে খোকা বলল: তুমি ওইখানে শোও।

হেসে বললুম: বড় হয়ে তুমি তোমার জায়গা ছেড়ে দিয়ো, আজ নয়।

বড় হয়ে ত্যাগের কথা সবাই ভুলে যায়, দিতে কেউই রাজি হয় না। ওটা বয়সের ধর্ম। সবাই তখন চায়। ইচ্ছা শুধু পাবার। যে কিছুই চায় না আর যে সবই দিতে পারে, তাকেই আমরা সত্যিকারের বড় বলি। তেমন বড় মানুষ যে দিনে দিনে দেশে দুর্লভ হচ্ছে। আমার কথা শুনে খোকা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল, বললুম: এবারে তোমার নাম বল।

অভিমন্যু।

বাঃ, চমৎকার নাম তো।

আমি মহিলার চোখের দিকে তাকিয়ে একটা তৃপ্তির ইঙ্গিত পেলুম। বললুম: জান খোকা, অভিমন্যু যাদের নাম, তারা খুব তাড়াতাড়ি সব শিখে ফেলে।

আমিও শিখব।

নিশ্চয়ই শিখবে।

জান, আমার জন্যেই মা বেড়াতে বেরিয়েছে।

সত্যি নাকি! তোমরা বুঝি ধারা দেখবে?

অভিমন্যু মাকে জিজ্ঞাসা করল: দেখব নাকি মা?

মা মাথা নাড়লেন সম্মতিতে।

বললুম: কালিদাসের জন্মস্থানটা তা হলে দেখে নিয়ো। কালিদাসের নাম শুনেছ তো? কবি—মস্ত বড় কবি।

অভিমন্যুর বাবার কথায় বাধা পেলুম। গম্ভীর গলায় তিনি বললেন: এবারে শুতে এস।

আমার চেয়ে বেশী লজ্জা পেলেন অভিমন্যুর মা। সেই লজ্জা ঢাকার জন্যই যেন আমার সঙ্গে আলাপ শুরু করলেন: কালিদাসের জন্ম ধারায়, না উজ্জয়িনীতে?

শুধুমাত্র সৌজন্য রক্ষার জন্যই উত্তর দিলুম: কেউই সেকথা জানে না।

তবে এ কথা কেন বলছেন?

এও একটা মত আছে। ধারার মাইল দেড়েক দূরে একটা কালীস্থান আছে, ধারার লোকেরা বলে কালিদাসের সাধনাস্থান।

আপনি দেখেছেন বুঝি?

না।

মহিলা আমার সম্পূর্ণ উত্তরের জন্য মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বললুম: বইয়ে পড়েছি। কালিদাস আর ভোজরাজকে নিয়ে একটা মজার গল্প আছে। তুমি শুয়ে পড় অভিমন্যু।

আগে তোমার মজার গল্প বল।

অভিমন্যুর মা বললেন: ও আসবে না। আপনি গল্প বলুন।

বললুম: ধারার রাজা ভোজরাজের সভাসদ ছিলেন কালিদাস। ভারী বন্ধুতা। একদিন ঝগড়া হয়ে গেল। কালিদাস বললেন, আর নয়, এ রাজ্যে আর থাকব না। বলে চলে গেলেন। ভোজরাজের মন খারাপ। এতদিনের পুরনো বন্ধু এমন করে এক কথায় চলে গেল! অনেক ভেবেচিন্তে তিনি এক ফন্দী বার করলেন। নিজের মৃত্যু-সংবাদ তিনি নিজেই রটিয়ে দিলেন। বুঝলে অভিমন্যু, রাজ্যের লোক শুনল যে ভোজরাজ মারা গেছেন। আর এদিকে তিনি ছদ্মবেশে নগরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত যা ভেবেছিলেন তাই হল। ভোজরাজের মৃত্যুর খবর কালিদাসের কানেও পৌঁছল। তাঁর ভারী দুঃখ হল! ভাবলেন, বন্ধুর রাজ্যের কী দশা হল একবার দেখে আসি। এসে দেখলেন, সবই নিরানন্দ।

অভিমন্যুর মায়ের দিকে তাকিয়ে বললুম: কালিদাস বললেন—

অদ্য ধারা নিরাধারা নিরালম্বা সরস্বতী।
পণ্ডিতা খণ্ডিতা সর্বে ভোজরাজ দিবং গতে॥

এই শ্লোকের কথা ভোজরাজের কানেও পৌঁছল। তিনি বুঝলেন, কালিদাস ফিরে এসেছেন। তা না হলে এমন শ্লোক আর কে লিখবে। বন্ধু যে তাঁকে কত ভালবাসেন, তা বুঝতেও বাকি রইল না। তাড়াতাড়ি তাঁর সঙ্গে দেখা করে সব কথা খুলে বললেন। দুই বন্ধুর আবার ভাব হয়ে গেল।

গল্পটি অভিমন্যুর ভাল লেগেছে। কিন্তু আমি তাঁর মাকে বললুম: কালিদাস শ্লোকটি পালটে দিলেন। বললেন—

অদ্য ধারা সদাধারা সদালম্বা সরস্বতী।
পণ্ডিতা পণ্ডিতা সর্বে ভোজরাজে ভুবং গতে॥

অভিমন্যুর বাবা ডাকলেন: খোকা—

অভিমন্যু ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেল।

ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে বললেন: শুয়ে পড়।

অভিমন্যুর মা আর বাধা দিলেন না। জামাকাপড় বদলে ছেলেকে শুইয়ে দিলেন। ভদ্রলোক বললেন: তুমিও শুয়ে পড়। সেই শেষ রাতে তো আবার উঠতে হবে!

শেষ রাত কোথায়, সকালবেলায় বল।

মহিলা আমার দিকে ফিরে বললেন: আপনিও খাণ্ডোয়ায় নামবেন তো?

আমি কলকাতা যাচ্ছি।

ভদ্রলোক বললেন: তবে এ গাড়িতে কেন উঠেছেন! এ গাড়ি ঘুরে এলাহাবাদ হয়ে যাবে। নাগপুর হয়ে ফিরলে আপনি তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারতেন।

হেসে বললুম: বোম্বেতে যে এক ঘণ্টা বেশী সময় পেলুম!

মহিলাও হাসলেন।

ভদ্রলোক বললেন: আমারও ইচ্ছে ছিল সোজা কলকাতা ফিরবার। কিন্তু ভাগ্যের দোষে এখন অনেক ঝামেলা পোয়াতে হবে।

ভাগ্যের দোষে কেন বলছ, সৌভাগ্য বল। কজন এসব দেশ দেখবার সুযোগ পায়!

আমাকে প্রশ্ন করতে হল না। মহিলা নিজেই বললেন: আমরা একটুখানি ঘুরে যাব—উজ্জয়িনী বিদিশা আর খাজুরাহো। এদিকে আর আসা হবে কি না কে জানে, দেখে গেলে অনেকদিনের সাধ পূর্ণ হবে।

খুব সত্যি কথা।

আপনার শখ নেই?

আমার!

এ কথার কী উত্তর দেব ভেবে পেলুম না। ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে এসে এখন বলতে পারি নে যে আমার শখ নেই। ভ্রমণের আনন্দের

সঙ্গে আরও একটু তৃপ্তি ছিল জড়িয়ে। সেই তৃপ্তির অভাবে এই যাত্রা বিস্বাদ লাগছে। বললুম : ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এবারে বিশ্রামের দরকার।

মহিলা বললেন : বেড়াতে আমরা ক্লান্ত হই নে। রাতে ঘুমোতে না পেলে যেটুকু কষ্ট হয়, দিনের বেলায় নতুন দেশ দেখে সব ভুলে যাই।

মনে মনে তাঁর সমস্ত কথা আমি স্বীকার করে নিলুম।

মহিলা বললেন : আপনার যে ভাল লাগত তাতে সন্দেহ নেই।

কেন বলুন তো?

যে কালিদাসের কথা বললেন, আমরা সেই কালিদাসেরই বিদিশা আর উজ্জয়িনী দেখব। তারপর খাজুরাহো। অদ্ভুত কবিত্বময় স্থান।

ভদ্রলোক একটা সিগারেট ধরাচ্ছিলেন। কি মনে করে আমার দিকেও একটা বাড়িয়ে দিলেন। অন্যমনস্ক-ভাবে আমি সেটা নিয়ে নিলুম। যখন মনে পড়ল আমি সিগারেট খাই না, তখন ভদ্রলোক দেশলাই জ্বেলে সেটা ধরিয়ে দিচ্ছেন। আমি আর আপত্তি করলুম না।

ভদ্রলোক সিগারেটে একটা টান দিয়ে বললেন : দুর্গা বলে নেমে পড়ুন, তারপর দেখা যাবে।

সিগারেটের ধোঁয়ায় গলাটা জ্বালা করছে। মনে হল বুকটাও বুঝি জ্বলছে। বললুম : ভেবে দেখি।

বোম্বের আলো অনেকক্ষণ হল মিলিয়ে গেছে। যাঁরা জেগে আছেন তাঁরা ঘুমোবার আয়োজন করছেন। অনেকে ঘুমিয়েও পড়েছেন। অভিমন্যু ঘুমিয়ে পড়েছে। তার বাবা মাও শুয়ে পড়েছেন। আমি আমার কোণটিতে জেগে বসে আছি। আমার চোখে আজ ঘুম আসছে না। দুটি স্বপ্নময় নাম মনে পড়ছে। বিদিশা আর উজ্জয়িনী। আকাশের মেঘের মত মন যায় মুক্ত হয়ে। লঘুপক্ষ পাখির মত ওড়ে, যুগ থেকে যুগান্তরে চলে যায়, বর্তমান থেকে স্বর্ণময় অতীতে। কে দেখেছে সেদিনের ভারত, কে শুনেছে সেদিনের বাণী! সেই যুগান্তরের বার্তা আজ শ্লোকের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। আর কয়েকটি নাম সেই কল্পনার বিলাসকে রেখেছে বাঁচিয়ে। বিংশ শতাব্দীর বিশ্ব বড় স্থূল হয়ে গেছে। যা চাই, তা হাতের মুঠোয় মধ্যে পেতে হবে। নিংড়ে নিংড়ে তার রস বার করে নেব, তারপর অপরিসীম অবজ্ঞায় তার ছিবড়ে ফেলে দেব পথের ধুলোর ওপর। বিশ্ব হয়েছে ভোগসর্বস্ব। অনুভবের জগৎ আমরা অনাদরে হারিয়েছি। দেহ সেখানে মিলিয়ে যায়, বিদেহী মন খোঁজে হৃদয়ের স্পন্দন। রামগিরির প্রাণের স্পন্দন বিন্ধ্যকে অতিক্রম করেছে অনায়াসে। 'যেমন করে আলো করে, বাতাস করে, মেঘ করে, তেমনই করে প্রাণও করে। প্রাণও কথা কয়, এক প্রাণের কথা আর এক প্রাণ শোনে তপস্যা দিয়ে, প্রেম দিয়ে। সাধকে আর প্রেমিকে কোন তফাত নেই। দুজনেই পাগল।

কিন্তু আমার আজ এ কী হল? কেন আমি ঘুমোতে পারছি না! দুটো নাম আজ কেন আমায় অশান্ত করে তুলেছে! আমি তো কবি নই, কল্পনার বিলাস নেই আমার। তবু কেন ওরা আমায় টানবে।

সেই সাধুর কথা আমার মনে পড়ল। পথের ডাকে যে মানুষটি সংসার ছেড়েছিলেন। সংসার ত্যাগের প্রয়োজনের কথা আমি মানি নি। সংসারে থেকেও তো ঘুরে বেড়ানো যায়। কিন্তু আজ আমার অন্য কথা মনে এল। আজ খানিকটা সন্দেহ জাগছে। স্বাতিকে ফেলে মামা-মামীকে ছেড়ে আমি কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি। আমার চাকরি আছে। পুজোর ছুটিতে বেরিয়েছিলুম। সে ছুটি আমার কবে গেছে শেষ হয়ে। কাজে তো যোগ দিতে হবে! পয়সা দিয়ে যারা কাজ নেয়, তারা আমার অনিয়মের আর কত প্রশ্রয় দেবে! এ সবই যুক্তির কথা, সত্য কথা। কিন্তু মন কেন মানতে চাইছে না। এমন অবুঝ হলে কি সংসারে থাকা চলে! সংসারে শৃঙ্খলা আছে, শাসন আছে। সংসারে বাস করতে হলে তার বিধিনিষেধকে শ্রদ্ধা করতে হবে। না পারলে সন্ন্যাস নাও, বাণপ্রস্থ গ্রহণ কর। সংসারে থেকে বিদ্রোহ করো না। সেই সাধুকে আজ আমার শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা হল। মুক্ত মনের সঙ্গে বন্দীজীবনের সন্ধি করার

চেষ্টা তিনি করেন নি। একটা পথ তিনি বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু—

এই কিন্তুটা বড় মর্মান্তিক। শুধু ঘুরে ঘুরে যে মন ভরে না! মন ভরাবার জন্যে আরও কিছু চাই। ওই সাধুও কি আর কিছু চাইছেন না? একান্তে তাঁর তপস্যায় আর কোন বাসনা কি তাঁকে অশান্ত করে তুলছে না? সমুদ্র থেকে হিমালয়ে, মন্দির থেকে তীর্থে নিয়ে যাচ্ছে না উদ্‌ভ্রান্তের মত টেনে টেনে?

পিছনে যে আমারও আছে টান। নতুন টান। এক বছর আগে যখন মুক্ত বলে গর্ব করেছি, তখন কি এই টানের কথা জানতুম। আজ সাধু হবার সংকল্প নিতে ভয় করে। আমার স্বর্গ যে সংসারে নেমে এসেছে। সাধনা নেমেছে জীবনে। যক্ষের স্বপ্নই আজ আমার স্বপ্ন হোক।

জানি নে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। যখন ঘুম ভাঙল, বাইরের আকাশ তখন স্বচ্ছ হয়ে গেছে। অভিমন্যুর মা পূর্বাকাশের দিকে চেয়ে বসে ছিলেন। আমার দিকে চোখ পড়তেই বললেন: বসে বসেই ঘুমিয়ে নিলেন তো?

মুখে তাঁর প্রসন্ন হাসি।

আমিও হেসে বললুম: তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর এই তো শৌখিনতা!

তা বটে।—তারপরেই বললেন: খাণ্ডোয়াতেই তা হলে নামবেন তো?

নামব?

মহিলার দৃষ্টিতে আমি অনুরোধের বেদনা দেখলুম। অভিমন্যুর বাবা অকাতরে ঘুমুচ্ছিলেন। তাঁর দিকে চেয়ে বললেন: দেখছেন তো ওঁকে? জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছি।

কিন্তু আমি কী করতে পারি?

ভাল সঙ্গী কি হতে পারতেন না ভাই?

অদ্ভুত শোনাল এই সম্বোধনটি। কতদিন আগে কে আমাকে ভাই বলে ডেকেছে মনে পড়ল না। আজকের এই সকালে একটা নতুন আস্বাদ পেলুম। সহসা কোন উত্তর মুখে জোগাল না।

গাড়ির ভিতরে আরও অনেকে উঠে বসেছে। আলাপও শুরু হয়েছে। অভিমন্যুর মাও আবার কথা কইলেন: আপনার আপত্তি কিসের?

সময়ের। আমাকে তাড়াতাড়ি কলকাতা পৌঁছতে হবে।

আমাদেরও সময় কম। ওঁর ছুটি ফুরোচ্ছে—

কথাটা সম্পূর্ণ করলেন না। মনে হল বলতে চেয়েছিলেন, পয়সাও ফুরিয়েছে। আমার পকেটে বেশী পয়সা ছিল না। বোধ হয় সেইজন্যই এই কথা মনে এল। ভাল করে স্মরণ করে দেখলুম যে পয়সার অভাব আমার অন্তরায় হবে না। কলকাতা পর্যন্ত টিকিট কাটা আছে। একটু ঘুরে যাবার জন্যে কিছু অতিরিক্ত ভাড়া লাগবে, আর কিছু বাস-খরচ। এতদিনের অনুপস্থিতির জন্য যদি চাকরি গিয়ে না থাকে তো আর কয়েকটা দিন বাড়লে কিছু বেশী ক্ষতি হবে না। তবু আমার রাজি হতে সঙ্কোচ হল।

খাণ্ডোয়ায় পৌঁছে শেষ পর্যন্ত নামতেই হল। অভিমন্যু আমাকে নামাল। বলল: তুমি না থাকলে গল্প শোনাবে কে?

তার মা বললেন: সত্যিই তো, কালিদাসের গল্প আমি জানি নে।

তার বাবা বললেন: সবাই যখন বলছে, দুর্গা বলে নেমেই পড়ুন।

মধ্যভারতের আকাশ বড় স্বচ্ছ। দুর্গানাম করেই আমি গাড়ি থেকে নেমে পড়লুম।

[ক্রমশ]

[পূর্বানুবৃত্তি]

মন্দিরার সঙ্গে কথা বলে মঞ্চ থেকে বেরিয়ে এসে প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে ঢুকে আর নাটক দেখার ইচ্ছে হল না সুরজিতের। ভাবল একবার উপরে গিয়ে সুধীবাবুর সঙ্গে দেখা করে আসবে, কিন্তু দরোয়ানের কাছে খবর পেল ইতিমধ্যেই তিনি বাড়ি চলে গেছেন। রমেন চৌধুরীকেও বুকিং অফিসে দেখতে না পেয়ে পানওয়ালার দোকান থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে সুরজিৎ উঠে বসল দু নম্বর বাসে।

বাসের ওপর থেকে রাস্তার দু দিকের দোকানের সারি, তাদের আলোর ঝলমলানি দেখতে বেশ ভাল লাগে তার। দোকানগুলো চেনা, এমন কি সাইন-বোর্ডের ওপর লেখার ধরনগুলোও অতি পরিচিত। হঠাৎ দেখলে মনে হয় বারো বছর আগের কলকাতা ঠিক আগের মতই আছে। হয়তো দু-চারটে দোকানের মালিক বদলেছে, এমন কি নামও বদলে থাকতে পারে, কিন্তু বলে না দিলে তা চোখে পড়ে না। এরা যেন একটা নকশা কাটা ছবির অংশ বিশেষ, পৃথক কোন সত্তা নেই।

সুরজিৎ এ পাড়ায় আসত তার কলেজ-জীবনে। স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে সে পাস করে বেরিয়েছে বাংলা সাহিত্যে অনার্স নিয়ে। তাই ম্যাট্রিকের পর চার বছর প্রত্যহ ট্রামে-বাসে তাকে আসতে হয়েছে ভবানীপুর থেকে সুদূর শ্যামবাজারে। তার পর এই বারো বছর বড় বেশী এদিকে আসা হয় নি। আগে যখন দক্ষিণ-কলকাতায় ভাল ভাল সিনেমা হল তৈরি হয় নি, তখন অন্ততঃ বাংলা ছবি দেখার জন্যে তাদের আসতে হত উত্তর-কলকাতায়। এখন আর তার দরকার হয় না। যে কোন ছবি কলকাতার তিন জায়গায় মুক্তি পায়। তবে আর কেন অতখানি পথ ভেঙে উত্তর-কলকাতায় যাওয়া।

সুরজিৎদের বাড়ি ভবানীপুরে। পূর্ণ থিয়েটার ছাড়িয়ে অল্প একটু দক্ষিণ দিকে এগিয়ে বাঁ হাতি যে সরু গলিটা চলে গেছে তারই মাঝামাঝি ওদের পৈতৃক বাড়ি। বাইরে থেকে দেখলেই বোঝা যায় আগে একটাই বাড়ি ছিল, এখন তিন ভাগ করা হয়েছে। মোড়ের মাথায় যে অংশটি সবচেয়ে চোখে পড়বার মত, যে বাড়ির হলদে রঙের দেয়ালের সঙ্গে প্রায় সেই একই রঙের জানলা দরজা সুন্দর করে সাজানো, সে অংশটি সুরজিতের জ্যাঠামশাইয়ের। তিনি নামকরা উকিল, ছেলেরাও বিলিতী কোম্পানির ভাল চাকুরে। মাঝখানের অংশ সুরজিৎদের। অনেক দিন বাইরের দেয়ালে রঙ পড়ে নি। বিশেষ করে গত বারের প্রবল বর্ষায় দেয়ালের অনেক জায়গাতেই ছোপ ছোপ শেওলা পড়েছে। সুরজিৎদের পাশের অংশে থাকেন তার ছোট কাকা। উনি ডাক্তার—এ পাড়ায় বেশ পসার আছে। বড়দাদার মত বাড়িকে রঙিন করে না সাজালেও সব সময়ই ঝকঝকে পরিষ্কার করে রাখেন। সাদা দেয়ালের ওপর সবুজ জানলা দরজাগুলো দেখতে বেশ ভাল লাগে।

সুরজিতের বাবা বেঁচে থাকলে তিনিও নিশ্চয় বাড়ি রাখতেন ভালভাবেই, কারণ তিন ভাইয়ের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে সৌখিন। রোজগার করেছেন যথেষ্ট, বিশেষ করে শেষ চার বছর যখন তিনি বামড়া স্টেটের দেওয়ান ছিলেন। পুত্র সুরজিৎ ও কন্যা মাধবীকে মানুষ করতে চেয়েছিলেন সব রকমের সুযোগ এবং সুবিধা দিয়ে। কিন্তু বিধি বাম, তাই স্টেটের কাজ দেখতে গিয়ে কলকাতার বাইরেই মারা গেলেন তিনি। কাছে তখন আত্মীয়স্বজন কেউ ছিল না, অনেকে মনে করেন এ মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। স্টেটেরই অন্য শরিকরা রানীমার বিশ্বস্ত দেওয়ানকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছে। সে ঘটনা অবশ্য এখন ইতিহাসে দাঁড়িয়েছে। সেই আকস্মিক বিপদে এ বাড়ির সকলে ভেঙে পড়লেও যিনি অসীম সাহসে বুক বেঁধে অবিচলিত ছিলেন তিনি সুরজিতের মা পদ্মাবতী। স্বামী যে খুব বেশী টাকা রেখে যেতে পেরেছিলেন তা নয়, যে রকম রোজগার করেছিলেন, খরচাও করেছেন দু হাতে। ব্যাঙ্কে জমানো যে সামান্য টাকা ছিল আর ইন্‌সিওরেন্স থেকে পাওয়া কয়েক হাজার টাকা সম্বল করে সুরজিৎ আর মাধবীকে মানুষ করার সম্পূর্ণ ভার নিজের হাতে নিলেন, ওরা তখন স্কুলের ছাত্রছাত্রী। ভাশুর দেওর সাহায্য করতে এলে তিনি সবিনয়ে তাঁদের ফিরিয়ে দিয়েছেন। অভাবের কোন আঁচ ছেলেমেয়েদের গায়ে লাগতে না দিয়ে, সমস্ত ঝক্কি নিজের মাথায় নিয়ে পদ্মাবতী তাদের মানুষ করেছেন। এখন অবশ্য সে দুদিন আর নেই, সুরজিৎ রোজগার করছে, মাধবী কলেজের উঁচু ক্লাসের ছাত্রী। তবু তারা যেন এখনও ছোট ছেলেমেয়ের মতই, এ সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী তাদের মা।

সুরজিৎ যখন বাড়ি ঢুকল রাত্রি প্রায় সাড়ে নটা। বাইরের ঘরে দুজন ভদ্রলোক বসেছিলেন। চা-জলখাবার তাঁদের খাওয়া হয়ে গেছে। পদ্মাবতী পান সুপারির রেকাবিটা এগিয়ে দিতে দিতে সুরজিৎকে দেখে হেসে বললেন, আজকেই তুই এত দেরি করলি খোকা। এঁরা এসে অনেকক্ষণ বসে আছেন।

সুরজিৎ হাত তুলে তাঁদের নমস্কার করে অপ্রস্তুত হেসে বলে, আমি তো জানতাম না আপনারা আজকে আসবেন বিমলবাবু, তাই একটা কাজে বেরিয়েছিলাম।

বিমলবাবু অমায়িক হাসলেন : তাতে কি হয়েছে, এমন কিছু রাত হয় নি। দেখা না হলে অবশ্য দুঃখ পেতাম।

আমাকে দু মিনিটের জন্য মাপ করুন, মুখ হাতটা ধুয়ে আসি।

নিশ্চয়, নিশ্চয়।

সুরজিৎ দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। মুখ হাত ধোয়াটা অবশ্য মুখ্য প্রয়োজন নয়, তার দরকার ছিল মায়ের সঙ্গে একান্তে কথা বলার। কলঘরে গিয়ে জোরেই ডাকে : মা, একবার এদিকে এস।

পদ্মাবতীও যেন এই ডাকটুকুর অপেক্ষা করছিলেন। ছেলের কাছে এসে একগাল হেসে বললেন, মাধবীকে ওঁদের খুব পছন্দ হয়েছে।

খুশীতে সুরজিতের চোখ দুটো নেচে ওঠে : তাই নাকি !

সামনের মাসেই বিয়ে দিতে চান। আমি বলেছি তোর সঙ্গেই সব কথা বলতে।

সে তো খুব ভাল। মাধুকে বলেছ ?

ওর কোন অমত নেই।

সুরজিৎ তবু কি যেন ভেবে নিয়ে বলে, তা হলেও পাকা কথা দেবার আগে আমি একবার মাধুর মতটা জিজ্ঞেস করব। যাই, বিমলবাবুর সঙ্গে কথাটা বলে আসি।

দিন সাতেক আগে বিমলবাবু তাঁর ভাইয়ের জন্য পাত্রী দেখতে এসেছিলেন এ বাড়িতে। পাত্র বিলিতী তেল কোম্পানির প্রতিনিধির কাজ করে। মাইনে ভালই পায়, মোটামুটি শিক্ষিতও বটে। আজ তাঁরা এসেছেন শুধু মেয়ে পছন্দ হয়েছে এই খবর দিতেই নয়, পাকাপাকি বিয়ের দিন স্থির করতে। কারণ আগে থেকে না জানালে পাত্রের পক্ষে ছুটি পাওয়ার অসুবিধে আছে।

সুরজিৎ বাইরের ঘরে ফিরে এসে সরাসরি বিয়ের কথাতেই চলে এল : তা হলে আমার বোনটিকে আপনাদের পছন্দ হয়েছে।

বিমলবাবুর সঙ্গে একটু বয়স্ক যে ভদ্রলোকটি এসেছিলেন তিনি পান-খাওয়া দাঁত বার করে হাসলেন : পছন্দ না করার আর কি আছে, রূপে গুণে এমন চমৎকার মেয়ে, যেমনি শিক্ষা, দীক্ষা, তেমনি ঘর। তার ওপর কত বড় বংশ—

সুরজিৎ থামিয়ে দেয়, তা হলেও মাধবীর রঙ তো ফরসা নয়।

রঙ হল বাইরের জিনিস, আসল হল মন। আমরা এই রকমই একটি শান্ত মেয়ে খুঁজছিলাম। আমাদের ছেলেটিও বড় ঠাণ্ডা মেজাজের। একবার আলাপ হলে বুঝতে পারবেন, নিজেদের ছেলে বলে বলছি না, ঠিক যেন মহাদেব।

সুরজিৎকেও হাসতে হয় : তা তো বটেই। যাই হোক আপনাদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক হলে আমরা সকলেই খুব খুশী হব। তা কবে নাগাদ আপনারা দিন স্থির করতে চান? আমার জ্যাঠামশাই, কাকা আছেন, তাঁদের সঙ্গেও পরামর্শ করতে হবে।

বিমলবাবু বললেন, আমাদের তো ইচ্ছে সামনের মাসে। যদি অবশ্য আপনাদের অসুবিধে না থাকে।

পান-খাওয়া ভদ্রলোক মাঝখান থেকে কথার খেই ধরলেন : এ বিয়েতেও অসুবিধে! আমাদের তো দাবি-দাওয়া কিছুই নেই। আপনাদের মেয়ে, গয়নাগাঁটি যা ভাল বুঝবেন দেবেন। আমরা সে ধরনের বরপক্ষ নই যে ফর্দ মিলিয়ে গয়নাগাঁটি ওজন করে নেব। বিশ ভরি দেন কি পঁচিশ ভরি দেন, যা আপনাদের সুবিধে। শাড়ি, জামা, কি টুকিটাকি জিনিসপত্র কি দেবেন তা কি আবার বলতে হয় নাকি, আপনাদের এখান থেকে তত্ত্ব যাবে, পাঁচ বাড়ির লোক এসে দেখবে—দৃষ্টিকটু না হলেই হল। ফার্নিচার আজকাল এত রকম হয়েছে, আমরা সেকেলে মানুষ আর কি বলব, আপনাদের মেয়ে যা পছন্দ করবে তাই দেবেন।

সুরজিৎ যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক স্বরে বলে, নিশ্চয়, আমাদের সাধ্যমত করব বইকি। আমার মায়ের যা গয়নাপত্র সব মাধবীই পাবে।

তবে, অর্ধেক কাজ তো এগিয়েই আছে। বুঝেছ বিমল, এসব বনেদী ঘর—এক মাস কেন, বললে এঁরা পনেরো দিনেই মেয়ের বিয়ে দিতে পারেন। সব কথাই তো বলা হয়ে গেল। এ ছাড়া সামান্য কিছু টাকা যা লাগবে—

সুরজিৎ থামিয়ে দেয় : কিসের টাকা?

ছেলের বাবা নেই তো, পাছে ও মনে কষ্ট পায় তাই বেশ ধুমধাম করেই বিয়ে দিতে হবে।

দিন না, তাতে কি হল।

মানে আমাদের ছেলের বাড়ি, ঘর থেকে টাকা বার করে তো আর বউভাতে খরচ করা যায় না, লোকে হাসবে যে। তাই কিছু টাকা—

সুরজিৎ সোজা হয়ে বসে : কত?

কত আর, হাজার পাঁচ-ছয় হবে। কি বল বিমল? যেটুকু না হলে নয়, তাই আর কি। লোকজন খাওয়ানো, বড় করে একটা প্যাণ্ডেল করা, কালু হোসেনের সানাই, এই আর কি—

সুরজিৎ তখনও নিজেকে সংযত করে : তা হলে একটু মুশকিল আছে। মানে, বিয়ের ব্যাপারে কোন রকম পণ দেওয়া বা নেওয়া আমরা পছন্দ করি না।

পান-খাওয়া ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে পড়েন : না না, এ তো পণের টাকা নয়, মানে যেটুকু খরচা হবে শুধু সেই টাকাটাই।

মাপ করবেন। জিনিসপত্র ছাড়া কোন রকম নগদ টাকা আমি দেব না। পাঁচ হাজারও নয়, পাঁচ টাকাও নয়।

তা হলে এই সব লোকজন খাওয়ানো, প্যাণ্ডেল বাঁধা—

সুরজিৎ কঠিন স্বরে বলে, করবেন না। যদি নিজেদের পয়সা না থাকে অন্য লোকের কাছ থেকে ভিক্ষে চেয়ে জাঁকজমক করার কোন অর্থ নেই। আপনি যা, তাই লোককে বুঝতে দিন।

এবারে ভদ্রলোক চটে যান : টাকা নেই, দিতে পারবেন না বললেই তো হয়, অত গরম গরম কথা শোনাচ্ছেন কেন?

স্বরজিৎও বিরক্ত হয়ে ওঠে : ভিক্ষে চাইতে গেলে কথা শুনতে হয় বইকি। আর এ নিয়ে কথা না বাড়ানোই বোধ হয় ভাল, নমস্কার।

ভদ্রলোক দুজন উঠে পড়েন : আচ্ছা দেখব, বিনা পণে কোথায় আপনার বোনের বিয়ে দেন।

তাঁরা বেরিয়ে গেলে স্বরজিৎ ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দেয়, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। বোঝে, মা এখুনি আসবেন, বিমলবাবুদের বিষয়ে কথা বলবেন। স্বরজিতের কিন্তু আর এ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে ভাল লাগে না। তাই এড়িয়ে যাবার জন্যে পদ্মাবতীকে ঘরে ঢুকতে দেখে নিজে থেকেই বলে, জানি, তুমি বলবে আমার এতটা রাগ করা উচিত হয় নি, কিন্তু কি করব বল, আমি যা অপছন্দ করি তাকে কিছুতেই স্বীকার করতে পারি না।

পদ্মাবতী গম্ভীর স্বরে বললেন, আমি তো কিছু বলি নি খোকা। মাধবী তোমার বোন, যা ভাল বুঝেছ তাই করেছ।

মার এই ধরনের প্রাণহীন নির্লিপ্ত কথাগুলো শুনতে স্বরজিতের ভাল লাগে না, এর চেয়ে তিনি বিরক্ত হলে রাগ করলে সে স্বস্তি বোধ করত।

তোমাকে না জিজ্ঞেস করেই আমি ওদের বারণ করে দিলাম, তুমি নিশ্চয়ই তাই রেগে গেছ।

রাগ আমি কারুর ওপর করি না। তোমরা বড় হয়েছ, তোমাদের স্বাধীন মতামতের বিরুদ্ধে কোন কাজই আমি করতে চাই না। তবে যতদূর শুনেছি এ ছেলেটি ভাল ছিল।

স্বরজিৎ উত্তেজিত হয় : ভাল ছেলে তো টাকা চাইল কেন?

পদ্মাবতী বুঝিয়ে দিয়ে বলেন, ও কি করবে, বাড়ির লোকে বলেছে—হাজার হোক ছেলের বাড়ি তো।

যার নিজের কোন মত নেই, অন্যের কথায় নাচে—সে পুরুষমানুষ নয়।

এমন কিছু বেশী টাকাও তো ওরা চায় নি। পাঁচ হাজার টাকা সব বিয়েতেই খরচা হয়। দরকার পড়লে তোমার কাকাই তো টাকা দিতে চেয়েছিলেন।

স্বরজিৎ আর শুনতে পারে না, বিরক্ত হয়ে পায়চারি করে : যে দাঁড়কাক, তার দাঁড়কাক থাকাই ভাল, ধার করে ময়ূরের পালক লাগালে তাকে আরও বীভৎস দেখায়। আমি তাদের ঘেন্না করি।

পদ্মাবতী কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, মাধবী এসে পড়ে তা থামিয়ে দেয় : দাদা ঠিকই করেছে, ওখানে আমি বিয়ে করব না।

করো না। তোমাদের কোন ব্যাপারেই আর আমি থাকতে চাই না। রাত হয়েছে, খাবে চল।

বলেই পদ্মাবতী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

স্বরজিৎ সেইদিকে তাকিয়ে থেকে বলে, মা রেগে গেছেন।

মাধবী ছোট্ট উত্তর দেয় : উপায় কি।

আমি জানতাম তুই আমার কথায় সায় দিবি। ব্যক্তিত্বহীন একটা জড় পদার্থ বিয়ে করে কোন মেয়ে কি সুখী হতে পারে? আমাদের এই সমাজের কথা যত ভাবি গা জ্বালা করে। লেখাপড়া শিখে ছেলেরা সব চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলে, অর্থনীতির বুকনি আওড়ায়, কিন্তু নিজের বিয়ের বেলা বাপ-মার অতি বাধ্য ছেলে। পণের টাকা সিন্দুকে ভরতে এতটুকু তাদের চক্ষুলজ্জা করে না।

স্বরজিতের কথা শুনতে শুনতে মাধবীও উত্তেজিত হয়ে ওঠে : তোর নাটকের মধ্যে এইসব কথাগুলোই লেখ্ না। তাতে সকলের উপকার হবে।

মাধবীর কোন কথাটাই স্বরজিতের কানে যায় না, নিজের মনেই বলে যায় : নিজেকে কখনও ছোট করিস না, তাতে যে নারীত্বের অপমান। লেখাপড়া শিখেছিস, কাজ করবি। যদি জীবনে এমন কেউ আসে—যে দেবে ভালবাসার সম্মান, তাকেই গ্রহণ করবি, নয়তো নয়। করতে হবে বলে কখনও বিয়ে করিস না।

ভেতর থেকে পদ্মাবতী আবার ডাকলেন, খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, খাবে এস।

ভাই-বোনে নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে মায়ের সামনে খেতে বসে।

দুপুরের দিকে প্রায় রোজই ঘণ্টাখানেকের জন্য সুরজিৎ যায় কফিহাউসে। কফিহাউসের নিজের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এখানে ঠিক চায়ের দোকানের আড্ডা বসে না, রকে বসা ছেলেরা একজোট হলেও গুলতানি করতে ভয় পায়। আবার এ ঠিক প্যারীর কাফেও নয় যেখানে মনীষীর জন্ম হয়। যা ভাল লাগে তা হল এখানকার পাঁচমিশেলী ভিড়। হীরো ওয়ারশিপের কেউ ধার ধারে না। এখানে আসেন অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিক, শিল্পী, চিত্রজগতের দিক্‌পাল। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আলাপ করার জন্য অন্যেরা চাঞ্চল্য প্রকাশ করে না। আর পাঁচজনের মত তারাও আসে, বসে, এক কাপ গরম কফি নিয়ে গল্প করে, আবার একসময় সকলের অজান্তে উঠে চলে যায়।

সেইজন্যেই সুরজিতের কফিহাউসে আসতে ভাল লাগে। অবশ্য প্রতিদিন আসার অভ্যেস বেশীদিনের নয়, মাস ছয়েক হবে। আগে তার অফিস ছিল ক্লাইভ বিল্ডিংয়ে, এখন উঠে এসেছে ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীটে, তাই লাঞ্চের সময় ঘণ্টাখানেক সে এখানে কাটাতে পারে। সকালবেলা বাড়ি থেকে খেয়ে বেরয় বলে কফিহাউসে বসে খুব যে কিছু খাওয়া হয় তা নয়, একখানা কেক, এক প্লেট স্যাণ্ডউইচ কি বড়জোর ডিমের অমলেট – তাও রোজ নয়। আলুভাজা কি পকোড়ার সঙ্গে কয়েক কাপ কফি তার বরাদ্দ জলখাবার।

প্রথম প্রথম এক কোণে বসে সুরজিৎ কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাতো আর শুনত সামনের টেবিলের রাজনৈতিক আলোচনা, কিংবা শিল্প-সাহিত্য নিয়ে সূক্ষ্ম বিতর্ক। আজকাল কিন্তু আর একলা বসে থাকতে পারে না। এই ক মাসে পরিচয় হয়েছে অনেকের সঙ্গে, সকলেই কফিহাউসের বন্ধু, এখানেই দেখা হয়। খুব একটা ঘনিষ্ঠ আলাপ গড়ে না উঠলেও এদের অনেকের সঙ্গে এমনই একটা সম্পর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে যে কারুর সঙ্গে কিছুদিন দেখা না হলে খবর নিতে ইচ্ছে করে হঠাৎ কি হল তার, কেন আসে না কফিহাউসে।

এ পর্যন্ত যার কোনদিন কামাই দেখে নি সুরজিৎ সে হল সুবোধ হাজরা। তামাটে রঙ, পাকানো শরীর, কপালের সবুজ শিরগুলো উঁচু হয়ে থাকে। সব সময় চোখে পরে কাল চশমা। মাঝে মাঝে প্যাণ্ট আর বুশ-সার্ট পরলেও তাকে মানায় বেশী ধুতি আর গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবিতে। শান্তিনিকেতনী ধরনে কাঁধে রাখে একটা ঝোলা, কথাবার্তার ধরনেই বুঝিয়ে দেয় সে শর্ট টেম্পারের লোক, নিজের মতের সঙ্গে না মিললেই চট করে খেপে যায়। হাজরা কী কাজ করে সুরজিৎ তা এখনও ভাল জানে না, বোধ হয় ইন্‌সিওরেন্সের দালাল। বেশীর ভাগ সময় কাটায় কফিহাউসে, এর ওর টেবিলে কফি খেয়ে। অনেকেই তাকে পছন্দ না করলেও সুরজিতের ভাল লাগে। কারণ সুবোধ হাজরা নবনাট্য আন্দোলনের একজন প্রধান। প্রগতি-মঞ্চ নামে যে নাট্যগোষ্ঠী যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে হাজরাই তার সাধারণ সম্পাদক। শুধু সম্পাদক বললে বোধ হয় সুবোধের সবটুকু পরিচয় দেওয়া হয় না, এই দলের হয়ে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ একমাত্র সে-ই করে।

আজ হাজরা এক কোণে চুপচাপ বসেছিল, এ তার স্বভাববিরুদ্ধ। তাই সুরজিৎ বিস্মিত না হয়ে পারে না: কি ব্যাপার, চুপচাপ যে?

হাজরা শুকনো মুখে উত্তর দেয়, দূর মশাই, আর ভাল লাগছে না।

তবু?

আজকের বাংলা কাগজ পড়েছেন?

না। কেন?

হাজরা চোখ পাকিয়ে বলে, সমালোচনার নামে যা-তা, গালাগাল করেছে। আমাদের 'বন্য বলাকা'র প্রডাশানটার কিছুই নাকি তার ভাল লাগে নি। না সেট, না অ্যাক্টিং—শুধু প্রশংসা করেছে দুটি মেয়েকে যারা একেবারেই পার্ট করতে জানে না।

কেন জানা নেই প্রগতি-মঞ্চের নাটককে কাগজে গালাগাল দিয়েছে শুনে সুরজিতের ভাল লাগল। মনে মনে ঠিক করল, এক কপি কাগজ কিনে বাড়ি নিয়ে যাবে। তবু চোখেমুখে বিস্ময়ের ভাব এনে বলে, কেন এ রকম করলে বলুন তো?

বজ্জাতি। নাটক বোঝে, না ঘণ্টা। শুনবেন ছিল রিপোর্টার, এখন হয়েছে সমালোচক। বিদ্যে জাহির করতে হবে তো। আমাদের কি, লেট্ দি ডগস্ বার্ক, দি ক্যারাভান উইল পাস অন।

সুরজিৎ কফিতে দুধ মেশাতে মেশাতে আড়চোখে হাজরার মুখটা দেখে নিয়ে বলে, মুখে স্বীকার না করলেও মনে মনে বেশ আপনি মুষড়ে পড়েছেন।

হাজরা চোখের চশমাটা নামিয়ে রুমাল দিয়ে মোছে: তা হয়তো পড়েছি, সে আমাদের দলের ছেলেমেয়েদের জন্যে। কত আশা কত উৎসাহ নিয়ে তারা এখানে অভিনয় করতে এসেছে, কড়া নিয়মের মধ্যে তারা কাজ করে, মুখ বুজে পরিচালকের ধমক সহ্য করে। এই ধরনের একটা সমালোচনা পড়লে তাদের মন ভেঙে যাবে না? হয়তো আমাদের দোষ-ত্রুটি হয়েছে, কিন্তু এতটা নিন্দে করবে কেন? সেদিনের অভিনয় দেখতে দর্শক তো কম হয় নি। তাদের ভাল লাগল কি করে?

হাজরা আর কথা বলতে পারল না, একমাথা টাক আর প্রকাণ্ড ভুঁড়ি নিয়ে চেয়ার টেবিল সরাতে সরাতে পল্টু মিত্তির এসে দাঁড়াল তাদের সামনে। প্রথম কথাই বলে, কি হে হাজরা, কাগজ কেমন জুতিয়েছে তোমাদের?

হাজরা চোখ তুলে তাকিয়েও কোন উত্তর দিল না।

পল্টু মিত্তির বলে যায়, যা পার না তা কেন করতে যাও। নাটক করা কি চারটিখানি কথা। ইবসেনের 'ওয়াইল্ড ডাক', তার কি নাম হল, না—'বন্য বলাকা'। নামটাই তো ভুল।

হাজরা এবার কথা বলে, আমি এ নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই না।

পল্টু মিত্তির হি হি করে হাসে: তোমার না হয় সময়ের দাম নেই, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছ। কিন্তু আমাদের টাকার তো দাম আছে। এই সব ছাইপাঁশ নাটক দেখবার জন্যে যে গুচ্ছের টিকিট গছিয়ে যাও, তা কি ভাল হচ্ছে?

সুবোধ হাজরা খেপে গিয়ে উঠে পড়ে: ক পয়সার টিকিট তুমি আমার কাছ থেকে নিয়েছ তার হিসেব দিয়ো, সামনের মাসে টাকা দিয়ে দেব।—বলেই টেবিল ছেড়ে অন্য দিকে চলে যায়।

পল্টু মিত্তির ব্যাঙের মত গম্ভীর গলা করে বলে, ছোকরা চটেছে।

সুরজিৎ হাসবার চেষ্টা করে: বেচারীর মনটা আজ ভাল নেই তাই আপনার কথাটা শুনে মাথার ঠিক রাখতে পারে নি।

নাটকটা কিন্তু ওরা ভালই করেছে।

কি বললেন!

বেয়ারাকে ডিমের অমলেট আনতে বলে পল্টু মিত্তির সুরজিতের দিকে মুখ ফেরায়: আমি রবিবার গিয়েছিলাম ওদের নাটক দেখতে। হাজরাই টিকিট দিয়েছিল, বেশ ভাল লাগল।

তা হলে কাগজে—

ওরা বুঝতে পারে নি।

তবে হাজরাকে চটিয়ে দিলেন কেন?

ইচ্ছে করে। ও এখানে বসে থাকলে ডিমের ভাগ দিতে হত।

সুরজিৎ জোরে হেসে ওঠে: সত্যি, আপনাকে বোঝা যায় না।

মিত্তিরও হাসে, কদিনের আর পরিচয়?

তা ছ মাস হল বইকি।

ও তো কিছুই নয়। আমার স্ত্রীই আমাকে এখনও বুঝতে পারেন না। আমাদের বিয়ে হয়েছে আঠারো বছর।

দুজনের গল্প চলল অনেকক্ষণ—পারিবারিক গল্প।

কফিহাউস থেকে অন্যদিনের চেয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল হাজরা, হাঁটতে হাঁটতে চলল এসপ্ল্যানেডের দিকে। মনটা তার মোটেই ভাল নেই, কফিহাউসের যে টেবিলে গেছে সেখানেই ওই এক আলোচনা—কাগজে কি লিখেছে। দিন দুই আর এদিকে আসা চলবে না। কিন্তু এখন যাবেই বা কোথায়? প্রত্যেক দিন প্রায় পাঁচটা পর্যন্ত কফিহাউসে আড্ডা মেরে ঠিক অফিসের

ভিড় ভাঙবার আগে ট্রাম ধরে এসপ্ল্যানেড থেকে যায় বালীগঞ্জে প্রগতি-মঞ্চের অফিসে। আজ তার হাতে প্রায় দু ঘণ্টা বাড়তি সময়, পকেটে পয়সা থাকলে সে যে-কোন একটা সিনেমায় ঢুকে পড়ত, কিন্তু তাও নেই। অগত্যা সে হাঁটতে শুরু করে।

মেট্রো পেরুলে ইউ. এস্. আই. এসের বড় বড় কাঁচের শো-কেস, সেখানে এব্রাহাম লিঙ্কন আর গান্ধিজীর তুলনা করে নানারকম ছবি দিয়ে কি সব লিখে রেখেছে। হাজরা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখে। মনটা এতই অন্যমনস্ক যে লেখাগুলো একবার পড়ে গেলেও, কি পড়ল বুঝতে পারে না। ইউ. এস. আই. এসের অফিসের ভেতর থেকে দুটি মেয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল, তাদের মধ্যে একজন হাজরার পরিচিত। প্রগতি-মঞ্চের কোন একটা নাটকে কিছুদিন অভিনয় করেছিল। পাছে দেখা হলে 'বন্য বলাকা'র কথা তোলে তাই পাশ ফিরেই হাজরা দক্ষিণ দিকে হাঁটতে শুরু করল।

লিণ্ডসে স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে কোন্ দিকে যাবে ভাবছিল হাজরা, এমন সময় তার সামনে দিয়ে চলে-যাওয়া দোতলা বাসের ওপর থেকে কে যেন তার নাম ধরে ডাকে। বাসটা সামনের স্টপে গিয়ে দাঁড়াতেই নেমে এল অলক। হাজরার দিকে এগিয়ে এসে বলে, আমি তোকেই খুঁজছিলাম, আজ কফিহাউসে যাস নি?

হাজরা নাকটা কুঁচকে বলে, গিয়েছিলাম, তবে টিকতে পারলাম না। একটা সিগারেট দে।

অলক পকেট থেকে সিগারেট বার করে দেয়: চল্, কোথাও বসে একটু কথা বলা যাক।

কোথায়?

অলক হাতঘড়িটা দেখে নেয়: খেতে হবে, সারাদিন খাওয়া হয় নি। চল্, কোন পাঞ্জাবীর দোকানে যাই।

দুজনে লিণ্ডসে স্ট্রীটের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

অলকের চুল উস্কখুস্ক, প্যাণ্ট-সার্টও ময়লা। হাজরা সেইদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, কোথায় গিয়েছিলি?

একটা স্টেজ-রিহার্সাল ছিল।

কাদের?

স্কুলের শো। মেয়েদের নাচ, দু-একটা নাটকের দৃশ্য, লাইটিং করতে হবে—এই আর কি।

সে যাই হোক, টু পাইস থাকবে তো?

অলক হাসে: তা থাকবে। বড়লোক স্কুল, আলোর ভাড়া দিয়েও গোটা পঞ্চাশ টাকা ম্যানেজ করব।

হগ মার্কেটের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মিনার্ভা পেরিয়ে তারা এসে পৌঁছল সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোডে। এখানকার পাঞ্জাবী রেস্তরাঁগুলোর বেশ নামডাক আছে। দোকানে বসে খাওয়া-খদ্দেরের চেয়েও কিনে নিয়ে যাওয়ার ভিড় এখানে বেশী। বড় বড় গাড়ি এসে থামে দোকানের সামনে, তন্দুরী-মুরগী তুলে নিয়ে যে যার বাড়ি চলে যায়। অলকের বাড়িতে রান্নার ব্যবস্থা নেই, তাই দু বেলাই তাকে খেতে হয় বিভিন্ন রেস্তরাঁয়। যেদিন যে দোকান কাছে পায় সেখানেই ঢুকে পড়ে। তবে এখানকার এই পাঞ্জাবী দোকানগুলোর ওপর যেন তার একটু দুর্বলতাই আছে।

রেস্তরাঁর মধ্যে ঢুকে পেছনের দিকের একটা টেবিলে বসে ওরা হাতে-গড়া রুটি আর মাংসর অর্ডার দেয়।

এতক্ষণে হাজরা জিজ্ঞেস করে, কেন আমাকে খুঁজছিলি বললি না?

অলক অন্যদিকে তাকিয়ে উত্তর দেয়, হ্যাঁ, বলছি। মানে তোকে যে বলাই মুশকিল, ফস্ করে জ্বলে উঠবি।

অলক কথাটা বলতে সত্যিই ভয় পাচ্ছিল। তা দেখে হাজরার হাসি পায়: তা হলে সে রকম কথা বলিস না।

মানে আমি বলছিলাম কি, প্রগতি-মঞ্চের জন্যে দু-একজন বাইরের আর্টিস্ট নিলে ক্ষতি কি? নাটক ভাল, অভিনয় ভাল, সেই সঙ্গে যদি দু-একটা বক্স-অফিস নাম থাকে, দেখবি কি কাণ্ড হয়। আপনা থেকেই টিকিট বিক্রি হবে, এখনকার মত আর বাড়ি বাড়ি ঘুরে টিকিট পুশ করতে হবে না। কাগজওয়ালারাও অনেক সমঝে মতামত লিখবে।

হাজরা বুঝতে পারে এ সব অলকের নিজের কথা নয়, কেউ তাকে বুঝিয়েছে। হেসে জিজ্ঞেস করে, কে তোকে ওকালতি করতে পাঠাল? কুন্তল বুঝি?

যেই পাঠাক, ক্ষতি কি ?

আমাদের আদর্শটা কোথায় থাকবে ? আমরা বিশ্বাস করি গোষ্ঠীবদ্ধ অভিনয়ে। সেখানে একজন অভিনেতা বা অভিনেত্রীর প্রাধান্য আমরা স্বীকার করি না।

বয় খাবার দিয়ে গিয়েছিল, অলক হাজরার দিকে মাংসর প্লেটটা এগিয়ে দিয়ে বলে, এই, তুই রেগে যাচ্ছিস। আগে নিজেরা দাঁড়াই, প্রগতি-মঞ্চের নাম ছড়িয়ে পড়ুক, তারপর আদর্শ আঁকড়ে পড়ে থাকলেই তো হবে।

হাজরা ভোঁতা গলায় বলে, তুই একটা অপারচুনিস্ট।

অলক হাসে : হয়তো তাই, কিন্তু আমি সকলের ভালর জন্যই বলছি। রমাদি যখন নিজে থেকেই আসতে চাইছেন, টাকাকড়ি দেবার কোন বালাই নেই, ওঁকে হিরোইন করলে আমি বলছি 'বন্য বলাকা' হিট হয়ে যাবে।

তা হয়তো হবে, কিন্তু—

আর কিন্তু নয় হাজরা, আমি তোকে বলছি, দলের সকলেরই তাই ইচ্ছে।

শুধু একা কুন্তলেরই নয় !

হাজরার চোখ দুটো জ্বলে ওঠে, ও, আমাকে বাদ দিয়ে বুঝি তোমাদের একটা মীটিং হয়ে গেছে এর মধ্যে।

অলক তখনও বোঝাবার চেষ্টা করে, দূর বোকা, মীটিং কেন হবে। সকলের সঙ্গেই তো আমার আলাপ, কথায়-বার্তায় যা বুঝলাম আর কি। রমাদি ফিল্ম আর্টিস্ট, এখন যথেষ্ট নাম রয়েছে, টাকা না নিয়ে যখন আমাদের মধ্যে আসতে চাইছেন, তখন আর ভাবছিস কেন ?

রুটি আর মাংসটা পুরো খেয়ে ফেলে পেটের সঙ্গে হাজরার মাথাটাও ঠাণ্ডা হয়। বলে, বেশ, তোমাদের যদি সকলেরই ইচ্ছে, তাই হোক। নেক্সট প্রোডাকশন থেকে 'বন্য বলাকা'য় রমাদি পার্ট করুন—কিন্তু এই একটা নাটকেই। এবং ওঁর নামের পাশে লেখা থাকবে গেস্ট আর্টিস্ট।

অলক নিজের সাফল্যে খুশী হয়। হেসে জিজ্ঞেস করে, আর এক প্লেট মাংস আনাই ?

হাজরাও হেসে ফেলে : দরকার নেই, বরং দু কাপ গরম চা।

অলক সানন্দে চায়ের অর্ডার দেয়।

মঙ্গলবার।

রুবী থিয়েটারের তিনতলার ঘরে বসে এইমাত্র সুরজিৎ তার নাটক পড়া শেষ করেছে। শুনছিলেন চারজন—হৃষীবাবু স্বয়ং, ম্যানেজার রমেন চৌধুরী, পরিচালক রতিবাবু এবং মন্দিরা। এবার সুরজিতের শোনবার পালা তাঁরা কী বলেন।

প্রথম কথা বললেন হৃষীবাবু, এতক্ষণ তিনি কানে পায়রার পালক ঢুকিয়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছিলেন, এখন বাঁ কান থেকে তাকে ডান কানে চালান দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলেন, কি রকম মনে হল ?

পালটা প্রশ্ন করলেন রমেন চৌধুরী : আপনার কেমন লাগল, সার্ ?

ভালই।

আমারও তো ভালই লাগল। গল্প আছে, চরিত্র ফুটেছে—

বাধা দিলেন পরিচালক মশাই : রমেন, তুমি আর নাটক সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ কর না। ধরা পড়ে যাবে।

রমেন চৌধুরী বিরক্ত হয় : কি ধরা পড়ে যাব ?

রতিবাবু নাকে নস্যি ঠুসতে ঠুসতে বলেন, তাবৎ শোভতে মূর্খ যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে।

তার মানে ?

তুমি বক্স-অফিস নিয়েই থাক, সাহিত্যচর্চা করতে এস না।

রমেন চৌধুরী সহ্য করতে পারে না পরিচালক রতীন ঘোষালকে। বড় যেন স্পষ্টবাদী। কারুর ধার ধারেন না। নিজের মতামত ভাল করেই সবাইকে শুনিয়ে দেন। রতিবাবু আজকের লোক নন। বলতে গেলে সেই আর্টস থিয়েটারের আমল থেকে রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত। পালা করে সবকটা থিয়েটারেই কাজ করেছেন, তবে এক নাগাড়ে বহুদিন কোথাও লেগে থাকেন নি। কাজও করেছেন নানারকম। কোথাও ছিলেন অভিনেতা, কোথাও নাট্যকার আবার কোথাও বা প্রচারসচিব। কিছুদিন

বুঝি একটা সাপ্তাহিক পত্রিকাও সম্পাদনা করেছিলেন, সেই সূত্রে দৈনিক সংবাদপত্রের সঙ্গেও পরিচয় আছে ভালরকমের। এখন অবশ্য বয়স পৌঁছেছে পঞ্চাশের কোঠায়, অভিনয় করা ছেড়ে দিয়েছেন বহুদিন, তবে থিয়েটারের নেশা কাটাতে পারেন নি। সন্ধ্যের দিকে প্রায়ই একটা না একটা থিয়েটারে ঢুকে বেশ খানিকক্ষণ আড্ডা মেরে যান—হয় মালিক, না হয় শিল্পী, চাইকি সিফটারদের সঙ্গেও গল্প করতে তাঁর ভাল লাগে। একাল সেকালের রঙ্গালয়ের কতরকম রঙ্গকথা তাঁর ঝুলিতে। শোনাবার লোক পেলেই তার সামনে উজাড় করে দেন। থিয়েটারের ছেলেমেয়েরা তাঁকে শ্রদ্ধা করে, আন্তরিক ভালবাসে—এইটাই তাঁর পরম লাভ।

হৃষীবাবু এবার সরাসরি রতিবাবুকেই প্রশ্ন করলেন, আপনার কি মনে হল?

রতিবাবু রুমাল দিয়ে নাকটা পরিষ্কার করছিলেন, বললেন, মাল আছে।

তার মানে?

নামাতে পারেন, চলবে। তবে—

রতিবাবু থেমে যান।

হৃষীবাবু এবার চোখটা তুললেন: আহা, আপনার 'তবে'টাই তো শুনতে চাইছি! একটু ঝেড়ে কাশুন মশাই।

রতিবাবু হেসে ফেলেন: না, এ সে রকম একটা মারাত্মক 'তবে' নয়, মামুলী 'তবে'। মানে একটু অদল-বদল করতে হবে। কিছু কাটতেও হবে, আবার কিছু জুড়তেও হবে।

সুরজিৎ কিছু বলতে যাচ্ছিল। রতিবাবু থামিয়ে দেন: তোমার ভয় নেই। একেবারে নলচে-খোলচে পালটে দেব না। যা বদলাব তোমার সঙ্গে পরামর্শ করেই।

মন্দিরা হেসে ফেলে: কেন মিথ্যে স্তোক দিচ্ছেন ভদ্রলোককে।

রতিবাবু মুখ তুলে তাকান।

মন্দিরা বলে, মনে নেই সেই 'নিশার-স্বপনে'র বেলা। আসল বইটার তো কিছুই রাখেন নি। শুধু বোধ হয় চরিত্রের নামগুলো ঠিক ছিল!

রতিবাবুও হাসেন: সে আর কি করব—স্রেফ মলাট থেকে নাটক তৈরি করা।

তার মানে?

'নিশার-স্বপন' খ্যাতনামা লেখকের নামকরা উপন্যাস। বাস্, আর যায় কোথা, হৃষীবাবু একই টাকায় দুটো জিনিস কিনে ফেললেন—লেখকের নাম আর বইয়ের মলাট। কিন্তু নাটক করবে কে? ধর্ শালা রতীন ঘোষালকে।

হৃষীবাবুর কানে পালক দেওয়া শেষ হয়েছিল, ভাল করে রুমালে মুছে পালকটি দেরাজের মধ্যে রেখে দিয়ে বললেন, এটা কিন্তু রতিবাবু মিথ্যে বড়াই করছেন না, সত্যি উনি গাধাকে ঘোড়া বানাতে পারেন।

প্রশংসা শুনে রতীন ঘোষাল খুশী হন, মৃদু মৃদু হাসেন: আমি তো সবাইকে বলি, পাবলিক থিয়েটারের ডিরেক্টার হতে গেলে খানিকটা ম্যাজিশিয়ানও হতে হয়। যে রকম মলাট থেকে নাটক তৈরি করা, খোশামুদে পাতিহাঁস শিল্পীকে রাজহাঁস অভিনেতা বানানো, মুঘল দরবারের সেটকে সামাজিক নাটকে কাজে লাগানো, এমনভাবে চরিত্র সাজাতে হবে যাতে না নতুন ড্রেস কিনতে হয়।

কথাগুলো বলে সগর্বে সকলের মুখের দিকে তাকান। সুরজিতের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মুখে লেগে থাকা হাসির মাত্রাটা একটু বাড়িয়ে দেন: তোমার নাটকে তো কোন খাটুনিই নেই। দুটো রাত্রি জাগলেই নাটক দাঁড়িয়ে যাবে।

হৃষীবাবু টেবিলের ওপর ঝুঁকে বসলেন, গলাটা গম্ভীর করে বললেন, তা হলে এই ঠিক হল, রুবী থিয়েটারের নেক্সট প্রডাকশন সুরজিৎ সেনগুপ্তর 'নূতন যুগের ভোরে'।

রতিবাবু রসিকতা করে বলেন, আমি সমর্থন করলাম।

তা হলে রিহার্সাল কবে থেকে শুরু হবে?

নাটক কবে নামাতে চান বলুন?

হৃষীবাবু অকারণে ক্যালেণ্ডারটার দিকে তাকিয়ে বলেন, আপনাদের কুড়ি দিন সময় দিলাম, ১লা বৈশাখ আমরা নতুন নাটক খুলব।

রতিবাবু সীটের ওপরই নড়েচড়ে বসলেন: অতি

উত্তম প্রস্তাব। ব্রাদার সুরজিৎ, এবার তুমি আমার সঙ্গে লেগে পড়। সকালে ঘণ্টা দুই করে আমার বাড়িতে কাটাও, প্রয়োজনবোধে সন্ধ্যের দিকেও বসতে হবে। কথা শুনে ঘাবড়ো না, আমরা হচ্ছি "ধর্ তক্তা, মার্ পেরেক"-দলের লোক।

ইতিমধ্যে রমেন চৌধুরী চার প্লেট কাটলেট আনিয়ে সকলের সামনে সাজিয়ে দেয়। নিজের মনেই হাসতে হাসতে বলে, এবারে বড় ভাল সিলেক্‌শান করেছেন সার্, এ নাটক আমাদের হিট হবে। আমি তো রোজ অ্যামেচারের থিয়েটার দেখছি, গরম গরম ডায়ালগ সব শুনতে চায়। প্যান্‌প্যানে প্রেমের গল্প আর চলে না।

রতিবাবু অনভ্যস্ত হাতে কাঁটা-ছুরি দিয়ে কাটলেট কাটতে কাটতে রমেন চৌধুরীকে থামিয়ে দেন : ফের তুমি নাটক নিয়ে কথা বলছ, তার চেয়ে রাই আনতে বল।

রমেন চৌধুরী কিন্তু এবার বিরক্ত হল না : যাই বলুন সার্, দিনের পর দিন বক্স-অফিসে বসে থেকে দর্শকের নাড়ী বুঝে ফেলেছি। দিন না একগাদা বস্তির সীন, দেখি কি করে নাটক চলে। এক টাকা, দেড় টাকার সীট কোনদিনই ফুল হবে না। তারা দেখতে চায় বড়লোকের বাড়ি, ঝলমলে আলো, দামী দামী পোশাক। তবে শেষ পর্যন্ত একটা স্যাক্রিফাইস না দিলে বই লঙ রাণে যাবে না। একশো নাইটেই নাভিশ্বাস উঠবে।

রতীন ঘোষাল আবার বাধা দেন : বললাম যে মাস্টার্ড চাই।

এই যে নিয়ে আসছি।

রমেন চৌধুরী বেরিয়ে গেলে মন্দিরা হেসে লুটিয়ে পড়ে : কি রকম সবজান্তার মত বলে গেল। সুরজিৎবাবু, আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ওর একটি কথাও শুনবেন না। যদি ডাইনে যেতে বলে, আপনি যাবেন বাঁয়ে, নীচে নামতে বললে আপনি উপরে উঠবেন।

এত রকম কথাবার্তা শুনে সুরজিতের মজা লাগছিল। হেসে জিজ্ঞেস করল, কেন বলুন তো?

রমেনবাবু যা গণনা করেন ঠিক তার উলটো হয়, 'নিশার স্বপন' বলেছিলেন পঁচিশ নাইটে উঠে যাবে, সেটা চলল দুশো রজনী। ওঁর মতে 'মোহিনীমায়া' হিট নাটক, অথচ পঞ্চাশ রাত্রির পর চোঙা দিয়ে ডেকে লোক ঢোকাতে হত। শুধু কি তাই, অ্যাডভান্সের টিকিট সেল দেখে যেদিনই বলেন 'হাউস ফুল' যাবে, সেদিন কারেণ্ট মোটেই টানে না। ফাঁকা হাউসে আমাদের চেঁচাতে হয়।

হৃষীবাবু এ প্রসঙ্গের পূর্ণচ্ছেদ টানলেন : যাই বলুন, রমেন কিন্তু লোক ভাল। এ লাইনের অভিজ্ঞতা ওর কম দিনের নয়। প্রায় চোদ্দ বছর থিয়েটারের ম্যানেজারী করছে। যাই হোক রতিবাবু পুরোদমে কাজ শুরু করে দিন, আমিও তা হলে পাব্লিসিটির কাজ শুরু করি।

সেদিনকার সভা ভেঙে গেল। রাত তখন দশটা।

রুবী থিয়েটার থেকে বেরিয়ে সুরজিৎ ট্যাক্সি ধরল। তার বুকের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা। এতদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করেও কোথাও কোনরকম সুযোগ সে পায় নি কিন্তু আজ হঠাৎ কি করে তার সামনের দেয়াল সরে গিয়ে নতুন জীবনের সিংহদ্বার খুলে গেল? তাও এত সহজে? মাত্র দুদিন সে রুবী থিয়েটারে এসেছে, কাউকেই তার বিশেষ পছন্দ হয় নি, খোশামোদও করে নি এতটুকু, তবু কি করে এক কথায় এরা রাজী হল তার নাটক নিতে! ভাবতেও আশ্চর্য লাগে।

কিন্তু ভালও লাগে। যদি এ নাটক থিয়েটারে জমে যায়, তা হলে আরও পাঁচ জায়গা থেকে তার ডাক আসবে, নবীন নাট্যকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবে মঞ্চজগতে। বলা যায় না, নামকরা কাগজেও হয়তো সে লেখবার সুযোগ পাবে। সেইটাই হবে তার পরম লাভ। এতদিন ধরে যেসব কথা সে বলতে চেয়েছে আঘাতের পর আঘাত করে, ঘুণধরা সমাজের যে দেয়ালগুলো সে ভেঙে দিতে চেয়েছে, তা অন্ততঃ প্রকাশ করতে পারবে সে ছাপার অক্ষরে।

এমনি কত রকম কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফেরে সুরজিৎ। ঘরে ঢুকে নাটকের পাণ্ডুলিপি দেরাজের মধ্যে সযত্নে ভরে রাখে। মাধবী পেছন থেকে জিজ্ঞেস করে, আজ এত দেরি হল?

সুরজিৎ তার দিকে মুখ তুলে তাকায়, কথা বলে না, চোখ তার আনন্দে উজ্জ্বল।

দাদার এ অভিব্যক্তির সঙ্গে মাধবী সুপরিচিত: কি রে, নতুন কিছু খবর আছে বুঝি? বল্ না।

আমার নাটক রুবী থিয়েটারে প্লে হবে।—কথা বলতে গিয়ে আনন্দে সুরজিতের গলা কেঁপে ওঠে।

সত্যি? কোন্টা?

'নূতন যুগের ভোরে'।

দাদার এ সৌভাগ্যে আনন্দে অধীরা মাধবী চোখের জল সামলাতে পারে না: আমি তো আগেই বলেছিলাম খুব ভাল লেখা হয়েছে, এতে যা তোর নাম হবে না, দেখবি।

মা কোথায় রে?

শরীরটা ভাল নেই, শুয়ে পড়েছেন।

সুরজিৎ উদ্বিগ্ন হয়: কি হয়েছে?

না, আজ একাদশী কিনা। সারাদিন কিছু খান নি, কোমরের ব্যাথাটাও একটু বেড়েছে।

ওষুধ খেয়েছেন?

হ্যাঁ। দেখি যদি জেগে থাকেন।

মাধবী ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, একটু বাদেই পাশের ঘর থেকে চেঁচিয়ে ডাকে, দাদা, মা ডাকছেন, এঘরে আয়।

সুরজিৎ মার ঘরে গিয়ে দেখে পদ্মাবতী উঠে বসেছেন, সস্নেহ হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করে জিজ্ঞেস করলেন, কই, আমাকে তো আগে বলিস নি। রুবী থিয়েটারের সঙ্গে কবে তোর কথা হল?

সুরজিৎ মায়ের কাছটিতে এসে বসে: পাছে না হয় তাই আগে বলি নি।

কাল তোর জ্যাঠামণি আর কাকাবাবুকে বলে আসিস।

সুরজিৎ বাধা দেয়: না মা এখন থাক্, এ লাইনের লোকদের কথার কোন দাম নেই। তারপর ওরা যদি নাটক না নামায়, সবাই আমায় খেপাবে। তোমরাও কাউকে বলো না।

পদ্মাবতী মাধবীকে বললেন, তোদের খাবার জায়গা কর্ মাধু, আমি গিয়ে বসছি।

তুমি আবার কেন উঠবে, শুয়ে পড়।

পদ্মাবতীর গলা অন্য রকম শোনায়: উনি কিন্তু আমায় বরাবর বলতেন, খোকা বড় হলে লেখক হবে।

তাই নাকি, বাবা এ কথা বলতেন?

পদ্মাবতী দীর্ঘশ্বাস ফেলেন: হ্যাঁ। আমি অবশ্য তর্ক করে বলতাম খোকা ব্যারিস্টার হবে। কিন্তু ওঁর কথাটাই ফলল।

সুরজিৎ ও মাধবী দুজনেই বিস্মিত হয়। মায়ের মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে সুরজিৎ মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি খুশী হও নি?

অন্যমনস্ক পদ্মাবতী উত্তর দেন, কেন হব না। তোরা খুশী হলেই আমি খুশী। চল্, খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর অনেকক্ষণ খাটে শুয়ে থেকেও কিছুতেই সুরজিতের চোখে ঘুম এল না, এপাশ-ওপাশ করে শেষকালে উঠে পড়ল, একটা সিগারেট ধরিয়ে পায়চারি করল ঘরের মধ্যে। ভুলে যাওয়া অনেক কথা আজ তার মনে পড়ছে। জ্যাঠামশাইয়ের বিরাট খাট-খানাকে স্টেজ বানিয়ে তারা থিয়েটার করত জাঠতুতো খুড়তুতো ভাইবোনেরা সব মিলে, সঙ্গে থাকত পাড়ার ছেলেরাও। দেখতে আসতেন বাড়ির গুরুজনেরা। খাটের নীচেই ছিল গ্রীনরুম, সেখানে মাথায় পাগড়ী বেঁধে রাজপুত্র মন্ত্রিপুত্র সেজে বসে থাকত সুরজিৎরা, তারপর হুইসিল বাজলেই খাটের ওপর উঠে নিজেদের পার্ট বলে এসে আবার ঢুকে যেত খাটের নীচে। শুনত দর্শকদের হাততালি, আবার পর্দা ফাঁক করে দেখত কারা কতখানি হাসছে।

সে প্রায় বিশ বছর আগেকার কথা। সুরজিৎ তখন ছ-সাত বছরের ছেলে। সে সময় যার সবচেয়ে বেশী উৎসাহ ছিল, সে হল অটলদা—সুরজিতের জাঠতুতো দাদার বন্ধু। বাড়িতে কোন উৎসব হলে—সে মুখেভাত, পইতে, কি সরস্বতী পুজো—যাই হোক না কেন অটলদা আর দাদা ভাই-বোনদের নিয়ে লাগাত থিয়েটার। রোজ সন্ধ্যেবেলা চলত রিহার্সাল, হৈ-হৈ আনন্দের মধ্যে কাটত দিন।

কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নাটক করার উৎসাহ কমে গেল এ বাড়িতে, বিশেষ করে অটলদা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে কলকাতার বাইরে চলে যাবার পর থেকে। দাদা এখন ব্যারিস্টার, খুব মন দিয়ে প্র্যাকটিশ করে। ছেলেবেলার নাটকের কথা উঠলে হেসে পাইপ কামড়ে বলে, অটলের দৌলতে স্টেজ-ফ্রাইটটা কেটে গিয়েছিল, তাই কোর্টে দাঁড়িয়ে সওয়াল করতে কোনদিনই হাঁটু কাঁপে নি।

সবাই ছেড়ে দিলেও মঞ্চের নেশা যেন পেয়ে বসল সুরজিৎকে। বাড়িতে আর অভিনয় না হওয়ায় সে ঢুকল পাড়ার ক্লাবে। তারপর স্কুলে। যে কোন সুযোগেই সে নামত মঞ্চে, অভিনয় করত ছোট-বড় চরিত্রে। তখনও সে অভিনেতাই। নাট্যকার সুরজিতের জন্ম হল তার কলেজ-জীবনে। একাঙ্ক নাটক দিয়ে শুরু করে দীর্ঘ ছ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর হাত পাকল তার পূর্ণাঙ্গ নাটকে।

কলেজ-জীবন থেকেই তার পরিচয় বিদেশী নাট্যকারদের সঙ্গে। শেক্সপীয়ার তাকে মুগ্ধ করেছে। হ্যামলেটের অন্তর্দ্বন্দ্ব, ম্যাকবেথের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ওথেলোর ঈর্ষার জ্বালা কি ভাবে তাদের অজানতে টেনে নিয়ে গেছে চরম পরিণতির দিকে, তা পড়তে পড়তে মন হতাশ হয়ে পড়লেও মহৎ কারুণ্যে ভরে গেছে। ভাষার দিক দিয়ে দেখতে গেলে সে যুগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যকার মার্লো। শেক্সপীয়ারের আগে জন্মেও দ্বিতীয় এডওয়ার্ডের ট্র্যাজেডি সার্থক ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। সুরজিতের ভাল লাগে অস্কার ওয়াইল্ডের নাটকের কথোপকথন। কি তীব্র শ্লেষ। সুদূর নরওয়ের হেন্‌রিক ইবসেন তাকে নাড়া দিয়েছে; নাটকের মধ্যে দিয়ে সমাজকে সচেতন করে তোলার কি অপূর্ব প্রয়াস। মাত্র কয়েকটি নাটক লিখেই তিনি অমরত্ব লাভ করেছেন বিশ্বসাহিত্যে। তাঁর থেমে যাওয়া কলম যেন হাতে তুলে নিলেন আইরিশ নাট্যকার বার্ণাড শ। গণতন্ত্রের ভণ্ডামী, খৃষ্টানীতির প্রহসন, শ্বেতাঙ্গের মিথ্যা দম্ভ, আভিজাত্যের মুখোশ খুলে ফেলে চোখে আঙুল দিয়ে প্রকাশ করেছেন তাদের সত্যিকারের স্বরূপ। কালস্রোতে শ বেঁচে থাকবেন কিনা তা নিয়ে ঘোরতর তর্ক উঠলেও সুরজিৎ জানে এ কথা সকলেই বিশ্বাস করেন যে নাট্যকারের দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন একাগ্র নিষ্ঠার সঙ্গে। প্রমাণ করেছেন সত্যিই এ যুগে অসির চেয়ে মসীর শক্তি বেশী। কি নির্মম তাঁর কলমের চাবুক!

হায় বাংলাদেশ! যেখানে জন্মেছেন বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্রের মত দেশবরেণ্য ঔপন্যাসিক, রবীন্দ্রনাথের মত বিশ্বকবি, গিরিশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলালের মত অনন্যসাধারণ নাট্যকার, সেই দেশে আর নাট্যকার জন্মাল না। বছরের পর বছর ধরে পেশাদার মঞ্চে অভিনীত হল কয়েকজন ব্যবসায়ী লেখকের নাটক। যারা কোনরকমে কথার পিঠে কথা সাজিয়ে, থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ আর নামকরা অভিনেতৃদের মন জুগিয়ে নাটক লিখে গেলেন।

তাই পেশাদার মঞ্চ আজও ঘুরছে, কিন্তু এগোল না এক পাও।

সুরজিতের মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে। সে নিজে কি লিখতে পারবে নাটক যাতে থাকবে মানুষের দুঃখ-সুখের কথা, হতে পারবে সত্যিকারের নাট্যকার যার লেখা পড়ে নতুন আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে ভাবীকালের পাঠক!

হাতের সিগারেটটা নিভিয়ে দিয়ে সুরজিৎ খাটে শুয়ে পড়ে।

শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ে যেখানে দোতলা বাসগুলো থামে তারই সামনে দিয়ে যে ছোট গলিটা এগিয়ে গেছে সেখানেই রতীন ঘোষালের ভাড়া বাড়ি। সারা দুপুর ঘুমিয়ে সবেমাত্র চায়ের পেয়ালা হাতে ইজিচেয়ারে বসেছেন এমন সময় সুরজিৎ ঘরে ঢুকল। রতীন ঘোষাল সাদরে অভ্যর্থনা করলেন।

এস ব্রাদার, এই তক্তাপোশের ওপরেই বস।

বাড়ির অন্দরমহলের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বললেন আর এক কাপ চা নিয়ে আসার জন্যে। সুরজিতকে জিজ্ঞেস করলেন, মিষ্টিটিষ্টি কিছু আনাব নাকি?

সুরজিৎ সোজা অফিস থেকেই এসেছে, খিদেও পেয়েছিল বেশ। তবু মুখে বলে, না, এখন থাক্।

রতিবাবু প্রসঙ্গান্তরে গেলেন : নাটকখানি দিব্যি লিখেছ ভায়া, পড়লাম। বেশ লাগল। পার্ট কপি করতে থিয়েটারে দিয়ে দিয়েছি।

সুরজিৎ ভেবেছিল নাটক সম্বন্ধে আজ তাকে অনেক রকম সমালোচনাই শুনতে হবে, মনে মনে শঙ্কিতও হয়েছিল পাছে মাথার ঠিক রাখতে না পেরে ঝাঁজালো তর্ক করে বসে, কিন্তু তার বদলে নাটক একেবারে কপি হতে গেছে শুনে খুশী হল, তবু জিজ্ঞেস করল, আপনি যে বলেছিলেন কিছু অদলবদল করবেন ?

রতিবাবু নস্যি গুঁজে গুঁজে নাকটা বোঝাই করে বললেন, ভেবে দেখলাম এখন করে কোন লাভ হবে না। বরং রিহার্সালের সময় প্রয়োজনবোধে একটা কাঁচি আর খানিকটা গঁদের আটা নিয়ে বসলেই হবে।

তার মানে ?

কোথাও কাঁচি দিয়ে কাটো, আর কোথাও আঠা দিয়ে সাঁটো। একে বলে এডিটিং। এই করে এখানে পত্রিকা চলে, নাটক নামানো হয়। অনেকটা দর্জীর কাজ।

সুরজিৎ একটু হাসে : কাকে কি পার্ট দেবেন ভেবেছেন নাকি ?

মোটামুটি ঠিক করে রেখেছি, হৃষীবাবুকে বলেওছি। তবে উনি অ্যাপ্রুভ না করলে তো আর কিছু হবে না।

কবে থেকে রিহার্সাল ফেলবেন ?

সামনের সোমবার, সন্ধ্যে সাতটায়। ততদিনে অন্ততঃ প্রথম অঙ্কের কপি পেয়ে যাব।

সুরজিৎ অন্য কথা ভাবছিল, হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, এত অল্প সময়ের মধ্যে কি নাটক নামানো যাবে ?

রতিবাবু অভিজ্ঞতার হাসি হাসলেন : পেশাদার বোর্ডে তাই হয়। পনের দিনের বেশী রিহার্সাল হয় না। অবশ্য প্রথম ক নাইট স্টেজ রিহার্সালই হয়, সত্যিকারের পারফরমেন্স হয় না। সে কথা সবাই জানে, এমন কি দর্শকরাও। যাঁরা প্রথম দিকে নাটক দেখতে আসেন, তাঁরা আবার পরেও এসে দেখে যান নাটক কতটা দানা বাঁধল।

এর চেয়ে একটু আগে থেকে রিহার্সাল দিয়ে তৈরি হয়ে নামলে ক্ষতি কি ?

সে তো আমরা বুঝি, কিন্তু মালিকরা বোঝেন কই। যখন চলতি নাটকের নাভিশ্বাস ওঠে, দর্শকরা জবাব দিয়ে যায়, তখনই ভাবা হয় নতুন নাটক নামানোর কথা। সে সময় আর ভাববার অবকাশ থাকে না। তা ছাড়া আজকের দিনে কস্ট্ অফ প্রডাক্শানও যে বেড়ে গেছে খুব বেশী। . বেশীদিন বোর্ড কামাই দিলে পোষাবে কেন ?

সুরজিৎ জোর দিয়ে বলে, তা হলে অন্য সময় রিহার্সাল করুন—সারারাত ধরে, কিংবা দুপুরবেলা।

রতিবাবু তাতেও হাসেন : আর্টিস্ট কোথায় পাবে ভায়া, সিনেমার স্যুটিং কামাই করে তো কেউ আর নাটকের রিহার্সাল দিতে আসবে না।

সবাই তো ফিল্ম-আর্টিস্ট নয় !

অন্যরা অফিসে চাকরি করে। শুনতেই পেশাদার মঞ্চ, শুধু এইটাকেই পেশা করলে কারুর বাড়িতেই দুবেলা হাঁড়ি চড়বে না। আগেকার দিনে সুবিধে ছিল অনেক—আমি বলছি শিশিরকুমারের সময়ও। তখন মঞ্চের শিল্পীরা বেশীর ভাগ কাজ করতেন মঞ্চে। শুধু তাই নয়, ভালবাসতেন পাদপ্রদীপের সামনে এসে দাঁড়াতে। তখনকার দিনে দেখেছি অল্প সময়ের মধ্যে নাটক নামলেও রিহার্সাল হত পুরো দমে। এমনও দিন মনে পড়ে যখন বড়বাবু সকাল থেকে নতুন নাটকের মহলা নিচ্ছেন, দুপুরবেলা ঘণ্টাখানেকের জন্যে শিল্পীরা ছুটি পেল মাংস-ভাত খাবার। থিয়েটারেই তা রান্না হয়েছে, আবার দুপুর থেকে চলল রিহার্সাল, বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। তার পরেই যে যার সাজঘরে ঢুকত, সেজেগুজে নামত সাড়ে ছটায় চলতি নাটকে। এতটুকু বিরক্তি কোনদিন দেখি নি তাদের মুখে। সেইজন্যেই সেকালের নাটকে আমরা দেখেছি জীবন্ত অভিনয়। যে অভিনয়ের গুণে সাধারণ নাটকও অসাধারণ মনে হয়েছে।

সেকালের কথা শুনতে সুরজিতের ভাল লাগছিল, কিন্তু রতিবাবু নিজেই থামিয়ে দেন : চল ব্রাদার, থিয়েটারেই যাওয়া যাক। আজ বেস্পতিবার, শো আছে,

সকলের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। সোমবার যাতে পুরোদমে রিহার্সাল হয় তার ব্যবস্থা করা দরকার।

চলুন।

দু মিনিট। আমি গায়ে একটা জামা চড়িয়ে আসি।

সুরজিতের মনে হয় রতিবাবু লোকটি ভাল, বেশ প্রাণখোলা কথাবার্তা। সে যুগের মানুষ হলেও এ যুগের ভাল জিনিসটা দেখার চোখ তাঁর আছে। তা না হলে সুরজিতের আধুনিক লেখাকে তিনি কিছুতেই পছন্দ করতে পারতেন না। সবচেয়ে ভাল লাগে রতিবাবুর হাসিভরা মুখ, কোন সময়ই যেন তা বিষণ্ণ হয় না। অথচ ঘরের চেহারা দেখে মনে হয় না যে তাঁর আর্থিক অবস্থা খুব সচ্ছল। বহুদিন রঙ-না-পড়া ছোট্ট ঘর, নড়বড়ে তক্তাপোশের ওপর একটা তেলচিটে পাটি, ময়লা ছেঁড়া শাড়ি দরজায় পরদা হয়ে ঝুলছে। সব কিছুর মধ্যেই যেন অভাবের আভাস সুস্পষ্ট।

ধুতি আর পাঞ্জাবি পরে বেরিয়ে এলেন রতীন ঘোষাল। বললেন, এটুকু পথ বেড়াতে বেড়াতেই চলে যাব, কি বল ব্রাদার ?

বেশ তো।

দুজনে তারা বেরিয়ে পড়ে। শ্যামবাজারের পাঁচমাথা পেরিয়ে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট দিয়ে হাঁটতে থাকে দক্ষিণে। বেশ ভিড়। অফিস-পাড়া থেকে আসা লোক-ভর্তি ট্রাম-বাস এখানে এসে খালি হয়ে যাচ্ছে। চারদিকে মানুষ। কেউ যাচ্ছে বাড়ি, কেউ ঢুকছে সিনেমায়। কেউ বা দাঁড়িয়ে আছে দোকানের সামনে।

এরই মধ্যে রতীন ঘোষাল একসময় বললেন, এখন তোমাদেরই আসা দরকার এই থিয়েটার লাইনে। তোমরা নবীন, মনে উৎসাহ আছে, চাবুক মেরে যদি বেতো ঘোড়াকে ছোটাতে পার।

রুবী থিয়েটারে আজ বিক্রি নেই বললেই হয়। অতি অল্প দর্শক। বিনা পয়সায় লোক ডেকেও হলের অর্ধেকটা ভরানো যায় নি। অবশ্য আজ কারুরই সেদিকে খেয়াল নেই, সকলেই ব্যস্ত নতুন নাটককে নিয়ে। সুরজিতের মনে হল হঠাৎ সে যেন এ থিয়েটারের হিরো হয়ে পড়েছে, দরোয়ান চাকর থেকে শুরু করে টিকিট বিক্রির বাবুরা পর্যন্ত তাকে দেখিয়ে ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে। রমেন চৌধুরী এক মিনিটের জন্যেও তাকে কাছছাড়া করতে চাইছে না। দু-একজন চুনোপুঁটি শিল্পী এরই মধ্যে কোন সুযোগে এসে ঢিপ ঢিপ করে প্রণাম করে গেল। বড় মজা লাগছিল তার। রতিবাবু মালিকের সঙ্গে দেখা করতে ওপরে চলে গেলে সুরজিৎ নীচেই বসে থাকে। ভাবে, বছর কয়েক আগের কথা, যখন সে টিকিট কেটে এই থিয়েটার প্রাঙ্গণে পায়চারি করতে করতে দেখত এক একজন শিল্পী আসছে—কেউ বা গাড়িতে কেউ বা রিক্শায়, অন্যের কৌতুহল-ভরা দৃষ্টি এড়িয়ে চট্ করে গলি দিয়ে ঢুকে যেত অন্দর-মহলে। আর এখন, কদিন বাদেই তার নিজের নাটক এখানে অভিনয় হবে।

শুনুন—

সুরজিতের চিন্তাস্রোত ছিঁড়ে যায়।

জানলার বাইরে থেকে একটি মেয়ে তাকে ডাকে, অপরিচিতা হলেও একে সে দেখেছে রুবী থিয়েটারের চলতি নাটকে অভিনয় করতে।

আমায় কিছু বলছেন ?

মেয়েটি সহজ গলায় বলে, আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে, ভেতরে আসব ?

আসুন।

মেয়েটি ঘরে ঢোকে, সুরজিৎ উঠে দাঁড়ায়। এতটুকু সময় নষ্ট না করে মেয়েটি সরাসরি জিজ্ঞেস করে, শুনলাম পরের নাটকের নাট্যকার আপনি ?

এখনও তাই কথা আছে।

শুনলাম তাতে নাকি আমার কোন পার্ট নেই ?

সুরজিৎ চোঁক গেলে : সে বিষয়ে আমি ঠিক কিছু জানি না।

মেয়েটি চোখ দুটো ছোট করে : শুনলাম আর্টিস্ট সিলেক্শান করছেন আপনি ?

তা তো নয়, পরিচালক যাকে নেবেন—

মেয়েটি সুরজিৎকে কথা শেষ করতে দেয় না : আগে থিয়েটারে তাই নিয়ম ছিল, পরিচালকরাই শিল্পী বেছে নিতেন। তাতে আমাদেরও সুবিধে ছিল। কার কি রকম অভিনয় ক্ষমতা তা তাঁরা জানতেন। এবার থেকে শুনছি আপনার পছন্দমত আর্টিস্ট নেওয়া হবে। বেশ তো, আমাকে দিয়ে পার্ট বলান, পারি কিনা দেখুন। তার আগেই আপনি আমাকে বাদ দিয়ে দিলেন কি করে?

সুরজিৎ বিব্রত বোধ করে : সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন, কেউ আপনাকে ভুল বুঝিয়েছে, এখনও কাউকে পার্ট দেওয়া হয় নি, সোমবার প্রথম রিহার্সাল হবে।

মেয়েটি হাসে—শ্লেষভরা হাসি : সে রিহার্সালে আমাদের ডাকা হয় নি—যারা পার্ট পাবার তারা পেয়ে গেছে।

ও, তাই নাকি! আমি বরং রতিবাবুকে জিজ্ঞেস করে রাখব।

মেয়েটি এক নিঃশ্বাসে বলে যায় : আমার নাম বীথি সেন, মঞ্চে অভিনয় করছি তিন বছর। ছবিতে পাঁচ বছর, অ্যামেচারে করি না। আমার রোজগারের ওপর নির্ভর করছে সমস্ত সংসার, আমার দুই ছেলে, মা, বুঝতেই পারছেন। কলকাতার শহরে কষ্টেসৃষ্টে বেঁচে থাকতেও এই পাঁচটা প্রাণীর জন্যে কতগুলো টাকা দরকার?

সুরজিৎ বাধা দেয় : আর কিছু বলতে হবে না, আমি রতিবাবুকে—

বীথি সেনের চোখে জল এসে পড়ে, মোছবার সে চেষ্টা করে না। বলে যায়, এই থিয়েটারেই যা আমার বাঁধা রোজগার। এইটে চলে গেলে চোখে অন্ধকার দেখতে হবে। দুটি অপোগণ্ড শিশু, বৃদ্ধা মা, তাদের তো বোঝাবার কিছু নেই। দুবেলা তাদের খাওয়াতে হবে। খাওয়াবই বা কিভাবে তাও আপনি জানেন, আমি তো নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেয়েছিলাম, আপনারা দাঁড়াতে দিলেন না।

আমি?

যদি পা হড়কায় আমাকে নিয়েই পরের নাটক লিখবেন, কি বলুন? লোকে দেখবে, হাততালি দেবে। বোধ হয় আপনার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাচ্ছি, চলি। এর পর আমার সীন আছে।

বীথি সেন ঘর থেকে বেরিয়ে গ্রীনরুমের দিকে চলে গেল। ঝড়ের মত এসে সুরজিতের মনের আনন্দোজ্জ্বল দেওয়ালির আলো নিভিয়ে দিয়ে চলে গেল।

[ক্রমশ]

লঘু বর্ষণ ঃ বৃত্ত

অসিতকুমার

কড়াইশুঁটি, কড়াইশুঁটি ছোট্ট সবুজ দানা
তোমায় খাবে বলে এখন নাচছে পাখির ছানা।
পাখির ছানা, পাখির ছানা জানতে পার কী?
কাটব তোমায় বলে আমার বঁটি শানাচ্ছি।
লোহার বঁটি, লোহার বঁটি, ভাবছ তুমি কি?
তোমার বুকে ছুরি হবার মন্ত্র কি ভাবছি।

'সে'

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

টেকোমাথা বুড়ো গল্প বলছে :

"তারপর ওদিকে বড়মন্ত্রী তো রাজকন্যার গুলিসুতো খেয়ে ফেলেছে। কেউ কিছু জানে না। ওদিকে রাক্ষসটা করেছে কি, ঘুমুতে ঘুমুতে হাঁউ মাঁউ-কাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ বলে হুড়মুড় করে খাট থেকে পড়ে গিয়েছে। অমনই ঢাক ঢোল সানাই কাঁসি লোক লস্কর সেপাই পল্টন হৈ হৈ রৈ রৈ মার-মার কাট-কাট— এর মধ্যে হঠাৎ রাজা বলে উঠলেন, পক্ষিরাজ যদি হবে, তা হলে ল্যাজ নেই কেন ? শুনে পাত্রমিত্র ডাক্তার মোক্তার আক্কেল মক্কেল সবাই বললে, ভাল কথা ! ল্যাজ কি হল ? কেউ তার জবাব দিতে পারে না। সব সুরসুর করে পালাতে লাগল।"

আশা করি রসিক পাঠককে বলে দিতে হবে না যে এই অংশটি স্বনামখ্যাত সুকুমার রায়ের 'হ-য-ব র-ল' থেকে গৃহীত হয়েছে। এই স্বপ্নমঙ্গলের কাহিনী রচনা করে সুকুমার রায় অবিনাশী গৌরবের অধিকারী হয়েছেন। জাগ্রত বাস্তব জগতের বিচারে এ কাহিনী উদ্ভট, খাপছাড়া বিশুদ্ধ গাঁজা মাত্র। কিন্তু না, এ হল প্রতিভার জাগ্রত স্বপ্নের ফসল। সুকুমার রায় সেই বিরল প্রতিভা।

বিখ্যাত অঙ্কবিদ্ চার্লস ডজ্সনের কথা আমরা মনে রাখি না, কিন্তু 'লুই ক্যারল' এই ছদ্মনামে যে অপূর্ব খাপছাড়া গ্রন্থ—'অ্যালিস ইন্ ওআণ্ডারল্যাণ্ড' তিনি রচনা করেছেন, তা অমর হয়ে আছে ও থাকবে। জগতের কোটি কোটি শিশু এই বই পড়ে আনন্দ পেয়েছে ও পাবে। এবং সম্ভবতঃ শিশুদের জনকজননীরাও এই বই পড়ে আনন্দ পান।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, সুকুমার রায়, পরশুরাম এই জাতীয় উদ্ভট রচনায় খ্যাতি অর্জন করেছেন। ইংরেজিতে লুই ক্যারল, এডোঅর্ড লীয়র, ইউজিন ফীল্ড, অগডেন ন্যাশ 'ননসেন্স' কবিতা রচনা করেছেন। উদ্ভট স্বপ্নমঙ্গলের কথা ও এলোমেলো কবিতা রচনা করা সোজা নয়, তার জন্য প্রয়োজন গভীর কল্পনা, অবাধ উৎকল্পনা ও মনস্তত্ত্বে অভিজ্ঞতা। ইম্যাজিনেশন ও ফ্যান্সি, দুয়ের উপরই দখল চাই। অতিশিষ্ট অতিভদ্র নিয়মশাসিত প্রথাবদ্ধ সংসারের পেষণে যখন মন বিদ্রোহ করতে চায়, খেপে যেতে ইচ্ছে করে, তখন এই ননসেন্স ও ফ্যাণ্টাসির জগতে, খাপছাড়া ও উৎকল্পনার রাজ্যে পালিয়ে যাবার তীব্র বাসনা জাগে।

এই স্বপ্নমঙ্গলের কথায় রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ছিল সমগ্র জীবনব্যাপী। "হিং টিং ছট" ('সোনার তরী') থেকে "গল্পসল্প" তার পরিচয়স্থল।

রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় রচনার মধ্যে 'সে' একটি আশ্চর্য রচনা। 'সে' প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে, ইং ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের সর্ববিধ সৃষ্টিতে তাঁর সমগ্র জীবনে অস্বীকৃত ছায়াময় জগতের আভাস ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের ছবিতে, গদ্য-কবিতায়, 'তিনসঙ্গী' গল্পগ্রন্থে স্থূল অসুন্দর ভয়ঙ্কর অন্ধকার ছায়ালোকের ও অবহেলিত জগতের স্বীকৃতি লক্ষ্য করা যায়। ছবিতে যে অ-রূপ জগতের রূপ ফুঠে উঠেছে, তা এতদিনের রবীন্দ্র-সাহিত্যে অস্বীকৃত ছিল। আর "তিনসঙ্গী" গল্পে বিজ্ঞান-উপাদানের সমাবেশ ও বিজ্ঞান-মনস্কতা লক্ষ্য করা যায়। এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বপরিচয়' (১৯৩৭) লেখেন ও বিজ্ঞান-কর্মীদের সান্নিধ্যে আসেন। 'সে' গ্রন্থে বিজ্ঞান-মনস্কতা ও খেয়ালিপনা দুই-ই আছে। 'সে' গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ উৎসর্গ করেছেন বিজ্ঞানী-অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে। এটিও এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

॥ ২ ॥

উৎসর্গ-পত্রে রবীন্দ্রনাথ নিজেই 'সে' গ্রন্থের পরিচয় দিয়েছেন। সেটি আলোচনা করলে এর স্বরূপ বুঝতে সহায়তা করবে বলে আমার ধারণা।

কবি বলেছেন :

'আমারো খেয়াল-ছবি মনের গহন হতে
ভেসে আসে বায়ুস্রোতে।
নিয়মের দিগন্ত পারায়ে
যায় সে হারায়ে
নিরুদ্দেশে
বাউলের বেশে।
যেথা আছে খ্যাতিহীন পাড়া
সেথায় সে মুক্তি পায় সমাজ-হারানো লক্ষ্মীছাড়া।
যেমন-তেমন এরা বাঁকা বাঁকা
কিছু ভাষা দিয়ে কিছু তুলি দিয়ে আঁকা,
দিলেম উজাড় করি ঝুলি।
লও যদি লও তুলি,
রাখো ফেলো যাহা ইচ্ছা তাই—
কোনো দায় নাই।'

মনের গহন থেকে ভেসে-আসা খেয়াল-ছবির মিছিল 'সে' গ্রন্থে দেখা গিয়েছে। ফসল কাটার পর শূন্য মাঠে যে তুচ্ছ আগাছার ফুল ফোটে, রবীন্দ্রনাথ 'সে' গ্রন্থকে তার সঙ্গে উপমা দিয়েছেন। ফ্যাণ্টাসির ধর্ম তিনি এর উপরে আরোপ করেছেন, নিরুদ্দেশ বাউলের বেশে এ ভেসে বেড়ায়। খেয়ালী লঘু কল্পনার উদ্দেশ্যহীন খাপছাড়া সঞ্চরণ বলেই একে তিনি মনে করেন।

'সে' কি কেবল ছোটদের জন্য লিখিত? 'সে' পড়ে তা মনে হয় না। শিশুর অবাধ বিস্ময় ও কৌতূহলের খোরাক 'সে' জোগায়, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে যে বিজ্ঞান-মনস্কতা 'সে' গ্রন্থে আছে, তা সম্পূর্ণরূপে শিশুবোধ্য নয়। শিশুর কল্পনা-সীমান্ত ছাড়িয়ে গেছে 'সে'। বিশ্বসৃষ্টিকে অবলম্বন করে শেষের দিকের কয়েকটি অধ্যায়ে যে বক্তব্য উপস্থিত করা হয়েছে, তা প্রতিভার স্পর্শে অ-সাধারণত্বের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।

॥ ৩ ॥

'সে' গ্রন্থের প্রধান চরিত্র তিনটি—আমি (গল্পকথক), তুমি (গল্পের শ্রোতা অর্থাৎ পুপুদিদি) আর সে (অনামিকতার আচরণে আবৃত)। 'সে' মানুষটি সম্পূর্ণ খেয়ালী, বলা যায় উদ্ভট ও খাপছাড়া। একে নিয়েই যত গল্প। তার চরিত্রে যত হাস্যকর উপাদান আছে বা থাকা উচিত ছিল, সে সবকে নিয়ে সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য গল্প 'আমি' খাড়া করেছেন।

'সে' গ্রন্থের সূচনায় প্রথম পরিচ্ছেদে গল্পকথক 'আমি' মানুষের অন্যতম আদিম প্রবৃত্তি—গল্প শোনার প্রবৃত্তির কথা উল্লেখ করেছেন। গল্পরসের সঙ্গে এখানে মিলেছে উদ্ভটরস আর বিজ্ঞানরস; সবটা মিলে এক অপূর্ব সৃষ্টি। 'সে' গ্রন্থ রচনার কৈফিয়ত দিয়েছেন এই বলে, "অনেক গল্প শুরু হয়েছে এই ব'লে যে, এক যে ছিল রাজা। আমি আরম্ভ ক'রে দিলুম, এক যে আছে মানুষ। তার পরে লোকে যাকে বলে গপ্‌পো, এতে তারও কোনো আঁচ নেই। সে মানুষ ঘোড়ায় চ'ড়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে গেল না। একদিন রাত্রি দশটার পর এল আমার ঘরে। আমি বই পড়ছিলুম। সে বললে, দাদা, খিদে পেয়েছে।"

এই ভূমিকা থেকেই বোঝা গেল এই গল্প বাঁধা-ধরা পথে চলবে না। 'সে' পরিচিত সংসারের লোক, তার খিদে পায় এবং খায় ভাল। এমন একটি ঘোরতর সংসারী চরিত্রকে নিয়েই যত কাণ্ড।

প্রথম থেকে একাদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত কাহিনী 'সে'-র টানে চলে এসেছে। 'সে'-র নানা কীর্তিকলাপের সরস বর্ণনা পাই। 'আমি' ও 'পুপেদিদি'—দুজনে মিলে 'সে'-কে নিয়ে কত মজাই করেছেন। গোড়াতেই লেখক বলেছেন, এ রূপকথা নয়। "এ তো রাজপুত্তুর নয়, এ হল মানুষ, এ খায়-দায় ঘুমোয়, আপিসে যায়, সিনেমা দেখবারও শখ আছে। দিনের পর দিন যা সবাই করছে তাই এর গল্প।...তার পরে? তার পরে এই রকমই আরও কত কী—বড়োবাজার থেকে বহুবাজার, বহুবাজার থেকে নিমতলা।"

গল্পকথক বলছেন, "আমাদের এই 'সে' পদার্থটি

ক্ষণজন্মা বটে ; এমনতরো কোটিকে গোটিক মেলে। মিথ্যে কথা বানাতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিভা। আমার আজগবি গল্পের এত বড়ো উত্তর-সাধক ওস্তাদ বহু ভাগ্যে জুটেছে। গল্প-প্রশ্নের উত্তরপাড়ার এই যে মানুষ, মাঝে মাঝে একে পুপুদিদির কাছে এনে হাজির করি—দেখে তার বড়ো চোখ আরও বড়ো হয়ে ওঠে। খুশি হয়ে বাজার থেকে গরম জিলিপি এনে খাইয়ে দেয়।—লোকটা অসম্ভব জিলিপি ভালোবাসে, আর ভালোবাসে শিকদার পাড়া গলির চম্‌চম্‌। পুপুদিদি জিগেস করে, তোমার বাড়ি কোথায়। ও বলে, কোন্‌নগরে, প্রশ্নচিহ্নের গলিতে।"

এই অনামিক অথচ অতি-প্রত্যক্ষ 'পয়লা নম্বরের মানুষ' সে-কে নিয়েই যত গল্পের সূচনা। হুঁহাউ দ্বীপের ইতিহাস, শিবাশোধন সমিতির রিপোর্ট, গেছোবাবা, সে-র বরযাত্রা ও বিয়ে, তাস্‌মানিয়ার শ্রীযুক্ত কোজুমাচুকু ও শ্রীমতী হাঁচিয়েন্দানি কোরুস্কুনা, আধুনিক বাঘেদের প্রগতি-আন্দোলন, সে-র চেহারাহারানো, স্বামীস্বত্ব-দাবিতে পাতুখুড়োর গিন্নির মামলা, সে-র মগজে বাঁদরের মগজ, খরগোশ-ঘণ্টাকর্ণ, শুক-সারীর দ্বন্দ্ব—পর পর এই এগারোটি কাহিনীতে গল্পকথক আমাদের ফ্যাণ্টাসির রাজ্যে নিয়ে গেছেন। এর মধ্যে যোগসূত্র আদি ও অকৃত্রিম 'সে'। তাই কখনই বাস্তব জগৎ থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় না। 'সে' এই জগতেরই লোক, তাকে নিয়ে রঙ্গ করতে করতে গল্পকথক স্ফূর্তিতে গাঁজার গল্প রচনা করেছেন। শিশুর জগতে 'সে' এক নতুন আনন্দের বার্তাবহ হয়ে এসেছে। পুপেদিদির 'পরে গল্পগুলির প্রতিক্রিয়াতেই তার পরিচয় পাওয়া যায়।

এরপর দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত শেষাংশে বিজ্ঞান-মনস্কতার পরিচয় নাই। এখানে অলৌকিক রসের সঙ্গে মিশেছে বিজ্ঞান-কৌতূহল। দ্বাদশ পরিচ্ছেদে বিশ্বসৃষ্টির বিজ্ঞান-কাহিনীকে সুর-বেসুরের দ্বন্দ্ব বর্ণনচ্ছলে গল্পকথক উপস্থিত করেছেন। 'পত্রপুটে'র "পৃথিবী" কবিতায় সৃষ্টিকাহিনীর যে অপরূপ কবিতামূর্তি, এখানে তারই অলৌকিক ফ্যাণ্টাসিপ্রতিমা। শেষে পাই কবির নিজস্ব বক্তব্য: "আমার মতটা বলি। দুঃশাসনের আস্ফালনটা পৌরুষ নয়, একেবারে উল্টো। আজ পর্যন্ত পুরুষই সৃষ্টি করেছে সুন্দর, লড়াই করেছে বেসুরের সঙ্গে। অসুর সেই পরিমাণেই জোরের ভান করে যে পরিমাণে পুরুষ হয় কাপুরুষ। আজ পৃথিবীতে তারই প্রমাণ পাচ্ছি।" শেষ মন্তব্যটি প্রফেটের উক্তি বলে মনে করা যায়। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে 'অধ্যাপন-সরোবরের গভীর জলের মাছ' মাস্টারমশাইকে উপলক্ষ করে কথক সৃষ্টিকাহিনী বর্ণনা করেছেন—এবার জীবের জন্ম ও বিবর্তনের পালা—মনের সঙ্গে মাংসের ঠেলাঠেলি মারামারি—মনোবাহী মানুষ সৃষ্টির শেষতম অধ্যায়। চতুর্দশ পরিচ্ছেদে কিশোর সুকুমারকে কেন্দ্র করে গল্পের বুনুনি—জীবের বিবর্তনের কথা এল স্বপ্নবর্ণনার মাধ্যমে—গাছপালা নদীর সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে।

গল্পের সমাপ্তি হয়েছে সুকুমারের বিদায়পত্রে। সে লিখেছে : "য়ুরোপে চন্দ্রলোকে যাবার আয়োজন চলেছে। যদি সুবিধা পাই যাত্রীর দলে আমিও নাম লেখাব। আপাতত পৃথিবীর আকাশ-প্রদক্ষিণে হাত পাকিয়ে নিতে চাই।...ছেলেবেলা থেকে অকারণে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকাই আমার অভ্যাস। ঐ আকাশটা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ যুগের কোটি কোটি ইচ্ছে দিয়ে পূর্ণ। এই বিলীয়মান ইচ্ছেগুলো বিশ্বসৃষ্টির কোন্ কাজে লাগে কী জানি। বেড়াক উড়ে আমার দীর্ঘনিশ্বাসে উৎসারিত ইচ্ছেগুলো সেই আকাশেই যে আকাশে আজ আমি উড়তে চলেছি।"

'বনবাণী' ও 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থের রচয়িতাকে এখানে চিনে নিতে পারি। দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ পরিচ্ছেদ কাব্যরসে ও গভীর ভাবকল্পনায় সমৃদ্ধ, বিজ্ঞান-মনস্কতায় ও খেয়ালে পরিপূর্ণ। প্রতিভার লীলার এক অভিনব পরিচয়স্থল হয়ে রইল 'সে' গ্রন্থ।

॥ ৪ ॥

আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথের ছবির সঙ্গে এই গ্রন্থের গভীর যোগ রয়েছে। 'সে' রচনার পূর্বেই বিদেশে রবীন্দ্রচিত্রের প্রদর্শনী হয়েছে ও বিদেশী চিত্ররসিকদের সমাদর লাভ করেছে। রবীন্দ্র-সাহিত্য মূলতঃ আলোর জগৎ, রবীন্দ্র-চিত্র অন্ধকারের জগৎ। সৃষ্টিসূচনায় যে অন্ধকার ছিল, তার বিবরণ 'সে' গ্রন্থে কেবল রঙে নয়, রেখায় ধরা পড়েছে। রবীন্দ্রকৃত রেখাচিত্রগুলি 'সে'-র অন্যতম আকর্ষণ। মলাটের রঙিন পেনসিল-ড্রয়িং, 'সে', 'পাল্লারাম', ও 'পুপু'—জলরঙে আঁকা এই তিনটি ছবি এবং বহুসংখ্যক পেনসিল-ড্রয়িং দেখলে আর সন্দেহ থাকে না যে অন্ধকারের জগৎ এখানে কবির নিকট সমাদৃত হয়েছে। বিশেষ করে এতে যে সব পশুর ছবি আঁকা হয়েছে, তা যে রকম প্রথাচ্যুত দুঃসাহসিক কল্পনানির্ভর, তা রবীন্দ্রনাথের এক অন্য পরিচয় বহন করে। 'গাণ্ডিসাঙ্‌তুং', 'গেছো বাবা', 'ঘণ্টাকর্ণ', 'হিংস্রজাতের ঘণ্টাকর্ণ', 'জিব-বেরকরা কাঁটাওয়ালা', 'পাতুখুড়োর গিন্নি', 'শ্রীমতী হাঁচিয়েন্দানি কোরুস্কুনা', 'পাঁড়েজি', 'স্মৃতিরত্নমশায়', 'কনে-দেখা মাঝরাত্তিরের অন্ধকারে' প্রভৃতি ড্রয়িংগুলি এর প্রমাণ।

রামেন্দ্রসুন্দরের জীবন-দর্শন

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

প্রাচীন ভারতে 'জিজ্ঞাসা' কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। 'জিজ্ঞাসা' কথাটির অর্থ 'জানিবার ইচ্ছা', কিন্তু নানা জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে কৌতুহলই জিজ্ঞাসা নয়। সত্যকে দর্শন করিবার জন্য শ্রদ্ধাবান ব্যক্তির যে অবিচলিত নিষ্ঠা, তাহাকেই বলে জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসার একজন নিত্য সহচরী আছেন, তাহার নাম শুশ্রূষা। এই শুশ্রূষার অর্থ কিন্তু সেবা নয়, সত্যদর্শী আচার্যের নিকট হইতে শ্রবণ করিবার ইচ্ছা। মনু বলিয়াছেন, 'মানুষ যেমন খনিত্রের দ্বারা খনন করিতে করিতে জল প্রাপ্ত হয়, তেমনই শুশ্রূষু শিষ্য সমস্ত গুরুগত বিদ্যা প্রাপ্ত হন।'

'যথা খনন্ খনিত্রেণ নরো বার্য্যধিগচ্ছতি।
তথা গুরুগতাং বিদ্যাং শুশ্রূষুরধিগচ্ছতি॥'

এই জিজ্ঞাসা ও শুশ্রূষা যাহার আছে, তিনি কোন না কোনদিন সত্যকে দর্শন বা উপলব্ধি করিবেনই। আমরা যাহাকে 'দর্শন' বলি, তাহার অর্থ এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। কেহ কেহ বলেন, 'দর্শন' অর্থে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী বোঝায়। এই অর্থে অবশ্য প্রত্যেক সাহিত্যিক বা প্রত্যেক মনস্বী ব্যক্তিই দার্শনিক। ইংরেজিতে কিন্তু 'ফিলজফি' কথাটির মানে জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ (Love of Knowledge)। চিন্তাশীল মানুষের মনে বিভিন্ন সময়ে কত প্রশ্ন জাগে যাহার সমাধান মানুষ সহজে খুঁজিয়া পায় না। বিজ্ঞান কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ সত্য মানিয়া লইয়া তাহার যাত্রা শুরু করে, কিন্তু মানুষের অবাধ্য মন তো বিনা প্রমাণে কিছুই মানিতে চায় না। তাই বিজ্ঞান যাহা বিনা বিচারে মানিয়া লয়, 'ফিলজফি' উহার প্রমাণ বা অপ্রমাণের ভার গ্রহণ করে। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দেশে 'ফিলজফি' প্রধানতঃ বিচার-বিশ্লেষণের সাহায্যেই সত্যকে নিরূপণ করিতে চেষ্টা করে, তাই পাশ্চাত্ত্য দর্শনের উদ্দেশ্য প্রধানতঃ মানুষের কৌতুহলের চরিতার্থতা। পক্ষান্তরে ভারতীয় দর্শনের উদ্দেশ্য অপরোক্ষ অনুভূতি, ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি অথবা মুক্তি। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক কি তবে জিজ্ঞাসু নন? ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দিক দিয়া বিচার করিলে অবশ্যই তাঁহাদিগকে 'জিজ্ঞাসু' বলা যায়, কিন্তু মীমাংসা দর্শনের প্রথম সূত্রে যে অর্থে বলা হইয়াছে, 'অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' অথবা বেদান্তদর্শনের প্রথম সূত্রে যে অর্থে বলা হইয়াছে, 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা', সেই অর্থে কিন্তু 'জিজ্ঞাসা'কে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের উৎস বলা চলে না। পাশ্চাত্ত্য দর্শনের উৎস বিস্ময় (অ্যারিস্টটলের মতে বিস্ময় হইতেই জ্ঞানের আরম্ভ, wonder is the beginning of wisdom) অথবা কুতূহল। আবার ভগবদ্-গীতায় যে অর্থে 'জিজ্ঞাসু'কে 'ভগবানের ভজনাকারী' ও 'ভাগ্যবান' বলা হইয়াছে, সে অর্থে প্রতীচ্য দার্শনিকগণ 'জিজ্ঞাসু' নন। গীতার সেই প্রসিদ্ধ শ্লোকটি স্মরণ করুন—

'চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥'

'হে অর্জুন, চারি প্রকার লোক আমার ভজনা করেন, তাঁহারা সকলেই ভাগ্যবান। তাঁহারা হইতেছেন—আর্ত বা পীড়িত, জিজ্ঞাসু, অর্থকামী ও জ্ঞানী।'

'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে 'ঈশোপনিষদ্' হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—

'হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্য-ধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥'

'হে জগৎপালক সূর্য, হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ আচ্ছাদিত আছে, জিজ্ঞাসু আমার দর্শনের জন্য তুমি সেই আবরণ উন্মোচন কর।'

পদার্থ-বিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের নানা শাখায় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শন গভীরভাবে অধ্যয়ন করিয়া রামেন্দ্রসুন্দর

সত্যের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের মধ্যে একটা দ্বৈত সত্তা ছিল, তিনি একদিকে ছিলেন বিচার-বিশ্লেষণে নিপুণ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক, যুক্তিবাদকে আশ্রয় করিয়া তিনি হইয়াছিলেন সংশয়বাদী (sceptic), অজ্ঞেয়বাদী (agnostic) ও ভাববাদী (idealist), অপর দিকে তিনি ছিলেন স্বধর্মনিষ্ঠ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যাতা, 'কর্মকথা' ও 'যজ্ঞকথা'র রচয়িতা। সর্বোপরি, তিনি ছিলেন সহৃদয় সাহিত্যিক ও সাহিত্য-সমালোচক আর তাঁহার প্রকাশভঙ্গীটি ছিল সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নিজস্ব। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক নিবন্ধকেও তিনি হাস্যরসে স্নিগ্ধ ও প্রসাদগুণে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যঙ্গে তীক্ষ্ণতা ছিল, বেদনাবোধ ছিল কিন্তু কোন বিদ্বেষ ছিল না। আবার ভূদেব বা বঙ্কিমের রচনায় যে বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের পরিচয় পাওয়া যায়, রামেন্দ্রসুন্দরের রচনায় তাহার অভাব আছে। উনিশ শতকের শেষ পাদ ছিল প্রত্যয়ের যুগ, কিন্তু বিংশ শতকের প্রথম পাদেই (এমন কি, উনিশ শতকের শেষ দশকে) একটা জিজ্ঞাসা ও সংশয় মনীষীদের চিত্তকে অধিকার করিয়াছিল। আমরা বলিয়াছি, জিজ্ঞাসু রামেন্দ্রসুন্দর প্রধানতঃ ছিলেন যুক্তিবাদী, তিনি যুক্তি-তর্কের সাহায্যে দেখাইয়াছেন যে বৈজ্ঞানিকেরা যাহাকে সনাতন সার্বভৌমিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন (যেমন কালের অনাদিতা, দেশের অসীমতা, জড়ের অনশ্বরতা, শক্তির অবিনাশিতা প্রভৃতি) তাহা সাপেক্ষ, আংশিক ও প্রাদেশিক সত্যমাত্র। হার্বার্ট স্পেন্সারের মূল নীতি বা First Principles-এর তত্ত্ব তিনি প্রবল যুক্তির সাহায্যে খণ্ডন করিয়াছেন। অথচ 'জিজ্ঞাসা'র উৎসর্গ-পত্রে রামেন্দ্রসুন্দরের আর একটি পরিচয় রহিয়াছে। স্বর্গত পিতার উদ্দেশ্যে গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিতে গিয়া তিনি বলিতেছেন—

'দেব গোবিন্দসুন্দর,

পিপাসামাত্র সম্বল দিয়া জীবনের পথে প্রেরণ করিয়াছিলে; ভাগ্যহীন পথিক কোথায় চলিল, দেখিবার জন্য অপেক্ষা কর নাই।

বিষাদের ঘনচ্ছায়ায় সংসার-ক্ষেত্র আবৃত রহিয়াছে, কোটি মানবের হাহাকার সেই অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া ভীত পথিকের ত্রাস জন্মাইতেছে। যে দীপ-বর্তিকা একমাত্র পথ-প্রদর্শক ছিল, কোন্ বিধাতার দারুণ বিধি তাহা অকালে নির্ব্বাপিত করিল।

ভয় নাই, ভয় নাই;—যে স্নেহসিক্ত আশীর্ব্বচন যাত্রারম্ভে উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহার স্মৃতি-প্রেরিত প্রতিধ্বনি আজিকার দিনে অভয়-বাণীর কার্য্য করিবে।

ভয় নাই, ভয় নাই;—কোন্ অদৃশ্য হস্ত কোথায় রহিয়া মঙ্গলময় লক্ষ্য-দেশের নির্দ্দেশ করিতেছে; তাহার অঙ্গুলিস্পর্শ এই অন্ধকারেও স্পষ্টভাবে অনুভব করিতেছি।

পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব নিয়তির বিধানে আবর্ত্তসঙ্কুল জগৎ-প্রবাহের উপরি ক্ষণে ক্ষণে ভাসিয়া উঠে, বুঝিতে পারি, জগন্নিয়ন্তার কোন্ নিয়মে তাহা স্বকার্য্যসাধন অসমাপ্ত রাখিয়া বুদ্বুদের মত অন্তর্হিত হয়, তাহা বুঝিলাম না।

মহাবাহো, তোমার উদ্ধত বাহুদ্বয় কোন্ ঊর্দ্ধদেশের অভিমুখে প্রসারিত ছিল, আমার অজ্ঞানান্ধ নেত্র তাহার আবিষ্কারে সমর্থ হইতেছে না। আমার পূর্ব্বপিতামহ সূরিগণ দিব্য নেত্রে তাহা দেখিতে পাইতেন,—তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।

জীবনদাতা, পিপাসামাত্র সম্বল দিয়া জীবনের পথে প্রেরণ করিয়াছিলে; এই জিজ্ঞাসা সেই পিপাসারই মূর্ত্তিভেদ। ত্বৎপ্রদত্ত সম্বল আজি ত্বদীয় চরণোপ্রান্তে উৎসর্গ করিলাম।'

এই উৎসর্গ-পত্র হইতে রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনে তাঁহার পিতৃদেবের অসামান্য প্রভাবের কথা জানা যায়। আর জানা যায়, তাঁহার পিতৃদেবই তাঁহার জীবনে 'জ্ঞান-পিপাসা'র সঞ্চার করিয়াছিলেন, আলোকবর্তিকারূপে তাঁহাকে অন্ধকারে পথ দেখাইয়াছিলেন। দুঃখকষ্ট-জর্জরিত সংসারে তাঁহাকে অভয় দিয়াছিলেন। রামেন্দ্র-সুন্দর সংসারের পুঞ্জীভূত দুঃখ-বেদনাকে অস্বীকার করেন নাই, এই বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী তাঁহাকে অনেকটা নৈরাশ্যবাদীও (pessimist) করিয়া তুলিয়াছিল, 'বিধাতার দারুণ বিধি' বা 'নিয়তির বিধান' তাঁহার নিকট

ছিল দুর্জ্ঞেয় বা দুরধিগম্য, কিন্তু তাঁহার বিধাতা সগুণ ব্রহ্ম বা Personal God নন, তিনি যাহাকে বিধি বলেন, তাহা বৈজ্ঞানিকের inexorable laws যাহার ফলে শশি-দিবাকরেরও গ্রহ-পীড়ন ঘটিয়া থাকে। অথচ অদৃশ্য হস্তের অঙ্গুলি-স্পর্শ অনুভব করেন যে রামেন্দ্রসুন্দর, মঙ্গলময় লক্ষ্যদেশে বিশ্বাস করেন যে রামেন্দ্রসুন্দর, তিনি নিশ্চয়ই সংশয়বাদী নহেন। তিনি যে 'নিয়তির বিধানে'র কথা বলেন, সে নিয়তিও অন্ধ নয়, সে নিয়তির অর্থই তো নিয়ম, আর সেই নিয়মের দ্বারা যিনি জগৎকে পরিচালিত করেন, তিনিই তো জগন্নিয়ন্তা, কিন্তু তাঁহার বিধান যে মানব-বুদ্ধির অগম্য, 'Mysterious are the ways of Providence', অথবা জগৎটাই একটা সীমাহীন রহস্য, বুদ্ধিতে যাহার ব্যাখ্যা চলে না, 'a riddle, an enigma, an inexplicable mystery।' আবার দেখিতে পাই, ঋষিগণ যে সর্বদা দিব্যদৃষ্টিতে বিষ্ণুর পরম পদ দর্শন করিতেন—

'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ
দিবীব চক্ষুরাততম্'

ইহাও রামেন্দ্রসুন্দরের দৃঢ় প্রত্যয়। তাঁহার নেত্রদ্বয় যে অজ্ঞান-তিমিরে অন্ধ, তিনি যে দিব্যদৃষ্টি লাভ করিতে পারেন নাই, এ কথা তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীকার করিয়াছেন, এইখানেই তিনি বৈদিক সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী।

'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে যে রামেন্দ্রসুন্দরকে দেখিতে পাই, তিনি কিন্তু কোথাও দিব্যদৃষ্টির কথা বলেন নাই। তিনি সত্যকে লাভ করিয়াছেন বুদ্ধির দ্বারা, বোধি বা প্রজ্ঞার (intuition) দ্বারা নয়। সত্যকে লাভ করিয়াছেন, কারণ, মানুষ বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিতে করিতে এমন একটা অবস্থায় উপনীত হয় যখন তাঁহার দৃষ্টি হইতে সহসা অন্ধকার যবনিকা অপসারিত হয়, জিজ্ঞাসু তখন জ্ঞানী হইয়া যান, জ্ঞানী তখন ভক্ত হইয়া পড়েন। আর এইজন্যই ভগবান জিজ্ঞাসুকে তাঁহার ভজনাকারী বলিয়াছেন।

রামেন্দ্রসুন্দর কি দুঃখবাদী?

সংসারে প্রতিটি মানুষই সুখকে লাভ করিতে ও দুঃখকে পরিহার করিতে চায়। সুখ তাহার নিকট উপাদেয়, দুঃখ হেয়। কিন্তু মানুষের জীবনে দুঃখের অন্ত নাই, এমন কি, ইতর প্রাণীর জীবনেও দুঃখ আছে! কিন্তু সংসারে মানুষের জীবনে সুখের মাত্রা বাড়িতেছে, না দুঃখের মাত্রা বাড়িতেছে? যাঁহারা বলেন সংসারে সুখের মাত্রা বাড়িতেছে, তাঁহাদের মতে দুঃখ জিনিসটা সুখের সাময়িক অভাব মাত্র। ইঁহারা আশাবাদী—লাইব্নিজ ও হেগেল ইঁহাদের প্রধান পাণ্ডা। লাইব্নিজ বলেন, যত প্রকার পৃথিবী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তাহাদের মধ্যে আমাদের এই পৃথিবীই সর্বশ্রেষ্ঠ (The world is the best of all possible world)। হেগেল বলেন, দুঃখ বা অমঙ্গল ব্রহ্মের অভিব্যক্তির অপরিহার্য অঙ্গ (Evil is a necessary phase in the self-evolution of the Absolute)। আবার দুঃখবাদীদের মধ্যে একালে দুইজনের নাম উল্লেখযোগ্য, শোপেনহাওয়ার ও হার্টম্যান। তাঁহাদের মতে সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের মাত্রা বাড়িতেছে। অভিব্যক্তির ফলে দুঃখের মাত্রা কমিতেছে, এ কথা আদৌ সত্য নহে। যাহাকে আমরা সুখ বলি, উহা দুঃখের অভাব ভিন্ন আর কিছুই নয়। অবশ্য, সুখই যে মানুষের জীবনে সর্বদা কাম্য, এ কথা জন স্টুয়ার্ট মিলও (যাঁহার মতে সুখ বা দুঃখই ভালমন্দের মাপকাঠি হওয়া উচিত) স্বীকার করেন নাই। তাঁহার সেই প্রসিদ্ধ উক্তি স্মরণ করুন—'It is better to be a human being dissatisfied than to be a pig satisfied, better to be a Socrates dissatisfied than to be a human being satisfied.' দুঃখের মধ্য দিয়াই যে মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ, দুঃখই যে মানবের পরম গৌরব, এ কথা তো রবীন্দ্রনাথ বারংবার আমাদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। রামেন্দ্রসুন্দর পরম রসিক পুরুষের ন্যায় উভয় পক্ষের যুক্তি পর্যালোচনা করিয়াছেন কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত আমাদের সম্মুখে স্থাপন করেন নাই। তবে দুঃখবাদের দিকেই যে তাঁহার প্রবণতা

বেশী, তাহা সহজেই বোঝা যায়। একাধিক প্রবন্ধের মধ্য দিয়া তিনি বলিতে চাহিয়াছেন—দুঃখকে সহজে মাথা পাতিয়া মানিয়া লও, দুঃখের অস্তিত্বে ভীত হইও না, কারণ, দুঃখকে বিলুপ্ত করিতে গেলে সুখও বিলুপ্ত হইবে, (স্বামিজী বলিয়াছেন, সুখকে বাড়াইতে গেলে দুঃখের মাত্রাও বাড়িয়া যায়—As you increase your happiness in Arithmetical Progression, you increase your misery in Geometrical Progression) সুতরাং দুঃখকে স্বীকৃতি দান করিয়া অকুণ্ঠিতভাবে জীবনের সকল কর্তব্য করিয়া যাও। আদি-কবি বাল্মীকিও আমাদিগকে এই শিক্ষাই দিয়াছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের মতে দুঃখ নিছক অমঙ্গল নয়, কারণ, মানুষের দুঃখবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ-আহরণের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দুঃখানুভূতি ক্রমশঃ তীব্রতর হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবুদ্ধির আবির্ভাব ঘটিয়াছে। সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতির উৎপত্তি-সম্পর্কে জীববিদ্যা কোন আলোকপাত করিতে পারে না। রামেন্দ্রসুন্দর মনে করেন, মানুষের দুঃখানুভূতি ক্রমশঃ তীব্রতর হইতেছে বটে কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহার আনন্দানুভূতিও তীক্ষ্ণতর হইতেছে, ইহা প্রকৃতির একপ্রকার ক্ষতিপূরণ-ব্যবস্থা। তাই সে দুঃখকে করুণরসে রূপান্তরিত করে, ট্রাজিডি হইতে সে আনন্দ আহরণ করে। এই প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটলের বিখ্যাত মতবাদ স্মরণীয়। ট্রাজিডি আমাদের মনে করুণা ও ভীতির উদ্রেক করিয়া আমাদের রুদ্ধ বেদনাকে অশ্রুরূপে মুক্ত করিয়া দেয়, ইহাই তাঁহার Theory of Catharsis. কবি শেলিও বলিয়াছেন—

> 'We look before and after,
> And pine for what is not,
> Our sincerest laughter
> With some pain is fraught
> Our sweetest songs are those that tell of saddest thought.'

অমঙ্গলের উৎপত্তি সম্পর্কে রামেন্দ্রসুন্দর যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে ব্যঙ্গ আছে, বিদ্রূপ আছে; রামেন্দ্রসুন্দর দেখাইয়াছেন, অমঙ্গলের উৎপত্তির কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা কেহ দিতে পারেন নাই। তবে এ কথা সত্য যে, মঙ্গল ও অমঙ্গল আপেক্ষিক শব্দ। তিনি বলেন—'আমরা মঙ্গল বলিতে ও আনন্দ বলিতে যাহা বুঝিতে পারি, অমঙ্গল ছাড়িয়া ও দুঃখ ছাড়িয়া তাহার অস্তিত্ব নাই। আমাদের নিকট আঁধার ছাড়িয়া আলো নাই, সাদা ছাড়িয়া কালো নাই, দুঃখ ছাড়িয়া সুখ নাই। জগৎ হইতে যদি আঁধারের বিলোপসাধন করিতে যাই, সঙ্গে সঙ্গে আলোকের বিলোপসাধন ঘটিয়া যাইবে। দুঃখকে যদি নির্বাসিত করিতে যাই, সুখও সঙ্গে সঙ্গে নির্বাসিত হইয়া যাইবে।...নিরবচ্ছিন্ন নিরপেক্ষ আঁধার কেমন, তাহা বুঝিতে পারি না। আবার... নিরবচ্ছিন্ন নিরপেক্ষ আলোক কেমন, তাহাও আমাদের কল্পনার অনধিগম্য। আলোকের পার্শ্বে আমরা আঁধার দেখিতে পাই; আঁধার আছে বলিয়াই আমরা আলোকের অস্তিত্ব প্রত্যয় করি। অমঙ্গলকে লোপ কর; মঙ্গলকে ধরিয়া রাখা অসাধ্য হইবে, মঙ্গল সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাইবে। অমঙ্গলের পার্শ্বে থাকিয়াই মঙ্গল মঙ্গল, নতুবা মঙ্গল অর্থশূন্য বাতুলের প্রলাপ।...

অতএব এস বন্ধু, অকারণে আত্মপ্রবঞ্চনায় প্রয়োজন নাই। অমঙ্গলের অপলাপ করিও না, অমঙ্গলকে সম্মুখে দেখিয়াও অস্বীকারের চেষ্টা পাইও না।...যতদিন তোমার জাগ্রদবস্থা, মঙ্গল ও অমঙ্গল সমান ভাবে তোমাকে জড়াইয়া থাকিবে। যখন অমঙ্গলের তিরোধান হইবে, তখন মঙ্গলেরও তিরোধান হইবে; তোমার জাগরণ তখন সুষুপ্তিতে বিলীন হইবে।...মঙ্গলকে আহ্বান কর, অমঙ্গলের নিকট প্রণত হও। একেকে আলিঙ্গন কর, অপরকে নমস্কার কর। গন্তব্য পথে তোমার গতি হউক; মঙ্গল ও অমঙ্গল তোমার পথপ্রদর্শক হইয়া তোমায় প্রেরণা করিতে রহুক। ধীরপদে তোমার কর্তব্য সম্পাদন কর, তোমার নিরূপিত স্বধর্ম আচরণ কর। কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে তোমার অধিকার নাই। ফলের প্রতি, মঙ্গলের প্রতি বা অমঙ্গলের প্রতি তুমি দৃকপাত করিও না। শ্রুতি স্মৃতি সদাচার তোমার পথ-প্রদর্শক হউক।

সকলের উপর আত্মতৃপ্তি তোমার পথ-প্রদর্শক হউক। যিনি তোমার অভ্যন্তর হইতে তোমাকে পথ দেখাইতেছেন, তাঁহার তৃপ্তিবিধানে তোমার মতি থাকুক। তৎপ্রদর্শিত মার্গে তুমি নির্ভয়ে অগ্রসর হও। মঙ্গলের জয় হউক, অমঙ্গলেরও জয় হউক; উভয়ের জয়ই তোমার জয়।'

অমঙ্গলের উৎপত্তি কেন? ইহা মানব-মনের একটি চিরন্তন জিজ্ঞাসা। বুক্ অব জবের (Book of Job) রচয়িতার মনে এই প্রশ্ন জাগিয়াছিল। কিন্তু তিনি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নাই। সেমেটিক জাতির সেই চিরন্তন সিদ্ধান্তই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। 'বিধাতার আদেশ পালন কর কিন্তু তোমার সমীম বুদ্ধি লইয়া তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে চেষ্টা করিও না।' দশমহাবিদ্যার কবির কণ্ঠেও একই প্রশ্ন—

'অশুভ সৃজন কার? নিরমল বিধাতার
মানস হইতে কি এ মলিনতা রচনা?'

ভারতীয় দর্শনে দুঃখ ত্রিবিধ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দর্শনে অমঙ্গল বা Evil দ্বিবিধ—ভৌতিক বা Physical, আর আধ্যাত্মিক বা Moral. প্রশ্ন এই—সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের করুণাময়ত্বের সঙ্গে অমঙ্গলের সকল ক্ষেত্রে সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য বিধান করা যায় কিনা? মার্টিনো প্রভৃতি মনীষিগণ এইরূপ সঙ্গতিবিধানের নিষ্ফল প্রয়াস করিয়াছেন। রামেন্দ্রসুন্দর কিন্তু ইহাদের এই ব্যর্থ প্রচেষ্টার উপর বিদ্রূপের কশাঘাত করিয়াছেন।

সত্যের সন্ধানে রামেন্দ্রসুন্দর

সত্য কী—ইহা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের মনের চিরন্তন প্রশ্ন। বৈজ্ঞানিক বিনা প্রমাণে কতকগুলি কথা স্বীকার করিয়া লন, যথা—আমাদের মনের বাহিরে জগতের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, প্রকৃতির রাজ্যে নিয়মের একরূপতা আছে ইত্যাদি। এই সকল কথা মানিয়া না লইলে বৈজ্ঞানিক তাহার গবেষণায় অগ্রসর হইতে পারেন না। প্রকৃতির রাজ্য যে নিয়মের রাজ্য, প্রকৃতিতে যাহা ঘটে, তাহা যে কখনও অতিপ্রাকৃত হইতে পারে না, যে ঘটনার কারণ আমরা জানি না, তাহাকেই যে অতিলৌকিক ঘটনা বলিয়া নির্দেশ করি, বৈজ্ঞানিক রামেন্দ্রসুন্দর ইহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন—কোন্ সত্য যে চিরন্তন সত্য, তাহা আমরা কেমন করিয়া জানি? প্রকৃতি যে নিয়মের রাজ্য, তাহা আমাকে কে বলিল? ইহা আমরা ভূয়োদর্শন বা পুনঃ-পুনঃ দর্শনের সাহায্যে জানিয়াছি। কিন্তু ইহা যে চিরদিন সত্য ছিল বা চিরদিন সত্য থাকিবে, অথবা আমাদের এই জগতে যাহা সত্য তাহা যে সকল লোকেই সত্য হইবে, তাহার তো কোন প্রমাণ নাই। ব্যাবেজের পরিকল্পিত ঘড়ির ন্যায় কোথাও যে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিবে না, তাহা কেমন করিয়া জানি? আবার আমার বাইরে যে বস্তুজগৎ আছে, তাহারই বা প্রমাণ কি? আমরা বহির্জগতের অস্তিত্বের প্রমাণ পাই কতকগুলি সংবেদনের (sensation) মধ্য দিয়া। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের অনুভূতির মধ্য দিয়া অর্থাৎ কতকগুলি প্রত্যয়ের মধ্য দিয়া বহির্জগতের অস্তিত্বের অনুমান করি মাত্র। আমরা যাহাকে বস্তুর প্রত্যক্ষ বলি উহা তো স্নায়ুর ক্রিয়া বা মস্তিষ্কের আলোড়ন মাত্র। এই আলোড়নের সঙ্গে বস্তুর কি সম্পর্ক, আজও কেহ তাহার মীমাংসা করিতে পারেন নাই। আমরা যখন স্বপ্ন দর্শন করি, তখনও তো কতকগুলি প্রত্যয় পরম্পরাক্রমে আমাদের মনে উদিত হয়, আর স্বপ্নদর্শনকালে কেহ সেই প্রত্যয়গুলিকে মিথ্যা বলিয়া মনে করেন না। সুতরাং জগতে একটি মাত্র সত্য সকল সত্যের উপরে। সে সত্য হইতেছে—অহমস্মি, আমি আছি। রামেন্দ্রসুন্দরের এই কথাটি যেন গণিতশাস্ত্রবিদ দার্শনিক দেকার্তের (Descartes) কথার প্রতিধ্বনি—Cogito Ergo Sum. আমি যেহেতু সংশয় প্রকাশ করি, অতএব প্রমাণিত হইল যে আমি চিন্তা করি, আর আমি চিন্তা করি বলিয়াই আমি আছি, ইহা নিশ্চিত সত্য। এই 'আমি' বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাই চরম সত্য।

কিন্তু সংসারে বাঁচিতে হইলে, জীবন-সংগ্রামে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য জয়ী হইতে হইলে বহির্জগতের অস্তিত্ব আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আচার্য শঙ্করের ন্যায় রামেন্দ্রসুন্দরও জগতের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করিয়াছেন। মার্কিন দার্শনিক উইলিয়াম জেমসের ন্যায় রামেন্দ্রসুন্দরও উপযোগিতাবাদ বা Pragmatism-এ বিশ্বাস করেন। কিন্তু ভাববাদ বা Idealismই তাঁহার দৃষ্টিতে চরম সত্য। রামেন্দ্রসুন্দরের মতে 'আমি আছি' ইহা নিরপেক্ষ ধ্রুব সত্য, পারমার্থিক সত্য। তিনি বলেন—'এই সত্যে বিশ্বাস করিয়া নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইলে আরও কতকগুলা সত্যে বিশ্বাস করিতে হয়। যাহাতে বিশ্বাস না করিলে জীবনযাত্রা চলে না বা নিজের অস্তিত্ব টিকে না, তাহাকেই আমরা সত্য বলি। কিন্তু এই শ্রেণীর সত্য আপেক্ষিক বা ব্যবহারিক সত্য। মনুষ্যের যাবতীয় বিজ্ঞান এই ব্যবহারিক সত্য লইয়াই কারবার করে।' এই হিসাবেই প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা সত্য। ইহা না মানিলে আমাদের মঙ্গল নাই, ধরাধামে টিকিয়া থাকিবার কোন উপায় নাই। এইজন্যই 'নিয়মের রাজত্ব' প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর বলিয়াছেন—'যেদিন লোষ্ট্রপাতিত আম্র ভূপৃষ্ঠ অন্বেষণ না করিয়া আকাশমার্গে ধাবিত হইবে, সেই ভয়াবহ দিন মনুষ্যের ইতিহাসে বিলম্বিত হউক।'

মুক্তপুরুষ রামেন্দ্রসুন্দর

'আমি আছি' ইহাই ধ্রুব সত্য, কিন্তু এই 'আমি' কে? 'কে আমি'—ইহাই ভারতীয় মনের চিরন্তন প্রশ্ন। সাংখ্যদর্শন বলেন, আমি অসঙ্গ পুরুষ, উদাসীন, দ্রষ্টা, সাক্ষীস্বরূপ, এই উপলব্ধি যেদিন হইবে, সেদিন নৃত্যপটীয়সী প্রকৃতির নৃত্য—এই magical cosmic dance থামিয়া যাইবে। অদ্বৈতবাদী বলেন, আমি দেহ নই, মন নই, বুদ্ধি নই, অহঙ্কার নই, আমি নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধমুক্ত চৈতন্যস্বরূপ। রামেন্দ্রসুন্দরের চিন্তাধারায় অদ্বৈত বেদান্তের প্রভাব বিপুল, কিন্তু আচার্য শঙ্করের প্রতি তাঁহার মনোভাব যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিকের মনোভাব। খ্রীষ্টীয় Salvation ও আমাদের মুক্তি যে এক নয়, তাহা তিনি সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। "জগতের অস্তিত্ব", "সৃষ্টি", "অতিপ্রাকৃত" (দ্বিতীয় প্রস্তাব), "আত্মার অবিনাশিতা", "এক না দুই", "মুক্তি" ও "মায়াপুরী" প্রবন্ধে লেখক তাঁহার সিদ্ধান্ত বিচিত্র ভঙ্গীতে প্রকাশ করিয়াছেন। এই নিবন্ধগুলি আচার্য শঙ্করের শারীরক ভাষ্যের উপর নূতন আলোকপাত করিয়াছে। "জগতের অস্তিত্ব" প্রবন্ধে লেখক বলেন—

'আমিই চিন্ময় একমাত্র সদ্বস্তু, আর সমস্তই আমার কল্পনা। আমার চৈতন্যের প্রমাণ অনাবশ্যক, মদ্বহির্ভূত চৈতন্যের প্রমাণ নাই।...

এই...সদ্বস্তু, ইহার স্বরূপ কি? ইহা সৎ, ইহা অস্তি, ইহা সত্যপদার্থ—তথাস্তু। ইহা চিৎ, ইহা চিন্ময় পদার্থ—তথাস্তু। ইহা আনন্দস্বরূপ—তাই কি? কেহ কেহ ভ্রূকুটি করিবেন;—বলিবেন জানি না, উহা অজ্ঞেয়, অনির্দেশ্য। মাধ্যমিক বৌদ্ধ বলিবেন, উহা সৎ নহে, অসৎও নহে, সৎও বটে, অসৎও বটে, তাহাও নহে, সৎও নয়, অসৎও নয়, তাহাও নহে। উহার পারিভাষিক নাম শূন্য। হিউম ও হক্সলি হয়তো বলিবেন, সদ্বস্তুর জন্য এত মাথাব্যথা কেন? যাহা আছে, তাহাই আছে। মায়াপটের অন্তরালে যাইবার আবশ্যকতা কি? চিদ্বস্তু, সন্দেহ নাই। কিন্তু চিদ্বস্তুর মূলে কি আছে, অন্বেষণের প্রয়োজন নাই। সদ্বস্তুর মরীচিকায় প্রতারিত হইও না।'

"মুক্তি" প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি লিখিয়াছেন—

'আমি কেন আপনাতে মায়ার আরোপ করিয়া ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া জগতের সৃষ্টি করি, আর কেনই বা আপনাতে অবিদ্যার আরোপ করিয়া জগতের দাসত্ব অভিনয় করিয়া প্রতারিত হই, তাহার উত্তর বোধ করি নাই। বেদান্ত বলেন, উহাই আমার স্বভাব; বৈষ্ণব বলেন, উহা আমার লীলা বা খেয়াল; শাক্ত বলেন, উহা আমার আনন্দ; বৌদ্ধ ও অজ্ঞানবাদী বলেন, উহা জিজ্ঞাসা করিও না। পরমেষ্ঠী প্রজাপতি ইহার উত্তর ঋষিমুখে বলাইয়াছেন—এই সৃষ্টি যাহা হইতে আবির্ভূত হইয়াছে, তিনিই ইহা বিধান করিয়াছেন বা তিনি

ইহা করেন নাই; যিনি পরম ব্যোমে অবস্থান করিয়া ইহার অধ্যক্ষ, তিনিই ইহা জানেন, অথবা তিনিও তাহা জানেন না। এই তিনি কে? এই তিনি আমি স্বয়ং, আমা হইতে স্বতন্ত্র আর কাহারও অস্তিত্বের কল্পনা অনাবশ্যক;—করিলে তিনিও আমারই জ্ঞানগম্য বা কল্পনীয় হইয়া পড়িবেন, আমারই সৃষ্ট মাটির পুতুল হইবেন; অতএব ওই প্রশ্নের উত্তর আমিই জানি, অথবা জানিয়াও জানি না, এইরূপ ভান করি।'

'জ্ঞানান্মুক্তিঃ' ইহাই রামেন্দ্রসুন্দরের বিশ্বাস ছিল—স্মরণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের মধ্য দিয়া তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি পরম জ্ঞানী হইলেও তাঁহার অন্তরে যে সর্বদা ভক্তির ফল্গুধারা প্রবাহিত হইত, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র ভূমিকায় তাহার প্রমাণ আছে। কোন অপরিচিত ব্যক্তি কয়েকটি প্রশ্নের সমাধান চাহিয়া রামেন্দ্রসুন্দরের নিকট একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, রামেন্দ্রসুন্দর চিঠিখানির যে উত্তর দিয়াছিলেন, উহাতে আন্তরিকতার পরিচয় আছে। 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'য় উদ্ধৃত সেই পত্রখানি হইতে আমরা অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিলাম—

'যে সকল প্রশ্ন তুলিয়াছেন, তাহার উত্তর দেওয়া আমার সাধ্য নহে। মৃত্যুর সম্মুখে মানুষ চিরকাল ভীত, মরণকে জয় করিবার জন্য ইতিহাসের আরম্ভ হইতে মানবের চেষ্টা। যে চেষ্টায় মানবজাতির অগ্রণীগণ বিমুখ হইয়াছেন—সর্বদেশের সুধীগণ যেখানে পরাহত হইয়া আসিয়াছেন, আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির নিকট সেই সেই উৎকট সমস্যার মীমাংসা পাইবেন কিরূপে?

'আমি যতদূর বুঝিয়াছি, যতক্ষণ মানুষের জীবভাব থাকিবে, ততদিন মরণের ভয় হইতে নিষ্কৃতি নাই—ততদিন religiousnessই একমাত্র উপায়,—এই religiousness-এর মোটামুটি দুইটা লক্ষণ, একটা optimistic,—তাঁহার চরণে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা—ইহা রামপ্রসাদের
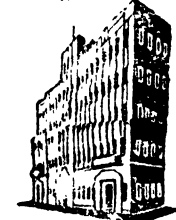
ভাব,—আমি যখন মায়ের চরণ আঁকড়াইয়া আছি তখন কি ভয়—শমন বেটা কি করিবে?

* * *

'আর একটা দিক দৈন্যের দিক—আমি পাপী তাপী দীন, আমার কি হইবে—হয়তো তিনি দয়া করিয়া টানিয়া লইবেন—যদি তিনি কূলে ধরিয়া উদ্ধার করেন তবেই রক্ষা।

* * *

'মনে যতক্ষণ জীবভাব থাকিবে ততক্ষণ সংশয় যাতনা যাহা মরণ-ভয় হইতে উৎপন্ন তাহা থাকিবেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যতক্ষণ আপনার ব্রহ্মস্বরূপতার উপলব্ধি না ঘটে, ততক্ষণ মরণ-ভয় যাইবার নহে। আমিই ব্রহ্ম—আর কোনো ব্রহ্ম নাই—আমিই জগৎকর্তা ও জগৎ-বিধাতা—এই যে জন্ম-মৃত্যু-জীবন, এ সমস্তই আমার লীলাভিনয়—এইটুকু উপলব্ধি না হইলে বিরহভাব ঘুচিবার কোনো সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ইহাও উপলব্ধির ব্যাপার—কোন চেষ্টা করিয়া তর্ক দ্বারা এ উপলব্ধি ঘটিবে না।'

রামেন্দ্রসুন্দর পত্রলেখককে দুইখানি বই পড়িবার উপদেশ দিয়াছিলেন, আমরাও রামেন্দ্রসুন্দরের অনুরাগী পাঠকগণকে বই দুইখানি পড়িতে বলি—ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অভয়ের কথা' ও উইলিয়াম জেমসের 'Varieties of Religious Experience.'

এই পত্রখানিতে আমরা দেখিতে পাই, রামেন্দ্রসুন্দর ভক্ত হইলেও জ্ঞানের সাধনার দিকেই তাঁহার অন্তরের প্রবণতা ছিল। তিনি জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, কেন না, তিনি শ্রদ্ধাবান, তৎপর ও সংযতেন্দ্রিয় ছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের তৃতীয় নেত্র উন্মীলিত হইয়াছিল, তাই তিনি সত্যকে দর্শন করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্ত্যের কোন কোন মনীষী বা কবিও আত্ম-সমাহিত অবস্থায় এই দিব্য-দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন। সেক্সপীয়ার যখন বলিয়াছেন—'We are such stuff as dreams are made of' অথবা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যখন কোকিলকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

'O blessed bird! The earth we pace,
Again appears to be,
An unsubstantial, fairy thing,
It is fit home for thee.'

তখন তাঁহারাও দিব্যনেত্রে সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ভারতীয় সাধনার উত্তরাধিকারী রামেন্দ্রসুন্দর জ্ঞানের সাধনার দ্বারা সত্যকে উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

উপসংহার

রামেন্দ্রসুন্দরের মহাপ্রয়াণ-দিবস উপলক্ষ্যে (৬ই জুন, ১৯১৯, ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬) আমরা সংক্ষেপে তাঁহার দার্শনিক চিন্তাধারার সম্পর্কে আলোচনা করিলাম। তাঁহার সম্পর্কে আরও নানা দিক দিয়া আলোচনা করা চলে—যেমন বাংলার প্রবন্ধ-সাহিত্যে রামেন্দ্রসুন্দর, চরিত্রশিল্পী রামেন্দ্রসুন্দর, ভারতীয় সাধনার উত্তরাধিকারী রামেন্দ্রসুন্দর প্রভৃতি। রামেন্দ্রসুন্দর শুধু পঞ্চান্ন বৎসর জীবিত ছিলেন কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তাঁহার দান বিপুল। আবার সাহিত্যসেবী রামেন্দ্রসুন্দরের চেয়ে মানুষ রামেন্দ্র-সুন্দর ছিলেন আরও বড়, তিনি ছিলেন স্বদেশপ্রেমিক ও মানবতার ধর্মে দীক্ষিত, তাই তিনি জাতিকে কল্যাণের পথ নির্দেশ করিয়াছিলেন। বাঙালীর পরম দুর্ভাগ্য, সে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরকে তাঁহার জন্ম-দিবস বা মৃত্যু-দিবস উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধা-নিবেদন করে না, তাঁহার রচনাবলী হইতে প্রেরণা লাভ করে না। ইহাতে তাহার নিজেরই কল্যাণ ব্যাহত হয়—'প্রতিবধ্নাতি হি শ্রেয়ঃ পূজ্যপূজা-ব্যতিক্রমঃ'। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন না করিয়া বাঙালী যে মহাপাপ করিয়াছে, আজও কি তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিবার সময় আসে নাই?

উইলিয়ম হিকি (৭)

শেরিফের নিষ্ঠুর আচরণে জাস্টিস হাইড সেদিন খুবই ব্যথিত হয়েছিলেন। অসহায় মহিলাটির দিকে চেয়ে তাঁর চোখে জল এসে গিয়েছিল। আর একটি কথাও তিনি বলতে পারেন নি। চুপিচুপি কেবল তাঁর এজেণ্টকে বলে দিয়েছিলেন প্রত্যেক মাসে ৫০৲ টাকা করে মহিলাটিকে সাহায্য করতে, এবং কোথা থেকে কে তাঁকে এই অর্থ সাহায্য করছে তা যেন তিনি কিছুতেই জানতে না পারেন। প্রায় পনের মাস হাইড এইভাবে মহিলাটিকে সাহায্য পাঠিয়েছিলেন, এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর গোপনতাও তিনি রক্ষা করতে পারেন নি। তারপর হঠাৎ একদিন সকালে মহিলাটি হাইডের বাড়ি এসে, শহরের এক বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ীর সঙ্গে তাঁর বিবাহের প্রস্তাবের কথা জানালেন, এবং বললেন যে আর তাঁর অর্থসাহায্যের প্রয়োজন হবে না। হাইডের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতায় তাঁর দুই চোখ দিয়ে অনর্গল ধারায় জল ঝরতে লাগল। হাইড তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন, এবং তাঁর পুনর্বিবাহের সংবাদে তিনি যে খুব খুশী হয়েছেন, তাও তাঁকে জানাতে ভুললেন না। দয়াদাক্ষিণ্য দানধ্যান অনেককে করতে দেখেছি, কিন্তু মনে হয়েছে, কোথায় যেন তাঁদের আত্মপ্রচারের একটা বাসনা তার মধ্যে লুকিয়ে আছে। এ রকম বিনা আড়ম্বরে, ঢাক না পিটিয়ে, অকৃপণভাবে অসহায় ও বিপন্ন মানুষকে দানধ্যান করতে হাইডের মতন খুব কম লোককেই দেখেছি।

জাস্টিস হাইডের জীবনে আরও দুটি ঘটনার কথা উল্লেখ করব যা শুনলে আপনারা হাসি সংবরণ করতে পারবেন না।

নগরের নটীর হাইড-সন্দর্শন

একদিন রাতে চেম্বার থেকে হাইড বাড়ি ফিরছিলেন, এমন সময় একজন তরুণী ইয়োরোপীয় মহিলা দৌড়তে দৌড়তে এসে রাস্তার উপর তাঁর পালকি দাঁড় করাল। তারপর সেই বিচিত্রবেশা মহিলার কি কান্না, কপাল চাপড়ানো ও আবেদন-নিবেদনের বহর! হাইড স্বভাবতঃই হতভম্ব হয়ে গেলেন। কলকাতা শহরের রাস্তার উপর ঘটনাটি ঘটছে। জাস্টিস হাইডের পালকিও সকলের চেনা, আর তরুণী মহিলাটিও কারও অচেনা নয়, কারণ সে মহানগরের একজন বহুজনপরিচিতা বারাঙ্গনা। তাকে চিনতেন না কেবল হাইডসাহেব। তবু তার বিচিত্র বেশভূষা, এবং ততোধিক বিচিত্র মুখ-হাত-পা নাড়ার ভঙ্গি দেখে তিনি কিছুটা সন্দেহ করেছিলেন। প্রকাশ্য রাস্তার উপর নাটকীয় দৃশ্যটি জমতে দেওয়া ঠিক নয় বলে তিনি মহিলাটিকে বললেন, পরদিন সকালে

তাঁর বাড়ি আসতে। বাড়িতে বসে তিনি তার অভিযোগ সব শুনবেন এবং সাধ্যমত তার বিহিত করারও চেষ্টা করবেন বলে আশ্বাস দিলেন। কিন্তু মহিলা তো সাধারণ মহিলা নয়, কম্‌লির মত নাছোড়বান্দা। সে তৎক্ষণাৎ বলল যে পরদিন সকাল পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার মত অবস্থা নয় তার। সমস্যাটা জরুরী, এবং এখনই তার একটা যা-হোক সমাধান করা প্রয়োজন।

হাইডের পালকি গৃহাভিমুখে বেয়ারারা কাঁধে করে বয়ে নিয়ে চলল। পাশে পাশে সেই তরুণী বারাঙ্গনাটিও দৌড়তে লাগল। শহরের জনপথে, রাত্রিবেলা, সে এক বিচিত্র দৃশ্য।

বাড়ি ফিরে হাইড জামাকাপড় বদলে খানাটেবিলে নৈশভোজনের জন্য বসেছেন জনতিনেক বন্ধু নিয়ে, এমন সময় বেয়ারা খবর দিল যে একজন মেমসাহেব খোঁজ করছেন। হাইড বুঝতে পেরে তাকে উপরতলায় ডেকে পাঠালেন। খাবার সময়, অতএব বাধ্য হয়ে তরুণীটিকেও খাবার কথাও বলতে হল। ধন্যবাদ জানিয়ে সে বলল যে ভোজনে তার রুচি না থাকলেও, কিঞ্চিৎ মদিরাপানে তার আপত্তি নেই। বেশ বড় এক গ্লাস মদিরা পান করে সে তার নাম বলল 'ডান্‌ডাস'। বর্তমানে যে জঘন্য জীবন তাকে যাপন করতে হচ্ছে তা বর্ণনা না করাই ভাল। এই বলে মিস্ ডান্‌ডাস জীবনের কথা বলতে শুরু করল। সদ্‌বংশের মেয়ে সে, তার দুই ভাইয়ের মধ্যে একজন সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন, আর একজন নৌবাহিনীর লেফ্‌টেন্যাণ্ট। তার বয়স যখন বছর চোদ্দ তখন একজন তারুণ্যতেজোদ্দীপ্ত অশ্বারোহীবাহিনীর অফিসারকে দেখে সে প্রেমে পড়ে, এবং পিতৃগৃহ ত্যাগ করে চতুর্দশী ডান্‌ডাস তার সহধর্মিণী হয়। অশ্বারোহী অফিসারের সঙ্গে সারা ইংলণ্ড চষে বেড়িয়ে অবশেষে রাজাজ্ঞায় স্বামীর ইস্ট ইণ্ডিজে যাত্রাকালে তার সঙ্গে ভারতবর্ষে মাদ্রাজ প্রদেশে চলে আসে। তখন টিপুর সৈন্যদের সঙ্গে ইংরেজদের লড়াই হচ্ছে এবং সেই লড়াইয়ে তার বীর অশ্বারোহী যোদ্ধা স্বামী প্রাণ হারায়। তারপর চরম দুঃখকষ্ট ও দারিদ্র্যের মধ্যে পড়ে শ্রীমতী ডান্‌ডাস যে জীবন বরণ করতে বাধ্য হয়েছে, তা তো তাঁরা স্বচক্ষে দেখতেই পাচ্ছেন। এই কথা বলে হাইডের সামনে ডান্‌ডাস ঝর্‌ঝর্ করে কেঁদে ফেলল। কোমলতায় হাইড স্ত্রীলোককেও হার মানিয়ে দেন। অতএব তাঁর হৃদয়ও সঙ্গে সঙ্গে গলে গেল। ধরা গলায় তিনি বললেন, তারপর ?

তারপর আর কি ? বাংলাদেশে এসে ডান্‌ডাস নতুন বারাঙ্গনাবৃত্তি অবলম্বন করে জীবন ধারণ করতে লাগল। বছরখানেক হল সে জনৈক মিড্‌লটন সাহেবের বাড়িতে একখানা ঘর নিয়ে থাকে ও খায়, এবং তার জন্য যে টাকা দিতে হয় তা প্রাপ্যের চেয়ে অনেক বেশী বলেই তার ধারণা। তথাপি মিড্‌লটন ও তাঁর স্ত্রী উভয়েই তার উপর অকথ্য অত্যাচার করে, এমন কি কারণে অকারণে মধ্যে মধ্যে তাকে বেদম ঠ্যাঙানিও দেয়। অদ্য রজনীতে সেই ঠ্যাঙানির দাপটেই সে ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে, এবং সেই সময় তাঁকে পালকি চড়ে যেতে দেখে ছুটে এসে পালকি আটকেছে। বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে না এলে আজ বোধ হয় তার বাড়িওয়ালা ও বাড়িওয়ালী দুজনে মিলে তাকে খুনই করে ফেলত।

ঘটনাটি করুণ, বলবার ভঙ্গিটিও মর্মস্পর্শী, বলতে বলতে অঝোরে অশ্রুবর্ষণ, এবং সবার উপরে অভিনেত্রী বক্তা সুন্দরী তরুণী—এতগুলি ব্যাপারের অভাবনীয় সমাবেশে হাইডসাহেব রীতিমত বিচলিত ও অভিভূত হলেন। তাঁর স্বাভাবিক মানবতাবোধ অত্যন্ত উগ্রভাবে সজাগ হয়ে উঠল। ছলাকলায় সুদক্ষা শ্রীমতী ডান্‌ডাস সহজেই তাঁর অন্তরের দুর্গটি জয় করে ফেললেন।

হাইড বললেন, "আজ রাতে আপনি ঘরে ফিরে যান, আমার ভৃত্য গিয়ে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে। তার সঙ্গে আমি একটি পরোয়ানাও পাঠিয়ে দিচ্ছি, কাল সকালে যাতে মিস্টার ও মিসেস মিড্‌লটন আমার বাড়িতে উপস্থিত হয়ে, আমার সামনে, তাঁদের অভদ্র ও অন্যায় আচরণের কৈফিয়ত দেন সে জন্য।"

বলা বাহুল্য, শ্রীমতী ডান্‌ডাসের এ প্রস্তাব পছন্দ হল না। তৎক্ষণাৎ আপত্তি জানিয়ে সে বলল, প্রাণ

থাকতে আর সে ওই বাড়িতে পদার্পণ করবে না, রাত্রিযাপন করা তো দূরের কথা। যদি অন্য কোথাও আশ্রয় না মেলে, তা হলে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে রাত্রি কাটিয়ে দেবে।

একজন অসহায় হতভাগ্য নারী, তার উপর সুন্দরী তরুণী, শহরের পথে পথে ঘুরে রাত কাটাবে, এ প্রস্তাব হাইডসাহেবেরও মনঃপূত হবার কথা নয়। তিনি তাঁর সর্দার-বেয়ারাকে ডেকে বললেন, "বাড়িতে কোন খালি ঘরে মিস্ ডানডাসের রাত্রিতে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারবে ?"

সর্দার-বেয়ারা সবিনয়ে বলল, "সম্ভব হবে না হুজুর। কারণ কোন ঘরই খালি নেই, এবং দু-তিনটে বেশী খাটপালং যা ছিল তা আপনার এক বন্ধু সেদিন বারাসাত নিয়ে গেছেন।"

হাইড বেশ দুশ্চিন্তায় পড়লেন। বৃদ্ধ বিলি পসন সে-রাতে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন ছিলেন। বৃদ্ধ বেশ রসিক ব্যক্তি। হাইডকে চিন্তিত দেখে তিনি বললেন, "সার্, বৃথা চিন্তা করে লাভ কি ? ঘর এবং বিছানা দুইই যখন পাওয়া যাচ্ছে না, তখন এক কাজ করতে পারেন। আপনার ঘরও বড়, বিছানাও যথেষ্ট প্রশস্ত। তার একপাশে নবাগতা অতিথির শয়নের ব্যবস্থা করে দিলে ক্ষতি কী ?"

কাঁচা রসিকতা হাইড কোনদিনই বিশেষ বরদাস্ত করতে পারতেন না। বৃদ্ধ বিলির কথায় তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, "কথাবার্তায় মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলছেন, ভাল লক্ষণ নয়। মনে হয়, আপনার মস্তিষ্কটি একেবারে ঝাঁজরা হয়ে গেছে।"

হাইডের সমস্যার সমাধান অবশ্য ডানডাস নিজেই করে দিল। সে বলল, শহরে দু-তিনটে ভাল ট্যাভার্ন আছে, তার যে-কোন একটিতে সে স্বচ্ছন্দে রাত কাটাতে পারে। ট্যাভার্নের কথা শুনে হাইড তেমন খুশী হলেন না, কারণ কলকাতার ট্যাভার্ন সম্বন্ধে তাঁর আদৌ ভাল ধারণা ছিল না। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে মট্ সাহেব ছিলেন। তিনি বললেন যে তাঁর জানা দুটি ভাল ট্যাভার্ন আছে, যেখানে ভদ্রভাবে রাত্রিবাস করা যে-কোন মহিলার পক্ষে সম্ভব বলে তিনি মনে করেন।

মটের কথা শুনে হাইড আশ্বস্ত হলেন এবং তখনই তাঁর বেয়ারাদের ডেকে হুকুম দিলেন, পালকি সাজিয়ে মেমসাহেবকে ভাল একটি ট্যাভার্নে পৌঁছে দিয়ে আসতে। অবশেষে তাই করা হল। জাস্টিস হাইডের পালকি চড়ে নগরের নটী ডানডাস চলল ট্যাভার্ন সন্ধানে। নগরের লোক অবাক হয়ে দেখতে লাগল এবং যার মুখে যা এল তাই বলতে লাগল। দু-চারটে কথা ও মন্তব্য যে হাইডের কানেও পৌঁছয় নি, তা নয়। কিন্তু তিনি তা গ্রাহ্য করেন নি। সেটুকু সৎসাহস তাঁর বরাবরই ছিল দেখেছি। যা তিনি ভাল বুঝতেন বা করা কর্তব্য মনে করতেন, তা লোকজনের মতামত উপেক্ষা করেই করতেন। বিরূপ মন্তব্যে কখনও ভয় পেতেন না।

বেয়ারাদের ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি তাঁর ঘরে চুপ করে বসে ছিলেন, শুতে যান নি। তারা যখন ফিরে এসে বলল যে মেমসাহেব একটি ভাল ট্যাভার্নে উঠেছেন, এবং তার মালিক হুজুরের কথা শুনে তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করেছে, তখন তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম নিতে গেলেন।

পুডিং বিভ্রাট

দ্বিতীয় ঘটনাটি খাদ্য নিয়ে ঘটেছিল। সেটা উল্লেখ করছি এই জন্য যে হাইডের চরিত্র বুঝতে তা সাহায্য করবে। হাইডের এক বন্ধু একবার রংপুর থেকে তাঁর জন্য কিছু ভাল বাদাম পাঠিয়েছিলেন। বাংলাদেশের কোথাও সে বাদাম পাওয়া যেত না, একমাত্র রংপুরে ছাড়া। তাও আবার একটিমাত্র গাছে সেই বাদাম ফলত। হাইড কিছুটা ভোজনবিলাসী ছিলেন। বাদাম পেয়ে তিনি খুব খুশী হলেন এবং খানসামাকে ডেকে বলে দিলেন প্রতিদিন দুধের সঙ্গে বাদাম দিতে, আর তার সঙ্গে আমের পুডিং। খানসামা বৃদ্ধ, কানে একটু কম শুনত। তা ছাড়া হাইড বই পড়তে পড়তে ও লিখতে লিখতে, মুখ নীচু করে এমন ভাবে জড়িয়ে কথা বলতেন যে অর্ধেক কথা বোঝা যেত

না। খানসামার কানে তিনটি কথা মাত্র পৌঁছল—আমের পুডিংয়ের 'পুডিং'. কথাটি, 'দুধ' আর 'বাদাম'। সুতরাং সে ভাবল, সাহেব তাকে রাতের খানার জন্য ভাল করে 'বাদামের পুডিং' বানাতে বলেছে। যত বাদাম ছিল সমস্ত ঝেড়েমুছে দিয়ে সে পুডিং বানাল। খাবার সময় উৎসাহের সঙ্গে সেই পুডিং নিয়ে হাইডের সামনে টেবিলের উপর রাখা মাত্রই, তার চেহারা দেখে তিনি চমকে উঠলেন। চক্ষু বিস্ফারিত করে খানসামার দিকে চেয়ে বললেন, "এ যে বিশাল পুডিং দেখছি! কার জন্য বানিয়েছ, আমাদের জন্য, না ফোর্ট উইলিয়মের গোরা সৈন্যদের জন্য? তারাও খেয়ে শেষ করতে পারবে কিনা, আমার সন্দেহ আছে।"

খানসামা মুখ কাঁচুমাচু করে দাঁড়িয়ে রইল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "এখন বল তো খানসামা সাহেব, পুডিং নামে এই বিশাল পিণ্ডাকার পদার্থটির নাম কি? কিসের পুডিং?"

খানসামা হাত রগড়ে বলল, "আজ্ঞে হুজুর, এ হল আজ্ঞে পুডিং। আপনি বলেছিলেন হুজুর, তাই আজ্ঞে—বাদামের পুডিং।"

কথা শুনে লাফ দিয়ে উঠে হাইড বললেন, "হ্যাঁ, কি বললে, বাদামের পুডিং? আরে জানোয়ার, গর্দভ, রাস্কেল, স্কাউণ্ড্রেল, অপদার্থ কোথাকার! বাদামের পুডিং, না অশ্বডিম্ব বানিয়েছ! কে খাবে তোমার পুডিং? খাবেন কেউ আপনারা?"

নিমন্ত্রিত অতিথিরা খাবার টেবিলে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। হাইড আরও ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, "বাদামের পুডিং বানিয়েছ, সব বাদামগুলো শেষ করে দিয়েছ! বেরোও রাস্কেল, বেরিয়ে যাও বলছি—"

ইত্যবসরে একজন অতিথি একটুখানি পুডিং কেটে খেয়ে, "বাঃ বাঃ চমৎকার পুডিং দেখছি, বাদামের যে এত সুস্বাদু পুডিং হয় তা তো জানতাম না—" ইত্যাদি বলে বোধ হয় হাইডসাহেবকে সান্ত্বনা দেবার ও ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু হাইড তাতে শান্ত হলেন না, একবার রেগে গেলে সহজে তাঁকে শান্ত করাও যেত না। খানসামার উপর তাঁর অনর্গল কটুবাক্যবর্ষণ চলতে থাকল।

তারপর থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত কেউ আর হাইড-সাহেবের মুখে বাদামের কথা শোনেন নি। 'বাদাম' কথা উচ্চারণ করলেই তিনি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতেন। সামান্য পুডিং নিয়ে যে এই বিভ্রাটের সৃষ্টি হতে পারে, তা কেউ কল্পনাও করতে পারবেন না।

মুর্শিদাবাদের রেসিডেণ্ট

বন্ধু রবার্ট পটের চাকরিলাভের কাহিনী

জুলাই মাসের দিকে (১৭৮৪ সন) এসপ্লানেড অঞ্চলে বেশ বড় একটি বাড়ি খালি পাওয়া গেল। খোলামেলা ও আলোবাতাসের দিক থেকে এরকম বাড়ি হঠাৎ পাওয়া কঠিন। অতএব আর দেরি না করে বাড়িটা ভাড়া করে ফেললাম। বাড়িটা পুরনো হলেও বাদশাহী ধরনের এবং কোর্ট হাউসের কাছে, কলকাতার কেন্দ্রস্থলে এত সুন্দর বাড়ি তখন খুব কমই ছিল।

জুলাই মাসেই আমার বন্ধু রবার্ট পট খুব ভাল একটি চাকরি পেল। তখনকার দিনে কোম্পানির আমলের সবচেয়ে লোভনীয় চাকরি। বাংলার নবাবের দরবারে মুর্শিদাবাদে রেসিডেণ্ট (Resident) নিযুক্ত হল পট। বিরাট চাকরি, যেমন টাকা তেমনি মর্যাদা ও ক্ষমতা। নবাবের সমস্ত দেনাপাওনার টাকা, মাসহারা ইত্যাদি যা কিছু সব কোম্পানি তাঁদের মুর্শিদাবাদের রেসিডেণ্টের হাত দিয়ে পাঠান, এবং—'a considerable portion of it always stuck to his fingers'—সেই হাত দিয়ে নবাবের হাতে যাবার সময় তার বেশ খানিকটা অংশ রেসিডেণ্টের হাতের দশ আঙুলে আটকে থাকে (বোধ হয় হিকিসাহেব বলতে চান যে নবাবের টাকা-পয়সা লেনদেনের ব্যাপারে রেসিডেণ্ট বেশ দু পয়সা কমিশন পান—বি)।

শুধু তাই নয়, রেসিডেণ্টের অর্থাগমের আরও

একটি প্রশস্ত পথ ছিল, যা অনেকেই জানেন না। নবাব তাঁর ব্যক্তিগত ভোগবিলাসের জন্য ইয়োরোপীয় পণ্যদ্রব্যাদি যথেষ্ট কেনাকাটা করতেন, এবং তার সম্পূর্ণ ভার থাকত সাহেব রেসিডেণ্টের উপর। তিনি যা বলতেন, যা পছন্দ করে দিতেন, তাই তিনি বিলিতী বাছাই মাল মনে করে পরম নিশ্চিন্তে কিনে ফেলতেন। কোন্ বিদেশী দ্রব্যের কি মূল্য, তাও এদেশী নবাবের জানবার কথা নয়, বিদেশী রেসিডেণ্ট জানতেন। অতএব সেদিক থেকেও যথেষ্ট অর্থ পকেটস্থ করার তাঁর সুযোগ ছিল। কেউ সে সুযোগ অপব্যবহার করেছেন বলে মনে হয় না।

পট যখন ইংলণ্ডে ছিল তখন লর্ড হাই-চ্যান্সেলর থার্লোর (Lord Thurlow) চেষ্টায় সে এই চাকরিটি কোম্পানির ডিরেক্টরদের কাছ থেকে যোগাড় করে। তখন কথা ছিল যে সেই বছরেই (১৭৮৩ বা ১৭৮৪) রেসিডেণ্ট সার্ জন ডয়িলি (Sir John D'oyly) কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করবেন, এবং রবার্ট পট মুর্শিদাবাদের রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হবে। কিন্তু ডয়িলি সুযোগ বুঝে শেষ কোপ মারতে ছাড়লেন না। পটের চাকরি পাওয়ার কথা শুনে তিনি জানালেন যে ইচ্ছা করলে এখনই অবসর না নিয়ে তিনি আরও দু-তিন বছর চাকরি করতে পারেন। জানাবার উদ্দেশ্য হল, পটের উপর চাপ দিয়ে, ঘাড় মটকে, বেশ কিছু টাকা আদায় করা। গরজ পটের, চাকরি পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে যোগ দিতে না পারলে হয়তো পরে ফসকে যেতেও পারে। এবং চাকরিটাও যা-তা চাকরি নয়। পট তাই চট করে ডয়িলির টোপটি গিলে ফেলল।

বন্ধুবান্ধব আমরা সকলে তাকে নিষেধ করলাম, অনর্থক অর্থদণ্ড দিতে। কিন্তু চাকরির জন্য পট এত বেশী ব্যস্ত হয়ে উঠল যে কারও কথা সে শুনল না। দু-দশ হাজার টাকা নয়, শুনে তিন লক্ষ সিক্কা টাকা ডয়িলির হাতে পট সমর্পণ করেছিল। তাতেও নাকি ডয়িলি মন্তব্য করেছিলেন যে দু বছর আগে মুর্শিদাবাদের রেসিডেণ্টের চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের বিনিময়ে যা ন্যায্য খেসারত তাঁর পাওয়া উচিত ছিল, তা তিনি পান নি। তাই তিনি প্রস্তাব করলেন যে তাঁর গৃহের পুরনো আসবাবপত্তরগুলিও পটের কিনে নেওয়া উচিত। দাম ডয়িলির এজেণ্টই ঠিক করে দেবেন। এজেণ্ট দাম ঠিক করলেন ৯০ হাজার টাকা। পট নগদ মূল্যে ডয়িলির মালপত্তরও কিনে নিল, যদিও তার অধিকাংশই তার কোন কাজে লাগে নি। সর্বসাকুল্যে পটের কাছ থেকে প্রায় চার লক্ষ টাকা বিদায়-সেলামি নিয়ে ডয়িলি দয়া করে মুর্শিদাবাদের রেসিডেণ্টের পদ থেকে যথাসময়ের বছর দুই আগে অবসর গ্রহণ করলেন।*

মুর্শিদাবাদের রেসিডেণ্টের গদিতে বসবার সুযোগ পেয়ে পট ভারি খুশী হল, চার লক্ষ টাকা নগদ দক্ষিণার জন্য তার একটুও দুঃখ হল না। মহানন্দে মুর্শিদাবাদ যাত্রা করে সে তাড়াতাড়ি আফজলবাগে তার বাড়িটি দখল করে বসল। মুর্শিদাবাদ শহর থেকে প্রায় মাইল চার দূরে আফজলবাগ। রেসিডেণ্টের বাড়িটিও প্রাসাদতুল্য, গড়ন-পরিকল্পনাও অতি সুন্দর। কিন্তু তার চেয়ে আরও অনেক বেশী সুন্দর আমার বন্ধু পটের কল্পনা। সেই কল্পনাকে রূপ দেবার জন্য সে রেসিডেণ্টের পুরনো বাড়ি ভেঙেচুরে নতুন করে গড়তে আরম্ভ করল। কোথাও দুখানা ছোট ঘর ভেঙে একখানা বড় ঘর করল, কোথাও নতুন বারান্দা করল, কোথাও বা নতুন সিঁড়ি। তাতে বাড়ির চেহারাই একেবারে বদলে গেল, দেখলে মনে হয় যেন লাট-বেলাটের বাড়ি। বসবাসের ব্যাপারে

---

* কলকাতার বিখ্যাত 'black zamindar' গোবিন্দরাম মিত্র, মহারাজা নবকৃষ্ণ প্রমুখ কোম্পানির আমলের বাঙালী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ইংরেজরা অসদুপায়ে অর্থোপার্জনের অনেক অভিযোগ করে গেছেন। অভিযোগ খানিকটা অতিরঞ্জিত হলেও, একেবারে মিথ্যা নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে কোম্পানির বড় বড় সাহেব কর্মচারীরা যে কতদূর সিদ্ধহস্ত ছিলেন, মুর্শিদাবাদের রেসিডেণ্ট ডয়িলি তার একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। নিজের জাতভাইকে দোহন করতেও তিনি কিছুমাত্র দ্বিধা করেন নি। অতএব কোম্পানির আমলের বাঙালী বড়কর্তারা যদি 'গুরুর যোগ্য শিষ্য' হিসেবে ইংরেজ মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দু পয়সা করে থাকেন, তা হলে খুব অন্যায় করেন নি।—বি

দেখেছি, পটের বরাবরই একটা ব্যক্তিগত রুচি ছিল। তার সঙ্গে কারও তুলনা হয় না। বর্ধমানেও একবার সে মাত্র কয়েক মাসের জন্য ছিল, কিন্তু তার মধ্যেই বাড়ি ও আসবাবের ব্যাপারে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা খরচ করে ফেলেছিল।

একটি বিচিত্র দুর্ঘটনা

জীবনে দুর্ঘটনা ঘটেছে অনেক, বিশেষ করে কলকাতা শহরে, এবং অধিকাংশই আমার ফিটনগাড়ি চালাতে গিয়ে। একদিন এক ডিনারের নেমন্তন্নে একটু বেশী মাত্রায় মদ্যপান করে ফেলেছিলাম। পা টলছিল, বেসামাল বোধ করছিলাম। ভোজ শেষ হবার পর, ক্যাপ্টেন বন্ধু মর্ডান্টাট বললেন, তাঁকে নিয়ে ফিটনে করে একটু বায়ু সেবন করাতে। সুরা পানের পর বায়ু সেবন বেশ ভালই লাগে। আমিও তাই রাজী হলাম, এবং দুর্বুদ্ধির বশে নিজেই ফিটন হাঁকিয়ে বেড়াতে বেরুলাম। বল্‌গা হাতেই ধরা রইল, কিন্তু তাতে ঘোড়া দুটির ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়নোর কোন বাধা হল না। পিঠে চাবুক পড়তে বেগ প্রায় বাতাসের গতি ধরল। চোখে তখন ক্ল্যারেটের রঙ ধরেছে, ফুরফুরে হাওয়া লাগছে গায়ে, আর মনে হচ্ছে যেন দেবদূতদের মতন পুষ্পরথে করে স্বর্গের দিকে উড়ে চলেছি। জানিও না কখন ঘোড়া দুটি ফোর্টের দিকে বাঁক নিয়েছে। ক্যাপ্টেনের ইচ্ছা ছিল ফোর্টের ভিতর দিয়ে যাবার। আমি নিজেই তাই শুনে ঘোড়ার মুখ কখন কেল্লার দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছি খেয়াল নেই। স্বর্গের বদলে যে আমরা ফোর্টের দিকে চলেছি, এবং দুরন্তবেগে, তাও হুঁশ নেই। ফোর্টের ভিতরে ঢোকার রাস্তাগুলি সরু সরু, জোরে গাড়ি চালিয়ে যাওয়া কখনই উচিত নয়। সে চেতনা তখন আমাদের লুপ্তপ্রায়। সরু পথে ঘোড়া সবেগে ছুটেছে, ডান-বাঁ জ্ঞানও নেই। ফোর্টের ভিতর থেকে আর একখানি গাড়ি আসছিল বাইরে। কিভাবে যে আমার ফিটন তার গা ঘেঁষে তীরবেগে বেরিয়ে গেল, এবং কেমন করে সামনাসামনি প্রচণ্ড সংঘর্ষে ধুলোয় গুঁড়িয়ে না গিয়ে তার পক্ষে এই ভেল্‌কি দেখানো সম্ভব হল, তা আমি জানি না, আমার ঘোড়ারা জানে। ধাক্কা যদি লাগত তা হলে ধরাধাম থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হত, শেলের মতন গাড়ির জোয়াল বিঁধত বুকে এবং তার ফলে হাড়-পাঁজর টুকরো টুকরো হয়ে হাওয়ায় উড়ত নিশ্চয়। ভাবতেও গা শিউরে ওঠে।

একটা ফাঁড়া কেটে গেল। ফোর্টের ভিতর ঢুকলাম, গাড়ির বেগ না কমিয়ে। তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে, ভাল করে পথও দেখছি না চোখে। এমন সময় একটা তীব্র গোঙানি শুনে চেয়ে দেখলাম, জনৈক গোরাসৈন্য আমার ফিটনের ধাক্কায় রাস্তায় চিত হয়ে পড়েছে, এবং কি করব ভাবতে না ভাবতে নিমেষের মধ্যে ঘোড়া দুটো ও গাড়ির চাকাগুলো তার দেহের উপর দিয়ে চলে গেল মনে হল। ফিটন থামাব কিনা ভাবছি, এমন সময় ক্যাপ্টেন বললেন, "কি করছেন হিকিসাহেব? তাড়াতাড়ি গাড়ি হাঁকিয়ে কেটে পড়ুন, অন্ধকারে কেউ দেখতে পায় নি। সৈনিকের দফা শেষ হয়ে গেছে, তার জন্য কোন চিন্তা নেই।"

বুকের ভেতরটা ঢিপ ঢিপ করে উঠল। ভয়ে অবশ হয়ে বল্‌গা ছেড়ে দিলাম। ঘোড়া দৌড়ে ফোর্ট পার হয়ে গেল। বাইরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। মনটা কিন্তু একেবারে দমে গেল। একটা নিরীহ লোককে এইভাবে বধ করলাম ভেবে কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। দ্বিতীয় দিন সকালে আমার বন্ধু ফোর্টের ডাক্তার উইলসনের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ফোর্টের ভিতরে ঢোকার সময় পলাতক খুনী আসামীর মতন অপরাধী বোধ করছিলাম। ডাক্তার উইলসনের কাছে গিয়ে, এ কথা সে কথার পর, জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা, দু-একদিনের মধ্যে ফোর্টের ভিতরে কোন গাড়িচাপা-টাপার দুর্ঘটনা ঘটেছে কি?" ডাক্তার বললেন, "দিন দুই আগে সন্ধ্যাবেলা একটি অদ্ভুত দুর্ঘটনা ঘটেছে। তৃতীয় রেজিমেন্টের একটি সৈনিক কর্নেল হ্যাম্পটনের কোচগাড়িতে চাপা পড়েছে। মনে হয় গাড়ির জোয়ালে জোরে বুকে ধাক্কা লেগেছিল,

কর্নেল বুঝতে পারেন নি বলে চলে গেছেন। সৈন্যটাকে আহত অবস্থায় ধরাধরি করে আমার কাছে নিয়ে আসতে, আমি তার অবস্থা দেখে ভাবলাম হয়তো টেঁসেই যাবে। কিন্তু খানিকটা রক্ত কেটে বার করে দেবার পর সে বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল। এখন হাসপাতালে ভালই আছে, বোধ হয় কাল সকালেই ছাড়া পেয়ে যাবে।"

এই কথা বলে ডাক্তার উইলসন বললেন, "সৈন্যটি নিজের দোষেই চাপা পড়েছিল। মদ খেয়ে বেশ উন্মত্ত অবস্থায় সে রাস্তা দিয়ে চলছিল, আর কর্নেলের ঘোড়াও গিয়েছিল খেপে, তিনি সামলাতে পারেন নি। পলাশীর গেট দিয়ে নাকি তীব্র বেগে তাঁর গাড়ি বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল। সৈন্যটির ধারণা, কর্নেলের গাড়ি, আমার ধারণা কিন্তু অন্যরকম। অন্য কারও গাড়ি, এবং আরোহী চারজন নয়, দুজন। তবে এই সময় সন্ধ্যাবেলা প্রায় কর্নেল হ্যাম্পটন গাড়ি করে ফোর্টের মধ্যে ঘুরে বেড়ান বলে সৈন্যটি তাঁর কথা বলেছে।"

আহত সৈন্যটি ভাল আছে ও সুস্থ হয়ে উঠছে শুনে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। নিজের অপরাধ স্বীকার করার সাহসও পেলাম অনেক। ডাক্তারকে বললাম, পূর্বাপর সব ঘটনার কাহিনী। শুনে তিনি আমার পলায়ন-কৌশলের জন্য ধন্যবাদ জানালেন। আমি বললাম, "লোকটি সুস্থ হয়ে উঠলে, অনুগ্রহ করে একদিন যদি তাকে আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দেন, আমি ক্ষতিপূরণ বাবদ তাকে কিছু টাকা দেব তা হলে।" উইলসন রাজী হলেন।

কয়েকদিন পরে সৈন্যটি এল আমার বাড়িতে, তার রেজিমেণ্টের ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে একখানি চিঠি নিয়ে। চিঠিতে তিনি লিখেছেন, "আপনার ক্ষতিপূরণের উদার প্রস্তাবে আমরা সকলেই খুব খুশী হয়েছি। তবে টাকাটা যদি সৈন্যটির হাতে না দিয়ে আপনি তার স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেন তা হলে খুবই ভাল হয়। সৈন্যটি এমনিতে খুব ভাল, সাহসী ও কর্তব্যপরায়ণ, কিন্তু একটি মারাত্মক দোষ তার মদ্যপান। টাকা হাতে পেলে সে মদ খেয়ে উড়িয়ে দেবে। তার স্ত্রী অত্যন্ত পরিশ্রম করে চারটি ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন, সংসার দেখছেন, এবং মুখ বুজে মাতাল স্বামীর সব অত্যাচার সহ্য করছেন। সেইজন্য আমার অনুরোধ, টাকাটা আপনি দয়া করে তার স্ত্রীর কাছেই পাঠিয়ে দেবেন।"

চিঠি পেয়ে আমি তাই করলাম, বেশ মোটা একটা টাকা তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ের নামে পাঠিয়ে দিলাম। কিন্তু তাকেও একেবারে খালি হাতে বিদায় করতে কষ্ট হল, দুটি সোনার মোহর দিলাম তাকে। পরে খবর পেয়ে খুশী হলাম যে সৈন্যটি সেই মোহর দুটি নিজে খরচ না করে তার স্ত্রীকেই পাঠিয়ে দিয়েছিল। তার স্ত্রী তাই দিয়ে সংসারের প্রয়োজনীয় অনেক জিনিসপত্র কিনেছিলেন।

[ক্রমশ]

'শনিবারের চিঠি'র ভাদ্র সংখ্যাটি "পূজা-সংখ্যা"রূপে মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হইতেছে। পূজা-সংখ্যার বিস্তৃত বিবরণ শ্রাবণ সংখ্যায় দেওয়া হইবে।

পাগ্‌লা-গারদের কবিতা

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

এক নদী, বহু তরঙ্গ

দূর হতে সমুদ্রের গন্ধ ভেসে আসে,
জলাক্ত নুনের গন্ধ। সেই গন্ধ নাকের ডগায়
নিয়ে নিয়ে বয়ে চলে বহু-তরঙ্গিত এক নদী
আনমনা।
খোঁজে না সে পথ, তাই পথ তারে ফেরে খুঁজে খুঁজে।

আকাশের এক চাঁদ তার বুকে বহু হয়ে যায়;
এক সূর্য বার বার শুষে নিতে চেয়ে তার তরঙ্গ অনেক,
বার বার ব্যর্থ হয়;
অনেক, অনেক স্মৃতি এক শূন্যে ভিড় করে ভাসে;
ঝিকমিক করে তারা, খসে খসে পড়ে কখনও বা
শূন্যেই হারিয়ে যায়।

কভু মেঘে ঢাকা রৌদ্র, কখনও বা রৌদ্রের ধমকে
অন্ধ মেঘ; মাঝে মাঝে ইন্দ্রের ধনুক
এক সাথে বহু চোখে বহু রূপে দেখা দিয়ে হাসে;
বহু-তরঙ্গিত নদী দেখে, কভু দেখেও দেখে না,
আনমনে বয়ে চলে সমুদ্রের গন্ধ শুঁকে শুঁকে।

দুই দিকে দুই তীর বাধা নয়, দেয় অগ্রগতি;
ভেসে ভেসে চলে স্রোত অনেক নৌকার তলা দিয়ে;
কখনও বা আসে ঝড়, বজ্রনাদ, বিদ্যুৎ-চমক,
বৃষ্টির মুষলধারা বেঁধে এসে সজারুর কাঁটার মতন
ক্ষমাহীন।

পরোয়া করে না নদী, কোনও বাধা করে না সে ভয়;
নাকে সমুদ্রের গন্ধ, কানে নিয়ে সমুদ্র-আহ্বান
বহু-তরঙ্গিত নদী বহুরঙ্গে আনমনে বয়ে বয়ে চলে,
করে না সমুদ্র-খোঁজ;
সে জানে সমুদ্র তারে টেনে নেবে নিজেরি গরজে।

হুল ও মধু

যে নদীতে তরী ভাসে তারি জলে মাঝে মাঝে তরী
ডুবে যায়,
হে মৌমাছি!
হুলন্দাজ রূপে জানি বোল্‌তার তুমি কাছাকাছি,
কিংবা তার চেয়ে ঢের পাকা—
মধুকর রূপে তব হুলন্দাজ রূপ পড়ে ঢাকা,
খেজুরি কাঁটার খোঁচা খেজুরি গুড়েতে কেবা পায়?
তোমার হুলের হলাহল
তোমার মধুতে খোঁজা ব্যর্থ হবে জানি,
(গহন অরণ্যে কোথা নগরের কল-কোলাহল?)
মাঝে মাঝে তবু হায় শুনি তাহাদের কানাকানি
যারা সারা বেলা
তোমার হুলের কথা ভুলিতে পারে না, তাই
তোমার মধুরে করে হেলা।

পাথরের জনার্দন পাল

পার্কের ঈশান কোণে বসে আছে পাথরের বেদীর ওপর
পাথরের জনার্দন পাল,
মুখে তার সূক্ষ্ম হাসি, ভাঙা দুটি গাল,
পায়ে পাথরের চটি, গায়ে তার পাথরের শাল।

ভাবী ছেলেদের ভবিষ্যৎ ভেবে ভেবে
মাথার অনেক ঘাম পায়ে ফেলে জনার্দন পাল
বিশ-ত্রিশ পতি থেকে হয়েছিল বহুলক্ষপতি
চড়া দামে বেচে বেচে শস্তা কেনা নানাবিধ মাল।

করেছিল বহু কিছু আমদানি রপ্তানি
মোটা মোটা মুনাফায় পাল জনার্দন,
নিজে রোগা থেকে। তার ছেলেরাই করিছে কাপ্তানী
সে পয়সায়, ছিনিমিনি খেলার মতন।

পাথরের সাদা বুকে কালো কালো অক্ষরেতে লেখা
জনার্দন কীর্তিকথা আনমনে নীরবে ঝিমায়।
জনারণ্য মাঝে আহা জনার্দন একান্তই একা,
খেয়াল করে না কেহ, তার পানে যদি বা তাকায়।

কত শিশু বড় হয়ে বাবা হল নতুন শিশুর,
তারপর পিতামহ, তারপর মিশে গেল পাঁচে।
পাথুরে বেদীর 'পরে নীরব নিস্পন্দ নির্বিকার
সেই একই চেহারার জনার্দন পাল বসে আছে।

জানি জানি একদিন অক্কা পেয়ে চলে যাব আমি,
কোথা যাব জানে মহাকাল।
পার্কের ঈশান কোণে তখনও হয়তো বসে রবে
পাথরের জনার্দন পাল।

বিশ্বসাহিত্যের সূচীপত্র

শ্রীদীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল

প্রথম খণ্ড : উপন্যাস

'ওল্ড গোরিয়ো' (১)

"Glory is the sunlight of the dead"
—Balzac.

বালজাকের সাহিত্যজীবনের সকাল তখনও ভাল করে স্বরু হয় নি।

খুব ছোট একখানা একফালি ঘর। ঘর বললে একটু বাড়িয়েই বলা হয়; কোনওরকমে মাথা গোঁজা যায় এমন একটুকরো জায়গা। শোবার, খাবার, পরবার, কেউ এলে আড্ডা দেবার এবং লেখবার ঘর। সেই ঘরের মধ্যে পা-ভাঙা চেয়ার, নড়বড়ে টেবিল, টেবিলের ওপর কালির চেয়েও কালো-হয়ে-যাওয়া দোয়াতদান, একটুকরো রুটি, একটি অপরিষ্কার গেলাস, এক জাগ লেমোনেড, ভিখারীর পক্ষেও ব্যবহারের অযোগ্য শতছিন্ন শয্যা পাতা, যে কোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে এমনই একটি তক্তাপোশ। সেই ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখছিলেন বালজাক; একটি বন্ধু আসতে স্বপ্ন ভেঙে গেল তাঁর। অভিবাদনের কর বাড়িয়ে দিতে দিতে স্বাগত জানালেন :

"Welcome, my friend, to the abode which I have not left except once for the last two months. During all this time I have not got up from my bed where I work at the great masterpiece".

টেবিলের ওপর পরম নিশ্চিন্তে পড়ে আছে একটি নাটকের ধুলায় ধূসর পাণ্ডুলিপি—লেখকের নিজের মতে, 'great masterpiece'। নিজের প্রতিভার ওপর দুর্জয় আস্থা সত্ত্বেও বালজাক পাণ্ডুলিপি হাতে দ্বারস্থ হলেন The Academie Francaise-এর সভ্য একজন বিশেষজ্ঞের। ডাক্তারের কাছে অসুস্থ শিশুকে এনে তার মা যেমন জানতে চায় তার সন্তান সারবে কিনা, তেমনই নাটকের পাণ্ডুলিপি বিশেষজ্ঞের হাতে তুলে দিয়ে বালজাক প্রশ্ন করেন :

"Will you kindly examine this work, Monsieur, and tell me what I should do in the future."

পাণ্ডুলিপি পাঠ করে সাহিত্যের শল্য-চিকিৎসক রায় দেন : "In the future do anything but write."

বকের ছদ্মবেশে স্বয়ং ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে পরীক্ষা করবার কারণে জিজ্ঞেস করেছিলেন : 'বিস্ময়' কি? ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির তার উত্তর করেছিলেন : প্রত্যহ কত লোক মৃত্যুর কটাহে যমের খাদ্যে রূপান্তরিত হচ্ছে, তবুও লোকে তা অবলোকন করেও বিশ্বাস করতে চায় না যে তারও অবধারিত পরিণতি ওই মৃত্যুর কটাহে যমের খাদ্যরূপে—এর চেয়ে বড় 'বিস্ময়' নেই আর। জীবন-জিজ্ঞাসু না হয়ে ধর্ম যদি সাহিত্যজিজ্ঞাসু হতেন তা হলেও ওই এক উত্তরের ছাঁচ থেকেই তৈরী হতে পারত, 'সাহিত্যের বিস্ময় কি'—এই প্রশ্নের মীমাংসাও। সব দেশে সব যুগের সাহিত্য ব্যাপারেই সমকালীন মতামত কতবার ভ্রান্ত প্রমাণিত হল; তবুও, আজও সমকালের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক সম্পর্কেও কখনও কখনও এই রায় দিতে বাধে না লিটারারি এক্সপার্টদের : "In the future do anything

but write"। বিশ্বসাহিত্যেই এর চেয়ে বড়, এর চেয়ে চরম 'বিস্ময়' আর কি ?

'Morning shows the day'—বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবপ্রকৃতি, দুয়েরই ক্ষেত্রে এর চেয়ে বড় অসত্য যে আর কিছু নেই—যেন তাই প্রমাণ করবার জন্যেই বালজাক তাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রারম্ভেই এমন একজনের কাছে গিয়েছিলেন যাঁর সুস্পষ্ট মত ছিল, বালজাক আর যাই করুন, বালজাক যেন লেখবার চেষ্টা না করেন। এই মত যে কতদূর ভ্রান্ত, এই ভবিষ্যদ্বাণী যে কি পরিমাণ উদ্‌ভ্রান্ত তারই পরিচয়ে, বিশ্বসাহিত্যের বৃহত্তম সৃষ্টির প্রয়াস The Human comedy-র [Old Man Goriot যার Life-force] স্রষ্টা Honore De Balzac-এর সাহিত্য-জীবন প্রদীপ্ত। যে মুহূর্তে বালজাক শুনতে পেলেন যে ভবিষ্যতে তিনি যাই হতে চান লেখক হতে না চান যেন কখনই, সেই মুহূর্ত থেকেই উজ্জ্বলতর হল দুই চোখে জীবনদৃষ্টি, হাতের মুঠিতে ধরা কলমের মুখে অক্ষরের অক্ষৌহিণী হল সজ্যবদ্ধ, প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তর হল তৎক্ষণাৎ: লেখক ছাড়া আর কিছুই হতে চান না তিনি।

সকাল থেকে মেঘের পর মেঘ জমে আকাশে, দেখা যায় না সূর্যের মুখ। সবাই স্থিরসিদ্ধান্ত করে আবহাওয়া বিভাগের উৎসাহে যে আজকের সমস্ত দিনটাই এমনই কেটে যাবে; প্রায় এমনই ভাবে কেটেও যায় দিন। দিন ফুরিয়ে যাবার আগে ঘটে যায় অঘটন। সূর্যানন থেকে সহসা অপসারিত হয় মেঘের মুখঢাকা। সারাদিনের কামাইয়ের ক্ষতিপূরণ করে দিবসের শেষ সূর্য; চতুর্গুণ তেজে দীপ্ত হয়—উদ্দীপ্ত করে বিশ্বচরাচরবাসীকে। লেখা থেকে শতহস্ত দূরে থাকার উপদেশ হেলায় অগ্রাহ্য করে মেঘমুক্ত সূর্যের মত ব্যর্থতার আর হতাশার, অসাফল্যের আর অমর্যাদার অন্ধকার অপসারিত করে জ্বলে উঠেছেন যে বালজাক বারবার, তাঁর 'The Human comedy'-র চেয়ে বিস্ময়কর সৃষ্টিপ্রয়াসের ঘটনা বিশ্বসাহিত্যেও আর একবার অনুষ্ঠিত হবার দৃষ্টান্ত আজ পর্যন্ত অনুপস্থিত। বিশ্বসাহিত্যের বৃহত্তম বিস্ময় 'দি হিউম্যান কমেডি'র স্রষ্টা, 'The Academie Francaise-এর সভ্য কর্তৃক তিরস্কৃত হয়েছেন সাহিত্য-জীবনের প্রারম্ভে ওই একবারই কেবল, এমন নয়। জীবনের শেষেও পান নি অ্যাকাদেমীর স্বীকৃতি ["He died at night. It must have been night over France, for the people took scarce notice of his passing. But even in the daytime of his life they had given him no glory. When he had applied for membership in the French Academy of letters, the pompous gentleman slammed the door in the 'face of the clown'."]।

এই একই লোক সম্পর্কে তাঁর মৃত্যুর শতাব্দীকাল পরে আমরা পড়ছি:

"As I said at the beginning of my introduction to War and Peace, of all the great novelists that have enriched with their works the spiritual treasures of the world, Balzac is to my mind the greatest. He had genius." [Great Novelists and Their Novels]

অনরে ছ বালজাক নিজের জীবন দিয়ে যা আবিষ্কার করেছিলেন তাই বিধৃত রয়েছে উপরে উদ্ধৃত তাঁর বাণীর মধ্যেই—"Glory is the sunlight of the dead।"

এই পৃথিবীতে কোনও কোনও মানুষ কখনও কখনও অতিরিক্ত জীবনীশক্তি নিয়ে আসে; উদ্বৃত্ত স্বাস্থ্যের ছটা তাদের সর্বাঙ্গে ঝলমল করে। তারা হাসে বেশী, কাঁদে বেশী, এবং সাধারণ লোকের চেয়ে মানুষকে ভালবাসে অনেক বেশী। স্বাস্থ্যরক্ষার ধার এরা কোনও দিন ধারে না; বরং স্বাস্থ্যই নিজের থেকে আগু বাড়িয়ে এদের সযত্নে রক্ষা করবার সব দায়িত্ব গ্রহণ করে। প্রকৃতি এদের দেয় বেশী বলে নেয়ও বেশী। ভাবনাশক্তি অতিরিক্ত অপব্যয়ের আশ্চর্য ক্ষমতায় প্রায়ই এদের চলে যেতে হয় অসময়ে। যতদিন থাকে ততদিন এদের দিকে তাকিয়ে মানুষের বিস্ময় হার মানে; যেদিন যায় সেদিনও

সারা জগৎকে জানান দিয়ে তবে যায়। সেই উল্কাপাতের দিকে চেয়েও বিস্ময়ের সীমা থাকে না সমসাময়িক কালের।

অনরে দ্য বালজাক, La Comedie Humaine-এর রচয়িতা, একটু অতিরিক্ত, একটু অপরিমিত প্রতিভাই সম্ভবতঃ নিয়ে এসেছিলেন। 'সম্ভবতঃ' বললাম বটে, কিন্তু একান্ন বছরের মধ্যে [১৭৯৯-১৮৫০] বালজাকের সংখ্যাহীন রচনার পরিমাণ অবগত হলে যে কেউ 'সম্ভবতঃ' কথাটা সংশোধন করে যে কথা বসাতে চাইবেন তা হচ্ছে 'অসম্ভবতঃ'। 'অসম্ভবতঃ' ব্যাকরণসঙ্গত হবে কিনা এক্ষেত্রে, জানি না; তবে জীবনসঙ্গত যে তা জানি। অন্ততঃ বালজাকের ক্ষেত্রে যে জীবনসঙ্গত নয় তা জানি। এবং বিশ্বসাহিত্যের পাঠক হিসেবে আরও যা জানি তা হচ্ছে প্রতিভার বিচারে কেবল রচনার মহত্বই গণ্য নয়, রচনার সংখ্যাও গণনার যোগ্য। দু-চারটি 'ব্যতিক্রম'কে বাদ দিলে, দেশেকালে প্রতিভাবানদের একটি সংজ্ঞা সম্পর্কে অন্ততঃ দ্বিমত বা দ্বিধার অবকাশ নেই। রচনার মাহাত্ম্য এবং পরিমাণের অজস্রতার গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম ঘটেছে যেখানে কেবল সেখানেই দেখা পাওয়া গেছে প্রতিভার। সব দেশে সব কালেই প্রতিভা বিরল; La Comedie Humaine-এর গুণ এবং ওজন বালজাককে করেছে বিরলতর প্রতিভা। কেন করেছে তা জানতে হলে অতি অবশ্যই মনে রাখতে হবে এই অনবদ্য উক্তি:

"...Fertility is a merit in a writer, and Balzac's fertility was prodigious. His field was the whole life of his time and his range as extensive as the frontiers of his country. His knowledge of men was vast,...and he knew the middle class of society, doctors, lawyers, clerks and journalists, shopkeepers, village priests.... His observation was precise and minute. His invention was stupendous, and the list of characters he created is staggering."

এই উক্তি বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে; যদিও বালজাকের 'prodigious fertility' ব্যাখ্যার অতীত। 'দি হিউম্যান কমেডি'র ভূমিকায় বালজাক নিজেই ব্যাখ্যাকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে এই রচনাবলী 'হিউম্যান কমেডি'র মত দুঃসাহসিক দাবিযুক্ত নামকরণের যোগ্য কি অযোগ্য, সে বিচারের ভার ন্যস্ত করেছেন পাঠকের ওপর।

বালজাকের এই 'হিউম্যান কমেডি' মানবজীবনের বৃহত্তম শোভাযাত্রা; দু হাজার মানুষের মুখ এই মিছিলে ক্রূরতা ও উদারতার মেঘ ও রৌদ্রে, সাফল্য ও ব্যর্থতার আলোছায়ায়, মৃত্যু ও জন্মের কান্না-হাসির পৌষ-ফাগুনের পালায় অপরূপ হয়ে দেখা দিয়েছে। কড়া কালো কফির কাপের ওপর দীর্ঘ বাইশ বৎসরের বিনিদ্র রাত্রির বিরামহীন প্রয়াসের পরিণতি। মাসের পর মাস কখনও চোদ্দ, কখনও ষোল, কখনও আঠার ঘণ্টা কাজ করেছেন দিনে। দু হাজার চরিত্র পর্যন্ত উপস্থিত করতে পেরেছিলেন তিনি; তিন থেকে চার হাজার চরিত্রের পরিকল্পনা ছিল তাঁর। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে 'দি কমেডি হিউমেন' এই অসাধারণ সাধারণ শিরোনামায় তখনও পর্যন্ত প্রকাশিত উপন্যাসের এবং ক্রমশঃ প্রকাশিতব্য উপন্যাসের পরিচয়-লিপির যে তালিকা তিনি ঘোষণা করেন তাতে প্রত্যেকটি উপন্যাসের আলাদা আলাদা যে নাম তিনি দিয়েছিলেন এবং ভবিষ্যতে দিতে চেয়েছিলেন, সর্বসাকুল্যে তার যোগফল দাঁড়িয়েছিল এক শত চুয়াল্লিশ। এই সময়ের মধ্যে অন্যান্য প্রবন্ধ, গল্প এবং নাটিকা ছাড়া, 'হিউম্যান কমেডি'র অন্তর্গত প্রায় নব্বইটি উপন্যাস তিনি প্রকাশ করে যান—যে উপন্যাসের প্রায় প্রত্যেকটিকে প্রথম শ্রেণীর বলে রায় দিয়েছেন বিশ্বের বিদগ্ধজন।

পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি বালজাক। তাঁর জীবনের ভাষ্যকারের তার জন্যে এতটুকু খেদ নেই:
"Balzac never completed his grandiose plan. He was an artist rather than an artisan; and it is the artisan alone who can ever complete his task. Every novel in the

Human Comedy was written in an agony of toil. His style was obscure. The fires of his inspiration were often darkened with the smoke of a heavy phraseology. But to the end of his life he struggled with the burden of his creation, and he left a monument all the more magnificent for its unfinished strength." [Living Biographies of Famous Novelists]

নির্বাণের মধ্যে যে সৃষ্টির অন্ত খোঁজে সে যোগী ; আর অন্তহীন সৃষ্টির শিখা যার মধ্যে অনির্বাণ জ্বলে সেই-ই শিল্পী।

কিন্তু এই সুদীর্ঘ বাইশ বছর ধরে শুধুই কি উপন্যাস-লেখা চলছিল ? না। নেপথ্যে চলছিল জীবনের লেখাও ; জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রণয় লেখা। খেলা খেলা করে যে লেখা আরম্ভ হয় তাই একদিন আগুন ধরিয়ে দেয় ক্ষুধিত কামনার স্তূপে ; জ্বলে ওঠে জীবনের, যৌবনের নিষিদ্ধ আলো—আলো নয় আলেয়া। সেই আলোয় ঝাঁপ দেবার জন্যে পতঙ্গ, সেই মরীচিকায় পথ ভুলে মরবার জন্যে উদ্‌ভ্রান্ত পথিক বারবার উন্মুখ হয়। বারবার ব্যর্থ যৌবন করাঘাত করে নিষিদ্ধ জীবনের বন্ধ দরজায় ; তারপর একসময় মেঘে মেঘে আকাশকুসুম তুলে সূর্য যখন অস্তে পড়ে ঢুলে তখনই অবারিত হয় জীবনের সিংহদ্বার। আলোর সঙ্গে পতঙ্গের আলিঙ্গন হয়, তৃষ্ণার সঙ্গে পানীয়ের হয় মিলন। কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে অনেক ; জীবনের মশালে নিঃশেষ হয়ে, পুড়ে ফুরিয়ে ছাই হয়ে গেছে যৌবনের দাহিকাশক্তি।

টিকিটের ওপর ওডেসার একটি ডাকঘরের ছাপ সমেত চিঠি আসে বালজাকের কাছে ; L' Etranger—এই ছদ্মস্বাক্ষরে। বালজাকের লেখার অনুরাগিণী এই পত্রপ্রেরকের ঠিকানা অজ্ঞাত থাকায়, বালজাক রাশিয়ায় প্রবেশানুমোদিত একমাত্র ফরাসী পত্রিকায় এই বিজ্ঞপ্তি দেন : "M. de B has received the communication sent to him ; he has only this day been able by this paper to acknowledge it and regrets that he does not know where to send his reply."

এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হবার পর বালজাকের লেখার অনুরক্তা সম্পর্কে আমরা জানতে পারি যে : "...She saw Balzac's advertisment and so arranged that she might receive his letters if he wrote to her in care cf a bookseller at Odessa."

বালজাকের লেখার ভক্ত এই পত্রপ্রেরক অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত এবং বিপুল সম্পত্তির মালিক এক পোলিশ মহিলা। নাম—Eveline Hanska। চিঠি লেখবার কালে এঁর বয়স বত্রিশ ; বিবাহিত ; স্বামী বয়সে অনেক বড়। এবং পাঁচটি সন্তানের মধ্যে তখন একটি কন্যাই কেবল জীবিত।

এবং বালজাকের জীবনের এবং সাহিত্যের সূত্রধার বলছেন যে অতঃপর : "A correspondence ensued." এবং ওই সঙ্গেই একটি কথায় বালজাকের প্রণয়পর্বের আভাস দিয়েছেন এই বলে :

"Thus began the great passion of
Balzac's life."

যৌবনের রঙিন কাগজে হৃদয়ের সবুজ লিপিকা—এই চিঠিতে বালজাক অক্ষরের স্বরলিপিতে চিরকালের জন্য বেঁধে রেখে গেছেন শব্দের সঙ্গীত। এই চিঠির প্রত্যেকটি ছত্রে স্পর্শ করা যায় রক্তমাংসের একটি মানুষকে। চিঠি বললে এইগুলিকে প্রায় কিছুই বলা হয় না। এর সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া স্বয়ং বালজাকের পক্ষেও সহজ হত না। একটি মানুষের মনের ভাবনা-চিন্তা, কামনা-বাসনা, সৃষ্টি করতে পারার আনন্দোল্লাস এবং বন্ধ্যা দিনের ব্যর্থতার হাহাকার এই পত্রে উজাড় করে আর একজনের পায়ে ঢেলে দিয়েছেন বালজাক। নিজেকে নিংড়ে নিংড়ে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত রিক্ত, বিপর্যস্ত, এক হতভাগ্য বহন করে এনেছে এই পত্রে জীবনের পাত্রে যৌবনের অঞ্জলি। সে অঞ্জলি দেবার সময় হয়েছে যখন তখন জীবননাট্যের কবররূপে দগ্ধশেষ মশালের ভস্মরাশি মাত্র বাকী আছে

ছড়িয়ে পড়ার। নির্বাপিত হবার আগে সেই প্রাণের মশাল, নিরুত্তাপ হবার আগে সেই যৌবনের স্পর্শ আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেছে নিখিল বিশ্বের সমস্ত নর-নারীর রক্তে, তার শিরায় শিরায়। প্রাণের সেই আগুন—যে আগুনের আলোয় আজও জ্বলে ওঠে অন্ধকারে অস্ত যাবার আগে স্বর্ণময় সন্ধ্যাকাশ একবার, যৌবনের সেই স্পর্শ, যে স্পর্শে আজও আর একবার আন্দোলিত হয় বসন্তপূর্ণিমার রাত্রে কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী।

সার্ভেন্টিস, বালজাক, হুগো, ডুমা—বিশ্বসাহিত্যের যাঁরা বিস্ময় তাঁদের বিস্ময়কর গল্পের নটেগাছ যে চিরকালের জন্যে মুড়িয়েছে; ফুরিয়ে গেছে আরব্যোপন্যাসের এক হাজার এক রাতের সব রোমাঞ্চ তার কারণ কেবল এই নয় যে দুনিয়ার ভোল পালটে গেছে অথবা মানবজীবন হয়েছে জটিলতর। তার সবচেয়ে বড় কারণ সার্ভেন্টিসের মত, বালজাক হুগো ডুমার মত অভিজ্ঞতার কালিতে জীবনের গল্প হৃদয় দিয়ে লেখবার কলম হাতে নিয়ে আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না জগৎপারাবারের তীরে যেখানে মানবশিশুর মেলা সেখানে তাদের সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে দাঁড়াতে। তাদের আনন্দে আনন্দ, তাদের দুঃখে দুঃখ তেমন করে আর বাজে না মানুষের গল্প শোনাবার ভান করে যারা আজ তাদের; জীবনের গল্পে তাই আজ বিচার, বুদ্ধি, বিশ্লেষণ, দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতির তত্ত্ব সব আছে; নেই কেবল জীবন। নেই তার কারণ জীবনের গল্প মানবজীবন থেকে দূরে দাঁড়িয়ে লেখা সম্ভব নয়। মানুষের গল্প মানুষের সঙ্গে না মিশে ঘরে বসে লেখা অসম্ভব। জীবনে জীবন যোগ করতে জানার জাদু নেই যার চোখে ব্যর্থ হতে বাধ্য 'কৃত্রিম তার গানের পসরা'। 'থি. মাস্কেটীয়ার্স', 'ট্রিস্ট্রাম শ্যাণ্ডি', 'লে মিসারেবল', 'হিউম্যান কমেডি' এবং সবার আগে সবার উপরে 'গালিভার্স ট্রাভেলস', 'রবিনসন ক্রুসো' এবং 'ডন কুইক্সোট' কি শুধুই বয়স্ক শিশুপাঠ্য গল্প? না। এরও মধ্যে অবশ্যম্ভাবী উপস্থিত হতে হয়েছে তত্ত্ব, এবং জীবনদর্শনকে। তা না হলে নিছক গল্পের দাবিতে এরা টিকে থাকতে পারত না এতকাল; ক্লাসিকের—কালোত্তীর্ণতার মুকুট উঠত না এদের মাথায়, বিশ্বসাহিত্যের কিছুতেই হতে পারত না চিরকালের বিস্ময়। শুধু বিচার, বিশ্লেষণ, তত্ত্ব, তথ্য অথবা দর্শনে যেমন বলা যায় জীবনের গল্প, তেমনই কেবল সিচুয়েশানে গোয়েন্দা গল্প হয়, জীবনের গল্প হয় না।

তথ্য, তত্ত্ব, জীবনদর্শনের সঙ্গে সিচুয়েশনের, সংলাপের সর্বোপরি চরিত্রবিকাশের সোনায় সোহাগা যোগ হওয়া চাই। এই দুয়ের যোগাযোগেই রূপকথা দাঁড়ায় জীবনের অপরূপ কথা হয়ে। কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের, অভিজ্ঞতার সঙ্গে ধ্যানের, হৃদয়ের সঙ্গে বুদ্ধির, বিশ্লেষণের সঙ্গে প্রজ্ঞার, বিচারের সঙ্গে সহানুভূতির মিলন না হলে 'সৃষ্টি'র জন্ম সম্ভব হয় না। হয় না যে তা আজ আমরা দেখতেই পাচ্ছি; কিন্তু তার কারণ সবসময়ে দেখতে পাচ্ছি না, দেখাতে পারছি না। তার কারণ হচ্ছে যাঁরা 'ডন কুইক্সোট' 'রবিনসন ক্রুসো,' 'গালিভার্স ট্রাভেলস' লিখেছিলেন তাঁরা প্রতিভার এবং পাগলামির দ্বন্দ্বে নিত্য বিচলিত ছিলেন। এই পরস্পরবিরোধী আকর্ষণে উত্তেজিত, উন্মথিত, ক্ষতবিক্ষত এক রক্তাক্ত সত্তা যা রচনা করেছে তা পাঠকের মধ্যেও সৃষ্টির সঙ্গে অনাসৃষ্টির, শুভের সঙ্গে অশুভের, ছন্দের সঙ্গে বিশৃঙ্খলার দ্বন্দ্ব সঞ্চারিত করতে পেরেছে; পাঠককেও বিচলিত করেছে। উত্তেজিত উন্মথিত, ক্ষতবিক্ষত এবং রক্তাক্ত হয়েছে পাঠকসত্তাও। প্রকৃতির অথবা ভগবানের যারই সৃষ্টি হোক এই মাটির ঢেলা—পৃথিবী যার প্রিয় নাম, সেখানে ভালোরা কেন এত দুঃখ পায়, মন্দ যারা তারা কেন জিতে যায় জীবনযুদ্ধে; অথবা শেষ পর্যন্ত পুণ্যেরই জয় হয়, আর পাপের পরাজয় হয় কি না এই প্রশ্ন জেগেছে যাঁদের চৈতন্যে এবং কলমের মুখে যাঁরা সঞ্চারিত করতে পেরেছেন এই জীবনজিজ্ঞাসার জ্বালা তাঁরাই কেবল হতে পেরেছেন বিশ্বসাহিত্যের বিস্ময়।

কারা সেই বিস্ময়কর ব্যক্তি বিশ্বসাহিত্যের? তাঁরা হলেন সেই সব ব্যক্তি যাঁদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব ওতপ্রোত হয়ে আছে রক্তে, শিরায়, চেতনায়, ভাবনায়, কল্পনায়, অস্থিমেদমজ্জায়। স্বপ্নে, স্বপ্নভঙ্গে, কর্মে, কর্মের বিরতিতে, জাগরণে, নিদ্রায় যাঁদের নিস্তার নেই এই

নামগ্রাসী, আকারগ্রাসী, পরিচয়গ্রাসী, সর্বগ্রাসী জীবন-জিজ্ঞাসার নিরন্তর বৃশ্চিক-দংশন থেকে, এঁরা কারা? এঁরা কখনও জ্ঞানী কখনও বিজ্ঞানী; কখনও কবি, কখনও কথাশিল্পী। কিন্তু সবার ওপর, সবার আগে, সব কথার পরে এঁরা বিদূষক। মানুষের মুক্তি খুঁজতে এঁরা মানুষকে ত্যাগ করে বনে যান না। চুরি করলে শাস্তিতে সোজা হয় চোর—বিশ্বাস করেন না। মানুষ বাদে কোনও ইজম অথবা 'বাদে' আস্থা নেই এঁদের। মানুষের বেদনায় করুণ, তার আনন্দে উজ্জ্বল এঁদের আনন। মানুষের জয়ে যাঁদের জীবনের পতাকা উড্ডীন, মানুষের পরাজয়ে মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারান না তাঁরা। যত দুঃখ যত কষ্ট, যত বঞ্চনা, যত হতাশা—তত আনন্দ, তত হাসি, তত গান বাঁধেন এঁরা প্রাণের বীণায়।

জীবনের রঙ্গমঞ্চে আজ জ্ঞানী, বিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, তাত্ত্বিক, তাথ্যিকের দেখা মেলে; সংখ্যায় যত দেখা গেলে ভাল হত, তার চেয়ে অধিক সন্ন্যাসীতে আজ জীবনের গাজন নষ্ট। দেখা নেই কেবল বিদূষকের। দেখা নেই সার্ভেন্টিস, ডিফো, স্টার্ণ, সুইফট্, হুগো, ডুমা, বালজাক, ভলতেয়ারের। বিশ্বের শেষ বিদূষক বার্ণার্ড শ-ও বিদায় নিয়েছেন। পৃথিবীকে রঙ্গমঞ্চ বলেছেন কবি। বিদূষক ছাড়া রঙ্গমঞ্চ অকল্পনীয়; এই বিদূষকেরা জ্ঞানের কথা বিজ্ঞানীর মত মুখ গম্ভীর করে বলে না; এরা তত্ত্বোপদেশের বাণী দেয় না গুরুর আসনে বসে; এরা জীবনের বটগাছটাতে কখনও কখনও 'হঠাৎ বিদেশী পাখির' মত বাসা বাঁধে। 'তাদের ডানার নাচ চিনে নিতে নিতেই' তারা চলে যায়। 'তারা অজানা সুর নিয়ে আসে দূরের বন থেকে'। 'জীবনযাত্রার মাঝে মাঝে জগতের অচেনা মহল থেকে আসে আপন-মানুষের' দূত, 'হৃদয়ের দখলের সীমানা বড়ো করে দিয়ে যায়'। 'না ডাকতেই আসে, শেষকালে একদিন ডেকে আর পাওয়া যায় না। চলে যেতে যেতে বেঁচে-থাকার চাদরটার উপরে ফুলকাটা কাজের পাড় বসিয়ে দেয়, বরাবরের মতো দিনরাত্রির দাম দিয়ে যায় বাড়িয়ে'।

এমনই এক বিদূষক না হলে সমগ্র মানবজীবন নিয়ে রচিত যে মহাকাব্য তার নাম হত 'হিউম্যান ট্রাজেডি'; সমস্ত মানুষের সেই মহত্তম ট্রাজেডিকে 'দি হিউম্যান কমেডি' বলা এক বিদূষকের পক্ষেই সম্ভব। সেই-ই বিদূষক যে কেবল বলতে পারে এমন করে: "...I laugh till I cry, and I cry till I laugh." [Laurence Sterne]

সমগ্র মানুষের সবচেয়ে স্মরণীয় ট্রাজেডি নিয়ে বিরচিত সকল যুগের অবিস্মরণীয় জীবননাট্য 'দি হিউম্যান কমেডির' স্রষ্টাও এমনই এক বিদূষক।

নিজের দুঃখকে যিনি পরের হাসি করেছেন, সেই বালজাক জ্ঞানী, বিজ্ঞানী, কথাশিল্পী, তাত্ত্বিক—সব; কিন্তু সবার উপরে কি নন বিশ্বসাহিত্যের মহত্তম বিদূষক?

মাদাম হান্‌স্‌কার সঙ্গে পত্রের যোগ ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হতে সময় নিল না বালজাকের কলমে। চিঠির পর চিঠিতে নিজেকে এমন অসহায়, এমন সঙ্গলোভাতুর করে মেলে ধরলেন তিনি যে মহিলার কোমল হৃদয়ে করুণার, সমবেদনার, সখিত্বের বীজ অঙ্কুরিত হল। রোমান্টিক হান্‌স্‌কা তখন সংসার, স্বামী, কন্যা এবং বিপুল ভূসম্পত্তির মধ্যে উত্তেজনা খুঁজে পাচ্ছেন না আর। দু বছর কেবলমাত্র চিঠিতে সাক্ষাৎ এবং সংলাপ বিনিময়ের পর, স্বামীর স্বাস্থ্যভঙ্গহেতু সুইৎসজারল্যাণ্ডে এলেন। নিমন্ত্রিত হয়ে বালজাকও গেলেন সেখানে। শোনা যায়, সেখানে জনসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত একটি উদ্যানে পায়চারী করছিলেন যখন বালজাক তখন একটি বেঞ্চিতে আসীন মহিলাকে বই পড়তে লক্ষ্য করেন। সেই মহিলা তাঁর রুমাল মাটিতে ফেলে দিলে বালজাক তা তুলে দিতে গিয়ে দেখলেন যে বইটি পাঠরতা রুমালের মালিক, সে বই বালজাকেরই লেখা। এর পর এই গল্পের পুনরাবৃত্তিকার লিখছেন: "He spoke. It was the woman he had come to see."

বালজাকের সঙ্গে তাঁর লেখার অনুরাগিণী এই রমণীর প্রথম সাক্ষাতের অনুভূতি সম্ভবতঃ রমণীয় হয় নি; কারণ: "She may have been a trifle taken aback at

the first sight of the fat, red-faced man, like a butcher in appearance, who had written her such lyrical and passionate letters,..." কিন্তু: "...but if she was, the brilliance of his gold-flecked eyes, his abounding vitality, made her forget the shock and in no long time he became her lover."

এই প্রণয়কে পরিণয়ে রূপ দিতে কিন্তু দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল বালজাককে। ইতোমধ্যে আরও নারী দেখা দিয়েছে; লেখা হয়েছে আরও উপন্যাস, এবং ঘটে গেছে অনেক উত্থান-পতন। বালজাকের সেই দুর্দমনীয় জীবনীশক্তি—সৃষ্টিধর্মী মানুষের ইতিহাসেও যার তুলনা বিরল, তাঁকে জীবনের পথ দিনের প্রান্তে এসে পৌঁছলে মুখোমুখি এনে দিয়েছে সেই নারীর; সেই অনুরাগিণী, যাকে একদিন বালজাক দর্পভরে শুনিয়েছিলেন:

ফিরাবে তুমি মুখ,
ভেবেছ মনে আমারে দিবে দুখ?
আমি কি করি ভয়।
জীবন দিয়ে তোমারে প্রিয়ে, করিব আমি জয়।

জীবন দিয়েই যে বালজাক সেই রমণীকে জয় করেছিলেন এ কথা সত্য; আক্ষরিক অর্থে সত্য।

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে মঁসিয়ে হান্‌স্কা মারা গেলেন। বালজাক চিঠি লিখলেন মাদাম হান্‌স্কাকে: "I will not be a farthing in debt, my dear, I will have five hundred thousand francs in commissions, not counting the returns from the Human Comedy, which will amount to that much more. Thus, beautiful lady, you will be marrying a million or more, if I do not die."

মাদাম হান্‌স্কা আরও পাঁচ থেকে সাত বছর ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন বালজাককে। তারপর ভাগ্যের মত তাঁকেও বালজাকের কাছে হার মানতে হল। বিবাহের মুহূর্তে, বালজাক তাঁর বোনকে জানাচ্ছেন: "I am at the climax of my dream."

বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু স্বপ্নভঙ্গ হল। মাদাম হান্‌স্কা বেঁচেই আছেন তখন কেবল কিন্তু যৌবন বেঁচে নেই কোথাও; না দেহে, না মনে। বালজাকও অবশ্য বাঁচলেন না। ভিক্টর হুগো, এই সময়ে তাঁকে দেখতে এসে যে ধারণা নিয়ে ফিরে যান তা হচ্ছে: "Married, rich,—and almost dead.'

বালজাকের মৃত্যুদিবসেও এসেছেন হুগো: "There was a colossal bust of the author in the salon. The bust of the marble was like the ghost of the man who was to die....As I approched the bed I saw his profile. It was like that of Napoleon. An old sick-nurse and a servant of the house stood on either side of the bed. I lifted the counterpane, and took the hand of Balzac. The nurse said to me, 'He will die about dawn'."

ভোর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেন নি বালজাক। সমস্ত জীবন নিশীথ রাত্রি যখন সবচেয়ে নির্জন তখনই সৃষ্টির দুর্জয় প্রেরণা এসে আচ্ছন্ন করেছে অমিতবীর্য 'দি হিউম্যান কমেডি'-কারকে। পুরাতন রচনার জীর্ণবাস পরিত্যাগ করে নবসৃষ্টির নতুন পরিধেয় পরবার মুহূর্তেও সকালের প্রতীক্ষায় থাকেন নি তিনি।

কৃষ্ণবর্ণ মৃত্যুর তুরঙ্গে রক্তবর্ণ জীবনের সওয়ার হয়েছিলেন যখন বালজাক তখনও তাঁর বিশ্বব্যাপী খ্যাতির রাত্রিকাল, শেষ যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়ে গেল 'হিউম্যান কমেডি'র জয়যাত্রা; জীবনে যাকে চেয়েছিলেন তাকে পেয়ে জেনেছিলেন তাকে চান নি। জীবনে যা পান নি মৃত্যু তাঁকে এনে দিল তাই: Glory। মৃত্যু তাঁকে যা জানতে দিতে চায় নি জীবন দিয়েই তা জেনেছিলেন বালজাক: "Glory is the sunlight of the dead."

[ক্রমশ]

দাহ

সুশীল সিংহ

ফিরে এলো সেই তিথি, সেই রাত। দীপাবলীর রাত। সেই বারান্দায়, আলসেতে থরে থরে প্রদীপ সাজানো। সেই লাল নীল রুপোলী ফুলকি ঝরানো আলোর ফোয়ারার মত তুবড়ির রঙ। সেই রঙমশাল। দেওয়ালের ওপর আচমকা পটকার শব্দ। সেই সাজসজ্জা, মাতন। হাওয়ায় গন্ধকের গন্ধ। প্রদীপের আগুনে শ্যামা-পোকার মরণ।

ওগো, আবার এলো।

*　　*　　*

একদিন ছিল—সেদিন ছিল এই গতবারও—যখন প্রদ্যোত ঠিক আসত এই দিনটিতে। তখন বেণু ঘরণী হয় নি অভিজিৎ শিকদারের। মাথায় সিঁদুর, হাতে শাঁখা-নোয়া নিয়ে কল্যাণী বধূ হয় নি সে। চলার সময় হাতের চুড়িগুলো রিনিঠিনি আওয়াজ তুলত না। হারের সোনার কাঁটাগুলো ফুটত না গলায়।

এই দিনটিতে নিজেকে সাজাত বেণু। কখন তার পায়ের আওয়াজ শোনা যায়, তার জন্য কান পেতে চোখ মেলে থাকত। গতবারেও যে শাড়ি, যে রঙ পছন্দ করে প্রদ্যোত, সেই সাজে নিজেকে সাজিয়েছিল বেণু। দীঘল বেণী দুলছিল তার পিঠে। কান পেতে, চোখ মেলে ছিল সে। এবং তার শরীরটা কেমন যেন সির-সির করছিল। রোমাঞ্চে নয়—উৎকণ্ঠায়, দ্বিধায়, সংকোচে এবং আরও অনেক কিছুর একটা মিশ্র পুলকে। কেন না গতবার সে কলকাতায় ছিল না, ছিল কাঁচরাপাড়ায়।

আসলে পুজোর ছুটিতে একরকম জোর করেই তাকে পাঠানো হয়েছিল তার মাসীমার কাছে। প্রদ্যোতের সঙ্গে তার মাখামাখি বাড়ির অভিভাবকদের যথার্থ চিন্তিত করে তুলেছিল।

প্রদ্যোত কি আসবে এখানে! এই কাঁচরাপাড়ায়!

সকাল থেকে ভাবছিল বেণু। বেণুর কাছে তার কথা দেওয়া আছে, এই তিথির সন্ধ্যায় সে বেণুর কাছে আসবেই আসবে। গত চার বছর কথা রেখেছে প্রদ্যোত। সে তো কলকাতায়। এবার?

বেণুর মন যেন বলছিল—আসবে, সে আসবেই।

সে মনে মনে চাইছিল প্রদ্যোত আসুক। সকলে দেখুক যে কলকাতা থেকে দূরে পাঠালেই তার নাগালের বাইরে পাঠানো যায় না। নিজের মনে ভাবতে ভাবতে যেন পুজো-বাড়ির ঢাকের বাদ্যির মত থেকে থেকে গুরু-গুরু শব্দ হচ্ছিল বুকের মধ্যে।

এবং প্রদ্যোত এসেছিল। তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। বাড়িতে বাড়িতে সবে প্রদীপ জ্বলতে শুরু করেছে। বিচ্ছিন্নভাবে মাঝে মাঝে বাজির আওয়াজ ভেসে আসছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আনন্দ-কাকলি নাচছে বাড়িতে বাড়িতে। স্টেশন থেকে অনেক লোককে জিজ্ঞাসা করে করে এলো প্রদ্যোত। বলল, বেণু, তোমায় বাজাতে এলাম।

একরাশ পটকা আনত প্রদ্যোত—হরেকরকম। কোনটায় কেবল রঙের বাহার। কোনটায় কান-ফাটানো আওয়াজ। কোনটার বা ধরন-ধারণই পাজী পাজী, গতবার কাঁচরাপাড়াতেও এনেছিল।

"প্রদ্যোত" নামটা মাসীমাও শুনেছিলেন। তিনি স্পষ্টই অপ্রসন্ন হলেন। মুখে কিছু বললেন না। কোন রকমে একটু কাষ্ঠ হাসি হেসে পাশ কাটালেন।

বেণু এতে ব্যথা পেয়েছিল অন্তরে। কিন্তু প্রদ্যোতের যেন সে বিষয়ে কোন ভ্রূক্ষেপই নেই। বাড়ির ছেলে-মেয়েদের সে মাতিয়ে দিয়েছিল, তাদের সঙ্গে মেতে উঠেছিল এক লহমায়। আর ক্রমে ক্রমে বেণু—বন্দনাও, যেন সত্যিই বেজে উঠেছিল।

তোমার খুব সাহস।—চোখ বড় বড় করে একান্তে বলেছিল বেণু।

কেন নয়?

মাসীমার বাড়িতে চেনা-জানা নেই, হুট্ করে চলে এলে?

তাঁদের কাছে তো আসি নি, তোমার কাছে এসেছি।

আমি জানতাম তুমি আসবে।—অস্ফুটে বলে মাথাটা নামিয়ে নিয়েছিল বেণু। বাঁ পায়ের কোমল পাতা অকারণে মেঝের ওপর ঘষেছিল।

জানতে? জানবেই তো। তুমি যে সবজান্তা।—আদর-মেশানো গলায় বলেছিল প্রদ্যোত। ভঙ্গীটা ছিল উদাসীন।

হাতের নখ দিয়ে চেয়ারের হাতলে আঁচড় কেটেছিল বন্দনা। বলেছিল, এখানে তো তোমার কোন আদর হল না।

সে তো তোমাদের বাড়িতেও হয় না।—এই বলে প্রদ্যোত তার হাতখানা চেপে ধরেছিল।

হাত ছাড়, বাইরে বাগানে সবাই রয়েছে।

জানি। ওদের সঙ্গে তো কত খেললাম, গল্প করলাম, তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলব না?

না। বাইরে চল।

তবে বাইরেই এস।—এই বলে উঠে দাঁড়িয়েছিল প্রদ্যোত।

এ অনুষ্ঠানটিও বন্দনা জানে। মস্ত অতিকায় একটা তুবড়ি এনেছে প্রদ্যোত নিশ্চয়ই। সেটায় তাকে আগুন লাগাতে হবে। সে প্রথমে ভয় পাবে, অন্য কাউকে দিতে চাইবে, কিন্তু কিছুতেই ছাড়া পাবে না। অবশেষে একটা ফুলঝুরি জ্বালিয়ে তুবড়ির মুখে ধরতে হবে তাকেই। তারপর আগুনের ফুলকিগুলো উঠবে—অনেক উঁচুতে উঠবে। নানা রঙের আগুনের কণা চকমকি পাথরের মত জ্বলতে জ্বলতে পড়বে। সেই আলো এসে পড়বে বন্দনার মুখে। সবাই অবাক হয়ে যাবে। বন্দনাও। প্রদ্যোত হাসবে।

আজ কিন্তু তার লজ্জা হচ্ছিল। সবচেয়ে আকর্ষণীয় বাজিটা যে বিশেষভাবে তার জন্যই প্রদ্যোত এনেছে, এ কথাটা এভাবে মেলে ধরলে সে যেন মাটিতে মিশে যাবে।

তার মাসীমা বলেছিলেন, কত বড় এটা! এটা যে অনেক বড় বাবা, অ্যাঁ!

ওটাতে তুমিই আগুন লাগাও মাসীমা।—বেণু বলেছিল।

না বাপু, ওটা বরং খোকনকে দে। আমি আবার কেন—

বেণু যাকে ইচ্ছে তাকেই বাজিটা বিলিয়ে দিতে পারে এ কথাটা ধরে নিয়েছিলেন মাসীমা। মেনেও নিয়েছিলেন। প্রদ্যোত যেন এসব কথা শুনতেই পায় নি। প্রদীপের শিখা থেকে নিজেই একটা ফুলঝুরি ধরিয়ে নিয়ে বন্দনার হাতে গুঁজে দিয়ে বলেছিল, তাড়াতাড়ি।

বাধ্য হয়েছিল বেণু।

বাগান থেকে ফিরে আর ঘরে ঢোকে নি প্রদ্যোত। সেখানেই মাসীমার পায়ে হাত দিয়ে ঢিপ করে প্রণাম করে সে বলেছিল, চলি মাসীমা।

সেকি! দুটি খেয়ে যাও।

না মাসীমা, আমার সময় নেই। ট্রেন ধরতে হবে।—এই বলে গেট খুলে দ্রুত কদমে হনহন করে সে চোখের বাইরে চলে গিয়েছিল।

যথেষ্ট লজ্জাই সে দিয়ে গেছে। তুবড়িটা মাসীমা কিংবা খোকন পোড়ালে কেমন শোভন হত, গতবার দীপাবলীর রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভেবেছিল বন্দনা। ভাবতে বাধ্য করেছিল প্রদ্যোত। তুবড়িটা কে জ্বালাল অথবা জ্বালাল না এটা ছিল উপলক্ষ মাত্র, ভাবনার মূল ছিল আরও গভীরে। সে মুহূর্তে বন্দনা তা জানত না।

কলেজ খুললেই আবার দেখা করতে আসবে প্রদ্যোত। দেখা করতে আসবে ভবানীপুরের সেই মিল্ক সেন্টারে—যেখানে বন্দনা পার্টটাইম কাজ নিয়েছে। কাজ নিয়ে বাড়ির সকলের অসন্তোষ বাড়িয়েছে সে। সত্যিই তো তার চাকরির কোন প্রয়োজন ছিল না।

তবে হ্যাঁ, পৃথিবীর প্রায় সব সভ্যদেশেই ছাত্রছাত্রীরা
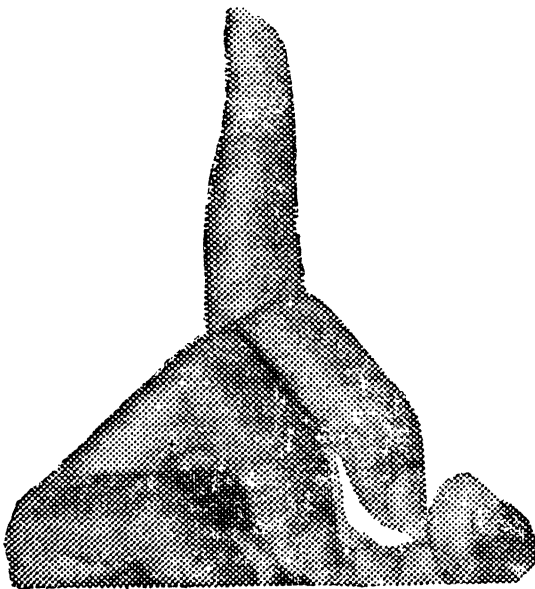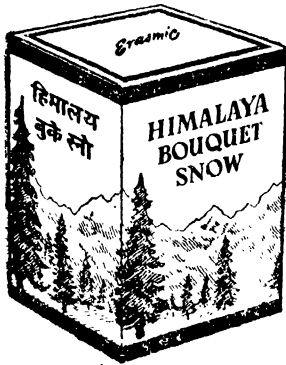
নামা টুকিটাকি কাজ করে সামান্য কিছু উপার্জন করে। বন্দনাও করছে। এই ছিল তার যুক্তি। কিন্তু সে মনে মনে জানত যে কোনদিন প্রদ্যোতের ডাকে সাড়া দিয়ে যদি সে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ায় তা হলে এই শ্রমের অভ্যাস, চাকরির অভ্যাস তার থাকা দরকার। সে অভ্যস্ত হচ্ছিল। নিজেকে এইভাবে প্রস্তুত করছিল বন্দনা সাড়া দেবে বলে।

বাড়িতেও আসবে প্রদ্যোত—আসবে অসঙ্কোচে। কে কি ভাবল না ভাবল তা একটুও না ভেবে, বুক টান করে, মাথা উঁচিয়ে, গমগম করে বাড়ির মধ্যে গিয়ে দেখা করে আসবে। সে মাঝে মাঝে দেখা করতে না এলে ফাঁকা মনে হবে, বিকেলবেলাটা অসম্ভব অসহ্য দীর্ঘ মনে হবে। মাধবী, রেণু বা মায়া যার বাড়িতেই হোক অকারণে বেড়াতে যেতে বাধ্য হবে, হয়তো বা কান্নাও পাবে।

কিন্তু প্রদ্যোতের এই আসা, বন্দনার এই চেয়ে থাকা—এবার এতে একটা আগল পড়া দরকার। পাঁচ বছর আলাপ হয়েছে তাদের। এই পাঁচ বছরে বড়দার বন্ধু প্রদ্যোতদা হয়েছে 'দ্যুতি'। এই নামটা বন্দনারই দেওয়া। খানসাতেক চিঠি যা লিখেছে তাতে সম্বোধন করেছে 'দ্যুতি' বলে। একটা চিঠিতে লিখেছিল,··· মাধবীকে তো চেন। ও ঠাট্টা করে বলল, প্রদ্যোত তো নয়, খদ্যোত। ওকে কিছু বলি নি। তোমায় বলি, বেশ তো, তুমি আমার অন্ধকারের জোনাকি, স্বপ্নের কণা।···

দ্যুতি বা প্রদ্যোত যেন একটা খেলা। তার দৃপ্ত ভঙ্গী যেন সেই খেলাঘরের জাদু, যা বন্দনাকে পেয়ে বসেছে। খেলা আর খেলা। বাইশ-বসন্তের সীমানায় দাঁড়িয়ে এই খেলা-খেলা আর ভাল লাগে নি বন্দনার। আগে আড়াল—তারপর আগুন। মেয়েরা তাই-ই চায়। বন্দনাও চেয়েছিল। প্রদ্যোত কেবল আগুন নিয়ে বেড়ায়। আড়ালের কথা ভাবে না বোধ হয়।

আড়াল—তারপর আগুন। কথাটার অর্থ জলের মত স্বচ্ছ, সহজ। কিন্তু মুখ ফুটে সে কথাটা জানাতে আত্মসম্মানে বাধে। বন্দনার বাধল। কলকাতায় ফিরে তাই সে নিজের আচরণে সে কথাটাই জানাতে চেয়েছিল। প্রদ্যোত দেখা করতে এলে সে কম কথা বলত, আসত না। তার সবকটা রুমাল হারিয়ে গেছে শুনেও সে কাপড়ের কোণে ফুল তুলতে বসল না। বাজার থেকে দুটো কিনে দিল। ঔদাসীন্য নয়, নিস্পৃহতাও নয়, গভীরতর ইঙ্গিত ছিল তার এই আচরণে। প্রদ্যোত কি বুঝল না তা? বুঝেও অবুঝের ভান করল? না ভুল বুঝল? ক্ষোভ? অভিমান? অথবা আত্মসম্মান? ভালবাসার চেয়ে কি তা বড়?

সিদ্ধান্ত করতে পারল না বন্দনা।

এক মাস, দু মাস, তিন মাস কেটে গেল দেখতে দেখতে। রাতের নির্জন আঁধারে একা একা অনেক কাঁদল বন্দনা। মিল্ক সেণ্টারের চাকরি ছেড়ে দিল সে। তবুও হুঁশ হল না প্রদ্যোতের। একবার তাকে খোলা গলায়, সরল চোখে প্রশ্ন করল না—কি হয়েছে? কেন এই ভাবান্তর?

প্রদ্যোতকে উদ্দেশ করে বন্দনা বলল, মিথ্যুক,—ভণ্ড।

মাধবী সায় দিয়ে বলল, ঠিক। ছেলেরা অমনি। তোর চিনতে বুঝতে যা দেরি হল।

খবর গেল মাধবীর কাছেও। সে এসে বলল, হ্যাঁ বন্দনা, তোর নাকি বিয়ে?

রেণু বলল, হ্যাঁ।

তারপর রেণু তার সখীকে হবু বরের ছবি দেখাল। হাফবাস্ট ফোটো। বেশ শক্ত-সমর্থ চেহারা। মাথার চুল পাতলা। চওড়া গোঁফ। জামার দুটি বোতাম লাগানো। ভিতরে গেঞ্জি নেই। তাই রোমশ বুকের খানিকটা বোঝা যাচ্ছে।

দিব্যি।—এই বলে ঠাট্টা করার মত হাসল মাধবী: থাকেন কোথায়? করেন কী?

মধুবনীর ফরেস্ট অফিসার।

হায় বন্দনা, শেষকালে তুই বনে চলে যাবি?

হ্যাঁ, অরণ্যের অন্তঃপুরে চলে যাবে রেণু—নিভৃতে।

বন্দনা চলে এসেছে। টালি-ছাওয়া সুন্দর বাংলো। লাগোয়া অডিট-হাউসে কাঁপার কালিকা সিং তার পরিবার নিয়ে থাকে। সকাল-সন্ধ্যায় মেমসাহেবকে বুট ঠুকে সেলাম জানায় সে। দরজায় হাজির দিবারাত্র।

দূরে পরেশনাথের পাহাড়। সেই পাহাড়কে ঘিরে বিস্তারিত বন। জানা না-জানা হাজারো গাছ। বনের মাঝখান দিয়ে পাকডাণ্ডী পথ। জিলিপির মত পথটা ঘুরে ঘুরে বাইশ মাইল বনের ভিতর দিয়ে চলে গেছে। অভিজিতের মোটরবাইকের পিছনে বসে কতবার এই পথে বেড়াতে গেছে বন্দনা। বাংলো থেকে পথটা লাল সুরকির। দুপাশে সারি সারি মহুয়ার গাছ। ঋতুবিশেষে কী আকুল-করা ঝিম-ধরানো তীব্র গন্ধ। তাই তো বনের নাম মধুবনী। মাঝে মাঝে কখনও কখনও খেয়াল হলে মহুয়া ফুলের শরবত খায় অভিজিৎ। বেণুকেও খাওয়ায়। রক্তে যেন পুজোবাড়ির ঢাক নয়—অরণ্য-বাসীদের মাদল বাজে—দ্রিমাদ্রিম্-তা-দ্রিমাদ্রিম।

স্বামীর সঙ্গে অরণ্যের গভীরে বেড়াতে গেছে বন্দনা। পালিয়ে যাওয়া ছুটন্ত ধবধবে খরগোশ দেখে হাততালি দিয়ে উঠেছে। বেড়াতে গেছে তোপচাঁচী হ্রদে। কাচের মত স্বচ্ছ ঝকঝকে জল সে হ্রদে। তাতে পাহাড়ের ছায়া কাঁপে। সাদা সাদা বকের ঝাঁক আলতো আঁচড়ে সেই ছায়ার গায়ে ঝিলিমিলি কেটে দেয়। সেই হ্রদে বোটে করে ভেসেছে বেণু। অভিজিৎ দাঁড় টেনেছে আর নানা গল্প বলেছে। পাহাড়ের গুহা থেকে, বনের গভীর থেকে রাত্রির নিশীথ নির্জনে নাকি বাঘেরা ওই হ্রদে জল খেতে আসে। সকালে উঠে তার দাগ দেখা যায়। হ্রদের সঙ্গে লাগানো বাংলোয় রাত কাটালে দেখা যায় সে দৃশ্য। ওখানে ওরা একটা রাত থাকবে, বনের বাঘের জল খাওয়া দেখবে।

এই ভাবে দিন কাটছিল।

কিন্তু সময়ের হিসেবে সেখানেও এসে গেল সেই তিথি। সেদিন সকালে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গালের ওপর আলতো ভাবে সফেন বুরুশ চালাতে চালাতে অভিজিৎ বলেছিল, দেখ তো, আর কতদিন ?

কি কত দিন ?

কালীপুজো গো।

সেই প্রথম একটা বিন্দুর মত ছোট, সামান্য ভয়ের অঙ্কুর মনের মধ্যে উঁকি দিয়েই মিলিয়ে গিয়েছিল। তারপর সেটা বাড়ছে। বাড়তে বাড়তে অনেক বড় হয়ে উঠল—যেন গ্রাস করে ফেলবে।

মিথ্যে ভয়, নিজেকে বোঝাল বেণু, এখানে সে আসবে না। আর যদি আসে তা হলেই বা ভয় কিসের ? ভয় কেন ?

না—কোন প্রমাণ প্রদ্যোতের কাছে নেই। কিছুই নেই। মাধবীকে ধন্যবাদ।

বিয়ের ঠিক সাতদিন আগে মাধবী বলেছিল, তোর বিয়ের কথা ‘খদ্যোত’ শুনেছে ?

ঠাট্টা ভাল লাগে নি বেণুর। বলেছিল, হ্যাঁ।

কি করে জানলি ?

বন্দনা জানত যে তার বিয়ের খবর সবার আগে মাধবীই পৌঁছে দিয়েছে প্রদ্যোতকে। সে শুধু বলল, আমি জানি।

শুনেও তোর কাছে একবারও আসে নি ?—পরামর্শ দেওয়ার মত ফিসফিস গলায় মাধবী বলেছিল, আমার কিন্তু ভাল লাগছে না ভাই।

কেন ?

আমার মনে হয় চিঠিগুলো তোর চেয়ে আনা ভাল। পুরুষমানুষকে বিশ্বাস কি ?

বিয়ের দিন যত এগিয়ে আসছিল এই কথাটাই তত বেশী করে নিজের মনে ভাবছিল বেণুও। কিন্তু কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছিল না। প্রথমে অন্তর থেকে পরে নিরুপায় হয়ে সে প্রদ্যোতকে বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছিল। আজ যখন তার নিজের মনের সঙ্গে একই তালে মাধবীর গলা সাবধান করে দিল, সে বড় অস্থির বোধ করল তখন। প্রদ্যোতের কাছে লেখা সেই চিঠিগুলো আবার চেয়ে আনতে হবে ! এত ছোট হতে হবে বন্দনাকে !

মাধবীই বোঝাল, তুই নিজে যা বন্দনা। তুই চাইলে যদি হাতে তুলে দেয়। হয়তো দু-একখানা রেখে দিতে

চাইবে। বলবি, দয়া করে ফিরিয়ে দাও। বলবি, আমার যা আছে তা সব নিয়েও—'

অত্যন্ত বেহায়া মনে হয়েছিল মাধবীকে। তার মুখে হাত চাপা দিয়ে তাকে থামিয়ে দিয়েছিল বন্দনা।

চিঠি প্রদ্যোত ফিরিয়ে দিয়েছিল—একটিও না রেখে। দয়া চাইতে হয় নি বেণুকে। প্রদ্যোত তাকে স্পর্শও করে নি। শান্ত চাউনি দিয়ে অভ্যর্থনা করে বলেছিল, একটু বস। চা খেয়ে যাও।

বেণুর কোন চিঠিই প্রদ্যোত রাখে নি। বরং তাকে লেখা অনেকগুলি চিঠির একটি আজও রেখে দিয়েছে বন্দনা। কেন? কেন রেখে দিয়েছে সে? কোনদিন তো খুলে পড়ে না। এই বাঘের থাবার মত দীপাবলীর রাত এগিয়ে আসার আগে, কই, চিঠিটার কথা তার মনেও হয় নি। প্রদ্যোতের লেখা অন্য চিঠিগুলোর সঙ্গে এটাও তার পুড়িয়ে ফেলা উচিত ছিল। নিশ্চয়ই।

তবুও ভয়টা কোনমতে যাচ্ছে না। প্রদ্যোতের কাছে কোন অস্ত্রই নেই, এ কথা জেনেও না। সে আসবে, এ কথাটা মনে হতেই কেঁপে উঠছে সে। সে যেন কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে অজস্র বাজি তৈরি করেছে প্রদ্যোত। তারপর, আজ এখানে আসবে বলে হাওড়ায় ট্রেন ধরল। ট্রেন থেকে সে গোমো বা দেওঘরে নেমেছে। এখন হয়তো এগিয়ে আসছে বাসে করে। হয়তো বাসের সহযাত্রীদের জিজ্ঞাসা করছে—মধুবনীর ফরেস্ট অফিসারের বাংলোয় যাবার পথ কোন্‌টা? হয়তো লাল পথ দিয়ে সে হেঁটে হেঁটে আসছে। সারা গায়ে চুলে তার লাল ধুলো লেগেছে। এখুনি হয়তো সামনে এসে দাঁড়াবে। বলবে, বেণু, তোমায় বাজাতে এলাম।

গেট খোলার ক্যাঁচ করে শব্দ হল। কে? কে এল? কে?

কেউ না। কালিকা সিং গেট খুলে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। অভিজিতের নির্দেশমত কি একটা ধরে আছে।

দু-দুটো ডবল ব্যারেল গান গুলি ভরা ঝুলছে ঘরে। একবার সেগুলোর দিকে, একবার স্বামীর দিকে তাকাল বেণু। সৌখিন শিকারী নয় তার স্বামী। এ অরণ্যের অধিকর্তা সে—অব্যর্থ নির্ভুল তার হাতের টিপ: বিপুল বলশালী, অকুতোভয়, সূর্যস্নাত শাল গাছের মত সোজা সরল, পুরুষ। স্বামী—বেণুর আড়াল ও আগুন।

একরাশ মোমবাতি আনিয়েছে অভিজিৎ। গন্ধক, সোরা, লোহাচুর, পটাস এইসব বাজি তৈরির জিনিস আনিয়েছে প্রচুর। গত পনেরো দিন ধরে কেবল বাজিই হচ্ছে। আগেকার আমলের পানের বাটার মত তুবড়ি বানিয়েছে একটা। বন্দনাকে বলেছে যে ওটাতে তাকেই আগুন লাগাতে হবে। কোথায় যেন মিল আছে প্রদ্যোতের সঙ্গে।

তাই কি ভয়টা বেড়ে উঠেছে এত?

আসবে। আসবে। সে আসবেই। তাদের মেলামেশা কেউ কোনদিন ভাল চোখে দেখে নি। আদর দূরে থাক্‌, প্রদ্যোতকে তেমন কোন প্রশ্রয়ই দেয় নি বাড়ির কেউ। তবু সব অনাদরকে উপেক্ষা করে প্রদ্যোত এসেছেই।

ভয়? এখানে কোথায় তার ভয়? ওই তো তার স্বামী, ওই কালিকা সিং—তবুও ভয়! ঘাতকের খাঁড়ার মত ভয়টা যেন চোখের সামনে দুলছে।

সন্ধ্যে হয়ে এল। মোমবাতি সাজাচ্ছে ওরা। কোথায় পাতার ওপর শব্দ হল, চমকে উঠল বন্দনা। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎই মনে হল প্রদ্যোত যেন কথা বলতে বলতে হেঁটে আসছে পথ দিয়ে। হুবহু যেন প্রদ্যোতের গলা।

দেখ: বেণু তার স্বামীকে বলল, কার যেন গলা শোনা গেল না?

কান পেতে শুনল অভিজিৎ।

কোথায় আবার কার গলা।—এই কথা বলতে গিয়ে দেখল বেণু কালিকা সিংয়ের ছেলের হাতে একটা বাজি ধরিয়ে দিচ্ছে।

আলোর মালা পরিয়ে দেওয়া হল বাংলোটায়। কালিকা সিংয়ের সঙ্গে ছাদে উঠেছে অভিজিৎ। বাতি জ্বালাচ্ছে। আর ওখান থেকে জানতে চাইছে বেণুর কাছে—লাইনটা সোজা হয়েছে তো?
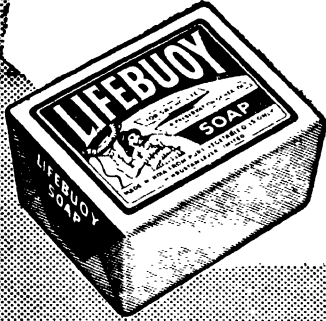
বাতির সারি সোজা হয়েছে কিনা এ কথা বলতে গিয়ে থরথর করে আচমকা কেঁপে উঠছে বুকের ভেতরটা। মনে মনে মিনতি জানাল বন্দনা, ঠাকুর, যেন সে না আসে—না আসে। যেন কিছুতেই না আসে। না—না।

রাত্রি গভীর হল। ফরেস্ট অফিসার শিকদারের বাংলোয় সার সার মোমের শিখা কাঁপল। হাওয়ায় ভাসল গন্ধক। লাল নীল আগুনের ফুলকি ছুটল।

মোম নিভল। রাত্রি গভীরতর হল। মুঠো মুঠো মানকের কুঁড়ির মত জোনাকি জ্বলতে আর নিভতে লাগল অরণ্যের ঘন তমিস্রায়।

উতলা অন্তর শান্ত হল না তবু। বন্দনার মনে হল এই অন্ধকারে প্রদ্যোত হয়তো পথ হারিয়ে গেছে। দিশে পাচ্ছে না। দূরে কোথাও একটা জানোয়ার ডাকল। তার ডাকের প্রতিধ্বনি ভেসে এল হাওয়ায়। কেউ কি ডাকল, বে—ণু—উ—উ—উ? কত না ডাক, কত না ধ্বনি, কত যে অজস্র শব্দ রাতের অরণ্যে! বন্দনা যেন আজ সবকটি শব্দের ওপর কান পেতে শুয়েছে। প্রদ্যোত—যদি সে এসে থাকে—যদি পথ হারিয়ে গিয়ে থাকে এই বনে!

বন্দনা মনে মনে বলল, ঠাকুর, যদি সে এসে থাকে তবে তাকে তুমি দেখ, রক্ষা কর।

সে তিথি চলে গেল। তার মনের এই শঙ্কাদোদুল, উতলা ভাব কাটতে লাগল তিনদিন। কেউ এল না। দীপাবলীর দিন নয়, তার পরদিন নয়—তার পরদিনও নয়।

নিশ্চিন্ত হল বন্দনা। নিশ্চিন্ত হল এবং বিরক্ত হল। তার মনে হল প্রদ্যোতটা অত্যন্ত ভীরু, কাপুরুষ। তার বুক চিতিয়ে চলা, গমগম করে হাঁটা, এ সবই লোক-দেখানো। ভেতরে ভেতরে লোকটা অসম্ভব দুর্বল। *নিশ্চয়ই—না হলে কোন কথা না বলে চিঠিগুলো ফিরিয়ে দেয়! মানুষের একটা আত্মসম্মানজ্ঞান তো থাকে! সে তো বন্দনার মুখের ওপর বলতে পারত, চিঠি আমার। দেব না।* এখানে আসতেও তো পারত কালীপুজোর দিন। সাহস নেই।

প্রদ্যোত এলে সে দেখিয়ে দিত যে সে যত্ন করতে জানে। এল না। অভিজিতের পাশে নিজেকে ছোট মনে হবে। বন্দনার এত সুখ দু চোখে সইবে না তার। আসে নি সেইজন্য—মনে মনে সিদ্ধান্ত করল বন্দনা।

সাতদিন পর বেল বাজল—সাইকেলের। ফরেস্ট অফিসারের বাংলোয় ডাক আসে বেলা পৌনে তিনটে আন্দাজ সময়। ডাকপিওন সাইকেল করে এসে চিঠি বিলি করে যায়। দুপুরে সামান্য তন্দ্রার মত আমেজ ধরেছিল। এবার উঠে পড়ল বন্দনা। একটি সাপ্তাহিক আর একটা মাসিক পত্রিকা এসেছে। একটা কার্ড লিখেছেন মা—পারিবারিক কুশল। আর একটা চিঠি আছে। হাতের লেখা দেখে বোধ হচ্ছে লিখেছে মাধবী। বাকী চিঠিগুলো অভিজিতের। সাহিত্যপত্রগুলো নেড়েচেড়ে বিজ্ঞাপন দেখল বন্দনা। তারপর খামটা খুলল। হ্যাঁ, মাধবীরই চিঠি।

একবার পড়ল। দুবার—তিনবার পড়ল সে। নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর মাধবী। কেমন দু-লাইনে ডঙ্কা বাজানোর মত খবরটা জানিয়েছে তাকে! হাত থেকে চিঠিটা খসে পড়ে গেল মেঝেয়।

হাওয়াতে উড়িয়ে নিচ্ছিল খসে-পড়া চিঠির কাগজ। বন্দনা নীচু হয়ে সেটা তুলে নিল। নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল তারপর। নির্জন দুপুর। বাংলোর টালির ওপর বসে কর্কশ কণ্ঠে বুনো পাখি ডাকছে একটা। পাখির ডাক নয়—যেন করাত।

ট্রাঙ্কের একেবারে তলায় প্রদ্যোতের সেই একমাত্র চিঠিটা রেখে দিয়েছিল বন্দনা। কতদিন আগে লেখা। ঠিকানার অক্ষরগুলো ম্রিয়মাণ, রঙ বদলেছে। চিঠিটা একবার পড়তে চাইল বন্দনা। খানিকটা পড়ল। আর পারল না। পড়ল না।

বাইরে এসে বারান্দার কোণে পাশাপাশি রাখল চিঠি দুখানা। মাধবীর লেখা চিঠি আর তুলে রাখা প্রদ্যোতের চিঠিটা। দুটো চিঠি পাশাপাশি রেখে আগুন লাগাতে গিয়ে আবার পড়ল সে। কেবল মাধবীর চিঠিটার

আগুন লাগিয়ে দিল। কাগজটা কুঁকড়ে পুড়ে কার্বন হয়ে গেল। মেঝের ওপর কালো দাগ পড়ল সামান্য।

প্রদ্যোতের লেখা এই চিঠিখানা আবার পড়তে চাইল বন্দনা। চোখের জলে ঝাপসা ঠেকল। চিঠিটা সে রেখে দিল জামার নীচে—বুকের মাঝখানে দু হাতে জানলার সিক ধরে সে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে রইল দিগন্তের দিকে।

বিকেল হল। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সেইখানে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আছে বন্দনা। ঘন অরণ্যানীর শ্যামল সমারোহের ওপর দিনান্তের সোনাঝুরি রোদ ঝরছে। আকাশটা যেন একটা নিভে আসা চিতার মত জ্বলছে।

মাধবী মাধবী মাধবী—তিনবার উচ্চারণ করল বন্দনা।

দূরে মোটরবাইকের শব্দ হচ্ছে।

অভিজিৎ ফিরছে। চোখ মুছল বন্দনা। আঁচল তুলে কাপড় গুছিয়ে নিল। বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। হাসল। এ সবই প্রতিদিনের।

তারপর নিজের হাতে আজ অনেক রান্না করল বন্দনা। অভিজিৎকে অন্যদিনের তুলনায় একটু বেশী জোর করে খাওয়াল। অনুনয়ে, আবদারে, আদরে খেতে বাধ্য হল অভিজিৎ।

রাত্রি হল। কলঘরে এসে দাঁড়াল বন্দনা। জামার ভিতর থেকে চিঠিটা বার করল। অক্ষরগুলো শরীরের ঘামে ভিজে ফুলে গেছে। ফরসা বুকের ওপর কালো ছোপ পড়েছে একটা। কাগজ পোড়ানোর পর মেঝেয় যেমন দাগ পড়েছিল তেমনি।

বিকেলে বুক ঠেলে কান্নার জোয়ার এসেছিল বন্দনার। নিজেকে সামলে সংযত করেছিল বন্দনা। ভেবেছিল রাত্রি আরও গভীর হলে, অভিজিৎ ঘুমিয়ে পড়লে, সে কাঁদবে সারারাত। কিন্তু এখন, কলঘরের অন্ধকারে অকস্মাৎ তার নিজের মনের একটা অন্ধকার দিক ঝলসে উঠল তার সামনে। ঝলসে দিল তাকেও। এত স্বার্থপর সে! এ কি সত্যি? এই কি মনে ছিল তার? প্রদ্যোত—আর কোনদিন আসবে না প্রদ্যোত! কোন দীপাবলীর রাতে প্রদ্যোতের স্মৃতি ভয় দেখাবে না তাকে! পোড়াবে না! প্রদ্যোত আসতে পারে, এসে তার সাজানো বাগানের ফুলগুলিকে দলে দেবে এই ভয়ে আর কোন দীপাবলীর রাতে আতঙ্কে কাঁপতে হবে না বন্দনাকে!

যদি পারত দেওয়ালে মাথা ঠুকে ডুকরে কেঁদে উঠত বন্দনা। কাঁদলে সে বাঁচত। কান্না নেই। বুকটা পাথর হয়ে গেছে। নীরেট। কলঘর থেকে পালিয়ে গেল বন্দনা। পালিয়ে গেল আড়ালে, আগুনের বেড়াজালে—অভিজিতের কোলে।

* * *

গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল অভিজিতের। তার পাশে শুয়ে ঘুমন্ত বন্দনা ঘুমের ঘোরে কাঁদছে।

কাঁদছিলে কেন তুমি?

বিশ্রী স্বপ্ন দেখছিলাম একটা।

অভিজিৎ ঘুমিয়ে পড়ল আবার।

কোথায় ঘুম? ঘুম নেই বন্দনার। কান্না নেই। বাইরে জানলার ওধারে অন্ধকারে অজস্র খদ্যোত জ্বলছে আর নিভছে। অন্ধকারের স্তব করছে ওরা।

মাধবীর চিঠিতে খবর এসেছে দীপাবলীর আগের দিন বাজি তৈরি করার সময় অসাবধানে আগুন লাগায় প্রদ্যোত মারা গেছে—জীবন্ত দগ্ধ।

জানলার বাইরে জোনাকিরা জ্বলছে আর নিভছে। জোনাকি! খদ্যোত! প্রদ্যোত!

কান্না যেন ত্যাগ করেছে বন্দনাকে। সেই খদ্যোতবিদ্ধ অশ্রুহীন অন্ধকার বন্দনার বুকের ভেতরটা যেন পুড়িয়ে খাক করে দেবে।

রহসি

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

রাত্রির আঁধার নামে আমার প্রাঙ্গণে,
মসৃণ, পিচ্ছিল কালো পাখা দুটি তার—
যেন কোন্ অজানিত ব্যথা সঙ্গোপনে
তারি মাঝে ঢেলে দেয় ক্লান্ত মনোভার।
নিঃসঙ্গ নিষুতি রাত, নিঃসীম নিশ্চল,
যুগান্তের মৌনতারে করিয়া সারথি—
রুদ্ধশ্বাসে চেয়ে রয় যেথা অচঞ্চল
অনিরুদ্ধ তপস্যার নির্বাক আরতি।
আদিহীন অন্তহীন দিগন্তের কোলে
অস্বনিত কোন্ ভাষা তরঙ্গিয়া যায়—
আঁধার জলধি মাঝে অশ্রুত কল্লোলে,
দিশাহীন ইঙ্গিতের অদৃশ্য লিখায়!
মনে হয় কোথা নাই জীবন-উত্তাপ
যেন কোন্ মেরুদেশ-তুহিন-শীতল
চূর্ণিত-তুষার বায়ু করে পরিমাপ
অন্ধ ক্লীব নৈরাশ্যের কোথা আছে তল!

আমার আকাশভরা এত হাসি আলো,
এত প্রেম অফুরন্ত শান্তির কূজনে,
নাহি জানি অকস্মাৎ কোথায় মিলালো
নিগূঢ় রহস্যমাঝে মায়ার গহনে!
মনে হয় শূন্য আজি দিগন্তের পারে,
চিহ্নিত সীমার মাঝে নিখিল জগৎ
বিক্ষুব্ধ কামনা তার জাগে বারেবারে
ব্যাপ্ত করি জলধিরে, সমুদ্র-পর্বত,
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যেন কী হতাশা
মূর্ছিত কল্পনালোকে বেদনা-বিকল
গতিহীন জ্যোতিহীন মৌন-মূক ভাষা
নিষ্ফল প্রয়াসে নিতি জাগে অবিরল।

কেবা তুমি অলক্ষিতে রহিয়া আড়ালে,
সে কোন্ মায়ায় রচি আলোকের স্তব,
অভ্র-নীল আচ্ছাদনে রূপ-রুদ্রতালে
আঁধিয়ারে দিলে আনি শাশ্বত গৌরব।
সে কি শুধু ইন্দ্রজাল, মানস-প্রচ্ছায়ে
নিত্য নব সুরভিত ক্ষণের আরতি—
মিথ্যারে সত্যের মাঝে দিলে কি বিছায়ে
শুধুই হেরিতে তার ব্যর্থ পরিণতি?

অতন্দ্রিত হে গোপন, তোমার পূজায়
অন্তরের অনুরাগ প্রকাশে বিধুর
অজানার খেলাঘরে সুতীব্র আশায়
কাহারে সুমুখে ধরে নিয়তি সুদূর?
তরলিত বহ্নিস্রোতে প্রাণের বারতা
তরঙ্গিয়া অনির্দেশপানে ছুটে চলে
সীমার বাঁধন খুলি অসীমের কথা
আসক্তিরে মুঞ্চে তবু ভাসে অশ্রুজলে।

চিরন্তনী জিজ্ঞাসার হে চিরদুর্জয়
চিরায়ত কালরূপে সুচির আঁধারে
নিত্য আনো অলৌকিক অলোক-বিস্ময়—
তোমারে ধরিতে নারি জ্ঞানের প্রাকারে!
অদৃশ্য সঙ্কেত শুধু করিয়া বিস্তার
কী কথা কহিয়া যাও গোপনে গোপনে—
রহসি রহিয়া কর রহস্য-বিহার
সঞ্জীবিত করি ক্ষুণ্ণ আশা-দীর্ণ জনে।

'মোদের গরব, মোদের আশা'

দেবব্রত ভৌমিক

"The writer must, naturally, make a living in order to exist and write, but he must not exist and write in order to make a living....The writer in no way regards his works as a means. They are ends in themselves; so little are they a means for him and others that, when necessary, he sacrifices his existence to theirs and, like the preacher of religion, he takes as his principle: 'Obey God more than men', men among whom he is himself included along with his human needs and desires."

Karl Marx—'Debaten ueber Pressfreiheit', MEGA, Part I, Vol. I, pp. 222-23.

বিশেষ করে মার্ক্স সাহেবের উক্তি দিয়ে রচনা শুরু করার পিছনে আমার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। মানুষের জীবনের সমস্ত ক্রিয়াকলাপের পিছনেই যিনি সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রণোদনা খুঁজে পেয়েছেন, এবং সমাজের প্যাটার্নকে পরিবর্তনের জন্যই জীবনের সব-কিছু নিয়োগ করার কথা যিনি আজীবন ঘোষণা করে এসেছেন, সেই বিশেষ ব্যক্তির মুখে লেখক-সত্তার এই নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার বাণী পাঠককে একটু গভীরতর দিক থেকেই ভাবাবে বলে আমার বিশ্বাস। অবশ্য, সত্যি কথা বলতে গেলে গোড়াতেই বলতে হয় যে শুধুমাত্র যিনি পাঠক, তাঁকে চিন্তান্বিত করার জন্য এ প্রবন্ধের অবতারণা নয়; আমি ভাবাতে চাই লেখককেই।

কেন চাই, তার কৈফিয়ত দিতে হলে প্রথমেই আমাদের আধুনিক সাহিত্যের চরিত্রের কথাটা মোটামুটি আলোচনা করে নিতে হয়। কোন সাহিত্যকেই আমরা কেবল বয়সের হিসেব মিলিয়েই আধুনিক আখ্যা দিই না। ও-অভিধার পিছনে জন্মক্ষণের হিসেব যতটা গণ্য, চরিত্র-লক্ষণের বিচার তার থেকে ঢের বেশী গ্রাহ্য—অর্থাৎ আধুনিক কালের সাহিত্যমাত্রেই আধুনিক-সাহিত্য নয়। যে-সাহিত্যে আধুনিক মানসের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট, একমাত্র তাকেই আমরা আধুনিক সাহিত্য আখ্যা দিতে পারি—তা তার বয়েসের হিসেবে গরমিল যতই থাকুক না কেন। অবশ্য, এ-কথা সর্বদা-স্বীকার্য যে চরিত্র-বৈশিষ্ট্য বয়োধর্মেরই অনুগামী। এবং সেইজন্যই সাধারণ-সত্যের বিচারে শেষ পর্যন্ত বয়সের হিসেব নিতে হয় আমাদের সর্বত্রই।

আধুনিক সাহিত্যের এই বয়স-বিচারে প্রবৃত্ত হলে, অর্থাৎ উৎসের সন্ধানে অগ্রসর হতে গেলে আমাদের স্বদেশের সীমাকে পেরিয়ে যেতে হয়। আর, এক্ষেত্রে সাগর-লঙ্ঘনে জাত যাবার কোন সম্ভাবনাই নেই; কেন-না আধুনিক সাহিত্য বস্তুটিই কোন বিশেষ ভৌগোলিক সীমারেখায় ধরা দিতে নারাজ। দেহগত রূপের বিচারে যাই হোক না কেন, মনোগত স্বরূপের বিশ্লেষণে, আধুনিক সাহিত্য কোনমতেই কোন দেশীয় বা প্রদেশীয় সাহিত্য নয়। ওকে আমরা যথার্থ অর্থে বিশ্ব-সাহিত্যই বলতে পারি। বিশ্বের সব ভাষার সাহিত্যই ওখানে কয়েকটি সাধারণ লক্ষণের দ্বারা 'আধুনিক'—এই সংজ্ঞায় গ্রন্থিবদ্ধ হয়েছে।

মোটামুটিভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই আধুনিক

মানসের জন্ম বলা যেতে পারে। শিল্প-বিপ্লব ব্যক্তিকে যে স্বতন্ত্র ব্যক্তি-সত্তার গৌরব দিয়েছিল, এবং রেনেসাঁসের আন্দোলন এই ব্যক্তি-সত্তার সামনে যে নতুন উষার স্বর্ণদ্বার অবারিত করে ধরেছিল, সাধারণভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেকার সমস্ত মানস-কৃতিতেই তার প্রভাব সুস্পষ্ট। রেনেসাঁসী চেতনা জীবনকে একটি বিশেষ সুমিত সুন্দর অর্থ দান করেছিল—যে অর্থ একান্তভাবেই মানবিক, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং যুক্তিনির্ভর। এই পজিটিভ অর্থের ঐশ্বর্যে শক্তিমান হয়েই উনিশ শতকের জীবন বিভিন্ন দিক থেকে সৃষ্টিশীল হয়ে উঠেছিল। সমস্ত সমাজের মধ্য দিয়েই তখন অবাধ অগাধ সৃষ্টিশীল আলো-হাওয়ার প্লাবন বয়ে গিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তৎকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কিছু বৈপ্লবিক আবিষ্কার এই রেনেসাঁসী সুস্থির জীবন-চৈতন্য এবং সুস্থ মূল্যবোধের বনিয়াদে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে। যে উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সন্তানেরা এতদিন রেনেসাঁসের ঐতিহ্য ও শিক্ষার উত্তর-সাধক হিসেবে সমাজের বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন সৃজনশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে এসেছে, হঠাৎ ব্যাকুল বিস্ময়ে তারা দেখতে পেয়েছে যে পায়ের নীচে থেকে জমি সরে যাচ্ছে। শিল্প-বিপ্লবের পর থেকে নতুন অর্থনৈতিক উৎপাদন-ব্যবস্থার বনিয়াদের উপর সমাজের নায়ক হিসাবে যে নতুন বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল, অনেকদিন আগে থেকেই অলক্ষ্যে তাদের অগ্রণীর ভূমিকায় ভাটা পড়তে শুরু করেছিল। ইতিহাসের আপন ডায়লেকটিক্ বিবর্তনের নিয়মে ওই বিশেষ কালের পজিটিভ সৃষ্টিশীল ভূমিকা নিঃস্ব হয়ে যাবার পর নেগেশ্যনের কাজ আপনা থেকেই ভিতরে-ভিতরে শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের নির্মম আঘাতে সেই নেগেশ্যনের বা ডেকাডেন্সের নগ্ন রূপ স্পষ্ট করে ধরা পড়ল। অপরূপ রূপের প্রতিমার উপর থেকে রঙ ধুয়ে গেল, মাটি খসে গেল—কুৎসিতভাবে প্রকট হয়ে উঠল পচা খড়কুটোর নোংরা আবর্জনা। দলে-দলে তরুণ যুবককে যখন বাধ্য হয়ে গোরু-ছাগলের মত কামানের খোরাক হতে হল, বুভুক্ষার যন্ত্রণায় মাকে যখন সন্তান ত্যাগ করতে হল, পতিব্রতা নারীকে যখন পণ্যবস্তুর মত নিজের দেহকে বিক্রয় করতে হল, তখন মানুষের মনে রেনেসাঁসের সুস্থ জীবনদর্শন এবং মূল্যবোধের ওপরে আস্থা চুরমার হয়ে ভেঙে গেল। বাইরের দিক থেকে যেমন আঘাত এল যুদ্ধের, তেমনি ভিতরের দিক থেকেও আহত হতে হল জ্ঞানের নতুন দিগন্ত আবিষ্কারে। ডারুইনের গবেষণা, মার্ক্স-এঙ্গেলসের সমাজের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ এবং ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞানের আবিষ্কার মানুষের পূর্বতন সুস্থির চেতনাকে বিপর্যস্ত করে দিল। আর সব থেকে বড় কথা—যে মধ্যবিত্ত জেণ্টেলম্যান এতদিন নব্য কালচারের আদি ও অকৃত্রিম ধারক-বাহকের ভূমিকায় অভিনয় করে এসেছেন, তাঁর সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টার মূলে যে স্বচ্ছন্দ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল, সে ভিত্তিও প্রায় ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল তখন। উৎপাদন-ব্যবস্থা ক্রমেই লার্জস্কেল প্রোডাকশনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, ছোটখাট ব্যবসার ওপর মনোপলাইজেশনের দানবের ছায়া ক্রমেই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। এমনি অবস্থায় সমাজের মন কিছুতেই শান্ত সুস্থ ও সুন্দর হয়ে থাকতে পারে না। পারে নিও। অবিশ্বাস অসন্তোষ সংশয় সন্দেহ চারিদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। পচনশীল জগৎ-ব্যাপারকে কোন মঙ্গলময় পরম কারুণিক ঈশ্বরের দৈবী লীলার করুণা-দান মনে করে সান্ত্বনা পাবার সুযোগও আর বিশেষ অবশিষ্ট রইল না। রেনেসাঁস-পূর্ব সহজ ধর্মীয় বিশ্বাসের অবলম্বনও যেমন নষ্ট হয়ে গেল, তেমনি রেনেসাঁসী চেতনার যুক্তিনিষ্ঠ উদারতন্ত্রী আত্ম-প্রত্যয়ও আর শক্তি জোগাতে পারল না। শ্রীমতী উলফ্ যাকে 'leaning tower sensation' বলেছেন, সেই sensation-এ শ্রেণী-হিসাবে অধঃপতিত মধ্যবিত্ত মন তখন টলমল করে উঠেছে। শিল্পে-সাহিত্যেও তারও অশুভ ছায়া পড়েছে সবদিক থেকে। লেখকেরা জগৎকে কেবল 'waste land' বলে চিত্রিত করেছেন এবং মানুষকে বর্ণনা করেছেন 'hollow men' হিসাবে। কোন দিক থেকে কোন আশার বাণী শোনাতে পারেন নি কেউ। শুধু যে পারেন নি, তাই নয়, আসলে

শোনাতেও চান নি কেউ। তাঁদের ব্যাধিগ্রস্ত মনে সমস্ত আশার আনন্দের ও শান্তির কথাই সত্যের অপলাপ এবং মনগড়া মোহের ব্যর্থতা বলে প্রতিভাত হয়েছে। আশার কথা শোনাতে যেন লজ্জিতই বোধ করেছেন সকলে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু পর্যন্ত চলেছে এই একই অবস্থা। এই সময়ের মধ্যে একদিকে যেমন কিছু সংখ্যক লেখক রুশ-বিপ্লবের আপাত-সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে মার্ক্সবাদের মধ্যে নতুন সৃষ্টিশীল জীবনের সম্ভাবনার পথ খুঁজে নিয়েছেন, তেমনি অপরদিকে বহু শক্তিমান কবি-সাহিত্যিকই বিপরীতমুখী হয়ে পিছনের দিকে পা বাড়িয়েছেন—কেউ ধর্মের নামাবলী গায়ে জড়িয়ে জীবনের অবশিষ্ট দিন কায়ক্লেশে কাটিয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, কেউ প্রাচীন লোক-কথার রোমান্টিক জাগর-স্বপ্নের বালুকায় উটপাখির মত মাথা গুঁজে ঝড়ের ঝাপটাকে এড়াতে চেয়েছেন, আবার কেউ-বা অবচেতনার গভীর গুহায়িত অন্ধকারে কেবলই অন্ধের মত ঘুরপাক খেয়ে মরেছেন। হাক্সলী-ঈশেরউডের মত লেখকেরা, যাঁরা প্রচুর শক্তির ঔজ্জ্বল্যে সকলের চোখ ধাঁধিয়ে আসরে নেমেছিলেন, তাঁরা কিছুকাল প্রচণ্ড উৎসাহে দু হাতে পচনশীল সমাজের আবরণ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, তীব্র ব্যঙ্গের হাসিতে প্রথাসিদ্ধ জীবনযাত্রার পূর্ণতার অহমিকাকে সচকিত করে তুলেছেন। কিন্তু তারপর? তারপর এই নেগেটিভ কাজের একঘেয়ে তুচ্ছতায় ক্রমেই ক্লান্ত হয়ে উঠেছে তাঁদের অমিত উৎসাহ। এবং অবশেষে হলিউডি ফিল্মের স্ক্রিপ্ট রচনায় ও অবসর সময়ে সর্ব-গ্লানি-হর উপনিষদ অথবা বেদান্তের চর্চায় প্রাজ্ঞজনোচিত উপায়ে তাঁরা অতীত যৌবনের স্মৃতিকে বিস্মৃত হবার ঐকান্তিক সাধনায় রত হয়েছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী এবং পরবর্তী কালেও মূলগত দিক থেকে সেই অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটে নি। সব দিক থেকে শুধু লক্ষণগুলোই আরও তীব্র হয়ে প্রকট হয়ে উঠেছে। মানুষের বিশ্বাসের ওপর একে একে আঘাত এসে পড়েছে আরও নানা দিক থেকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সর্বগ্রাসী ভয়াবহতা প্রথম যুদ্ধের স্মৃতিকে ম্লান করে দিয়েছে। হিরোসিমা-নাগাসাকিতে বিজ্ঞানের একটি পরম আবিষ্কারের চরম ধ্বংসকারীতার রূপ যে-মানুষ একবার প্রত্যক্ষ করেছে, তার পক্ষে জীবনের অন্তর্লীন কোন শুভচেতনায় অবিচল থাকা প্রায় অসম্ভবেরই নামান্তর হয়ে উঠেছে। অপর দিকে, যারা কম্যুনিজমের আস্তিক্যকে আশ্রয় করে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে চেয়েছিল, তাদেরও চরম আঘাতের মুখোমুখি হতে হয়েছে বারবার। ক্রুশ্চেভ কর্তৃক মহিমান্বিত স্তালিনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন, ম্যালেনকভের নির্বাসন; হাঙ্গেরীর বিপ্লবকে রক্তের স্রোতে ধুয়ে দেবার প্রচেষ্টা, এবং সর্বশেষে প্রাচ্যের প্রাজ্ঞ চীন কর্তৃক ভারতসীমান্ত লঙ্ঘন ইত্যাদি ঘটনার আঘাতে সৎবিবেকবান মানুষের পক্ষেই জগতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নের সঙ্গে কম্যুনিজমকে যুক্ত করে নিশ্চিন্ত থাকার অবকাশ নেই আর। ফলে, সব দিক থেকেই মার খেয়ে মানুষের জীবন আজ নোঙরহীন নৌকোর মত উধাও নিরুদ্দেশে ভেসে চলেছে—কোথাও কোন প্রত্যয়ের দৃঢ় খুঁটিকে আশ্রয় করে দাঁড়াতে পারছে না কেউ। আর সব থেকে বড় কথা এই যে, এ ভেসে যাওয়ায় তার কোন গতির আবেগ নেই, নিরুদ্দেশ-যাত্রার রহস্যঘন রোমাঞ্চ নেই—আছে শুধু নিরুপায় আত্মসমর্পণের গ্লানি, যন্ত্রণা। এই গ্লানি আর যন্ত্রণার ছাপই আজকের বিশ্ব-সাহিত্যের অঙ্গে-অঙ্গে। আধুনিক সাহিত্যের মানস-প্রকরণের এটাই বোধ হয় সব থেকে বড় উপকরণ।

এ-উপকরণ যেমন রয়েছে য়ুরোপের সাহিত্যে, আমেরিকার সাহিত্যে—তেমনি বাংলাদেশের সাহিত্যেও। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে এ-উপকরণের ব্যবহার ঠিক পাশ্চাত্ত্যের মত হয় নি। হয় নি—তার কারণ, এ-দেশের মানসভূমির বৈশিষ্ট্য। সে ভূমি পূর্ববর্তী কাল থেকেই বিশেষ কর্ষণায় যে-ফসল ফলানোর জন্যে তৈরি হয়েছিল, তা 'আধুনিকতা' হলেও ঠিক ও-দেশের তুল্য নব্যতা নয়। বাংলাদেশে রেনেসাঁসের আন্দোলনের সঙ্গে য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের রূপের একটা মূলগত পার্থক্য আছে। বাংলায় ওই নব-জাগৃতির বাণী কেবল কিছু ইংরেজী-শিক্ষিত

নাগরিক উচ্চবিত্ত মানুষের জীবনের মধ্য দিয়েই এসেছিল। এবং প্রায় নগরের সীমারেখার মধ্যেই তাঁদের জীবনকে কেন্দ্র করে তার ঢেউ ওঠানামা করেছিল। সমগ্র দেশ এবং সমস্ত সমাজের মধ্যে সে আন্দোলন বিশেষ একটা তরঙ্গ বিস্তার করে নি। করলেও সেটা বাইরের কিছু ঘটনা এবং ক্রিয়াকলাপেই সীমাবদ্ধ ছিল; জীবনের গভীরে প্রবেশ করে মানস-সত্তার মূল শক্তির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে পারে নি। পারে নি, তার কারণ, সে-সময়ের সমাজের বিশেষ অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্যাটার্ন, এবং তার পূর্ব-ইতিহাস। আমাদের নব-জাগৃতির পুরোহিতেরা বোধ হয় সে আন্দোলনকে তাঁদের সাংস্কৃতিক জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন। আর তা ছাড়া, তাঁদের অধিকাংশেরই জীবনের আর্থিক ভিত্তিটা ছিল জমির উপরে। নতুন যন্ত্রশিল্পের মালিকানা-স্বত্বে নব্য শ্রেণী হিসাবে তাঁদের উদ্ভব ঘটে নি। অর্থনৈতিক দিক থেকে সমাজ-বিন্যাস রয়ে গেছে প্রায় পূর্বানুগই। নব-জাগৃতির পুরোধারা নতুন যুগের দায় বাইরে মীটিঙে এজিটেশ্যনে এবং খবরের কাগজে চুকিয়ে দিয়ে ঘরে ফিরে এসে হাত-পা ধুয়ে পুনরায় সেই সনাতন সমাজেরই প্রতিভূ হয়ে বসেছেন। তারপর, আবার সেই গোবর এবং গঙ্গাজল, টিকি এবং সন্ধ্যাহ্নিক। মাত্র জনকয়েকের উজ্জ্বল ব্যতিক্রম-দৃষ্টান্ত ছাড়া, অন্য অধিকাংশের সম্বন্ধেই এমন কথা মনে করার যথেষ্ট অবকাশ আছে। বস্তুতঃ, রেনেসাঁসের ভাবধারা অধিকাংশ ব্যক্তিই সমগ্র সত্তা দিয়ে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন কি না, সে বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ আছে। চাঁদসদাগরের মতই তাঁরা বৈদেশিক চেঙ্গমুড়ি কাণীর পূজা অবহেলায় বাঁ-হাতে সেরে দিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের চোখ এবং মন সব সময়ই ফিরিয়ে রেখেছেন স্বদেশীয় সনাতন শৈবলিঙ্গের দৃঢ়তার উপরে। মনে হয়, সে-যুগের বেশীর ভাগ ব্যক্তি সম্পর্কেই এ উক্তিকে সত্য বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। রেনেসাঁসের ভাবধারা স্বাভাবিক ডায়লেকটিক্ প্রসেসে আমাদের স্বদেশীয় সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তির স্ফুরণ হিসাবে আসে নি। ওটা আমাদের ওপর ফরেন্ এলিমেন্টের মত বাইরে থেকে এসে চেপে বসেছে। আর, তার মূল অর্থনৈতিক বনিয়াদটাও যে যথোপযুক্ত সবল হয় নি, সে কথা তো আগেই বলেছি। কাজেই ও-ভাবধারা সম্পূর্ণভাবে আমাদের মানসিক কাঠামোটাকে পরিবর্তিত করতে পারে নি; পুরনো কাঠামোর উপরেই একটা নতুন ভঙ্গীর রঙ লাগিয়েছে মাত্র। আমরা সম্পূর্ণভাবে সামনের দিকে এগোতে পারি নি—এক পা এগিয়েছে সামনে, আর এক পা পিছনে। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেই এ দ্বন্দ্ব স্পষ্ট করে ধরা পড়ে। বঙ্কিমের একদিকে যেমন রেনেসাঁসী উদারনৈতিক যুক্তিবাদ, অপর দিকে তেমনি হিন্দু রিভাইভ্যালের সনাতন ভক্তিবাদ। এই আপাতবিরোধী ভাবধারার দ্বন্দ্ব আমাদের সমাজ-মানসে বর্তমান দিন, অর্থাৎ আধুনিক কাল পর্যন্ত সমানই রয়ে গেছে। আর, সেইজন্যই আমাদের আধুনিক মনের লক্ষণ সম্পূর্ণভাবে বৈদেশিক আধুনিকতার অনুকারী নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের পর যখন রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্যের হাল ধরেছেন, তখন তাঁর মধ্যেও এই ভাববিরোধ উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এ বিরোধ ঠিক বঙ্কিমানুগ হয়ে থাকে নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্যে হিন্দু-রিভাইভ্যালিজমের জায়গায় বসিয়েছেন ব্রাহ্ম ভাববাদকে। এক দিকে রেনেসাঁসী উদারনৈতিক যুক্তিবাদ, এবং অপর দিকে ব্রাহ্ম ভাববাদ; এক দিকে প্রাচ্যের ভাব-সিদ্ধির প্রতি প্রীতি, এবং অপর দিকে পাশ্চাত্ত্যের কর্ম-সাধনার প্রতি আকর্ষণ—এই উভয় ভাবধারার টানাপোড়েনেই গঠিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের মানস-ভূমি। এ উভয় ভাবধারার সমন্বিত প্রবেগ নিয়ে তাঁর মন কবি-মানসের বিশিষ্ট নিয়মে একবার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসীমার রূপের চরম প্রান্তে পৌঁছেছে, তারপর আবার ইন্দ্রিয়াতীত অরূপ অসীমের চূড়ান্তের উদ্দেশে নিরুদ্দেশযাত্রা করেছে।* দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংকট যে তাঁর মনে কখনও আসে নি, তা নয়। কিন্তু তিনি সচেতন মননের সাহায্যে উপনিষদীয় আনন্দবাদের দ্বারা সমস্ত ক্ষুদ্র-খণ্ডতাকে অতিক্রম করে

* 'শনিবারের চিঠি', মাঘ ১৩৬৪ সংখ্যায় লেখকের 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

গেছেন, সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংকট-সন্দেহকে পরাস্ত করেছেন। কিন্তু অবচেতন মনে যে সম্পূর্ণভাবে জয়ী হতে পারেন নি, তার পরিচয় রয়েছে তাঁর ছবিতে, তাঁর কোন কোন গদ্য এবং পদ্য রচনার শব্দ-নির্বাচনে। যুদ্ধোত্তর কালেও রবীন্দ্রনাথের রচনায় আধুনিক যুগের কোন প্রভাব পড়ে নি দেখে অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, বিস্ময়ের কোন কারণই নেই এতে। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কবি-প্রকৃতি, এবং তাঁর উদয়-লগ্নের সাংস্কৃতিক পটভূমির বৈশিষ্ট্যকে স্পষ্ট করে বুঝতে পারলে তাঁর কাব্য-কৃতির রহস্যকেও বোঝা যায় সহজেই।

যাই হোক, আমরা যাকে আধুনিকতা বলেছি, রবীন্দ্রনাথ সে-অর্থে আধুনিক নন। আধুনিক সময়ের অন্তর্লীন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সন্দেহ-যন্ত্রণার অভিঘাত তাঁর স্পর্শকাতর মনকে আঘাত করেছে, অবচেতনায় কিছু প্রভাব বিস্তারও করেছে, কিন্তু সচেতন মননে তিনি তাকে অতিক্রম করে গেছেন। আর যে-ঐতিহ্যের শক্তিতে তাঁর এ অতিক্রমণ ঘটেছে, তা নব্যযুগের বাইরে-থেকে-আমদানি-করা রেনেসাঁসী ঐতিহ্য নয়—ভারত-ইতিহাসের কয়েক হাজার বছরের ভাব-সাধনার সমন্বিত রূপ। কিন্তু তাঁর পরবর্তী যুগে যাঁরা সাহিত্যে এসেছেন, যাঁদের আমরা আধুনিক বলতে পারি, তাঁরা এ রূপকে স্বীকার করেন নি। সে-আধুনিকদের কথাতেই এবার আসতে হবে আমাদের।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বাংলার সাহিত্য-সংসারে এমন একদল লেখকের আবির্ভাব ঘটেছে, যাঁদের জগৎ রবীন্দ্রনাথের জগতের থেকে অনেক দূরে। রবীন্দ্র-মানসিকতার থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন তাঁরা। তাঁদের যেতে হয়েছে। যেতে হয়েছে যুগের প্রয়োজনে। ইতিহাসের আন্তর গরজই তাঁদের টেনে এনেছে সামনে—তৈরি করে দিয়েছে তাঁদের মানসিকতা। যুদ্ধোত্তর যুগের যে বিশেষ মানসিকতার কথা আগে বলেছি, সেই মানসিকতাতেই গড়ে উঠেছে তাঁদের আন্তর সত্তা, তাঁদের ভাব-জগৎ। এ-জগতে অনন্ত কোন বিশ্বাস নেই, অবিচল কোন প্রত্যয় নেই, অন্ত-নিরপেক্ষ শাশ্বত কোন সৌন্দর্যের, কোন ভাবের অনুভূতি নেই। আছে শুধু অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধা, যন্ত্রণা, গ্লানি। যুদ্ধোত্তর কালেও রবীন্দ্রনাথ বহুদিন ধরে শিল্পসৃষ্টি করেছেন। কিন্তু সে-কালেও যে-মানসসঙ্কট তাঁকে আচ্ছন্ন করে নি, সেই সঙ্কট এঁদের অভিভূত করে দিয়েছে। তার কারণও ছিল স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের মূল কাঠামোটা, ইন্‌ডিভিজুয়্যাল সাইকোলজিতে অ্যাডলার যাকে ইগো বলেছেন, সেই ইগো যে-সময়ে গড়ে উঠেছে, সেটা যুদ্ধপূর্ব কাল; এবং তার পরিবেশ ঠাকুরবাড়ির বিশেষ আবহাওয়া। এই ইগো এবং সঙ্গে সঙ্গে তার জীবন-পরিকল্পনা তাঁকে যে দৃঢ় প্রত্যয়ের ভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে গেছে, সে-প্রত্যয় যুদ্ধোত্তর কালের আঘাতেও টলে নি। কিন্তু রবীন্দ্রোত্তর যুগের যে নব্য লেখককুলকে আমরা আধুনিক লেখক বলি, তাঁদের জীবনে সে-সুযোগ ঘটে নি। তাঁদের শৈশব-কৈশোর কেটেছে যুদ্ধের বিষাক্ত আবহাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়ে, তাঁদের ইগো গড়ে উঠেছে চতুর্দিকের অবক্ষয়ের দুঃসহ আঘাতে-আঘাতে; তাঁদের জীবনদর্শনে কোথাও কোন শাশ্বত সত্য, শাশ্বত সৌন্দর্য ঠাঁই পায় নি। রবীন্দ্রনাথের মত তাঁরা কোন ঐতিহ্যানুসারী দৃঢ় প্রত্যয়ে জীবনের সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে অবিচল থাকতে পারেন নি, কোন সামগ্রিক আনন্দবোধের প্রশান্তিতে সমস্ত ক্ষুদ্র-খণ্ডকে শোক-দুঃখ-ব্যথা-যন্ত্রণাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারেন নি। তাঁরা আধুনিক কালের হতাশ যন্ত্রণা-জর্জর মানসকেই তাঁদের সাহিত্যে রূপ দিতে এগিয়ে এসেছেন। তাঁদেরই আমরা রবীন্দ্রোত্তর যুগের লেখক বা আধুনিক লেখক বলি।

আমি আগেই বলেছি যে আধুনিক সাহিত্য মানেই বিশ্বসাহিত্য। কিন্তু এ-কথা আমরা কিছুতেই বলতে পারি না যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের কোথাও কোন গরমিল নেই। বরং মনে হয়, এ উভয়ের মধ্যে মিলের থেকে গরমিলের সংখ্যাই বেশী। মিলটা আপাততঃ, কিন্তু গরমিলটা মূলতঃ। এ কথা স্পষ্ট করে বুঝতে গেলে উৎসের দিক থেকে, অর্থাৎ লেখক-মানসের দিক থেকে, আমাদের

আধুনিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করতে হয়।

এদেশে রেনেসাঁসের আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গে আমি বলেছি যে সে আন্দোলনের হোতারা শিল্পের মালিকানা-স্বত্বে নতুন শ্রেণী হিসাবে দৃঢ় ভূমির ওপর পা রেখে দাঁড়াতে পারেন নি। তাই, তাঁদের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যেই একটা চরম দুর্বলতা এবং অন্তঃসার-শূন্যতা রয়ে গেছে। এ দুর্বলতা এবং অন্তঃসারশূন্যতা পরবর্তী কালের মানসে আরো বেশী প্রকট, আরো বেশী তীব্র। আধুনিক কালের এই লেখকদের জীবন তার স্পষ্ট প্রমাণ হয়ে চোখের সামনে হাজির রয়েছে। এঁদের অধিকাংশই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। জমির সঙ্গে এঁদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ লুপ্ত হয়েছে (কিছু অংশ উপস্বত্বভোগী হওয়া সত্ত্বেও)। আবার শিল্পের সঙ্গেও কোন নতুন নিকট-সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। এই ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় তাঁরা পূর্ববর্তী যুগের 'leaning tower sensation'-এর চেয়েও ঢের বেশী শক্তিশালী অসহায়তার এবং অনিশ্চিতির sensation-এর আঘাতে সব সময়ই টলমল করেছেন। তাঁরা না পেরেছেন বৃহত্তর গ্রাম্য জনতার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে, না পেরেছেন নতুন-শ্রেণী-হিসাবে-গড়তে-থাকা শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিতে। এই অবস্থায় তাঁদের দৃষ্টি এবং চেতনা একমাত্র নিজেকে কেন্দ্র করেই শামুকের মত আত্মাভিমানী স্বার্থবোধের খোলস রচনা করেছে। একমাত্র নিজেকে ছাড়া তাঁরা আর কাউকেই চেনেন নি। আর, চেনেন নি বলেই বাইরের দিকে যখনই তাকিয়েছেন—তাকিয়েছেন রোমান্সের রঙিন চশমা চোখে দিয়ে। আমাদের আধুনিক সাহিত্যে কৃষক এবং শ্রমিক জীবন নিয়ে যা কিছু রচিত হয়েছে, তার অধিকাংশ সম্বন্ধেই এ কথা প্রয়োগ করা যেতে পারে বলে আমার মনে হয়।

যেমন রেনেসাঁসের ভাব আমরা পাশ্চাত্যের কাছে ধার করে নিয়েছি, তেমনি নিয়েছি আধুনিকতাকেও। এবং ধার-করা বস্তু বলেই তাকে আমরা কখনই একেবারে আত্মসাৎ করে নিতে পারি নি। পাশ্চাত্যে আধুনিক মানসের যে সুতীব্র যন্ত্রণা, সে-যন্ত্রণা আমাদের কাছে সম্পূর্ণভাবে সত্যবস্তু নয়। ওদের ও-যন্ত্রণা যে ভাবে বিচলিত করতে পারে, সৃষ্টিশীল করতে পারে, আমাদের তা পারে না। আর পারে না বলেই আমাদের কোন লেখক এ যুগের চিত্রকেও সার্থকভাবে রূপ দিতে পারেন নি, এ যুগের যন্ত্রণাকে সার্থকভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হন নি।

আমি আগেই বলেছি যে রেনেসাঁসের সময় থেকেই আমাদের মানসসত্তার এক পা সামনে আর এক পা পিছনে। আধুনিক লেখকদের সম্পর্কেও এ কথা সত্য। ব্যক্তিগত জীবনে এঁদের শিক্ষা ইংরেজী ভাষায়। ইংরেজী ভাবধারার মধ্যেই এঁদের মনের পুষ্টি। কিন্তু গোষ্ঠীজীবনে অর্থাৎ পারিবারিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে, জীবনের বিশেষ বিশেষ আচার-আচরণ-রীতি-নীতির ক্ষেত্রে, এঁদের অধিকাংশেরই জীবন এখনও সেই সনাতন চণ্ডীমণ্ডপে নিষ্ঠাবতী মাসী-পিসির সুদৃঢ় আঁচলে শক্ত গেরোয় বাঁধা। কাজেই, মানসসত্তার দিক থেকে এঁদের এক অদ্ভুত দোটানায় সব সময় দুলতে হচ্ছে। না পারছেন সম্পূর্ণভাবে আধুনিক মানসের অবিশ্বাসকে যন্ত্রণাকে গ্রহণ করতে, না পারছেন রাবীন্দ্রিক প্রত্যয়কে মেনে নিতে। জীবনাচরণের বৃহত্তর ক্ষেত্রের দিক থেকে এঁদের মন একেবারে বিশ্বাসহীন নয়। কিন্তু সে বিশ্বাসকে প্রত্যক্ষভাবে সচেতন মনে স্বীকার করে নেবার সাহস এবং চরিত্র এঁদের নেই। ইংরেজী শিক্ষার অর্থহীন অভিমান এবং এক ধরনের হীনমন্যতা বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভারতীয় ঐতিহ্যে এবং বিশ্বাসে আস্থার কথা ঘোষণা করতে এঁরা যেন কেমন-একটা বিকৃত লজ্জা অনুভব করেন। আবার, সম্পূর্ণভাবে অবিশ্বাসকে বিশ্বাস করাও এঁদের সাহসে কুলোয় না। যদি কুলোত তবে তার দ্বারাই এঁরা সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারতেন।

এই উভয়মুখী টানের ফলে কোন দিকেই এঁরা সৃষ্টিশীল হবার সুযোগ পাচ্ছেন না। না পারছেন সম্পূর্ণভাবে আধুনিক জীবনের যন্ত্রণাকে ফোটাতে, না পারছেন তাকে অতিক্রম করে যাবার জন্যে কোন আশার আলো চোখের সামনে তুলে ধরতে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে যে-সব লেখক আমাদের সাহিত্য-সংসারে এসেছেন, তাঁদের সকলেরই প্রায় এই একই অবস্থা। একমাত্র উজ্জ্বল ব্যতিক্রম দেখতে পাই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনিই বোধ হয় বর্তমান বাংলা সাহিত্যের একমাত্র অনাধুনিক লেখক। তাঁর রচনায় সন্দেহ নেই, সংকট নেই, অবিশ্বাসের যন্ত্রণা নেই। আছে সহজ গ্রহণ, স্বাভাবিক স্বীকার—এক কথায় বিশ্বাস। এই বিশ্বাসই তাঁর রচনার যা-কিছু গুণ এবং যা-কিছু দোষ। এই বিশ্বাসের ফলেই তাঁর সৃষ্ট চরিত্র একদিকে যেমন একটা সুস্থ প্রশান্তি পেয়েছে, অপর দিকে তেমনি দ্বন্দ্ব-সংকট-সংঘর্ষকে অতিক্রম করে পূর্ণতর মানব হিসেবে বিকশিত হবার সুযোগ হারিয়েছে। (বিশেষ করে উপন্যাসের দিক থেকে এটা খুবই বড় রকমের দুর্বলতা।)

তারাশঙ্করের মধ্যেও এই বিশ্বাসের কথা আছে। কিন্তু এ-বিশ্বাস যেন উপর থেকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া উপদেশ। তাঁর এ বিশ্বাসের বাণী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে অন্তর-ঘনিষ্ঠতা লাভ করে একাত্ম হয়ে যেতে পারে নি—অর্থাৎ এক কথায়, সার্থক শিল্পবস্তুতে পরিণত হয় নি। তারাশঙ্কর যেখানে সার্থক স্রষ্টা সেখানে তিনিও আধুনিক। সেখানে যুগের যন্ত্রণা এবং অস্থিরতা তাঁর সৃষ্টিশীল অবচেতনাকেও চঞ্চল করে তুলেছে। যাই হোক, একালের লেখকেরা তাঁদের সাহিত্য-কর্মে কখনও ফাঁকি দিতে চান নি। কেবল পূর্বোক্ত মানস-দ্বন্দ্বের দুর্বলতার জন্যই তাঁরা সার্থক সৃষ্টির সুযোগ হারিয়েছেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী এবং পরবর্তী কালে বাংলা সাহিত্যে যে আর একদল লেখকের আবির্ভাব ঘটেছে, তারা কেবল পূর্বোক্ত আধুনিকতার লক্ষণগুলির দ্বারাই আক্রান্ত নয়—পরিবেশগত কারণে আরও কতকগুলি নতুন লক্ষণও তাদের চরিত্রকে অধিকার করেছে। অনেক আগে থেকেই সমাজে যে মূল্যবোধের ভাঙনের কাজ শুরু হয়েছিল, দানবীয় পারমাণবিক যুদ্ধের আঘাতে এবং দেশবিভাগের নিদারুণ অভিজ্ঞতায়, সে-কাজ এতদিনে প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। পরাধীনতার কালে আমাদের সমাজে দেশকে কেন্দ্র করে কতকগুলো সাময়িক মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়েছিল। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর সেগুলির সাহায্যে সমাজে একটা নতুন সৃষ্টিশীলতার পটভূমি গড়ে ওঠা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তা হয় নি। সংগ্রামের পরিণত ফল হিসাবে যদি স্বাধীনতা-প্রাপ্তি ঘটত, তবে হয়তো পূর্ববর্তী সংগ্রামের উন্মাদনাই নতুন সৃষ্টির উন্মাদনায় পরিণত হতে পারত। কিন্তু যেহেতু স্বাধীনতা-লাভ ঘটেছে আকস্মিক চুক্তির ফলে, এবং নবলব্ধ গদির চেতনায় আমাদের রাজনৈতিক প্রভুরা সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বেমালুম ভুলে যেতে বসেছেন, সেইজন্যই দেশে নতুন সৃষ্টিশীল চেতনা এবং মূল্যবোধ গড়ে উঠতে পারে নি। শুধু যে নতুন মূল্য-বোধই গড়ে ওঠে নি, তাই-ই নয়, পুরনো মূল্যবোধও প্রয়োজনের সমাপ্তিতে ধ্বংস হয়ে গেছে। সমস্ত সমাজ-মানসের ওপরেই নেমে এসেছে একটা নিদারুণ নেতিধর্মী হতাশার ছায়া। এবং এই হতাশারই বিপরীত পরিণতি হিসাবে চারিদিকে জেগে উঠেছে এপিকিউর্যান্ ভোগবাদ। সমাজ-মানসের এই দুর্বলতার সুযোগেই সাহিত্যে দেখা দিচ্ছে নানা বিকৃতি। ধর্মের নামে, ইতিহাসের নামে, বাস্তবতার নামে চুটকি অশ্লীল রচনায় বাজার ছেয়ে যাচ্ছে। ধর্মের ছদ্মবেশে অত্যন্ত অপটু হাতে লেখা যৌনবিকৃতির বর্ণনাও সাহিত্য নামে বাজারে চলে যাচ্ছে। ইতিহাস পরিণত হয়েছে বাইজীর নাচ এবং রাজা-মহারাজার রসালো ব্যভিচারের বিবরণে। বাস্তবতার অজুহাতে নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনের নোংরা ছবি আঁকা হচ্ছে। (যেন দরিদ্র মানুষের জীবনে কোন মানবিক চেতনা এবং মূল্যবোধ নেই।) যাঁরা একটু বেশী চালাক, তাঁরা পরিচিত জীবনের গণ্ডীর বাইরে চলে যাচ্ছেন। কেউ গারো-পাহাড়ের মানুষের বিবরণে কেবলই তাদের মেয়েদের সুপুষ্ট স্তনের মত উরুর বর্ণনা করছেন, আবার কেউ-বা ভ্রমণ-কাহিনীর নামে তীর্থের চিত্রের সঙ্গে ন্যাকান্যাকা 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি'-গোছের প্রেমের গল্প মিশিয়ে দিব্বি ককটেল বানাচ্ছেন। সব মিলিয়ে সাহিত্যের বাজার সরগরম হয়ে উঠেছে।

উঠবেই। কেন না, ইতিমধ্যেই সাহিত্যের একটা বিশেষ বাজার সৃষ্টি হয়ে গেছে, যে বাজার আগে ছিল না। প্রকাশনার ব্যবসা আগেও ছিল। কিন্তু তাকে নিছক ব্যবসা হিসাবে বোধ হয় আগে কখনও দেখা হয় নি—যেমন এখন হচ্ছে। শুধু যে ব্যবসা বলেই দেখা হচ্ছে, তাই নয়, তাকে লার্জস্কেল বিজনেসে পরিণত করারও চেষ্টা চলেছে। আর, লার্জস্কেল বিজনেস মাত্রেরই ঝোঁক মনোপলির দিকে। এখানেও সে ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। তাই, প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে সংবাদপত্র—প্রতিদিন যার নতুন সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে, এবং সকলের মধ্যেই যা প্রতিদিন ছড়িয়ে পড়ছে। এই প্রকাশনা এবং সংবাদপত্র মিলে যে চক্র তৈরি হচ্ছে, বাংলার আধুনিক সাহিত্য-সংস্কৃতিকে তা আজ গ্রাস করে নিতে বসেছে। লেখকদের তারা দলে দলে চাকরি দিচ্ছে, নানা ভাবে রচনা প্রকাশের সুযোগ দিচ্ছে, যূথবদ্ধ প্রচারে খ্যাতিমান করছে, এবং হরেক কিসিমের সরকারী-বেসরকারী পুরস্কারপ্রাপ্তির পথ প্রশস্ত করে দিচ্ছে। মধ্যবিত্ত লেখকের পক্ষে এ মনোহর টোপের লোভ সামলানো শক্ত। বিশেষ করে যে আধুনিক লেখকের পায়ের নীচে কোন দৃঢ় বিশ্বাসের জমি নেই, পিছনে কোন ঐতিহ্যের সযত্নলালিত চেতনা নেই, এবং সামনে কোন আশার আলো নেই তার পক্ষে উপস্থিত ভোগের প্রলোভন সংবরণের কোন কারণই থাকতে পারে না—থাকে নিও। আমাদের লেখকদের অধিকাংশই আজ প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সংবাদপত্রের কর্তৃপক্ষের পায়ে মাথা মুড়িয়ে দিয়েছেন। এবং তারই ফলে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রকৃত কর্ণধার হয়ে বসেছেন এমন সব ব্যক্তি—ভিন্নতর ক্ষেত্রে যাঁদের বহুবিধ দক্ষতার কথা দুষ্ট লোকের দ্বারা রটিত হলেও সাহিত্য-বোধের অপবাদ কেউ কখনও

দেয় নি। অব্যাপারের ব্যাপারী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায় রচিত বলেই ভারতচন্দ্রের মত কবিকেও বিদ্যা এবং সুন্দরের অসুন্দর রকমের মিলন ঘটাতে হয়েছিল। কাজেই, আমাদের নব-কৃষ্ণচন্দ্রদের তত্ত্বাবধানে কোন্ সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে, তা বুঝ সাধু যে জান সন্ধান। আমাদের শাস্ত্রে বলে যে বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস। কিন্তু ব্যবসায়ে সরস্বতীর বাস—এমন কথা কেউ কোনদিন বলে নি। আর বর্তমানে বাজারে নেমে সরস্বতীর যে হাল দেখা যাচ্ছে, তাতে ভবিষ্যতে পাব্লিশারের সুনজরে পড়ার লোভেও কেউ কোনদিন বলবে বলে ভরসা হয় না।

বাংলা সাহিত্যের এই বর্তমান অবস্থার কথা স্মরণ করেই আমি প্রথমে মার্ক্স সাহেবের উক্তিটি উদ্ধৃত করেছি : "The writer must, naturally, make a living in order to exist and write, but he must not exist and write in order to make a living." যে কোন সৎ লেখকের পক্ষে এ উক্তির অনুগামী হওয়াটাই স্বাভাবিক। আর, যখন এর বিপরীত দৃষ্টান্তই ব্যাপকভাবে কোন সাহিত্যে দেখা যায়, তখন সে সাহিত্যের চরম দুর্দিন বলেই মনে করা যেতে পারে। আমাদের আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও আজ এই দুর্দিনই চলেছে। গাড়ি, বাড়ি, ফিল্ম, প্রাইজ—ইত্যাদির লোভেই লেখকেরা লিখছেন—লেখার জন্য নয়।

এই অবস্থাকে পরোক্ষভাবে সমর্থন করেই কোন কোন তথাকথিত সমাজতাত্ত্বিক সমালোচক বলছেন যে এটা ইতিহাসেরই অনিবার্য রূপ ; এর জন্য কোন লেখককে দায়ী করে লাভ নেই। এ-ধরনের যুক্তি প্রয়োগে একটা মস্ত ফাঁকি আছে বলেই আমার মনে হয়। ইতিহাসের এই কার্যকারণবাদের সব থেকে বড় প্রবক্তা যে মার্ক্স-এঙ্গেলস্, তাঁরাও কোনদিন ঐতিহাসিক প্রবাহের বিবর্তনে ব্যক্তির দানকে অস্বীকার করেন নি। ইতিহাস যেমন ব্যক্তি সৃষ্টি করছে, তেমনই ব্যক্তিও আবার ইতিহাসকে পরিবর্তিত করছে। এবং সেইজন্যই ইতিহাসের অভ্যন্তরস্থ হওয়া সত্ত্বেও, ইতিহাসের নিয়ন্ত্রণে ব্যক্তির ভূমিকা এবং দায়িত্ব কিছুমাত্র কম নয়। সেদিক থেকে আমাদের আধুনিক লেখকেরাও সমস্ত দায়িত্ব ইতিহাসের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে কিছুতেই নিষ্কৃতি পেতে পারেন না।

আর তা ছাড়া, ডেকাডেন্ট সমাজের লেখক হলেই যে তাকে অবক্ষয়ের ব্যাধিতে ভুগতে হবে, তারও কোন মানে নেই। ইতিহাস তার বিরুদ্ধে অনেকবারই সাক্ষ্য দিয়েছে। ১৭৫০-এর জার্মান সমাজের চরম অবক্ষয়ের সময়েই গ্যয়টে, শীলার, কাণ্ট এবং ফিখটের আবির্ভাব। মানস-বিধৃত ভাবজগৎ এবং বাহ্য বস্তুজগতের চলার ছন্দ যে ঠিক একই তালে চলে না, এ-সব ঘটনা থেকে সেটাই বোধ করি প্রমাণ হয়। কাজেই, ব্যক্তির ভূমিকা অস্বীকার করার কোন উপায়ই নেই কোন দিক থেকে। বিশেষ করে যে-ব্যক্তি লেখক, তার দায় তো সীমানাহীন। শুধু যে বর্তমানের মিডিয়ম হিসাবেই তার কাজ, তা নয়—বর্তমানকে ভবিষ্যতে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বও রয়েছে তার।

মার্ক্সের যে উক্তি দিয়ে আমি প্রবন্ধের শুরু করেছি, তাতে লেখক-সত্তার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার বাণীই ঘোষিত হয়েছে। তার সঙ্গে একটু আগেই লেখকের যে দায়িত্বের কথা বললাম, তা হয়তো ঠিক খাপ খাচ্ছে না। উভয়ের মধ্যে হয়তো পাঠকেরা একটা আপাত-বিরোধ আবিষ্কার করবেন। কিন্তু একটু গভীরভাবে ভেবে দেখলেই সে-বিরোধের নিরসন ঘটতে পারে। লেখকের পক্ষে সমাজ-কল্যাণের জন্য স্বতন্ত্রভাবে সচেষ্ট হবার কোন প্রয়োজনই নেই। যদি তিনি সৎ হন এবং তাঁর সাহিত্যকেই সব-কিছুর উপরে রক্ষা করে চলেন, অন্যতর কোন উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য সাহিত্যকে যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার না করেন, তবে তিনি শিল্পের বিশেষ নিয়মেই যে সৌন্দর্য এবং সত্যের সৃষ্টি করবেন, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে-কোন ভাবেই হোক না কেন সমাজের এবং মানবের কল্যাণে তা লাগবেই। লেখক যখন সাহিত্যসৃষ্টিতে রত,সাহিত্যই তখন তাঁর কাছে end in itself। কিন্তু তিনি সহৃদয়-মানস, এবং তাঁর কল্পনার মূল উৎস এই বিশ্বজগৎ বলেই জীবন এবং জগতের প্রয়োজনীয় ভাব তাঁর সৃষ্টিতে আপনা থেকেই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কাজেই লেখকের দায়িত্বে এবং সাহিত্যের স্বাধীনতায় আপাতভাবে বিরোধিতা যা-ই দেখা যাক না কেন প্রকৃতপক্ষে উভয়ে কোন দ্বন্দ্বই নেই।

নেই বলেই আমাদের বিশ্বাস। এবং সেইজন্যই এবার আমাদের নব্য-লেখকদের সামনে কয়েকটি নীতির কথা হাজির করতে চাই :

১। যশের জন্য লিখিবেন না। তাহা হইলে যশও হইবে না, লেখাও ভাল হইবে না। লেখা ভাল হইলে যশ আপনি আসিবে।

২। টাকার জন্য লিখিবেন না। ইউরোপে এখন অনেক লোক টাকার জন্যই লেখে, এবং টাকাও পায় ; লেখাও ভাল হয়। কিন্তু আমাদের এখনও সেদিন হয় নাই। এখন অর্থের উদ্দেশ্যে লিখিতে গেলে, লোক-রঞ্জন-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া পড়ে। এখন আমাদিগের দেশের সাধারণ পাঠকের রুচি ও শিক্ষা বিবেচনা করিয়া লোক-রঞ্জন করিতে গেলে রচনা বিকৃত ও অনিষ্টকর হইয়া উঠে।

৩। যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া

দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। যাঁহারা অন্য উদ্দেশ্যে লেখেন, তাঁহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে।

৪। যাহা অসত্য, পরনিন্দা বা পরপীড়ন বা স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্য, সে সকল প্রবন্ধ কখনও হিতকর হইতে পারে না, সুতরাং তাহা একেবারে পরিহার্য। সত্যই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী-ধারণ মহাপাপ।

৫। যাহা লিখিবেন, তাহা হঠাৎ ছাপাইবেন না। কিছুকাল ফেলিয়া রাখিবেন। কিছুকাল পরে উহা সংশোধন করিবেন। তাহা হইলে দেখিবেন, প্রবন্ধে অনেক দোষ আছে। কাব্য নাটক উপন্যাস দুই এক বৎসর ফেলিয়া রাখিয়া তার পর সংশোধন করিলে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। যাঁহারা সাময়িক সাহিত্যের কার্যে ব্রতী, তাঁহাদের পক্ষে এই নিয়ম রক্ষাটি ঘটিয়া উঠে না। এজন্য সাময়িক সাহিত্য, লেখকের পক্ষে অবনতিকর।

৬। যে বিষয়ে যাহার অধিকার নাই, সে বিষয়ে তাহার হস্তক্ষেপণ অকর্তব্য। এটি সোজা কথা, কিন্তু সাময়িক সাহিত্যতে এ নিয়মটি রক্ষিত হয় না।

৭। বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা করিবেন না। বিদ্যা থাকিলে, তাহা আপনিই প্রকাশ পায়, চেষ্টা করিতে হয় না। বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা পাঠকের অতিশয় বিরক্তিকর এবং রচনার পারিপাট্যের বিশেষ হানিজনক। এখনকার প্রবন্ধে ইংরাজি, সংস্কৃত, ফরাশি, জর্ম্মান্ কোটেশন বড় বেশী দেখিতে পাই। যে ভাষা আপনি জানেন না, পরের গ্রন্থের সাহায্যে সে ভাষা হইতে কদাচ উদ্ধৃত করিবেন না।

৮। অলঙ্কার-প্রয়োগ বা রসিকতার জন্য চেষ্টিত হইবেন না। স্থানে স্থানে অলঙ্কার বা ব্যঙ্গের প্রয়োজন হয় বটে; লেখকের ভাণ্ডারে এ সামগ্রী থাকিলে, প্রয়োজন মতে আপনিই আসিয়া পৌছিবে—ভাণ্ডারে না থাকিলে মাথা কুটিলেও আসিবে না। অসময়ে বা শূন্য ভাণ্ডারে অলঙ্কার প্রয়োগের বা রসিকতার চেষ্টার মত কদর্য আর কিছুই নাই।

৯। যে স্থানে অলঙ্কার বা ব্যঙ্গ বড় সুন্দর বলিয়া বোধ হইবে, সেই স্থানটি কাটিয়া দিবে, এটি প্রাচীন বিধি। আমি সে কথা বলি না। কিন্তু আমার পরামর্শ এই যে, সে স্থানটি বন্ধুবর্গকে পুনঃপুনঃ পড়িয়া শুনাইবে। যদি ভাল না হইয়া থাকে, তবে দুই চারি বার পড়িলে লেখকের নিজেরই আর উহা ভাল লাগিবে না—বন্ধুবর্গের নিকট পড়িতে লজ্জা করিবে। তখন উহা কাটিয়া দিবে।

১০। সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা। যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। কেন না, লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে বুঝান।

১১। কাহারও অনুকরণ করিও না। অনুকরণে দোষগুলি অনুকৃত হয়, গুণগুলি হয় না। অমুক ইংরাজি বা সংস্কৃত বা বাঙলা লেখক এইরূপ লিখিয়াছেন, আমিও এরূপ লিখিব, এ কথা কদাপি মনে স্থান দিও না।

১২। যে কথার প্রমাণ দিতে পারিবে না, তাহা লিখিও না। প্রমাণগুলি প্রযুক্ত করা সকল সময়ে প্রয়োজন হয় না, কিন্তু হাতে থাকা চাই।

এই যে নিয়মগুলির কথা বললাম, এর একটিও আমার নিজের রচনা নয়—১২৯১ সালের মাঘ মাসের 'প্রচারে' বঙ্কিমচন্দ্রই এর প্রত্যেকটি 'বাঙলার নব্য-লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' করে গেছেন। আমি তাকেই পুনরুদ্ধার করে বাংলার বর্তমান নব্য-লেখকদের প্রতি পুনরায় নিবেদন করছি।

১২৯১ সালে এই নিয়মগুলির যতটা প্রয়োজন ছিল, আজ ছিয়াত্তর বছর পরে তাদের প্রয়োজন তার থেকে ঢের বেশী বেড়েছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। আমরা যাকে একদিন 'মোদের গরব, মোদের আশা' বলে সোচ্চারে ঘোষণা করেছি, সেই গর্ব এবং আশাকে আজ আমরাই নিজের হাতে ধুলোয় লুটিয়ে দিচ্ছি। শুধু দিচ্ছিই না, তাতে আমরা এক ধরনের বিকৃত আনন্দ অনুভবও করছি। কোন জাতির পক্ষেই এর থেকে লজ্জার দুঃখের এবং পরিতাপের বিষয় আর কিছুই হতে পারে না। সেইজন্যই আজ আমাদের প্রত্যেকেরই কর্তব্য নিজে আত্মসচেতন হওয়া এবং অপরকে আত্মসচেতন করা। সেই দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যেই আমি বাংলার নব্য-লেখকদের প্রতি এই সামান্য গুটিকয়েক কথা নিবেদন করতে ভরসা পেলাম।
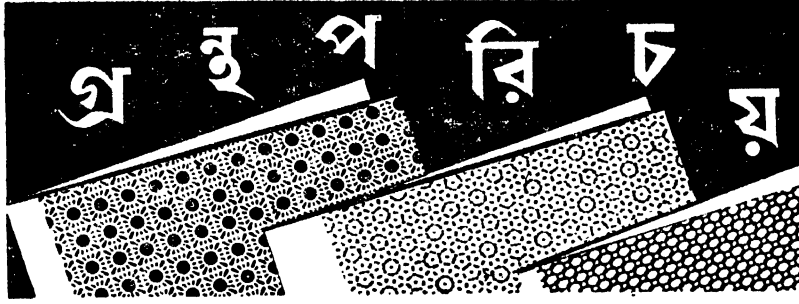
১। **জুপিটার**ঃ বাণী রায়। মিত্রালয়, ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দুই টাকা।

২। **স্বয়ম্বর**ঃ পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য। নবান্ন প্রকাশনী, ১০।১ ঘোষপাড়া লেন, কলিকাতা-৩৬। এক টাকা।

৩। **দিগন্তের মেঘ**ঃ সন্তোষকুমার অধিকারী। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭। দুই টাকা।

শ্রীবাণী রায়, একজন বিশিষ্ট মহিলা কবি, এবং তিনি একটি পরিশীলিত কবিমনের অধিকারিণী। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটি আর পাঁচটি সাধারণ কাব্যগ্রন্থের একই সারির সৃষ্টি নয়। বিষয়বস্তুর নির্বাচন ও পরিবেশ প্রাচীন গ্রীক্ সাহিত্য থেকে নেওয়া। এই নির্বাচন কাব্যগ্রন্থটিতে অনন্যসাধারণ স্বাতন্ত্র্য ও স্বাদ এনে দিয়েছে।

সমগ্র কাব্যগ্রন্থটি ঘিরে একটি কঠিন ব্যক্তিত্ব আছে। যে ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কবিত্বের আশ্চর্য মিলন ঘটেছে। 'জুপিটার' কাব্যগ্রন্থের এই চরিত্রটুকু উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই ব্যক্তিত্ব এবং এই কবিত্বের আবরণ পেরিয়ে কোথায় যেন একটা করুণ পূরবীর আলাপ আমরা শুনতে পাই—

"নই আমি রাজকন্যা,
তবু অনিমিখ
প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করি দিগন্তের সীমা,
ধুলো ওঠে ঝড় হয়ে, শুষ্কপত্র খসে,
ধূসরে মিলিয়ে যায় সুদূর নীলিমা।
ওঠে না অশ্বের ধূলি শুধু চক্রবালে,
রাজপুত্র, এ নয়ন ঢাকে বাষ্পজালে।" (রাজপুত্র)

শেষের লাইনে এসে যেটুকু পেলাম, সেটুকু না পেলে সমস্ত জীবনই আবর্জনাময় হয়ে উঠত। 'জুপিটারে'র বহু কবিতায় ঐশ্বর্যময় প্রেমের অনুভূতির বেদনার আভাস পাওয়া যায়।

কবিতাগুলির প্রকাশভঙ্গী দুর্বোধ্যতার উৎপীড়ন থেকে মুক্ত। মাঝে মাঝে খুব সুন্দর কাব্যাংশ চোখে পড়ে, যেমন—

"জীবনে রয়েছে ভাগ আলোকে আঁধারে।
আলোতে তরঙ্গে জাগে,
কম্পিত ঈথার সুরে সুরে উর্ধ্বমুখী।
জানি না তমসা, জানি না অন্ধের ভীতি।
আমারি দেবতা,
প্রেমের দেবতা সেই বায়ুস্তর শেষে
হাসে আলোকের দেশে—
নমামি ঈশ্বর।" (প্রেত-স্বস্ত্যয়ন)

'জুপিটার' বাংলা-সাহিত্যে প্রকাশিত আধুনিক কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হয়ে রইল। এই স্বাতন্ত্র্য তার ঋজুতায়, কবিত্বে এবং একটি নিঃশব্দ বেদনার আভাসে।

'স্বয়ম্বর' পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্যের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। ইতিপূর্বে, 'প্রাণবসন্ত' ও 'তৃতীয় নয়ন' প্রকাশিত হয়েছে। এবং কবি হিসেবে ইনি স্বীকৃতি পেয়েছেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, 'স্বয়ম্বর' পড়ে আনন্দলাভ করবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হল। মাঝে মাঝে সুন্দর সুন্দর লাইন পাওয়া যায়, কিন্তু প্রায় কোন কবিতাই শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায় না। তার কারণ মনে হয়েছে, কবিতাগুলির মধ্যে সঙ্গীতের অভাব ও গদ্যগন্ধী শব্দ প্রয়োগের ওপর লেখকের অনাবশ্যক দুর্বলতা। একটি ভাল লাইন দিয়ে কবিতার আরম্ভ হল—

"যেখানে আমার সূর্য মাথা তোলে সেখানেই
আমার পূর্বাশা"

কিন্তু শেষে এসে বহু কষ্টে পড়তে হয়—

"তোমার ইথিয়োপিয়া উর্ধ্বের বৈকুণ্ঠ হোক ;
রাজফিসিয়াস
প্রিয়তমা পাটরাণী ক্যাসিয়োপিয়ার প্রেমে ভরুক আকাশ ;
রাজকন্যা আন্দ্রোমিদা পাসিয়াসের হাত চুম্বন করুক।"

এখানে 'আকাশ', 'চুম্বন' সব আছে, একমাত্র কবিতাটুকু নেই। শোনা যায় নাকি এই সব না হলে আধুনিক কবিতা হয় না এবং এক শ্রেণীর মুষ্টিমেয় পাঠক আছেন, যাঁরা এই সব রেফারেন্স, কবিতার অভিধানে পর্যাপ্ত পরিমাণ পেলে অত্যন্ত আনন্দিত হন। ব্যক্তিগত রুচির ওপর কটাক্ষপাত না করেও বলা যায়, এই সব নিষ্ঠুর প্রচেষ্টার ফলে বাংলা কবিতা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সাধারণ কবিতাপ্রিয় মানুষের কাছ থেকে কবিতা সরে এসেছে। এই ক্ষতি সাহিত্যের পক্ষে অপূরণীয়।

'স্বয়ম্বর' পড়ে, একটি জিনিস মনে হয়েছে, পূর্ণেন্দুবাবুর মধ্যে কবিমনের পরিচয় থাকলেও, তাঁর হাতের মধ্যে কোথায় একটি রুক্ষতা আছে, যার জন্য প্রায় কোন কবিতাই রসোত্তীর্ণতার গভীরে আমাদের নিয়ে যায় না। বহুদিন গলা সাধলেও, গলার সুরে মাধুর্য আনবে এমন কোন মানে নেই, এই বিষয়টি বোধ হয় এমন—যা অনুশীলনের বিশেষ অপেক্ষা রাখে না, যা সহজাত। পূর্ণেন্দুবাবুর কবিতায় এই মাধুর্যহীনতার অপূর্ণতা অত্যন্ত চোখে পড়ে। যে কবিতা পাঠককে মুগ্ধ করে না, মনকে স্তব্ধ করে না, কয়েকটি মুহূর্তের জন্যও অন্তরকে অন্যমনা করে না সে কবিতার মধ্যে পাণ্ডিত্যের যত বেশী প্রোটিন থাক্ না কেন—কবিতা হিসেবে তা ব্যর্থ এবং একজন কবিতাপ্রিয় মানুষ হিসেবে নম্রভাবে এইটুকু বলতে চাই—সে কবিতা আমার পক্ষে অসহ্য। পাঠকদের বিচারের জন্য আমি একটি কবিতার কয়েকটি লাইন তুলে দিচ্ছি :

"এই সব দিনরাত, জীবনের প্রতিক্ষণ মুহূর্ত যদিও
কেবল অস্বস্তি, [তবু দোক্তার ধকের মত]
এরাও ত প্রিয়,
* * * *
[নস্তের কামড়ে যেন মুগ্ধ আনচান হয়ে
স্বস্তি ডেকে আনে]
এই স্বাদ আছে তাই জীবন যাপন আর
[ধুত্তোর ধুত্তোর]
মুহূর্তেরা বারবার নতুন আস্বাদ নিয়ে সুধু রসোত্তর।"
(এসো তবে জলে নামি)

"ধুত্তোর ধুত্তোর" এই ধরনের শব্দ প্রয়োগ করে লেখক আমার মন্তব্য প্রকাশের ভারটুকু নিজের হাতে নিয়ে আমাকে অপ্রিয় ভাষণের পাশ থেকে মুক্ত করেছেন বলে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

কোন কাব্যগ্রন্থকে, কোন কবিতাকে ভাল না বলতে পারলে, নিজেরই খারাপ লাগে, একটি গোপন বেদনাবোধ নিজেকেই যেন ম্লান করে। কারণ, আজকের দিনে অবিচ্ছিন্নভাবে কবিতার সাধনা করা, প্রাত্যহিক জীবনের নানান বিরোধ, অভাব ও অসম্মানকে অস্বীকার করে কবিতাকে ভালবাসা যে কত কঠিন, তা কবিতাসাধক মাত্রেই জানেন। সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে থেকেও, এবং নিজেকে নানাভাবে বঞ্চিত করেও যাঁরা কবিতা লেখেন, তাঁদের কবিতাকে কখনও কখনও খারাপ বলতে পারি, বলতে হয়, কিন্তু এর পশ্চাতে সত্যি একটি বেদনাবোধ লুকিয়ে থাকে। কবিতা লিখে তিনি হয়তো সফল হলেন না, কিন্তু তিনি কবিতাকে ভালবেসেছেন ; তাঁর জীবনের সমস্ত অসম্পূর্ণতার উর্ধ্বে এই যে ভালবাসার পবিত্রতা এর মূল্য অস্বীকার করবার অধিকার কারুর নেই।

তেমনই ভাল কবিতা পড়ে তাকে ভাল বলার মধ্যেও একটি গোপন আনন্দ আছে, যে আনন্দটুকু সকলের সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করতে ইচ্ছে করে। "দিগন্তের মেঘ" সেই ভাগ করে ভোগ করার মত আনন্দ আমাদের সামনে নিয়ে এসেছে।

ভাল কবিতা, সুন্দর কবিতা, সার্থক কবিতা কোন্‌টি তাকে চিনিয়ে দেবার দরকার হয় না। সে আলোর মত আপনিই ছড়িয়ে পড়ে—তাকে পাণ্ডিত্যের ভান করতে হয় না, আধুনিকতার ঢঙ দেখাতে হয় না, অথবা দলবল নিয়ে বাহবা দেবার লোকদের আসর জমিয়ে ঢাক পেটাতে হয় না। সে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। এমনি দু-একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

"একটি নিঃশব্দ দিনে শব্দহীন দিনের আকাশে
আলো আর তিমিরের চেতনা যে মিশে এক হয়।
সমস্ত জীবন, আর সূর্যময় মাঠ বন নদী,
ভুলে যাই…
সঙ্গীহীন অনন্ত সময়
একটি মুহূর্ত মাত্র,
সঙ্গ তব পাই আমি যদি॥"
(স্বপ্নকামনা)

"দুঃখের অনন্তরাত্রে আমরা শুনেছি পদধ্বনি।
আমরা শুনেছি কণ্ঠ—এ'পথের অন্তিমে অমৃত।"
(ক্রমণ)

"ঘাস ফুল ফুটে থাকে একা,
শিশিরের বাধা ঠেলে আপনাকে বিকশিত করে।
ভাষা চায় পতঙ্গ একক,
সন্ধ্যার আঁধারে তার অবিশ্রান্ত ধ্বনির বিস্তার।…
সীমাহীন নিরুদ্দেশে ছড়ানো প্রান্তর
ঘাসে আর ফুলে আর পতঙ্গের সুরে
জীবনকে স্পষ্ট করে যায়…"
(একটি মৃত্যুর সংবাদ)

"প্রলয় উত্তীর্ণ শান্ত পৃথিবীপ্রতীক্ষা দাও মোরে,
দাও দীপ্ত অনির্বাণ অমৃতসম্ভব প্রাণ
অনন্ত ঐশ্বর্যে যার এ তমিস্র রাত্রি হয় ভোর॥"
(নিশীথ প্রার্থনা)

উদ্ধৃতি দিতে গেলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে যাবে। যদিও এইরূপ উদ্ধৃতিযোগ্য অংশ এই কাব্যগ্রন্থে প্রচুর রয়েছে (উদ্ধৃতিযোগ্য অংশ থাকার প্রাচুর্য, কবির ক্ষমতার আর একটি নিদর্শন)। কবিতাগুলির মধ্যে একটি সত্যিকারের কবিমন, একটি পবিত্র প্রশান্তি ও একটি সহজ অনাবিলতার সুর আছে যা হৃদয়কে স্পর্শ করে যায়, পড়ার পর একটু ভাবি, মনে হয় সত্যিই তো এইটি খাঁটি জিনিস। সার্থক কবিতার সমালোচনার জন্য এর চেয়ে বেশী কিছুর প্রয়োজন হয় না।

কিন্তু তাই বলে 'দিগন্তের মেঘ' ত্রুটিশূন্য কবিতাসঙ্কলন এ মনে করার কোন কারণ নেই। কবিতাগুলির মধ্যে কোথাও কোথাও ছন্দপতন ঘটেছে, একই শব্দের একেবারে পাশাপাশি ব্যবহার রয়েছে, "লুকাইয়া" "ঘনাইয়া" "ফুরাইতে" প্রভৃতি আপাত-অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ ত্রুটিগুলি কবির পক্ষে সংশোধন করা উচিত।

কিন্তু এই ত্রুটিগুলিকে কবি পাঠকের চোখে বড় হয়ে ওঠবার সুযোগ দেন নি—কারণ যে একটি সুন্দর প্রশান্ত আকাশ তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, তার কাছে এই ত্রুটিগুলি নিষ্প্রভ হয়েছে, যদিও সেগুলি ত্রুটিই।

একটি কথা নিঃশঙ্কচিত্তে বলবার আজ সময় এসেছে এবং তা এই যে, বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে বহুদিন থেকে অকবি বা অতি নিম্নস্তরের কবিদের প্রাধান্য চলেছে। জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, দিনেশ দাশ, বিমল ঘোষ ও অজিত দত্ত প্রভৃতি শ্রদ্ধেয় কবিদের পরবর্তী সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে এ কথা বলছি। এ প্রাধান্য প্রধানতঃ গড়ে উঠেছে, কবি-প্রতিভার চেয়ে, সংগঠন গড়বার প্রতিভাকে কেন্দ্র করে। এই নিম্নস্তরের কবিরা যে কোন উৎস থেকেই হোক নিজেদের প্রচার-কার্যের সুবিধা পেয়েছেন। এঁদের হুঙ্কারে কবিতার কোমল প্রাণ পীড়িত হয়েছে, যেগুলি কবিতাই নয় সেগুলিকে মহৎ কবিতা বলে চিৎকার শুরু করা হয়েছে। (চিৎকার করা প্রয়োজন হয় তখনি যখন তার মধ্যে আসল উপাদান কম থাকে।) এই বিষাক্ত পরিবেশের বন্দীত্ব থেকে কবিতার মুক্তি হোক। আজ তাই সুন্দর

কবিতার, সংবেদনশীল কবিতার এবং প্রাণকে স্পর্শ করে এমন কবিতার প্রতি আমাদের প্রার্থনার দিন এসেছে। সে প্রার্থনার চিহ্ন দেখলাম 'দিগন্তের মেঘে'।

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

সাহিত্যের সমস্যা—নারায়ণ চৌধুরী—পপুলার লাইব্রেরী, ১৯৫।১বি, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। তিন টাকা।

শ্রীনারায়ণ চৌধুরীর সাম্প্রতিক প্রবন্ধ-সংগ্রহ 'সাহিত্যের সমস্যা'য় মোট বারটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে।* নারায়ণবাবুর প্রবন্ধ পড়লেই বোঝা যায় যে সে প্রবন্ধের বক্তব্য তাঁর উপলব্ধি অনুশীলন এবং প্রত্যয়ের গভীরতা থেকে জন্ম নিয়েছে। সাহিত্যবিষয়ক কোনও কিছু আলোচনা করতে গিয়ে তিনি অপর সমালোচকের মন্তব্যের কষ্টিপাথরে আপন বক্তব্য ঘষে নিয়ে তার যাথার্থ্য সম্পর্কে নিঃসংশয় হবার চেষ্টা করেন না। তাঁর পরিশীলিত মনোমুকুরে বাংলাসাহিত্যের যে প্রতিচ্ছবি ধরা পড়েছে, যথার্থবাদিতার সঙ্গে তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে কুণ্ঠা নেই তাঁর। বিপত্তি সেই জন্যেই। সাহিত্যের সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিত্বের সম্পর্ক যোগ করে সাহিত্যালোচনা করতে গিয়ে আত্মীয় ব্যক্তিও শত্রু হয়েছে। "ভালো" লেখকের লেখার "মন্দ" দিকগুলি সম্বন্ধে তাঁকে সচেতন করতে গিয়ে তিনি নিন্দিত হয়েছেন, চেনা লেখকের রচনা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি পূর্ণোকুম্ভোচ্ছলনবৎ চাটুকারিতার উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করতে পারেন নি কখনও— আর সেই জন্যেই তাঁকে পংক্তির বাইরে একা থাকে হয়েছে। তবু সাহিত্য পাঠ করে যে সত্য তিনি অন্ত লাভ করেছেন, অপ্রিয় হলেও তা প্রকাশ করতে অপ্রস্তু হন নি। 'সাহিত্যের সমস্যা' গ্রন্থেও সে পরিচয় রয়েছে "লেখা লেখা খেলা" করতে গিয়ে এবং "সহজ সুরে সহ কথা বলতে গিয়ে হাল-আমলের লেখকেরা যে সমস্য সৃষ্টি করছেন, তাতে সাহিত্যের এবং সেই সঙ্গে রচয়িতা ব্যক্তিত্বের যে সর্বনাশ ঘটছে তা-ই নারায়ণবাবুর সর্বাধি দুশ্চিন্তার কারণ। সাহিত্যের ভোজে "রম্যরচনা" না এক প্রকার ভোজ্যবস্তুর সন্ধান পাই। তাতে "বাগবিস্ত আছে, কলরব আছে, আত্মপ্রচার আছে, ব্যঞ্জনা নেই রচনাকে "রম্য" করতে গিয়ে রুচি যেখানে অপরিচ্ছ সেখানে নারায়ণবাবুর মনস্তাপের অবধি নেই।

সাহিত্যের পাঠক হিসাবে যে প্রশ্ন এবং যে সংশয় তাঁ মনে জেগেছে এই গ্রন্থে তার অনেকগুলি নিয়েই আলোচ করা হয়েছে। শিল্প বড়, না জীবন বড়? সাহি বিশ্রম্ভচর্চা না জীবনসাধনা? সাহিত্যের গুণাগু নির্ণয়ে সাহিত্যসেবীর ব্যক্তিত্ব-বিচার অপরিহার্য কি না শিল্পীর সামাজিক ব্যক্তিত্ব ও শিল্পী-ব্যক্তিত্বের ম পার্থক্য কোথায়? বর্তমান সমাজ-পরিস্থিতিতে সাহিত্যে "দেহবাদে"র আধিপত্য কেন? সমালোচকের ভূমি কী হবে? আধুনিক কাব্যান্দোলনের প্রেরণায় কতখা সততা রয়েছে? সার্থক উপন্যাসে উপাদান বড় লেখকের ক্ষমতা বড়?—ইত্যাদি বহু বিষয় নি আলোচনা করা হয়েছে 'সাহিত্যের সমস্যা' গ্রন্থে। যাঁ নারায়ণবাবুর মতামত মানবেন না, তাঁরাও তাঁ নির্ভীকতা, সততা ও ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হবেন।

অরুণকুমার মিত্র

* জীবনশিল্প, সাহিত্যে ব্যক্তিত্বচর্চা, সাহিত্যবিচারের মাপকাঠি, সাধু ও চলিত ভাষার দ্বন্দ্ব, 'রম্যরচনা', বর্তমান সাহিত্য ও সমাজ পরিস্থিতি, সমাজ-সমালোচনা, ভাষাভিত্তিক সমালোচনা, সমালোচকের ভূমিকা, আধুনিক কাব্য-আন্দোলন, বাংলার মফস্বল শহর, উপন্যাসের উপাদান।

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : ৫৬-২৮৩৮

৩২শ বর্ষ,
১০ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৬৭
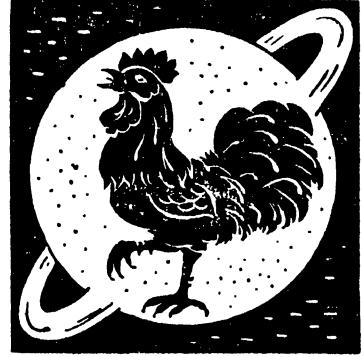
সংবাদ-সাহিত্য

১৫ই আগস্ট, ১৯৬০

আধুনিক ভারতের নবলব্ধ স্বাধীনতার তের বছর আজ পূর্ণ হল। আজ ভারতের সম্বাৎসরিক উৎসবের দিন। অষ্টআশি বছর আগে এই শুভ দিনটিতেই ভারতের মাটিতে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। এ বৎসর আমাদের কর্তব্যানুষ্ঠানের গুরুত্ব আরও বেড়েছে বিশ্বগৌরব কবি রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষ পূর্তিকে উপলক্ষ করে। কাজেই তাঁরই ভাষায় বন্দনা করে আমরা ভারতবর্ষের মানুষ, আত্মস্থ হব—

“হে ভারতবর্ষের চিরারাধ্যতম অন্তর্যামী বিধাতৃপুরুষ, তুমি আমাদের ভারতবর্ষকে সফল কর। ভারতবর্ষের সফলতার পথ একান্ত সরল একনিষ্ঠতার পথ। তোমার মধ্যেই তাহার ধর্ম, কর্ম, তাহার চিত্ত পরম ঐক্য লাভ করিয়া জগতের, সমাজের, জীবনের সমস্ত জটিলতার নির্মল সহজ মীমাংসা করিয়াছিল। যাহা স্বার্থের, বিরোধের, সংশয়ের নানা শাখাপ্রশাখার মধ্যে আমাদিগকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়, যাহা বিবিধের আকর্ষণে আমাদের প্রবৃত্তিকে নানা অভিমুখে বিক্ষিপ্ত করে, যাহা উপকরণের নানা জঞ্জালের মধ্যে আমাদের চেষ্টাকে নানা আকারে ভ্রাম্যমাণ করিতে থাকে, তাহা ভারতবর্ষের পন্থা নহে। ভারতবর্ষের পথ একের পথ, তাহা বাধাবর্জিত তোমারই পথ—আমাদের বৃদ্ধ-পিতামহদের পদাঙ্কচিহ্নিত সেই প্রাচীন প্রশস্ত পুরাতন সরল রাজপথ যদি পরিত্যাগ না করি, তবে কোনমতেই আমরা ব্যর্থ হইব না। জগতের মধ্যে অদ্য দারুণ দুর্যোগের দুদিন উপস্থিত হইয়াছে—চারিদিকে যুদ্ধভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে—বাণিজ্যরথ দুর্বলকে ধূলির সহিত দলন করিয়া ঘর্ঘর শব্দে চারিদিকে ধাবিত হইয়াছে—স্বার্থের ঝঞ্ঝাবায়ু প্রলয় গর্জনে চারিদিকে পাক খাইয়া ফিরিতেছে—হে বিধাতঃ, পৃথিবীর লোক আজ তোমার সিংহাসন শূন্য মনে করিতেছে, ধর্মকে অভ্যাসজনিত সংস্কারমাত্র মনে করিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে—হে শান্তং শিবমদ্বৈতম্, এই ঝঞ্ঝাবর্তে আমরা ক্ষুব্ধ হইব না, শুষ্ক মৃত পত্ররাশির ন্যায় ইহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ধূলিধ্বজা তুলিয়া দিগ্বিদিকে ভ্রাম্যমাণ হইব না—আমরা পৃথিবীব্যাপী প্রলয় তাণ্ডবের মধ্যে একমনে একাগ্র নিষ্ঠায় এই বিপুল বিশ্বাস যেন দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া থাকি যে—

“অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততোভদ্রানি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥”

আজ আমরা সশ্রদ্ধচিত্তে নত মস্তকে স্মরণ করব সেই সব

প্রণাম হিমালয়কে, কবি-হিমালয় রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"ভারতের হৃদয়-সমুদ্র এতকাল
করিয়াছে উচ্চারণ উর্ধ্বপানে যে বাণী বিশাল—
অনন্তের জ্যোতিঃ স্পর্শে অনন্তেরে যা দিয়েছে ফিরে
রেখেছ সঞ্চয় করি হে হিমাদ্রি, তুমি স্তব্ধ শিরে।
তব মৌন শৃঙ্গমাঝে তাই আমি ফিরি অন্বেষণে
ভারতের পরিচয় শান্ত-শিব অদ্বৈতের সনে।"

ভারতের দেবতাত্মা সেই হিমালয় আজ বিক্ষুব্ধ, তার সমাহিত শান্তি বিঘ্নিত ও বিপর্যস্ত। আজ এই শুভদিনে বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, কৃত্তিবাস, তুলসীদাস, রবীন্দ্রনাথ-বন্দিত সেই হিমালয়ের বিশাল উদার গম্ভীর অভ্রংলিহ মহিমা ভারতকে নতুন করে উপলব্ধি করতে হবে। সর্বস্ব পণ করে রক্ষা করতে হবে তার শান্তি, অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে ভারতের হিমালয়ের শাশ্বত মহিমা। আজ হিমালয়ের বন্দনা-গান ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হোক দক্ষিণে কন্যাকুমারী, পশ্চিমে দ্বারকা এবং পূর্বে আসামের সীমান্ত পর্যন্ত—

উত্তর দিশি জুড়ি তুমি দেবতাত্মা
হিমালয়, রক্ষিছ এ ভারতে নিত্য ;
বক্ষের স্নেহধারে মৃত্তিকা সিঞ্চিয়া
ফলে-ফুলে-শস্যে করিছ বিচিত্র।

তোমার ছত্রছায়ে ভারতের ঐক্য
রক্ষিছ চিরকাল, চিরকাল রক্ষ।
গম্ভীর রূপ হেরি নতশির সকলেরই,
বন্দিছে যুগে যুগে স্পন্দিতচিত্ত।

হিমালয়, রহ চিরজাগ্রত চক্ষে,
রহ অভ্রংলেহী ভারতের বক্ষে।

আমাদের গ্লানি দূর কর দেবতাত্মা,
দূর কর বিরোধের দ্বন্দ্ব।
প্রান্তরে পল্লীতে নির্ঝর-ধারে তব
বয়ে যাক মিলনের ছন্দ।

উপনিষদের মহাঋষিদের বাক্য—
মহা হিমালয় তুমি একা তার সাক্ষ্য ;
নমো নমঃ হিমালয়, ভারতের আশ্রয়,
নমঃ নগ-অধিরাজ, ভারতের মিত্র ॥

স্বাধীনতা-লাভের পর নতুন সংবিধান রচনা করে নবভারত-গঠনের কঠিন কাজে আমরা সগৌরবে অগ্রসর হয়ে চলেছিলাম। হায়, হতভাগ্য আমরা, এরই মধ্যে আমাদের প্রাদেশিক, সাম্প্রদায়িক, ভাষাগত, দলগত ও ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি মাথাচাড়া দিয়ে চলার পথে বাধার সৃষ্টি করছে—যেমন করত বৈদেশিক শাসনের আমলে তাদেরই কূটনৈতিক চক্রান্তে। এই সর্বনাশা স্বার্থবুদ্ধি থেকেই জন্মাচ্ছে ভেদবুদ্ধি এবং ব্রিটিশ আমলের অভ্যাস-বশেই মোহগ্রস্ত আমরা পরস্পর কলহ করে সর্বনাশ ডেকে আনছি। সীমান্ত নিয়ে বহিঃশক্তির সঙ্গে যখন সংঘর্ষ চলছে তখনই নিজেদের মধ্যে ভাষা-সমস্যা তুলে কুৎসিত বীভৎস আত্মহনন খণ্ডিত করতে চাইছে ভারতের অখণ্ড সংহতি। এই আত্মঘাতী ভেদবুদ্ধি, এই প্রদেশ, রাজ্য, জাতি ও ভাষা নিয়ে পরস্পর কলহ-বিদ্বেষ সমূলে বিনাশ করবার কাজে ভারতের সব মানুষ এক মায়ের সন্তান হিসেবে সচেষ্ট না হলে বহুদিনের বহুজনের রক্তক্ষয়ী জীবনপণ-সাধনায় অর্জিত স্বাধীনতা অচিরে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে, প্রতিবেশী রাজ্যে রাজ্যে বাধবে সর্বনাশা সংগ্রাম—যেমন বেধেছিল পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কালে। পুরাণ ইতিহাস আমাদের সাবধান করে দিচ্ছে। স্বার্থবুদ্ধি ভেদবুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে এখন আমাদের নিরন্তর জপ করতে হবে—ভারত এক, ভারত অখণ্ড, ভারতীয়রা যেখানেই থাক, যে ভাষাতেই কথা বলুক—তারা অভিন্ন, এক মায়ের সন্তান, ভাই ভাই। আজ ভারতবাসী সকলের এক মন্ত্র, এক ইষ্ট, এক ধ্যান। এই "একমন্ত্র" নতুন করে আসমুদ্রহিমাচল ভারতভূমিতে প্রচারিত ও গীত হোক। শয়নে স্বপনে জাগরণে চিন্তায় এই আমাদের ধ্যানের সঙ্গীত হোক—

ভারতমন্ত্রে কে নিবি দীক্ষা আয় রে,
ভূমা ভুলে অল্প নিয়ে দ্বন্দ্বে সময় যায় রে।

আয় বাঙালী, আয় মারাঠী,
প্রয়াগী, দ্রাবিড়, গুজরাটী,
পাঞ্জাবী শিখ কৃপাণধারী,
ওড়িয়াসামী, আয় বেহারী—
সবাই মিলে গড়তে হবে ভারত-সমবায় রে।

মন্দিরে মসজিদে মোদের ধর্ম থাকুন বন্দী।
ভায়ে ভায়ে হাত মিলিয়ে মায়ের চরণ বন্দি।

টানতে জগন্নাথের এ রথ
এক হয়েছে মহা-ভারত
অনেক কুরুক্ষেত্র শেষে ;
আবার মহৎ কর্ স্বদেশে—
একলা কারো সাধ্য এ নয়, সকলের এ দায় রে॥

সবশেষে আহ্বান জানাই দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে যাদের হাতেই জাতির ভবিষ্যৎ, ভারতের গৌরব নির্ভর করছে। আমাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে, নবভারত গঠনের দায়িত্ব সম্পূর্ণ তাদের। প্রাচীন ভারতবর্ষের মহৎ ঐতিহ্যময় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে নতুন ভারত। প্রাচীন গৌরবের কথা তাদের স্মরণ করিয়ে দেবার কাজ আমাদের। পুরাতন আদর্শে তারা উদ্বুদ্ধ হোক কিন্তু তারা প্রতিষ্ঠা লাভ করুক নতুন পৃথিবীতে। আজ শুভ ১৫ই আগস্ট তারিখে, স্বাধীনতা লাভের ত্রয়োদশ বার্ষিক উৎসব দিবসে তরুণ-তরুণীদের কণ্ঠে তাদের পথচলার গান শুনে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা নতুন আশায় অনুপ্রাণিত হোক :

স্বপ্ন-সরণি পায়ে পায়ে হয়ে পার
পৌঁছিনু এসে কঠিন মাটির দেশে ;
আকাশে যদিও ভাসে লঘু মেঘভার,
হয়তো তাহাই ঘন হবে অবশেষে।
হয় হোক, মোরা তাহাতে করি না ভয়,
আমরা তরুণ, মোরা চিরদুর্জয়॥

হয়ে একপণ, চলি মোরা একমনে
দুর্গম পথে পরস্পরের সাথী,
যদি বা তড়িৎ ঝলকে মেঘের কোণে,
উদ্দামবায়ু যদি বা নেবায় বাতি—
চিরপথচারী আমরা করি না ভয়।
আমরা তরুণ, মোরা চিরদুর্জয়॥

আমরা তরুণ, নবভারতের আশা,
আঁধার নিশীথে আমরাই শুকতারা—
ভাঙিয়া জাতির জড়তা সর্বনাশা
আনি এ তিমিরে আলোর বন্যাধারা।
দ্বিধা দূর করি, মোরা দূর করি ভয়,
আমরা তরুণ মোরা চিরদুর্জয়॥

শ্রীকৃষ্ণের ভারতের, অশোকের ভারতের, আকবরের ভারতের, আমাদের ভারতের জয় হোক্।

ভারত-ভাগ্যবিধাতার প্রতি

স্বাধীনতা দিবসের প্রাতে দিল্লীর লালকেল্লা হইতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে কোনও প্রদেশ বা রাজ্যের স্বার্থ অপেক্ষা ভারতের স্বার্থ বড়। আগে ভারত, পরে আসাম বাংলা বা পাঞ্জাব। এই ঘোষণার কোনই প্রয়োজন ছিল না। ইহা স্বতঃ-সিদ্ধের মত সত্য। পুরাণে-ইতিহাসে-কাব্যে দেখিতে পাই ভারতের কোনও খণ্ডিত অংশ কখনই কি স্বদেশে কি বিদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। বহিঃপৃথিবীর সাহিত্য-ইতিহাস ধর্মগ্রন্থ-পুরাণ-ভ্রমণকাহিনীতে সর্বত্রই ভারতেরই উল্লেখ আছে। "মহাভারত" কথাটাই অন্ততঃপক্ষে সাড়ে তিন হাজার বছরের পুরাতন। কোনও প্রাদেশিক ভেদবুদ্ধি যদি তখনকার ভারতের কোথাও প্রচলিত থাকিত তাহা হইলে আমরা আজ রত্নাকর বাল্মীকি, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস অথবা মহাকবি কালিদাসের জন্মস্থান খুঁজিতে খুঁজিতে এতখানি হয়রান হইতাম না। পরবর্তীকালের পাণিনি, কপিল, কণাদ, গৌড়পাদ, অশ্বঘোষ, কহ্লন, শঙ্কর, রামানুজ, বাণভট্ট,

ভবভূতি, গুণাঢ্য-সোমদেব, কৌটিল্য-চাণক্য-বিষ্ণুশর্মা, শ্রীচৈতন্য, গোরক্ষনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ, মীরাবাই, কবীর, দাদু, নানক, তুকারাম, সুরদাস, তুলসীদাস—কে কোন্ ভূখণ্ডের লোক ভারতবর্ষের কোনও মানুষই তাহার হিসাব রাখে নাই। এমন কি, বুদ্ধ মহাবীরের জন্ম-স্থানেরও কোনও বিশেষ মাহাত্ম্য নাই। রামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ যে স্থানের লোকই হউন সারা ভারতবর্ষ রামনবমী জন্মাষ্টমী পালন করে। যে যেখানেই পয়দা হইয়া থাকুন সবাই ভারতের। এই অখণ্ড একত্ববোধের মূলে ছিল ধর্ম এবং আজও তাহাই আছে। তীর্থস্থান এবং যোগ-কুম্ভ-মেলাস্থানগুলি আদিকাল হইতে আজও পর্যন্ত সেই সাক্ষ্যই বহন করিতেছে। সেইখানেই সত্যকার ভারত অনাদিকাল হইতে বর্তমান আছে এবং আরও অনন্তকাল থাকিবে। সে ভারত এক, অখণ্ড, অদ্বিতীয়। মিথিলা-বঙ্গের কবিরা এই একত্ববোধের ফলেই ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করিয়াছেন, কৃত্তিবাস রচনা করিয়াছেন অযোধ্যার রাম এবং মিথিলার সীতার জয়গান, রামায়ণ। পাঞ্জাবের গোরক্ষনাথ মৎস্যেন্দ্রনাথের কীর্তিকথা বাংলা পয়ারে বঙ্গদেশের সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। পদ্মিনীর উপাখ্যান লিখিয়াছেন চট্টগ্রামের আলাওল।

বাঙালী কখনই ভারত-মাহাত্ম্যবিরোধী নয়। তাহার প্রতিবাদ হিন্দী-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, গুর্জর-মারবার-শোষণের বিরুদ্ধে। গুর্জর মারবার বা ভোজপুর ভারত নহে। জওহরলাল সেই ভুলটাই করিয়াছেন। যে বাংলাদেশের রামমোহন বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ অখণ্ড ভারত ছাড়া আর কিছু কখনই চিন্তা করেন নাই, ভারতের স্বাধীনতার সাধনায় যে বাঙালী হিন্দুমেলা, ভারত-সভা, ভারত মহাসভা, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের নাম দিয়াছে স্বদেশী আন্দোলন, "এই ভারতের-মহামানবের সাগরতীরে" যে বাংলাদেশের কবির কল্পনা, "জয়হিন্দ" ধ্বনি যে বাংলাদেশের নেতার সৃষ্টি, উনবিংশ-শতাব্দীর যে বাংলা-দেশের সাহিত্যে ভারতমহিমা ওতপ্রোত হইয়া আছে সে বাঙালী ভারতকে কখনও কোনওকালে একমুহূর্তের জন্য হেয় জ্ঞান করে নাই এবং করিবেও না। পণ্ডিত জওহরলাল মনেপ্রাণে কবি ও সাহিত্যিক, বাংলাদেশের কবির ভারতকথা তাঁহার ভাল লাগিবে বিবেচনায় এখানে মৃত্যুর মাত্র এক বৎসর পূর্বে ৩১ জুলাই ১৯৪০ তারিখে শান্তিনিকেতন-মন্দিরে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের একটি ভাষণ অংশতঃ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :

ভারতবর্ষের ধর্ম

প্রথম যুগে মানুষের জীবনযাত্রা ছিল নিতান্তই অনিশ্চিত। আহার-বিহার প্রভৃতি সকল প্রয়োজনের ব্যবস্থাই ছিল একান্ত দুর্লভ, পরস্পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল অত্যন্ত ক্রূর, নিষ্ঠুর। পশুচারণ থেকে কূট বণিকবৃত্তি পর্যন্ত মানব-ইতিহাসের সকল অবস্থাতেই দেখি কাড়াকাড়ির চেষ্টা ছিল প্রবল। এই দস্যুবৃত্তি নির্মম হয়েছিল মানব সমাজে। এরই তাড়নায় সেদিন মানুষ শক্তিকে শ্রদ্ধা করেছে, শক্তির প্রচণ্ড বিরুদ্ধতাকে দূর করে, শান্ত করে, প্রাণপণে তাকে আপনার পক্ষে টানবার চেষ্টা করেছে। জীবনকে এই ভাবে দেখার ফলে তাদের ধর্মে শাসন-নীতি হয়েছে প্রবল; এরই ফলে সে-যুগে যার হাতে ছিল শাসনদণ্ড সে জোর করে সকলকে এনেছে নিজের মতে, নিজের বাহুবলের দ্বারা এবং দেবতাকে স্বপক্ষে টেনে সে নির্লজ্জের মত পীড়িত করেছে অন্যকে।

একমাত্র উপনিষদের ধর্মেই দেখতে পাই ঋষিরা দূর করতে পেরেছেন শক্তির ভয়ংকর এই ভয়কে। তাঁরা বলেছেন, "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে"—এমন দৃঢ়স্বরে এত বড় কথা কোনো ধর্মে কোথাও বলা হয় নি। এই আনন্দের দিকেই চলেছে সৃষ্টি, ভয়ের দিকে নয়। এ-কথা যাঁরা বলেছেন তাঁদেরও জীবন তখন ছিল বিভীষিকার দ্বারা হিংস্রতার দ্বারা ঘেরা। এই আদিম যুগের মানুষই যেদিন অন্যত্র পূজা করেছে অন্ধ শক্তিকে, সেই যুগেরই আর এক মানুষের অন্তরে প্রথম এল উপনিষদের মন্ত্রে আনন্দের অমোঘ বাণী, সে-বাণী এল আমাদেরই এই ভারতবর্ষে।

আনন্দের এ বাণী সকলের সঙ্গে সমান ভাবে মিলিত

হবার বাণী। মূঢ়তা বা ভয়ের চিহ্নলেশমাত্র এর মধ্যে নেই। এই সাধনায় সদাজাগ্রত চেষ্টার সুনিশ্চিত নির্দেশ আছে। আপনাকে নির্মল, শুচি করতে হবে, সৃষ্টির মূলে নিহিত রয়েছে যে ঐক্য তাকে মৈত্রীভাবের চর্চায় বুঝতে চেষ্টা করতে হবে, পরমদেবতার সঙ্গে নিগূঢ়তম আত্মীয়তা স্থাপন করতে হবে। ইহজীবনের সকল প্রিয়সম্পর্কের অপেক্ষা তিনি প্রিয়তর এই কথাই তাঁরা বার বার ঘোষণা করেছেন দ্বিধাহীন উদাত্ত কণ্ঠে—"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা", তিনিই অন্তরের অন্তরতর আত্মা যিনি এই বিশ্বের অন্তরে নিরন্তর বাস করছেন। তিনি সকল প্রিয়ের প্রিয়, সকলের চেয়ে ভয়ংকর তিনি নন। এই উপলব্ধির মধ্যে মূঢ়তার তিলমাত্র চিহ্ন নেই, মন্ত্রতন্ত্রের নিষ্ঠুর বাক্যজালে কোথাও তাঁকে শান্ত করার ভীরু চেষ্টা নেই, বিকৃতির কণামাত্র স্থান নেই।...

জগতের বীভৎস ব্যভিচারের মধ্যে আজ এই সত্যটি বিশেষ করে স্মরণ করবার দিন এসেছে। লোভ কোরো না—এ বাণী আজ সংগ্রামের বিক্ষুব্ধ আবর্তে মানুষ মনে রাখতে পারছে না। এর স্থান বুঝি আজ রাষ্ট্রনীতি থেকে একেবারেই মুছে গেল; সমাজনীতির ক্ষেত্রে তো বহু পূর্বেই মানুষ এ-বাণী বিস্মৃত হয়েছিল। অত্যন্ত লজ্জার কথা, উপনিষদের মন্ত্রের এই দেশেও মানুষকে অপমানিত আমরা কম করি নি। লোভের তাড়নায় মানুষ আজ মানুষের সম্মিলিত শক্তিকে দিকে দিকে বলহীন করছে, মারছে। যুগান্তরের সাধনায় পাওয়া সকল বিশ্বাসকে সে আজ নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করছে, দুর্বল করছে। এতে যে প্রতিনিয়ত সে নিজেকেই আঘাত করছে তা নিজেও জানে না।

এই ভেদবুদ্ধি যে আমাদের দেশের অন্তরের জিনিস নয় তা আমরা ভুলতে বসেছি। এর পীড়নে কী পরিমাণে পঙ্গু আমরা হয়েছি এবং আজো হচ্ছি, জীবনের ক্ষেত্রে ক্রমশই কি ভাবে শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি তা আমরা এতদিন বুঝি নি, আজো বুঝতে পারলুম না। আমার মনে হয় এই মনোবৃত্তির জন্যে দায়ী আমাদের অনার্য রক্ত যা পরবর্তী যুগে অলক্ষিতে আমাদের দেহের মধ্যে এসে মিশেছে। ইতিহাস ভালো করে আমার জানা নেই, কিন্তু আমার মনে হয় এই কারণেই হয়ত মানবতার বা সাম্যের যে ধর্ম তা মুছে গিয়েছে। অনার্য রক্তের সংমিশ্রণের বিকৃতিকে অস্বীকার কেমন করে করি যখন চারিদিকে দেখি এই বিকৃত মনোবৃত্তি শক্তির নামে, বলের নামে সমগ্র মানব-সমাজকে জীর্ণ করছে। দৃষ্টি তাদের এতদূর অন্ধ যে তারা দেখতেও পায় না এতে নিজেরই নৌকায় ছিদ্র করা হচ্ছে।

আমাদের দেশেও আজ তাই ভাববার সময় এসেছে। ভাবনা জাগছে ভারত আজ তার এই চরম বিপদের সময় আপনাকে খুঁজে পাচ্ছে না কেন? এর মূল কারণ নির্দেশ করা একেবারেই কঠিন নয়। ধীরে ধীরে অতি সুনিশ্চিত এবং সুনিপুণ দক্ষতার সঙ্গে এ-দেশে মানুষের কেন্দ্রগত শক্তির মূল ছেদ করা হয়েছে, তাকে অপহরণ করা হয়েছে কূট রাষ্ট্রনীতির সাহায্যে। আজ সাহায্য করবার ডাক এসেছে, কিন্তু সে-শক্তি এখন কোথায়। ভারত সহায়তা করতে পারবে না বিশ্বমানবকে কোনো ক্ষেত্রেই। আমরা দাস্যবৃত্তিতে দীক্ষিত হয়েছি মনুষ্যত্ব হারিয়ে; আজ কাদের সাহায্যে এই যুগান্তরগত পরাভবের গ্লানি দূর করব। মানুষকেই যে আমরা তিলে তিলে নিঃশেষে হারিয়েছি। যে ধর্ম এক দিন মানুষকে কাছে টেনেছিল সাম্যের আকর্ষণে, প্রেমের আকর্ষণে তাতে এতবড়ো কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা হয়েছে যে, দেবতাকে যারা ভয়ের তাড়নায় পূজা করে তারা দেবতার পশু, তারা নিজেদের তুচ্ছ আচারবিচারের যূপে আবদ্ধ হয়ে আছে। পূজারীর গৌরব তাদের জন্য নয়, সৃষ্টির যজ্ঞশালায় কোনো শুভকার্যে তাদের অধিকার নেই। দেখতে পাচ্ছি সেই হিংস্র পশুরাই আজ দলে দলে খরনখরদন্ত বিস্তার করে দিকে দিকে উদ্দাম হয়ে জেগে উঠেছে। কে আজ তাদের শান্ত করবে, নিবৃত্ত করবে জানি নে।

এই নিদারুণ বিপদের মুখে দাঁড়িয়েও তবু গৌরবের সঙ্গে আমাদের স্মরণ করবার দিন এসেছে যে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি সেই ভারতবর্ষে যে-দেশে পরম আনন্দ-

হবার রাণী। মূঢ়তা বা ভয়ের চিহ্নলেশমাত্র এর মধ্যে নেই। এই সাধনায় সদাজাগ্রত চেষ্টার সুনিশ্চিত নির্দেশ আছে। আপনাকে নির্মল, শুচি করতে হবে, সৃষ্টির মূলে নিহিত রয়েছে যে ঐক্য তাকে মৈত্রীভাবের চর্চায় বুঝতে চেষ্টা করতে হবে, পরমদেবতার সঙ্গে নিগূঢ়তম আত্মীয়তা স্থাপন করতে হবে। ইহজীবনের সকল প্রিয়সম্পর্কের অপেক্ষা তিনি প্রিয়তর এই কথাই তাঁরা বার বার ঘোষণা করেছেন দ্বিধাহীন উদাত্ত কণ্ঠে—"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা", তিনিই অন্তরের অন্তরতর আত্মা যিনি এই বিশ্বের অন্তরে নিরন্তর বাস করছেন। তিনি সকল প্রিয়ের প্রিয়, সকলের চেয়ে ভয়ংকর তিনি নন। এই উপলব্ধির মধ্যে মূঢ়তার তিলমাত্র চিহ্ন নেই, মন্ত্রতন্ত্রের নিষ্ঠুর বাক্যজালে কোথাও তাঁকে শান্ত করার ভীরু চেষ্টা নেই, বিকৃতির কণামাত্র স্থান নেই।···

জগতের বীভৎস ব্যভিচারের মধ্যে আজ এই সত্যটি বিশেষ করে স্মরণ করবার দিন এসেছে। লোভ কোরো না—এ বাণী আজ সংগ্রামের বিক্ষুব্ধ আবর্তে মানুষ মনে রাখতে পারছে না। এর স্থান বুঝি আজ রাষ্ট্রনীতি থেকে একেবারেই মুছে গেল; সমাজনীতির ক্ষেত্রে তো বহু পূর্বেই মানুষ এ-বাণী বিস্মৃত হয়েছিল। অত্যন্ত লজ্জার কথা, উপনিষদের মন্ত্রের এই দেশেও মানুষকে অপমানিত আমরা কম করি নি। লোভের তাড়নায় মানুষ আজ মানুষের সম্মিলিত শক্তিকে দিকে দিকে বলহীন করছে, মারছে। যুগান্তরের সাধনায় পাওয়া সকল বিশ্বাসকে সে আজ নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করছে, দুর্বল করছে। এতে যে প্রতিনিয়ত সে নিজেকেই আঘাত করছে তা নিজেও জানে না।

এই ভেদবুদ্ধি যে আমাদের দেশের অন্তরের জিনিস নয় তা আমরা ভুলতে বসেছি। এর পীড়নে কী পরিমাণে পঙ্গু আমরা হয়েছি এবং আজো হচ্ছি, জীবনের ক্ষেত্রে ক্রমশই কি ভাবে শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি তা আমরা এতদিন বুঝি নি, আজো বুঝতে পারলুম না। আমার মনে হয় এই মনোবৃত্তির জন্তে দায়ী আমাদের অনার্য রক্ত যা পরবর্তী যুগে অলক্ষিতে আমাদের দেহের মধ্যে এসে মিশেছে। ইতিহাস ভালো করে আমার জানা নেই, কিন্তু আমার মনে হয় এই কারণেই হয়ত মানবতার বা সাম্যের যে ধর্ম তা মুছে গিয়েছে। অনার্য রক্তের সংমিশ্রণের বিকৃতিকে অস্বীকার কেমন করে করি যখন চারিদিকে দেখি এই বিকৃত মনোবৃত্তি শক্তির নামে, বলের নামে সমগ্র মানব-সমাজকে জীর্ণ করছে। দৃষ্টি তাদের এতদূর অন্ধ যে তারা দেখতেও পায় না এতে নিজেরই নৌকায় ছিদ্র করা হচ্ছে।

আমাদের দেশেও আজ তাই ভাববার সময় এসেছে। ভাবনা জাগছে ভারত আজ তার এই চরম বিপদের সময় আপনাকে খুঁজে পাচ্ছে না কেন? এর মূল কারণ নির্দেশ করা একেবারেই কঠিন নয়। ধীরে ধীরে অতি সুনিশ্চিত এবং সুনিপুণ দক্ষতার সঙ্গে এ-দেশে মানুষের কেন্দ্রগত শক্তির মূল ছেদ করা হয়েছে, তাকে অপহরণ করা হয়েছে কূট রাষ্ট্রনীতির সাহায্যে। আজ সাহায্য করবার ডাক এসেছে, কিন্তু সে-শক্তি এখন কোথায়। ভারত সহায়তা করতে পারবে না বিশ্বমানবকে কোনো ক্ষেত্রেই। আমরা দাস্যবৃত্তিতে দীক্ষিত হয়েছি মনুষ্যত্ব হারিয়ে; আজ কাদের সাহায্যে এই যুগান্তরগত পরাভবের গ্লানি দূর করব। মানুষকেই যে আমরা তিলে তিলে নিঃশেষে হারিয়েছি। যে ধর্ম এক দিন মানুষকে কাছে টেনেছিল সাম্যের আকর্ষণে, প্রেমের আকর্ষণে তাতে এতবড়ো কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা হয়েছে যে, দেবতাকে যারা ভয়ের তাড়নায় পূজা করে তারা দেবতার পশু, তারা নিজেদের তুচ্ছ আচারবিচারের যূপে আবদ্ধ হয়ে আছে। পূজারীর গৌরব তাদের জন্য নয়, সৃষ্টির যজ্ঞশালায় কোনো শুভকার্যে তাদের অধিকার নেই। দেখতে পাচ্ছি সেই হিংস্র পশুরাই আজ দলে দলে খরনখরদন্ত বিস্তার করে দিকে দিকে উদ্দাম হয়ে জেগে উঠেছে। কে আজ তাদের শান্ত করবে, নিবৃত্ত করবে জানি নে।

এই নিদারুণ বিপদের মুখে দাঁড়িয়েও তবু গৌরবের সঙ্গে আমাদের স্মরণ করবার দিন এসেছে যে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি সেই ভারতবর্ষে যে-দেশে পরম আনন্দ-

না, ছুঁচ ফুটোবার প্রয়োজন দেখি না, কেন না ওতে দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতা কিছুমাত্র বাড়ে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে বাস্তবিক মানুষের মত আকৃতি, বাঙালীর মত ভাষাভাষী এই প্রাণীগুলি কী ছিল? এরা কি ছিল শুধু পরগাছা? শুধু পুংমধুকর—মধুচক্রের প্রাচুর্যের দিনে নিষ্কর্মা যে জীবগুলোকে আলস্য-মধুপানে বাঁচিয়ে রাখে কর্মী মক্ষিকাকুল একটিমাত্র প্রহরের জৈব প্রয়োজনের বিলাসী উদ্দেশ্যে, তার পরমুহূর্তের প্রাণদণ্ড যাদের পুরা-লিখিত? অথবা এরাও মানুষ ছিল—চাষী আর দোকানদার, ছুতোর আর কামার, শ্রমিক আর শিক্ষক?

যদি শুধু পরগাছা, শুধু পুংমধুকর ছিল এরা তবে যে-সমাজ, যে-দেশ পঞ্চাশের মন্বন্তর মাথায় নিয়েও এদের নিষ্ঠুর নির্মম পরিত্যাগের সদ্‌বুদ্ধি দেখাতে পারে নি, সে-সমাজ অধঃপাতিত হয়েছে সেইদিনই—সেই অক্ষমতার মুহূর্তেই। তার অধঃপাতের নিশ্চয়তা অপেক্ষা করে নি চুয়ান্নর দেশবিভাগ পর্যন্ত।

কিন্তু না, এত শত সহস্র পরগাছা, এত অগণন পুংমধুকর পুষে রাখবার ক্ষমতা কী করে থাকবে পঞ্চাশের বিধ্বস্ত বাঙালীর অর্থনীতিতে? নিশ্চয় এরা জুটিয়ে গিয়েছিল অন্ততঃ জঠরের অন্ন, অঙ্গের পরিধেয়, মাথা গোঁজবার কিছু একটা আশ্রয়, হয়তো বা তুলসীমঞ্চের কাছাকাছি একটি গাঁদা কি সন্ধ্যামণির বিলাসও। জুটিয়ে চলেছিল সেই তিপ্পান্ন কি চুয়ান্নর যাযাবরবৃত্তি অবলম্বনের আগের দিন পর্যন্ত। কিন্তু অর্জনের সেই পথ ছিল নিশ্চয় এত কৃত্রিম, অর্থনীতিক উৎপাদনের সঙ্গে এতই নিঃসম্পর্ক, যাতে মাত্র দুশো কি পাঁচশো মাইলের পর্যটন চারটি কি ছটি দ্রাঘিমাংশের অক্ষহ্রাস মরণমার মেরে দিতে পারল। মানুষ থেকে তারা ভিক্ষুক হল, ভিক্ষুক থেকে পরিণত হল ক্লিন্ন কৃমিকীটে। কেন না তারা হয়তো ছিল পরগাছার চাইতেও পরোপজীবী, পুংমধুকরের চাইতেও নিষ্প্রয়োজনীয়ের উৎপাদক। এরা ছিল সেই অর্থহীন সংজ্ঞাভুক্ত শ্রেণী যা উল্লেখ করে মূর্খ আমরা এখনও গর্বে আত্মহারা হই। এরা মধ্যবিত্ত ছিল।

মধ্যবিত্ত! কে সৃষ্টি করেছিল হাস্যকর এই শব্দটি? বিত্ত অর্থ যেন নাসিকে ছাপা দশ টাকা পাঁচ টাকার নোট, স্ট্র্যাণ্ড রোডে ছ্যাঁচা আধুলি সিকি অথবা আলিপুরের নতুন ট্যাঁকশালে বানানো নয়া-পয়সা! যে মানুষগুলো কোনদিন দেশের বিত্ত একটি রতি তৈরি করল না, শুধু ভোগ করে গেল আইনের মার-প্যাঁচে, তারা হল মধ্যবিত্ত। কেন না ওরা টাকা উপার্জন করে। ওরা জমি চষতে জানে না, ভাগচাষী লাগাতে তো জানে; নৌকো বাইতে জানে না, খেয়াঘাটের বন্দোবস্ত নিলামে ডেকে নিতে তো পারে; শিক্ষকতা করতে জানে না, ইস্কুলের সেক্রেটারি সেজে সরকারী গ্রান্টের টাকায় হিসাবের কারচুপি করতে তো কম যায় না; ওরা সব মধ্যবিত্ত। সব কিছুর ঠিক মধ্যিখানটিতে আছে ওরা, মধ্যবিত্তরা—মধ্যস্বত্বভোগ থেকে শুরু করে মধ্যস্থতার মর্কটবৃত্তি পর্যন্ত প্রতি নিষ্ফল বৃত্তিতে।

তাই যেদিন রাষ্ট্রবিপ্লব আসে, কর্মিষ্ঠতার সেই নিষ্ঠুর পরীক্ষার দিনে মধ্যপদলোপীকর্মধারয়ের মত এই মধ্যবিত্তরা লুপ্ত হয়ে যান কালের ধূলায়। উদ্বাস্তু কলোনীর ভঙ্গুর খোলায় দু'দিন কি চারদিন টিকে থাকার ব্যর্থপ্রয়াস প্রহসনে পর্যবসিত হয়ে যায়—যদি না মধ্যবিত্ততার ভগ্নতরী ছেড়ে উদ্যমের সমুদ্রে মরণপণ ঝাঁপ দেবার সুবুদ্ধি আসে সময় থাকতেই।

সিন্ধী আর পঞ্জাবী উদ্বাস্তু উপহাসের পাত্র নয়, কারণ তারা মধ্যবিত্ত ছিল না। বাঙালী উদ্বাস্তুর হাতে আজ ওদের চতুর্গুণ মূলধন দিন, এরা ভিক্ষা করার ক্লেশটুকুও অস্বীকার করে সেই মূলধন কুরে কুরে খাবে—এমন কুঁড়ে এই মধ্যবিত্তরা। কেন না চিরকাল এরা মূলধন ভেঙে ভেঙে খেতেই শিখেছে, যে-মূলধন ছিল এদের মধ্যবিত্ততার সীমিত পরমায়ু। এদের মধ্যে যে উকিল ছিল তার প্রতিজ্ঞা সে উকিলই থাকবে অথবা ভিক্ষুক হবে; ভাববে না বাংলাদেশের দেড়-কুড়ি জেলা এখন আধ-কুড়ি হয়েছে এবং যারা ভিক্ষুকদের ভিক্ষে দিত সেই মধ্যবিত্তরা অধিকাংশ ভিক্ষুক হয়ে গেছে। যে তালুকদার ছিল তার তালুক গেছে; কিন্তু তালুক ছাড়া সে যে আর

হবার বাণী। মূঢ়তা বা ভয়ের চিহ্নলেশমাত্র এর মধ্যে নেই। এই সাধনায় সদাজাগ্রত চেষ্টার সুনিশ্চিত নির্দেশ আছে। আপনাকে নির্মল, শুচি করতে হবে, সৃষ্টির মূলে নিহিত রয়েছে যে ঐক্য তাকে মৈত্রীভাবের চর্চায় বুঝতে চেষ্টা করতে হবে, পরমদেবতার সঙ্গে নিগূঢ়তম আত্মীয়তা স্থাপন করতে হবে। ইহজীবনের সকল প্রিয়সম্পর্কের অপেক্ষা তিনি প্রিয়তর এই কথাই তাঁরা বার বার ঘোষণা করেছেন দ্বিধাহীন উদাত্ত কণ্ঠে—"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা", তিনিই অন্তরের অন্তরতর আত্মা যিনি এই বিশ্বের অন্তরে নিরন্তর বাস করছেন। তিনি সকল প্রিয়ের প্রিয়, সকলের চেয়ে ভয়ংকর তিনি নন। এই উপলব্ধির মধ্যে মূঢ়তার তিলমাত্র চিহ্ন নেই, মন্ত্রতন্ত্রের নিষ্ঠুর বাক্যজালে কোথাও তাঁকে শান্ত করার ভীরু চেষ্টা নেই, বিকৃতির কণামাত্র স্থান নেই।···

জগতের বীভৎস ব্যভিচারের মধ্যে আজ এই সত্যটি বিশেষ করে স্মরণ করবার দিন এসেছে। লোভ কোরো না—এ বাণী আজ সংগ্রামের বিক্ষুব্ধ আবর্তে মানুষ মনে রাখতে পারছে না। এর স্থান বুঝি আজ রাষ্ট্রনীতি থেকে একেবারেই মুছে গেল; সমাজনীতির ক্ষেত্রে তো বহু পূর্বেই মানুষ এ-বাণী বিস্মৃত হয়েছিল। অত্যন্ত লজ্জার কথা, উপনিষদের মন্ত্রের এই দেশেও মানুষকে অপমানিত আমরা কম করি নি। লোভের তাড়নায় মানুষ আজ মানুষের সম্মিলিত শক্তিকে দিকে দিকে বলহীন করছে, মারছে। যুগান্তরের সাধনায় পাওয়া সকল বিশ্বাসকে সে আজ নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করছে, দুর্বল করছে। এতে যে প্রতিনিয়ত সে নিজেকেই আঘাত করছে তা নিজেও জানে না।

এই ভেদবুদ্ধি যে আমাদের দেশের অন্তরের জিনিস নয় তা আমরা ভুলতে বসেছি। এর পীড়নে কী পরিমাণে পঙ্গু আমরা হয়েছি এবং আজো হচ্ছি, জীবনের ক্ষেত্রে ক্রমশই কি ভাবে শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি তা আমরা এতদিন বুঝি নি, আজো বুঝতে পারলুম না। আমার মনে হয় এই মনোবৃত্তির জন্যে দায়ী আমাদের অনার্য রক্ত যা পরবর্তী যুগে অলক্ষিতে আমাদের দেহের মধ্যে এসে মিশেছে। ইতিহাস ভালো করে আমার জানা নেই, কিন্তু আমার মনে হয় এই কারণেই হয়ত মানবতার বা সাম্যের যে ধর্ম তা মুছে গিয়েছে। অনার্য রক্তের সংমিশ্রণের বিকৃতিকে অস্বীকার কেমন করে করি যখন চারিদিকে দেখি এই বিকৃত মনোবৃত্তি শক্তির নামে, বলের নামে সমগ্র মানব-সমাজকে জীর্ণ করছে। দৃষ্টি তাদের এতদূর অন্ধ যে তারা দেখতেও পায় না এতে নিজেরই নৌকায় ছিদ্র করা হচ্ছে।

আমাদের দেশেও আজ তাই ভাববার সময় এসেছে। ভাবনা জাগছে ভারত আজ তার এই চরম বিপদের সময় আপনাকে খুঁজে পাচ্ছে না কেন? এর মূল কারণ নির্দেশ করা একেবারেই কঠিন নয়। ধীরে ধীরে অতি সুনিশ্চিত এবং সুনিপুণ দক্ষতার সঙ্গে এ-দেশে মানুষের কেন্দ্রগত শক্তির মূল ছেদ করা হয়েছে, তাকে অপহরণ করা হয়েছে কূট রাষ্ট্রনীতির সাহায্যে। আজ সাহায্য করবার ডাক এসেছে, কিন্তু সে-শক্তি এখন কোথায়। ভারত সহায়তা করতে পারবে না বিশ্বমানবকে কোনো ক্ষেত্রেই। আমরা দাস্যবৃত্তিতে দীক্ষিত হয়েছি মনুষ্যত্ব হারিয়ে; আজ কাদের সাহায্যে এই যুগান্তরগত পরাভবের গ্লানি দূর করব। মানুষকেই যে আমরা তিলে তিলে নিঃশেষে হারিয়েছি। যে ধর্ম এক দিন মানুষকে কাছে টেনেছিল সাম্যের আকর্ষণে, প্রেমের আকর্ষণে তাতে এতবড়ো কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা হয়েছে যে, দেবতাকে যারা ভয়ের তাড়নায় পূজা করে তারা দেবতার পশু, তারা নিজেদের তুচ্ছ আচারবিচারের যূপে আবদ্ধ হয়ে আছে। পূজারীর গৌরব তাদের জন্য নয়, সৃষ্টির যজ্ঞশালায় কোনো শুভকার্যে তাদের অধিকার নেই। দেখতে পাচ্ছি সেই হিংস্র পশুরাই আজ দলে দলে খরনখরদন্ত বিস্তার করে দিকে দিকে উদ্দাম হয়ে জেগে উঠেছে। কে আজ তাদের শান্ত করবে, নিবৃত্ত করবে জানি নে।

এই নিদারুণ বিপদের মুখে দাঁড়িয়েও তবু গৌরবের সঙ্গে আমাদের স্মরণ করবার দিন এসেছে যে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি সেই ভারতবর্ষে যে-দেশে পরম আনন্দ-

স্থাবরতা বা স্থবিরতা এগুলোও আমি কিছু আর অন্তর দিয়ে মেনে নিই নি। তবে ওই ধরনের মতবাদগুলি নিয়ে বিতণ্ডা করবার জন্য চিরকাল সক্রেটিসের পরে কোপারনিকাস এবং ডাল্টনের পরে অটোহান্ জন্মে থাকেন; স্থবির পৃথিবী জঙ্গম হন, নিশ্চল মার্তণ্ড হন পরিব্রাজক, অকাট্য পরমাণুর বিচূর্ণিত দেহ থেকে সৃষ্টি হয় বিশ্বধ্বংসী আণবিকশক্তি। পরীক্ষাগারের সত্যকে মিথ্যায় অবলুণ্ঠিত করার জন্যে রয়েছেন পরীক্ষাগারেরই পরবর্তী অবতারগণ; আমার পক্ষে তা অনধিকার। কিন্তু যে সত্যের ল্যাবরেটরী করোটির দেওয়াল-ঘেরা মস্তিষ্কের বাইরে নেই, নির্মোহ দৃষ্টি ছাড়া, অপক্ষপাত চিন্তা ছাড়া নেই যার পরীক্ষা-নিরীক্ষা, তার বিচারে যদি দীর্ঘপ্রচলিত বলেই কোন মতবাদকে আভূমি-লুণ্ঠিত কুর্নিশ জানাই, তবে ধিক্ আমাকে। বাঙালীর গৌরব-রবি অস্তমিত—এর মধ্যে প্রমাণিত সত্য কোথায়?

২

পাঠকের সৌভাগ্য আমি ইতিহাসের ছাত্র নই; এবং শিক্ষকও নই। বাংলাদেশের মাপজোকবিহীন থানকাপড়ের মত ভাঁজ করে রাখা ইতিহাসটাকে নিজের ধারণার মাপেজোপে ছেঁটেকেটে নিপুণ একটি ধাপ্পার কুর্তি তৈরি করে তাদের সামনে মেলে ধরতে স্বভাবতঃই তাই ভরসা পাব না। তার বদলে আপনাকেই আমি সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করব, বাঙালীর অধঃপতন কবে থেকে শুরু হল? আপনার যে-কোন উত্তর মেনে নিয়েই আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে পারে; উত্তর যদি আপনার যথার্থ হয়, সৎ যদি হয় আমার সত্যানুসন্ধান, তবে আমার প্রত্যুত্তরও হবে নির্ভুল। আর আপনার উত্তরে যদি ত্রুটি থাকে তবে নিশ্চয় আমার করোটির ল্যাবরেটরী তার স্বয়ংক্রিয় মননযন্ত্র থেকে আপনার উত্তর আপনাকেই দেবে ফিরিয়ে—ঠিক ত্রুটির স্থলটিতে ছোট্ট একটু ঢেঁড়া-চিহ্ন এঁকে।

শ্রদ্ধেয় এক দেশনেতা যেদিন—এইতো সেদিন, বলেছিলেন বাঙালা কেবল কাঁদতে জানে; সেদিন বা তারই অব্যবহিত আগে কি শুরু হয়েছে আমাদের অধঃপাত? বঙ্গদেশের স্মিত মানচিত্রকে যেদিন রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের ছুরিকা দিয়ে দু টুকরো করে কেটে ফেলা হল, সেদিন? তারই পরে তো দেখতে পেলাম ক্লীব নির্বীর্য মানুষের পাল রুগ্ন শূকরের মত নিজের ক্লেদের মধ্যে বসে বসে আবর্জনায় উদরপূর্তির প্রয়াসে ক্লিন্ন। ওরা উদ্বাস্তু শিবিরে শিবিরে ভিক্ষার চাল কাঁড়া নেবে, না, আকাঁড়া নেবে তারই কোলাহলে দিন কাটায়; ওরা শিয়ালদার প্ল্যাটফর্মে, অকল্যাণ্ড হাউসের প্রাঙ্গণে, ভাঙা প্রাসাদের আনাচে-কানাচে লুব্ধ শকুনের মত বাসা বাঁধে। ভিক্ষা ছাড়া বৃত্তি জানে না, ক্ষুধা ছাড়া প্রেরণা জানে না, মৃত্যু ছাড়া সূর্যোদয় জানে না, কলহ ছাড়া অবসর-বিনোদন জানে না, বিলাস জানে না সন্তান-প্রসবের কদর্যতা ছাড়া। আশ্চর্য, দেশবিভাগের আগে এরা কী ছিল? যদি কৃষক ছিল তো রাজস্থানের ঊষর মৃত্তিকা, দণ্ডকারণ্যের কুমারী বনানী, আন্দামানের নারিকেল-কুঞ্জবীথি কেন এদের হাতছানি দেয় নি, কেন জানায় নি এদের পেশল পৌরুষের প্রতি অমোঘ চ্যালেঞ্জ? যদি ছিল কামার কি কুমোর, ছুতোর কিংবা রাজমিস্ত্রী, তবে আজ মানিকতলার খালের ধারে ধারে, ভোরবেলাকার এস্প্ল্যানেড-কলেজ স্ট্রীট-বড়বাজারের ফুটপাথে কেন দেখি না ওদের উত্তরপ্রদেশ কি বিহার, উৎকল কি পঞ্জাবের দূর-দুরান্ত থেকে আগত কারিগরদের পরিশ্রমী পংক্তিতে আপন দক্ষতায় প্রতিষ্ঠাবান্? রাজস্থানবাসী বণিকের স্বজনপ্রীতিতে অক্ষম ঈর্ষায় জর্জর হয়ে যখন বাঙালীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখি তখন কেন চোখে পড়ে না যে গত তের বৎসর কাল কলকাতার সৌখীন অঞ্চলে উদ্বাস্তুদের যে কটি মণিহারী দোকান নিয়ন-আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তার প্রত্যেকটি সিন্ধী কি পঞ্জাবী পশ্চিমাগত উদ্বাস্তুর—বাঙালীর নয়। স্বজনপ্রীতিতে এর ব্যাখ্যা মেলে না; স্বজনবিদ্বেষেও না।

হায় সন্দিগ্ধ প্রাবন্ধিক, এর পরেও কি তোমার চোখে ছুঁচ ফুটিয়ে দেখাতে হবে যে বাঙালী অধঃপাতিত জাতি?

না, ছুঁচ ফুটোবার প্রয়োজন দেখি না, কেন না ওতে দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতা কিছুমাত্র বাড়ে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে বাস্তবিক মানুষের মত আকৃতি, বাঙালীর মত ভাষাভাষী এই প্রাণীগুলি কী ছিল? এরা কি ছিল শুধু পরগাছা? শুধু পুংমধুকর—মধুচক্রের প্রাচুর্যের দিনে নিষ্কর্মা যে জীবগুলোকে আলস্য-মধুপানে বাঁচিয়ে রাখে কর্মী মক্ষিকাকুল একটিমাত্র প্রহরের জৈব প্রয়োজনের বিলাসী উদ্দেশ্যে, তার পরমুহূর্তের প্রাণদণ্ড যাদের পুরা-লিখিত? অথবা এরাও মানুষ ছিল—চাষী আর দোকানদার, ছুতোর আর কামার, শ্রমিক আর শিক্ষক?

যদি শুধু পরগাছা, শুধু পুংমধুকর ছিল এরা তবে যে-সমাজ, যে-দেশ পঞ্চাশের মন্বন্তর মাথায় নিয়েও এদের নিষ্ঠুর নির্মম পরিত্যাগের সদ্‌বুদ্ধি দেখাতে পারে নি, সে-সমাজ অধঃপাতিত হয়েছে সেইদিনই—সেই অক্ষমতার মুহূর্তেই। তার অধঃপাতের নিশ্চয়তা অপেক্ষা করে নি চুয়ান্নর দেশবিভাগ পর্যন্ত।

কিন্তু না, এত শত সহস্র পরগাছা, এত অগণন পুংমধুকর পুষে রাখবার ক্ষমতা কী করে থাকবে পঞ্চাশের বিধ্বস্ত বাঙালীর অর্থনীতিতে? নিশ্চয় এরা জুটিয়ে গিয়েছিল অন্ততঃ জঠরের অন্ন, অঙ্গের পরিধেয়, মাথা গোঁজবার কিছু একটা আশ্রয়, হয়তো বা তুলসীমঞ্চের কাছাকাছি একটি গাঁদা কি সন্ধ্যামণির বিলাসও। জুটিয়ে চলেছিল সেই তিপ্পান্ন কি চুয়ান্নর যাযাবরবৃত্তি অবলম্বনের আগের দিন পর্যন্ত। কিন্তু অর্জনের সেই পথ ছিল নিশ্চয় এত কৃত্রিম, অর্থনৈতিক উৎপাদনের সঙ্গে এতই নিঃসম্পর্ক, যাতে মাত্র দুশো কি পাঁচশো মাইলের পর্যটন চারটি কি ছটি দ্রাঘিমাংশের অক্ষহ্রাস মরণমার মেরে দিতে পারল। মানুষ থেকে তারা ভিক্ষুক হল, ভিক্ষুক থেকে পরিণত হল ক্লিন্ন কৃমিকীটে। কেন না তারা হয়তো ছিল পরগাছার চাইতেও পরোপজীবী, পুংমধুকরের চাইতেও নিষ্প্রয়োজনীয়ের উৎপাদক। এরা ছিল সেই অর্থহীন সংজ্ঞাভুক্ত শ্রেণী যা উল্লেখ করে মূর্খ আমরা এখনও গর্বে আত্মহারা হই। এরা মধ্যবিত্ত ছিল!

মধ্যবিত্ত! কে সৃষ্টি করেছিল হাস্যকর এই শব্দটি? বিত্ত অর্থ যেন নাসিকে ছাপা দশ টাকা পাঁচ টাকার নোট, স্ট্র্যাণ্ড রোডে ছ্যাঁচা আধুলি সিকি অথবা আলিপুরের নতুন ট্যাঁকশালে বানানো নয়া-পয়সা! যে মানুষগুলো কোনদিন দেশের বিত্ত একটি রতি তৈরি করল না, শুধু ভোগ করে গেল আইনের মার-প্যাঁচে, তারা হল মধ্যবিত্ত। কেন না ওরা টাকা উপার্জন করে। ওরা জমি চষতে জানে না, ভাগচাষী লাগাতে তো জানে; নৌকো বাইতে জানে না, খেয়াঘাটের বন্দোবস্ত নিলামে ডেকে নিতে তো পারে; শিক্ষকতা করতে জানে না, ইস্কুলের সেক্রেটারি সেজে সরকারী গ্রাণ্টের টাকায় হিসাবের কারচুপি করতে তো কম যায় না; ওরা সব মধ্যবিত্ত। সব কিছুর ঠিক মধ্যিখানটিতে আছে ওরা, মধ্যবিত্তরা—মধ্যস্বত্বভোগ থেকে শুরু করে মধ্যস্থতার মর্কটবৃত্তি পর্যন্ত প্রতি নিষ্ফল বৃত্তিতে।

তাই যেদিন রাষ্ট্রবিপ্লব আসে, কর্মিষ্ঠতার সেই নিষ্ঠুর পরীক্ষার দিনে মধ্যপদলোপীকর্মধারয়ের মত এই মধ্যবিত্তরা লুপ্ত হয়ে যান কালের ধূলায়। উদ্বাস্তু কলোনীর ভঙ্গুর খোলায় দু'দিন কি চারদিন টিকে থাকার ব্যর্থপ্রয়াস প্রহসনে পর্যবসিত হয়ে যায়—যদি না মধ্যবিত্ততার ভগ্নতরী ছেড়ে উদ্যমের সমুদ্রে মরণপণ ঝাঁপ দেবার সুবুদ্ধি আসে সময় থাকতেই।

সিন্ধী আর পঞ্জাবী উদ্বাস্তু উপহাসের পাত্র নয়, কারণ তারা মধ্যবিত্ত ছিল না। বাঙালী উদ্বাস্তুর হাতে আজ ওদের চতুর্গুণ মূলধন দিন, এরা ভিক্ষা করার ক্লেশটুকুও অস্বীকার করে সেই মূলধন কুরে কুরে খাবে—এমন কুঁড়ে এই মধ্যবিত্তরা। কেন না চিরকাল এরা মূলধন ভেঙে ভেঙে খেতেই শিখেছে, যে-মূলধন ছিল এদের মধ্যবিত্ততার সীমিত পরমায়ু। এদের মধ্যে যে উকিল ছিল তার প্রতিজ্ঞা সে উকিলই থাকবে অথবা ভিক্ষুক হবে; ভাববে না বাংলাদেশের দেড়-কুড়ি জেলা এখন আধ-কুড়ি হয়েছে এবং যারা ভিক্ষুকদের ভিক্ষে দিত সেই মধ্যবিত্তরা অধিকাংশ ভিক্ষুক হয়ে গেছে। যে তালুকদার ছিল তার তালুক গেছে; কিন্তু তালুক ছাড়া সে যে আর

কিছু বোঝে না, মাথার তালুতে মোট বইবে সে কী করে? বরঞ্চ হাতের তালু চিত করে সে মোটর-বাসের জানলায় জানলায় প্রেতমূর্তির মত ভিক্ষে করে বেড়াবে। আসলে ভিক্ষা আর অপহরণ দুটোর মধ্যে মৌল পার্থক্য তো যৎসামান্য: এরা আগে অপহরণরূপ ভিক্ষাবৃত্তিতে জীবিকানির্বাহ করত, এখন ভিক্ষারূপ অপহরণবৃত্তি ছাড়া আর সম্বল নেই। যেমন, সরকারী ঋণের অর্থ কিংবা বেসরকারী দানের কথাই ধরুন।

তা হলে যে সংক্রান্তিকে আপনি বাঙালীর অধঃপাতের মুহূর্ত বলেছেন, তখন যদি বা এই মহামারীর গুটিকা দেখা দিয়ে থাকে তবে তার মর্মে সংক্রমণ আরও অনেক আগে—মধ্যবিত্ততার সৃষ্টিমুহূর্তে।

৩

তবে আরও অতীতে ডুব দিই আসুন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র যেদিন শ্রমবিমুখ বাঙালীর উদ্দেশে কঠোর সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন সেই যুগে কি মিলবে বাঙালীর অধঃপাতের সূচনা? কিন্তু শ্রমবিমুখতা তো মধ্যবিত্ততা ব্যাধিরই একটিমাত্র সামান্য লক্ষণ, সম্ভবতঃ সর্বপ্রধান লক্ষণ। যে উৎপাদন করে, কৃষিজাত শস্য হোক, কৃষ্টিজাত মনস্বিতা হোক, বাণিজ্যজাত সমৃদ্ধি হোক অথবা শ্রমজাত পণ্য হোক, যে উৎপাদন করে তাকে তো শ্রমবিমুখ হলে চলে না। যে শ্রমবিমুখ, সে উৎপাদন করে না; সে মধ্যবিত্ত। ডাক্তার মধ্যবিত্ত নয় যদি না সে জীবনবীমার দালালের উপদালালে পর্যবসিত হয়। উকিল মধ্যবিত্ত, সে মধ্যস্বত্বভোগী তালুকদার-জোতদারের কিংবা উচ্চস্বত্বভোগী জমিদারের মধ্যবিত্ততার মুখাপেক্ষী।

মধ্যবিত্ত সৃষ্টির অশুভ লগ্ন থেকে আরও উজানে যেতে হবে তা হলে বাঙালীর অধঃপতন কবে শুরু তারই সন্ধানে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পেরিয়ে আরও অতীতে।

সিরাজদ্দৌল্লার রাজত্বে একবার থেমে দেখা চলতে পারে; শচীনবাবুর নাটুকে সিরাজ নয়, সৌজারের চাইতে স্বেচ্ছাতন্ত্রী আসল সিরাজদ্দৌল্লার যুগে। দেখব বাঙালীর মত ক্লীব অপদার্থ জাতের বিশ্বে বুঝি আর জুড়ি নেই। রাজধানীর আশেপাশে শ্রেষ্ঠী আর আমলারা দস্যুর মত নিষ্ঠুর সর্বস্বাপহারক, দূর-দূরান্তে দস্যুদল রাজশক্তির বেসরকারী আমলার মত নিরঙ্কুশ। এরই মধ্যে কয়েক কোটি বাঙালী আলস্যমন্থর গাভীর মত নিরবধি কালকে রোমন্থনে পরিপাক করছে।

আরও একটু অতীতে লক্ষণসেনের যুগে উঁকি মেরে না দেখাই ছিল ভাল। সে-যুগের লক্ষণসেনই তো এ-যুগের উদ্বাস্তুগোষ্ঠীর আত্মিক পিতামহ। এদের পূর্বসূরী। পলায়ন আর পলায়ন—পশ্চিম থেকে পুবে, পুব থেকে পশ্চিমে; থাকিতে চরণ মরণে কি ভয়, জয় শ্রীচরণ ভরসা!

আর কত পশ্চাদপসরণ করব খাঁটি বাঙালীর মত? শেষে কি দেখব আমরা অধঃপাতিত নই, আজন্মপতিত জাতি?

৪

অথচ তা বলবার উপায় নেই। বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি—এর মত সত্যের অপলাপ তো দুটি নেই। আসলে আমরা অতিমাত্রায় আত্মাভিমানী ও আত্মসর্বস্ব জাতি। বিপদে পড়লে আমরা পিতৃনাম যদি বা কখনও বিস্মৃত হই তবু ভুলতে পারি না ইতিহাসের বা উপকথার আনাচে-কানাচে আমাদের গৌরবকাহিনীর যা কিছু ছিটেফোঁটা ছড়িয়ে আছে। চতুর্দশ পুরুষ আগে আমার যে প্রবর-পিতা একটু ঘি খেয়েছিলেন, তার বিমল সুগন্ধ আমরা এখনও পাই আমাদের আঙুলে, এখনও তাই লেহন করতে ভুল হয় না আমাদের। আর সেই সব গৌরব-কাহিনী সগর্ব আবৃত্তি করার সময়ে বাঙালীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য শুধুমাত্র বঙ্গদেশের অধিবাসীর নামই উচ্চারণ করি তা নয়, সর্বভারতীয় কাউকেই বাদ দিই না। সীতা-সাবিত্রীর নাম একসঙ্গে অবলীলাক্রমে উচ্চারণ করে আমরা বঙ্গললনার সতীত্বের আদর্শ ঘোষণা করি।

বরঞ্চ রেহুলার নাম বলতেই ভুলে যাই। বিদ্যাপতিকে তো আমরা একেবারেই আত্মসাৎ করে ফেলেছি।

অতএব বাঙালীর গৌরবরবি নামক কাল্পনিক বস্তুটির অস্তিত্ব কোনকালেই ছিল না এ কথা বলার দুঃসাহস প্রকাশ করলেও আমার দেহ অক্ষত থাকবে, কায়িক ক্ষমতায় বাঙালী নিশ্চয় এতখানি অপারগ হয়ে পড়ে নি এখনও। একসময়ে সমাদৃত সিরাজদ্দৌল্লা, মীরকাশেম, নন্দকুমার, প্রতাপাদিত্য, কেদার রায়, বঙ্গে বর্গী ইত্যাদি অনৈতিহাসিক প্রহসনগুলি পড়ে কিংবা দেখে এবং ডি.এল. রায় ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের রোমান্টিক কবিতা ও গানের বাষ্পীয় চাপে আমাদের সকলেরই এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে বাঙালীয়া এককালে—কোন এক অনির্দিষ্ট এবং অনির্দেশ্য যুগে—নিশ্চয়ই একটা জাতের মত জাত ছিল।

রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি, সুভাষচন্দ্রের আকাশচুম্বী প্রেষ্টিজ (রাসবিহারী বসু এবং তারও আগে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ যে একই রোমান্টিক অ্যাডভেঞ্চারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন সেকথা আমাদের স্মরণ নেই) ইত্যাদি কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনা আমাদের শূন্যগর্ভ দম্ভকে করে তুলেছে আরও দুরারোগ্য। আজ আর বাঙালীর অতীত গৌরবের মিথ্ ভাঙবার কোন সহজ উপায় নেই।

অস্বীকার করব না, রাজা রামমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত দুর্লভ ব্যক্তিত্ব ও মনীষা সৃষ্ট হয়েছিল বাংলার মাটিতে। কিন্তু একটি কোকিল ফাল্গুনের আগমন প্রমাণিত করে না; একটি সেক্সপীয়রে হয় না ইংরেজী সাহিত্যের পূর্ণ মূল্যায়ন। পৃথিবীর এমন কোন্ হতভাগ্য জাত আছে যার মধ্যে জন্মান নি একজন ঈশ্বরচন্দ্র, একজন চিত্তরঞ্জন কি একজন শ্রীচৈতন্য? একটি মাত্র পাব্লো নেরুদাকে দিয়ে কি চিলির কাব্যপ্রতিভাকে বিচার করব?

জাতির আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্বের বিচার হয় না একজন কি পাঁচজন মহাপুরুষ দিয়ে। মহাপুরুষের বিরাটত্বকে জাতির মৃৎ-প্রাচীরে ঘিরে রাখা যায় না; রাখলে তা অন্যায়। মহাপুরুষ দেশের নয় বিশ্বের, জাতের নয় মানুষ জাতির। জাতির আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্বের বিচার তার নামহীন অগণিতের দোষে-গুণে; তার সামগ্রিক অস্তিত্বে, স্থাপত্যে, সাহিত্যে, শিল্পকলায়; শুধু তাই বা কেন, তার জাতীয় চরিত্রের মাধুর্যে, জাতীয় বর্ণালীর ঔজ্জ্বল্যে।

পুরী-কোনারক-ভুবনেশ্বর সাক্ষ্য দেয় উৎকলের নিশ্চিহ্ন গৌরবের। বঙ্গদেশে তেমন সাক্ষ্য অনুপস্থিত। বঙ্গদেশের হৃতগৌরবের সাক্ষ্য যদি কিছু থাকে, যদি কোন কালে থেকে থাকে বাঙালীর সুবর্ণাভ যুগ, তবে তা খুঁজতে হবে ঢাকার মসলিনে, নবদ্বীপের টোলে, কালীঘাটের পটে, কবিগানে পাঁচালীতে, মঙ্গলকাব্যে ও ব্রতকথায়।

মৃত এই সাক্ষ্যগুলির বিশ্লেষণ সময়-সাপেক্ষ; এই মুহূর্তে তার জন্য আমার প্রস্তুতি নেই। কিন্তু বিস্তৃত বিশ্লেষণ না করেও বলতে পারি মসলিন আর পট, টোল আর পাঁচালী যুগের প্রয়োজনে নিশ্চিহ্ন হতে বাধ্য। গেছে যদি আপদ গেছে, মিথ্যা কোলাহল। মসলিন থেকে আজগুবী কতকগুলি কাহিনী ছাড়া কী পেয়েছে বাংলা দেশ? কালীঘাটের পটের পটভূমির কতটুকু বিস্তৃতি? পাঁচালী আর মঙ্গলকাব্য থেকে ইতিহাসের মসলা নেওয়া যায় যতখানি, বাঙালীর গর্ব করার মত কী এমন আছে ওতে? কাল্পনিক যে স্বর্ণযুগের সঙ্গে তুলনায় আজকের বাঙালী নিজেকে ধিক্কৃত করছে তা কি বুনো রামনাথের তেঁতুলতলার সঙ্গে অভিন্ন?

যে পুরাতনের প্রশংসায় আমরা পঞ্চমুখ সে পুরাতনের বয়স বোধ হয় দুই শতাব্দীর বেশী নয়; সম্ভবতঃ আরও কম। সে পুরাতন ইংরেজের ছত্রচ্ছায়ায় লালিত; বিদেশী শক্তির প্রথম দেশীয় সুহৃৎ হিসাবে যেদিন বঙ্গদেশ প্রথম আদৃত হল, বাঙালীর গৌরবের যুগ জন্ম নিল মাত্র সেইদিন। সামন্ততন্ত্রের উৎপীড়ন-জর্জর খণ্ড ভারতে বাঙালী প্রথম উপলব্ধি করল, হানাদারের ছদ্মবেশে ইংরেজ ভারতবর্ষের ত্রাতা। আগ্রা আর অযোধ্যা জানে নি, মহারাষ্ট্র আর পঞ্জাব বুঝতে পারে নি, কর্ণাট আর কোশল রয়েছে মধ্যযুগের যোগনিদ্রায় স্তব্ধ; এমন কি গ্রেট ব্রিটেন নিজে বুঝতে পারে নি যে পরাধীনতার নিষ্ঠুর

ছদ্মবেশে সেকালের রাত্রিশেষে একালের সূর্য উঠল ভারতবর্ষে—ভারতের পূর্বদিগন্ত বঙ্গদেশে।

সেই উপলব্ধি যে বাঙালীদের হৃদয়ে এসেছিল বঙ্গ-গৌরব-একাঙ্কিকার তারাই মিতক্ষম নায়ক। তাদের পনের আনার উত্তম ব্যয়িত হল কলকাতার সওদাগরী হৌসে ইংরেজের মুৎসুদ্দি আর অংশীদার হতে, সারা ব্রিটিশ ভারতের জনপদে জনপদে সচ্ছল বাঙালীদের উপনিবেশ গড়ে তুলতে, অথবা বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যায় জমিদারীর সীমানা বিস্তীর্ণ থেকে বিস্তীর্ণতর করে তুলতে। বাঙালীর আকস্মিক গৌরব-খ্যাতি এদের কাছে ঋণী। এবং এদেরই থেকে সৃষ্টি হল পরোপজীবী মধ্যবিত্তশ্রেণীর। স্বত্ব আর উপস্বত্ব নিয়ে তাদের কতশত মারপ্যাচ; তারই গরজে যৌথ পরিবার নামক বিস্ময়কর এক প্রতিষ্ঠান, তারই ফোকরে ফোকরে নিষ্কর্মা পুংমধুকরদের আলস্য-গুঞ্জন; এবং তাদের অবশ্যম্ভাবী সর্বনাশকেই আজ মনে হয় বাঙালী জাতির সর্বনাশ।

৫

কিন্তু বাঙালী জাতির শতকরা কজন তারা? দুই পল যাদের আয়ু সেই হাউইগুলির সশব্দ গগনারোহণকে জাতীয় উত্থান ভেবেছিলাম বলেই আজ তাদের নিরগ্নি পতনকে ভাবছি বাঙালীর অধঃপতন। এদের বাইরে যে কোটি কোটি সাধারণ বাঙালী, ইংরেজী-বারুদে ঠাসা হয় নি বলে যারা তুবড়ির ফুল্‌কি ছোটাতে পারে নি এতদিন, তাদের গৌরবচ্যুতি তো কই ঘটে নি—কারণ গৌরবের লগ্নই আসে নি তাদের। প্রথম ইংরেজী ভাষা শিক্ষার সুযোগ অতিমাত্রায় অসদ্ব্যবহার করেছিল যারা, মোগল খামখেয়ালির থেকে স্বাগত-সম্ভাষণীয় পরিবর্তন-সংহত রাজশক্তির প্রথম পৃষ্ঠপোষকতায় ধন্য হয়েছিল যারা, ভারতবর্ষের কোমল ক্রীড়াঙ্গনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অসংখ্য গোল দিয়েছে তারা দীর্ঘ একযুগ। তারপর যখন প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা দিয়েছে জনপদে-জনপদে, প্রান্তে-প্রান্তে, এমন কি নিজের নগরাঙ্গনেও তখনই পূর্বসূরী লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রের শরণ নিয়েছে তারা। বঙ্গগৌরব-প্রহসনের কাহিনীসার তো এই। কিন্তু নাট্যমঞ্চে অবতীর্ণ হবার সুযোগ আসে নি যাদের, সাজঘরের কোণে কোণে উঁকি-ঝুঁকি মেরেই যারা আমাদের চুম্‌কি-চমকানো রাজা-রাজড়ার সান্নিধ্যগর্বে ডগমগ হয়েছে, তারা কি এখন অভিনয়ে অংশ নেবে না? ভেঙে-পড়া মঞ্চে কি নতুন আঙ্গিকে মঞ্চস্থ হবে না নতুন যুগের বলিষ্ঠ নাটক?

হবে। কারণ ভাগ্যদেবীর অকারণ কৃপায় কুড়িয়ে পাওয়া বারুদটুকু নিঃশেষ হতে পারে নি মুৎসুদ্দি আর জমিদারদের হাতে। ইংরেজের জাহাজে ভেসে আসা একালের বাতাস যাদের মনের পালে এসে লেগেছিল, সেই বাঙালীদের পনের আনার বিমূঢ় ব্যসনের পরেও আর এক আনা বেঁচে গিয়েছে কয়েকজন বাঙালীর হৃদয়ে।

সংখ্যায় তারা মুষ্টিমেয় আর রক্তের সম্পর্কে তারা মধ্যবিত্ত হাউইদের সগোত্র, তাই শ্রেণী হিসাবে তাদের পৃথক পরিচয় পাই নি এতদিন। মধ্যবিত্তদের সঙ্গেই জড়িয়ে গিয়েছে তারা সম্পর্কের কাকতালীয়তায়, স্বার্থের সাময়িক প্রয়োজনে; কিন্তু আদর্শে তারা ততখানি পৃথক যতখানি পার্থক্য অঙ্গারে আর হীরকে, ঝিনুকে আর মুক্তায়, চুনাপাথরে আর প্রবালে। কাকের নীড়ে কোকিলের মত এরা মধ্যবিত্ততার বিবরে লালিত। এদের সৃষ্টি মধ্যবিত্তের অনায়াস পরস্বাপহরণের স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে; কিন্তু একই পূর্বপুরুষ থেকে প্রজাত বানর আর মানুষের মত কিছুমাত্র সাযুজ্য নেই তাদের সঙ্গে এদের।

শ্রেণী হিসাবে এরা পরিচয়হীন, কিন্তু ব্যক্তি হিসাবে এরাই ছড়িয়ে আছে বাংলার আশার প্রদীপ হয়ে। এরাই ডিরোজিয়োর বিপ্লবী শিষ্য ছিল। এরাই ইংরেজের কাছে রাজনীতির পাঠ নিয়ে ইংরেজ বিতাড়নের আন্দোলনে সে-পাঠের সফল পরীক্ষা দিয়েছে। এরাই কাব্যে আর সাহিত্যে বাংলা ভাষাকে মর্যাদার আসন দিতে চেয়েছে। এরা নাটক বানিয়েছে, অভিনয় করেছে,

চলচ্চিত্রের নতুন দিগন্ত খুলতে চাইছে অসংখ্য ত্রুটির পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তবু নিরলস অধ্যবসায়ে। মধ্যবিত্ত নয়—এরা বাংলার বুদ্ধিবিত্ত।

এতদিন এই বুদ্ধিবিত্তরা জীবিকার অপ্রচুরতায় হয়েছিল মধ্যবিত্তর শিবিরানুসারী। আজ ওই চাকা ঘুরতে আরম্ভ করেছে; বুদ্ধিবিত্তরা আজ স্বীয় জীবিকার জন্য ওদের মুখাপেক্ষী নয় আর। ক্ষেত চাষ করে শস্য ফলায় যে চাষী, তারই মত আজ বুদ্ধিবিত্তও বুক ভরে স্বাধীনতার বাতাস টেনে বলতে পারে—মস্তিষ্ক চষে সে-ও চিন্তা ফলায়; সে চিন্তা আজ আর কল্পনা-বিলাস মাত্র নয়, সে চিন্তাও আজ ধানের মত গমের মত অর্থনীতির পণ্য। ভারতীকে ছেড়ে লক্ষ্মীর উপাসনা ধরতে হবে না আর বেশীদিন, জঠরের খাদ্য জোটাবার ভার নিতে এসেছেন ওই দেবী ভারতী।

অপরপক্ষে বন্ধ্যা মধ্যবিত্তশ্রেণীর নিশ্চিত মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয়ে গেছে আজ। তাদের মরণ-আর্তনাদকে আর ভুল করব না আমরা বাঙালীর সঙ্কট-লক্ষণ বলে। মধ্যবিত্তের মৃত্যু বুদ্ধিবিত্তের স্বকীয় স্বরাট্ পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত হবার ইঙ্গিত।

আজ বরঞ্চ মুমূর্ষু মধ্যবিত্ততা বাঁচবার তাগিদে বুদ্ধিবিত্তর শিবিরে আশ্রয় নিতে চাইবে। বলবে, ওগো শিল্পী, ওগো কবি, ওগো সাহিত্যিক, ওগো চিন্তাবিদ্, আমিও তোমার মত মধ্যবিত্ত। আমার স্বার্থেই তোমার স্বার্থ; তোমাকে আমি এতদিন অন্ন জুটিয়েছি, সেবা জুটিয়েছি, পিতৃত্ব-ভ্রাতৃত্ব-বন্ধুত্ব জুটিয়েছি, অবসর জুটিয়েছি তোমার বুদ্ধি অনুশীলনের, আশ্রয় জুটিয়েছি শীতাতপ থেকে আত্মরক্ষার, পরিচয় জুটিয়েছি সামাজিক মর্যাদার; আজ আমার দুর্দিনে তুমি আমাকে তোমার অন্নের অংশ দাও, তোমার গৌরবের অংশ দাও, তোমার পরিচয়ের মর্যাদা দাও। বুদ্ধিবিত্ত অংশ দেবে না, স্বীকৃতি দেবে না, উত্তর দেবে না। মহাকালের কাছ থেকে শেষ উত্তর পেয়ে গেছে যারা, তারা আজ উত্তর-কাল। তাদের জন্য সময় অপেক্ষা করে না, বিলাপ করে না।

এরা পরোপজীবী নয়—শ্রমজীবী। কৃষকের মত, শ্রমিকের মত, মিস্ত্রির মত এরাও কপালের ঘাম ঝরিয়ে নিজের অন্ন অর্জন করে; আর সেই অর্জন-প্রয়াসে সমাজকে দেয় তাদের উৎপন্ন বিত্তের অংশ। এরা তাই আত্মীয়তা অনুভব করবে মধ্যবিত্তের সঙ্গে নয়—শ্রমজীবীর সঙ্গে, এরাই ওদের ডাক দেবে বাংলার ভাঙা রঙ্গমঞ্চকে নতুন যুগের বাস্তব-সজ্জায় সাজিয়ে তুলতে, নতুন আঙ্গিকে নতুন অভিনয়ে উদ্দীপ্ত হতে। তবেই তো বাংলার যে মিথ্যাকল্পিত স্বর্ণযুগের কাহিনী এতকাল আভাসে ইঙ্গিতে অস্পষ্ট ভাষায় শুনে এসেছি তা সত্য হয়ে মুখরিত হবে। একটি মাত্র সামাজিক ভগ্নাংশের কাকজ্যোৎস্না-সমৃদ্ধির দুর্গোৎসব নয়, কোটি কোটি বাঙালীর আনন্দোজ্জ্বল আবীর-ছড়ানো বসন্তোৎসব তবেই হতে পারবে বঙ্গদেশে।

৬

আজও তা হয় নি। আসন্ন হলেও এসে পড়ে নি সেই স্বর্ণ-যুগ। কিন্তু আসবেই। বুদ্ধিবিত্ত আর কায়বিত্ত এই দুই শ্রমজীবী বাঙালী নিশ্চয় আনবে সেই দিন। আর ভারতবর্ষের অন্য যে কোন রাজ্যের চাইতে বাংলাদেশে সে যুগ প্রথমে আসতে বাধ্য, কেন না বাঙালী বুদ্ধিবিত্তরা অবাঙালী বুদ্ধিবিত্তের চাইতে এক শতাব্দীর জ্যেষ্ঠ। এতদিন মধ্যবিত্ততার রাহুগ্রাসে বাঙালী বুদ্ধিবিত্ত অপ্রকট হয়ে ছিল, তবু এখনও অন্য যে-কোন রাজ্যের চাইতে তারা এগিয়ে আছে।

মধ্যবিত্তের স্বাভাবিক মৃত্যুকে যদি আমরা ত্বরান্বিত করতে পারি দেশ থেকে, সমাজ থেকে এবং অন্তর থেকে; কায়িক শ্রম এবং কায়শ্রমিককে যদি শ্রদ্ধা করতে শিখি আবেগহীন নির্মোহ মূল্যায়নের নিরিখে; শ্রমের মর্যাদার রোমান্টিক বিভ্রান্তিতে যদি আবার ছন্দোবয়নের চাইতে বস্ত্রবয়নকে কিংবা বিজ্ঞান-চর্চার চাইতে শরীরচর্চাকে শ্রেষ্ঠ বলে ভুল না করি; প্লেন লিভিং অ্যাণ্ড হাই থিঙ্কিংয়ের চাইতে হাই লিভিং অ্যাণ্ড হাই থিঙ্কিং করতে পারা যে কাম্যতর এই সহজ সত্য যদি বুঝতে পারি; এবং

বুদ্ধিবিত্ততার এইপ্রকার অন্যান্য অনুসিদ্ধান্তগুলি আয়ত্ত করার জন্য যদি নিষ্ঠার সঙ্গে প্রবৃত্ত হই, তবে আমরা সিদ্ধকাম হবই।

কেন্দ্রীয় সরকারের কজন মন্ত্রী বাংলা ভাষায় কথা বলেন, তা নিয়ে শিরঃপীড়া বোধ করার প্রয়োজন নেই আমাদের। চিন্তারাজ্যের অগ্রদূত যদি হতে পারি আমরা—যা আমরা ছাড়া অন্য কোন ভারতীয় জাতির পক্ষে হওয়া অসম্ভব—তবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যে ভাষাভাষী হোন, বাংলা ভাষা তাঁকে শিখতেই হবে চিন্তার পথ্য-অন্বেষণের জন্য; ইংরেজ বৈজ্ঞানিককে যেমন জর্মন ভাষা শিখতে হয়।

ফুটবল খেলায় এবং মল্লযুদ্ধে আমরা যদি চিরকাল পঞ্জাবী ও ভোজপুরীদের কাছে হেরেও যাই, তাতে বাঙালীর লজ্জাবোধ করার মত কিছু নেই। কলকাতা কর্পোরেশনের জলের কল-সংক্রান্ত সব কারিগরী কর্মে উৎকলবাসীরা নিযুক্ত, তাতেই বা দুশ্চিন্তার কী আছে আমি বুঝতে পারি না। চট্টগ্রামের অধিবাসী জলপাইগুড়িবাসীর চাইতে যোগ্য নাবিক, এ নিয়ে অভিযোগ করা নিরর্থক। যে-অস্ত্রে বাঙালী শক্তিমান্ সেই অস্ত্রের সার্থক অনুশীলন করব আমরা, অনভ্যস্ত অস্ত্রের নয়। স্বধর্মে নিধনং নয়, স্বধর্মে উজ্জীবিত হব আমরা, পরধর্ম ভয়াবহ জ্ঞান করে।

অর্থাৎ এক কথায়, বাঙালী কোনদিন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ জাতি ছিল এখন সে অধঃপাতিত—তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকসুলভ এই অসত্য ছিঁচকাঁদুনে পদ্য-পঠন-পাঠন পরিত্যাগ করার সময় আজ এসে গেছে। তার পরিবর্তে সহজ সরল গদ্যে এই নিরলঙ্কার সত্য পরিবেশন করা আজ একান্ত কর্তব্য যে বাঙালী দীর্ঘকাল যাবৎ আলস্যপ্রিয় দুর্বল এবং পশ্চাৎপদ জাতি ছিল, গত এক কি দুই শতাব্দীর ঐতিহাসিক সুযোগ লাভ করে সে মননক্ষমতার অনুশীলন করেছে অন্যান্য ভারতীয় জাতির চাইতে অধিকমাত্রায় এবং এখন, দ্বিখণ্ডিত বঙ্গে যখন তার পক্ষে অন্যপ্রকার প্রতিযোগিতায় ভিন্ন প্রদেশবাসীর সঙ্গে এঁটে ওঠা কঠিনতর হয়ে উঠবে তখন, বাঙালীর কর্তব্য সেই শ্রেয়তর মননক্ষমতাকে সুষ্ঠু ও পরিকল্পিতভাবে প্রয়োগ করা।

কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর পঠিতব্য এই প্রাথমিক সরল কথাটুকু পরিবেশন করার জন্যই আমি এই দীর্ঘ প্রবন্ধের অবতারণা করি নি, বলাই বাহুল্য। সরল এই প্রাথমিক সত্যের গর্ভে সঞ্জীবিত হয়ে আছে আমার এই বিশ্বাস যে বাঙালীর সমগ্র অতীত যত অন্ধকারাচ্ছন্ন হোক, তার ভবিষ্যৎ আশা-সমুজ্জ্বল।

সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের অগ্রদূত নবজাত বাঙালী বুদ্ধিবিত্ত শ্রেণী—যা ইংরেজী ইণ্টেলিজেন্সিয়া শব্দের অনুবাদ মাত্র নয়। বুদ্ধিজীবী মানুষের মন থেকে মধ্যবিত্ত সংস্কার নির্মূল করে ফেলে তাদের শ্রেণীবদ্ধ করলে যা পাই তাকেই আমি বলেছি বুদ্ধিবিত্ত।

●

'মানসী'র দুইটি কবিতা

শ্রীসজনীকান্ত দাস

রবীন্দ্ররচনাপঞ্জী প্রস্তুত কালেই, কবি তাঁহার কৈশোরে ও যৌবনে যে সকল সাময়িক পত্রিকায় রচনা প্রকাশ করিতেন সেগুলি তন্নতন্ন করিয়া দেখিতে গিয়া ১২৯৪ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'ভারতী ও বালকে'র ৮৩-৮৬ পৃষ্ঠায় "বিফল মিলন" শীর্ষক একটি কবিতা পাইলাম। রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরসংযুক্ত কবিতা। হিসাব করিয়া দেখিলাম তখন 'মানসী'র যুগ। সাময়িক পত্রে প্রকাশিত কবিতার হিসাব ধরিলে ১২৯৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে 'কড়ি ও কোমলে'র যুগ শেষ হইয়াছে, ওই মাসের 'ভারতী ও বালকে' "বিরহ" কবিতাটি বাহির হইয়াছিল। 'কড়ি ও কোমল' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়—বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকামতে ২রা অগ্রহায়ণ ১২৯৩। 'মানসী'ই পরবর্তী কবিতাসংগ্রহ। ১২৯৭ সালের ১০ই পৌষ ইহার প্রকাশ হইলেও দেখিতেছি ১২৯৪ বৈশাখ হইতেই রচনা শুরু। 'মানসী'তে প্রত্যেক কবিতার শেষে যে সন-তারিখ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় ১২৯৪ সালের বৈশাখে তিনটি কবিতা রচিত হয়—"ভুলে", "ভুলভাঙা" ও "পত্র (বাসস্থান পরিবর্তন উপলক্ষে)"। ইহার মধ্যে শেষেরটি মাত্র বৈশাখের 'ভারতী ও বালকে' প্রকাশিত হয়। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে লেখা এই কবিতা-পত্র হইতেই জানা যায় কবি তখন দক্ষিণে নীড় বাঁধিয়াছেন অর্থাৎ জোড়াসাঁকো ছাড়িয়া পার্ক স্ট্রীটের বাসায় আছেন। 'মানসী'র গোড়ার কবিতাগুলি হইতে পরিষ্কার বুঝা যায়, কবি তখন বিরহের কাল যাপন করিতেছেন।

'রবীন্দ্ররচনাবলী'তে প্রকাশিত 'মানসী'র জন্য ১৯৪০ সনের ২৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে কবি যে "ভূমিকা" রচনা করেন তাহাতে 'মানসী'-কাব্যরচনার পীঠস্থান হিসাবে পার্ক স্ট্রীট, জোড়াসাঁকো, দার্জিলিংকে বাদ দিয়া একমাত্র গাজিপুরকেই কবি প্রশস্তি নিবেদন করিয়াছেন এই ভাবে—

"গাজিপুর আগ্রা-দিল্লির সমকক্ষ নয়, সিরাজ-সমরখন্দের সঙ্গেও এর তুলনা হয় না, তবু মন নিমগ্ন হল অক্ষুণ্ণ অবকাশের মধ্যে। আমার গানে আমি বলেছি, আমি সুদূরের পিয়াসী। পরিচিত সংসার থেকে এখানে আমি সেই দূরত্বের দ্বারা বেষ্টিত হলুম, অভ্যাসের স্থূল-হস্তাবলেপ দূর হবামাত্র মুক্তি এল মনোরাজ্যে। এই আবহাওয়ায় আমার কাব্যরচনার একটা নতুন পর্ব আপনি প্রকাশ পেল।"

অর্ধশতাব্দীরও উর্ধ্বকাল (৫৩ বৎসর) পরে 'মানসী'কে স্মরণ করিতে গিয়া কবি গাজিপুরে প্রেয়সীসহবাসে রচিত কবিতাগুলিকেই কেন প্রাধান্য দিলেন বলিতে পারি না, কিন্তু আমরা দেখিতেছি 'মানসী'-প্রকাশের মাত্র সাত বৎসর পরে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে লেখা (১৮৯৮, ২৯ জানুয়ারি) একখানি পত্রে তিনি 'মানসী'র মর্মকথা এই ভাবে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন :

"...ভালো করে ভেবে দেখতে গেলে, মানসীর ভালোবাসার অংশটুকুই কাব্যকথা—বড়ো রকমের সুন্দর রকমের খেলা মাত্র—ওর আসল সত্যি কথাটুকু হচ্ছে এই যে, মানুষ কী চায় তা কিছু জানে না—এক ঘটি জল চায় কি আধখানা বেল চায় জিজ্ঞাসা করলে বলতে পারে না; আমি এমন অবস্থায় মনের সঙ্গে আপসে বোঝাপড়া করে কল্পনার কল্পবৃক্ষের মায়াফল পাড়বার চেষ্টা করছি।...... আমার ভালোবাসার লোক কই? আমি ভালোবাসি অনেককে—কিন্তু মানসীতে যাকে খাড়া করেছি সে মানসেই আছে, সে আর্টিস্টের হাতে রচিত ঈশ্বরের প্রথম অসম্পূর্ণ প্রতিমা। ক্রমে সম্পূর্ণ হবে কি?"

১২৯৪ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'ভারতী ও বালকে' প্রকাশিত "বিফল মিলন" কবিতার প্রথম স্তবকটি পড়িয়া এই মনের সঙ্গে বোঝাপড়ার সুর লক্ষ্য করিলাম। সুতরাং 'মানসী'র পাতা উলটাইয়া খুঁজিতে লাগিলাম। সূচীপত্রে

"বিফল মিলন" বলিয়া কোনও কবিতা নাই। ছন্দটা খুবই পরিচিত বোধ হইল। স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম ইহা 'মানসী'র তৃতীয় ও চতুর্থ কবিতা "বিরহানন্দ" ও "ক্ষণিক মিলনে"র ছন্দ—"ছিলাম নিশিদিন আশাহীন প্রবাসী"র হুবহু অনুরূপ ছন্দ। এই ছন্দ সে সময় এমনই নূতন যে কবিকে পরে গ্রন্থের ফুটনোটে লিখিতে হইয়াছে—"এই ছন্দে যে যে স্থানে ফাঁক, সেইখানে দীর্ঘ যতিঃপতন আবশ্যক।" কাজেই ভুল হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কবিতাটির পাঠে আর একটু অগ্রসর হইতেই দেখি—প্রথম দুই স্তবক বাদ দিলে "বিফল মিলন"ই "বিরহানন্দ"। শুধু "বিরহ-তপোবনে" স্থলে "বিরহ-মায়াবনে", "মনের যত কথা" স্থলে "বুকের যত কথা" এবং "দিবশ নিশি ধরে" স্থলে "দিবারজনী ধরে" জাতীয় দুই চারিটি শব্দের পার্থক্য আছে। কবিতাটির বারোটি স্তবক বা স্ট্যান্জা। শেষ দশ স্ট্যান্জাই "বিরহানন্দ।" সমগ্র কবিতাটি এই :

বিফল মিলন।

মিলন হল যদি
নিরবধি
কাঁদিয়া,
রাখিতে পারি না যে
হৃদি মাঝে
বাঁধিয়া!
প্রেমের ফুল-পাশে
মরে ত্রাসে
যে জনা,
কেমনে রাখি তারে
বারে বারে
সাধিয়া!
ফুটো না ফুল রাশি,
আর বাঁশি
বেজো না,
হেথা যে অমানিশি
দশ দিশি
আঁধিয়া!

যে জন চলিয়াছে
তারি পাছে
সবে ধায়!
নিখিলে যত প্রাণ
যত গান
ঘিরে তায়।
ধরার রূপ ভার
লুটে তার
চরণে,
ধায় গো উদাসিয়া
যত হিয়া
পায় পায়।
যে জন পড়ে থাকে
একা ডাকে
মরণে!
সুদূর হতে হাসি
আর বাঁশি
শোনা যায়!

ছিলাম নিশি দিন
আশাহীন
প্রবাসী,
বিরহ মায়াবনে
আনমনে
উদাসী।
আঁধারে আলো মিশে
দিশে দিশে
খেলিত;
অটবী বায়ুবশে
উঠিত সে
উছাসি।
কখনো ফুল দুট'
আঁখিপুট
মেলিত,
কখনো পাতা ঝরে
পড়িত রে
নিশাসি'।

তবু সে ছিনু ভালো
আধা-আলো-
আঁধারে,
গহন শত-ফের
বিষাদের
মাঝারে!
নয়নে কত ছায়া
কত মায়া
ভাসিত,
উদাস বায়ু সে ত
ডেকে যত
আমারে!
ভাবনা কত সাজে
হৃদিমাঝে
আসিত,
খেলাত অবিরত
কতশত
আকারে!

বিরহ-পরিপূত
ছায়া-যুত
শয়নে,
ঘুমের সাথে স্মৃতি
আসে নিতি
নয়নে।
কপোত দুটি ডাকে,
বসি শাখে,
মধুরে,
দিবস চ'লে যায়
গ'লে যায়
গগনে!
কোকিল কুহু তানে
ডেকে আনে
বধুরে,
নিবিড় শীতলতা
তরুলতা-
গহনে!

আকাশে চাহিতাম,
গাহিতাম
একাকী,
বুকের যত কথা,
ছিল সেথা
লেখা কি?
দিবা রজনী ধ'রে
ধ্যান ক'রে
তাহারে,
নীলিমা-পরপার
পাব তার
দেখা কি?

তটিনী অনুক্ষণ
ছোটে কোন্
পাথারে !
আমি যে গান গাই,
তারি ঠাঁই
শেখা কি ?

বিরহে তারি নাম
শুনিতাম
পবনে,
তাহারি সাথে থাকা
মেঘে ঢাকা
ভবনে।
পাতার মরমর,
কলেবর
হরষে ;
তাহারি পদধ্বনি
যেন গণি
কাননে।
মুকুল সুকুমার
যেন তার
পরশে ;
চাঁদের চোখে ক্ষুধা
তারি সুধা-
স্বপনে !

করুণা অনুক্ষণ
প্রাণমন
ভরিত,
ঝরিলে ফুলদল
চোখে জল
ঝরিত !
পবন হুহু ক'রে
করিতরে
হাহাকার,
ধরার তরে যেন
মোর প্রাণ
ঝুরিত !
হেরিলে দুখে শোকে
কারো চোখে
আঁখিধার

তোমারি আঁখি কেন
মনে যেন
পড়িত !

শিশুরে কোলে নিয়ে
জুড়াইয়ে
যেত বুক,
আকাশে বিকাশিত'
তোরি মত
স্নেহমুখ !
দেখিলে আঁখি-রাঙা
পাখা-ভাঙা
পাখীটি,
"আহাহা" ধ্বনি তোর
প্রাণে মোর
দিত দুখ !
মুছালে দুখনীর
দুখিনীর
আঁখিটি,
জাগিত মনে ত্বরা
দয়া-ভরা
তোর সুখ !

সারাটা দিনমান
রচি গান
কত না !
তোমারি পাশে রহি
যেন কহি
বেদনা।
কানন মরমরে
কত স্বরে
কহিত,
ধ্বনিত' যেন দিশে
তোমারি সে
রচনা।
সতত দূরে কাছে
আগে পাছে
বহিত
তোমারি যত কথা
পাতা লতা
ঝরণা।

তোমারে আঁকিতাম,
রাখিতাম
ধরিয়া।
বিরহ ছায়াতল
সুশীতল
করিয়া।
কখন দেখি যেন
ম্লান-হেন
মুখানি,
কখন আঁখি-পুটে
হাসি উঠে
ভরিয়া।
কখন সারারাত
ধরি হাত
দুখানি,
রহি গো বেশবাসে
কেশপাশে
মরিয়া !

বিরহ সুমধুর
হল দূর
কেন রে !
মিলন-দাবানলে
গেল জ্বলে
যেন রে !
কই সে দেবী কই
হের ওই
একাকার,
শ্মশান-বিলাসিনী
বিবাসিনী
বিহরে !
নাই গো দয়ামায়া,
স্নেহছায়া
নাহি আর,
সকলি করে ধুধু
প্রাণ শুধু
শিহরে !

এইখানেই কিন্তু "বিফল মিলন" ও "বিরহানন্দে"র মামলা মিটিল না। 'মানসী'র পরের কবিতা "ক্ষণিক মিলন"ও এই মামলায় জড়াইয়া গিয়াছে। এইটি একই ছন্দে চার স্তবকের কবিতা, কবিতার শেষে রচনার তারিখ দেওয়া আছে "৯ই ভাদ্র ১৮৮৯ [১২৯৬]" অর্থাৎ "বিফল মিলনে"র দুই বৎসর তিন মাস পরের তারিখ। অথচ দেখিতেছি ইহার তৃতীয় স্তবক "যে জন চলিয়াছে তারি পাছে সবে ধায়" ও "বিফল মিলনে"র দ্বিতীয় স্তবক প্রায় অভিন্ন। প্রথম দুইটি স্তবকও যে "বিফল মিলনে"র প্রথম দুইটি স্তবকেরই পরিবর্ধিত পুনর্লিখিত রূপ একটু লক্ষ্য করিলেই তাহা ধরা যায়। "বিফল মিলনে"র সহিত "ক্ষণিক মিলনে"র আশ্চর্য মিল দেখাইবার জন্য নীচে উহা উদ্ধৃত হইল।

ক্ষণিক মিলন

একদা এলোচুলে কোন্ ভুলে ভুলিয়া
আসিল সে আমার ভাঙা দ্বার খুলিয়া।
জ্যোৎস্না অনিমিখ, চারিদিক সুবিজন
চাহিল একবার আঁখি তার তুলিয়া।
দখিন বায়ুভরে থরথরে কাঁপে বন,
উঠিল প্রাণ মম তারি সম দুলিয়া।

আবার ধীরে ধীরে গেল ফিরে আলসে,
আমার সব হিয়া মাড়াইয়া গেল সে।

আমার যাহা ছিল সব নিল আপনায়,
হরিল আমাদের আকাশের আলো সে।
সহসা এ জগৎ ছায়াবৎ হয়ে যায়,
তাহারি চরণের শরণের লালসে।

যে জন চলিয়াছে তারি পাছে সবে ধায়,
নিখিলে যত প্রাণ যত গান ঘিরে তায়।
সকল রূপ-হার উপহার চরণে,
যায় গো উদাসিয়া যত হিয়া পায় পায়।
যে জন পড়ে থাকে একা ডাকে মরণে,
সুদূর হতে হাসি আর বাঁশি শোনা যায়।

শবদ নাহি আর, চারিধার প্রাণহীন,
কেবল ধুক্‌ধুক্‌ করে বুক নিশিদিন।
যেন গো ধ্বনি এই তারি সেই চরণের,
কেবলি বাজে শুনি, তাই গুণি দুই তিন।
কুড়ায়ে সব শেষ অবশেষ স্মরণের,
বসিয়া একজন আনমন উদাসীন।

৯ই ভাদ্র ১৮৮৯

একটি কবিতাংশ (ভাব ও ভাষাসহ) ব্যবহার করিয়া লওয়া দুই বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ কেন কবিতান্তরের জন্ম দিলেন এ রহস্য আজ আর সন্ধান করিয়া ভেদ করা যাইবে না। আমার মনে হয় "ক্ষণিক মিলনে"র সন-তারিখে ভুল আছে। "বিরহানন্দ" ও "ক্ষণিক মিলন" একই কালের রচনা। স্বর্গীয় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীপুলিনবিহারী সেন প্রভৃতি রবীন্দ্র-গবেষকগণ 'ভারতী ও বালকে' প্রকাশিত "বিফল মিলন" কবিতাটি লক্ষ্য করেন নাই। তাঁহারা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 'মানসী'র কবিতাগুলির নাম ও তারিখই ব্যবহার করিয়াছেন। ফলে "বিরহানন্দ" যে "বিফল মিলনে"ই গুপ্ত হইয়া আছে সে সংবাদ গুপ্তই থাকিয়া গিয়াছে।

প্রভাতকুমার 'মানসী'র অনেক স্তর-ভাগ করিয়াছেন—পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে বেদনাশ্রিত প্রথম স্তর, দার্জিলিঙে দ্বিতীয় স্তর, গাজিপুরে তৃতীয় স্তর। "বিফল মিলন" প্রথম স্তরের অন্তর্গত এবং এই স্তরের কবিতার বেদনার কথা কবি স্বয়ং "শান্তিনিকেতনে 'মানসী' অধ্যাপনাকালে কথিত 'মানসী' কাব্যপাঠের ভূমিকা"য় ('প্রবাসী', ১৩৪৭ আশ্বিন, পৃ. ৭৬৫-৬৮) এইভাবে বলিয়াছেন :

" 'মানসী'র প্রথম পাঁচ-ছয়টি কবিতা বেদনার কবিতা। এই কাব্য দুঃখের কথায় শুরু হ'ল কেন, এটি একটি তর্কের বিষয়। মানুষ তার রসসৃষ্টিতে, রচনাতে বড় স্থান দিয়েছে দুঃখকে, বেদনাকে। অ্যারিষ্টটল থেকে আরম্ভ ক'রে পৃথিবীর যত আলংকারিক তার কারণ নির্ণয় করতে চেষ্টা করেছেন অনেক প্রকারে। এ বিষয়ে আমার নিজের একটি মত আছে। আমরা নিজেকে অনুভব করতে চাই। নিখিল বিশ্ব যখন আমাকে স্পর্শ করে, তখন আমরা আপনাকে অনুভব করতে পাই, সুন্দরকে যখন দেখি তখন নিজেকে উপলব্ধি করি। এইরকমে আপনাকে যখন পাই, তখন আমরা খুশি হই।···

দুঃখের মধ্যে আমরা গভীরভাবে আপনাকে অনুভব করি। কিন্তু সংসারে বাস্তবক্ষেত্রে দুঃখের সঙ্গে ক্ষতি জড়িত থাকে। সাহিত্যে সেই নিত্য সম্বন্ধ নেই। যেমন কিং লীয়ারে রাজার মানসিক বিকৃতি, রামায়ণে সীতার কাহিনী। সেই কঠিন দুঃখের মধ্যে আপনাকে দেখতে পাই, কিন্তু ক্ষতির কোনো কারণ থাকে না, সম্পূর্ণ নিষ্কাম দুঃখ।···

মানসীর প্রথম দিকের কবিতাগুলিকে কোন্‌ শ্রেণীতে ফেলা উচিত বলা কঠিন। তাতে কবির হৃদয়ের আবেগ রয়েছে ; কিন্তু কবিতার শেষ কথা তো তা নয়। হৃদয়ের আবেগ কবিতার উপকরণ বা মশলার মতন, সেই সব উপকরণ থেকে সৃষ্টি হয় সৌন্দর্যের, সেই সৌন্দর্যসৃষ্টি সুচারুরূপে সম্পন্ন করলে কবি তখন ভুলে যান তুচ্ছ দিকের কথা। তখন সেই আবেগকে উপলক্ষ্য ক'রে মনের বেদনার ভিত্তিভূমিতে সৃষ্টি করতে চান শিল্পকুশলতায় সুন্দরকে। অর্থাৎ তিনি শিল্পরচনা করেন যাতে তাঁর সুখদুঃখ, সাময়িক আবিলতামুক্ত হয়ে চিরন্তনের বুকে গেঁথে যায় নির্মাল্যে। এই শিল্পসৃষ্টিকে গৌণভাবে বলতে পারা যায় অটোবায়গ্রাফি, কিন্তু মুখ্যভাবে তা হচ্ছে আপনার রচনাকে আপনার সৃষ্টিকে চিরস্থায়ী করবার আগ্রহ।

মানসীর গোড়ার কবিতা হচ্ছে সেই ভাবের আলপনা। ছন্দের দিকে দৃষ্টি দিলে বোঝা যায়। তার আগে বাংলা কবিতায় এ-সব ছন্দের আমদানি হয় নি। বাংলা কাব্য পয়ার আর ত্রিপদীতেই সীমাবদ্ধ ছিল। ক্রমে যুক্ত অক্ষরকে কবিতার মধ্যে আহ্বান ক'রে, তার ধ্বনির পূর্ণ মূল্য দেওয়া হ'ল।"

এই ভূমিকার পরিশিষ্টে কবি যে কথা বলিয়াছেন তাহাই 'মানসী'র গোড়ার কবিতাগুলি সম্পর্কে সর্বাধিক স্মরণীয় :

"কাব্যে যে বেদনা ফুটে ওঠে সে-বেদনা ব্যক্তিগত নয়।···মানসীর প্রথম দিকের অনেক কবিতায় মনে হবে আত্মজীবনের প্রেরণা আছে, সে-কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়।"

সত্য যে নয় তাহার প্রমাণ কবিতাগুলিতেই আছে। কবি পার্ক স্ট্রীটের বাসায় আছেন। অপরাহ্নে কাল-

বৈশাখীর মাতন শুরু হইয়াছে। ব্যক্তিগত বিরহ-বেদনার প্রকাশ এই অবস্থায় অস্বাভাবিক নয় কিন্তু কবি আপন চিত্তকে উদার এবং বিস্তার করিয়া নিখিল-বিরহীজনের বেদনা অনুভব করিতেছেন :

"বৃষ্টি-ঘেরা চারিধার, ঘনশ্যাম অন্ধকার,
ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দ, আর ঝরঝর পাতা।
থেকে থেকে ক্ষণে ক্ষণে গুরু গুরু গরজনে
মেঘদূত পড়ে মনে আষাঢ়ের গাথা।
পড়ে মনে বরিষার বৃন্দাবন অভিসার,
একাকিনী রাধিকার চকিত চরণ।
শ্যামল তমালতল, নীল যমুনার জল,
আর, দুটি ছল ছল নলিন নয়ন।
এ ভরা বাদর দিনে কে বাঁচিবে শ্যাম বিনে,
কাননের পথ চিনে' মন যেতে চায়।
বিজন যমুনা কূলে বিকশিত নীপমূলে
কাঁদিয়া পরাণ বুলে বিরহ ব্যথায়।"

"বিফল মিলন" বা "বিরহানন্দে" মিলন-দাবানলে সুমধুর বিরহ জ্বলিয়া যাইবার বেদনা শ্মশান-বিলাসিনী বিবসনা কালীকেই স্মরণ করাইয়া দিতেছে :

"বিরহ সুমধুর হ'ল দূর কেন রে ?
মিলন দাবানলে গেল জ্বলে যেন রে !
কই সে দেবী কই, হের ওই একাকার,
শ্মশান-বিলাসিনী বিবাসিনী বিহরে।"

ব্যক্তিগত বিরহ-বেদনাও যে আছে তাহার প্রমাণ—

"বিরহে তারি নাম শুনিতাম পবনে,
তাহারি সাথে থাকা মেঘে ঢাকা ভবনে।"

কবির স্মৃতি-কথায় আছে—"[দ্বিতীয়বার] বিলাত-যাত্রার আরম্ভপথ হইতে যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন জ্যোতিদাদা চন্দননগরে গঙ্গাধারের [মোরান সাহেবের] বাগানে বাস করিতেছিলেন ; আমি তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।...বাড়ির সর্বোচ্চতলে চারিদিক-খোলা একটি গোল ঘর ছিল। সেইখানে আমার কবিতা লিখিবার জায়গা করিয়া লইয়াছিলাম। সেখানে বসিলে ঘনগাছের মাথাগুলি ও খোলা আকাশ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়িত না। তখনো সন্ধ্যাসঙ্গীতের পালা চলিতেছে ; এই ঘরের প্রতি লক্ষ করিয়াই লিখিয়াছিলাম—

অনন্ত এ আকাশের কোলে
টলমল মেঘের মাঝার
এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর
তোর তরে কবিতা আমার।"

"বিফল মিলনে" আছে—

"বিরহ-পরিপূত ছায়াযুত শয়নে
ঘুমের সাথে স্মৃতি আসে নিতি নয়নে।
কপোত দুটি ডাকে বসি শাখে মধুরে,
দিবস চলে যায় গলে যায় গগনে।"

স্মৃতি-কথায় পাই—

"আমার গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গ করা পূর্ণ বিকশিত পদ্মফুলের মতো একটি একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কখনো বা ঘনঘোর বর্ষার দিনে হারমোনিয়ম যন্ত্র-যোগে বিদ্যাপতির 'ভরাবাদর মাহভাদর' পদটি গানের মতো সুর বসাইয়া বর্ষার রাগিণী গাহিতে গাহিতে বৃষ্টিপাত মুখরিত জলধারাচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন খ্যাপার মতো কাটাইয়া দিতাম ; কখনো বা সূর্যাস্তের সময় আমরা নৌকা লইয়া বাহির হইয়া পড়িতাম, জ্যোতিদাদা বেহালা বাজাইতেন, আমি গান গাহিতাম ; পূরবী রাগিণী হইতে আরম্ভ করিয়া যখন বেহাগে গিয়া পৌঁছিতাম তখন পশ্চিমতটের আকাশে সোনার খেলনার কারখানা একেবারে নিঃশেষে দেউলে হইয়া গিয়া পূর্ব-বনান্ত হইতে চাঁদ উঠিয়া আসিত।"

কবি 'জীবন-স্মৃতি'র শেষ পরিচ্ছেদে 'মানসী'র "ভুলে"-"ভুলভাঙা"-"বিফল মিলনে"র বেদনা-মুক্তির প্রয়াসের কথা বলিয়া এই ভাবে জীবন-নাট্যের প্রথম পালাভিনয়ের কাহিনী সাঙ্গ করিয়াছেন :

"আমি আমার সেই ভৃত্যের আঁকা খড়ির গণ্ডির মধ্যে বসিয়া মনে মনে উদার পৃথিবীর উন্মুক্ত খেলাঘরটিকে যেমন করিয়া কামনা করিয়াছি, যৌবনের দিনেও আমার নিভৃত হৃদয় তেমনি বেদনার সঙ্গেই মানুষের বিরাট হৃদয়লোকের দিকে হাত বাড়াইয়াছে। সে যে দুর্লভ, সে যে দুর্গম, দূরবর্তী। কিন্তু তাহার সঙ্গে প্রাণের যোগ না যদি বাঁধিতে পারি, সেখান হইতে হাওয়া যদি না আসে, স্রোত যদি না বহে, পথিকের অব্যাহত আনাগোনা যদি না চলে, তবে যাহা জীর্ণ পুরাতন তাহাই নূতনের পথ জুড়িয়া পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে মৃত্যুর ভস্মাবশেষ কেহ সরাইয়া লয় না, তাহা কেবলই জীবনের উপর চাপিয়া পড়িয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।"

কবির জীবন-দেবতা এই চরম দুর্ভাগ্য হইতে আধুনিক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবিকে রক্ষা করিয়াছেন। "বিফল মিলন" "ক্ষণিক মিলনে"র ব্যক্তিগত বিরহ-বেদনা অতিক্রম করিয়া স্রষ্টা ও শিল্পী "ঈশ্বরের প্রথম অসম্পূর্ণ প্রতিমা" সার্থক-ভাবে, সুন্দর ভাবে সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছেন।

পাথরে প্রাণ

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

গল্পটা যদি ওইখানেই শেষ হত তো চুকে যেত ল্যাঠা।

যে মেয়ের বিয়ের জন্যে এত, সেই মেয়ে আবার বাড়িতে ফিরে এল। নটেগাছটি মুড়লো।

কিন্তু এ নটেগাছ মুড়োবার নয়।

তাই দিন-সাতেক পরেই একদিন সন্ধ্যায় বহুকালের পুরনো মডেলের একটি বনেদী ফোর্ডগাড়ি খুব আওয়াজ করতে করতে আর টলতে টলতে এসে দাঁড়াল বাসুদেবের বাড়ির সামনে।

গাড়ির মতই টলতে টলতে গাড়ি থেকে নামল গাড়ির মনিব। জন্তু-জানোয়ার-মার্কা বুশ-সার্ট-পরা খিদিরপুরের সেই ছোকরা। বাসুদেবের জামাই। লিলির স্বামী।

প্রথমে এসেই গড় হয়ে প্রণাম করল শ্বশুরকে। বলল, পেন্নাম! কোথায়? আমার শাশুড়ীঠাকরুণ কোথায়?

ঘরে ঢুকেই দেখল শাশুড়ী দাঁড়িয়ে। পরিতোষের তখন হেঁচ্‌কি উঠছে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না।

ইঁটের উপর বসানো তক্তাপোশ একদিকে, আর একদিকে রাজ্যের যত লোহালক্কড়, মোটরগাড়ির ভাঙা পার্টস্‌. তারই গায়ে ঠোক্কর খেয়ে কোনরকমে দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে রইল পরিতোষ।

জামাইয়ের এ রূপ শাশুড়ী এই প্রথম দেখল। বিয়ের পর প্রথম জামাই এসেছে বাড়িতে, এ ঘরে বসানো চলে না। বসাতে হলে ভেতরের দিকে লিলির ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাতে হয়। অথচ জামাইকে ধরে ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে না গেলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে মরবে। নিজের হাতে জামাইকে ধরে নিয়ে যাওয়াটা ভাল দেখায় না। অনন্ত এখনও কাজ থেকে ফেরে নি। কি করবে তাই ভাবছে। এমন সময় লিলি এসে দাঁড়াল। লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে নিজেই সে এগিয়ে গিয়ে পরিতোষের হাত ধরে বলল, এস, ভেতরের ঘরে বসবে এস।

পরিতোষ কিছুতেই যাবে না। বলে, বসব কেন? বসবার জন্যে আমি আসি নি। আমি এসেছি তোমাকে নিয়ে যেতে। মা, আমি আপনার মেয়েকে এক্ষুনি নিয়ে যাব। গাড়ি নিয়ে এসেছি।

পাশের বাড়ির লোকজনের নজরে পড়ে যাবে, কেলেঙ্কারির আর বাকী কিছু থাকবে না, এই ভেবে লিলি তাকে একরকম জোর করে টানতে টানতে তার নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। মাকে বলল, মা, তুমি এস।

পরিতোষ বলল, মাকে ডাকছ কেন ডার্লিং?

চুপ কর বলছি, ইতরোমি করো না।

লিলি তাকে থামিয়ে দিয়ে মাকে ঘরে ঢুকিয়েই ঘরের খিলটা দিল বন্ধ করে। বউদিদিকে তার সবচেয়ে বেশী লজ্জা।

লিলি বলল, এই দেখো মা, তোমার জামাই দেখো। মদ খেয়ে রোজ এমনি কেলেঙ্কারি করে। বাড়িতে রাত্রিবাস করে না।

পরিতোষ বলল, মার সামনে আমাকে অপমান করতে চাও?

লিলি বলল, তোমার মা আমাকে কম অপমান করে নি। অপমান করে বাড়ির সরকারকে সঙ্গে দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে বাড়ি থেকে।

পরিতোষ বলল, তুমি এলে কেন? আচ্ছা, আপনিই বলুন তো মা, ও এল কেন? ও যদি বলত হাম্‌ নাহি যায়েঙ্গা, তা হলে আমার মায়ের ফাদার্স ফাদার ওকে তাড়াতে পারত?

লিলির মা বলল, না বাবা, তোমার মায়েরই বা দোষ দিই কেমন করে বল। কিন্তু বাবা, তুমি বিশ্বাস কর, গিলটির গয়না আমরা জেনেশুনে দিই নি। আমরা ঠকে গেছি আর এক জায়গা থেকে।

জামাই বলল, পুলিস-কেস করে দিন—জেল হয়ে যাবে। শ্বশুরমশাই না পারেন, আমাকে নাম-ঠিকানা দিয়ে দেবেন। আমি সব ম্যানেজ করে দেব।

শাশুড়ী বলল, এখন আর তার পথ নেই বাবা, আমার ছেলে দিয়েছে সে পথ বন্ধ করে।

তা হলে গুলি মারুন।—পরিতোষ বলল, আপনার মেয়ের গয়নার অভাব নেই মা। বন্ধকী গয়নাই আছে একটি সিন্দুক ঠাসা। সব তামাদি হয়ে গেছে। তা ছাড়া মায়ের সব ভারি ভারি সোনার গয়না—ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে নতুন করে গড়িয়ে নিক না আপনার মেয়ে যত খুশি। চল, কালকেই আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।

এই বলে লিলির দিকে তাকিয়ে পরিতোষ বলল, নাও, আর দাঁড়িয়ে থেকো না। হারি আপ্‌। আমার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

শাশুড়ী বলল, আজকেই যাবে বাবা? আমার কত

ভাগ্যি তুমি এসেছ আমার বাড়িতে। আজকের রাতটা এইখানে থেকে গেলে হত না?

পরিতোষ বলল, না মা, আজকে আমাদের ছেড়ে দিন। আর একদিন বরং আমরা তুজনে এসে এই বাড়িতে রাত কাটিয়ে যাব। লিলি, আর দেরি করো না।

লিলি বলল, বেশ, তবে আজ তুমি মায়ের কাছে বলে যাও কাল থেকে আর ওরকম করে মদ খাবে না।

এই দেখো, কী সব বাজে কথা আরম্ভ করলে মায়ের সামনে! মদ আমি খাই?

লিলি বলল, না, খাও না? আজ কি খেয়েছ?

পরিতোষ বলল, এটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের ফ্যামিলির একটা ইয়ে। আমার বাপ-ঠাকুরদা বলত— যাক্‌গে, সে-সব অনেক কথা। তোমাকে বলব সব।

এই বলে কথাটাকে এড়িয়ে যেতে চাইল পরিতোষ।

লিলি কিন্তু সহজে ছাড়ল না। বলল, বেশ, তবে এই কথা রইল—এবার যেদিন সন্ধ্যেবেলা বাড়ি থাকবে না সেইদিনই আমি চলে আসব এইখানে।

পরিতোষ তাতেই রাজী হয়ে গেল। বলল, তাই হবে। চল।

সত্যি-সত্যিই যাবার জন্য তৈরি হল লিলি।

সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিল না পরিতোষ, তবু যাবার সময় জেদ ধরে বসল—নতুন বউদিদিকে একটি প্রণাম না করে সে যাবে না।

লিলির হল বিপদ। ধরে ধরে নিয়ে যাওয়া চলে না। তাই বলল, থাক্‌, আর একদিন এসে প্রণাম করে যেয়ো।

কিন্তু মাতালের জেদ। যা ধরবে, তা সে করবেই।

অগত্যা লিলিই তার নতুন বউদিকে ডেকে নিয়ে এল তার সেই ছোট্ট ঘরের ভেতর।

মিনতি আসতেই পরিতোষ একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার পায়ের কাছে।

গুডমর্নিং নতুন বউদি, বিয়ের হাঙ্গামায় তোমাকে ভাল করে আমার দেখাই হয় নি।

বসে পড়ে আর উঠতে পারছিল না পরিতোষ। লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে লিলি দিল হাত বাড়িয়ে। ধরে ধরে তুলে তাকে আবার খাটের ওপর বসিয়ে দিয়ে বলল, তোমার শরীর খারাপ, তবু কেন যে এ রকম করে ঘুরে বেড়াচ্ছ জানি না।

শরীর খারাপ? কোন্‌ শালা বলে আমার শরীর খারাপ?

এই বলে লিলিকে একেবারে চরম অপ্রস্তুত করে দিয়ে পরিতোষ বলল, লণ্ঠনটা তুলে ধর না—বউদির চেহারাটা দেখি ভাল করে।

লিলি বলল, ভাল করে দেখতে হবে না। চল।

মিনতি বলল, ভাল করে দেখবার মত মেয়ে আমি নই ভাই। ঠাকুরঝিকে ভাল করে দেখ তা হলেই আমরা খুশী হব।

ভেরি গুড, ভেরি গুড!—বলতে বলতে চোখ মিট মিট করে পরিতোষ তখন তার আপাদমস্তক বেশ ভাল করেই দেখে নিয়েছে। গায়ের রঙ তার কালো, তার ওপর লণ্ঠনের আলোটাও তেমন জোর ছিল না, তাই বোধ করি পরিতোষের প্রণাম-নিবেদন খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। লিলির দিকে তাকিয়ে বলল, ঠাকুরঝি, চল।

এই বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে হাসতে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল পরিতোষ।

মেয়ে-জামাই বিদায় হয়ে গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল লিলির মা।

দোরের কাছে ঠায় বসে ছিল বাসুদেব।

লিলির মা এসে বলল, জামাইটে ভাল হয়েছে।

বাসুদেব বলল, কিন্তু দেখে মনে হল খুব মদ খায়।

তা খাক। তুমি খাও না?

বাসুদেব বলল, আমরা ফিটার মিস্ত্রি। আমাদের একটু-আধটু না খেলে চলে না।

লিলির মা বলল, জামাইও বড়লোকের ছেলে। ওদেরও খেতে দোষ নেই।

বাসুদেবের মুখে একটুখানি হাসি দেখা গেল। বলল, মাতালরা লোক ভাল হয়।

সবাই হয় না।

লিলির মা বলল, এই যেমন তুমি। তুমি তো ভাল হলে না?

বাসুদেব দপ করে জ্বলে উঠল: আমি লোক খারাপ? আবার সেই কথা?

বাসুদেবের চিরকালের ধারণা—লোক সে খুব ভাল। তাই কেউ যদি তাকে খারাপ লোক বলে তো সে চটে আগুন হয়ে ওঠে।

লিলির মা ভয়ে ভয়ে বলল, না না, লোক তুমি ভাল। এইবার সবই যখন চুকে গেল, তখন যাও একবার সেই পাঁচু মিস্ত্রির কাছে। গিল্‌টির গয়নার একটা ফয়সালা কর।

বাসুদেব বলল, নিশ্চয়ই যাব। আজ তো হবে না। কাল যাব।

পরের দিন বাসুদেব সত্যি সত্যিই পাঁচুর কাছে যাবার

জন্য তৈরি হয়েছিল। বেলা তখন বোধ করি দুটো। চারিদিকে রোদ্দুর ঝাঁ ঝাঁ করছে। আর ঠিক সেই সময়েই একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে পাঁচু মিস্ত্রি নিজেই তার বাড়িতে এসে হাজির।

পান খেয়ে কালো কালো ঠোঁট দুটি লাল করে নিয়ে একটা সিগারেট টানতে টানতে পাঁচু এসেই থপ্ করে বসে পড়ল ঘরের চৌকাঠের ওপর।

বাসুদেব বলল, তোমারই কাছে যাচ্ছিলাম।

আমার সৌভাগ্য। তা যাওয়াটা হল না কেন?

এই যে, তুমি এসে গেলে!

পাঁচু বলল, হ্যাঁ, এলাম। এইদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম বাসুদেবকে একবার দেখে যাই। তোমার আর ছেলেমেয়ে আছে?

বাসুদেব বলল, না।—বলেই হেসে ফেলল।

পাঁচুর কিন্তু নজর এড়াল না। বেলা দুটোর সময় মদ সে খেয়েছে প্রচুর। ভুর ভুর করে দিশী মদের গন্ধ বেরুচ্ছে তার মুখ দিয়ে। কিন্তু কথা শুনে বোঝবার উপায় নেই। বলল, হাসলি যে?

তুমি কি আজকাল বিয়ের ঘটকালিই করছ নাকি?

পাঁচু বলল, হ্যাঁ, করছি। এতে লাভ আছে।

বাসুদেব বলল, সেটা আমি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।

পাঁচু একটু চাঙ্গা হয়ে ভাল করে চেপে বসল। পোড়া সিগারেটটা ফেলে দিয়ে আবার একটা নতুন সিগারেট ধরাল। জিজ্ঞাসা করল, কি রকম? হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিস্ কেন বললি বল্?

বাসুদেব বলল, ছেলের বিয়ে দিলাম। কালো বউ ঘরে আনলাম শুধু সোনার গয়নার লোভে। সেই গয়না দিয়ে মেয়ে পার করলাম। তুমি তো সবই জান। কিন্তু গয়নাগুলো সব গিল্‌টি। মেয়েকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

জামাই এসে মেয়েকে আবার যে নিয়ে গেছে সে কথাটা সে চেপে গেল। বলল না।

পাঁচু জিজ্ঞাসা করল, কে তাড়িয়ে দিয়েছে? জামাই?

বাসুদেব বলল, না। জামাইয়ের মা।

পাঁচু অবলীলাক্রমে বলে বসল, আবার নিয়ে যাবে। তোমার মেয়েকে আমি দেখেছি। তোমার জামাইকেও আমি চিনি। পরিতোষ ঠিক কুকুরের মত ঘুরে বেড়াবে তোমার মেয়ের পিছু পিছু। বাগাতে যদি পার তো বুড়ো বয়েসে নিজের সংসারের ভাবনাটাও আর ভাবতে হবে না। যাক, ওর জন্যে ভাবি না। এবার ছেলে-বউয়ের খবর বল। বউটাকে তুমিও তাড়িয়ে দিয়েছ নাকি?

বাসুদেব বলল, দেওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু আমার ছেলে অনন্ত ছাড়ল না মেয়েটাকে। মেয়েটাও গেল না।

পাঁচু বলল, যাবে না জানি।

বাসুদেব বলল, তুমি জান?

হ্যাঁ রে বাবা জানি, জানি। আমাদের ছেলেমেয়েরা সব কুত্তার বাচ্চা। মন-টনের ধার ধারে না। একটা দেহ হলেই হল। আর সেই জন্যেই এই বিজ্‌নেস্‌টা ধরেছি।

সোনার গয়না বলে তাই গিলটির গয়না দেবে?

পাঁচু বলল, তোমার ছেলেটি যে গিলটি বাসুদেব, সেদিকে একবার তাকাও।

বল কি পাঁচু? আমার ছেলে রাজপুত্রের মত দেখতে।

ওই দেখতেই শুধু।—পাঁচু বলল, ঘড়ির দোকানে মাইনে পায় তো মাসে চল্লিশটি টাকা। গিল্‌টি নয় তো কী? ও যে কাপড় পেয়েছে, জামা পেয়েছে, জুতো পেয়েছে, আংটি পেয়েছে, ঘড়ি পেয়েছে, তার ওপর এক হাজার টাকা পেয়েছে—এইটেই যথেষ্ট।

বাসুদেব বলল, সেই হাজার টাকা থেকে তো তুমি নিয়েছ দুশো টাকা।

আর ওদের কাছ থেকে নিয়েছি পাঁচশো টাকা।

বাসুদেব সে কথা জানত না। কথাটা শুনে অবাক হয়ে গেল। বলল, তা হলে তুমি জানতে গয়নাগুলো সব গিল্‌টির?

অম্লান বদনে পাঁচু বলে বসল, নিশ্চয়ই জানতাম।

বাসুদেব রেগে উঠল।

এ ষড়যন্ত্র তা হলে তুমিই করেছিলে?

আমি ষড়যন্ত্র করি নি বাসু, ষড়যন্ত্র যদি কেউ করে থাকে তো করেছে ভগবান।

এই বলে বাসুদেবের পিঠ চাপড়ে পাঁচু বলল, রাগ করিস নি। তুই সারাজীবন চুরি জোচ্চুরি করলি, মানুষকে ঠকালি, বউকে ঠ্যাঙালি, তারপর বুড়ো বয়সে ভেবেছিলি, ছেলের বউয়ের গয়না বেচে বেচে তোফা আরামে বসে বসে খাবি—সেইটি আর হতে দিলে না। দেখ্, আজকাল যে-লোকটা ভগবানগিরি করছে, তার হাতটা তেমন দরাজ নয়। একটু টিপে টিপে পয়সাকড়ি ছাড়ছে আমাদের মতন চোর-জোচ্চোরদের হাতে।

পাঁচু আবার একটা সিগারেট ধরাল। বলল, সব ঠিক হয়ে যাবে বাসু, ভাবিস নি। এবার চল্ একবার কাশী যাই দুজনে। একটু পুণ্যি করে আসি।

এই বলে মনের আনন্দে জোরে সিগারেটটা টেনে টেনে পাঁচু খুব ধোঁয়া বের করতে লাগল।

হুজুগ ও যুগ

(১৯২০—১৯৬০)

গণপতি রায়

"এ কথা আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে, এটা আণবিক বিজ্ঞানের যুগ, জেট-টেলিভিশনের যুগ; আমাদের ভাবধারাকে এদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে—নতুবা ধ্বংস অনিবার্য।"

গত দশ বছরের মধ্যে এমন একখণ্ড সংবাদপত্র, এমন একটি বক্তৃতা আমি উল্লেখ করতে অক্ষম, যার মধ্যে উল্লিখিত সাবধান-বাণী কোনও না কোনভাবে প্রচারিত হয়েছে। অপাঙ্‌ক্তেয় বার্ষিক 'নবারুণ' (প্রচার-সংখ্যা দুইখানি, হাতে লেখা কিনা তাই!) থেকে শুরু করে বহুল-প্রচারিত নিউ-ইয়র্ক-টাইম্‌স্ (২০০০০০ দৈনিক), আইসেনহাওয়ার থেকে পরমপূজ্য দালাই-লামা, বার্ট্রাণ্ড রাসেল থেকে লেখকাধম পর্যন্ত সর্বত্র ওই একই বাঁধা বুলি—সেই বহু-জৃম্ভিত যুগ-প্রশস্তি।

অগত্যা একদিন "ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্, ত্বগস্থি মাংসম্ প্রলয়ঞ্চ যাতু" বলতে বলতে ভাবতে বসলুম। তাবে বাড়া তাবে বাড়া সমস্ত যুগ-নায়ক যখন পরম গম্ভীরভাবে ওই একই সাবধান-বাণী একই সুরে প্রচার করছেন দশ-দশটা বছর ধরে তখন আমিই বা কোন্ লাটের জামাই যে ব্যাপারটা একটি দিন ভাবতেও পারব না। তা ছাড়া সবজান্তা মিত্র-মহলে ঠাঁই পাব না জগতের হাল-চালে ওয়াকিবহাল না হলে। ভাবনার উপকরণ ছিল দশ বছরের পুরনো ডায়েরী, পনের বছরের 'শনিবারের চিঠি', কুড়ি বছরের 'বসুমতী'র বার্ষিক এক খণ্ড, এবং আমার অক্ষয় স্মৃতি। গৌতম বুদ্ধের মত আমায় কৃচ্ছ সাধন করতে হয় নি, সে দুর্ভোগ থেকে অব্যাহতি পেয়েছি পূর্বোল্লিখিত সাহিত্য-সম্পাদনার কৃপায়। বুদ্ধদেব এত ভেবে-চিন্তে পেয়েছিলেন নির্বাণ—তথা শূন্য, আমিও পেয়েছি "হুজুগ" অর্থাৎ শূন্য। বুদ্ধদেবের আবিষ্কার মোটেই মৌলিক নয়, এমন একটি কথাও তিনি বলেন নি যা উপনিষদে আগে ছিল না। আমি যা বলতে চলেছি সেই ঘটনাগুলো সকলেরই জানা আছে। জানা যা নেই, তাই বলাটাই আমার কৃতিত্ব। সে ওই হুজুগ।

আমার সঞ্চয়িত দিনগত-ভাবপঞ্জী পুনঃপুনঃ পর্যালোচনা করার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, বিংশ শতাব্দীর শিল্প ও বিজ্ঞান-সাধনা মানুষ ও সভ্যতাকে উন্নতির পথে এক ইঞ্চিও এগিয়ে দেয় নি, এবং এই সমুদয় গাল-ভরা বিশেষণগুলি নিছকই মনুষ্যত্বের দৈন্য ঢাকবার হাস্যকর প্রয়াসমাত্র। সুযোগ-সন্ধানী কূট-নীতিকের হুজুগ-সৃষ্টি জনমতকে বিভ্রান্ত করার জন্য। আণব-উদ্‌যান শক্তির অনুশীলন, মহাশূন্য পরিক্রমণ প্রভৃতি এই হুজুগেরই এক একটি অধ্যায় মাত্র। সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে ওদের দাম এক কানাকড়িও নয়। তবু যে আমরা আকাশ ফাটিয়ে অগ্রগতির জয় ঘোষণা করি, তার কারণ আর কিছুই নয়—এই হুজুগে-প্রচারে আমাদের স্বাধীন বিচারবুদ্ধি বিপর্যস্ত হয়েছে। আমরা আজ কূটনীতিকের হাতের দড়ির পুতুল। তাঁর অঙ্গুলী-সঞ্চালনে, তাঁরই ইচ্ছায় আমরা হাসি কাঁদি নাচি গাই। তাঁর ইচ্ছায় আমরা বাঁচি এবং তাঁরই কটাক্ষপাতে মরি।

হুজুগগুলি যে কূটনীতিকের সৃষ্ট, এবং এর প্রচারমূল্যে আমরা আমাদের স্বাধীন বিচারবুদ্ধিকে বিকিয়ে দিয়েছি, তা কয়েকটি মাত্র হুজুগের ইতিহাস পড়লে জানা যাবে। তার আগে হুজুগের স্বরূপ ও তার সঙ্গে কূটনীতিকের সম্বন্ধটা পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। (১) একান্তই ব্যক্তিগত ঘটনা, বা (২) নিছক সামান্য গুরুত্বহীন সাধারণ কোনও ঘটনাকে উপলক্ষ করে যখন একটি জাতি বা দেশ সাময়িক এক ভাব-তরঙ্গে ভাসে, স্নায়ু-উত্তেজক কোনও আন্দোলনে মাতে, তখন সেই তথাকথিত আন্দোলনকেই হুজুগ বলা যায়। এর বিশেষ লক্ষণ এই যে, উক্ত আন্দোলনের সপক্ষে কোনও উপযোগিতামূলক যুক্তি থাকে না, এবং পরিণামেও কোন স্থায়ী কল্যাণ সাধিত

হয় না। আমেরিকায় আকাশ-ছোঁয়া কোনও প্রাসাদের একপাশে অগণিত নর-নারীর ভিড়। ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়। এক অষ্টাদশী কিশোরী জলের পাইপ বেয়ে একশো-তলা বাড়ির ছাদে ওঠবার চেষ্টা করছে। সবে চার-তলা ছাড়িয়েছে, এতেই হাঁসফাঁস করছে। উৎসুক দর্শকেরা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছেন—কতক্ষণে মেয়েটি পড়বে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা টাটাচ্ছে, উপর দিকে এক-নাগাড়ে তাকিয়ে থেকে চোখ জ্বালা করছে, ঘাড় টনটন করছে—তবু এই হুজুগ ছেড়ে এক পা-ও কেউ নড়বেন না। ইতিমধ্যে রঙ্গস্থলে একদল কর্মীর আবির্ভাব। হাতে ঝুলছে শতখানেক বাইনাকুলার ও ফোল্ডিং টুল। কোনও বিখ্যাত এস. অ্যাণ্ড এস. কোম্পানির কর্মচারী এঁরা। উপস্থিত জনতা আগ্রহসহকারে অনুগ্রহ করলেন—এক একটি বাইনাকুলার ও মোড়া ঘণ্টা পিছু পঞ্চাশ সেণ্ট হিসাবে ভাড়া নিয়ে। সর্বসমেত এক লক্ষ বাইনাকুলার বিতরিত হল। পাঁচ ঘণ্টার প্রহসনে কোম্পানির আয় হল ৩০০০০০ ডলার। খবর নিলে জানা যাবে ছাদ-অভিযাত্রী কন্যাটি এই কোম্পানি কর্তৃক নিয়োজিত।

উল্লিখিত দৃষ্টান্তে চতুর ব্যবসায়ীর মানবচরিত্র বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান, এবং সেই জ্ঞানকে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত করার অভিনব উপায়-উদ্ভাবনী বুদ্ধি যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। দৃষ্টান্তটি একটি মামুলী ছোট হুজুগের। দেশব্যাপী বড় হুজুগও ঠিক ওই রকমই। শুধু স্থান ও কাল কিছু ব্যাপক বিস্তৃত।

প্রতিটি জাতির মধ্যে সময়ে সময়ে এক একটি ভাব-তরঙ্গ আসে, জাতিকে আপাদমস্তক একটি প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে মিলিয়ে যায় ঘটনা-প্রবাহে নবতর তরঙ্গের অবকাশ দিয়ে। ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা, সুজাতা সরকারের মৃত্যুরহস্য বা বাণী মিত্রের জবানবন্দী একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার, তুচ্ছাদপিতুচ্ছ ঘটনা মাত্র; কিন্তু সেদিন আসমুদ্রহিমাচল অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছে সংবাদ-পত্রের, তুফান উঠিয়েছে চায়ের পেয়ালায়। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে সেনাপতি গান্ধীজীর সময়োপযোগী নির্দেশ কাগজে যথেষ্ট মর্যাদা পায় নি, কিন্তু স্তম্ভের পর স্তম্ভ জুড়ে পাতার পর পাতা ভরে এই সকল মামলার ধারা-বিবরণী প্রকাশে স্থানাভাব ঘটে নি। জনমতের মানদণ্ডে সেদিন নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছিল যে নিছক ব্যক্তিগত ঘটনা তথা হুজুগের দাম স্বাধীনতার চেয়ে কম নয়।

জন-চিত্তের এহেন রিক্ততা শুধুমাত্র ভারতেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। আমেরিকার কেণ্টাকী গুহায় স্বেচ্ছায় অবরুদ্ধ ফ্রয়েড কলিন্সের মৃত্যু-অভিযান, ১৯২৪ সনে ক্রশওয়ার্ড পাজ্‌ল্, ১৯২৭ সনে লিণ্ডবার্গের বিমানে না থেমে আটলাণ্টিক পাড়ি—সমস্ত বিশ্ববাসীর রুদ্ধশ্বাস মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। সবচেয়ে নাড়া দিয়েছিল টেনেসীর ডে-টন শহরের একটি বিচার-প্রহসন। ব্যাপারটা ব্যক্তিগত হলেও বস্তুতঃ ধর্ম বনাম বিজ্ঞানের যুদ্ধে পরিণতি লাভ করেছিল। আলোচ্য বিষয়ের প্রামাণ্য নজীর বিধায় ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন।

প্রথম মহাসমরের প্রয়োজনে বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। বিশেষতঃ ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞান ইতিমধ্যেই শিক্ষিত জন-চিত্তে ধর্মবিশ্বাসের মূলকে শিথিল করে দিয়েছিল, তার উপরে যান্ত্রিক অগ্রগতি যেটুকু বাকী ছিল, সেটুকু নিঃশেষে নষ্ট করে দিল। ফলে গোটা খ্রীষ্টান সমাজটাই নাস্তিকতার দিকে ঝুঁকে পড়ে। বাইবেল তথা সাধুসন্তদের পরিবর্তে ফ্রয়েড্, জাঙ, অ্যাড্‌লার ও ডারউইন তাদের মনে কায়েমী আসন করে নিয়েছিলেন। ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যাণ্ট দুটো দল তো ছিলই আগে থেকে, এখন আবার প্রোটেস্ট্যাণ্ট দলেই দুটো দল দেখা দিল। যাঁরা বাইবেল-কথিত সমাচারকে ধ্রুব সত্য বলে মেনে নিলেন, বিজ্ঞানের যুক্তিকে মোটেই আমল দিতে চান না—তাঁরা পরিচিত হলেন ফাণ্ডামেণ্টালিস্ট নামে, আর যাঁরা বৈজ্ঞানিক যুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে ধর্মরক্ষা করতে প্রয়াসী তাঁরা পরিচিত হলেন মডার্নিস্ট (লিবারেল) নামে। এই দুটো দলের নীতিগত বিরোধ এমনই তীব্রতর পর্যায়ে উঠেছিল এবং সমাজে প্রতিক্রিয়া-মূলক উত্তেজনা এমনই প্রচণ্ড হয়ে উঠেছিল যে শেষ পর্যন্ত টেনেসী প্রদেশে আইনই প্রণীত হল যাতে বাইবেল-

বিরোধী কোন শিক্ষা ছাত্রদের দেওয়া না হয়। ডে-টন শহরের সেণ্ট্রাল হাই-স্কুলের জনৈক শিক্ষক জন্ টমাস্ স্কোপস্ স্বেচ্ছায় এবং বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই এই আইন অমান্য করলেন ছাত্রদের থিয়োরী অব ইভোলিউশন্ বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে। তাঁকে তখনই গ্রেপ্তার করা হল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই সারা আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ল উত্তেজনা। দেশের প্রথম শ্রেণীর আইনবিদেরা স্বেচ্ছায় দু দলকে সমর্থন করতে এগিয়ে এলেন। তুমুল উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে, নাটকীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে বিচার-প্রহসন শেষ হল—স্কোপস্ সামান্য শাস্তি পেলেন। শুধুমাত্র আইনভঙ্গের জন্যই তিনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন—অন্য কোন যুক্তি ছিল না। সমগ্র বিশ্বের দরবারে সেদিন সংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছিল—Christ's teachings are inconsistent with this industrial age.

অভ্যাসদোষে এ কথা আমরা ভুলতে বসেছি যে মানুষ স্বভাবতঃই অসভ্য ও বর্বর। তাই সে একান্তই উত্তেজনা-প্রিয়। জোর-জবরদস্তি করে তার ঘাড়ে সভ্যতা চাপিয়ে দিয়ে উত্তেজনামূলক কাজগুলি আইন দিয়ে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অসভ্য মানুষ একে অপরের স্ত্রী চুরি করে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়, স্বাভাবিক বন্য নিয়মের মর্যাদা বাঁচে। সুসভ্য আমাদের উপায় কি? অগত্যাই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবার চেষ্টা করি। তাই নিউইয়র্কের স্নিভার-গ্রের মামলা, বাংলায় সুজাতা সরকারের মামলার ধারাবিবরণী পাঠ করে আমরা মাতাল হই। কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি ছাড়াও হাতের পাঁচ সিনেমা তো আছেই। আজ এই সিনেমাই অব্যাহত যৌন-উত্তেজনা সরবরাহের গুরুদায়িত্ব বহন করছে। ১৯৪৩ সনে, কলকাতার ফুটপাথে যখন শত শত নরনারী অনাহারে মরছে, তাদের মৃতদেহগুলি ডিঙিয়ে সিনেমার টিকিট-কাউণ্টারে ব্যগ্র জনতার নির্লজ্জ দৃশ্য আজও স্মৃতি থেকে মুছে যায় নি। অত দূরের কথায় দরকার কি—এই সেদিনও শিয়ালদার প্ল্যাটফর্মে অগণিত আশ্রয়হীন অভাগা মানুষের ভিড়, তারই আশেপাশে সিনেমাঘরের "হাউসফুল" প্ল্যাকার্ডের দিকে তাকিয়ে হিসাব করে দেখেছি, মাত্র সাতটি 'শো'র সংগৃহীত অর্থে এদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন সম্ভব। এ হল সিনেমা হুজুগ।

অন্যান্য উত্তেজনামূলক হুজুগের মধ্যে যে দ্বন্দ্বযুদ্ধকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছিল, তাকে দেখতে পাওয়া গেল সহস্রগুণে অধিক উত্তেজনাময় আবেষ্টনী-মুষ্টিযুদ্ধের মঞ্চে। আগে দ্বন্দ্বযুদ্ধে একটা না একটা হেতুর প্রয়োজন ছিল। শতকরা ষাটেরও বেশী ছিল নারীঘটিত প্রণয়মূলক হেতু, দ্বিতীয় পর্যায়ে আসত ব্যক্তিগত সম্মানহানি হেতু। আধুনিক কালের মুষ্টিযুদ্ধে কোনও হেতুর প্রয়োজন নেই। অথচ নিষ্করুণ মারের দাপট দেখে এ কথা মনে করা কঠিন যে উভয় প্রতিযোগীর মধ্যে বংশানুক্রমিক শত্রুতা নেই। নিতান্ত অহেতুক এবং নৃশংসতায় অন্যতম এই মুষ্টিযুদ্ধ-হুজুগে অগণিত সুসভ্য নরনারী অফুরন্ত বন্যবর্বরতার স্বাদ পান। বন্যবর্বরতায় নৃশংসতা আছে বটে, কিন্তু অকারণে ঠাণ্ডা মাথায় এমন পাশবিক আনন্দে মাতে না। মুষ্টিযোদ্ধা টনী দু বছরের মধ্যেই ১,৭৪২,২৮২ ডলার উপার্জন করেন, তাঁর প্রতিযোদ্ধা ডেমস ওই একই সময়ের মধ্যে (১৯২৬-২৭) আট লক্ষ ডলার পান, জো-লুই রেকর্ড করেন বাইশ লক্ষ ডলার দেড় বছরের মধ্যেই পেয়ে। হায়, কত ধন যায় সভ্য-জাতির একপ্রহরের প্রমোদে!

শুধু যৌন-উত্তেজনায় এবং পাশবিক রক্ততৃষায় সভ্যতার সংস্কার বেশীদিন ডুবে থাকতে পারে না, অথচ হুজুগ না হলে বেঁচে থাকা দায়। সমগ্র সভ্য নরসমাজ যখন এমনই অস্বস্তিকর অবস্থায় আই-ঢাই করছিল, তখন মাহেন্দ্রক্ষণে খবর এল লিণ্ডবার্গ একা একটানা সটান পাড়ি দিয়েছেন আটলান্টিক মহাসাগর তাঁর ছোট্ট বিমানে সওয়ার হয়ে। ওঃ, সমগ্র সভ্যজগৎ জুড়ে সে কী উল্লাস! বোধ হয় সেদিন তাঁরা বহুদিন পর প্রথম নিয়েছিলেন ঈশ্বরের নাম লিণ্ডবার্গের নিরাপদ প্রত্যাবর্তন কামনায়। তারপর সত্যিই যেদিন তিনি ফিরে এলেন, সেদিন তিনি কল্পনাও কি করতে পেরেছিলেন যে তাঁর দেশবাসীরা তাঁর জন্য যে কৃত্রিম তুষারবর্ষণ-অভ্যর্থনা ব্যবস্থা

রেখেছিলেন তাতে ব্যবহৃত হয়েছিল ১৮০০ টন পাতলা কাগজের টুকরো? ভাবতে পেরেছিলেন কি তিনি একখানি টেলিগ্রাম তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে যা লম্বায় ছিল ৫২০ ফুট, যাতে ছিল ১৭,৫০০ জনের নাম? আরও ছিল ৫৫,০০০ টেলিগ্রাম একখানি লরীতে বোঝাই হয়ে। খেতাব দেড় ডজন, পদক এক ডজন, ডলার বিয়াল্লিশ লক্ষ, আর বাদবাকী যা ছিল তার ফর্দ করতে হলে দস্তুরমত মোটা একখণ্ড বই হয়ে পড়বে।

কিন্তু কিসের জন্য এত হৈহৈ ব্যাপার রৈরৈ কাণ্ড? বিমানে আটলান্টিক পাড়ি দেওয়া এমন কিছু কৃতিত্ব নয়। তাঁর আগেও ১৯১৯ সনে অ্যালকক্ ও ব্রাউন আটলান্টিক পাড়ি দিয়েছিলেন নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড থেকে আয়ার্ল্যাণ্ড পর্যন্ত। ওই বছরেই এন্. সি.-৪ পাঁচজন যাত্রী নিয়ে অ্যাজোর্সের পথে পার হয়েছিল এবং ব্রিটিশ ডিরিজিব্ল্ (R 34) ৩১ জন আরোহী নিয়ে স্কটল্যাণ্ড থেকে আইল্যাণ্ডে পৌঁছেই আবার উলটোমুখে ঘরের পথে ফিরে গিয়েছিল। লিণ্ডবার্গের অভিযানের প্রভেদটা ছিল এইখানে যে তিনি সটান নিউইয়র্ক থেকে প্যারিস গিয়েছিলেন মাঝখানে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে অবতরণ না করেই এবং তিনি ছিলেন বিমানের একমাত্র আরোহী ও বৈমানিক। আসলে ব্যাপারটা ছিল নিতান্তই বেপরোয়া গোঁয়ার্তুমির, এবং লিণ্ডবার্গই এ কথাটা জানতেন সবচেয়ে বেশী। তবু যে তিনি পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডে অর্ধদেবতার সম্মান অর্জন করলেন, তার কারণটা ছিল স্বাভাবিক। সন্ত্রাসের বীরত্ব ও ব্যভিচারে একটা সুসভ্য জাতির অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। উচ্চকোটির প্রেম, আদর্শনিষ্ঠা, এবং সেই সঙ্গে দুর্জয় আত্মবিশ্বাসের প্রমাণ কোন একটি মানুষের মধ্যে খুঁজে ফিরছিল তারা। এক লিণ্ডবার্গের মধ্যেই তা পাওয়া গেল। মানুষের মধ্যে অপার্থিব শক্তির আবির্ভাব যে অসম্ভব নয়, এই প্রমাণটা পেয়েই তাদের এত উল্লাস। এটা ১৯২৭ সনের ঘটনা।

প্রাচ্য ভূখণ্ডেও ওই একই সময়ে একই বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল। হুজুগ যে ক্রমপর্যায়ে জাতির ইতিহাস সৃষ্টি করে তার একটিমাত্র বাস্তব উদাহরণ পাওয়া গেল চিরন্তন হুজুগবিমুখ অর্ধমৃত ভারতবর্ষে। শিল্পবিপ্লব ও বিজ্ঞানপ্রগতি এ দেশের ধর্ম ও দর্শনকে কাবু তো করতে পারলই না, অধিকন্তু দিল অধিকতর শক্তি ও বিশিষ্ট মর্যাদা। রাজনীতি, কূটনীতি, সমরনীতি, দমননীতি এবং আধুনিকতম প্রভুত্বনীতিকে অবলীলায় পরাস্ত করতে পারে এমন অজেয় নীতি যে আত্মিক-সাধনা থেকে উদ্ভূত হয়, তা আগে কারও জানা ছিল না। আজ যাকে নীতি বলছি, ত্রিশ বছর আগে তাকে হুজুগ ছাড়া কিছু বলা চলত না। এতে যৌন-আবেদনের ছিটেফোঁটা গন্ধ নেই, উগ্র-উত্তেজনামূলক মুষ্টিযুদ্ধের বা আটলান্টিক অতিক্রমণের গোঁয়ার্তুমিও নেই। অথচ এদের চেয়ে সহস্রগুণ অধিকমাত্রায় সৎসাহস ও তার সঙ্গে আধ্যাত্মিক আবেদন সংমিশ্রিত থাকায় এ যেমনই অজেয় তেমনই অভূতপূর্ব অবাস্তবতায় পূর্ণ। ১৯১৯-২০ সনে হল এই নতুন হুজুগের অভ্যুদয়। জগতে এই হুজুগ "সত্যাগ্রহ" নামে পরিচিত, এবং এর প্রবর্তক মহাত্মা গান্ধী শ্রেষ্ঠ মানব হিসাবে সম্মানিত। যে ব্রিটিশ-শাসক অমৃতসরে রক্তবন্যা বইয়েছিল, বহুশত নিরস্ত্র নিরীহ নরনারীকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল বিনা দ্বিধায়—তারা হতবুদ্ধি হয়ে গেল এই অভিনব হুজুগের সামনে। কী তারা করবে এমন একদল হুজুগে জনতা নিয়ে, যারা স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসে বেয়নেটের সামনে, দলে দলে মার খায় বিনা প্রতিবাদে, পূর্ণ করে জেল-হাজত। বাধা দেওয়া তো দূরের কথা, প্রচণ্ড পীড়নেও তারা রাগ করে না, দেয় না অভিশাপ—সমস্ত আইন চূর্ণ করে অবলীলায় চরম পরিণামকে নিঃশেষে উপেক্ষা করে। সুসভ্য ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদ শোচনীয়রূপে পরাস্ত হল, আর নিরস্ত্র ভারতবাসী পেল নতুন এক অজেয় অস্ত্র এবং আন্তর্জাতিক সম্মান।

স্বাধীনতা অর্জনের পরেও এই সত্যাগ্রহনীতি টকে-ঝোলে-অম্বলে সর্বত্র প্রয়োগ করা হচ্ছে। পরীক্ষা-বিমুখ মারমুখী ছাত্রদল, দ্রাবিড়-কাজাগামদল, শিখ-আকালীদল এবং অন্যান্য সকলেই এক-নয়া-পয়সা সুবিধা আদায়ে এই ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করছেন—অথচ উপযোগী আত্মসংযম নিয়ম পালন করছেন না। ফলে যা হুজুগ থেকে নীতির

পর্যায়ে উঠেছিল, আজ তাই আবার হুজুগের অধঃপাতে নেমে পড়েছে।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে নুরেমবার্গ শহরে যে বাইশ লক্ষ সাদা-কালো-লাল রঙের স্বস্তিকা-চিহ্নিত পতাকা উড়েছিল, তাকে হুজুগ ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? নিঃসন্দেহে সেদিন কোনও রাষ্ট্রীয় বা ধর্মীয় তিথি-পর্ব ছিল না, ছিল না কোন রাজনৈতিক আন্দোলন বা শোভাযাত্রা। এ ছিল এক মারাত্মক রকম পাগলামির হুজুগ। পাগলামি নিশ্চয়ই, তবে পরিকল্পিত পাগলামি, তাই সহস্রগুণে বেশী মারাত্মক। একটিমাত্র অর্ধোন্মাদ মানুষ এক শক্তিশালী সংস্কৃতিসম্পন্ন জাতিকে খেপিয়ে তুলে ঝাঁপ দিতে বাধ্য করল জ্বলন্ত চিতায়। এ হুজুগের পরিণাম এমনই ভয়ঙ্কর যে সবচেয়ে সাহসী বীরপুরুষেরও বুক কেঁপে ওঠে। মাত্র একজন বা দুজন অপ্রকৃতিস্থ হুজুগে কূটনীতিকের কর্মফলে সারাটা পৃথিবী রক্তে স্নান-তর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

১৯৩৮ সনে চেকোশ্লোভাকিয়ার উপর যে অন্যায় অত্যাচার চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল ও তার ফলে সে-দেশের মর্ম-পীড়িত সুসন্তানগণের যে ব্যথাভরা আবেদন অনন্তের দরবারে পৌঁছেছিল, তারই অমোঘ প্রতিক্রিয়ায় ১৯৪৭-৪৮ সনে নোয়াখালিতে বেধে গেল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, এ কথা পাগলের যুক্তি বলেই মনে হবে বটে, কিন্তু হুজুগগুলোর ক্রম-বিবর্তন লক্ষ্য করলে একে হেসে উড়িয়ে দেওয়া শক্ত। জেট, রেডিও, টেলিভিশনের কল্যাণে বস্তু ও ভাবের আদান-প্রদান এতই সহজ হয়েছে যে সুমেরু আজ কুমেরুর প্রতিবেশিত্ব দাবি করে। ছ হাজার মাইল দূরে কানাডায় যা ঘটে, তার সাড়া জাগে ভারতের বুকে ছ মিনিটের মধ্যেই। কলকাতায় চালের দর যখন পঁয়ত্রিশের সিঁড়িতে, কুশলী ট্রাপিজ খেলোয়াড়ের পক্ষেও যখন শরণার্থীদের না মাড়িয়ে পথ চলা শক্ত, এমন প্রাণান্তকর অবস্থাতেও পথে পথে স্লোগান শুনি—"লেবাননে মার্কিন-সেনা অপসারণ চাই", "বৃটেন সুয়েজ ছাড়ো"।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে আমি অবান্তর কথার অবতারণা করেছি, কারণ উল্লিখিত ঘটনাগুলি "হুজুগ" পর্যায়ের নয়। এ স্থলে আমার প্রশ্ন:

(১) মহাত্মা গান্ধী কি জনসাধারণের অনুমতি নিয়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেছিলেন?

(২) হিটলার কি তাঁর দেশবাসীদের (এমন কি তাঁর সহকর্মীদের) পরামর্শ নিয়েছিলেন চেকোশ্লোভাকিয়া আত্মসাৎ করবার আগে?

(৩) লেবানন ও সুয়েজ খালে সেনা-সন্নিবেশ কি যথাক্রমে আমেরিকা ও বৃটেনের অধিবাসীদের অনুমোদিত ছিল?

(৪) ভারতের পক্ষে লেবানন বা সুয়েজ ছাড়ো আন্দোলন করবার কি কোন সার্থক যুক্তি ছিল?

(৫) এবং উল্লিখিত (২), (৩) এবং (৪) দফায় বর্ণিত হুজুগগুলির পরিণামে সংশ্লিষ্ট দেশ বা জাতিগুলির কি কোন রকম কল্যাণ সাধিত হয়েছে?

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে প্রথম দফায় বর্ণিত "সত্যাগ্রহ" প্রকৃতই হুজুগ নয়, কারণ হুজুগের প্রথম লক্ষণ এতে বর্তমান থাকলেও বাকীগুলি নেই, এবং দ্বিতীয়তঃ ও পক্ষান্তরে এর পরিণাম এক প্রাচীন ঐতিহ্যসম্পন্ন জাতির সমূহ-কল্যাণ। এই সব হুজুগ ইতিহাসে ঠাঁই পায় না। ঢেউয়ের পর ঢেউ আসে, আবার পিছয়—বন্যা এমনি করেই এগিয়ে চলে, নিশ্চিহ্ন করে কতশত সমৃদ্ধ জনপদ। ঘটনার পর ঘটনাকে কেন্দ্র করে হুজুগের পর হুজুগ আসে, মিলিয়ে যায়, এমনি করে কখন কোন্ ফাঁকে জাতির উত্থান-পতন ঘটে, ঐতিহাসিকের খাতায় লেখা হয় শুধু সন-তারিখ এবং সামনের প্রত্যক্ষ কারণগুলি। কারণেরও কারণ এই হুজুগগুলি তাঁর অগোচরে মহাকালের কোলে বসে বিদ্রূপের হাসি হাসে। হুজুগেই হুজুগ টানে এ কথা যদি এখনও নিঃসংশয়ে প্রমাণিত না হয়ে থাকে, তবে এই শেষ উদাহরণে হবেই।

কেচ্ছা-হুজুগ, খেলার হুজুগ, গোঁয়ার্তুমির হুজুগ প্রভৃতির মত শান্তি-হুজুগও দস্তুরমত একটি হুজুগ।

ব্যাপকতায় বিরাটতম, আয়োজনে বিপুলতম এবং ফল-প্রসবে ন্যূনতম এই হুজুগটির বিষয়ে জনসাধারণ স্বল্পতম অবহিত। কজন আজ খবর রাখেন যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে জগৎ জুড়ে উদার সুরে যে "শান্তি চাই" ধ্বনি উঠেছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেও সেই হুজুগের কার্বন-কপি পাওয়া গেছে? তুলনা করুন:

প্রথম মহাসমর	দ্বিতীয় মহাসমর
কুড়ি লক্ষ মনীষীর স্বাক্ষরিত একখানি অস্ত্র-বর্জন আবেদনপত্র একটি লরিতে বোঝাই করে জেনেভায় পাঠানো হয়েছিল।	১৯৫৯ সনে কুড়ি হাজার লোকের এক শান্তি-শোভাযাত্রা স্কটল্যাণ্ড থেকে লণ্ডন পর্যন্ত পায়ে হেঁটে গিয়েছিল। সমস্ত বৈজ্ঞানিক একত্রিত হয়ে প্রতিজ্ঞা করেন ধ্বংস-যজ্ঞে তাঁরা আর সহযোগিতা করবেন না। আর্নেস্ট হেমিংওয়ে পুলিট্জার পুরস্কার পান 'Farewell to Arms' লিখে।
দশ লক্ষ ফ্রাঁ খরচ করে একটি প্রকাণ্ড প্রাসাদ তৈরি হয়েছিল শান্তি-সম্মেলনের জন্য।	আজও এই প্রাসাদই অনুরূপ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।
চৌষট্টিটি দেশের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন।	পৃথিবীর সমস্ত জাতিই আজ জাতি-সংঘের সভ্য, শুধু পৃথিবীর এক-পঞ্চমাংশ লোকের বাসভূমি চীন ছাড়া।
প্রতিটি প্রতিনিধিকে একখানি করে স্বর্ণপদক উপহার দেওয়া হয়েছিল।	শুধুমাত্র মহাত্মা গান্ধী ও শ্রী নেহেরু ছাড়া প্রতিটি যুদ্ধ-পাগল রাজনীতিক নোবেল প্রাইজ কিংবা অনুরূপ পুরস্কার পেয়েছেন শান্তি-প্রচেষ্টার জন্য।
সর্বমোট সাতাশটি অস্ত্র-বর্জন পরিকল্পনা পেশ হয়েছিল, যার উপর সংশোধনী প্রস্তাবের সংখ্যা ছিল এক হাজারেরও বেশী।	'উনো'তে অনুরূপ শতাধিক প্রস্তাব উঠেছে ১৯৫৮ পর্যন্ত। ১৯৫৯ সনে শীর্ষ-সম্মেলনের প্রস্তুতি চলছে।
সবচেয়ে মজার কথা এই যে, যখন এমনই আড়ম্বরের সঙ্গে অস্ত্র-বর্জন আন্দোলন চলছিল, ঠিক তখনই ফ্রান্স প্রভৃত সমর-আয়োজন প্রস্তুত রেখেছিল, এবং বৃটেনও বার্ষিক ১০০,০০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয়-বরাদ্দ রেখেছিল সামরিক খাতে।	ঠিক যেমনটি আজ "আণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ" আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে নিত্যনতুন পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণও চলেছে পাশাপাশি এবং যথাবিহিত শান্তি-প্রচেষ্টার সঙ্গে জোর-কদমে চলেছে ন্যাটো, সীয়াটো, বাগদাদ প্রভৃতি আক্রমণাত্মক উদ্যোগ।

[৪৪১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

গল্প

পুরুষ

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃথিবীতে ওর সবচেয়ে বড় শত্রু যদি কেউ থাকে তবে সে পুরুষমানুষ। কী স্বার্থপর, কী নিষ্ঠুর, কী ভীষণ এই পুরুষ জাত! ঘৃণায় ভ্রূ দুটো কুঁচকে ওঠে সুনীলার। কী করে যে মেয়েরা পুরুষমানুষকে সহ্য করে— ভেবে ও অবাক হয়ে যায়। এর চেয়ে বিস্ময় সংসারে আর কী থাকতে পারে! আজীবন একটা কাঠখোট্টা গোঁপদাড়িওলা পুরুষকে সহ্য করা, এ যে কী ভয়াবহ! সুনীলা ভাবতেও পারে না।

তবু ওর দিদি যে কেন আজও কাঁদে ও কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না।

জামাইবাবুর মত একটা নোংরা লোক দিদিকে ছেড়ে যে চলে গেছে, এ তো সৌভাগ্যের কথা। দিদি কিন্তু কাঁদে। দিদির কান্না দেখে ওর যেমন গা জ্বলে যায় পুরুষের ওপর রাগে, তেমনি আবার কান্নাও পায়।

দিদিকে ও ভালবাসে।

ওরা দু বছরের ছোট-বড়। একসঙ্গে খেলেছে, এক থালায় খেয়েছে, এক বিছানায় শুয়েছে বহুকাল।

প্রমীলা সুনীলা দু বোন, কিন্তু মন একটি।

আর ভাই-বোন নেই, তাই সর্বক্ষণ দুজন দুজনকে ছাড়া কিছু জানত না।

দুজনেই যখন থার্ড ইয়ারে উঠল, প্রমীলার তখন বিয়ে হয়ে গেল—প্রায় অভাবনীয় আকস্মিকভাবে। তথাগত সেনশর্মা ছেলেটির নাম। বাবার অফিসের বন্ধুর ছেলে। এম. এ. পাস করে চাকরি করছে। লম্বা সমর্থ শরীর। গায়ের রঙ ময়লা, কিন্তু চোখেমুখে বুদ্ধির দীপ্তি ঠিকরে পড়ছে। তখন কি সুনীলা জানত লোকটা এমন শয়তান!

প্রমীলা পড়াশুনোয় একটু নীরেস, তাই ওর মাস্টার খোঁজ করতে গিয়ে বাবা এনে জোটালেন এই ছেলেটিকে। ওর ঝলমলে হাসি আর চোখাচোখা কথায় প্রমীলার খুশী উপচে পড়ল।

সুনীলারও যে তখন ওকে ভাল লেগেছিল সেটা এখনও অস্বীকার করতে পারে না। ওর ভাল লাগাটা কঠিন স্বভাবের তলায় চাপা ছিল।

প্রমীলা চাপতে পারল না।

ওদের যে শুধু মনে তফাত তা নয়। দেহেও।

প্রমীলা নরম, ছোটখাটো মানুষ, চোখ দুটো বড় বড়। আহ্লাদে ভরা।

সুনীলার শ্যামা শক্ত সুদীর্ঘ শরীর। ঠোঁট দুটি পাতলা, কিন্তু চাপা। কথা বলে কম।

তথাগতর অসামান্য যৌবনের বেগে প্রমীলা ভাসল— প্রায় গলে গেল।

সুনীলার বেশ মনে আছে, তথাগত যখন পাশের ছোট ঘরখানায় প্রমীলাকে পড়াতে বসত, প্রমীলা ওর দিকে বিমুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকত।

ওর ডাগর চোখের মুগ্ধ চাউনিটা এত বেশী স্পষ্ট লাগত যে তথাগত পড়াতে পড়াতে মুখ তুলে হেসে ফেলত। বলত, সাজাহান কি আমার মুখে, না, এই বইয়ে?

সুনীলার কানে আসত। মনে মনে আজ হাসি পায়, ওর মুখে সাজাহান নয় ঔরঙ্গজীব। নাটক পড়ানো বন্ধ করে তারপর চলত ওদের গল্প।

সুনীলার কানে আসত প্রমীলা বলছে, আচ্ছা, জাহানারা বিয়ে করে নি কেন?

তথাগত গম্ভীর হয়ে বলত, এ প্রশ্ন তো পরীক্ষায় আসবে না।

তবু জানতে ইচ্ছে হয়।

বড় হয়ে ইতিহাস পড়লে জানতে পারবে, জাহানারা

এক রাজপুত হিন্দুকে ভালবাসত। বিয়ে করা বারণ ছিল।

প্রমীলা রেগে বলে, আমি কি বড় হই নি ?

আর কোন আওয়াজ শুনতে পেত না সুনীলা। এর পর হয়তো ফিসফিস করে কথাবার্তা হত।

কথা যত গোপনেই হোক, ব্যাপারটা গোপন রইল না।

মা শুনে বললেন, বিয়েতে যখন বাধা নেই, তখন বিয়ে হোক।

বাবাও মত দিলেন।

সুনীলার যে শুধু মত ছিল তা নয়। ওরও তথাগতকে বেশ ভাল লাগত। ও লুকিয়ে লুকিয়ে তথাগতকে যে কতবার দেখেছে, কতবার অকারণে ওর কাছে যেতে ইচ্ছে হয়েছে, সে কথা আজ আর কেউ জানে না।

দিদির মনোভাব বুঝেই ও বেশী এগোয় নি।

দিদি সুখী হবে জেনে ও নিজেকে সংযত করেছে। তবু স্বপ্ন দেখেছে। তথাগত মেয়েদের মনে স্বপ্ন জাগায়। আর সে স্বপ্ন চুরমার করে দিতেও জানে।

দিদির বিয়ে হল। আনন্দে ভরে উঠল দিদি কিছুটা বোকার মত। জামাইবাবুর গেঞ্জিটা পর্যন্ত নিজে হাতে পরিষ্কার করে না দিতে পারলে স্বস্তি পেত না।

শ্বশুরবাড়ি গেল। প্রথমবার এবং সেই শেষবার।

মাস ছয়েক পরে জানা গেল তথাগত এক বান্ধবী অধ্যাপিকার সঙ্গে নিখোঁজ হয়েছে। খোঁজ করলে হয়তো পাওয়া যেত। কিন্তু খোঁজ করবার মত স্পৃহা আর কারও রইল না। বিশেষ করে দিদির শ্বশুর ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করল এর পর।

দিদি চলে এল চোখে জল নিয়ে। সুনীলা রাগে দুঃখে খেপে গেল।

দিদিকে বলল, আমি খুঁজে বার করে আনব রাস্কেলটাকে, তোর সামনে চাবকাব।

দিদি আরও কাঁদল, সুনীলার দিকে তাকিয়ে বলল, ওর ওপর রাগ করিস নে। দোষ আমারই, তাই হয়তো আমাকে ও ভালবাসতে পারে নি।

তবে ভালবাসার অভিনয় করেছিল কেন ?—তর্জন করে ওঠে সুনীলা।

পুরুষমানুষ অমন করেই থাকে।

সুনীলা চাপা রাগে ঠোঁট চেপে বলল, পুরুষ জাতটাই এমনি।

প্রমীলা শুধুই কাঁদল। আর কিছু করতে পারল না।

বছরখানেক কাটবার পর প্রমীলা আবার বি. এ. পড়তে শুরু করল। সুনীলা তখন বি. এ. পাস করে চাকরি করছে। সেই থেকে পুরুষমানুষকে দু-চোখে দেখতে পারে না সুনীলা। ওর বিয়ের কথা যে বলে তার দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে শুধু চলে যায়।

এই সময়েই একদিন সুনীলা অফিস থেকে ফেরবার পথে দেখতে পায় তথাগতকে। সে ওকে দেখতে পায় নি। আপন-মনে দুখানা বই বগলে নিয়ে হাঁটছিল।

সুনীলা একটু পিছিয়ে পড়ল। লক্ষ্য করল তথাগত একটা বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল।

বাড়িটা ভাল করে চিনে রাখল সুনীলা। মুখে ক্রূর হাসি খেলে গেল ওর।

বাড়ি ফিরে সটান চলে গেল দিদির ঘরে। হাঁপাচ্ছিল সুনীলা।

প্রমীলা একটা সোয়েটার বুনছিল। সুনীলার দিকে তাকিয়ে বলল, কি রে, অমন হাঁপাচ্ছিস কেন ?

রাস্কেলটার দেখা পেয়েছি।

প্রমীলার বোনা বন্ধ হয়ে গেল। তাকিয়ে রইল শুধু।

রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। একটা বাড়িতে ঢুকল। বাড়িটা চিনে এসেছি।

প্রমীলা কথা বলতে পারছে না। চোখ দুটো ছলছল করছে।

সুনীলার কান দুটো রাঙা। উত্তেজিত স্বরেই বলল, তুই দেখবি দিদি, আমি ছাড়ব না। রোববার সকালে যাব। চাবকে আসব। তোকে বলে রাখলুম।

প্রমীলার চোখ জলে ভরে উঠেছে। রুদ্ধকণ্ঠে বলে, কি দরকার ওকে বিরক্ত করে ?

বিরক্ত মানে ? চাবকাব, তোকে বলে রাখলাম।

সুনীলা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। মনে ওর স্থির প্রতিজ্ঞা—এতদিনে দিদির অপমানের প্রতিশোধ নিতে পারবে ও।

রোববার সকালে নিজেকে সযত্নে সংযত করে কঠিন মুখে ও বাড়ি থেকে বেরোয়। প্রমীলা দেখে একটি কথাও বলে না। আর্তচোখে শুধু তাকিয়ে থাকে।

সুনীলা রাস্তায় বেরিয়ে ভাবে, যদি তাকে অপমান করে? একটু ভয় হয়।

অপমান অমনি করলেই হল! দরকার হলে পুলিসে খবর দেবে সুনীলা। ও দেখিয়ে দেবে যে মেয়েছেলে খেলার পুতুল নয়, প্রয়োজন হলে জ্বালিয়ে দিতে পারে পুরুষকে—জ্বালিয়েই দেবে। ওর সুখ যদি কিছু থাকে জ্বালিয়ে দিয়ে আসবে।

বাড়িটা চিনতে বেশী কষ্ট হয় না। এই বাড়ি। কড়াটা নাড়তে গিয়ে তবু একটু ভয় ভয় করে। যদি সেই অধ্যাপিকাটি থাকে! দুজনে মিলে যদি ওকে চেপে ধরে! যা-তা বলে বার করে দেয়?

দেয় তো দেবে। সে-ও প্রাণ খুলে শুনিয়ে দিয়ে আসবে। অধ্যাপিকাকেও বলে আসবে ওর দিদির অবস্থা। মুখোশ খুলে দিয়ে আসবে। ভালই হবে।

নীচে একটা চাকর নেমে আসছে দেখে তাকে জিজ্ঞেস করে সুনীলা।

চাকরটা বলে, দোতলার ঘরে থাকেন। সোজা উঠে যান।

সুনীলা মনটাকে খুব শক্ত করে ওপরে উঠে যায়।

দোতলায় উঠে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করবার দরকার হয় না। দেখে সামনের ঘরে একটা চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছে তথাগত।

সুনীলা ঘরে ঢোকে। কই, কোন মেয়েছেলে নেই তো!

খবরের কাগজ থেকে মুখ তোলে তথাগত। একটু চমকে ওঠে। পরক্ষণেই হেসে বলে, আরে! কি খবর?

সুনীলা একটু বাঁকা হেসে বলে, খবর তো আপনার কাছে।

তথাগতর মুখখানা ম্লান হয়ে যায়। করুণ স্বরে বলে, আমার আর কি খবর বলো? একা একা পড়ে আছি।

একা?—হাসে সুনীলা, দ্বিতীয় পক্ষটি কোথায়?

তথাগত গম্ভীর হয়ে চুপ করে থাকে।

সুনীলা সোজাসুজি প্রশ্ন করে, আপনি দিদির ওপর এমন অবিচার করলেন কেন?

অবিচার!—তথাগতর চোখ দুটো কারুণ্যে ভরে ওঠে, অবিচার আমি করি নি।

তাকে ছেড়ে চলে আসবার মত নীচ হয়েছেন সেটা না হয় মেনে নিলাম। তার ভালবাসাকে অস্বীকার করলেন কি করে?

তথাগত অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে বলে, কারণ, তাকে আমি ভালবাসতে পারি নি।

তবে বিয়ের আগে তাকে ভালবাসার কথা বলতেন, সেগুলো কি বানানো?

তথাগত ব্যথিত হয়: তুমি সব জান না। আমি তাকে একবারও ভালবাসার কথা জানাই নি। ও কথাটা তোমার দিদির কাছ থেকেই আমার কানে বার বার এসেছে।

ভেতরে একটা যন্ত্রণা চেপে যেন বলে তথাগত, বলতে পার, যাকে ভালবাসতে পারলাম না তাকে নিয়ে কি করে সারাজীবন ঘর করি?

সুনীলা স্তব্ধ হয়ে যায়। তথাগতর বেদনার্ত মুখের দিকে তাকিয়ে ওর কাঠিন্য নরম হয়ে আসে। আস্তে আস্তে বলে, তবে বিয়ে করলেন কেন?

বিয়ে করলাম—বাবার একান্ত অনুরোধে। বাবা বললেন, তাঁর বন্ধুর কন্যা। তা ছাড়া তাঁরও খুব পছন্দ হল প্রমীলাকে। বাবার অবাধ্য কখনও হই নি, তাই সাহস পেলাম না। এখন দেখছি তখন অবাধ্য হলেই ভাল হত।

আবার যেন যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ওঠে তথাগত: এ কথা তো স্বীকার করো, প্রমীলার ড্যাবডেবে চোখের বোকা-বোকা চাউনি আর ভিজে ভিজে কথা—এ কি সহ্য করা যায়।

সুনীলা এ কথাটা মনে মনে অস্বীকার করতে পারে না। দিদিটা বরাবরই কেমন বোকা-বোকা।

অসহ্য। তাই একটা মিছে কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম।

সুনীলার মনটা সমবেদনায় নরম হয়ে উঠেছে। কী বলতে এসে কী হয়ে গেল।

বলে, তবে কি অধ্যাপিকা—

ওটা বাজে কথা। কী বলে আর বেরিয়ে আসব বল?

তথাগত অসহায় চোখ তুলে তাকায় সুনীলার দিকে: একজনকে ভাল লেগেছিল জীবনে, কিন্তু তার আমাকে ভাল লাগে কিনা জানবার ফুরসত পেলাম না!

সুনীলার বুকের ভেতরটা কাঁপে। এ কী বলছে তথাগত? এ কি সত্যি?

তাকে পেলে হয়তো প্রাণ ভরে ভালবাসতে পারতাম।

কি মধুর লাগছে কথাগুলো! বেদনায় ভয়ে সুনীলার ছোট কপালটি ঘেমে ওঠে। ভয় করছে সুনীলার। সহজ হবার জন্যে বলে, কোথায় খান আপনি?

তথাগত একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বলে, হোটেলে। কে আর রেঁধে দেবে বল?

এই একখানা ঘর নিয়েই আছেন?

হ্যাঁ।

এবারে সুনীলা উঠতে চায়। তথাগত বলে, একটু চা করে দিই। চা খেয়ে যাও।

সুনীলা বলে, তবে না হয় আমিই করি। সব দেখিয়ে দিন।

স্টোভ জেলে চা তৈরি করে সুনীলা। ওর ভেতরটা যেন তোলপাড় হচ্ছে আজ। কিছুতেই আর সহজ হতে পারছে না। ভাল করে আর কথাও বলতে পারছে না।

তথাগতর ইঙ্গিতটা এত স্পষ্ট আর এতই আকস্মিক যে ও যেন চারতলা থেকে একতলায় পড়ে একেবারে পিষে গেছে। ও যা বলল তা যদি সত্যি হয়, তবে সুনীলা কী করবে? কী করতে পারে ও? ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছে না।

চা খেতে খেতে তথাগত ডাকে: সুনীলা!

সুনীলার বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে।

একটা অনুরোধ করব?

বলুন।

তুমি মাঝে মাঝে আসবে—কথা দাও।

সুনীলা আবার ঘেমে ওঠে।

বল?

মুখটা নীচু করে বলে সুনীলা, আসব।

কাল আসবে অফিসের পরে?

একটু ভেবে সুনীলা বলে, আসব।

তারপর উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

বাড়ি ফিরে আসতে আসতে ভয়ে বার বার ঘেমে ওঠে সুনীলা। ফিরে গিয়ে দিদিকে কী বলবে? এ কী বিপদ! আর এ বিপদে যে এত আনন্দ তাও তো ও এর আগে কখনও ভাবতে পারে নি!

ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারে না।

বাড়ি এসে কারও সঙ্গে কোন কথা বলে না। দিদিকে এড়িয়ে চলে সাবধানে। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ে। চোখ বুজে ঘুমোতে চেষ্টা করে। কিন্তু বার বার তথাগতর ব্যথাভরা চোখ দুটোর কথা মনে হয়। কিছুতেই ঘুম আসে না। চোখ বুজে পড়ে থাকে দিদির ভয়ে।

শুয়ে শুয়ে ও পায়ের শব্দ শুনতে পায়। বুঝতে পারে দিদি এসে ফিরে গেছে কয়েকবার।

বিকেলে ঘুম থেকে উঠে তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে তৈরি হতে থাকে। প্রমীলা ঘরে ঢোকে।

শাড়ি পালটে পরতে পরতে বুকটা কাঁপে সুনীলার। আর উপায় নেই।

হ্যাঁ রে, সকালে কি হল?

সুনীলা যেন অবাক হয়ে যায়। আমতা আমতা করে বলে, কিসের কি হল?

ওই যে সকালে যেখানে যাবি বলেছিলি?

সুনীলা হাসবার চেষ্টা করে: ও! সেখানে যাই নি। এক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলাম। ওখানে যেতে তো তুই বারণ করলি।

প্রমীলা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। আর একটা কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

নির্জলা মিথ্যে কথা বললে সুনীলা। কিন্তু কেন ও মিথ্যে কথা বলতে গেল? কিসের ভয়? ও নিজেই যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। কিছুই বুঝতে পারছে না ওর ভেতরে কী হচ্ছে। ভেতরে একটা অস্বাভাবিক তোলপাড় চলেছে—এই মাত্র বুঝতে পারছে।

পরদিন অফিসের পর তথাগতর ঘরে যেতে হল। আবার চা তৈরি করতে হল। ঘেমে উঠল আনন্দে ভয়ে। এক অদ্ভুত আস্বাদ। সুনীলা খুশীতে ভরে উঠছে।

তার পরদিনও গেল। তারপর নিয়মিত সপ্তাহে তিন দিন করে।

প্রথম প্রথম ভয় ভয় করত। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন অপরাধের মত মনে হত।

সহজ করে দিল তথাগত।

একদিন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। আলোটা তখনও জ্বালে নি তথাগত।

সুনীলার ভারী অস্বস্তি লাগছিল। বলল, আলোটা জ্বালো নি কেন?

থাক্।

তথাগত ওর কাছে আসে। সুনীলা জড়োসড়ো হয়ে বসে। বলে, আমাকে কি ভয় করে?

সুনীলা কথা বলে না। বলতে পারে না।

তোমার ভয়ের জন্যে একবার ঠকেছি। আর ঠকব না।

সুনীলা কোনমতে বলে, তার মানে?

তার মানে, যখন পড়াতে যেতুম, তখন তো ভয়ে ভয়ে আমার কাছে আসতে না।

তা নয়।

তবে?

সুনীলা একটু হেসে বলে, দিদির জন্যে। দিদির জন্যে বড় কষ্ট হয়।

তথাগত ওর একটা হাত চেপে ধরে বলে, আমারও হয়। কিন্তু সংসারের নিয়ম বড় কঠিন সুনীলা। একজনকে সফল হতে হলে আর একজনকে ব্যর্থ হতে হবে।

সুনীলা কথা বলে না। বাধাও দেয় না ওকে।

তারপর ধীরে ধীরে সুনীলাও সহজ হয়ে এসেছে। ওই একটি কথাই বার বার ভেবেছে। একজনকে সফল হতে হলে আর একজনকে ব্যর্থ হতে হবে। একজনের বেশী পেতে হলে আর একজনের বঞ্চিত হতে হবে। এ যে সংসারে কঠোর নিয়ম। সে কী করতে পারে!

বাড়িতে ফিরতে মাঝে মাঝে দেরি হলে মা হয়তো বলেছেন, অফিস থেকে ফিরতে এত দেরি হল যে?

অফিসে কাজ ছিল।

কোনদিন বা বলেছে, এক বন্ধুর ওখানে গিয়েছিলাম।

দিনের পর দিন মিথ্যে কথা বলেছে। সে আরও হাজার বার মিথ্যে কথা বলতে পারে। কিন্তু নিজে মিথ্যে হয়ে যেতে পারে না। তাকে সফল হতেই হবে। জীবনের এ আনন্দ সে ছাড়তে পারবে না।

এ কথা সে নিজেও বুঝেছে। দিদির বিয়ের আগে থেকেই তথাগতকে সে ভালবাসত, তাই তথাগতর ওপর অত রাগ হয়েছিল। আর রাগ হয়েছিল সমস্ত পুরুষ-জাতের ওপর। এটা ব্যর্থ ভালবাসার আক্রোশ মাত্র।

সুনীলার ভালবাসা আজ তথাগত স্বীকার করে নিয়েছে। তথাগতকে সে পুরোপুরি পেয়েছে। এর চেয়ে বড় পাওয়া এখন আর তার কাছে কিছুই নেই।

এসব দিনগুলো জীবনে যেন পিছলে যায়। অতি দ্রুত কেটে যায়। কী করে যে এত শীগগির দিনরাতগুলো কাটে ভেবে পাওয়া যায় না। এমনি করে বছর দেড়েক যে কী করে কেটে গেছে সুনীলা টেরও পায় নি। টের পেল আরও মাসখানেক পরে।

ইদানীং তথাগতর ঘরে গিয়ে ওকে পাওয়া যায় না ঠিকমতো। মাঝে মাঝেই গিয়ে দেখে ঘরে তালা ঝুলছে। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বাড়ি ফিরে আসে সুনীলা।

বাড়িতে অকারণে সকলের ওপর রেগে ওঠে। রাত্রেও ঘুম হয় না। অস্বাভাবিক মানসিক অস্বস্তিতে দিনরাত কাটে। কিছুদিন ধরেই তথাগত কথার ঠিক রাখে না।

ওকে বেশ একটু রাগ দেখাতে হবে। মনে না হলেও বাইরে।

সেদিন অফিস থেকে এসে তথাগতকে পেয়ে যায় সুনীলা। ঘরে ঢুকে চুপ করে বসে। কথা বলে না। হাসে না।

তথাগত হেসে বলে, কি হল, কদিন আস নি যে?

সুনীলা কথা বলে না।

কি হল? রাগ হল নাকি?

ওর কাছে গিয়ে বসে কাঁধের ওপর একটা হাত রাখে। সুনীলা হাতখানা জোর করে সরিয়ে দিয়ে বলে, আজ উঠি।

এখনি উঠবে?

হ্যাঁ।

একটা কথা ছিল।

কথা বলবার সময় নেই আমার।

রোববারে যে সব ঠিক করে ফেলেছি। তোমাকে নিয়ে কলকাতার বাইরে কাছাকাছি কোথাও বেড়াতে যাব।

সময় হবে না।

তবে সব বাতিল করে দেব?

খুশি।

বলে চলে আসে সুনীলা।

রাস্তায় নেমেই ওর চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসে। এত কঠিন না হলেও সে পারত। ও হয়তো মুখটা কালো করে বসে থাকবে। আজ কিছুই খাবে না। রাত্রে হয়তো ঘুমোবে না।

তথাগতর মনে যে তার কথাগুলো কতখানি বিঁধবে এই ভেবে আপসোসের আর অন্ত নেই ওর। আবার ফিরে গেলে কেমন হয়? না, থাক্। রোববার যাওয়া যাবে। গিয়ে ওর অভিমান ভাঙিয়ে ওকে জোর করে বাইরে নিয়ে যাবে। পারবে ওর অভিমান ভাঙতে। যত রাগই করুক না কেন, একটু আদর করে দুটো মিষ্টি-কথা বললেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তথাগত এখন সম্পূর্ণ তার আয়ত্তে।

রোববার সকালে উঠে বাড়িতে বলল তার জনকয়েক বান্ধবীর সঙ্গে বাইরে যেতে হবে। কে আর কী বলবে? চাকুরে মেয়ে, কেউই বিশেষ কিছু বলে না। মা এক-আধ সময় বলে, এত বাইরে বাইরে বেড়ানো ভাল নয়।

মায়ের কথায় সুনীলা আমল দেয় না।

ফিকে সবুজ শাড়ি পরে প্রসাধন করে নিজেকে অনেক মেজেঘষে তুলল সুনীলা। সেদিন অনেক কঠিন কথা বলে এসেছে, তাই আজ ওকে মুগ্ধ করে খুশী করতে হবে।

রাস্তায় চলতে চলতে বার বার মনে হচ্ছে সুনীলার—যদি ও কিছুতেই কথা না বলে? সেদিনের ব্যবহারে ভীষণ রেগে গিয়ে থাকে? তবে ভীষণভাবেই আদর করতে হবে, সাধাসাধি করতে হবে। ভালবাসা দিয়ে তথাগতকে জয় করেছে সুনীলা। সে আর যাবে কোথায়? সে এখন ওর আয়ত্তে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে দেখতে পায় তথাগত নামছে সিঁড়ি দিয়ে।

ট্রাউজার পরনে, কাঁধে একটা বড় ব্যাগ ঝোলানো।

তথাগত ওকে দেখে যেন চিনতে পারে না।

সুনীলা হাসে, এগোয়।

তথাগত দুটো সিঁড়ি পিছিয়ে উঠে ডাকে, শীগগির এস শান্তা।

শান্তা! সুনীলার মুখের রক্ত এক নিমেষে নীল হয়ে গেছে।

একটি দীর্ঘাঙ্গী ফরসা মেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, তারও কাঁধে একটা ব্যাগ ঝোলানো। ঘরের তালাটা টিপে দিয়ে তথাগতর কাছে আসতেই তথাগত ওর একখানা হাত প্রায় জড়িয়ে ধরে সুনীলার পাশ দিয়ে তরতর করে নেমে যায়।

মেয়েটি সুনীলার চেয়ে অনেক বেশী সুন্দরী। বুদ্ধির দীপ্তি চোখেমুখে স্পষ্ট।

কিন্তু এ বুদ্ধি কি শেষ পর্যন্ত থাকবে?

শিল্পালোক

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

শিল্পোৎকর্ষের লক্ষণ :

শিল্পসৃষ্টির উৎকর্ষ নির্ভর করে মুখ্যত: শিল্পী-মনের সংক্রামণ শক্তির (power of infection) উপর। যে শিল্পের সংক্রামণশক্তি যত পরিমাণে বেশী সেই শিল্প সে পরিমাণে সার্থক। শিল্পী-অন্তরের অনুভূতি যেমন বিচিত্র তেমনি সেই অনুভূতির গুণ ও পরিমাণগত প্রকারভেদও লক্ষণীয়। শিল্পী স্বীয় অন্তরের যে অনুভূতি অপরের অন্তরে সঞ্চার করে দেন সেই অনুভূতি খুব তীব্র হতে পারে, খুব মৃদুও হতে পারে; খুব গভীর হতে পারে, খুব তরলও হতে পারে; সূক্ষ্মও হতে পারে আবার স্থূলও হতে পারে। সেই অনুভূতির উৎসে থাকতে পারে শিল্পীর স্বদেশচেতনা বা আত্মপ্রীতি, নিয়তি বা ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ, প্রেমের উন্মাদনা (যেমন দেখা যায় অনেক উপন্যাসে), উচ্ছৃঙ্খল সম্ভোগচেতনা (যেমন দেখা যায় অনেক ছবিতে), দুর্দান্ত সাহসিকতা, আনন্দোল্লাস (যেমন নাচ দেখে), হাস্যরস (যেমন কৌতুকপূর্ণ গল্পে), সৌন্দর্যচেতনা বা বিস্ময়বোধ। কিন্তু কথা হচ্ছে শিল্পী-অন্তরের কি ধরনের এবং কোন্ অনুভূতি সার্থক রসসৃষ্টির সহায়ক ?

এই প্রশ্নে এসে জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও সমালোচকেরা বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কোন কোন শিল্প-সমালোচক বলেন, অনুভূতি গভীর হোক বা তরল-ভাবাপন্ন হোক, তাতে কিছু যায়-আসে না। শিল্পসৃষ্টির উৎকর্ষ নির্ভরশীল অনুভূতির প্রকাশে। অর্থাৎ সার্থক শিল্পের প্রধান পরিচয় তার বিষয়বস্তুতে নয়, তার রূপাঙ্গিকে, তার উপভোগ্যতায়। এই বিষয়ে যে বিতর্ক আছে সে সম্পর্কে আলোচনায় অগ্রসর না হয়ে বর্তমানে অনুভূতির উৎস সম্পর্কেই আলোচনা করা যাক। হৃদয়ের যে প্রদেশে অনুভূতি জন্মলাভ করে সেই উৎসে যদি একটা অনাবিল আনন্দোজ্জ্বল প্রশান্তি না থাকে, সেই অনুভূতির উৎসে থাকে যদি একটা অস্থিরতা, অবিশ্বাস, চাঞ্চল্য, তা হলে সে-অনুভূতির প্রকাশে আনন্দতন্ময় শিল্পসৃষ্টি হবে কী করে ?

এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী টলস্টয় বলেন, যা মানুষের ধর্মবিবেক (Religious perception) থেকে উদ্ভূত হয় তাই হল অনুভূতি। ধর্মবিবেক বলতে অবশ্য তিনি কোন সঙ্কীর্ণ ধর্মচেতনাকে লক্ষ্য করেন নি। যে অনুভূতি মানুষের চিত্তে সৎ, চিৎ ও আনন্দের ভাব সৃষ্টি করে সেই চেতনাই মানুষের ধর্মবিবেক। শিল্পী-শ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথও এ-সম্পর্কে টলস্টয়ের সঙ্গে একমত।

জীবন-শিল্পী টলস্টয় প্রকৃত শিল্পকর্মের লক্ষণ নির্ণয় করেছেন এ-ভাবে: প্রথমতঃ, যে বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে শিল্প সৃষ্টি হয় তার সঙ্গে স্রষ্টার থাকবে একটা অন্তরঙ্গ মনের যোগ; দ্বিতীয়তঃ, শিল্পকর্মের অঙ্গসজ্জা এবং সুষমা হবে চিত্তাকর্ষক; তৃতীয়তঃ, যে বিষয়কে শিল্পী শিল্পকর্মে রূপ দেবার প্রয়াস পাবেন তার প্রতি তাঁর থাকবে গভীর ভাবতন্ময় প্রীতি।

টলস্টয়-বর্ণিত শিল্পোৎকর্ষের এই সমস্ত লক্ষণের ভিতর সর্বজনীন সত্যের ইঙ্গিত আছে সন্দেহ নেই। তথাপি নন্দনতাত্ত্বিকদের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে শিল্পের উৎকর্ষ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব হয়েছে দেখা যায়। টলস্টয় তাঁর সুবিখ্যাত 'What is Art ?' গ্রন্থে তিনটি মুখ্য মতবাদের উল্লেখ করেছেন।

প্রথমতঃ, একদল শিল্পতাত্ত্বিকের মতে শিল্পকর্মের উৎকর্ষ নির্ভর করে বিষয়ের গুরুত্বের উপর। অর্থাৎ যে বিষয় মানুষের কাছে কল্যাণধর্মী, নীতিপ্রদ এবং শিক্ষামূলক, শুধুমাত্র সে সমস্ত বিষয় নিয়েই উৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টি সম্ভব। উক্ত মতবাদীদের মতে ধর্মনীতি সমাজ এবং রাজনীতি-সম্পর্কীয় সত্যকে যখন চমৎকার চিত্তাকর্ষক সজ্জায় সজ্জিত করা হয় তখনি তাকে বলা যায় শিল্পকর্ম।

শিল্পোৎকর্ষ সম্পর্কে দ্বিতীয় মতবাদীরা হলেন সৌন্দর্য-তাত্ত্বিক বা কলাকৈবল্যবাদী। তাঁদের মতে সত্যিকারের শিল্পকর্মের মূল্য নির্ভর করে আঙ্গিক-সৌন্দর্যের উপর। এঁরা মনে করেন, শিল্পের প্রকৃত শিল্পত্ব নির্ভর করে প্রকাশের মনোহারিত্বে। এই মতবাদীদের মতে শিল্পসৃষ্টির প্রধান উপকরণ হল শিল্পীর টেক্‌নিক। এই টেক্‌নিকের সাহায্যে শিল্পী এমন শিল্পমূর্তি সৃষ্টি করেন, যা দেখলে বা পড়লে পাঠকের মন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। কোন সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য, সুন্দর ফুল বা ফল, কোন নগ্নমূর্তি বা নৃত্যের দৃশ্য—যা দেখলে মানুষের মনে একটা তৃপ্তির ভাব আসে—তাই হল শিল্পকর্ম।

শিল্প সম্পর্কে তৃতীয় মতবাদীরা হলেন—বাস্তববাদী। এঁদের মতে শিল্পের প্রকৃত পরিচয় হল বাস্তবের যথাযথ রূপ-প্রকাশে। বাস্তবজীবনের প্রতিবিম্ব যখন কোন সৃষ্টি-কর্মের উপর পড়ে তখনি তাকে বলা চলে প্রকৃত শিল্পকর্ম। এঁরা বলেন, বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বা প্রকাশের সৌন্দর্যের উপর শিল্পসৃষ্টি ততটা নির্ভরশীল নয়, যতটা নির্ভরশীল বাস্তবের তথ্যনিষ্ঠ রূপ দেবার ক্ষমতার উপর।

উক্ত তিনটি মতবাদের মধ্যে শিল্পের উৎকর্ষ সম্পর্কে যে আংশিক সত্য নিহিত রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। এই সমস্ত মতের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায়, কারুশিল্পের মত চারুশিল্পও নিত্য-নিয়ত সৃষ্টি করা সম্ভব এবং বাস্তবক্ষেত্রে দেখাও যাচ্ছে উৎকর্ষের দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য হোক বা না হোক, শিল্পজগতে সৃষ্টির পরিমাণ ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে। শিল্পের আদর্শ সম্পর্কে উক্ত তিনটি মতবাদ এত বিরোধীভাবাপন্ন যে প্রকৃত শিল্পকর্মের সঙ্গে মূল্যহীন শিল্পসৃষ্টির বিভেদরেখা টানা সাধারণ শিল্পামোদীর কাছে শক্ত হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া বর্তমান শিল্পসৃষ্টি-কর্মে এ-ও দেখা যাচ্ছে, শিল্পের সংজ্ঞা ও পরিধি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অনেক মূল্যহীন তুচ্ছ সৃষ্টিও যে শিল্পের শ্রেণীভুক্ত হয়েছে তা নয়, অনেক অনিষ্টকর ভাব এবং বস্তুও শিল্পজগতে অনধিকার প্রবেশ করে সৌন্দর্যসৃষ্টির নামে শিল্পামোদীর মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। এই মন্তব্য শুধু আধুনিক বাংলা বা ভারতের শিল্পজগৎ সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়, সমগ্র বিশ্বের শিল্পলোকে এই নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি দেখে সত্য কল্যাণ ও আনন্দবাদী বিবেকবান্ শিল্পস্রষ্টারা ভীত হয়েছেন।

এর পর প্রশ্ন ওঠে, তা হলে প্রকৃত শিল্পকর্ম কী? টলস্টয় বলেন, শিল্পকর্ম হল সেই ধরনের মানস-ক্রিয়া যা মানুষের অস্পষ্টভাবে অনুভূত ভাব বা চিন্তাকে স্বচ্ছ করে তোলে—যার ফলে তা অপরের অন্তরে সহজেই সংক্রামিত হয়।

সাম্প্রতিক কালে আমাদের শিল্পীদের একটা প্রবণতা হল স্বল্প-জানা বা সাধারণ মানুষের নিকট অজানা বা অচিন্তিতপূর্ব জীবনপরিবেশ ও তথ্যকে শিল্পকর্মের বিষয়ীভূত করে সেই সৃষ্টিকে পাঠক বা দর্শকের নিকট চমকপ্রদ করে তোলা। শিল্পসৃষ্টিতে এরূপ কৌশল অবলম্বনকে ঐন্দ্রজালিকের সস্তায় 'স্টাণ্ট' দেওয়ার প্রবৃত্তির সঙ্গে তুলনা করা চলে। শিল্পের উৎকর্ষ চিন্তায় টলস্টয় স্রষ্টার উক্ত প্রবণতা সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তা খুবই উল্লেখযোগ্য। টলস্টয় বলেন—"Though a work of art must always include something new, yet the revealation of something new will not always be a work of art." প্রবীণ শিল্পীর এই উল্লেখযোগ্য অভিমতটি আমাদের শিল্পবিলাসী তরুণ শিল্পীদের চিন্তার যোগ্য। তাঁদের এই নতুন জীবন-আবিষ্কারের মধ্যে দেখা যাচ্ছে সরস্বতীর কমলবনে মদমত্ত হস্তীর অস্থির পদক্ষেপ। তাঁরা তাঁদের অস্থির পদচারণা সংযত করে শিল্পসৃষ্টির উৎকর্ষ সম্পর্কে জীবনশিল্পীর অভিমত কি শুনুন। টলস্টয় বলেন, প্রকৃত শিল্পসৃষ্টির জন্য শিল্পীর নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দিকে লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক:

প্রথমতঃ—যে নতুন ভাববস্তু নিয়ে শিল্পী শিল্প-রচনায় অগ্রসর হবেন তা মানবজাতির পক্ষে মূল্যবান বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ—সেই ভাববস্তুর প্রকাশ স্বচ্ছ হওয়া প্রয়োজন যাতে সাধারণ লোক তা সহজে বুঝতে পারে।

তৃতীয়তঃ—যে ভাবপ্রেরণা শিল্পীকে নবসৃষ্টিকার্যে অনুপ্রাণিত করবে তা যেন তাঁর অন্তর্নিহিত প্রয়োজনের তাগিদ থেকেই উত্থিত হয়, বাইরের কোন প্রলোভনের ফলে নয়।

নতুন তথ্যপুঞ্জের সমাবেশ বা তত্ত্বের কচকচিকে ঠিক নবসৃষ্টি বলা চলে না। নবসৃষ্টি হল দ্রষ্টা শিল্পীর অন্তরোত্থিত মানবসমাজের প্রতি নবীন বাণী। টলস্টয় মনে করেন, যে সৃষ্টির মধ্যে জীবনদ্রষ্টার এই নবীন বাণীর পরিচয় নেই, সেই সৃষ্টিকে শিল্পকর্ম বলা চলে না। শুধু তাই নয়, অন্তরপ্রেরণার বশেও যদি শিল্পী তুচ্ছ ও অনাবশ্যক বিষয়কে বুদ্ধিদীপ্ত ভঙ্গীতে শিল্পকর্মে প্রকাশ করেন, সেই প্রয়াসকেও ঠিক শিল্পসৃষ্টি বলে অভিহিত করা যায় না।

শিল্পসৃষ্টির নামে অনাসৃষ্টির বাহুল্যের যুগে উক্ত মতটির সারবত্তা আমাদের নবীন শিল্পীদের অনুধাবনযোগ্য।

শিল্পের উৎকর্ষ আলোচনায় টলস্টয় আরও মনে করেন, শিল্পীর অকৃত্রিম হৃদয়ভাবের পরিচয় যতই থাক্ না কেন, শিল্পের প্রকাশ যদি অবোধ্য বা দুর্বোধ্য হয় তা হলে তাকেও ঠিক শিল্পকর্ম বলা চলে না (কথাটা আমাদের আধুনিক কবিদের ভাববার যোগ্য)। এ ছাড়া উক্ত জীবন-শিল্পীর মতে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বা প্রকাশের স্বচ্ছতা সত্ত্বেও সেই সৃষ্টিকে যথার্থ শিল্পকর্ম বলা চলে না যদি সেই সৃষ্টির প্রেরণা শিল্পীর গভীর অন্তরপ্রদেশ থেকে উত্থিত না হয়। এ ছাড়া কোন অভিসন্ধিপ্রণোদিত হয়ে শিল্পী যখন কিছু সৃষ্টি করেন তাকেও ঠিক শিল্পসৃষ্টি বলা চলে না। এরূপ অভিসন্ধিপরায়ণ শিল্পীকে আমাদের শিল্পীশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র তস্করের সঙ্গে তুলনা করতেও দ্বিধা করেন নি।

প্রকৃত শিল্পকর্মের লক্ষণ নির্ণয় করতে গিয়ে টলস্টয় বলেন : (১) শিল্পের বিষয়বস্তু শুধু অজ্ঞাতপূর্ব হলেই হবে না, সেই বিষয়বস্তু মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয় হওয়াও প্রয়োজন ; (২) শিল্পের প্রকাশ হবে স্বচ্ছ যা সকলের কাছে বোধগম্য হয় ; (৩) শিল্পপ্রেরণার উৎসে থাকবে শিল্পী-মনের কোন অন্তর্নিহিত সংশয়-সমাধান প্রয়াস। টলস্টয় বলেন, এই তিনটি বৈশিষ্ট্য যে-সৃষ্টিতে আংশিকভাবেও বর্তমান তাকে বলা চলে শিল্পকর্ম, আর যে-সৃষ্টিতে এর একটি বৈশিষ্ট্যও অনুপস্থিত, তাকে ঠিক শিল্পকর্ম নামে অভিহিত করা চলে না।

শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের লক্ষণ নির্ণয়ে জীবন-শিল্পী টলস্টয় প্রকাশের স্বচ্ছতার উপরে যে বিশেষ জোর দিয়েছেন এই যুগের সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিল্পীমহলেও তা স্বীকৃত হবে না নিশ্চয়ই। শিল্পে মানবমনের যে ভাব ও ভাবনা রূপ পায় তা শুধু চেতন স্তরের নয়, অবচেতন স্তরেরও। এই অবচেতন মনের স্তরে মানুষের যে সমস্ত চিন্তা নিত্যনিয়ত ক্রিয়াশীল, তার রূপ মানুষের জ্ঞানের জগতে অস্পষ্ট, অস্বচ্ছ। সেই অস্পষ্ট ভাব, অনুভূতি, অভীপ্সা বা বেদনা যখন শিল্পীর শিল্পসৃষ্টিতে আত্মপ্রকাশ করে, তখন সেই শিল্পে অস্পষ্টতা আসতে বাধ্য। শিল্পে এই অস্পষ্টতার স্বীকৃতি ও অভিব্যক্তি পাশ্চাত্ত্য দেশের প্রতীকী আন্দোলনে (symbolist movement)। প্রাচ্যদেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পী রবীন্দ্রনাথও এই অস্পষ্ট প্রতীকী শিল্পের (symbolist art) সমর্থক। তাঁর কোন কোন সার্থক নাটকে (অচলায়তন, রক্তকরবী, মুক্তধারা, কালের যাত্রা প্রভৃতি) এবং মানবমনের সূক্ষ্ম ভাবব্যঞ্জনাময় কাব্যধর্মী কোন কোন উপন্যাসে (চতুরঙ্গ) আধুনিক শিল্পীর এই প্রতীকতাপ্রীতি প্রবল প্রত্যয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। সাম্প্রতিক কালে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেরই শক্তিমান বহু শিল্পী এবং বিদগ্ধ শিল্প-সমালোচক প্রতীকী শিল্পকে রসোত্তীর্ণ শিল্পের নিদর্শন হিসেবে প্রাধান্য দিচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'Personality' নামক গ্রন্থে সত্যের স্বরূপ ব্যাখ্যায় স্পষ্টতঃ ঘোষণা করেছেন : "Clearness is not necessarily the only or the most important aspect of the truth." পাশ্চাত্ত্য মনীষী এড্মণ্ড বার্কও সত্যের অস্পষ্টতার সমর্থনে বলেছেন : "A clear idea is another name for a little idea." আমাদের যে অনুভূতি যুক্তিনির্ভর জ্ঞানের জগতে সীমাবদ্ধ সেই

অনুভূতির প্রকাশও স্বচ্ছ। কিন্তু যে অনুভূতির উৎস মানুষের ভাবনির্ভর অন্তর্লোক সেই অনুভূতির প্রকাশও অস্পষ্ট—রহস্যময়। পাশ্চাত্ত্য শিল্পী-মনীষী জোশুয়া রেনল্ডস্ সেজন্য অস্পষ্টতাকে বলেছেন একপ্রকার মহৎ ভাবের অভিব্যক্তি (Obscurity is one sort of the sublime)। যে সৌন্দর্য স্বরূপে প্রকাশিত সেই সৌন্দর্যের ভিতর মানুষের দৃষ্টি স্বচ্ছন্দবিহারের অবকাশ পায়, কিন্তু কল্পনা অবাধে পাখা বিস্তার করতে পারে না। অস্পষ্ট সৌন্দর্যের ভিতরই মানুষের কল্পনা-বিকাশের অবকাশ আছে। সেজন্য আধুনিক সৌন্দর্যতাত্ত্বিকমাত্রই স্বীকার করেন রূপক এবং সাঙ্কেতিক শিল্পেই শিল্পের চরম অভিব্যক্তি ঘটেছে।

জীবন-শিল্পী টলস্টয়ের মতে শ্রেষ্ঠ শিল্পের অন্যতম পরিচয় হল তার নৈতিক আবেদনে। যে শিল্পের বিষয়বস্তু প্রয়োজনীয় এবং আবেদন সর্বলোকাশ্রয়ী সেই শিল্প নীতিনির্ভর হতে বাধ্য। কিন্তু কলাকৈবল্যবাদীরা তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন তুলবেন, সুনীতি-দুর্নীতির প্রশ্ন তুলে ব্যাপারটিকে ঘুলিয়ে তোলা হয়েছে, শিল্প তো নীতিশাস্ত্রের কোড্ নয় যে তা নীতিমূলক হতে বাধ্য। শিল্পের উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি, এবং এই রস সৌন্দর্যসম্ভব; অতএব যে শিল্পকর্মে সৌন্দর্যের নিখুঁত প্রকাশ হয় সেই শিল্পই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু কথা ওঠে, যে শিল্পের আবেদন দুর্নীতিমূলক সেই শিল্পকে সুন্দর সৃষ্টিকর্ম বলা চলে কিনা? আমাদের দেশের শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন তত্ত্বজ্ঞানী মনীষী। সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—যা 'aesthetically beautiful' তাই সুন্দর। আধুনিক জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী রবীন্দ্রনাথও আর্টের অহেতুকী প্রেরণাকে স্বীকার করে নিয়েও শ্রেষ্ঠ শিল্পের অন্যতম অঙ্গ হিসাবে নীতিবোধের প্রেরণাকেও স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন নি। রবীন্দ্রনাথের মতে দুর্নীতির আবেদন চিত্তের উত্তেজনায় এবং সুনীতির আবেদন চিত্তের প্রশান্তিতে। তিনি বলেন, 'উত্তেজনাকে আনন্দ ও বিকৃতিকে সৌন্দর্য বলিয়া ভুল করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক'; কিন্তু 'সৌন্দর্যবোধকে পূর্ণভাবে লাভ করিতে হইলে চিত্তের শান্তি চাই।' (সাহিত্য, পৃ. ৩৪)

শিল্পের উৎকর্ষ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই ভাবগভীর কথাটি আমাদের আধুনিক শিল্পীদের বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

শিল্পসৃষ্টির উৎকর্ষ সম্পর্কে উক্ত ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে কোন্ শিল্পকর্ম অসম্পূর্ণতার লক্ষণাক্রান্ত সে বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায়। প্রবীণ শিল্পী টলস্টয় একপেশে শিল্পসৃষ্টির শ্রেণীবিভাগ করেছেন এভাবে:

(ক) যে শিল্পকর্মে শুধু বিষয়বস্তুরই প্রাধান্য
(খ) শুধুমাত্র আঙ্গিক-সৌন্দর্যে যে শিল্প স্বতন্ত্র
(গ) যে শিল্প শুধুমাত্র অকৃত্রিম হৃদয়ানুভূতি-প্রধান

শিল্পসৃষ্টির প্রকারভেদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তরুণ শিল্পীদের শিল্পপ্রয়াসে হয়তো অকৃত্রিমতা আছে, কিন্তু তাঁদের বিষয়বস্তুতে গুরুত্বের অভাব, কিংবা ফর্মে আপেক্ষিক সৌন্দর্যের অভাব। অপর পক্ষে প্রাচীন শিল্পীদের শিল্পকর্ম বিষয়গৌরবে গৌরবান্বিত হলেও আঙ্গিক-সৌন্দর্যের হীনতায় ম্লান। আবার মৌলিক প্রতিভাহীন শিল্পীর রচনায় বিষয়গৌরব এবং অকৃত্রিমতার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে সাধারণতঃ আঙ্গিকসজ্জার চমকপ্রদ ঔজ্জ্বল্য।

শিল্পসৃষ্টির চরমতম উৎকর্ষ সম্পর্কে শেষ কথা এখনও উচ্চারিত হয় নি, কোনদিন হবে কিনা সন্দেহ আছে। তবে বিভিন্ন যুগের শিল্পরচনার ধারার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এক যুগে শিল্পসৃষ্টি এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করে বিকাশলাভ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ক্লাসিক যুগের শিল্পরচনায় বিষয়বস্তুর মূল্য স্বীকৃত হত বেশী; পরবর্তীকালের শিল্পকর্মে স্পষ্টতা বা আন্তরিকতার দাবি যত প্রবল হয়ে উঠেছিল তা ছিল শিল্পসৃষ্টির প্রথম যুগে অনুপস্থিত। মধ্যযুগে দেখা যায়, শিল্পকর্মে সৌন্দর্যসৃষ্টির দাবি উঠছে প্রখর হয়ে, অথচ যে বিষয়গৌরব বা শিল্পীমনের অকৃত্রিমতা পূর্বযুগে শিল্পসৃষ্টির উৎকর্ষের লক্ষণ বলে স্বীকৃত হত তার মূল্য গেছে অনেক কমে। আবার বর্তমান যুগে দেখা যাচ্ছে, শিল্পের দাবি কেন্দ্রীভূত হয়েছে অকৃত্রিমতা ও বাস্তবধর্মিতার উপর। অথচ পূর্বযুগের শিল্পোৎকর্ষের মান হিসাবে যে সৌন্দর্য, বিশেষতঃ বিষয়গৌরবের যে দাবি মুখ্যতঃ স্বীকৃত হত—সেই মানের যথেষ্ট অবনতি দেখা যাচ্ছে। সাম্প্রতিককালের শিল্পকর্মে বিষয়গৌরব স্বীকৃত হলেও সেই শিল্প ক্রমশঃ অস্পষ্ট, সঙ্কেতধর্মী এবং ভঙ্গীপ্রধান হয়ে উঠছে। এ ছাড়া এ যুগের বিশিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদীদের মতে শিল্প সেই পরিমাণে সার্থক যে পরিমাণে তা সমাজের প্রয়োজনের দাবি মেটাতে সমর্থ।

অনাগত ভবিষ্যতে সমাজচিন্তার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পোৎকর্ষের মান সম্পর্কে মানুষের ধারণা যে আরও পরিবর্তিত হবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

উইলিয়ম হিকি (৮)

১৭৮৫ সনের এপ্রিল মাসে বেঞ্জামিন মী (Benjamin Mee) নামে আমার এক বন্ধু বিলেত থেকে বাংলাদেশে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর পিতা লণ্ডন শহরের একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী এবং 'ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডে'র অন্যতম ডিরেক্টর ছিলেন। লণ্ডনে তিনি রীতিমত বিলাসিতার মধ্যে জীবন কাটিয়েছেন এবং অর্থের অপব্যয়ও করেছেন যথেষ্ট। তা ছাড়া, নানারকমের ফাটকাবাজিতেও অনেক টাকা লোকসান দিয়েছেন। অবশেষে দেনার দায়ে পৈতৃক সম্পত্তির প্রায় অধিকাংশই তিনি পাওনাদারদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হন। বন্ধুবান্ধবরা তখন তাঁকে পরামর্শ দেন, ভাগ্যান্বেষণের উদ্দেশ্যে ভারতযাত্রা করতে। বাংলার সেনাবাহিনীতে একজন ক্যাডেটের চাকরি নিয়ে তিনি এদেশে আসেন। উদ্দেশ্য যে চাকরি করা নয় তা বোঝাই যায়। ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষপুটে কোনরকমে একবার এদেশে পৌঁছে, স্বাধীনভাবে কিছু করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। আমার সঙ্গে তাঁর ইংলণ্ডেই আলাপ হয়, এবং বন্ধুত্বও গভীর হয় দুজনের মধ্যে।

বেঙ্গল ব্যাঙ্ক

কলকাতা শহরে পৌঁছবার অল্পদিনের মধ্যেই বেঞ্জামিন ক্যাডেটের চাকরি ছেড়ে দেন এবং বেঙ্গল ব্যাঙ্কে অংশীদাররূপে যোগদান করেন। তখন ব্যাঙ্কের আরও দুজন অংশীদার ছিলেন, জেকব রাইডার ও মেজর মেটকাফ, দুজনেই আমার বন্ধু। ব্যাঙ্কের ব্যবসা খুবই জমে উঠেছিল এবং লাভও হচ্ছিল যথেষ্ট। সারা এশিয়া মহাদেশের ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত এলাকায় বেঙ্গল ব্যাঙ্কের নোট চালু হয়েছিল বেশ, নগদ টাকার মতনই তার লেনদেন হত সর্বত্র। এত বেশী পরিমাণ টাকার নোট চলত ব্যাঙ্কের, যা তখনকার দিনে সত্যিই কল্পনা করা যায় না। কিন্তু মানুষ সব সময় স্থিরবুদ্ধি ও দূরদৃষ্টি নিয়ে কাজ করে না, এমন কি নিজের মঙ্গল ও স্বার্থ কোথায় তাও বোঝে না। বেঙ্গল ব্যাঙ্কের অংশীদারদেরও তাই হল। তাঁরা দুর্বুদ্ধির বশবর্তী হয়ে, ব্যাঙ্কের উন্নতির দিকে মনোযোগ না দিয়ে, নানারকমের বাণিজ্যের ও অর্থ উপার্জনের পরিকল্পনা করতে লাগলেন। কতকগুলি পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যেতে, বাজারে তাঁদের সুনাম ক্ষুণ্ণ হল, লোকের আস্থা ভেঙে গেল তাঁদের উপর। লোকের বিশ্বাস হারালে ব্যাঙ্কের ব্যবসা চালানো যায় না। কিছুদিনের মধ্যেই তাই তাঁদের ব্যাঙ্কের দ্রুত অবনতি শুরু হল, এবং অবশেষে প্রতিষ্ঠানটি উঠেও গেল।

কোম্পানির একজন অতি-বুদ্ধিমান কর্মচারী

এই প্রসঙ্গে টমাস হেন্‌চম্যানের কথা মনে পড়ছে। বিলেত থেকে একই জাহাজে তিনি বেঞ্জামিনের সঙ্গে বাংলাদেশে এসেছিলেন। কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে তাঁর মতন বুদ্ধিমান চালাক লোক তখন আর কেউ ছিলেন কিনা সন্দেহ। বেশ কয়েক বছর তিনি বাংলাদেশে ছিলেন কোম্পানির কন্‌ট্র্যাক্টর হিসেবে, এবং ইয়োরোপের বাজারের জন্য পোশাক-কাপড় সরবরাহ করাই তাঁর কাজ ছিল। এই কন্‌ট্র্যাক্টরী করে তিনি এত ক্লান্ত হয়ে পড়লেন যে স্বদেশে ইংলণ্ডে তাঁকে ফিরে যেতে হল স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য। তিন বছর পরে তিনি আবার ফিরে এলেন কলকাতায়, কোম্পানির কন্‌ট্র্যাক্টর-রূপে নয়, মিলিটারী পে-মাস্টার-জেনারেলের বিরাট চাকরি নিয়ে। হেন্‌চম্যানের কৃতিত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই।

বন্ধু পট সন্নিধানে মুর্শিদাবাদ যাত্রা

মুর্শিদাবাদের নবাব-দরবারে আমার বন্ধু বব পট যে 'রেসিডেণ্ট' নিযুক্ত হয়েছিল, সে-কথা আগে বলেছি। বড় চাকরি পেয়েও পট যে তার অ্যাটর্নি বন্ধুর সুখদুঃখের কথা ভোলে নি তা বুঝলাম, যখন দেখলাম যে সে মুর্শিদাবাদ থেকে খোঁজখবর করে একটি সুন্দর এদেশী মেয়ে আমাকে কলকাতায় উপঢৌকন পাঠিয়েছে, আমার নিজের ভোগের জন্য (হিকির ভাষায়, 'for my private use')। মেয়েটির নাম কিরণ (অর্থাৎ কিরণবালা)। কিরণবালার সঙ্গে প্রায় বছরখানেক মনের সুখে একত্রে বাস করার ফল হল একটি পুত্রসন্তান। মনে মনে আমি মেনে নিতে বাধ্য হলাম যে সে আমারই সন্তান, যদিও তার ঘন কালো চুল ও কালো রঙ দেখে মনটা আমার আদৌ প্রসন্ন হয় নি। পুত্রের গায়ের ও চুলের রঙের কথা চিন্তা করে মধ্যে মধ্যে মনটা কেমন উদাস হয়ে যেত।

একদিন বাইরে থেকে বেড়িয়ে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত সময়ে বাড়ি ফিরে দেখলাম, মাদাম কিরণবালা ঘরের মধ্যে বিছানার উপর আমার একজন খিদ্‌মৎগারকে জড়িয়ে ধরে দিব্বি শুয়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে। পাশে নবজাত সন্তানটিও গভীর ঘুমে মগ্ন। আমি সন্তর্পণে পিছনের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকেছি, তাদের ঘুম ভাঙার কথা নয়। নিদ্রাভিভূত কিরণবালা ও খিদ্‌মৎগারকে ডাক দিতেই তারা উঠে বসে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। বোধ হয় ভাবছিল, আমি স্বপ্নের ছায়ামূর্তি, না, বাস্তব কায়ামূর্তি! আমি অবশ্য একটুও বিচলিত হই নি। তাদের ঘুম ও বিস্ময়ের ঘোর কাটার পর প্রশ্ন করে জানলাম যে কেবল আমি নই, আমার নোকর খিদ্‌মৎগারও কিরণবালার সঙ্গে সমানে এতদিন ধরে সহবাস করে এসেছে। নবজাত আবলুস কাঠের মতন পুত্রের জন্মরহস্যও অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেল। ভৃত্য ও কিরণবালা দুজনকেই সন্তানসহ বিদায় করে দিলাম বাড়ি থেকে। কিন্তু পরে যখন শুনলাম, কিরণ খুব দুঃখে দিন কাটাচ্ছে, তখন তার জন্য একটা মাসহারার বন্দোবস্ত করতে হল।

মেজর রাসেল কয়েক মাস ধরে পেটের অসুখে ভুগছিলেন। কিছুতেই তাঁর অসুখ সারছে না দেখে ডাক্তাররা তাঁকে হাওয়াবদল করতে বললেন। রাসেল ঠিক করলেন, মুর্শিদাবাদে পটের কাছে কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম নিতে যাবেন। আমাকে তাঁর সঙ্গী হিসেবে যাবার জন্য অনুরোধ করতে আমিও রাজী হলাম। অনেকদিন শহর ছেড়ে বাইরে যাই নি, মনটাও হাঁপিয়ে উঠেছিল। মুর্শিদাবাদ যাওয়া স্থির হয়ে গেল। একটি ভাল পানসি নানাবিধ খাদ্যদ্রব্যে ও পানীয়ে ভর্তি করা হল আমাদের মুর্শিদাবাদ সফরের জন্য। যাবার পথে নদীতীরের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে করতে চললাম। পলাশী-গৃহ—এবং পলাশীর সেই ঐতিহাসিক রণাঙ্গন দেখলাম, যেখানে ক্লাইব সিরাজের সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত স্থাপন করেছিলেন। কলকাতা থেকে নৌকোয় করে মুর্শিদাবাদ পৌঁছতে আটদিন সময় লাগল। পট থাকত আফজলবাগে কাশিমবাজারের নদীর তীরে, বহরমপুর সেনাবাস থেকে

তিন মাইল এবং মুর্শিদাবাদ শহর থেকে দু মাইল দূরে। এই মুর্শিদাবাদ শহরেই বাংলার নবাব তখনও বাস করতেন।

পট যে-বাড়িতে বাস করত, তা রাজপ্রাসাদ বললেও ভুল হয় না। বাড়িতে তার আসবাবপত্তর যথেষ্ট ছিল, সবই রাজকীয় স্টাইলের। পট থাকতও রাজার মতন। মেজর রাসেল ও আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করে পট তার প্রাসাদে নিয়ে গেল। আমার জন্য প্রাসাদের একটা দিক আগে থেকে সাজিয়েগুছিয়ে সে ঠিক করে রেখেছিল। পরম আরাম-বিলাসে বসবাস করার জন্য একজন মানুষের যা-কিছু প্রয়োজন হতে পারে, তার সবই সে ব্যবস্থা করেছিল। স্নানের জন্য ঠাণ্ডা-গরম জল থেকে আরম্ভ করে, এদেশে ভোগবিলাসের জন্য প্রয়োজন কোন সামগ্রীরই অভাব ছিল না।

পরদিন সকালে পটের সঙ্গে আমার বহরমপুর বেড়াতে যাওয়া স্থির হল। সকালে উঠে দেখলাম পটের প্রাসাদের বিশাল সোপানশ্রেণীর দু পাশে সারিবদ্ধ হয়ে সাজগোজ করে ভৃত্যরা দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমরা যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছিলাম তখন আমাদের তারা এদেশী কায়দায় সেলাম করতে লাগল। সিঁড়ি দিয়ে নেমে প্রাঙ্গণে পৌঁছতে দেখলাম, একদল সুসজ্জিত অশ্বারোহী চমৎকার সব আরবী ঘোড়ার পিঠের উপর সুন্দর ভঙ্গিতে বসে রয়েছে। তাদের কোমরের পাশে তলোয়ার ঝুলছে। সামনে আমাদের জন্য একটি বড় ফিটন প্রস্তুত ছিল। আমরা ফিটনে ওঠার সময় অশ্বারোহীরা তলোয়ার খুলে অভিনন্দন জানাল। এত সব চোখ-ধাঁধানো ব্যাপার দেখতে অভ্যস্ত নই বলে পটকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এসব আবার কি?" পট হাসতে হাসতে বলল, "এরা আমার দেহরক্ষী, সংখ্যায় ষাটজন। আমি যখন কোথাও বেরুই তখন এরা এইভাবে হাজ্‌রে দেয়।" ফিটনে উঠে পট যখন ঘোড়ার লাগাম ধরল, তখন দুজন অশ্বারোহী আগে দৌড়তে লাগল সামনে, এবং দশজন চলল পিছনে। এইভাবে রক্ষী-পরিবৃত হয়ে আমরা বহরমপুর পৌঁছলাম। সেনাবাসের অফিসাররা আমাদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ইয়োরোপীয় ও দেশী সৈন্যদের ব্যারাক দেখালেন। বহরমপুরের অন্যান্য সরকারী অফিস-ঘরবাড়িও দেখলাম। আমার দু'চারজন পুরনো বন্ধু তখন এখানে থাকতেন। তাঁদের মধ্যে কাশিমবাজার কুঠির প্রধান মিস্টার কেলি ও মুর্শিদাবাদের কমার্সিয়াল রেসিডেণ্ট মিস্টার এডওয়ার্ড ফেনউইকের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। অতঃপর কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে অন্যান্য পরিচিত বন্ধুবান্ধব যাঁরা ছিলেন তাঁদের বাড়ি-বাড়ি ঘুরে আমাদের নামের একটি করে কার্ড রেখে এলাম। হঠাৎ খবর না দিয়ে আসার জন্য তাঁদের অনেকের সঙ্গেই সাক্ষাৎ হল না। এইসব কাজ সারতেই বেলা বেড়ে গেল অনেক। মধ্যাহ্নভোজনের জন্য তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হল।

বেলা দুটোর সময় খাবার টেবিলে আমরা প্রায় তিরিশজন খেতে বসলাম। নবাগত অতিথি মেজর রাসেল ও আমি ছাড়া, পটের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব আরও কয়েকজন সেখানে থাকতেন। সকাল-সন্ধ্যায় প্রত্যেকের বেড়াবার জন্য গাড়ি ঘোড়া মজুত থাকত, পটের জন্য থাকত আলাদা একটি ফিটন। আমি যাবার পর পট বাড়ির প্রত্যেক লোকজনকে আমার প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে বলে দিয়েছিল, কারণ আমার যা পেশা তাতে বাইরে বেড়াবার অবকাশ খুব কম এবং কোন জায়গায় একবারের বেশী দুবার আসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব দুবেলা যাতে গাড়ি করে আমাকে এ-অঞ্চলের সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থান দেখিয়ে নিয়ে বেড়ানো হয়, তার ব্যবস্থা করারও নির্দেশ দিয়েছিল পট। প্রতিদিনের ভ্রমণ-তালিকাও সেইভাবে সে তৈরি করে দিয়েছিল। নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়ে দিনগুলো যে কেমন করে কেটে যেত তা আমি টেরও পেতাম না।

নবাব-দর্শন

অনেক জায়গার মধ্যে নবাবের প্রাসাদে বেড়াতে যাবার কথা স্বভাবতঃই বিশেষভাবে মনে আছে। যাবার আগের দিন পট নবাব-বাহাদুরকে খবর পাঠিয়েছিল যে সে তার বিশেষ অন্তরঙ্গ এক বন্ধুকে নিয়ে পরদিন সকালে

তাঁর প্রাসাদে দেখা করতে যাবে এবং তাঁর সঙ্গে ব্রেকফাস্ট খাবে। নির্দিষ্ট দিনে সকালে যখন আমরা নবাব-প্রাসাদে পৌঁছলাম, তখন নবাব আমাদের সাদর অভিনন্দন জানালেন, এবং আপ্যায়ন করে প্রাসাদের ভিতরে নিয়ে গেলেন। সাহেবী রুচি অনুযায়ী আমাদের জন্য ব্রেকফাস্টের চমৎকার আয়োজন করা হয়েছিল। খাওয়া শেষ হলে নবাব বাহাদুর নিজে আমাদের তাঁর বিশাল প্রাসাদের সমস্ত মহল ঘুরে ঘুরে দেখালেন। প্রাসাদের সংলগ্ন তাঁর উদ্যান দেখলাম, গাড়িঘোড়ার আস্তাবলও দেখলাম। নবাবের জীবনযাত্রার এইসব বিচিত্র উপকরণ দেখে যে রীতিমত চমৎকৃত হয়েছিলাম, তা বলাই বাহুল্য।

সাধু-দর্শন

নবাবের প্রাসাদ থেকে আফজলবাগে ফিরে আসার সময় পথে একজন এদেশী সাধু দেখলাম। দেখে মনে হল সাধুটি খোঁড়া এবং পথের ধারে দাঁড়িয়ে পথিকদের কাছে ভিক্ষা চাইছে, কিন্তু তার ভিক্ষা চাওয়ার ভঙ্গি অদ্ভুত। পথের ধারে দাঁড়িয়ে বিকট স্বরে সে চিৎকার তো করছেই, উপরন্তু যে সব অঙ্গভঙ্গি করছে তাও ভয়ংকর। পাশ দিয়ে যাবার সময় পট সাধুটিকে লক্ষ্য করে একটি টাকা ছুঁড়ে দিল। আশ্চর্য ব্যাপার দেখলাম, সাধুটি টাকার দিকে চেয়েও দেখল না, ততোধিক তাচ্ছিল্যের সঙ্গে অন্যদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে অনর্গল দুর্বোধ্য মাতৃভাষায় কি যেন বকবক করতে লাগল। কণ্ঠস্বর ও প্রকাশভঙ্গি থেকে মনে হল, সাধু রীতিমত ক্রুদ্ধ হয়ে কি বলছে। পটকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলল, সাধুটি নাকি অকথ্য ভাষায় আমাদেরই গালাগাল দিচ্ছে। পটের মতে তার কটূক্তির তাৎপর্য হচ্ছে এই :

"আরে হারামজাদা বিলেতি বাঁদর! দয়ার অবতার মনে করছ নিজেকে? তাচ্ছিল্য করে সাধুকে একটা টাকা ছুঁড়ে দিয়ে টাকার গরম দেখাচ্ছ হা-রা-ম-জা-দা! আরে বিলেতি বাঁদর, টাকার গরম কি দেখাচ্ছিস আমাকে! তাও বুঝতাম যদি অন্ততঃ একশো টাকা ছুঁড়ে দিতিস। বিলেতি বাঁদর হয়ে তোরা রাজপ্রাসাদে থাকিস, আর সাধু হয়ে আমার মাথা গোঁজার স্থান নেই। শত শত ভৃত্য তোদের সেবা করে, আর কীটপতঙ্গ মাছির উপদ্রবে আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠি! ব্যাটা বাঁদর, বড় অহংকার হয়েছে তোদের! সামনে-পেছনে ঘোড়সওয়ার ছুটিয়ে, পথের ধুলো উড়িয়ে লোকজন তাড়িয়ে রথ হাঁকিয়ে চলেছিস! নবাব রে! আবার এত বড় স্পর্ধা হয়েছে যে যাবার সময় ব্রাহ্মণ সাধুকে লক্ষ্য করে একটা ময়লা টাকা ছুঁড়ে দিচ্ছিস? হারামজাদা বিলেতি বাঁদর, ভেবেছিস এইভাবে দান করে স্বর্গে যাবি? তা হবে না, সে পথ বন্ধ। জঘন্য নরকে যাবি তোরা, এবং সেখানে যমরাজ তোদের অন্যায় অত্যাচার ও পাপের জন্য আষ্টেপৃষ্ঠে চাবুক মেরে শায়েস্তা করবে।"

পটের এই ব্যাখ্যা শুনে আমি অবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "পথে গাড়ি হাঁকিয়ে যেতে যেতে এত কথা তুমি শুনলে কি করে, এবং যদি বা শুনেও থাক তা হলে এদেশী ভাষার অর্থ বুঝলে কি করে? সবটাই তোমার কল্পনা নয় তো?" উত্তরে পট বলল যে, সে বহুবার পথ চলতে এই সাধুকে দেখেছে, তার কথা শুনেছে, এবং গাড়ি থেকে নেমে সাধুর সামনে দাঁড়িয়ে দোভাষীকে দিয়ে তার কটূক্তির অর্থ বুঝে নিয়েছে।

তিনদিন পরে নবাব-বাহাদুর সাড়ম্বরে পারিষদ-অনুচর পরিবৃত হয়ে আফজলবাগে পটের বাড়িতে এলেন সামাজিক শিষ্টতা রক্ষার জন্য। আমাদের তিনি নৈশ-ভোজের নিমন্ত্রণ করে গেলেন। সেদিন রাতে সদলবলে আমরা নবাব-প্রাসাদে গিয়ে পর্যাপ্ত ভূরিভোজে আপ্যায়িত হলাম, এবং তার সঙ্গে চমৎকার আতসবাজির উৎসবও দেখলাম।

খাঁটি বাঁদর দর্শন

অবশেষে একদিন অসংখ্য এদেশী বাঁদর দর্শনের পর আমার মুর্শিদাবাদ সফর শেষ হল। দশ-বিশটা বাঁদর নয়, কয়েক হাজার বাঁদর দেখলাম একসঙ্গে। তাদের ডেরা ছিল মুর্শিদাবাদ থেকে মাইল পাঁচেক দূরে একটি নিভৃত

আম্রকুঞ্জে। এ অঞ্চলের অনেক পর্যটক এই বানর-উপনিবেশ দেখতে আসতেন বলে তারা নর-সান্নিধ্যে বেশ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। নরমূর্তি দেখে বানরের দল আদৌ বিচলিত হত না, বরং বেশ নিকট আত্মীয়বন্ধুর মত সোৎসাহে লেজ তুলে দর্শকদের কাছে এসে ঘিরে বসত, এবং হাত-পা জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করত। কিচির-মিচির শব্দ ও কুৎসিত মুখভঙ্গিমা করে একপাল বাঁদর কাছে আসতেই আমি ভয় পেয়ে গেলাম। সঙ্গীরা আমাকে শান্ত করে বললেন, ভয় পাবার কিছু নেই, ওরা খাবার চাইছে। পট মধ্যে মধ্যে যখন বাঁদর দেখতে আসত তখন সঙ্গে করে প্রচুর পরিমাণে কেক মিষ্টি ও কলা নিয়ে আসত। বাঁদরগুলির হাবভাব দেখে মনে হল, সেদিনও যে আমরা এসব খাবার নিয়ে গেছি তা তারা জানে। কেক-মিষ্টি-কলা বিতরণ করার পর বাঁদরগুলি মহানন্দে তারস্বরে চিৎকার করতে করতে লাফ দিয়ে আবার গাছের ডালে উঠে গেল।

প্রত্যাবর্তনের পথে

পনের দিন এইভাবে আফজলবাগে কেটে গেল। আর থাকা চলে না, কলকাতায় ফিরতে হবে। মেজর রাসেল আরও কিছুদিন থাকবেন মনস্থ করলেন। পটের একখানি বগিগাড়িতে করে নির্দিষ্ট দিনে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করলাম। গাড়ি করে পলাশী-গৃহ পর্যন্ত পৌঁছে দেখলাম, সেখানে বেয়ারারা পালকি নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। গাড়ি থেকে নেমে পালকিতে চড়লাম। অনেকে দেখেছি, বেশ স্বচ্ছন্দে পালকির মধ্যে শুয়ে ঘুমিয়ে যেতে পারেন, আমি তা পারি না। পারতপক্ষে পথ চলাচলের জন্য যতদূর সম্ভব আমি পালকি এড়িয়ে চলি। এক্ষেত্রে গত্যন্তর নেই বলে বাধ্য হয়ে পালকিতে চলতে হল। পালকি-বেয়ারারা সাধারণতঃ ঘণ্টায় চার মাইল করে পথ চলে, সূর্যাস্তের পর ছায়া নামলে তার চেয়ে বেশীও যেতে পারে। দিনের বেলা রোদের তাপে পালকি বইতে তাদের খুবই কষ্ট হয়। পালকির পেছনে আরোহীর মালপত্তর নিয়ে কুলিরা দৌড়তে থাকে। পথ দীর্ঘ হলে স্বভাবতঃই একদল বেয়ারা আগাগোড়া পালকি বইতে পারে না। সমস্ত পথটা বিভিন্ন 'স্টেজে' বা পর্বে ভাগ করা থাকে, সাধারণতঃ আট মাইল অন্তর এক-একটি পর্বের শেষ হয়। দুই পর্ব পর্যন্ত পথ চলার পর বেয়ারা-বদল হয়, অর্থাৎ একদল বেয়ারা ষোল মাইল পথ পালকি টানে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তখন গ্রীষ্মকাল এবং গরমও এত বেশী যে হেঁটে পথ চলাই দুঃসাধ্য। তার উপর অধিকাংশ চলার পথই হল খোলা মাঠের বুকের উপর দিয়ে। যেদিকে চেয়ে দেখ সেদিকেই কেবল মাঠ আর মাঠ। ধুধু করছে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ, রোদের হল্‌কা ছুটছে মাটি দিয়ে, গাছপালা ঝোপঝাড় কিছুরই চিহ্ন নেই কোথাও। মাথার উপরে ঝকমকে নীল আকাশ, তার মধ্যে জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডের মত সূর্য চারিদিক যেন ঝল্‌সে দিচ্ছে। বেয়ারা প্রায় আটক্রোশ পথ চলার পর রোদের ঝলসানিতে মুষড়ে পড়ল, কাতরস্বরে বলল, "সাহেব, আর আমরা পালকি বইতে পারব না।" তাদের মুখের দিকে চেয়ে বুঝলাম, আর এক পাও পালকি টানার ক্ষমতা নেই তাদের। অন্য একদল বেয়ারা তারা খোঁজ করল, কিন্তু গ্রাম কোথায় আর লোকই বা কোথায়? নেড়া মাঠের মধ্যে অসহায় অবস্থায় পালকিতে বসে রইলাম। প্রায় ঘণ্টাখানেক বসে থাকার পর অসহ্য গরমে অনিশ্চয়তার মধ্যে ছটফট করছি, এমন সময় মাথায় এক মতলব খেলে গেল। এর মধ্যে বেয়ারাদেরও প্রায় ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নেওয়া হয়ে গেছে। তাই ভাবলাম কিছু বেশী পয়সা বকশিশ বা ঘুষ দেবার লোভ দেখালে হয়তো তারা উৎসাহিত হতে পারে। টাকাপয়সা, বিশেষ করে বকশিশ ও ঘুষ এমন জিনিস যে তাতে সব জাতের মানুষের ওপর সমান ক্রিয়া হয়। এদেশে এসে এ অভিজ্ঞতা আরও বেশী করে লাভ করেছি। নির্জীব মানুষকে ঘুষ সজীব করে তোলে, অথর্ব ও পঙ্গুকে নতুন জীবনীশক্তি দান করে। ঘুষের জাদুস্পর্শে খোঁড়াও সোজা হয়ে দৌড়তে আরম্ভ করে। অতএব বেয়ারাদের কাছে বেশ লোভনীয় ঘুষের

প্রস্তাব করলাম। সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম তারা চাঙ্গা হয়ে উঠল, বুক টান করে সোজা হয়ে দাঁড়াল, এবং দ্বিগুণ উৎসাহে পালকির বাঁট কাধে তুলে হনহন করে পথ চলতে লাগল। কিন্তু মানুষ তো, শক্তির সীমা আছে। ঘুষের মাদকতায় তারা মাত্র ছ মাইল পথ পালকি বয়ে নিয়ে গেল। তারপর বিশাল এক জনশূন্য প্রান্তরের মধ্যে আমাকে নামিয়ে দিয়ে বলল, "আর পারব না।" তখন প্রায় দ্বিপ্রহর, সূর্যের তাপে গোটা মাঠটা জলন্ত চুল্লীর মত গন্‌গন্‌ করছে। বহু কাকুতি-মিনতি করে ও টাকার লোভ দেখিয়েও আর কোন ফল হল না। তাদের ভাবগতিক দেখে মনে হল, আর এক পাও চলতে তারা রাজী নয়। নিজেদের মধ্যে চাপা স্বরে কিছুক্ষণ কি যেন তারা আলাপ করল, তারপর আমাকে মাঠের মধ্যে ফেলে হঠাৎ এমন ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে আরম্ভ করল যে আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম। কি ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারলাম না। অনেকদিন হয়ে গেল এদেশে আছি, এ রকম বিচিত্র অভিজ্ঞতা এর আগে কখনও হয় নি। সেদিন মনে হল, এই মাঠের মধ্যেই বোধ হয় আমাকে দগ্ধে দগ্ধে মরতে হবে।

তাকিয়ে দেখলাম, শূন্য মাঠের উপর দিয়ে বেয়ারারা প্রাণপণে দৌড়চ্ছে, প্রায় মাইল তিনেক দূরে একটা গাছের ঝোপের মত কি দেখা যাচ্ছে সেইদিকে। সেটা কোন্‌ দিক, পুব পশ্চিম, না উত্তর দক্ষিণ, এবং ওই ঝোপটাই বা কিসের, কিছুই উপলব্ধি করতে পারলাম না। মাথার ঘিলু রোদের তাপে গলে তরল হয়ে গেছে মনে হল। মাথাটা ভোঁ ভোঁ করে ঘুরতে লাগল, মনে পড়ল ১৭৫৭ সনে কলকাতার অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী। সূর্যাস্তের পর ছায়া নামলে যে নিশ্চিন্ত হব তাও তখন ভাবতে পারছি না। কারণ আগেই শুনেছি, এ অঞ্চলে বাঘের উপদ্রব ভয়ংকর, এবং সন্ধ্যার অন্ধকারে শিকারের সন্ধানে তারা বাইরে বেরোয়। দিনে রোদ এবং রাতে বাঘ, এই ভয়াবহ উভয়-সংকটের চিন্তায় কাতর হয়ে পড়লাম। একবার মনে হল রোদে পুড়ে মরার চেয়ে বাঘের পেটে যাওয়া ভাল, আবার পরক্ষণেই বাঘের পেটে যাওয়ার আতঙ্কে শিউরে উঠে ভাবলাম রোদে দগ্ধে মরা অনেক ভাল। নানারকমের উগ্র চিন্তা ও কল্পনা কিলবিল করতে লাগল মাথার মধ্যে। শেষে ক্লান্ত হয়ে পালকির ভিতরে ঢুকে শুয়ে রইলাম।

ঘণ্টা দুই পালকির ভিতরে শুয়ে থাকার পর দূরে মনে হল কারা যেন এইদিকে আসছে। আরও কাছে এগিয়ে আসতে মনে হল, আমারই পালকি-বেয়ারারা। তারা আবার দল বেঁধে ফিরে আসছে। মনে একটু আশার সঞ্চার হল। ফিরে আসার পর তারা বলল, মাইল আড়াই-তিন দূরে একটা আমবাগান ও পুকুর আছে তারা জানত। দৌড়ে গিয়েছিল তারা সেই পুকুরে স্নান করার জন্য। তা না হলে এই গরমে আজ তাদের আধমরা হয়ে শুয়ে পড়ে থাকতে হত। পুকুরে স্নান করে, আমগাছ থেকে আম পেড়ে খেয়ে, বাগানের ছায়ায় তারা ঘণ্টা দুই ঘুমিয়ে এসেছে। এখন তাদের ক্লান্তি দূর হয়েছে, পূর্ণ উদ্যমে পালকি বইতেও তাদের আপত্তি নেই। এতক্ষণ পরে আমার দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটল। পালকি চলল প্রান্তরের উপর দিয়ে। একটা গ্রামের কাছে পালকি আসতে থামতে বললাম বেয়ারাদের। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে গেছে। একটা তরমুজ কিনলাম গ্রাম থেকে এবং তাই খেয়ে কোনরকমে তৃষ্ণা নিবারণ করলাম।

বিকেল চারটে নাগাদ হুগলী পৌঁছলাম, কলকাতা থেকে মাইল তিরিশ দূরে। হুগলীতে আমার এক বন্ধু কিন্‌লক-সাহেব থাকতেন। তাঁর বাড়িতে উঠে, একটু জলযোগ ও বিশ্রাম করে, কলকাতামুখো রওয়ানা হব ঠিক করলাম। বাড়িতে গিয়ে শুনলাম, প্রায় তিনদিন হল বন্ধুটি আমার শিকার করতে বেরিয়েছেন, সপ্তাহান্তে ফিরবেন। তাঁর ভৃত্যরা সংবাদ দিল। আমার রোদে-পোড়া ক্লান্ত চেহারা দেখে খানসামা বুঝল যে আমি বিশ্রাম নিতে এসেছি। সে আমাকে বাড়ির ভিতরে আহ্বান করে নিয়ে গিয়ে বিশ্রাম করতে অনুরোধ করল। তারপর খানসামাটি আমাকে আশ্বাস দিল যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে আমার জন্য কিছু খানা তৈরি করে নিয়ে আসছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে

চমৎকার খানার সঙ্গে এক বোতল ক্ল্যারেট আনতেও ভুলল না। খানাপিনা শেষ করে মনে হল, বন্ধুর খানসামার কৃপায় পুনর্জীবন লাভ করেছি। খানসামাটি আমাকে সুন্দর একটি সাজানো শয়নকক্ষে নিয়ে গিয়ে ঘুমুতে বলল, কিন্তু আমি আর দেরি করতে পারলাম না। তাকে বললাম, আমাকে কলকাতায় ফিরতেই হবে, তা না হলে কাজের ক্ষতি হবে, এবং বিশ্রাম নিয়েও স্বস্তি পাব না। সন্ধ্যা সাতটার সময় হুগলী থেকে পালকিতে রওয়ানা হয়ে রাত প্রায় দুটোর সময় কলকাতায় পৌছলাম আমার বাড়িতে। বাড়ি পৌঁছেই সোজা ঘরে গিয়ে সটান হয়ে শুয়ে পড়ে ঘুম দিলাম। আমার মুর্শিদাবাদ সফরের কাহিনী এইখানে শেষ হল।

লর্ড কর্নওয়ালিসের আগমন

১৭৮৫ সনের আগস্ট মাসে দুজন ভদ্রলোক কলকাতা এসে পৌছলেন ইংলণ্ড থেকে। একজন স্কটল্যাণ্ডের বিখ্যাত ডাক্তার জেম্‌স হেয়ার, আর একজন ব্যারিস্টার রবার্ট লেডলি। কলকাতায় দুজনেই প্র্যাক্‌টিশ করতে এসেছেন, একজন ডাক্তারি, একজন ব্যারিস্টারি। দুজনেই বিশিষ্ট গুণী ভদ্রলোক, কলকাতার সাহেব-সমাজে তাঁদের উপস্থিতিতে সাড়া জাগল।

আমি এই সময় কলকাতার "Bachelars Club"-এর একজন সভ্য নির্বাচিত হয়েছি। নাম দেখেই বোঝা যায়, ক্লাবটি কেবল অবিবাহিত পুরুষদের জন্য। কেউ বিবাহ করলে তাঁকে সভ্যপদ ত্যাগ করতে হত। আমি যখন সভ্য নির্বাচিত হই, তখন ক্লাবের সভ্যসংখ্যা কুড়িজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই ধরনের ক্লাবের সভ্যপদ যে খুব বেশীদিন কেউ বজায় রাখতে পারতেন না, তা বলাই বাহুল্য। ঘন ঘন ক্লাবের সভ্য বদল হত। অবিবাহিত সভ্যরা বিবাহ করে পদত্যাগ করতেন, আবার নতুন সভ্য নির্বাচিত হত। ক্লাবটি ছোট হলেও, কলকাতার সাহেব-সামাজে তার নামডাক ছিল খুব। প্রায় বিশ বছরের উপর ক্লাবটি টিকে ছিল।

সেপ্টেম্বর মাসের (১৭৮৫ সন) গোড়ার দিকে লর্ড কর্নওয়ালিস কলকাতা এসে পৌছলেন, গবর্নর-জেনারেল ও কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ, উভয় পদের দায়িত্ব নিয়ে। কর্নওয়ালিসের আগে আর কাউকে এই যুক্ত-পদের দায়িত্ব দেওয়া হয় নি। তাঁর সঙ্গে প্রাইভেট সেক্রেটারি হয়ে এলেন কর্নেল রস, এবং 'এডি' হয়ে এলেন দুজন—ক্যাপ্টেন হলডেন ও ক্যাপ্টেন ম্যাডান। রস, হলডেন ও ম্যাডান তিনজনেই আমাদের অবিবাহিতদের ক্লাবের সভ্য নির্বাচিত হলেন।

লর্ড কর্নওয়ালিসের উপস্থিতির কয়েকদিনের মধ্যেই উইলিয়ম বার্ক তাঁর বাগানে বিরাট এক ভোজের আয়োজন করলেন। নবাগত গবর্নর-জেনারেলকে আপ্যায়ন করাই তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। কর্নওয়ালিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হবার সুযোগ হয় আমার এই ভোজসভায়। তাঁর ভদ্র ও শিষ্ট আচরণে আমি মুগ্ধ হই। সুরাযোগে চর্বচোষ্য ভোজ খাওয়া রাত্রি প্রায় আটটা পর্যন্ত চলবার পর, কর্নওয়ালিস শহরে ফিরে আসার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বার্ক তাঁকে অনুরোধ করলেন আরও কিছুক্ষণ থাকার জন্য, কিন্তু তিনি অনুনয়-বিনয় করে বললেন যে, খাদ্য ও পানীয় দুই-ই তিনি খুব উপভোগ করে পর্যাপ্ত পরিমাণে খেয়েছেন, আর কিছু খাবার ক্ষমতা নেই তাঁর। গৃহে ফিরে তাঁকে অনেক দরকারী কাজ সারতে হবে, এর বেশী পান-ভোজন করলে তিনি কিছু করতে পারবেন না।

মিস্টার বার্ক তাঁকে কোচে তুলে দিয়ে এলেন। তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি কর্নেল রসও ভোজটেবিল থেকে উঠে পড়েছিলেন, কিন্তু বার্ক তাঁকে ছাড়লেন না। কর্নওয়ালিস তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, "যতক্ষণ খুশী বার্ক সাহেব আপনি মিস্টার রস ও অন্যান্যদের আটকে রাখুন। মিস্টার রসকে বসিয়ে যতক্ষণ ইচ্ছা খাওয়ান, আমার আপত্তি নেই।" এই কথা বলে তিনি কোচ হাঁকিয়ে চলে গেলেন। একাই গেলেন, সঙ্গে একজনও ভৃত্য চাপরাসী বা সিপাহী কেউ গেল না দেখলাম। শুনেছি, যতদিন

কর্নওয়ালিস বাংলাদেশে ছিলেন, ততদিন তিনি কেবল সরকারী ব্যাপারে ছাড়া কোন ব্যক্তিগত বা সামাজিক ব্যাপারে কখনও সিপাহী-ভৃত্য পরিবেষ্টিত হয়ে চলাফেরা করতেন না। যে-কোন সাধারণ সুরুচিসম্পন্ন ভদ্রলোকের মত বিনা আড়ম্বরে একাই তিনি চলাফেরা করতে ভালবাসতেন।

বার্কের বাগানবাড়িতে খানাপিনার অভিজ্ঞতার পর কর্নওয়ালিস মনস্থ করেন, বাইরে কারও বাড়িতে আর কোনদিন নিমন্ত্রণ খাবেন না। প্রত্যেকদিন তাঁর গৃহেই তিনি প্রায় কুড়ি-পঁচিশজন নিমন্ত্রিত অতিথিদের নিয়ে ডিনার খেতেন। কেবল প্রথানুযায়ী বছরে একদিন চীফ-জাষ্টিসের বাড়ি, অথবা কোন সরকারী উৎসবে তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতেন। এ ছাড়া বাড়ির বাইরে কখনও কোন খানাপিনার সভায় তিনি যেতেন না। তাঁর পরিবারের সকলের সঙ্গেই আমার অন্তরঙ্গ পরিচয় হয়েছিল বলে সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন আমিও তাঁর বাড়ি নিমন্ত্রণ খেতে যেতাম। নির্দিষ্ট সময়ে খানাটেবিলে বসা হত, গ্রীষ্মকালে বেলা চারটেয়, শীতকালে বেলা তিনটের সময়। গবর্নর-জেনারেল প্রায় দু ঘণ্টা সময় খানাটেবিলে কাটাতেন, এবং নিজে পানভোজন তদারক করতেন। টেবিলের উপর মদের বোতল হাতে হাতে ঘুরবে, এই ছিল তাঁর নির্দেশ। কেউ যদি বোতল 'pass' করতে দেরি করতেন, অথবা তাতে ছিপি আঁটতে ভুলে যেতেন, তা হলে কর্নওয়ালিস খানাটেবিলে বসেই ঠাট্টা করে বেশ দু-কথা তাঁকে শুনিয়ে দিতেন। এইভাবে দু ঘণ্টা ধরে প্রত্যহ নিমন্ত্রিত অতিথিদের নিয়ে তাঁর গৃহে ডিনার খাওয়া চলত।

তখনকার রীতি অনুযায়ী প্রত্যেক বছর ক্রীসমাসের দিন গবর্নর-জেনারেল, তাঁর কৌন্সিলের সদস্যরা এবং কলকাতা শহরের গণ্যমান্য সাহেবসুবোরা সকলে কোর্ট-হাউসে একত্রে মিলে ডিনার খেতেন। রাতে মহিলারা 'সাপার' খেতেন এবং শেষে 'বল্‌নাচ' হত। সে-বছরেও ২৫ ডিসেম্বর ভোজের দিন ঠিক হল। লর্ড কর্নওয়ালিস এই পদ্ধতিতে ক্রীসমাস উৎসব পালনের বিরোধী ছিলেন। কারণ তাঁর মতে এইভাবে নাচগানহল্লার মধ্যে ধর্মোৎসব পালন করলে তার কোন গাম্ভীর্য বা মর্যাদা রক্ষা করা হয় না। কলকাতা শহরে ইংরেজরা যে ক্রীসমাস উৎসবকেও এই ভোগবিলাসের স্তরে নামিয়ে এনেছেন, এ দৃশ্য দেখে তিনি মর্মাহত হয়েছিলেন। তারপর থেকে, প্রধানতঃ কর্নওয়ালিসের জন্যই, ক্রীসমাস উৎসবের ধারা বদলে যায় কলকাতায়।

বাণিজ্য-বোর্ডের সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ

১৭৮৬ সনের জানুয়ারি মাস থেকে কর্নওয়ালিস একটি অত্যন্ত কঠোর ও অপ্রিয় কর্তব্য পালনে অগ্রণী হন। কোম্পানির সিনিয়র কর্মচারীদের বিরুদ্ধে নানাবিধ প্রতারণার গুরুতর অভিযোগ সম্পর্কে ডিরেক্টররা তাঁকে তদন্ত করার আদেশ দিয়েছেন। অভিযোগ হল, তাঁরা পণ্যদ্রব্যের কন্ট্র্যাক্টের ব্যাপারে নিজেরা জড়িত থেকে, অথবা অনেক সময় বেনামীতে নিজেরাই কন্ট্র্যাক্ট নিয়ে কোম্পানিকে ন্যায্য মুনাফা থেকে বঞ্চিত করেছেন।

কোম্পানির ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালনা করতেন 'বোর্ড অফ ট্রেড' (Board of Trade)। একজন প্রেসিডেণ্ট ও এগারজন সদস্য নিয়ে এই বাণিজ্য-বোর্ড গঠিত হত। কোম্পানির সিনিয়র কর্মচারীরা ক্রমিক পদোন্নতির ফলে বোর্ডের সদস্যপদ লাভ করতেন। তাতে যে তাঁরা খুব প্রসন্ন বা কৃতার্থ হতেন তা নয়, কারণ পদোন্নতির ফলে তাঁদের কেবল সম্ভ্রম-মর্যাদাই বাড়ত, অধিক অর্থপ্রাপ্তি ঘটত না। বোর্ডের সদস্যদের মাসিক বেতন ছিল তখন ১১০০৲ সিক্কা টাকা। প্রত্যেকে প্রায় তার অনেক বেশী টাকা বাইরের ব্যবসা-বাণিজ্যাদি থেকে রোজগার করতেন। অতএব বোর্ডের সদস্য হবার পর তাঁরা সকলেই এই আর্থিক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে নেন। ব্যবস্থাটা এইরকম : তাঁরা যাঁদের পণ্যদ্রব্যের কন্ট্র্যাক্ট পাইয়ে দেবেন, তাঁদের কাছ থেকে কমিশন নেবেন, অথবা নিজেরাই গোপনে বেনামীতে কন্ট্র্যাক্ট নিয়ে মুনাফাটা আত্মসাৎ করবেন। এ কাজ

তাঁরা নিঃসঙ্কোচেই করতেন, এবং এদেশের সমস্ত লোক তো বটেই, বিলেতের কোম্পানির ডিরেক্টররাও খুব ভালভাবেই তাঁদের এই অপকৌশলে অর্থোপার্জনের কথা জানতেন। তবু হঠাৎ ডিরেক্টররা কেন ক্রুদ্ধ হয়ে লর্ড কর্নওয়ালিসকে এই অপ্রীতিকর কর্তব্য পালন করতে বললেন, তা বোঝা যায় না। তাঁরা বিলক্ষণ জানতেন যে কোম্পানির কোন সিনিয়র কর্মচারী মাসিক ১১০০৲ টাকা বেতন পেয়ে বাংলাদেশে সমর্যাদায় দিনযাপন করতে পারেন না। অতএব যে-কোন উপায়ে হোক, বাড়তি টাকাটা তাঁদের রোজগার করতেই হয়। কেউ ঘুষ নেন, কেউ কমিশন নেন, কেউ বা গোপনে ব্যবসা করে মুনাফা করেন। তা না করলে, কেবল কোম্পানির মুনাফার তহবিল ভর্তি করলে, তাঁদের চলবে কেন? এতৎসত্ত্বেও কোম্পানির ডিরেক্টররা হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে বাণিজ্য-বোর্ডের সদস্যদের প্রতারণার অপরাধে অভিযুক্ত করে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন বলে মনে হয় না। দুঃখের বিষয়, এই অপ্রিয় কাজটা সম্পাদন করার ভার পড়েছিল কর্নওয়ালিসের উপর। তিনি গুপ্তচর-গোয়েন্দা লাগিয়ে বোর্ডের সদস্যদের কাজকর্ম ও গতিবিধির খোঁজখবর করতে লাগলেন। এ কথা নিশ্চয় বলব যে, এ কাজ গবর্নর-জেনারেলের যোগ্য কাজ নয়। তাঁর সময়ে বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন উইলিয়ম বার্টন। বার্টনের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করা হল। তাঁর পূর্বের দুজন প্রেসিডেন্ট (দুজনেই তখন ইংলণ্ডে ছিলেন) ডেভিস ও অলড্রাসিকেও (Aldrassey) একই অপরাধে অভিযুক্ত করা হল। এই তিনজন প্রেসিডেন্ট ছাড়া, মিস্টার রাইডার, মিঃ রুক, মিস্টার বেটম্যান, মিস্টার কেইলি নামে চারজন বোর্ডের সদস্যের বিরুদ্ধেও অভিযোগ পেশ করা হল। মিস্টার টমাস ফ্লুকম্যান নামে একজন কনট্রাক্টরও বোর্ডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকার জন্য অভিযুক্ত হলেন। কোম্পানির অ্যাটর্নি প্রত্যেক অপরাধীর বিরুদ্ধে অভিযোগের খসড়া ও প্রতারিত অর্থের বিল তৈরি করলেন। বিল তৈরি হতে না হতেই বিলেতের ডিরেক্টরদের কাছ থেকে কর্নওয়ালিস নতুন নির্দেশ পেলেন এই মর্মে যে, যাঁদের অভিযুক্ত করা হয়েছে তাঁদের যেন অবিলম্বে, আদালতের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত, বোর্ডের সদস্যপদ থেকে বরখাস্ত করা হয়। অর্থাৎ আদালতের বিচারের আগেই ডিরেক্টররা নিজেরাই রায় দিয়ে দিলেন। কোম্পানির কয়েকজন গণ্যমান্য বিশিষ্ট পুরাতন কর্মচারী এইভাবে রাতারাতি একেবারে অসহায় অবস্থায় পথে এসে দাঁড়ালেন।

এদিকে আমার বন্ধুবান্ধবরা এই সময় প্রতিদিন আমাকে অজস্র অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে লাগলেন। কলকাতার অন্যতম অ্যাটর্নি হিসেবে বোর্ডের অধিকাংশ সদস্যের মামলা আমিই পরিচালনা করব এবং তার জন্য প্রচুর অর্থও পাব, এই তাঁদের উল্লাস ও অভিনন্দনের কারণ। অভিযুক্তদের মধ্যে আমার উপর মামলা পরিচালনার ভার দিলেন প্রেসিডেন্ট বার্টন, রাইডার বেটম্যান, ফ্লুকম্যান ও কেইলি। সুতরাং কথাটা যে একেবারে মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত হয়ে রটেছিল তা নয়।

বোর্ডের প্রেসিডেন্ট বার্টন প্রথমে খুব বুক ফুলিয়ে বললেন যে আদালতে তিনি এমন সব সত্য কথা প্রকাশ করবেন যাতে ডিরেক্টরদের অভিসন্ধি ফেঁসে যাবে এবং বিচারকরাও তাঁকে নির্দোষ বলে রায় দিতে বাধ্য হবেন। কিন্তু মামলা ওঠার কয়েক দিন আগে তিনি গোপনে খবর পেলেন যে সরকারপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে দলিলপ্রমাণসহ প্রতারণার এত তথ্য সংগ্রহ করেছেন যে কোর্টে তাঁর পরাজয় অনিবার্য। পরাজয় হলে তাঁর নামে প্রায় এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড (প্রায় ১৯-২০ লক্ষ টাকা) ডিক্রি হবে। এই সংবাদ পেয়ে তিনি অত্যন্ত ঘাবড়ে গিয়ে ডাচদের আশ্রয়ে শ্রীরামপুরে পালিয়ে গেলেন, এবং সেখানে কয়েক মাস আত্মগোপন করে থাকার পর ডাচ-জাহাজে করে ইউরোপ যাত্রা করলেন। বাকী জীবন আর তিনি ইংলণ্ডে ফিরে যান নি। কোপেনহ্যাগেন শহরে ভূসম্পত্তি কিনে ওমরাহ হয়ে কিছুকাল বসবাস করার পর বার্টন দেহত্যাগ করেন। আমার একজন প্রধান মক্কেলের মামলা এইভাবে চুকে যায়।

মেসার্স বেটম্যান ও রাইডার কোর্টে উপস্থিত হয়ে

প্রথমেই অ্যাটর্নির টাকার বিল খানিকটা পরিমাণ কমিয়ে মেনে নেন। কিন্তু তাঁরা যে তাঁদের মনিব ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে প্রতারণা করেছেন, এ কথা স্বীকার করেন না। উৎকোচ বা কমিশন যা তাঁরা কনট্র্যাক্টরদের কাছ থেকে পেয়েছেন, তা তাঁদের ন্যায্য প্রাপ্য বলেই তাঁরা মনে করেন। তার মধ্যে কোন অসাধু উদ্দেশ্য, অথবা কোম্পানিকে ঠকানোর ইচ্ছা থাকে না। প্রকৃতপক্ষে বাণিজ্য-বোর্ডের সদস্য নিযুক্ত হয়ে তাঁরা নিজেরাই যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে নিয়েছেন। কোম্পানির আর্থিক ক্ষতির কোন প্রশ্নই ওঠে না, বরং খেসারতের কথা উঠলে তাঁরাই সেটা দাবি করতে পারেন। তাঁদের এই যুক্তি যে অনেকটা ন্যায়সঙ্গত, কোম্পানির ডিরেক্টররা তা স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। বেটম্যান ও রাইডার দুজনেই আবার তাঁদের আদেশে বোর্ডের সদস্যপদে পুনর্বহাল হন।

কোর্টে মিস্টার কেইলি কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা লড়তে থাকেন। প্রায় পনের মাস কলকাতার সুপ্রিমকোর্টে মামলা চালিয়ে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। ডাক্তাররা তাঁকে স্বদেশে ফিরে যাবার পরামর্শ দেন। কেইলি ইংলণ্ডের কোর্টে মামলা চালাবার অনুমতি চাইলে সরকার তা মঞ্জুর করেন। তিনি ইংলণ্ড চলে যান। যাবার সময় আমি তাঁকে আমার বাবা ও ভাইয়ের কাছে চিঠি দিয়ে দিই। বিলেতে কেইলির মামলা পরিচালনার ভার তাঁদের উপর পড়ে। আমার বাবাই ছিলেন বিলেতে কেইলির সলিসিটর। কিছুদিন পরে বাবার সঙ্গে কেইলির মামলা-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে মতান্তর হয়। অন্য অ্যাটর্নি তাঁর মামলার দায়িত্ব নেন। কয়েক বছর ধরে প্রচুর খরচ করে মামলা চালাবার পর কেইলি জয়লাভ করেন বটে, কিন্তু দেনায় তিনি ডুবে যান। অবশেষে দেনার দায়ে তাঁকে কিছুদিন জেল খাটতেও হয়।

মিস্টার ফ্লুকম্যানই কেবল বাংলাদেশ থেকে দফায় দফায় তাঁর মামলা লড়েছিলেন। প্রত্যেক দফায় তিনি জয়ীও হয়েছিলেন। শেষে কেবল নিজের খরচা দিয়েই তাঁর মামলার নিষ্পত্তি হয়ে যায়। ডিরেক্টররা তাঁকে কনট্র্যাক্টরীর কাজে পুনর্বহাল করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি রাজী হন নি। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, যে-কোম্পানির ডিরেক্টররা তাঁদের কর্মচারীদের প্রতি এরকম সংকীর্ণ মনোবৃত্তির পরিচয় দেন, তাঁদের অধীনে কাজ তিনি করবেন না। কিছুদিন পরে ফ্লুকম্যান ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে 'কোর্ট অফ্ প্রোপ্রাইটার্সে' কোম্পানির ডিরেক্টরদের কাজকর্মের ও নীতির তীব্র সমালোচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন।

প্রায় ষোল মাস ধরে সুপ্রিমকোর্টে এই মামলাগুলি চলে (১৭৮৬-৮৭) এবং তার ফলে আমার যে অর্থপ্রাপ্তি ঘটে তাতে নিজের দেনা প্রায় অর্ধেক শোধ করে ফেলি। কলকাতা শহরে নবাবী চালে জীবন কাটানোর ফলে দেনায় আমার মাথার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে ছিল। বাণিজ্য-বোর্ডের সদস্যদের মামলা পরিচালনা করে যে দু-পয়সা পেলাম তাতে দেনা অর্ধেক শোধ হল। বাকী অর্ধেকের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেলাম না। কেবল দেনা নয়, তার সুদের কথা ভাবলেও ভয় হত। শতকরা ১২ টাকা হারের কম সুদে টাকা ধার পাওয়া যেত না। ঘরভাড়া, চাকর-বাকর, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি নিয়ে আমার মাসিক সংসার-খরচ লাগত প্রায় চার হাজার টাকা, এবং কষ্টে চালালেও তিন হাজার টাকার কমে কুলোতে পারতাম না।

['সুতানটি সমাচার' আপাততঃ এইখানেই শেষ হল। ধারাবাহিক রচনাকারে আর প্রকাশিত হবে না। হিকির বাকী কাহিনী, এবং মিসেস ফে. ও ফ্যানি পার্ক্সের স্মৃতিকথা যা এখানে প্রকাশ করা হল না, তা একত্রে যথাশীঘ্র সম্ভব 'সুতানটি সমাচার' নামে গ্রন্থাকারেই প্রকাশিত হবে।—সঃ]

বিশ্বসাহিত্যের সূচীপত্র

শ্রীদীপেন্দ্রকুমার সান্যাল

প্রথম খণ্ড ঃ উপন্যাস

ওল্ড্ গোরিও (২)

"This man is the soldier with the sword, and I am the soldier with the pen...Yet I shall succeed where Napoleon failed. For I shall conquer the world."

—[নেপোলিঁওর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে বালজাক]

নেপোলিঁও পারেন নি, বালজাক পেরেছিলেন। দিগ্বিজয়ের তুরঙ্গ থেকে পতন ঘটেছিল বিশ্ববিজয়ী বোনাপার্টির, রচিত হয়েছিল পৃথিবীর ইতিহাসের বৃহত্তম ট্রাজেডি হিউমেন। আর বালজাকের হাতে সংরচিত হয়েছিল 'The Human Comedy'; তার দিগ্বিজয় আজও শেষ হয় নি।

দুঃসহ অন্তর্দ্বন্দ্বে নিত্য-দোলায়িত দুরন্ত জীবনের দুর্দান্ত যৌবনের অধীশ্বর বালজাক; তাঁর সঙ্গে তুলনা চলে কেবল মহাবীর্যবতী বীরভোগ্যা এই বসুন্ধরার। যে-বসুন্ধরা অচল অবরোধে আবদ্ধ এই, আবার একটু পরেই মেঘলোকে উধাও যে-বসুন্ধরা, গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে ধ্যাননিমগ্না যে, নীলাম্বুরাশির অতন্দ্র তরঙ্গে কলমন্দ্রমুখরা যে অন্নপূর্ণা কখনও, কখনও অন্নরিক্তা ভীষণা, ললিতে কঠোরে পুরুষে নারীতে যার বিপরীত প্রকৃতি সেই পৃথিবীর সঙ্গেই শুধু তুলনীয় পৃথিবীর সাহিত্যে অতুলনীয় উপন্যাসের স্রষ্টা বালজাক-চরিত্রের। তরবারির চেয়েও তীক্ষ্ণধার লেখনী হাতে আবির্ভূত জীবনযোদ্ধা বালজাকের জীবন যে-কোনও যোদ্ধার জীবনের চেয়ে অনেক রক্তাক্ত, অনেক বেশী রোমাঞ্চকর। দুর্দাম দুর্বার বর্ষায় দুকূল প্লাবিত মহানদীর মত বালজাক তাঁর জীবনের একদিক গড়ে তুলেছেন যখন তখনই ভেঙে গেছে তার আর এক দিক। কিন্তু নদী যেমন দু তীরের কোনও দিকেই তাকায় না, তার অদৃশ্য নিঃশব্দ জল বয়ে চলে অবিচ্ছিন্ন অবিরল আদিকাল থেকে অনাদিকালের উদ্দেশে, তার তীরে কোন্ বিশাল জনপদ বিপুল বিত্ত নিয়ে অতল জলের আহ্বানে সাড়া দিতে তলিয়ে যাচ্ছে জলের অতলে, অথবা জাগছে জল থেকে উঠে আসা সদ্যোস্নাতা কোন নতুন ভূখণ্ড, একবার চেয়ে দেখছে না সেই ভৈরবী, সেই চির বৈরাগিণী—নিরুদ্দেশ এগিয়ে চলাতেই কেবল যার রাগিণী শব্দহীন সুরে চিরদিন শ্রুত। সেই নদীর মতই বেগবান, জীবনরণরঙ্গভূমে যৌবনের দূত বালজাক সেই নদীর মতই পথ-চলার আনন্দে দু হাতে পাথেয় করেছেন ক্ষয়। ঝঙ্কারমুখরা এই ভুবনমেখলা নদী উতলা করেছে যৌবনের কবি বালজাককে; সমুদ্রের ঢেউ তাঁর রচনায় হয়েছে নৃত্যমুখর; অরণ্যের আদিম আকুলতা তাঁর প্রত্যেকটি অক্ষরে হয়েছে উন্মুখর।

এই বালজাক বিপরীত গুণের এক বিচিত্র সমন্বয়। স্মরণের অতীত সেই প্রাগৈতিহাসিক অসভ্য অন্ধকারের কাল থেকে সভ্যতার কৃত্রিম পসরায় আপাদমস্তক আবৃত আজকের সকাল পর্যন্ত সমস্ত মানুষের মধ্যেই ভালমন্দের সাদাকালোর আলোছায়ার নিত্যনিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব বর্তমান। শুভ-অশুভ, শুম্ভ-নিশুম্ভ, রাম-রাবণ, জেকিল-হাইডের হাত থেকে কোনদিন মুক্তি নেই মানবপুত্রের; বালজাকও তার ব্যতিক্রম হবেন কেন। কিন্তু তাঁর চরিত্রে ভালমন্দের এবং জীবনে মেঘ ও রৌদ্রের এমন

বিপরীত দৃষ্টান্তের এমন বিপুল সমাবেশ এত বিস্ময়কর যে তা নিঃসংশয়ে উল্লেখের দাবি রাখে। মানচিত্রের মতই এই মানবচরিত্রে ভিন্ন রঙ, ভিন্নতর রেখার এমন বিচিত্র আলিম্পন ব্যাখ্যার অতীত, বর্ণনার অনায়ত্ত।

এমনই একটি পরমাশ্চর্য পৃষ্ঠা সেই চরমাশ্চর্য জীবন থেকে তুলে দিই এখানে।

উপন্যাসের পর উপন্যাসেও তখন ব্যর্থতা এবং আর্থিক ক্ষতি ছাড়া কিছুই কপালে জুটছে না বালজাকের। কিন্তু হাস্যমুখে অদৃষ্টকে অস্বীকার করবার দুর্জয় প্রেরণায় প্রদীপ্ত এই প্রতিভাধর উপন্যাসের ক্ষেত্র থেকে সাময়িক সরে এসে প্রবেশ করলেন নাটকের কুরুক্ষেত্রে। অন্তরঙ্গ বন্ধু গতিয়েরকে ডেকে পাঠিয়ে বালজাক বললেন: "Here you are at last, Theo, you idler, dawdler, sloth! You ought to have been here an hour ago! Tomorrow I am going to read to Harel a grand drama in five acts."

গতিয়ের দীর্ঘশ্রুতির জন্য প্রস্তুত হতে হতে জিজ্ঞেস করেন: "And you want to read it to me and hear my advice?"

"The drama is not written!"—জবাব দেন বালজাক।

যে নাটক তার পরের দিন শোনাবার সে নাটক তার আগের দিন পর্যন্ত লেখা হয় নি—এ জবাব একমাত্র বালজাকের পক্ষেই দেওয়া সম্ভব।

প্রত্যেক লেখকের ক্ষেত্রেই তার রচনার ওপর তার জীবনের ধারা কম বেশী প্রভাব বিস্তার করেই। লেখক-জীবন গড়ে ওঠে লেখকের ব্যক্তিজীবনের ছায়ায়। কিন্তু বালজাকের লেখকজীবনের পর্যালোচনায় তাঁর এই বিপরীত ব্যক্তিত্বের অপরিসীম প্রভাব বালজাকের কোনও জীবনী-লেখকই অস্বীকার করতে পারেন নি, বরং অসাধারণ গুরুত্ব দিয়েছেন তাকে। 'Old Goriot'-এর ইংরেজি অনুবাদের 'Introduction'-এ M. A. Crawford স্পষ্টাক্ষরে লিখেছেন একেবারে আরম্ভেই: "Old Goriot is one of Balzac's finest novels, revealing all his virtues and showing few of his faults—he had both on a grand scale." এই 'virtues' এবং 'faults'—দুই-ই 'grand scale'-এ বালজাকের লেখায় নয় কেবল, জীবনেও আগাগোড়া পাশাপাশি উজ্জ্বল কন্‌ট্রাস্টে উপস্থিত।

একরঙা জীবন নয়, অনেকরঙা জীবন যাদের তাদেরও সঙ্গে তুলনা চলে না, প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তন-বিচিত্র বালজাকের রঙিন যৌবনের—রঙীনতর জীবনের। কালবৈশাখীর কালো শ্যেনপাখির মত যে ঝড় বিদ্যুৎ-চঞ্চুবিদ্ধ দিগন্তকে ছিনিয়ে নিতে আসে সেই ঝড়ে বালজাকেরই জীবনের—যৌবনের ঝঙ্কার। আবার দক্ষিণ থেকে হাওয়া দিলে ফাল্গুনের অলস অপরাহ্নে ছড়িয়ে যায় আম্রমুকুলের গন্ধে যে বিরহমিলনের স্বগতপ্রলাপ, চাঁদের পেয়ালা ছাপিয়ে উপচিয়ে পড়ে যে স্বর্গীয় মদের ফেনা পূর্ণশশী উদিত হলে সিন্ধুপারের ধরণী, সেই স্নিগ্ধ গন্ধোচ্ছ্বাস আকাশের আঙিনায় সেই স্বর্গালোকের অবর্ণনীয় রূপ যেন বালজাকের জীবনের—যৌবনের উৎস থেকেই উৎসারিত।

নাটক মঞ্চস্থ হবার অনেককাল আগেই মাত্রাতিরিক্ত অতিনাটকীয় পত্রে অকারণ অবারণ উচ্ছ্বসিত বালজাক লিখছেন: "—Werdet tells me that my Country Doctor was sold out in eight days. Ha! 'ha!—I have wherewith to make faces at the November and December bills that disturb you. Ho! ho!—There are many millions in Eugenie Grandet!" "Vautrin" নাটক অভিনীত হবার মুহূর্তে লিখছেন আবার: "I have gone through many miseries. But if I have a success, my miseries will be completely over." সেই নাটকের প্রথম রজনীর ইতিহাস অত্যন্ত করুণ: "It was difficult to finish the performance for the roars and the hisses and the catcalls and even the threats of the

audience." কিন্তু বালজাকের তাতে কিছু এসে যায় নি। তাঁর জীবনে সেই বহু আশার বহুতর আশঙ্কার প্রথম রজনীতে বালজাকের কার্যকলাপ বালজাকেরই উপযুক্ত: "But during that first performance Balzac was unperturbed. He was fast asleep on a bench in the back of the theatre, in the midst of another dream." মধুর স্বপ্ন ভঙ্গ হতেও দেরি হয় না অবশ্য এবং স্বপ্নভঙ্গের অব্যবহিত পরেই আবার মধুরতর স্বপ্নে বাস্তববিস্মৃত হতে দেরি হয় আরও অনেক কম।

এক নিঃশ্বাসে বালজাককে বলতে শোনা গেছে একবার: "Don't console me. It is useless—I am a dead man." আর একবার: "By God, you are right! My genius will make me live."

প্রকাশকদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ পুরুষ ও রমণীর মতই রাগে ও অনুরাগে উজ্জ্বল। অনবরত অগ্রিম অর্থ গ্রহণ করেছেন। যে প্রকাশকরা তাঁর মতে, "...the vultures that eat the flesh of Prometheus"—তাদের কাছে বারবার হাত পাততে হয়েছে তাঁকে, প্রাপ্যের চেয়ে যে টাকা প্রাপ্য হয় নি তার জন্যেই বেশী। কিন্তু হাত পেতেছেন ভিখারীর মত নয়—যেন টাকাটা নিয়ে অনুগ্রহ করেছেন তাদেরই এমনই রাজকীয় দাবিতে: "Some day, and that day is not far off, you will have made your fortune out of me" এবং এই সঙ্গেই পত্রের আসল লক্ষ্য 'পুনশ্চ'-তে উপস্থিত করেছেন বুদ্ধিমান বালজাক: "...I have raised 1500 francs from Rothschild and drawn a draft for that amount on you, due ten days after sight."

যে দুর্ধর্ষ দুর্দশার মধ্যে পড়ে বালজাক এইভাবে টাকার জন্যে থাবা দিয়েছেন বারবার প্রকাশকের ঝুলিতে, সেই টাকা যখন এসেছে বালজাকের মুঠোয়, ঠিক তখনই সেই দুষ্প্রাপ্য বস্তুর পাখা গজিয়েছে এবং মুহূর্তে উড়ে গেছে সে কখনও কিনে আনতে পোর্সিলেন, ক্যাবিনেট, কখনও দুর্লভ প্রস্তরমূর্তি, কখনও বা অলঙ্কার। যে দুর্দশার মধ্যে বালজাকের বাস তার অতলে তলিয়ে গেছেন আরও। বালজাকের মা, যিনি পুত্রকে দেউলিয়া হবার হাত থেকে বারবার বাঁচিয়েছেন, পত্রে অনুযোগ করেছেন: "My son, as you've been able to afford yourself...mistress, mounted canes, rings, silver, furniture, your mother may also without indiscretion ask you to carry out your promise." বালজাক এর উত্তরে: "I think you'd better come to Paris and have an hour's talk with me."—এই দু ছত্র লিখেই দায় সেরেছেন। [Vie de Balzac—Andre Billy—অনুবাদ: সমারসেট মম।]

এবং সমারসেট মম্ সোচ্চার হয়েছেন এই মন্তব্যে এই প্রসঙ্গে: "What are we to say to this? His biographer says that since genius has its rights the morality of Balzac should not be judged by ordinary standards. That is a matter of opinion. I think it is better to acknowledge that he was grossly selfish, very unscrupulous and none too honest."

কিন্তু এই 'unscrupulous' এবং 'none too honest' বালজাকই বদলে যেতেন সম্পূর্ণ যখন লেখার প্রুফ নিয়ে বসতেন। এই একটি জায়গায় দারিদ্র্যের কাছে, স্বার্থের কাছে, প্রকাশকের কাছে—কারুর কাছে নতি স্বীকার করেন নি তিনি। নতুন লেখায় হাত দিলে যেখানে আরও অর্থ, আরও উত্তেজনা, আরও সুযোগ আসত, সেখানেও ত্যাগ করেন নি পুরনো লেখাকে। সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধনের পরেও যতক্ষণ না সম্পূর্ণ সায় দিয়েছে বিবেক, ততক্ষণ প্রকাশকের তর্জনগর্জনে, সংসারের সহস্র নিপীড়নে এবং পাওনাদারের উপর্যুপরি আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়েছেন বালজাক; বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন [ওদের দেশে অতিরিক্ত প্রুফ দাবি

করলে তার ব্যয়ভার বহন করতে হয় লেখককেই], কিন্তু বিভ্রান্ত হন নি। শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে সৈনিক যেমন স্বদেশের সূচ্যগ্র মেদিনীও যাতে বিদেশীর করায়ত্ত না হয় তার জন্যে চেষ্টা করে, কলম হাতে বালজাক তেমনই লড়েছিলেন আমরণ শিল্পের শুচিতাকে সব কনসিডারেশনের উর্ধ্বে রাখতে। ভুল বললাম, কলম নয়—বালজাকের হাতে কলম ছিল না সংশোধনের সময়—বল্লম ছিল। বল্লম দিয়ে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিতেন প্রুফ। রচনার সঙ্গে রক্তাক্ত হতেন রচনাকার।

প্রুফ-প্রসঙ্গে তাঁর জীবনীকার জানিয়েছেন: "The proof was returned to him, and this he treated as if it were only an outline of the projected work. He not only added words, he added sentences, not only sentences, but paragraphs, and not only paragraphs but chapters. When his proofs were set up once more with all the alterations and corrections and a fair set delivered to him, he went to work on them again, and made more changes. Only after this would he consent to publication and then only on condition that in a future edition he should be allowed to make further revisions and improvements."

সমস্ত দুঃখকষ্ট কলহ অসম্মান আত্মগ্লানি এবং অনমনীয়তা, ধ্রুববিশ্বাস এবং অদম্য উৎসাহ, অপরিমিত উদ্দীপনার বিপরীত সংঘর্ষের এত তুচ্ছ খুঁটিনাটি-সমেত বিবরণ লিপিবদ্ধ করবার সঙ্গত কারণ আছে। এরই ভিতর থেকে সকলের অলক্ষ্যে সকলের অবজ্ঞা, সকল ব্যর্থতা, আর্থিক অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়েই সমকালীন সমালোচনার সীমান্তহীন উর্ধ্বে উড্ডীন হচ্ছিল সৃষ্টির জয়পতাকা। বজ্রমুষ্টিতে সংহত হচ্ছিল একটি প্রতিজ্ঞা, চোখের সামনে অবারিত হচ্ছিল আর একটি আকাশ, হৃদয়ের সীমানার সীমা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল দেশ ও কালের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ছিন্নভিন্ন করে, জন্ম নিচ্ছিল সুবিশাল সৃষ্টির ভ্রূণ। এই আর্থিক অসঙ্গতির অনতিক্রম্য বিপর্যয়ের মধ্যেই আত্মগোপন করেছিল 'হিউম্যান কমেডি'-সৃষ্টির ক্রন্দন: "...and in these circumstances he wrote some of his best novels ;..."

অর্থাভাবের দুর্লঙ্ঘ্য গিরি, ব্যর্থতার মরুকান্তার, বিচ্ছেদের দুস্তর পারাবারের ওপারে জাগছিল সৃষ্টির নতুন চর। প্রতিভার অরুণরশ্মিজালে প্রতিকূল রাত্রির তিমির অন্ধকার ছিন্নভিন্ন করে অত্যাসন্ন হচ্ছিল স্বর্ণ এক সূর্যোদয়ের ব্রাহ্মমুহূর্ত। অদ্বিতীয় বালজাকের দুই চোখে দেখা দিচ্ছিল তৃতীয় আর এক দৃষ্টি: "a vision as brief as life and death, deep as an abyss, great as the sound of the sea..."।

এবং দুর্যোগের ঘনঘটা জীবনের সুনির্মল আকাশ অন্ধকার করে অন্তহীন মেঘে যখন আতঙ্কের ভয়ঙ্কর কৃষ্ণবর্ণ ছায়া ছড়িয়ে গেছে, বেদনার নীল অঞ্জনঘন পুঞ্জ ছায়ায় যখন সম্বৃত অম্বর তখনই গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে গর্জে উঠেছেন 'দি হিউম্যান কমেডি'-কার: "I have no dread of poverty. If disgrace and contempt were not a beggar's lot, I would beg, to be enabled to solve in peace the problems that fill my mind. At times I grasp the universe of thought, I knead it, I mould it, I pierce it, I comprehend it....But the man who sees two centuries ahead of him dies on the scaffold....By God, I shall shout the truth even in my silence. Let the angels build hospitals for suffering souls. But until they do, I shall build them a palace of dreams."

'দি কমেডি হিউমেনে'র 'ওলড্ গোরিও'কে বুঝতে হলে সবার আগে বুঝতে হবে এই বালজাককে। জীবনযুদ্ধে হার-না-মানা এই যে বালজাক, যত দুঃখ, যত ব্যর্থতা, যত বেদনা, যত অসম্মান, যত বাধা,—তত উত্তেজিত, তত উদ্দীপিত, তত অস্থির, তত দুর্দমনীয়, তত দুর্জয়। দুঃখের

ভরা বর্ষায় হেগেলের কণ্ঠে উচ্চারিত প্রাণের পাবকবাণী : "I hold the future of mankind in my palm." অশ্রুজলের তিক্ততায় অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকেই জন্ম নিয়েছে বালজাকের এই অপরূপ জীবনদর্শন : "It is the destiny of man, to rise from action through abstraction to sight. And then, when the final stage is reached, the material flesh of man will return to its divine origin—the spiritual world of God...." [Living Biographies of Famous Novelists.]

বালজাকের উপন্যাসে সবার উপরে যা সত্য তা পরমার্থ নয়—তা অর্থ। আধ্যাত্মিক কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয় নি তাঁর দৃষ্টি ; তিনি জীবন দিয়েই আবিষ্কার করেছিলেন যে অর্থই পরমার্থ। মানবজীবনের চাকা যে ঘোরায় সে মহাকাল নয়, সে কোনও পরমপুরুষ নয়—সে হচ্ছে চরম পুরুষকার। তার রথের যে চাকার তলায় পিষ্ট দলিত হয় সমাজ সংসার সব,—সে চাকা রুপো দিয়ে তৈরী। রজতচক্রে আবর্তিত হচ্ছে এই জগৎসংসার। তার নৃত্যের তালে তাল দিয়ে, তার সঙ্গীতের ঝঙ্কার কানে নিয়ে যে পা ফেলতে পারবে কেবল সেই পারবে টিকে থাকতে ; বাকী সবাই ছিন্নভিন্ন হয়ে হারিয়ে যাবে চৈত্রের শেষদিনে কালবৈশাখীর ঘূর্ণীতে যেমন উড়ে ঝরে ফুরিয়ে যায় জীর্ণপাতা নবপত্রের জন্যে পথ উন্মুক্ত করতে। টাকা—টাকা—টাকা। অর্থই সামর্থ্য। রক্তে উত্তাপ সঞ্চার করে অর্থ ; চোখে দৃষ্টি, বাহুতে বল, নিদ্রায় স্বপ্ন সঞ্চার করে অর্থ ; শরীরে সামর্থ্য। অর্থই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস। নীলিমার নীলে আর বনানীর শ্যামলিমায়, তৃণের সবুজে, সূর্যোদয়ের সোনায়, পুষ্পের সুবাসে, সন্ধ্যা-তারার দীপ্তিতে, সমুদ্রের সঙ্গীতে, নির্ঝরিণীর স্বপ্নভঙ্গে, পর্বতশৃঙ্গের তুষারকিরীটে রূপের অনুভূতি নয়—রুপোর বিভূতিই বিচ্ছুরিত।

'Living Biographies of Famous Novelists' গ্রন্থে বালজাক প্রসঙ্গে তারই প্রতিধ্বনি :

"His novels are an epic of sordid lust—an overpowering thirst for material success. He is the poet-laureate of the capitalistic urge. Money is the only yardstick to human worth. It is the lifeblood that flows in the veins of his characters. It supplies the oxygen to their lungs, the food to their brains, the gospel to their hearts. The clink of gold is their music, their poetry, their philosophy, their relegion, their life. It is the stuff their dreams are made of. Under its magic spell they create beauty and perpetrate crimes. The Stock Exchange is the arena for heroic battles and infamous treacheries. Money breeds, coin attracts coin, a five-franc note is jealous of a ten-franc note and struggles to increase. Money is the cosmic force that rules the earth. It is the Prospero and the Caliban, the God and the Devil who shake the world between them."

পৃথিবীটা কার, এই প্রশ্নের মধ্যেই বালজাক তার উত্তর খুঁজে পেয়েছিলেন—পৃথিবী টাকার।

[ক্রমশ]

মঞ্চকন্যা

ধনঞ্জয় বৈরাগী

[পূর্বানুবৃত্তি]

কলকাতার সমস্ত রাস্তায় অলিতে-গলিতে পোস্টার পড়েছে—রুবী থিয়েটারের নতুন নাটকের বিজ্ঞাপন। সুরজিৎ সেনগুপ্তের 'নূতন যুগের ভোরে' প্রস্তুতির পথে। কাগজের বিজ্ঞাপন আর দেয়ালের পোস্টারে কাজ দিয়েছে খুবই, সাড়া পড়ে গেছে নাট্যরসিক মহলে। প্রথমতঃ এমন চটকদার নাটকের নাম সহজে চোখে পড়ে না। তার ওপর একেবারে নাম-না-জানা অপরিচিত নাট্যকার। এ ঘোষণায় খুশী হয়েছেন তাঁরা, যাঁরা নতুন কিছু দেখতে চান। যাঁরা এতদিন ধরে পেশাদার মঞ্চের একঘেয়ে নাটক দেখে মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। আর যেন সেই থোড়-বড়ি-খাড়া নিয়ে লেখা গল্প ভাল লাগে না। সেই সঙ্গে সন্ত্রস্ত হয়েছেন পেশাদারী মঞ্চের গোঁড়া ভক্তরা, যাঁরা সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে পুরনো দিনের আবর্জনাগুলোকেও জমিয়ে রাখতে চান রঙ্গালয়ের প্রতিটি রন্ধ্রে। আবার যাদের কাছে আঙুর ফল টক লেগেছে অর্থাৎ বহুদিন চেষ্টা করেও সাধারণ রঙ্গালয়ে নিজেদের লেখা নাটক নামাতে পারে নি তারা পোস্টারে সুরজিতের নাম দেখেই জিভে শান দিতে লেগে গেছে। এ নিয়ে আলোচনা হয় প্রত্যেকটি থিয়েটারে, স্টুডিওতে, শিল্পীদের মধ্যে, শ্যামবাজারের চায়ের দোকানে, বিভিন্ন নাটুকে গোষ্ঠীতে। এমন কি প্রগতিমঞ্চও বাদ যায় না।

প্রগতিমঞ্চের রিহার্সাল সবেমাত্র শেষ হয়েছে। রাত দশটা। সেদিনকার কথামত রমাদিকেই 'বন্ধ বলাকা'র নায়িকার অভিনয় করার জন্য নিমন্ত্রণ করে আনা হয়েছে। তাই রিহার্সাল একটু দেরিতে আরম্ভ হয়, স্টুডিওতে কাজ থাকলে বাড়ি ফিরে ক্লাবে আসতে দেরি হয় রমাদির। রমাদির যোগ দেওয়ায় প্রগতিমঞ্চের আর কিছু সুবিধা হোক বা না হোক একটা বিষয়ে উন্নতি হয়েছে নিশ্চয়, কাটা সৈনিকের যারা পার্ট করে তারা পর্যন্ত রিহার্সালে কামাই করে না। রমাদি আসবার আগে থেকেই সকলে এসে আসর জুড়ে বসে থাকে।

অনেকে চলে গেলেও ঘরে তখনও বেশ কয়েকজন বসে গল্প করছিল। প্রত্যেক দিনের মত আজও সুবোধ হাজরা হিসেব মেলাচ্ছে। কুন্তল নাটকের কপিগুলো একত্র করে বাড়ি যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে, দু-চারটি উৎসাহী নতুন সভ্য বেশীক্ষণ বসে থেকে কুন্তলের নজরে পড়ার চেষ্টা করছে। এমন সময় দরজার মুখ থেকে ফিরে দাঁড়িয়ে রমাদি ডাকলেন অলক ঘোষকে। বললেন, যদিও আমি আপনাদের ক্লাবের সভ্যা নই, তবু ভাবছিলাম—

রমাদি থামতেই অলক ব্যস্ত হয়ে পড়ে: বলুন না, কি বলছিলেন।

রমাদি হাসলেন: এখানে অভিনয় করছি বলে আমার অনেক বন্ধু এ ক্লাব সম্বন্ধে জানতে চান, আমি কিছুই বলতে পারি না, তাই—

রমাদি আবার থামলেন।

অলক হেসে ফেলে: আহা, কি ভাবছেন তাই বলুন না।

প্রগতিমঞ্চের কনস্টিটিউশানটা বোধ হয় আমার একবার পড়ে দেখা উচিত।

এ আর এমন কি কথা, আমি এখনই এনে দিচ্ছি।

অলক ঘোষ রমাদিকে খুশী করার সুযোগ পেয়ে সোৎসাহে এগিয়ে যায় সুবোধ হাজরার দিকে। বলে, এই, চট্ করে একটা কনস্টিটিউশানের কপি দে তো।

হাজরা তখনও খাতায় কী হিসেব লিখছিল। মুখ না তুলেই জিজ্ঞেস করে: কেন, কি ব্যাপার?

রমাদি চাইছেন।

কেন?

এমনি।

হাজরা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়, প্রগতিমঞ্চের কনস্টিটিউশান নিয়ে ওঁকে মাথা ঘামাতে হবে না।

অলক ঘোষ বিব্রত বোধ করে: আহা, পড়তে চাইছেন, দে না।

হাজরা কর্কশ কণ্ঠে উত্তর দেয়, না, দেব না।

তুই ভারি গোঁয়ার গোবিন্দ। আমি যে বলে এলাম নিয়ে আসছি।

এখন গিয়ে আবার বল্—নেই।

যদিও মুখে হাজরা বলল যে রমাদিকে কনস্টিটিউশানটা পড়তে দেবে না, তবু অলকের শুকনো মুখ দেখে বোধ হয় একটু মমতা বোধ করে, হয়তো মনে পড়ে গেল পাঞ্জাবীর দোকানে খাওয়া রুটি আর মাংসের কথা—তাই ফাইলের মধ্যে থেকে টাইপ করা কনস্টিটিউশানের কপি বার করে দিল অলকের হাতে। বলে, তুই বলেই দিচ্ছি, অন্য কেউ হলে দিতাম না।

কপিটা ব্যাগের মধ্যে ভরে রমাদি অলক ঘোষকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, কালই এটা আপনাদের ফেরত দিয়ে দেব।

অলক ঘোষ বাধা দিয়ে বলে, না না, তাড়া কিছু নেই, যতদিন খুশি ওটা রাখুন না।

এ তো আর গল্প-উপন্যাস নয় যে তারিয়ে তারিয়ে পড়ব।—বলে হাসতে হাসতে রমাদি গিয়ে উঠলেন ট্যাক্সিতে কুন্তলের সঙ্গে।

রোজই রিহার্সালের পর কুন্তল নিজে রমাদিকে বালীগঞ্জের বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে তবে বাড়ি যায়।

সবাই চলে যাবার পর ঘর ফাঁকা। বসে আছে শুধু দুজন—সুবোধ হাজরা আর অলক ঘোষ। অলক পাখার তলায় চিত হয়ে শুয়ে পড়ে ছাদের কড়িকাঠ গোনে। হাজরা হাতের কাজ শেষ করে ক্যাশবাক্স আলমারিতে তুলে রাখে। জিজ্ঞেস করে, কি রে, যাবি না?

অলক অন্যমনস্ক সুরে বলে, চল্।

হাজরা মুচকি হেসে অলকের দিকে তাকায়: কী এত ভাবছিস? তোর কথা তো সবই শুনলাম। রমাদিকে আনা হয়েছে—প্রগতিমঞ্চ সরগরম। তবে আর কিসের ভাবনা।

অলক একটা বড় হাই তুলে উঠে বসে: এখন আর প্রগতিমঞ্চ নয়, নিজের কথাই ভাবছি।

কি হল আবার?

ও বাড়িতে আর থাকা চলবে না। রোজই কেলোর কীর্তি—রতনলালটা একেবারে বকে গেছে। এখন দু পয়সা রোজগার করছে তো—স্কুলে নাচ শেখায়, প্রাইভেট ছাত্রী আছে, তার ওপর এখন সিনেমার নৃত্য-পরিচালক—পয়সা পেলেই বদ্ধ মাতাল হয়ে বাড়ি ফেরে।

তোরা আপত্তি করিস না?
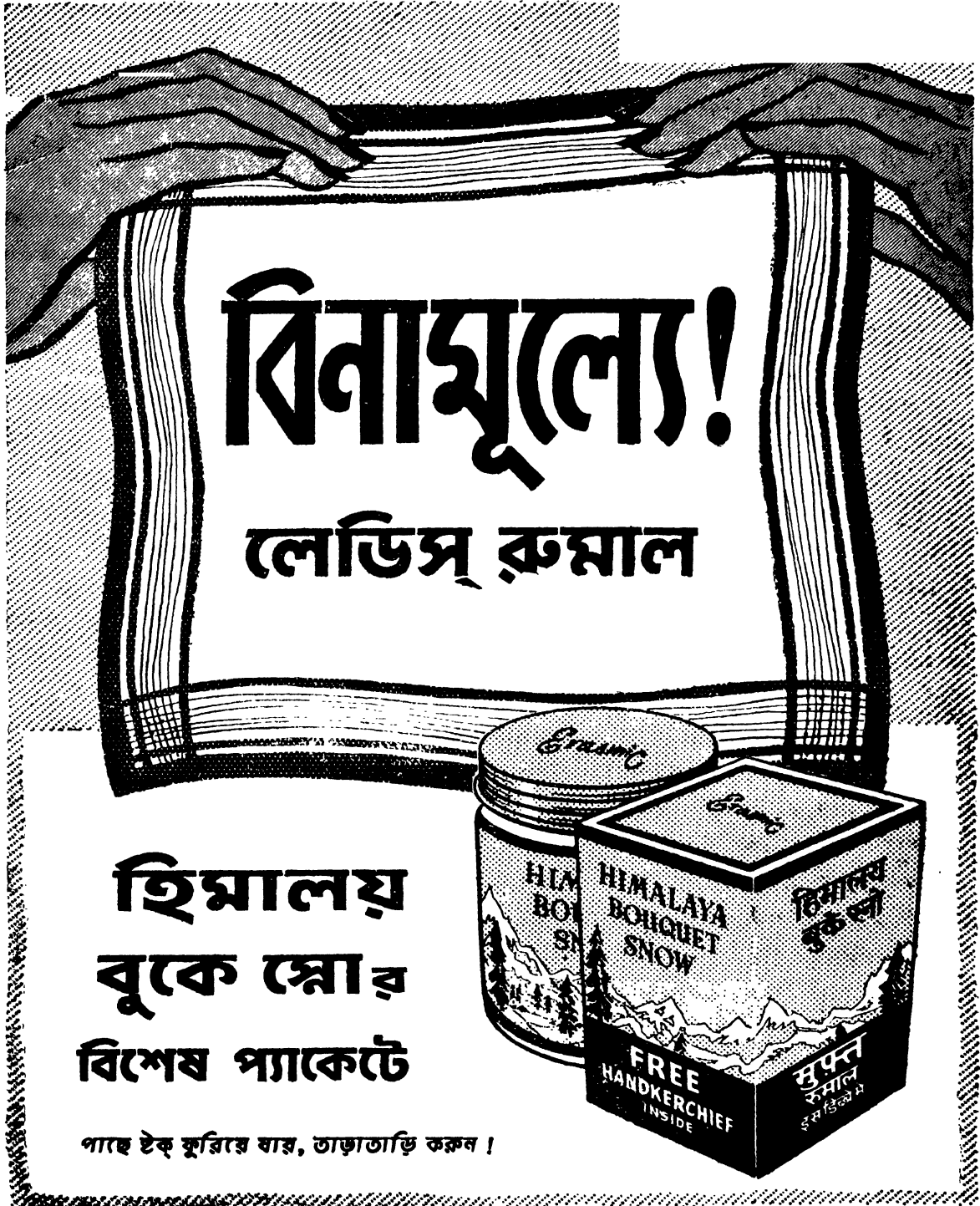
বললে শুনছে কে। আমি যাও-বা একটু বলি, মদন তো একেবারে চুপচাপ।

হাজরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, কেন? মদন তো বেশ ভাল ছেলে ছিল।

হলে হবে কি, নিজের তো বিশেষ রোজগার নেই, রতনলালই ওকে নিয়ে গিয়ে দু-একটা স্টুডিওতে কাজ যোগাড় করে দিয়েছে। তাই রতনলালের অনুরোধে দু-এক পাত্র নিজেও খেয়ে নেয়। ওখানে আর আমার থাকা চলবে না।

অথচ বাড়িটা তো তোর?

তা সত্যি।

বিনামূল্যে!
লেডিস্ রুমাল
হিমালয়
বুকে স্নোর
বিশেষ প্যাকেটে
পাছে ষ্টক্ ফুরিয়ে যায়, তাড়াতাড়ি করুন !
HIMALAYA
BOUQUET
SNOW
হিমালয়
বুকে স্নো
FREE
HANDKERCHIEF
INSIDE
মুফ্‌ত
রুমাল

অলক ঘোষ দিল্লীর ছেলে। ছেলেবেলা থেকেই আলো নিয়ে খেলা করে। রথের সময় এমন করে ব্যাটারি দিয়ে বাল্‌ব্‌ লাগাত যে রথের চাকা ঘোরার সঙ্গে চরকির মত আলো ঘুরত। টর্চের মুখে কাচের ওপর হিজিবিজি আঁকা ছবি লাগিয়ে সিনেমা দেখাত সমবয়সী বন্ধুদের। স্কুল-জীবন থেকেই শুরু হল তার ইলেকট্রিক বাল্‌ব্‌ নিয়ে নাড়াচাড়া করা। আর লাল নীল হলদে সবুজ সেলোফেন কাগজের কারসাজি। স্কুলের অনুষ্ঠানে, বারোয়ারী পুজোর মণ্ডপে, যেখানেই আলোর খেলা দেখাবার এতটুকু সুযোগ থাকত, অলক তা কিছুতেই ছাড়ত না। এ ধরনের কাজে বেশী মন দেওয়ার জন্যেই বোধ হয় অত্যন্ত বুদ্ধিমান হয়েও লেখাপড়ায় বিশেষ সুবিধে করতে পারল না অলক। বার দুই ইণ্টার-মিডিয়েটের বেড়ায় মাথা ঠুকে শেষ পর্যন্ত ইস্তফা দিল কলেজ-জীবনে। চেষ্টা করলে ছোটখাটো কোন চাকরি যে সে দিল্লীতে পেত না তা নয়, কিন্তু যখন দেখল বাড়িতে বাবা মা তার ওপর আস্থা হারিয়ে মেজো ভাইকেই মানুষ করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন তখন একদিন না বলে-কয়ে খানকয়েক জামা আর এক বস্তা আলোর সরঞ্জাম নিয়ে চলে এসেছিল কলকাতায়। উঠেছিল দূর-সম্পর্কের এক মেসোমশাইয়ের বাড়িতে, কিন্তু সেখানেও টিকতে পারল না বেশীদিন। রোজগার শুরু হতেই ভাড়া নিয়েছিল একটি বাড়ি—মনোহরপুকুর রোডে। দুখানা ঘরের একতলা ছোট্ট ফ্ল্যাট, ভাড়া পঁচাত্তর টাকা। একলা খরচা চালাতে পারবে না বলেই সঙ্গে করে এনেছিল রতনলাল আর মদনকে। রতনলাল নাচের মাস্টার, মদন ছবি আঁকে। কোন একটা স্কুলের নাচের শোতে তিনজনে একসঙ্গে কাজ করেছিল, সেইখানেই পরিচয়, ক্রমে বন্ধুত্ব, শেষে সহবাস। আজ সেই বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার কথাই ভাবছে অলক ঘোষ। এখন অবশ্য একলাই সে থাকতে পারে, মাস গেলে মোটামুটি একটা রোজগার তার হয়ই।

সুবোধ হাজরা সহজ গলায় বলে, যদি অসুবিধে হয়, অন্য জায়গা না পাওয়া পর্যন্ত এই অফিসে এসে থাকতে পারিস। এখানে?

কেন, আপত্তি আছে?

আপত্তি আমার নয়, কিন্তু ক্লাবের অন্য ছেলেরা কি বলবে।

কেউ কিছুই বলবে না।

তা হলেও মীটিং ডেকে সবাইকে বলা দরকার।

সুবোধ হাজরা সদম্ভে বলে, এ নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না। আমার ওপর কথা বলবার মত লোক প্রগতিমঞ্চে কাউকে জন্মাতে হবে না। যেদিন খুশি এখানে চলে আসবি, মালপত্তর নিয়ে। চল্, রাত হল।

ঘর বন্ধ করে দুজনে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। অনেক বাড়িতেই আলো নিভে গেছে। ফুটপাথে বিছানা পেতে শুয়ে আছে কলকাতার সেই সব নাগরিক—যারা একটা ছোট্ট কুঠরির মধ্যে বাসা বেঁধে বাস করে, একসঙ্গে পঁচিশ জন লোক। পানওয়ালার দোকানে তখনও কাজ শেষ হয় নি। জল ঢেলে সামনের ফুটপাথ সাফ করে দড়ির খাটিয়া পেতে শোবার ব্যবস্থা করছে সর্দারজীরা।

সুবোধ হাজরা অলকের কাছ থেকে একটা সিগারেট চেয়ে নিয়ে ধরায়। চলতে চলতেই বলে, রুবী থিয়েটারের সুরজিৎ সেনগুপ্তকে আবিষ্কার করেছি।

অলক ঘোষ কৌতূহল প্রকাশ করে: তাই নাকি, কোথায়?

কফিহাউসে। ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপও আছে, কথাও হয়, অথচ ও যে নাট্যকার তা তো জানতাম না।

আমার সঙ্গে একবার আলাপ করিয়ে দিবি? দেখি না চেষ্টা করে যদি পেশাদার মঞ্চে ঢুকে পড়া যায়।

হাজরা ঠোঁট উলটিয়ে বলে, ও কি আর পারবে, তবু একবার কাল আসিস কফিহাউসে, দেড়টা নাগাদ। পরিচয় করিয়ে দেব।

সেই ভাল হবে।

দুজনে এগিয়ে গিয়ে মোড়ের মাথায় বাস ধরে।

পরের দিন কফিহাউসে কারুর আর জানতে বাকী রইল না যে সাধারণতঃ একটা থেকে দুটোর মধ্যে প্রশস্ত

ললাট, উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যে ভদ্রলোকটি কোণের টেবিলে নির্জনে ঠাণ্ডা কফি পান করেন তাঁরই নাম সুরজিৎ সেনগুপ্ত—রূবী থিয়েটারের নবীন নাট্যকার। এ খবর রটনার মূলে অবশ্য একজনই—সুবোধ হাজরা। অভ্যাসমত এক টেবিল থেকে আর এক টেবিলে মৌমাছির মত উড়ে বেড়াবার সময় গুনগুন করে সকলের কানে এ খবরটিও ঢেলে দিয়েছে, তাই চেনা-অচেনা অনেকের কাছ থেকেই সুরজিৎকে শুনতে হল—কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স্‌।

সুরজিৎ না বোঝার ভান করে হাসে : কি ব্যাপার ?

আর তো লুকিয়ে রাখতে পারবেন না, আমরা সব শুনে ফেলেছি। কবে খাওয়াচ্ছেন বলুন।

আগে নাটক উদ্বোধন হতে দিন।

সে কদিন অপেক্ষা করতে আমরা রাজী আছি। কিন্তু তারপর চাই হরদম পাস, আর একদিন পেট পুরে খাওয়া। এ শুধু আপনার কফিহাউসের বন্ধুদের জন্য।

পল্টু মিত্তির দূর থেকে কথাগুলো শুনে উপভোগ করছিল। এগিয়ে এসে বলল, কফিহাউসের চেয়ে বড় পাবলিসিটি সেণ্টার কলকাতায় আর কোথাও নেই, এখানকার লোক ভাল বললে অতি নাক-তোলা লোকেরাও আপনার থিয়েটার দেখতে দৌড়বে। আর যদি খারাপ বলি—

সুবোধ হাজরা বাকিটা শেষ করে দেয় : থিয়েটার হলে মাছি তাড়াতে হবে—এই তো ?

তুমি কেন মাঝখান থেকে ফ্যাচফ্যাচ করছ হাজরা। এ তোমাদের প্রগতিমঞ্চের ছেলেমানুষী নয়, রীতিমত প্রফেশ্যনাল থিয়েটার।

হাজরা ফোঁস করে উঠল। কে যেন গরম তেলে বেগুন ছেড়েছে : দেখ মিত্তির, নাটকের তুমি 'ন' বোঝ না, কেন তুমি ভদ্রলোকের সঙ্গে যা-তা বকছ। ভদ্রলোক একটা চান্স পেয়েছেন, কোথায় আমরা তাঁকে উৎসাহ দেব তা নয়, কি করে তার কিছু পয়সা খসাবে এই মতলব।

এর পর যা হয়—ঘটলও তাই। পল্টু মিত্তির আর সুবোধ হাজরা আধঘণ্টা ধরে ঝগড়া করে গেল। নাটক-থিয়েটারের গণ্ডী ছাড়িয়ে শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত আক্রমণ। আনন্দ পেল আর পাঁচজন যারা বসেছিল সেই টেবিলে। পল্টু মিত্তির কোনদিনই উত্তেজিত হয় না, আজও হয় নি। এত চেঁচামেচির মধ্যেও অভ্যাসমত চিবিয়ে চিবিয়ে জিজ্ঞেস করে, তোমার রাশি কী ?

সুবোধ হাজরা খেপে যায় : ওসব বুজরুকি আমি বিশ্বাস করি না।

আমার মনে হয় তোমার রাশি বৃষ, ষাঁড়ের মতই নীরেট, তেমনই গোঁয়ার।

আর তুমি ?

পল্টু মিত্তির মুচকি হাসে : আমি তুলা রাশির লোক, সব সময় ওজন করে দেখি।

হাজরা ফেটে পড়ে : ঘোড়ার ডিম ওজন কর। তোমার রাশি তুলা নয়—তুলো। বালিশের তুলো—কার্পাস।

আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে টেবিল চাপড়ে সুবোধ হাজরা উঠে পড়ে। পল্টু মিত্তির কিন্তু ব্যাঙের মত গম্ভীর গলায় তখনও বলে, উঠলে কেন, তোমায় একটা ঠাণ্ডা কফি খাওয়াতাম।

থাক্, আর আদিখ্যেতার দরকার নেই। সুরজিৎবাবু, আপনার সঙ্গে একজনের আলাপ করিয়ে দিতে চাই, যদি একবার ওই কোণের টেবিলে আসেন।

নিশ্চয়ই।—বলে ওঠবার ভঙ্গী করে সুরজিৎ।

পল্টু মিত্তির খপ করে তার হাতটা ধরে ফেলে বলে, যাচ্ছেন যান, বাধা দেব না, তবে হাজরা যদি আপনাকে কোন প্রোপোজাল দেয়, জানবেন তার মধ্যে ওর দু আনার দালালি আছে।

হাজরা চোখমুখ লাল করে বলে, চলে আসুন সুরজিৎবাবু, ও একটা অসভ্য। কী করে ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে হয় তাই জানে না। কাঁচা বাংলায় যাকে বলে একটা শুয়োর।

টেবিলসুদ্ধ সবাই হেসে ফেলে, এমন কি পল্টু মিত্তিরও। মাসের মধ্যে দশদিন এ রকম ঝগড়া ওদের লেগেই আছে। এ ধরনের চেঁচামেচি শুনলে পাশের

টেবিলের লোকেরা বিচলিত হলেও এ টেবিলের সদস্যরা উপভোগই করে।

কোণের টেবিলে বসে ছিল অলক ঘোষ। সুবোধ হাজরা সুরজিৎকে নিয়ে এসে পরিচয় করিয়ে দিল। মামুলী দু-একটা কথাবার্তার পরই অলক থিয়েটারের কথা বলে, রুবী থিয়েটারে আপনার নাটক হচ্ছে শুনে বড় আনন্দ হল। পেশাদার মঞ্চের এক বিচিত্র পরিবেশ, সেখানে এমন সব প্যাঁচ করে রেখেছে যে আপনার আমার মত লোকের ঢোকবার কোন উপায়ই নেই।

সুরজিৎ পকেট থেকে সিগারেট বার করে অন্যদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, সে আর জানি না! আমি যে সুযোগ পেয়েছি—এ একেবারে হঠাৎ, জানি না এতে সত্যি কোন লাভ হবে কি না।

অলক ঘোষ জোর দিয়ে বলে, না না, ঢুকতে হবে, যেমন করে হোক আমাদের ঢুকতে হবে।

সুরজিৎ সিগারেটে আগুন ধরিয়ে কাঠিটা নেবাতে নেবাতে বলে, সেদিন 'বন্য বলাকা'য় আপনার লাইটিং দেখলাম, বড় চমৎকার হয়েছে—বিশেষ করে সেই জায়গাটা, যেখানে দিন কেটে গেল, সন্ধ্যে হয়ে এল—তারপর রাত। সামনে কথাবার্তা চলছে, অথচ মঞ্চের আলো ক্রমশঃ বদলে কি সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করল। আমি তখনই আপনার কাজের তারিফ করেছি।

অলক ঘোষ প্রশংসা শুনে খুশী হয়। গভীর গলায় বলে, স্বপ্ন দেখি অনেক, কাজ করতেও চাই, কিন্তু সুযোগ কোথায়! কটাই বা আলো পাই। তার মধ্যে অর্ধেক ডিমারে কাজ করে না। পেছনে যে বড় নীল পর্দা দিয়ে সাইক্লোরামা তৈরি করব তাই বা সব স্টেজে পাচ্ছি কই।

সুবোধ হাজরা এরই মধ্যে মন্তব্য করে: এ কথা ঠিক, নাটকে আলোকসম্পাত করার যে একটা প্রয়োজনীয়তা আছে তা অলকই প্রথম লোকের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। যদি কোন সুযোগ পান এ ছোকরাকে একটু ব্যাক করবেন। আমি বলছি, ও আপনাকে সাহায্য করতে পারবে খুব।

সুরজিৎ এই কথাটাই শুনবে আশা করছিল। বলে, সে আমাকে বলতে হবে না। যদি একবার খুঁটি গেড়ে বসতে পারি, আপনাদের সবাইকেই আস্তে আস্তে নিয়ে যাব।

অলক ঘোষ চট্ করে বলে, আমাদের প্রগতিমঞ্চের জন্য কিন্তু আপনাকে নাটক দিতে হবে। আমরা তো মৌলিক নাটক খুঁজছি। আপনাদের মত শক্তিশালী নাট্যকাররা যদি সাহায্য না করেন তা হলে নবনাট্য আন্দোলন কতটুকু আর এগোতে পারবে।

সুরজিৎ না বলে পারে না: মজা কি জানেন, নাটক বগলে করে কত জায়গায় যে হেঁটেছি তার ইয়ত্তা নেই। কারুর কাছ থেকে এতটুকু আশার বাণীও শুনি নি, কিন্তু আজ বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে একটা নাটক পেশাদার মঞ্চে লেগে গেছে বলে, আমি রাতারাতি শক্তিশালী নাট্যকার হয়ে গেছি।

সুবোধ হাজরা দুজনকেই থামিয়ে দেয়: দোষ আপনার সুরজিৎবাবু। রোজ আপনার সঙ্গে আমার কফিহাউসে দেখা হচ্ছে, আপনাকে থিয়েটারের টিকিট গছাচ্ছি, আপনি জানেন, আমি প্রগতিমঞ্চের সেক্রেটারি—তবু একদিনও বলেন না যে আপনি নাটক লেখেন।

পাছে আপনারা হাসেন, তাই বলি নি।

অলক ঘোষ দরকারি কথা সেরে নেয়: যদি অসুবিধে না হয় আপনার সঙ্গে নাটকের মহলা দেখতে যাব। লাইট সম্বন্ধে কিছু কিছু আপনাকে সাজেশান দিতে পারব, যদি ভাল মনে করেন কাজে লাগাবেন। তার জন্য আমাকে কোন পয়সা দিতে হবে না।

বেশ তো, আপনাকে খবর দেব। আপনার ঠিকানা?

অলক ঘোষ একটু ভেবে নিয়ে বলে, সম্প্রতি আমি বাড়ি বদলাচ্ছি, হাজরাকে বলে দিলেই হবে।

হাজরা হাসে। বলে, আর আমার ঠিকানা তো জানেনই—কফিহাউস।

দুজনকে নমস্কার করে সুরজিৎ উঠে পড়ে: এবার আমাকে মাফ করবেন। প্রায় আড়াইটে বাজে, এখুনি অফিসে হাজিরা দিতে হবে।
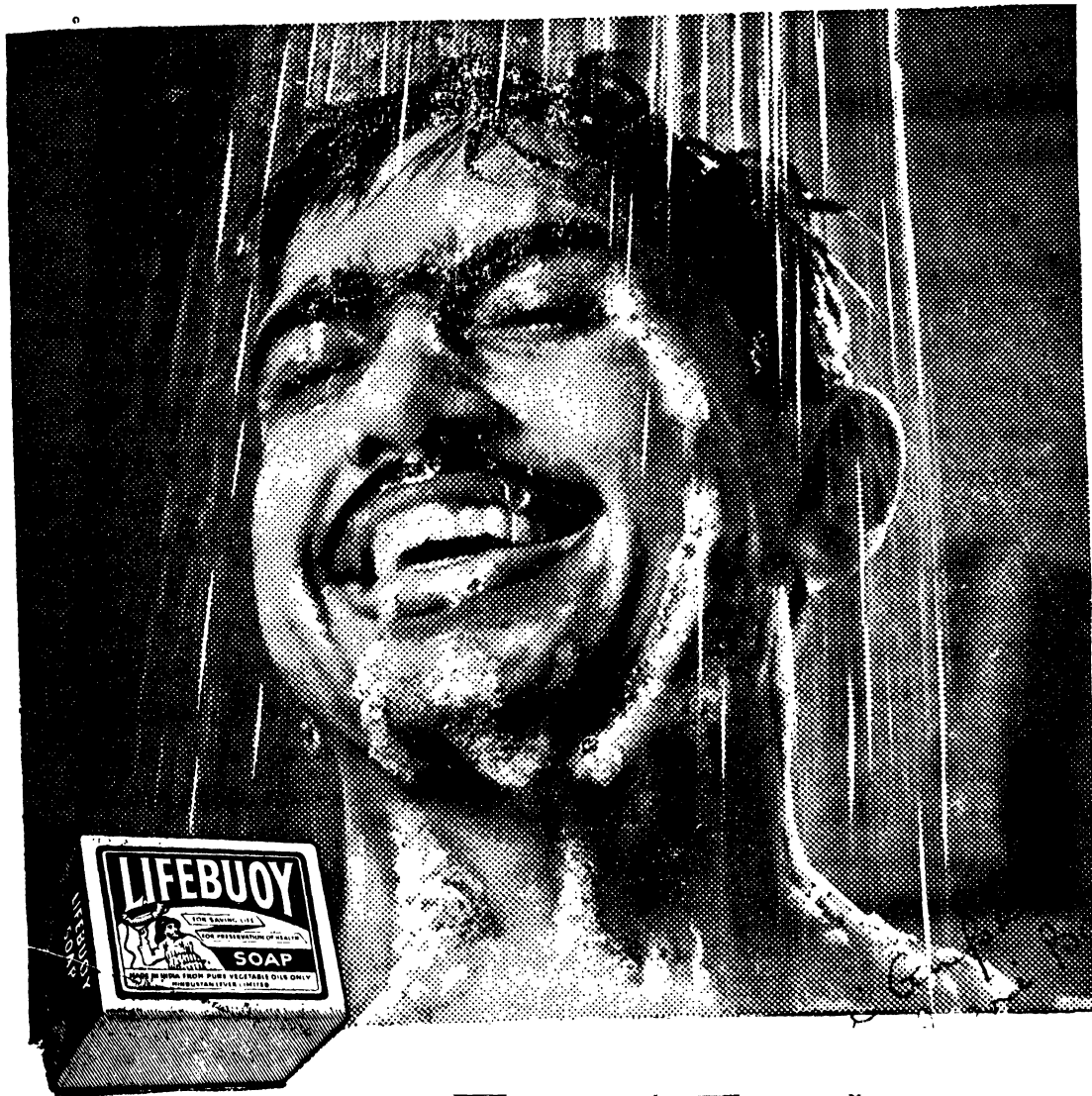
LIFEBUOY
FOR SAVING LIFE
FOR PRESERVATION OF HEALTH
SOAP

ইতিমধ্যে কফিহাউসের আড্ডা অনেকখানি পাতলা হয়ে এসেছে, কোন টেবিলই আর ভর্তি নেই। দু-একজন ইতস্তত: বসে গল্প করছে নিজেদের মধ্যে। কারুর দিকে না তাকিয়ে স্থরজিৎ বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

রুবী থিয়েটারের পোস্টার পড়ার পর থেকে নাট্যকার স্থরজিতের নাম শুধু যে বাইরেই ছড়িয়ে পড়ল তা নয়, ঘরের মধ্যেও আলোচনা চলল পুরোদস্তুর। জ্যাঠামশাই আর কাকা—সাহিত্যের সঙ্গে যাদের ভাশুর-ভাদ্রবউ সম্পর্ক, যাঁরা পড়েন শুধু খবরের কাগজ, তাঁরাও বিস্ময় প্রকাশ করলেন। জ্যাঠামশাই বললেন, আশ্চর্য, খোকন কী সব লেখেটেখে জানতাম, কিন্তু তার বই যে পাবলিক থিয়েটারে অভিনয় হবার মত—এ কখনও ভাবতে পারি নি। কাকা বললেন, ও একেবারে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ, বাংলায় ফেল করার ভয়ে সায়েন্স পড়ে ডাক্তার হলাম, আর সেই বংশের ছেলে হয়ে খোকন কিনা বই লিখছে!

সাহিত্যের সঙ্গে স্থরজিতের যোগসূত্র কোথায়—বাড়ির আর কেউ খুঁজে না পেলেও যিনি খোকনের এই নাট্যখ্যাতিতে মোটেই বিস্মিত হন নি, তিনি জ্যাঠাইমা। প্রসন্ন হাসি হেসে বলেন, খোকন যে বই লিখবে এ আমি খুব জানতাম। ওর বাবারও কি কম শখ ছিল! নানা কাজের চাপে ঠিক ফুটল না।

স্থরজিৎ জিজ্ঞেস করে, বাবার লেখা আপনি দেখেছেন?

দেখেছি বইকি, কত দেখেছি। নতুন বিয়ে হয়ে যখন এ বাড়িতে এলাম, তোমার বাবা তখন স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ে কিংবা কলেজেই ঢুকেছে। ও তখন কবিতা লিখত। আমাকে দেখাত। যদিও কোথাও ছাপাটাপা হয় নি, কিন্তু বেশ ভাল লিখত।

লেখা বন্ধ করলেন কেন?

জ্যাঠাইমা চোখ দুটো ছোট করে পুরনো দিনের কথা ভাববার চেষ্টা করেন: বন্ধ একেবারে করে নি—লিখত, তবে খুব কম। কলেজ থেকে বেরিয়েই কাজে ঢুকে গেল, আর সময় পেত না। খুব তাড়াতাড়ি কাজে উন্নতি করলে তো।

স্থরজিৎ মুখটা নীচু করে বলে, এক এক সময় মনে হয় বাবার লেখার খাতাগুলো পেলে বেশ হত। পড়তাম, হয়তো অনেকটা ওঁকে বুঝতেও পারতাম।

জ্যাঠাইমা চোখের জল মুছলেন: সেদিনের কথা মনে হলে বড় কষ্ট হয়। হঠাৎ খবর এল তোমার বাবা মারা গেছেন, সারা বাড়িটা যেন ঝিমিয়ে পড়ল। কোথায় যে কোন্ জিনিস পড়ে রইল কে আর তখন খবর রেখেছে। আমার মনে হয় ওর লেখবার খাতাপত্তর সব ওর সঙ্গেই ছিল, সেগুলো আর কেউ আনে নি।

কিন্তু বাড়ির এ ধরনের আলোচনায় কখনই যোগ দিতেন না পদ্মাবতী। সব সময় মৃদু হেসে হ্যাঁ বা না সামান্য উত্তর দিয়ে সরে যেতেন। মার এই নির্লিপ্ত ভাব মোটেই ভাল লাগত না মাধবীর। প্রায়ই সে অনুযোগ করত, দাদার সঙ্গে থিয়েটার নিয়ে তুমি কোন কথাই বল না। ও কিছু বলতে গেলেও তুমি একটু বাদেই উঠে যাও। কেন বল তো?

পদ্মাবতী স্থির দৃষ্টিতে মাধবীকে একবার দেখে নেন। বলেন, সবাই তো কথা বলছে।

তাতে কি হয়েছে, তোমার শুনতেও ইচ্ছে করে না?

বয়স বাড়ছে তো, উৎসাহও কমছে। এতগুলো বছর ধরে শুধু কর্তব্য পালন করেছি! এখন তোমরা মানুষ হয়েছ, বড় হয়েছ, আর নতুন করে কিছু ভাবতে পারি না।

মাধবী বোঝে মা কথা এড়িয়ে যাচ্ছেন। স্থরজিতের লেখক-জীবনের সূচনা দেখে তিনি মনে মনে শঙ্কিতই হয়েছেন, শুধু মুখে তা প্রকাশ করছেন না। মাধবী না বলে পারে না: দাদা ব্যারিস্টার হলেই তুমি বেশী খুশী হতে।

পদ্মাবতী আবার মেয়ের দিকে তাকান: ব্যারিস্টার পদবীর ওপর আমার কোন লোভ নেই। আমি চেয়েছিলাম স্থরজিৎ মাথা তুলে দাঁড়াক—মানুষের মত মানুষ হোক। তোমাদের মানুষ করার জন্যে আমি কোনদিন কারুর কাছে হাত পাতি নি। তোমাদের বাবা যা রেখে গিয়েছিলেন তাই দিয়েই সব খরচা চালিয়েছি। নিজের জন্যে আমি মোটেই ভাবি না,

বড়লোকের মা হবার সাধ আমার নেই। বরাবর ভাবতাম, বড় হয়ে খোকন দশজনের মধ্যে একজন হবে। হল না!

মাধবী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, কেন তুমি ভাবছ হল না? দাদা যদি লেখক হিসেবে নাম করে তাতে কত সম্মান!

পদ্মাবতী এ প্রসঙ্গ নিয়ে আর আলোচনা করতে চান না, উঠে দাঁড়ান। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, হলেই ভাল।

মাধবীর সঙ্গে সুরজিতের এ বিষয় নিয়ে কোন খোলাখুলি আলোচনা না হলেও মার এ মনোভাবের কথা সুরজিতের অজানা ছিল না। সে জানে পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট হলেই মা যখন সানন্দে তাকে আদর করে কাছে টেনে নিতেন তখন থেকেই ছেলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি মনে মনে আকাশকুসুম রচনা করতেন। ছেলেবেলা থেকেই সুরজিৎ মাকে ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে। বাবার অভাব পূরণ করে কত কষ্টে এই দুই ভাইবোনকে মানুষ করেছেন। সে কথা ভাবলেই সুরজিতের চোখে জল আসে। কিন্তু বয়স যত বাড়তে লাগল, ধীরে ধীরে তার মনে জাগল সাহিত্যপ্রীতি। নারকোলের মধ্যে যেভাবে সকলের অজান্তে জল প্রবেশ করে সেইভাবে কোন্‌দিন তার হৃদয় সাহিত্যরসে পূর্ণ হয়ে ভালবাসায় রূপান্তরিত হল তা সুরজিৎ নিজেই বুঝতে পারে নি। একদিন মায়ের আশা পূরণ করার জন্যে সে ভেবেছিল ভালভাবে পাস করে বেরিয়ে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দেবে, হয় বড় চাকরি নিয়ে সরকারী গদিতে বসবে, নয়তো বিলেত গিয়ে ব্যারিস্টারীর তকমা লাগিয়ে আসবে। কিন্তু লিখতে শুরু করে সে বুঝল, দু নৌকোয় পা দিয়ে চলা যাবে না। লেখক হতে গেলে বড় চাকরির লোভ তাকে ছাড়তে হবে। বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলালের যুগ চলে গেছে, সরস্বতীর আরাধনা করলে লক্ষ্মীর অনুগ্রহ পাওয়া শক্ত। সুরজিৎ জানত মা এতে মোটেই খুশী হবেন না। কিন্তু হৃদয়ের অনুপ্রেরণাকে সে অস্বীকার করতে পারে নি।

এক একসময় সুরজিৎ বলে, মার জন্যে আমার বড় কষ্ট হয়। উনি যা চাইলেন আমি তা হতে পারলাম না। কিন্তু কি করব।

মাধবী সহানুভূতি প্রকাশ করে: তুমি ভুল করছ। মুখে না বললে কি হবে, তোমার নাটক থিয়েটারে হচ্ছে বলে মা খুব খুশী হয়েছেন।

সুরজিৎ ম্লান হাসে: আমি যে তোর দাদা ভুলে যাস কেন, মার মনের কথা কি আর আমি বুঝতে পারি না। গাড়ি বাড়ি মান-ইজ্জত—আমিও যে একদিন এসব কথা ভাবতাম, কিন্তু হঠাৎ কে যেন মনটা বদলে দিল। ও-সব বড় ফাঁকা রে, বড় মিথ্যে।

মাধবীর দিকে তাকিয়ে তার মাথাটা সস্নেহে নেড়ে দিয়ে সুরজিৎ বলে, তবে তোর বিয়েটা একটা ভাল জায়গায় দিতে হবে।

মাধবীও হাসে: থাক্‌, সে নিয়ে আর তোকে মাথা ঘামাতে হবে না।

কেন, অলরেডি কাউকে পছন্দ করেছিস নাকি?

মাধবী সহজ গলায় বলে, আমি চাকরি করব।

সে তুই কর্‌ না, কিন্তু গাড়ি-বাড়ি আছে এমন জামাই আমায় একটা যোগাড় করতে হবে, তাতে অন্ততঃ মা একটু খুশী হবেন।

মাধবী সশব্দে হাসে: তুই বেশ আছিস দাদা, মিথ্যে ফাঁকা সব বড় বড় কথা বলে আমাকে এখন সেইখানেই ঠেলবার মতলব।

সুরজিৎও হাসতে থাকে। এমনি হাসি-ঠাট্টার মধ্যে দিয়েই দুই ভাইবোনের দিন কেটে যায়। দশ বছর আগেও তারা যেমন ছিল, এখনও তেমনি। এতটুকু পরিবর্তন হয় নি।

সেদিন রবিবার।

ঘুম ভেঙে গেলেও ইচ্ছে করেই শুয়েছিল সুরজিৎ। আজ অফিস নেই। সকালের দিকে বেরুবারও কোন কথা ছিল না। তাই অন্যদিনের মত সাত-তাড়াতাড়ি উঠতে ভাল লাগছিল না। ভাবছিল নাটকের কথা—কদিন বাদেই তার উদ্বোধন। কে জানে পাবলিক কি ভাবে নেবে! কাগজেই বা কী লিখবে কে বলতে পারে! পাশের ঘর থেকে মাধবীর গান ভেসে

আসছে। গলাটা ওর মিষ্টি, শিখলে ভাল গান করতে পারত। জ্যাঠাইমার পুজোর ঘর থেকে ঘণ্টা বাজছে। নিশ্চয় কুলপুরোহিতের ইস্কুলে-পড়া পনেরো বছরের ছেলে গায়ে নামাবলী চাপিয়ে পুজো করতে বসেছে। বাইরের ঘরে কারা যেন ঢুকল, মার সঙ্গে কথা বলছে। আত্মীয়-স্বজন কেউ হবে বোধ হয়। মনে মনে বিরক্ত হয় সুরজিৎ, ইচ্ছে না করলেও এখুনি হয়তো উঠে গিয়ে গল্প করতে হবে। কেন যে এরা যখন-তখন আসে।

একটু পরেই মা এসে ঘরে ঢুকলেন : খোকা, তোকে কারা খুঁজছেন বাইরে।

সুরজিৎ বিরক্তি গোপন না করেই জিজ্ঞেস করে, কারা ?

আমি চিনি না। নাম বললে চৌধুরী। সঙ্গে একটি মেয়ে এসেছে।

সুরজিৎ উঠতে উঠতে বলে, জানি না আবার কে এল, দেখি।

সুরজিৎ মুখ ধুয়ে গায়ে জামা দিয়ে বাইরের ঘরে এসে দেখে রুবী থিয়েটারের ম্যানেজার রমেন চৌধুরী। সুরজিৎকে দেখেই দাঁড়িয়ে উঠে একগাল হেসে বলে, সার্, আপনাকে বিরক্ত করলাম না তো ? কিন্তু থিয়েটারে কিছুতেই আপনার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছি না, তাই আজ রোববার দেখে শুভ্রাকে নিয়ে সোজা এখানে চলে এলাম। শুভ্রা মিত্র। ওর কথা তো আগে থেকেই বলে রেখেছি।

মেয়েটি যেন তৈরি হয়েই ছিল, কথা শেষ হওয়ার আগেই হাসি-হাসি মুখ করে এগিয়ে এসে ঝুপ করে সুরজিৎকে প্রণাম করে। সুরজিৎ ঠিক এজন্যে প্রস্তুত ছিল না। বলে ওঠে, আরে আরে, একি হচ্ছে।

উত্তর দিল রমেন চৌধুরী, আমি খুব বড় মুখ করে ওর মাকে বলে এসেছি, ওকে চান্স কিন্তু আপনাকে দিতেই হবে।

সুরজিৎ বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করে : আপনি তো জানেন রমেনবাবু, আমার আর কতটুকু ক্ষমতা, হবীবাবু মালিক, রতীনবাবু পরিচালক, ওঁরা যাকে যাকে নেবেন—

সে কথা আর আমাকে বলতে হবে না সার্। হবীবাবুকে বলে রেখেছি, শুভ্রাকে ওঁর রীতিমত পছন্দ হয়েছে। অনেকক্ষণ বসিয়ে গল্প করলেন। এখন আপনার যদি অমত না হয়, তা হলেই রতীনবাবুকে আমি চেপে ধরব।

অগত্যা সুরজিৎকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে হয়, আপনি আগে অভিনয় করেছেন ?

শুভ্রা বড় বড় চোখ তুলে তাকায় : অনেক পার্ট করেছি তবে প্রফেশ্যনাল থিয়েটারে নয়, অ্যামেচারদের সঙ্গে। আপনাদের বোর্ডের মন্দিরাদি, বীথিদি সবাই আমাকে চেনেন।

এক ধরনের চরিত্র অভিনয় করতে আপনার ভাল লাগে ?

শুভ্রা ফিক করে হাসে, এক সারি সুন্দর ঝকঝকে দাঁত বেরিয়ে পড়ে : দুঃখের রোল আমার ভাল আসে, সেন্টিমেণ্টাল চরিত্র আর কি। খুব সহজে আমি কাঁদতে পারি। বীথিদির মত চোখে গ্লিসারিন দিতে হয় না।

রমেন চৌধুরী মাঝখান থেকে ওকালতি করে : শুভ্রা ঠিক বলেছে সার্, এই কদিন আগে আমাদেরই বোর্ডে 'পথের শেষে' নাটকে পারুলের পার্ট করল—সে হাউহাউ করে কি কান্না। আপিসের ছেলেগুলোকে তো পাশে দাঁড়াতে দিল না, এমন কি মন্দিরার ললিতাও খুলল না। আমি বলছি সার্, শুভ্রাকে নিলে আপনার নাটকের-ড্র বাড়বে।

শুভ্রা মিত্রের চেহারা ভালই। বড় চোখ, টিকলো মুখ, চুলের সামনের দিকটা কোঁকড়ানো, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মানানসই লম্বা, তবে মনে হয় বয়েসের অনুপাতে শরীরটা ভারী করে ফেলেছে। একটু ঝরে গেলেই যেন ভাল হয়।

সুরজিতের মনের কথা বুঝতে পেরেই যেন রমেন চৌধুরী বলে ওঠে, স্টেজে ওকে যা মানায় সার্, তা আপনি নিজে না দেখলে বুঝতে পারবেন না। সেদিন শাজাহানে সাদা পোশাক পরে যখন পিয়ারা সেজে বেরিয়ে এল, দর্শকরা সব বলাবলি করছিল মেয়েটি কে ?

এ লাইনে ওর ফিউচার খুব। তবে আমার ইচ্ছে আপনার বই থেকেই সেটা শুরু হোক।

সুরজিতের আর বকবক করতে ভাল লাগে না, কথা সংক্ষেপ করার জন্যে বলে, ঠিক আছে, আমি রতীনবাবুর সঙ্গে কথা বলব। আমার দিক থেকে কোন আপত্তি হবে না।

রমেন চৌধুরী উঠে পড়েঃ বাস্, তা হলেই হল। বাকিটা আমি ম্যানেজ করে নেব সার্।

শুভ্রা মিত্র পাছে আবার প্রণাম করে তাই সুরজিৎ আগে থেকেই প্রস্তুত হয়েছিল, হাত তুলে নমস্কার করে তাদের বিদায় জানায়।

সপ্রতিভ শুভ্রা খুশী হয়ে যাবার আগে হেসে বলে, আপনাকে কিন্তু আমি দাদা বলে ডাকব।

কদিন থেকে রিহার্সাল শুরু হয়েছে নাটকের।

বৃহস্পতি শনি রবি এই থিয়েটারের দিনগুলো বাদ দিয়ে অন্যদিন সন্ধ্যেবেলা বোর্ড ভাড়া দেওয়া থাকে অ্যামেচার পার্টিদের। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত এ সব মঞ্চ যে খুব বেশী ভাড়া হত তা নয়, কিন্তু এখন নাট্য-আন্দোলনের দৌলতে আর বিভিন্ন অফিসের রিক্রিয়েশান ক্লাবের কল্যাণে একটি সন্ধ্যাও মঞ্চ খালি পড়ে থাকে না। তাই থিয়েটারের নিজস্ব নাটক নামাবার সময়ও রিহার্সালের জন্য বোর্ড খালি পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ রুবী থিয়েটারের তিনতলার ঘরে মহলা দেওয়া হয়। হৃষীকেশবাবুর অফিসের সামনে দিয়ে যে বারান্দা উত্তর দিকে এগিয়ে গেছে, তারই শেষপ্রান্তে মাঝারি আকৃতির ঘর। ধুলো-পড়া ময়লা অবস্থাতে থাকলেও নাটকের মহলার আগে ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার শতরঞ্চি ও ফরাশ পেতে রাখা হয়। রিহার্সালে সময়মত আসে ছুচো অভিনেতারা—যারা দু লাইনের পার্ট বলে বা মঞ্চে এসে ভিড় করে দাঁড়ায়। মহলার সময় কোনদিনই তাদের পার্ট বলানো না হলেও তারা আসে—পাছে বাদ পড়ে যায়। আর আসে মেয়েরা, কারণ থিয়েটারের গাড়ি তাদের ধরে আনে। যদিও আসতে তাদের দেরি হয়, ওরা দোষ দেয় ড্রাইভারকে। যাঁরা আসেন সবচেয়ে দেরি করে আর চলে যান সবচেয়ে তাড়াতাড়ি—তাঁরা হলেন বক্স-আর্টিস্ট। এঁদেরই নাম বড় হরফে ছাপানো হয় পোস্টারের ওপর, এঁদের জন্যই নাকি থিয়েটার চলে।

রুবী থিয়েটারের সবচেয়ে নামকরা বক্স-আর্টিস্ট প্রদীপ মুখার্জী। দীর্ঘ গৌরবর্ণ চেহারা, সুঠাম শরীর, মাথায় পাতলা চুল, তীক্ষ্ণ চোখ, গম্ভীর কণ্ঠস্বর—অভিনেতা হবার সবরকম স্বাভাবিক গুণই তার আছে। রুবী থিয়েটারের যে-কোন নাটকের প্রধান চরিত্র তার বাঁধা, কিন্তু রিহার্সালে সে আসে না—কারণ সময় নেই, বিজি আর্টিস্ট।

দ্বিতীয়জন রসময় ঘোষ—একটা আস্ত ভাঁড়। কালো, মোটা চেহারা, মাথায় বাবরী চুল, নাকের পাশে একটা বড় আঁচিল। শরীরটাকে ভেঙেচুরে যেমন করে খুশি নেচেকুঁদে সে লোক হাসাতে পারে। দর্শক হাসলে সে অভিনয়ের মধ্যে বাড়াবাড়ি করে, হাততালি পেলে ডিগবাজী খেতেও প্রস্তুত। রিহার্সালে সে আসে, তবে নিজের পার্ট বলে না, অন্যদের দোষ ধরে।

ঠিক এ ধরনের রিহার্সালের সঙ্গে সুরজিৎ কোনদিনই পরিচিত ছিল না। যদিও রতীনবাবু সময়মতই আসেন, তবে ঘরে ঢুকেই শুরু করেন পুরনো দিনের থিয়েটারের গল্প—গিরীশবাবু কি ভাবে রিহার্সাল নিতেন, সে সময় কত বিদ্বান বিচক্ষণ লোকেরা ঘরে উপস্থিত থাকত—হাসি-ঠাট্টা করার কোন সুযোগই ছিল না। অভিনেত্রীরা গভীর মনঃসংযোগ করে গুরুর কাছে অভিনয় শিখত। গিরীশচন্দ্রের শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে কোথায় পার্থক্য ছিল অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফির শেখানোর কিংবা অমৃতলাল মিত্রের। নবীন শিল্পীদের দল সাগ্রহে শুনত রতীনবাবুর গল্প। তারপর হঠাৎ যখন মেয়েরা অনুযোগ করত দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে, তখন শুরু হত রিহার্সাল।

রিহার্সাল মানে মাটিতে বসে বসেই জোরে জোরে পার্ট বলা। কোথায় গলা উঠবে নামবে, তারই নির্দেশ দেওয়া। মঞ্চের ওপর কে কোথায় দাঁড়াবে, কোন্ কথার সঙ্গে এগোবে বা পেছবে তা বলা হয় না কাউকে। এই রকমই নাকি পেশাদার মঞ্চের রিহার্সাল দেওয়ার দস্তুর।

কুচোদের দলের একটি ছেলে—নাম কান্তি, প্রথম থেকেই সে সুরজিতের সঙ্গে আলাপ করেছে। ফিসফিস করে সে বলে, আমাদের পার্ট বলানো হবে সেই স্টেজ-রিহার্সালের দিন। প্রথম দু-চার নাইট স্টেজে ঢুকে কোথায় গিয়ে দাঁড়াব বুঝতে না পেরে রোজই বকুনি খাব বড় অ্যাক্টারদের কাছে।

সুরজিৎ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, তা হলে নাটক নামবে কি করে?

ওই তো মজা। প্রদীপদা হয়তো বলবে, কান্তি এগিয়ে যা। যেই আমি এগোব, রসময়দা সার্ট ধরে এক হ্যাঁচকা টান মারবে—পেছো বলছি। আমাদের অবস্থা ত্রিশঙ্কুর মত।

প্রদীপবাবুরা কি কোনদিনই পার্ট বলবেন না?

কান্তি কোঁচাটা ঠিক করতে করতে বলে, বলবে হয়তো দু-একদিন যদি কর্তারা ভাল টিফিনের ব্যবস্থা করেন। তা অবশ্য খুব যে সিরিয়াসলি বলবে তা নয়, বেশীর ভাগই হাসি-ঠাট্টা করে সময় কাটাবে।

সুরজিৎ চিন্তিত স্বরে বলে, আগে তো এরকম ছিল না।

তা বলতে পারি না মশাই, তবে বছর দশেক এ লাইনে ঘোরাঘুরি করছি, রিহার্সালের অবস্থা সব জায়গাতেই এইরকম। বড় আর্টিস্টরা সব স্টেজে মারবেন যে, আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাব আমরা।

প্রদীপ মুখার্জী বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। সুরজিতের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই হাত নেড়ে কাছে ডাকে। একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বলল, আপনার সঙ্গে আমার কেউ পরিচয় করিয়ে দেয় নি, তবে জানি আপনিই নাট্যকার। আমার পার্টটা পেয়েছি, পড়েছি, ভাল লেগেছে। কিন্তু পুরো নাটকটা তো এখনও পড়ি নি, রিহার্সালও দেখি নি, তাই জিজ্ঞেস করছি শেষ পর্যন্ত কি আমার মা মারা যাবেন?

সুরজিৎ ছোট্ট উত্তর দেয়, হ্যাঁ।

ওঁকে কাশী পাঠিয়ে দিলে পারতেন।

কেন?

দেখতেন, মেয়েরা কি রকম নিত—রোজ লেডিজ ফুল যেত।

কোন উত্তর না দিয়ে সুরজিৎ হাসতে থাকে।

প্রদীপ মুখার্জী সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বেশ নিশ্চিন্ত গলায় বলে, আমার ডায়ালগ কিছু বদলাতে হবে—সে আপনাকে বিরক্ত করব না, আমি নিজেই লিখে নিচ্ছি। আপনার ভাবটা ঠিকই থাকবে, শুধু অভিনয় করার জন্যে একটু সুবিধে করে নেওয়া।

সুরজিৎ ভয় পেয়ে বলে, খুব বেশী বদলাবেন না, বরং আমাকে যদি একবার দেখিয়ে নেন—

হা হা শব্দ করে প্রাণ খুলে হাসে প্রদীপ মুখার্জী: আরে মশাই, আমাকে কোন ভয় নেই, আমি কখনও রামকে শ্যাম বানাই না। দেখবেন ওই রসময়টা কি করে। নিরেট মুখ্যু তো। একবার ভাঁড়ামী করতে শুরু করলে আর কিছুতেই থামবে না। আপনার বইটাকে পুরোপুরি মার খাইয়ে তবে ও ছাড়বে।

ঘরের ভেতর থেকে রতিবাবু ডেকে পাঠালেন বলে প্রদীপ মুখার্জী চলে যেতে যেতে খাদের পর্দায় গলা নামিয়ে বলে যায়, রসময়ের অনেক কীর্তি আপনাকে পরে বলব—ও একটি চীজ।

তখনও সুরজিতের হাতের সিগারেটটা শেষ হয় নি, নীচের দিকে তাকিয়ে দেখছে অ্যামেচার থিয়েটারের দর্শকরা ইণ্টারভ্যালে বেরিয়ে ভিড় করেছে। এমন সময় পেছন থেকে কে ডাকল, সুরজিৎবাবু—

আর কেউ নয় রসময় ঘোষ। সুরজিৎ মুখ ফেরাতেই ভদ্রলোক চোখ গোল গোল করে হাসেন: কেমন লাগছে প্রফেশনাল থিয়েটার?

সুরজিৎ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে: ভালই।

কেন মিথ্যে কথা বলছেন, আমি বেশ বুঝতে পারছি থিয়েটারের হালচাল দেখে আপনি রীতিমত হতাশ হয়েছেন। হবারই কথা, যতগুলো ভ্যাগাবণ্ড আর লোফার এসে জুটেছে, মা সরস্বতীর সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে কি হলেন—না, স্টেজ-আর্টিস্ট।

বিস্মিত সুরজিৎ চোখ তুলে তাকায়।

রসময় জিভ দিয়ে নীচের ঠোঁট চাটে : ওই যে প্রদীপ মুখার্জী—রুবী থিয়েটারের গ্রেট হিরো। একবার জিজ্ঞেস করে দেখুন না, একখানা সেক্সপীয়রের বই পড়েছে কিংবা বার্নার্ড শ ? তা হলেই বিদ্যে বেরিয়ে পড়বে। অত কথা কি, গিরীশচন্দ্রের 'আনন্দ রহ' কি 'মায়াতরু'র নাম শুনেছে ও ? জানে, কবে প্রথম বাংলা থিয়েটার শুরু হল ? আরে মশাই, এ একটা মুখ্যুর ডিপো, আপনার মত লেখাপড়া-জানা ভদ্রলোক তো কারুর সঙ্গে কথাই বলতে পারবেন না।

প্রসঙ্গ বদলাবার জন্যে সুরজিৎ জিজ্ঞেস করে, পার্ট পছন্দ হয়েছে আপনার ?

সেই কথাই তো বলতে এলাম। কড়া লিখেছেন মশাই। হাসতে হাসতে লোকের পেটে খিল ধরে যাবে। আমাকে কিছুই করতে হবে না শুধু মাঝে-মধ্যে একটু নুন আর মরিচ ছড়াতে হবে। অল্পবিস্তর হাসির চাটনি। বুঝলেন না ?

সুরজিৎ সাহস করে জিজ্ঞেস করে, আমার ডায়ালগগুলো থাকবে তো ?

রসময়ের চোখ সন্দেহে ছোট হয়ে আসে : কে আমার নামে লাগিয়েছে শুনি, নিশ্চয় ওই প্রদীপটা। কানের কাছে ফিসফিস করছিল তখনই বুঝেছি। ওকেই একটু নজরে রাখবেন মশাই, পাঁড় মাতাল। কোন্‌দিন যে কি বলবে সীনে তার কোন ঠিক নেই, ভেরি ডেঞ্জারাস্ ম্যান।

এদের কথাবার্তা শুনলে সত্যিই সুরজিতের আশ্চর্য লাগে। পরনিন্দা আর পরচর্চাই এখানে প্রধান আলোচনার বিষয়। অন্যের ভালটা সহজে কেউ দেখতে পায় না। পাঁচজন একত্র হয়ে প্রাণখোলা হাসি হেসে এরা যখন গল্প করে, সুরজিৎ বোঝে সেটা এদের অভিনয়। আসল স্বরূপ ধরা পড়ে সন্ধ্যার অন্তরালে, নির্জন ঘরের আড়ালে একলা যখন কথা বলার সুযোগ পায়। তাদের মধ্যে ফুটে ওঠে মীরজাফরের ছবি, শোনা যায় ইয়াগোর কণ্ঠস্বর, চোখে তাদের কুচক্রী ঔরঙ্গজেবের দৃষ্টি। প্রদীপ মুখার্জী, রসময় ঘোষের মতই অন্য অভিনেতারাও সুরজিৎকে একান্তে ডেকে অন্যদের কাছ থেকে সাবধান হতে বলে, রমেন চৌধুরী কানে কানে উপদেশ দেয়, স্টেজ-ম্যানেজার মুকুলবাবু পুরনো সেট সীনের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে অন্যদের মুণ্ডপাত করে।

এসব দেখে সুরজিতের মনে পড়ে যায় নির্মলেন্দু লাহিড়ী মশায়ের কথা, যা হয়তো বইয়ে পড়বার সময় তার অদ্ভুত লেগেছিল। পাবলিক থিয়েটারে প্রবেশেচ্ছু কোন নবীন নাট্যকারকে তিনি বলেছিলেন—কাউকে বিশ্বাস করেছ কি ঠকেছ—থিয়েটার এমনি জায়গা।

এ কথা বলছেন কেন ?

বলছি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে।

কিন্তু আপনারা শিল্পী, আপনাদের শিল্পচর্চার জগৎ।

হ্যাঁ, আমরা শিল্পী। তবে কি জানেন, শিল্পচর্চার জগতে অনেক কিছুই পাওয়া যায়, পাওয়া যায় না শুধু শিল্পীমন। ও বস্তুটি এখানে একান্ত দুর্লভ।

এ কথাগুলো যে কতখানি সত্যি তা কদিন মাত্র এই থিয়েটারের আঙিনায় ঢুকে সুরজিৎ জলের মত বুঝতে পেরেছে। যে মন্দিরা গুহ বলতে গেলে একরকম অগ্রণী হয়ে তাকে এখানে নিয়ে এসেছে, সে পর্যন্ত সুবিধে পেলেই বাঁকা ভাষায় কথা বলে, শুনলাম, শুভ্রাকে আপনিই পছন্দ করে নিয়েছেন—

সুরজিৎ আপত্তি তোলে : আমি কেন নেব।

মন্দিরা হাসে : বাজারে গুজব শুনলাম, তাই বলছি। শুভ্রা নাকি আজকাল আপনার বাড়িতেও যাচ্ছে।

একদিন গিয়েছিল বটে রমেনবাবুর সঙ্গে।

কি জানি ওর মধ্যে কি গুণ দেখেছেন আপনি—বয়সটা কম, চেহারায় চটক আছে, ওইটুকুই যা। এ পর্যন্ত একটা পার্টও ঠিকমত করতে পারে না।

সে কি, আমি যে শুনলাম—

মন্দিরা গুহর চোখ দুটো জ্বলে ওঠে : কে বলেছে, ওই রমেন চৌধুরী তো ? শুভ্রাদের বাড়িতে কি ওর কম দিনের যাতায়াত !

কথা ঘোরাবার জন্যে সুরজিৎ ইচ্ছে করেই জিজ্ঞেস করে, নাটক কিরকম দাঁড়াবে মনে হচ্ছে ?

বলা খুব শক্ত।

কেন ?

রন্তিদার তো মাথা খারাপ, বাসুদেবকে অতবড় একটা পার্ট দিয়েছেন, ও কি আর টানতে পারবে ? তার ওপর আপনার শুভ্রা। ওই দুটো পার্টই না মার খায়।

রিহার্সালে কিন্তু সুরজিতের ভাল লেগেছে এ দুজনের পার্ট, এরা অন্ততঃ মন দিয়ে অভিনয় করার চেষ্টা করেছে। মঞ্চ-অভিজ্ঞতা বেশীদিনের নয় বলেই বোধ হয় উৎসাহটা এখনও বেশী। তবে মন্দিরার সামনে এ কথা বলার ইচ্ছে হল না সুরজিতের।

মন্দিরা কিন্তু থামে না : ওই বাসুদেব, দেখছেন তো কিচ্ছু পারে না, কিন্তু চেহারাটা ভাল। দেখবেন একদিন ওরও নাম হবে। এখন থেকেই ফিল্মে চান্স পাচ্ছে—কদিন বাদেই নায়ক, হাজার হাজার টাকা রোজগার।

মন্দিরা নিজের মনেই কি যেন ভাবে। বোধ হয় মনে পড়ে যায় অতীতের কথা। অন্যমনস্ক স্বরে বলে, ওকে যত দেখি ততই মনে হয় তপনের কথা—আপনাদের তপনকুমার, চিত্রজগতের একচ্ছত্র সম্রাট। একদিন আমার সঙ্গেই থিয়েটার করত। লোকে বলত রাঙামূলো, পার্ট করতে পারত না দেখে সবাই হাসত, কিন্তু মনটা ভাল ছিল। আমি নিজে ওকে শেখাতাম। কতদিন দুপুরবেলা ওই নীচের গ্রীনরুমে বসে বসে অভিনয় শিখিয়েছি, অথচ আজ সে কোথায়, আর আমি কোথায়!

মন্দিরার শেষের কথাগুলো বড় করুণ শোনায়। সুরজিতের সাহিত্যিক মন জিজ্ঞাসু হয়ে ওঠে : ওর সঙ্গে আজকাল দেখা হয় ?

হয়। এত ওপরে উঠে গিয়েও তপন সেই থিয়েটারের দিনগুলো ভোলে নি। আসে, গল্প করে, দুঃখের কথা বলে, সাহায্যও করতে চায়। কিন্তু কি করবে বেচারা, ছবিতে যে আমার চেহারাটা কিছুতেই ভাল আসে না।

কথাগুলো বলে নিজেই জোর করে হাসে। বলে, এসব কথা ভাববার কোন মানে হয় না, আপনিও হয়তো একদিন নাম-করা নাট্যকার হবেন, তখনও আমি এই থিয়েটারেরই মেয়ে।

উত্তর দেবার কিছু ছিল না, সুরজিৎ খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। হঠাৎ একসময় নীরবতা ভঙ্গ করে বলে, আপনি যে বলেছিলেন আমায় নটগুরুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন, তাঁর কাছে নিয়ে যাবেন।

মন্দিরা এতক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। গলা পরিষ্কার করে বলে, বাবাকে বলে রেখেছি, উনি আপনাকে নিয়ে যাবেন। বাবা ওদের সঙ্গে থিয়েটার করতেন তো। তাই বাবার সঙ্গে যোগসূত্রটা এখনও আছে। আসুন না একদিন আমাদের বাড়ি।

যাব একদিন।

আগে থেকে কিন্তু আমায় বলে রাখবেন, বাবাকে সামলে রাখতে হবে।

তার মানে ?

পুরনো দিনের লোক, নেশা করলে মাথার ঠিক থাকে না।

এ ধরনের কথা কোন মেয়ের মুখে শুনলে অনেকেই অবাক হয়, সুরজিৎও হল।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে মন্দিরা কৌতুক বোধ করে : এখানকার সবকিছুই আপনার নতুন লাগছে, না ? মাঝে মাঝে এমন অবাক হয়ে তাকান, দেখলে মনে হয় একেবারে ছেলেমানুষ, আমার ভারি হাসি পায়।

মন্দিরা খিলখিল করে হাসে।

সুরজিৎ তার দিকে সবিস্ময়ে চেয়ে থাকে, সত্যি আশ্চর্যময়ী এই মন্দিরা গুহ।

ঢিমেতেতালায় নতুন নাটকের রিহার্সাল চলছিল একরকম ভাবে। তা দেখে সুরজিৎ খুব বেশী উৎসাহিত না হলেও আর সবাই ভাবছিল শেষ পর্যন্ত নাটক ভালই দাঁড়াবে। কিন্তু বিপদ এল কদিন বাদে।

ফোন এল সুরজিতের অফিসে—সে যেন দুপুরের মধ্যে হৃষীবাবুর সঙ্গে দেখা করে, বিশেষ দরকার।

প্রথমটা এ খবরের গুরুত্ব বুঝতে না পারলেও হৃষীবাবুর সঙ্গে দেখা হবার পর সুরজিৎ সত্যিই চিন্তিত হয়ে পড়ল। রুবী থিয়েটারের অফিস-ঘরে চুপচাপ বসে রয়েছেন

হৃষীকেশবাবু। গম্ভীর মুখ, গম্ভীর চিন্তামগ্ন। অস্থির স্বরে বললেন, কদিন থেকেই রতিবাবু বলছিলেন তাঁর শরীরটা ভাল যাচ্ছে না, কিন্তু হঠাৎ যে এ রকম বেয়াড়া অসুখে পড়ে যাবেন ভাবতে পারি নি। কাল আসেন নি দেখে আমি নিজেই গিয়েছিলাম। একশো চার-পাঁচ জ্বর, মাথার যন্ত্রণা। সাতদিন বাদে নাটক খুলবে, কি যে করব ভেবে পাচ্ছি না।

সুরজিৎ আস্তে আস্তে বলে, তা হলে বরং উদ্বোধনের দিন পেছিয়ে দিন।

তা কি করে সম্ভব—পয়লা বৈশাখ একটা শুভদিন! ইতিমধ্যে কাগজে পোস্টারে পয়লা বৈশাখ বলে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে, পেছিয়ে দিলে তো চলবে না।

সুরজিৎ চুপ করে থাকে, কি বলবে ভেবে পায় না।

হৃষীবাবু আবার বলেন, আপনি একবার বরং রতিবাবুর বাড়ি যান, দেখুন এখন কেমন আছেন। আজকের মধ্যে যা হোক একটা ডিসিশান আমাদের নিতে হবে।

সুরজিৎ উঠে পড়ে: এখুনি যাব?

ঘুরে আসুন, আমি এখানেই অপেক্ষা করছি।

সুরজিতের কাঁধের ওপর হাত রেখে হৃষীকেশবাবু জোর দিয়ে বললেন, মনে রাখবেন পয়লা বৈশাখ আমাদের নাটক খুলতেই হবে—যে রকম করে হোক।

সারা রাস্তাই সুরজিৎ ভাবতে ভাবতে গেছে রুবী থিয়েটার থেকে রতীন ঘোষালের বাড়ি পর্যন্ত, কি করে সে বিপদের মুশকিল-আসান করবে। হাতে আর মাত্র সাতদিন সময়, তার মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠে নতুন নাটক মঞ্চস্থ করা রতিবাবুর পক্ষে অসম্ভব।

বাইরের ঘরেই তক্তাপোশের ওপর চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিল রতীন ঘোষাল। আগের চেয়ে জ্বর একটু কমেছে, কিন্তু শরীরে অস্বস্তি খুব, উঠে বসলেই মাথা ঘোরে। সুরজিৎকে দেখে একটু হাসবার চেষ্টা করলেন, হাত নেড়ে ইঙ্গিত করলেন কাছে বসবার জন্যে।

সুরজিৎ রতিবাবুর বিছানায় গিয়ে বসে, মাথা নীচু করে ওঁর কথা শোনে।

রতীন ঘোষাল বিড়বিড় করে বললেন, বড় বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে ব্রাদার। এ নিশ্চয় জাপানি ফ্লু, বেশ কিছুদিন ভোগাবে।

হৃষীবাবুর কাছে শুনেই আমি আসছি।

উনি সকালে এসেছিলেন, তখন খুব জ্বর। কথাই বলতে পারি নি।

উনি খুব ব্যস্ত হয়েছেন পয়লা বৈশাখ কি করে নাটক নামবে তাই ভেবে।

রতীন ঘোষাল একটু চুপ করে থেকে বলেন, কেন? ভাবনার কি আছে? আমি যেতে না পারলে তুমি পরিচালনা করবে।

সুরজিৎ একেবারে আকাশ থেকে পড়ে: আমি!

কেন, পারবে না? তুমি তো এই নাটকই অফিসে সবাইকে শিখিয়েছ।

তা শিখিয়েছি, কিন্তু এরা সব প্রফেশ্যনাল আর্টিস্ট, আমার কথা কি শুনবে?

নিশ্চয় শুনবে। না শুনলে হৃষীকেশবাবু শোনাবেন। তুমি আমার নাম করে বলো, সবাই রাজী হবে।

তবু যেন সুরজিৎ মনে জোর পায় না। বলে, আমি কি পারব এই সাতদিনের মধ্যে নতুন বই তৈরি করাতে।

রতীন ঘোষাল শুকনো হাসেন: সাতদিন কম সময় নয় সুরজিৎ। অনেক বছর আগের কথা, স্টার থিয়েটারে নামল দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাণা প্রতাপ', অভিনয় করছেন অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল বসু, নরীসুন্দরীর মত নাম-করা শিল্পী। তারিখটা বোধ হয় ৬ই শ্রাবণ, ১৩১২ সাল। নাটক জমল, কিন্তু দ্বিজুবাবুর সঙ্গে স্টারের মনোমালিন্য হল, সে যে-কোন কারণেই হোক। দ্বিজুবাবু এসে মিনার্ভা থিয়েটারকে বললেন, 'রাণা প্রতাপ' এখানেও নামাতে হবে। পাল্লা দিয়ে অভিনয় করে দেখাতে হবে স্টারের চেয়ে মিনার্ভার অভিনয় ভাল। মিনার্ভায় পরিচালনা করলেন স্বয়ং গিরীশচন্দ্র, অভিনয় করলেন দানীবাবু, মুস্তাফী সাহেব, তারাসুন্দরী আরও অনেকে। সে নাটকও নেমেছিল মাত্র সাতদিনের মধ্যে।

সুরজিৎ মাথা নীচু করে বলে, সে অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল, কারণ পরিচালক ছিলেন স্বয়ং গিরীশচন্দ্র।

তাঁরই কথা স্মরণ করে কাজে নেমে যাও। আশীর্বাদ করছি তুমি জয়যুক্ত হবে।

রতীন ঘোষালের গলা কাঁপল। অভিজ্ঞ পরিচালকের আন্তরিক আশীর্বাদ।

সুরজিৎ প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল।

শুরু হল তার নতুন জীবন। শুধু নাট্যকার নয়—পরিচালক সুরজিৎ সেনগুপ্ত।

[ক্রমশ]

রম্যাণি বীক্ষ্য

মধ্যভারত পর্ব ॥ শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী ॥

দুই

আমরা অনেকটা সময় পেয়েছি। ওয়েটিং-রুমে স্নান করে চা খেয়েছি। টিকিট নিয়েছি পালটে। ভোর সাড়ে ছটায় নেমে পৌনে এগারোটা পর্যন্ত অবসর। বাইরে বেরিয়ে শহরটাও দেখে নেওয়া যেত, কিন্তু মিনতির অনুরোধে অভিমন্যুর সঙ্গে খেয়ে নিতে হল। মৌ বিকেলে পৌঁছয়। তার আগে কোন খাবার জায়গা নেই। মিনতি বলল: হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে নেই।

বিরূপাক্ষ বললেন: ঠিক কথা। কাল হয়তো কিছুই জুটবে না।

খেয়েদেয়ে আমরা ছোট লাইনের গাড়িতে চাপলুম।

এদিকের রেলপথের কোন ধারণা আমার ছিল না। গাড়িতে বসে টাইমটেবলের মানচিত্র দেখে মোটামুটি একটু বোঝা গেল। বোম্বে থেকে দিল্লীর দুটো পথ আছে। পশ্চিম-রেলের পথ সুরত বরোদা রতলাম হয়ে দিল্লী গেছে আর মধ্য-রেলের পথ নাসিক খাণ্ডোয়া ভূপাল ঝাঁসি আগ্রা হয়ে দিল্লী পৌঁছেছে। এই দুটো পথ মিলেছে মথুরায় এসে। এদের যোগাযোগ আছে তিন জায়গায়—জলগাঁও থেকে সুরত, ভূপাল থেকে নাগ্‌দা, আর বিনা থেকে কোটা। উজ্জয়িনী নাগ্‌দার কাছে ভূপালের পথে। বড় লাইনের স্টেশন। খাণ্ডোয়ার ছোট লাইন এসে এখানে মিলেছে, রতলামের দিকেও গেছে একটা ছোট লাইন। অভিমন্যুর বাবা বললেন: আমরা মৌয়ে নামব। ইন্দোরে নামলেও চলে। ইন্দোর থেকে মাণ্ডুর বাস মৌ আর ধার হয়ে যায়।

তারপরে নিশ্চয়ই উজ্জয়িনী!

সেখান থেকে ভূপাল সাঁচি ও ভিল্‌সা। বিদিশার নাম এখন ভিল্‌সা।

আমরা আর কী দেখব?

ঝাঁসি আর খাজুরাহো।

অভিমন্যুর বাবার মেজাজ রাতের মত অপ্রসন্ন নয়। বললেন: মিনতির মিনতিতে এই কেলেঙ্কারি করলাম।

কিসের কেলেঙ্কারি!

ভদ্রলোক বললেন: সোজা পথে ঘরে না ফিরে বাঁকা পথে এই ঘুরপাক খাওয়া কেলেঙ্কারি নয়! তবু রক্ষা যে রেলের পাসে যাচ্ছি। পাস হাতে নিয়ে ইঞ্জিনের মত আগে-পিছে যাবার উপায় নেই। আপনাদের মত টিকিট-কাটা যাত্রী হলে নাগপুর ঘুরে যেতে হত।

আপনি তা হলে রেলের লোক?

খাঁটি রেলের। আপিসে বসে ফাইল ঘাঁটি নে, বিল পাস করি নে। সারাদিন রেল নিয়েই কারবার। পাণ্ডব-বর্জিত দেশে আমি স্টেশন-মাস্টার। তেরজন লোকের ইস্টিশনে ছোটবাবু। আমার অনুমতি পেলে ট্রেন আসে, ট্রেন যায়। মেল ট্রেন থাকলে তাকেও আমার অনুমতি নিয়ে যাওয়া-আসা করতে হত। আমার নাম বিরূপাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়। আসুন, একটা সিগারেট ধরান।

বলে পকেট থেকে তাঁর সিগারেটের প্যাকেট বার করলেন।

আমি হাত গুটিয়ে বললুম: ধন্যবাদ, আমি সিগারেট খাই নে।

সেকি!

মিনতিও আশ্চর্য হয়েছেন দেখলুম।

কালকের কথা ভাবছেন তো, কাল অন্যমনস্কভাবে নিয়ে ফেলেছিলুম।

বিরূপাক্ষ বললেন: ভাল। এ আমার নামে সিগারেট, কাজে বিড়ির গোত্র। মিনতি আমাকে শৌখিনতা শেখাচ্ছে।

প্যাকেটটা লক্ষ্য করে বললুম: ও তো আজকাল উঁচুতলার জিনিস। বড় বড় সরকারী কর্মচারীরা আজকাল ওই ব্র্যাণ্ড খাচ্ছেন। সোনার কেস থেকে তাঁরা বার করেন।

বলেন কি!

কিন্তু আমাদের বেসরকারী অফিসে তত চলে না। আমাদের সাহেবরা ব্র্যাণ্ড দেখাবার জন্যে কৌটো হাতে রাখেন।

বিরূপাক্ষ তাঁর সিগারেট ধরালেন। কড়া তামাকের গন্ধ। মিনতি বললেন: যাই বল, এ তোমার বিড়ির চেয়ে ঢের ভাল। বিড়ির গন্ধে আমার বমি আসে।

অভিমন্যু এতক্ষণ চুপ করে ছিল। হঠাৎ বলে উঠল: আমিও সিগারেট খাব মা!

আমি কৌতুক বোধ করলেও হাসবার সাহস পেলুম না। বিরূপাক্ষর মেজাজকে আমার ভয় ছিল। কিন্তু এখন তাঁকে একেবারে স্বতন্ত্র মানুষ বলে মনে হল। বললেন: বাপকে বেটা হবে।

মিনতি বললেন: আপনার বাড়িতে সবাই ভাববেন তো?

প্রশ্ন শুনে আমি হাসলুম।

বিরূপাক্ষ বললেন: তোমার সঙ্গে পোস্টকার্ড আছে তো, একখানা বার করে দিয়ো।

আমাকে বললেন: খাণ্ডোয়ায় ফেললেই ভাল হত! মৌয়ে নেমে গাড়িতেই ফেলে দেব।

মিনতি তখুনি তাঁর বাক্স থেকে পোস্টকার্ড বার করবেন ভাবছিলেন। বাধা দিয়ে বললুম: দরকার নেই।

সেকি, বাড়িতে একটা খবর দেবেন না?

বাড়ি থাকলে তো খবর দেব?

আমি এই তরুণ দম্পতির চোখে গভীর অবিশ্বাস দেখলুম। বাড়ি নেই এমন লোকও এদেশে আছে!

হেসে বললুম: উত্তরপাড়ার একখানা ভাড়াটে ভাঙা ঘরে আমার একার সংসার। দেশের বাড়িতে আমার শেষ আত্মীয়ের শেষ নিঃশ্বাস পড়েছে, বিদেশের ঘরে নতুন আত্মীয় আনবার ভরসা আজও পাই নি।

মিনতি বললেন: বিয়ে করেন নি বুঝি?

বিরূপাক্ষ বললেন: ভাল করেছেন।

অভিমন্যু অনেকক্ষণ থেকে উসখুস করছিল, বলল: কে তোমাকে খেতে দেয়?

কেউ না।

কেউ না!

অভিমন্যু যেন মর্মাহত হল। একটা লোক রোজ না খেয়ে থাকে!

প্রশ্ন করলুম: তুমি আমাকে খেতে দেবে?

একটু ভেবে অভিমন্যু বলল: তুমি আমাদের কাছে কেন থাক না, তা হলে তো মা তোমাকে খেতে দিতে পারে।

মিনতি বললেন: মামীমা এসে তোমার মামাকে খেতে দেবেন। হ্যাঁ ভাই, আপনার নামটা কী!

গোপাল।

বিরূপাক্ষ বললেন: চমৎকার নাম।

কেন?

প্রথম ভাগ পড়তে পড়তেই নাম লেখা যায়, আমার নাম আমি এখনও ভুল লিখি।

মিনতি হেসে বললেন: ভুল লেখার ভয়ে উনি 'বি. বি.' লেখেন।

বিরূপাক্ষ বললেন: সাহেব নই বলেই বিবির প্রতি একটু দুর্বলতা।

মনে হল, এসব তাঁদের পুরনো রসিকতার কথা।

পুরনো জিনিস উপভোগের মত আবেগশূন্য। আমি কিছু বলতে গিয়েও মিনতির দৃষ্টিতে উদ্বেগ দেখে থেমে গেলুম। উদ্বিগ্ন হবার কারণ নেই। অভিমন্যু আর বসে থাকতে না পেরে গাড়ির ভিতর ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু দরজা বন্ধ। চলতি গাড়িতে টাল সামলাতে না পারলে মারাত্মক কিছু ঘটবে না। মিনতি তবু নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না।

অভিমন্যু একজন যাত্রীর জিনিসপত্র পরীক্ষা করছিল। বিরূপাক্ষ ডাকলেন: খোকা।

অভিমন্যু মুখ ফিরিয়ে হাসল। ভাবখানা এই রকম যে তোমরা অকারণে ব্যস্ত হচ্ছ। প্রথম পদক্ষেপ মানুষ আশঙ্কার চোখে দেখে। অথচ এই পদক্ষেপের প্রেরণা ফুরলেই পৃথিবীর যাত্রা যাবে বন্ধ হয়ে। মনের আবেগ যখন পায়ে সঞ্চারিত হয়, মানুষ তখন চলে। কে জানে, এই চলা কবে শুরু হয়েছিল। চলার ইতিহাস বলার ইতিহাসের চেয়েও পুরনো। লেখার ইতিহাসে এসব কথা লেখা নেই। খানিকটা অনুমান আছে মাত্র। সেই অনুমান দিয়ে আমরা প্রাগৈতিহাসিক ঘটনাকে স্বপ্নময় করে রেখেছি।

একদা এই বিরাট দেশে আর্ট-সভ্যতার পদক্ষেপ হয়েছিল আজকের অভিমন্যুর মত টলমল। দূরে দাঁড়িয়ে আদিম সভ্যতা তাকে সশঙ্ক পিতামাতার মত প্রত্যক্ষ করেছে। পৃথিবীর জন্মের যেমন হিসাব নেই, তেমনি নেই সভ্যতার জন্মের হিসাব। মহাভারতের কাল আমরা নির্ণয় করেছি, পারি নি রামায়ণের কাল নির্ণয় করতে। পুরাণের হিসাবে তার বয়স তের লক্ষ এক হাজার বছর। বিদেশীরা পুরাণ মানে না। খ্রীষ্টের জন্মের তারিখ দিয়ে তারা ইতিহাস রচনা করেছে। সে ইতিহাস মাত্র কয়েক হাজার বছরের। এই গোলার্ধে তখন তিনটি নদীর উপত্যকায় সভ্যতার বিকাশ হয়েছে। সিন্ধু নীল আর ইউফ্রেতিস। মেম্ফিস মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা তার সাক্ষী দিচ্ছে। মাটি খুঁড়ে নগরের ধ্বংসাবশেষ না পেলে বিদেশীরা বোধ হয় এ কথাও অস্বীকার করত। তারা দাবি করে, এ দেশের সভ্যতা এসেছে ভোলগার উপত্যকা থেকে। ইংরেজ যেমন করে ভারত উদ্ধারে এসেছে, পাদরিরা ঘুরে বেড়িয়েছে হিদেনদের মুক্তির জন্যে, তেমনি করেই নাকি ভোলগার মানুষ এদেশে এসেছে সভ্যতার মশাল হাতে। আসুক, এখানে সে তর্ক নয়। ভারতে আর্য-সভ্যতার উন্মেষ হয়েছে খ্রীষ্টের জন্মের দু হাজার বছর আগে। প্রথমে পঞ্চনদে, তারপর ব্রহ্মবর্তে, গঙ্গা যমুনার উপত্যকায় হয়েছে তৃতীয় অবস্থায়। ধীরে ধীরে সভ্যতা এল সুরাষ্ট্র আর অবন্তীতে। উজ্জ্বল হল উজ্জয়িনী আর বিদিশা। সেও খ্রীষ্টের জন্মের সাত-আটশো বছর আগের ঘটনা। সাতপুরার দক্ষিণে বিদর্ভে ছিল অনার্য অধিকার। দণ্ডকারণ্যেও। বিংশ শতাব্দীর প্রখর আলো আজও এই অরণ্য ভেদ করে নি। এবারে বুঝি করবে।

অতীতের বিস্মৃত ইতিহাসে এ অঞ্চলের একটা ঐতিহ্য ছিল। শুধু ইতিহাসে কেন, রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের যুগেও এই ঐতিহ্য ছিল ভারতবিশ্রুত। স্কন্দপুরাণে অবন্তীর উল্লেখ আছে ভারতের সাতটি মোক্ষ-দায়িকা জনপদের সঙ্গে:

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকা॥

অবন্তী উজ্জয়িনী মালব বোধ হয় একই স্থানের ভিন্ন নাম। যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। একদা নাকি অবন্তী ছিল মালব রাজ্যের রাজধানী। কেউ বলেন, অবন্তীই রাজ্যের নাম, উজ্জয়িনী তার রাজধানী। প্রাচীন গ্রন্থ আলোচনায় শুধু সংশয় বাড়ে, প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। ঋক্ সংহিতায় অবন্তীর উল্লেখ নেই, আছে সূত্রগ্রন্থে। তখন এ দেশে যাদের বাস ছিল তারা নামে মানুষ হলেও ঠিক মানুষের মত ছিল না। তারা ছিল একটা মিশ্র জাতি। বেদের আর্যরা সহস্রাধিক বৎসর ধরে এ অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেছেন।

রামায়ণে অবন্তীর নাম আছে। সীতার অন্বেষণে সুগ্রীব বিন্ধ্যাশ্রিত অবন্তীতেও বানর পাঠিয়েছিলেন। মহাভারতে সঞ্জয় অবন্তীর নামোল্লেখ করেছেন। উজ্জয়িনী নামও পাওয়া যায়। কিন্তু মালব রাজ্য বলেছেন

দক্ষিণ-ভারতে। পুরাণের কত স্থানে অবন্তী উজ্জয়িনীর নাম আছে জানা নেই। তবে স্থানে স্থানে যে আছে এতো জানা গেছে। মৎস্যপুরাণে বিন্ধ্যপৃষ্ঠনিবাসী জনপদের তালিকায় অবন্তীর নাম পাওয়া গেছে। অবন্তী নগরে মঙ্গল গ্রহের জন্ম হয়েছিল। বিষ্ণুপুরাণে পাওয়া যায়, কৃষ্ণ বলরাম অস্ত্রশিক্ষার জন্য অবন্তী নগরে এসেছিলেন সন্দীপনি মুনির নিকট।

অবন্তীর পরিচয় আছে বৌদ্ধশাস্ত্রেও। সিংহলের মহাবংশে আছে, সম্রাট বিন্দুসার তাঁর পুত্র অশোককে উজ্জয়িনীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। বৌদ্ধ-সমৃদ্ধি কী করে গড়ে ওঠে, সে ইতিবৃত্ত আমাদের জানা নেই। তবে সমৃদ্ধির সংবাদ প্রসারিত হয়েছিল সারা ভারতে। তাই চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন চাঙকে এদেশে আসতে হয়েছে। তখনও এখানে তিন-চারটি বিহার বিদ্যমান ছিল। শ-তিনেক বৌদ্ধ নাকি ধ্বংসের হাত থেকে সেই বিহারগুলিকে বাঁচাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন। পশ্চিমে মালবের রাজধানী ধারা নগর, পূর্বে মহেশ্বরপুর, উত্তরে মথুরা ও জজহোতি, এবং দক্ষিণে সাতপুরার পর্বতমালা—এই ছিল সে যুগের উজ্জয়িনী রাজ্য। রাজা ব্রাহ্মণ। দেশে তাই হিন্দুধর্মের প্রাধান্য।

পাশ্চাত্ত্য দেশের টলেমি ও পেরিপ্লাসের গ্রন্থেও উজ্জয়িনীর উল্লেখ আছে বিকৃত অবস্থায়। তাঁরা ওজিনি বলেছেন। হিউয়েন চাঙের মত উ-শে-এন-না বলেন নি।

বরাহ-মিহিরের বৃহৎ সংহিতায় অবন্তীর সমৃদ্ধির পরিচয় আছে। সমাজের পরিচয় আছে শূদ্রকের নাটক মৃচ্ছকটিকে। ব্রাহ্মণ চারুদত্তের সঙ্গে বারবনিতা বসন্তসেনার প্রেমকে অবলম্বন করে কবি উজ্জয়িনীরই উজ্জ্বল চিত্র এঁকেছেন। এ কাহিনী আধুনিককালের যে কোন কাহিনীর মত চমকপ্রদ—চিরনূতন।

তারপর কালিদাসের মেঘদূত:

"প্রাপ্যাবন্তী-নুদয়নকথাকোবিদগ্রাম বৃদ্ধান্
পূর্বোদিষ্টমনুসরপুরীং শ্রীবিশালাং বিশালাম্।
স্বল্পীভূতে সুচরিতফলে স্বর্গিনাং গাং গতানাং
শেষৈঃ পুণ্যৈর্হৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকম্।"

"সিন্ধুপারে অবন্তীপুর
যেথায় উদয়নের গান,
বৃহৎ-কথার গল্পে ভরা
গাঁয়ের পিতামহের প্রাণ!
উজ্জয়িনী নগর সেথা
শ্রীবিশালা শ্রেষ্ঠপুরী
মর্তলোকে খানিক যেন
করেছে কেউ স্বর্গ চুরি!
পুণ্যক্ষয়ে ত্রিদশ হতে
ধরায় এসে নামল যারা,
তাদের বাকি সুকাজটুকুর
ফল কি হেথায় আনলো তারা?"

তিন

বিরূপাক্ষ বললেন: রাতে একেবারেই ঘুম হয় নি, তাই না?

মিনতি সরে বসে বললেন: একটু গড়িয়ে নেবেন?

আমি লজ্জা পেলুম। বসে বসেই আমি বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। তবে কি স্বপ্ন দেখছিলুম এতক্ষণ!

বিরূপাক্ষ বললেন: আজ রাতে আমরা ট্রেনে ঘুমব। মৌয়ে ভাল ওয়েটিং-রুম আছে।

ওয়েটিং-রুমে কেন?

এ তো বিলিতী ধর্মশালা। ছারপোকা নেই, তার বদলে ভাল বাথরুম আছে।

তা হলে ইন্দোরে যাওয়াই ভাল। সেখানকার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আরও ভাল হবে।

বিরূপাক্ষ বললেন: তা হলে অন্য বিপদ আছে। স্থানাভাব হবে। আর বাসেও তেরো তেরো ছাব্বিশ মাইলের বেশী ভাড়া দিতে হবে। ইন্দোর থেকে যে বাস ছাড়ে, সে মৌ ধার হয়ে মাণ্ডু যায়।

দেখি।—বলে ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে টাইম-টেবলখানা চেয়ে নিলেন। বইয়ের শেষে মানচিত্র আছে। সেখানা খুলে আমাকে বোঝাতে বললেন: এই হল মৌ বা মাউ। এখানে নেমে আমরা বাসে মাণ্ডু

একটু সানলাইটেই
অনেক জামাকাপড় কাচা যায়
তার কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা
SUNLIGHT
SOAP
SUNLIGHT
SOAP

যাব—পঞ্চান্ন মাইল পথ। সময় লাগবে প্রায় চার ঘণ্টা—ভাড়া দু টাকা ছ পয়সা। ধারে অনেকক্ষণ দাঁড়াবে।

তারপর ?

মিনতির দিকে চেয়ে বিরূপাক্ষ বললেন: তারপর মোক্ষলাভ। যার জন্যে এত শ্রম, সে রত্ন মুঠোর ভেতর।

মিনতি লজ্জা পেয়েও পেলেন না। বললেন: ভোর-বেলায় আমাদের যাত্রা। শুনেছি, সকাল সকাল বেরিয়ে পড়তে পারলে সন্ধ্যেবেলাতেই ফিরে আসা যায়।

আমি দেশে ফেরার কথা ভাবছিলুম। ঘুরে ঘুরে শরীর কত ক্লান্ত হয়েছে, এখন বোঝা যাচ্ছে না। মনটা ঝিমিয়ে পড়লেই বোঝা যাবে। আমি তাঁর মানচিত্রের উপর ঝুঁকে পড়ে বললুম: তারপর আমরা কোথায় যাব ?

বিরূপাক্ষ বললেন: মৌ থেকে ইন্দোর যাবার অসংখ্য ট্রেন। তারই কয়েকখানা যায় উজ্জয়িনী। ইন্দোরে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে আমরা উজ্জয়িনী যাব। সেখানে পুরো একটি দিন।

মিনতি বললেন: একটি সন্ধ্যাও কাটাব শিপ্রার তীরে। সম্ভব হলে রাত।

সুর করে বিরূপাক্ষ বললেন:

"দূরে বহু দূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রা নদীপারে
মোর পূর্ব জনমের প্রথমা প্রিয়ারে।"

মাঝখানেই মিনতি বলে উঠেছিলেন: থাক্ থাক্, তোমার কাব্য এখন থাক্।

আমি প্রশ্ন করলুম: আপনি কবিতা লেখেন বুঝি ?

কবিতা বলি।

পরম কৌতুকভরে মিনতি বললেন: বলে দেব ?

না বললেও বুঝতে পারলুম যে বিরূপাক্ষ কোন সময় কবিতা লিখেছেন, কিংবা এখনও লেখেন। এই প্রসঙ্গটি এড়াবার জন্যে তাড়াতাড়ি বললেন: উজ্জয়িনী থেকে ভূপালের বড় লাইন দেখুন। ভূপাল থেকে ঝাঁসির গাড়ি ধরব। মাঝখানে সাঁচি আর ভিল্‌সা।

এ সব জায়গাতেই ওঠা-নামা আছে। পরিশ্রম আছে, সময়েরও দরকার। বিরূপাক্ষ বলে চললেন: ঝাঁসি থেকে হরপালপুর খাজুরাহোর জন্যে।

বললুম: মধ্যভারতের রাজধানী গোয়ালিয়র ?

উপায় নেই। রেল কোম্পানির পাস আমাকে হরপালপুর থেকে মানিকপুর, সেখান থেকে এলাহাবাদ হয়ে দেশে নিয়ে যাবে। তা না হলেই গাঁটের কড়ি। গাঁট শূন্য।

আমার পকেটও ভর্তি নয়। যা সামান্য পুঁজি নিয়ে বেরিয়েছিলুম, খরচ করলে তা অনেক আগেই শেষ হয়ে যেত। মামা ঈগল পাখির মত আমার পকেট আগলেছেন। কোনখানে আমায় খরচ করতে দেন নি। কলকাতার টিকিটখানাও নিজে কেটে দিয়েছেন। বলেছিলেন, তোমাকে আমি ডেকে এনেছি, কলকাতা থেকে জয়পুরের ভাড়াটাও আমার দেওয়া দরকার।

হাত পেতে পয়সা নিতে আমি শিখি নি। শুধু মাইনের টাকা নিই গুনে গুনে। সেই টাকারই কিছু অবশিষ্ট আছে।

বিরূপাক্ষর হাত থেকে আমি টাইমটেবলটা নিলুম। মিনতি একখানা গাইড-বই বার করে দিলেন। নিবিষ্টমনে আমি সব মিলিয়ে নিতে লাগলুম। একসময় মনে হল, একটা দিন আমরা সংক্ষেপ করতে পারি। বিরূপাক্ষকে সেই কথা বলতেই তিনি উৎসাহ পেলেন, বললেন: সত্যি ?

গাইড-বই খুলে তাঁকে বুঝিয়ে দিলুম: মৌ থেকে মাণ্ডু পঞ্চান্ন মাইল—ভাড়া দু টাকা ছ পয়সা আর ইন্দোর থেকে মাণ্ডু বাষট্টি মাইল—ভাড়া দু টাকা চার আনা। দশ পয়সায় একটা দিন বাঁচছে।

মিনতি একখানা বই পড়ছিলেন, আমার দিকে মুখ তুললেন।

বললুম: বিকেলে মৌ পৌঁছে কিছু করবার নেই। কিন্তু একটু এগিয়ে ইন্দোরে নামলে শহরটা আজই দেখা হয়ে যাবে। তারপর কাল মাণ্ডু, পরশু উজ্জয়িনী।

অত্যন্ত তৎপরভাবে বিরূপাক্ষ একটা সিগারেট বার করে বললেন: ইচ্ছা করুন।

তাঁর কথায় ও কাজে আমি হাসলুম। মিনতিও হাসলেন। বিরূপাক্ষ নিজেই সিগারেট ধরালেন।

মিনতি আস্তে আস্তে বললেন: রেলের লোক কিনা—

কথাটা বিরূপাক্ষ লুফে নিলেন, বললেন: টাইমটেবল দেখা আর টিকিট কাটা, এ কাজ দুটো যাত্রীরাই ভাল পারে। আমার নিজের স্টেশনের সময় জিজ্ঞেস কর, সব মুখস্থ।

মিনতি বললেন: দেখুন তো ভাই গোপালবাবু, উজ্জয়িনীতে একটা রাত থাকা যায় কিনা?

টাইমটেবল আমার হাতেই ছিল। দেখে বললুম: অনায়াসে। মাণ্ডু থেকে ফিরে এসে ইন্দোরেই রাত কাটাব। উজ্জয়িনীর ট্রেন দেখছি সকাল পৌনে আটটায়। পৌঁছবে বেলা সাড়ে দশটায়। ভূপালের গাড়ি আমরা বিকেল সাড়ে ছটায় ধরব না। রাত দুটো দশে একটা ট্রেন ছাড়ে—উজ্জয়িনী থেকেই ছাড়ে। সকাল সাতটায় ভূপাল।

উজ্জ্বল চোখে মিনতি বললেন: দেখলে তো!

সহাস্যে বিরূপাক্ষ বললেন: এ তো চিরকালই দেখছি। আমি কেন, সবাই দেখছে। গাঁয়ের যোগী কোনদিন ভিখ পায় না।

একসময় আমরা নর্মদার পুল পেরিয়ে গেলুম। আরও কিছু পরে বিন্ধ্যের পাদদেশে গিয়ে পৌঁছব। উঠব তার মালভূমির উপর। ভারতের মানচিত্রের দিকে চেয়ে চিরকাল আমার একটি বিস্ময় জেগেছে। এ অঞ্চলে দুটি পর্বতশ্রেণী পূর্ব থেকে পশ্চিমে সমান্তরাল ভাবে বিস্তৃত। বিন্ধ্য ও সাতপুরা। বিন্ধ্য উত্তরে, সাতপুরা দক্ষিণে। আর এই দুই শ্রেণীর দক্ষিণ প্রান্তে প্রবাহিত হচ্ছে দুটি বিখ্যাত নদী—নর্মদা ও তাপ্তি। বিন্ধ্যের দক্ষিণে নর্মদা, আর সাতপুরার দক্ষিণে তাপ্তি। বোম্বের পর পশ্চিমঘাট পর্বতমালা অতিক্রম করে এসেছি। সাতপুরার নীচে দিয়ে রেলপথ। ভুসাবলের পর তাপ্তি পেরিয়ে আমরা মহাদেও পর্বতের দিকে যাই নি। উত্তরে এসেছি বিন্ধ্য পর্বতের দিকে। আর কিছুদূর এগিয়ে মধ্যভারতের মালভূমি শুরু হবে।

রাজস্থান ভ্রমণের সময় আরাবল্লীর পর্বতমালা দেখেছি। আবু থেকে আজমীর পর্যন্ত। জয়পুর আলোয়ারে কেন, দিল্লীতেও এই পাহাড়ের নমুনা দেখি। দিল্লীর রোমান্স তো আবু পাহাড়ে গিয়ে শেষ হল। শেষ কেন, নতুন রোমান্সেরও তো শুরু সেইখানে। এই তো কয়েকটা দিন আগের ঘটনা। পনরো-কুড়ি দিন আগে মিত্রা ও চাওলার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। রানা আসে নি। মামীমা খুব আশা করেছিলেন রানা আসবে। চিতোর আর উদয়পুরে তিনি অস্বস্তি বোধ করেছিলেন। রানা এসে আবু পাহাড়ে বসে থাকবে, এ ভারি অন্যায় কথা। রানার সঙ্গে যে স্বাতির বিয়ে ঠিক হয়ে আছে।

মামাকে বড় নির্বিকার বোধ হয়েছিল। রানা আসবে না, এ কথা তিনি বলেন নি। কিন্তু আসবে বলেও তাঁর ভরসা ছিল না। রানার বাবা মিস্টার ব্যানার্জি তাঁর সহপাঠী বন্ধু। প্রেসিডেন্সী কলেজে একসঙ্গে পড়েছিলেন। সেইখানেই সম্বন্ধের শেষ। বি.এ. পাস করে তিনি বিলেত গিয়েছিলেন। ফিরেছিলেন সিভিলিয়ান হয়ে। মামা দেশে ফিরলেন বাপের জমিদারী দেখতে। বাংলার জমিদারদের সম্বন্ধে মিস্টার ব্যানার্জির মনোভাবের কথাও মামা বলেছিলেন, সম্পত্তি দেখছে, না অধঃপাতে গেছে! আশকারা দিয়ে গভর্মেণ্ট একগুষ্টি অপদার্থ পুষছে।

বলেছিলেন, তুমি জান না গোপাল। আমাদের প্রতি কত গভীর ঘৃণা ওরা বুকের ভেতর পুষে রেখেছে। যাদের চালচুলো ছিল না, আর যাদের প্রচুর ছিল, তাদের দু দলকেই ওরা ঘৃণা করে। সরকারী প্রতিপত্তিওয়ালা বন্ধুমহলে যা বলে, তাও জানি। সে সব নোংরা কথা আর নাই বা শুনলে।

শুনতে আমি চাই নি। আর সে সম্বন্ধে যা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। শুধু তাঁর মত আমার মনেও একটা প্রশ্ন জেগেছিল। তাঁর উপযুক্ত পুত্র রানা কেন স্বাতিকে বিয়ে করতে চাইল। সে কি তার বাপের কাছে এ যুগের শিক্ষা পায় নি, না তার

অন্তরের মর্যাদা দিয়েছে সকলের উর্ধ্বে। তাই যদি হবে তো আবু পাহাড়ে কেন এল না।

এল তার বোন মিত্রা, আর সেই পাঞ্জাবী যুবক চাওলা। মিত্রার কথা আমি ভুলব না। এমন স্পষ্টবাদী মেয়ে আমি বোধ হয় আজও দেখি নি। গোড়া থেকেই আমি এ কথা অনুভব করেছিলুম। সমস্ত বুদ্ধি দিয়ে বিশ্বাস করলুম সেইদিন, যেদিন ওখলায় আমার পাশে বসে বলল, চাওলাকে আমি ভালবাসি, কিন্তু বিয়ে করব না। সে কথা আমি ওকে জানিয়ে দিয়েছি।

মিত্রা আমাকে মামার বাড়ি থেকে তুলে এনেছিল, স্বাতিকে আনে নি। ইচ্ছে করেই আনে নি। যমুনার ধারে সেই ছায়াঘন শ্যামল পরিবেশে বসে বলেছিল, আপনার পোশাকী রূপটা দেখেছি। ইচ্ছে হল, আপনাকে একান্তে একবার দেখি।

বলেছিল, মানুষের দুটো রূপ অত্যন্ত স্পষ্ট। একটা তার সমাজের কাছে—অভিনেতার মত সেটা তার বাইরের রূপ। আর একটা তার নিজস্ব—সেটা ভেজালহীন খাঁটি পরিচয়। আমার বিশ্বাস, মানুষের একটা তৃতীয় রূপ আছে। সেটা তার একান্তে কোন একজনের সামনে, যাকে সে—

একটা ঢোঁক গিলে বলেছিল, ভালবাসে।

মিত্রা তার বিশ্বাসের কথা আমায় বুঝিয়ে বলেছিল, মানুষ যখন প্রথম ভালবাসে তখন তার তৃতীয় রূপ কতকটা অভিনেতারই মত কৃত্রিম রূপ। ভালবাসা যত গভীর হয়, ততই সে রূপ বদলায়। শেষে তার সত্য রূপের সঙ্গে আর কোন তফাত থাকে না। মানুষকে চিনতে হলে তাই একান্তে দেখতে হয়।

অন্য মেয়ে হলে নিজের মনকে মিত্রা এমন অকপটে মেলে ধরত না। লজ্জা পেত, হয়তো ভয়ও পেত। কোন স্বল্প-পরিচিত পুরুষ তাকে নির্লজ্জ ভাববে। এ তো ভয়েরই কথা। মিত্রা ভয়কে জয় করেছে। সংস্কারকে উপেক্ষা করছে। তাকে আমার ভাল লেগেছিল। বলেছিলুম, চাওলাকে যখন ভালই বাসেন, তখন বিয়ে করতে আপত্তি কি?

মিত্রা বলেছিল, তার সঙ্গে আমার মতের মিল নেই। সে ভাবে ঘুঁটেকুড়ুনীর দুঃখই দুঃখ, রাজকন্যের দুঃখ দুঃখ নয়। তার মন সমাজ-সচেতন। কিন্তু একটা মতবাদকে ঝেড়ে ফেলতে গিয়ে আর একটা মতবাদের ভারে বেঁকে গেছে। লোকটা এখন আর সুস্থ নয়।

আবু পাহাড়ে রানা স্বাতির জন্য এল না। মিত্রা এল চাওলার সঙ্গে। যাকে সে অসুস্থ ভাবে, তারই সঙ্গে এল। মনে হল, তাদের এই আসার ভিতর আরও কোন গভীর অর্থ আছে। সে কথা আমার কাছে এখনও স্পষ্ট হয় নি।

মামী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, রাণা এল না কেন?

চাকরি।

পুজোর সময়েও চাকরি!

চাওলা আমায় একটা চিমটি কেটেছিল লুকিয়ে। বলেছিল, সিনিয়রের ইচ্ছে নয়।

মামা গম্ভীরভাবে বলেছিলেন, বুঝেছি।

মিত্রার দৃষ্টি একটু অবনত হয়েছে। আর মামী হয়েছেন বিষণ্ণ। তিনিও বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন যে রানা আর আসবে না।

আবু পাহাড় থেকে নেমে আসবার সময় চাওলা বলেছিল, তুমি থাক, তোমার জায়গায় আমি নেমে যাই।

সবাই উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন, কিন্তু স্বাতির চোখে আমি কৌতুক দেখেছিলুম। আমার কর্তব্য স্থির করতে আর একটুও দেরি হল না। বললুম, আসি।

এক টুকরো কাগজ আমার পকেটে গুঁজে দিয়ে চাওলা বলল, ভেবেছিলুম, মিত্রার হাতে গুঁজে দিয়ে আমি তোমার জায়গায় ফিরে যাব। কিন্তু তার যখন দরকার হল না, তুমি ওখানা নিয়ে যাও।

চলতি বাসে কাগজখানা পড়ে দেখলুম। অত্যন্ত কাঁচা হাতে একছত্র কবিতা লেখা—তোমারই হউক জয়।

চাওলা বলেছিল, মিত্রার কাছে সে বাংলা শিখছে। আগে দেখলে এই কাগজখানা আমি তাকেই উপহার দিতুম। তারা হাত ধরাধরি করে হাঁটতে শুরু করেছে। দেখে অদ্ভুত ভাল লাগল।

[ক্রমশ]

গল্প

অবন্ধ্যা

হিমাদ্রি চক্রবর্তী

শিমুল গাছটা লাল ফুলে ছেয়ে গেছে।

প্রতি বছরই এমন সময়ে নিষ্পত্র জরাজীর্ণ গাছটা যৌবন ফিরে পায়। সকলের অলক্ষ্যে একটি দুটি করে পাতা ঝাড়া ডালপালার ফাঁকে ফাঁকে উঁকিঝুঁকি মারতে থাকে। ভোরের শিশিরে স্নান করে সারাদিন রোদ পুইয়ে ফাল্গুনী হাওয়ার মাতলামীতে গা ভাসিয়ে দেয় বিকেলে। শীত পেরোবার পর থেকেই এই রকম নিঃশব্দ খেলা চলতে থাকে জবুথবু রোঁয়া-ওঠা কাকভুশণ্ডি শিমুল গাছটায়। তারপর একদিন সোনারোদ সকালে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করে সবাই, কোথা থেকে একপাল দুরন্ত রঙিন শিশু ঝাঁপিয়ে পড়েছে গাছটার মাথায়। দমকা হাওয়ায় টুকটুকে লাল থোকা থোকা ফুলগুলি কেঁপে কেঁপে উঠছে অগ্নিশিখার মত।

দীর্ঘদিন পর বাড়ি ফিরে এসেছি চাকরিস্থল থেকে লম্বা ছুটি নিয়ে। শিমুল গাছটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আর আশ মেটে না। বনগন্ধের মত শৈশবের অস্পষ্ট স্মৃতি কৈশোরের দুয়ার উন্মুক্ত করে যৌবনের প্রথম বেদনার্ত সুখের মত নতুন করে রোমাঞ্চ জাগায় যেন। এই বুড়ো শিমুল আর তার পাশের ক্লাব-ঘরটার সঙ্গে আমাদের ছেলেবেলার সকল স্মৃতি সকল কাহিনী জড়িয়ে আছে বনস্পতির শাখায় শাখায় শতসহস্র তরুলতার মত।

বাড়িতে বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবর নিই পাড়ার আর সকলের—কে কোথায় আছে, কেমন আছে। পুরনো বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে প্রায় সকলেই আছে এখানে—শম্ভু টোটন জগা তোতলা নিমাই সকলেই। কেবল বিলটু মাঝখানে আজমীঢ় গিয়েছিল চাকরি নিয়ে। অবাঙালী মালিকের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় সে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে আবার এসে শিকড় গেড়েছে ঘরে। চৌধুরীদের মেয়ে বুলুর বিয়ে হয়ে গেছে নাকি খুব বড় এক অফিসারের সঙ্গে। সান্যালদের মিঠু আর হালদার-বাড়ির মন্টি-রিজিয়ার বিয়েতে তো নিজেই উপস্থিত ছিলাম। হিসেব করে দেখলাম সমবয়সী মেয়েদের প্রায় সকলেরই বিয়ে হয়ে গেছে। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যেও অনেকে মার অসুবিধে অনুভব করতে আরম্ভ করেছে। শম্ভু তো লাভ-ম্যারেজ করে বসেছে এরই মধ্যে—বিয়ে না করে নাকি উপায় ছিল না।

কথার শেষে যতিচিহ্নের মত ভৈরবকাকার মেয়ে অণিমার কথাও উঠল। পাড়াসুবাদে ভৈরবকাকা মানে ভৈরব ঘোষাল আমাদের এখানকার পুরনো বাসিন্দে। জঙ্গল কেটে খানা-ডোবা ভরাট করে এই অঞ্চলে জন-বসতির পত্তন হওয়ার শুরুতেই আমাদের পাড়ার দক্ষিণ প্রান্তে বেশ কয়েক কাঠা জমির উপর গোটাকয়েক ছাতিমগাছের মালিকানা-স্বত্ব নিয়ে বেশ পাকাপোক্ত ভাবেই আটচালা ঘর তুলেছিলেন ভৈরব ঘোষাল। পেশাতে পুরুতঠাকুর হলেও বেশ চণ্ডপ্রকৃতির এবং উগ্র-স্বভাবের লোক ছিলেন তিনি, এই শুনেছি সকলের মুখে। কিন্তু আমাদের জ্ঞান হবার পর থেকেই তাঁকে দেখে আসছি বিছানায় আধ-শোওয়া, শরীরের নিম্নাঙ্গ পক্ষাঘাতে পঙ্গু।

সেই অণিমার বিয়ে হয় নি আজও, আর হবেও না বোধ হয় কোনদিন। ছেলেবেলায় একসঙ্গে খেলাধুলো করেছি আমরা। একসঙ্গে বললে একটু ভুল হয়—আমরা খেলতাম, আর একটু ফাঁকে বসে অণিমা আমাদের জামা জুতো পাহারা দিত। ধবধবে ফরসা স্কার্ট-ব্লাউজ পরা বুলু কিংবা সালোয়ার-কামিজ পরা মিঠু মন্টি রিজিয়া সবাইকে আমরা নিজের নিজের দলে টানবার চেষ্টা করতুম। তুচ্ছ কারণে বুলু হঠাৎ ঝগড়া করে বসলে, গায়ে পড়ে ভাব করার জন্য সাধ্য-সাধনা করতুম—কিন্তু অণিমাকে

এসে পৌঁছত। চৌধুরীদের বুলু, সান্যালবাড়ির মিঠু, হালদারবাড়ির মণ্টি-রিজিয়া এমন কি অণিমা পর্যন্ত। অবশ্য এতে ওদের স্বার্থ কোন কম ছিল না। কিন্তু বাৎসরিক পরীক্ষার মাস দুই আগে থেকে আপনা-আপনি রণদামামা স্তব্ধ হয়ে যেত। এ ব্যাপারে একটা অলিখিত চুক্তি হয়ে গিয়েছিল যেন আমাদের মধ্যে। এমন কি গায়ে পড়ে ভাব করার স্পৃহাও জেগে উঠত।

এমনি করে একটার পর একটা বাৎসরিক পরীক্ষার গণ্ডি উতরে যেতে যেতে ম্যাট্রিকের টেস্ট পরীক্ষা দেবার পর একদিন হঠাৎ আমরা আবিষ্কার করলাম আমরা বড় হয়েছি। ইতিমধ্যে চিৎকার করে অন্য একজনকে ডাকতে গিয়ে গলা দিয়ে তিন রকম কর্কশ স্বর বেরুতে আরম্ভ করেছে, জুলফির নীচে পাতলা দাড়ি আর গোঁফের রেখা দেখা দিতে আরম্ভ করেছে, জামার নীচে আগা-পাস্তলা দড়ি দিয়ে বেঁধেও দৈর্ঘ্যে নিজেকে ছোট করে স্কুলের ফুটবল টিমে খেলবার অনুমতি পাচ্ছি না। এমন সব চমকপ্রদ ঘটনাগুলি সচেতন মনে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি, কিন্তু একদিন একটা ছোট্ট ঘটনার পর বুঝতে পারলাম আমরা কৈশোরের যুদ্ধোত্তর দিনে পা দিতে চলেছি।

সেদিন বৃষ্টি পড়ছিল খুব। স্কুলে থাকলে খাকী শার্ট ভিজিয়ে রেনী-ডে আদায় করতাম অবশ্যই। কিন্তু তখন প্রায় নির্বাধ মুক্তি। সকাল সকাল ফাইন্যাল পরীক্ষার পড়ায় ইতি দিয়ে এক এক করে ক্লাবঘরে এসে আড্ডা জমিয়েছিলাম—আমি, বিণ্টু, টোটন, শম্ভু, জগা আর তোতলা নিমাই। অর্থাৎ আমাদের ব্যাচের চাঁই বলতে সকলেই ছিলাম সেদিন। জানলার ধারে বসে আসন্ন পরীক্ষার কথাই হচ্ছে। রিমঝিম বৃষ্টি পড়ছে, নীচু মাঠটা জলে ভরে উঠেছে প্রায়। এমন সময়ে দেখতে পেলাম চৌধুরীদের মেয়ে বুলু, পরনে নীল শাড়ি আর সাদা ব্লাউজ, শাড়ির আঁচলটা ডান হাতে ঘোমটার মত মাথার উপর ধরে মিঠুদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে খালি পায়ের উপর শাড়িটা বাঁ-হাতে একটু তুলে ধরে আলতো পায়ে হেঁটে চলে গেল নিজেদের বাড়িতে।

আমাদের কথার স্রোতটা থেমে গেল হঠাৎ। সবুজ বৃষ্টি-ভেজা ঘাসের উপর শঙ্খের মত সাদা প্রায় হাঁটু পর্যন্ত অনাবৃত একজোড়া পা হেঁটে গেল লীলায়িত ভঙ্গীতে। আমরা সবাই একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছিলাম যতক্ষণ না পর্যন্ত বুলু ওদের বাড়ির গেটে মেহেদি-বেড়ার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর একটা অস্বস্তিকর নীরবতার মধ্যে আমাদের কিছুক্ষণ কাটল নিঃশব্দে। ধরা পড়ে যাওয়ার লজ্জায় কেউ কারও দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছিলাম না। এসব কিছুই নয় অথচ কী যেন! এমন তো এর আগে কোনদিন হয় নি!

বিণ্টু সহজ গলায় বলতে চেষ্টা করল, শাড়ি পরলে মেয়েদের কিরকম লম্বা দেখতে লাগে, তাই না?

আমি অস্পষ্ট গলায় জবাব দিলুম, হুঁ।

নিমাই থতিয়ে থতিয়ে কী একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। আবার সেই অস্বস্তিকর নীরবতা। বাড়িতে কাজ আছে বলে শম্ভু হঠাৎ উঠে গেল। তারপর আর আড্ডা জমল না, একটা না একটা ছুতো করে উঠে দাঁড়ালাম একে একে। বৃষ্টিও থেমে এসেছে প্রায়।

টুপটাপ বৃষ্টি মাথায় ভিজতে ভিজতে বাড়ি ফিরে এলাম। কোন কারণ নেই, তবু কি যেন একটা অস্বস্তির খোঁচা তাড়া করে ফিরছিল তখন থেকে। ঝাঁকড়া জামরুল গাছের তলায় ছাগলছানাটা শুকনো খড়ের গাদা বেছে নিয়ে চুপ করে শুয়ে আছে। সেটাকে খানিক আদর করতে করতে ঘাড় ফিরিয়ে একবার চৌধুরীদের আনারসের বাগানটা লক্ষ্য করলাম—কেউ নেই। আরও কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে নিরাসক্তভাবে পড়ার ঘরে ঢুকতে গিয়ে চোখে পড়ল ভৈরবকাকার মেয়ে অণিমা মার পিছন পিছন ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকল, ছেঁড়া নোংরা শাড়িটা বৃষ্টিতে ভিজে স্যাতনেতে হয়ে পিঠের হাড় দুটোর সঙ্গে কদাকারভাবে আটকে আছে। আবার চাল ধার চাইতে এসেছে বোধ হয়!

তারপর আরও বেশ কিছুদিন কেটে গেছে, কিন্তু বুলুকে আমরা ভুলতে পারি নি। কয়েক বছর আগেকার ছবি ভাসে চোখের সামনে, শঙ্খ-সাদা গায়ের রঙ,

টিকলো নাক, টানা ভুরুর নীচে ভ্রমর-কালো চোখ, পিছনে কোঁকড়ানো চুলের ঢাল কোমর ছাপিয়ে নেমেছে স্তবকে স্তবকে। রঙিন রেশমী শাড়ির আঁচল উড়িয়ে লাল সুরকি-ঢালা রাস্তায় বুলু মৃদু হেসে আমাদের পাশ কাটিয়ে মেহেদি-বেড়ার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যেত।

কিন্তু নিমাই আর থতিয়ে কথা বলতে চেষ্টা করত না, বিল্টুও গলায় আয়াসসাধ্য সহজ ভাব ফোটাত না। তখন বড় হয়েছি, কলেজী গাম্ভীর্য এসেছে আমাদের মধ্যে। তবুও কি যেন একটা নিঃশব্দ পরিবর্তন ঘটত সকলের মনে। সিগারেট ধরাতে গিয়ে কেউ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ত কিংবা নস্যির ডিবের উপর বেতালা টোকা উঠত।

অণিমাও হয়তো কোন কোন দিন জীর্ণ তাঁতের শাড়িটা সারা দেহে ব্যাণ্ডেজের মত জড়িয়ে মন্থর পায়ে হেঁটে গেছে এই পথে, আমাদের পাশ দিয়ে। কিন্তু আমাদের উত্তপ্ত আলোচনায় যতি পড়ে নি, ফিরেও তাকাই নি কেউ। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অণিমার সামনের দাঁত দুটো যেন বিশ্রী রকম উঁচু হয়ে উঠেছে গাল ভেঙে গিয়ে। বাঁ দিকের চোখের মণিটাও যেন কেমন সাদা ঘোলাটে। তেলহীন রুক্ষ কদাকার চেহারা, বেশীক্ষণ কাছাকাছি থাকলে গা ঘিনঘিন করে যেন।

তবু যেন মনে হয় অণিমা তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে একদৃষ্টে। শম্ভু একদিন সোজাসুজি বলেই ফেলল, অণিমাটা আজকাল কেমন বেহায়ার মত তাকায় লক্ষ্য করেছিস? গিলে খাবে যেন!

জগা ঠাট্টা করে বলে, ওর বিয়েটা ছাঁদনাতলার বদলে শ্যাওড়া গাছতলায় দিলেই মানাবে ভাল।

আমি চিন্তিতভাবে সিগারেটে টান দিয়ে বলেছিলাম, বিয়ে নামক জিনিসটাই অণিমার মন থেকে মুছে ফেলা উচিত, তা না হলে মুশকিল আছে মেয়েটার।

অণিমাদের নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ আছে বইকি। আমাদের পাড়াটা একটু সৌখীন। সামনে লাল সুরকি-ঢালা রাস্তার পাশে সবুজ ঘাসের আস্তরণ, আর পিছনে পাহাড়ী ঢলের রুপোলী ফিতের মত সরু নদী। প্রায় প্রত্যেকটি বাড়ির সামনে মরসুমী ফুলের ছোটখাটো বাগান। ইউক্যালিপ্টাস আর ঝাউ গাছের ফাঁকে ফাঁকে বুগেনভোলিয়া আর কসমসের ঝোপে হাজার রঙিন প্রজাপতির মত ফুল ফোটে, ডালিয়া আর ক্রিসান্থিমামের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ফোটে সূর্যমুখী আর রজনীগন্ধা। মেহেদি-বেড়ার আভিজাত্য-ঘেরা পরিচ্ছন্ন বাড়িগুলি। এরই মাঝে নিতান্ত বিসদৃশভাবে দাঁড়িয়ে আছে অণিমাদের বাড়িটা, ন্যাড়া ছাতিমের নীচে ভাঙাচোরা উইঢিবির মত। সেই পুরনো আটচালার চাল রোদ-বৃষ্টি-জলে ঝুরঝুর করে ভেঙে গেছে পোড়া পাঁপরের মত। আলকাতরায় রঙ করা কেরোসিন টিনের চাল আর দরমার বেড়া। ফুলের বাগানের বদলে লঙ্কা আর বেগুনের গুটিকয়েক শুকনো চারা সারের অভাবে বিবর্ণ হয়ে কুঁকড়ে মাথা নামিয়েছে। পক্ষাঘাতে ভৈরব ঘোষালের সমস্ত দেহটাই আড়ষ্ট হয়ে গেছে আজকাল। শুনেছি কেবল একটা বিশ্বগ্রাসী খিদেয় তার ভারি ঠোঁট দুটো তৃষিত চাতকের মত কেঁপে ওঠে বারবার। আধঘণ্টা অন্তর অন্তর নাকি ভৈরব-কাকার খিদে পায় আর সেই খিদের তৃপ্তি না হওয়া পর্যন্ত একটা জান্তব গোঙানি ঠিকরে বেরুতে থাকে তার গলা দিয়ে।

পাড়ার গিন্নীদের আড্ডায় ভৈরব ঘোষালের সংসার নিয়ে আলোচনাটা আজকাল বিরক্তি আর নাক কোঁচকানোর ভিতর দিয়ে শেষ হয়। হালদার-গিন্নী পানের পিক ফেলে, আলতো করে একটিপ দামী জর্দা মুখে ফেলে বলেন, সত্যিই এবার ওদের উঠে যাওয়া উচিত এ-পাড়া থেকে। জমিটা বিক্রি করে দিলেও তো কিছু সুরাহা হয়।

পাড়ার অন্যতম সম্ভ্রান্ত বাসিন্দে রাজেন সান্যালের স্ত্রী অর্থাৎ মিঠুর মা টপ করে কথাটা আঁকড়ে ধরে উৎসাহিতভাবে বললেন, উনি তো সেদিন এই কথাটাই অত করে বোঝালেন অণিমাকে। ভাল দামও দেবেন বলেছিলেন। তা মেয়ের আদিখ্যেতা দেখে বাঁচি না, বলে কিনা—মাথা গোঁজার জায়গাটুকুও যদি যায় তবে আর রইল কি?

সকলেই একবাক্যে অণিমার এই ধরনের অন্যায় জিদের

নিন্দা করতে লাগল: আরে, আগে পেটের ভাত জোগাড় কর্ তবে তো মাথা গোঁজার জায়গা!

রিজিয়া রোদে বসে মেয়ের গায়ে তেল মালিশ করতে করতে বলে, জান মা, কালকে অণিমাকে দেখলাম, সেজেগুজে কোথায় যেন বেরুচ্ছে।—তারপর মুখে আঁচল-চাপা দিয়ে হেসে বলে, আহা, সাজের কি ছিরি, কানের পাশে এক খাবলা পাউডার লেগে রয়েছে, এদিকে আবার কপাল চুঁইয়ে তেল গড়াচ্ছে, মনে হচ্ছিল যেন—

পাড়ার নতুন ভাড়াটে প্রফেসরের রূপসী বউ বিশেষণটা হাতের কাছে জুগিয়ে দেয়: যেন শিঙ্গি মাছে কেউ ছাই মাখিয়েছে।

উচ্ছ্বসিত হাসিতে খিলখিল করে সকলেই এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ে: শুনেছিলাম হাসপাতালে নাকি নার্সের চাকরি পেয়েছে?

সঠিক খবর দিল বুলুর মা: অণিমা টিকে দিয়ে বেড়ায়। ও নিজে ঠিক দেয় না, টিকাদারবাবুর সঙ্গে থেকে লোকের হাতে স্পিরিট ঘষে। চৌধুরীসাহেবই নাকি শেষ পর্যন্ত মিউনিসিপ্যাল কমিশনারদের মিটিংয়ে কথাটা তুলে অণিমাকে ভ্যাক্সিনেশন অফিসে ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

কথাটা শুনে অল্পবয়সী কুমারী মেয়েদের দল একটু শিউরে ওঠে যেন—অণিমাদি অজানা অচেনা পুরুষ-মানুষের হাত ধরে! হাত শক্ত করে ধরে স্পিরিট ঘষতে লজ্জা করে না একটুও! ছবিটা মনে মনে কল্পনা করে রঙিন সিল্কের শাড়ির নীচে তাদের নরম ফোলা ফোলা হাতের তালু ঘেমে ওঠে। এ ওর মুখের দিকে আড়চোখে তাকায়, তারপর ফিক্ করে হেসে ফেলে ছুটে পালিয়ে যায় ওখান থেকে।

বড়দের আসরে প্রফেসর-গিন্নী মুখ টিপে হেসে বলে, অণিমা যদি হাত জাপটেও ধরে তো কোন পুরুষের মন টলবে না।

* * *

বসন্তের হাওয়াটা মোলায়েম হলেও রোগটা তেমন নয়। শহরের দক্ষিণ দিকটাতে মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে বসন্ত। টিকাদারবাবুর কাজ বেড়ে গেছে চতুর্গুণ। ব্যস্তসমস্তভাবে হাতবাক্সটা নিয়ে শহরের এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে লোকটা। পিছনে দেখা যাবে স্ট্র্যাপ-ছেঁড়া জুতো ঘষতে ঘষতে স্পিরিটের বোতল আর তুলোর প্যাকেট হাতে অণিমা চলেছে। তেল-তেল ঘামে আর পরিশ্রমে মুখের রঙটা বেগুনী হয়ে উঠেছে, বাঁ দিকের চোখের মণিটা নিষ্প্রভ সাদা।

এরই মধ্যে একদিন সকালে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের হৈচৈ কোলাহলে ঘুম ভেঙে গেল। ছোট বোন লুকু বাবরী দুলিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে বলে গেল, ছোড়দা, দেখবে এসো অণিমাদি টিকে দিতে এসেছে। বাবা চায়ের পেয়ালা হাতে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা উপভোগ করছিলেন, কিন্তু মুখে গাম্ভীর্য টেনে বললেন, যাও অঞ্জন, হাতমুখ ধুয়ে টিকেটা নিয়েই নাও—সময়টা খুব খারাপ।—তারপর অণিমাকে লক্ষ্য করে নীচু গলায় অনুকম্পা মিশিয়ে বললেন, পুওর গার্ল।

শার্টের আস্তিন গুটিয়ে সুপুষ্ট বাঁ হাতটা এগিয়ে দিতে অণিমা যেন সাগ্রহে হাতটা আঁকড়ে তুলে ধরল একেবারে ওর প্রায় বুকের কাছে। মাকড়শার ঠ্যাংয়ের মত সরু সরু আঙুলে পেঁচিয়ে ধরেছে হাতটা। এতক্ষণের কৌতুককর ব্যাপারটা মা, ছোট পিসীমার কাছে এখন যেন বেশ দৃষ্টিকটু লাগল, গম্ভীরমুখে তাঁরা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। বউদি মুচকি হাসি গোপন করতে ঘুরে দাঁড়াল।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় নিয়ে যেন অণিমা হাতে স্পিরিট ঘষে। ওর এই বিশ্রী স্বভাবটা নাকি অনেকেরই চোখে পড়েছে।

সেদিন ক্লাবঘরের আড্ডায় কথাটা উঠল। শম্ভু নতুন বিয়ে করেছে, আমাদের অনেক কিছু না-জানা জগতের খবর ওর নখদর্পণে। সিগারেটে দীর্ঘ টান মেরে ও বিজ্ঞ ভাবে বলে, এটা হচ্ছে এক ধরনের রিপ্রেস্ড্ প্যাশন। বাইরে থেকে ওদের ফ্রিজিড বলে মনে হলেও মনে মনে ওরা ভয়ঙ্কর হয়, বুঝলি। আমরা মাথা নেড়ে সায় দিই,
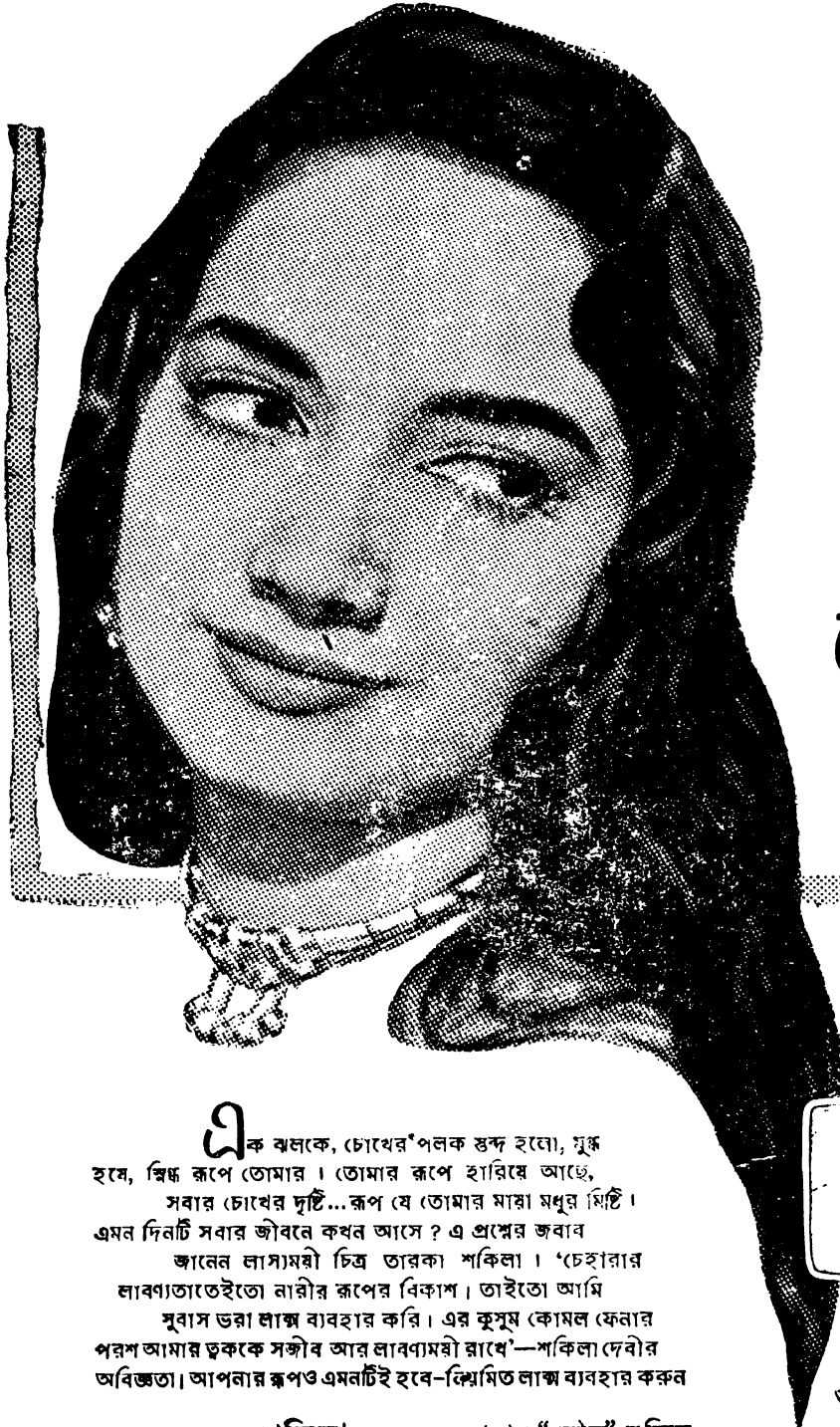
অণিমাদের মত মেয়েদের পক্ষে খুব স্বাভাবিক এটা। কিন্তু মোটেই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

* * *

ছুটির মেয়াদ ফুরিয়ে এল। প্রীতিভোজ, হৈচৈ আর নিটোল আড্ডার ভিতর দিয়ে দিনগুলো কী করে যে কেটে গেল টেরই পাই নি। মাঝখানে অণিমাদের নিয়ে একটা হৈচৈ উঠেছিল। ভৈরবকাকা মারা গেছেন, গোল বাধল শ্মশানে যাওয়া নিয়ে। আমরা চক্ষুলজ্জার খাতিরে দু-একজন এগিয়ে যাচ্ছিলাম কিন্তু বাবা-মা সকলেই ঘোর আপত্তি তুললেন—ঝাঁকে ঝাঁকে লোক মরছে বসন্তে, এ সময় রিস্ক নেওয়া ঠিক নয়। শেষে রিফিউজী কলোনির কয়েকটি ছেলে খবর পেয়ে এগিয়ে এসেছে।

যাবার আগের দিন আকস্মিকভাবে আবার অণিমাকে দেখলুম। টোটনের বউদির ছেলে হয়েছে—খবরটা জন্মরেজেস্ট্রী অফিসে দিতে গিয়েছিলাম। ভ্যাক্সিনেশন-ওয়ার্ডে বারান্দার ছায়ায় চেয়ার-টেবিল পাতা। স্পিরিট-ভেজানো তুলো-হাতে অণিমা একা লোচন কুশারীর সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে।

জীবনে বোধ হয় এই প্রথম অণিমার সম্বন্ধে একটু কৌতূহল বোধ করে এগিয়ে গেলাম। লোচন কুশারীর নামের সঙ্গে একটা প্রীতি-মেশানো অস্বস্তি জড়িয়ে আছে এই মফস্বল শহরের সকলের মনে। এখানকার শ্মশানের ঘাটবাবু। ভাঙা কলমটা কালিতে ডুবিয়ে খসখস করে মৃত্যুর পরোয়ানা সই করে মোটা খেরো-বাঁধানো খাতায় সযত্নে মৃতের নাম-ধাম-বিবরণ টুকে রাখে, কাঠ ওজনের সময় শ্যেন-দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে ওজনের কাঁটা, যাতে একখানা কাঠও পর্যন্ত না বেশী যায়, এমন কি শোনা যায়, মৃতের খাটের তোশক-বালিশ নিয়ে পর্যন্ত নাকি মুদ্দফরাশদের সঙ্গে জঘন্যভাবে ঝগড়া করে। তিনকুলে কেউ নেই, শ্মশানেই থাকে খায়, শহরের দিকে বড় একটা আসে না। লোচন কুশারীর চেহারাটা আরও ভীতিপ্রদ। চল্লিশোর্ধ্বে বয়স, তার উপর থুতনি থেকে ডান দিকের গালের চোয়াল পর্যন্ত একটা বীভৎস পোড়া দাগ, ক্ষত শুকিয়ে যাবার পরেও জায়গাটা কাঁচা শ্বেতী রোগের মত দগদগ করছে। ভ্রূর নীচে কোঁচকানো চামড়া ঝুলে পড়েছে গলিত মাংসস্তূপের মত। দেখে মনে হয় লোচন কুশারী সদ্য সদ্য চিতার আগুনে ঝলসে উঠে এসেছে আধপোড়া হয়ে। লোকে বলে মাঝরাত্রে শ্মশানের নিভন্ত চিতাগুলির আশেপাশে কী যেন খুঁজে বেড়ায় লোচন কুশারী। এহেন লোককে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলে সকলেই।

একা একা অমন একটা জায়গায় থাকেন, অসুখ-বিসুখ হলে মুখে জল দেবার লোকটা পর্যন্ত নেই। আগে থেকে সাবধান হওয়াটা ভাল নয় কি?—অণিমার গলা সমবেদনায় আর্দ্র শোনায়।

বিস্মিতভাবে চোখ তোলে লোচন কুশারী। বিশ্বাসহীন দৃষ্টি অনেকক্ষণ ধরে কী যেন খোঁজে অণিমার মুখে। অনেক দিন—অনেক দিন পর যেন কোন এক ভুলে-যাওয়া সুরের তন্ত্রীতে ঘা পড়ল। ঠাণ্ডা মেথিলেটেড স্পিরিট শুকিয়ে গেছে অনেকক্ষণ, কেবল কোমল সুষমায় উষ্ণ একটা শীর্ণ হাতের স্পর্শে লোচন কুশারীর ভারী দেহটা কেঁপে উঠল একবার।

চোরের মত নিঃশব্দে পা টিপে টিপে সরে এলাম ওখান থেকে। দূরে শিমুল গাছটার দিকে নজর পড়ল, রক্তিম আগুনের শিখার মত টুকটুকে লাল থোকা থোকা ফুলগুলি দমকা হাওয়ায় কাঁপছে।

হুজুগ ও যুগ

[৩৮২ পৃষ্ঠার পর]

উক্ত ছয়টি দফা ছাড়াও অন্ততঃ আরও শতাধিক দৃষ্টান্ত আমার হাতেই আছে, কিন্তু শান্তি-আন্দোলন যে হুজুগ ছাড়া আর কিছু নয় তা ইতিমধ্যেই প্রমাণ হয়ে গেছে। তবু যদি কোনও নাছোড়বান্দা এতেও সন্তুষ্ট হতে না চান, তবে তাঁকে আমি বলতে বাধ্য হব যে মানুষ কোনদিনই শান্তি চায় নি এবং শান্তি চাওয়াটা তার স্বভাব-বিরুদ্ধ। প্রমাণস্বরূপ ইতিহাস তুলে ধরব, যা থেকে দেখা যাবে যে গত সাড়ে তিন হাজার বছর ধরে পৃথিবীতে অবিরাম যুদ্ধ-বিগ্রহ চলেছে, এবং যতই সভ্যতার উন্নতি হচ্ছে বড় বড় যুদ্ধগুলোর মধ্যে ব্যবধানকালও ততই কমে আসছে। যথা :

(১)	প্রুসিয়ান যুদ্ধ	১৮৬৪	হতাহত	ত্রিশ লক্ষ
(২)	প্রথম মহাসমর	১৯১৪	„	ষাট লক্ষ
(৩)	দ্বিতীয় „	১৯৪০	„	দুই কোটি
(৪)	কোরিয়া যুদ্ধ	১৯৫২	„	কুড়ি লক্ষ

এ ছাড়া তো প্রথম ও দ্বিতীয়, দ্বিতীয় ও তৃতীয়, এবং তৃতীয় ও চতুর্থ যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে বহুশত ছোটখাটো যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল এবং আজও চলেছে।

১৯২০ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত এই সকল প্রধান প্রধান হুজুগগুলির বিষয়ে চিন্তা করলে দেখা যাবে পূর্ণিমা অমাবস্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক নিয়মগুলির মত এগুলিও কেমন সুন্দর এক ছান্দসিক নিয়মে চলেছে। পূর্ণিমা-অমাবস্যা আমরা ভুলি না, রেখে দিই দেওয়াল-পঞ্জীতে, শুধু হুজুগগুলির কথাই ভুলে যাই। কিন্তু ভোলে না মহাকাল। জাতির ভাবধারাকে ইচ্ছামত গড়ে-পিটে ইতিহাসে আনে পরিবর্তন, আঁকে ওঠা-নামার আলপনা।

সমস্যা জাগে মানুষের কর্মফলে। মানুষ কর্ম করে প্রচলিত শিক্ষা ও সংস্কৃতি অনুযায়ী। শিক্ষার ধারা বয়ে চলে যুগোপযোগী সমাজ-ব্যবস্থার প্রকৃতি অনুযায়ী, এবং সংস্কৃতি গড়ে ওঠে তারই সঙ্গে তাল রেখে। আজকাল আবার প্রশ্ন উঠেছে—শিক্ষা অনুযায়ী সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, কিংবা সমাজ-ব্যবস্থা অনুযায়ী শিক্ষার প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়। বিষয়টি গুরুতর, এবং এ বিষয়ে আলোচনা বর্তমানে অপ্রাসঙ্গিক। শুধু এইটুকু নিরাপদে বলা চলে যে প্রথমটি নিঃসংশয়ে মঙ্গলজনক, এবং দ্বিতীয়টির বিষয়ে বলবার সময় আসে নি এখনও।

এ বিষয়ে কিন্তু কোন সন্দেহ নেই যে, শিক্ষা সমাজ ও রাষ্ট্রের লক্ষ্য মানুষের আত্যন্তিক সুখ বিধান করা, এবং ইতিহাস প্রমাণ দিচ্ছে গত সাড়ে তিন হাজার বছরের মধ্যে পৃথিবীর কোন দেশই লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে নি। আরণ্যক যুগে মানুষ যথেষ্ট কষ্ট পেয়েছে সত্য, কিন্তু আজ এই যান্ত্রিক যুগে সে তার চেয়ে বেশী সুখ পাচ্ছে না—তার প্রমাণ দিচ্ছে করোনারী থ্রম্বোসিস্। সেই পুরনো পাথরের যুগে যে সমস্যা ছিল, আজ মহাশূন্য-জয়যাত্রা-যুগেও সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ সমস্যা উদ্ধত ভঙ্গীতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে—"সুখ নাই স্বস্তি নাই কোথাও ছিটে-ফোঁটা।" কেন এমন হয়? এই অতৃপ্তির, এই পরাজয়ের গ্লানি ভোলবার উপায় কি? এই হুজুগগুলির মর্মই বা কি?

অ্যারিস্টটল্ বললেন, মানুষের মত এমন সুন্দর তেজীয়ান, তুরীয়ান ও বলীয়ান প্রাণী তুচ্ছ সুখভোগের জন্য সৃষ্ট হয় নি। হয়েছে কাজ করবার জন্য। কর্মে তার আগমন, কর্মেই তার বিসর্জন। সেই অবধি পাশ্চাত্ত্য জগৎ কাজ নিয়েই মেতে রইল। কাজই যখন অবলম্বন, তখন শিক্ষা এবং সমাজ-ব্যবস্থাও তদুপযোগী হওয়া প্রয়োজন। তাই এল হাজার কিসিম্‌কা ইজ্‌মের হুজুগ। ইজ্‌ম্ দিয়ে কাজ বাড়ানো যায়, ভোগ্য-সামগ্রীও বাড়ানো যায়, কিন্তু প্রাণের ক্ষুধা মেটানো যায় না। বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেন, কাজ কমিয়ে ছুটি বাড়ানো হোক।

কিন্তু যান্ত্রিক সভ্যতা যতই উন্নততর হবে মানুষের শ্রমের উপর তার দাবিও ততই বেড়ে যাবে। বিজ্ঞান যতই নির্ভুলতর হবে, মানুষের বুদ্ধি যতই বাড়তে থাকবে, এবং কূটনীতিকের প্রচারকার্য যতই নিখুঁত হতে থাকবে, মানুষের নিজস্ব গণ্ডির স্বরূপটাও ততই বদলে যেতে থাকবে। সেদিন রাম তার নিজের জন্য চিন্তা করবে না, সীতার জন্য তো নয়ই, কার জন্য যে সে সদা ব্যস্ত থাকবে তা সে নিজেই জানবে না। বালজাক তাঁর উপন্যাসে এই অবস্থাটা বেশ সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন। নায়িকা যখন কাঁদছে, স্বামী তখন বলছে—"শোন শোন, তোমার চোখের জলে কি-কি আছে আমি বিশ্লেষণ করেছি, ওতে আছে খানিকটা phosphate of lime, কিছু chloride of soda, খানিকটা mucus আর বাকীটা জল।"

কর্মব্যস্ত বৈজ্ঞানিক স্বামীর কাছে তাঁর স্ত্রীর চোখের জলের দাম ওইটুকুই, তার বেশী নয়। স্বামী যেদিন তাঁর স্ত্রীর চোখের জলকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণই করবেন সেই সুদিনকে মানুষের ভাগ্যে বিলম্বিত বা ত্বরান্বিত করবার দায়িত্ব উত্তর-পুরুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে চলবে না। আমাদেরই তা ঠিক করতে হবে। মস্তিষ্কে বুদ্ধির পরিমাণ বেড়ে গেলেই কি মানুষ উন্মাদ হয়?

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকাবাসীদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটি। তাঁর ভাষার স্বাভাবিক জলদ্মন্দ্র রুদ্র-মাধুর্য ও অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণীর ভয়াবহ গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য অনুবাদ না করে সেটুকু উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করা গেল না। তিনি বলেছিলেন :—

"It is one of the evils of your Western Civilisation, that you are after intellectual education alone, and there is no safeguard with it. There is one mistake made; you give this education but you take no care of the heart. *It only makes you ten times more selfish and that will be your destruction.*"

এ কথা জানতে আজ বাকী নেই কারও, দ্রষ্টা ব্রহ্মবিদের ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য হয়েছে।

হুজুগের ঝোঁকে আমরা কেবলই ভুলে যাই বিজ্ঞান আমরা চাই কেন? তথাকথিত সুখ বিধানের জন্যই তো! কিন্তু কপালদোষে "উল্টা সমঝ্লি রাম" হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভগীরথের মত বহু দুঃখ সহ্য করে বহু সাধনায় সভ্যতার বুকে খাল কাটলুম যেজন্য, সেই বিজ্ঞান-স্রোত এল শেষ পর্যন্ত, কিন্তু সেই সঙ্গে দেখছি এসে গেছে প্রকাণ্ড এক কুমীর। আজ বিজ্ঞান-সিঞ্চিত উর্বরা সভ্যতা-ভূমিতে বাস করে কুমীরের ভক্ষ্য হব, কিংবা পালিয়ে যাব হিমালয়ের প্রত্যন্ত প্রদেশে এই সমস্যায় ইতিমধ্যে অনেক সুসভ্য পরিবার বিষ খেয়ে মরেছে।

কবি দার্শনিকশ্রেষ্ঠ টেনিসনের একটা কবিতায় আমাদের অবস্থার যে করুণ প্রতিচ্ছবি ফুটেছে তা সকলের পড়া দরকার—

"—Science moves, but slowly, creeping on from point to point,
Slowly comes a hungry people, as lion creeping nigher.
Glares at one that nods and winks behind a slowly dying fire.

* * *

Knowledge comes but wisdom lingers and I linger on the shore,
And the individual withers, and the world is more and more."

Knowledge and Wisdom—জ্ঞান ও বিদ্যা। জ্ঞান—জানা। বিদ্যা—সেই জানাটাকে আমার শরীর ও মনের অঙ্গীভূত করে নেওয়া। কে না জানে বর্ণ-বিদ্বেষ, জাতি-বিদ্বেষ এবং গায়ের জোর প্রভৃতি নীতি আজকের যুগে অচল। কিন্তু সেই জ্ঞানকে কোনদিন অন্তরে-বাহিরে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছি কি? যদি না করে থাকি, তবে দোহাই আপনাদের—ভাগ্যে যা ঘটে ঘটুক, আর হুজুগে মাতাবেন না।

সংবাদ-সাহিত্য

[৩৬০ পৃষ্ঠার পর]

ভাষায় বহু চীনা ও ভারতীয় শব্দ ঢুকিয়াছে, লিপি চীনা এবং বর্ণমালা ভারতীয়—তাহাতে আমাদের লজ্জা নাই। এই ঋণ আমাদিগকে এক করিয়াছে, সমৃদ্ধ করিয়াছে এই কারণে আমরা কৃতজ্ঞ। প্রশ্ন করিলাম, বর্ণমালা ভারতীয় মানে? জবাব পাইলাম, এগারো শো বছর আগে এক ভারতীয় অর্হৎ আমাদিগকে স্বর-ব্যঞ্জন বর্ণমালার ক্রম শিখাইয়াছিলেন, সেই ক্রমই আমরা অনুসরণ করিতেছি। ভারতীয় ভাষা? যে গৃহাচ্ছাদন টাইল সর্বদা আমাদের মাথা রক্ষা করে তাহাকে আমরা খাওওরা বলি—ভারতীয় খাপরা শব্দেরই জাপানী রূপ উহা। তিনি বলিলেন, ভারতবর্ষের এক হওয়ার সব চাইতে বড় বাধা ভাষা ও লিপির পার্থক্য। ইহা যেদিন এক হইবে সেদিন ভারতবর্ষের বহু সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে, ভারতবর্ষ শক্তিশালী হইবে। কিন্তু তাহা হউক বা না হউক বর্তমানে প্রচলিত ভাষাতেই শিক্ষার বিস্তার চাই—৯৯.৯ না হউক শতকরা আশি জন শিক্ষিত হওয়া চাই।

গত কয়েক বৎসর হইতে দেখিতেছি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ে বাধার সৃষ্টি করিতেছেন। পরীক্ষা পাসের হার একদিকে মারাত্মকরকম কমাইয়া ফেলা হইতেছে অন্যদিকে অকৃতকার্য ছাত্রদের কোনও কলেজে স্থান নাই। যে কলেজে ছয়শত ছাত্র ফেল হইয়াছে সে কলেজে মাত্র ত্রিশজনকে পুনঃপ্রবেশের অধিকার দেওয়া হইতেছে। ইচ্ছা করিয়া প্রথম শ্রেণীর অনার্স দেওয়া বন্ধ করিয়া সর্বভারতীয় চাকুরিতে বাঙালীর ছেলের স্বার্থহানি ঘটানো হইতেছে। সমপর্যায়ের ছাত্ররা অন্যপ্রদেশে কর্তৃপক্ষের উদারতায় প্রথম শ্রেণীর ছাপ পাইয়া চাকুরিতে সুবিধা করিয়া লইতেছে। এই আত্মঘাত মোটেই প্রশংসনীয় নয়। বাংলাদেশের অলিতেগলিতে ইউনিভার্সিটির উপর ইউনিভার্সিটি স্থাপিত হইয়া করদাতাদের অর্থের শ্রাদ্ধ হইতেছে অথচ বৎসরে বৎসরে হাজার হাজার ছাত্র কলেজে ঢুকিতে না পারিয়া চলন্ত ট্রেনের তলায় ঢুকিতে চাহিতেছে। ইস্কুলে স্যামুয়েল টেলর কোলরীজের 'রাইম অব দি এনসিয়েন্ট মেরিনারে' একজন নাবিকের হাহাকারে শুনিয়াছিলাম—"ওয়াটার ওয়াটার এভ্‌রি-হোয়ার নট এ ড্রপ টু ড্রিঙ্ক।" বাঙালীর ছেলেদেরও অনুরূপ দুর্দশায় ফেলা হইতেছে। ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি এভ্‌রিহোয়ার, নট এ সীট টু সিট। ফেল করাইলেই ছাত্ররা ফেল হয়, পাস করাইলে শিক্ষার ধারাটা অব্যাহত থাকিয়া শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়িয়া যায় এবং জাপানী ভদ্রলোকের মত এই যে, শিক্ষিতের হার বাড়িলেই দেশের কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী।

ফরিয়াদী

নরহত্যা, খুনখারাপি, লুঠতরাজ, খাণ্ডবদাহন এবং নারীধর্ষণ ইত্যাদি সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত ও ব্যাপকভাবে করিয়া যাহারা আসামীশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে—যাহাদের উপরে এই সব অমানুষিক বর্বরতা অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ, ফরিয়াদীস্বরূপ তাহারা—তাহাদের অর্থাৎ ওই আসামীদের বিরুদ্ধে নালিশ রুজু করিয়াছে উচ্চতম বিচারকের দরবারে। আসামী-ফরিয়াদী উভয় দলের চরম শাসন-ব্যবস্থা এই দরবারেরই হাতে সংবিধান বলে অর্পিত ছিল। যদি এ কথা সত্য হয় এই রাহাজানির সংবাদ পূর্বাহ্নে পাওয়া সত্ত্বেও ইহা নিবারণের কোন চেষ্টাই উচ্চতম কর্তৃপক্ষ করেন নাই তাহা হইলে তাঁহাদের বিচারও পক্ষপাতদুষ্ট হইতে বাধ্য। পূর্বপ্রদত্ত প্রশ্রয়-পাপকে ঢাকিবার জন্য ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের ছলের অভাব কখনই হয় না। যথাযথ বিচারে সন্দেহ করিয়াই ফরিয়াদী পক্ষ আতঙ্কিত হইয়াছে। তাহারা নিরুপায়, অসহায়, কাজেই অসহায়ের অবলম্বনীয় একমাত্র পথ পলায়ন করিতে করিতে ক্রন্দন-চীৎকারে দিঙ্‌মণ্ডল মুখর করিতে বাধ্য হইতেছে। মাত্র চৌদ্দ বৎসর পূর্বের ভয়াবহ স্মৃতি তাহাদিগকে আরও ভয়াতুর করিয়া তুলিয়াছে। উচ্চতম কর্তারা যদি অপক্ষপাত বিচারের দ্বারা হতাশাক্লিষ্ট মানুষের মনে আশ্বাস ও সাহস সঞ্চার করিতে না পারেন তাহা হইলে বর্তমান উদ্বাস্তু-সমস্যা দ্বিগুণিত হইয়া দেশের সংহতি সাংঘাতিক ভাবে বিপন্ন করিবে। যে চক্রান্তের ফলে এমন কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে সে চক্রান্তে উচ্চ নীচ ও আসামী ফরিয়াদী যাঁহারাই থাকুন তাঁহাদিগকে সন্ধান করিয়া বাহির করিয়া উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা না করিলে পাপের মূলোচ্ছেদ হইবে না এবং ভয়ার্তের ভয় কখনই দূর হইবে না। কিন্তু আসামীর হাতে যতকাল পাপানুষ্ঠান-ক্ষেত্রের কর্তৃত্ব ও শাসনভার থাকিবে ততকাল ন্যায়বিচারের চেষ্টা বিড়ম্বনায় পর্যবসিত হইবেই। এই কারণেই আমরা সাময়িক ভাবে শাসন-ব্যবস্থা পরিবর্তনের দাবি জানাইতেছি। আর একটা কারণ ১৯৬১ সনের আদমশুমারি। সংখ্যাগুরুকে সংখ্যালঘু করিবার জন্য যাহারা নৃশংস অত্যাচারে কুণ্ঠিত নয়, আদমশুমারির দপ্তর তাহাদের তাঁবে থাকিলে হয় নয় হইতে

কতক্ষণ ? অত্যাচার-ব্যভিচারের উদ্দেশ্য যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনই হয় তাহা হইলে আগামী আদমশুমারি পর্যন্ত শাসন-ব্যবস্থান্তর একান্ত প্রয়োজন। এ যুগে যখন ন্যায়-নীতি-ধর্ম সমস্তই সংখ্যাসাপেক্ষ তখন সংখ্যাটা যাহাতে বাস্তবানুসারী হয় তাহার ব্যবস্থা করাও উচ্চতম কর্তৃপক্ষের কর্তব্য। যে ভূখণ্ডের সহিত সমগ্র দেশের সীমান্তসমস্যা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত সে ভূখণ্ডের অন্তর্বিরোধ দীর্ঘস্থায়ী হইলে আন্তর্জাতিক অপঘাত অচিরাৎ আসিয়া পড়িবে। অঙ্কুরে বিনাশ না করিলে এই ভেদবুদ্ধিজাত তুষানল দেশের সর্বত্র ধিকিধিকি জ্বলিতে থাকিবে এবং একদিন অনুকূল বাতাসের সহায়তায় প্রচণ্ড দাবানলের সৃষ্টি করিয়া অখণ্ডকে খণ্ডিত এবং এককে বিচ্ছিন্ন করিয়া সমগ্রকে সমূলে ধ্বংস করিবে।

পুরাতন কথা

আসামে ভাষা লইয়া যে আন্দোলন তাহা আকস্মিক বা আধুনিক নয়। স্মরণ হইতেছে ১৯৩৬ সনে আমরা প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য গৌহাটি গিয়াছিলাম। সেখানে তখনই আসামী ভাষাভাষীরা উগ্রপন্থী হইয়াছেন। আমরা আমাদের ভাষণে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, বাংলা আসামী একই ভাষা। বাংলা ভাষা অনুশীলনের ফলে অনেক অগ্রসর। সুতরাং দুইকে এক করিলেই লাভ, পৃথক হইলে দুই পক্ষেরই ক্ষতি। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া পেটকাটা ব-সম্বলিত কয়েকটি চিঠি পাইলাম; কয়েকটিতে আমরা দ্বিতীয়বার আসাম গেলে আমাদের পেটও কাটিয়া ফেলা হইবে এইরূপ শাসানি ছিল। কয়েকটি মুদ্রিত সংবাদপত্র স্থানে স্থানে লাল কালির দাগ দিয়া আমাদের পাঠানো হইয়াছিল, লাল মার্কার মোদ্দা কথা আমাদের রুধির-দর্শন। এই আন্দোলন যে থামে নাই তাহার প্রমাণ পাইলাম ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের আশ্বিনের 'প্রবাসী'র "বিবিধ প্রসঙ্গে"। স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তখন লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—

"আসাম প্রদেশের বাঙালী

ভৌগোলিক ও ভাষিক বঙ্গের কতক অংশ—যেমন শ্রীহট্ট জেলা—আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। অসমিয়া-ভাষাভাষী অনেকে এই জেলাটিকে পুনর্বার বাংলাদেশভুক্ত দেখিতে ইচ্ছুক।

বঙ্গের কিয়দংশ আসামপ্রদেশভুক্ত হওয়ায় এবং আসাম প্রদেশের অন্যান্য অংশেও অনেক বাঙালী থাকায় ও যাওয়ায় ফল এই হইয়াছে যে, আসাম প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৪৩ জন বাংলা-ভাষী এবং শতকরা ২১.৬ জন অসমিয়া-ভাষী। অর্থাৎ প্রদেশটির নাম যদিও আসাম, কিন্তু এখানে অসমিয়া-ভাষীরা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ নহে। সমস্ত আসাম প্রদেশের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি শুধু তাহার সেই অংশটির কথা ধরা যায় যাহাকে খাস্ আসাম বা আসাম উপত্যকা বলে, তাহা হইলে দেখি সেখানেও অসমিয়া-ভাষীরা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ অর্থাৎ অর্ধেকের উপর কিম্বা অন্ততঃ অর্ধেকও নহেন। সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে তাঁহারা শতকরা ৪১ জন, বাঙ্গালীরা প্রায় শতকরা ২৩ জন, বাকী শতকরা ৩৬ জন অন্য নানা ভাষাভাষী।

আসাম প্রদেশে বা খাস আসামে অসমিয়া-ভাষীরা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ নহেন বলিয়া, সমগ্র প্রদেশে বাঙালীদের সংখ্যা তাঁহাদের প্রায় দ্বিগুণ বলিয়া, তথাকার বাঙালীরা সেখানে প্রভুত্ব করিতে বা তথাকার প্রধান অধিবাসী বলিয়া পরিগণিত হইতে চান না। অসমিয়া-ভাষীদের ও তাঁহাদের ভাষাসাহিত্য-সংস্কৃতির পূর্ণ উন্নতি হওয়াতে তাঁহাদের কোন আপত্তি নাই। শিল্প-বাণিজ্যে ও কৃষিতে এবং সরকারী চাকরীতে অসমিয়া-ভাষীরা পূর্ণ সুযোগ ও অধিকার প্রাপ্ত হউন, ইহাও বাঙালীরা চান। কিন্তু তাঁহারা ইহাও চান যে, যেহেতু তাঁহারাও ভারতবর্ষের মহাজাতির, জানপদবর্গের ও পৌরজনের অংশ এবং যেহেতু তাঁহারাও আসাম প্রদেশেরও অধিবাসী, সেই জন্য তাঁহাদের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে বিনষ্ট বা খর্ব করিবার কোন সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ চেষ্টা হইবে না, তাঁহাদের সন্তানেরা মাতৃভাষায় শিক্ষা পাইবে, তাঁহারা ন্যায্য মূল্যে জমি লইয়া ঘর-বাড়ী চাষ-বাস ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে পারিবেন, এবং যোগ্যতা অনুসারে সরকারী চাকরী তাঁহারা পাইবেন। এই সকল ও অন্য কোন কোন বিষয়ে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ নানা বাধাবিঘ্ন ঘটায় এই বৎসর ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে আসাম প্রদেশের পৌরজন-সভার (Assam Citizens' Association-এর) একটি কন্‌ফারেন্স হইয়াছিল। আগেও এরূপ একাধিক কন্‌ফারেন্স হইয়া গিয়াছে। এই বৎসরের কন্‌ফারেন্সটিতে ২১টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তৎসমুদয়ের ও অন্যান্য অনেক বিষয়ের বৃত্তান্ত সমন্বিত একটি রিপোর্ট সভা ইংরেজীতে বাহির করিয়াছেন। রাধাকুমুদ বাবু তাহার ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন।

সমুদয় প্রস্তাবই ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত।"

গ্রন্থ-পরিচয়

রবীন্দ্রস্মৃতি : ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। বিশ্বভারতী, কলিকাতা-৭। দুই টাকা।

রবীন্দ্র-শতবার্ষিক উৎসব-দিবসের মাস কয়েক পূর্বেই ইন্দিরা দেবীর মৃত্যু অতিশয় শোচনীয়। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সঙ্গীত সম্বন্ধে বর্তমানে তিনিই সর্বাধিক অভিজ্ঞ ছিলেন এবং তাঁহারই কল্যাণে আমরা বিশ্বের পত্রসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় দান 'ছিন্নপত্রে'র পাঠাধিকার লাভ করিয়াছি। 'কড়ি ও কোমল' 'শিশু' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের নানা কবিতায় তিনি কবির কতখানি স্নেহ-ভাজন ছিলেন তাহার শাশ্বত প্রমাণ রহিয়া গিয়াছে।

সুখের বিষয় মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তাঁহার 'রবীন্দ্র-স্মৃতি' 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' প্রভৃতি হইতে সংগ্রহ করিয়া শ্রীপুলিনবিহারী সেন প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। এই স্মৃতিগ্রন্থে এমন অনেক বিচিত্র সংবাদ আছে যাহা আর কাহারও জানা ছিল না। মানুষ, কর্মী, কবি রবীন্দ্রনাথকে সমগ্রভাবে দেখিবার পক্ষে গ্রন্থখানি বিশেষ সহায়তা করিবে। এবং এই সমগ্র দর্শন মধুর ও মনোহর। সেই কবিই শ্রেষ্ঠ কবি যাঁহার পরিচয় দিনে দিনে ম্লান না হইয়া উজ্জ্বলতর হয়—স্বর্গীয়া ইন্দিরা দেবী রবীন্দ্রনাথের আলেখ্য আর একটু উজ্জ্বল করিয়া গেলেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান : শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পনের টাকা।

দীর্ঘ কুড়ি বৎসরেরও পরে শ্রীচৈতন্যসাহিত্য বিষয়ে অতিশয় মূল্যবান এই গ্রন্থখানির যে দ্বিতীয় সংস্করণ হইল তাহাতে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। কোনও মহাপুরুষ সম্পর্কে গ্রন্থ নানাভাবে লেখা যায়; ভক্ত পক্ষেও লেখা হয় আবার পাষণ্ড পক্ষেও। পাষণ্ডেরা সন্দেহ তোলেন, ভক্তেরা তাহা নিরাকরণ করেন। মজুমদার মহাশয় মহাবৈষ্ণব এবং ভক্ত মানুষ। তিনি চৈতন্যদেবের যাবতীয় চরিতাখ্যানের আলোচনা করিয়া উপাস্যের সম্পূর্ণ রূপ পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন, বহু পরস্পরবিরোধী উক্তির সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বর্তমান সংস্করণে তাঁহার বিগত কুড়ি বৎসরের নবলব্ধ গবেষণা ও চিন্তার ফল যুক্ত হওয়াতে বইটির মূল্য আরও বাড়িয়াছে।

গোপীচন্দ্রের গান : শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। দশ টাকা।

দীনেশচন্দ্র সেন, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য ও বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'গোপীচন্দ্রের গান' দীর্ঘকাল দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল অথচ বাংলা সাহিত্য ও সমাজ সম্পর্কে গবেষণাকারীদের ইহা একটি মূল্যবান উপাদান। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রায় তিন যুগ পরে গ্রন্থখানি নূতন আলোকে সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করাতে তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ১৮৭৮ সনে প্রাচ্যবিদ্যার্ণব গ্রীয়ার্সন কর্তৃক এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে "মানিকচন্দ্র রাজার গান" প্রকাশিত হওয়াতে বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হয়। তাহার পরে বহুজনে বহু নামে এই কাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রকাশ করিয়া বাংলার সামাজিক ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহে সহায়তা করিয়াছেন। ডাঃ ভট্টাচার্য এই সকল খণ্ড খণ্ড সাধনার ফল নিজ গ্রন্থমধ্যে ব্যবহার করিয়া এবং নিজস্ব সুচিন্তিত মন্তব্য মণ্ডিত করিয়া এই "ম্যাগনাম ওপাস" প্রকাশ করিলেন। তাহার ভূমিকা ও টীকা অতিশয় মূল্যবান হইয়াছে।

কুমুদরঞ্জনের কাব্যবিচার : শ্রীক্ষেত্র গুপ্ত। গ্রন্থ-নিলয়, কলিকাতা-৬। দুই টাকা পঁচাত্তর ন. প.।

কুমুদরঞ্জন মল্লিকের কাব্যসাহিত্য সমুদ্রবিশেষ। তিনি যে কত কবিতা লিখিয়াছেন এবং এখনও প্রায় প্রত্যহ লিখিতেছেন তাহার হিসাব তাঁহার নিজেরও নাই, আর কাহারও নাই। কতগুলি গ্রন্থাকারে কবিতাগুলি মুদ্রিত হইয়াছে তাহা বলা কঠিন কারণ সব গ্রন্থ সুপ্রাপ্য নহে। সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় সহস্রাধিক কবিতা যে আত্মগোপন করিয়াছে নিঃসংশয়ে তাহা বলিতে পারি। শ্রীমান ক্ষেত্র গুপ্ত এই সমুদ্র মন্থন করিয়া বিচিত্র ও মনোহর রত্নরাজির

সঙ্গে বাংলা কাব্যরসিকদের পরিচয় ঘটাইলেন। নয়টি অধ্যায়ে কুমুদরঞ্জনের মানসিকতা ও কাব্যরীতি বিশ্লেষিত হইয়া কবির একটি সামগ্রিক পরিচয় ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। উদ্ধৃতিগুলির বাছাইও চমৎকার। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী ভূমিকা লিখিয়া গ্রন্থের মূল্যবৃদ্ধি করিয়াছেন।

শুভ-নির্মাল্য—নাটিকা: নবীনচন্দ্র সেন। আট আনা।

প্রভাত—কবিতা: দীপককুমার সেন। আট আনা।

জননী ও জন্মভূমি—বাণী-সঙ্কলন: মণীন্দ্রনাথ সেন ও অমূল্যরতন চৌধুরী। এক টাকা।

তিনটি পুস্তকই নবীনচন্দ্র গ্রন্থাগার, কলিকাতা-২৮ হইতে প্রকাশিত।

ষাট বৎসর পূর্বে পুত্র নির্মলচন্দ্রের বিবাহ-উপলক্ষে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন 'শুভ-নির্মাল্য' নাটিকাটি রচনা করিয়াছিলেন ও বিবাহ-বাসরে ইহা অভিনীত হইয়াছিল। আত্মীয়বান্ধবদের মধ্যে বিতরণের জন্য ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি ইহা মুদ্রিতও হয়। এই অধুনা-দুষ্প্রাপ্য কৌতুককর নাটিকাখানি পুনর্মুদ্রিত করিয়া শ্রীমান দীপক সেন তাঁহার অসাধারণ নবীনচন্দ্র-ভক্তিরই পরিচয় দিয়াছেন। ইতিপূর্বে নবীনচন্দ্রের কোনও গ্রন্থাবলীতে ইহা মুদ্রিত হয় নাই।

'প্রভাত' কয়েকটি সুমধুর কবিতার সমষ্টি। কিশোর কবির ভাব ও ছন্দ আমাদিগকে আশান্বিত করিয়াছে।

'জননী ও জন্মভূমি' একখানি চমৎকার বাণীসংগ্রহ গ্রন্থ। মহাভারত-রামায়ণ-পুরাণ, বিভিন্ন দেশের ও জাতির ধর্মগ্রন্থ ও নীতিশাস্ত্র এবং প্রধানতঃ বাঙালী মনীষী ও কবিদের জননী ও জন্মভূমি প্রশস্তিসূচক বাণী দ্বারা গ্রন্থখানি সমৃদ্ধ। বহু বিখ্যাত ও পরিচিত শ্লোকাংশ ও কাব্যাংশের একত্র সমাবেশ দেখিয়া আনন্দ হইল। যাঁহারা জননী ও জন্মভূমিকে ভালবাসেন তাঁহারা এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া কাছে রাখিলে প্রীত ও উপকৃত হইবেন।

—স.

হারানো ছন্দ: মীরাটলাল। অরুণিমা প্রকাশনী, ২ নং জগবন্ধু মোদক রোড, কলিকাতা-৫। দুই টাকা।

উপন্যাসে কাহিনীর একটা বড় স্থান আছে, একথা স্বীকার করেও বলা যায়, চরিত্রসৃষ্টিতেই ঔপন্যাসিকের দক্ষতা। ডিকেন্স দিয়েছেন কতকগুলি অবিস্মরণীয় চরিত্র আর হার্ডি পড়লেই একটানা কাহিনীর এক মোহময় আকর্ষণ মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ভিন্নতর স্বাদ পাওয়া যায় লরেন্সে, জয়েসে। অতএব উপন্যাসের শেষ কথা কেউ বলেন নি, বলা সম্ভবও নয়। বাংলা দেশের উপন্যাসে পশ্চিমের হাওয়া এসেছে উনিশ শতকে, এখনও সেই খোলা জানলা বন্ধ হয় নি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সক্ষম ও অক্ষম হাতের উভয়বিধ রচনা পড়েই মনকে বলতে পারি, এত ব্যস্ততা কেন, রসের শেষ কথা এখনই জানতে চাওয়া ভুল, বাংলা উপন্যাসের বয়সই বা হল কত।

মীরাটলালের 'হারানো ছন্দ' আলোচনায় উপন্যাসের এই ভূমিকার দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তরুণ লেখক এখানে একটি জীবনের কাহিনী বলেছেন, যা দুঃখ ও বেদনা, মান-অভিমানের স্তর পেরিয়ে একটি প্রণয়মধুর পরিসমাপ্তিতে গিয়ে পৌঁছেছে। তিনি দুটি জীবনের একটি কাহিনী বলেছেন, অমিতাভ আর শাশ্বতী, ভাগ্যচক্রে যাদের বিবাহ, ভাগ্যবিড়ম্বনায় যাদের বিচ্ছেদ ঘটেছিল। দুটো চরিত্র পৃথক মেজাজের, স্বতন্ত্র তাদের দৃষ্টিভঙ্গী। অমিতাভ খ্যাতিহীন যুবক, শাশ্বতী বিত্তশালিনী তরুণী। বিয়ে হলেও তাদের মন জোড়া লাগে নি। কিন্তু অমিতাভ তার অজ্ঞাতবাসে কঠোর সাহিত্যসাধনায় যেদিন দেশজোড়া খ্যাতি অর্জন করল, অভিমানিনী শাশ্বতী সেদিন সাগ্রহে এসে ধরা দিল স্বামীর কাছে। তাদের হারানো ছন্দ আবার জীবনের স্বপ্ন ও সৌন্দর্যে প্রতিষ্ঠিত হল।

মীরাটলালের কুশলী লেখনীতে এই সুন্দর রোমান্টিক কাহিনীটি স্বল্পপরিসরে পুরুষ ও নারী হৃদয়ের সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে অনুরণন তুলতে সমর্থ হয়েছে। কাহিনী ও চরিত্র দুই-ই এখানে সমান মর্যাদা পেয়েছে। লেখকের আন্তরিকতায় জীবনের উষ্ণ স্পর্শ সমগ্র উপন্যাসটিকে দিয়েছে এক বিরল সৌন্দর্য, যার জন্য অপেক্ষা করে থাকা যায়। লেখকের এই প্রথম উপন্যাসে পরিণত মনের সন্ধান পেয়ে তৃপ্তি পেয়েছি। তিনি জীবনের গভীরতর, প্রশস্ততর উপন্যাস লিখবেন এ আশা করি। কৃষ্ণ ধর

বৈঠকী গল্প: সন্তোষকুমার দে। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড। কলিকাতা-১২। দুই টাকা পঞ্চাশ ন.প.।

বাংলায় রসরচনা অন্য রচনার তুলনায় কমই লেখা হয়। সন্তোষকুমার দে-র 'কৌতুক-যৌতুক,' 'সরস গল্প' এবং বর্তমান গ্রন্থ 'বৈঠকী গল্প' তাঁকে রসরচনার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। বর্তমান গ্রন্থে পনেরটি সরস রচনা আছে—তার মধ্যে একটি একাঙ্ক নাটিকা এবং দুটি ব্যঙ্গ কাব্য এবং বাকি বারোটি ছোট গল্প। ব্যঙ্গকাব্যের মধ্যে 'টলিউডের উনি' শনিবারের চিঠির একটি পূজা-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়ে রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

'বৈঠকী গল্প' গ্রন্থখানির অন্যতম আকর্ষণ ব্যঙ্গচিত্রী রেবতীভূষণ ঘোষের অঙ্কিত সুন্দর চিত্রগুলি। রূপে রসে 'বৈঠকী গল্প' তাই পরম উপভোগ্য হয়েছে। আমরা গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি। —প্রবোধ নাগ

শতাব্দীর অধীশ্বর*

"Whether it be that I was born mad or a little too sane, my kingdom was not of this world : I was at home only in the realm of my imagination, and at my ease only with the mighty dead"—G. B. S.

শতাব্দীর আদ্যক্ষর যে শ সে কেবল 'একশত' এই কথার সংক্ষিপ্তকরণ নয় ; বর্তমান শতাব্দীর যিনি অধীশ্বর তিনিও নিঃশব্দে উপস্থিত ওই একটি শব্দের মধ্যেই : জর্জ বার্নার্ড শ।

এই শতাব্দীর অধীশ্বর দুজন। প্রাচ্যের—রবীন্দ্রনাথ ; প্রতীচ্যের—বার্নার্ড শ। না। রবীন্দ্রনাথ কেবল প্রাচ্যের নন, প্রতীচ্যেরও। রবীন্দ্রনাথ কেবল শতাব্দীর নন, কালেরও অধীশ্বর। তিনি নিরবধি কালের এবং বিপুলা পৃথ্বীর—কারণ তিনি কবি। বার্নার্ড শ জীবনরঙ্গমঞ্চের শেষ বিদূষক ; এই বিশ্বের অশেষ বিস্ময়। ভোলতেয়ারে যে বিপুল বিচিত্র বলশালী বিস্ময়ের সূচনা ; শ'য়ের চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেই অশেষ বিস্ময়ের অনির্বাণ শিখার অবশেষ লুপ্তপ্রায়। একথা ঠিক যে ভোলতেয়ারের সঙ্গে শ'য়ের নাম যুক্ত হলেও ভোলতেয়ার প্রথম শ্রেণীর 'উইট', শ দ্বিতীয় শ্রেণীর। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীতে 'বিলং' করা সত্ত্বেও শ এক জায়গায় বিশ্বের সমস্ত প্রথম শ্রেণীর বিদূষকের তুলনায়, ভোলতেয়ারের সঙ্গে অসম তুলনাতেও অদ্বিতীয় ; সেই অবধারিত ক্ষেত্র হচ্ছে মানুষের প্রতি তুলনাবিহীন বিশ্বাসের কুরুক্ষেত্র। সেক্সপীয়রের নাটক যখন সেক্সপীয়রের জীবনদর্শন আওড়ায় : Out, out, brief candle, শ তখন গর্জন করে ওঠেন : Life is no brief candle for me. It is a sort of splendid torch, which I have got hold of for the moment : and I want to make it burn as brightly as possible before handing it on to future generations."

সেক্সপীয়রের সঙ্গে নয়, দ্বিতীয় শ্রেণীর সৃষ্টিধর্মী নাট্যকারদের তুলনাতেও শ'য়ের নাট্যকার হিসেবে স্বীকৃত হবে না কোনও দাবি। ভবিষ্যৎকালের কথা বলছি না ; এখনই শ প্রায় বিস্মৃত। উইট অথবা ইনটেলেকচুয়াল হিসেবেও শ'য়ের প্রতিষ্ঠা অস্থায়ী। কেবল একা তাঁর নয়, ওয়েলস্, ওয়েন সমেত যাঁরা fallen among fabians তাঁরা আজ হয় জীবিতাবস্থায় নয় মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ধরা পড়ে গেছেন ; ধরা পড়ে গেছেন যে তাঁরা সবাই অল্প জলের সফরী ; তাঁরা কেউ জায়াণ্ট তো ননই, উপরন্তু সেক্সপীয়র, তলস্তয়, দস্তয়েভস্কি, গেটে, রবীন্দ্রনাথ, এমন কি ডারুইন, কার্ল মার্কস, হ্যাভলক এলিস, সিগমুণ্ড ফ্রয়েডদের তুলনাতে পিগমিও নন। প্রথম মহাযুদ্ধ চলাকালীন আর্নল্ড বেনেটের দিনপঞ্জীতে সেই কথাই পড়ি তাই :

"Soon after Shaw and the Wellses came Hardy seemed to curl up....The spectacle of Wells and G. B. S. talking firmly and strongly about the war, in their comparative youth, in front of this aged, fatigued and silent man—incomparably their superior as a creative artist—was very striking." [The Journals of Arnold Bennett : July 1917]

টমাস হার্ডিকেই বেনেট 'incomparably superior as a creative artist' বলেছেন শ আর ওয়েলসের থেকে ; আরও বড়দের নাম না হয় নাই করলাম।

Creative artist না হয় ফেবিয়ানরা নাই হলেন। কিন্তু এঁদের রচনায় এবং উক্তিতে এমন একটি শব্দও পাওয়া শক্ত যা আগামীকাল অনেক দূরের কথা, একাল পর্যন্ত এসে পৌঁছেচে। এর কারণ এঁরা যে পরিমাণ গর্জেছেন সে পরিমাণে বর্ষণ এত নগণ্য যে শ এবং ওয়েলস অথবা ফেবিয়ানদের আর কেউ কখনও ছিলেন বললেও, তাঁরা কে ও কী, জানতে চাইবে আগামী কয়েক বছর বাদের কাল ; এখনই তাঁরা 'had been'।

তা হলে শ কেন শতাব্দীর অধীশ্বর ? নাট্যকার অথবা মনীষী বলে নন নিশ্চয়ই। শ'য়ের সৃষ্ট কোনও চরিত্রের নাম পর্যন্ত লোকে মনে রাখে নি ; না সাধারণ, না অসাধারণ কেউই। মনে রাখে নি, কারণ তারা

জীবন্ত চরিত্র নয় কেউ। ডক্টর জনসনের উইট সম্পর্কে বইয়ের পর বই লেখা চলে; শ'য়ের উইট খুব বেশী হলে রীডার্স ডাইজেস্টের পাদপূরক হিসেবে চলে। শ তবুও এ শতাব্দীর অদ্বিতীয় নাম; সে নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হবার যোগ্য নাটকের, উইটের অথবা মনীষার কারণে নয়; মানুষ হিসেবে শ'য়ের মহত্ত্বই এর একমাত্র কারণ।

শ'য়ের নাট্যজীবনের নয়, জীবননাট্যের মূল্য অপরিসীম।

অসত্যের, অর্ধসত্যের বিরুদ্ধে মনুষ্যত্বের সংগ্রামে রক্তাক্ত বার্নাড শ-ই এ শতাব্দীর এবং আগামী বহু শতাব্দীর প্রণম্য। ভবানী মুখোপাধ্যায় তাঁর জর্জ বার্নাড শ নামক বাংলা গ্রন্থে শ'য়ের নাট্যজীবনের বিশ্লেষণের চেয়ে, জীবননাট্যের ব্যাখ্যায় অনেক বেশী সময়, নিষ্ঠা এবং পৃষ্ঠা ব্যয় করেছেন বলেই এ বই আজ পর্যন্ত শ'য়ের ওপর যত ভাষায় যত বই বেরিয়েছে তাদের সকলের চেয়েই এ কারণে অনেক বেশী উল্লেখযোগ্য।

আমি জানি যে এদেশের সাময়িক-পত্রের সমালোচনার নামে দলীয় লোক হলে তার স্তুতি এবং বৈরী হলে ব্যক্তিগত আক্রোশ প্রদর্শনের পৃষ্ঠায় ভবানীবাবুর এই বইয়ের প্রধান ত্রুটি বলে যেটি পরিগণিত হবে, সেটিই আমার দৃষ্টিকোণ থেকে এ বইয়ের সবচেয়ে বড় গুণ—শ'য়ের নাট্যজীবনের চেয়ে জীবননাট্যের উপস্থিতি। আমার এই বক্তব্য পেশ করে অতঃপর প্রবৃত্ত হই এই নাতিবৃহৎ কিন্তু সুমহান বাংলা জীবনীগ্রন্থের আলোচনায়।

দুই

শ'য়ের সমস্ত নাটকের চেয়ে শ নিজে অনেক বেশী নাটকীয় চরিত্র [সব মহৎ এবং মন্দ মানুষই অল্পবিস্তর অতিনাটকীয়]। সেই দুর্দান্ত ড্রামাটিক জীবনকে বঙ্গভাষায় উপস্থিত করতে গিয়ে ভবানীবাবু কদাচ মেলোড্রামাটিক হয়েছেন, এর জন্যে যথেষ্ট সাধুবাদেও তাঁর প্রাপ্য পূরণ হয় না। তিনি সংযত সংহত ভাষায় একটি জীবনসঙ্গত আলেখ্য তুলে ধরেছেন—এদেশের জীবনীগ্রন্থের ইতিহাসে যার অনুরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অতি বিরল। বঙ্গভাষায় উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে, অন্ধভক্তির আতিশয্যে, সর্বোপরি অলীক অবাস্তব এবং অবিশ্বাস্যের অনিবার্য পৌনঃপুনিকতায় জীবনের এতটুকু গন্ধ পর্যন্ত সেই জীবনী থেকে সম্পূর্ণ উবে যায়; প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম ছত্র থেকেই ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় অমূল্য জীবনের মূল্যবান উপাদানসমূহ। ভবানী মুখোপাধ্যায়ের জর্জ বার্নাড শ, বাংলা জীবনচরিতের সেই চরিতামৃত-ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত অসতর্ক সজাগ থাকার ফলে, সত্যের অমৃত পরিবেশনে প্রথম সমর্থ সাবালকপাঠ্য বাংলা জীবনী। এ হচ্ছে এ বইয়ের এক গুণ; তার আর এক গুণ আরও পজিটিভ, আরও সুনির্দিষ্ট—তা হচ্ছে বঙ্গভাষায় যখনই যিনি উচ্ছ্বাসবর্জিত যথাযথ জীবনী রচনা করতে এগিয়েছেন তখন তিনি নীরস তথ্যের, শুষ্ক সন-তারিখের, বিশুষ্ক সংখ্যাতত্ত্বের এমন সমাবেশ ঘটিয়েছেন যাতে চরম কৌতূহলোদ্দীপক জীবনীও হয়ে দাঁড়িয়েছে অচিন্তনীয়রূপে অপাঠ্য। ভবানী মুখোপাধ্যায়ের জর্জ বার্নাড শ অতিকথনের অতিনাটকীয়তার মুদ্রাদোষ থেকে যেমন, তেমনই প্রসাদগুণবঞ্চিত ভাষার অজীর্ণতার 'অ-সুখ'পাঠ্যতার কবল থেকেও সম্পূর্ণ মুক্ত একটি তথ্যের সঙ্গে উপস্থাপনের, তত্ত্বের সঙ্গে নির্বাচনের, সন-তারিখের সঙ্গে কালোত্তীর্ণ সত্যের সার্থক রাখীবন্ধনের অতি উজ্জ্বল উদাহরণ।

সব দেশে সব কালেই সাহিত্যে-শিল্পে কেউ তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়; যেমন কেউ কেউ প্রাপ্যের চেয়ে বেশী পায়। আমাদের দেশেও তার ব্যতিক্রম হবে কেন? বঙ্গভাষার পাঠকপাঠিকাদের কাছে ভবানী মুখোপাধ্যায়ের যা প্রাপ্য তার তুলনায় অনেক কম পেয়েছেন তিনি। প্রধানতঃ তাঁর পরিচয় অনুবাদক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার ফলেই এই প্রাপ্তিযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন তিনি। হয়েছেন এতকাল; এখন তাঁর নতুন করে দিগ্বিজয় আরম্ভ হবে যে-গ্রন্থ উপলক্ষ করে সে বইয়ের নামই: জর্জ বার্নাড শ। এই গ্রন্থে যে ভবানী মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে সে ভবানী মুখোপাধ্যায়ের ইংরেজী ভাষার শ্রেষ্ঠ বঙ্গানুবাদকের পরিচয়ই একমাত্র পরিচয় নয়। একটি মহৎ জীবনের জীবন্ত অনুবাদ করেছেন তিনি এই গ্রন্থে। এ গ্রন্থ বঙ্গভাষায় যাঁরা জীবনচরিত রচনায় হাত দিতে চান, কেমন করে আদর্শ জীবনী লিখতে হয়, সে সম্পর্কে তাঁদের বর্ণপরিচয় করাবার যোগ্যতার অধিকারী।

ভবানী মুখোপাধ্যায় বহু ভাল ইংরেজি বইয়ের আরও ভাল অনুবাদ করেছেন বাংলায়; বাংলা ভাষায় রচিত ভবানী মুখোপাধ্যায় বিরচিত জর্জ বার্নাড শ—ইংরেজি এবং অন্য ভাষায় অনূদিত হবার দাবি রাখে।

দীপেন্দ্রকুমার সান্যাল

---

*জর্জ বার্নাড শ: ভবানী মুখোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা-১২। আট টাকা পঞ্চাশ ন. প.।

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন: ৫৫-২৮৩৩

৩২শ বর্ষ,
১১শ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৬৭
পূজা সংখ্যা
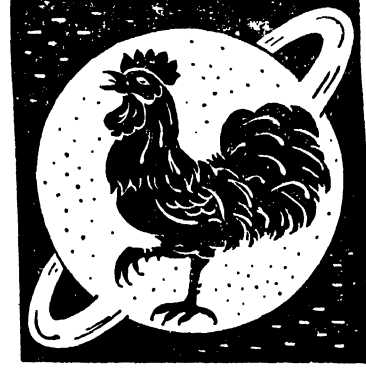
গ্রন্থাকারে পরিত্যক্ত রবীন্দ্রনাথের হাস্য ও ব্যঙ্গ কৌতুক

শ্রীসজনীকান্ত দাস

১২৯১ বঙ্গাব্দ বাংলা সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসে ও রবীন্দ্রনাথের জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ওই বৎসরের ৮ই বৈশাখ কাদম্বরী দেবীর আকস্মিক মৃত্যুতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভারতী'র সম্পাদকত্ব পরিত্যাগ করেন এবং স্বর্ণকুমারী দেবী উহার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুশোকে সাময়িকভাবে উদাসীন ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়েন। এই কালে কয়েকটি ধর্মমূলক সাময়িক পত্রের প্রকাশে বাংলা সাময়িক সাহিত্য নীতিশাস্ত্র-ধর্ম-সংক্রান্ত কলহ-বাদানুবাদে মুখর হইয়া উঠে। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর 'বঙ্গবাসী' সাপ্তাহিক (১ম প্রকাশ ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৮৮) এবং কৃষ্ণকুমার মিত্র ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি নব্যব্রাহ্মগণ পরিচালিত 'সঞ্জীবনী' সাপ্তাহিকে (প্রথম প্রকাশ ৩ বৈশাখ ১২৯০) তো খিটিমিটি লাগিয়াই ছিল। ১২৯১ সালের বৈশাখে মাসিক 'ব্রাহ্মজীবন', শ্রাবণে বঙ্কিমের পৃষ্ঠপোষকতায় অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় মাসিক 'নবজীবন' এবং বঙ্কিম-জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত মাসিক 'প্রচার', ভাদ্রে ব্রাহ্ম বিপিনচন্দ্র পালের সহায়তায় গগনচন্দ্র হোম সম্পাদিত মাসিক 'আলোচনা' এবং আশ্বিনে শান্তিপুর হইতে শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত (হিন্দুধর্ম প্রসারকল্পে) মাসিক 'আর্য্যবন্ধু' বাহির হইল। 'নবজীবন' ও 'প্রচারে'র প্রথম সংখ্যাতে যথাক্রমে "ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা" ও "হিন্দুধর্ম্ম" প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র প্রিয়বন্ধু আদিব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রধান দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে "দুঃখিত" করিলেন। ১২৯১ ভাদ্র সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করিলেন। শ্রাবণ মাস হইতেই 'নবজীবন' 'সঞ্জীবনী' ও 'বঙ্গবাসী'তে কলহ শুরু হইয়াছিল। 'সঞ্জীবনী'তে "র" আদ্যাক্ষরযুক্ত লেখকও এই কলহে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'রবীন্দ্রজীবনী'কার প্রভাতকুমার লিখিয়াছেন: "আদিব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই আগ্রহ দেখিয়া মহর্ষি বোধ হয় মনে মনে খুশি হইলেন; মৃতকল্প আদিসমাজের মধ্যে পুনরায় প্রাণসঞ্চার করা যায় ভাবিয়া তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথকে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক ও রবীন্দ্রনাথকে আদিব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকপদে নির্বাচিত করাইলেন (১২৯১ আশ্বিন)। যুবক রবীন্দ্রনাথ সম্পাদকপদে অধিরূঢ় হইয়া নিজ কর্তব্য অত্যন্ত আগ্রহ ও নিষ্ঠার সহিত সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন......" ['রবীন্দ্রজীবনী' ১ম খণ্ড ২য় সং, পৃ. ১৫৭]

শোকবিমূঢ় নিষ্ক্রিয় রবীন্দ্রনাথ হাতে কাজ পাইয়া অত্যন্ত উৎসাহী ও উগ্র ভাবাপন্ন হইয়া নব্যহিন্দুদের সহিত

ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। কবি ও লেখকের পক্ষে যুদ্ধ মানেই মসীযুদ্ধ। 'সঞ্জীবনী'তে প্রথম প্রকাশিত ১ম সংস্করণ 'কড়ি ও কোমলে'র "পত্র। শ্রীমান দামু বসু এবং চামু বসু সম্পাদক সমীপেষু" (১২৯১ ?) হইতে আরম্ভ করিয়া ১২৯৯ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে লেখা 'সোনার তরী'র "হিং টিং ছট" পর্যন্ত বহু কবিতা একদিকে যেমন এই মসীযুদ্ধের ফল, অন্যদিকে তেমনি 'ব্যঙ্গকৌতুকে'র গোড়ার দুইটি রচনা "রসিকতার ফলাফল" (১২৯২ বৈশাখ 'ভারতী') এবং "ডেঞ্জে পিঁপড়ের মন্তব্য" (১২৯২ বৈশাখ 'বালক') এবং সমগ্র 'হাস্য-কৌতুক' বইখানিও (জ্যৈষ্ঠ ১২৯২ হইতে ভাদ্র ১২৯৪-এর মধ্যে রচিত) সেই কলমের লড়াইয়ের ফসল। "দামু-চামু" সংক্রান্ত ২১ স্তবকের কবিতাটি রবীন্দ্র-সাহিত্য হইতে একেবারে বিলুপ্ত করা হইয়াছে। প্রভাতকুমার 'রবীন্দ্রজীবনী'তে (১ম খণ্ড ২য় সং পৃ. ১৭২) শেষের ১৫ (৭-২১) স্তবকের ৩টি স্তবক পরিত্যাগ করিয়া ১২টি স্তবক পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন। আমি এখানে কবিতাটির প্রথম ৬ স্তবক এবং প্রভাতকুমার-পরিত্যক্ত ১৩, ১৭ ও ১৮ স্তবক মোট ৯টি স্তবক পুনর্মুদ্রিত করিয়া এই যুগের পাঠকদের সম্পূর্ণ কবিতাটি দেখিবার সুযোগ করিয়া দিলাম :

১। দামু বোস্ আর চামু বোসে
কাগজ বেনিয়েছে,
বিদ্যেখানা বড্ড ফেনিয়েছে !
(আমার দামু আমার চামু !)

২। কোথায় গেল বাবা তোমার
মা জননী কই !
সাত রাজার ধন মাণিক ছেলের
মুখে ফুট্‌চে খই !
(আমার দামু আমার চামু !)

৩। দামু ছিল এক-রত্তি
চামু তথৈবচ,
কোথা থেকে এল শিখে
এই খচমচ !
(আমার দামু আমার চামু !)

৪। দামু বলেন "দাদা আমার"
চামু বলেন "ভাই,"
"আমাদের দোঁহাকার মত
ত্রিভুবনে নাই !"
(আমার দামু আমার চামু !)

৫। গায়ে পড়ে গাল পাড়চে
বাজার সরগরম,
মেছুনি-সংহিতার ব্যাখ্যা
হিঁদুর ধরম !
(দামু আমার চামু !)

৬। দামুচন্দ্র অতি হিঁদু
আরো হিঁদু চামু
সঙ্গে সঙ্গে গজায় হিঁদু
রামু বামু শামু—
(দামু আমার চামু !)

১৩। মনু বলেন "ম'নু আমি"
বেদের হল ভেদ,
দামু চামু শাস্ত্র ছাড়ে,
রৈল মনে খেদ !
(ওরে দামু ওরে চামু !)

১৭। আদর পেয়ে নাদুস্ নুদুস্
আহার করচে ক'সে,
তরিবৎটা শিখলেনাক
বাপের শিক্ষাদোষে !
(ওরে দামু চামু !)

১৮। এস বাবু কানটি নিয়ে,
শিখ্‌বে সদাচার,
কানের যদি অভাব থাকে
তবেই নাচার !
(হায় দামু হায় চামু !)

'ভারতী ও বালক' ১২৯৪ আষাঢ়ে প্রকাশিত "হেঁয়ালিনাট্য" [পিতাপুত্র] রবীন্দ্রনাথের রচনা হওয়া সত্ত্বেও 'হাস্য কৌতুকে' স্থান পায় নাই ; ইহাতে আর্যামির বিরুদ্ধে খোঁচা নাই তবে উচ্চশিক্ষিত নব্যবঙ্গের ভাষা

ও নীতিবোধের বিরুদ্ধে কঠিন শ্লেষ আছে। এতখানি ইংরেজী প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথ 'গোড়ায় গলদে'র ললিত চাটুজ্জে ছাড়া আর কাহাকেও দিয়া করান নাই। লেখাটি 'ভারতী ও বালক' হইতে নীচে উদ্ধার করিয়া দিলাম:

হেঁয়ালিনাট্য

বৈকুণ্ঠ, তস্য পুত্র খগেশ এবং অন্যান্য পাঁচজন।

বৈ। আমার ছেলের কি বুদ্ধি! প্রায় আমারই মত। যখন তর্ক করে মুখের কাছে দাঁড়ান যায় না! বাবা খগেশ, অনেক লোক উপস্থিত আছেন, এইখেনে একবার তর্ক কর্ত্তে আরম্ভ কর দেখি!

অন্য পাঁচজন। (মনে মনে) তা হলে পালাতে হয় বুঝি!

খগেশ। আচ্ছা রাজি আছি। এখন কাকে ওড়াতে হবে কাকে রাখ্‌তে হবে বলে দাও!

অন্য পাঁচজন। (মনে মনে) আপনাকে আর বাবাকে রেখে বাকি সকলকে উড়িয়ে দাও!

বৈ। বাবা, যেটা হাতের কাছে পাও সেইটেই ওড়াও। ইহকাল ওড়াও, পরকাল ওড়াও।

খ। তা হলে রোস বাবা, আগে dinnerটা খেয়ে নেওয়া যাক্, তার পরে খেয়ে দেয়ে বেশ ঠাণ্ডা হয়ে রয়ে-বসে চুরট টান্‌তে টান্‌তে চুরটের ধোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আরামে উড়িয়ে দেব, যারা যারা উপস্থিত থাকবে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যাবে।

বৈ। That's right খগেশ! আপনারা সকলেই দেখ্‌চেন, আমার খগেশ কেমন sensible। ওর মাথায় কোন রকম nonsense নেই। যেটা real এবং immediate want তার প্রতি ওর প্রথম নজর—তার পরে সেটা satisfied হলে পরে কাগজের চুরটের মত জগতের ডগায় তর্কের দেশলাই ধরিয়ে ওটাকে quietly বসে বসে ধোঁয়া করেই ওড়াও বা ছাই করেই ফেল তাতে আরাম বই কারো কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই।

খ। হাঃ হাঃ হাঃ, বাবা has put the matter very well indeed. আমি দেখেছি বাবা যেমন clearly and with great precision একটা proposition lay down কর্ত্তে পারেন, এমন there are very few men who—

বৈ। সে আর তোমার বলবার দরকার নেই। I know that. আর কিছু না, এর secret হচ্ছে clear head এবং proper training। আমাদের দেশের লোকের ঐ দুটো জিনিষেরই বিশেষ অভাব and in consequence none of them has the least idea how to think out a subject.

খ। And I must confess তুমি আমার বাবা হওয়াতে আমার ঐ এক মস্ত advantage হয়েছে, certainly I possess a clear head, আর তার জন্যে আমি তোমার কাছে really grateful আছি বাবা।

অন্য পাঁচজন। বাপ-বেটার কি বিনয়।

খ। Nonsense! বিনয়! আচ্ছা এস এই বিষয়ে একটা settle করা যাক! I don't believe in বিনয়। It must be either hypocrisy or ignorance, যারা really clever they know they are clever and why should they not make it known to other people! Now come বিনয় কাকে বলে, let us have a definition of it.

অন্য পাঁচজন। (মাথা চাপ্‌ড়াইয়া) Clear head নেই। খগেশ বাবু, তোমার বাবার মত বাবা আমাদের ছিল না। বিনয়ের definition আমাদের ঠাহর হচ্চে না!

বৈকুণ্ঠ। ওহে ও যজ্ঞেশ্বর, শুনে যাও শুনে যাও, আমার ছেলে খগেশ এদিকে তর্ক কর্ত্তে আরম্ভ করেছে—It's a treat to hear him argue। (খগেশের পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া) Go on খগেশ।

যজ্ঞে। আজ আমাদের ওখেনে খেতে গেলে না যে!

খগেশ। (হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া) Now come কেন খেতে যাব!

যজ্ঞে। কথা ছিল যে।

খ। কি কথা ছিল ভাল করে analyze করে দেখা

যাক্। তুমি আমাকে বল্লে খগি কাল আমাদের বাড়ি খেতে যাবে কি? আমি বল্লুম "হাঁ" ভেবে দেখ it was no promise। তুমি simply একটি fact জান্‌তে চেয়েছিলে এবং তখন যেটা likely answer বোধ হল সেইটে তোমাকে বল্লুম। মনে কর if you had asked me খগি, কাল তুমি কি কালো মোজা পরবে, and if I happened to have answered হাঁ, এবং আজ যদি আমি কালো মোজা না পরতুম, what then! কিন্তু তুমি যদি বল্‌তে—

যজ্ঞে। বুঝেছি খগেশ, আর কাজ নেই।

খ। কাজ আছে। তুমি না কি হঠাৎ এসে একটা wrong statement করে সকলের মনে একটা vague impression create করে দিয়েছ যে আমি আমার promise রাখিনে তারি absurdity আমি প্রমাণ করে দিতে চাই! Now to the point—তুমি আমাকে next question জিজ্ঞাসা করলে "কখন্ আস্‌বে?" আমি বল্লুম "তা বল্‌তে পারিনে আমি ঘড়ি ধ'রে কাজ করিনে।" তুমি একটা further question জিজ্ঞাসা করলে আমি তার এক indefinite উত্তর দিলুম—and the last question was "তুমি কি খাবে? মাংস না ডাল ভাত?" আমি বল্লুম "যা পাব তাই খাব।" There it ended, এর থেকে কি কি প্রমাণ হচ্চে দেখা যাক্—

যজ্ঞে। রক্ষে কর বাপু আমার বাড়িতে যে তোমার পা পড়েনি সে আমার পরম সৌভাগ্য বল্‌তে হবে।

অন্য পাঁচ জন। পা পড়েনি বলচেন কি, মাথা পড়েনি বলুন—আপনার নেমন্তন্নের মধ্যে যদি ওঁর clear headটা হঠাৎ গিয়ে পড়ত সে ত কামানের গোলা পড়ত, আপনার বন্ধুবান্ধবেরা সশঙ্কিত হয়ে উঠত। Clear head অতি ভয়ানক জিনিষ! বিশেষ, সভাস্থলে।

যজ্ঞে। তা ঠিক বলেছেন।

বৈ। (পিঠ থাব্‌ড়াইয়া) তুমি বলে যাও না খগেশ। থাম্‌লে কেন। বেশ বল্‌ছিলে।

খ। যার এক পাতা logic পড়া আছে সে কখনো deny কর্ত্তে পার্ব্বে না যে—

য। তোমার যা বল্‌বার বল আমরা চল্লুম।

বৈ। কেন কেন?

যজ্ঞে। ভদ্র সমাজে নিমন্ত্রণে বা বন্ধুবান্ধবের সভায় ভদ্রলোকেরা গল্প সল্প করে, আমোদ করে, আলোচনা করে, কিন্তু পারতপক্ষে তর্ক করে না। যারা কথায় কথায় তর্ক উঁচিয়ে খেঁকিয়ে আসে, তাদের এক রকম সঙ্কীর্ণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকতে পারে বটে কিন্তু তারা ভদ্র নয়।

বৈ। কিন্তু ideaর precision—

খ। Perceptionএর clearness,

বৈ। Exepressionএর luminous lucidity.

খ। The sense of utter futility of all fog and fallacy—

যজ্ঞে। ও সবই থাক্‌তে পারে কিন্তু তাই বলে তার্কিকতা নামক তীক্ষ্ণ ও নর্ত্তনশীল জিহ্বাগ্রভাগ সগর্ব্বে সকলকে প্রদর্শন করবার জন্যে সর্ব্বদা বের করে উঁচিয়ে রেখে দিতে হবে ভদ্রসমাজে তার কোন আবশ্যক নেই।

খ। "ভদ্রসমাজের" definition কি?

বৈ। And what is "তর্ক।"

খ। জিহ্বাই বা কি? Where is the analogy?

বৈ। এবং "আবশ্যক" কাকে বলে?

খ। তোমার idea of "সর্ব্বদা"ই বা কি রকম!

সকলে। আর এক দণ্ড এখানে থাকা নয়।

খ। দেখেছ বাবা, একটা proposition-এর মধ্যে string of inaccuracies!

বৈ। Want of precision and proper training! [সমাপ্ত]

'হাস্য-কৌতুকে'র "একান্নবর্ত্তী" নামক কৌতুকনাট্যটি "হেঁয়ালিনাট্য" শিরোনামায় ১২৯৪ সালের বৈশাখের 'ভারতী ও বালকে' বাহির হয়। ইহার প্রথমাংশ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া পুস্তকে এইরূপ দাঁড়াইয়াছে:

"দৌলত। হৃদয় যখন ভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে তখন কোম্পানির দমকল এলেও থামাতে পারে না। একান্নবর্ত্তী পরিবার সম্বন্ধে সভায় দাঁড়িয়ে অনর্গল বলতে লাগলুম,

সভাপতি ঘুমিয়ে পড়াতে নিষেধ করবার কেউ রইল না। শেষকালে দুজন ছোকরা এসে দুই হাত ধরে আমাকে টেনে বসিয়ে দিলে। সেদিন এত উৎসাহ হয়েছিল।

কানাই। বটে, তা হবার কথাই তো। তা আপান কী বলেছিলেন।

দৌলত। আমি বলেছিলেম স্বার্থত্যাগের উপায় একান্নবর্তী পরিবার। যেখানে পরের অর্থেই জীবন-নির্বাহ হয় সেখানে স্বার্থের কোনো প্রয়োজনই হয় না। খবরের কাগজে আমার বক্তৃতা খুব রটে গেছে—তারা সকলেই বলছে, দুঃখের বিষয় দৌলত বাবুর পরিবার কেউ নেই, তিনি একলা। (দীর্ঘনিশ্বাস)"

মূলে ছিল :

"দৌ। হৃদয় যখন ভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে তখন বক্তৃতা করা কি সহজ? একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা সম্বন্ধে আমি যতই ভাব্‌তে লাগ্‌লুম আমার উৎসাহ ততই প্রবল হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, সভায় দাঁড়িয়ে ততই আমি অনর্গল বল্‌তে লাগ্‌লুম সভাপতি ঘুমিয়ে পড়াতে আমাকে নিষেধ করবার কেউ রইল না। অবশেষে দেখলুম্ শোন্‌বাব লোকও বড় একটা কেউ নেই, সেজের বাতিগুলো শুভ্র অশ্রুধারায় বিগলিতকলেবর হয়ে ক্রমেই অস্তিমের নিকটবর্ত্তী হতে লাগ্‌ল। কিন্তু আমার বাগ্মিতা-শিখা সমান ভাবেই জ্বল্‌তে লাগল; শেষ কালে দুজন ছোক্‌রা এসে জোর করে আমার হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিলে। বাড়িতে ফিরে এসে আমার কালাচাঁদ খানসামাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে জোর করে বসিয়ে বাকি বক্তৃতাটুকু তাকে শুনিয়ে তবে রাত্তিরে একটু ঘুম হয়। সে দিন আমার এত উৎসাহ হয়েছিল।

কানাই। বটে, তা হবারই কথা। তা আপনি কি বলেছিলেন?

দৌ। আমি বলেছিলেম যে দেশে একান্নবর্ত্তী পরিবার নেই সে দেশের লোকেরা সকাল সকাল মারা পড়ে, কারণ ব্যামো হলে তাদের সেবা করবার কেউ থাকে না। অকালমৃত্যু যে কি শোচনীয় ঘটনা তা আমি সকলকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেম। আমি বল্লেম "দেখ ভাই, তোমার যে শিশু সন্তানটি সবেমাত্র বাবা বল্‌তে, হামাগুড়ি দিতে এবং দাড়ি ধ'রে টান্‌তে শিখেছে আজ হঠাৎ যদি ফিরে গিয়ে দেখ সে হাত পা খিঁচিয়ে ধনুষ্টঙ্কার হয়ে মরে প'ড়ে রয়েচে তা হলে তোমার মনে কি রকম ভাবের উদয় হয়?"

যুবক শ্রোতাদের ডেকে বল্লুম "হে যুবক, এখনি যদি তোমার বাড়ি থেকে একটি দূত ঊর্দ্ধশ্বাসে এসে তোমাকে খবর দেয় যে তোমার সুন্দরী যুবতী স্ত্রীর মুখকমল দিয়ে অনবরত রক্ত উঠ্‌চে, তার কমলায়ত লোচন দুটি একেবারে উল্টে গিয়েছে, এবং তার কোকিলবিনিন্দিত কণ্ঠ থেকে ঘড়্‌ঘড়্ শব্দ ছাড়া আর কিছুই শ্রুতিগোচর হচ্চে না, তা হলে তুমি কি কর!" এই যেমন বলা অমনি পাঁচ সাতটা লোক এসে আমার গলা চেপে ধর্‌লে। আমার উন্মত্তকারী বক্তৃতা শুনে তাদের যে কতদূর পর্য্যন্ত আবেগ উপস্থিত হয়েছিল তাদের দৃঢ় মুষ্টির প্রভাবে আমি অত্যন্ত স্পষ্টই বুঝ্‌তে পারলুম। সেখেনে আর অধিক কিছু না বলে বাড়ি ফিরে এসে কালাচাঁদকে ঘুম থেকে জাগিয়েই আমি বল্লুম "হে সভাপতি এবং হে কালাচাঁদ, হঠাৎ যদি এখনি তোমার বাড়ি থেকে চিঠি আসে যে, তোমার যুবক জামাইটি কাল ভোরের বেলায় ওলাউঠো হয়ে হিম হয়ে মরে গেছে এবং তোমার ১২ বৎসরের মেয়েটি বিধবা হয়েচে তা হলে তুমি কি কর!" কালাচাঁদ কেঁদে ভাসিয়ে দিলে—আমিও খানিকক্ষণ আর কথা কইতে পারলুম না। আমার নিজের বক্তৃতা-শক্তির প্রভাবে আমার নিজের কণ্ঠরোধ হয়ে গেল, আমি অনেকক্ষণ মুখ নত করে চুপ করে কেবলিই অশ্রু বিসর্জ্জন করতে লাগ্‌লুম। কালাচাঁদ তার পর দিনই আমার কাজ ছেড়ে দিয়ে দেশে চলে গিয়েচে। একান্নবর্ত্তী পরিবার না থাকা এতই শোকাবহ, এতই মর্ম্ম-বিদারণকারী, এতে হৃদয় এতই ভীত, শুম্ভিত, চকিত এবং বিস্ফারিত এবং বিদ্রাবিত হয়। কানাই কি বল?

কা। আজ্ঞে তা হয় বটে। আমার এখনিই হচ্চে।

দৌলত। কেবল তাই নয় কানাই। আমি বলেছিলেম স্বার্থত্যাগ শিক্ষার একমাত্র উপায় একান্নবর্ত্তী

পরিবার। এরূপ পরিবারে পরের অর্থেই অধিকাংশ লোকের জীবন নির্ব্বাহ হয়, স্বার্থের কোন সম্ভাবনা বা আবশ্যক থাকে না। চতুর্দ্দিকের খবরের কাগজে আমার বক্তৃতা অত্যন্ত রাষ্ট্র হয়ে গেছে—তারা সকলেই বলেচে দুঃখের বিষয় দৌলত বাবুর পরিবার কেউ নেই তিনি একলা! (দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ)

কা। আহা, এমন মহৎ ব্যক্তিরও এমন দশা হয়!"

১২৯২ হইতে ১২৯৪ সালের মধ্যে এই 'হাস্য-কৌতুকে'র দ্বন্দ্ব পরিসমাপ্ত হয়। ধর্মনিরপেক্ষ খাঁটি সাহিত্যিক 'ব্যঙ্গকৌতুকে'র সূত্রপাত ১২৯৮ সালে—'ভারতী ও বালক' এবং সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায়। প্রাচীন প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক হাস্যকর সাহিত্যিক গবেষণা, ১২৮২ সালে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে'র প্রকাশে বাংলাসাহিত্যে ন্যাকামি ও হা-হুতাশের বন্যা এবং 'হিতবাদী'র কর্তৃপক্ষের সহিত তাঁহার ছোটগল্পের বিষয়বস্তু লইয়া মনান্তর রবীন্দ্রনাথকে এইকালে যথেষ্ট পীড়িত ও উত্তেজিত করিয়াছিল। তাহার ফলেই আমরা 'ব্যঙ্গ-কৌতুকে'র "প্রত্নতত্ত্ব", "লেখার নমুনা", "সারবান সাহিত্য" ইত্যাদি রচনা পাইয়াছি। "মীমাংসা" শীর্ষক রচনায় প্রেম-পাগলদের প্রতি যে কশাঘাত আছে ১২৯৯ সালের আশ্বিন সংখ্যা "ভারতী ও বালকে" প্রকাশিত "নিষ্ফল চেষ্টা" ও "সফলতার দৃষ্টান্ত" রচনা দুইটিতে বিদ্রূপ তদপেক্ষা বড় কম নাই। রচনা দুইটি "মীমাংসা" অপেক্ষা নিকৃষ্ট তো নহেই, আমাদের বিবেচনায় উৎকৃষ্ট। কিন্তু 'ব্যঙ্গকৌতুক' পুস্তকাকারে বাহির করিবার সময় এই দুইটি রচনা যে কেন বাদ পড়িয়াছে জানি না। সম্ভবতঃ অনবধানতাবশতঃ এইরূপ হইয়া থাকিবে। পরবর্তী সংস্করণ 'ব্যঙ্গকৌতুকে' এই দুইটির স্থান করিয়া দিবার অনুরোধ-(শ্রীপুলিনবিহারী সেনের দরবারে)সহ এখানে আটষট্টি বৎসর পরে সেগুলির পুনর্মুদ্রণ করিলাম। যুগের পরিবর্তন ঘটিয়াছে সত্য। কিন্তু হতাশ আদেখ্‌লা প্রেমিকেরা তেমনি আছে। কাজেই প্রায় ত্রিপাদ শতাব্দীকাল পরে এযুগের পাঠকও যে কৌতুকবোধ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

নিষ্ফল চেষ্টা

অনেকগুলি বাঙ্গলা পদ্য, বিশেষতঃ গদ্যপ্রবন্ধ পড়িয়া আমার সর্ব্বদাই কি-যেন কে-যেন কখন-যেন-কেমন-যেন-কি-যেন-কি-ময় হইয়া যাইতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু কোনরূপ সুযোগ পাইয়া উঠি না।

আপিসের ছুটি হইলে পদব্রজে পথে বাহির হই; মনে করি, একেবারে উদাস হইয়া কি-যেন হইয়া যাইব; কিন্তু দেখিয়াছি ঠিক নিয়মিত সময়ে বাড়িতে পৌঁছিয়া হাত মুখ ধুইয়া জলযোগ করিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে তামাক টানিতে বসি—মনের কোন যায়গায় কোন রূপ বিহ্বলতা অনুভব করি না।

বাড়ির গলির মোড়ে একটা প্রৌঢ়া পানওয়ালী বসিয়া থাকে সকালেও দেখিতে পাই, বিকালেও দেখিতে পাই, এবং নিমন্ত্রণ খাইয়া অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরিবার সময় স্তিমিত দীপালোকে তাহার ক্লান্ত মুখচ্ছবি দৃষ্টিপথে পড়ে। মনে করা দুঃসাধ্য নয় যে, সে নিশিদিন যেন কাহার জন্য, যেন কিসের জন্য, যেন কোন্ অপরিচিত স্মৃতির জন্য, যেন কোন্ পরিচিত বিস্মৃতির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া প্রত্যেক পথিকের মুখের দিকে চাহিতেছে। কিন্তু সেরূপ কল্পনা করিয়াও কোন ফল হয় না। বিস্তর চেষ্টা করি, তবু কিছুতেই তাহাকে দেখিয়া হৃদয়ের মধ্যে জ্যোৎস্নার সুগন্ধ, বাঁশির আলিঙ্গন, নিস্তব্ধতার সঙ্গীত জাগ্রত হইয়া উঠে না। তাহার স্বহস্তরচিত অনেক পান কিনিয়া খাইয়াছি কিন্তু তাহার মধ্যে চূণ খয়ের এবং গুটিদুয়েক খণ্ড সুপারি ছাড়া একদিনের জন্যও বাসনা, স্মৃতি, আশা অথবা স্বপ্নের লেশমাত্রও পাই নাই।

যে দিন চাঁদ উঠে সে দিন মনে করি, চাঁদের দিকে তাকাইয়া থাকা যাক্, দেখি তাহাতে কিরূপ ফল হয়। বেশিক্ষণ একভাবে থাকিতে পারি না। অনতিবিলম্বে ঘুম আসে।

বাতায়নে গিয়া বসি। রান্নাঘর হইতে ধোঁয়া আসে, আস্তাবল হইতে গন্ধ পাই এবং প্রতিবেশিনীগণ অসাধু-ভাষায় পরস্পরসম্বন্ধে স্ব স্ব মনোভাব উচ্ছ্বসিতস্বরে ব্যক্ত করিতে থাকে। নিদ্রিত অথবা জাগ্রত কোন প্রকার স্বপ্নই টিঁকিতে পারে না।

সেখান হইতে উঠিয়া একাকী ছাতে গিয়া বসি। আপিসের ময়রা, ইন্সিওরেন্সের টাকা, ধোবার কাপড় দিতে বিলম্ব, প্রভৃতি বিচিত্র বিষয় অসংলগ্নভাবে মনে উদয় হইতে থাকে, কিন্তু কিছুতেই কোন বিস্মৃত মুখচ্ছবি, কোন পূর্ব্বজন্মের সুখস্বপ্ন মনে পড়ে না।

দেখিয়াছি আমার বন্ধুরা প্রায় সকলেই নীরব কবি। সকলেরই প্রায় হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেছে, অশ্রুজল শুকাইয়া গেছে, আশা ফুরাইয়া গেছে, কেবল স্মৃতি আছে এবং স্বপ্ন আছে। সুতরাং তাঁহাদের কাছে আমার মনের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করিতে লজ্জা হয়।

হৃদয় আছে অথচ প্রাণপণ চেষ্টাতেও হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে না এ কথা আমি কেমন করিয়া স্বীকার করি!

আমি বেশ আছি, আরামে আছি, নিয়মিত বেতন পাইলে আমার কোনরূপ কষ্ট হয় না এ কথা একবার যদি প্রকাশ হইয়া পড়ে তবে বন্ধুসমাজে আমার আর কিছুমাত্র প্রতিপত্তি থাকিবে না।

সেই ভয়ে নীরব হইয়া থাকি। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলি নীরব চিন্তা সর্ব্বাপেক্ষা গভীর চিন্তা, নীরব বেদনা সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র বেদনা, এবং নীরব কবিতা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবিতা। চোখে যে সহজে অশ্রুজল পড়ে না ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থ্ আমার হইয়া তাহার জবাব দিয়া গেছেন।

আসল কথা, আমার বন্ধুবান্ধবদের সকলেরই একটি করিয়া "কে-যেন" "কি-যেন" আছে, অথবা ছিল অথবা ভবিষ্যতে থাকিবার সম্ভাবনা আছে; আমার আর সমস্ত আছে কেবল সেইটা নাই।

আমি কি করিব? কি করিলে আমার বুক ফাটিবে, সুখ থাকিবে না, আশা ফুরাইবে। হাসিব কিন্তু সে কেবল লোক-দেখানে; আমোদ করিতে ছাড়িব না কিন্তু সে কেবল অদৃষ্টকে সবলে উপেক্ষা করিবার জন্য। আপিসে যাইব, কিন্তু সে কেবল কাজের মধ্যে আপনাকে নিমগ্ন করিবার অভিপ্রায়ে।

এক কথায়—কি করিলে একটি "কে-যেন" একটি "কি-যেন" পাওয়া যায়!—

সফলতার দৃষ্টান্ত

হরি হরি! আমার কি হইল! মরি মরি, আমাকে এমন করিয়া পাগল কে করিতেছে!

তবে সমস্ত ইতিহাসটি খুলিয়া বলি!

কিছু দিন হইতে প্রত্যহ সকালে আমার ডেস্কের উপর একটি করিয়া ফুলের তোড়া কে রাখিয়া যায়?

হায়! কে বলিবে কে রাখিয়া যায়! তোমরা জান কি, কাহার কোমল চম্পক অঙ্গুলি এই চাঁপা গুলি চয়ন করিয়াছিল? বলিতে পার কি, এই গোলাপে কাহার লজ্জা, এই বেলফুলে কাহার হাসি, এই দোপাটি ফুলে কাহার দুটি বিন্দু অশ্রুজল এখনো লাগিয়া আছে? তোমরা সংসারের লোক, তোমরা বুঝিতে পারিবে কি সে হৃদয়ে কত ভালবাসা, হরি হরি কত প্রেম!

রোজ মনে করি আজ দেখিব—এই নীরব হৃদয়ের প্রেমের উচ্ছ্বাস আমার ডেস্কের উপর কে রাখিয়া যায় আজ তাহাকে ধরিব, আমার অন্তরে অন্তরে যে ব্যথা হাহাকার করিতেছে আজ তাহাকে বলিব—এবং মরিব।

কিন্তু ধরি ধরি ধরা হয় না, বলি বলি বলা হয় না, মরি মরি মরিতে পাইলাম না!

কেমন করিয়া ধরিব! যে গোপনে আসে গোপনে চলিয়া যায় তাহাকে কেমন করিয়া বাঁধিব! যে অদৃশ্যে থাকিয়া পূজা করে, যে নির্জ্জনে গিয়া অশ্রুবর্ষণ করে, যে দেখা দেয় না, দেখিতে আসে, ওরে পাষাণ হৃদয়, তাহার গোপন প্রেমব্রত ভঙ্গ করিবি কেমন করিয়া?

কিন্তু থাকিতে পারিলাম কই—অশান্ত হৃদয় বারণ মানিল কই—একদিন প্রত্যুষে উঠিলাম।

দেখিলাম আমার বাগানের মালী তোড়া হাতে করিয়া লইয়া আসিতেছে।

কৌতূহল সম্বরণ করিতে পারিলাম না। কম্পিত হৃদয়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ওরে জগা, তুই এ তোড়া কোথায় পাইলি রে!"

সে তৎক্ষণাৎ কহিল "বাগান হইতে তৈয়ার করিয়া আনিলাম!"

আমি কাতর কণ্ঠে কহিলাম, "প্রবঞ্চনা করিস্‌না রে জগা, সত্য করিয়া বল্‌—এ তোড়া তোকে কে দিল !"

সে কহিল "প্রভু এ আমি নিজে বানাইয়াছি !"

আমি পুনশ্চ ব্যাকুল অনুনয়ের সহিত কহিলাম—"আমার মাথা খাইস্‌ জগা, আমার কাছে কিছু গোপন করিস্‌ না, যে এ তোড়া তোকে দিয়াছে তাহার নামটি আমাকে বল্‌।"

মালাকর অনেকক্ষণ অবাকভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—প্রভুর আজ্ঞা পালন করিবে, না রমণীর বিশ্বাস রক্ষা করিবে, বোধ করি এই দুই কর্ত্তব্যের মধ্যে তাহার চিত্ত দোদুল্যমান হইতেছিল। অবশেষে করজোড়ে একান্ত কাতরতা সহকারে সে উৎকল-উচ্চারণ-মিশ্রিত গ্রাম্য ভাষায় কহিল—"প্রভো, এ কুসুমগুচ্ছ আমারি স্বহস্তের রচনা।"

বুঝিলাম সে কিছুতেই সেই অজ্ঞাতনাম্নীর নাম প্রকাশ করিবে না।

আমি যেন চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইলাম, আমার সেই অপরিচিত অনামিকা—আমার সেই জন্মান্তরের বিস্মৃতনামা প্রিয়তমা তোড়াটি প্রস্তুত করিয়া মালীর হাতে দিতেছেন এবং অশ্রুগদ্গদ কাতরকণ্ঠে কহিতেছেন—"এই তোড়াটি গোপনে তাঁহার ঘরে রাখিয়া আয় জগা, কিন্তু আমার মাথা খাস্‌, আমার মৃতমুখ দর্শন করিস্‌ জগা, আমার নাম তাঁহাকে শুনাইস্‌ না, আমার কথা তাঁহাকে বলিস্‌ না, আমার পরিচয় তাঁহাকে দিস্‌ না, আমার হৃদয়ের বেদনা হৃদয়েই থাকুক, আমার জীবনের কাহিনী জীবনের সহিতই অবসান হইয়া যাক্‌ !"—

জগা ত চলিয়া গেল। কিন্তু আমি আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তোড়াটি হৃদয়ে চাপিয়া ধরিলাম, দুটি একটি কণ্টক বক্ষে বিঁধিল—বুকের রক্তের সহিত ফুলের শিশির এবং ফুলের শিশিরের সঙ্গে আমার চোখের জল মিশিল। হরি হরি, সেই অবধি আমার এ কি হইল। কি যেন আমাকে কি করিল! কে যেন আমাকে কি বলিয়া গেল! কোথায় যেন আমার কাহার সহিত দেখা হইয়াছিল! কখন যেন তাহাকে হারাইয়াছি। কেবল যেন এই তোড়াটি—এই কয়েকটি ক্রোটনের পাতা, এই শ্বেত গোলাপ এবং এই গুটিকতক দোপাটি—আমার কাছে চিরজীবনের মত কি যেন কি হইয়া রহিল এবং এখন হইতে যখনি জগা মালীকে দেখি তাহার মুখে যেন কি যেন কি দেখিতে পাই এবং সেও আমার ভাবগতিক দেখিয়া অবাক হইয়া আমারও মুখে যেন কি যেন কি দেখিতে পায়! জগতের লোকে সকলে জানে যে, আমার জগা মালী আমাকে বাগান হইতে ফুল তুলিয়া তোড়া বাঁধিয়া দেয়, কেবল আমার অন্তর জানে, আমাকে কে যেন গোপনে তোড়া পাঠাইয়া দেয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

'কড়ি ও কোমল' প্রথম সংস্করণের আর একটি পরিত্যক্ত রচনা হইতে সংবাদপত্র ও সংবাদ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিরূপ মনোভাব নিম্নে অংশতঃ উদ্ধৃত ১৪টি পংক্তিতে এইভাবে প্রকাশ পাইয়াছে :

"খবর ব'য়ে বেড়ায় ঘুরে খবরওয়ালা ঝাঁকা-মুটে।
আমি বাপু ভাবের ভক্ত বেড়াইনাকো খবর খুঁটে।
এত ধূলো, এত খবর কল্‌কাতাটার গলিতে!
নাকে চোকে খবর ঢোকে দু-চার কদম চলিতে।
এত খবর সয় না আমার মরি আমি হাঁপোষে।
ঘরে এসেই খবরগুলো মুছে ফেলি পাপোষে।
আমাকে ত জানই বাছা! আমি একজন খেয়ালি।
কথাগুলো যা' বলি, তার অধিকাংশই হেঁয়ালি।
আমার যত খবর আসে ভোরের বেলা পুব দিয়ে।
পেটের কথা তুলি আমি পেটের মধ্যে ডুব দিয়ে।
আকাশ ঘিরে জাল ফেলে তারা ধরাই ব্যবসা।
থাক্‌ গে তোমার পাটের হাটে মথুর কুণ্ডু শিবুসা।
কল্পতরুর তলায় থাকি নই গো আমি খবুরে।
হাঁ করিয়ে চেয়ে আছি মেওয়া ফলে সবুরে।"

রচনাটি "চিঠি" শিরোনামায় ১২৯২ ফাল্গুনের 'বালকে' প্রথম বাহির হয়। তাহার পরে সংবাদপত্র, সংবাদ ও সাময়িকপত্র সম্বন্ধে অজস্র ব্যঙ্গবিদ্রূপে রবীন্দ্ররচনা কণ্টকিত হইয়াছে। প্রথম বিদ্রোহকেই এইখানে স্থান দিলাম। বহু বৎসর পরে 'শিশু' কাব্যগ্রন্থে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত আকারে উপরে-উদ্ধৃত-অংশ-বর্জিত-ভাবে "চিঠি" কবিতাটি "পরিচয়" নামে প্রকাশিত হয়।

শার্লক হোমসের শিষ্য মিস্টার লক তিন দিন তিন রাত্রি কিছুই খান নি, যা খেয়েছেন কাজের আরম্ভে। এখন শুধু একটু একটু কফি আর প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পাইপ। বেহালা থেকে কিছু দূরে ডায়মণ্ড হারবার রোডের পাশে কোনো এক পল্লীতে একটি নির্জন বাড়ি তাঁর জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

বেহালায় যে বাড়িতে খুন হয়েছে সে বাড়িতে তিনি মাত্র পনেরো মিনিট ছিলেন। এই পনেরো মিনিট তিনি, যে ঘরে খুন হয়েছে তার ভিতরে প্রবেশ করে প্রয়োজনীয় কয়েকটি জিনিসের মাপজোক করেছেন। তার বেশি কিছু না।

ডায়মণ্ড হারবার রোডে যেখানে লক আছেন, ঠিক তার বিপরীত দিকের এক পল্লীতে থর্নডাইকের শিষ্য মিস্টার থর্ন মাইক্রোস্কোপ নিয়ে ঘটনাস্থলের কিছু ধুলো, একগোছা বেওয়ারিশ চুল এবং হত্যার পর দরজা ভেঙে যারা সে ঘরে প্রবেশ করেছিল তাদের মধ্যকার একমাত্র স্থানীয় পুলিস ভিন্ন আর সবার মাথার একটি করে চুল নিয়ে পরীক্ষা করছেন আজ কয়েকদিন ধরে।

এঁরা দুজনেই লণ্ডন থেকে এসেছেন দিন সাতেক হল। এ সবই অবশ্য প্রাইভেট ব্যবস্থা। পুলিসের ব্যবস্থাও কম নয়। কেস্‌টি এমনই রহস্যপূর্ণ যে তা ভেদ করতে যত রকম সম্ভব উপায় অবলম্বন করার হুকুম আছে বাড়ির মালিকের। কাজেই পুলিস স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত একটি গোয়েন্দা কুকুরকে তার পরিচালক বা প্রযোজকসহ আনিয়ে নিয়েছে।

এ ভিন্ন একটি দেশী রোগা কুকুরকেও মাঝে মাঝে সন্দেহজনকভাবে বেহালা-ডায়মণ্ড হারবার রোড এলাকায় ঘোরাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে।

বেহালার বিখ্যাত হাম্বড়া চৌধুরীর বাড়িতে খুন হয়েছে। প্রচুর টাকার মালিক। প্রকাণ্ড বাড়ি। এঁর

পূর্বপুরুষ উত্তর-প্রদেশের কোনো জেলা থেকে এসে ইংরেজ আমলে কলকাতার বাসিন্দা হয়ে পড়েছিলেন। সেই থেকে এই পরিবার ধনাঢ্য। এঁদের যে কত টাকা তা কেউ অনুমান করতে পারে না। এঁরই স্ত্রী একবার জলে ডুবে অজ্ঞান হয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ডাকা হয়। ডাক্তার বললেন কৃত্রিম শ্বাসের ব্যবস্থা করতে হবে। আর যায় কোথা? হাম্বড়া উত্তেজিতভাবে বললেন, মানে? আমার স্ত্রীকে কৃত্রিম শ্বাস? ডাক্তার, অবিলম্বে আসল শ্বাসের ব্যবস্থা কর, যত টাকা লাগে দেব। তুমি না পার, অন্য ডাক্তার ডাকছি।

এই কাহিনীটিই কি করে বিলেতে চালান হয়ে যায় এবং এটা এখন তাদেরই দেশের গল্প বলে প্রচলিত।

এই হাম্বড়া চৌধুরীর বাড়িতে খুন! অসম্ভব কাণ্ড। অসম্ভব এজন্য যে, ঘর ভিতর থেকে বন্ধ, অথচ খুন। আরও অসম্ভব এজন্য যে আততায়ীর এত বড় স্পর্ধা হল কি করে।

কিন্তু কে খুন হয়েছে তা এতক্ষণ বলা হয় নি। সেটা এ কাহিনীর পক্ষে অবান্তর বলেই বলা হয় নি। যে-কোনো একটি স্ত্রীলোক খুন হয়েছে ধরা যাক। সম্ভবতঃ স্ত্রীলোকটি হাম্বড়া চৌধুরীর স্ত্রী। তাঁর ঝিও হতে পারে। মোট কথা কে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই, কেন না সে আপনার আমার কারও আত্মীয়া নয়।

পুলিসের প্রাথমিক অনুসন্ধান শেষ হয়ে গেছে। দিনের বেলা ঘর ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করতে হয়েছিল পুলিসের। বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত দরজা বন্ধ দেখে সন্দেহ হয়। দরজা পার হয়ে বাঁয়ের দিকে পাঁচ হাত দূরে খাট। খাটের শিয়রে জানলা। সে জানলা দিয়ে একটা বিড়ালও বাইরে পালাতে পারে না। সামনের দিকে দরজার পাশের জানলা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল।

দারোগা যখন দরজা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর সঙ্গে কয়েকজন কনস্টেবল ছিল, তারা দরজা ভেঙে দিয়েই বিদায় হয়ে যায়। ভিতরে প্রবেশ করেন পুলিসের দারোগা ও হাম্বড়া চৌধুরী। দরজা ভাঙার শব্দে আরও কয়েকজন সিঁড়ি বেয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসেন সেই দোতলার ঘরে।

ক্রম অনুযায়ী সাজালে এই রকম হয়। প্রথম দারোগা, পরে হাম্বড়া চৌধুরী, পরে দুজন নবাগত আত্মীয় দুলালচাঁদ ও নকুলেশ্বর। সবশেষে তাঁদের ঠিক পিছনে ঘরে ঢুকেছে হাম্বড়ার ভাইপো সনৎকুমার।

জেরার সময় নকুলেশ্বর স্বীকার করেছে যে সে-ই সবার শেষে ঘরে এসেছে। অথচ সনৎ বলছে সে সবার শেষে এসেছে।

সবাই অবাক। অবাক আততায়ীর কৌশলে। এই কৌশলটি কি, তার মীমাংসা না হলে আততায়ী যে কে তা ভাবাই যাচ্ছে না।

গলা টেপা হয়েছে, ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেছেন। তারপর ধস্তাধস্তির চিহ্ন এবং সর্বশেষ গলায় ছুরির আঘাত। অতএব কোনোমতেই এটি আত্মহত্যা নয়। ছুরি পড়ে আছে দূরে। ছুরির হাতলে আঙুলের ছাপ নেই।

যদি কেউ খুন করে থাকে তবে সে পালাবে কি করে? কে আততায়ী? কিন্তু এ প্রশ্ন আপাততঃ উঠছে না, কারণ যেই হোক সে কি করে পালাবে আগে তা আবিষ্কার না হলে কে খুন করল ভেবে লাভ নেই। লাভ নেই এই কারণে যে যাকে ধরা হবে সেই বলবে কি করে সম্ভব? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে পুলিসকে।

তিন দিন ধরে বাড়ির সবাইকে জেরা করা হয়েছে এবং পুলিসের তিনখানা মোটা খাতা লেগেছে তা লিখতে। কিন্তু অন্দরের দোতলার সুরক্ষিত ঘরে একটি স্ত্রীলোক খুন হল অথচ ভিতর থেকে দরজা এমনভাবে বন্ধ যে বাইরে এসে সে রকম বন্ধ করা অসম্ভব এবং দরজা বন্ধ রেখে ঘর থেকে কারও বাইরে আসা অসম্ভব।

দ্বিতীয় প্রশ্ন: ঘরের মধ্যে কোনো গুপ্ত দরজা আছে কি না। কিন্তু সে দিকেও নিরাশ হতে হল। একটি

দেয়াল-আলমারি আছে বটে, কিন্তু নানাজাতীয় যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করা হল, কোনো রহস্যের সন্ধান মিলল না।

অতএব সব যেমন আছে তেমনি রইল। পুলিস বলল, আগে দরজা-রহস্যের সমাধান চাই, তারপর অন্য কথা। অর্থাৎ কে খুন করল, খুনের 'মোটিভ' কি ইত্যাদি ভাবা যাবে। ইতিমধ্যে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের শিক্ষিত কুকুর স্কট এসে পৌঁছচ্ছে প্লেনে। সে যাকে নির্দেশ করে, তাকে গ্রেপ্তার করে রেখে পরে ভাবা যাবে দরজার রহস্য।

হাম্বড়া দেখলেন সমস্যা জটিল। তিনি সব শুনে বহু টাকা খরচ করে বিলেতের দুই বিখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভকে আনিয়ে নিয়েছেন। তাঁদের কথা আগেই বলা হয়েছে। পুলিসের বড়ই আপত্তি ছিল, বলেছিলেন ওদের আবার কেন? কিন্তু হাম্বড়া পুলিসের কথা রাখতে পারেন নি। তাঁর বাড়িতে খুন—সাধারণ ব্যাপার নয়।

মিস্টার লক এবং মিস্টার থর্ন দুজনেই ভারতবর্ষে এসে খুব স্ফূর্তি বোধ করছেন। তবে এ কথাও বলেছেন, ঘটনার বিবরণ পেলে লণ্ডনে বসেই রহস্য ভেদ করতে পারতেন। তবে থর্ন শুধু বিবরণ পেলে কিছু করতে পারতেন না, ঘটনাস্থলের কিছু ধুলো পেলে চেষ্টা করে দেখতে পারতেন।

ইতিমধ্যে পনেরোটা দিন কেটে গেছে। পুলিস কাউকেই গ্রেপ্তার করে নি। কিন্তু স্কট এসে পড়াতে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন। স্কটের সঙ্গে তার পরিচালক কনস্টেবল রবার্টও এসেছে। তাদের তো আর বেকার বসিয়ে রাখা চলে না, তাই নিহতা স্ত্রীলোকের রক্ত শুঁকিয়ে রবার্ট কুকুরকে ইশারা করতেই কুকুর তার কর্তব্য পালনে রত হল। সে মাটি শুঁকতে শুঁকতে অদৃশ্য আততায়ীর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে লাগল। সে প্রথমে এলোমেলো ঘুরতে লাগল। একবার বাড়ির ভিতরে গেল, কিন্তু সেখানে সেদিনকার কেউ উপস্থিত ছিল না, ছিলেন একমাত্র হাম্বড়া চৌধুরী। কুকুর একটু বিভ্রান্তভাবে বেরিয়ে এলো পথে, আবার বাড়ির ভিতর গেল, আবার এলো। প্রকাণ্ড বাড়ির ভিতর কুকুর দিশাহারা হয়ে ঘুরে একটি বেলা কাটাল। কিন্তু উপায় তো নেই। সে শেষ বারের মত যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথের দিকে চলতে লাগল তখন প্রায় সন্ধ্যা। চলল সে ডায়মণ্ড হারবার রোড ধরে।

আরও একটি দেশী কুকুর তাদের অনুসরণ করছিল, কিন্তু কেউ তা লক্ষ্য করে নি। এই সময় লক একটু সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন, হঠাৎ রবার্টের সঙ্গে দেখা হতেই আনন্দে গদগদ হয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানালেন। বললেন, একটু কফি খেয়ে যাও। রবার্ট বলল, স্কট অনুসরণ করছে রক্তের গন্ধ। লক বললেন, তা হোক। ও এগিয়ে যাক, তুমি তো গাড়িতে আছ, ভয় কি। রবার্ট লকের পুরনো বন্ধু।

রবার্ট লকের ঘরে গিয়ে বসলেন। পুলিসের দারোগাও রবার্টের সঙ্গে ছিলেন, তিনিও অগত্যা লকের বাড়িতে গেলেন। মিনিট পাঁচেকের ব্যাপার। রবার্ট ও দারোগা কফি পেলেন এক পেয়ালা করে, কিন্তু হত্যা বিষয়ে একটি কথাও লক বললেন না। শুধু জিজ্ঞাসা করলেন, কবে ফিরবে মনে করছ? রবার্ট বলল, বোধ হয় দিনতিনেকের মধ্যে। দারোগাকেও লক খুব অভ্যর্থনা জানালেন, এবং কলকাতার আবহাওয়া ভিন্ন তাঁর সঙ্গে অন্য কোনো বিষয়েই কোন আলাপ করলেন না।

লক মনে মনে ভীষণ খুশী, কেন না তাঁর কাজ প্রায় শেষ। কিন্তু বাইরে থেকে তা কারও বোঝবার উপায় নেই। এদিকে থর্নও আপন ঘরে বসে যে সব অদ্ভুত পরীক্ষা চালাচ্ছেন তাও প্রায় সাফল্যের মুখে এসে পড়েছে।

দারোগা ও রবার্ট যখন লকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বড় রাস্তার উপর এলেন তখন তাঁরা দেখতে পেলেন স্কট বেশিদূরে যায় নি। কয়েকজন লোক তাকে আদর করছিল, এবং স্কট আনন্দে ল্যাজ নাড়ছিল। কিন্তু রবার্টকে দেখে ল্যাজ নাড়া থামিয়ে দিল, যারা ওকে

আদর করছিল তারাও নিজেদের অপরাধী মনে করে ওখান থেকে সরে গেল বলে মনে হল।

কালো দেশী কুকুরটিকে আর দেখা গেল না।

কিন্তু স্কটের মধ্যে স্পষ্ট একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। কারণ স্কট হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে গেছে। সে যেন তার সমস্ত উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। সন্দেহ জাগল, কেউ কিছু খাইয়ে দিয়েছে হয়তো। যারা আদর করছিল তারা সন্ধ্যার অন্ধকারে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে, তাদের আর চিহ্নমাত্র দেখা গেল না। সবই একটা রহস্য বলে মনে হতে লাগল। রহস্যসংখ্যা ক্রমবর্ধমান।

ভয়ানক ব্যাপার যে! শিক্ষিত কুকুর। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের প্রথম শ্রেণীর গোয়েন্দা কুকুর। তার এই পরিবর্তনে রবার্ট মুষড়ে পড়ল। হাজার হাজার লোক উৎসুক হয়ে আছে কুকুরের ওস্তাদি দেখার জন্য। বিলেতে ট্রাঙ্ক কল করা হল। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড বলল, ওখানে চিকিৎসা না করিয়ে স্কটকে অবিলম্বে এখানে পাঠিয়ে দাও। টাকা ফেরত দেওয়া হবে বলে দিও।

জরুরি নির্দেশ।

এদিকে লক দরজার রহস্যভেদের কাজে আরও কিছু এগিয়েছেন। এখন মাত্র আধ-আনা বাকি। তাঁর কাজের সুবিধা এই যে কাউকে জেরা করতে হচ্ছে না। সমস্ত তর্কবিতর্ক শুধু নিজের সঙ্গে। তাঁর পদ্ধতি তাঁর নিজের। তিনি যদি দেখেন একটি ত্রিভুজ পড়ে আছে অথচ তার একটা বাহু নেই, তা হলে যতক্ষণ না সেই হারানো বাহু খুঁজে পাচ্ছেন, ততক্ষণ তাঁর আর বিরাম নেই। খুঁজে পেলে ওই ত্রিভুজের যে-কোন দুটি বাহু তৃতীয় বাহুটির চেয়ে বড়, অথবা ত্রিভুজমধ্যস্থিত তিনটি কোণের যোগফল দুই সমকোণের সমান, প্রমাণ করে তবে নিষ্কৃতি।

লক ভাবছেন। দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করা অসম্ভব। ভিতর থেকে বন্ধ করলে দরজা না খুলে বাইরে আসা অসম্ভব। অথচ খুন। অথচ দেওয়ালে কোনো গুপ্ত দরজা নেই।

তা হলে আততায়ী কি—

লক লাফিয়ে উঠলেন। ত্রিভুজের হারানো বাহু খুঁজে পাওয়া গেছে। সব মিলে যাচ্ছে। তিনটি কোণের যোগফল দুই সমকোণের সমান!

ওদিকে ধর্নের পরীক্ষাও শেষ। মাত্র কয়েকটি চুল নিয়ে পরীক্ষা। তিনিও আনন্দে লাফাতে লাগলেন এবং ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে ছোট্ট গাড়িখানায় স্টার্ট দিলেন। এবং ওই একই সময়ে লকও তাঁর গাড়িতে স্টার্ট দিলেন। দুজনেই নক্ষত্রবেগে ছুটে চলেছেন, দুজনেরই অধৈর্য চরমে উঠেছে, এবং কেউ এক সেকেণ্ড সময় নষ্ট করবেন না প্রতিজ্ঞা করে স্পীড দিয়েছেন। ফলে ডায়মণ্ড হারবার রোডের দু পাশের দুই গলি থেকে দুজনে বেরিয়ে এসে হেড-অন কলিশন হতে হতে বেঁচে গেলেন। গাড়ি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দুজনেরই অসাধারণ, সামান্য একটু গুঁতোর উপর দিয়েই তাই তাঁরা রক্ষা পেলেন। গুঁতোটা প্রায় আদরে পিঠ চাপড়ানোর মতোই হালকা এবং প্রীতিপূর্ণ।

তবু ব্যাপারটা কারোরই ভাল লাগল না। ওঁরা ঠিক করলেন গাড়ি দুখানা ওখানেই রেখে হেঁটে যাবেন। হাঁটতে হাঁটতে অনেক আলাপ করা যাবে।

আলাপের বিষয়, কলকাতার ইতিহাস। খুনজখম গোয়েন্দাগিরি নয়—মোট কথা নিজেদের বৃত্তিবিষয়ে কিছুই না।

ওঁরা দুজনেই গিয়ে পৌছলেন চৌধুরী বাড়িতে। হাম্বড়া চৌধুরী খুব খুশী। অভ্যর্থনা জানালেন ওঁদের।

গিয়ে শুনলেন সেদিনকার উপস্থিত সবাই নিজের কাজে বাইরে চলে গিয়েছিলেন। সনৎও বাইরে গিয়েছিল কিন্তু ফিরে এসেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে জানা গেল অম্বরাও ফিরে এসেছে।

লক শুধু হালকাভাবে একবার জিজ্ঞাসা করলেন সেদিন সবশেষে ঘরে কে ঢুকেছিল? এবং এ কথা জিজ্ঞাসা করার আগে বারবার ক্ষমা চেয়ে নিলেন।

সনৎ বলল, আমি।

নকুল বলল, আমি।

লক প্রশ্ন করলেন, নকুলবাবু, আপনিই যে শেষে ঢুকেছিলেন এ বিষয়ে এমন নিশ্চিত হলেন কি করে?

নকুল বলল, আমি পিছনে কাউকে আসতে দেখি নি।

পিছনে তাকিয়েছিলেন দোতলায় ওঠবার সময়?

একবার।

কেন?

দেখলাম আরো কেউ আসছে কি না।

বড়ই অস্বাভাবিক ইচ্ছা। যাই হোক কিছু মনে করবেন না, এটি আমার নিছক কৌতূহল।

কৌতূহল কেন বলছেন? আপনি তো তদন্ত করছেন এই কেস্।

না। আমার কাজ হচ্ছে দরজার রহস্য ভেদ করা। তার বেশি কিছু না।

লক পাইপে নতুন তামাক পুরে আগুন ধরিয়ে টানতে টানতে বলতে লাগলেন, দরজার রহস্যটা এত সহজ আগে ভাবতে পারি নি। ত্রিভুজের একটি বাহু হারালে তার সন্ধান করা সহজ। কিংবা অনেক বাহু কুড়িয়ে এনে কোন্‌টা ফিট করে তা দেখাও সহজ। কিন্তু ত্রিভুজ পড়ে আছে অথচ তার তিনটি বাহুর একটিও নেই, এ বড় কঠিন রহস্য। আমার চিন্তাধারাটি এইভাবে চলল : হয় তিনটি বাহুই আছে আমি দেখতে পাচ্ছি না, অথবা একটিও নেই, এবং কোনো দিনই খুঁজে পাব না।

তারপর একটু থেমে পকেট থেকে ভাঁজ করা একখানা কাগজ খুললেন এবং বললেন এইটি হচ্ছে ওই ঘরের নকশা। আপনারা দেখুন সব ঠিক আঁকা হয়েছে কি না।

সবাই বললেন, ঠিক হয়েছে। সবাই অর্থাৎ ওখানে তখন যাঁরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা আমাদের পূর্ব-পরিচিত। রবার্টও স্কটকে নিয়ে এসেছিল সেখানে। যদি আততায়ী এদের মধ্যে কেউ থেকে থাকে তবে হঠাৎ স্কটের মাথা ভাল হয়ে যেতেও পারে, এই আশা। এজন্য রবার্ট মাঝে মাঝে পকেট থেকে নিহতার রক্তমাখা শাড়ের টুকরো বার করে শোঁকাচ্ছিল। কিন্তু স্কট নির্বিকার।

এমন সময় হঠাৎ ফটকের বাইরে সেই রহস্যজনক রোগা কুকুরটির মাথা দেখা যেতেই স্কট ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠল, এবং শিকল ছিঁড়ে তাকে আক্রমণ করবে বলে বারবার চেষ্টা করতে লাগল। রবার্ট লজ্জিত হয়ে স্কটকে আড়ালে নিয়ে গেল।

লক বলতে লাগলেন, আমার কথা বিশ্বাস করতে পারেন। দরজা ভেঙে যাঁরা ঘরে ঢুকেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ যিনি ঢুকেছেন তিনিই আততায়ী। তিনি কে, তা আমি বলব না, তা বলতে আমি আসিও নি।

লক অতঃপর ম্যাপ খুলে একে একে সব বোঝাতে লাগলেন। বললেন, এই দেখুন, এই দরজা ভাঙা হয়েছে, তারপর এইভাবে আপনারা বাঁয়ের দিকে গেছেন নিহতার খাটের কাছে। আপনাদের অনুসরণ করেছে আততায়ী।

কেমন করে?—সবাই সমস্বরে প্রশ্ন করলেন।

লক বললেন, আততায়ী ঘরেই লুকিয়েছিল, দরজার আড়ালে। আপনারা তখন উত্তেজিত ছিলেন, তাই দুদিক দেখেন নি, ঘরে ঢুকে শুধু বাঁ দিকেই দৃষ্টি দিয়েছেন। কিন্তু আততায়ী খুন করে দরজা খুলে বেরিয়ে যায় নি কেন, তার হাজার রকম কারণ থাকতে পারে। তাকে জেরা করে আপনারা প্রকৃত কারণ নির্ণয় করুন। আমি এবারে আসি। নষ্ট করবার মতো এক মুহূর্ত সময় আমার হাতে নেই—এক ঘণ্টা পরে আমার প্লেন ছাড়বে।

পুলিসের এতক্ষণ যে সন্দেহ ছিল, তা অনেকটা দূর হল, তাই দারোগা লকের বিদায়কালে তাঁকে জড়িয়ে ধরে গোটা দশ-বারো চুমু খেলেন।

এবারে ধর্মের পালা। এক-একটি অংশ এক এক-

জনের হাতে। লকের অংশ শেষ হয়ে থর্নের অংশ আরম্ভ হল।

থর্ন বলতে লাগলেন, আমি যে সাফল্যের কথা এখন আপনাদের কাছে বলতে যাচ্ছি—আততায়ীর নাম আবিষ্কারের সাফল্য—তা সম্ভব হয়েছে প্রধানতঃ ভারতীয় বিখ্যাত ডিটেকৃটিভ ব্রজবিলাস সরকারের নিষ্ঠাপূর্ণ সহযোগিতায়। ব্রজবিলাস যখন ছদ্মবেশের বিশেষ শিক্ষালাভের জন্য বিলেতে ছিলেন তখন থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। এবং তিনি আজ এই সভাতে উপস্থিত আছেন বলা চলে।

সবাই পরস্পরের দিকে চাইতে লাগলেন।

থর্ন বললেন, ঠিক এখানে নয়, ফটকের বাইরে। আপনাদের অনুমতি পেলেই তাঁকে ডাকতে পারি।

নিশ্চয় ডাকুন।—বললেন চৌধুরী।

থর্ন ডাকতেই বাইরের কুকুরটি ভিতরে এল ল্যাজ নাড়তে নাড়তে।

থর্ন বললেন, ইনিই ব্রজবিলাস সরকার। বর্তমানে ইনি কুকুরের ছদ্মবেশে আছেন। মিস্টার সরকার, আপনি ছদ্মবেশ ছাড়ুন।

আদেশ পাবামাত্র কুকুর মানুষের ভঙ্গিতে দু-পায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে মানুষের ভাষায় বলল, একটু অন্তরাল দরকার।

তাকে বাথরুম দেখিয়ে দেওয়া হল। দু-মিনিট পরেই ব্রজবিলাস বেরিয়ে এল, হাতে চামড়ার ব্যাগ। ছদ্মবেশটা উলটো করে ধরলেই ব্যাগের চেহারা পায়, এ এক অদ্ভুত ব্রিটিশ আবিষ্কার।

থর্ন বললেন, লকের পরে অবশিষ্ট আছে দুটি রহস্য, তার একটি আমি ভেদ করেছি, আর একটি করেছেন মিস্টার সরকার। আমারটি একটু জটিল, আপনাদের ধৈর্যের উপর অত্যাচার করা হবে না তো?

বিলক্ষণ! আপনি যতক্ষণ ইচ্ছা সময় নিন।—বললেন চৌধুরী। দারোগাও বললেন, আমার ক্রমেই সব অদ্ভুত লাগছে—আপনি সব বলুন, খুব মনোযোগ দিয়ে শুনব।

ইতিমধ্যে থর্নের ঘর থেকে দুটি বড় বড় বাক্স এসে পৌঁছেছে। তার একটিতে একটি টেপ রেকডিং যন্ত্র, অন্যটিতে মাইক্রোস্কোপ। থর্ন বাক্স দুটি খুলতে খুলতে বললেন, আততায়ীর নাম আমি আগেই প্রকাশ করে দিই—তার নাম সনৎ।

হঠাৎ একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হল, সনৎকে দারোগা ধরে ফেললেন।

থর্ন বলতে লাগলেন, আমার পদ্ধতি একটু ঘোরা পথে। মাপজোক দরকার হয় না। আগেই বলেছি যে হত্যার ঘর থেকে আমি চুল সংগ্রহ করেছিলাম। তারপর কি করেছি শুনুন। আমি ব্রজবিলাসবাবুর সাহায্যে জানতে পেরেছি সনতের একজন প্রণয়িনী আছে। তার নাম প্রকাশ করব না। তবে তাকে আমি আমার পরীক্ষা-ঘরে আনাবার ব্যবস্থা করেছিলাম নানা কৌশলে। গভীর রাত্রে ঘটনাটা ঘটেছিল, কেউ জানে না। খুনের কিনারা হতে পারে ভেবেই এটি করেছিলাম। কারণ ঘর থেকে আমি যে চুল সংগ্রহ করেছিলাম তা সনতের চুল এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি, কারণ পরে ও-ঘরে যাঁরা গেছেন সবার চুল আমি পরে চেয়ে নিয়েছি। মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা করা সহজ।

তারপর মেয়েটিকে জেরা করে শুনলাম ওদের প্রণয় গভীর। শুনলাম সনৎ ওর সান্নিধ্যে এলেই রোমাঞ্চিত হত। এ কথা মেয়েটিকে সে বারবার বলেছে। আমি পরীক্ষা করে দেখলাম, ঠিক। মাইক্রোস্কোপের স্লাইডে চুল বসিয়ে মেয়েটিকে বললাম তুমি সনৎ সনৎ বলে ডাক। মেয়েটি ডাকতে লাগল—আমি দেখলাম মাইক্রোস্কোপে, সে ডাকে স্লাইডের উপর চুলটি খাড়া হয়ে নাচছে। এ নাচ এত সূক্ষ্ম যে খালি চোখে ভাল দেখা যায় না।

আপনাদের এ পরীক্ষা দেখাবার জন্য আমি মেয়েটির কণ্ঠস্বর রেকর্ড করে নিয়েছি।

থর্ন সবাইকে তাঁর পরীক্ষা দেখিয়ে অবাক করলেন। নিহতার হাতের মুঠিতে যতগুলো চুল ছিল সব একসঙ্গে স্লাইডের উপর নাচতে লাগল, টেপ রেকর্ডে মেয়ের কণ্ঠে "সনৎ সনৎ" ডাক শুনে।

থর্ন বললেন, আমার অংশ শেষ হল, আমি এবারে বিদায় নিই। পরের অংশ ব্রজবিলাসবাবু বলবেন। দারোগা আনন্দে উত্তেজিত হয়ে উঠে থর্নকে জড়িয়ে শ'খানেক চুমো খেলেন এবং বললেন, আপনি যাবেন না, একটুখানি অপেক্ষা করে যান।

ব্রজবিলাস দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, আমার উপর ভার পড়েছিল স্কট নামক স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের শিক্ষিত গোয়েন্দা কুকুর হঠাৎ বিগড়ে গেল কেন তা আবিষ্কারের। আমি ঠিক এই ঘটনার সন্ধান করতেই কাজ আরম্ভ করি নি। ব্যাপারটা হঠাৎ আমার চোখে পড়েছে। এটি নিতান্তই দৈব যোগাযোগ।

স্কট বিপক্ষের কাছ থেকে ঘুষ খেয়েছে। ঘুষ খেয়ে তার কর্তব্য থেকে সে চ্যুত হয়েছে। আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন সে আমাকে কুকুরের ছদ্মবেশে এখানে দেখেই চিনতে পেরেছিল, আমাকে আক্রমণ করতে চেয়েছিল, এবং শিকলবাঁধা না থাকলে আমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলত। কারণ তার ওই দুষ্কার্যের সাক্ষী ছিলাম আমি।

স্কটকে অতঃপর সেখানে আনা হল। স্কট লজ্জায় মাথা নীচু করে রইল।

রবার্ট সব শুনে স্তম্ভিত।

শোনা গেল দশ হাজার টাকা ঘুষ খেয়েছে।

স্কট ধরা পড়ে বড়ই বিব্রত হয়ে পড়ল এবং আত্মরক্ষার জন্য নিজের ব্যবহার হঠাৎ পরিবর্তন করে আগের মত ল্যাজ নাড়তে লাগল। রবার্ট তা দেখে আশান্বিত হয়ে নিহতার রক্তমাখা কাপড়ের টুকরো নাকে ধরতেই স্কট একলাফে সনতের ঘাড়ে পড়ে তাকে চিত করে ফেলল।

থর্ন বললেন, ভারতবর্ষের জল-বায়ুতে কিছু একটা আছে বলে মনে হয়। কারণ আমারও মাঝে মাঝে মনে হয়েছে বিপক্ষ অনেক টাকা ঘুষ দিতে এলে হয়তো নিয়ে ফেলব।

সবাই হেসে উঠলেন। এবং দারোগা ব্রজবিলাসকে তিনটি চুমু খেয়ে আনন্দ প্রকাশ করলেন।

হত্যার মোটিভ নিয়ে অতঃপর তিনি ভাবতে লাগলেন।

জাঁহাপনা

"বনফুল"

সত্যেরই জয় হয়, নিশ্চয় নিশ্চয়, ঠিক বাত
সত্যের সাধনায় জাঁহাপনা মগ্ন যে দিনরাত
তাঁহার গোমুখী হতে সুতরাং নিঃসৃত হয় যা
নির্জলা সত্য তা নির্ঘাৎ।

২

রাত্রিকে দিন করা দিনকে রাত্রি করা সম্ভব
জাঁহাপনা বোঝেন তা, বোঝেনাকো বোকা ডিক্-টম্ সব
জিনিয়াস জাঁহাপনা খান রোজ পলান্ন ক্ষীরসা
এরা খায় ডাল ভাত গম যব।

৩

জাঁহাপনা সমতুল আছে আর কোন্ 'ইন্‌শান্' বল
তাঁকে বলা মিথ্যুক। নাক মল, ওরে তোরা, কান মল।
ইতিহাসী জাঁহাপনা একচেটে কারবারী সত্যের
বুঝিস না এ কথাটা প্রাঞ্জল!

৪

'জয় জয় জাঁহাপনা' অতএব এই গান জোরে গাও
বেসুরো গাইবে যারা তারা সব সরে যাও, মরে যাও।
বঞ্চিত গৃহহারা? তারা তো বাক্স আর প্যাঁটরা
যে কোনও গুদোমে সব ভরে দাও।

সত্যের সঙ্গীতে লাগাইতে হবে কবে কোন্ সুর
জানে না তা রামা-শামা ডিক্-টম্ রমজান-মনসুর
জানেন তা জাঁহাপনা, সুতরাং বল খালি তোমরা
জি হুজুর, জি হুজুর, জি হুজুর।

মারীচ

শ্রীসজনীকান্ত দাস

ভূস্বর্গ কাশ্মীরে বোনা হয় কার্পেট ; কোনোটিতে ধীরে ধীরে উজ্জ্বল স্বর্ণমিনার ও চোখ-ঝলসানো রৌপ্য-গম্বুজ-শোভিত মসজিদ-প্রাসাদ-সমাকীর্ণ মক্কাশরিফ, কোনোটিতে বা মন্দিরচূড়া ও প্রাসাদ-বিপণির পটভূমিকায় কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাট—সিঁড়ির পরে সিঁড়ি, গঙ্গাবক্ষে তরণী-শ্রেণী—দক্ষশিল্পীর নিপুণহস্তে পশম-সূত্রের টানা-পোড়েনের মধ্যে একটির পর একটি চিত্র পরিস্ফুট হইতে থাকে—বহুবর্ণে বিচিত্র, অপরূপ। দেশে-বিদেশে এই কার্পেটের সমাদর ; লোকে শুইয়া বসিয়া মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখে, মুখে তারিফ করে।

কিন্তু উলটাইয়া পাত, দেখিবে মক্কা-মদিনা কাশী-কাঞ্চী গয়া-সারনাথ সব একাকার। একবার এক মহামান্য মৌলভীকে কার্পেটের উলটাপিঠ দেখিয়া বাছাই করিতে বলায় তিনি পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরে হাত দিয়া তোবা করিয়াছিলেন এবং একবার এক মহামহো-পাধ্যায় ব্রাহ্মণপণ্ডিত কাশীবিশ্বেশ্বর মন্দির ভ্রমে দিল্লীর জুম্মামসজিদ বাছাই করিয়া কি ভাবে "রামঃ রামঃ" বলিয়া উঠিয়াছিলেন—মুসলমান শিল্পীরা খরিদ্দারদের কাছে সকৌতুকে সেই গল্প করিয়া থাকে। তাহারা এই কাহিনীটিকে নিজেদের শিল্পদক্ষতার পরিচয়স্বরূপ প্রচার করে বটে কিন্তু সেই সঙ্গে এই চিরন্তন দার্শনিক সত্যও উদ্‌ঘাটিত হয় যে, বহিঃপ্রকাশ যত স্বতন্ত্রই হউক, সকল বস্তুর অন্তরের রূপ এক।

দক্ষিণপন্থী দেশনায়ক শ্রীরামচন্দ্র ঘোষ ও বামপন্থী "লীডার" শ্রীরাবণচন্দ্র বসু আসলে বরানগরের একই কার্পেট-কারখানায় প্রস্তুত মাল—লোকে এখন অসম্মান-সূচক "চীজ" অভিধা দেয়, কিন্তু আমরা ঐতিহাসিক, এরূপ বিশেষণ প্রয়োগ করিতে পারি না। নেপথ্য-দর্শনে অর্থাৎ উলটাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে, বাল্যকালে দুজনেই পড়াশুনায় অমনোযোগী, খেলাধূলায় দক্ষ, দুর্দান্ত প্রকৃতির বালক ছিল। তাহাদের উৎপাতে পাড়ার আবৃদ্ধবনিতা অর্থাৎ কর্তা ও গিন্নীরা সর্বদা সশঙ্ক ও সন্ত্রস্ত থাকিতেন। রাস্তায় বেওয়ারিস ঘোড়া দেখিলেই তাহারা পালা করিয়া তাহার পিঠে চড়িয়া, বিনা লাগামে ও জিনে দাবড়াইয়া ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড নিরীহ পথিকের পক্ষে সংকিত ও বিপদসঙ্কুল করিত এবং দলভ্রষ্ট বা পথভ্রান্ত

পাঁঠা দেখিলেই সেটিকে কব্জা করিয়া নিশীথরাত্রে নিঃশব্দে বড়ালদের প'ড়ো বাগানবাড়িতে সদলবলে "ফিষ্টি" লাগাইত। হরিদাসের বুলবুল ভাজা, আলু-কাবলি ও গোলাবি গেণ্ডেরি-ওয়ালারা তাহাদিগকে দেখিলেই উর্ধ্বপুচ্ছ গাভীর মত দৌড় মারিত, কারণ প্রত্যেককেই কোন-না-কোন সময়ে লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হইয়া বস্তুমূল্যে ঠগীকর যোগাইতে হইয়াছে। লুণ্ঠনের ভাগ পাইয়া বরানগরের বাল-সমাজ উভয়কে আদর্শপুরুষজ্ঞানে ভয়ভক্তি করিত। কিন্তু প্রবীণেরা বলিতেন, ত্রেতায় পরস্পর-বিরোধী রামরাবণের যুদ্ধে সোনার লঙ্কা ছারখার ও ত্রিভুবন তোলপাড় হইয়াছিল, কলিতে রামরাবণের সৌহার্দ্যে এখন বরানগর ছারখার হইতেছে, ভবিষ্যতে ত্রিভুবনও প্রকম্পিত হইবে।

তাঁহাদের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইয়াছে। প্রুফে একটু ভুল ছিল, মহাকাল তাহা সংশোধন করিয়া লইয়াছেন—ত্রেতার ঐতিহ্য কলিকালেও অটুট আছে। অর্থাৎ, দুই বন্ধু শেষ পর্যন্ত প্রকাশ্যতঃ বন্ধু নাই, দুই পরস্পরবিবদমান দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া ঘোরতর শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কি করিয়া এইরূপ ঘটিল সে কাহিনী পশ্চিমবঙ্গের পলিটিকাল ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আমরা সংক্ষেপে সূত্রমাত্র দিতেছি।

রামচন্দ্রের প্র-প্র-প্র-পিতামহের পিতামহ ভীমচন্দ্র নবাব সিরাজউদ্দৌলার বরাহনগর মোকামের সেরেস্তাদার খান-খানান উজবেগআলি বেগের খাস দাওয়ান ছিলেন। দোলদুর্গোৎসব, বারমাসে তেরপার্বণ—ভীম ঘোষের যেমন রবরবা তেমনই দাপট ছিল। কালের দুরন্ত কশাঘাতে ভীমের গদার তুলা ও ছেঁড়া ন্যাকড়া প্রভৃতি বাহির হইয়া ঝড়ের মুখে এদিক-ওদিক ছিটকাইয়া পড়িয়াছে, রামচন্দ্রের পিতা দশরথ ঘোষ কোনওক্রমে একটা ড্রাইংক্লিনিঙের দোকান ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। পুত্র রামচন্দ্রই তখন একমাত্র ভরসা। ঘুড়ি-লাটাই ডাণ্ডাগুলি হাডুডুডু ও ফুটবলের মধ্য দিয়া খোঁড়াইয়া হাঁটিয়া রামচন্দ্র যখন ইণ্টার আর্টসের চৌকাঠ পার হইয়া স্কটিশচার্চ কলেজে বি. এ. পড়িতেছে এমন সময় অনিচ্ছুক শিক্ষার্থীদের সসম্মানে "পরিত্রাণায়" অসহযোগ আন্দোলনের সুদর্শনচক্রহস্তে অবতাররূপী মহাত্মা গান্ধী ভারতের রাষ্ট্রীয় জগতে "সম্ভব" হইলেন। বাইবেল-ক্লাসের সংক্ষিপ্ত কালটুকুকে বাল্যকালের অভ্যস্ত বীরত্ব প্রকাশের পক্ষে অতীব সঙ্কীর্ণ জ্ঞানে পিতার ধোলাই এবং ধোলাই কারবারের ভবিষ্যৎ উপেক্ষা করিয়া রামচন্দ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতারূপ সীতা উদ্ধারকল্পে অহিংস-অসহযোগ-আন্দোলনরূপ সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িল। যখন রাক্ষসদের কারাকবলমুক্ত হইয়া আবার ভারত-উপকূলে ভাসিয়া উঠিল তখন দশরথ গতায়ু, তাই ত্রিবর্ণ পতাকাধারী পুষ্পমাল্যশোভিত মহিমান্বিত বীরপুত্রকে প্রত্যক্ষ দর্শনের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইলেন।

রাবণচন্দ্রের বংশতালিকা অতখানি অতীত-গৌরব-বাহিনী নয়, ইংরেজরা যাহাদের 'আপস্টার্ট' অখ্যাতি দেয় রাবণের পিতা হিরণ্যকশিপু বসু সেই শ্রেণীভুক্ত বলিয়া শত্রুরা নাসিকাকুঞ্চিত করিত। তিনি শিয়ালদহ-পুলিসকোর্টের দুঁদে উকীল। মক্কেলের কাজে মেজাজ যত মোলায়েমই দেখান, ঘরে তাঁহার মেজাজ তিরিক্ষি, শাসন কড়া। রাবণকে "বাধ্যতামূলক" ভাবে এক 'চান্সে'ই ম্যাট্রিক, আই. এ., বি. এ. পাস করিতে হইল। ভগীরথের মত চরকা-ঘর্ঘর-শঙ্খ বাজাইয়া গান্ধীজী যখন কলিকাতার হুগলীখাল প্লাবিত করিলেন, রাবণ-চন্দ্র তখন এম. এ ও ল একই সঙ্গে পড়িতেছে এবং ছাত্রসমাজের ডিবেটিং কম্পিটিশনে কৃতিত্ব দেখাইয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। হিরণ্যকশিপুর প্রতাপ তখনও অটুট, কাজেই হুগলীতে গঙ্গার প্লাবন রাবণকে স্পর্শ করিল না।

রাবণচন্দ্র যখন ডিবেটিং সোসাইটিতে যুক্তিকে ধারাল এবং লজিককে সূক্ষ্মতর করিতে ব্যস্ত, রামচন্দ্র তখন ফলতো-টু-কাশীপুরের মিল-এরিয়ার খোলা মাঠে জীমূতমন্দ্রে বক্তৃতা প্র্যাকটিশ করিয়া সিদ্ধ হইয়া অসহায় জনতাকে ইচ্ছামত হাসাইতেছে কাঁদাইতেছে, তাহারা হস্তামলকবৎ তাহার এতই আয়ত্তে আসিয়া পড়িয়াছে যে আজকাল "শ্রীরাম-চন্দ্রজী কী জয়" ঘোষণা করিবার কালে অরিজিন্যাল শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করে না।

ত্রিশ হইতে তেত্রিশ এবং বিয়াল্লিশ হইতে ছেচল্লিশ সনের শেষতক রামচন্দ্র জেলে জেলেই কাটাইল। রাবণচন্দ্র এম. এ. ও ল পাস করিয়া পিতার আগ্রহে ও বদান্যতায় বিলাত গেল এবং সেখানে ডিবেটিংয়ে প্রভূত সম্মান ও গ্রেজ ইনে বার-এট-ল ছাপ লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে এন্‌রোল্‌ড্‌ হইল। হিরণ্যকশিপু পুত্রের অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিতে দেখিতে চক্ষু মুদিলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে বাল্যের অবদমিত (রিপ্রেস্‌ড্‌) সমাজ-বিরোধী মনোবৃত্তি রাবণচন্দ্রের কাজে ও চিন্তায় পুনর্মুক্তি খুঁজিতে লাগিল। রাবণচন্দ্র অতীব সঙ্গোপনে উৎকট বামপন্থীদলের পার্টিখাতায় নাম লিখাইল।

ইহাই হইল সংক্ষিপ্ত পূর্বইতিহাস। একটা ব্যাসকূটও পূর্বাহ্নে এখানেই নিরাকৃত হওয়া প্রয়োজন। কাহিনীর শিরোনামাদৃষ্টে রসিক রোমাণ্টিক পাঠক স্বভাবতঃই অনুমান করিতেছেন, রামচন্দ্রের সুন্দরী স্ত্রীকে অপহরণ করিবার জন্য রাবণচন্দ্র নিশ্চয়ই কাহাকেও মারীচের মত সোনার হরিণ সাজাইয়া পাঠাইয়াছিল এবং সেই হতভাগ্যই এই ইতিহাসের লক্ষ্য। কল্পনাবিলাসী পাঠক মহাশয়কে আমরা বলিব, ঘটনা মোটেই এরূপ নয় বন্ধু। দেশনেতা শ্রীরামচন্দ্র ঘোষ চিরকুমার, আ-অসহযোগ ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী। সুতরাং সীতাহরণ ও মারীচ-বধ এক্ষেত্রে অবান্তর। এখানে মারীচ কে তাহা বলিতে আমাদের সংকোচ হইতেছে, তবু ঐতিহাসিককে সত্যনিষ্ঠ হইতে হইবে, কাজেই বলিতেছি, মারীচ আমি, তুমি, আমরা, তোমরা অর্থাৎ মারীচ হইতেছে দেশের আপামর জনসাধারণ, সভাশোভাযাত্রা-সংখ্যাবর্ধনকারী জনতা। এই "মারীচ" কথাটা আমরা কলিকাতার বিখ্যাত হৃদ্‌রোগবিশারদ পি. জি. হাসপাতালের ডক্টর ব্যানার্জির কাছ হইতে ধার করিয়াছি।

এখন কাহিনীর পরিণতিটা শুনুন।

দেশ স্বাধীন হইয়াছে। সংখ্যাগুরু দক্ষিণপন্থী রামচন্দ্রের দলের হস্তে শাসনক্ষমতা স্বতঃই ন্যস্ত হইয়াছে। কলির রামচন্দ্র স্বয়ং রাজা হইয়া অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপালন ভার লইতে পারেন না, কারণ কলিতে অনেক পার্টি, অনেক দলাদলি। কলির রামচন্দ্র অন্তরালে থাকিয়া কলকাঠি নাড়েন, নেপথ্যবিধান করেন।

কাজেই রাবণচন্দ্র একদা গভীর নিশীথে চালতা-বাগানে রামচন্দ্রের ভাড়াটে ভবনে উপস্থিত হইয়া বলিল, দাদা, আমি রাবণ। রামচন্দ্র রাবণের গোপন অপকীর্তির কথা দুর্মুখদের মুখে কিছু কিছু অবগত হইয়া বেশ অপ্রসন্নই ছিল, একটু শুষ্ককণ্ঠেই বলিল, তা রাবণ ভায়া, এখানে কি মনে করে?

একটা প্যাক্ট করতে এলাম দাদা।

প্যাক্ট? কিসের প্যাক্ট?

রাবণের বাম চক্ষু ও বাম ওষ্ঠ কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত হইয়া মৃদু হাসি ফুটিল। বলিল, প্যাক্ট এই রুজিরোজগারের। যা বাজার পড়েছে, তোমার ধোলাই-কারবার তো ধুয়ে-মুছে গেছে। বিয়ে-থা কর নি বটে কিন্তু আমি তো জানি, জ্যেঠাইমা মানে তোমার মা আছেন. ভাইবোনেরাও সপরিবারে তোমার কাঁধে চেপে আছে। বক্তৃতা ভাল দিলে নাম হয় বটে কিন্তু এদেশে পয়সা তো মেলে না। আমার কথা যদি জিজ্ঞেস কর তা হলে বলব, এদেশের হাইকোর্টেও অকাট্য যুক্তি আর সূক্ষ্ম লজিকের কোনও দাম নেই। জজেরা আবেগময়ী বক্তৃতা আর হুজুর-হুজুরের ভক্ত। ছেলেবেলায় রামচন্দ্র ঘোষের শাগরেদি করে কাঁচুমাচু হয়ে মামলা জেতা আমার পছন্দ হয় না। কাজেই মক্কেলও জোটে না। বাবার খুব নামডাক রোজগার ছিল, কিছু রেখেও গিয়েছিলেন কিন্তু একে একে তালপুকুরের তালগাছ সব সাফ হয়ে এসেছে দাদা। এখন ভরসা এই প্যাক্ট।

আরে ছোঁড়া, খুলেই বল্ না, কিসের প্যাক্ট?

তুমি ডাইনে নাম করেছ, ডাইনেই থাক, আমি বাঁয়ে যাই। আর যোগসাজসে ডাইনে-বাঁয়ে ধুন্ধুমার বাধিয়ে রাখি। বাজার সরগরম রাখলে—

রামচন্দ্র ধমক দিয়া বলিল, আমার সঙ্গে চালাকি করতে এসেছিস? বাঁয়ে তো তুই আগেই ভিড়েছিস, আজ এসেছিস আমড়াগাছি করতে। যা, ভাগ্।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাগানো গেল না। রামচন্দ্রের নরম মন, তাহা ছাড়া মনে মনে হয়তো ত্রেতার ট্রাডিশন অনুযায়ীই রাবণের প্রতি তাহার টান ছিল। প্যাক্ট

হইয়া গেল। কী সে প্যাক্ট তাহা খুলিয়া বলা সম্ভব নয়, পাঠককে অনুমানে বুঝিতে হইবে।

ধনী ব্যবসায়ী মহলে স্বভাবতঃই রামচন্দ্রের অগাধ প্রতিপত্তি। রাম-রাজত্বের ইহারাই খুঁটি। একবার রাবণ এক বক্তৃতায় 'মেঘনাদবধ' কোট করিয়া বলিয়াছিল, এই রক্তচোষা ধনীরা দক্ষিণপন্থী ভি. আই. পি.দের মাথায় "ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ ফণীন্দ্র যেমতি, বিস্তারি অযুত-ফণা ধরেন আদরে ধরারে।"

স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের এবং উচ্চ-বেতন-নিশ্চিন্ত শিক্ষিত সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে লজিক-ম্যাজিকওয়ালা রাবণচন্দ্রের প্রসার-প্রতিপত্তি দিনে দিনে পরিবর্ধমান হইতেছিল। ছেলে-মেয়েরা হৈ-চৈ চায়, সরকারী কর্মচারীদের ঈর্ষাজর্জরিত চিত্তে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রবল অসন্তোষ; রাবণচন্দ্র দুইটিকেই কাজে লাগাইতে লাগিল।

পশ্চিমবঙ্গের রঙ্গমঞ্চ গোপন প্যাক্টের ফলে কিছুকাল মিলনান্ত নাটকের অভিনয়ে নিরুপদ্রব রহিল। কিন্তু উৎপাতহীন নিশ্চিন্ততা বামপন্থীর পক্ষে বাম, মারাত্মক। কাজেই হঠাৎ একদিন শোনা গেল ট্রাম-স্ট্রাইক হইবে। রামচন্দ্র রাবণের দ্বিমুখীনতার আভাস পাইয়া মনে মনে শঙ্কিত হইতেছিল, ট্রাম-স্ট্রাইক ঘোষণায় সে বিচলিত হইল এবং সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া স্ট্রাইক এবং সমবেদনা-সঞ্জাত হরতাল রদ করিতে মনস্থ করিল।

গভীর রাত্রির অন্ধকারে রাবণচন্দ্র রামচন্দ্রের গৃহাকাশে উদিত হইল। রামচন্দ্র সরাসরি প্রশ্ন করিল, এ কী কাণ্ড শুরু করেছ, এমন তো কথা ছিল না।

চ্যাঙড়াদের কন্ট্রোল করতে পারছি না দাদা। তুমি এবারটা ক্ষ্যামাঘেন্না করে সরে যাও। আর এমন ভুল হবে না।

মানে, বাধা দেব না?

দোহাই দাদা, তা হলে রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে যাবে। তুমিও মরবে, আমিও মরব।

কিন্তু আমি যে ভলাণ্টিয়ারদের পোস্টিংয়ের হুকুম দিয়েছি। তাদের এখন ঠেকাবে কে?

তুমি নতুন হুকুম ইস্যু কর, গোড়ায় একটু গোলমাল হয়তো হবে কিন্তু তোমার হুকুম পেলেই আমি শেষ রক্ষা করব।

শেষরক্ষা সত্য সত্যই হইল, অর্থাৎ রাবণের জিত, রামচন্দ্রের হার হইল। ট্রাম-বাস পোড়ানো, ইটপাটকেল ছোঁড়া, বোমা-কাঁদুনে গ্যাসের খেল্ শুরুতেই শেষ হইল, কারণ দক্ষিণপন্থী ভলাণ্টিয়ারদের কোথাও দেখা গেল না। হরতাল সাক্‌সেস্‌ফুল, ট্রামধর্মঘট জয়যুক্ত হওয়াতে রাবণের জয়জয়কার হইল।

কিন্তু খিলাফৎ প্যাক্টের মত, স্বরাজ্যপার্টির প্যাক্টের মত এ প্যাক্টও টিকিল না। দস্যু রত্নাকর শুরুতে রাম-নাম উচ্চারণ করিতে অপারগ হইয়া "মরা-মরা" বলিতে বলিতে রাম-নাম-উচ্চারণের পুণ্যবলে পাপমুক্ত হইয়াছিল, রাবণচন্দ্রও বাহিরে রামচন্দ্রের শত্রুর ভূমিকায় অভিনয় করিতে করিতে সত্যসত্যই তাহার ঘোরশত্রু হইয়া উঠিল। তখনই গোল বাধিল। রামচন্দ্র নিজের হাত কামড়াইতে লাগিল কিন্তু তখন উপায় ছিল না। ইদানীং রাবণ নিশাভিসারে রামের কাছে আসা বন্ধ করিয়াছে। রাম জানিয়া বুঝিয়াও বোকা বনিয়া গিয়াছে। সে মনে মনে কঠিন হইয়া রাবণের সহিত দ্বৈরথ-যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

সুযোগ অচিরাৎ মিলিল। রাস্তাঘাটে বনেবাদাড়ে স্টেশনে ক্যাম্পে—যেখানে যত ছিন্নমূল উদ্বাস্তু ছিল রাবণ নানা কৌশল-কসরতে ধীরে ধীরে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছিল। তাহাদিগকেই মারীচস্বরূপ ব্যবহার করিয়া রাবণ রামচন্দ্রের সীতা অর্থাৎ ক্ষমতা অপহরণে তৎপর হইয়াছিল। এবারও স্থান সেই রামায়ণ-খ্যাত দণ্ডকারণ্য। দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসন চলিবে না—ইহাই হইল রাবণের ইস্যু। এদিকে পশ্চিমবঙ্গের বনবাদাড় ক্যাম্প, কলিকাতার পথঘাট স্টেশন এই অসহায় নিরন্ন বিপন্ন মানুষগুলির দ্বারা আচ্ছন্ন থাকায় দেশের নৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা পঙ্কিল ও বিপর্যস্ত হইয়া পড়িতেছে। মাংসলোলুপ ধনী ব্যবসায়ী মক্কেলদের সামলাইতেই রামের প্রাণান্ত হইতেছে। দণ্ডকারণ্যকে

বাসযোগ্য ও নিরাপদ করিয়া ইহাদিগকে সেখানে চালান না করিলে রাজ্যের সমূহ বিপদ। রাবণের সমূহ বিপদ ইহারা অপসারিত হইলে। কলিকাতায় এবং কলিকাতার আশেপাশে ইহারা আছে বলিয়াই "চলবে না" মিছিলে একডাকে কয়েক হাজার মারীচ পাওয়া যায়; রাজভবন, মন্ত্রণাভবন, মহাকরণিকভবন, প্রধানমন্ত্রীভবন ঘেরাও করিয়া মন্ত্রী-পরিষৎকে বিচলিত ও শঙ্কিত করিবার ইহারাই একমাত্র অস্ত্র। সংগ্রাম ঘোষণা করিয়া প্রতিবাদ মিছিলে তেরটি লোক লইয়া কেরোসিনের কুপির মত টিমটিম করিতে করিতে লালদীঘি অভিযান করিলে বামপন্থীরা হাস্যাস্পদ হইবে। কাজেই যেন-তেনপ্রকারেণ দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা বানচাল করিতেই হইবে।

দুই পক্ষই প্রস্তুত হইতে লাগিল। হঠাৎ একদিন কুরুরাজসভায় শ্রীকৃষ্ণের মত শেষবারের জন্য রামভবনে রাবণের নিশীথাভিসার হইল। শরৎ মহারাজ কথিত 'লীলা-প্রসঙ্গে'র সে শিষ্যভাব আর নাই, একেবারে গুরুর সেই রণংদেহি-ভাব। রাম বলিল, আবার কী মতলবে?

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে বন্ধু এবং সখা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতা শুনিয়েছিলেন। আমি তোমার বন্ধু, সখা এবং ছোটভাইও। দাদা, এখনও বলছি নিবৃত্ত হও। নবযুগের গীতা তোমাকে শোনাতে এসেছি।

কার্লমার্কসের জবানিতে তো? ও আমার পড়া আছে।

না, আরও নতুন—

লেনিনের?

—না, আরও অভিনব—

স্টালিনের?

—না দাদা, তার পরেরও কথা আছে।

তবে পরের কথা যুদ্ধের পরে হবে। শ্রীকৃষ্ণ অনুশাসন-পর্বে অনুগীতা শুনিয়েছিলেন। তুমি অনুজ, অনুগীতা শোনাতে পার। সেই পর্বে তুমিও এসো, আমি প্রস্তুত থাকব।

দেখ, তোমার সঙ্গে প্যাক্ট যখন ভেঙেই গেছে, রুজিরোজগারের কথা আর তুলব না। তোমার কল্যাণের জন্যে বলছি, প্রতিনিবৃত্ত হও। তুমি হেরে যাবে।

রামচন্দ্রের রক্তে মৃত ভীম ঘোষের সিংহ-আত্মা গর্জন

শেষে উভয়পক্ষে যে আন-পার্লামেণ্টারি বিশেষণ ও সম্বোধন বিনিময় হইল, ঐতিহাসিকের তাহা রেকর্ডযোগ্য নহে। শেষ-দুইটি বাক্য মাত্র ঐতিহাসিক। রাবণ বলিল, ক্যাপিটালিস্ট-গ্র্যামফেড র‍্যাম, সাবধান, তোমাকে মাটন বানিয়ে চপ করে খাব।

রাম বলিল, দূর হ ভূশণ্ডির মাঠের র‍্যাভেন, কা কা করে আর দিক্ করিস না।

ইহার পর শেষ অঙ্কের প্রথম দৃশ্য। গড়ের মাঠে অক্টারলনি মনুমেণ্টের পাদদেশে শক্তিপরীক্ষা। রাবণের অর্গ্যানিজেশন নিখুঁত। হাজার হাজার বিপন্ন উদ্বাস্তু মারীচ সেখানে সমবেত হইয়া "চলবে না, চলবে না" ধ্বনিতে ফাটা মনুমেণ্টে আরও ফাট ধরাইতেছে। সমস্ত দিনের আয়োজনের উত্তেজনায় রাবণ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে উঠিল সবশেষে। তাহার নিঃশ্বাস লইতে কষ্ট হইতেছে। সে কষ্ট উপেক্ষা করিয়া সে বজ্রনির্ঘোষে বলিতে চেষ্টা করিল কিন্তু প্রেমাস্পদার কানে কানে প্রেমিকের গভীর আবেগকম্পিত মৃদু ফিসফিসের মতো মাইক ঘোষণা করিল—ভাই সব, জান দিয়াও মান রাখিতে হইবে। রক্তপায়ী ছারপোকাদের টিপিয়া টিপিয়া নিঃশেষে রক্তটুকু বাহির করিয়া লইয়া তবে মারিবে। মানুষের প্রাণ লইয়া এইভাবে গেণ্ডুয়া খেলা—মানুষ আমরা কিছুতেই ঘটিতে দিব না। মোটর-কারেই যাহাদের বিলাস-ভ্রমণ তাহারা নিরীহ দরিদ্র পথচারী মানুষকে চাপা দিতে পারিলেই খুশী হয়। কিন্তু পথের মানুষ সমবেত হইয়া যদি ঘুরিয়া দাঁড়ায়, গতির মুখে তাহাদের দুইদশটির প্রাণ হয়তো বলিদান হইতে পারে কিন্তু মোটরকারসহ ধনী বিলাসীকে ছাতুমাত্রে পর্যবসিত করিতে বেগ পাইতে হয় না। আমরা তাহাই করিব, ছাতু করিয়া দিব, ছাতু—

রাবণ হঠাৎ ডায়াসের উপরে এলাইয়া পড়িল। দর্শকশ্রোতাদের মধ্যে প্রথমে একটা অসহায় হতভম্ব ভাব কিন্তু তার পরেই হৈ-হৈ কোলাহল। সভা ভাঙিয়া গেল। বামপন্থী ডাক্তার মজুমদার ডায়াসের উপরেই ছিলেন, তিনি হাঁটু গাড়িয়া পরীক্ষান্তে বলিলেন,

ডাক্তার মজুমদার নিজের গাড়িতে করিয়া করোনারি-শেলাহত অচৈতন্য রাবণকে পি. জি. হাসপাতালে লইয়া গিয়া নিজের প্রতিষ্ঠাবলে কেবিনজাত করিলেন।

মারীচ-সম্প্রদায় উঠি-উঠি করিতেছে এমন সময় গগনবিদীর্ণ করিয়া রামচন্দ্রের জয়ধ্বনি শোনা গেল। দক্ষিণপন্থীরা বামপন্থীদের পরিত্যক্ত ডায়াস ও মাইক অধিকার করিয়া অচিরাৎ মনুমেণ্টপ্রকম্পী বক্তৃতা জুড়িয়া দিল। যাহারা চিরকাল "রামে মারিলেও মরিব, রাবণে মারিলেও মরিব" ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকে বক্তৃতার বিষয়বদলে তাহাদের কোনই আপত্তি হইল না। বাম ডাহিন, হৃদয়গ্রাহী করিয়া বলিতে পারিলে সব সমান। আর হৃদয়বিদারক ভাষা ও ভঙ্গিতে বলিবার ক্ষমতা রামচন্দ্রের ছিল। সে বজ্রনির্ঘোষে বলিল—ভাই সব, গড্ডলিকাপ্রবাহে গা ঢালিয়া আত্মহত্যা করিও না। যাহারা তোমাদের কল্যাণকামী সাজিয়া তোমাদিগকে হিতাহিতবিবেচনাহীন ভেড়ার মত নিশ্চিত মৃত্যুগহ্বরে নিক্ষেপ করিতে চাহিতেছে তাহারা তোমাদের শত্রু। নিজেদের স্বার্থসাধনে উহারা তোমাদের সর্বনাশসাধনে পশ্চাদপদ যে নয় তাহার প্রমাণ তোমরা বহুবার পাইয়াছ। ভাবিয়া দেখ, তোমাদের বুভুক্ষু মুখে উহারা কি এককণা তণ্ডুল দিতে পারিয়াছে, তোমাদের নগ্নগাত্রে কি একফালি জীর্ণবস্ত্রের আবরণ উহারা দিয়াছে? প্রতারকের কথায় ভুলিও না। ওঠো, জাগো, যাহা শ্রেয় তাহাই বাছাই করিয়া লও—

আকাট-বামপন্থী দুই চারিজন এখানে-ওখানে তখনও ছিল, তাহাদের মধ্যে একজন তীব্র ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আমাদের মা-বোনেদের ইজ্জত লইয়া রাত্রির অন্ধকারে ছিনিমিনি খেলিয়াছে কে? তোমার ধনী পৃষ্ঠপোষকদের দালালরা। আর আজ আমাদের ভাল করিতে আসিয়াছ তুমি? ফাই, ফাই অন ইউ।

হৈহৈ কোলাহল উঠিল। রামচন্দ্র কণ্ঠস্বর উচ্চতর করিয়া কোলাহল থামাইতে গেল কিন্তু দীর্ঘকাল জেলের মধ্যে নানা কায়িক অত্যাচার ভোগ করিয়া তাহার হার্ট জখম হইয়াছিল। নিতান্ত মনের জোরে সে দৌড়ধাপ বক্তৃতা করিয়া বেড়াইত বটে কিন্তু ভঙ্গুর দেহ আজ আর এতখানি উত্তেজনার ভার সহিতে পারিল না। শ্রীরামচন্দ্র ঘোষ বাতাহত কদলীর ন্যায় মাইকের উপরেই ঢলিয়া পড়িল।

সন্তর্পণে সশ্রদ্ধভাবে রামভক্তেরা পশ্চিমবঙ্গের শ্রেষ্ঠ বৈদ্যের পরামর্শমতে রামচন্দ্রকে পি. জি. হাসপাতালে লইয়া গেল, সেখানে সর্বশ্রেষ্ঠ কেবিনে তাহাকে ভর্তি করা হইল।

পরদিন প্রাতে দুই পরস্পরবিরোধী উত্তেজনার বশে যখন শহরবাসী দুই দলে বিভক্ত হইয়া শোভাযাত্রা করিতে ও শোভাযাত্রা ভাঙিতে তৎপর হইয়াছে, হাতবোমা, ইটপাটকেল বর্ষণে রাস্তার বাতি, পথনির্দেশক বৈদ্যুতিক চিহ্ন এবং ফায়ারব্রিগেডের আহ্বান-যন্ত্র একদল ভাঙিতেছে এবং অন্য দল লাঠি ও কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগে তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিতেছে, ট্রাম পুড়িতেছে, বাস পুড়িতেছে এবং ধরপাকড় এমন কি গুলিবর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে, পি. জি. হাসপাতালে তখন দুই বন্ধু একই কামরায় মিলিত হইয়াছে। রাবণ অপেক্ষাকৃত অল্প সময়েই সুস্থ হইয়াছিল, বারান্দায় পায়চারি করিতে করিতে হাওয়ায় ওড়া পর্দার ফাঁক দিয়া শয্যাউপবিষ্ট রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইয়া ভিতরে ঢুকিয়া অনাবিল উচ্ছ্বাসে তাহাকে কুশল প্রশ্ন করিয়াছে। তাহাকে এক ভক্তিময়ী বামপন্থী গতরাত্রেই একটিন নেসকফি ভেট দিয়া গিয়াছিল। সে নিজের কেবিনে গিয়া নার্সের কাছে দুধ ও গরম জল চাহিয়া লইয়া দুই কাপ কফি পরিপাটি ভাবে প্রস্তুত করিয়া রামচন্দ্রের কেবিনে লইয়া আসিয়াছে এবং রামচন্দ্রও উপহৃত কোলে বিস্কুটের টিন খুলিয়া মুচমুচে নোনতা বিস্কুট বাছাই করিয়া রাবণকে দিয়া নিজেও লইয়াছে এবং পরস্পরকে তারিফ করিতে করিতে কফি সহযোগে বিস্কুট ভক্ষণ অন্তে রামচন্দ্র 'করোনা' চুরুট ও রাবণচন্দ্র 'চারমিনার' সিগারেট ধরাইয়া আরাম করিয়া টানিতেছে দেখা গেল।

কলিকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ হার্টস্পেশালিস্ট ডাক্তার ব্যানার্জি বেলা ঠিক দশটায় রোগী পরিদর্শনে আসিয়া দুই দেশবিখ্যাত রোগীকে একই কেবিনে একই শয্যায় ওই ভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া মৃদু হাস্য করিলেন। তাঁহার চোখেমুখে একটা প্রশ্নের ভাব ফুটিতে দেখিয়া রামচন্দ্র একটু জবাবদিহি করা আবশ্যক মনে করিল। সেও হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, আমরা বাল্যবন্ধু, ডক্টর ব্যানার্জি।

ডক্টর ব্যানার্জির মুখফোড় দুর্নাম আছে। তিনি বলিলেন, রামরাবণে তো বেশ একসঙ্গে বসে কফি-বিস্কুট-তাম্রকূটধূমের সঙ্গে আঁতাত করছেন, ওদিকে যে বেচারা মারীচদের রক্তে কলকাতার রাজপথ ভেসে গেল। মারামারি চলছে এখনও। আর. জি. কর, ন্যাশনাল, নীলরতন, মেডিকাল, ইসলামিয়ার সব বেড ভর্তি, এখন শম্ভুনাথ উপচে আমাদের এখানেও ঠেল মারছে। এমার্জেন্সী ওয়ার্ড আর কোপ করতে পারছে না।

রাম রাবণ উভয়ে একসঙ্গে লজ্জায় মাথা নীচু করিল।

সম্বুদ্ধ

মহাভারত-কথা

অষ্টাদশ দিবসে অষ্টাদশ-অক্ষৌহিণী সেনা নিঃশেষ হইল। যোদ্ধ্রভাবে মহাসমর নিরস্ত হইল। বিজেতা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির সর্বজনসম্মতিক্রমে হস্তিনাপুরীর সিংহাসনে সমারূঢ় হইলেন।

দীর্ঘকাল তিনি রাজ্যভোগ করিলেন। তিনি দিগ্বিজয় করিলেন, অশ্বমেধ করিলেন, এবং আরও বহু বহু মহাকর্মানুষ্ঠানের অন্তে সশরীরে স্বর্গযাত্রা করিলেন। তাঁহার সেই মহাজীবনের মহাকাহিনী মহামুনি ব্যাসদেব গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু ব্যাসদেব চারণধর্মী কবি। মহাভারতের কাহিনী মূলতঃ কুরুক্ষেত্র-মহাসমরের কাহিনী। সে কাহিনীর আদিপর্ব উদ্যোগপর্ব সমরপর্ব এবং উত্তরকালের দিগ্বিজয়-পর্ব তিনি যাদৃশ ধৈর্য ও নিষ্ঠাসহকারে সবিস্তারে বর্ণন করিয়াছেন, রাজ্যশাসন-পর্ব তাদৃশ করেন নাই।

ব্যাসদেব কর্তৃক অনুক্ত ভারত-কাহিনীর একটি অধ্যায় এই নিবন্ধে বর্ণিত হইল।

সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির রণক্লিন্ন ভারতভূমিকে সর্বথা সুসংবদ্ধ ও সুসন্নিবিষ্ট করিতে মনোযোগী হইলেন। ভাগ্য তাঁহার অনুকূল, এক্ষণে পুরুষকারও তাঁহার সহায় হইল। শত্রুপক্ষ সমূলে নির্জিত ও উৎপাটিত। যুধিষ্ঠির বিদ্বান ও জ্ঞানপ্রবীণ। মহাবল ভ্রাতৃচতুষ্টয়, মহাকৌশলী শ্রীকৃষ্ণ ও মহারথ রাজন্যবর্গ তাঁহার অনুগত। মহাজ্ঞানী ঋষিগণ তাঁহার নিত্যসহচর। তিনি রাজধর্মে পারদর্শী, সত্যসন্ধ, জিতেন্দ্রিয় ও জিতধী বলিয়া বিখ্যাত, সৌম্যমূর্তি সৌম্যপ্রকৃতি সৌম্যভাষী বলিয়া বিজ্ঞাত। রাজ্যের শৃঙ্খলা-বিধানে এই সমস্তই তাঁহার সহায়ক হইল। স্থান কাল ও পাত্রভেদে তোষণ, শোষণ পোষণ ও শাসন, এই নীতি-চতুষ্টয়ের যথোচিত প্রয়োগ দ্বারা তিনি অচিরাৎ সসাগরা জম্বুদ্বীপকে স্ববশে আনয়ন করিলেন। এই বিচিত্র মহাভূমির সর্বত্র শান্তি ও সাম্যের বাণী প্রসারিত হইল।

কেবল ইহাই নহে। যাহা কোন রাজা কোনদিন করে নাই, করিবে না—ধর্মান্তরপরায়ণ ম্লেচ্ছ প্রজাবৃন্দের প্রীতিবিধান-মানসে তিনি স্বেচ্ছায় স্বীয় রাজ্যকে খণ্ডিত করিলেন; পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে দুইটি বৃহৎ ভূভাগ স্বীয় শাসন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকে ম্লেচ্ছজাতির স্বকীয় আবাসভূমি বলিয়া ঘোষিত করিলেন। আর্যেতর জাতিদিগের মধ্যে ধন্য ধন্য রব পড়িয়া গেল। দানশূর সমদর্শী ধর্মরাজের নাম ও কীর্তি দেশে দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

নিয়ত বিরাম ও বিশ্রামবিহীন হইয়া যুধিষ্ঠির রাজ্যের সর্ববিধ উন্নতিসাধনে যত্নবান্ হইলেন। ভারতের মহিমা প্রচার, মৈত্রী ও বাণিজ্য বিস্তার ও ধনাগমের উদ্দেশ্যে

তিনি কখনও স্বয়ং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বহু দেশে দেশে ভ্রমণ করিলেন; কদাচ বা স্বরাজ্যে থাকিয়া বিদেশাগত রাজন্য ও রাজদূতগণকে স্বাগত জানাইলেন। দিকে দিকে তাঁহার খ্যাতি, দেশে দেশে তাঁহার সমাদর। ভারতের কেন, পৃথিবীরই কোন রাজা বা শাসক এতাদৃশ বিপুলা কীর্তির অধিকারী হইয়াছেন কিনা সন্দেহ।

কেবল বিদেশে নহে, স্বদেশেও তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার তুলনা ছিল না। তাঁহার উচ্চারিত সামান্য বাক্যও কণ্ঠে কণ্ঠে সংগৃহীত ও ধ্বনিত হয়, তাঁহার প্রতিটি নির্দেশ ও বাণীকে রাজ্যের আবালবৃদ্ধবনিতা আপ্তবাক্য-তুল্য জ্ঞান করে, তিনি পথে বাহির হইলে তাঁহার দর্শন-লাভমানসে অসূর্যম্পশ্যা কুলবালা কুলবধূগণ উন্মুক্ত রাজপথে দৃশ্যমানা হন, রাজ্যের সকল শিশু স্বতঃ তাঁহাকে পিতৃব্য-সম্বোধন করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করে।

ভ্রাতা ও রাজন্যবর্গকে যুধিষ্ঠির বিশেষ বিশেষ কর্তব্যে নিযুক্ত করিলেন। পররাষ্ট্রের সহিত সদ্ভাব স্থাপন ও রক্ষা করিতে হইলে বহুদর্শী ও বহুভাষী হইতে হয়, অতএব সে কর্তব্যটি তিনি স্বীয় স্কন্ধেই ন্যস্ত রাখিলেন। ভীমবল ভীমসেন রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা ও শাসনের ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিলেন, মন্ত্রণাসভায় স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের পরেই তাঁহার স্থান নির্দিষ্ট হইল। অর্জুন ও তাঁহার বিকল্পে শ্রীকৃষ্ণ, সেনাবাহিনীর ভার প্রাপ্ত হইলেন। বিশ্বরাজন্যসভায় কোন দৌত্য বা আলোচনা আবশ্যক হইলে তাহার ভারও শ্রীকৃষ্ণের উপরে অর্পিত হইল—বাগ্মিতায় ও বাক্-কৌশলে তাঁহার তুল্য আর কেহই ছিল না।

সর্বভূতে সমদর্শী যুধিষ্ঠির ঘোষণা করিলেন, তাঁহার রাজ্যে মানুষে মানুষে প্রভেদ নাই, তুল্য যোগ্যতাশালী সকলেই তুল্য মর্যাদার অধিকারী হইবে। অভিজাত ও অনভিজাতের, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের সামাজিক মর্যাদা-বিভেদ হ্রাস পাইল। জাতি, ধর্ম, ভাষা বা প্রদেশ-ভেদে আদর-ভেদ লুপ্ত হইল। সকলেই সমান, সকলেই তুল্যাধিকারী। প্রত্যেক জাতির, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠান অব্যাহত হইল। প্রত্যেকের আনন্দ-উৎসবে ও অনুষ্ঠানে যাহাতে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলেই অংশ গ্রহণ করিতে পারে, তজ্জন্য স্থির হইল, প্রত্যেকের প্রতি পর্বদিনে সমগ্র প্রজা ও রাজপুরুষগণ কর্ম-বিরতি উপভোগ করিবেন। ভাদ্রপদের কৃষ্ণা-অষ্টমী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি, এবং যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকও ওই তিথিতেই হইয়াছিল। অতএব প্রতি বৎসর উক্ত তিথিটি সর্বজনীন জাতীয় উৎসব ও সমারোহ-দিবস বলিয়া গণ্য হইল। যুধিষ্ঠিরের শাসন-প্রতিষ্ঠা, আগামীকালের দেশবাসীর নিরাপদ জীবন ও সমৃদ্ধির সূচনাস্বরূপ; অতএব তাঁহার নিজস্ব জন্মতিথিটি রাজ্যের সর্বত্র শিশু-মহোৎসবের দিন বলিয়া ধার্য হইল।

এবংবিধ ভূয়িষ্ঠ সদ্বিধান প্রাপ্ত হইয়া প্রজাগণ যৎপরোনাস্তি হৃষ্ট হইল। তাহারা সকলে একবাক্যে কহিল, ত্রেতায় শ্রীরামচন্দ্রের পরে আর কোন রাজা এরূপ সুশাসক ও সুখ্যাত হন নাই। জম্বুদ্বীপে রামরাজ্যের পুনরাবির্ভাব হইল বলিয়া তাহারা আনন্দে অধীর হইল। তাহারা জানিত না রামরাজত্বে একাধিপত্য ছিল রাম-চরণাশ্রিত বানর-সেনার।

রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষের অবসানে ভীমসেন নিবেদন করিলেন, তিনি কর্ম হইতে অবসর চাহেন, তীর্থযাত্রা করিবেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভ্রাতঃ, কেন তোমার এই অকাল নির্বেদ? আমি কি কোন কারণে তোমার অপ্রীতি বা অপ্রত্যয়ের ভাজন হইয়াছি?

ভীমসেন দুই কর্ণ স্পর্শ করিলেন, কহিলেন, এরূপ উক্তি শ্রবণ করাও পাপ। আপনার সমালোচনা আমার দ্বারা সম্ভবে না, এবং আপনার চরিত্রও ত্রুটি-বিচারের অতীত। আমি অব্যাহতি চাহিতেছি, কারণ এই নিষ্কর্ম কর্মজীবন আমার ভাল লাগিতেছে না। আমি আজন্ম যোদ্ধা, ভীষণ রণক্ষেত্রে ভীষণা গদা স্কন্ধে বিচরণ করাকেই চিরদিন সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ বলিয়া জ্ঞান করিয়াছি। এই সুখরাজ্যে সর্বত্র শান্তি; আপনি নিরপেক্ষ সর্বাঙ্গীণ শান্তির উদ্গাতা। এই নীতি সর্বথা প্রশংসনীয়, কিন্তু আমার পক্ষে ইহা দুষ্পাচ্য। রণক্ষেত্রের পরিবর্তে

গৃহকোণে, গদার পরিবর্তে লেখনী সঞ্চালন করিয়া আমার দিন কাটিতেছে। ব্যায়ামাভাবে আমার বাহু শীর্ণ ও কটিদেশ পীন হইতেছে। আমি বৃকোদর, দ্রুত বৃষোদরে পরিণত হইতেছি। রণ-হুঙ্কারের পরিবর্তে জৃম্ভনধ্বনি মাত্র আমার কণ্ঠে নির্গত হইতেছে। এই অবস্থা অসহনীয়।

কেন ? এই সেদিন-মাত্র তুমি বিদ্রোহী হয়-দ্রবপতিকে পরাভূত করিয়াছ, তাহার অতি-তেজস্বী সেনাপতি রেজভীঃকে নির্জিত ও বন্দী করিয়াছ।

ওই একটিমাত্র। গণ্ডুষমাত্র সরিৎপানে কি অগস্ত্যের তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় ? তাহাতে তৃষ্ণার বৃদ্ধিমাত্র। আমাকে ক্ষমা করুন। আমার প্রতি রুষ্ট হইবেন না। যতদিন আমার প্রয়োজন ছিল, আমি নির্বিচারে কর্তব্য পালন করিয়াছি। এই সুখরাজ্যে আমি অর্থহীন। আমি যুদ্ধ জানি, সুখশয্যা চিনি না। আমার নয়নদ্বয় নিশাজাগরণ-ক্লান্ত, আমার মধ্যদেশ বাতবেদনা-কাতর। দয়া করুন, এই আলস-শয়ন হইতে আমাকে মুক্তি দিন।

যুধিষ্ঠিরের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। সস্নেহে ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিলেন, কহিলেন, তোমার ব্যথা আমি বুঝিয়াছি। বেশ, বল, কি তোমার অভিপ্রায় ?

ভীম কহিলেন, আমার নিকট হইতে এই কর্মভার ফিরাইয়া লউন। আমি নিরুদ্দেশ তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইব।

কোথায় যাইবে ?

তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। তীর্থে তীর্থে কিছুদিন ভ্রমণ করিবার সঙ্কল্প আছে, হয়তো দেশান্তরেও যাইব। আর, এই পৃথিবীতে ভ্রমণ করিয়া যদি পরিতৃপ্ত না হই, হয়তো স্বেচ্ছায় যমপুরীর পথেই চলিয়া যাইব।

সে কি কথা! না না, তাহা যাইও না। আমরা সকলে এইখানে রহিলাম, তুমি একাকী যমালয়ে যাইবে কি!

গেলামই বা। বনবাসে, অজ্ঞাতবাসে, বহুবার বহু যাত্রায় আমিই অগ্রগামী হইয়াছি। পূর্বগামী সেনাস্বরূপ আমি গিয়া নবতর দেশ আবিষ্কার করিয়াছি, নিষ্কণ্টক করিয়াছি, আপনারা পরে গিয়া তথায় নির্বিঘ্নে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। হিড়িম্ব, বক প্রভৃতি রাক্ষসবৃন্দ এইরূপেই নিহত হইয়াছিল। তাহারই না হয় পুনরাবৃত্তি হইবে—আমি অগ্রে যমলোকে পৌঁছিয়া আপনাদিগের জন্য স্থান রচনা করিয়া রাখিব। আর বাধা দিবেন না, আমাকে বিদায় দিন।

যুধিষ্ঠির তাঁহাকে পুনরায় আলিঙ্গন করিলেন, সাশ্রুনেত্রে কহিলেন, দিলাম।

ভীমকর্মা ভীমসেন রাজসভা হইতে অবসৃত হইয়াছেন, এই সংবাদ শ্রবণে প্রতিবেশী নবসৃষ্ট ম্লেচ্ছরাজ্য, ও রাজ্যমধ্যস্থ অনার্য-প্রদেশে মহা উৎসব পড়িয়া গেল। স্নিগ্ধ-প্রকৃতি যুধিষ্ঠিরের রাজ্যে একমাত্র ভীমসেনকেই তাহারা ভয় করিত।

দীর্ঘ দশবৎসর কাল যুধিষ্ঠির নিষ্ঠাভরে রাজ্যপালন করিলেন। দেশ-দেশান্তর হইতে বহু জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির আগমন ও সমাবেশের ব্যবস্থা করিলেন। ইঁহাদিগের শিল্প-কৌশলে দেশের সর্বত্র বৃহৎ বৃহৎ কর্মশালা ও শক্তিসঞ্চারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইল ; কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, সর্বক্ষেত্রে নবীনতর কর্মোদ্যম ও সমৃদ্ধির সূচনা দেখা যাইতে লাগিল।

একাদশ বর্ষের প্রান্তে পৌঁছিয়া যুধিষ্ঠির ক্লান্তি অনুভব করিলেন। প্রজাবর্গ একান্তভাবে তাঁহারই মুখাপেক্ষী, অমাত্যবর্গ সমস্ত কার্যে কেবল তাঁহারই নির্দেশ চাহিয়া বসিয়া থাকেন। একা তিনি কত পারিবেন ? ধর্মপুত্র, তথাপি তিনি মানবী-সন্তান। প্রথম বয়সে সুখ-লালিত রাজপুত্র, মধ্যবয়সে বনবাসে ও রণক্ষেত্রে নানাবিধ অনভ্যস্ত কৃচ্ছ্র বহন করিয়াছেন, এক্ষণে বৃদ্ধবয়সে তাঁহার সে উদ্যমের গতি স্তিমিত হইয়া আসিল। গণনা করিয়া দেখিলেন, বয়স সপ্ততির রেখা স্পর্শ করিয়াছে।

তখন তিনি একদিন ভ্রাতা ও অমাত্যবর্গকে একত্র আহ্বান করিলেন। কহিলেন, আমি কিঞ্চিৎ ক্লান্তি বোধ করিতেছি, অবসর গ্রহণ করিতে চাহি। তোমরা আমার কার্যভার গ্রহণ কর।

তাঁহারা সমস্বরে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। কহিলেন, আপনি কি দোষে আমাদিগকে ত্যাগ করিতেছেন ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, তোমাদের দোষ নাই। আমিই ক্লান্ত, জরায় আক্রান্ত। শক্তির অবসানেও দুর্বল হস্তে দণ্ডধারণ করিয়া থাকার অর্থ হয় না, তাহাতে রাজ্যের হানি। আমি কিছুই ত্যাগ করিতেছি না, কিঞ্চিৎ অবসর মাত্র চাহিতেছি। আর এই অবসরও চিরদিনের জন্য নহে, সাময়িক মাত্র। বিশ্রামান্তে পুনরায় তোমাদিগের সহিত মিলিত হইব, পুনরায় কর্মভার স্বীকার করিব। আমি এই জাতির সেবক, চিরদিন তাহাই থাকিব।

ভ্রাতারা তর্ক করিলেন না। দেবী দ্রৌপদীও সম্মতি দিলেন। কিন্তু অমাত্য ও রাজপুরুষগণ কিছুতেই সম্মত হইলেন না। যুধিষ্ঠির না থাকিলে তাঁহাদিগের সমূহ প্রমাদ। যুধিষ্ঠির নিরতিশয় স্নিগ্ধস্বভাব ও ক্ষমাশীল। প্রকাণ্ড-পরিমাণ অন্যায় বা কর্মে অবহেলা করিলেও তিনি মৃদু-ভর্ৎসনার অধিক দণ্ডবিধান করেন না ; তাহাও করেন অতি সসংকোচে—যেন তিনি স্বয়ংই অপরাধী। এমন মৃদু বিচার, অন্যায় ও কর্তব্যহানির এমন নির্বিচার ক্ষমা, আর কাহার নিকটে মিলিবে ? আর কে আছেন, যিনি সমস্ত অপবাদ অভিযোগ নিজে স্বীকার করিয়া লইবেন তথাপি আশ্রিত অনুচরদিগকে সর্ববিধ শাস্তি ও নিগ্রহ হইতে রক্ষা করিবেন ? হায়, যুধিষ্ঠির না থাকিলে এত সুখের রামরাজত্বেরও এইখানেই ইতি !

পূর্ণ সপ্তাহকাল যাবৎ উভয়পক্ষে বিতর্ক ও মিনতি বাক্যের স্রোত বহিতে লাগিল। যুধিষ্ঠির বারংবার করুণকণ্ঠে কহিলেন, আমার অবস্থাটা বুঝুন, আমাকে কি মারিয়া ফেলিবেন ?

রাজপুরুষগণ ততোধিক করুণকণ্ঠে কহিলেন, তবে আপনিই আমাদিগকে মারিয়া ফেলুন। আপনি যদি না থাকেন, তবে আমরা আর কয়দিন।

এই অশ্রুবর্ষণের প্রতিযোগিতায় অবশেষে তাঁহারাই জয়ী হইলেন, কারণ তাঁহারা বহু, যুধিষ্ঠির একক। তাঁহাদিগের অগণিত নয়নের অজস্র অশ্রুপ্লাবনে একাকী যুধিষ্ঠিরের দুইটি মাত্র নয়নের দুইটি মাত্র অশ্রুবিন্দু কোথায় ভাসিয়া গেল। যুধিষ্ঠির তর্কে ভঙ্গ দিলেন। সম্ভবতঃ ইহাদিগের ক্রমাগত ও নিয়মিত স্তববাক্যে মোহিতও হইয়াছিলেন। কহিলেন, বেশ, যাইব না।

তখন সেই রাজপুরুষগণ কহিলেন, কিন্তু আপনি শ্রান্ত, এ কথাটিও অবিস্মরণীয়। আপনি আমাদিগের উপরোধ রক্ষা করিয়াছেন, আমরাও আপনার আবেদনপত্র বিবেচনা করিয়া দেখিব।

ক্রমে সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল, যুধিষ্ঠিরকে দুই মাস কালের জন্য বিশ্রামের অনুমতি দেওয়া হইবে। হিমালয়-পৃষ্ঠে স্বনির্ঝর মন্দাকিনী-কুলুকুলিত স্নিগ্ধ উপত্যকাভূমিতে তিনি বিশ্রামার্থে গমন করিবেন, তথায় পর্বতপৃষ্ঠের নির্মল বনশোভা ও রাষ্ট্র-কচালানভিজ্ঞ সরলচিত্ত পর্বতবাসীদিগের সাহচর্যে মনের ক্লান্তি অপনোদন করিবেন, নিতান্ত প্রয়োজন হইলে অমাত্য ও সচিববর্গ সেই স্থলে তাঁহার নিকটে নির্দেশ প্রার্থনা করিতে যাইবেন। অথবা হয়তো তিনিই মধ্যে মধ্যে প্রয়োজনবোধে মর্ত্যভূমিতে অবতরণ করিবেন।

উপত্যকাভূমিতে সর্বসুখপ্রদ গৃহ নির্মিত হইল। যুধিষ্ঠির মহা সমারোহে তথায় উপনীত হইলেন। দুই মাসকাল তিনি সেই গৃহে বাস করিলেন। সেই সময়ের মধ্যে বহু সচিব ও রাজপুরুষ বহু সূত্রে তাঁহার সহিত পরামর্শ বা নির্দেশ প্রার্থনা ব্যপদেশে বিনাব্যয়ে হিমালয়-ভ্রমণ সারিয়া লইলেন। একাধিকবার তাঁহাকেও পর্বতবাস হইতে নিম্নভূমিতে ছুটিয়া আসিতে হইল। বিশ্রাম-বিহীন বিশ্রাম ভোগের অন্তে যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

এই বিশ্রাম-ছলনার দ্বারা যুধিষ্ঠিরের ক্লান্তিভার কতদূর অপনোদিত হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা অন্যের অসাধ্য। কিন্তু এই ঘটনা হইতেই পরবর্তীকালে বহুতর অনিষ্টের সূত্রপাত হইল।

যুধিষ্ঠির সর্বত্র সমাদৃত ; তাঁহার প্রকৃতির জন্যও বটে, নীতির জন্যও বটে, সকলের সম্মাননীয়। তিনি সকলকেই

মিত্রজ্ঞান করেন, কাহাকেও বৈরনেত্রে দেখেন না, আঘাত পাইয়াও প্রত্যাঘাত করেন না। পরস্পর মর্মান্তিক বৈরভাবাপন্ন রাজগণও প্রত্যেকে এককভাবে যুধিষ্ঠিরের বন্ধু বলিয়া গণ্য। তাঁহার সহিত প্রকাশ্য বৈর কেহ করিতে চাহিলে সে ব্যক্তি জগৎসমক্ষে স্বতঃই ধিক্কৃত হইবে, এইরূপ আশঙ্কায় এযাবৎ কেহ তাঁহার বা তাঁহার রাজ্যের অনিষ্ট চেষ্টা করে নাই।

কিন্তু তিনি ক্লান্ত হইয়াছেন, কর্মভার স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিতে চাহিতেছেন, এই বার্তা বিদ্যুদ্বেগে দিগ্বিদিকে প্রচারিত হইল। রাজ্যের বাহিরে ও অভ্যন্তরে যে সকল অনিষ্টবুদ্ধি এতকাল বিপদের ভয়ে নিশ্চেষ্ট হইয়া ছিল, তাহারা অকস্মাৎ উল্লসিত ও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষে, দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে সমুদ্রতীরে অবস্থিত কেরল রাজ্যে অন্তর্দ্রোহ দেখা দিল।

তথাকার অমাত্যমণ্ডলী প্রজাবর্গের দ্বারা নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের কর্মনীতি সর্বাংশে যুধিষ্ঠিরের মনঃপূত নহে, তথাপি প্রজাগণের ইচ্ছানুক্রমে তিনি তাঁহাদিগের পদাভিষেক স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। অমাত্যগণও রাজ্যশাসনে নানাবিধ নূতন প্রণালী ও সংস্কার প্রবর্তনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এক্ষণে প্রজাবর্গ অকস্মাৎ সেই অমাত্যমণ্ডলীর কার্যে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। অমাত্যগণ কহিলেন, তাঁহাদিগের বিরোধীপক্ষগণই কৌশলে প্রজাকে উত্তেজিত করিতেছে। তাঁহারা দ্রোহ দমনের চেষ্টা করিলেন, ফলে বিসংবাদ আরও বৃদ্ধি পাইল।

রাজ্যে বিশৃঙ্খলার উদ্যোগ যখন তীব্র হইল, যুধিষ্ঠির তৎপর হইয়া প্রজাবর্গের নিকটে এক বাণী প্রেরণ করিলেন। বলিলেন, এই অমাত্যবর্গ তোমাদেরই দ্বারা নির্বাচিত। তোমরা যদি ইহাদিগকে না চাহ, কাহাকে চাহ, বল। প্রজারা যুধিষ্ঠিরের বাক্যে তৃপ্ত হইল, তাঁহার মনোনীত ব্যক্তিগণকে একবাক্যে নূতন অমাত্য বলিয়া নির্বাচন করিয়া লইল। যুধিষ্ঠিরের নামের প্রভাব তখনও এইরূপ প্রবল ছিল।

পশ্চিম ও পূর্বপ্রান্তে নবগঠিত ম্লেচ্ছরাজ্য। তাহারা ক্রমাগত সীমান্তপ্রদেশ আক্রমণ করিত, নানাবিধ উপদ্রব সৃষ্টি করিত। ম্লেচ্ছদিগের জন্য পৃথক রাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে যুধিষ্ঠির স্বেচ্ছায় স্বরাজ্যকে বিভক্ত করিয়াছিলেন। তৎকালে উভয়পক্ষই প্রজাবর্গকে এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন, অতঃপর ম্লেচ্ছভূমি হইতে সমস্ত আর্যসন্তানকে আর্যভূমিতে লইয়া আসা হইবে, আর্যরাজ্যে অবস্থিত সকল ম্লেচ্ছ তাহাদিগের নিজস্ব রাজ্যে চলিয়া যাইবে, পরস্পর-বিরুদ্ধ-ধর্মাবলম্বী জনগণ নিয়ত একত্র বাস করিবার ফলে যে বিড়ম্বনার সৃষ্টি এতাবৎকাল হইতেছিল, তাহা নিরাকৃত হইবে, এই আশ্বাসবাক্যে বিশ্বাসস্থাপন করিয়াই কলহক্লান্ত আর্যগণ দেশবিভাগে সম্মত হইয়াছিল।

ম্লেচ্ছগণ নানাবিধ বলে ও কৌশলে তত্রত্য আর্যসন্তানগণকে বিপর্যস্ত ও বিতাড়িত করিতে লাগিল, তাহারা সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া ভারতভূমিতে আসিয়া আশ্রয়-ভিক্ষু হইল; কোনমতে ভিক্ষামুষ্টি দান করিয়া যুধিষ্ঠির তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিলেন, এবং ক্রমশঃ রাজ্যের সর্বত্র ইহাদিগকে ভূমি ও কর্ম দিয়া শনৈঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন। আর্যভূমিতে অবস্থিত ম্লেচ্ছগণ কিন্তু যে যেমন ছিল রহিয়া গেল, তাহাদিগকে বিতাড়নের কোন উদ্যমই যুধিষ্ঠির করিলেন না। বিভেদনির্বিশেষে সমদর্শন ও প্রজাপালনই তাঁহার রাজধর্ম ছিল। ইহাতে ম্লেচ্ছগণ আশ্বস্ত, আর্যদিগের একাংশ অসন্তুষ্ট এবং ম্লেচ্ছরাজ্যের আর্যদ্বেষী শাসকবৃন্দ উল্লসিত হইলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, আঘাত করিলেও যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে প্রত্যাঘাত করিবেন না। অতএব ম্লেচ্ছসেনা ক্রমশঃ রাজ্যের সীমান্তদেশে অনুপ্রবিষ্ট হইতে লাগিল। যুধিষ্ঠির কখনও বা শান্তির প্রার্থনাবাণী প্রচার করিয়া ক্ষুব্ধ প্রজাকে শান্ত রাখিলেন, কখনও বা ম্লেচ্ছদিগের অধিকৃত বা প্রদাবিত ভূমিখণ্ড ও গ্রাম তাহাদিগকেই ছাড়িয়া দিয়া বৃহত্তর আক্রমণের সম্ভাবনাকে কথঞ্চিৎ ঠেকাইয়া রাখিলেন। এই মহত্ত্বের মূল্য ম্লেচ্ছরা বুঝিল না; তাহারা সাক্ষাতে তাঁহাকে মহানুভব বলিয়া স্তুতি করিত। কার্যোদ্ধার

করিত, স্বগৃহে বসিয়া তাঁহাকে বৃহন্নলাগ্রজ নামে আখ্যাত করিত।

এই ব্যাপার প্রথমাবধিই চলিতেছিল, কখনও মন্দবেগে কখনও বা তীব্রতর গতিতে। এক্ষণে, যুধিষ্ঠিরের বৈকল্য-স্বীকৃতির পর হইতে ম্লেচ্ছদিগের বিক্রম বাড়িল। সীমান্তরেখা ও সীমান্ত-চুক্তি বারংবার ও বিনা দ্বিধায় লঙ্ঘিত হইতে লাগিল।

উত্তর-দেশে, হিমালয়ের পরপারে খর্বনাসা ও তির্যক্‌-দর্শী চৈনিক জাতির বাস। যুধিষ্ঠিরের রাজত্বের ষষ্ঠ ও অষ্টম বর্ষে তাহাদিগের রাষ্ট্রপ্রধান যুধিষ্ঠিরের সহিত মৈত্রীকামনায় জম্বুদ্বীপে আগমন করিয়াছিলেন, উভয় রাষ্ট্রপতির ও উভয় রাষ্ট্রের গভীর সম্প্রীতি ও নীতি-সাম্যের বহুল প্রমাণ সাড়ম্বরে নিখিল বিশ্বে প্রচারিত হইয়াছিল।

যুধিষ্ঠিরের হিমালয়-প্রবাসের বিবরণ সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছিল, চীনদেশেও সে বার্তা পৌঁছিয়াছিল। অচিরাৎ একদিন সংবাদ আসিল, চৈনিক সেনা হিমালয়-গিরিবর্ত্ম পার হইয়া ভারতের সীমান্তরেখা লঙ্ঘন করিয়াছে, দেশের অভ্যন্তরে বহুদূর অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, এবং আরও ভূয়িষ্ঠতর ভূভাগ সহ সমগ্র হিমালয়-গিরিপ্রদেশকে তাহাদিগের রাজ্যভুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

এই সংবাদে ভারতের জনতা উদ্বেল হইয়া উঠিল। স্বীয় দেশের অঙ্গহানি কেহই স্বেচ্ছায় স্বীকার করিতে চাহে না। ম্লেচ্ছরাজ্যের জন্য বিস্তীর্ণ দেশখণ্ড ছাড়িয়া দিয়াও বাঞ্ছিত ফললাভ করা যায় নাই। চীন-প্রধান অল্পদিন মাত্র পূর্বে এই রাজ্যে ভ্রমণ এবং বহুবিধ ভাষা ও ভঙ্গীসহকারে মৈত্রী-বাক্য বিবৃত করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার এই আকস্মিক রূপ-পরিবর্তনকে একান্তরূপেই লবণ-স্বাদ-বিস্মৃতি ব্যতীত আর কিছুই বলা চলে না। এই অকৃতজ্ঞতা ও মিথ্যাচরণে ভারতের জনতা বিক্ষুব্ধ হইল। অপিচ, আর্যজাতি নাসা-গৌরবদীপ্ত; খর্বনাসা চৈনিকগণ এমন অবলীলাক্রমে তাহাদিগের নাসা মর্দন করিয়া দিল, এই চিন্তা তাহাদিগকে অস্থির করিয়া তুলিল। যুধিষ্ঠির অতি কষ্টে তাহাদিগকে শান্ত রাখিলেন, স্বয়ং উপযাচক হইয়া চীনাধিপতির সাক্ষাৎপ্রার্থী হইলেন। কহিলেন, যুদ্ধে কি ফল। যুদ্ধ করিয়া কি হয় তাহা তো কুরুক্ষেত্রেই সম্যক্ দেখিয়াছি। কুরুক্ষেত্রের পূর্বে আমি আলাপ-আলোচনা দ্বারা কলহের মীমাংসা করিতে চাহিয়াছিলাম। দুর্যোধন তাহাতে স্বীকৃত হইলে এমন করিয়া কৌরবের বংশনাশ হইত না। যুদ্ধে কাজ নাই, আসুন মীমাংসা করি। আপনারা কতটুকু চাহেন?

চীনাধিপতি পুনঃপুনঃ পত্রালাপে ও বিলম্বিত সাক্ষাৎকারে কালহরণ করিতে লাগিলেন। অসহায় যুধিষ্ঠির তাহাতেই স্বস্তিবোধ করিলেন। ইতিমধ্যে চৈনিক সেনা তাহাদিগের অধিকৃত অঞ্চলে সমর-সম্ভার-বহনক্ষম বৃহৎ বর্ত্ম নির্মাণ করিতে লাগিল, রণসম্ভার ভাণ্ডার ও দুর্গ নির্মাণ করিতে লাগিল, যুধিষ্ঠিরের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসরও হইতে লাগিল। যুধিষ্ঠির ইহার উত্তরে দীর্ঘ দীর্ঘ প্রেমপ্রমাদপূর্ণ প্রতিবাদ-লিপি প্রেরণ করিতে লাগিলেন।

এই সকল ব্যাপারে রাজ্যের সংহতি ও দৃঢ়তা ক্রমশঃ শিথিল হইল। ইহার কিছুকাল পরে যুধিষ্ঠির রাজ্যরক্ষায় হতাশ্বাস হইয়া রাজপদ পরিত্যাগ করেন ও স্বর্গপ্রবেশ-কামনায় হিমালয়ের পথে মহাপ্রস্থান করেন। সে কাহিনী ব্যাসদেব স্বয়ং বর্ণনা করিয়াছেন।

যুধিষ্ঠিরের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতি যে শ্রদ্ধা ও প্রীতির বশে ভারতের সমস্ত প্রদেশ একত্র গ্রথিত ছিল তাহার মূলসূত্র ছিন্ন হইল। এবং তাহার ফলে একীকৃত ভারতভূমি অচিরাৎ শতধা বিদীর্ণ ও বহুসংখ্যক পরস্পর-বিদ্বেষী ক্ষুদ্র জনপদে বিভক্ত হইয়া পড়িল। ব্যাসদেব সে দুঃখের কাহিনী প্রাণ ধরিয়া বিবৃত করিতে পারেন নাই, তাই মহাপ্রস্থান বর্ণনার দ্বারাই তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছিলেন। ইহার সহস্র বর্ষ পরে, পাশ্চাত্ত্য ম্লেচ্ছজাতির শাসনে ভারতভূমি পুনরায় একত্র গ্রথিত হইয়াছিল।

যুধিষ্ঠিরের শাসনকালের দ্বাদশ বর্ষ পর্যন্ত আমরা বর্ণনা করিয়াছি। ত্রয়োদশ বর্ষের একটি বৃহৎ ঘটনার বিবরণ দ্বারা এই কাহিনী সমাপ্ত করিব।

ম্লেচ্ছ ও চৈনিক জাতির সহিত যে সংঘাত, তাহা বৈদেশিক। তাহাতে পীড়া জন্মে, কিন্তু আত্মঘাত হয় না। বরং বহিঃস্থ শত্রুর উপস্থিতি রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ও আন্তরিক সংহতিকে দৃঢ়সংবদ্ধ করিয়া তুলে। এইজন্যই এই সকল বিসংবাদ দুঃখদায়ক হইলেও মর্মান্তিক বা সর্বথা মারাত্মক হয় না।

কিন্তু ত্রয়োদশ বর্ষের শেষভাগে এমন একটি ঘটনা ঘটে, যাহার ফলে দেশের অভ্যন্তরেই প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা ও বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। বস্তুতঃ পাণ্ডবসাম্রাজ্যের বিচ্ছেদ ও ধ্বংসের বীজ সেইখানেই উপ্ত হইয়াছিল বলিয়া বহু তত্ত্বদর্শীর ধারণা।

জম্বুদ্বীপের পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে বঙ্গদেশ। পূর্ব-উত্তর প্রান্তে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। পর্বতাকীর্ণ উচ্চাবচ দেশ বলিয়া ইহাকে অসমভূমিও বলা হইত।

উদ্যোগপর্বে, যখন পাণ্ডব ও কৌরব উভয়পক্ষ সর্বত্র মিত্র অন্বেষণ করিতেছিলেন, বঙ্গদেশ স্বতঃ পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। প্রাগ্‌জ্যোতিষও হয়তো করিত। কিন্তু যুধিষ্ঠির তাহার মৈত্রী যাজ্ঞা করিলেন না। প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ ভগদত্ত নিরতিশয় হীনরুচি ও ক্রূরকর্মা বলিয়া বর্ণিত ছিলেন। তাঁহার দুর্নাম-শ্রবণে যুধিষ্ঠির সন্ত্রস্ত হইলেন। এরূপ ব্যক্তি তাঁহার মিত্র বলিয়া পরিচিত হইলে, তাঁহার সে দুর্নাম ও তৎকর্তৃক অনুষ্ঠিত অনুচিত কর্মের দায়িত্ব তাঁহাকেও স্পর্শ করিবে। অপিচ, প্রকৃতি-ক্রূরকে নিছক সন্ধির শর্ত বা হিতোপদেশ দ্বারা অনভ্যস্ত সৌজন্যের পথে চালিত করা সম্ভব নহে। কোথায় কখন কোন্ ছলে তাহার প্রকৃতিগত নীচতা আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিবে স্থির নাই। এইসকল কথা চিন্তা করিয়া তিনি স্থির করিলেন, প্রাগ্‌জ্যোতিষের মৈত্রী তিনি কামনা করিবেন না। প্রস্তাব সাধু। কিন্তু সেই আক্রোশে প্রাগ্‌জ্যোতিষপতি ভগদত্ত স্বেচ্ছায় কৌরবপক্ষ আশ্রয় করিলেন।

কুরুক্ষেত্রে ভগদত্ত অসীম শৌর্য প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার বাহন মহাহস্তীর সহিত যুদ্ধে স্বয়ং ভীমসেন পর্যন্ত কিয়ৎকালের জন্য পর্যুদস্ত হইলেন, এবং তাঁহার ষষ্টি-সংখ্যক হস্তিবাহিত রথের তাড়নে অসংখ্য পাণ্ডবসৈন্য নিহত হইল। অবশেষে অর্জুনের অস্ত্রে স-হস্তী ভগদত্ত নিহত হইলেন।

যুদ্ধান্তে বিজিত-রাজক প্রাগ্‌জ্যোতিষ যথারীতি পাণ্ডবের সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। যুধিষ্ঠির সুষ্ঠু শাসন-মানসে শ্রীনাগেশ-নামক মহাবল ও রণকুশল রাজপুত্রকে প্রাগ্‌-জ্যোতিষের শাসকপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

রাজত্বের নবম বর্ষে, প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের পূর্ব-প্রান্তস্থিত পার্বত্য নাগভূমি অকস্মাৎ বিদ্রোহী হইল। নাগজাতি অনার্য ও বনবাসী; অস্ত্রবলে তাহাদিগকে নির্জিত করা অর্জুনাদি বীরগণের পক্ষে আদৌ কঠিন ছিল না। কিন্তু কোমলপ্রকৃতি যুধিষ্ঠির তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি ক্ষমাধর্মী, তাঁহার ক্ষমা-প্রধান নির্দেশে বিদ্রোহ-দমনে নিযুক্ত সেনা নিয়ত সংবৃতায়ুধ হইয়া চলিতে বাধ্য হইল। শেষ পর্যন্ত নাগভূমিকে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরস্থ স্বশাসিত অঞ্চল বলিয়া স্বীকার করিয়া যুধিষ্ঠির যুদ্ধের অবসান করিলেন। রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষের শেষভাগে এই সন্ধি স্থাপিত হইল।

বঙ্গদেশের অধিকাংশ ভূমি নবসৃষ্ট ম্লেচ্ছরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, এবং তদ্দেশবাসী আর্যগণ ক্রমশঃ পিতৃভূমি হইতে বিচ্যুত হইয়া পাণ্ডব-রাজ্যে আশ্রয়ভিক্ষু হইয়াছিল, সে কাহিনী পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে। বঙ্গদেশের যে অংশ তখনও পাণ্ডবরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহা স্বল্পায়তন ও ঊষর। বহিরাগত বিপুলসংখ্যক পূর্ববঙ্গীয়-দিগকে স্বচ্ছন্দে ধারণ ও পালন করিতে পারে, এমত শক্তি তাহার ছিল না।

অপিচ, স্বভূমি হইতে বলাদ্‌ভ্রষ্ট ও স্বকার্যদ্বারা অর্জিত দুর্দৈবের ভাজন এই পূর্ববঙ্গীয়গণ স্বভাবতঃই অভিমানী ও স্পর্শচেতন হইবে; তাহাদিগকে বহুসংখ্যায় একত্র সমাবিষ্ট হইয়া থাকিতে দেওয়া সুযুক্তি নহে। অতএব

যুধিষ্ঠির তাহাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করিয়া সাম্রাজ্যের সর্বত্র প্রেরণ করিতেছিলেন; যেন তাহারা স্বকীয় স্বাজাত্য বিস্মৃত হইয়া উক্ত দেশসকলের সহিত একাত্ম ও ক্রমে তাহার মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া যায়। এইরূপে বহু বঙ্গদেশীয় উদ্বাস্তু প্রতিবেশী প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যে আশ্রয়লাভ করিয়াছিল। ইহা ব্যতীত, বহু পূর্বকাল হইতেও বহু বঙ্গবাসী প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যে বাসস্থাপন করিয়াছিল; সে দেশের শ্রী ও সমৃদ্ধি-বিধানে তাহাদিগের কৃতিও সামান্য ছিল না।

রাজা, রাজ্যবাসী প্রজার চরিত্রের ও প্রবৃত্তির প্রতীক-স্বরূপ। ভগদত্ত ক্রূরকর্মা বলিয়া মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছেন। বস্তুত তাঁহার রাজ্যের প্রজারই চরিত্র তাঁহাতে মূর্তিমান হইয়াছিল। তাহারা পার্বত্যজাতি, কঠিন ও পরুষ আচরণে অভ্যস্ত, এবং প্রস্তরময়ী ভূমির প্রস্তরনিভ স্তন্যে লালিত বলিয়া বুদ্ধিতে ও হৃদয়বৃত্তিতে প্রস্তরতুল্য। যুদ্ধান্তে বিজয়ী যুধিষ্ঠিরের নিকটে তাহারা অগত্যা আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিল, তাঁহার শাসন ও তাঁহার নীতির প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করিয়াছিল। কিন্তু বস্তুতঃ সে নীতিকে তাহারা অন্তরে গ্রহণ করে নাই। উপলাশী উষ্ট্র-পক্ষী কোমল মাখনপিণ্ড গিলিতে পারে না। যুধিষ্ঠিরের সাম্যনীতি অসমভূমিতে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিল না।

পাণ্ডবগণ কর্তৃক ভগদত্ত প্রথমে অবজ্ঞাত ও পরে নিহত হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ স্বভাবতঃই পাণ্ডবগণের প্রতি বিমুখ ছিল, এবং সে বিমুখতা ক্রমশঃ সমগ্র আর্যসমাজের প্রতিই বিস্তৃত হইয়াছিল। পাণ্ডব-শাসিত প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে ভগদত্তবংশীয় অভিজাতগণ প্রকাশ্যে অথবা গোপনে পাণ্ডব ও আর্য-বিদ্বেষী হইয়া রহিল। বাহ্যতঃ যুধিষ্ঠিরের বশ্যতা স্বীকার করিলেও, অন্তরে তাহারা তাঁহার শাসনকে উপেক্ষা করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিল। নাগজাতির বিদ্রোহলব্ধ জয়ধ্বনি তাহাদিগের চিত্তে উৎসাহসঞ্চার করিল।

যুধিষ্ঠির বহু বঙ্গীয়কে প্রাগ্‌জ্যোতিষে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তাহা প্রাগজ্যোতিষ-বাসীদিগের মনঃপূত হয় নাই। অতর্কিতে একদা তাহারা বলহীন ও সহায়হীন বঙ্গীয়দিগের উপরে আপতিত হইল। তাহাদিগের গৃহ ও কুটির অগ্নিদগ্ধ করিল, রুদ্রমূর্তিতে সংহার ও প্রহার করিয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট ও স্থানভ্রষ্ট করিল। লুণ্ঠিত ও আহত পলাতকের আর্তনাদে, অনাথ শিশু ও ধর্ষিতা নারীর ক্রন্দনে প্রাগ্‌জ্যোতিষের আকাশ-বাতাস প্রতিধ্বনিত হইল। নিরীহ মানবের সেই শান্তির রাজ্যকে বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত করিয়া স্ব-সৃষ্ট শ্মশানচারী প্রেততুল্য ভগদত্ত-বংশীয়গণ তাণ্ডব-নর্তনে মত্ত হইল। দগ্ধগৃহ ধেনু রক্তাভ মেঘদর্শনে ভীত হয়। বঙ্গীয়গণ একবার পিতৃপুরুষগত জন্মভূমি হইতে বিনা অপরাধে ও বিনা অবসরে বিধ্বস্ত ও বিতাড়িত হইয়াছে। পুনরায় অবিকল তদনুরূপ ধ্বংস ও বিতাড়ন-মহোৎসবের আবির্ভাবে তাহারা বিহ্বল হইয়া গেল; এই আতিথ্যবিমুখ দেশ ত্যাগ করিয়া আশ্রয়লাভ মানসে পুনরায় তাহারা পশ্চিমবঙ্গদেশাভিমুখে পলায়নপর হইল। পিতা পুত্রকে, পুত্র মাতাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিল, পশুবৎ কামোন্মত্ত জনতার হস্তে স্ত্রীগণকে পরিত্যাগ করিয়া পুরুষগণ প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। ভাগ্যদোষে বুদ্ধিভ্রংশ হয়; মনুষ্যত্ব পুরুষত্বাদি সকল বৃত্তিই মনুষ্যকে পরিত্যাগ করে।

কিন্তু পলাইতে চাহিয়াও তাহারা যথেচ্ছ পলাইতে পারিল না। উন্মত্ত জনতা তাহাদিগের পথ রুদ্ধ করিল, শকট ও যান ভগ্ন করিল, নিঃসহায় নির্বান্ধব ও নির্বীর্য পলাতকদিগকে অমানুষিক নির্যাতন করিয়া পৈশাচিক আনন্দ ও উল্লাসে অধীর হইল। একাধিক বর্ষকাল ব্যাপিয়া নিঃশব্দ প্রস্তুতি ও আয়োজনের পরে অকস্মাৎ এই কার্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অতর্কিত ও প্রচণ্ড আঘাতে নিঃসহায় বলহীন আর্যগণ বিহ্বল হইয়া পড়িল। হিতাহিত জ্ঞানরহিত হইয়া তাহারা প্রাণ ও সম্ভ্রমরক্ষার্থে ইতস্ততঃ ধাবিত হইল। আর্যজাতি প্রাণ অপেক্ষাও নারীর সম্ভ্রমকে মূল্যবান জ্ঞান করিত। দুষ্কৃতকারীগণ নারীধর্ষণেই বিশেষ উৎসাহ ও পারদর্শিতা প্রদর্শন করিতেছিল। আর্য নারীর রূপ ও সংস্কৃতি-গৌরব বিখ্যাত ছিল, তাহারা সভ্য, শিক্ষিত ও মার্জিত। তাহাদিগের সম্বন্ধে কতিপয় প্রাগ্‌জ্যোতিষগণের মনে চিরদিনই একটা পাশব

লোলুপতা ছিল। কিন্তু সে লোলুপতা এতকাল দূরতঃ লালাস্রাবেই পর্যবসিত থাকিত, এক্ষণে সুযোগ পাইয়া তাহারা সর্বপ্রকার সংযম ও শোভনতার সীমা লঙ্ঘন করিল। বালিকা হইতে বৃদ্ধা, কেহই তাহাদিগের পশুচিত উন্মত্ততার হস্তে অব্যাহতি পাইল না।

সমগ্র রাজ্যে আর্যজাতীয়গণের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। অনেকে নিহত আহত ও অন্যথা বিধ্বস্ত হইল, অনেকে পলায়নপর হইল, অনেকে পশুধর্মী মানবের হস্তে পতন অপেক্ষা বন্যজন্তুর সহবাস শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়া অরণ্যে পর্বতে আত্মগোপন করিল। যাহারা পারিল না তাহারা প্রতিমুহূর্তে প্রাণসংশয় বা ততোধিক লাঞ্ছনা গণনা করিয়া কম্পিত কলেবরে বিনিদ্র রজনী যাপন করিতে লাগিল।

আহত ও অনাহত পলাতক আর্যগণ ক্রমশঃ বঙ্গদেশে আসিয়া আশ্রয়প্রার্থী হইল। তাহাদিগের দুর্দশা দর্শন ও শ্রবণ করিয়া বঙ্গবাসী জনগণ বিক্ষুব্ধ ও বিচলিত হইল, ইহার নিরাকরণ ও প্রতিবিধান চাহিয়া তাহারা উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

প্রাগ্‌জ্যোতিষস্থিত রাজপুরুষ ও রক্ষী-বাহিনী উৎপীড়িতদিগকে রক্ষা করিতে আদৌ প্রয়াসী হয় নাই; বরং শরণার্থীদিগকে অবজ্ঞা ও উপহাসে জর্জরিত করিয়াছে; বহুক্ষেত্রে তাহারা স্বয়ং দুষ্কৃতকারীগণের সহিত মিলিত হইয়া লুণ্ঠন ও ধর্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছে, প্রয়োজনবোধে স্বাস্থ্য ও শক্তিমান আর্য পুরুষগণকেই ধৃত ও অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে—যেন দুষ্কৃতকারীগণ তাহাদিগের সম্পত্তি ও স্ত্রীগণের প্রতি অবাধে যথেচ্ছ আচরণ করিতে পারে, এরূপ কাহিনীও শ্রুত হইল। বঙ্গদেশীয় জনতা, বঙ্গদেশীয় রাজপুরুষগণ রুদ্ধরোষে অধীর হইলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের কিছু করিবার শক্তি ছিল না। প্রাগ্‌জ্যোতিষ পৃথক রাজ্যখণ্ড। সাম্রাজ্যের সংবিধান অনুসারে, তথায় শান্তি স্থাপনের বা বিপন্ন উদ্ধারের জন্য স্বকীয় সেনা বা শান্তিরক্ষক প্রেরণের অধিকার বঙ্গদেশের ছিল না। তাঁহারা কেবল যথাশক্তি প্রয়াস করিয়া আগত শরণার্থীদিগকে শুশ্রূষা ও গুড়-চিপিটকাদি আহার্য দ্বারা কোনক্রমে বাঁচাইয়া রাখিলেন। যাহারা তখনও দুর্বৃত্ত-করকবলিত তাহাদিগকে রক্ষা বা উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা তাঁহাদিগের সাধ্যায়ত্ত ছিল না।

তখন অন্য উপায় না পাইয়া, বঙ্গদেশীয় জনতা ও বঙ্গদেশীয় শাসকবৃন্দ, রাজধানী হস্তিনাপুরীতে স্বয়ং ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকটে বার্তা প্রেরণ করিলেন। তাঁহাদিগের প্রার্থনা, যুধিষ্ঠির স্বয়ং উপদ্রুত অঞ্চলে তাঁহার বাহু প্রসারিত করুন, শৃঙ্খলা স্থাপন ও দুর্গতদিগকে নির্ভয় করুন।

বার্তা পাইয়া যুধিষ্ঠির কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন। নানাবিধ পরস্পরবিরোধী চিন্তা ও সংশয় তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল।

তাঁহার তৎকালে বয়স একসপ্ততিবর্ষ অতিক্রান্ত হইয়াছে। দেহ জরাক্রান্ত, কেবল মানসিক শক্তিবলে তাহাকে কথঞ্চিৎ কার্যক্ষম রাখিতেছেন। এ সকল ক্ষেত্রে তাঁহার প্রধান ভরসাস্থল ছিলেন মহাবল ভীমসেন, তিনি আর নাই। অর্জুন আছেন, কিন্তু তিনি যৌবনধর্মী, সংশয়ক্ষেত্রে সর্বথা নির্ভরযোগ্য নহেন।

এই ঘটনা, ইহা কেবল মামুলীক বিশৃঙ্খলামাত্র নহে। রাজনীতির বহু সূক্ষ্মতর ও জটিলতর প্রশ্ন ইহার সহিত জড়িত। সবিশেষ চিন্তা না করিয়া পদক্ষেপ বিপজ্জনক হইবে।

প্রজার উপরে উৎপীড়ন হইতেছে। উৎপীড়িত প্রজার রক্ষণ অবশ্যই রাজধর্ম। কিন্তু উৎপীড়িত বঙ্গীয়দিগকে রক্ষা করিবার আশু উপায়, উৎপীড়ক প্রাগ্‌জ্যোতিষদিগের উপরে প্রত্যুৎপীড়ন। তাহাও উৎপীড়নই বটে। প্রথমক্ষেত্রে উৎপীড়ন করিতেছে অন্যে, রাজা নিষ্ক্রিয়। দ্বিতীয়ক্ষেত্রে তাঁহাকে স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া উৎপীড়ন করিতে হইবে। তাহা প্রজাপালন-নীতির প্রতিকূল কিনা, সেকথা বিবেচ্য। অপিচ উপদ্রুত বঙ্গীয়গণ সংখ্যায় অল্প, প্রাগ্‌জ্যোতিষগণ সংখ্যাবহুল। অল্প-সংখ্যককে রক্ষা করিবার ছলে বৃহত্তর সংখ্যাকে উৎপীড়ন করা বিধেয় কিনা, তাহাও বিবেচ্য। দুইটি অনিষ্ট যখন পরস্পর-বিরোধী হয়, তখন বৃহত্তর অনিষ্টকে

এড়াইবার জন্য ক্ষুদ্রতর অনিষ্টকে স্বীকার করিয়া লওয়াই রাজধর্ম।

কেবল রাজধর্ম নহে, কূটনীতির দিক হইতেও চিন্তা করিতে হইবে। বঙ্গীয়গণ অল্প, দুর্বল। তাহারা রক্ষা প্রার্থনা করিতেছে। রক্ষিত না হইলে তাহারা ক্ষুব্ধ হইবে, হয়তো সম্যক্ বিনষ্ট হইবে। তাহাতে রাজার অপবাদ বটে। কিন্তু প্রাগ্‌জ্যোতিষগণ সংখ্যাভূয়িষ্ঠ ও প্রবল। সে দেশ তাহাদিগেরই স্বদেশ। শাসন করিতে গেলে তাহারা রুষ্ট হইবে, তাহাতে সমূহ বিপদের শঙ্কা। ক্ষুদ্রতর অভিযোগ হইতে অব্যাহতির জন্য বৃহত্তর বিপত্তিকে স্বেচ্ছায় আহ্বান করা সমীচীন নহে। অল্পের জন্য যে বহুকে হারাইতে ইচ্ছুক হয়, সে বিচারমূঢ়, ইহাই কবিপ্রসিদ্ধি। অতএব, কূটনীতির দিক হইতে বিচার করিলে এক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

অথচ একেবারে নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকাও বিপজ্জনক। উৎপীড়িত হতাশ্বাস প্রজা মৃত্যু-নিঃশ্বাসের সহিত অক্ষম বা রক্ষণ-বিমুখ রাজাকে ধিক্কার দিয়া মরিবে। সে ধিক্কার অন্যত্র ব্যাপ্ত হইয়া বহুতর কণ্ঠে বহুশঃ প্রতিধ্বনিত হইবে। তাহাতে দেশে ও বিদেশে সমূহ মর্যাদাহানি। সে সম্ভাবনাকে আহ্বান করা সমীচীন নহে।

বহুবিধ চিন্তা করিয়া অবশেষে যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরামর্শ করিলেন। তাঁহার যাবতীয় চিন্তা ও সংশয় নিবেদন করিয়া পরিশেষে কহিলেন, সখে, আমার মনে হইতেছে, তুমি স্বয়ং একবার গিয়া স্বচক্ষে অবস্থা সমীক্ষণ করিয়া আসিলে ভাল হয়। তোমার আহরিত বার্তা ও বিবরণ দৃষ্টে যথাকর্তব্য নির্ধারণ করা সহজ হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, শুনিয়াছি, প্রাগ্‌জ্যোতিষ অতি মনোরম স্থান, তাহার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী মুনিজন-মনোহারী। আমি কখনও দেখি নাই, এই ব্যপদেশে একবার ভ্রমণ করিয়া আসিতে আপত্তি নাই। সখা অর্জুনকে কি সঙ্গে লইয়া যাইব?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, না। অর্জুন বীর, কিন্তু যুবাপ্রকৃতি, অকস্মাৎ উত্তেজিত হইতে পারে। ক্ষেত্র জটিল, সতর্ক হইয়া পদক্ষেপণ আবশ্যক। সম্যক্ অবস্থা না বুঝিয়া অর্জুনকে সেখানে লইয়া যাওয়া উচিত হইবে না। আপাততঃ তুমি একাই যাও।

শ্রীকৃষ্ণ জ্যোতিঃপথে প্রাগ্‌জ্যোতিষে উপনীত হইলেন, এবং দিবসত্রয় পরিভ্রমণান্তে হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করিলেন।

যুধিষ্ঠির তাঁহাকে একান্তে লইয়া কহিলেন, কি দেখিলে বল।

কৃষ্ণ কহিলেন, রাজন্, তোমার বুদ্ধি কুশাগ্র, তোমার দৃষ্টি বহুদূরপ্রসারী। তুমি ঠিকই ভাবিয়াছ, অকস্মাৎ সে দেশে হস্তক্ষেপ করিতে যাওয়া সঙ্গত হইবে না।

কারণ? তাহারা তো প্রজা?

বঙ্গীয়গণ? অবশ্যই। কিন্তু তাহারা ম্লেচ্ছকিল-সেবনাৎ শিলীভূতপৃষ্ঠ; কিছু কিল নূতন করিয়া খাইলে তাহারা মরিবে না। আর একান্তই যদি মরে, সে ক্ষতি অগত্যা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে, মহামারীতে বা জলোচ্ছ্বাসে মরিলে কি করিতে পারিতাম?

তাহারা দুর্বল, ক্ষুব্ধ হইলেও প্রত্যক্ষ অনিষ্ট করিতে পারিবে না। পক্ষান্তরে, প্রাগ্‌জ্যোতিষগণ প্রবল, এবং সাম্রাজ্যের প্রতি সম্যক ভক্তিমান নহে। ক্রুদ্ধ হইলে তাহারা বিশেষ অনিষ্টের হেতু হইতে পারে।

কি প্রকারে?

প্রাগ্‌জ্যোতিষের সীমারেখার এক বিস্তৃত অংশ ম্লেচ্ছরাজ্যের সংলগ্ন। বর্তমান বিশৃঙ্খলা-সাধনে বহুতর ম্লেচ্ছ প্রাগ্‌জ্যোতিষগণের সহকারী হইয়াছিল, এরূপ গুজব-কথাও আমি শুনিয়া আসিয়াছি। কঠোর হস্তে শাসন করিতে গেলে প্রাগ্‌জ্যোতিষগণ সে শাসনকে অগ্রাহ্য করিবে বা প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে কিনা তাহা চিন্তনীয়; এবং বিদ্রোহী প্রাগ্‌জ্যোতিষভূমি সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ম্লেচ্ছরাজ্যের সহিত সংযুক্ত হইতে চাহিবে, এরূপ আশঙ্কার কারণ আছে। মনে হয়, এইরূপ আশা মনে লইয়াই ম্লেচ্ছগণও এই কার্যে তাহাদিগকে

উৎসাহিত করিয়াছে। এই ঘটনা আকস্মিক নহে, দীর্ঘকাল ধরিয়া ইহার প্রস্তুতি চলিতেছিল, এবং বহুদিন ধরিয়া অল্প অল্প করিয়া ক্রমে বহুসংখ্যক ম্লেচ্ছ প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে।

সে কি! আর্যসাম্রাজ্য ছাড়িয়া বিধর্মী ম্লেচ্ছদিগের সহিত মিলিত হইবে, প্রাগ্‌জ্যোতিষের ধর্মজ্ঞান কি এতই লুপ্ত হইবে?

শ্রীকৃষ্ণ স্মিতমুখে কহিলেন, তুমি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, তুমি যদি প্রয়োজনানুরোধে প্রজারক্ষণরূপ রাজধর্ম বিস্মৃত হইতে পার, তাহারা তো শিক্ষারহিত বর্বর মাত্র।

যুধিষ্ঠির নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণ পুনরায় কহিলেন, কেবল ম্লেচ্ছ নহে। দক্ষিণে পশ্চিমে ম্লেচ্ছ, উত্তরে চৈনিক সেনা সীমান্তে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বসিয়া আছে। প্রাগ্‌জ্যোতিষে সাম্রাজ্যের বাহু শিথিল হইয়াছে, জানিবামাত্র তাহারা সে দেশকে কবলিত করিতে প্রয়াসী হইবে। ম্লেচ্ছগণ আর্য হইতে ভিন্নধর্মী মাত্র; চৈনিকগণ ধর্মদ্বেষী, নাস্তিক। স্বদেশেও তাহারা সর্ববিধ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বর্জন করিয়াছে। চৈনিক বা ম্লেচ্ছ যদি প্রাগ্‌জ্যোতিষ অধিকার করে ও সাম্রাজ্যের দ্বারদেশে আসিয়া বসে, তাহাদের সমূহ অনিষ্টের আশঙ্কা। অতএব এক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় বঙ্গীয়কে অগত্যা বিস্মৃত হওয়াই একমাত্র পন্থা। সমগ্র ভারতভূমির কল্যাণ সর্বাগ্রে চিন্তনীয়, তাহার তুলনায় ক্ষুদ্র বঙ্গদেশ বা প্রাগ্‌জ্যোতিষের আবেগোচ্ছ্বাস তুচ্ছ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। মন্ত্রণাসভা আহ্বান করিব।

প্রাসাদের অভ্যন্তরে গোপন প্রকোষ্ঠে মন্ত্রণাসভা বসিয়াছে।

সভা একান্ত ক্ষুদ্র। পাণ্ডব-ভ্রাতৃচতুষ্টয়, দেবী দ্রৌপদী, শ্রীকৃষ্ণ ও ব্যাসদেব।

সভার সমক্ষে যুধিষ্ঠির সমস্ত লব্ধ বিবরণ ব্যক্ত করিলেন; এ বিষয়ে তাঁহার মনে যে সকল চিন্তা ও শঙ্কার উদয় হইয়াছে, তাহাও বিবৃত করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত ও সংগৃহীত তথ্যাদি নিবেদন করিলেন; কূটনীতির দিক হইতে তিনি যে সিদ্ধান্ত ও নিষ্ক্রিয় কর্মপন্থার পক্ষপাতী, তাহাও সবিশেষ যুক্তিসহকারে ব্যক্ত করিলেন।

উভয়ের বিবৃতির অবসানে যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ, ভ্রাতৃগণ, দেবী দ্রৌপদী, এ বিষয়ে আপনাদিগের মতামত ও পরামর্শ আমি প্রার্থনা করি।

ধীমান্ নকুল ও সহদেব একবাক্যে কহিলেন, দেব, আমরা আপনার নিয়ত বশবর্তী। আপনি যাহা স্থির করিবেন, তাহাই আমাদিগের অভিমত।

ব্যাসদেব কহিলেন, বৎস, তুমি স্থিতপ্রজ্ঞ, জিতধী। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

সতাং হি সন্দেহ-পদেষু বস্তুষু
প্রমাণম্ অন্তঃকরণ-প্রবৃত্তয়ঃ।

অতএব এক্ষেত্রে তোমার আর্য-অন্তর হইতে যে সিদ্ধান্ত স্বতঃ উদ্গত হইবে, তাহাই অভ্রান্ত বলিয়া গণ্য ও আচরণীয়।

অর্জুন কহিলেন, দেব, আমার একটি নিবেদন। ম্লেচ্ছরাজ্য হইতে বিতাড়িত ও বিত্রস্ত বঙ্গীয়গণকে আপনিই অভয় প্রদান করিয়াছিলেন। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে আপনিই তাহাদিগকে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। প্রাগ্‌জ্যোতিষ তাহাদিগের অপরিজ্ঞাত দেশ, তত্রত্য অধিবাসীগণ বঙ্গীয় সংস্কৃতি ও ভাষার প্রতি সম্যক্ বন্ধুভাবাপন্ন না হইতে পারে, এই সংশয় তাহারা তৎকালে ব্যক্ত করিয়াছিল বলিয়া স্মরণ হইতেছে। বলুন, ইহা কি সত্য নহে?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, সত্য।

অর্জুন কহিলেন, তাহাদের সেই আশঙ্কা এক্ষণে সত্যে পরিণত হইয়াছে। প্রাগ্‌জ্যোতিষগণ তাহাদিগকে সহ্য করিতে প্রস্তুত নহে, ছলেবলেকৌশলে তাহাদিগকে বিধ্বস্ত ও বিতাড়িত করিতে ব্রতী হইয়াছে। আপনি যে আশ্বাস সেই বঙ্গীয়গণকে দিয়াছিলেন, তাহার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ইহা কি আপনার রাজমর্যাদারও হানিকর নহে? এবং তাহা যদি হয়, তবে সেই মর্যাদা রক্ষার্থেই

কি আমরা বদ্ধপরিকর হইতে, প্রাগ্‌জ্যোতিষগণকে সম্যক্ শাসন করিতে বাধ্য হইতেছি না ?

কৃষ্ণ কহিলেন, সখে, রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্রতর স্বার্থকে বর্জন করিতে হয়। কূটনীতির অনুরোধে ক্ষুদ্র মর্যাদাবোধকেও প্রায়শঃ বিস্মৃত হইতে হয়।

অর্জুন কহিলেন, হা ধিক্। জরাগ্রস্ত জ্যেষ্ঠ স্বীয় রাজকর্তব্য পালনে সাহসী হইতেছেন না ; সেই দুর্বলতাকে কূটনীতির নামে শাকাবৃত করা হইতেছে ! ইহা দেখিবার জন্য আমি কেন বাঁচিয়া আছি। হায়, কেন কর্ণের একাঘ্নী-আঘাতে আমার প্রাণ বিনির্গত হইল না। হে কৃষ্ণ, তুমিই না একদা স্বজন-নিধন-পরাঙ্মুখ অর্জুনকে 'ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ' বলিয়া মহাসমরে প্রবৃত্ত করিয়াছিলে ?

কৃষ্ণ অম্লানমুখে কহিলেন, করিয়াছিলাম, কারণ তৎকালে তাহাই প্রয়োজন হইয়াছিল। এক্ষণে সেই শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধ শ্রবণ কর—

'সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ'।

অর্জুন কহিলেন, তবে কি ইহাই বুঝিব, সেই ভাগ্যহত প্রজাগণের রক্ষার্থে আমাদিগের কিছুই কর্তব্য নাই ? হে অগ্রজ, আপনার নিন্দা কখনও শ্রবণ করি নাই ; আজ কি আমাকে নিজ মুখে আপনার নিন্দা করিতে হইবে ? গন্ধর্বরাজ চিত্ররথের হস্তে বন্দী চিরশত্রু দুর্যোধনকে উদ্ধার করিতে আপনিই আমাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আজ স্বীয় প্রজাকে রক্ষা করিতে আপনি পরাঙ্মুখ হইতেছেন ? এ কি সেই আপনি ? না আপনার বেশধারী অন্য কেহ আজ রাজার আসনে উপবিষ্ট ?

যুধিষ্ঠির নীরব হইয়া রহিলেন।

তখন প্রজ্বলিত বহ্নিশিখার ন্যায় জ্যোতিষ্মতী দেবী দ্রৌপদী সভাস্থলে দণ্ডায়মানা হইলেন। তাঁহার রোষদীপ্ত আননচ্ছটায় সভাগৃহ উদ্ভাসিত হইল।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে ফাল্গুনী, ক্ষুব্ধ হইও না ; জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবের ছদ্মবেশে অন্য কেহ ভাবিয়া ইহাকে অবমাননা করিও না। ইনিই সেই যুধিষ্ঠির। সত্যসন্ধ, মানবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির। জীবনযুদ্ধে সর্বদা স্থির থাকিতে পারেন বলিয়া ইহার যুধিষ্ঠির নাম ; এই অবিচলতা সেই নামেরই সার্থকতা প্রমাণ করিতেছে। ভুল করিও না, মানবশ্রেষ্ঠ বলিয়াই ইনি সাধারণ মানবের দুঃখদৈন্যে নির্বিকার থাকিতে পারেন—নরলোকে ও বড়লোকে অনেক তফাত।

মহারাজ যুধিষ্ঠির! ভাবিয়াছিলাম কথা বলিব না, এই অপুরুষোচিত মন্ত্রণায় অংশ গ্রহণ করিয়া ইহার সহচারী পাপের অংশভাক্ হইব না। তুমি কথা বলিতে বাধ্য করিলে।

মহারাজ, তুমি ধর্মরাজ, সত্যসন্ধ। যাহাকে কোন কারণে একবার ধর্ম বলিয়া জানিয়াছ, কোনকালে কোনক্রমে তাহা হইতে ভ্রষ্ট হও না, ইহাই তোমার গর্ব। আজ তোমার সে গৌরব কোথায় ? প্রজাপালনের যে ব্রতকে জীবন-প্রারম্ভে বরণ করিয়া লইয়াছিলে, যে ব্রত পালনের সুযোগ লাভের জন্য বংশনাশী মহাসমরে ব্রতী হইয়াছিলে, আজ কোথায় গেল তোমার সে ধর্মপালন ? কিংবা হয়তো ইহাই তোমার ধর্মনিষ্ঠা—অপরাধীকে ক্ষমা করাই তো ক্ষমাধর্মের পরম প্রকাশ !

মহারাজ, ধিক্ তোমাকে। তুমি সত্যসন্ধ, এই খ্যাতি আশৈশব শ্রবণ করিয়াছি। অতর্কিতে উচ্চারিত মাতৃসত্য হইতে তুমি পাছে ভ্রষ্ট হও, এই বিবেচনায় আমি বিনা দ্বিধায় পঞ্চপত্নীত্ব স্বীকার করিয়াছিলাম। আমাকে পণে জয় করিয়াছিলেন ফাল্গুনী, তাঁহার সম্পর্কে তুমি আমার গুরুস্থানীয়। তথাপি আমি বিচলিত হই নাই। পঞ্চপত্নীত্বের গ্লানি ও অবমাননা চিরদিন আমার সহচারী হইয়া থাকিবে ; যুগে যুগে দেশে দেশে ইতরজনের মুখে আমার নাম বক্রহাস্যের সহিত উচ্চারিত হইবে, ইহা নিশ্চিত জানিয়াও আমি কিঞ্চিন্মাত্র দ্বিধাপ্রকাশ করি নাই। মহারাজ, আজ কোথায় রহিল তোমার সেই সত্য-সন্ধিৎসা ?

কৃষ্ণ কহিলেন, সখি, ক্ষুব্ধা হইও না, স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখ। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির আজীবন অতন্দ্র ও একনিষ্ঠ হইয়া প্রজাপালন করিয়াছেন। আজ যদি তাঁহার সকৃৎ-স্খলন হইয়াই থাকে, তবুও কি তাহা ক্ষমণীয় নহে ?

দ্রৌপদী কহিলেন, না। প্রজাপালনে অতন্দ্র ছিলেন বলিয়াই তাঁহার এই স্খলন অধিকতর মর্মপীড়ার কারণ হইয়াছে। প্রত্যাশা যেখানে নাই, সেখানে হতাশাও নাই, যাহার সামর্থ্য নাই, সে স্বতঃই অক্ষম। যে সামর্থ্য থাকিতেও অক্ষমতার সাধনা করে, সে জ্ঞানপাপী, সর্বথা নিন্দনীয়। আর, স্বামী-স্ত্রীতে কথা হইতেছে, তুমি তাহার মধ্যে অনধিকার চর্চা করিতেছ কেন?

কৃষ্ণ কহিলেন, সখি, তুমি আত্মবিস্মৃতা হইতেছ। ধর্মরাজকে ও আমাকে এইরূপে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিবে, ইহা তোমার নিকটে প্রত্যাশা করি নাই।

দ্রৌপদী কহিলেন, আমাকে সখী-সম্বোধন না করিলে বাধিতা হইব। কৃষ্ণসখী বলিয়া পরিচয় দিতে আমি গর্ববোধ করিতাম। আজ আপনাকে কৃষ্ণসখী বলিয়া মনে করিতে, তোমার মুখে সখী সম্বোধন শুনিতে আমি গ্লানি বোধ করিতেছি। ধিক্! কৃষ্ণ, তুমিই কি সেই কৃষ্ণ, যিনি কৌরব-সভায় দুঃশাসনকর্তৃক অবমানিতা দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন, যিনি দুরাচার শিশুপালকে বধ করিয়াছিলেন, যিনি পরপীড়নপরায়ণ জরাসন্ধের বধে উদ্যোগী হইয়াছিলেন? না, তুমি তাহার ছায়ামাত্র, রাজলক্ষ্মী-রাক্ষসীর গ্রাসজীর্ণ উদ্গারাবশেষ মাত্র। নচেৎ, কোথায় আজ তোমার সেই চক্র, যাহার দ্বারা আমাকে বস্ত্র যোগাইয়াছিলে? আমার প্রজা-রমণীর লজ্জা অপহৃত ধূলি-লুণ্ঠিত হইতেছে, তাহারা 'হা মধুসূদন' বলিয়া আর্তনাদ করিতেছে, তাহাদিগের সম্ভ্রম-রক্ষায় তুমি উদাসীন কেন? না কি বুঝিব, তোমার লজ্জাহারিত্ব কেবল সখীর ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত, অন্য নারীর লজ্জা-নিবারণে তোমার কোন প্রবৃত্তি বা প্রয়োজন নাই? তাহা হইলে, ধিক্ আমাকে যে সেইদিন একাকী আমার বন্ধুকে দীনবন্ধু বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, অসঙ্কোচে ও কৃতজ্ঞ অন্তরে তাহার হস্তের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। আজ বুঝিতেছি, দীনবন্ধু-বেশী একক-সখীর বন্ধুর সেই সাহায্য স্বীকার করা অপেক্ষা আমার চরম লাঞ্ছনা হওয়াও বরণীয় ছিল। সে লাঞ্ছনা দৈহিক লাঞ্ছনামাত্র হইত; তোমার সাহায্য আমার মনের লাঞ্ছনার হেতু হইয়াছে।

মহারাজ যুধিষ্ঠির! তুমি মহারাজ। জগতের সকল বস্তু, সকল চিন্তার উপরে, রাজ্যই তোমার অভীষ্ট দেবতা। কৌরবসভায় যেদিন লাঞ্ছিতা হইয়াছিলাম, তুমি নির্বিকার দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়াছিলে। সেদিন ভাবিয়াছিলাম, তাহা তোমার অসীম চিত্ত-সংযমের প্রমাণ। ভাবিয়া স্বামী-গর্বে স্ফীতা হইয়াছিলাম। হা, আজ বুঝিতেছি, সংযম নহে। তাহা তোমার ঔদাসীন্য মাত্র ছিল। তুমি রাজ্য-লোলুপ, রাজপদের মহিমাই তোমার একমাত্র কাম্য। আমার লাঞ্ছনা দেখিয়া যদি বিচলিত হইতে, উষ্মা প্রকাশ করিতে, হয়তো কৌরবগণ অপ্রসন্ন হইত, আপোষে রাজ্যাংশ-লাভের জন্য তুমি যে তদ্বির করিতেছিলে তাহাতে ব্যাঘাত সৃষ্ট হইত। এই জন্যই আমার অপমানে আর্তনাদে তোমার অক্ষিপল্লব কম্পিত হয় নাই; ভীমসেন রোষে গর্জন করিয়া উঠিলে তাঁহাকে ইঙ্গিতে নিরস্ত করিয়াছিলে।

আজও তুমি সেই রাজমহিমা-মুগ্ধ রাজা। তোমার প্রজা ধর্মনাশভয়ে, ইতরহস্তে চরম লাঞ্ছনার ভয়ে, আর্তনাদ করিতেছে, তুমি নির্বিকার, হইয়া বধিরত্বের সাধনা করিতেছ; পাছে কোন কারণে দুষ্কৃতকারীগণ তোমার উপরে অপ্রসন্ন হয়, পাছে তোমার রাজ্যভোগ-সম্ভাবনা তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়।

তোমাকে ধিক্কার দিব না, তোমার প্রতি উচ্চারিত ধিক্কার স্বয়ং ধিকৃত হইবে। কিন্তু প্রশ্ন করি, নিজের পত্নীর মর্যাদা তোমার স্বকীয় ধন, তাহার বিনাশ তুমি সহ্য করিতে পার, সহ্য করিয়া মহত্ত্বের মিথ্যা-গৌরব অর্জন করিতে পার। কিন্তু প্রজা তোমার সর্বথা রক্ষণীয়। রমণী পুরুষের রক্ষণীয়া। আর্তব্যক্তি ক্ষত্রিয়ের রক্ষণীয়।

"ক্ষতাৎ কিল ত্রায়ত, ইত্যুদগ্রঃ
ক্ষত্রস্য শব্দো ভুবনেষু রূঢ়ঃ"

বলিয়া, ক্ষত্রকুলতিলক রাজা বলিয়া আত্মশ্লাঘা করিতে। হে ক্ষত্রিয়রাজ, আজ কোথায় তোমার সেই গর্ব? আর্ত-ব্যক্তিকে, রমণীকে, প্রজাকে সর্বথা রক্ষা করাই পরম রাজধর্ম। সে ধর্মে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া কোন্ লজ্জায় তুমি রাজাসনে বসিয়া রহিয়াছ? নামিয়া আইস। মহারাজ ভরত-প্রতিষ্ঠিত, মহাবীর ভীষ্ম-রক্ষিত ওই মহা-সিংহাসনকে কলঙ্কিত করিও না।

হায়, আজ কোথায় মধ্যমপাণ্ডব মহাবল ভীমসেন! দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণরত পাপমতি দুঃশাসনের বজ্রমুষ্টি তাঁহার হুঙ্কারে শিথিল হইয়াছিল। তাঁহারই অনুরোধে, তাঁহারই আশ্বাসে সেদিন আমি আত্মঘাতিনী হই নাই। আমার লাঞ্ছনার প্রতিশোধ লইবেন বলিয়া তিনি সেই সভা-ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করিয়াছিলেন; দুঃশাসনের বক্ষ-রক্তে রঞ্জিত হস্তে আমার মুক্ত বেণী বন্ধন করিয়া, দুর্যোধনের উরুদ্বয় ভগ্ন করিয়া, সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন। আমার পাঁচজন স্বামীর মধ্যে তিনিই পুরুষ নামের যোগ্য ছিলেন।

সেই একবার নহে। বিরাটের পুরীতে দুর্মতি কীচক আমার প্রতি লুব্ধ হইল। সভার সমক্ষে, তোমার সমক্ষে, আমাকে পাদপ্রহারে ভূপাতিত করিল। তুমি নীরব হইয়া রহিলে। উত্তেজিত হইলে দ্যূতক্রীড়ার চাল ভুলিয়া যাইবে, এই আশঙ্কাই তোমার মনে প্রবল ছিল।

কিন্তু ভীমসেন আমার সে অপমান বিস্মৃত হন নাই। সেই রজনীতে একক সময়ে মহাবল ও ক্রূরকর্মা কীচককে তিনি বধ করিলেন; তৎপরে তাঁহার তুল্য-বলশালী উনশত ভ্রাতাকে বধ করিলেন। হা, আজ কোথায় সেই বৃকোদর, কোথায় সেই অমিতবল লৌহমানব বল্লভ! তিনি থাকিলে আজ আমাকে এরূপে নিষ্ফল আর্তনাদ করিতে হইত না। আমি পঞ্চপতিসনাথা; কিন্তু এরূপ পৌরুষ-রহিত পতির পত্নীত্ব অপেক্ষা আজন্ম-বৈধব্যও আমার শতগুণে অধিক সহনীয় হইত।

মহারাজ, তোমার মহিষী বলিয়া গৌরব করিতাম। আর সে গৌরব করিব না। তোমাকে দোষ দিই না। তুমি আজন্ম দ্যূতাসক্ত, সমস্ত জীবন দ্যূত-ক্রীড়াই করিয়া গেলে। রাজ্য, ভ্রাতা, পত্নী, সকলেই বারংবার তোমার সেই দ্যূতের পণ হইয়াছে। কিন্তু রাজ্য-লোভে তোমার সে দ্যূতক্রীড়া; আজ রাজলক্ষ্মীকেই তুমি সেই দ্যূতের পণ করিলে।

তুমি যাহাই হও, আমি তোমাকে পতি বলিয়া জানিয়াছি, আমি আজও তোমার অনুগতা ধর্মপত্নী। তোমার বিরুদ্ধাচরণ আমি করিব না। কিন্তু তোমার ওই ধর্ষিতা-দীর্ঘশ্বাস-কম্পিত রাজসিংহাসনের অংশভাগিনী হইতে আর আমাকে আহ্বান করিও না, এই আমার মিনতি। ধিক্ এ রাজ্য, ধিক্ আমি এ রাজ্যের রাণী।

মহারাজ, তোমার পত্নী-পরিচয়ে ইহজীবন কাটাইলাম; আমাকে ক্ষমা করিও, যদি ইহজন্মের পরেও আর তোমাকে পতি বলিয়া মান্য করিতে অক্ষমা হই। আমার উপরে ক্রুদ্ধ হইও না। আমি তোমার মত মহাপুরুষ নহি, আমি দুর্বলা নারীমাত্র। নারীর আর্তনাদে আমার চিত্ত মথিত হয়, একদা স্বয়ং দুর্বৃত্ত-হস্তে লাঞ্ছিতা হইয়াছিলাম বলিয়াই সকল নারীর লাঞ্ছনাকে নিজের লাঞ্ছনা বলিয়া মনে করি।

মহারাজ, তুমি রাজ্যশ্রীর স্বামী হইয়াছ, জীবনব্যাপী দ্যূতক্রীড়াবলে লব্ধ সেই মহিষীকে লইয়া সুখে কালাতিপাত কর। আমাকে আর ডাকিও না, আমি তোমার সহিত স্বর্গবাসও করিতে চাহি না। ভাগ্যক্রমে যদি এমন দিন আসে, তোমার সহিত যদি সশরীরেও স্বর্গের পথে যাত্রা করিতে হয়, সেদিন যেন আমি পথেই পড়িয়া মরি, তোমার সঙ্গে তোমার পত্নী-পরিচয়ে যেন স্বর্গের দ্বারে প্রবেশ করিতে বাধ্য না হই, বিধাতার চরণে ইহাই আমার পরম প্রার্থনা রহিল।

দ্রৌপদীর স্বভাবমধুর কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ তীব্র ও উচ্চ হইয়া গগনস্পর্শী হইল, কক্ষের প্রাচীরে প্রাচীরে প্রতিধ্বনিত হইল। সে স্বরবিস্তার নিস্তব্ধ হইবার পূর্বেই দেবী অসম-পদবিক্ষেপে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলেন।

নির্জন গৃহে ক্রন্দন-বিহ্বলা দ্রৌপদী কক্ষতলে লুণ্ঠিতা হইতেছিলেন।

বঙ্গদেশীয় প্রতিভূগণ দ্বারপ্রান্তে গিয়া দাঁড়াইলেন। ভয়ে ভয়ে ডাকিলেন, দেবি!

দ্রৌপদী উত্তর দিলেন না।

প্রতিভূ-প্রধান কহিলেন, দেবি, আমরা এক্ষণে কি করিব?

দ্রৌপদী কথা কহিতে পারিলেন না। মুক্তবেণী মস্তক আর্তবেগে সঞ্চালিত করিয়া বুঝাইলেন, আমি জানি না— আমি জানি না।

প্রতিভূ কহিলেন, দেবি, আমরা ফিরিয়া যাইতেছি। আমাদিগকে একটি বাণী দিন।

দ্রৌপদী মুখ তুলিয়া চাহিলেন। অশ্রুতে আচ্ছন্ন দৃষ্টি মেলিয়া কহিলেন, কি দিব?

বাণী।

কি বলিব?

যাহা হউক।

কি বলিব। আমার বলিবার কিছু নাই, তাহা কি এতক্ষণেও বুঝ নাই?

দ্রৌপদীর কণ্ঠ অশ্রু-বিকৃত হইল; আমি অসহায়া, পথের ভিখারিণী অপেক্ষাও হীনা। তোমাদিগকে কোন্ আশ্বাসবাণী আমি দিব? আমাকে ক্ষমা কর।

বঙ্গদেশীয় প্রতিভূ অধ্যবসায়ে অতুল্য। কহিলেন, তথাপি দেবি, যাহা হয় একটু কিছু বলিয়া দিন। আমরা ফিরিবামাত্র তাহারা জানিতে আসিবে কি বাণী লইয়া আসিলাম। তাহাদিগকে কিছু তো বলিতে হইবে।

দ্রৌপদীর নয়ন শুষ্ক হইয়া আসিতেছিল। কহিলেন, কি বলিব?

যাহা আপনার অভিরুচি।

বলিয়া কি হইবে?

আমরা সেই বাণীকে আপনার অভিমত বলিয়া প্রচার করিব; আপনার উপদেশ বলিয়া পালন করিব।

দ্রৌপদী মুখ তুলিয়া চাহিলেন। নয়নদ্বয় প্রখর হইল। কহিলেন, পারিবে?

অবশ্য পারিব। বলুন দেবি। বলিয়া প্রতিভূ ঝটিতি লেখনী ও ভূর্জপত্র বাহির করিলেন। কহিলেন, বলুন দেবি, নির্যাতিত, অবহেলিত বঙ্গবাসীর প্রতি কি আপনার নির্দেশ?

দ্রৌপদী কহিলেন, নির্বংশ হও।

১৫. ৮. ১৯৬০

বিলম্বিত লয়

শ্রীসজনীকান্ত দাস
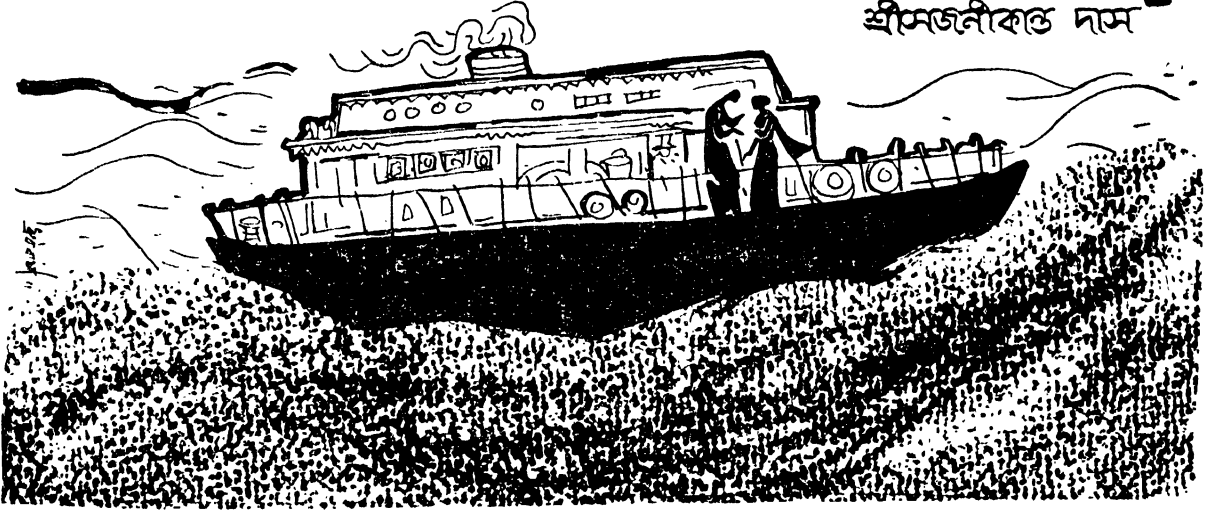
পালিয়ে যেতে আন্দামানে হঠাৎ হ'ল জাহাজ-ডুবি,
জড়াজড়ি ক'রে ম'রে তখন হল স্ফূর্তি খুবই।
দুদিন পরেই ছাড়াছাড়ি—ফুলে-শিথিল বাহুর পাশে
যায় না বাঁধা পরস্পরে; খবর পেয়ে বাপ-মা আসে।
তোমায় ক'রে কফিনজাত রাখল পুঁতে কবর খুঁড়ে,
কাঁধে চেপে ক্যাওড়াতলায় আমি গেলাম চিতায় পুড়ে।
তুমি রইলে মাটি চাপা, আমি রুপোর ভস্মাধারে;
খুঁজে বেড়াই পরস্পরে গত দিনের অন্ধকারে।

বছর তিনেক পড়েছিলাম একই সঙ্গে বি.এ. এম.এ.—
কে জান্‌ত ছাই, লেপ্‌টে যাব—সতীর্থে কয়, গভীর প্রেমে।
তোমার বাবা খ্রীষ্ট ভজেন, আমার বাবা কেষ্টভজা,
মনে পড়ে তুমি খেলে পেষ্ট্রি-পুডিং, আমি গজা

প্রথম ছুটির পিরিয়ডে স্কটিসচার্চে কমন-রুমে।
টিফিন সারা হলে মোদের চোখের পাতা মিষ্টি-ঘুমে
জড়িয়ে যেমনি এল অমনি—'টমরি'র সেই টমাস দেড়ে
এসেই কাঁধে থাবড়া মেরে চেঁচিয়ে বলে, "আছিস বেড়ে!"
হিংস্র তাহার অট্টহাসি; তুমি দারুণ বিরক্তিতে,
আড়চোখেতে দেখে নিলাম, করিডরের একটি ভিতে
দাঁড়াও গিয়ে; লজ্জা হল কেন জানি জাগলও ভয়,
হয় নি বটে তখনো তো সরাসরি বাগ্‌বিনিময়!

মুখে মুখে রট্‌ল খবর, মিথ্যে খবর রটে বেশি;
কলেজসুদ্ধ জান্‌ল সবাই, খ্রীষ্টানী জেন্‌ এলোকেশী
শিবেন দাসের বুকে চ'ড়ে জিভ কেটেছে লজ্জাভরে—
শিবেন দাস সে এই অধমই; লজ্জাঘৃণায় গেলাম ম'রে।

ক্লাসের শেষে পথে এসে চাইলামও তো তোমার ক্ষমা,
তুমি চোস্ত ইংরেজিতে রাগ যতটা ছিল জমা,
উজাড় ক'রে আমার শিরে গট্‌গটিয়ে গেলে চ'লে
শ্রীচুনী গোস্বামী যথা বল ঢুকিয়ে ই.-বি.-গোলে!
ইংরেজিতে জুতো মেরে মাতৃভাষায় পরের দিনই
চাইতে গভীর অ্যাপলজি হ'ল প্রথম চেনাচিনি।
সেই প্রথমই শেষ হ'ল সেই সর্বনাশা স্টীমার-ট্রিপে,
তোমার বাবা আমার বাবা ধরতে গেলেন একই জীপে।
একে যীশুখ্রীষ্ট ভজেন অন্যজনা কেষ্টভজা,
সমান ব্যথায় চেয়ে দেখেন উড়ছে উজান স্টীমার-ধ্বজা!
তরী তখন তীর ছেড়েছে, আমরা দেখি দাঁড়িয়ে ডেকে
পরস্পরের হাত-নাড়াটাই, বাঁকে স্টীমার গেল বেঁকে।

ভাগীরথী দামোদরের প্রেমের মিলন খানিক বাদে,
অস্তাচলে তাকাই দুজন রেলিং ধ'রে কাঁধে-কাঁধে।
দুইকে কখন তিন ক'রে দেয় রূপনারায়ণ স্নেহ ঢালি—
ত্রিবেণীসঙ্গমে বিশাল ঢেউ-উত্তাল গেঁয়োখালি।

তিমির আসে নিবিড় হয়ে, নারিকেলের উচ্চ চূড়া,
স্নানের ঘাটে কলসি-কাঁখে ঘরে ফিরে যায় বধূরা।
আবছা হয়ে এল ছবি, দাঁড়িয়ে ডেকের একটি কোণে
জানতে কি চাই পরস্পরে কী ভাব জাগে কাহার মনে!

মধ্যরাতে মাঝদরিয়ায় রে-রে হাঁকে কালবোশেখী
ডাকাত-পড়ার মতন আসে, আছাড়-পিছাড় কাণ্ড সে কী!
চারিদিকে কান্নাকাটি জীবন-ভিক্ষা যমের দ্বারে,
জল-কল্লোল হারিয়ে গেল নরকণ্ঠের হাহাকারে।
দাঁড়িয়ে থাকা দায় হ'ল, জল আছড়ে পড়ে পাটাতনে
কেবিনবদ্ধ করল মোদের হুকুম দিয়ে নাবিক-জনে।
তোমার মুখে ফুটল হাসি, বললে, "এ তো ভালই হ'ল,
ডুয়েট-গানে অনেক বাধা, গাওয়াই ভাল সোলো-সোলো।
বাবা আমার বাপ-মা দুইই, দেখেছি জল তাঁহার চোখে,
আমরা যদি ভুল করেছি, কালবোশেখী করল ও.কে.!"
বলতে বলতে ঝলসে ওঠে মেঘ-মাটি-জল, জাহাজখানা
থরথরিয়ে উঠল কেঁপে, আকাশ-দৈত্য দিল হানা;
শব্দে ভীষণ মূর্ছাহত এলিয়ে পড়লে আমার বুকে,
ডুবল বজ্রদগ্ধ তরী, সকল ভ্রান্তি গেল চুকে।

লোয়ার সার্কুলার রোডের সেমিট্রিতে একলা শুয়ে
শুনতে কালের পদধ্বনি, টুপ-টাপ্-টুপ পড়ত ভূঁয়ে
বকুল ঝ'রে বাদল বায়ে, পারতে নিতে গন্ধ চিনে ?
বকুল-গ'ড়ে দিয়েছিলাম অনেক খুঁজে জন্মদিনে।
আমি মাইল পাঁচেক দূরে চেৎলা রোডের এক কিনারে
বুড়ো বাবার বাক্সে ছিলাম নক্সাকাটা রৌপ্যাধারে।
দীর্ঘশ্বাসে উড়ে উড়ে পড়ব গিয়ে তোমার কাছে—
নোটের তাড়ার মাঝে বন্দী, বেরবার কি উপায় আছে !
একদিন সেই বেরিয়েছিলাম সকল বাঁধন ছেদন ক'রে—
ভস্মরূপেই বদ্ধ হলাম রোমান্টিক্ মৃত্যুতে ম'রে !

এমনি ধারা বিফলতায় কাট্‌ত জীবন চিরকালই,
মহাকালের পেটের খবর জানেন একা মহাকালী !
চেৎলা ছেড়ে বাবা আমার পার্কসার্কাস অ্যাভিন্যুয়ে
পালিয়ে এলেন নীচের ফ্ল্যাটে অতীত স্মৃতি মুছে ধুয়ে।
"ছেড়ে পীঠস্থান কালীঘাট কবর-কসাই-গুণ্ডাপাড়ায়"
আসতে মায়ের আপত্তি খুব, এলেন শেষে বাবার তাড়ায়
তাঁহার সেল-ট্যাক্সো আপিস, ট্রামের পথেই বেলেঘাটা,
বাসে চেপে যাবেন তেমন নেইকো বয়স, বুকের পাটা।

এমন কঠিন কথার পরে অগত্যা মা সয়েই থাকেন—
আমি ভাবি, মারে কে তায় স্বয়ং কেষ্ট যারে রাখেন !

একদিন কী হ'ল শোনো মেঘ-বাদলে পিছল সে রাত,
নিঝুম নিষুত ভদ্র পাড়ায় পথের বাতি নেবে হঠাৎ।
তক্কে তক্কে চোররা ছিল নতুন ভাড়াটেদের দেখে,
এসেছিল জনছয়েকে তেল-কালি সর্বাঙ্গে মেখে।
ট্রাঙ্ক-স্যুটকেশ-সেলাইকল আর রেডিও সেট-আতরদানি—
মায়ের গয়না ভর্তে ছিল, বাবার সে হাতবাক্সখানি
মাথায় মাথায় নিয়ে গেল তারি সঙ্গে নিল আমায় ;
সামনে বিরাট কবরখানা, সেথায় মাথার বোঝা নামায়—
তোমার সমাধিরই ওপর নিত্যঝরা বকুলতলে।
সেইখানেতে ঘণ্টা দুয়েক ভাগাভাগি বখরা চলে—
টাকাকড়ি কাপড়চোপড় রুপোর বাসন আতরদানি
সবার শেষে খুল্‌ল তারা হাতবাক্সের কৌটাখানি।
পাত্রখানা দামী বটে, ভেতরের ছাইভস্মগুলো !
ছড়িয়ে দিল মাটির 'পরে, ধুলোর সাথে মিশল ধুলো।
জনমানবহীন চারিদিক কেউ কোথা নেই ডাইনে-বামে
চোরেরা সব পালিয়ে যেতে, আকাশ-ভাঙা বৃষ্টি নামে।
আমার চিতাভস্ম তোমার মাটি-হওয়া দেহের সাথে—
মিলে গেলাম পরস্পরে মাহভাদর বাদর-রাতে !

শরৎ এল, উড়ে মালী গোলাপ-কলম সেই মাটিতে
পুঁতেছিল যত্ন করেই, আড়াইটি মাস না কাটিতে
রঙীন গোলাপ ফুটল গাছে, যেমন বাহার তেমনি সুবাস।
দেখতে দেখতে এল সবার আকাঙ্ক্ষিত অঘ্রান মাস,
তোমার শুভ জন্মদিবস। পোস্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাসের যত
ভক্ত তোমার, পুষ্প-অর্ঘ আনল সবাই সাধ্যমত।
এসেছিল টমাস দত্ত কামিয়ে দাড়ি-গোঁফ বিল্‌কুল্‌,
চক্ষু দুটি ছলছলো, হারিয়ে গেছে কথার সে হুল।
হাঁটু গেড়েই ব'সে ছিল—এসেছিল রেজিনা পল,
বকুলতলায় দাঁড়িয়ে তোমার বাবার দৃষ্টি ছিল সজল।
নজর থাকলে দেখতে পেতে আমার বাবা খানিক তফাত
দাঁড়িয়ে ছিলেন আমার মায়ের কাঁধে রেখে কম্পিত হাত।

শুভদিনের শুভ্রপ্রাতে, কবর-ফোঁড়া গোলাপ গাছে
অবাক হয়ে দেখল সবাই একটি গোলাপ ফুটে আছে—
গাঢ় রক্তরাঙা সে ফুল, কেউ কি বুঝল তাহার ভাষা ?
রঙের তলায় লুকিয়ে আছে কত যে সুখ, কতই আশা!

সবাই যখন বিদায় হ'ল একা টমাস এল ফিরে,
শ্রদ্ধাভরে চয়ন করে সঙ্গীবিহীন গোলাপটিরে,
লাগায় কোটের বাটন-হোলে, ভেজে তাহার চোখের পাতা।
হয়তো বলে, "এলোকেশী, এই বুকেতেই রইল পাতা
আসন তোমার, হে প্রেয়সী, থাকবে যদিন আমি বাঁচি।"
জান্‌ল নাকো হতভাগা ওই ফুলেতেই আমি আছি॥

কলকাতার একটি কলেজের একদল তরুণ বাঙালী ছাত্র একসময় বাংলাদেশে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন—উনিশ শতকের দ্বিতীয় প্রহরে।

একজন অবাঙালী পর্তুগীজ ফিরিঙ্গি শিক্ষক ছিলেন এই ছাত্রদলের দীক্ষাগুরু। তাঁর নাম 'হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও', এবং তাঁর তরুণ ছাত্রদলের নাম 'ইয়ং বেঙ্গল'। কলেজের নাম 'হিন্দুকলেজ'।

নবীনের কলরবে প্রবীণের সমাজে হৃদ্‌কম্পের সঞ্চার হয়েছে অনেকবার। কিন্তু সমাজচৈতন্যের মূল পর্যন্ত সজোরে নাড়া দিয়েছিলেন ইয়ং বেঙ্গল দল নির্ভয়ে। সমাজতরীর ভরাডুবির আশংকায় স্থিতস্বার্থ প্রবীণেরা সেদিন যে-রকম সাংঘাতিক সোরগোল করে আকাশ ফাটিয়েছিলেন, তার তুলনা এদেশের ইতিহাসে বিরল। তাঁদের আস্ফালনকে নবীনেরা কেল্লার কামান-বিস্ফোরণের সঙ্গে তুলনা করে ব্যঙ্গ করতেন আর বলতেন, 'ও ভয়ে কম্পিত নয় মোদের হৃদয়'। বৃদ্ধদের গোঁড়ামির জবাব দিতেন তাঁরা এই ভাষায়: "The bigots are up with their thunders of fulmination. We hope, perseverence will be the Liberal's answer."

আজকের বিশ শতকের বহুমুখী বেগবান সমাজে প্রবীণ-নবীনের আদর্শসংঘাতে উনিশ শতকের প্রচণ্ড আবর্ত সৃষ্টি হওয়া আর সম্ভব নয়। কারণ সতত-সচল সমাজের বুকে আজ ঝঞ্ঝামদমত্ত বলাকার অস্থিরতা জেগেছে, বেগের আবেগ সঞ্চারিত হয়েছে এবং তার চলার মন্ত্র হয়েছে 'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে'। সচল-অচলের তীব্র বৈপরীত্য বৈজ্ঞানিক যুগে আজ দ্রুতবিলীয়মান। একশ-দেড়শ বছর আগে উনিশ শতকের বাংলার সমাজে এই সার্বিক সচলতা ছিল না। স্থিতি-গতির বৈপরীত্য ছিল তখন সাদা-কালোর মতন সুতীব্র ও সুস্পষ্ট। কুম্ভকর্ণের অচৈতন্য নিদ্রায় অভিভূত ছিল সমাজ। সামান্য আঘাতে তার অসাড় দেহে চৈতন্যের উদয় হত না। আঘাতের পর আঘাত করে এবং তার প্রচণ্ডতা বাড়িয়ে, ঘুমন্ত সমাজের চৈতন্য জাগানোর প্রধান ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন 'ইয়ং বেঙ্গল' দল। প্রবীণ-নবীনের দ্বন্দ্ব তখন তাই ভয়ংকর নির্দয় রূপ ধারণ করেছিল। একদিকে রক্ষণের সংশয়-ভয়-আর্তনাদ, আর একদিকে ভাঙনের শঙ্কাহীন উল্লসিত কোলাহল—এই দুয়ের এক বিচিত্র অর্কেস্ট্রা রচিত হয়েছিল ডিরোজীয়ানদের যুগে।

নব্যবঙ্গের ফিরিঙ্গি শিক্ষাগুরু ডিরোজিও নিজেও বয়সে তরুণ ছিলেন, ছাত্রদের চেয়ে মাত্র চার-পাঁচ বছরের বড়। তরুণ গুরুর ব্যক্তিত্বের জাদুস্পর্শে বাংলার সুপ্ত তারুণ্যের দীপ্ত প্রকাশ হয়েছিল সেদিন। অবাক হয়ে ভাবতে হয়, একজন ফিরিঙ্গি যুবকের এই ঐন্দ্রজালিক ব্যক্তিত্বের উৎস ছিল কোথায়?

পত্রিকায় পত্রিকায় কতরকমের সংবাদ যে তখন প্রকাশিত হত তার ঠিক নেই। হিন্দুকলেজের নবীন যুবক ছাত্রদের সংবাদ। প্রত্যেক সংবাদে বিবাদের ঝংকার এবং সমাজের সর্বশ্রেণীর লোকের অভিযোগ শোনা যেত। বিচক্ষণের সতর্কবাণী, ভারী ওজনের সব উপদেশ, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের নির্মম বাক্যবাণ বর্ষিত হত তরুণ ছাত্রদের উপর অজস্র ধারায়। কেউ ছাত্রদের "কুর্তি এবং টুপি ও মোজা ও দস্তানা প্রভৃতি" ইংরেজী পোশাক দেখে লিখছেন যে, ছেলেরা জোয়ান বয়সে এই পোশাক পরে যদি কোন বাঙালী গৃহস্থ বাড়িতে ঢোকে, এমন কি নিজের পরিবারেও, তা হলে ঘরে সাহেব ঢুকেছে বলে লোকে কলঙ্কও রটাতে পারে। কেউ লিখছেন, "স্বজাতীয় অক্ষর ও ভাষা ত্যাগ করিয়া ইংরেজী চলন হইল এই এক আশ্চর্য্যের বিষয়।" এখানেই অবশ্য আশ্চর্যের বিষয়ের শেষ হয় নি। রামগোপাল রায় যাঁর নাম তিনি R. Roy. লিখছেন দেখে লেখক সাতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে বলছেন, "R লিখিলেই রামগোপাল হয় কিসে জানিব কারণ এই অক্ষরে রামকানাই, রামনাথ ইত্যাদি নাম আছে, আর যদি ওই R. Roy-এর স্ত্রীর নাম কৃষ্ণপ্রিয়া হয় তবে এই অভিনব মতে তাঁহার নাম কি প্রকারে লিখা যাইবেক।"

প্রশ্ন হচ্ছে, রামগোপাল রায়ের স্ত্রী যদি Mrs. Roy লেখেন, তা হলে অন্যান্য শতসহস্র রায়পত্নীরা কি বলে পরিচয় দেবেন? তেমনি যাঁর নাম কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় "তেঁহ K. Banerjee, ক বানরজী" লেখেন যদি তা হলেই বা উপায় কি? কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তান 'বন্দ্যোপাধ্যায়' হঠাৎ ইংরেজের উৎপীড়নে 'বানরজী' হবেন কেন? এরকম অনেক কুটিল প্রশ্ন ও জটিল সমস্যা "কস্যচিৎ স্বজাতীয়াক্ষরত্যাগে বিরক্তস্যের" মস্তিষ্কাভ্যন্তরে চাকভাঙা ভীমরুলের মতন ভোঁ ভোঁ করে হুল ফোটাচ্ছিল, এবং তার কোন উত্তর বা সমাধান তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। চিন্তা করলে বোঝা যায়, বাণ দুটি তিনি ইয়ং বেঙ্গল দলের দুজন চাঁইকে লক্ষ্য করে ছুঁড়েছেন—রামগোপাল ঘোষ ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

কেউ হিন্দুকলেজের ছাত্রদের 'জাবনিক রুটিভক্ষণে', অর্থাৎ মুসলমানের দোকানে রুটিমাংস খাওয়াতে অত্যন্ত বিচলিত হয়েছেন। "কস্যচিৎ কালীকিঙ্করস্য" লিখছেন, জনৈক গৃহস্থ ভদ্রলোক নিজের পুত্রকে (হিন্দুকলেজের ছাত্র) সঙ্গে নিয়ে '৺জগদম্বার দর্শনে' যান। গঙ্গাস্নানান্তে পূজার নৈবেদ্যসহ 'জগদীশ্বরীর সন্নিধানে' উপস্থিত হয়ে তিনি অষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন বটে, কিন্তু তাঁর সুসন্তানটি তা করেন না। "ব্রহ্মাদি দেবতার দুরারাধ্যা" যে জগদম্বা, তাঁর দিকে তাকিয়ে পুত্রটি 'good morning, Madam' বলে অভিনন্দন জানায়। পুত্রের ব্যাপার দেখে পিতা স্বভাবতঃই হতভম্ব হয়ে যান। এই কি হিন্দু কলেজের শিক্ষার ফল?

এই সব সমালোচনায় বাইরের পরিবেশ যখন সরগরম, ডিরোজিও তখনও হয়তো আসন্ন ঝড়ের কথা কল্পনা করতে পারেন নি। সম্ভ্রান্ত হিন্দুসমাজের কর্ণধাররা চারিদিক থেকে পরোক্ষে তাঁকেই বাণবিদ্ধ করছিলেন। হিন্দু-কলেজের শিক্ষক তিনি, বিদ্যার সঙ্গে নীতিশিক্ষা দেওয়ার দায়িত্বও তাঁর ছিল। সে দায়িত্ব পালন না করে তিনি অমার্জনীয় অপরাধ করেছেন বলে কলেজের কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করেন। যে বৈপ্লবিক জীবনদর্শনে তিনি ছাত্রদের দীক্ষা দিয়েছিলেন, প্রাজ্ঞ প্রবীণেরা একবাক্যে বলেন, তার জন্যই নাকি হিন্দুকলেজের ছাত্রদের নৈতিক ঐতিহ্যের প্রতি অবিচল আস্থায় ফাটল ধরেছিল। ডিরোজিওর শাস্তি হয়েছিল পদচ্যুতি। অভিযোগের সমুচিত জবাবও দিয়েছিলেন তিনি, যথাস্থানে আমরা তা প্রকাশ করব। কিন্তু জবাবের চেয়েও বড় জীবনের কথা তিনি ভাবছিলেন মনে হয়। তিনি জানতেন না তখনও যে জীবনের কয়েকটি দিন মাত্র তাঁর অবশিষ্ট ছিল, এবং

বাইশ বছর বয়সেই সমস্ত চিন্তাভাবনা চুকিয়ে তাঁকে ইহজগৎ ছেড়ে চলে যেতে হবে। নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের কথাই তিনি যে কেবল চিন্তা করছিলেন তা নয়, গভীর উদ্বেগের সঙ্গে, শিক্ষক-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে হয়তো তিনি তাঁর তরুণ ছাত্রদের ভবিষ্যতের কথাই বেশী করে ভাবছিলেন। যে-ছাত্রদের উদ্দেশে তিনি লিখেছিলেন :

"Expanding like the petals of young flowers
I watch the gentle opening of your minds –"

সেই ছাত্রদের আদর্শ রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারের বিরুদ্ধে সমাজের লোকের এত নালিশের কারণ কি? ধর্ম নীতি, মানবিক গুণ, পারিবারিক ও সামাজিক ঐতিহ্য, কোন কিছুর প্রতি সত্যিই কি তাদের কোন আস্থা নেই, শ্রদ্ধা নেই? নোঙরহীন নৌকোর মতন, বন্দরহীন সমাজ-সমুদ্রে তারা কি কেবল টলমল করে ভেসে বেড়াবে?

ডিরোজিও নিশ্চয়ই ভাবছিলেন, "তা হলে কি সত্যিই আমার সমস্ত শিক্ষাদান ব্যর্থ হবে? আমার স্বপ্ন, আমার কল্পনা-বাসনা, নবীন জীবন নিয়ে আমার দুঃসাহসিক পরীক্ষা, কিছুই কি সার্থক হবে না? একদিন বাংলার এই সোনার তরুণেরা তাদের কচি কচি ডানা-ঝাপটানির পালা শেষ করে অসীম শক্তি নিয়ে নিঃসীম আকাশে মুক্ত বিহঙ্গের মতন পক্ষবিস্তার করবে, বিশ্বের জ্ঞানসমুদ্র মন্থন করে অমৃতের আস্বাদ পাবে, এই ছিল আমার স্বপ্ন। যা সত্য, যা মহৎ, তার একনিষ্ঠ পূজারী হবে তারা এই ছিল আমার বাসনা। তাই তো আমি বাংলার এই তরুণদের কথা মনে করে স্বতোৎসারিত আন্তরিক ছন্দে লিখেছিলাম :

'And how you worship Truth's omnipotence !
What joyance reigns upon me, when I see
Fame in the mirror of futurity
Weaving the chaplets you are yet to gain
And then I feel I have not lived in vain.'"

অকালমৃত্যু না হলে ডিরোজিও নিশ্চয়ই অনুভব করতেন যে তিনি বৃথা জীবনধারণ করেন নি। তাঁর ছাত্রদের জীবন-মুকুল বিকশিত হওয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু হল। এ-সত্য অনুভব করার জন্য বেঁচে রইলেন বাংলার তরুণেরা, কেবল উনিশ শতকে নয়, পরবর্তী শতকেও। তরুণদের শিক্ষাগুরু তারুণ্যের মধ্যগগনেই অস্ত গেলেন।

একটি পর্তুগীজ ফিরিঙ্গি পরিবারে সূর্যোদয় হয়েছিল একদিন। ডিরোজিও জন্মেছিলেন ১০ এপ্রিল, ১৮০৯ সনে।

মৌলালির দরগার কয়েকগজ দক্ষিণে সার্কুলার রোডের উপর বাগান-পুকুরসহ বড় চৌহদ্দির মধ্যে লালরঙের দোতলা একটি বাড়ি আছে। দেখলে বোঝা যায়, সেকেলে বাড়ি। এই বাড়িতেই ডিরোজিও জন্মগ্রহণ করেন। বাড়িটি নিঃসন্দেহে বাংলার তরুণদের পীঠস্থানরূপে গণ্য হবার যোগ্য। বাড়ি থেকে কয়েকশত গজ দক্ষিণে পার্ক স্ট্রীটের প্রাচীন গোরস্থানে ডিরোজিওর সমাধি। জন্মস্থান থেকে দক্ষিণে গোরস্থান যতদূর, প্রায় ততদূর উত্তর-পশ্চিমে ডিরোজিওর জীবনের প্রধান কর্মস্থান গোলদীঘির হিন্দুকলেজ। খুব বেশী হলে এই এক কিংবা দুই বর্গমাইল ক্ষেত্রের মধ্যে তাঁর জীবনের বাইশটা বছর সীমাবদ্ধ ছিল দেখা যায়। কিছুদিনের জন্য রুটি ও কবিতার উৎস সন্ধানে ভাগলপুর যাত্রা করা ছাড়া জীবনে এই সীমানা অতিক্রম করার প্রয়োজন হয় নি তাঁর।

কলকাতা শহরে পর্তুগীজদের মধ্যে ডি'রোজারিও পরিবারের প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট। ডিরোজিওর পিতা J. Scott & Co. নামে কলকাতার বিখ্যাত সদাগরী হৌসে ভাল চাকরি করতেন। তাঁর আর্থিক অবস্থাও বেশ ভাল ছিল মনে হয়, কারণ সার্কুলার রোডের গৃহসম্পত্তি তিনি নিজের অর্থেই করেছিলেন। পর্তুগীজরা তখন এদেশের ফিরিঙ্গি-সমাজে অনেকটা উপেক্ষিতের মতন বাস করতেন। তাঁদের গৌরবের যুগ তারও প্রায় একশ বছর আগে সতের শতকেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া তাঁরা ছিলেন প্রধানতঃ বণিক, ভাল নাবিক ও যোদ্ধা, শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের অবকাশ এদেশে তাঁরা বিশেষ পান নি।

ডি'রোজারিও পরিবারেও এই বাণিজ্যিক মনোবৃত্তি প্রবল ছিল বলে মনে হয়। এরকম প্রতিকূল পরিবেশে প্রতিপালিত হয়ে ডিরোজিও কি করে জ্ঞানবিদ্যার কঠোর সাধনায় আত্মোৎসর্গ করার প্রেরণা পেয়েছিলেন, সে প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক।

প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে ডি'রোজারিও পরিবারের চেয়ে ড্রামণ্ডের বিদ্যালয়ের কথা বেশী করে মনে পড়ে। এই বিদ্যালয়ে ডিরোজিও ছ' বছর বয়স থেকে চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষালাভ করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ড্রামণ্ড সাহেব বাল্যকাল থেকে কৈশোর পর্যন্ত শিক্ষা দিয়ে ডিরোজিওর ভবিষ্যৎ জীবনের কাঠামটি সুদক্ষ কারিগরের মতন কেটেকুঁদে গড়ে দেন। তাঁর জীবনে পরিবারের চেয়ে বিদ্যালয়ের এবং বাপ-মা-ভাই-বোনের চেয়ে শিক্ষকের প্রভাব অনেক বেশী দূরপ্রসারী। ডিরোজিওর জীবনের ভাস্কর ছিলেন তাঁর শিক্ষক ড্রামণ্ড, যেমন ইয়ং বেঙ্গলের জীবন-শিল্পী ছিলেন শিক্ষক ডিরোজিও।

ড্রামণ্ডের স্কুলের নাম ছিল 'ধর্মতলা অ্যাকাডেমি'। চাঁদনির কাছে ছিল তাঁর স্কুল। উত্তরে গুমঘর, পশ্চিমে হসপিটাল স্ট্রীট, দক্ষিণে ধর্মতলা এবং পুবে হার্ট সাহেবের ঘোড়ার আস্তাবল। উত্তর-দক্ষিণ-পুব-পশ্চিম চারিদিক থেকেই স্কুলে প্রবেশ করা যেত। বাড়ি থেকে স্কুলে হেঁটে যেতে বালক ডিরোজিওর দশ-পনের মিনিটের বেশী সময় লাগত না। ছ' বছর বয়সে ডিরোজিও স্কুলে ভর্তি হন, চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। তিনি যে অসাধারণ মেধাবী ছাত্র ছিলেন, পরীক্ষার ফলাফল দেখলে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কৃতী ও প্রতিভাবান ছাত্র হিসেবে আটবছর বয়সে তিনি একটি স্বর্ণপদক পুরস্কার পান। ডিরোজিওর সাহিত্য ও সাংবাদিকতার অন্যতম গুরু বিখ্যাত 'ইণ্ডিয়া গেজেট' পত্রিকার সম্পাদক জন গ্র্যাণ্ট একবার তাঁর পত্রিকায় লেখেন: "A boy of the name of Derozio gave good conception of Shylock...it was an interesting sight to behold the native children sitting side by side with the sons of Europeans. This is as it should be." গ্র্যাণ্টের এই মন্তব্য থেকে ড্রামণ্ডের স্কুল এবং ডিরোজিওর প্রতিভা সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়। গ্র্যাণ্ট অবশ্য তখন জানতেন না যে অদূর ভবিষ্যতে এই বালক ডিরোজিওর সঙ্গে তিনি সাহিত্য-সাংবাদিকতার অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়বেন।

সাহেব ও ফিরিঙ্গিদের স্কুলের মধ্যে কলকাতায় তখন ড্রামণ্ড, শেরবোর্ন ও হাটম্যান—এই তিনজনের স্কুলের সুনাম ছিল খুব। ধর্মতলায় ছিল ড্রামণ্ডের স্কুল, উত্তর-চিৎপুর অঞ্চলে আদিব্রাহ্মসমাজের কাছে ছিল শেরবোর্নের স্কুল, বৈঠকখানায় ছিল হাটম্যানের স্কুল। কলকাতার প্রাচীন বনেদী বাঙালী পরিবারের সন্তানেরা অনেকে ফিরিঙ্গিগুরু শেরবোর্নের কাছে কালোপযোগী ইংরেজীবিদ্যা আয়ত্ত করে জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। শোনা যায় শেরবোর্নের মা ছিলেন ব্রাহ্মণকন্যা, তাই বোধ হয় এদেশের ব্রাহ্মণ্যপ্রথানুযায়ী ছাত্রদের কাছ থেকে উৎসব-পার্বণের সময় শেরবোর্ন তাঁর গুরুদক্ষিণা আদায় করতে আদৌ কুণ্ঠিত হতেন না। শেরবোর্ন নিজের নামে (Sherbourn's Bazar) একটি বাজারও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন উত্তর-কলকাতায়, বাৎসরিক ৫০০৲ টাকা খাজনায় কোম্পানির কাছ থেকে ৯৯ বছরের লিজ নিয়ে। কেবল বিদ্যার প্রতি নয়, বিত্তের প্রতিও যে শেরবোর্নের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল তা বোঝা যায়।

হাটম্যান ছিলেন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, 'ওল্ড মিশন চার্চে'র অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। বিদ্যার চেয়ে ধর্মের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল বেশী, তাই এদেশী ছাত্রের অভিভাবকরা তাঁর বৈঠকখানার স্কুলে ছেলে পাঠাতে ভয় করতেন। ক্লাসিকাল বিদ্যায় পারদর্শী বলে হাটম্যানের খ্যাতি ছিল, কিন্তু ধর্ম-বাতিকের জন্য তাঁর স্কুলের তেমন সুনাম ছিল না। তাঁর সম্বন্ধে একটি বেশ মজার কাহিনী একবার 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রে (১৬ এপ্রিল, ১৮০৫) প্রকাশিত হয়েছিল। কাহিনীটি এই: "কয়েকদিন আগে সন্ধ্যাবেলা মিস্টার ও মিসেস হাটম্যান তাঁদের তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘোড়ার গাড়ি করে বাড়ি ফিরছিলেন,

এমন সময় রাস্তার উপর হঠাৎ একটি হাতী দেখে ঘোড়া যায় খেপে। ঘটনাটি ঘটে এসপ্লানেডে। ঘোড়া ভয় পেয়ে গাড়িসহ যাত্রীদের নিয়ে ড্রেনের মধ্যে লাফ দিয়ে পড়ে।” হাটম্যান সপরিবারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে বাড়ি ফেরেন। ঘটনাটি থেকে বোঝা যায়, ডিরোজিওর ছাত্রজীবনে অন্ততঃ কলকাতা শহরে এসপ্লানেডের মতন জায়গায় হাতী চলেফিরে বেড়াত। অর্থাৎ মধ্যযুগের রক্তমাংসের নীরেট স্তম্ভ নবযুগের কলকাতা শহরে সচল ছিল তখনও।

শেরবোর্ন ও হাটম্যানের সঙ্গে ডিরোজিওর শিক্ষক ডেভিড ড্রামণ্ডের দৈহিক বা মানসিক কোন চেহারার সাদৃশ্য ছিল না। ড্রামণ্ড ছিলেন খাঁটি বিলেতি সাহেব, তার উপর স্কচম্যান। যেমন দুর্দ্ধর্ষ ও একগুঁয়ে প্রকৃতির লোক, তেমনি বিচক্ষণ ও পণ্ডিত। দর্শন সাহিত্য বিজ্ঞান প্রায় সকল বিষয়েই তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। ডিরোজিওর জন্মের বছর চার পরে ১৮১৩ সনে স্কটল্যাণ্ড থেকে ড্রামণ্ড বাংলাদেশে আসেন স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্য করে অর্থোপার্জন করতে। কিন্তু অন্য কোন বাণিজ্যে মনোযোগ না দিয়ে তিনি অল্পদিনের মধ্যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্‌যোগী হয়ে ওঠেন। প্রথমে কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে অর্থসাহায্য নিয়ে তিনি ‘ধর্মতলা অ্যাকাডেমি’ প্রতিষ্ঠা করেন, পরে নিজে তার অন্যতম স্বত্বাধিকারী হন। তাঁর পিঠের উপর একটি বড় বিসদৃশ কুঁজ ছিল বলে শহরে অনেকের কাছে তিনি কুঁজওঠা ড্রামণ্ড বলে পরিচিত ছিলেন। বাইরের এই কদর্য কুঁজের ক্ষতিপূরণস্বরূপ মনে হয় সৃষ্টিকর্তা তাঁকে আশ্চর্য সমুন্নত ঋজুমনের অধিকারী করেছিলেন। ড্রামণ্ডের মনের সেই বলিষ্ঠ ঋজুতার প্রকাশ যিনি একবার দেখেছেন তিনি জীবনে কখনও তা ভোলেন নি।

অত্যন্ত সাহসী, মেজাজী ও বিলাসী লোক ছিলেন ড্রামণ্ড। ‘গুরুমহাশয়’ বা ‘শিক্ষক’ বলতে আমাদের মনে একটি যে নিরীহ জীবের প্রতিমূর্তি ভেসে ওঠে, ড্রামণ্ডের সঙ্গে তার মিল ছিল না কোথাও। বেশ সুন্দর বড় একটি বাড়িতে তিনি বাস করতেন, সর্বত্যাগী সাধুর মতন নয়, ভোগীর মতন পরমানন্দে আরামবিলাসে। বাড়িতে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে পান-ভোজন ও নাচগান করতেও তিনি দ্বিধা করতেন না। স্কুল-মাস্টার বা গুরুমশায় হলেই যে কৌপীন পরে আত্মপীড়ন করতে হবে, এ নীতি তিনি প্রকাশ্যে অবজ্ঞা করে চলতেন। তিনি বলতেন, টাকার দিক থেকে না হলেও মনের দিক থেকে মানুষমাত্রই সম্রাট, সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রেখে, মানবিক রুচি বিকৃত না করে, আত্মতৃপ্তি ও আত্ম-প্রকাশের জন্য যা ইচ্ছে তাই সে করতে পারে। ঈশ্বর যদি কেউ থাকেন তো থাকুন, স্বর্গ কোথায় যদি কারও তা সন্ধান করার প্রচুর অবকাশ থাকে তো তিনি করুন, তবে আপাততঃ এই মর্তলোকে মানুষই ঈশ্বর, মানুষই তার সর্বময় কর্তা, এবং মানবচিন্তাই ঈশ্বরচিন্তার নামান্তর। মানুষের চেয়ে বৃহত্তর সত্য পৃথিবীতে আর কিছু নেই। ঘোর সংশয়বাদী ও যুক্তিপন্থী ড্রামণ্ড এ কথা কেবল যে বন্ধুদের বলতেন তা নয়, ছাত্রদেরও বলতেন। ‘ধর্মতলা অ্যাকাডেমি’র কুঁজ ওঠা স্কচম্যান শিক্ষককে সকলে তাই ভয় করে চলতেন, বিশেষ করে এদেশী ছাত্রদের অভিভাবকরা। ড্রামণ্ডের সাহচর্যে ছেলেরা নাস্তিক ও অতিশয় যুক্তিবাদী হয়ে উঠে সমাজে ও সংসারে বিপর্যয় ঘটাতে পারে, এই ছিল তাঁদের ভয়। তা হলেও ড্রামণ্ডের শিক্ষাদানের বৈশিষ্ট্যের জন্য এদেশী বা বিদেশী কোন ছাত্রেরই তাঁর অভাব হত না।

ড্রামণ্ডের বাড়িতে যেমন পানভোজন হত, তেমনি দর্শন বিজ্ঞান ও সাহিত্যচর্চাও হত। ভোগবিলাসের মধ্যে তাঁর সাহিত্য ও দর্শনবিলাস ছিল অন্যতম। সেইজন্য স্যাণ্ডফোর্ড আর্নট এই কটি কথা লিখে তাঁর ফার্সী ব্যাকরণ একখানি ড্রামণ্ডকে উপহার দিয়েছিলেন: “To David Drummond Esq., who amidst the luxuries of the East never lost his relish for the metaphysics and the muse...” ড্রামণ্ড ‘D. D.’ নাম দিয়ে সমসাময়িক ইংরেজী পত্রিকায় কবিতা ও সাহিত্যবিষয়ে প্রবন্ধ লিখতেন। তাঁর লেখা কবিতার একটি সংকলনও প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু তার খোঁজ-

খবর কেউ বিশেষ রাখতেন না। সাহিত্য বা কবিতার রসাস্বাদনের পরিবেশ তখনও কলকাতায় সৃষ্টি হয় নি। তা হলেও তখনকার বিদ্যোৎসাহী ইংরেজ-সমাজে ড্রামণ্ডের সাহিত্যপ্রতিভার সমঝদার যে দু চারজন ছিলেন না তা নয়। শোনা যায় তাঁর সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিষয়ে কবিতা পাঠ করে মেটকাফ খুশী হয়ে তাঁকে ৫০৲ টাকা কাব্যগ্রন্থের জন্য চাঁদা পাঠিয়েছিলেন। ড্রামণ্ড নিজেও একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন, তার নাম 'Weekly Examiner—A Journal of Politics, News and Literature'। প্রায় বছর দুই চলার পর (১৮৩৯-৪১) পত্রিকাখানি বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৪৩ সনে এপ্রিল মাসে ৫৬ বছর বয়সে ড্রামণ্ডের মৃত্যু হয়।

সুদূর স্কটল্যাণ্ড থেকে আগত সামান্য একজন স্কুল-মাস্টারের স্মৃতির কোন নিদর্শন কলকাতার মতন বিশাল মহানগরে সযত্নে রক্ষা করা হবে, এমন দুরাশা কেউ করবেন বলে মনে হয় না। আমরাও তা করি না। তবু কেউ যদি ঘুরতে ঘুরতে সারকুলার রোডের গোরস্থানে ঢুকে খোঁজ করেন, তা হলে ডিরোজিওর গুরু ডেভিড ড্রামণ্ডের একটি নিদর্শন অন্ততঃ দেখতে পাবেন এবং সেটি তাঁর সমাধি। তার স্মৃতিফলকে লেখা আছে :

Beneath lie the mortal remains of
David Drummond, a Native of Scotland,
and for many years a successful teacher of youth
in this city ; he departed this life on the
28th April 1843, aged 56 years.
This Monument was erected to the Memory
of the deceased by a few of his friends and
pupils who respected his character, admired
his talents and esteemed his worth.

'ধর্মতলা অ্যাকাডেমি' বা 'উইকলি একজামিনার', ড্রামণ্ডের কোন কীর্তির চিহ্ন নেই বলে কোন দুঃখ নেই। কারণ তাঁর সমাধির গায়ে খোদাই-করা এমন কয়েকটি কথা আছে তাঁর সম্বন্ধে যা তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রেষ্ঠ অর্ঘ হিসেবে গ্রহণ করা যায়। সেই কথা কয়েকটি হল—'a successful teacher of youth'—এবং ড্রামণ্ডের নিজের জীবনে না হলেও, তাঁর অন্যতম ছাত্র ডিরোজিওর জীবনপ্রসঙ্গে এ কথার তাৎপর্য যে কত গভীর তা সহজেই অনুমান করা যায়। পর্তুগীজ ফিরিঙ্গি পরিবারে জন্মে ডিরোজিও কোথা থেকে শিক্ষা ও প্রেরণা পেয়ে নবযুগের জীবনদর্শনে তাঁর 'ইয়ং বেঙ্গল' ছাত্রদলকে উদ্‌বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন, তার আভাস পাওয়া যায় তাঁর নিজের শিক্ষাগুরু ড্রামণ্ডের এই পরিচয় থেকে।

বিদ্যালয় নয়, সাহিত্য-দর্শন-পত্রিকাও নয়, ডিরোজিওর মতন একজন ছাত্র তৈরি করাই হল ড্রামণ্ডের জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ড্রামণ্ড ছিলেন 'তরুণদের একজন সার্থক শিক্ষক,' এতদূর সার্থক যে তাঁর ছাত্র ডিরোজিওরও এই হল শ্রেষ্ঠ পরিচয়। সার্থক শিক্ষকের ছাত্র অনেকে শুধু সার্থক শিক্ষকই হয়েছেন, কিন্তু তরুণ যুবকদের সার্থক শিক্ষকের ছাত্র নিজে তরুণদেরই শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হতে পেরেছেন, এমন দৃষ্টান্ত বেশী নেই ইতিহাসে। ডিরোজিও তাঁর শিক্ষকজীবনে গুরু ড্রামণ্ডের আদর্শই অনুসরণ করেছেন এবং সার্থক হয়েছেন গুরুর চেয়ে অনেক বেশী।

বাইরের সমাজনেতারা এবং হিন্দুকলেজের কর্তারা যখন শিক্ষক ডিরোজিওর চরিত্র, নীতিবোধ ও মতবাদের বিরূপ সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন, তখন ডিরোজিওর শিক্ষক ড্রামণ্ড জীবিত ছিলেন, কর্মক্ষমও ছিলেন। তা যখন ছিলেন তখন জানতে ইচ্ছে হয়, কেন তিনি হিন্দুকলেজের কর্তৃপক্ষের সামনে সশরীরে উপস্থিত হয়ে ডিরোজিওর বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগের জবাব দেন নি? কেন 'successful teacher of youth' ড্রামণ্ড বলেন নি তখন যে হিন্দুকলেজের তরুণ ছাত্রদের চরম প্রগতিবাদী মনোভাবের জন্য যদি কেউ দায়ী থাকেন তা হলে তিনি দায়ী, তাঁর ছাত্র ডিরোজিও দায়ী নন? কিন্তু এ রকম কোন ঘটনা ঘটেছে বলে আমরা জানি না, ঘটলে নিশ্চয় ব্যাপারটা খুব নাটকীয় হত। কিন্তু বাস্তব জীবনের সমস্ত ঘটনা নাটকীয় নয় বলে হয়তো ড্রামণ্ডের পক্ষে তখন চুপ করে দর্শকের মতন

ডিরোজিওমুখী ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ্য করাই স্বাভাবিক ছিল।

আট বছর ড্রামণ্ডের কাছে শিক্ষালাভ করে চোদ্দ বছর বয়সে ডিরোজিও কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি জানতেন না যে তাঁর ছাত্রজীবনের মতন কর্মজীবনের মেয়াদও মাত্র আট বছর। বিদ্যালয় ছেড়ে প্রথমে তাঁকে বছর দুই সদাগরী আফিসে কেরানীর চাকরি করতে হয়। কিন্তু চারদেয়ালের বদ্ধ পরিবেশে বন্দী হয়ে কেরানীর কলমপেষার একঘেয়ে কাজ করতে কোন তরুণেরই ভাল লাগে না, ডিরোজিওরও লাগে নি। চাকরি ছেড়ে ভাগলপুরে তিনি মাসিমার কাছে কিছুদিনের জন্য চলে যান। সেখানে তাঁর মেসোমশায় জনসন সাহেব নীল কুঠির মালিক ছিলেন। নীলচাষের ধুম পড়েছিল তখন ভাগলপুর অঞ্চলে। কুঠিয়াল জনসনের অর্থের অভাব ছিল না। ডিরোজিও পরম নিশ্চিন্তে কিছুদিন তাঁদের স্নেহাশ্রয়ে থাকার সুযোগ পেয়ে কাব্যচর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন। তখন তিনি ষোল বছরের যুবক। ভাগলপুরের প্রাকৃতিক পরিবেশ, পাহাড় নদী, তাঁর কবিমানসের বিকাশে সাহায্য করেছিল। গঙ্গার প্রবাহ এবং মুঙ্গের, ভাগলপুর, ডালটনগঞ্জের গিরিশ্রেণীর দিকে চেয়ে ডিরোজিও তন্ময় হয়ে যেতেন কাব্যিক কল্পনায়। কল্পনা মূর্ত হয়ে উঠত ছন্দে—

Ye waters bright that beneath me roll !
Tell me, where is the light of my soul—
On the mountain-top, on the boundless main,
By the pebbly beach, or the desert plain ?
Yet tell me,—burns the vital spark,
Or is it quenched, and my soul all dark ?—
Winds ! that, like winged spirits play
Around my temples, say, O ! say,
Whither my love can be wandering now
Without my garland to bind his brow ?—

এই সকাতর আকুলতা 'The Maniac Widow'-র বেদনার প্রকাশ হলেও, তরুণ কবি ডিরোজিও এর মধ্যে তাঁর নিজের প্রেমের ব্যাকুলতারই রূপ দিয়েছেন। ভাগলপুরে এইভাবে কবিতা লিখে তাঁর দিন কাটত। সেখান থেকে কলকাতায় 'ইণ্ডিয়া গেজেটে'র সম্পাদক ডক্টর গ্র্যান্টের কাছে কবিতাগুলি তিনি পাঠিয়ে দিতেন। 'Juvenis' নামে তাঁর অনেক কবিতা ও সাহিত্যরচনা 'ইণ্ডিয়া গেজেট' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। লেখার সূত্রে এই সময় থেকে গ্র্যান্টের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গ্র্যান্টের পোষকতায় ও উৎসাহে তাঁর কাব্য-সাহিত্য-চর্চা অবাধে চলতে থাকে, এবং সুধীমহলে অল্পবয়সেই তিনি বেশ খ্যাতি অর্জন করেন।

মনে হয় বছরখানেকের বেশী ভাগলপুরে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি, কারণ ১৮২৬ সনের মাঝামাঝি তাঁর কলকাতার হিন্দুকলেজে শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়—"ইংরাজী পাঠশালায় ডিয়রম্যান নামক একজন গোরা আর ডি রোজী সাহেব এই দুই জন নূতন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন" (সমাচার দর্পণ, ১৩ মে, ১৮২৬)। হিন্দুকলেজের চতুর্থ শিক্ষকের পদে তিনি নিযুক্ত হন। তখন ডিরোজিওর বয়স ঠিক সতের।

হিন্দুকলেজ তখন জুনিয়র ও সিনিয়র দুইভাগে বিভক্ত ছিল, একটিকে 'পাঠশালা' ও আর একটিকে 'মহাপাঠশালা' বলত। কলেজ পরিচালনার ভার ছিল তখন একটি 'ম্যানেজিং কমিটি' বা 'অধ্যক্ষ সভার' উপর। গোপীমোহন দেব, জয়কৃষ্ণ সিংহ, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গানারায়ণ দাস ও হরিমোহন ঠাকুরকে নিয়ে প্রথম অধ্যক্ষসভা গঠিত হয়। কলেজের গবর্ণর ছিলেন গোপীমোহন ঠাকুর ও বর্ধমানরাজ তেজচন্দ্র। ১৮১৯ সনে ডেভিড হেয়ার কলেজের ভিজিটার বা পরিদর্শক নিযুক্ত হন, ১৮২৪ সন থেকে ডক্টর উইলসন এই পদ গ্রহণ করেন। জানুয়ারি ১৮২৫ সনের রিপোর্টে হিন্দুকলেজের শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে উইলসন লেখেন: "The general result of the operations of the Hindu College is to give the students a considerable command

of the English language, to extend their knowledge of History and Geography, and to open to them a view of the objects and means of Sciences." ইংরেজী ভাষায় ও সাহিত্যে, ইতিহাসে ও ভূগোলে, এবং বিজ্ঞানে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়াই হিন্দুকলেজের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বিদ্যালয়ের এই শিক্ষাদর্শের সঙ্গে ডিরোজিওর নিজের আদর্শের কোথাও যে কোন অসঙ্গতি ছিল তা মনে হয় না। তবু ঘটনাচক্রের এমনই পরিহাস যে চার-পাঁচ বছরের মধ্যেই আদর্শচ্যুতির অপরাধে ডিরোজিও দণ্ডিত হলেন।

ডিরোজিও হিন্দুকলেজে শিক্ষকের পদ গ্রহণ করার পর, পরিদর্শক উইলসন বাৎসরিক রিপোর্টে ছাত্রদের শিক্ষার অগ্রগতির কথাই উল্লেখ করেছেন। ১৮২৭ সনে, অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষার পরেও তিনি সিনিয়র বিভাগের ছাত্রদের ইংরেজী রচনাশক্তির ক্ষমতা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছেন। তা সত্ত্বেও তিনি মন্তব্য করেছেন যে সিনিয়ার ছাত্রদের সমগ্র ইংরেজী সাহিত্যে আরও গভীর ব্যুৎপত্তির প্রয়োজন। ১৮২৮ সনে উইলসন লেখেন যে কলেজের প্রথমশ্রেণীর ছাত্ররা পোপের কবিতা, মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট', এবং সেক্সপীয়রের ভাল ভাল নাটকগুলি সম্বন্ধে বেশ চমৎকার জ্ঞানলাভ করেছে। এ ছাড়া ইতিহাস দর্শন গণিত ও বিজ্ঞানেও তাদের উন্নতি হয়েছে যথেষ্ট। ১৮২৪ সনে যখন তিনি পরিদর্শক নিযুক্ত হন তখন প্রথমশ্রেণীর ছাত্ররা Tegg-এর Book of Knowledge ও Enfield-এর Speaker পাঠ করত, এবং তাতে যেটুকু শিক্ষা তাদের হত তার চেয়ে অনেক বেশী শিক্ষা এখন (১৮২৮ সনে) পঞ্চমশ্রেণীর ছাত্ররা পেয়ে থাকে। আর এখনকার প্রথমশ্রেণীর ছাত্রদের সঙ্গে আগেকার প্রথমশ্রেণীর কোন তুলনাই হয় না—"Whilst those of the present first-class, admit of no comparison with anything yet effected by the College, and far exceed the expectations which I then expressed or entertained."

১৮১৭ সনে হিন্দুকলেজ স্থাপিত হওয়ার পর থেকে প্রায় সাত-আট বছর পর্যন্ত ছাত্রসংখ্যা বাড়ে নি বললেই চলে। ১৮২৪ সন পর্যন্ত ছাত্রসংখ্যা একশতের বেশী ছিল না, তার মধ্যে ২৫ জন ছিল পে-স্কলার, বাকি সকলে বিনা বেতনে পড়ত। ১৮২৫ সন থেকে পে-স্কলারের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে, ১৮২৬-এর শেষে ২২৩ জন, ১৮২৭-এর শেষে ৩০০ জন এবং ১৮২৮-এর শেষে ৩৩৬ জন হয়। ১৮৫০-৫১ পর্যন্ত পে-স্কলারের সংখ্যা গড়ে ৪৫০ জন ছিল বলা চলে। কেবল ১৮৩০-৩১-৩২ সনে দেখা যায় কলেজের ছাত্রসংখ্যা কিছু কমে গিয়েছিল। এর কারণ উল্লেখ করে কের (J. Kerr) সাহেব বলেছেন: "The falling off...was supposed to be owing partly to the establishment of other schools, partly to the commercial distress which prevailed at that period, and partly to a panic among the natives caused by a supposed interference with the religion of the boys who, under the influence of Mr. Derozio, were fast losing their respect for the venerable customs of their forefathers." কের যদিও অন্যান্য স্কুল প্রতিষ্ঠা ও আর্থিক সঙ্কটের কথা বলেছেন, তা হলেও ১৮২৯-৩০-৩১ সনে হিন্দুকলেজের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে যে প্রবল আন্দোলন গড়ে উঠেছিল প্রধানতঃ ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রবৃন্দকে লক্ষ্য করে, তারই ফলে অভিভাবকরা অনেকে তাঁদের ছেলেদের কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দেন।

কিন্তু হঠাৎ কী এমন ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হল দু-এক বছরের মধ্যে যার জন্য কলেজের একজন তরুণ বয়সের শিক্ষক ডিরোজিও সমগ্র হিন্দুসমাজের সামনে অপরাধীর মতন কাঠগড়ায় দাঁড়াতে বাধ্য হলেন? অথচ আগে যে পরিদর্শকের রিপোর্টের কথা আমরা উল্লেখ করেছি তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে ডিরোজিওর আমলে কলেজের ক্রমিক উন্নতি ছাড়া অবনতি হয় নি। শিক্ষার মানের দিক থেকে, ইংরেজী সাহিত্য দর্শন ইতিহাস

বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে, ছাত্রদের দ্রুত উন্নতি লক্ষ্য করে পরিদর্শক উইলসন নিজেই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছেন, এবং এতদূর উন্নতি যে আশাতিরিক্ত তাও তিনি স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন নি। শুধু যে শিক্ষার মান বেড়েছে তা নয়, কলেজের বৈতনিক ছাত্রসংখ্যাও ডিরোজিওর সময় দু-তিন বছরের মধ্যে দ্রুত হারে বেড়েছে, এবং সেটা নিশ্চয় কলেজের উপর অভিভাবকদের আস্থাবৃদ্ধির লক্ষণ হিসেবে ধরা যেতে পারে। কেবল ডিরোজিওর জন্যই যে কলেজের এই সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হচ্ছিল তা বলা যায় না, কিন্তু শিক্ষক হিসেবে তিনি তার জন্য অন্ততঃ কিছুটা দায়ী ছিলেন বলা যায়। তা হলে হঠাৎ কেন তাঁরই মাথার উপর পুঞ্জীভূত আক্রোশের মেঘ সশব্দে ফেটে পড়ল, এবং তাঁরই প্রিয় ছাত্রদের ঘিরে প্রচণ্ড ঝড় উঠল সমাজে ?

এককথায় এর উত্তর হল, গুরু ড্রামণ্ডের মতন ডিরোজিও নিজেও ছিলেন (যদিও ড্রামণ্ডের মতন ডিরোজিওর সমাধির স্মৃতিফলকে তা লেখা নেই) 'a successful teacher of youth'—তরুণদের সার্থক শিক্ষক। আরও অনেক শিক্ষক ছিলেন হিন্দুকলেজে, কোন কোন বিষয়ে তাঁর চেয়ে হয়তো তাঁরা অনেক বেশী পণ্ডিতও ছিলেন, ভাল পড়াতেও পারতেন, কিন্তু কলেজের রেজিস্টার-খাতায় ছাড়া ইতিহাসের পাতায় তাঁরা কোন স্বাক্ষর রেখে যেতে পারেন নি। তার কারণ বিদ্যাবুদ্ধি পাণ্ডিত্য নিষ্ঠা কর্মক্ষমতা সবই ছিল তাঁদের, ছিল না কেবল ডিরোজিওর মতন জাদুকরী ব্যক্তিত্ব ও চুম্বকতুল্য চরিত্র। তাঁদের পাণ্ডিত্য ছিল, প্রতিভা ছিল না, এবং পাণ্ডিত্যও যা ছিল তা নীরেট পাথরের মতন অচল। কিন্তু ডিরোজিওর পাণ্ডিত্যের চেয়ে প্রতিভা ছিল বেশী, এবং বিদ্যা যেটুকু ছিল তাঁর তা প্রতিভার স্পর্শে চকমকির মতন জ্বলে উঠত। তাঁর সান্নিধ্যে যাঁরা আসতেন তাঁরা কেবল বিদ্যার শীতল চাপ নয়, প্রতিভা-স্ফুলিঙ্গের এই উত্তাপও অনুভব করতেন। গুরু-শিষ্যের শিক্ষক-ছাত্রের তো নিশ্চয়ই, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কেও যেখানে কেবল বাধ্যতার চাপ আছে, মনের তাপ নেই, সেখানে বন্ধন কখনও অকৃত্রিম ও অবিচ্ছেদ্য হয় না—হতে পারে না। হিন্দুকলেজে শিক্ষক ডিরোজিওর সঙ্গে তাঁর ছাত্রদের যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তার মধ্যে হৃদয়ের ও প্রতিভার এই উত্তাপ ছিল বলেই বাইরের জনসমাজে তার প্রকাশ হয়েছিল চোখ-ধাঁধানো বিদ্যুৎ-ঝিলিকে।

ডিরোজিওর ছাত্ররাই এই আন্তরিক সম্পর্কের কিছু কিছু বিবরণ দিয়ে গেছেন। রাধানাথ শিকদার লিখেছেন যে ডিরোজিওর বিদ্যাভিমান কিছু থাকলেও, তাঁর মতন সহানুভূতিশীল স্নেহপ্রবণ শিক্ষক তখন দুর্লভ ছিল। কোন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার আগে তিনি ছাত্রদের চমৎকারভাবে বুঝিয়ে দিতেন শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য কী। ছাত্ররা তাতে লাভবান হত সবচেয়ে বেশী এবং কেবল বিদ্যা আয়ত্ত করেই তাদের তৃপ্তি হত না, জীবনে ও সমাজে তার প্রয়োগ-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় তারা অনুপ্রাণিত হত। আর কোন শিক্ষক ছাত্রদের মনে এরকম উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগাতে পারতেন না। রাধানাথ নিজে তাঁর কাছে সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করে বিশেষ উপকৃত হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, মানুষের জীবনের সবচেয়ে যে বড় শিক্ষা, সত্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা, তা তাঁরা তাঁদের গুরু ডিরোজিওর কাছ থেকে লাভ করেছিলেন।

প্রত্যক্ষভাবে ডিরোজিওর ছাত্র নন অথচ সেযুগের একজন বিশিষ্ট প্রত্যক্ষদর্শী, গোঁড়া-হিন্দু-সমাজ-পরিত্যক্ত আর-একজন প্রতিভাবান বাঙালী রেভারেণ্ড লালবিহারী দে, ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রদের সম্বন্ধে যা লিখে গেছেন তা উল্লেখযোগ্য। ডিরোজিওর মৃত্যুর বছর তিনেক পরে ১৮৩৪ সনে লালবিহারী দে প্রথম কলকাতায় আসেন লেখাপড়া শেখার জন্য। ডিরোজিয়ান যুগের কলরব তখনও শান্ত হয় নি, বরং মনে হয় যেন গুরুর মৃত্যুর পরে ইয়ং বেঙ্গল দল দ্বিগুণ উৎসাহে তাঁদের আদর্শ প্রচারে অগ্রসর হয়েছিলেন। এই পরিবেশের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লালবিহারী দে'র ছিল। ডিরোজিও সম্বন্ধে অনেক কথা তিনি তাঁর ছাত্রদের কাছ থেকে শুনেছিলেন মনে হয়। তিনি লিখেছেন: "হিন্দুকলেজের তরুণ ছাত্ররা বেকন

(Bacon) লক (Locke) বার্কলে (Berkeley) হিউম (Hume) রীড (Reid) ও স্টুয়ার্ট (Stewart) প্রমুখ দার্শনিকদের রচনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। এই জ্ঞানলাভের ফলে তাঁদের গতানুগতিক চিন্তাধারায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হতে থাকে। প্রত্যেক বিষয়ে তাঁরা প্রশ্ন করতে, তর্ক করতে ও সন্দেহ করতে আরম্ভ করেন। তাঁদের এই নতুন শিক্ষাদানের কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশী ডিরোজিওর। হিন্দুকলেজে ডিরোজিওর 'ক্লাস' ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকমের। ছাত্ররা তাঁর ক্লাসে জ্ঞানবিদ্যার এক নতুন আস্বাদ পেতেন যা আর কোথাও পেতেন না। ছাত্রদের মনে অনুসন্ধিৎসা জাগানোই ডিরোজিওর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। হয়তো ছোট জিনিসের সঙ্গে বড় জিনিসের তুলনা করা হবে, কিন্তু তবু ডিরোজিওর ক্লাসের সঙ্গে একমাত্র প্লেটো ও আরিস্ততলের 'আকাদেমি'র তুলনা করা যায়। ক্লাসরুমের বদ্ধ আবহাওয়ায় স্বভাবতঃই তাঁর স্বচ্ছন্দ বিষয়ালোচনা খাপ খেত না। কলেজের ক্লাসরুম থেকে ছাত্রদের তিনি তাই তাঁর বাড়ির বৈঠকখানায় ডেকে নিয়ে যেতেন। কিছুদিন পরে আলোচ্য বিষয়ের প্রসারতার দিক দিয়ে বাড়ির পরিবেশও যখন সঙ্কীর্ণ মনে হল তখন তিনি বাইরে ছাত্রদের নিয়ে একটি পাঠচক্র ও বিতর্কসভা গড়ে তুললেন।"

ডিরোজিও কি শিক্ষা দিতেন এবং কেমন করে শিক্ষা দিতেন তার খানিকটা পরিচয় পাওয়া গেল। শিষ্যদের চেয়ে গুরু বয়সে মাত্র চার-পাঁচ বছরের বড় ছিলেন, প্রাচীনকালের প্রবীণ গুরুমশায় বা ঋষিদের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা চলে না। বিদ্যাভিমান ডিরোজিওর খানিকটা ছিল বলে তাঁর দু-একজন ছাত্র ও বন্ধুবান্ধব উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সামনে অভিমানের প্রাচীর তুলে তিনি ছাত্রদের কোনদিন দূরে ঠেলে দেন নি। বয়সের দিক থেকে ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর যে বন্ধুর মতন মেলামেশার সুযোগ ছিল, তার সদ্ব্যবহার তিনি পুরোমাত্রায় করেছেন। ছাত্রদের বন্ধুর মতন কাছে টেনে নিয়েছেন, এবং সেই টান ক্রমেই প্রবল হয়েছে মনের সরসতার জন্য। ছাত্ররা মন্ত্রমুগ্ধের মতন তাঁর কাছে এসেছে এবং তাঁর প্রতিভা পাণ্ডিত্য ও চরিত্র গভীর আধ্যাত্মিক প্রভাব বিস্তার করেছে তাদের মনের উপর। ডিরোজিওর ছাত্ররা তাই যে কেবল বিদ্বান হয়েছেন তা নয়, অসাধারণ চরিত্রবান পুরুষও হয়েছেন অনেকে।

ডিরোজিওর শিক্ষাপদ্ধতির যে অভিনবত্ব ছিল তা কি? অন্যদের সঙ্গে তার পার্থক্য ও বিশেষত্বই বা ছিল কোথায়? প্রথম বিশেষত্ব হল, পুথিগত বিদ্যা কোনরকমে মগজগত করতে তিনি ছাত্রদের কখনও উপদেশ দিতেন না। মুখস্থ করে পরীক্ষায় পাসমার্ক পাওয়া এবং প্রতিযোগিতায় লটারীর মতন বরাতের জোরে জয়লাভ করার যে শিক্ষাদর্শ, ডিরোজিও শিক্ষক হিসেবে তা ঘৃণা করতেন এবং ছাত্রদেরও ছাত্র হিসেবে তা ঘৃণা করতে উপদেশ দিতেন। তিনি বলতেন, শিক্ষার্থীর মনে জ্ঞানবিদ্যার অনির্বাণ আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলাই শিক্ষকের উদ্দেশ্য এবং শিক্ষার শ্রেষ্ঠ আদর্শ। শিক্ষক-জীবনে তিনি নিজেও তাই করতেন। দর্শন সাহিত্য বা যে-কোন বিষয় নিয়ে যখন তিনি আলোচনা করতেন, তখন পাঠ্যপুস্তকের বেড়াঘেরা সীমানা ছাড়িয়ে তিনি তার অসীম দিগন্তে একটার-পর-একটা রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করতে করতে যাত্রা করতেন। আলোচনায় বিভোর হয়ে, বিষয়-মাধুর্যে মশগুল হয়ে, তিনি ভুলে যেতেন তাঁর যান্ত্রিক কর্তব্যের কথা। ছাত্ররাও ভুলে যেত ক্লাশের কথা, নির্দিষ্ট পাঠ্যবস্তুর কথা। মনে তাদের প্রশ্নের পর প্রশ্ন জাগত, অজানাকে জানার ব্যাকুলতা বাড়ত। সাগ্রহে তারা প্রশ্ন করত, নানারকমের প্রশ্ন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন, আরও প্রশ্ন করতে ডিরোজিও উৎসাহ দিতেন। সবসময় শিক্ষকই যে তার জবাব দিতেন তা নয়, ছাত্ররা প্রশ্ন করত, ছাত্ররাই তার জবাব দেবার চেষ্টা করত। ক্লাস আর কলেজের ক্লাস থাকত না, বিতর্কসভায় পরিণত হত। এইটাই ছিল ডিরোজিওর শিক্ষাপদ্ধতির প্রধান বিশেষত্ব ও অভিনবত্ব।

কলেজের ক্লাসরুম থেকে ডিরোজিওর বাড়ির

বৈঠকখানায় বসত আলোচনা-সভা। বাড়ির আবহাওয়াও শেষে যখন সভার পক্ষে সংকীর্ণ বলে মনে হল তখন মানিকতলায় শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানবাড়ির ঘর ঠিক করা হল সভার জন্য। সভার নাম দেওয়া হল 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' (Academic Association)। মনে হয় ১৮২৭ সন থেকেই এই আলোচনাচক্রের ঘরোয়া বৈঠক শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৮২৮-২৯ সনের মধ্যেই অ্যাকাডেমিক সভার খ্যাতি ও প্রভাব বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল। বাগানবাড়ির নিভৃত গৃহকোণ থেকে বাইরের সমাজের মুক্ত প্রাঙ্গণে সোরগোল তুলেছিল তরুণদের এই বিদ্বৎসভা। বিচক্ষণ প্রাজ্ঞরাও সভায় যোগদান করার লোভ সম্বরণ করতে পারতেন না। লালবিহারী দে লিখেছেন: "In this grove of Academus—and the debating society had a garden attached to it, it being held on the premises now occupied by the Ward's Institution—did the choice spirits of young Calcutta hold forth, week after week, on the social, moral and religious questions of the day. The general tone of the discussions was a decided revolt against existing religious institutions···The young lions of the Academy roared out, week after week 'down with Hinduism! down with Orthodoxy!" বাংলার তরুণ সিংহশাবকদের গগনভেদী গর্জন শোনা যেত মানিকতলার বাগানবাড়িতে—যাবতীয় ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে, নৈতিক ভণ্ডামি ও নোংরামির বিরুদ্ধে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, যুক্তিহীন শাস্ত্রবচনের বিরুদ্ধে, প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে, জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রিক আর্থনীতিক ও মানসিক দাসত্বের বিরুদ্ধে, নিয়তিবাদের বিরুদ্ধে, দেবতার বিরুদ্ধে। ঘরে-বাইরে তার প্রতিধ্বনি হত। ঘর কাঁপত, সমাজও কাঁপত।

ডেভিড হেয়ার আসতেন সবুজরঙের কোট পরে যুবক সেজে, যৌবন ফিরে পেতেন তিনি যুবকদের সভায় এসে। উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের প্রাইভেট সেক্রেটারি আসতেন, বিশপ্‌স্ কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর মিল্‌স আসতেন, কলকাতার সুপ্রীমকোর্টের চীফ-জাস্টিস আসতেন। ডিরোজিও সভাপতি, সম্পাদক উমাচরণ বসু। সদস্য ও বক্তা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং ডিরোজিওর অন্যান্য ছাত্ররা। আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করতেন একজন। ঈশ্বর আছেন কি নেই? জাতিভেদ ভাল কি মন্দ? প্রতিমাপূজা বর্জনীয় কি না? যুক্তি বড়, না অন্ধ বিশ্বাস বড়? বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, না ক্ষুরধার বুদ্ধির আলোকে ও তর্কে? ব্যক্তিস্বাধীনতা, না সমষ্টি-দাসত্ব—কোন্‌টা কাম্য? এইসব বিষয় নিয়ে দুই পক্ষই যুক্তির জাল বিস্তার করতেন। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ মনীষীদের উক্তি ও যুক্তি অনর্গল উদ্ধৃত করা হত বিতর্কের সময়। ছোটখাট খণ্ডযুদ্ধ হয়ে যেত সভাঘরে, কেবল বাক্যবিলাসী বক্তৃতার নয়, সাধনালব্ধ বিদ্যারও। বয়োবৃদ্ধরা অবাক হয়ে যেতেন, বিদেশী ইংরেজ শ্রোতারা হয়তো মনে মনে ভয়ও পেতেন। কারণ ডিরোজিও যে দেশপ্রেমিক ছিলেন এবং ভারতবর্ষকেই স্বদেশ মনে করতেন, এ কথা তাঁরা জানতেন। জাতে পর্তুগীজ-ফিরিঙ্গি হলেও ডিরোজিও মনেপ্রাণে ভারতীয় ছিলেন। তাঁর তরুণ বয়সের লেখা অনেক কবিতায় এই স্বদেশ-প্রেমের সুর ঝংকৃত হয়ে উঠেছে। কেবল "জঙ্গিরার ফকির" কাব্যে নয়, ছোট ছোট আরও অনেক কবিতায়। তার মধ্যে ১৮২৭ সনে প্রকাশিত ডিরোজিওর প্রথম কাব্যসংকলনের প্রথম কবিতা 'The Harp of India' একটি চমৎকার নিদর্শন:

Why hang'st thou lonely on yon withered bough?
Unstrung, for ever, must thou there remain?
Thy music once was sweet who hears it now?
Why doth the breeze sigh over thee in vain?—

Silence hath bound thee with her
fatal chain :
Neglected, mute, and desolate art thou,
Like ruined monument on desert plain :—
... ... but if thy notes divine
May be by mortal wakened once again,
Harp of my country, let me strike
the strain !

আঠার বছরের তরুণ কবির স্বদেশ সম্বন্ধে এই কল্পনা ও বেদনা বিস্ময়কর নয় কি ? "স্বদেশ আমার, তোমার বীণার ছেঁড়া তারে আবার আমায় সুর বাঁধতে দাও !"

ভারত-বীণার ছেঁড়া তারে ডিরোজিও নিজেই যে কেবল সুর বাঁধতে চেষ্টা করেছিলেন তা নয়, তাঁর তরুণ ছাত্রদের মনেও সেই সুরের ঝংকার তুলেছিলেন। বিতর্ক-সভায় রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা সম্বন্ধেও আলোচনা হত। 'Young lions of Bengal' কেবল সামাজিক গোঁড়ামির বিরুদ্ধে নয়, বিদেশীর দাসত্বের বিরুদ্ধেও ঘন ঘন গর্জন করতেন। 'পার্থিনন' নামে সভার একটি মুখপত্রও প্রকাশ করা হয়েছিল। এই 'পার্থিনন' বোধ হয় বাঙালীদের দ্বারা প্রথম প্রকাশিত ইংরেজী পত্রিকা। 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' (১ সেপ্টেম্বর, ১৮৪২) থেকে জানা যায় যে 'পার্থিনন' দুই সংখ্যা মাত্র প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথমসংখ্যার বিষয়বস্তু ছিল স্ত্রীশিক্ষা, হিন্দুধর্ম, গবর্ণমেণ্টের বিচার-বিভাগের ব্যয়বাহুল্য ইত্যাদির আলোচনা সমালোচনা। দ্বিতীয়সংখ্যা ছাপা হয়েছিল বটে, কিন্তু গ্রাহকদের কাছে তা পাঠানো হয় নি। বাঙালীর প্রথম ইংরেজী পত্রিকার প্রথমসংখ্যা দেখেই গোঁড়ার দল এতদূর শংকিত হয়েছিলেন যে দ্বিতীয়সংখ্যা 'মুদ্রাঙ্কিত' হলেও তাঁরা "গ্রাহকদিগের নিকটে প্রেরিত হইতে দেন নাই।"

'পার্থিনন' বন্ধ হলেও "যুবক হিন্দুদিগের সত্যানুসন্ধানের প্রবল ইচ্ছা নিবারিত হয় নাই।" সভার আলোচনা ও বিতর্কের ভিতর দিয়েই সত্যের দুর্গম পথে তরুণ বাংলার দুঃসাহসিক অভিযান চলতে থাকল। ডিরোজিও নিজে কেবল যে এই সভাতেই বক্তৃতা দিতেন তা নয়, মধ্যে মধ্যে অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সভাতেও তিনি বক্তৃতা দিতে যেতেন। হেয়ার সাহেব তাঁর পটলডাঙার স্কুলে ডিরোজিওকে বক্তৃতা দেবার জন্য আহ্বান করে নিয়ে যেতেন। হিন্দুকলেজের ছাত্রগোষ্ঠীর বাইরে কলকাতার তরুণ ছাত্রসমাজের মধ্যে ডিরোজিওর প্রভাব ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছিল। তার ফলে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রসার-প্রতিপত্তিও ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছিল, এবং হিন্দুসমাজ ক্রমেই আতংকিত হয়ে উঠছিলেন। কিন্তু তরুণদের এই আলোচনা-সভা সম্বন্ধে হিন্দুসমাজ এত সন্ত্রস্ত হয়েছিলেন কেন ?

রামমোহন রায়ের 'আত্মীয়সভা' তার অনেক আগে ১৮১৫ সনে গড়ে উঠেছিল। পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সহমরণপ্রথা ইত্যাদি সামাজিক কুপ্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আত্মীয়সভার বৈঠকেও নিয়মিত আলোচনা হত। কিন্তু ডিরোজীয়ানদের অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের মতন বাইরের সমাজে তা নিয়ে বিশেষ কোলাহলের সৃষ্টি হয় নি। তার কারণ, ১৮১৫-২০ আর ১৮২৫-৩০-এর মধ্যে মাত্র দশ-পনের বছরের তফাত হলেও, সামাজিক পরিবেষ্টনের পার্থক্য তার মধ্যে অনেকখানি ঘটে গিয়েছিল। কতকটা মানুষের জীবনের মতন সমাজ-জীবনেরও বিভিন্ন যুগের ও পর্বের গতিবেগ ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় তারতম্য ঘটে। জীবনের পর্বে পর্বে, বাল্যে যৌবনে প্রৌঢ়ত্বে ও বার্ধক্যে যেমন চলার গতি ও ছন্দ বদলায়, তেমনি যুগে যুগে এবং একই যুগের ভিন্ন ভিন্ন পর্বে সমাজের চলার গতি ও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ধারা বদলায়। সামাজিক গতিবিজ্ঞানের মূলসূত্র এই। ডিরোজীয়ানদের সময় ঘটনাবর্তে গতি সঞ্চারিত হয়েছিল অনেক বেশী। আত্মীয়সভার সামাজিক গড়নই (social composition) ছিল অন্যরকমের, উচ্চবিত্ত ও মধ্যবয়স্কদের প্রাধান্য ছিল তার বৈশিষ্ট্য। রামমোহন নিজেও ছিলেন তখন মধ্যবয়সী ও বিত্তবান। ইয়ং বেঙ্গলের যুগে সমাজের চেহারায় একটা বড়রকমের পরিবর্তন ঘটল, সর্বপ্রথম নতুন পাশ্চাত্যবিদ্যায় শিক্ষিত

মধ্যবিত্ত যুবকশ্রেণীর আবির্ভাব হল সমাজে। একজন মধ্যবিত্ত শিক্ষক তাদের গুরু হলেন। পাশ্চাত্যবিদ্যায় সুশিক্ষিত এবং মধ্যবিত্ত, দুটিরই সামাজিক গুরুত্ব যথেষ্ট। অ্যাকাডেমিক সভার গড়নে এই নতুন মধ্যবিত্তের প্রাধান্য তো ছিলই, আত্মীয়সভার মতন মধ্যবয়স্কের মন্থরতাও ছিল না তার মধ্যে। নবজাত শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তের ঐতিহাসিক গতিশীলতার সঙ্গে তারুণ্যের বেগবান প্রাণের আবেগ মিলিত হয়েছিল ইয়ং বেঙ্গলের বিতর্কসভায়। তাই তার ভয়ংকর গর্জনে ও ফেনিল উচ্ছ্বাসে সমাজের জীর্ণ পুরাতন বাঁধগুলি ভাঙবার উপক্রম হয়েছিল। হিন্দু-সমাজের রক্ষকরা সেইজন্য এত বেশী আতঙ্কিত হয়েছিলেন। আতঙ্কের হেতু ছিল। এই সময় আরও কতকগুলি ঘটনা তাঁদের আতঙ্কে ইন্ধন যোগান দিল।

বড় নদীর তীরে দাঁড়িয়ে তরঙ্গভঙ্গের দৃশ্য দেখলে সামাজিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের স্বরূপ সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা করা যায়। তরঙ্গকে আঘাত করে তরঙ্গ, তরঙ্গমালা ভেঙেচুরে মিলেমিশে যায়, আরও বড় তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। সমাজেও ঘটনার সঙ্গে ঘটনার সম্পর্ক এইরকম অবিচ্ছিন্ন। প্রথম ঘটনা দ্বিতীয়কে আঘাত করে এবং তৃতীয়কে ভেঙে আত্মসাৎ করে পরবর্তী ঘটনাকে ভয়াবহ করে তোলে। ডিরোজিওর জীবনের ট্র্যাজিডি হল, ১৮২৯-৩০-৩১ সনের মধ্যে তিনি এইরকম অবিচ্ছিন্নসূত্রে গ্রথিত কয়েকটি বড় বড় ঘটনা-তরঙ্গের সম্মিলিত আঘাতের সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং তার প্রচণ্ড ঝাপটায় তাঁর নিজের জীবন ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। অন্ততঃ বর্তমান লেখকের তাই ধারণা। সব ঘটনার স্রষ্টা তিনি নন, কিন্তু ঘটনাচক্রের তিনিই সবচেয়ে বড় ট্র্যাজিক নায়ক।

১৮২৯-এর ডিসেম্বর থেকে ১৮৩১-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত দু-বছরে মাত্র ডিরোজিওর জীবন-নাট্যের শেষ অংক রচিত হয়েছে। দু-বছরের এই ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ্য করলে নাটকের করুণ পরিণতি অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না:

১৮২৯, ডিসেম্বর : বেন্টিঙ্ক সতীদাহ আইনতঃ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

১৮৩০, জানুয়ারি : হিন্দুরা 'ধর্মসভা' গঠন করে সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ-আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হন।

১৮৩০, মে : পাদ্রি আলেকজাণ্ডার ডাফ সস্ত্রীক কলকাতায় আসেন।

১৮৩০, জুলাই : ডাফ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন (General Assemebly's Institution)

১৮৩০, আগস্ট : ডাফের পরিকল্পনাঅনুযায়ী খ্রীষ্টধর্ম-মাহাত্ম্য বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা হয় প্রকাশ্যে।

১৮৩০, নভেম্বর : রামমোহন রায় ইংলণ্ড যাত্রা করেন।

১৮৩১, এপ্রিল : ডিরোজিওর বিরুদ্ধে হিন্দুকলেজের কর্তৃপক্ষের অভিযোগ এবং ডিরোজিওর পদত্যাগ।

১৮৩১, মে : কৃষ্ণমোহন সম্পাদিত ইয়ং বেঙ্গলের ইংরেজী মুখপত্র *The Enquirer* প্রকাশিত হয়।

১৮৩১, জুন : ইয়ং বেঙ্গলের বাংলা মুখপত্র "জ্ঞানান্বেষণ" প্রকাশিত হয়।

১৮৩১, আগস্ট : কৃষ্ণমোহনের বাড়ি থেকে তাঁর তরুণ বন্ধুরা প্রতিবেশীর গৃহে (ব্রাহ্মণ) গোমাংসের হাড় নিক্ষেপ করে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করেন।

১৮৩১, নভেম্বর : গোঁড়া হিন্দুসমাজকে তীব্র বিদ্রূপ করে কৃষ্ণমোহন *The Persecuted* নামে ইংরেজী নাটক রচনা করেন।

১৮৩১, ডিসেম্বর : ডিরোজিও হঠাৎ রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যান।

টীকা-টিপ্পনি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াও এই কালানুক্রমিক ঘটনাবিন্যাস লক্ষ্য করলে যে-কেউ বুঝতে পারবেন, ডিরোজিওর জীবনের করুণান্ত পরিণতির জন্য তাঁর নিজের

চেয়ে তাৎকালিক ঘটনাচক্র কত বেশী দায়ী। ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়াসহ যদি একটি জ্যামিতিক ডায়েগ্রাম আঁকা সম্ভব হত, তা হলে বোধ হয় ডিরোজিওর দিকে তার সর্বগ্রাসী গতি আরও পরিষ্কার হয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠত।

ঘটনাগুলির অন্ততঃ একটা চলতি ব্যাখ্যা প্রয়োজন। ১৮২৮-২৯ সনে বাংলার তরুণ সিংহশিশুরা যখন তাঁদের শিক্ষক ডিরোজিওর প্রেরণায় কুসংস্কার, মিথ্যাচার ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের গুহাভ্যন্তর থেকে তর্জন-গর্জন করছিলেন, তখন নবযুগের নায়ক রামমোহন রায় পূর্ণগৌরবে কলকাতার সামাজিক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হিন্দুকলেজের তরুণ ছাত্রদের কার্যকলাপ ধ্যানধারণা সম্বন্ধে তাঁর মনে কিরকম প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল তা তিনি প্রকাশ করেন নি। ১৮২৯-এর ৪ ডিসেম্বর বেন্টিঙ্ক অনেক টালবাহানা করে সতীদাহ আইনতঃ নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন এবং তার ফলে রক্ষণশীল বিরাট হিন্দুসমাজকে তীব্র কশাঘাত করে তিনি জাগিয়ে তুললেন। ১৮৩০-এর ১৭ জানুয়ারি হিন্দুদের 'ধর্মসভা' স্থাপিত হল, সংহত ও সংঘবদ্ধ হল হিন্দুসমাজ। লোকবল ও অর্থবলের দিক দিয়ে বিচার করলে তার শক্তি বিরাট, সংহত রূপও ভয়াবহ। 'ধর্ম গেল, জাত গেল' রব উঠল, কলকাতার আকাশ ফাটতে লাগল ধর্মধ্বজীদের হৈ-হল্লায়। তাঁদের সমস্ত আক্রোশ ধাবিত হল হিন্দু-কলেজ ও তার নব্যশিক্ষিত তরুণ ছাত্রদের দিকে। কারণ পাশ্চাত্যবিদ্যাই সর্বনাশের মূল বলে তাঁরা স্থির সাব্যস্ত করলেন।

এমন সময় (২৭ মে, ১৮৩০) পাদ্রি আলেকজাণ্ডার ডাফ এসে পৌঁছলেন কলকাতায়। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দীপনায় অস্থির হয়ে ছিলেন তিনি মনে হয়। আসার মাস দুয়ের মধ্যে তিনি রামমোহন রায়ের প্রত্যক্ষ সহায়তায় 'জেনারেল অ্যাসেম্বলিস্ ইনস্টিটিউশন' প্রতিষ্ঠা করলেন (১৩ জুলাই ১৮৩০), এবং লালবিহারী দে'র ভাষায় 'Duff laid the foundation of Christian Education in India'. জোড়াসাঁকোয় ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়িতেই ডাফ সাহেবের স্কুল খোলা হল, যে-বাড়িতে প্রথম হিন্দুকলেজ এবং রামমোহনের ব্রাহ্মসভাও স্থাপিত হয়েছিল। ডাফ দেখলেন, খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের চমৎকার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে কলকাতায়, কারণ ইংরেজীশিক্ষিত বাংলার তরুণেরা স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তির মূল্য দিতে শিখেছে। যে হিন্দুকলেজে শিক্ষার ফলে তাদের এই চিন্তাশক্তির ও বিচারবুদ্ধির বিকাশ হয়েছে, ডাফের ভাষায় সেটি হল 'the very *beau-ideal* of a system of education without religion.' সুতরাং প্রথমে তিনি ধর্মভিত্তিক শিক্ষার অভাব পূরণ করলেন নিজে স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। তারপর সামনে ধর্মের শূন্য প্রান্তরের দিকে চেয়ে তাঁর কামনার শিখা জলে উঠল। অশিক্ষিত ও গোঁড়াদের মধ্যে আর ধর্মপ্রচার করতে হবে না। শিক্ষিত যুক্তিবাদী তরুণদের কাছে খ্রীষ্টধর্মমাহাত্ম্য ব্যাখ্যানের সম্ভাবনা বিপুল। *India and India Missions* গ্রন্থে তিনি তাই আশায় উদ্ভাসিত হয়ে লিখেছেন, "We hailed the circumstance as indicating the approach of a period for which we had waited and longed and prayed." অতএব ধর্মানুপ্রাণিত পাদ্রি ডাফ খ্রীষ্টধর্মবিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতার ব্যবস্থা করলেন। হিন্দুকলেজের কাছে যে-বাড়িতে তিনি থাকতেন তার একতলার হলঘরে বক্তৃতা হবে, একাধিক বক্তৃতা। শ্রোতারা বক্তাকে খুশিমতন প্রশ্ন করতে পারবেন, বক্তৃতার পর বিতর্ক হতেও বাধা নেই। হুঁশিয়ার ডাফের লক্ষ্য যে কি তা বক্তৃতার স্থান-নির্বাচন থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। লক্ষ্য হিন্দুকলেজের নব্যশিক্ষিত তরুণের দল, যাদের সংস্কারমুক্ত বুদ্ধিদীপ্ত মনে কোন বিশেষ ধর্মগোঁড়ামি নেই। যদি তাদের সেই মুক্ত আলোকোজ্জ্বল মানসভূমিতে খ্রীষ্টধর্মের বীজ একটু ছড়িয়ে দেওয়া যায় তা হলে ফসলের জন্য আর ভাবতে হবে না, সোনার ফসল ফলবে সেখানে। ডাফ লিখেছেন যে অশিক্ষিত অনুন্নত জাতির হাজার-জনকে ধর্মান্তরিত করার চেয়ে কলকাতা শহরের একজন উচ্চবর্ণের সদ্বংশের সুশিক্ষিত তরুণকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দিতে পারলে শতগুণ সুফল পাওয়া যাবে

বলে তাঁর বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তিনি ধর্মপ্রচারের মহৎ কর্মে ব্রতী হলেন। পাদ্রি হিল সাহেব প্রথম বক্তৃতা দিলেন, অত্যন্ত গরম বক্তৃতা। ভূমিকম্পে মেদিনী কেঁপে ওঠার মতন বক্তৃতার ফলে কলকাতার হিন্দুসমাজ কেঁপে উঠল। ডাফ সাহেবের ভাষায়, "The whole town was literally in an uproar." লালবিহারী দে লিখেছেন, "that lecture fell like a bombshell among the College authorities." ডাফ নিজে হিন্দুসমাজের উপর, বিশেষ করে হিন্দুকলেজের কর্তৃপক্ষের উপর এই বক্তৃতার প্রবল প্রতিক্রিয়ার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন এই ভাষায়: "বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে সারা হিন্দুসমাজের মধ্যে একটা গুজব দুরন্ত বেগে রটতে আরম্ভ করল, রীতিমত হৈচৈ পড়ে গেল শহরে। বাস্তবিকই সেই বৈদ্যুতিক প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ যাঁরা না স্বচক্ষে দেখেছেন তাঁদের বর্ণনা করে বুঝিয়ে বলা তা সম্ভব নয়। বক্তৃতার পর হিন্দুদের একটা বদ্ধমূল ধারণা হল, যে-কোন প্রকারে ফুসলিয়ে বা ভয় দেখিয়ে খ্রীষ্টান পাদ্রিরা এদেশের হিন্দু যুবকদের ধর্মান্তরিত করার সংকল্প করেছেন। শহরের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত কয়েকদিন ধরে অনবরত সভা ডেকে হিন্দুসমাজের পাণ্ডারা খ্রীষ্টান পাদ্রিদের কু-মতলবের কথা জনসাধারণকে বোঝাতে আরম্ভ করলেন। পাদ্রিদের খপ্পর থেকে কি উপায়ে হিন্দুদের, বিশেষ করে তরুণদের রক্ষা করা যায় সে সম্বন্ধে প্রকাশ্য জনসভায় ও সংবাদপত্রে আলোচনা হতে থাকল। হিন্দুকলেজের ছাত্রদের অভিভাবকরা অনেকে কলেজ-কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করলেন এই বলে যে কলেজের বিজাতীয় শিক্ষার ফলেই যুবকদের নৈতিক চরিত্রে ভাঙন ধরছে। প্রতিদিন এই মর্মে অভিযোগ আসতে থাকল কলেজে। কলেজের পরিচালকরা রীতিমত শংকিত হয়ে উঠলেন। ব্যস্ত হয়ে তাঁরা পরিচালকসভার মীটিং ডেকে এই মর্মে এক প্রস্তাব পাস করলেন যে কলেজের ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণে তাঁরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হয়েছেন, এবং সেইজন্য কোন ধর্মসংক্রান্ত আলোচনা-সভায় ছাত্রদের যোগ দিতে তাঁরা নিষেধ করছেন।"

স্বয়ং ডাফ সাহেবের এই বিবরণ থেকেই বোঝা যায়, পাদ্রি হিলের বক্তৃতায় কি প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। সত্যিই তাঁর বক্তৃতাটি বোমার মতন ফেটে পড়েছিল হিন্দুসমাজের মাথার উপর। এক্ষেত্রেও তরঙ্গের সমস্ত আঘাতটা হিন্দুকলেজকেই সহ্য করতে হয়েছিল দেখা যায়। জনৈক "হিন্দুকালেজছাত্রস্য পিতুঃ" লিখেছেন, "প্রায় সকল ছেলেগুলি একগুঁয়ে অবশ অধৈর্য এবং অনেক বিষয় বিপরীত ইহারা স্থানে২ সভা করিয়াছে তাহাতে আচার ব্যবহার ও রাজনিয়মের বিবেচনা করে এই সকল দেখিয়া পুত্রের কালেজে যাওয়া রহিতকরণের চেষ্টা করিলাম…"। চেষ্টা করেও অবশ্য অনেক পিতা সফল হন নি, কারণ ছেলেরা কলেজ ছাড়তে চায় নি। কিন্তু তা হলেও এই সময় অনেক পিতা ভয় পেয়ে ছেলেদের কলেজ ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ১৮২৯ থেকে ১৮৩২ সনের মধ্যে হিন্দুকলেজের ছাত্রসংখ্যা দ্রুতহারে কমে গিয়েছিল, "owing partly to a panic among the natives caused by a supposed interference with the religion of the boys." (J. Kerr)

একদিকে বেণ্টিঙ্কের সতীদাহ-নিবারণ আইন, আর একদিকে ডাফ-হিল প্রমুখ অত্যুৎসাহী পাদ্রিদের খ্রীষ্টধর্মাভিযান—এই দুয়ের তরঙ্গস্রোত প্রবল বেগে ধাবিত হল গোলদীঘির দিকে এবং সজোরে আঘাত করল হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠানকে। একজন শিক্ষককে ঘিরেই সকলের সমস্ত আক্রোশ ধূমায়িত হতে থাকল—তিনি ডিরোজিও। ডিরোজিওর দোষ একটি নয়, একাধিক। প্রথম দোষ, তিনি নিজে বয়সে তরুণ, অতএব তরুণ ছাত্রদের যে-কোন মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া ও খেপিয়ে তোলা তাঁর পক্ষে সবচেয়ে সহজ। দ্বিতীয় দোষ, তাঁর অভিনব শিক্ষাপদ্ধতি। স্বাধীন আলোচনা প্রশ্ন-উত্তর তর্ক-বিতর্কের ভিতর দিয়ে তিনি ছাত্রদের নিজস্ব মতামতের প্রতি এমন একটা অন্ধ অনুরাগ জাগিয়ে তুলেছেন যার মর্যাদা তারা সবসময় রাখতে পারে না এবং যার ফলে তাদের মানসিক স্বেচ্ছাচারিতাই প্রশ্রয় পায়। তৃতীয় দোষ, শিক্ষক হিসেবে ডিরোজিওর নিজের

মতামত প্রচলিত গতানুগতিক বিশ্বাস ও ধ্যানধারণার বিপরীত। তাঁর মতে যা যুক্তিগ্রাহ্য নয়, বুদ্ধিগম্য নয়, তা বেদ-কোরাণ-বাইবেলের আপ্তবচন হলেও গ্রহণযোগ্য নয়। এত দোষ যাঁর তাঁকে ক্ষমা করা যায় না, বিশেষ করে শিক্ষক হিসেবে তরুণ ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র-গঠনের দায়িত্ব তাঁর উপর কিছুতেই দেওয়া যায় না। অভিভাবকরা সমস্বরে কলেজ থেকে ডিরোজিওর পদচ্যুতি দাবি করলেন এবং কলেজের কর্মকর্তারা সেই দাবি বিবেচনা করার জন্য ব্যস্ত হয়ে জরুরী সভা ডাকলেন।

এর মধ্যে আরও একটি ঘটনা তাঁদের আতঙ্ক ক্রোধ ও উদ্বেগ বাড়িয়ে দিল। ডাফ লিখেছেন, পাদ্রি হিলের বক্তৃতার পরে হিন্দুকলেজের কর্তারা ছাত্রদের সভা-সমিতিতে যোগদান সম্বন্ধে যখন নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন তখন শহরের ইংরেজী পত্রিকাগুলি একবাক্যে কঠোর ভাষায় তাঁদের নীতি 'presumptuous', 'tyrannical', 'absurd and ridiculous', ইত্যাদি বলে সমালোচনা করেছিলেন। এই সব ইংরেজী পত্রিকার মধ্যে বোধ হয় সবচেয়ে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছিলেন *India Gazette* পত্রিকা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ডক্টর গ্র্যাণ্ট, ডিরোজিওর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। ডিরোজিও নিজে তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন সহকারী সম্পাদক হিসেবে। বাইরের শিক্ষিতমহল এবং হিন্দুকলেজের কর্তৃপক্ষ এ কথা জানতেন। সুতরাং 'ইণ্ডিয়া গেজেটে'র সম্পাদকীয় সম্বন্ধে গুজব রটে গেল যে ডিরোজিওই তার লেখক। কেউ কেউ লেখার স্টাইল দেখেও সেকথা বলতে লাগলেন। তার দু-চার লাইন আমরা এখানে উদ্ধৃত করছি :

> We regret much to see the names of such men as David Hare and Rossomoy Dutt attached to a document which presents an example of presumptuous, tyrannical and absurd intermeddling with the right of private judgmet on political and religious questions. The interference is presumptuous, for the Managers as Managers have no right whatever to dictate to the students of the Institutions how they shall dispose of their time out of College. It is tyrannical, for although they have not the right, they have the power, if they will bear the consequences, to inflict their serious displeasure on the disobedient. It is absurd and ridiculous, for if the students knew their rights, and had the spirit to claim them, the Managers would not venture to enforce their own order, and it would fall to the ground an abortion of intolerance.

এই কটূক্তির পর ডাফ সাহেবকে অনুরোধ করা হয় বক্তৃতা চালিয়ে যেতে, এবং কলেজের ছাত্রদের উৎসাহিত করা হয় নির্ভয়ে সমস্ত বিধিনিষেধ অমান্য করে পাদ্রিদের সভায় যোগদান করতে। ডিরোজিওই লিখুন আর ডক্টর গ্র্যাণ্টই লিখুন, 'ইণ্ডিয়া গেজেট' পত্রিকার এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধের ভাবে ও ভাষায় যে সংযমের অভাব ঘটেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রমাণাদি থেকে মনে হয় ডিরোজিও নিজেই এই প্রবন্ধ লিখেছিলেন। হিন্দুকলেজের পরিচালকরা বয়সে সকলেই প্রায় প্রবীণ ছিলেন, এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তির দিক থেকে নয়, বিদ্যাবুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের দিক থেকেও যে তাঁরা সর্বজনশ্রদ্ধেয় ছিলেন, সেকথা মনে রেখে ডিরোজিও যদি তাঁদের নীতির সমালোচনা করতেন তা হলে তাতে সুফল ফলত বেশী। প্রবন্ধটি পড়লে কোন সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বলে মনে হয় না, মনে হয় কোন গোপন বিপ্লবীচক্রের উত্তপ্ত একটি ইশ্‌তেহার। এর পরে ডিরোজিওকে শিক্ষকের পদে নিযুক্ত রাখা সমীচীন কিনা, সে-বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য কলেজের কর্তৃপক্ষ যদি সভা ডাকেন তা হলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

প্রসঙ্গতঃ ডিরোজিওর অসহিষ্ণু চরিত্রের আরও একটি দৃষ্টান্তের কথা মনে পড়ছে। কলেজের অধ্যক্ষ ডানসেল্‌ম (D'anselme) সাহেবের সঙ্গে—"যিনি অতিখ্যাতাপন্ন বিদ্বান এবং প্রায় আরম্ভাবধি প্রধান শিক্ষকরূপে নিযুক্ত থাকিয়া শিক্ষকদিগের সুরীতিক্রমে বিদ্যা প্রদান করিয়াছেন"—ডিরোজিওর নানাবিষয়ে প্রায় বচসা হত বোঝা যায়। মনে হয় কলেজের বাইরে তাঁর প্রিয় ছাত্রগোষ্ঠীর সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়ে আলাপ-আলোচনা করার উদ্দেশ্যে তিনি ছুটির জন্য প্রায়ই অধ্যক্ষকে অনুরোধ করতেন। নির্দিষ্ট সময়ের আগে ডানসেল্‌ম সবসময় তাঁর ছুটি মঞ্জুর করতেন না। তাই নিয়ে ডিরোজিও তাঁকে রূঢ় কথা শোনাতেন। হিন্দুকলেজের হাতে-লেখা নথিপত্রের (১৮৩১, ৫ ফেব্রুয়ারি তারিখের) একটি কার্যবিবরণ থেকে তা বোঝা যায়। কলেজ-কমিটির সদস্যরা এই তারিখের একটি সভায় তাঁকে ডেকে অধ্যক্ষের কাছে দুঃখপ্রকাশ করতে বলেন, এবং ডিরোজিও এই কথা লিখে সই করে দেন, "He regrets that Mr. D'anselme should have supposed he had any intention to treat him with insult or disrespect." ঘটনাটি ছোট হলেও উপেক্ষণীয় নয়, বিশেষ করে ১৮৩১ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে ঘটনাটি ঘটেছে বলে এর গুরুত্ব আছে।

ডিরোজিওর এই উদ্ধত ও অসহিষ্ণু স্বভাবের জন্য যে হিন্দুসমাজের আক্রোশ তাঁর উপর বিস্ফোরিত হয়েছিল তা নয়। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে পরিপার্শ্বের ধূমায়িত বহ্নিতে তাঁর তরুণসুলভ উগ্রতা বেশ খানিকটা ইন্ধন যোগান দিয়েছিল। ধীরস্থির শান্তপ্রকৃতির হলেও আগুন হয়তো ঠিকই জ্বলে উঠত—কারণ এ-আগুন শুধু হঠাৎ উত্তেজনার আগুন নয়, মনের আগুন, বুদ্ধির আগুন, নতুন চেতনার আগুন, আদর্শের আগুন—যার প্রধান হোতা ছিলেন ডিরোজিও। তবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সেই আগুনে যথাকালে অবিবেচকের মতন নিজে ঘৃতাহুতি না দিলে হয়তো তা শিখাবিস্তার করে অতটা তড়িৎগতিতে তাঁকে গ্রাস করতে উদ্যত হত না। অশোভন কটুভাষায় ঐভাবে কলেজের কর্মকর্তাদের সমালোচনা করার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না। তার উপর পত্রিকার পৃষ্ঠায় কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করতে ছাত্রদের উসকানি দিয়ে এবং ডাফ সাহেব ও তাঁর সহযোগীদের খ্রীষ্টধর্মবিষয়ে বক্তৃতা চালিয়ে যেতে অনুরোধ করে নিশ্চয় গ্র্যাণ্ট অথবা ডিরোজিও হঠকারিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সামাজিক পরিবেশ অনুকূল হলেও এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য তাঁরা অপদস্থ হতেন। প্রতিকূল অবস্থায় ডিরোজিও স্বভাবতঃই ঝড়ের ঝাপ্‌টা সহ্য করতে পারেন নি।

১৮৩১, ২৩ এপ্রিল, শনিবার।

হিন্দুকলেজের পরিচালকমণ্ডলীর জরুরী সভা বসল। সভায় উপস্থিত হলেন কলেজের গবর্নর চন্দ্রকুমার ঠাকুর, সহঃসভাপতি উইলসন, রাধাকান্ত দেব, রাধামাধব ব্যানার্জি, রামকমল সেন, ডেভিড হেয়ার, রসময় দত্ত, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, লক্ষ্মীনারায়ণ মুখার্জি (সম্পাদক)। জরুরী সভা আহ্বানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে প্রথমেই বলা হল:

> The object of convening this meeting is the necessity of checking the growing evil and the public alarm arising from the very unwarranted arrangement and misconduct of a certain teacher in whom great many children have been intrusted, who it appears have maturely injured their morals and introduced some strange system, the tendency of which is destructive to their moral character and to the peace in society.

এখানে 'a certain teacher' যে ডিরোজিও তা বলাই বাহুল্য। বহু ছেলের নৈতিক চরিত্র গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাঁর উপর, কিন্তু তাঁর বিচিত্র শিক্ষাপদ্ধতি তার ভিত ভেঙে দিয়ে সমাজে বিশৃঙ্খলার পথ পরিষ্কার

করেছে। এই হল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ। অভিযোগের সপক্ষে তাঁরা সভায় বললেন যে ২৫ জন সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের সন্তান এর মধ্যে কলেজ ছেড়ে চলে গেছে, এবং প্রায় ১৬০ জন ছাত্র কলেজে আসা বন্ধ করেছে। অভিভাবকরা বহু চিঠিপত্র লিখেছেন তাঁদের মতামত জানিয়ে। সমস্ত দিক বিবেচনা করে সভায় কতকগুলি প্রস্তাব পেশ করা হল, তার মধ্যে প্রধান এইগুলি :

ক। ডিরোজিও যেহেতু সমস্ত অনর্থের মূল এবং জনসাধারণের ভীতির কারণ হয়ে উঠেছেন, সেইজন্য তাঁকে কলেজ থেকে অপসারিত করা দরকার এবং ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগও ছিন্ন করা আবশ্যক। (প্রস্তাবের ভাষা এই : Mr. Derozio being the root of all evils and cause of public alarm, should be discharged from the College, and all communications between him and the pupils be cut off.)

খ। উচ্চশ্রেণীর যে-সব ছাত্রের অভ্যাস ও স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে আপত্তিকর রিপোর্ট পাওয়া গেছে এবং যারা ভোজসভায় যোগদান করেছিল, তাদের কলেজে রাখা চলবে না।

গ। যে-সব ছাত্র হিন্দুধর্মের প্রচলিত প্রথাদি পালন করতে চায় না, প্রকাশ্যে ধর্মবিরোধী কথাবার্তা বলে, তাদেরও অবিলম্বে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা প্রয়োজন।

ঘ। মৌখিক শাসনে ফল না পাওয়া গেলে দৈহিক দণ্ডদানের ক্ষমতা দিতে হবে প্রধান শিক্ষককে।

প্রস্তাবগুলি যথারীতি পেশ করার পরে প্রথম ও প্রধান প্রস্তাব, ডিরোজিওর পদচ্যুতি সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হল। আলোচনার জন্য বিষয়টি উপস্থাপন করা হল এইভাবে :

Whether the Managers had any just grounds to conclude that the moral and religious tenets of Mr. Derozio as far as ascertainable from the effects they have produced upon his scholars are such as to render him an improper person to be intrusted with the education of youth.

ছাত্রদের মনে ডিরোজিওর নীতি-ধর্মবিষয়ে মতামতের প্রতিক্রিয়া দেখে তাঁর সম্বন্ধে এমন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়ার কোন সঙ্গত কারণ আছে কি না যে তিনি তরুণদের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণের একজন অনুপযুক্ত ব্যক্তি।

চন্দ্রকুমার ঠাকুর বলেন যে তথ্যপ্রমাণ যা পাওয়া গেছে তা থেকে এমন সিদ্ধান্ত করতে তিনি নারাজ যে ডিরোজিও একজন অযোগ্য শিক্ষক।

উইলসন বলেন যে ডিরোজিওর শিক্ষার কোন কুফলের প্রমাণ তিনি পান নি এবং তাঁকে একজন সুযোগ্য শিক্ষক বলেই তিনি মনে করেন।

রসময় দত্ত বলেন যে রিপোর্টে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা ছাড়া ডিরোজিওর বিরুদ্ধে আর-কিছু তিনি জানেন না বা শোনেন নি।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণের অভাবে ডিরোজিওর চরিত্র বা শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ স্বীকার করতে রাজী নন বলে মত প্রকাশ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ সিংহ পরিষ্কার জবাব দিয়ে দেন যে ডিরোজিওর বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা, কোনটাই গ্রহণযোগ্য নয়।

ডেভিড হেয়ার বলেন যে ডিরোজিওর মতন সুযোগ্য শিক্ষক দুর্লভ এবং তাঁর শিক্ষায় সুফল ফলেছে বলে তাঁর বিশ্বাস।

রাধাকান্ত দেব বলেন যে ডিরোজিওকে তিনি একজন দায়িত্বজ্ঞানহীন অযোগ্য শিক্ষক বলে মনে করেন, তাঁর উপর তরুণদের শিক্ষার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।

রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ডিরোজিও যে একজন অযোগ্য ব্যক্তি সে-সম্বন্ধে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে।

রামকমল সেন রাধাকান্ত দেবের মতামত সমর্থন করে ডিরোজিওর অযোগ্যতার কথা ব্যক্ত করেন।

ন'জনের মধ্যে ছ'জন ডিরোজিওর পক্ষে এবং তিনজন বিপক্ষে মতামত প্রকাশ করেন। যে-ভাবে প্রস্তাবটি উত্থাপন করা হয়েছিল তা ভোটে বাতিল হয়ে গেল দেখে ডিরোজিও-বিমুখ সদস্যরা প্রস্তাবটি ঘুরিয়ে অন্যভাবে আবার পেশ করেন। এবারে তাঁদের প্রস্তাব হল :

> Whether it was expedient in the present state of public feeling amongst the Hindoo Community of Calcutta to dismiss Mr. Derozio from the College.

প্রস্তাবটি দুমুখো করাতের মতন, যেদিক দিয়েই পাস হোক না কেন, এবারে ডিরোজিও কাটা পড়তে বাধ্য। যোগ্যতা-অযোগ্যতা, শিক্ষার সুফল-কুফল ইত্যাদি প্রশ্ন চাপা দিয়ে একটা গোটা সম্প্রদায়ের আত্মাভিমানের সমস্যাটি বড় করে তুলে ধরা হল সভার সামনে। ডিরোজিওর বিরুদ্ধে অভিযোগ যদি সত্য না-ও হয় তাতে কি যায় আসে! সত্য হোক, মিথ্যা হোক, কলকাতার হিন্দুসমাজের বদ্ধমূল ধারণা, তিনিই সমস্ত অনর্থের মূল এবং তরুণদের অনাচার-ব্যভিচারের প্রধান উৎসাহদাতা। সমগ্র হিন্দুসমাজের এই ক্ষুব্ধ ব্যথিত ও অপমানিত অভিমানের দিকে চেয়ে ডিরোজিওর পদচ্যুতি 'expedient' বা সমীচীন কি না বিচার করে দেখা উচিত।

এইভাবে যখন প্রস্তাবটি উঠল তখন বাঙালী কর্মাধ্যক্ষদের মধ্যে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ছাড়া বাকি সকলে তা সমর্থন করেন। কেউ বলেন 'পদচ্যুতি প্রয়োজন', কেউ বলেন 'অবস্থাগতিকে পদচ্যুতি মন্দের ভাল' মাত্র। বিদেশী ইংরেজ বলে উইলসন ও হেয়ার সাহেব হিন্দু সমাজের ক্ষোভ প্রসঙ্গে কোন মতামত প্রকাশে বিরত থাকেন। প্রস্তাব গৃহীত হয় এই মর্মে—"Resolved that the measure of Mr. Derozio's removal be carried into effect with due consideration for his merits and services." কলেজের কর্মাধ্যক্ষরা ডিরোজিওকে সরাসরি পদচ্যুত করেন নি।

একখানি চিঠিতে উইলসন সাহেব ডিরোজিওকে সভার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেন। তাতে তিনি ডিরোজিওকে অনুরোধ করেন, স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করার জন্য। পদত্যাগপত্রসহ ডিরোজিও পত্রোত্তরে উইলসনকে লেখেন :

> মহাশয়,—পদত্যাগপত্র এই সঙ্গে আপনার কথা মতন পাঠালাম। পত্রখানি পড়লেই দেখতে পাবেন, 'স্বেচ্ছায় পদত্যাগ' সম্বন্ধে আপনার যে অনুরোধ তা আমি গ্রহণ করতে পারি নি। আমার শিক্ষকতাকালে কলেজের কোন অনিষ্ট হয়েছে বলে যদি আমি মনে করতাম, অথবা তার সপক্ষে বিশ্বাসযোগ্য কোন প্রমাণ থাকত, তা হলে আমার দিক থেকে বিনা প্রতিবাদে পদত্যাগ করার যুক্তি আমি মেনে নিতাম। কিন্তু এতখানি স্বার্থত্যাগ করে একটা সাময়িক আঘাত সহ্য করার কি কোন আবশ্যকতা আছে? আমার তো মনে হয় নেই, তাই আমি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারছি না যে আমাকে আপনারা পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছেন। নির্বিবাদে পদত্যাগপত্র পাঠানো এই কারণে অসম্ভব মনে হল। আমি জানি আপনি মহানুভব ব্যক্তি, আমার সম্মান রক্ষার জন্য এই অনুরোধ করেছেন। কিন্তু কেবল সান্ত্বনায় কি আহতের বেদনার উপশম হয়? প্রাজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিরা যদি পদচ্যুত করে আমাকে অপমানিত করাই সাব্যস্ত করেন, তা হলে আমারও সে-অপমান সহ্য করার মতন শক্তি থাকা কাম্য।
>
> কলেজের কয়েকজন হিন্দু কর্মাধ্যক্ষ আমার বিরুদ্ধে যে অসংযত ক্রোধ প্রকাশ করেছেন তা সহজে শান্ত হবে বলে মনে হয় না। সুতরাং আবার কলেজে শিক্ষকের কাজ গ্রহণ করার কোন সম্ভাবনা দেখি না। তা ছাড়া, কর্মজীবনের স্রোতে ভাসতে ভাসতে এমন একদিকে চলে যেতে পারি যে হয়তো আর জীবনে

আপনার সান্নিধ্যলাভের সুযোগ পাব না। আজকে তাই এই সুযোগে আপনার কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। কলেজে কাজ করার সময় আপনার কাছ থেকে যে সহৃদয় ব্যবহার পেয়েছি তা কোনদিন ভুলব না।···ইতি

এইচ. এল. ভি. ডিরোজিও

ডিরোজিও এই চিঠির সঙ্গে যে পদত্যাগপত্রটি পাঠিয়েছিলেন তার মর্ম এই :

ম্যানেজিং কমিটি, হিন্দুকলেজ

ভদ্রমহোদয়গণ,—গত শনিবারের জরুরী সভায় আপনারা কলেজের সঙ্গে আমার সম্পর্কচ্ছেদ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন জেনে আমি পদত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছি, কেবল আপনারা আমাকে পদচ্যুত করে অপমানিত না করেন এই আশংকায়।

সভার কার্যবিবরণের মধ্যে স্থান পায় নি এরকম কয়েকটি বিষয়ের প্রতি প্রসঙ্গতঃ এখানে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রথমতঃ আমার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোন অভিযোগ আপনারা চেষ্টা করেও প্রমাণ করতে পারেন নি। আর যদি অভিযোগ করেও থাকেন, আমি তা এখনও জানি না, এবং আমাকে জানানোর প্রয়োজনও আপনারা বোধ করেন নি। যাঁরা অভিযোগ করেছেন তাঁদের সামনে উপস্থিত হয়ে আমার জবাব দেবার ন্যায্য অধিকার থেকেও আমাকে বঞ্চিত করেছেন। আমার ব্যক্তিগত চরিত্র, মতামত ইত্যাদির আলোচনা-সমালোচনা করেছেন আপনারা আমাকে উত্তর দেবার সুযোগ না দিয়ে। এ কথাও আমি জানি যে কমিটির অধিকাংশ সদস্য আমার বিরুদ্ধে অযোগ্যতার অপবাদ স্বীকার না করা সত্ত্বেও আপনারা আমাকে কলেজের শিক্ষক-পদ থেকে সরিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। অপরাধী যে তাকে জেরা করা হল না, সে জানল না তার অপরাধ কি, অথচ তার বিচার ও দণ্ডদান দুই-ই শেষ হয়ে গেল। আশা করি এগুলি সত্য বলে স্বীকার করবেন। তা হলেই হবে, আমি কোন মন্তব্য করব না।

পদত্যাগপত্রের শেষে উইলসন, ডেভিড হেয়ার ও শ্রীকৃষ্ণ সিংহকে ডিরোজিও আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন তাঁদের সৎসাহসের জন্য।

ডিরোজিওর চিঠির উত্তরে উইলসন পরে যে চিঠি লিখেছিলেন তার মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির নির্দিষ্ট আভাস পাওয়া যায়। উইলসন লেখেন :

প্রিয় ডিরোজিও,

মনে হয় আপনার কথাই ঠিক, কিন্তু তবু কলেজের হিন্দু ম্যানেজারদের সম্পর্কে অতটা রূঢ় মন্তব্য না করলেই ভাল হত। বাস্তবিক তাঁদের খুব দোষ নেই, কারণ সমাজের দাবির কাছে তাঁরা খানিকটা অবস্থাগতিকে মাথা হেঁট করতে বাধ্য হয়েছেন। তদন্ত বা বিচারের সুযোগ তাঁরা পান নি। আপনার নিন্দাবাদ বা বিরূপ সমালোচনা তেমন কিছু করা হয় নি। কলকাতার লোকের, বিশেষ করে হিন্দুদের, একটা ধারণা হয়েছে আপনার সম্বন্ধে, যেটা কলেজের পক্ষে ক্ষতিকর। সেটা সত্যি না মিথ্যে তা নিয়ে তথ্যপ্রমাণ ঘেঁটে অথবা সাক্ষীসাবুদ ডেকে কোন লাভ হত না। এখনও অন্ততঃ ঘরোয়াভাবে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে বলে আমার ধারণা। কিছুদিন তা হবেই।

আপনার বিরুদ্ধে তিনটি গুরুতর অভিযোগ করা হয়েছে। সেগুলি কি, ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে আমি জানাচ্ছি প্রশ্নাকারে। প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এমন কোন কথা নেই, যদি দরকার মনে করেন দেবেন।

আপনি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন ?

আপনি কি মনে করেন যে বাপ-মা'র আদেশ মান্য করা অথবা তাঁদের শ্রদ্ধাভক্তি করা নৈতিক কর্তব্যের মধ্যে গণ্য নয় ?

আপনার মতে ভাই-বোনের বিবাহ কি দোষের নয় ? এইসব বিষয়ে কি কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে আপনি আলোচনা করেছেন ?

আমি জানি, আমার কোন অধিকার নেই এসব কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করার। তবু আপনার বিরুদ্ধে হিন্দুদের অভিযোগ কি এবং গুজব কি রটেছে, সেই কথা জানাবার জন্য লিখলাম। এ অভিযোগ যে ভিত্তিহীন, সে কথা সাহস করে বলতে পারলে আমি নিজে খুবই সুখী হতাম, অথবা আপনার যুক্তিপূর্ণ কোন জবাব পেলে আমি কর্মাধ্যক্ষদের দেখিয়ে স্বস্তি পেতাম। নিবেদন ইতি

এইচ. এইচ. উইলসন

উইলসনের চিঠির যে উত্তর দিয়েছিলেন ডিরোজিও, সেটি তাঁর জীবনের মহার্ঘ্য দলিলরূপে গণ্য হবার যোগ্য। দীর্ঘ চিঠি, কিন্তু তার দলিলমূল্যের জন্য অবিকল উদ্ধৃতির দাবি রাখে।

এইচ. এইচ. উইলসন মহাশয় সমীপে

প্রিয় মহাশয়,

গতকাল সন্ধ্যায় আপনার চিঠি পেয়ে তৎক্ষণাৎ উত্তর দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু অন্য জরুরী কাজের জন্য তা দিতে পারি নি বলে মার্জনা করবেন। এখনও পর্যন্ত আমার ব্যাপারে আপনার এতটা আগ্রহ আছে দেখে সত্যিই আমি কৃতার্থ বোধ করছি। যে কয়েকটি প্রশ্ন আপনি আমাকে করেছেন তা আমার ব্যক্তিগত চরিত্রের দিক থেকে এত গুরুত্বপূর্ণ যে উত্তর একটু দীর্ঘ হবে এবং আপনাকে সেটা কষ্ট করে পড়তে হবে ভেবে লজ্জিত হচ্ছি। তবু আপনার মতন একজন স্বনামধন্য শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির কাছে এরকম একটি দীর্ঘ চিঠিতে অনেক গুরুবিষয় সম্বন্ধে মতামত প্রকাশের সুযোগ যে আপনি দিয়েছেন, সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর। কারও কাছে এমন কথা আমি কোনদিন বলি নি যে ঈশ্বর নেই। তবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব সম্বন্ধে মুক্ত মনে আলোচনা করা যদি অপরাধ হয়, তা হলে আমি অপরাধী স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই আমার। এ বিষয়ে নানা মুনির বা দার্শনিকের নানা মত আছে, আমি সেই মতামতগুলি নিয়ে খোলা মনে ছেলেদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। যাঁরা আস্তিক তাঁদের কথা বলেছি, যাঁরা নাস্তিক তাঁদের কথাও বলেছি, আর যাঁরা অস্তিনাস্তি প্রশ্নই উত্থাপন করতে চান না তাঁদেরও বাদ দিই নি। আমি জানি না, এরকম একটি গুরুবিষয় নিয়ে এইভাবে আলোচনা করার মধ্যে অন্যায় কোথায়! এক পক্ষের কথা অন্ধের মতন বিশ্বাস করব, অন্য পক্ষের যুক্তি শুনব না বা বিবেচনা করব না, এইটাই কি কোন বিষয়ে জ্ঞানলাভের শ্রেষ্ঠ পন্থা? কি করে তা হলে জ্ঞান পরিপূর্ণ হবে? আর বিশ্বাস যাই হোক, তার ভিতই বা দৃঢ় হবে কি করে, যদি না প্রতিপক্ষের মতামত সম্বন্ধে অবহিত থাকা হয় এবং তার যুক্তি খণ্ডন করার মতন ক্ষমতা থাকে। এদেশের একদল তরুণের শিক্ষার খানিকটা দায়িত্ব কিছুদিনের জন্য আমাকে দেওয়া হয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম, তাদের একদল গোঁড়া আপ্তবাদী না তৈরি করে সত্যিকার সুশিক্ষিত যুক্তিবাদী মানুষ তৈরি করব। তাই সকল বিষয়ে সর্বপ্রকারের মতামত নিয়ে অবাধে আলোচনা করতে আমি তাদের উৎসাহ দিতাম। আমার বিশ্বাস, তা না করলে কোন মানুষেরই অব্যক্ত প্রতিভা ও মানসিক শক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তি হয় না। আমার অনুসৃত পন্থার সমর্থনে লর্ড বেকনের এই উক্তিটি উদ্ধৃত করছি: 'If a man will begin with certainties, he shall end in doubts.' কিন্তু তাতেও দেখলাম যে এক সংশয় থেকে অন্য এক নতুন সংশয় জাগবে মনে, এবং অবশেষে সংশয়াকুল চিত্তের দোলায়মানতা আর শেষ হবে না কোনদিন। সেইজন্য আমি কলেজের ছাত্রদের দার্শনিক হিউমের রচনাবলীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি, কারণ হিউম অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও ধারাল যুক্তি দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে খণ্ডন করেছেন। কেবল তাই করেই আমি ক্ষান্ত

হই নি। ডক্টর রীড ও স্টুয়ার্টের প্রতিযুক্তি ও উত্তরও (হিউমের) তাদের পড়িয়েছি। হিউমের যুক্তির এত জোরালো প্রতিবাদ আজ পর্যন্ত আর কেউ করতে পারেন নি এবং 'this is the head and front of my offending.' ধর্মবিষয়ে ছাত্রদের জন্মগত ধারণার মূল পর্যন্ত যদি আমার এই শিক্ষার ফলে নড়ে গিয়ে থাকে তা হলে তার জন্য কি আমি দোষী? তাদের মনে কোন বিশেষ বিশ্বাস সৃষ্টি করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না এবং ক্ষমতাধীনও ছিল না। সুতরাং এই শিক্ষার ফলে কেউ যদি নাস্তিক হয়ে থাকে তা হলে তার জন্য নিন্দাবাদ যেমন আমার প্রাপ্য, তেমনি আস্তিক হয়েছে যারা তাদের জন্য সাধুবাদও নিশ্চয় আমি দাবি করতে পারি। সত্যি কথা বলতে কি, মানুষের জ্ঞানের সীমা ও মতামতের পরিবর্তনশীলতা সম্বন্ধে আমি নিজে এত বেশী সজাগ যে কোন ক্ষুদ্রতম বিষয় সম্বন্ধেও আমি সহজে একটি নির্দিষ্ট মত প্রকাশ করি না। অনুসন্ধানের অনন্ত সমুদ্রে দুজ্ঞের্য়-সত্যের দ্বীপে যাত্রা করাই জ্ঞানান্বেষণের শ্রেষ্ঠ পন্থা বলে আমার ধারণা। আমার নিজের মনের গড়নও তাই। প্রশ্নহীন সংশয়হীন মন যত শীঘ্র জড়ত্বের জালে জড়িয়ে পড়ে মানসিক অপমৃত্যু ঘটায়, প্রশ্নকাতর সংশয়াতুর মন তত সহজে মানুষকে সন্দেহবাদী বা নাস্তিবাদী করে তোলে না। এটা নয়, ওইটা সত্য, অথবা আমার যা বিশ্বাস সেটাই একমাত্র ধ্রুব সত্য, এমন কথা হলফ করে কোন প্রকৃত সত্যসন্ধানী বা জ্ঞান-তপস্বী কখনই বলবেন না।

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করা ও তাঁদের আদেশ পালন করা আমি নৈতিক কর্তব্য বলে মনে করি কিনা? বিশ্বাস করুন, আপনার এই প্রশ্নে আমি হতবাক হয়ে গেছি। জীবনে কোনদিন কেউ আমাকে এই ধরনের একটা জঘন্য কদর্য ও অস্বাভাবিক প্রশ্ন যে করবেন, স্বপ্নেও আমি তা ভাবতে পারি নি। আমি পিতামাতাকে শ্রদ্ধেয় মনে করি না, অথবা তাঁদের আদেশ অমান্য করা অন্যায় ভাবি না, আমার বিরুদ্ধে এতদূর হীন অপপ্রচারে যাঁরা আত্মতৃপ্তি লাভ করেছেন তাঁদের শুধু ঘৃণ্য মনে করেও আমি স্বস্তি পাচ্ছি না। আপনি বয়ঃজ্যেষ্ঠ শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি, এ বিষয়ে আপনাকে কি বলব বুঝতে পারছি না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে আমি যদি পিতৃহীন না হতাম তা হলে আমার পিতাই নিশ্চয় এই অপপ্রচারের উচিত জবাব দিতেন। এই বলে জবাব দিতেন যে যাঁরা আমার বিরুদ্ধে এই কুৎসিত অভিযোগ করেছেন, অথবা অন্য যাঁরা এদিক থেকে নিজেদের মহাত্মা বলে মনে করেন, তাঁদের কারও চেয়ে আমি কম পিতৃমাতৃভক্ত নই। খোঁজ করলে দেখা যাবে তাঁদের অনেকের চেয়ে হয়তো পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য জীবনে আমি অনেক বেশী পালন করেছি। সুতরাং আমি আমার ছাত্রদের যে এরকম শিক্ষা দিতে পারি না তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। বরং উলটোটাই আমি করেছি। ছাত্রদের মধ্যে যখনই এই ধরনের কোন মনোভাবের আভাস পেয়েছি, তখনই তাদের রীতিমত ধমক দিয়ে পিতামাতার বাধ্য হতে বলেছি। তবে সমাজে পিতামাতার অনেক তথাকথিত বাধ্য সন্তানকে দেখেছি কুলাঙ্গারে পরিণত হতে, তাই মধ্যে মধ্যে তাদের সাবধান করে দিয়েছি যে পিতামাতার প্রতি বাধ্যতার মুখোশ পরে অমানুষ হওয়ার চেয়ে কিছুটা অবাধ্য অশান্ত হয়েও মানুষ হওয়া শ্রেয়। তা হলেও পিতামাতার প্রতি ছেলেদের ব্যবহার সম্বন্ধে আমি যে কতখানি সজাগ ছিলাম তার দুটি দৃষ্টান্ত আপনার কাছে উল্লেখ করছি। যে দুজন সম্বন্ধে বলছি তারা কলকাতাতেই থাকে, যে-কোন সময় তাদের ডেকেও আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন। মাস দু-তিন আগে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (সম্প্রতি তাকে নিয়ে শহরে বেশ সাড়া পড়ে গিয়েছিল) আমাকে জানায় যে বাড়িতে পিতার নিষ্ঠুর আচরণ তার পক্ষে

অসহ্য হয়ে উঠেছে। বাড়ি না ছাড়লে তার উপায় নেই। আমি যদিও ঘটনাটা সত্যি বলে জানতাম, তা হলেও তাকে বাড়ি ছাড়তে নিষেধ করে বুঝিয়ে বললাম, 'অত অধৈর্য হলে চলে না, বাপ-মায়ের আচরণ অপ্রীতিকর হলেও তা সহ্য করতে হয়। বাড়ি থেকে তাঁরা যদি তোমাকে তাড়িয়ে না দেন, তা হলে নিজে তুমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে না।' আমার কথা শুনে দক্ষিণা বাড়িতেই রইল, কিন্তু দুঃখের বিষয় কয়েকদিনের জন্য। দু-তিন সপ্তাহ আগে আমাকে না জানিয়ে সে পিতৃগৃহ ছেড়ে আমার বাড়ির কাছে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে চলে এসেছে। বাড়িওয়ালার সঙ্গে কথাবার্তা পাকা করার পর আমাকে অবশ্য সে তার সিদ্ধান্ত জানিয়েছিল। আমি যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমাকে না জানিয়ে তুমি বাড়ি বদল করলে কেন?' তখন সে উত্তর দিল, 'আপনি তো তা হলে কিছুতেই আমাকে বাড়ি ছাড়তে দিতেন না।' এই গেল দক্ষিণারঞ্জনের কথা। মহেশচন্দ্র সিংহ নামে আর একটি ছেলে তার পিতা ও আত্মীয়স্বজনের প্রতি অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করে, খুড়ো উমাচরণ বসু ও ভাই নন্দলাল সিংহকে সঙ্গে নিয়ে আমার বাড়িতে দেখা করতে আসে। আমি তার অশোভন আচরণের জন্য প্রচণ্ড ধমক দিই এবং জানাই যে পিতার কাছে অনুতপ্ত হয়ে সে যদি ক্ষমা না চায় তা হলে তার সঙ্গে আর কোনদিন আমি কথা বলব না, কোন সম্পর্ক রাখব না। এ রকম আরও অনেক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করতে পারি, কিন্তু করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

"ভাই-বোনের বিবাহে কোন দোষ নেই বলে কি আপনি মনে করেন?" এই হল আপনার তৃতীয় প্রশ্ন। এ প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর হল, 'না, আমি কখনও তা মনে করি না।' এরকম আজগুবী বিষয় নিয়ে আমি কোনদিন ছাত্রদের কাছে কিছু বলি নি। একটা কথা ভেবে আমি সত্যিই খুব অবাক হয়ে যাচ্ছি যে এই ধরনের বিচিত্র সব অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে কার উর্বর মস্তিষ্ক থেকে আবিষ্কৃত হল! আমার সঙ্গে নানাবিষয়ে যাঁরা আলাপ-আলোচনা করেছেন তাঁরা এরকম মিথ্যা রটাবেন বলে আমার মনে হয় না। অন্ততঃ আমার ছাত্রদের মধ্যে এমন মূর্খ কেউ থাকতে পারে যে ভুল বুঝে এইসব রটিয়েছে, অথবা এমন ধূর্ত কেউ থাকতে পারে যে ইচ্ছে করে আমার মতামত বিকৃত করেছে, এ কথা আমি কিছুতেই ভাবতে পারছি না। আমার মনে হয় একদল দুর্বল চরিত্রহীন লোক, মিথ্যা গুজব ও আতঙ্কই যাদের উপজীব্য, আমার বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অপপ্রচারে মত্ত হয়ে উঠেছে। ধর্মবিষয়ে কেউ স্বাধীন চিন্তা করলে তাকে নাস্তিক ও নরাধম বলতে পারে সমাজের লোক, একথা মানি ও বুঝি। কিন্তু অন্যান্য যে-সব প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন সেগুলি যে এইভাবে কোন সভ্যসমাজে কোন সভ্যমানুষের চরিত্রকে কলঙ্কিত করার জন্য উদ্ভাবিত হতে পারে, তা আপনার চিঠি না পেলে আমার পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব হত না। এখন আপনার সহৃদয়তার মুখাপেক্ষী হয়ে বলছি, আপনি নির্ভয়ে এইসব গুজব একেবারে ভিত্তিহীন ও মিথ্যা বলে ঘোষণা করবেন। গুজব-রটনাকারীদের একথাও বলবেন, 'I am not a greater monster than most people.'

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমি জানি, একদল লোক অসীম উৎসাহে আমার সম্বন্ধে নানারকমের গালগল্প করতে আরম্ভ করেছেন। কেবল ব্যক্তিগত-ভাবে আমার সম্বন্ধে নয়, আমার পরিবার সম্বন্ধেও তাঁদের কুৎসিত কল্পনা ডানা মেলতে শুরু করেছে। একটি গল্প হল, আমার বোনের সঙ্গে (কেউ বলেছেন আমার মেয়ের সঙ্গে, যদিও আমার কোন মেয়ে নেই) একজন হিন্দু যুবকের নাকি শীঘ্রই বিবাহ হবে। খবর নিয়ে জেনেছি, বৃন্দাবন ঘোষাল নামে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ এই গল্পটি বেশ শ্রুতিরোচক করে সর্বত্র প্রচার করছে। এই গরীব ব্রাহ্মণটির পেশা

হল, প্রতিদিন সকালে উঠে লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে শহরের সব আজগুবী খবর জানানো এবং রসিয়ে রসিয়ে তাই নিয়ে আলোচনা করা। এই ঘোষালের মতন কিছু পেশাদার গুজব-রসিক চেষ্টা করলে রাতারাতি শিবকেও বাঁদর বানিয়ে ফেলতে পারেন। যাই হোক, এ সম্বন্ধে আর কিছু বলব না, কারণ অপবাদ বা গুজব কোনদিনই স্থায়ী হয় না, অবৈধ উৎপত্তির মতন তার দ্রুত অপমৃত্যুও নিশ্চিত।

আপনার প্রশ্নের উত্তর এইখানেই শেষ করলাম। এখন সবিনয়ে আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে পারি কি? মিথ্যা জনরবের ভয়ে, অথবা কুৎসা-প্রচারকদের তোষণের জন্য, আমাকে কলেজ থেকে কর্মচ্যুত করা কি আপনাদের মতন বিচক্ষণ ব্যক্তিদের পক্ষে সঙ্গত হয়েছে? এ কথা ঠিক যে আপনাদের সভার কার্যবিবরণের মধ্যে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ লিপিবদ্ধ করা হয় নি। কিন্তু একজনের বিরুদ্ধে যখন মিথ্যা জনরব রটে তখন তারই ভিত্তিতে যদি তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়, তা হলে সেটা মিথ্যাকেই সমর্থন করা হয় না কি? কেবল জনরব শান্ত করার জন্য কলেজের ম্যানেজাররা আমাকে কর্মচ্যুত করা সাব্যস্ত করেছেন, এ কথা মেনে নিতে আমি রাজি নই। আগে থেকেই তাঁরা বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন আমাকে তাড়াবার জন্য। অন্ধ ধর্মগোঁড়ামিই আমার প্রতি তাঁদের বিতৃষ্ণা জাগিয়ে তুলেছে। আমার তাই দৃঢ়বিশ্বাস বলে আপনাকে জানালাম, কিছু মনে করবেন না। তা যদি না হত তা হলে এরকম অভিনব কৌশলে, সমস্ত সৌজন্য ও শালীনতাবোধ বিসর্জন দিয়ে, এইভাবে তাঁরা আমাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করতেন না। তাঁদের এই ব্যবহারের কথা যাঁরা শুনেছেন তাঁরাই গভীর বেদনা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এই অবিচারের প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করতেও আমার প্রবৃত্তি হয় না, কারণ প্রতিবাদ করলে তাঁদের মতামতের মর্যাদা দেওয়া হবে। সেটুকু মর্যাদাও তাঁদের প্রাপ্য বলে আমি মনে করি না।

দীর্ঘ চিঠির জন্য আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, এবং আমার জন্য যে ঝঞ্ঝাট আপনি সহ্য করেছেন সেজন্য আবার আপনাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি। ইতি,

আপনার একান্ত অনুগত

এইচ. এল. ভি. ডিরোজিও

কেবল চিঠিখানারই যে এখানে শেষ হল তা নয়, ডিরোজিওর জীবন-কাহিনীরও প্রায় শেষ হয়ে গেল। চিঠির তারিখ ২৫ এপ্রিল ১৮৩১, ডিরোজিওর মৃত্যুর দিন ২৩ ডিসেম্বর ১৮৩১। উইলসন সাহেবকে ডিরোজিও লিখেছিলেন, শিক্ষকের কাজই যে ভবিষ্যতে করবেন তিনি তার কোন নিশ্চয়তা নেই। বিচিত্র কর্মস্রোতে ভাসতে ভাসতে জীবনের নোঙরহীন তরী কোথায় কোন্ বন্দরে ভিড়বে তা তিনি জানেন না। মনে হয়, শিক্ষকের কাজ আর তাঁর করার ইচ্ছা ছিল না, কবি ও সাংবাদিকের স্বাধীন জীবন কাটানোরই বাসনা ছিল। সে বাসনা পূর্ণ হল না কয়েক মাসের মধ্যে, কিন্তু তার প্রকাশ হয়েছিল তাঁর একান্ত বাঞ্ছিত কর্মে।

চিঠিখানা নিঃসন্দেহে ডিরোজিওর নিজের জীবনের জবানবন্দি। সওয়াল-জবাবের মতন করে এর মধ্যে তিনি তাঁর শিক্ষাদর্শ ও জীবনদর্শন দুইই ব্যক্ত করেছেন। ১৮২৭ সনে রচিত তাঁর কবিতার এই দুটি লাইন ১৮৩১-এর ২৫ এপ্রিলের পরে রচনা করলে হয়তো সময়োপযোগী হত—

My sceptre from my hand is riven,
Save Honour, all is lost!

সত্যিই কলেজ ছাড়ার পর তিনি যেন সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিলেন, সম্মান ছাড়া আর কিছুই তাঁর সম্বল ছিল না। কিসের সম্মান? তাঁর মতন আত্মাভিমানী তরুণের আত্মসম্মানই বড় সম্পদ, কিন্তু সামাজিক সম্মানও কম কাম্য নয়। আত্মসম্মানের ঔজ্জ্বল্য অভিমানের উত্তাপে

হয়তো আরও তীব্র রূপ ধরেছিল, কিন্তু সামাজিক সম্মান যে তাঁর অন্ততঃ সাময়িকভাবে ধূলায় লুণ্ঠিত হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর পরমায়ুর দিক থেকে এই সাময়িক ক্ষতিই চূড়ান্ত ক্ষতি বলে আদ্যোপান্ত ঘটনাটা এত বেশী মর্মান্তিক। অথচ মাত্র আট মাসের জন্য হলেও কিসের জন্য তাঁকে এই দুঃসহ অপমান ও কলঙ্কের বোঝা বহন করতে হল? দৈত্যাকার মিথ্যার প্রেতনৃত্যের দাপটে একজন তরুণ শিক্ষকের জীবন পদদলিত হল কেন?

সমাজের নিষ্ঠুর নীতির জন্য। এই নিষ্ঠুরতা বহুকাল ধরে চলে আসছে সমাজে, স্থিতস্বার্থের চক্রান্তে। কেবল রাজনীতির স্বার্থ নয়, অর্থের স্বার্থ নয়, ধর্মের স্বার্থ, শাস্ত্রের স্বার্থ, প্রথা-সংস্কারের স্বার্থ। সাধারণ মানুষকে অজ্ঞতার নিবিড় অন্ধকারে নির্বাসিত করে, মুষ্টিমেয় একদল মানুষ চিরকাল ঈশ্বরের পৌরোহিত্য, পরকালের দৌত্য এবং সমাজের নেতৃত্বের একচ্ছত্র অধিকার ভোগ করেছে। যখনই কেউ এই সত্যের সঙ্গে মানুষের মুখোমুখি পরিচয় ঘটাতে চেয়েছে, তখনই বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে তার জীবনে ও সমাজে। বিজ্ঞানের অগ্রদূতকে পিশাচ বলে অগ্নিদগ্ধ করা হয়েছে, স্বাধীনতার সৈনিককে বলা হয়েছে ধ্বংসকামী দানব, সত্যের পূজারীকে বলা হয়েছে প্রতারক, জ্ঞানের সাধককে বলা হয়েছে ভণ্ড তপস্বী। এই কারণে আমাদের দেশে নবযুগের প্রবর্তক রামমোহন অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছেন, সমাজ-জীবনে নির্বাসনদণ্ড ভোগ করেছেন, এবং ঘটনাচক্রে বিদেশে তাঁর মৃত্যু না হলে শেষ পর্যন্ত তাঁকে দেশত্যাগীও হতে হত। ডিরোজিও একই কারণে কলঙ্কিত হয়েছেন।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়ে ডিরোজিও সমাজেরও শিক্ষক হতে চেয়েছিলেন। তরুণ ছাত্রদের তিনি কেবল হিন্দু-কলেজের ছাত্র মনে করেন নি, নবযুগের বাংলার ভবিষ্যৎ ভাগ্যনিয়ন্তাও মনে করেছিলেন। অসংখ্য চাকরের মতন তিনি যদি নিশ্চিন্তে চাকরি করে যেতেন, তা হলে চক্রবৎ রুটিনের চাকায় ঘুরতে ঘুরতে জীবনটা তাঁর আরও দশজনের মতন কেটে যেত, এবং ইক্ষুদণ্ডের মতন পিষ্ট হয়ে রসও তার নিঙড়ে পড়ত মাটিতে। দুঃখের বিষয় সে-পথ তিনি বেছে নেন নি। নবীন বাংলার তরুণ ছাত্রদের তিনি ক্ষুরধার যুক্তি ও শাণিত বুদ্ধির বলে বলীয়ান নির্ভীক সমাজ-সৈনিক তৈরি করতে চেয়েছিলেন। এই তাঁর অপরাধ।

যে যুক্তি বিদ্যা ও বুদ্ধির জ্যোতিতে ডিরোজিও বাংলার তরুণদের জীবনের পথ আলোকিত করতে চেয়েছিলেন, তার বিকাশ হয় আঠার শতকে। মানব-সমাজে এক অত্যাশ্চর্য বুদ্ধিবিপ্লব ঘটে এবং অজ্ঞানতার সমুদ্রগর্ভ থেকে আলোকোজ্জ্বল যুক্তির উদ্ভব হয়। সতের শতকে বেকন (Bacon) ও লক (Locke) সংস্কার-শৃংখল থেকে মোহাচ্ছন্ন মানববুদ্ধির মুক্তির বাণী ঘোষণা করেন। আরিস্ততলের ন্যায়-অনুমানের পথ ছেড়ে বেকন গবেষণা-পরীক্ষার দ্বারা কার্যকারণসম্বন্ধ নির্ণয় ও সত্যানুসন্ধানের নতুন পথনির্দেশ করে দেন। জনশ্রুতি, কুসংস্কার, আপ্তবাক্য প্রভৃতি নানারকমের অন্তরায় থাকে এই সত্যের পথে। সেগুলি দূর না করতে পারলে সত্যের আলোক আলেয়ায় পরিণত হয়। লক বলেন যে প্রাচীন দার্শনিকদের মতামত অধিকাংশই অর্থহীন বাক্য ছাড়া কিছু নয়। মানসপ্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের অতীত কিছু আমাদের জানবার উপায় নেই। আঠার শতকে বেকন ও লক প্রদর্শিত যুক্তিবাদ ও মুক্তচিন্তা আরও কয়েকজন মনীষী ধর্মের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেন, তাঁদের বলা হয় একেশ্বরবাদী বা ডীয়িস্ট (Deist)। এঁরা ছাড়া, ফ্রান্সের এন্‌সাইক্লোপিডিস্টরাও যুক্তিবাদের পথে দুর্দান্ত অভিযান শুরু করলেন। তাঁদের প্রধান সমালোচনার পাত্র হলেন রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজকরা। এঁদের মধ্যে স্বনামধন্য হলেন ভল্টেয়ার, দিদেরো, হেলভিটিয়াস, দা'লেমবের, হলব্যাখ, কণ্ডোর্সে, রুশো ও ভল্‌নি। কেউ ছিলেন নাস্তিক জড়বাদী, কেউ ঘোর সংশয়বাদী এবং

কেউ বা অদ্বৈতবাদী। ভল্টেয়ার, রুশো ও ভল্‌নি ছিলেন একেশ্বরবাদী। হলব্যাখ, হেলভিটিয়াস, লা মেত্রি ও দিদেরো ছিলেন নাস্তিক। এঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মার অমরত্ব, এবং পাপ-পুণ্যের পারলৌকিক দণ্ড-পুরস্কারে বিশ্বাস করতেন না। দার্শনিক ডেভিড হিউম ছিলেন সংশয়বাদী, অলৌকিক ক্রিয়ায় (miracles) তাঁর আস্থা ছিল না। স্বাভাবিক ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তিনি ধর্মের উৎপত্তি ও ইতিহাস ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। ধর্মের বাহ্য অনুষ্ঠান ও নানা মতকে হিউম চতুর যাজক-পুরোহিতদের স্বার্থজনিত সৃষ্টি বলে প্রচার করেন। প্রায় দুই শতাব্দী ধরে পাশ্চাত্ত্য সমাজে এই বৈপ্লবিক চিন্তালোড়ন চলতে থাকে। নবযুগের বাংলার নতুন বিদ্যামন্দিরে, বিশেষ করে কলকাতা শহরের হিন্দুকলেজে, এই নব্যচিন্তার বার্তা স্বাভাবিকভাবেই পৌঁছয়। প্রতিষ্ঠাতাদের মতে হিন্দুকলেজ ছিল "the main channel by which real knowledge may be transferred from its European sources into the intellect of Hindusthan." কলেজ প্রতিষ্ঠার এই উদ্দেশ্যের কথা মনে রাখলে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার ঘাত-প্রতিঘাতে আশ্চর্য হবার কিছু থাকে না। কলেজের অধ্যাপক শিক্ষকদের মধ্যে ডক্টর টাইট্‌লার ও ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসন প্রমুখ দু-চারজন সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞানে পণ্ডিত ইংরেজও ছিলেন। পাশ্চাত্ত্য জীবনাদর্শের ভগীরথ তাঁদেরই হওয়া হয়তো উচিত ছিল। তাঁরা যে একেবারেই তা হন নি তা নয়। কিন্তু ডিরোজিওর মতন শাঁখ বাজিয়ে এদেশের সমাজকে কেউ কাঁপিয়ে তুলতে পারেন নি। তার উপর ডিরোজিওকে নিশ্চয় বিদেশী ইংরেজ বলা যায় না, পর্তুগীজ ফিরিঙ্গি হলেও ভারতীয়ই তাঁকে বলতে হয়। এ কথাও স্বীকার করতে হয় যে ভারতীয় ডিরোজিও, তাঁর পূর্বসূরী রামমোহনের মতন, নবযুগের ইউরোপীয় আদর্শের প্রবাহকে বাংলার তথা ভারতের জীবনগঙ্গার সঙ্গে মিলিত করার চেষ্টা করেছিলেন।

হিন্দুকলেজের আগে, ড্রামণ্ডের ধর্মতলা অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেখানে এদেশী ও বিদেশী ছাত্ররা একসঙ্গে বিদ্যাশিক্ষা করত। প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার মিলনক্ষেত্র একজন স্কচ শিক্ষক আগেই ধর্মতলাতে রচনা করেছিলেন। হিন্দুকলেজের মতন তার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল না বটে, কিন্তু এদেশে ইউরোপীয় জ্ঞানবিদ্যার 'channel' হিসেবে তার গুরুত্বও কম ছিল না। ধর্মতলার প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের এই ক্ষুদ্র মিলনতীর্থে ডিরোজিও শিক্ষালাভ করেছিলেন। তাঁর শিক্ষক ডেভিড ড্রামণ্ড শুধু যে স্কটল্যাণ্ডের একজন বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন তা নয়, ঘোর সংশয়বাদী ও যুক্তিবাদী স্কচ্ দার্শনিক ডেভিড হিউমের গোঁড়া ভক্ত ও শিষ্য ছিলেন। কুসংস্কার ও ধোঁয়াটে আধ্যাত্মিকতাকে তিনি ঘৃণা করতেন এবং জীবনটাকে মনে করতেন জ্যামিতির মতন প্রমাণসাপেক্ষ ব্যাপার। সম্যক্ বিষয়জ্ঞানকে তিনি ঈশ্বর বলতেন এবং বন্ধনহীন বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তিকে বলতেন নবযুগের যাজক। যা জ্ঞানাতীত ও যুক্তি-বহির্ভূত, তাঁর মতে তা মানুষের গ্রাহ্য হবার যোগ্য নয়। ধর্মতলা অ্যাকাডেমিতে নতুন যুগচিন্তার এই বীজ ড্রামণ্ড তাঁর ছাত্র ডিরোজিওর মনে বপন করেছিলেন। ডিরোজিওর মানস-জমিনে সেই বীজ অল্পদিনের মধ্যে সোনা ফলিয়েছিল। সেই সোনার ফসলের বীজ ডিরোজিও নিজে আবার হিন্দুকলেজে তাঁর ছাত্রদের মানসক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। মাত্র দশ-বার বছর পরের কথা। তাঁর ফসলের ঐশ্বর্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল বাংলার কূপমণ্ডূক সমাজ। নব্যবঙ্গের তরুণদের ক্ষুরধার বুদ্ধি ও শাণিত যুক্তির তরবারি যখন ধর্ম আচার-অনুষ্ঠান কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার আবরণ ছিন্ন করে জ্ঞানের আলোক বিকীরণের জন্য উদ্যত হয়ে উঠল, তখন সোরগোল পড়ে গেল রক্ষণশীল সমাজে। তাঁদের পাঁজর পর্যন্ত কেঁপে উঠল ভয়ে, রাষ্ট্রবিপ্লবের ভয়ে নয়, চিন্তাবিপ্লবের ভয়ে। সমাজে যতরকমের বিপ্লব আছে তার মধ্যে চিন্তাবিপ্লবই সবচেয়ে ভয়াবহ। সেই চিন্তা-বিপ্লবের মারাত্মক লক্ষণ দেখে প্রবীণেরা ক্রুদ্ধ হলেন এবং তাঁদের ধূমায়িত আক্রোশ বজ্রের মতন ফেটে

পড়ল তরুণদলের তরুণশিক্ষক ডিরোজিওর মাথার উপর।

বজ্রাহতের মতন ডিরোজিওর জীবন অচিরেই পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এত অভিশাপ ও দীর্ঘশ্বাসের আগুন বোধ হয় তাঁর সহ্য হল না। কয়েকমাসের মধ্যেই তাঁর জীবনলীলার অবসান হয়ে গেল।

কলেজের কর্তারা তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণ করতে পারেন নি। শিক্ষক হিসেবে তাঁর অসাধারণ যোগ্যতার কথাও প্রায় সকলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। অবশ্য রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন ও রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে অযোগ্য বলেছেন, কিন্তু সেটা সামাজিক কারণে। রাধাকান্ত দেব কলকাতার হিন্দুসমাজের নেতাস্বরূপ ছিলেন, সুতরাং হিন্দুদের প্রধান মুখপাত্র হিসেবে, প্রতিকূল পরিবেশের কথা চিন্তা করে, তাঁর পক্ষে ডিরোজিওর কোন গুণের কথা উল্লেখ করা সম্ভব ছিল না। রামকমল ও রাধামাধব এসব বিষয়ে ছায়ার মতন তাঁর অনুগামী ছিলেন, তাই তাঁরা তাঁর কথার প্রতিধ্বনি করেছিলেন মাত্র। সভায় প্রস্তাবের বয়ান বদলে ডিরোজিওর কর্মচ্যুতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছিল, এবং সেটাও 'with due consideration for his merits and services.'

এ কথা ইতিহাসের নথিপত্রে লেখা আছে, এবং লেখা থাকবেও চিরদিন যে, হিন্দুকলেজের তরুণ শিক্ষক ডিরোজিওর জীবন (এবং ডিরোজিও বিদেশী নন, ভারতীয়) গোঁড়া হিন্দুসমাজের নেতারা কলকাতার হিন্দুদের 'present state of public feeling'-এর দোহাই দিয়ে নির্বিকারচিত্তে জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন।

কলকাতার হিন্দুসমাজের 'বর্তমান মানসিক উত্তেজনার কাছে' একজন তরুণের সম্পূর্ণ ভবিষ্যৎ-জীবন এইভাবে নিঃসংকোচে বলিদান দেওয়া যুক্তিহীন ও হৃদয়হীন। কিন্তু যুক্তি ও হৃদয়ের দু-পায়ে ভর দিয়ে মানুষের সমাজ সবসময় এগিয়ে চলে না। তা যদি চলত তা হলে সমাজজীবনে যুগে যুগে সংকটের প্রলয়মেঘ ঘনিয়ে উঠত না। যুক্তি ও হৃদয়ের শক্তি যখন ক্ষয় হয়ে হয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়, তখনই সমাজ পক্ষাঘাতগ্রস্ত রুগীর মতন ভেঙে পড়ে, তার আর চলার শক্তি থাকে না। বাংলার সমাজে এইরকম এক সংকটকালে ডিরোজিওর জীবন জনশ্রুতির পূজায় নিবেদন করেছিলেন হৃদয়হীনেরা, কারণ পঙ্গু সমাজের দেহে চলৎশক্তিসঞ্চারের স্বপ্ন দেখেছিলেন ডিরোজিও।

জনতার উত্তেজনা নয় শুধু, স্মৃতিশক্তিও ক্ষণস্থায়ী। হিন্দুকলেজ ও ডিরোজিওমুখী উত্তেজনা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি বটে, কিন্তু ডিরোজিও ঝড়ের পর সূর্যোদয় দেখার জন্য দীর্ঘজীবীও হতে পারেন নি। তাঁর 'Morning after a Storm' কবিতার কথা মনে পড়ে—

> I wandered forth, and saw great Nature's
> power.
> The Hamlet was in desolation laid
> By the strong spirits of the storm; there lay
> Around me many a branch of giant trees,
> Scattered as leaves are by the southern
> breeze
> Upon a brook, on an autumnal day;
> Cloud piled on cloud was there, and they
> did seem
> Like the fantastic figures of a dream,
> Till morning brighter grew, and then they
> rolled away.

ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রদের কেন্দ্র করে যে-ঝড় উঠেছিল সমাজে তা কালবৈশাখীর মতনই ভয়ংকর। সমাজের

অনেক প্রাচীন বট-অশ্বত্থের মূল পর্যন্ত নড়ে গিয়েছিল সেই ঝড়ে, দু-একটি উপড়েও যায় নি যে তা নয়। স্বপ্নপুরীর দৈত্যের মতন ঘনঘোর স্তূপে মেঘ জমেছিল সমাজের আকাশে। তারপর যখন উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের ভোরের সূর্যালোকে সেই মেঘ কেটে যেতে থাকল, তখন সে-দৃশ্য উপভোগ করার জন্য ডিরোজিও জীবিত ছিলেন না।

শিক্ষকতা ছেড়ে ডিরোজিও সাহিত্য ও সাংবাদিকতার সাধনায় আত্মনিয়োগ করবেন স্থির করলেন। স্থির করেছিলেন মনে হয় তাঁর কাজকর্মের নতুন ধারা বিচার করে। বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং ছাত্রদের বিদ্বৎসভার ভিতর দিয়ে জনসমাজে স্বাধীন সংস্কারমুক্ত ভাবধারা প্রচারের পথ যখন প্রায় বন্ধ হয়ে গেল, তখন পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করে সেই পথে অগ্রসর হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় রইল না। ছাপাখানা, বই ও সংবাদপত্র আধুনিক যুগে সামাজিক আন্দোলনের ও জনমত গঠনের শক্তিশালী হাতিয়ার। ডিরোজিও তা বিলক্ষণ জানতেন, তাই পত্রিকার মাধ্যমে তাঁর স্বাধীন মতামত ও সামাজিক আদর্শ প্রচারের জন্য তিনি প্রস্তুত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানবাড়িতে তার পরেও অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের বা অনুরূপ কোন আলোচনা-সভার বৈঠক বসত কি না জানা যায় না। অন্ততঃ ডিরোজিওর ছাত্রদের সেরকম কোন সভা বসলে বাড়ির মালিক শ্রীকৃষ্ণ সিংহ খুশী হয়েই উৎসাহ দিতেন। কারণ ডিরোজিওর প্রতি সিংহ মহাশয়ের যে কত গভীর শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ও সহানুভূতি ছিল তা কলেজের পরিচালক-সভায় প্রকাশিত তাঁর নির্ভীক মতামত থেকে বোঝা যায়। তবে সভার বৈঠক বন্ধ হয়ে যাবারই সম্ভাবনা। বৈঠক বসলে মানিকতলার বাড়িতে হয়তো চড়াও হত ক্ষিপ্ত জনতা। নেতারা লেলিয়ে দিতেন।

পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত ডিরোজিও কেবল নিজে গ্রহণ করে চুপ করে থাকেন নি, তাঁর প্রিয় ছাত্রদেরও কয়েকজনকে তাই করতে উৎসাহ দিয়েছিলেন। ছাত্রদের মধ্যে অগ্রগণ্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স তখন (১৮৩১ সনে) ১৮ বছর, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বয়স ১৭ বছর, রামগোপাল ঘোষের বয়স ১৬ বছর, এবং গুরু ডিরোজিওর নিজের বয়স ২২ বছর। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের বিতর্কসভায় তিনি তাঁর ছাত্রদের বাগ্মিতা-বিকাশে সাহায্য করেছেন। সভায় কৃষ্ণমোহন ছিলেন "the readiest and most effective speaker, unaffected in manner, calm, and unimpassioned, though sometimes bursting forth into vehemence," এবং যে রামগোপাল ঘোষ পরে তাঁর বাগ্মিতার জন্য 'বাংলার ডেমস্থেনীস' আখ্যা পেয়েছিলেন, অমৃতলাল বসু বলেছেন, "this debating club was to him what the Oxford Club had been to many an English orator." গুরুগম্ভীর জটিল বিষয়ের বিতর্কে ষোল-সতের-আঠার বছরের তরুণদের এই প্রতিভার বিকাশ সত্যিই বিস্ময়কর। বিতর্কসভায় বাগ্মিতার বদলে এবারে স্বাধীন সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে প্রতিভার পরীক্ষার সময় এল। সিংহাসনচ্যুত গুরুর কাছে শিষ্যবৃন্দ সমবেত হলেন উপদেশ ও উৎসাহের জন্য। সভাগৃহে বন্দী হয়ে আর বাক্‌যুদ্ধ করলে চলবে না, তরবারির চেয়েও হাজারগুণ শক্তিশালী লেখনী ধারণ করে প্রকাশ্য জনসমাজে মিথ্যার বিরুদ্ধে, ভণ্ডামি ও শঠতার বিরুদ্ধে, ধর্মান্ধতা ও আচার-গোঁড়ামির বিরুদ্ধে, অজ্ঞানতা ও অশিক্ষা-কুশিক্ষার বিরুদ্ধে অকুতোভয়ে সংগ্রাম করতে হবে।

আঠার বছরের যুবক কৃষ্ণমোহনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল ইংরেজী *The Enquirer* পত্রিকা মে মাসে (১৮৩১), অর্থাৎ ডিরোজিওর কলেজ ছাড়ার মাসখানেকের মধ্যে। জুন মাসের গোড়াতেই সতের বছরের তরুণ দক্ষিণারঞ্জনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল বাংলা 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা। ডিরোজিও নিজে তাঁর সমস্ত পুঁজিপাটা দিয়ে 'ইস্ট ইণ্ডিয়ান' নামে আর-একখানি ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশ করলেন, ৯ নং কসাইতলা

(১১নং বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট) থেকে। পত্রিকার নামকরণ থেকেই বোঝা গেল, কেবল এদেশের হিন্দুসমাজের সংস্কারের জন্য নয়, নিজের নির্যাতিত ও অবহেলিত ফিরিঙ্গি-সমাজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের জন্যও তিনি বদ্ধপরিকর হলেন।

'এন্‌কয়ারার' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় তরুণ কৃষ্ণমোহন তাঁর লক্ষ্য ঘোষণা করে লিখলেন, "Having thus launched our bark under the denomination of *Enquirer*, we set sail in quest of truth and happiness." দক্ষিণারঞ্জনের বাংলা 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার উদ্দেশ্য প্রচারিত হল সংস্কৃত শ্লোকে—

এহি জ্ঞান মনুষ্যাণামজ্ঞান তিমিরংহর।
দয়া সত্যঞ্চ সংস্থাপ্য শঠতামপি সংহর॥

মানুষের অজ্ঞানতার তিমির হরণ করে, দয়া ও সত্যকে সংস্থাপন করে, শঠতাকে সংহার করে জ্ঞানের বিকাশ হোক, এই হল পত্রিকার আদর্শ। বছর দুই পরে 'জ্ঞানান্বেষণ' ইংরেজী-বাংলা দ্বিভাষী পত্রিকায় পরিণত হয়। 'এন্‌কয়ারার' ও 'জ্ঞানান্বেষণ' প্রধানতঃ হিন্দুসমাজ নিয়ে, এবং 'ইস্ট ইণ্ডিয়ান' ফিরিঙ্গি-সমাজ নিয়ে সত্য-প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। এডওয়ার্ডস বলেছেন, ডিরোজিও সম্পাদিত 'ইস্ট ইণ্ডিয়ান' পত্রিকাই হল "the first newspaper that was the recognised organ of Eurasians and which advocated their claims...with an elcquence and ability and a power of argument of which East Indians may well be proud." কৃষ্ণমোহন ও দক্ষিণারঞ্জনকে উপদেশ-পরামর্শ দিতেন ডিরোজিও, হয়তো 'এন্‌কয়ারার' পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে লিখতেনও; কিন্তু নিজে ফিরিঙ্গি বলে দূরে থাকতেন। ফিরিঙ্গি যদি হিন্দুসমাজের সংস্কারক হবার চেষ্টা করেন তা হলে খ্রীষ্টান পাদ্রিদের মতন তাঁকেও যে উপহাসের পাত্র হতে হবে, এ কথা তিনি জানতেন। তাই বোধ হয় দুই হিন্দুব্রাহ্মণ যুবককে তিনি হিন্দুসমাজের সংস্কারযুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব দিয়েছিলেন এবং নিজে ফিরিঙ্গি-সমাজের স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

সারা জুলাই মাস ধরে (১৮৩১) কলেজের তরুণদের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চলতে থাকল। উত্তেজনা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল মনে হয়। ১৬ জুলাই তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' লেখেন, "অপর শ্রীযুত মেম্বর মহাশয়দিগের প্রতি আমারদিগের নিবেদন এইমত আজ্ঞা তাবৎ ক্লাস মেস্টর এবং পণ্ডিত মহাশয়দিগের প্রতি দেন যে হিন্দু কালেজের ছাত্রেরা ফিরিঙ্গির মত পরিচ্ছদ না করিতে পায় যথা ফিরিঙ্গি জুতাপায় সবচুল মাথায় খালি আঙ্গরাখা গায় মালা নাই গলায় নেচরের গুণে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয় এবং দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে ইত্যাদি।" অভিযোগের বহর দেখে বোঝা যায়, বিরক্তি ও ব্যঙ্গবিদ্রূপের মাত্রা কোন্ সীমা পর্যন্ত পৌঁছেছিল। কলেজের ছাত্রদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের ধর্মসভার বিষোদ্‌গিরণও কিছুই বন্ধ হয় নি, ক্রমেই তার উত্তাপে ও গর্জনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিল সকলে। জুলাইয়ের শেষে (১৮৩১) 'এন্‌কয়ারার' পত্রিকায় কৃষ্ণমোহন লিখলেন, 'The rage of persecution is still vehement...The heat of *Gurum Shabha* is violent, and they know not what they are doing." গুড়ুমসভার (ধর্মসভা) গর্জন ক্রমেই গগনভেদী হয়ে উঠছে, কিন্তু তারা জানে না কি করছে তারা।

এই পরিবেশে, ২৩ আগস্ট তারিখে (১৮৩১) হঠাৎ একটি নাটকীয় ঘটনা ঘটে গেল। ঘটনার স্থান হল কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাড়ি এবং পাত্র হলেন তাঁর তরুণ বন্ধুবান্ধব। কৃষ্ণমোহনের বাড়ির (গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে) উত্তরে ভৈরবচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র চক্রবর্তী নামে দুজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বাস করতেন। ২৩ আগস্ট কৃষ্ণমোহন কোন কাজে বাইরে গিয়েছিলেন, এমন সময়

তাঁর বন্ধুবান্ধবরা দল বেঁধে তাঁর বাড়িতে এসে, বৈঠকখানায় বসে সমাজ-সংস্কারের গরম গরম বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে করতে খুব উত্তেজিত ও উল্লসিত হয়ে ওঠেন। অতঃপর সেই উত্তেজনার বশে মেছুয়াবাজারের এক মুসলমানের দোকান থেকে রুটি ও গোরুর গোস্ত নিয়ে এসে বাড়িতেই ভক্ষণ করতে আরম্ভ করেন। ব্যাপারটা তাতেই শেষ হয় না। ভক্ষণান্তে গোমাংসের হাড়গুলি তাঁরা উল্লাসধ্বনি দিতে দিতে পাশের চক্রবর্তীদের বাড়ির ভিতরে নিক্ষেপ করেন। 'গো-হাড় গো-হাড়' ধ্বনি শুনে চক্রবর্তীরা বেরিয়ে আসেন এবং ছেলেদের কীর্তি দেখে স্বভাবতঃই ক্ষিপ্ত হন। ব্রাহ্মণপ্রধান পাড়ায় দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ক্রোধোন্মত্ত প্রতিবেশীরা কৃষ্ণমোহনের বন্ধুদের চড়াও হয়ে মারতে যান। অনর্গল ধারায় অশ্রাব্য কটুবাক্য ও অভিসম্পাত তরুণদের উপর বর্ষিত হতে থাকে। মারের ভয়ে তাঁরা পলায়ন করেন। কৃষ্ণমোহনের অগ্রজ ভুবনমোহন বাড়িতে ফেরামাত্র প্রতিবেশীরা সমস্বরে দাবি করেন যে তাঁর অনুজকে কিছুতেই আর এ বাড়িতে স্থান দেওয়া চলবে না, আসা মাত্রই বিদায় করতে হবে।

তাই করা হল। কৃষ্ণমোহন বাড়ি ফিরে আদ্যোপান্ত বিবরণ শুনে বিস্মিত ও দুঃখিত হলেন, কিন্তু উত্তেজিত প্রতিবেশীদের শান্ত করার জন্য গৃহত্যাগ করা ছাড়া তাঁর গত্যন্তর রইল না।

গৃহত্যাগ করেও তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। এই সময় তাঁকে অতর্কিতে প্রহার করা, এমন কি হত্যা করারও ষড়যন্ত্র হয়েছিল শোনা যায়। কলকাতা শহরে ভয়ে তাঁকে কেউ বাড়িতে আশ্রয় দিতেও চান নি। অবশেষে বন্ধু দক্ষিণারঞ্জনের বাড়িতে তিনি আশ্রয় নেন। কিন্তু মাসখানেকের বেশী সেখানেও থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। বন্ধুর আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশীরা ও সমাজের লোকজন ক্রমেই আপত্তি করতে লাগলেন এবং কৃষ্ণমোহন ২৮ সেপ্টেম্বর বন্ধুর বাড়ি ছেড়ে চৌরঙ্গি অঞ্চলে সাহেবের গৃহে অতিথিরূপে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। শহরের কোন হিন্দুপাড়ায় তাঁর স্থান হল না।

তরুণদের এই আচরণ নিশ্চয় সমর্থনযোগ্য নয়। নিছক কিশোরসুলভ চাপল্যের বশেই যে তাঁরা এই কুকর্ম করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। পাখির নতুন ঠোঁট উঠলে বা ডানা গজালে যেমন সে ঘন ঘন যাকে খুশি কামড়াতে এবং যেখানে খুশি উড়তে চেষ্টা করে, ডিরোজিওর তরুণ ছাত্ররাও ঠিক তাই করছিলেন। নতুন প্রগতিবাদ, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সংস্কার-মুক্তির স্বাদ পেয়ে প্রথম যৌবনের উদ্দামতায়, তাঁরা নিঃসন্দেহে কিছুটা বেহিসেবী স্বেচ্ছাচারিতায় গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। তার জন্য কটুবাক্য ও কঠোর সমালোচনা অবশ্যই তাঁদের প্রাপ্য। সেই প্রাপ্য দিয়েও সস্নেহে ও সযত্নে তাঁদের প্রতিভাকে পালন করে ঠিক পথে পরিচালিত করা যেত। কিন্তু তার জন্য দরদ থাকা দরকার এবং তাঁদের প্রতিভার স্বরূপও উপলব্ধি করা প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় তখন প্রাচীন ও প্রবীণ সমাজে নব্যশিক্ষিত প্রগতিপন্থী তরুণদের প্রতি এই সহানুভূতি ছিল না। তাই কেবল দুর্মর সমালোচনায় তাঁরা সমাজের শত্রু মনে করে তরুণদের নির্যাতন করেছেন এবং নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছেন সমাজের বুক থেকে।

গো-হাড় নিক্ষেপের ঘটনার পর সমাজে যে কি ভীষণ সোরগোল সৃষ্টি হয়েছিল তা সহজেই কল্পনা করা যায়। আগে থেকেই উত্তেজনার একটা স্রোত বইছিল শহরে, এপ্রিল মাসের শেষে (১৮৩১) ডিরোজিওর পদচ্যুতির সময় থেকে আগস্টের শেষে কৃষ্ণমোহনের গৃহত্যাগের সময় পর্যন্ত তাতে ক্রমেই উত্তাল তরঙ্গের সঞ্চার হতে থাকে। তরুণদের উচ্ছৃঙ্খলতা ডিরোজিও নিশ্চয় সমর্থন করতেন না এবং সেজন্য তাদের শাসনও করতেন। কিন্তু তাঁর শাসন-নিষেধের বাঁধ ভেঙেও তরুণদের উচ্ছল সংস্কার-চেতনা মধ্যে মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে সমাজের বুকে আত্মপ্রকাশ করত। এই অসংযত উচ্ছলতার প্রকাশ লক্ষ্য করে ডিরোজিও বেদনাবোধ করলেও হতাশ হন নি।

নিরাশ্রয় হয়েও আঠার বছরের যুবক কৃষ্ণমোহন

নিরুৎসাহ হলেন না। 'এন্‌কয়ারার' পত্রিকায় তিনি লিখলেন :

Persecution is high for we have deserted the Shrine of Hinduism. The bigots are violent because we obey not the calls of superstition. Our conscience is satisfied we are right....but we will stand persecution. *A people* can never be reformed without noise and confusion...Blessed are we, that we are to reform the Hindu nation, we have blown in the trumpet, and we must continue to blow on.

"আমরা হিন্দুধর্মের আশ্রয়চ্যুত হয়েছি বলে আমাদের উপর নিষ্ঠুর নির্যাতন করা হচ্ছে। কুসংস্কার আমরা বর্জন করেছি বলে অতিধার্মিকরা আমাদের উপর খড়্গহস্ত হয়েছেন। বিবেকবুদ্ধির দিক থেকে আমরা যা করছি তা ন্যায্য ও সঙ্গত বলে আমরা মনে করি। নির্যাতন যত নিষ্ঠুরই হোক, তা সহ্য করার মতন প্রচুর শক্তি আছে আমাদের। আমরা জানি কোলাহল না করে, এবং খানিকটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি না করে একটা জাতির সংস্কার-সাধন করা যায় না। আমরা ধন্য, যেহেতু হিন্দুজাতির সংস্কারসাধনের ভার নিয়েছি আমরা। তার জন্য সংগ্রামের যে ভেরী বাজিয়েছি, তা শত নির্যাতন সহ্য করেও আমরা বাজিয়ে যাব।"

ডিরোজিও একদিন তাঁর তরুণ ছাত্রদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "আমি দেখছি, সদ্যফোটা ফুলের মতন পাপড়ি মেলে তোমাদের প্রতিভার মুকুল ফুটে উঠছে, মনের কপাট খুলে যাচ্ছে একে একে, এবং যে মোহের বন্ধনে তোমাদের প্রচণ্ড ধীশক্তি শৃঙ্খলিত তা ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। পাখির ছানার মতন তোমাদের ডানা-ঝাপ্‌টানি শুনছি আমি, আর কান পেতে আছি কবে নীড়ের বন্ধন ছেড়ে, মুক্ত ডানা মেলে, উধাও হবে তোমরা অবাধ আকাশের দিকে।"

মুক্তপক্ষ তরুণদের সেই শক্তিপরীক্ষা পূর্ণোদ্যমে শুরু হয়ে গেল ১৮৩১-এর আগস্ট-সেপ্টেম্বর থেকে। ভেরী বেজে উঠল সংস্কার-সংগ্রামের। চরৈবেতির মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে বাংলার নব্যশিক্ষিত তরুণেরা প্রতিজ্ঞা করলেন, তাঁদের ভেরী থামবে না কোনদিন।

ডিরোজিও বুঝলেন, সামাজিক প্রগতি ও কল্যাণের কামনায় উদ্ভাসিত এই তরুণের দল ভুল করবে অনেক, বাছা বাছা সব ভুল, এবং সংযম-শৃঙ্খলার বাঁধও ভাঙবে বহুবার। কিন্তু দুর্বার তাদের গতি প্রতিরোধ করবে কে?

কবি-দার্শনিক ডিরোজিও স্বপ্নে বিভোর হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। বাইশ বছর আট মাস বয়সে তাঁর মৃত্যু হল (২৩ ডিসেম্বর ১৮৩১)।

কলেরা রোগে হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হয়। অসুখের সময় তরুণ ছাত্ররা প্রায় সবসময় তাঁর রোগশয্যার পাশে বসে সেবাশুশ্রূষা করতেন। মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর অনুসন্ধানী মনের আকুলতা এতটুকু কমে নি। তরুণদলের একজন 'most spirited lad' মহেশচন্দ্র ঘোষ মৃত্যুর সময় পর্যন্ত প্রায় সর্বক্ষণ তাঁর কাছে ছিলেন। ডক্টর টাইট্‌লার, ডক্টর উইলসন, ডক্টর গ্র্যাণ্ট, ডেভিড হেয়ার এবং আরও অনেকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন, এবং রোগশয্যাতেও তাঁদের সঙ্গে নানা বিষয়ে তিনি আলাপ করার চেষ্টা করতেন। পাদ্রি হিল্‌ও (যাঁর বক্তৃতার পরে ডাফের ভাষায় 'The whole town was literally in an uproar') তাঁর সঙ্গে রোগশয্যায় সাক্ষাৎ করে খ্রীষ্টধর্মবিষয়ে তাঁর মতামত জানতে চেয়েছিলেন। মহেশচন্দ্র বলেন, মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ডিরোজিও নিজেকে খ্রীষ্টান বলে স্বীকার করেন নি। তিনি বলেছেন, "ধর্মবিষয়ে বা ঈশ্বর সম্বন্ধে সত্য কি তা আজও আমি জানি না, আমার অনুসন্ধান শেষ হয় নি

এখনও।” মহেশচন্দ্রের উক্তি মিথ্যা না হবারই সম্ভাবনা, কারণ ডিরোজিওর ছাত্রদের মধ্যে কৃষ্ণমোহনের আগে মহেশচন্দ্রই খ্রীষ্টান হয়েছিলেন। অতএব ডিরোজিও নিজেকে খ্রীষ্টান বলে স্বীকার করে গেছেন, এ কথা জানলে তিনি খুশীই হতেন।

‘এন্‌কয়ারার’ ও ‘জ্ঞানান্বেষণ’ পত্রিকা প্রকাশ করার সময় ডিরোজিওর তরুণ ছাত্ররা বলেছিলেন যে জ্ঞানের মহাসমুদ্রে, যুক্তি ও বুদ্ধির পাল তুলে দিয়ে সত্যের সন্ধানে তাঁরা অভিযান করছেন। তাঁদের দীক্ষাগুরু ডিরোজিও, মুক্তমনের পাল তুলে দিয়ে সত্যের সন্ধানে জীবন-নদীর পরপারে পাড়ি দিয়েছিলেন তরুণ বয়সে। তখন তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত করার সংকল্প করেছিলেন বাংলার তরুণ ছাত্রদল।

কলকাতা শহরের দক্ষিণ-পার্ক স্ট্রীটের প্রাচীন গোরস্থানে অনেক স্বনামধন্য ঐতিহাসিক পুরুষের সমাধি আছে। এই গোরস্থানেই ডিরোজিওকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর কীর্তি ও খ্যাতির কোন স্বাক্ষর নেই সেখানে। এমন কি প্রত্নতাত্ত্বিকের সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে গোরস্থানে না ঘুরে বেড়ালে তাঁর সমাধি খুঁজে পাওয়াও সম্ভব নয়। গোরস্থানের পশ্চিমপ্রান্তে এক কোণে জনৈক মেজর মেলিঙের সমাধির পাশে ডিরোজিও সমাধিস্থ। শোনা যায়, তাঁর মৃত্যুর পরে প্রায় আট শত টাকা সংগ্রহ করা হয়েছিল সমাধিমন্দির নির্মাণের জন্য। কিন্তু পরে সেই টাকার তহবিলের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি।

ডিরোজিওর স্মৃতির কোন যোগ্য সমাধি নেই বলে লজ্জার কারণ থাকলেও, দুঃখের কারণ নেই। বাংলার তরুণদের মানস-ফলকে তাঁর কীর্তির কথা খোদাই করা আছে; ভবিষ্যতেও থাকবে।

বোধ হয় কোলাহলময় শহরে রাজপথের পাশে কোন গোরস্থানে তাঁর কবিচিত্ত সমাধি কামনা করে নি। স্বরচিত ‘The Poet's Grave’ কবিতায় তাঁর নিজের সমাধির বাসনাই হয়তো তিনি ব্যক্ত করেছিলেন:

Be it beside the ocean's foamy surge,
  On an untrodden, solitary shore,
Where the wind sings an everlasting dirge,
  And the wild wave, in its tremendous roar
Sweeps o'er the sod!—There let his ashes lie
  Cold and unmourned—

ভবানী মুখোপাধ্যায়

এক

সারাদিন ধরে বিরামবিহীন তুষার বর্ষণে পথঘাট পিচ্ছিল। চলা-ফেরা করা কঠিন, গাড়িঘোড়ার পক্ষেও তেমন নিরাপদ নয়। তবু সেদিকে কারও যেন লক্ষ্য নেই, সব বাধা উপেক্ষা করে দলে দলে লণ্ডনের অভিজাত মহলের নরনারী সুসজ্জিত হয়ে উপস্থিত হচ্ছেন লণ্ডনের সেণ্ট জেমস থিয়েটারে। আজ একটি নতুন নাটকের উদ্বোধন রজনী। নাট্যরসিক লণ্ডনবাসীদের কাছে এই আকর্ষণ দুর্দমনীয়।

নাট্যকার নিতান্ত নবীন নন, এর আগে তাঁর দুখানি নাটক সাফল্যলাভ করেছে, তৃতীয় নাটকটি সম্প্রতি 'হে মার্কেট থিয়েটারে' স্বয়ং প্রিন্স অব ওয়েলসের উপস্থিতিতে উদ্বোধন করা হয়েছে, সুতরাং প্রাকৃতিক দুর্যোগ তুচ্ছ, ব্যক্তিগত ক্লেশ উপেক্ষণীয়।

নবীন নাট্যকার অসকার ওয়াইলডের "The Importance of Being Earnest" নাটকের প্রথম অভিনয় রজনী। তাই বিদগ্ধ দর্শকে প্রেক্ষাগৃহ পরিপূর্ণ। এই নাটকই অসকার ওয়াইলডের সাফল্যের স্বীকৃতি। নাট্যকার হিসাবে এই তাঁর সিদ্ধি-দিবস।

সেদিন কিন্তু নাট্যশালার ভিতরে ও বাইরে দুটি নাটকের অভিনয় চলছিল। নাট্যশালার ভিতরে অসংখ্য নাট্যরসিক দর্শকের ভিড় আর বাইরের নাটকের দর্শক দু-চারজন থিয়েটার-কর্মচারী ও পাহারাওলা। এই সেই ভিক্টোরীয় যুগের এক নিদারুণ বিয়োগান্ত কাহিনীর সূচনা। অসকার ওয়াইলডের জীবনের উজ্জ্বলতম দিনটিতেই নেমে এসেছিল অভিশাপ আর সর্বনাশ।

সেই শীতের রাতে একজন থিয়েটার-ভবনের দোরে দোরে ধাক্কা দিয়ে বেড়াচ্ছে। ভিতরে যেতে চায়, তার হাতে এক বোঝা শাকসবজি, তার মধ্যে গাজরগুলো বেশ দেখা যাচ্ছে। তাকে কিন্তু কেউ ভিতরে প্রবেশের সুযোগ দিচ্ছে না, সকলেই ভাগিয়ে দিচ্ছে। অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও যখন ভিতরে যাওয়া গেল না তখন নিষ্ফল আক্রোশে অভিসম্পাত করে লোকটি চলে গেল।

এই সব গাজর এবং অন্যান্য সবজি নাট্যকারকে ছুঁড়ে

মারার উদ্দেশ্যে আনা হয়েছিল। যে মুহূর্তে দর্শকরা নাট্যকারকে অভিনন্দন জানাবে ঠিক সেই মুহূর্তেই কাজ সারতে হবে এই ছিল বাসনা। মঞ্চস্থ নাট্যকারকে অপদস্থ করার এই স্বর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে প্রতিশোধ-উন্মত্ত মানুষটি অন্য উপায় চিন্তা করলেন। ইনিই সেই মার্কুইস অব কুইনসবেরী।

মার্কুইসের কনিষ্ঠ সন্তান লর্ড অ্যালফ্রেড ডাগলাসের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু এই নবীন নাট্যকার অসকার ওয়াইলড। কয়েক মাস ধরেই ওয়াইলডকে অপদস্থ করার সুযোগ খুঁজছেন ভদ্রলোক। কিছুতেই ডাগলাস আর ওয়াইলডের বন্ধুত্বের অবসান ঘটাতে পারছেন না। অনেক ভয় দেখিয়েছেন, অনুনয় করেছেন—কিছুতেই কিছু নয়। অথচ এই ঐতিহাসিক বন্ধুত্ব সারা লণ্ডন শহরের এক মুখরোচক কলঙ্ক কাহিনী। ক্লাবে, মজলিসে, পার্টিতে সর্বত্র এই কুখ্যাত অন্তরঙ্গতার আলোচনা চলে। কাফে রয়্যালে বসে মার্কুইস স্বচক্ষে এই দুই বন্ধুর নির্লজ্জ কীতিকলাপ লক্ষ্য করেছেন। সম্ভব হলে তিনি ওয়াইলডকে গুলি করতেন, তা নয় কতকগুলি নিষ্কর্মা লোক প্রেক্ষাগৃহে বসে সেই ঘৃণিত নাট্যকারের নাটক দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠছে—এ দৃশ্য অসহনীয়।

পিতা যেমন অসকার ওয়াইলডের সর্বনাশ সাধনে দৃঢ়সঙ্কল্প, পুত্র লর্ড ডাগলাসও তেমনই পিতা মার্কুইস অব কুইনসবেরীকে জব্দ করার মতলব আঁটছেন। কেউ কম নয়, দুজনের দেহেই উদ্দাম স্কটিশ রক্ত প্রবাহিত। মার্কুইস অব কুইনসবেরী সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষা অবহেলা করেছেন, নিজের স্ত্রীকেও তিনি নির্যাতন করেছেন। লর্ড ডাগলাস তাঁর জননীর পক্ষ থেকেই যেন পিতাকে শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বন্ধু ওয়াইলডকে নিয়ে পিতার ঈর্ষা ও ক্রোধ লর্ড ডাগলাসের প্রতিশোধ-স্পৃহা পূরণের একটি পথ মাত্র। এই সূত্রে হয়তো মার্কুইসকেও জেলে আটকানো সম্ভব হত।

পিতা-পুত্রের এই বিরোধ কিন্তু অসকার ওয়াইলডের জীবনের বিচিত্র অভিশাপ। এই বিরোধই শেষ পর্যন্ত অসকার ওয়াইলডের জীবনে কলঙ্ক ও চরম সর্বনাশ ডেকে নিয়ে এসেছে।

সেই দুর্যোগময়ী রজনীর কয়েক সপ্তাহ পরে ওল্ড বেলীর ফৌজদারী আদালতে মানহানির মামলার আসামী হিসাবে অসকার ওয়াইলডের বিচার শুরু হল। তাঁর জীবনের এই শেষ অঙ্ক গ্রীক ট্রাজেডির মতই বিয়োগান্ত। Lady Windermere's Fan নামক নাটকে ওয়াইলডের একটি চরিত্রের মুখে উচ্চারিত এই বাণীটি তাঁর নিজের সম্পর্কেও প্রযোজ্য—

"Misfortunes one can endure—they come from outside, they are accidents. But to suffer for one's own faults—ah!—there is the sting of life."

অসকার ওয়াইলড যেন স্বখাতসলিলেই ডুবে গেলেন। নাট্যকার ওয়াইলডের জীবননাট্যের শেষ অঙ্কের ইঙ্গিতই তাঁর জীবন-কথার মুখবন্ধ।

ভিক্টোরীয় যুগের তিনজন সাহিত্যিকের জীবন অস্বাভাবিকতার দোষে কলঙ্কিত। লুই ক্যারল তাঁর কল্পলোকের এলিসদের নিয়েই জীবন কাটানোর পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁর রুচিবিকার ছিল কিশোরী কুমারীদের প্রতি। রাসকিনের রোমান্স-বিলাস নারীর কৌমার্যে, বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি তাঁর নিদারুণ বিরাগ। বিবাহের পর স্ত্রীর রূপমাধুরী নিয়ে আনন্দময় জীবনের জয়গান করলেও ওয়াইলড রাসকিনপন্থী। লুই ক্যারল তাঁর বিকৃত রুচি নিয়ে উদ্ভট জীবন যাপন করেছেন, রাসকিন শেষ পর্যন্ত মানসিক বিকারের যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, আর ওয়াইলড অসম্মান আর দুর্নামের বোঝা মাথায় নিয়ে কারাদণ্ড ভোগ করে শেষ পর্যন্ত মানসিক সুস্থতা বজায় রেখেছিলেন।

অসকারের চারিত্রিক ত্রুটির জন্য তিনি স্বয়ং কতখানি অপরাধী তা আজ পর্যন্ত বিতর্কের বিষয় হয়ে আছে। মনস্তাত্ত্বিক বা মনোবিকলনবিদ সাইকিআট্রিস্টের মতে মানুষের মানসিক ও ভাবাবেগজনিত মনোভঙ্গী সম্পর্কে স্বাধীনতা আছে। প্রকৃতি মানুষের চরিত্র গঠন করে,

আর সেই প্রকৃতিই নির্ধারণ করে দেয় সমগ্র জীবনের রূপরেখা।

ওয়াইলড সর্বদাই মনে করেছেন যে জীবনের বিচিত্র পরিহাসে তাঁকে নিদারুণ শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে, সে অপরাধ তাঁর স্বকৃত, এ কথা তিনি বার বার বলেছেন। যে প্রেমের কোনও সংজ্ঞা নেই, নাম নেই সেই প্রেমের জয়গান করেছেন অসকার ওয়াইলড, কিন্তু সেই প্রেমই তাঁর জীবনে এক বিরাট বোঝা হয়ে পরিণামে বিচিত্র অভিশাপে পরিণত হয়েছে।

দুই

অসকার ওয়াইলডের পিতৃদেব চক্ষু-চিকিৎসক হিসাবে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন, এ ছাড়া প্রত্নতত্ত্ববিদ ও পুরাতত্ত্ব-গবেষক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। ডাবলিন শহরে তাঁর পূর্বপুরুষরা ইংলণ্ড থেকে এসে ঘর বেঁধেছিলেন। বার্নাড শ, সেরিডান প্রভৃতির মত অসকার ওয়াইলডের পরিবারবর্গ ইংরাজবংশোদ্ভূত। অসকারের প্রপিতামহ র‍্যালফ ওয়াইলড সপ্তদশ শতাব্দীতে সর্বপ্রথম ডাবলিনে এসেছিলেন। ধর্মবিশ্বাসে এঁরা প্রোটেস্টান্ট খ্রীষ্টান। ওয়াইলডের প্রপিতামহী, পিতামহী এবং জননী সকলেই আইরিশ বংশজাত। এই ডাবলিন শহরেই ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর তারিখে অসকার ওয়াইলড ভূমিষ্ঠ হন। তাঁর আর একটি ভাই ছিল দু বছরের বড়, নাম উইলিয়াম, আর পরে একটি বোন আইসোলা অতি অল্প বয়সেই মারা যায়। অন্য মতে ওয়াইলডের জন্ম হয় ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে।

এই পরিবারের সন্তানরা পোরটোরা রয়্যাল স্কুল এবং ট্রিনিটি কলেজে পড়াশোনা করেছেন। অসকারও বাল্য ও শৈশবে এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করেছেন এবং কৃতী ছাত্র হিসাবে স্বীকৃত হয়েছেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কুড়ি বছর বয়সে ম্যাগদালেন কলেজ, অক্সফোর্ড থেকে স্নাতক হয়ে বৃত্তিলাভ করেন। কবিতা রচনায় শ্রেষ্ঠ হয়ে নিউডিগেট প্রাইজ লাভ করেন।

অসকার ওয়াইলডের প্রথম জীবনীকার রবার্ট সেরার্ড অসকার চরিত্রে বংশানুক্রম কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে তা বিশদ ভাবে দেখিয়েছেন। এর ফলে উত্তরকালে তাঁর সকল জীবনীকারই সেই সূত্র ধরে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন, এবং অসকারের অপরাধের বোঝা তাঁর পূর্ব-পুরুষদের ওপর চাপিয়েছেন। তাঁর পিতামহীর পরিবারবর্গ আভিজাত্যে কুলীন হলেও 'Very unstable mentality'-র জন্য কুখ্যাত ছিলেন। অসকারের জননী ছিলেন উগ্রস্বভাবের এবং বাতিকগ্রস্ত, আর তাঁর পিতার চরিত্রের খ্যাতি ছিল না।

প্রাচীন যুগের বিখ্যাত লেখক চার্লস মাতুরিন ছিলেন অসকার-জননীর খুল্ল-পিতামহ। উদ্ভট এবং অবাস্তব কাহিনীকার হিসাবে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল। অসকার-জননী এবং স্বয়ং অসকার এই বাতিকগ্রস্তের দ্বারা পরোক্ষ-ভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছেন। এই মাতুরিনের "Melmoth the Wanderer" নামক কাহিনী পড়ে তরুণ বয়সে থ্যাকারে ভয়, আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠায় আকুল হয়েছিলেন। বালজাকও তাঁর রচনা পড়ে তাঁকে বায়রন, মলেয়ার প্রভৃতির সমশ্রেণীর বলেছিলেন, অবশ্য কালের বিচারে আজ তিনি বিস্মৃত। অসকার কিন্তু বালজাকের অভিমত মেনে নিয়েছিলেন, তাঁর আদর্শ লেখকদের মধ্যে বালজাক অন্যতম ছিলেন। বাল্যকালে তাঁর প্রস্তরমূর্তির দিকে গভীর বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতেন ওয়াইলড। ডাঃ ওয়াইলডের যখন বিবাহ হয় তখন তাঁর বয়স ছত্রিশ, স্ত্রীর বয়স পঁচিশ। ডাঃ ওয়াইলড ছিলেন খর্বকায়, স্ত্রী দীর্ঘাঙ্গী। স্ত্রীর আকৃতি সুন্দর, সুদৃঢ় ও সুগঠিত, তার পাশে ডাঃ ওয়াইলড নেহাত অকিঞ্চিৎকর—যেন হাতির গলায় ঘণ্টা। কিন্তু ভদ্রলোকের চরিত্রে আইরিশ বৈশিষ্ট্য ছিল—সীমাহীন লাম্পট্য ও কামুকতার জন্য আইরিশদের অখ্যাতি ছিল।

আকৃতি যাই হোক, ডাঃ ওয়াইলডের রমণীকুলে বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল, অসংখ্য প্রেমলীলার জন্য তাঁর দুর্নাম ছিল, কিন্তু চিকিৎসক হিসাবে ডাঃ ওয়াইলড বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। কুইন ভিক্টোরিয়ার চিকিৎসক হিসাবে তিনি তালিকাভুক্ত হয়েছিলেন, অবশ্য কখনও চিকিৎসা করেন নি। তা ছাড়া আইরিশ লোকগীতির সংগ্রাহক, প্রত্নতত্ত্ব-গবেষক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। মেকলে যখন ইতিহাস

রচনার উপকরণ সংগ্রহের জন্য আয়ার্লাণ্ডে গিয়েছিলেন, তখন ডাঃ ওয়াইলড তাঁকে বহু ঐতিহাসিক স্থান দেখিয়েছিলেন, প্রাচীন যুগের ধ্বংসাবশেষ ও ঐতিহাসিক নিদর্শন তাঁর নখদর্পণে ছিল।

জেন ফ্রানসেসকা সাধারণ প্রকৃতির মহিলা ছিলেন না। তিনি কল্পলোকের প্রাণী ছিলেন, সাধারণ মতামত তিনি গ্রাহ্য করতেন না। অতি-নাটকীয় পরিবেশে স্বরচিত স্বপ্নরাজ্যে তিনি বিচরণ করতেন। বাল্যকালে তিনি জোন অব আর্কের পদাঙ্ক অনুসরণে বিপ্লবী নায়িকার ভূমিকা গ্রহণ করে ফেনিয়ানদের স্যাকসন শৃঙ্খলমুক্ত হওয়ার জন্য প্রেরণা দান করেছিলেন। ছদ্মনামে কবিতা ও গদ্য রচনায় বিশেষ শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি। Jacta Alea Est নামক একটি রচনা 'Speranza' এই ছদ্মনামে তিনি ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই তারিখের 'Nation' নামক পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তৎক্ষণাৎ সেই পত্রিকা নিষিদ্ধ হয় এবং ভাইসরয় রাজদ্রোহের দায়ে সম্পাদককে অভিযুক্ত করেন। তিনি লিখেছিলেন—"One instant to take breath, and then a rising ; a rush, a charge from north, south, east and west upon the English garrison, and *the land is ours.*"

পত্রিকা-সম্পাদক গেভান ডাফির রাজদ্রোহের অভিযোগে বিচার হল। বিচারকালে যখন অ্যাটর্নি জেনারেল প্রবন্ধগুলির অংশবিশেষ পড়ে ডাফির অপরাধ বর্ণনা করছিলেন তখন জেন শ্রোতাদের আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—এই রচনা আমার, এর জন্য শাস্তি যদি পেতে হয়, সেই শাস্তি আমার প্রাপ্য।

আদালত তাঁকে থামিয়ে দিলেন, আদালতের সম্ভ্রমহানি হচ্ছে। কিন্তু এই স্বীকারোক্তির ফলে জুরিরা একমত হতে পারেন নি। এর পর ইয়ং আয়ার্লাণ্ড মুভমেণ্টের নেতৃবৃন্দ 'ভ্যান ডিমেন'স ল্যাণ্ড' (এ দেশের আন্দামান) নামক বন্দীশালায় প্রেরিত হলেন। ফেনিয়ান এবং সিনফিনের চেষ্টায় আয়ার্লাণ্ড অবশেষে স্বাধীন রিপাব্লিকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ডাঃ ওয়াইলডের এই বিপ্লব প্রচেষ্টায় গোপন সমর্থন ছিল। মিচেল এবং তাঁর দলবলের কারাদণ্ডের তিন বছর পরে তিনি বিপ্লবী নায়িকা জেনকে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বিবাহ করেন।

এই জোন অব আর্কের গর্ভে অসকারের জন্ম। জননীর বাসনা ছিল কন্যাসন্তানের, তাই পুত্র অসকারকে তিনি মেয়েদের পোশাক পরিয়ে সাজিয়ে রাখতেন। জনৈক বান্ধবীকে তিনি লিখেছিলেন—"A Joan of Arc was never meant for marriage, so here I am, bound heart and soul to the home hearth. Behold me, Speranza, rocking a cradle at this present writing in which lies my second son—a babe of one month old the 16th of this month, November, and as large and fine and healthy as if he were three months. He is to be called Oscar Fingal Wilde. Is not that grand, misty and Ossianic ?" ওঁদের বাড়িতে প্রতিদিন বৈঠক বসত। ডাঃ ওয়াইলডের বাউণ্ডুলের দল মদ্যপান আর নৈশভোজের হুল্লোড়ে মত্ত আর এদিকে তাঁর স্ত্রী ছিলেন সমসাময়িক লেখকদের সাহিত্যিক প্রেরণা। তাঁর প্রদত্ত ভোজসভায় সাহিত্যিক শিল্পী প্রভৃতি প্রতিভাধরদের ভিড় জমত। এই প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি-সম্পন্ন জনকজননীর সন্তান অসকার স্বাভাবিক কারণেই অতি অল্প বয়সে আপনাকে অপরের চেয়ে স্বতন্ত্র মনে করতে শুরু করলেন। আট বছর বয়সেই তিনি "learnt the ways to shores of old romance and had seen apples plucked from the tree of knowledge"। অসকারের যখন দশ বছর বয়স তখনই ডাক্তার ওয়াইলড নাইটত্ব লাভ করেন। সুইডেনের সম্রাটের কাছে "অর্ডার অব দি পোলার স্টার" সম্মান লাভ করলেন। রয়্যাল আইরিশ অ্যাকাডেমী সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর গবেষণা ও দানের স্বীকৃতিতে 'কানিংহ্যাম মেডাল' দান করলেন। সুতরাং "অসকার ফিংগেল ও ফ্লাহার্টি উইলস্ ওয়াইলড", সাধারণের চাইতে স্বতন্ত্র,

নিজের নামটিকে সংক্ষিপ্ত করে করলেন শুধু অসকার ওয়াইলড।

ডাবলিন তাই অসকার ওয়াইলডকে স্বদেশপ্রেমিক কবি হিসাবে পায় নি। আইরিশ স্বাধীনতা-সংগ্রাম অব্যাহত গতিতে চলেছে। এদিকে ইংলণ্ডে আইরিশদের ওপর প্রচণ্ড বিরূপতা, সেখানে নাটকে পরিহাসের চরিত্র আইরিশম্যান। ইংরেজরা বাড়ির চাকর পর্যন্ত আইরিশ-ম্যান রাখতে চান না বলে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেন। আইরিশ আত্মীয়-আত্মীয়াকে লণ্ডনে উপেক্ষা করা হত। তাই স্কুল কলেজ ছেড়ে অসকার ওয়াইলড বিশ্বপ্রেমিক হিসাবে লণ্ডনের সমাজজীবনে প্রবেশ করলেন, সেখানেই তাঁর আইরিশ জীবনের সমাপ্তি।

এই কালেই ডাঃ ওয়াইলডের জীবনে এক প্রচণ্ড বিপর্যয় ঘটল। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ডাবলিনের বিচারশালায় ডাঃ ওয়াইলডের নামে যে কুখ্যাত মামলা শুরু হয়েছিল ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে অসকার ওয়াইলডের মামলা যেন তারই পরিশিষ্ট।

মেরী ট্রাভার্স ট্রিনিটি কলেজের এক অধ্যাপকের মেয়ে। চিকিৎসা উপলক্ষে ডাঃ ওয়াইলডের সঙ্গে তাঁর রোগিণী মেরীর ঘনিষ্ঠতা হয় এবং সেই ঘনিষ্ঠতা পরে শারীরিক অন্তরঙ্গতায় পরিণত হয়। বহু অর্থ ও সময় তার পিছনে ব্যয় করেছেন ডাঃ ওয়াইলড। ডাক্তারের স্ত্রী জেন ঘটনাটি জানতে পেরেছিলেন, তবে স্বামীর চরিত্র তাঁর অজ্ঞাত ছিল না, তাই ব্যাপারটিকে তেমন গুরুত্ব দেন নি। মেরী যদিও জানত ডাক্তার একনিষ্ঠ প্রেমিকগোষ্ঠীর মানুষ নয়, তবু সে ডাক্তারকে একান্তভাবে পাওয়ার চেষ্টায় ছিল। ডাক্তার যথাকালে তার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করতে লাগলেন। বাড়ির একজন হওয়ার চেষ্টায় বেশী মেলামেশা করতে গিয়ে মেরী একদিন যখন শয়নকক্ষে উপস্থিত হল, তখন জেন তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন। মেরী কিন্তু এত সহজে ছাড়ার পাত্রী নয়। ডাক্তার তাকে পোশাক অলঙ্কার অর্থ ইত্যাদি দিয়ে ভোলানোর চেষ্টা করলেন। উপহারগুলি গ্রহণ করল মেরী প্রেমের পুরস্কার হিসাবে। তারপর ডাক্তার মেরীকে অষ্ট্রেলিয়ায় তার ভাইয়ের কাছে পাঠানোর জন্য ব্যবস্থা করলেন, এমন কি যাওয়ার ভাড়া পর্যন্ত দিলেন। সেই টাকা নিয়ে মেরী লিভারপুল ঘুরে ফিরে এল। আবার একবার টাকা নিয়ে আবার লিভারপুল ঘুরে ফিরে এল মেরী। এতদিনে সে বুঝল ডাঃ ওয়াইলডের প্রয়োজন শেষ হয়েছে। আগ্রহ ও আন্তরিকতার অবসান ঘটেছে। তার ওপর ডাক্তার-গৃহিণীর এই অপমান আর উপেক্ষা মেরীকে উত্তেজিত করে তুলল। সে কিছু পুস্তিকা ছাপিয়ে সর্বত্র বিতরণ করল—বিশেষতঃ ডাক্তারের বন্ধু, আত্মীয় এবং রোগীমহলে। মেরিয়ন স্কোয়ারের বাড়িতে লেডী ওয়াইলডের কাছেও পাঠানো হল।

মেরীর পুস্তিকা-বর্ণিত "Dr. Quilp" তাঁর রোগিণীকে প্রথম ক্লোরোফর্ম করে পরে তার ওপর দৈহিক সংসর্গ করেছেন, এই সব কথা বেশ রসালো করে লেখা ছিল। কেলেঙ্কারির চানাচুর সকলেই মুখরোচক মনে করে, তাই সর্বত্র এই ঘটনা ছড়িয়ে পড়ল। Dr. Quilp-ই যে ডাঃ ওয়াইলড সে আর কারও বুঝতে বাকী রইল না।

লেডী ওয়াইলড ছেলেমেয়েদের নিয়ে ব্রের সমুদ্র-উপকূলে বেড়াতে গিয়েছেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এসে ওই পুস্তিকা বিক্রি করতে চাইত। অবশেষে ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি ডাঃ ট্রাভার্সকে একখানি চিঠি লিখলেন—

'আপনার কন্যার অভব্য আচরণের কথা আপনার হয়তো জানা নেই, সে এই সমুদ্রতীরে নিম্নশ্রেণীর খবরের কাগজ বিক্রিওয়ালাদের সঙ্গে মিশে আমার নামে কুৎসা প্রচার করে, এমন কি তার রচিত পুস্তিকাতে তার সঙ্গে ডাঃ ওয়াইলডের অবৈধ সংসর্গের ইঙ্গিতও দিয়েছে। সে যদি তার নাম কলঙ্কিত করতে চায় আমার কিছুই বলবার নেই, কিন্তু তার উদ্দেশ্য আমাকে অপমান করা এবং কিছু অর্থ লাভ। স্যর্ উইলিয়াম ওয়াইল্ডের কাছে সে ভীতিপ্রদর্শন করে অনেক চিঠি লিখেছে। আপনাকে জানানো প্রয়োজন বোধ করি, কোনও ভীতিপ্রদর্শন বা অতিরিক্ত অপমান প্রচেষ্টার ফলে আর টাকা পাওয়া যাবে না। যে কলঙ্কের মূল্য সে চায়, তা সে কখনই পাবে না।

জেন. এফ. ওয়াইলড।'

এই চিঠিখানি কয়েক দিন পরে আকস্মিক ভাবে মেরীর হাতে পড়ে। ডাঃ ওয়াইলড কিছুই জানতেন না, তিনি তখন ডাবলিনে। জানলে কিছুতেই চিঠি পাঠাতেন না। তিনি ফিরে আসার পরও তাঁকে ঘটনাটি জানানো হয় নি, লেডী ওয়াইলড মনে করেছিলেন সমগ্র ঘটনার ওপর যবনিকা পতন হয়েছে।

এই চিঠিটা ভিত্তি করে মিস মেরী ট্রাভার্স এক মানহানির মামলা আনলেন। মানহানি বাবদ ২০০০ পাউণ্ড ক্ষতিপূরণের দাবি করলেন লেডি ওয়াইলডের কাছ থেকে, ডাঃ ওয়াইলডকেও এই অপরাধে সংযুক্ত করা হল সহযোগী প্রতিবাদী হিসাবে। মামলা শুরু হল।

জুরিদের কাছে বলা হল ক্লোরোফর্ম করা অচৈতন্য অবস্থায় ডাঃ ওয়াইলড তার সঙ্গে অবৈধ সংসর্গ করেছেন। অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়েছেন।

লেডী ওয়াইলডের পক্ষে উকীল মেরীকে প্রশ্ন করলেন—এই ঘটনার কথা কাউকে জানিয়েছিলে ?

মিস ট্রাভার্স। না।

তোমার বাবাকে ?

না।

কেন জানাও নি ?

তাঁকে কষ্ট দিতে চাই নি।

কিন্তু এই ভীষণ ব্যাপারের পরও তুমি ডাঃ ওয়াইলডের কাছে গিয়েছিলে ?

হ্যাঁ।

বার বার গিয়েছিলে, না যাও নি ?

হ্যাঁ।

আর কোনদিন এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে ?

হ্যাঁ।

দ্বিতীয় অপরাধের পর আবার গিয়েছিলে ?

হ্যাঁ।

আবার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে ?

হ্যাঁ।

তবু আবার গিয়েছ ?

হ্যাঁ।

যে ব্যক্তি তোমার এই সর্বনাশ করেছে তার কাছ থেকে টাকা নিয়েছ ?

হ্যাঁ।

ক্লোরোফর্ম সম্পর্কে মিস ট্রাভার্স বিশেষ কিছু বলতে পারে নি। ক্লোরোফর্ম কি রকম দেখতে তাই জানা নেই। তার গন্ধও জানা নেই, এবং শপথ করে বলতে পারে না ক্লোরোফর্ম ব্যবহার করা হয়েছে কি না। ক্লোরোফর্ম কথাটি বলার উদ্দেশ্য যে তার সংজ্ঞা ছিল না। লেডী ওয়াইলড বেশী মাত্রায় প্রতিবাদ করায় এবং তাঁর স্বামীর চরিত্রে তাঁর সন্দেহ নেই—এই কথা বলায় জুরিরা বিরক্ত হলেন। তাঁরা প্রশ্ন করলেন—

মেরী কি আপনাকে চিঠি লিখেছিল যে ডাঃ ওয়াইলড তার ওপর অসঙ্গত ব্যবহার করেছেন ?

হ্যাঁ, আমি তার জবাব দিই নি, কোনও আগ্রহ প্রকাশ করি নি।

এই কথায় আদালত বিস্মিত হল। সার্ উইলিয়াম জুরিদের সামনে দাঁড়াতে রাজী হলেন না। মেয়েটিও মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। জুরিরা বিচারে মিস ট্রাভার্সের ক্ষতিপূরণ বাবদ মাত্র এক ফার্দিং নির্ধারিত করলেন। অর্থাৎ দুপক্ষকেই শাস্তি দেওয়া হল।

কিন্তু সার্ উইলিয়ামের খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা সমস্ত নষ্ট হল। লেডী ওয়াইলড আর তাঁর পুরনো গরিমায় ফিরতে পারলেন না। তাঁর শরীর খারাপ হয়ে পড়ল। সকলে বলল, এর জন্য কলঙ্কই দায়ী। কেউ বলল, পাপের ফল। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন মারা গেলেন তখন অসকার ওয়াইলড অক্সফোর্ডের আণ্ডারগ্রাজুয়েট।

ডাঃ ওয়াইলড অনেক দিন রোগশয্যায় ছিলেন। এই দীর্ঘকাল ধরে মেরিয়ান স্কোয়ার ভবনে প্রতিদিন প্রাতে একজন অবগুণ্ঠনবতী মহিলা এসে রোগশয্যায় উপস্থিত থাকতেন। কেউ তাঁকে বাধা দিত না, লেডী ওয়াইলড তো নয়ই। তিনি সোজা ওপরে উঠে গিয়ে রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসতেন, একবারও মুখের আবরণ খুলতেন না। অসকার বলেছেন, ‘পৃথিবীর কোনও রমণীই হয়তো এই

দৃশ্য দিনের পর দিন সহ্য করত না কিন্তু আমার জননী তা করেছেন, কারণ তাঁর মনে ঈর্ষা ছিল না, তিনি আমার পিতৃদেবকে সত্যই ভালবাসতেন।' লেডী ওয়াইলড এই মৃত্যুপথযাত্রীর মনে শান্তি ও সান্ত্বনার প্রয়োজন বুঝেছিলেন, তাই তিনি মহিলাটির এই নিয়মিত উপস্থিতিতে বিরক্ত হন নি, আর সার্ ওয়াইলড স্ত্রীর করুণা ও মমতায় কৃতজ্ঞচিত্তে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

তিন

সর্বোত্তম ক্লাসিক্যাল স্কলার হিসাবে স্কুলের শেষ পরীক্ষায় অসকার পোরটোরা গোল্ড মেডেল পেলেন, প্রশ্নোত্তরের সময় তাঁর উত্তরে সবাই মুগ্ধ হলেন। স্বর্ণ অক্ষরে তাঁর নাম বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ফলকে আঁটা হল, অনেক বছর পরে অবশ্য এই নাম মুছে দেওয়ার আদেশ হয় তাঁর শেষ জীবনের দুর্নামের ফলে। প্রকৃতি অবশ্য এই অসম্মানের হাত থেকে অসকারকে নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন, স্কুল-বাড়ির প্রাচীরে দারুণ ফাটল হওয়ায় সেই ফলক আপনা থেকেই ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল।

ট্রিনিটি কলেজ, ডাবলিনে অসকার ক্লাসিকসে বিশেষ সাফল্যলাভ করলেন, প্রথম দিনের পরীক্ষায় (ব্যাকরণ ও প্রাথমিক তত্ত্ব) মাঝামাঝি, আর দ্বিতীয় উচ্চতর ক্লাসিকসে তিনি সবাইকে ছাড়িয়ে গেলেন। অসকারের এই বৈশিষ্ট্য, অঙ্কে কাঁচা, ব্যাকরণে মাঝামাঝি কিন্তু অন্য বিচারে তিনি সর্বোত্তম। ট্রিনিটিতে এক বছর পড়ার মধ্যেই অসকার এমন একটি বৃত্তিলাভ করলেন যা তাঁর সমগ্র কলেজ-জীবনের পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু তিনি অক্সফোর্ডে ছুটলেন ভাগ্যপরীক্ষার উদ্দেশ্যে। এই ট্রিনিটিতে তাঁর সহপাঠী ছিলেন এডওয়ার্ড কার্সন, কলেজের পড়াশোনায় অসকার তাঁকে পরাজিত করলেও উত্তরকালে বিচারশালায় কার্সনই এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে এই অনন্যসাধারণ প্রতিভার সর্বনাশ করেছেন।

অসকার বার্কলে গোল্ড মেডেল আর তাঁর অধ্যাপক মাহাফির প্রসন্ন আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে ট্রিনিটি থেকে অক্সফোর্ডে এলেন। রেভারেণ্ড জন পেটল্যাণ্ড মাহাফি ট্রিনিটির জুনিয়র ডীন। সেইকালে তাঁর মত হেলেনীয় পণ্ডিত আর কেউ ছিল না। চার্চ অব ইংলণ্ডের যাজকত্বে অভিষিক্ত হলেও তাঁর স্বর্গপুরী গ্রীসে। নিজের নামের আগে 'রেভারেণ্ড' উপাধি তিনি বর্জন করেছিলেন। ওয়াইলডের মনে তিনি গ্রাস আর রোম নিয়ে এক অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছিলেন। ট্রিনিটিতে উভয়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং উত্তরকালে মাহাফির গ্রীক সমাজ-জীবন সংক্রান্ত গ্রন্থটি ছাত্র অসকার ওয়াইলড পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করেন। স্কুলের মত ট্রিনিটিতেও অসকার নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতেন, খেলাধূলায় যোগ দিতেন না, শুধু সহমর্মিতার দিক থেকে পেয়েছিলেন মাহাফির মূল্যবান সংসর্গ।

স্কুলে পড়ার সময় ছোট বোন আইসোলার মৃত্যু হয়। অসকারের জীবনে এই প্রথম শোক। সে সময় তাঁর বয়স মাত্র বারো বছর। বালক অসকারের মনে এই শোক এত নিদারুণ হয়ে বেজেছিল যে তা ভুলতে অনেক সময় লেগেছিল। যে মেয়েটি তাঁর কাছে "a little ray of sunshine dancing about our home" বলে মনে হয়েছিল তার সমাধিতে তিনি নিয়মিত উপস্থিত হয়ে শোক নিবেদন করতেন। কবিতা লেখার গোড়ার যুগে অসকার এই ছোট্ট বোনটির উদ্দেশে সুন্দর একটি কবিতা লিখেছিলেন।

অক্সফোর্ড—অসকার ওয়াইলডের জীবনের এক স্মরণীয় কাল। স্বপ্নের অক্সফোর্ড—মাধুরী যেন আকাশ ছাপিয়ে ঝরছে। অসকার বলেছেন, 'বাবা আমাকে অক্সফোর্ডে পাঠিয়ে আমার জীবনের গতি ফিরিয়ে দিয়েছেন।' ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াইলড অক্সফোর্ডে উপস্থিত হলেন। বছরে পঁচানব্বই পাউণ্ডের একটা বৃত্তি পেলেন অসকার—ম্যাগদালেন ডেমিশিপ। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মডারেশনে তিনি ফার্স্টক্লাস পেলেন আর ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে অনার্স ফাইনাল পরীক্ষায় ফার্স্ট হলেন। কলেজের সর্বোৎকৃষ্ট ঘরটি অসকারকে দেওয়া হল, সেই ঘর তিনি নীল চীনামাটির

পাত্র আর নগ্ন ছবি দিয়ে সাজালেন। মাঝে মাঝে সেই ঘরে কবিতা পাঠের মজলিস বসত।

এরই চার বছর আগে চারুকলার স্লেড প্রফেসার হিসাবে জন রাসকিন অক্সফোর্ডে এসেছিলেন অধ্যাপনা করতে। সেই কালে রাসকিন প্রতিষ্ঠার সর্বোচ্চ শিখরে। রাসকিনের বক্তৃতা শোনার জন্য এত ভিড় হল যে ম্যুজিয়মে জায়গা হল না, সকলে রাসকিনকে নিয়ে সেলডোনিয়ানের প্রশস্ত কক্ষে গিয়ে বক্তৃতা শুনতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বক্তৃতা শোনার ব্যাপারে এত উৎসাহ ও আগ্রহ দেখা যায় না। রাসকিনের বক্তৃতা নাকি অতীব উপভোগ্য এবং অবিস্মরণীয়। আপনাকে জাহির করার বিশেষ কৃতিত্ব ছিল রাসকিনের। অসকার যখন প্রথমবার অক্সফোর্ডে গেলেন সেই ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রাসকিন সপ্তাহে দুদিন বক্তৃতা দিতেন—"Aesthetic and Mathematic Schools of Florence"। রাসকিনের হালচাল জাঁকজমক ভারী মনে লাগল অসকারের, এই জাহির করার ভাবটুকু তিনি রাসকিনের কাছেই পেয়েছিলেন। রাসকিনের চরিত্রের যে যৌন-বিকার পরে প্রচারিত হয় তা হয়তো অসকারও জানতেন। রাসকিন ডীন লিডেলের বাড়িতে তাঁর ছোট্ট মেয়ে এলিসের কাছে নিয়মিত যেতেন। ভিক্টোরীয় যুগের তিনজন যৌনবিকারগ্রস্ত প্রতিভাধর মানুষ একই কালে অক্সফোর্ডে কাটিয়েছেন এও এক বিচিত্র ঘটনা, সেই তিনজনের নাম—জন রাসকিন, লুই ক্যারল আর অসকার ওয়াইলড।

রাসকিনের উপদেশ অনুসারে অক্সফোর্ডের ছেলেরা উঁচু টিলা কেটে পথ বানিয়ে দিলেন। পথ অবশ্য তেমন ভাল হয় নি, কিন্তু এর প্রচার হয়েছিল প্রচণ্ড। অসকার সেই মাটি কাটার দলে ভিড়েছিলেন এবং রাসকিনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের সুযোগ পান। কাজের ফাঁকে ফাঁকে রাসকিনের সঙ্গে নন্দনতত্ত্বের আলোচনা চলত।

অক্সফোর্ডে অসকারের সঙ্গে আলাপ হল ডেভিড হাণ্টার ব্লেয়ারের, স্কটল্যাণ্ডের এক ব্যারন বংশের উত্তরাধিকারী। এই ছেলেটি কিন্তু অর্থ এবং সামাজিক মর্যাদা ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করল, বেনেডিকটিন মঙ্ক এবং অ্যাবট হিসাবে অধ্যাত্মজীবনের আকর্ষণ তাঁর প্রবল হল। এই বন্ধুটির সঙ্গে প্রোটেস্টাণ্ট অসকার ওয়াইলড বিভিন্ন ক্যাথলিক সমাবেশে হাজির হতেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রাসকিনের পদাঙ্কানুসরণে মিলান, পাদুয়া, ভেনিস ও ভেরোনায় তীর্থ করে অসকার আরও গভীর ভাবে ক্যাথলিক ভাবধারায় আকৃষ্ট হন। ইতালীতে কবি অসকার ওয়াইলডের সিদ্ধিলাভ ঘটেছে এ কথা বলা যায়। ইতালী সম্পর্কে তাই বিখ্যাত সনেটে ওয়াইলড বলেছেন—

"I reached the Alps : the soul within me burned

Italia, my Italia, at thy name—"

'ডাবলিন যুনিভার্সিটি ম্যাগাজিনে' কবি অসকার ওয়াইলডের সর্বপ্রথম কবি হিসাবে আত্মপ্রকাশ, "Chorus of Cloud Maidens" নামক সনেটটি সেই পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (১৮৭৫)। এর পর অক্সফোর্ডে থাকাকালেই তাঁর অধিকাংশ কবিতা লিখিত, উত্তরকালে কারাগারে বসে শুধু "Ballad of Reading Gaol" রচিত হয়। পরে তিনি শুধুমাত্র গদ্যলেখক হিসাবেই আত্মনিয়োগ করলেন।

ক্লাসিক পাঠের প্রভাবেই হোক, কিংবা বন্ধু ডেভিড হাণ্টার ব্লেয়ারের আধ্যাত্মিক সাহচর্যে অসকার ওয়াইলড ধর্মীয় ভাবাবেগে আপ্লুত হলেন। ধর্ম পালনের চাইতে ধর্মতত্ত্বানুসরণেই তাঁর আগ্রহ অধিক।

হাণ্টারের ক্যাথলিক ধর্মানুরাগ অসকারের মনে বিশেষ চেতনা সৃষ্টি করে, তাঁর কাছে ওয়াইলড নিজস্ব ধর্মীয় ধারণা, তাঁর ক্যাথলিজম-প্রীতি ও সেই কারণে পিতা ও পরিজনবর্গের প্রদত্ত বাধার কথাও জানালেন। হাণ্টার ব্লেয়ারের সহযোগিতায় বিভিন্ন রোমান ক্যাথলিক অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দিতেন, সেণ্ট এলয়সিয়ুসে ম্যানিং-এর উপাসনা শুনতে যেতেন। ওয়াইলড ভীষণ ভাবে এই ধর্মীয় ভাবাবেগে জড়িয়ে পড়লেন। তাঁর ঘরে ধর্মসম্পর্কীয় চিত্রাবলী সাজানো হল, এমন কি ম্যানিং-এর ছবিও সেই সঙ্গে টাঙানো

ল। বন্ধুজনেরা তাঁকে "Your Eminence" বলে দ্রূপ করতে শুরু করলেন। একজন যাজককে ওয়াইলড ার মনের কথা জানালেন। ধর্মযাজক তাঁকে উপদেশ লেন ক্যাথলিক মতে দীক্ষা নিতে, আর বললেন, তিমধ্যে তুমি কঠোর প্রার্থনা কর আর কম কথা বল।'

আর একজন যাজক বললেন, ঈশ্বরের কল্যাণস্পর্শ খনও অসকারের শিরে বর্ষিত হয় নি। এই সময় ান্টার ব্লেয়ার রোমের তীর্থক্ষেত্রে কাটাবেন স্থির রলেন। অসকারকে তিনি এই তীর্থযাত্রায় যোগ দওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। অসকারের হাতে তখন তমন অর্থ নেই। হান্টার ব্লেয়ার সব শুনে বললেন, আমি স্টারের ছুটিতে রোম যাচ্ছি, ইতালীর পথে আমি মনটনে আমার আত্মীয়ের বাড়ি থাকব, সেই সময় নটিকারলোয় তোমার জন্য দু-এক পাউণ্ড বাজি ধরব, যদি তামার রোমযাত্রা ঈশ্বরের অভিপ্রেত হয়, তা হলে এই াজি আমি জিতবই।

ভক্তের বোঝা ভগবান বয়, সেই দু পাউণ্ড ষাট াউণ্ড হয়ে গেল। ফলে ওয়াইলড জেনোয়ায় ওদের সঙ্গে ম্মিলিত হয়ে একত্রে রোম যাত্রা করলেন। রোমের তিহাস, তার প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন, অতীতের গৌরব অসকার ওয়াইলডকে বেশী আকৃষ্ট করল, ক্যাথলিক তিষ্ঠান হিসাবে বয়সের যে গৌরব সে হয়তো তাঁকে তমন স্পর্শ করে নি।

হান্টার ব্লেয়ার পোপের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের এক যবস্থা করলেন। ধর্মগুরু পোপ অসকারের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন—আশাকরি, ঈশ্বরের পবিত্রধামে তুমি তোমার সহযাত্রীর অনুগমন করতে পারবে।

অসকার সেদিন নিঃশব্দে সেই আশীর্বাদ মাথায় পেতে নিয়েছিলেন। হান্টার বলেছিলেন, 'দীর্ঘপথ আমরা নীরবে ফিরে এলাম। সারাপথ কেউ কোনও কথা বলি নি আর সেদিনের সেই আশীর্বাদ আমার মনে হয় অসকার অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত স্মরণ রেখেছিল।'

কীটসের সমাধিপার্শ্বে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের উদ্দেশে প্রোটেস্টান্ট চার্চের সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে অসকার ওয়াইলড নীরবে নতজানু হয়ে বসে রইলেন। তিনি লিখেছেন, সেই দেবশিশুর অতি-সাধারণ সমাধিপার্শ্বে বসে আমার মনে হল যে এই সৌন্দর্যের পূজারীকে তার কালপূর্ণ হওয়ার আগেই হত্যা করা হয়েছে; জেনোয়াতে গাইদো অঙ্কিত সাঁ সেবাস্তিয়ান ছবি দেখেছিলাম, সেই ছবি আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। শত্রুরা গাছের সঙ্গে বেঁধে এক দেবশিশুকে নিপীড়ন করছে, তার মাথায় শুকনো সোনালী চুল, ঠোঁট দুটি লাল, গায়ের রঙ বাদামী।

শহীদ সেবাস্তিয়ান অসকারের মনে এক অপূর্ব প্রেরণা এনেছে। কীটসের সম্পর্কে অসকার তাই লিখেছিলেন—

"Taken from life when life and love
were new,
The youngest of the martyrs here is lain
Fair as Sebastian and as early slain."

রোমের আকাশবাতাস যখন অসকারের মনকে আচ্ছন্ন করে তুলেছে তখন হঠাৎ মাহাফির চিঠি এল—"Come away with me to Greece and I will make an honest pagan of you."

তৎক্ষণাৎ গ্রীসে ছুটলেন অসকার। মাহাফির মতে—'সব সংস্কৃতির শেষ গ্রীসে, সব গ্রীসের পরিপূর্তি এথেন্সে, এথেন্সের চরম একরোপোলিস আর একরোপোলিসের শেষ কথা প্যানথিওন।' অসকার অবশেষে পশ্চিম আকাশ যখন জলছে, সমুদ্রের ওপর দিয়ে অভিযান লাল সূর্যের, সেই পরম মুহূর্তে গ্রীসে পৌছলেন। "I stood upon the soil of Greece at last."

রোমের প্রভাব গ্রীসে কেটে গেল। পরে অক্সফোর্ডে যখন হান্টার ব্লেয়ারের সঙ্গে দেখা হল তিনি দেখলেন অসকার সম্পূর্ণ পরিবর্তিত, তিনি 'Hellenized' এবং 'Paganised'। ভাবাবেগাকুল অসকার সর্বদাই শেষতম প্রভাবশালী ব্যক্তির প্রভাবেই আত্মহারা হয়েছেন।

*　　*　　*

অসকার বলতেন, "The only writers who have influenced me are Keats, Flaubert and Walter Pater and before I came across them I had already gone halfway to meet them."

সেই অক্সফোর্ডের কালে ওয়ালটার পেটার হলেন আর একজন ব্যক্তি—যাঁর প্রভাব অসকারের জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে। ওয়ালটার পেটার 'art for arts sake' নীতির একজন বলিষ্ঠ প্রচারক। তা ছাড়া তাঁর মত ছিল 'live dangerously', যা কিছু সুযোগ সামনে আসবে গ্রহণ কর। পেটারের আকৃতিতে কিঞ্চিৎ সৌন্দর্য-স্পর্শ দেওয়ার জন্য অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হয় তিনি গোঁফ রাখলে তবে মানাবে। তিনি তাই করেছিলেন। থাকতেন অতি সাধারণভাবে, কায়ক্লেশে, আর নিজের শারীরিক কুশ্রীতার জন্য দুঃখ করতেন।

এই ওয়ালটার পেটার একদিন অসকারকে বললেন, 'দিনরাত কেবল কবিতা লেখ কেন হে? গদ্য লেখ না কেন? গদ্য লেখা অনেক কঠিন।'

'Renaissance' পড়ার আগে ওয়ালটার পেটারের বক্তব্যটুকু ঠিক বুঝতে পারেন নি অসকার। পনেরো বছর পর অসকার লিখেছিলেন—"Carlyle's stormy rhetoric, Ruskin's winged and passionate eloquence, had seemed to me to spring from enthusiasm rather than from art. I do not think I knew then that even prophets correct their proofs— But Mr. Pater's essays became to me 'the golden book of spirit and sense, the holy writ of beauty.' They are still this to me."

অসকার বলেছেন হয়তো আমি বাড়িয়ে বলছি, কিন্তু অত্যুক্তি যেখানে নেই, সেখানে প্রেমও নেই, আর যেখানে প্রেম নেই সেখানে পারস্পরিক বোঝাপড়া নেই।

চার্লস ল্যাম্ব সম্পর্কে ওয়ালটার পেটার লিখিত একটি প্রবন্ধের বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এই ব্যাপারে পেটার অতিশয় ক্ষুণ্ণ হন। পেটার চরিত্রের এই ভীরুতা ও উৎকণ্ঠা অসকারের ভাল লাগত না, কারণ আকৃতি ও প্রকৃতিতে তিনি ছিলেন বলিষ্ঠ। তাই এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে অসকার বলেছিলেন—'দেখ একবার কাণ্ড! যে মানুষ পেটার হতে পারে কি করে সে এই ধরনের তৃতীয় শ্রেণীর পত্রিকার ইতর উক্তিতে কাতর হয় তা বুঝি না।'

লণ্ডন ইনষ্টিট্যুশনে ওয়ালটার পেটার প্রস্‌পার মেরিমে সম্পর্কে বক্তৃতা দিলেন। কণ্ঠস্বর ক্ষীণ এবং বিরক্তিকর। যেন আপন মনে কথা বলছেন। সভাশেষে বন্ধুদের প্রশ্ন করলেন—"I hope you all heard me?"

অসকার ওয়াইলড তৎক্ষণাৎ বললেন, "we over heard you."

পেটার অবশ্য সেদিন হেসে বলেছিলেন, তোমার সব কথারই জবাব তৈরি হয়ে থাকে দেখছি।

কিন্তু অসকারকে পেটার ভালবাসতে পারেন নি। অসকারের রচনার প্রশংসা করতে পারেন নি, এমন কি উত্তরকালে তাঁর সম্পর্কে অতি কদর্য উক্তিও করেছেন।

অসকার এই সব শুনে বলেছিলেন, "Yes, poor dear Pater has lived to disprove everything that he had written." লেখা এক জিনিস আর ক্ষেত্রে কর্মে তার রূপান্তরকরণ অন্য কথা।

অক্সফোর্ডের কাল শেষ হয়ে এল। ভাল ছাত্রের সুনাম অক্ষুণ্ণ রইল। তা ছাড়া কবিতা রচনায় Newdigate Prize লাভ করলেন। বিচারকমণ্ডলী নির্বাচিত কবিতার বিষয় ছিল সীজারের ভূমি, দান্তের সমাধিস্থান 'Ravenna'। সৌভাগ্যক্রমে ইতালী ভ্রমণ কালে 'র‍্যাভেনা'য় তরুণ কবি অসকার ব্যক্তিগত স্পর্শে কবিতাটিকে জীবন্ত করলেন। এই কবিতার গুণাগুণ নিয়ে মতভেদ আছে—কেউ বলেন অপূর্ব, চমৎকার উল্লেখনীয় লাইন কবিতাটির সর্বত্র, কেউ বলেন 'rhyme dictionary of mythology'। কবিতা যাই হোক কবি তাঁর কবিতা সেদিন যেভাবে আবৃত্তি করেছিলেন তা নাকি তার আগে কেউ শোনেন নি। সেলডোনিয়া

থিয়েটারের ইতিহাসে (অক্সফোর্ড) এ এক অপূর্ব স্মরণীয় ঘটনা।

অক্সফোর্ডের অঙ্কের যবনিকা পতনের সঙ্গে অসকারের জীবনের আর একটি অঙ্কের সূত্রপাত। হাণ্টার ব্লেয়ার বলেছেন অক্সফোর্ডে সব কিছু আলোচনাচক্রে নেতৃত্ব ছিল অসকারের। মন্তব্য, সূক্ষ্ম উক্তি, সুতীব্র শ্লেষবাক্য, উদ্ভট ধারণা এবং সরস আলোচনায় তিনি ছিলেন দলের মধ্যমণি। এমনই এক আলোচনা সভায় সকলে চলে যাওয়ার পর দু-একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুজনের কাছে অসকার জীবনের অভীপ্সা সম্পর্কে বলেছিলেন—

"God knows! I won't be a dried up Oxford don, anyhow.—I'll be a poet, a writer, a dramatist. Somehow or other I'll be famous, and if not famous I'll be notorious. Or perhaps—I'll rest and do nothing—These things are on the knees of the Gods. What will be, will be."

যা হওয়ার তা হবেই। অসকার একসঙ্গে প্রখ্যাত এবং কুখ্যাত হয়েছেন, আর লেখক, কবি ও নাট্যকার হিসাবে চিরস্মরণীয় হয়েছেন। অক্সফোর্ডের সোনালী দিনগুলি উত্তরকালে অসকারের জীবনে প্রচণ্ড প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব এনেছে সন্দেহ নেই। "Magdalen Walks" নামক কবিতায় অসকার লিখেছেন—

"And even the light of the sun will fade at last
And the leaves will fall, and the bird will hasten away,
And I will be left in the snow of a flowerless day
To think of the glories of spring, and the joys of a youth long past."

চার

লণ্ডনের সমাজে অসকার প্রবেশ করলেন ধীর, মৃদু-চরণে। স্ট্র্যাণ্ডের কাছে সালিসবারি স্ট্রীটে বাসা বাঁধলেন, সেটা ফ্যাশনদোস্ত সমাজের বাইরে। অথচ গোড়া থেকেই সমাজের শিরোমণিদের সঙ্গে অসকারের জানাশোনা, ডিউক অব নিউক্যাসলের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা, এদিকে হাণ্টার ব্লেয়ারের সঙ্গে বন্ধুত্ব এক বিরাট পাসপোর্ট। পুরনো বন্ধু রোনাল্ড সাউদারল্যাণ্ড-গাওয়ারের বোন ডাচেস অব ওয়েস্টমিনিস্টার অনেক সাহায্য করেছেন। তবু এসব কিছু নয়, আসল জিনিস অর্থ নেই। যেটুকু আয় তা সীমাবদ্ধ, নতুন রোজগারের আশা নেই।

কবিতার বই যা প্রকাশিত হয়েছিল তার সমালোচনা হল "The cover is consummate, the paper is distinctly precious, the binding beautiful, and the type is utterly too"—কিন্তু শুধু তাই নয়, Punch লিখলেন—এই কবিতাগুলি 'Swinburne and water'।

প্রকাশক ডেভিড বোগ লেখকের টাকায় আড়াইশ কপি গ্রন্থ ডাচ হ্যাণ্ডমেড পেপারে ছাপিয়ে, পার্চমেন্টে বাঁধিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। অথচ আশ্চর্য, চার সপ্তাহে চারবার এই কাব্যগ্রন্থটি ছেপে চারটি সংস্করণ করতে হল। কবির আনন্দের সীমা নেই। কিন্তু অর্থ না থাকায় সে আনন্দ নিরানন্দে পরিণত।

রাশিয়ার নিহিলিজমের পটভূমিকায় চার অঙ্ক নাটক 'VERA' লিখলেন অসকার ওয়াইলড। শিক্ষানবীস অসকারের প্রথম নাটক সাফল্য লাভ করল না। রুশ পটভূমি অবাস্তব এবং অবাস্তর ভাবে চিত্রিত হয়েছে এই নাটকে, কারণ নাট্যকারের প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই। 'অ্যাডেলফি থিয়েটারে' নাটকটি মঞ্চস্থ হওয়ার কথা, কিন্তু শেষ মুহূর্তে তা বাতিল করতে হল।

অসকার নিজে মার্কিন অভিনেত্রী মেরী প্রেসকটকে এই নাটক সম্পর্কে লিখেছেন—বর্তমান য়ুরোপে স্পেন থেকে রাশিয়া পর্যন্ত স্বাধীনতার জন্য সাধারণ মানুষের নিদারুণ আর্তনাদে অনেক সিংহাসন ও শাসনতন্ত্র টলমল। আর্টের পরিধিতে সেই সমস্যাটিকে আমি তুলে ধরেছি এই নাটকে। তবে এ নাটক রাজনীতির নয়, এ নাটক আবেগের। এতে কোনও রাষ্ট্রীয় মতবাদ নেই, আছে

মানুষের মনের কথা। আমার স্বপ্নের মানুষ এই নাটকে বিচরণ করছে। ভালবাসছে পরস্পরকে। এই নিয়েই লিখেছি, এই লক্ষ্য নিয়েই তার অভিনয় হবে। এই নাটকটিকে সমালোচকরা যাই বলুন, এর মধ্যে উত্তরকালের অসকার ওয়াইলডের প্রতিভার ছাপ সুস্পষ্ট।

বিখ্যাত শিল্পী ফ্রাঙ্ক মাইলসের স্টুডিওতে লিলি ল্যাংট্রি বসে আছেন, তাঁর পোর্ট্রেট আঁকছেন মাইলস, সেই সময় অসকার ওয়াইলড হঠাৎ স্টুডিওতে এসে হাজির হলেন। অনন্যসাধারণ সুন্দরী লিলি ল্যাংট্রি। আজকালকার চিত্রতারকাদের মত এইকালের সুন্দরীদের অতি দ্রুততালে উত্থান-পতন ছিল না, লিলির সৌন্দর্যের খ্যাতি আজ অনেক কাল পেরিয়েও অম্লান হয়ে আছে। অক্সফোর্ডের বন্ধু ফ্রাঙ্ক মাইলস পেনসিল-স্কেচ-বিশারদ, এবং লিলি ল্যাংট্রির স্কেচ বিভিন্ন ভঙ্গীতে এঁকে এবং প্রকাশ করে তিনিই একরকম লিলির সৌন্দর্যখ্যাতি প্রচার করেন। সালিসবারি স্ট্রীটের যে ফ্ল্যাটে অসকার থাকতেন তারই ওপরতলায় থাকতেন ফ্রাঙ্ক। প্রতিটি মনোহারি দোকানে সেই সময়ে ফ্রাঙ্কের আঁকা লিলির স্কেচ শোভা পেত। প্রথম দর্শনেই অসকার লিখলেন—
"A lily girl, not made for this world's pain."

লিলিকে অসকারের সেদিন ভেনাস ডি মিলোর চাইতে সুন্দরী মনে হয়েছিল। তাই তাঁকে এই প্রশস্তি নিবেদন। অসকার লিখলেন—

"Even to kiss her feet I am not bold,
Being o'ershadowed by the wings of awe,
Like Dante, when he stood with Beatrice.'

লিলি অল্প বয়সে বেলফাস্টের বয়স্ক বিপত্নীক মিঃ ল্যাংট্রিকে বিয়ে করেন, তাঁর বাবা লি ব্রেটন ছিলেন ডীন অব জারসী। কিন্তু লিলির সৌন্দর্য ল্যাংট্রির গৃহকোণে আবদ্ধ থাকার সামগ্রী নয়, তাই সারা লণ্ডনে তাঁর রূপের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। একদিন উচ্ছ্বাসের মাথায় শিল্পী ফ্রাঙ্ক মাইলস বলে উঠলেন—"I with my pencil, Oscar with his pen, will make her Joconde and the Laura of this century."

লিলির স্বামী রেস এবং জুয়া নিয়ে মত্ত; সেই হিসাবে অসকার ওয়াইলড সহচর হিসাবে বরণীয়। অসকারের কণ্ঠস্বর সম্পর্কে লিলি লিখেছেন—"One of the most alluring voices that I have listened to."

তা ছাড়া অসকার তখন Great Aesthete হিসাবে Punch পত্রিকার কার্টুন ছবির বিষয়বস্তু। প্রখ্যাত না হলেও অসকার সুখ্যাতি অর্জন করেছেন গোড়া থেকেই। সেই অসকার লিলিকে উদ্দেশ করে লিখলেন—"To Helen, formerly of Troy, now of London"—এমন একটি মানুষের কাছে প্রশস্তি লাভ কার না ভাল লাগে!

অসকারের এই ভাল লাগার পিছনে, ভাল পথেই হোক আর মন্দ পথেই হোক, কিছু খ্যাতি অর্জন করা প্রয়োজন এই নীতি ছিল, এ কথাও কেউ কেউ বলেন। লিলির ভক্তবৃন্দের তালিকায় যাঁরা ছিলেন তার মধ্যে প্রিন্স অব ওয়েলস (সপ্তম এডওয়ার্ড) অন্যতম। সমাজ-জীবনে যে প্রচণ্ড বিস্ময়, এবং বহির্জগতেও লিলির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে, সুতরাং সেই মেয়েকে প্রেম নিবেদন করার পিছনে নিছক প্রেম নয়, অন্য কিছু ছিল এই কথা অনেকে বলেন। 'The Days I knew' নামক আত্মজীবনীতে লিলি লিখেছেন—'ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার বাড়ির পথে ঘুরে অসকার কবিতার লাইন রচনা করতেন। একদিন ক্লান্ত হয়ে আমারই দোরগোড়ায় কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। অনেক রাত্রে ফিরতেন মিঃ ল্যাংট্রি, ঘুমন্ত অসকারকে ডিঙিয়ে সেদিন বাড়ি ঢুকতে হয়েছিল তাঁকে।'

দুজনের গভীর প্রেম জমে উঠল। সারা বসন্তকাল উভয়ে একত্র ঘোরাঘুরি করলেন। কিন্তু অসকারের সকল চেষ্টা বৃথা হল। শিল্প বিষয়ে লিলির এতটুকু আগ্রহ নেই, লিলি নিজেই শিল্পের বিষয়বস্তু—চিনি না খেয়ে যে চিনিই হতে চায়। একদিন রাসকিনকে এনে হাজির করলেন লিলির কাছে। পরিচিত হয়ে লিলি কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেল। এমন কি পোশাকপরিচ্ছদ সম্পর্কেও অসকারের নির্দেশ মানতে লিলি রাজী নয়।

অসকার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, লিলিটাকে নিয়ে পারা যায় না, যা বলি তা কিছুতেই শুনবে না।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ, আমি ওকে বলি ওর উচিত প্রতিদিন কালো পোশাক পরে, দুটি কালো ঘোড়ায় টানা কালো ভিক্টোরিয়া গাড়িতে চড়ে পার্কে বেড়ানো, সেই গাড়ির গায়ে রক্তাক্ষরে লেখা থাকবে 'Venus Annodomini'। তা কিছুতেই রাজী নয়।

আরও দুজন অভিনেত্রীকে ওয়াইলড প্রশস্তি জানিয়েছিলেন : একজন সারা বার্নহার্ড, 'Phedre' নামক সনেটটি তাঁকে উৎসর্গীকৃত; আর এলেন টেরী, তাঁর সম্পর্কিত অসকারের কবিতা এলেনকে বিশেষ আনন্দ দিয়েছে। এলেন পরে লিখেছেন—"The most remarkable men I have known were Whistler and Oscar Wilde."

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে স্ট্র্যাণ্ডের এই বাড়ি ছেড়ে অসকার চেলসিয়ার টাইট স্ট্রীটের বাসায় উঠে গেলেন, সঙ্গে ফ্রাঙ্ক মাইলসও গেলেন। মাইলস সুপুরুষ ছিলেন। এই টাইট স্ট্রীটের বাড়িতেও সালিসবারি স্ট্রীটের বাড়ির মত পার্টি এবং মজলিসে বহু বিচিত্র মানুষ এবং প্রখ্যাত ব্যক্তি হাজির হতেন—প্রিন্স অব ওয়েলস পর্যন্ত। মাইলসের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত অসকারের বিচ্ছেদ ঘটে। কারণটা জানা নেই। কেউ বলেন কবিতা নিয়ে বিরোধ, সে কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। মাইলস পরে হয় আত্মহত্যা করেন, নয়তো উন্মাদাগারে তাঁর মৃত্যু ঘটে। ঠিক যে কী ঘটেছিল সে কথা অজ্ঞাত।

আর সেই শেষ বসন্তের সঙ্গেই লিলি ল্যাংট্রি বা জারসী লিলির সঙ্গে অসকারের প্রেমেরও অবসান ঘটল।

গিলবার্ট এবং সালিভ্যান ওপেরার দল ন্যু ইয়র্কে তখন 'Patience' নাটকের অত্যন্ত সাফল্যজনক অভিনয় করছেন। আমেরিকান ব্যুরো এই নাট্য প্রযোজনার ব্যবস্থাপক। এঁদের হঠাৎ খেয়াল হল এই নাটকের সাফল্য আরও জমবে যদি Aesthete অসকার ওয়াইলডকে আমেরিকায় আনা যায়। একটু অনুরোধ করে তাঁকে যদি উদ্ভট পোশাক পরিয়ে শহরের পথে সূর্যমুখী আর লিলি ফুল হাতে করে শোভাযাত্রাও সাজানো যায় তা হলে চমৎকার হবে। অপেরা Bunthorne চরিত্রের জীবন্ত প্রতিমূর্তি হবেন অসকার।

অসকার তখন মার সঙ্গে এক নম্বর অভিংটন স্কোয়ারে আছেন, দ'য়লি কার্টের বিজনেস্ ম্যানেজার কর্নেল মর্স ন্যু ইয়র্ক থেকে 'কেবল' করলেন—"Will you consider offer for fifty readings ?" তৎক্ষণাৎ ওয়াইলড জবাব দিলেন—"Yes, if offer is good."

কর্নেল মর্স যে উদ্দেশ্যেই এই আমন্ত্রণ জানান, এই আমন্ত্রণ গ্রহণের পিছনে অসকার ওয়াইলডের একমাত্র যুক্তি ছিল আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রচারের। স্থির হল সকল খরচ কার্টে ব্যুরো বহন করবেন আর টিকিট বিক্রির এক তৃতীয়াংশও তিনি পাবেন রয়্যালটি হিসাবে। লিভারপুল থেকে Arizona জাহাজে ক্রীসমাস ইভের রাত্রে যাত্রা করে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারি অসকার ওয়াইলড ন্যু ইয়র্কে পৌছলেন।

য়ুনাইটেড স্টেটসে পৌছে কাস্টমস্ অফিসারের প্রশ্নের জবাবে অসকার বললেন—"I have nothing to declare except my genius."

সংবাদপত্রের রিপোর্ট তেমন অনুকূল না হলেও, লাঞ্চ, ডিনার, টি, রিসেপশান, ডান্স, ড্রাইভ, থিয়েটার পার্টি প্রভৃতির নিমন্ত্রণ আসতে লাগল শ্রাবণের ধারার মত। এখানে তিনি অর্থ সংগ্রহে এসেছেন, আত্মপ্রচারে এসেছেন সুতরাং একটি আমন্ত্রণও উপেক্ষণীয় নয়। প্রতিটি আসরে অসংখ্য মেয়ে উপস্থিত থাকতেন আর নানা রকমের পোশাকে সেজে আসতেন। অসকারও প্রীত্যর্থে লণ্ডনের রাস্তায় যে পোশাক পরে ঘুরতেন সেই পোশাকে সাজতে শুরু করলেন। যে পোশাকে এসথেটিকস্‌রা সাজতেন, সেই পোশাক পরে অনেকে অসকারের সম্বর্ধনা সভায় উপস্থিত হতেন, টেবিলে সূর্যমুখী এবং লিলি ফুল প্রচুর ভাবে সাজানো থাকত। গৃহকর্ত্রীর আসনের চাইতে কারুকার্যমণ্ডিত সুউচ্চ সিংহাসন মাননীয় অতিথি অসকারের জন্য নির্দিষ্ট থাকত। দু পাশে রমণীয় রমণীদের

নিয়ে আহারে বসতেন অসকার। মার্কিন নারীর সৌন্দর্যে প্রীত হয়ে অসকার বলেছিলেন—"America reminds me of one of Edgar Allan Poe's exquisite poems because it is full of belles."

এই উক্তি শোনার পর মেয়েদের মধ্যে একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন—Behold the tribute of the belles! এই বলে কয়েকটি গোলাপফুল কবির ওপর বর্ষণ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে সকলেই চতুর্দিক থেকে কবির ওপর পুষ্পবৃষ্টি শুরু করলেন। নন্দনতাত্ত্বিকের যোগ্য অভিনন্দন। পূর্বপরিকল্পনানুসারে অসকার ওয়াইলড অবশ্য বিচিত্র পোশাকে শোভাযাত্রা করে বেরোতে রাজী হন নি। তাতে অবশ্য ব্যবস্থাপকগণ ক্ষুণ্ণ হলেন।

ন্যু ইয়র্কে পৌছনর সাত দিন পরে 'চিকারিং হলে' প্রথম বক্তৃতা দিলেন অসকার ওয়াইলড। সভায় তিল ধারণের স্থান ছিল না। বক্তৃতার বিষয় "ইংলিশ রেনেসাঁস"। সুবিশাল জনতার ধারণা ছিল না অসকারের বক্তৃতার বিষয় সম্পর্কে, তাই অসকার যখন বিচিত্র পোশাকে বক্তৃতা-মঞ্চে অবতীর্ণ হলেন তখন শ্রোতারা ভাবছিল কিছু হাস্যকর কাণ্ড ঘটবে, কিন্তু অসকার শুরু করলেন—'আপনারা মিঃ সালিভানের চমৎকার গান এবং মিঃ গিলবার্টের রসাল কৌতুক শুনেছেন তিনশ রজনী ধরে, এত রঙ্গরসের পর আপনাদের যদি একটি সন্ধ্যায় কিছু সত্যকথন শোনার অনুরোধ জানাই তা হলে হয়তো নিছক অন্যায় অনুরোধ হবে না—'

সুকণ্ঠ অসকার সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্পর্কে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন, রাসকিন এবং ওয়ালটার পেটার তাঁর বক্তৃতার মৌল ভিত্তি। সভা সার্থক হল। নন্দনতত্ত্বের জন্য আগ্রহশীল শ্রোতাদের উৎসাহে নয়, অসকারের ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিগত মাধুর্য, বক্তব্যবিষয় পেশ করার বৈচিত্র্য এবং ভঙ্গিমা, মনোহর কণ্ঠস্বর, তা ছাড়া তাঁর স্বাতন্ত্র্য বিশেষ করে চোখে লেগেছে। তখনকার দিনে অক্সফোর্ডে গড়া মানুষ আমেরিকা তেমন দেখে নি। চার্লস ডিকেন্সের পর যুক্তরাষ্ট্রে এমন সম্মান আর কোনও বক্তা পান নি।

একজন উৎসাহী মহিলা বলেছিল, ন্যু ইয়র্কে আপনার এই সম্মান, বোষ্টনে আপনার পুজো হবে।

হার্ভার্ডের ছেলেরা বাটনহোলে একটি করে বিরাট লিলি ফুল গুঁজে আর হাতে সূর্যমুখী ফুল নিয়ে শোভাযাত্রা বার করল। অসকার বললেন, 'আমার চারদিকে দেখছি এসথেটিক মুভমেণ্টের চিহ্ন। কিন্তু আমার চারপাশ দেখে বলতে ইচ্ছে করে—ঈশ্বর, চেলাদের হাত থেকে আমাকে বাঁচাও।'

ন্যু হ্যাভেনের ছাত্ররাও তাঁকে বিদ্রূপ করার চেষ্টা করেছিল। প্রত্যেকে টকটকে লাল টাই গলায় এঁটে, হাতে একটি সূর্যমুখী ফুল নিয়ে শোভাযাত্রা বার করল, সেই শোভাযাত্রার পুরোভাগে রইলেন এক বিরাটাকৃতির নিগ্রো। বক্তৃতাসভার গ্যালারিতে বসে তারা কিন্তু বক্তাকে বিরক্ত বা বিব্রত করে নি।

লিডভালে খনি শ্রমিকদের আধিপত্য। সবাই বলেছিল যে ওখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফেরা কঠিন। অন্ততঃ ম্যানেজার গুলি খাবে, কারণ ওখানকার সবাই রিভলবার ট্যাঁকে নিয়ে ঘোরে ও কথায় কথায় গুলি চালায়।

অসকার অদম্য উৎসাহে সেখানে বেনভেনুতো চেলিনির আত্মকথা পাঠ করে শোনালেন। সবাই খুশী হয়ে প্রশ্ন করল, সেই চেলিনিকে কেন সঙ্গে আনলেন না?

অসকার জবাবে বললেন, আনতুম, কিন্তু মৃত্যু প্রতিবন্ধক, লোকটি মারা গেছেন।

একজন প্রশ্ন করল, কে তাঁকে গুলি করেছিল?

যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালে অলিভার ওয়েণ্ডেল হোমস্, লংফেলো, লুইসা এলকট, জেফারসন ডেভিস, হেনরী ওয়ার্ড বীচার, ওয়ালট হুইটম্যান প্রভৃতির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সুযোগ পান অসকার। তাঁরা সবাই তাঁকে অত্যন্ত প্রসন্ন মনে গ্রহণ করলেন।

কামডেনে হুইটম্যানের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন অসকার। হুইটম্যানের বয়স তখন তেষট্টি আর ওয়াইলডের সাতাশ। সুইনবার্ন, রসেটি, মরিস, টেনিসন, ব্রাউনিং প্রভৃতি সম্পর্কে গভীর আলোচনা হল। অসকার এঁদের সকলের সম্পর্কেই বিশেষভাবে আলোচনা করলেন।

বৃদ্ধ হুইটম্যানের খুব পছন্দ হল অসকারকে, তিনি বললেন, আমি তোমাকে অসকার বলেই ডাকি ?

নিশ্চয়ই, আমিও তাই ভালবাসি।

মহাকবির পায়ের কাছে বসে অসকার বললেন, কারও বক্তব্যবিষয়ের মধ্যে যদি তেমন সৌন্দর্য না থাকে বা তাঁর বলার ভঙ্গি যদি মনোহর না হয় তা হলে আমার মোটেই ভাল লাগে না। আমি তাঁর কথা শুনতে পারি না।

হুইটম্যান বললেন, কেন অসকার ? তা কেন ? যে মানুষ সৌন্দর্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে আছে, সে এমনই মরে আছে। আমার মতে সৌন্দর্য একটি সম্পূর্ণ যোগফল, আকারবিহীন নিছক বিমূর্তন (abstraction) মাত্র নয়!

ওয়াইলড হুইটম্যানের যুক্তি মেনে নিয়ে বললেন, ঠিক বলেছেন। মনে পড়ছে আপনি বলেছেন, "All beauty comes from beautiful blood and a beautiful brain."

এইভাবে দুঘণ্টা আলোচনা চলল। অবশেষে হুইটম্যান বললেন, অসকার, নিশ্চয়ই তোমার তৃষ্ণা পাচ্ছে, একটু ঘোল করে দিই।

বড় এক গ্লাস ঘোল করে অসকারকে দিলেন হুইটম্যান।

আশীর্বাদ করলেন, গুডবাই অসকার! গড্ ব্লেস ইউ!

হুইটম্যান ভারী খুশী হয়েছিলেন। লণ্ডনস্থ এক বন্ধুকে লিখলেন—"Have you met Oscar Wilde? He is a fine, large, handsome youngster and has the good sense to take a fancy on me."

য়ুনাইটেড স্টেটস থেকে কুইবেক, মনট্রিয়েল ও টোরনটো বেড়াতে গেলেন অসকার। নায়াগ্রা প্রপাত তাঁর মনে লাগে নি। আমেরিকা সম্পর্কে ওয়াইলডের অনেক চমকপ্রদ উক্তি আছে, তার মধ্যে আমেরিকান সম্পর্কে—"...American women are charming, but American men—alas!"

আর আমেরিকার কাছে "Art has no marvel, and beauty no meaning, and the past no message." এই তাঁর বাণী।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকাল ভ্রমণেই কাটল। সময় পেলেই অবশ্য 'The Duchess of Padua' নাটকের অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত সংলাপ লিখেছেন। আশা ছিল মেরী এনডারসন এই নাটকটি প্রযোজনা করবেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে লিলি ল্যাংট্রি ন্যু ইয়র্কে এলেন। তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়ে বললেন, "I would rather have discovered Mrs. Langtry than have made the discovery of America". ন্যু ইয়র্ক রঙ্গমঞ্চে টম টেলর লিখিত 'An Unequal Match' নামক নাটকে লিলি ল্যাংট্রি অবতীর্ণ হন। সেই নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গেই 'New York Herald'-এর গেস্ট ক্রিটিক হিসাবে লিখেছিলেন অসকার। অভিনয়ের প্রশংসা করতে না পেরে অভিনেত্রীর সৌন্দর্য সম্পর্কে লিখেছিলেন—"Pure Greek it is—" ইত্যাদি।

মোটামুটি যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ সফল হয়েছিল অসকার ওয়াইলডের। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারিতে তিনি ইংলণ্ডে ফিরলেন একরকম সাবালক হয়ে। অনেক জ্ঞান বেড়েছে, অভিজ্ঞতাও। ব্যবসাবুদ্ধি হয়েছে। পুরনো মুদ্রাদোষ বিলুপ্ত। তা ছাড়া 'aesthete' অসকার ওয়াইলডের যে সব বাতিক ছিল তা অন্তর্হিত হয়ে গেল। ইংলণ্ডে প্রবেশ করলেন নতুন সুসংস্কৃত অসকার ওয়াইলড।

পাঁচ

দিনকতক মার্কিনি সফরের গল্পগুজবে লণ্ডনের আসর জমিয়ে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে অসকার প্যারী ভ্রমণে গেলেন, এবং তিন মাস পরে একেবারে রিক্ত হয়ে ফিরে এলেন। উদ্দেশ্য ছিল মেরী এনডারসনের জন্য অমিত্রাক্ষর ছন্দের নাটকটি শেষ করা। গোড়া থেকেই বালজাক সম্পর্কে দারুণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল অসকারের এবং শেষ পর্যন্ত সেই শ্রদ্ধা অটুট ছিল। বালজাক সাদা ড্রেসিং গাউন পরে সন্ন্যাসীর মত ঝলঝলে পোশাকে লিখতেন, অসকারও তেমনই একটি পোশাক তৈরি করলেন। লিখবেন সেই পোশাক পরে, এমন কি বেড়ানোর ছড়িটা পর্যন্ত বালজাকের হাতির দাঁতের ছড়ির অনুকরণে

গড়ানো হল। লেখার সময় আশপাশে প্রখ্যাত লেখকদের গ্রন্থ বা জীবনী ছড়ানো রইল।

অসকার এক বন্ধুকে লিখলেন, 'প্রথম যুগের অসকার এখন মৃত, এখন অসকারের দ্বিতীয় পর্ব, এই অসকারের সঙ্গে পিকাডিলির পথে সূর্যমুখী হাতে নিয়ে যে লম্বাচুল মানুষটি ঘুরে বেড়াত তার কোনও সম্পর্ক নেই, মিল নেই।'

এই সময়েই প্যারীতে অসকারের প্রথম জীবনীকার রবার্ট সেরার্ডের সঙ্গে পরিচয় হল। উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হল, অবশ্য এর কিছুকাল পরে অসকারের প্রেমে পড়া এবং পরে সেই প্রেমের পরিণতি হিসাবে পরিণয়ে আবদ্ধ হওয়ায় ফলে এই বন্ধুত্বের সূত্র অসকারের দিক থেকে কিঞ্চিৎ ক্ষীণ হয়ে পড়ে। কিন্তু সেরার্ডের প্রীতির অন্ত নেই। শেষ পর্যন্ত এই মানুষটি অসকারের সকল সঙ্কটে অবিচল নিষ্ঠায় সহায়তা করেছেন।

রবার্ট হারবরো সেরার্ড ছিলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থের দৌহিত্র, স্বাভাবিক কারণেই তাঁর সাহিত্যিক আকাঙ্ক্ষা ছিল। অসকারের সঙ্গে যখন প্রথম পরিচয় তখন তাঁর বয়স মাত্র বাইশ। অক্সফোর্ড থেকে ডিগ্রী না নিয়েই সেরার্ড ফ্রান্সে গিয়েছিলেন, হাতে তেমন অর্থও ছিল না। সেরার্ডের প্রকৃতি ছিল নীতিবাগীশের, তাই বোহিমীয় বাউণ্ডুলে সমাজে না থেকে শহর থেকে দূরে নির্জন গৃহকোণে থাকতেই তাঁর আগ্রহ।

অসকার প্যারীতে পৌঁছে সাহিত্যিক ও শিল্পীসমাজে পরিচিত হওয়ার জন্য তাঁর সেই কাব্যসংগ্রহ 'Poems' সকলকে এক খণ্ড করে পাঠালেন, সেই সঙ্গে একটি করে চিঠি। যথারীতি সৌজন্য সহকারে অনেকে প্রাপ্তি স্বীকার করলেন। এই সংবাদ রবার্ট সেরার্ডের কানেও পৌঁছল, অসকারকে মনে মনে তেমন উচ্চস্থান দিতে পারেন নি সেরার্ড, বরং আত্মপ্রচারক এই আইরিশম্যান সম্পর্কে বিরাগ ছিল। ওয়াইলডের ঢঙ এবং কৌশল তাঁর ভাল লাগে নি—অবশ্য এর হেতু নিছক ব্যবসাগত ঈর্ষা এ কথা তিনি পরে স্বীকার করেছেন।

একটা ডিনারে রবার্ট সেরার্ডের নিমন্ত্রণ হয়েছিল। মনে একটা বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করেই সেরার্ড সেই ভোজসভায় যোগ দিয়েছিলেন। অসকারের পোশাক এবং আকৃতি দেখে সেরার্ডের প্রথমটা হাসি পেয়েছিল, কিন্তু ওয়াইলড যখন কথা বলতে শুরু করলেন সেরার্ড মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর মনে হল যেন প্রাণোন্মাদিনী সুতীব্র সুরা সেই বাক্যে প্রবাহিত হচ্ছে। তবু নীরব রইলেন সেরার্ড।

কথাপ্রসঙ্গে অসকার বললেন, লুভরে ভেনাস ডি মিলোর মূর্তি দেখে অপূর্ব আনন্দ পেয়েছি।

সেরার্ড হঠাৎ বললেন, আমি কখনও লুভরে যাই নি, ওই নামটুকু শুনলে আমার প্যারীর সবচেয়ে সস্তায় টাই বিক্রির দোকান Grands Magasins dy Louvre-এর কথা মনে হয়।

ওয়াইলড বললেন, বাঃ, চমৎকার উক্তি।

পরে সেরার্ড অসকারকে বলেছিলেন যে মনে মনে তিনি অসকারকে ঈর্ষা করতেন।

অসকার শুনে বলেছিলেন, ওটা ঠিক নয়, অপরের সাফল্যে যে মানুষ আনন্দ পায় তার জীবন মাধুর্য ও ঐশ্বর্যে ভরে ওঠে।

অসকার লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করলেন সেরার্ডকে। হোটেল ভলটেয়ারে লাঞ্চে এসে সেই রাতে ডিনার পর্যন্ত রইলেন সেরার্ড। ডিনারশেষে উভয়ে প্যারীর লাতিন কোয়ার্টারে ঘুরে বেড়ালেন প্রায় শেষ রাত পর্যন্ত। কেবল বই আর বই সম্পর্কিত আলোচনা হল, দুজনেই কবি-যশঃপ্রার্থী, সুতরাং মানসিক মিল অনেক। ওয়াইলড সুইনবার্ন এবং ওয়ালটার পেটারের কথাই বললেন বেশী করে। এমন কি কার্লাইলের 'ফ্রেঞ্চ রেভল্যুশনে'র নির্বাচিত অংশও আবৃত্তি করে শোনালেন।

রাত দুটোর পর দুই বন্ধু পরস্পরকে বিদায় জানিয়ে পরের দিনের কার্যসূচী স্থির করলেন। সেই রজনীতে দীর্ঘস্থায়ী সুদৃঢ় বন্ধুত্বের ভিত্তি স্থাপিত হল। পরে প্যারীর পথে পথে দুজনে অনেক ঘুরেছেন, অনেক আনন্দের দিন একত্রে কাটিয়েছেন। কুড়ি বছর পরে সেরার্ড লিখেছেন—"Each day my admiration for my friend grew almost more enthusiastic."

উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতি ও অন্তরঙ্গতা এইভাবে গড়ে উঠল। সেরার্ড বলেছেন, নিঃসন্দেহে ওয়াইলডের জীবনের এই সর্বশ্রেষ্ঠ কাল, উদ্বেগ আকুলতা চিন্তাভাবনা বর্জিত দিনগুলি পরমানন্দে কেটেছে। এই সময়েই ওয়াইলড অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 'The Duchess of Padua' নাটক এবং বিখ্যাত কবিতা "The Sphinx" রচনা শেষ করেন।

এই নাটকের জন্য মেরী এনডারসন এক হাজার ডলার অগ্রিম দিয়েছিলেন। কিন্তু নাটক সম্পূর্ণ হওয়ার পর যখন আমেরিকায় পাঠানো হল তখন আর জবাব আসে না। অবশেষে তার পাঠালেন অসকার। তার জবাব এল যে নাটকটি অপছন্দ হয়েছে। তার পরে অসকার উদাস-ভঙ্গীতে বললেন, "This, Robert, is rather tedious" তারপর সেই 'কেবলে'র কাগজটা ছিঁড়ে গুলি পাকিয়ে মুখে ফেলতে লাগলেন। যা ভাল লাগত তা amazing এবং যা খারাপ তা অসকারের কাছে tedious.

অসকারের হাতে তেমন টাকা নেই, তবু সারা প্যারী শহর খুঁজে জেরার্ড দ্য নারভালের একটি জীবনী অনেক দাম দিয়ে কিনে সেরার্ডকে উপহার দিলেন। বললেন, এই কবির কথা ইংলণ্ডের সাহিত্যিক মহলে আলোচিত হয়। কিন্তু ক্লাসিকের কথা সবাই আলোচনা করে, ক্লাসিক কেউ পড়ে না। তুমি এই বইটা পড়ে একটি ভাল প্রবন্ধ লিখতে পারবে এবং খ্যাতি অর্জন করবে।

চ্যাটারটন, অ্যালান পো, বোদলেয়ারের মত দ্য নারভালেরও শোচনীয় পরিণতি ঘটেছিল। কুখ্যাত পল্লীর একটি ঘরে দ্য নারভালের মৃতদেহ ঝুলন্ত অবস্থায় আবিষ্কৃত হয়। সেই রাত্রে দুই বন্ধুতে প্যারীর রাজপথে ঘুরে ঘুরে সেই কুখ্যাত পল্লীর সন্ধান করে কাটালেন।

এই সময় গণিকাপল্লীর ওপর একটি কবিতা লিখলেন অসকার—"The Harlot's House"। কবিতাটি সেই-সময়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বিষয়বস্তুতে বিকৃত রুচির আমদানি তখনও প্রসন্নচিত্তে কেউ গ্রহণ করত না। তিন মাস প্যারীতে থাকাকালে অসকার যাদের সঙ্গে মিশতেন তাদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে: শিল্পী, অভিজাত এবং অন্ত্যজ। যে-কোনও সাধারণ মানুষের সঙ্গে অবলীলাক্রমে মিশতে অসকারের বাধত না। আত্রে সালিশ, চোর, ভিক্ষুক, কবি, পুলিসের চর প্রভৃতি নানাবিধ গুণের অধিকারী। অসকার তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে আলাপ করতেন। এই কারণেই বিচারশালায় সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে অসকার বলেছিলেন—"I would talk to a street arab with pleasure."

আলফঁস দোদে অসকারের মুখে ভেনাস ডি মিলোর উচ্চপ্রশংসা শুনে বলেছিলেন—বাড়াবাড়ি। ভিক্টর হুগোর তখন অনেক বয়স, এক সম্বর্ধনা-সভায় অসকারকে তাঁর পাশে আসন দেওয়া হয়। কিন্তু দু-একটি কথা বলার পর হুগোর ক্লান্ত চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল। পল ভেরলাইনকে ভাল লাগে নি, তাঁর কুশ্রী আকৃতির জন্য। জোলার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, কিন্তু জোলা অসকারকে দেখে তেমন প্রীত হন নি। দেগাস, পিসারো, সার্জেণ্ট, কোকেলাইন প্রভৃতি শিল্পীদের সঙ্গেও পরিচয় হয়েছিল, আর সবচেয়ে হৃদ্যতা জমেছিল পল বুর্জের সঙ্গে। ক্রমে অর্থ শেষ হয়ে এল, সেরার্ড আগেই চলে এসেছিল, অসকারও লণ্ডনে ফিরে এলেন।

ছয়

সেরার্ডের আর্থিক সম্বল না থাকার জন্যই হোক বা অন্য কারণেই হোক দুই বন্ধুর মধ্যে একটা বিচ্ছেদ ঘটে। তারপর হঠাৎ কয়েক মাস পরে একই ট্রেনের যাত্রী হিসাবে দুজনের আবার দেখা হয়। অসকার তখন চার্লস স্ট্রীটে থাকেন, সেখানে থাকার জন্য আমন্ত্রণ করলেন সেরার্ডকে। দুজনের পুর্নমিলন হল বটে, কিন্তু প্যারীর সেই আনন্দ-উজ্জ্বল মুহূর্ত আর ফিরে এল না, সেখানে জীবনের অন্য অর্থ ছিল, এখানে অন্য এক জীবন। তারপর টাকা—সেরার্ড তখন একেবারে নিঃসম্বল বললেই চলে। অসকার তখন আবার বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান, মাঝে মাঝে প্রচুর রোজগারও হয়, তাঁর পকেট থেকে নোট বার করে সেরার্ডকে বলেন, এ আমাদের দুজনেরই টাকা।

সেরার্ড অবশ্য অতটা খুশী হতে পারতেন না, অর্থাভাব তাঁর মনে বিশেষ অশান্তির সৃষ্টি করছিল, তা ছাড়া এই সময় তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ যে উপন্যাস লিখেছিলেন তা মোটেই সফল হল না, কিছুই পাওয়া গেল না।

এমনই একদিন ক্লান্ত সেরার্ড ঘুমে আচ্ছন্ন, সেই ভোরে তাঁকে টেনে তুলে অসকার আহ্লাদে আটখানা হয়ে বললেন, বিয়ে করছি।

সেরার্ড ঘুমন্তই জবাব দিলেন, অতিশয় দুঃসংবাদ।

তারপর আবার পাশ ফিরে ঘুমতে লাগলেন।

অসকার বললেন, রবার্ট, তুমি একটি জন্তু—ব্রুট!

কথা আর অগ্রসর হল না। এক রকম সেই থেকেই বন্ধুত্বের উষ্ণ আবেশ শীতল থেকে শীতলতর হয়ে এল।

অসকার ওয়াইলডের আর একজন জীবনীকার বোরিস ব্রাসলের প্রশ্নের উত্তরে সেরার্ড ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে যে কথা বলেছিলেন তা এইখানে উল্লেখযোগ্য। তখন সেরার্ডের বয়স সত্তর পার হয়েছে, আর অসকার সম্পর্কিত অনেক ঘনিষ্ঠ তথ্য তিনিই জানতেন। তাই বোরিস ব্রাসল অসকার-জীবনের এই বিশেষ বিতর্কমূলক জ্ঞাতব্য তথ্য বিষয়ে তাঁকেই প্রশ্ন করেন। উত্তরে সেরার্ড বলেন :

"অক্সফোর্ডে পড়ার সময় অসকার সিফিলিসে আক্রান্ত হন, চিকিৎসার জন্য মারকারি ইনজেকশন দেওয়া হয়। সম্ভবতঃ এই চিকিৎসার ফলেই তাঁর দাঁতগুলি পরে কালো হয়ে যায় এবং নষ্ট হয়। মিস্ কন্সটানস্ লয়েডের কাছে বিবাহের প্রস্তাব পেশ করার আগে তিনি লণ্ডনের একজন ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষিত হন। ডাক্তার অভিমত দেন যে এখন তিনি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত এবং নির্বিচারে বিবাহ করতে পারেন। কিন্তু রোগ তাঁর দেহে ছিল এবং ক্রমশঃ তা প্রকাশিত হতে থাকে। তখন অসকার স্ত্রীর সঙ্গে দৈহিক সংসর্গ বাধ্য হয়েই বন্ধ করেন, এবং কোনও বন্ধুর দ্বারা সমকামিত্বে দীক্ষিত হন।"

এই ব্যাধিতেই শেষ পর্যন্ত অসকারের নাকি মৃত্যু হয়।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দেই অসকার ডাবলিনের কুইন্স কাউন্সেল স্বর্গীয় হোরাস লয়েডের ছাব্বিশ বছরের মেয়ে কন্সটানসের প্রেমে পড়লেন। তখন তাঁর নিজের বয়স ত্রিশ। কন্সটানস সুন্দরী ছিলেন, চমৎকার সোনালী চুল, বড় বড় দুটি উজ্জ্বল চোখ। তাঁকে দেখার কুড়ি বছর পরে একজন মহিলা লিখেছিলেন—"It was a face whose loveliness was derived more from the expression and exquisite colouring than from any claim to the regular lines that constitute beauty."—পৈতৃক অর্থও প্রচুর ছিল কন্সটানসের। সেইজন্য ফ্রাঙ্ক হ্যারিস বলেছিলেন, অসকার টাকার লোভে বিয়ে করেছেন। কথাটা ঠিক নয়, অসকার সত্যি কন্সটানসকে ভালবেসেছিলেন। লয়েড-পরিবার এই বিবাহে সুখী হয়েছিলেন, কন্সটানসের ভাই ওথো অসকারকে লিখেছেন—আর একজন সহোদর হিসাবে তোমাকে অভিনন্দন জানাই।

বিবাহের পূর্বে অসকার স্ত্রীর কাছে তাঁর অতীত জীবনের সমস্ত কথা প্রকাশ করেছিলেন আর কন্সটানস অতীতের কথা দুঃস্বপ্নের মত ভুলতে বলেছিলেন। ডাবলিনে না থাকলে উভয়ের মধ্যে পত্রবিনিময় হত। সেই চিঠির সাহিত্যিক মূল্য কম নয়। কন্সটানস স্বামীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—"Do believe that I love you most passionately with all the strength of my heart and mind." অসকার তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'Poems' একখণ্ড কন্সটানসকে উপহার দেন, তার প্রথম পৃষ্ঠায় কন্সটানসকে উদ্দেশ করে যে কবিতাটি অসকার রচনা করেন, আন্তরিকতা ও প্রেমের গভীরতার জন্য তা স্মরণীয়। সেই কবিতাটির শেষ স্তবক—

"And when wind and winter harden
All the loveless land
It will whisper of the garden,
You will understand."

এই কবিতাটি কবির ভগ্নী আইসোলার মৃত্যুতে রচিত "Requiescat" নামক বিখ্যাত কবিতাটিকেও ম্লান করে দেয়।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে প্যাডিংটনে সেণ্ট জেমস চার্চে শুভ-বিবাহ হয়ে গেল। পাত্রীর দাদামশায়ের শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন যদিচ জাঁকজমক বর্জন করা হয়েছিল তবু গির্জাঘরে তিলধারণের স্থান ছিল না। বর-বধূর পোশাক-পরিচ্ছদ নাকি অতুলনীয়, এবং সমস্তই অসকারের পরিকল্পনামাফিক। বিবাহের পর বর-কনে প্যারীতে মধুযামিনী যাপন করতে গেলেন।

বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রী উভয়ের আনন্দের আর সীমা রইল না। ফুল-হাসি এবং যৌবনের গান ছাড়া আর সব তুচ্ছ। রবার্ট সেরার্ডকে এই আনন্দের উৎস দেখালেন অসকার। সেরার্ড দেখলেন স্বামী-স্ত্রী দুজনের মধ্যে অসাধারণ প্রীতি ও প্রেম।

একদিন তিনজনে প্যারীর পথ দিয়ে চলেছেন ফিটন গাড়ি চড়ে, এমন সময় সেরার্ড বললেন, অসকার, আমার হাতের এই ছড়িটা যদি ফেলে দিই, দোষ হবে?

অসকার বললেন, নিশ্চয়ই, একটা কেলেঙ্কারি হবে, হৈচৈ, সোরগোল হবে। কিন্তু হঠাৎ এমন খেয়ালই বা হল কেন তোমার?

সেরার্ড বললেন, এটি গুপ্তি, এই ছড়ির ভেতর একটি তলোয়ার আছে, তোমাদের এত হাসিখুশী দেখাচ্ছে যে মনে হচ্ছে এই তলোয়ার তোমাদের বুকে বসিয়ে দিই।

মিসেস ওয়াইলড হেসে বললেন, ওটা বরং আমাকে দিন। এই আনন্দের স্মরণীয় স্মৃতিচিহ্ন হয়ে থাক এই ছড়িটা।

সত্যিই সেই ছড়ি অনেক দিন ধরে মিসেস ওয়াইলডের কাছে ছিল। অসকার সংসারে প্রবেশ করলেন, চেলসিয়ার টাইট স্ট্রীটের ষোল নম্বর বাড়ি হুইসলারের আঁকা ছবি দিয়ে সাজানো হল। তিনি 'Woman's World' নামক পত্রিকার সম্পাদকের পদ গ্রহণ করলেন, মাইনে বাৎসরিক তিনশ পাউণ্ড। এখনকার হিসাবে প্রায় দেড় হাজার পাউণ্ড। এই পত্রিকার মালিক ছিলেন বিখ্যাত প্রকাশক ক্যাসেল কোম্পানি। এই সময় আর্নল্ড বেনেটের সঙ্গে অসকারের পরিচয় হয়, আর্নল্ড সাপ্তাহিক 'Women' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। মেয়েদের পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে অসকার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, অনেক রচনা নিজেই লিখেছেন, তা ছাড়া অলিভ স্ক্রাইনার, মেরী করেলি, আর্থার সিমন্স, অসকার ব্রাউনিং প্রভৃতি তাঁর পত্রিকায় নিয়মিত লেখক ছিলেন। সম্পাদক নিজে সাহিত্য-পৃষ্ঠায় সমালোচনা লিখতেন। সমালোচক অসকার ডব্লু. বি. ইয়েটসের গোড়ার দিকের কবিতার মধ্যে সম্ভাবনা ও প্রতিশ্রুতির পরিচয় পেয়েছেন এবং অধ্যাপক সেণ্টস্‌-বেরীর রচনায় ব্যাকরণগত ভুল লক্ষ্য করে তিরস্কার করেছেন। গোড়ার দিকে কর্মশালার নিয়মনিষ্ঠা মেনে চললেও ক্রমে সম্পাদকীয় চাকরিও একঘেয়ে লাগত অসকারের, তাঁর আগমন ও নির্গমন অত্যন্ত অনিয়মিত হতে লাগল। কর্তৃপক্ষ দু-একবার বলে দেখলেন, তারপর ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর সংখ্যার পর তিনি পদত্যাগ করলেন, পত্রিকাটি এর পর আর এক বছর চলেছিল।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম পুত্র সিরিল এবং পরের বছর দ্বিতীয় পুত্র ভিভিয়ানের জন্ম হয়। সিরিল প্রথম মহাযুদ্ধের কালে মারা যান, ভিভিয়ান ১৯৪৬ সনে পিতার শেষ গল্পরচনা সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন।

কন্সটানস অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা ছিলেন। লেডী স্যাণ্ডহার্স্ট চার্চের কাজকর্মেই মত্ত থাকতেন, তিনি ছিলেন কন্সটানসের অন্তরঙ্গ বান্ধবী। বিবাহিত জীবনের শেষ দিকে কন্সটানস মাদাম ব্লাভাটস্কীর ভাঁওতায় থিওসফি নিয়ে অত্যন্ত মেতে ছিলেন। কন্সটানস অতিশয় সরলমতি মানুষ ছিলেন। অসকার বলতেন বিবাহের একটি ত্রুটি এই যে দু পক্ষকেই কিছু না কিছু মিথ্যের আশ্রয় নিতে হয়। অসকারও স্ত্রীকে অনেক মিথ্যা বলতেন, তার প্রমাণ একবার বলেছিলেন—গলফ্‌ খেলতেই অনেক সময় লাগে। কন্সটানস তাই বিশ্বাস করে একজনকে লিখেছিলেন—অসকার গলফ্‌ খেলা নিয়েই মেতে আছে।

চার বছর যেতে না যেতেই এই প্রেমের উদ্দাম স্রোতে ভাটা পড়ল। তার অবশ্য প্রধানতম কারণ কন্সটানসের মধুর প্রকৃতি, স্বামীকে তিনি স্বামী বলেই গ্রহণ করেছিলেন স্বামীর ওপর প্রভুত্ব খাটাতে পারেন নি, অথচ অসকারের

প্রকৃতি ছিল একজনের বলিষ্ঠ নিয়ন্ত্রণে চলা, কর্তৃত্ব মেনে নেওয়া। এমন ভদ্র নম্র সেবাপরায়ণা নারী তাই অসকারকে সংসারের শৃঙ্খলে বেশী দিন বাঁধতে পারে নি। অসকার ওয়াইলডের মতে তাই—"The worst of having a romance is that it leaves one so unromantic."

সাত

শিল্পী জেমস ম্যাকনীল হুইস্‌লারের সঙ্গে অসকারের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা অবশ্য অবশেষে কলহে শেষ হয়। হুইসলার ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন এবং সুপ্রতিষ্ঠিত। তখন পর্যন্ত কয়েকটি কবিতার লেখক ভিন্ন অসকারের অন্য পরিচয় নেই। দুজনেই সুরসিক, (অবশ্য এই রসিক কথাটির নিছক বাংলা অর্থে নিলে হবে না; ইংরেজী উইট কথাটির ঠিক বাংলা হয় না, যা হয় তা ভাঁড়ের কাছাকাছি, তাই সুরসিক বলাই ভাল) দুজনেই 'উইট', একেবারে কাঠে কাঠে, তাই শেষ পর্যন্ত যে বিরোধ অনিবার্য তাই ঘটেছে। হুইসলার ছিলেন প্রতিভাধর শিল্পী। শিল্প সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য অভিজ্ঞতা-প্রসূত, আর অসকারের জ্ঞান পুঁথিগত। বিরোধ বাধল এই ব'লে যে হুইসলারের কথা নিজের বলে চালাচ্ছেন অসকার, বেমালুম চুরি বলাই চলে। রাসকিন একবার বলেছিলেন—সাধারণের মুখে খানিকটা রঙ আর কালি ছুঁড়ে হুইস্‌লার দুশো গিনি লুটতে চায়।

এই উক্তির জন্য মানহানির মামলা আনলেন হুইসলার। আদালতে ছবি আঁকতে কত সময় লেগেছে এই প্রশ্নের উত্তরে হুইসলার বললেন—সম্ভবতঃ দুদিনের পরিশ্রম।

দুদিনের পরিশ্রমের দাম দুশ গিনি?

না, সারাজীবনের অভিজ্ঞতার দাম। (Oh no, for knowledge of a lifetime.)

সেই অল্প বয়সে এই উক্তি অসকারের ভারী মনে লেগেছিল, তাই তিনি একরকম যেচে হুইস্‌লারের সঙ্গে আলাপ করেন, পরে দুজনকে প্রায়ই কাফে রয়্যালে ভোজনরত দেখা যেত। তখন অসকার চেলা, আর হুইসলার গুরুর ভূমিকায়।

ইংলণ্ডে ফিরে অসকার ৬৫টি বক্তৃতা-সভায় যোগ দেন। গ্রীষ্মকালে মারগেট, রামস্‌গেট, সাউথপোর্ট প্রভৃতি বিশ্রামবিহারে আর শীতকালে লণ্ডন ও অন্যান্য শহরে আমেরিকার অভিজ্ঞতা বিষয়ে এবং নন্দনতাত্ত্বিক হিসাবে 'আধুনিক জীবনে আর্টের মূল্য' সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়েছেন। এইসব সৌন্দর্যতত্ত্বের বক্তৃতায় রাসকিন এবং হুইস্‌লারের বাণী এবং বক্তব্য যথেচ্ছ গ্রহণ করেছেন অসকার, এবং হুইসলার এই অপরাধ ক্ষমা করেন নি। হুইস্‌লারের বক্তব্য এবং বাণী নিজস্ব বলে চালানো এবং সেই সঙ্গে তাঁর বিরোধী রাসকিনের মতামতের প্রশংসা হুইস্‌লারের মনোমত হয় নি। হুইসলার ২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৫ 'আর্ট ফর আর্টস সেক' এই বিষয়বস্তু নিয়ে বক্তৃতা দিলেন প্রিন্স হলে। সেদিন 'Pall Mall Gazette'-এর তরফ থেকে ওয়াইলড বক্তৃতা-সভায় উপস্থিত ছিলেন। পরদিনের পত্রিকায় ওয়াইলড-লিখিত রিপোর্ট প্রকাশিত হল। অসকার বললেন, 'হুইসলারের জীবনের এই প্রথম বক্তৃতা। সর্বপ্রকার বক্তৃতার অসারতা নিয়ে তিনি এক ঘণ্টার উপর বক্তৃতা দিলেন।' তারপর চিত্রশিল্পীর ওপর কবির শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করে বললেন, "The Poet is the supreme artist and the real musician besides, and is lord of all life and all arts."

রিপোর্টের বক্রোক্তিতে হুইস্‌লার চট্‌লেন, কিন্তু অধিকতর ক্ষিপ্ত হলেন যখন লোকমুখে শুনলেন যে তাঁর প্রিন্স হলের বক্তৃতাটি নাকি অসকারের কাছ থেকেই নেওয়া। হুইসলার লিখলেন—আর্ট সম্পর্কে অসকারের সঙ্গে আমাদের কোথায় মিল? সে আমাদের সঙ্গে এক পাতায় খায়, আমাদের প্লেট থেকে 'মেওয়া' কুড়িয়ে নিয়ে পুডিং তৈরি করে মফস্বলে ফেরী করে।

অসকার অবশ্য এর জবাব দিয়েছিলেন আরও কঠোরতর ভাষায়। যদিচ তাঁর মতে যারা তর্ক করে বৈদগ্ধ্যের দিক থেকে তারা দেউলিয়া, তবু তিনি বলেছিলেন Vulgarity begins at Home and should be allowed to stay there।

এই বন্ধুত্ব শেষ পর্যন্ত তাই প্রচণ্ড বিরোধিতায় শেষ হ।

অসকার ওয়াইলডের জীবননাট্যে রবার্ট রসের মিকাটুকু উপেক্ষণীয় নয়, গুরুত্ব মোটেই কম নয়। ১৮৮৬ ষ্টাব্দে অক্সফোর্ডে উভয়ের প্রথম পরিচয়। রবার্টের য়স তখন সতেরো, অসকারের বয়স একত্রিশ। কুইন্স াউন্সেল জন রস যখন মারা যান তখন রবার্টের বয়স মাত্র বছর। ছেলেদের শিক্ষাদীক্ষা যেন ইংলণ্ডে হয় মৃত্যু-ালে তিনি এই নির্দেশ দিয়ে যান। কেম্ব্রিজের কিংস লেজে পড়তে এসেছিল রবার্ট। সেখানে বছরখানেক াকার পর রবার্ট রস সব ছেড়ে সাহিত্য ধরল, এবং Saturday Review' এবং 'Scots Observer' প্রভৃতি ত্রিকায় তার রচনা প্রকাশিত হল। রবার্ট রস অল্পবয়সেই সাহিত্যিক মহলে পরিচিত হয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করল, অনেক প্রখ্যাত সাহিত্যিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হল আর বিশেষ অন্তরঙ্গতা হল এডমণ্ড গসের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত রবার্ট রস এক আর্ট গ্যালারী প্রতিষ্ঠা করে শিল্প সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যবস্থা করল। রবার্ট রস ছেলেটির জনপ্রিয়তার কারণ তার আত্মপ্রচারের দিকে কোনও লক্ষ্য ছিল না। পরোপকারী এবং স্বার্থহীন এই ছেলেটিকে সবাই তাই পছন্দ করতেন। সাহিত্যজীবনের প্রারম্ভে রবার্ট রসের কাছে নানাবিধ সাহায্য পেয়েছেন অসকার ওয়াইলড। বয়সের তারতম্য সত্বেও ক্রমশঃ উভয়ের মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্ব জমে উঠল। এই কালেই অসকার তাঁর বিখ্যাত রূপকথা লিখতে শুরু করলেন।

'The Woman's World' সম্পাদনাকালে বা 'The Pall Mall Gazette' ও অন্যান্য পত্রিকায় সাময়িক রচনাবলী প্রকাশের সময় অসকার ওয়াইলড কয়েকটি ছোটগল্প, রূপকথা, প্রবন্ধ এবং উপন্যাস রচনা করেন। গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে সেগুলি ধারাবাহিক ভাবে সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় 'The Court and Society Review' পত্রিকায় অসকারের "The Canterville Ghost" প্রকাশিত হয়। এই গল্পেই শিল্পী হিসাবে অসকারের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা হয়। 'Lord Arthur Savile's Crime and other Stories' নামক গল্প-গ্রন্থে এইসব গল্প সঙ্কলিত হয়েছে। এইরকম আরও কয়েক সহস্র গল্প অসকার লিখতে পারতেন। কথাপ্রসঙ্গে, মদ্যপানের আসরে, নাটকাভিনয়ের অবসরে, ভোজসভায় প্রভৃতি বিভিন্ন পরিবেশে এমনই অনেক গল্প অসকার বলতেন, সেগুলি তিনি লেখেন নি কিন্তু অপর লোকে সেইসব গল্প পরে লিখেছেন। চটুলতা, রোমাণ্টিক আবেগ, বুদ্ধির দীপ্তি ও হৃদয়াবেগের সমন্বয়ে অসকারের গল্পের এক নিজস্ব মেজাজ গড়ে উঠেছিল।

এইদিক থেকে আমাদের দেশের শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মিল আছে। শরৎচন্দ্র আসরে বসে চমৎকার মজলিসী গল্প বলতে পারতেন, ভালবাসতেন গল্প করতে। লেখক হিসাবে কুড়ে ছিলেন, পরিশ্রমী ছিলেন না শরৎচন্দ্র। অসকারেরও লেখার জন্য কায়িক শ্রম ও সময় ব্যয় করা কষ্টসাধ্য ছিল। যাঁরা অসকারকথিত গল্প স্বকর্ণে শুনেছেন, তাঁদের মতে অসকারের লিখিত কাহিনীতে স্বাদ অনেক কম। অসকার বলতেন, "Writing bores me."

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে 'The Happy Prince and Other Tales' প্রকাশিত হল। অসকারের রূপকথা পড়ে সাহিত্যপাঠকরা বিস্মিত হলেন। সমালোচকদের উত্তরে অসকার বলেছেন—"I had about as much intention of pleasing the British child as I had of pleasing the British public." অসকারের একজন জীবনীকার বলেছেন, 'এই উক্তি সত্য, তবে একজন আইরিশ বালককে তিনি পুরোমাত্রায় খুশী করেছেন, তার নাম অসকার ওয়াইলড। কারণ হানস অ্যাণ্ডারসন থেকে জেমস ব্যারী পর্যন্ত ছোটদের লেখক-মাত্রই ভাবাবেগের দিক থেকে অপরিণতবুদ্ধি।' ১৮৯১, নভেম্বর মাসে 'A House of Pomegranates'

প্রকাশিত হয়। "The young king" গল্পটির প্রতি লেখকের অসীম মমতা ছিল। কারাদণ্ডের পূর্ব পর্যন্ত অসকার বলতেন—"technically speaking all my works are equally perfect." কিন্তু কারামুক্তির পর বলেছেন—কিছুই হয় নি, আমার রচনাবলী আমার প্রতিভার অসম্পূর্ণ অভিব্যক্তি।

সমালোচকদের মতে এই সময় থেকেই অসকারের প্রকৃতিতে এক বিচিত্র পরিবর্তন লক্ষিত হল। বাহ্যতঃ রূপকথা সরল এবং নির্দোষ মনে হলেও তার মধ্যে বিকৃত মনোবিকারের প্রবণতা আছে। এই সবই রবার্ট রসের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার সমকালীন যুগের অভিব্যক্তি। তাই অনেকের মনে সন্দেহ জাগে রবার্ট রসই অসকার ওয়াইলডের জীবনের দুষ্টগ্রহ। ফ্রাঙ্ক হ্যারিস লিখেছেন—রবার্ট রস নাকি বলে বেড়াত অসকার ওয়াইলডের সেই সর্বপ্রথম 'ছোকরা বন্ধু', এই গৌরব বা অখ্যাতির অধিকারী অ্যালফ্রেড ডাগলাস নয়। যদিচ ফ্রাঙ্ক হ্যারিসের সব কথার সমর্থন নেই এবং অতিরঞ্জন, মিথ্যাকে সত্য বলে চালানো, স্বকপোলকল্পিত কাহিনী অপরের ঘাড়ে চাপানোর অভ্যাস প্রভৃতি নানাবিধ বদনাম আছে, তবু এই ঘটনাটি হয়তো সত্য এ কথা মনে করা যায়। সেরার্ডও নাকি এমনই সন্দেহ করতেন। অ্যালফ্রেড ডাগলাস রসকে পছন্দ করতেন। তাঁর মতে রবার্ট রস ভাবালু, নার্ভাস এবং আবেগপ্রধান আত্মপ্রচারবিমুখ মানুষ। অসকারের প্রকৃতি-পরিবর্তন মনোবিজ্ঞানীর বিচার্য বিষয়। আগে যাকে বিকৃতরুচি বা যৌন-বিকার বলা হত, বর্তমানে তার নাম অ-স্বাভাবিক। প্রশ্ন হতে পারে যা স্বাভাবিক তার সংজ্ঞা কি? ফৌজদারী আদালতের রায় প্যাথলজিস্টের বিচারে নস্যাৎ হয়ে গেছে। অসকারের জীবনে কেন এই পরিবর্তন এল, কে তার জন্য দায়ী, তিনি কতটুকু 'স্বাভাবিক' আর কতখানি 'অ-স্বাভাবিক' এইসব সূক্ষ্ম-বিচারের ফল এখনও প্রকাশ পায় নি। মনীষীদের জীবনে কিছু না কিছু যৌন-বিকার বা বৈচিত্র্য দেখা যায়। অসকারও তেমনই একজন উদ্ভট প্রতিভাধর মানুষ, বিকৃত, বিভ্রান্ত, বিপথগামী। এই পরিবর্তনের ধারায় অসকারের ভূমিকা সক্রিয় কিংবা নিষ্ক্রিয় সেই কথা বলাও কঠিন তবে অসকার ওয়াইলডের সামগ্রিক জীবনের পরিচ এবং অক্সফোর্ডে পঠদ্দশায় সিফিলিসের আক্রমণ যা সত্য হয়, তা হলে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছনো কঠি হয় না।

দুটি সন্তানের জননী প্রিয়তমা স্ত্রীকে কেন যে অসকা পরিত্যাগ করেছিলেন সে কথাও অনুমানের ভিত্তিে প্রতিষ্ঠিত। অসকার স্বয়ং এই বিষয়ে বিভিন্ন স্থানে বিভি মন্তব্য করেছেন। সেই সব মন্তব্য কোনও কোনও ক্ষে বীভৎস। তাই জীবনীকারদের মতে রবার্ট রসের সা ঘনিষ্ঠতার যুগ থেকেই অসকারের প্রকৃতিও পরিবর্তিত সেই কালেরই মানবিক অভিব্যক্তি রূপকথা ও অ রচনায় প্রকাশিত। এই সময়ে অসকার কাজও করেছে সবচেয়ে বেশী। গদ্যরচনাও ক্রমশঃ একটা আকার এব লেখকের নিজস্ব ভঙ্গি লাভ করেছে।

অসকারের এই সময়ে লেখা, কথোপকথনের ভঙ্গিে রচিত একটি প্রবন্ধের কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি—

> মানুষের জীবন আর সাহিত্য; জীবন আ জীবনের অনবদ্য অভিব্যক্তি। মানুষের জীবন সম্বে গ্রীকরা যেসব নীতি নির্ধারণ করে গিয়েছেন, বর্তমা কালের এই অসত্যের মধ্যে তার বিচার ক কঠিন। আর অন্য ব্যাপারে তাঁরা যে বিধা দিয়েছেন তা এমনই সূক্ষ্ম যে আমরা তার অর্থ গ্রহ করতে পারি না। তাঁরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলে যে যে শিল্পের মধ্যে মানব-জীবনের অনন্ত বৈচিত্র প্রতিফলিত সেইখানেই শিল্পের সম্পূর্ণ সার্থকতা।

এই বিচিত্র প্রবন্ধের অপর এক অংশে অসকা বলেছেন—

> তোমার মতে হয়তো এই জীবন ধর্ম এ নীতি-বহির্ভূত। কথাটি সত্য। সব শিল্পকর্ম নীতিবিরুদ্ধ, যে আর্ট স্থূল এবং ইন্দ্রিয়জ বা যে-অ নীতিবাদের প্রচারক, সেগুলি অবশ্য ব্যতিক্রম তাদের চেষ্টা মানুষকে সৎ বা অসৎকর্মে প্ররোচি করা, কারণ সকল কর্মই নীতিশাস্ত্রগত। আ

কোনও কর্মে মানুষকে নিযুক্ত করে না। শুধু একটা মানসিক ভাবান্তর সৃষ্টি করে।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে "The Portrait of [M]r. W. H." প্রকাশিত হয়। এই রচনাটিকে অতি-[প্রা]কৃত কাহিনী বলা চলে। এই রচনার মধ্যে সুস্পষ্টভাবে [অ]সকার ওয়াইলডের সমকামিতার প্রতি আগ্রহ লক্ষ্য [ক]রা যায়। সেইকালে কোনও লেখক সমকামিতার প্রতি [প্র]চ্ছন্ন সমর্থন বা সহানুভূতি জানিয়ে সাহিত্য রচনা করতে [পা]রেন এ কথা ভাবা যেত না। 'Blackwoods' [প]ত্রিকায় প্রকাশিত এই রচনাটি সর্বসাধারণের নজরে [আ]সে নি, কারণ পত্রিকার প্রচারসংখ্যা বেশী ছিল না। [ত]বু W. H. কিংবা উইল হিউজেস ব্যক্তিটি যে কে তা [অ]নেকে সন্ধান করেছেন।

এই রচনাটি কাহিনীকারে গ্রথিত। সেক্সপীরীয় [স]াহিত্য সম্পর্কে ওয়াইলডের পাণ্ডিত্যের পরিচয় এই [র]চনাটিতে পাওয়া যাবে। উইল হিউজেস নামক একটি তরুণ অভিনেতার ওপর সেক্সপীয়রের যৌন-আকর্ষণ ছিল এই কথাই এই কাহিনীর মূল বক্তব্য। এই তরুণ অভিনেতা ডেসডেমোনা, পোর্সিয়া, রোসালিণ্ড, জুলিয়েট প্রভৃতি ভূমিকায় অভিনয় করতেন। যুক্তি হিসাবে রচনাটি হয়তো চলে যেত, কিন্তু হিউজেসকে একেবারে জীবন্ত চরিত্রে পরিণত করেছেন অসকার, সেই কারণেই নানা জল্পনার সূত্রপাত হল। এই সূত্র থেকেই সমালোচকরা মনে করেন এই সময় থেকেই অসকারের প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটেছে এবং স্বাভাবিক সুস্থ জীবনযাত্রার পরিবর্তে অস্বাভাবিক জীবনযাত্রা শুরু করেছেন।

এই রচনা সকলের নজরে না পড়লেও এর পরবর্তী রচনা 'The Picture of Dorian Gray' আন্দোলনের সৃষ্টি করল। সর্বত্র আলোচনা হতে লাগল এই উপন্যাসটির এবং এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে।

এই উপন্যাসটি অতি সহজ এবং সরল, দ্বৈত ব্যক্তিত্বের বিষয় নিয়ে কাহিনীটি রচিত। এর আগে স্টীভেনসনের 'Doctor Jekyll and Mr. Hyde' প্রকাশিত হয়েছে, এবং সেই কাহিনী সর্বজনপরিচিত।

Lippincott's Magazine নামক মার্কিন নীতি-বাগীশ পত্রিকায় 'The Picture of Dorian Gray' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। সেই পত্রিকায় তখন সমকালীন লেখক রচিত একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত হত। এই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ শুধু জুলাই, ১৮৯০ সংখ্যায় উপন্যাসটি প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হন নি, ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসঙ্কয়নেও এই উপন্যাসকে প্রথম স্থান দেওয়া হয়েছে। সমসাময়িক অন্যান্য লেখকেরা আজ বিস্মৃতির অতলতলে, কিন্তু Lippincott পত্রিকার সম্পাদকরা সেই ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থটিকে 'মাস্টারপীস' হিসাবে স্থান দিয়েছেন। মহৎ শিল্পকর্ম হিসাবে এই গ্রন্থটি আজ বিশ্বসাহিত্যে 'ক্লাসিকে'র মর্যাদালাভ করেছে।

এই গ্রন্থের বহু রকমের সংস্করণ পাওয়া যায়, এতগুলি বিভিন্ন সংস্করণ আর কোনও গ্রন্থের ভাগ্যে ঘটে নি। অনুমোদিত সংস্করণ ভিন্ন এই গ্রন্থের চোরাই সংস্করণও আছে।

এই গ্রন্থ রচনাকালে অসকার ওয়াইলডের বয়স ছত্রিশ; অসকার এই সময় বিশেষ অর্থকষ্টে বিব্রত। এতদিন আর্টের খাতিরে কাজ করেছেন, এই রচনায় হাত দিয়েছেন অর্থের মোহে।

আর্ট বা অর্থ যার খাতিরেই তিনি এই কাজে হাত দিন, এই গ্রন্থে তিনি স্বপ্রকাশ, তাঁর প্রতিভার পরিপূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় এই উপন্যাসে। যা তাঁর চরিত্রের ত্রুটি, যা তাঁর চরিত্রের সদ্গুণ সব এই গ্রন্থে বর্তমান। ফ্লবেয়ার একদিন আপনাকে মাদাম বোভারী বলে স্বীকার করেছিলেন, অসকারও বলতে পারেন আমিই ডোরিয়ান।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ার্ড লক অ্যাণ্ড কোম্পানি আরও কয়েকটি পরিচ্ছেদ সংযুক্ত করে এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। সেই সময়ে প্রকাশক লেখককে অনুরোধ করেন—'ডোরিয়ানকে কি আর একটু বাঁচিয়ে রাখা যায় না? অনুশোচনার ফলে সে কি সৎ হতে পারে না?'

সেদিন অসকার শুধু হেসেছিলেন, কোনও জবাব দেন নি।

অসকার ওয়াইলড একদা বলেছিলেন, আমার সমগ্র প্রতিভা ঢেলেছি নিজের জীবনে, আর রচনায় দিয়েছি মনীষা। মানুষটি আর তাঁর রচনাবলী সর্বদর্শনসমন্বয়। ডোরিয়ান গ্রের বিষয়বস্তু তাই বহুবিধ। প্রথমতঃ ওয়াইলডের হেলেনীয় সৌন্দর্যপ্রীতি। দ্বিতীয়তঃ ওয়ালটার পেটারের দর্শনের সমর্থন। ওয়ালটার পেটার বলতেন, "Burn always with this hard gem-like flame to maintain this ecstasy", তৃতীয়তঃ বালজাকের কল্পনাপ্রসূত Peau de Chagrin, এবং হুয়াসমানের মত যত কিছু অদ্ভুত আর অলৌকিক, এবং বিকৃতরুচি, তার সন্ধানমত্ততা।

'A Rebours' উপন্যাসের নায়ক যেন ডোরিয়ান গ্রের জ্যেষ্ঠ সহোদর। ওয়াইলড এই গ্রন্থটির কাছে ঋণী। তিনি বলেছেন, 'এই গ্রন্থ পীত গ্রন্থ, এমন অদ্ভুত বই ডোরিয়ান আর পড়ে নি—বিষাক্ত বই।' অথচ আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে অসকার বলেছেন, কোনও গ্রন্থ কাউকে খারাপ করতে পারে না। অসকারের কাছে সৌন্দর্যতত্ত্ব আর আর্ট দুটি বিভিন্ন বস্তু।

ডোরিয়ান গ্রের মধ্যে সৌন্দর্য আছে; ডোরিয়ান গ্রে তাই সৎ ও অসৎ উভয়বিধ বস্তুর সমন্বয়। অসৎ প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ডোরিয়ানের হাতেই ছিল। সে কিন্তু ধ্বংসাত্মক পথেই পদক্ষেপ করেছে। সেক্সপীয়ার তরুণ অভিনেতা উইল হিউজেসের তারুণ্যের আকর্ষণে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন, Picture of Dorian Gray গ্রন্থের আর্টিস্ট বেসিল হলওয়ার্ড তরুণ ডোরিয়ানের প্রভাবে পড়েছেন। ডোরিয়ান একদিকে তাঁর প্রেরণা, আর অপর দিকে ঘাতক।

ওয়াইলডের মতে জীবন আর্টকে অনুসরণ করে, অনুকরণ করে। ব্যক্তিগত জীবনে লর্ড অ্যালফ্রেড ডাগলাস ছিলেন ডোরিয়ান আর স্বয়ং ওয়াইলড বেসিল হলওয়ার্ড।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে অসকার ও অ্যালফ্রেড ডাগলাসের প্রথম দর্শন; ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মার্কুইসের বিপক্ষে ওয়াইলডের অবিবেচনা-প্রসূত যে মামলা দায়ের করা হয়েছিল তার মধ্যে বারবার এই সুবিখ্যাত গ্রন্থের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

ডোরিয়ান গ্রে গ্রন্থের অপূর্ব রচনাশৈলী শুধু অসকার ওয়াইলডের পক্ষেই সম্ভব। দীর্ঘকালের ব্যবধানেও ওয়াইলডের নায়কের রূপ ও যৌবন অটুট রয়ে গেল। ডোরিয়ানের বীভৎস চারিত্রিক ত্রুটি প্রতিফলিত হল ক্যানভাসের পর্দায় আঁকা ছবিটিতে।

ওয়াইলডের রচনার ক্ষুরধার শ্লেষ ও ব্যঙ্গ, অনুপম কাব্যধর্মী গদ্য, সমকালীন যুগের রীতিনীতি সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ এই গ্রন্থটিকে মূল্যবান করে তুলেছে।

উচ্ছৃঙ্খল জীবন আর অভিশপ্ত যৌবনের ব্যথা ও বেদনার অভিনব কাহিনী 'Picture of Dorian Gray'—এ কথা সর্বজনস্বীকৃত।

আমেরিকার 'Lippincott' পত্রিকার প্রতিনিধি লণ্ডনে একটি ছোট্ট ভোজসভায় অসকার ওয়াইলড, বৃটিশ পার্লামেন্টের আইরিশ সদস্য গিল এবং আর্থার কোনান ডয়েলকে আমন্ত্রণ করেন। কোনান ডয়েল তখন উদীয়মান তরুণ লেখক, পসারহীন ডাক্তার। অসকার সম্পর্কে সেই প্রথম পরিচয়ের কথা কোনান ডয়েল লিপিবদ্ধ করেছেন—"He towered above us all, and yet had the art of seeming to be interested in all that we could say....He took as well as gave, but what he gave was unique."

এই দিনকার আলোচনার ফলেই কোনান ডয়েল 'Lippincott' পত্রিকায় 'The Sign of Four' এবং অসকার 'The Picture of Dorian Gray' উপন্যাস প্রকাশ করেন।

অসকার লিখিত এই উপন্যাসটির প্রথম অবস্থায় একটি গল্পের আকার ছিল, বালজাকের *Peau de Chagrin* বা এডগার অ্যালান পো'র "William Wilson" জাতীয় কাহিনী, পরে এর সঙ্গে অভিনেত্রীর কাহিনী অংশ সংযুক্ত করা হয়, প্রেমে পড়ার ফলে প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটল। শিল্পীদের সঙ্গে অসকারের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল, তিনি তাদের স্টুডিওতে অনেক সময় কাটাতেন, চমৎকার মজলিসী লোক হিসাবে অসকারকে সবাই প্রীতির চোখে দেখতেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বেসিল ওয়ার্ড নামক জনৈক

শিল্পীর স্টুডিওতে নিয়মিত যাতায়াত করতেন অসকার। সেই সময় এক পরম রমণীয় কিশোর কুমারের পোর্ট্রেট আঁকছিল ওয়ার্ড। ছবি আঁকা শেষ হওয়ার পর ছেলেটি যখন চলে গেল তখন ওয়াইলড হঠাৎ বললেন—"what a pity that such a glorious creature should ever grow old !" (এমন সুন্দর প্রাণীও একদিন বুড়ো হবে।) অসকারের মত সমর্থন করে শিল্পী ওয়ার্ড বললেন, এমন যদি হত—ছেলেটি এমনই সুন্দর থাকত, আর ছবিটা বয়সের সঙ্গে জীর্ণ ও বিকৃত হয়ে যেত! এই আইডিয়াটুকু ওয়াইলডকে এক বিচিত্র প্রেরণা দিয়েছে। তাই উপন্যাসের শিল্পীর নাম বেসিল হলওয়ার্ড দিয়েছেন অসকার। এইভাবে ঋণ স্বীকার করেছেন। এই গ্রন্থের লর্ড হেনরী ওটন যেন অসকার চরিত্রেরই প্রতিফলন। জীবন-যৌবন ও রূঢ় বাস্তব সম্পর্কে লর্ড হেনরীর বক্তব্য যেন অসকারেরই কণ্ঠনিঃসৃত উক্তি।

আর্থার কোনান ডয়েলকে এই গ্রন্থ সম্পর্কে অসকার বলেছিলেন—"Between me and life there is a mist of words always, I throw probability out of the window for the sake of a phrase, and the chance of an epigram makes me desert truth. Still I do aim at making a work of art..."

গ্রন্থটি প্রকাশের সঙ্গে চতুর্দিকে তীব্র নিন্দা শুরু হল। অতি কঠোর সমালোচনা হল। কেউ বললেন, পুস্তক-লেখক ও প্রকাশককে অবিলম্বে দণ্ডিত করা হোক।

আর একটি পত্রিকা লিখলেন এর চেয়ে অসকার ওয়াইলড দরজীর দোকান খুলে সম্মানজনক কর্মে আত্ম-নিয়োগ করুন। লেখকের মস্তিষ্ক, বুদ্ধি, শিল্পজ্ঞান আছে, কিন্তু রুচি বিকৃত।

এখনকার কালে এই জাতীয় গ্রন্থসমালোচনায় বিক্রি বাড়ে, তখনকার কালে নীতির মূল্য ছিল অনেক বেশী, তাই এই সব বিরূপ সমালোচনা। ওয়ালটার পেটারও 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' গোছের একটা সমালোচনা করলেন 'The Bookman' নামক পত্রিকায়।

অসকার এর উত্তর দিলেন—"Yes, there is a terrible moral in Dorian Gray—a moral which prurient will not be able to find in it, but it will reveal to all those whose minds are healthy. Is this an artistic error ? I fear it is. It is the only error in the Book."

এর কিছু পরে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ সংখ্যা 'Fortnightly Review' পত্রিকায় 'A Preface to Dorian Gray' প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সংস্করণে এই নিবন্ধটি গ্রন্থে সংযুক্ত হয়।

অসকার এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে লিখেছেন :

"সকল আর্টই রসবস্তুর স্রষ্টা। শিল্পকে প্রকাশ করে শিল্পীকে প্রচ্ছন্ন রাখাই আর্টের লক্ষ্য।

যিনি নূতন ধারায় বা ভিন্ন ভঙ্গীতে রূপবস্তুকে রূপান্তরিত করেন, তিনিই সমালোচক।"

এই নিবন্ধেই অসকার ওয়াইলডের সেই বিখ্যাত উক্তি পাওয়া যায় :

"শ্লীল বা অশ্লীল গ্রন্থ বলে কিছু নেই। গ্রন্থ হয় সুলিখিত নয় কুলিখিত। এই পর্যন্ত।

কোনও শিল্পী কোনও সময়েই বিকারগ্রস্ত নন। তিনি সব কিছুই প্রকাশে পটু।

চিন্তা আর ভাষা শিল্পীর পক্ষে আর্টের হাতিয়ার।

পাপ আর পুণ্য শিল্পীর কাছে শিল্পের উপজীব্য।

আঙ্গিকের দৃষ্টিকোণে সকল আর্টের প্রকৃতি যেন সঙ্গীতবিদের আর্ট। আর অনুভূতির দৃষ্টিকোণে রূপদক্ষের অভিনয়-নৈপুণ্য হল চরিত্রসৃষ্টি।

সকল আর্ট তাই একাধারে সমতল ও প্রতীকধর্মী।

সমতল পার হয়ে যারা অতলে ডুব দেয় তারা বিপদের দায়িত্ব নেয়।

আর্টের আয়নায় প্রতিফলিত হয় দর্শক,—জীবন সেখানে প্রতিফলিত হয় না।"

এই গ্রন্থের মাধ্যমে অসকার নব্য সুখবাদ (Hedonism) সম্পর্কে নিজস্ব দর্শন প্রচার করেছেন। লর্ড হেনরীর মুখনিঃসৃত বাণীর মধ্যে লেখকের আত্মপ্রকাশ লক্ষণীয়—

'আমার মনে হয় মানুষ যদি নিজের জীবন থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্যুত হয়ে তার অনুভূতিকে রূপ দিতে পারে তা হলে জগৎ আনন্দের এমন এক নূতন স্বাদ পাবে যে আমরা আমাদের মধ্যযুগীয় ব্যাধি থেকে মুক্তি পেয়ে হেলেনিক আদর্শে ফিরে যাব—হয়তো হেলেনিক আদর্শের চাইতেও সূক্ষ্মতর, মহত্তর কিছুর সন্ধান পাব! কিন্তু বর্তমানকালে যিনি সবচেয়ে নির্ভীক তিনি নিজের সম্পর্কে শঙ্কিত। যে আত্মবঞ্চনা আমাদের জীবনকে নষ্ট করে তার মধ্যেই যে পিশাচকে আমরা দমন করার চেষ্টা করি তার উজ্জীবন ঘটে। যে আবেগ দমন করার জন্য আমরা সচেষ্ট তা মনের ভিতর পাক খায় আর জীবনটা বিষময় করে তোলে। দেহ একবার মাত্র পাপ করে, আর পাপের হাতে তার নিষ্কৃতি, কারণ সব কর্মই শুদ্ধির পথ। শুধু আনন্দের আস্বাদটুকু বা একটা অনুতাপ মনে জেগে থাকে, আর কিছুই থাকে না। মোহ বা আসক্তির হাত

থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র পথ তার মধ্যে ঝাঁপ দেওয়া।…

…এই যে আপনার গোলাপ-রাঙা যৌবন, এই যে গোলাপ-শুভ্র কৈশোর, এই নিয়ে আপনি আপনার বাসনা-কামনায় বিব্রত, ভয় ও ভাবনায় উদ্‌ভ্রান্ত, দিবাস্বপ্ন-নিশীথস্বপ্নের স্মৃতিই লজ্জায় আপনার মুখ রাঙা করে তোলে।'

লর্ড হেনরী অতঃপর ডোরিয়ানকে বলছেন, 'সৌন্দর্যের মধ্যে আছে প্রতিভার অভিব্যক্তি, হয়তো প্রতিভার চেয়ে বড়, এর কোনও কৈফিয়ত নিষ্প্রয়োজন।… এখন হাসছেন, যখন এই সম্পদ হারাবেন তখন আর হাসবেন না।—বিধাতা আপনার ওপর সদয়, তিনি যা দেন আবার ফিরিয়ে নেন। কয়েক বছর মাত্র পরিপূর্ণরূপে বাঁচবেন, যৌবনের সঙ্গে রূপও চলে যাবে, তখন হঠাৎ আবিষ্কার করবেন তার জয়মাল্য আর আপনার গলায় নেই, তখন যে-অতীতের স্মৃতিটুকু বহন করতে হবে পরাজয়ের গ্লানির চেয়ে তা তীক্ষ্ণ ও নির্মম। প্রতি মাসে আপনি সেই ভয়ংকরের দিকে এগিয়ে চলেছেন, শেষের সেই ভয়ংকর দিন।…জীবনের সোনালী মুহূর্ত অপচয় করবেন না,—বাঁচুন, বাঁচার মত বাঁচুন। যে অপরূপ জীবন পেয়েছেন তার মাধুরী উপভোগ করুন। নতুন আনন্দ, নতুন উত্তেজনার সন্ধানে ঘুরুন। কোনও কিছুকে ভয় করবেন না, এ যুগে চাই নতুন সুখবাদ। আপনি হবেন তার দৃষ্টপ্রতীক। এমন কিছু নেই যা আপনার করায়ত্ত নয়। মাত্র একটি ঋতুর জন্য এই পৃথিবী আপনার…

যৌবন অতি ক্ষণস্থায়ী। সাধারণ পাহাড়ী ফুলও ঝরে পড়ে, কিন্তু আবার মুকুলিত হয়। লাবারনাম আগামী জুন মাসে আবার আজকের মতই পীত হয়ে ফুটে উঠবে। আর একমাস পরে ক্লেমাটিস লতায় নক্ষত্রের রঙ লাগবে, ক্লেমাটিসের সবুজ আকাশের গায়ে এমনই তারার মত ফুল ফুটবে, আমরা কিন্তু আর যৌবন ফিরে পাব না। যে-আনন্দ কুড়ি বছর বয়সে ধমনীর মধ্যে প্রবাহিত তা শ্লথ হয়ে আসবে, অঙ্গ অবশ হবে, চেতনার তীক্ষ্ণতা হ্রাস পাবে। আমরা ক্রমশঃ পুতুলনাচের পুতুলের মত বিশ্রী হয়ে উঠব।…তারুণ্য! যৌবন! পৃথিবীতে তারুণ্য ছাড়া আর কিছুই নেই—'

(The Picture of Dorian Gray—Chapter II)

অসকারের জীবনের মধ্যে উপরোক্ত উক্তির এক বিচিত্র প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। ওয়ালটার পেটারের নন্দনতত্ত্ব একদা অসকারকে যে-শিক্ষা দিয়েছিল তা তিনি পরিপূর্ণরূপেই গ্রহণ করেছিলেন।

এই ডোরিয়ান গ্রের মাধ্যমেই হয়তো লর্ড অ্যালফ্রেড ডাগলাসের সঙ্গে অসকারের পরিচয় ঘটে, আর সেই পরিচয় তাঁর জীবনের সর্বনাশ ডেকে আনে। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে যখন উভয়ের প্রথম দেখা হয় তখন ডাগলাসের বয়স কুড়ি—যেন রক্তমাংসের জীবন্ত ডোরিয়ান গ্রে।

আট

সেণ্ট জেমস থিয়েটারের মিঃ জর্জ আলেকজাণ্ডার অসকারকে একটি নতুন নাটক লেখার জন্য উৎসাহিত করেন। লোকটি ফ্যাশনপ্রিয় ছিলেন, সেণ্ট জেমস্ থিয়েটার ফ্যাশনদুরস্ত রঙ্গমঞ্চ, আর সেই রঙ্গমঞ্চ অসকারের মত লেখকের চটকদার নাটক অভিনয় করলে হয়তো জমবে এই তাঁর ধারণা ছিল। তাই তিনি অসকারকে অনুরোধ করলেন একটি নাটক রচনার জন্য। অসকার বললেন, 'কালই একটা প্যানটোমাইম লিখে দেব।'

তখন অসকারের অর্থকষ্ট চলছে, তাই সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই এই প্রস্তাব। একশো পাউণ্ড অগ্রিম দেওয়া হল এবং অসকার তা খরচ করে উড়িয়ে দিলেন। আরও কিছু চাই, কিন্তু নাটক এক লাইনও লেখা হল না।

আলেকজাণ্ডার একদিন বললেন, কবে নাটক দেখব?

ওয়াইলড বললেন, যে কোনদিন খুশী যে কোনও নাটক দেখতে পার। যে রঙ্গমঞ্চে হচ্ছে সেইখানে যাও, আর আশা করি একটা ভাল সীট পেয়ে যাবে।

আমি কোন্ নাটকের কথা বলছি তা তুমি জান?

ভেঙে না বললে কি করে বুঝব?

যে-নাটক আমার জন্য লেখার কথা ছিল।

ওঃ, তাই বল, তা সে ভাই এখনও লেখাই হয় নি, দেখবে কি করে?

লিখতে শুরু করেছ কি?

না, কালি-কলম নিয়ে লিখতে শুরু করি নি, তবে মগজে এসেছে। সেখানেই এখন থাক্।

তোমার টাকার দরকার নেই?

টাকা! টাকার তো অনেক প্রয়োজন। ভাল কথা, তোমার কাছে আমার ঋণ রয়েছে যে!

তার জন্য ভেবো না।

একটুও ভাবছি না।

এই কথাগুলি হেসকেথ পীয়ারসনকে বলেছেন জর্জ আলেকজাণ্ডার।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে Lake Windermere-এ অবসর যাপনের সময় এই নাটকটি অবশেষে লিখলেন, সব নাটকই

এই ভাবেই লিখতেন অসকার। 'Lady Windermere's Fan' রচিত হল। আলেকজাণ্ডার নাটকটি পড়েই বললেন, চমৎকার হয়েছে, আমি হাজার পাউণ্ড দিয়ে অভিনয়ের পুরো স্বত্ব নিয়ে নিই।

অসকার বললেন, তোমার বিচার ও নির্বাচনশক্তিতে আমার এতই শ্রদ্ধা যে এই উদারতা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করছি।

অসকারের হিসাব ঠিক হয়েছিল, এই নাটকের অভিনয়বাবদ তিনি সাত হাজার পাউণ্ড রয়্যালটি পেয়েছিলেন, তখনকার কালে তেইশ সপ্তাহব্যাপী একই নাটকের অভিনয়, একটি আশ্চর্য ঘটনা।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারি নাটকের প্রথম রজনী। নাটকের চমৎকার সংলাপ এবং চটকদার বিষয়বস্তু দর্শককে মুগ্ধ করল। অভিনয়ান্তে দর্শকের আসন থেকে নাট্যকারকে দেখার অনুরোধ হল। অসকার অর্ধদগ্ধ সিগারেট হাতে রঙ্গমঞ্চে হাজির হয়ে বললেন, 'ভদ্রমহোদয় এবং মহোদয়াগণ, আজকের সন্ধ্যাটি বিশেষভাবে উপভোগ করেছি, অভিনেতৃবর্গ চমৎকার নাটকের চমৎকার অভিনয় করেছেন, এবং আপনাদের অভিনয়ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। এই সাফল্যে ও আপনাদের এই অভিব্যক্তির জন্য ধন্যবাদ, এই দেখে আমার মনে হয়েছে যে এই নাটক সম্পর্কে আমার মত আপনাদেরও উচ্চ ধারণা।'

কিন্তু এই উক্তির মধ্যে অভব্যতা এবং অর্ধদগ্ধ সিগারেট পানের মধ্যে বে-আদবী দেখে সকলে বিরক্ত হলেন। উইলিয়াম আর্চার অভিনয় দেখে বললেন, এই নাটক ক্লাসিকের মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য।

ভিনসেণ্ট ও'সালিভান লিখিত 'Aspects of Wilde' নামক গ্রন্থে 'Salome' নাটক সম্পর্কে চমৎকার কাহিনী আছে। তিনি বলেছেন, 'অসকার এই বিষয়-বস্তু নিয়ে কিছুকাল ধরে চিন্তা করছিলেন। প্যারীতে অবস্থান-কালে বন্ধুদের এক লাঞ্চ-সভায় ডেকে তিনি এই নাটকের সম্ভাব্য সংলাপ নিয়ে আলোচনা করেন। বাড়ি ফিরে একটি নতুন খাতা টেবিলের ওপর দেখে তৎক্ষণাৎ নাটক লিখতে বসলেন অসকার, কলমের ডগায় যেন আপনি খই ফুটতে লাগল। রাত এগারোটা পর্যন্ত এইভাবে লিখে চলেছেন, তারপর ঘড়ির দিকে লক্ষ্য করে তাড়াতাড়ি একটি কাফেতে গিয়ে খাবার দিতে বললেন এবং অর্কেস্ট্রার নেতাকে ডেকে বললেন :

'একটি মেয়ে রক্তের ওপর নগ্নপদে নৃত্যপরা, যে মানুষটিকে সে চেয়েছিল এবং হত্যা করেছে এ রক্ত তার। আমার চিন্তার সঙ্গে তাল রেখে একটা কিছু সুর বাজান।'

অর্কেস্ট্রায় নাকি এমন সুর ধ্বনিত হয়েছিল যে যারা কথাবার্তা বলছিল তারা সবাই নির্বাক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল। অসকার বাড়ি ফিরেই 'Salome' নাটকটি শেষ করলেন।

রবার্ট রস অবশ্য এই কাহিনী সমর্থন করেন না, তিনি বলেছেন যে নাটকটি টরকোয়ে নামক অঞ্চলে লিখিত। নাটকটি মূলে ইংরেজীতে রচিত না ফরাসীতে রচিত এই নিয়ে মতভেদ আছে। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে অক্টোবর প্যারীতে ফেরার পর জর্জ কার্জন (পরে ভারতের ভাইসরয় লর্ড কার্জন) একটি ব্রেকফাস্ট পার্টিতে অসকারকে আমন্ত্রণ করেন। সেইদিন অসকার বলেন, তিনি ফরাসী ভাষায় একটি নাটক লিখছেন সেটি ফ্রান্সে অভিনীত হবে ; এবং একদিন তিনি ফ্রেঞ্চ আকাদেমিসিয়ান হবেন। সেই ভোজসভার সকলেই অভিনয় দেখার জন্য ফ্রান্সে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন, কার্জন ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে যাবেন এই কথা হল। (অক্সফোর্ডে কার্জন এবং অসকার উভয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, অসকারের ঘরে বসে উভয়ে 'talking and thinking in Greek' করে অনেক সময় কাটিয়েছেন। অসকার বলতেন, কার্জন ভবিষ্যতে অনেক বড় হবেন, তাঁর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কার্জন ভারতের ভাইসরয় হয়েছিলেন এবং বলডুইন মাঝে না থাকলে হয়তো প্রধানমন্ত্রীও হতেন।)

এই আলোচনা থেকে মনে হয় অসকার সেই সময় ফরাসী ভাষায় নাটকটি রূপান্তরিত করছেন। অ্যালফ্রেড ডাগলাস ফরাসী থেকে নাটিকাটি ইংরেজীতে রূপান্তরিত করেন। তিনি বলেছেন 'এই নাটক ইংরেজীতে লেখা এবং ফরাসীতে অনূদিত। পীয়ের লুই এবং আঁদ্রে জিদ্ ফরাসী অনুবাদে সাহায্য করেছেন।' ডাগলাস লিখেছেন, 'সেই সময় অসকার ফরাসীতে তেমন দক্ষতা লাভ করেন নি। তা ছাড়া আঁদ্রে জিদ্ আমাকে বলেছেন অসকারের প্রাথমিক পাণ্ডুলিপি ছিল ভুলে এবং ত্রুটিতে পরিপূর্ণ।'

কিন্তু আঁদ্রে জিদ্ স্বয়ং লিখেছেন—"He narrated, gently, slowly, he knew French admirably."

এই সূত্রে বলে রাখা উচিত যে ডাগলাসকৃত 'Salome' নাটকের ইংরেজী অনুবাদ অসকারকে বিরক্ত করেছিল, তিনি সেই অনুবাদে স্কুলের ছাত্রসুলভ ত্রুটি দেখে বলেছিলেন—"a translation unworthy of you as an ordinary oxonian"। শিল্পী বিয়ার্ডসলীর অনুবাদও অসকার অমনোনীত করলেন।

যাই হোক মূলতঃ মেতারলিঙ্কের প্রভাবে রচিত এই নাটকটি অসকার অনেক গুণী ব্যক্তিকে পড়িয়ে শুনিয়ে-ছিলেন, তাঁদের উপদেশমত কিছু এদিক-ওদিক

পরিবর্তনও হয়তো করেছেন। সারা বার্নহার্ডকেও একদিন অনুরুদ্ধ হয়ে এই নাটক পড়ে শোনালেন। সারা তৎক্ষণাৎ নামভূমিকায় অভিনয় করবেন স্থির করলেন।

লণ্ডনের প্যালেস থিয়েটারে নাটকটি মঞ্চস্থ করা হবে স্থির হল। অসকারের উৎসাহের আর সীমা নেই, তারপর রিহার্সাল তিন সপ্তাহ চলার পর সরকারী নির্দেশে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে অভিনয় প্রদর্শন নিষিদ্ধ হল। একটা প্রচলিত প্রাচীন আইন অনুসারে ক্যাথলিক রহস্য নাটক অভিনয় আইনসঙ্গত ছিল না।

প্রথম নাটকের সাফল্যের পর এই ঘটনার আঘাতে অতি স্বাভাবিক কারণেই অসকার ভীষণ উত্তেজিত হলেন। সারা বার্নহার্ডও অসকারের ওপর চটলেন—এত সময় এবং উৎসাহ এইভাবে ব্যয়িত হল এই কারণে। একমাত্র 'The World' পত্রিকার সমালোচক উইলিয়াম আর্চার ব্যতীত কোনও সমালোচক, কোনও অভিনেতা এই সরকারী নির্দেশের বিরুদ্ধে একটিও প্রতিবাদ জানান নি। এই নিয়ে অসকারের মনে দুঃখ ছিল।

অসকার এত বেশী ক্ষিপ্ত হলেন যে একসময় ফ্রান্সে গিয়ে ফরাসী নাগরিকত্ব গ্রহণ করবেন স্থির করলেন। 'Punch' পত্রিকায় এই নিয়ে একটি কার্টুন চিত্র প্রকাশিত হয়। অসকারের ক্ষুন্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল, এই নাটক নিয়ে তিনি যতখানি চিন্তা করেছেন আর কোনও নাটক নিয়ে তত মাথা ঘামান নি।

হেরডের আদেশে সালোমে রক্তাক্ত রঙ্গমঞ্চে সাতটি ওড়নার নাচ নগ্নপদে নেচে সাধু যোকাননের মুণ্ড রৌপ্যপাত্রে উপহার প্রার্থনা করল। সাধু একদা সালোমের প্রেম প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সম্রাট হেরড প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য যোকাননের ছিন্ন মুণ্ড দিতে আদেশ দিলেন। ঘাতক ছিন্নমুণ্ড সালোমের হাতে দিল, সালোমে মুণ্ডটি আগ্রহে গ্রহণ করল, সম্রাট তাঁর আচকানে মুখ ঢাকলেন, আর হেরোডিয়ার মুখে কুটিল হাসি ফুটে উঠল। তারপর সেই মুণ্ড নিয়ে সালোমের স্বগতোক্তি শুরু হল :

"Ah! Thou wouldst not suffer me to kiss thy mouth, Jokanaan. Well! I will kiss it now. I will bite it with my teeth as one bites a ripe fruit. Yes, I will kiss thy mouth, Jokanaan. I said it; did I not say it? I said it. Ah! I will kiss it now."

হেরডের নির্দেশে সভাভঙ্গ হল, রাজসভার মশাল নির্বাপিত হল। একটি কালো মেঘে আকাশের চাঁদ সম্পূর্ণ ঢেকে গেল, চারিদিকে অন্ধকার। রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার। হেরড সোপান অতিক্রম করে চলে যাচ্ছেন, নর্তকীর কণ্ঠনিঃসৃত বিলাপধ্বনি শোনা যাচ্ছে, সহসা চন্দ্রালোক সালোমের দেহে এসে পড়ল। হেরড সেই দিকে তাকিয়ে হুকুম দিলেন—"Kill that woman." সৈনিকরা তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করল, জুডিয়ার রাজকন্যা হেরোডিয়ার কন্যা সালোমের জীবনদীপ নির্বাপিত হল।

ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীতে Salomeনাটকের ফরাসী সংস্করণ এবং পরবর্তী বছরে ইংরাজী সংস্করণ লণ্ডনে প্রকাশিত হল। জন লেন ছিলেন অসকারের প্রকাশক, তাঁরাই এই নাটক প্রকাশ করলেন। এই নাটক সম্পর্কে সমালোচকদের নিন্দায় 'ডোরিয়ান গ্রে'র নিন্দা ম্লান হয়ে গেল। তা ছাড়া শিল্পী অব্রে বীয়ার্ডসলী অঙ্কিত ছবি নাট্যকার বা সমালোচক কারও কাছে রুচিকর হয় নি। লেনকে অসকার সুনজরে দেখতেন না, একটি নাটকের ভৃত্যের নামকরণ করেছিলেন তার নামে। লেনও ব্যক্তিগতভাবে অসকারকে অপছন্দ করতেন।

'The Times' পত্রিকার সমালোচক লিখেছিলেন—"Salome is an arrangement in blood and ferocity, morbid, bizarre, repulsive—"

বার্লিনের ক্লীনেস থিয়েটারে প্রযোজক রাইনহার্ড 'Salome' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন এবং বিশেষ সাফল্য অর্জন করেন, সেই থেকেই কবি ও নাট্যকার অসকার ওয়াইলড বিশ্বসাহিত্যের লেখক হিসাবে স্বীকৃত। তাঁর গ্রন্থাবলীর প্রচার এক সময় শেক্সপীয়ারের সমতুল্য হয়, তাঁর সমস্ত ঋণ পরিশোধ হয়ে যায়, পরবর্তীকালে একমাত্র জর্জ বার্ণাড শ'র গ্রন্থাবলীর বিক্রয়সংখ্যা অসকারের সমতুল্য হয়।

ক্রমে অসকারের খ্যাতি ফ্রান্সে ছড়িয়ে পড়ল, একজন ইংরাজ লেখক নিয়ে ফরাসী সমাজ এর আগে এত মাতামাতি করে নি। ফরাসী সংবাদপত্রে প্রতিদিন অসকারের বাণী বা রচনা থেকে উদ্ধৃতি থাকত।

তুলোস লুত্রেক প্যাস্টেলে অসকারের একটি ছবি এঁকেছিলেন আর সোনালী পটভূমিতে লাল ওয়েস্টকোট পরা অবস্থায় একটি ছবি আঁকলেন উইলিয়াম রথেনস্টাইন।

হার্বার্ট বীরবোম ট্রি একদিন ওয়াইলডকে বললেন, আমার জন্য একটা নাটক লিখে দিন 'Lady Windermere's Fan'-এর মত। বীরবোম ট্রি ব্যবসায়ী ছিলেন না, তাঁর মন ছিল শিল্পীর। তবু তিনি পাঁচ বছর হে মার্কেট থিয়েটারের ম্যানেজার ছিলেন, পরে হিজ ম্যাজেষ্টিস

থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। অসকার তাঁকে বললেন, আমার 'Salome' নাটকের হেরডের ভূমিকায় আপনাকে চমৎকার মানাবে, কিন্তু বড় ঘরানার বনেদীদের ভূমিকায় আপনাকে একদম মানাবে না।

ট্রি তবু ছাড়বার পাত্র নন, প্রতিদিন অনুরোধ করে শেষ পর্যন্ত অসকারকে রাজী করালেন। ট্রি অসকারকে পছন্দ করতেন, আপনার প্রকৃতির প্রতিফলন লক্ষ্য করেছিলেন তিনি অসকারের মধ্যে। অসকার সম্পর্কে ট্রি বলেছেন—"Oscar was the greatest man I have ever known, and the greatest gentleman."

অসকার একবার বন্ধু ভিনসেণ্ট ও'সালিভানকে বলেছিলেন, 'আমি কারও জন্যে নাটক লিখি না, লিখি নিজের তৃপ্তির জন্য, পরে যদি কেউ অভিনয় করতে চায় তো অনুমতি দিই।'

ট্রির অনুরোধ কিন্তু শেষ পর্যন্ত শুনতে হল। টরকোয়েতে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে অসকার লিখলেন—'A Woman of no Importance'। ট্রি সেই সময় মফস্বলে ভ্রাম্যমাণ থিয়েটার দল নিয়ে ঘুরছেন। অসকার তাঁদের সঙ্গে তিন দিন গ্লাসগোয় কাটালেন। উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয়ে উঠল। ট্রির মুখে অসকারের প্রশংসা আর ধরে না।

নতুন নাটক রিহার্সালে পড়ল, অসকার রিহার্সালে উপস্থিত থাকেন, প্রয়োজন হলে তৎক্ষণাৎ নাটকের অংশ-বিশেষ একরকম নতুন করেই লিখে দেন। খানাপিনা এবং চমৎকার আলাপ-আলোচনায় এই সময়টা সুন্দর কেটেছে।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল তারিখে হে মার্কেটের থিয়েটার রয়্যাল রঙ্গমঞ্চে এই নাটক প্রথম অভিনীত হল এবং ওয়াইলডের আগের নাটক 'Lady Windermere's Fan'-এর মতই সাফল্য অর্জন করল।

প্রথম অভিনয়-রজনীতে দর্শকরা নাট্যকারকে দেখার বারবার অনুরোধ জানাল। সহসা বক্স থেকে এক বিরাটাকৃতি ভদ্রলোক বললেন, 'ভদ্রমহোদয় ও মহোদয়াগণ, দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে অসকার ওয়াইলড আজ এই প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত নেই।' বলা বাহুল্য, বক্তা স্বয়ং অসকার ওয়াইলড।

অভিনয়ান্তে 'মার্ভেলাস', 'ইউনিক্', 'ওয়াণ্ডারফুল', 'গ্রেট' প্রভৃতি প্রশংসার পুষ্পবৃষ্টি হল। নাট্যকার ও নট পরস্পরকে অভিনন্দন জানালেন:

অসকার। আমি বরাবরই আপনাকে আমার শ্রেষ্ঠ সমালোচক মনে করে আসছি।

ট্রি। বা রে, আমি তো কোনদিনই আপনার নাটকের সমালোচনা করি নি।

অসকার। সেই জন্যই তো আপনি সর্বোত্তম।

Lord Illingworth চরিত্রটি চমৎকার, নাট্যকার এই চরিত্রটি আপন আদর্শে গড়েছিলেন, তাঁর মুখনিঃসৃত বহু কথা ইলিংওয়ার্থের মুখে বলিয়েছেন এবং 'ডোরিয়ান গ্রে' উপন্যাসের লর্ড হেনরীর বক্তব্যও এখানে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। ট্রির ব্যক্তিগত চরিত্রের সঙ্গে ভূমিকাটি বিশেষ খাপ খেয়ে গেল। শেষজীবন পর্যন্ত এই অভিনয়ের প্রভাব তাঁর চরিত্রে ছিল। অসকার বলতেন, "It is a wonderful case of nature imitating art."

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে এই নাটকের রিহার্সাল শুরু হওয়ার কিছু আগেই অসকার আবার টরকোয়েতে লেডী মাউণ্ট টেম্পলের ভবনে বসে *La Sainte Courtisane* নামক নাটক লেখেন। 'Salome'-এর মত আর একটি নাটক লেখার বাসনা ছিল অসকারের—এই সেই নাটক। এই নাটকের কাহিনী তাঁর কাছে অতিশয় প্রিয়, অনেকের কাছেই এই গল্প বারবার বলেছেন। নাটকটি বেশীদূর অগ্রসর হয় নি। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে এক প্রশ্নের উত্তরে বললেন, এখনও লিখছি এবং চিন্তা করছি। এই নাটকে 'The Portrait of Mr. W. H.' নামক বিখ্যাত রচনার বক্তব্য পুনরুত্থাপন করা হয়েছে। তাঁর বিচারকালে এডা লেভারসনের কাছে এই নাটকের পাণ্ডুলিপি রেখে যান, ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীতে এই পাণ্ডুলিপি অসকারকে ফেরত দেওয়া হয়। তারপর পাণ্ডুলিপিটি একদিন ঘোড়ার গাড়িতে ভুলে ফেলে যান।

আঁরি দ্য রেনিয়ার বলেছেন, 'এ সময়ে অসকার ক্লান্ত স্থূলদেহ মানুষের মত কাফে, ক্যাবে, সালোঁতে পর্যায়ক্রমে ঘুরে বেড়িয়েছেন। সাফল্য মানুষের অনেক সময় বিশেষ ক্ষতি করে, অসকারের জীবনেও তাই ঘটল। দুটি নাটকে যে আর্থিক লাভ হল তাতেই মাথা ঘুরে গেল।

একজন জীবনীকার বলেছেন, 'স্কুল থেকে বেরিয়েই ছোট ছেলে হাতে পয়সা পেলে যেমন যা খুশি তাই করে, অসকারও তাই শুরু করলেন।'

বছর দুই এই ধরনের উদ্দাম জীবনযাত্রার পর অসকার তাঁর এক বন্ধুকে বলেছিলেন—"In this world there are only two tragedies, one is not getting what one wants, and the other in getting it."

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যে-সাফল্যের শিখরে উঠেছিলেন অসকার—তার ফলে তাঁর চারপাশে একটা ঈর্ষা ও বিদ্বেষের জাল সৃষ্টি হল এবং তাঁর বাকী জীবনটুকু আচ্ছন্ন করে রাখল। এই সময়ে তাঁর বার্ষিক আয় প্রায় আট হাজার পাউণ্ড, এখনকার মূল্যমানানুসারে প্রায় চল্লিশ-

পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড। অসকারের ভাগ্যলক্ষ্মী এক বিচিত্র রহস্য সৃষ্টি করলেন।

'An Ideal Husband' নাটকটির সম্পর্কে সর্বপ্রথম জুন ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কথা উঠলেও, তিনি তখন নাটকটি পরিকল্পনা করেছিলেন মাত্র। 'An Ideal Husband' ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি হে মার্কেটের থিয়েটার রয়্যালে মঞ্চস্থ হয়। প্রিন্স অব ওয়েলস (সপ্তম এডওয়ার্ড) বক্সে বসে নাটকাভিনয় দেখছিলেন। অভিনয়ান্তে লেখককে ডেকে অভিনন্দন জানালেন। লেখক বললেন, দু-একটি জায়গা দীর্ঘ হয়েছে, কাটতে হবে।

প্রিন্স অব ওয়েলস বললেন, দয়া করে অমন কর্ম করবেন না। একটি কথারও পরিবর্তন চলবে না।

এই নাটকে লেখকের পূর্ববর্তী নাটকাবলীর সকল গুণ বর্তমান ছিল, তা ছাড়া, সংগঠনে, আঙ্গিকে, রূপায়নে, চরিত্র-চিত্রণে যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হল।

এর পর ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে হঠাৎ টাকার প্রয়োজন হওয়ায় একদিন জর্জ আলেকজাণ্ডারকে অসকার বললেন, দেড়শো পাউণ্ড দাদন দিন, একটা নাটক লিখে দেব, আর যদি না পারি টাকা ফেরত দেব। এই হল নতুন নাটক 'The Importance of Being Earnest'-এর সূত্রপাত।

নাটকটি লিখিত হওয়ার পর প্রথমে আলেকজাণ্ডার মনে করেছিলেন এই হালকা কমেডি তাঁর উপযুক্ত নয়, তিনি তাই নাটকটি অন্যত্র পাঠালেন। কিন্তু হেনরী জেমসের নাটকটি সেণ্ট জেমস থিয়েটারে অচল হওয়ায় তিনি 'The Importance of Being Earnest' নাটকটি চেয়ে নিলেন।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারি সেণ্ট জেমস থিয়েটারে 'The Importance of Being Earnest' মঞ্চস্থ হল। সেদিন অতিশয় বিশ্রী আবহাওয়া। অতি তীব্র তুষার-ঝঞ্ঝায় চারদিক আচ্ছন্ন। ব্রুহাম, ভিক্টোরিয়া, হ্যানসম এবং অন্যান্য গাড়ি চলাচল করা কঠিন, তবু সেদিন সেণ্ট জেমস থিয়েটারে দর্শকের অভাব হয় নি। সারা লণ্ডনের রসিক-সমাজ অভিনয় দেখতে এসেছিলেন। অসকার সেদিন কিন্তু অধিকাংশ সময় স্টেজের ভিতরই ছিলেন। এই নাটক দেখে উইলিয়াম আর্চার লিখেছিলেন—"Farce is too gross and commonplace a word to apply to such iridescent filament of fantasy."

অসকার নিজে বলতেন—"There are two ways of disliking my plays, one way is to dislike them, the other to prefer Earnest."

ওয়াইলড বলেছেন, কমেডি লেখা খুব সহজ। 'ডোরিয়ান গ্রে' বা 'সালোমে'র মত গ্রন্থ লেখাই কঠিনতর কর্ম। এই দুটি গ্রন্থই তিনি প্রচুর পরিশ্রম করে লিখেছেন, তাই মমতাও ছিল বেশী।

যেদিন 'Earnest'-এর প্রথম অভিনয় রজনী, সেই দুর্যোগের রাত্রিতেই মার্কুইস অব কুইনসবেরী সেণ্ট জেমসের দোরে দোরে গাজর আর অন্যবিধ সবজি নিয়ে ঘুরেছেন নাট্যকারকে অপদস্থ করার জন্যে। সেকথা এই কাহিনীর প্রথমেই বলা হয়েছে। অসকারের জীবন-নাট্যে এইবার সেই শেষ অঙ্ক শুরু হল।

নয়

লিওনেল জনসন ছিলেন ভাল ছাত্র, কবি হিসাবেও বিশেষ শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন, কিন্তু অতিরিক্ত সুরাপানের ফলে অকালে তাঁর মৃত্যু ঘটে। লর্ড অ্যালফ্রেড ডাগলাস ছিলেন লিওনেলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের এক সন্ধ্যায় লিওনেল ডাগলাসকে অসকারের টাইট স্ট্রীটের বাসায় এনে পরিচয় করিয়ে দিলেন। প্রথম দর্শনেই প্রেম, সেই সময় ডাগলাসের বয়স মাত্র একুশ, অক্সফোর্ডে দু বছর কেটেছে, দেখায় কিন্তু ষোল-সতেরোর মত। দেবশিশুর মত সুন্দর আকৃতি—যেন তরুণ এডোনিস।

এই পরিচয়ই অসকারের জীবনের প্রচণ্ড অভিশাপ। যদি এই পরিচয় না ঘটত তা হলে পরিপূর্ণ জীবনভোগ করে অসকার হয়তো তাঁর বন্ধু সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের কাছ থেকে নাইটত্ব লাভ করে সসম্মানে পরলোকের পথে পাড়ি দিতে পারতেন, কিন্তু গ্রহ-নক্ষত্রের সমাবেশে সবই পরিবর্তিত হয়। যে ফ্রাঙ্কেনস্টাইন-সদৃশ 'ডোরিয়ান' অসকার স্বয়ং সৃষ্টি করেছিলেন সেই ফ্রাঙ্কেনস্টাইনই ডাগলাস-মূর্তিতে তাঁকে গ্রাস করেছে। লিওনেলও খুশী হন নি, তিনি অসকারকে উদ্দেশ করে বিখ্যাত সনেট রচনা করেছেন—"I hate you with a necessary hate"...

কুইনসবেরীর অষ্টম মার্কুইসের তৃতীয় সন্তান অ্যালফ্রেড ডাগলাস। অত্যাচারী স্বামীর হাত থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁর মা স্বামীকে ডিভোর্স করেন এবং ছেলেদের নিয়ে আলাদা থাকতেন। ডাগলাসকে তাঁর মা ছেলেবেলা থেকেই 'Bosie' বলে ডাকতেন, [Boysie (খোকন) কথাটির অপভ্রংশ], সেই নামেই সকলে অ্যালফ্রেডকে সম্বোধন করতেন। মার্কুইস ছিলেন একজন উন্মাদ

প্রকৃতির মানুষ। প্রচুর বিত্ত ও সম্মানের সঙ্গে মার্কুইস ডাগলাস পরিবারের প্রকৃতিগত 'Mad-bad blood'ও উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন। পত্নী ও সন্তানদের প্রতি তাঁর মমতা ছিল না, এমন কি মৃত্যুশয্যায় যখন তাঁর বড় ছেলে শেষ বিদায় নিতে এল, তখন তিনি তার গায়ে থুতু ফেলেছিলেন।

পিতা-পুত্রের মধ্যে যে ধরনের পত্রবিনিময় হয়েছে তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। Unmanly brute, crazy lunatic, persecutor of his wife, bully of his children—এইসব বিশেষণ তাঁর সন্তানপ্রদত্ত।

জ্যেষ্ঠ পুত্র লর্ড ড্রামলানরিগ ছিলেন পররাষ্ট্র-সচিব রোজবেরীর প্রাইভেট সেক্রেটারী, গ্ল্যাডস্টোন তখন প্রধানমন্ত্রী। তিনি ড্রামলানরিগকে ইংলিশ পীয়রত্বে অভিষিক্ত করার সুপারিশ করেন, স্কটিস পীয়রদের হাউস অব লর্ডসে বসার অধিকার ছিল না। মার্কুইস অব কুইনসবেরী মনোনীত সদস্য হিসাবে একটি আসন পেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শপথ গ্রহণ করতে রাজী না হওয়ায় পুনর্বার মনোনীত হন নি। পুত্র পিতার বিরক্তি ও রোষের ভয়ে এই পীয়রত্ব গ্রহণে রাজী হন নি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মার্কুইস অব কুইনসবেরী লিখিত অনুমতি দান করেন। ড্রামলানরিগ লর্ড কেলহেড হিসাবে পীয়রত্বে উন্নীত হলেন। এক মাসের মধ্যেই মার্কুইস অব কুইনসবেরী কুইন ভিক্টোরিয়া, গ্ল্যাডস্টোন, রোজবেরী প্রভৃতিকে অপমানজনক চিঠি লিখতে লাগলেন। রোজবেরীকে ঘোড়ার চাবুক মারবেন এই আশায় হামবুর্গ পর্যন্ত ধাওয়া করেছিলেন এবং রোজবেরীর হোটেলের দরজায় অপেক্ষা করছিলেন এমন সময় প্রিন্স অব ওয়েলস (সপ্তম এডওয়ার্ড) তাঁকে নিরস্ত করেন কৌশলে এবং পদমর্যাদার বলে।

এর পর মার্কুইস দুই পুত্রের পিছনে লাগলেন, অ্যালফ্রেডের বিরুদ্ধে রাগের কারণ অসকার ওয়াইলডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আর দ্বিতীয় পুত্র পার্সির (লর্ড ডাগলাস অব হউইক) ওপর রাগের কারণ সে ডাগলাসকে সমর্থন করত। এমন কি পার্সির তরুণী বধূকে অপমানসূচক অশ্লীল পোস্টকার্ড পাঠাতেন, অথচ তাকে চোখে দেখেন নি কোনওদিন। এই পিতার পুত্র লর্ড অ্যালফ্রেড ডাগলাস, অসকারের চোখে তাঁর 'Slim guilt soul, walked between passion and poetry' আর 'red-rose leaf lips that had been made no less for the music of song than madness of kisses.'

কুইনসবেরী যখন অসকার এবং ডাগলাসের ঘনিষ্ঠতার কথা জানতে পারলেন তখনই তিনি পুত্রকে এই অন্তরঙ্গতার অবসান ঘটানোর জন্য আদেশ দিলেন। পুত্র তখন সাবালক, তাই পিতার কথায় কর্ণপাত করার প্রয়োজন বোধ করল না। প্রথমটা পুত্রের নির্বুদ্ধিতায় বিরক্ত হলেও মার্কুইস বললেন, তোমার ভাতা বন্ধ করে দেব। উভয়ের মধ্যে বিশ্রী পত্রালাপ শুরু হল। অবশেষে একদিন কাফে রয়্যালে লাঞ্চের সময় পিতা-পুত্র এবং অসকারের সাক্ষাৎকার ঘটল। পুত্র পিতাকে নিজেদের টেবিলে আমন্ত্রণ করলেন। প্রথমটা প্রত্যাখ্যান করলেও মার্কুইস শেষ পর্যন্ত ওদের টেবিলে এলেন। অসকারের সঙ্গে পরিচিত হলেন, অসকারের বিচিত্র আলাপচারে মুগ্ধ হলেন, বেলা চারটে পর্যন্ত আলাপ-আলোচনা চলল।

কুইনসবেরী এমনই প্রীত হলেন যে ডাগলাসকে লিখলেন, যা সব এতদিন বলেছি তা প্রত্যাহার করছি, আমার বন্ধু লর্ড ডি গ্রে এবং তাঁর স্ত্রী বলেছেন অসকার লোকটি খুবই ভাল, প্রতিভাসম্পন্ন লোক এবং সুন্দর কথা বলেন। আর শেষে এই কথাও লিখলেন—"I don't wonder you are so fond of him ; he is a wonderful man." কিন্তু দুমাস যেতে না যেতেই যে-কে-সেই। আবার সেই কঠোর পত্রালাপ শুরু হল। পুত্র পিতার আদেশ পালন করতে রাজী হল না, বরং তাঁর অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলল। ভাতা বন্ধ করার মত নীচ কর্ম যদি করার ইচ্ছে হয়, করতে পারেন।

পিতা তাই করলেন। টাকা বন্ধ হল বটে, চিঠি বন্ধ হল না—উভয়ের চিঠির ভাষা দিন দিন তীব্রতর হয়ে উঠল।

একদিন অসকারের ১৬নং টাইট স্ট্রীটের বাসায় মার্কুইস এসে উপস্থিত। অসকার নির্ভয়ে তাঁর অভ্যর্থনা করলেন।

মার্কুইস বজ্রনিনাদে বললেন, বসুন।

ওয়াইলড শান্ত গলায় জবাব দিলেন, আমার বাড়িতে বা অন্য কোথাও এ ভাবে কথা বলার অনুমতি আমি কাউকে দিই নি। আপনি হয়তো আপনার চিঠির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে এসেছেন। আপনার ছেলেকে আপনি আমার স্ত্রী এবং আমার সম্পর্কে যে সব কথা লিখেছেন একদিন তার জন্য আমি আপনাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাব।

আমি আমার ছেলেকে যা খুশি লিখতে পারি।

আপনি কোন্ সাহসে আপনার পুত্র এবং আমার সম্পর্কে এমন যা তা লিখতে পারেন ?

স্যাভয় হোটেল থেকে আপনাকে দূর করে দিয়েছিল ক্ষণিকের নোটিসে। আপনার আচরণই তার জন্য দায়ী।

মিথ্যা কথা।

পিকাডেলিতে আপনি আলাদা ঘর নিয়েছেন ডাগলাসের জন্য।

আপনাকে কেউ মিথ্যা বলেছে। আমি এসব কিছুই করি নি।

মার্কুইস কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন, তিনি তর্ক করতে লাগলেন।

অসকার বললেন, লর্ড কুইনসবেরী, আপনি কি সত্যিই আপনার পুত্র এবং আমাকে অসদাচরণের দায়ে অভিযুক্ত করছেন?

জানি না, তবে আপনাকে দেখে তাই মনে হয়, আপনার ভঙ্গিও সেইরকম। যদি কোনদিন সাধারণ রেস্তোরাঁয় আপনাকে আর আমার পুত্রকে দেখি, তা হলে আমি দেখে নেব।

কুইনসবেরীর আইন আমি জানি না, তবে অসকার ওয়াইলডের আইন দর্শনমাত্রেই গুলি করা, আমার বাড়ি থেকে বিদায় হোন।

কুইনসবেরী বক্সিং সম্বন্ধে আইনপ্রণেতা হিসাবে খ্যাত।

একেবারে কুঁকড়ে গেলেন কুইনসবেরী, বললেন, কি বিশ্রী স্ক্যাণ্ডাল।

তাই যদি হয়। সেই স্ক্যাণ্ডালের জনক আপনি, আর কেউ নয়।

অসকারের ভৃত্য ভয়ে কাঁপছিল, অসকার তাকে উদ্দেশ করে বললেন, এই লোকটি মার্কুইস অব কুইনসবেরী। লণ্ডনের সর্বনিকৃষ্ট পশু। কোনদিন এঁকে এ বাড়িতে প্রবেশ করতে দেবে না। যান, এখন বিদায় হোন।

মার্কুইস মাথা হেঁট করে চলে গেলেন।

রবার্ট রসের সুপারিশে অসকার ওয়াইলড হামফ্রেস, সন অ্যাণ্ড কারস নামক বিখ্যাত সলিসিটর ফার্মের চার্লস হামফ্রেসের সঙ্গে মার্কুইসের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার জন্য পরামর্শ করলেন। মামলা হয়তো রুজু হত, কিন্তু ডাগলাসের আত্মীয় কারেজ উইনডহ্যামস্ এম. পি.র উপদেশে অসকার নিরস্ত হলেন। উইনডহ্যামস বলেছিলেন মার্কুইস ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। মার্কুইস ক্ষমা প্রার্থনা না করে স্বয়ং টাইট স্ট্রীটের বাসায় এক হামলা করতে এসেছিলেন।

অসকারের জননী পুত্রের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিলেন, তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন ডাগলাসকে, ডাগলাসও বিশেষ মাতৃভক্ত ছিলেন। ডাগলাসের মেজাজও বাপের মতই ছিল। ডাগলাস-জননী একটি পত্রে দুঃখ করে লিখেছিলেন—"the one of my children who has inherited the fatal Douglas temperament."

অনেক পরামর্শের পর ডাগলাসকে কায়রোতে লর্ড ও লেডী ক্রোমারের কাছে পাঠানো হল। লেডী কুইনসবেরী অসকারকে অনুরোধ করেছিলেন যেন 'Bosie'-র সঙ্গে যোগাযোগ না রাখেন। অসকার কথা দিয়েছিলেন এবং সে কথা রেখেছিলেন।

কায়রোতে সেই সময় তিনজন তরুণ লেখক ছিলেন, ক্যাণ্টারবেরীর আর্কবিশপের পুত্র এফ. ই. বেনসন, রবার্ট হিচেনস্ ('গার্ডেন অফ আল্লার' লেখক) এবং রেগী টার্নার। এঁরা সকলেই উত্তরকালে উপন্যাস-লেখক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছেন।

ডাগলাসের সঙ্গে হিচেনসের ঘনিষ্ঠ আলাপ হয় এবং অসকার সম্পর্কে অনেক কথা ডাগলাস তাঁকে বলেছিলেন। ফলে "The Green Carnation" নামে একটি গল্প লেখেন হিচেনস। এই গল্পে হিচেনস ওয়াইলডের জীবন নিয়ে এক বিদ্রূপাত্মক কাহিনী রচনা করলেন, ফলে এতদিন যা সন্দেহ বা কানাকানির মধ্যে ছিল তা সর্বত্র প্রচারিত ও আলোচিত হতে লাগল। ডাগলাস তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন—"He wrote his book 'The Green Carnation' entirely on the strength of and as the result of association with me, for he had not at that time met Oscar wilde"—

ডাগলাসের অবিবেচনাই তাঁর বন্ধুর মৃত্যুবাণ হয়ে দাঁড়াল।

লর্ড কিচেনারের সঙ্গে মিশরে ডাগলাসের এক রোমাণ্টিক যোগাযোগ ঘটে। লর্ড ক্রোমার তুরস্কের ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের অবৈতনিক সহকারী হিসাবে ডাগলাসের একটি কূটনৈতিক কাজও যোগাড় করে দেন, কিন্তু তাতে তাঁর মন বসল না। এর পর এথেন্সে চলে এলেন ডাগলাস। একদিন ওয়াইলড চিঠি পেলেন লেডী কুইনসবেরীর কাছ থেকে যে ডাগলাস ওয়াইলডের কাছ থেকে একটি চিঠির জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন।

ওয়াইলড কোনও উত্তর দিলেন না। আর চিঠিতে ফল হল না দেখে ডাগলাস নিজেই চিঠি দিলেন মিসেস ওয়াইলডকে। অসকার তবু নীরব। ডাগলাস জানালেন আমি প্যারী যাচ্ছি। অসকার প্যারী থেকে চলে এলেন। অবশেষে ডাগলাস এক দীর্ঘ পত্র লিখলেন এবং সেই পত্রে আত্মহত্যার ভীতি প্রদর্শন করলেন। পারিবারিক ইতিহাস অসকারের জানা থাকায় অসকার নরম হলেন। উভয়ের মিলন হল। অসকারকে দেখে অ্যালফ্রেডের চোখ

দিয়ে অবিরল জল ঝরতে লাগল, অসকারের হাতটি নিজের হাতের মধ্যে রেখে ছোট ছেলের মত নীরবে বসে রইলেন ডাগলাস।

এই ঘটনার দুদিন পরে কাফে রয়্যালের ডিনার টেবলে উভয়কে দেখলেন কুইনসবেরী। কুইনসবেরী ডাগলাসকে লিখেছিলেন—"With my own eyes I saw you in the most loathsome and disgusting relationship as expressed by your manner and expression......" পত্রশেষে 'your disgusted so-called father' লিখেছেন। পুত্রকেও so-called son বলতেন মার্কুইস।

সেণ্ট জেমস্ থিয়েটারে 'The Importance of Being Earnest' অভিনয়-রজনীর চারদিন পরে 'Albermarle' নামক ওয়াইলডের ক্লাবে গিয়ে 'To Oscar Wilde posing as a so*m*domite' এই কার্ডখানি রেখে চলে গেলেন। অনাবশ্যক 'm'-টি অজ্ঞানতাবশতঃ বলেই মনে হয়। দরোয়ান কার্ডখানি রীতিমত ব্যবস্থানুসারে রেখে দিল এবং দশদিন পরে ওয়াইলড যখন ক্লাবে এলেন তাঁর হাতে পৌছে দিল। ওয়াইলড কার্ডখানি গ্রহণ করে মার্কুইসের চ্যালেঞ্জ পাঠ করলেন। নির্বুদ্ধিতাবশতঃ ওয়াইলড এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে কুইনসবেরীর ফাঁদে পা দিলেন।

দশ

অসকার ওয়াইলডের জীবনের অভিশপ্ত দিন শুরু হল। বিচার আর কারাদণ্ডে এক বিস্ময়কর প্রতিভার সামগ্রিক জীবনের অবসান ঘটল। ওয়াইলডের অপরাধ সম্পর্কে বিচারক বলেছিলেন—"Corruption of the most hideous kind among young men"—

বেচারী অসকার। প্রজাপতিকে যেন জাঁতাকলে পিষে মারা হল। অসকারের মত নন্দনতাত্ত্বিক সূক্ষ্ম-সংবেদনশীল ব্যক্তি বীভৎস ব্যভিচারীর দুর্নামে কলঙ্কিত হলেন।

অসকারের শ্লেষাত্মক কবিতা, গভীর সৌন্দর্যানুভূতি ও মনোভঙ্গী, 'আর্টের জন্য আর্ট' এই নীতির প্রচারে নিবেদিতপ্রাণ অসকারের জীবনের এই বিচিত্র পরিণতি। এই কল্পনাবিলাসী মানুষটিকে রূঢ় বাস্তবতা ও মধ্যবিত্ত সামাজিক নীতির নিরিখে কি বিচার করা সম্ভব?

বিচারকের রায় শোনার পর আদালতে 'শেম শেম' ধ্বনি উঠেছিল। আদালতের বাইরে সাধারণ স্ত্রীলোকদের দল শোভাযাত্রা করে হল্লা করতে এসেছিল।

অসকার ওয়াইলডের বিচার কাহিনীর বিবরণ 'Trials of Oscar Wilde' নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে পাওয়া যায়। এই নিবন্ধের মধ্যে স্থানাভাবহেতু তা বিশদভাবে দেওয়া সম্ভব নয়। এই বিখ্যাত বিচার-কাহিনী সাহিত্য-রসসমৃদ্ধ এক করুণ কাহিনী—সাহিত্যের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস এই যে ওয়াইলডকে একটি নৈতিক প্রশ্নের জন্য সর্বনাশ ও অখ্যাতি বরণ করতে হয়েছিল। সাফল্যের মুহূর্তে ভাগ্য আর নিজস্ব প্রকৃতির ত্রুটির ফলে তাঁর চরম সর্বনাশ ঘটেছে। যে সঙ্কীর্ণমনা জনসাধারণকে তিনি উপহাস করেছেন, 'সবুজ কারনেশন' তাদের কাছে প্রয়োজনহীন।

খ্যাতি ও সৌভাগ্যের পথ যখন সামনে প্রসারিত তখন মার্কুইস অব কুইনসবেরীর আকৃতিতে অদৃষ্টপুরুষ এসে পথ রোধ করে দাঁড়ালেন। মার্কুইস তাঁর বাইশ বছরের ছেলে অ্যালফ্রেডের কল্যাণার্থে তাকে অশুচিস্পর্শ থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে এলেন। অথচ পিতা-পুত্রে আকাশ-পাতাল ব্যবধান, পুত্র তার জননীর স্নেহচ্ছায়ায় পরিপুষ্ট। তবু so-called father, তাঁর so-called sonকে ত্রাণ করার জন্য প্রচুর অর্থ এবং সামর্থ্য নিয়োগ করলেন। অসকারের বয়স তখন চল্লিশ। কুইনসবেরীর চরিত্র আগেই বর্ণনা করা হয়েছে। স্ত্রীর প্রতি পৈশাচিক ব্যবহার ও সন্তানদের প্রতি নির্মম অত্যাচারের ফলে তিনি সর্বত্র অপ্রিয় ছিলেন। অসকারের প্রতি তাঁর অসীম ঘৃণা আর তীব্র বিতৃষ্ণা। তাই

অসকারকে বললেন—'Posing as a sodomite'। নিছক হঠকারিতার বশে ওয়াইলড এই অভিযোগের প্রতিবাদ করলেন। তাঁকে সমর্থন করলেন ও উত্তেজিত করলেন মার্কুইস-তনয় লর্ড অ্যালফ্রেড ডাগলাস। নৃশংস কংসসদৃশ পিতাকে জব্দ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। ওয়াইলড মার্কুইসকে মানহানির দায়ে অভিযুক্ত করলেন।

ওল্ড বেইলীর আদালতে সুবিচারের আশায় অসকারের যাওয়া উচিত হয় নি। সন্দেহজনক চরিত্রের বহু নোংরা যুবকের সঙ্গে অসকারের মেলামেশা ছিল। তাদের সঙ্গে করে তিনি স্যাভয় প্রভৃতি বড় বড় হোটেলে নিয়ে খানা খেতেন, আড্ডা দিতেন। অ্যালফ্রেডকে লিখিত ওয়াইলডের কয়েকটি চিঠি নিয়ে আগেই ব্ল্যাকমেলের চেষ্টা চলছিল। একজন বলেছিল—"A very curious construction could be put on the letters", সেই সঙ্কটময় অবস্থার সামনে দাঁড়িয়েও অসকার বলেছিলেন—"Art is rarely intelligible to the criminal classes."

মার্কুইস তাঁর অভিযোগ সপ্রমাণ করার জন্য ওয়েস্ট-এন্ডের আঁস্তাকুড় থেকে চার্লস ব্রুকফিলডকে পেলেন। চার্লস ব্রুকফিলড সাহিত্যিক মনোবিলাসী মানুষ, কিন্তু বিশেষ অগ্রসর হতে পারেন নি সাহিত্যের ক্ষেত্রে। তাঁর সঙ্গে অক্সফোর্ডের সময় থেকেই অসকারের পরিচয় ছিল, এবং বিদ্বেষ ছিল। অসকারের একটি নাটকে ছোট্ট ভূমিকায় অভিনয় করতেন তিনি। নাট্যকারের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল। কয়েকটি উচ্ছৃঙ্খল যুবককে সাক্ষী হিসাবে সংগ্রহ করে দিল এই ব্রুকফিলড। ওয়াইলড নেহাত অবিবেচকের মত তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন।

অসকারের বন্ধুবান্ধবরা আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁকে দেশত্যাগ করার পরামর্শ দিলেন। সরকারও তাঁকে পালাবার সুযোগ দিয়েছিলেন বলে মনে হয়। কিন্তু শুধু ডাগলাসের অনুরোধে সেই সুযোগ তিনি গ্রহণ করেন নি। বিচারের পূর্বদিন ডাগলাস, ফ্রাঙ্ক হ্যারিস আর জর্জ বার্নাড শ তিনজনে একত্রে লাঞ্চ খেলেন। হ্যারিস ও শ সম্ভাব্য বিপদের কথা উল্লেখ করে অসকারকে বিদেশে যাওয়ার জন্য বিশেষ অনুরোধ করলেন।

মার্কুইস অব কুইনসবেরীর পক্ষ সমর্থনে দাঁড়ালেন কুইনস কাউনসেল এডওয়ার্ড কারসন। ইনি পরে আইন-মন্ত্রী ও লর্ড হয়েছিলেন। ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজে অসকার আর কারসন উভয়ে ছিলেন সহপাঠী। অসকার এ কথা শুনে বলেছিলেন—"No doubt he will perform the task with all the added bitterness of an old friend."

অসকারের এই কথা সত্য হয়েছিল। কারসনের জেরা আজও আইনজীবীদের আদর্শ।

জেরার মুখে অসকার বললেন, চিন্তার মধ্যে সুনীতি-দুর্নীতি বলে কিছু নেই। শুধু আছে দুর্নীতিমূলক ভাবাবেগ।

তা হলে বিকৃত নীতিসম্বলিত গ্রন্থকেও ভাল বলা যায়?

যে-গ্রন্থ প্রকৃত শিল্পকর্ম সে কোনও মতবাদের প্রচারক নয়।

'ডোরিয়ান গ্রের ছবি' বইটিকে বিকৃত রুচির উপন্যাস বলা যায়?

যারা বর্বর এবং অশিক্ষিত তারা তাই মনে করতে পারে।

ডোরিয়ান গ্রের প্রতি বেসিলের স্নেহ ও প্রীতি সাধারণ মানুষের কাছে কি একটি বিশেষ রুচির পরিচায়ক নয়?

সাধারণ ব্যক্তির মত ও মনোভাব সম্পর্কে আমার কোনও জ্ঞান নেই।

কারসন বুঝলেন অসকারের শ্লেষবাক্যের বর্মভেদ করা কঠিন। তিনি অ্যালফ্রেডকে লিখিত চিঠির অংশ উদ্ধৃত করে বললেন, আপনি ডাগলাসকে কি ভালবাসেন?

না, তাকে আমার ভাল লাগে। চিঠিটি একটি গদ্যকবিতা, সাধারণ চিঠি নয়, এর পর হয়তো 'King Lear' বা সেক্সপীয়রের কোনও সনেট রুচিসঙ্গত মনে হবে না।

সাক্ষ্য এবং জেরার ফলে মামলার অবস্থা বুঝে ওয়াইলডের পক্ষের উকীলরা মামলা তুলে নেওয়ার পরামর্শ দিলেন। তার অর্থ কুইনসবেরীর অভিযোগ মেনে নেওয়া। আদালত তাঁকে দেশত্যাগের সময় দিলেন। ব্যাঙ্ক থেকে টাকাকড়ি তুলে তিনি দেশত্যাগ করার চিন্তা করছেন এমন সময় গ্রেপ্তার হয়ে আবার আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন।

এইবার তাঁকে প্রশ্ন করা হল—"What is the love that dare not speak its name?

অসকার এই প্রশ্নের যা জবাব দিলেন তা চিরস্মরণীয়। আদালত এবং সাহিত্যের ইতিহাসে অসকারের সেই জবাব আজও পরম মূল্যবান উক্তি হিসেবে স্বীকৃত। এই প্রশ্নের উত্তরে অসকার বললেন :

> "The love that dare not speak its name in this country is such a great affection as there was between David and Jonathan, such as Plato made the very basis of his Philosophy, and such as you find in the sonnets of Michelangelo and Shakespeare. It is that deep, spiritual affection that is as pure as it is perfect... It is in this Century misunderstood, so much misunderstood that it may be described as the Love that dare not speak its name, and on account of it I am placed where I am now. It is beautiful, it is fine, it is the noblest form of affection. There is nothing unnatural about it."

অসকারের আত্মপক্ষ সমর্থনে এই উত্তর সর্বকালের বিচারকের দরবারে পেশ করা রইল।

এগার

দু বছর জেলে কারাদণ্ড ভোগ করার পর যখন অসকার কারামুক্ত হলেন তখন তিনি বুঝলেন যে তাঁর দণ্ড যাবজ্জীবনের। এই দু বছর প্রাথমিক শাস্তি মাত্র। সারাজীবন ধরে একঘরের মত সমাজচ্যুতের জীবন যাপন করতে হবে। অসকারের চাইতে স্বল্পখ্যাতিবিশিষ্ট মানুষের পক্ষে হয়তো এই শাস্তি এত নিদারুণ হয়ে উঠত না।

আইন যে শাস্তি দিয়েছিল তার ভোগ দু বছর, সমাজের শাস্তি সারাজীবনের। এই শত্রুপুরীতে অসকারের কয়েকজন মাত্র বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, যাঁরা এই দুর্দিনেও তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেন নি। তাঁরা একটি পরিকল্পনানুসারে অসকারের জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহ করেন।

রবার্ট রস লণ্ডনে থেকে পাওনা টাকাকড়ি সংগ্রহ করবেন, অসকারের স্ত্রীর সম্পত্তি থেকে তাঁর জন্য বরাদ্দ টাকা জোগাড় করবেন আর একাকী অসকার নির্বাসনে ফ্রান্সের অপরিচিত শহরে দিন কাটাবেন। এই সময় অসকার সেবাসটিয়ান মেলমথ এই ছদ্মনাম গ্রহণ করলেন। এই সর্বপ্রথম নির্বাসন এবং নিঃসঙ্গের জ্বালা অনুভব করলেন অসকার। রাতে মায়ের স্বপ্ন দেখতেন, চোখে তাঁর কঠিন কঠোর দৃষ্টি, রাতের ঘুম দুঃস্বপ্নে ভেঙে যেত। দিনের বেলা পাহাড় আর প্রান্তরে উদাসীনের মত ঘুরে বেড়াতেন। জেল থেকে ছাড়া পেলেও পুলিস পিছু ছাড়ে নি, তারা নজর রেখেছিল। ফ্রান্সের পুলিস তাঁকে জানিয়েছিল যে, কোনও রকম বেচাল দেখলে তারা শাস্তিদানের ব্যবস্থা করবে। এ ছাড়া কুইনসবেরী-নিযুক্ত প্রাইভেট ডিটেকটিভও ছিল।

বন্ধু রবার্ট রসকে তিনি মনের দুঃখ পত্রে লিখতেন। এই রবার্ট শেষ পর্যন্ত বন্ধুকে ত্যাগ করেন নি। অসকার তাঁকে বলতেন সেণ্ট রবার্ট। স্ত্রীর চিঠি আসত, সঙ্গে ছেলেদের ফোটো। স্ত্রী বছরে দুবার দেখা করার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু ছেলেদের সঙ্গে দেখার ব্যবস্থা নেই—সে আর এক যন্ত্রণা।

নরমাণ্ডি উপকূলের শান্তি ক্রমশঃ তাঁর মনেও শান্তি ও স্বস্তি দান করল। বার্নিভালে নিঃসঙ্গ বিহঙ্গের মত ডানাভাঙা উদ্দাম পাখির মত অসকার দিন কাটাতে লাগলেন। শহর তাঁর কাছে আতঙ্কর।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকাল শেষে শরৎকালের গোড়ায় ওয়াইলড্ মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পেতে লাগলেন। ক্রমশঃই সেই যন্ত্রণা বেড়ে উঠল। Absinthe সেবনের ফলে যন্ত্রণা আরও বাড়ল। ডাক্তাররা দেখে বললেন, অপারেশন করা প্রয়োজন। অপরাশেন সূক্ষ্ম এবং ব্যয়সাধ্য। খরচের কথা শুনে অসকার বললেন, "Ah, well then, I suppose I shall die as I have lived—beyond my means."

জাঁ দ্যুপয়রীয়র ছিলেন হোটেল ডি আলসাসের মালিক। তিনি একদিন বাড়িওলা কর্তৃক গৃহচ্যুত অবস্থায় অসকারকে দেখে বিশেষ দুঃখিত হন। আগেই উভয়ের পরিচয় ছিল, তিনি সকল দেনাপাওনা মিটিয়ে ওয়াইলডকে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন নিজের হোটেলে, এবং চিরদিনের মত সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রইলেন। তিনিই যন্ত্রণাকাতর অসকারের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। অসকার বারবার মাথায় হাত দিচ্ছিলেন, যন্ত্রণায় কাঁদছিলেন। সকলে মাথায় বরফ দিলেন, মরফিন ইনজেক্‌শন দেওয়া হল। কানের একটি ফোড়া অপারেশনে একটু সাময়িক স্বস্তি পাওয়া গেল। দ্যুপয়রীয়র নিজেই ডাক্তার, এবং ওষুধ পথ্য প্রভৃতি সবই খরচ করতে লাগলেন। এমব্যাসীর ডাক্তার টাকার (Tucker) অসকারকে দেখছিলেন।

২৫শে নভেম্বর আবার অবস্থা বেশ খারাপ হল। সেদিন রবিবার, সকাল থেকেই মাথার যন্ত্রণা হচ্ছিল। কানের সেই ফোড়ার ফলে মস্তিষ্ক ফুলে উঠেছিল—অবস্থা দেখে রসকে টেলিগ্রাম করা হল। এর আগে নভেম্বরের মাঝামাঝি রস চলে যাবে শুনে অসকার কেঁদে ফেলেছিলেন, আর দেখা হবে না বলেছিলেন। তখন রস অতটা বুঝতে পারেন নি।

মৃত্যুর পূর্বরজনীতে সন্তানদের কথা বলতেন অসকার, তাদের স্মৃতি মনে জাগত। বললেন, ভিভিয়ান একদিন সোফায় শুয়েছিল, বয়স তখন এগারো; বললাম, কি করছ? বললে কি জান, বললে—আমি ভাবছি, বিরক্ত করো না।

বারবার ছোট ছেলের মত গলা করে এই কাহিনী বলতে লাগলেন। ৩০শে নভেম্বর অচৈতন্য হয়ে পড়লেন অসকার, দুটো বাজতে দশ মিনিটে হোটেলের মালিক এবং শেষ সময়ের উপকারী বন্ধু জাঁ দ্যুপয়রীয়র তাঁকে বুকে জড়িয়ে আছেন এমন সময় শেষনিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল। মৃত্যুর সার্টিফিকেটে বলা হল সেরিব্রাল মেনিনজাইটিস্।

ন বছর ধরে ব্যাগনোর সমাধিক্ষেত্রে সামান্য নাম-ধাম তারিখসহ একটি সাধারণ কবরে শুয়েছিলেন অসকার। শেষকৃত্যের ব্যয় বহন করেছিলেন ডাগলাস।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে অসকারের সমস্ত ঋণ পরিশোধের পর বালজাক, সঁপা, সারা বার্নহার্ড, আদেলিনা পাত্তি প্রভৃতিকে যেখানে কবরস্থ করা হয়েছে, সেই Pere Lachaise সমাধিক্ষেত্রে তাঁকে সমাধিস্থ করা হল। এপস্টাইন কর্তৃক খোদিত একটি সমাধিফলকে সমাধি চিহ্নিত করা হল, অসকারপ্রেমিক ভক্তবৃন্দ সেই তীর্থস্থানে গিয়ে শ্রদ্ধার অশ্রুনিবেদন করেন।

সমাধিফলকে কবির স্বলিখিত চতুষ্পদী কবিতা উৎকীর্ণ আছে :

"And alien tears will fill for him
Pity's long-broken urn,
For his mourners will be outcast men,
And outcasts always mourn."

শ্রীদীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল

> "If Bengal dies, who will live?
> If Bengal lives, who will die?"

'দিল্লী চল, চল দিল্লী—'

দুর্গম গিরি, কান্তারমরু, দুস্তর পারাবার পার হয়ে তোমার সেই দৃপ্ত কণ্ঠস্বর এসে পৌছল। নিশীথ নগরীর নিদ্রাভঙ্গ হল। পরাধীন ভারতের শেষ পলাতক আর স্বাধীন ভারতের পথে অগ্রসর প্রথম পদাতিক ফিরে আসছে দেশের মাটির পায়ে আবার মাথা ঠেকাতে। রুদ্ধদ্বার রাত্রি অবসানে যে তরুণ বেরিয়েছিল মাতৃমুক্তি পণ করে, ফিরে আসছে সেই বীর ফেরারী। বালসূর্যের রশ্মিরক্তিম সেই তরুণ আননে, ভারতের কবির বাণী সে মুখে মুদ্রিত—জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন। পলাশীর প্রান্তরে বাঙালীর বিশ্বাসঘাতকতায় বাঙালীর রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল আম্রকানন, প্রায় দু শতাব্দী আগে; বাঙালীর সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে বাঙালীই এসে পৌছেছে আজ সর্বপ্রথম মণিপুরের প্রান্তরে।

তারায় তারায় অগ্নির অক্ষরে উজ্জ্বল হল তোমার আহ্বান:

> রক্তের ডাক এসেছে। ওঠো জাগো। এক মুহূর্ত দেরি নয় আর। অস্ত্র হাতে নাও। শত্রুপক্ষের সারি ভেদ করে আমরা যাব। মৃত্যুবরণ করে শহীদ হব আমরা। আমাদের বাহিনী যে পথে দিল্লী যাবে, চিরনিদ্রায় শায়িত হয়ে সেই পথ আমরা চুম্বন করব। দিল্লীর পথ স্বাধীনতার পথ। দিল্লী চল, চল দিল্লী।

কী ছিল সেদিন তোমার কণ্ঠস্বরে কে জানে! কেঁপে উঠল আসমুদ্র হিমাচল। সুরের আগুন তোমার স্বরে, আগুনের সুর তোমার গানে। নিশীথ নগরীর স্বপ্ন ছুটে যায়, টুটে যায় তন্দ্রা। সমবেত কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয় তোমার কণ্ঠনিঃসৃত ঐক্যের ধ্বনি: হিন্দোস্তানের জয়

হোক! জয় হিন্দ! দু শতাব্দী নিদ্রিত কুম্ভকর্ণ-ভারতের চেতনায় শ্রুত হয় অশ্রুতপূর্ব তোমার অভয়বাণী। মুহূর্তে তার ঘুম ভাঙে; কবির কণ্ঠ সাড়া দেয় তোমার ডাকে।

রণভেরী বাজে আজাদ হিন্দ ফৌজের:

কদম কদম বাড়ায়ে যা!

আটত্রিশ কোটি মানুষের শোষিত রক্তে তালে তালে নৃত্য করে সেই রণোন্মাদিনী সুর, আর ভয়ে কাঁপে ব্রিটিশ-সিংহের বুক। দুঃসময়ের মহাসমুদ্রের ওপার থেকে ভেসে আসে তোমার কণ্ঠে পরাধীন ভারতের শৃঙ্খলমুক্তির ঝঙ্কার!

ওই দূরে, বহুদূরে, ওই নদীর ওপারে, ওই বনভূমি আর পর্বত পেরিয়ে আমাদের দেশ; চির-আকাঙ্ক্ষিত আমাদের মাতৃভূমি। ওই মায়ের কোলে শুয়ে শুনেছি প্রথম এই পৃথিবীর ডাক; আজ ফিরে চলেছি মাতৃভূমির ডাকে, সেই মায়ের কোলে।

শোন। ভারতবর্ষ আমাদের ডাকছে; ডাকছে এই নবীন ভারতের সেই চিরপুরাতন দিল্লী। ডাকছে আটত্রিশ কোটি আশি লক্ষ ভারতের অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ। ভাই ডাকছে ভাইকে; রক্তের ডাক এসে পৌঁছেছে আজ রক্তে।

পরাধীন ভারতের পথে এসে পৌঁছয় তোমার ডাক!

এই সেই পথ, যে পথের কোথাও দাঁড়িয়ে আছে নিরস্ত্র নিহত মানুষের রক্তে রঞ্জিত জালিয়ানওয়ালাবাগের স্মৃতি; এই সেই পথ যেখানে আজও জড়িয়ে আছে স্বাধীনতার সংগ্রামে প্রথম বলি প্রফুল্ল চাকী আর ক্ষুদিরামের দীর্ঘশ্বাস। বীরের রক্তস্রোত, মাতার অশ্রুধারা বয়ে নিয়ে এই পথ গেছে একদিন দেশকে ভালবাসার অপরাধে দেশ থেকে চিরনির্বাসিতদের তপোবন আন্দামানে।

এই সেই পথ, যে পথ দিয়ে এসেছে শকহূনদল পাঠান-মোগল। বহুদূর অতীতে এই পথ দিয়েই গেছেন ভারতের এক রাজপুত্র। সকল কালের সমস্ত বিশ্বের মানবপুত্র গেয়েছে যাঁর উদ্দেশ্যে বারংবার:

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

এই সেই পথ, যে পথ দিয়ে এসেছে স্মরণের অতীত এক কালের কণ্ঠস্বর থেকে চিরকালের এই অমৃতবার্তা:

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

এই সেই পথ, যে পথ দিয়ে গেছে দেশবন্ধুর নশ্বর দেহ অবিনশ্বরলোকে। অবিনশ্বরলোক থেকে নশ্বরলোকে আবির্ভাবের প্রথম মুহূর্তে সঙ্গে করে এনেছিলেন যে 'মৃত্যুহীন প্রাণ'—নশ্বরলোক থেকে অবিনশ্বরলোকে ফিরে যাবার আগে তা দিয়ে গেছেন যাকে সেই ভারতপথিক আসছে সেখান দিয়ে—এই সেই পথ।

জানি এই পথ দিয়েই আসবে তুমি; তুমিই যে দেশবন্ধুর সেই 'মৃত্যুহীন প্রাণ'!

এই সেই পতন-অভ্যুদয়ে বন্ধুর পথ, যে পথ অতিক্রম করে এসে পৌঁছেছে আজ আর এক ভারতবন্ধুর ডাক:

আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।

তোমার কণ্ঠে সেদিন কথা বলেছিলেন স্বয়ং ভুবনমোহিনী ভারতবর্ষ: ম্যায় ভুখা হুঁ!

ভিক্ষার অন্নে মেটে না এ ভুখা, রাত্রির তপস্যা ছাড়া আসে না দিন। প্রাণ দিতে না জানলে, মৃত্যু জানে না পরাস্ত হতে।

সেই পথেই, দুর্গম অরণ্যপর্বত, দুস্তর সমুদ্র পার হয়ে এসে পৌঁছল একদিন এই ডাক: দিল্লী চল, চল দিল্লী। নিষ্প্রদীপ অন্ধকারে নিশীথ নগরীর আকাশে বজ্রে বিদ্যুতে আলোকিত হল তোমার উদাত্ত আহ্বান। ঝড় এল। ১৮৫৭-র যে ঝড় একবার উঠে থেমে গিয়েছিল, চৌরিচৌরায় আর একবার সে ঝড় মনে হয়েছিল উড়িয়ে নিয়ে যাবে সিংহলাঞ্ছিত বৃটিশ পতাকাকে। বিয়াল্লিশের আন্দোলনে লেগেছিল সে ঝড়ের দোলা; শেষবারের মত তোমার মৃত্যুহীন উদাত্ত আহ্বান-আলোকিত প্রলয়ের

বজ্রাগ্নিশিখায় মেঘের গর্জনে, বিদ্যুৎবিদীর্ণ সেই আকাশে ঝড় এল। সেই ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেল দিনপঞ্জীর পাতা। বেরিয়ে এল লুপ্তপ্রায় অতীতের পৃষ্ঠা থেকে তোমার জীবনের গৌরবোজ্জ্বল একটি দিন—একটি লাল অক্ষরে চিহ্নিত বৎসর। ১৯১৩—প্রেসিডেন্সী কলেজ।

দুই

প্রেসিডেন্সি কলেজের করিডরে কয়েকজন ছাত্রের ছোট একটা জমায়েত উত্তেজিত আলাপ করছে নিজেদের মধ্যে।

উত্তেজনার কারণ, র‍্যাভেনশ স্কুল, কটক থেকে সদ্য আগত একটি বাঙালী ছাত্র। আলাপরত একজনের কণ্ঠস্বর আর সকলের কথা ছাপিয়ে কানে আসে সকলের। তার বক্তব্য হচ্ছে র‍্যাভেনশ স্কুলের এই ছাত্রটি একটি বিস্ময়। বিস্ময়ের কারণ তার অসাধারণ মেধাই নয় মাত্র, অনন্যসাধারণ চরিত্রও বটে। কোনও স্ত্রীলোক কেবল তার ছায়া নয়, ছায়ার ছায়ারও ত্রিসীমানায় দুঃসাহস করে না যাবার। বিস্ময়ের বাকি আছে আরও। বালক বয়সেই এই 'বিস্ময়' একবার গৃহত্যাগ করে গিয়েছিল সন্ন্যাসধর্মের রহস্যাতুর আমন্ত্রণে। যারা শুনছিল তাদের মধ্যে একজন মৃদু আপত্তি করে: এতটা সত্য নয়। বাধা পেয়ে গর্জে ওঠে বক্তা: আলবাত সত্য। কি নিবারণ, বল না, আমার কথার প্রত্যেকটি অমোঘ সত্য কি না? নিবারণ কি বলে শোনা যায় না, কারণ ছাত্ররা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে মুহূর্তে—ঘণ্টা পড়েছে পিরিয়ড আরম্ভের।

বক্তাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় প্রতিবাদী এক কোণে। গিয়ে বলে, সত্যিই বলছি, সত্যি নয়।

কি সত্যি নয়?—বক্তা অবাক হয়ে প্রশ্ন করে।

এই যা বলছিলে এতক্ষণ কটকের ছাত্র সম্বন্ধে।—জানায় মৃদুকণ্ঠে আপত্তিকার।

তুমি কি করে জানলে যে সত্যি নয়?—এবারে বক্তার কণ্ঠস্বরেও জানবার আগ্রহ।

একটুখানি নিস্তব্ধতা। লজ্জার অরুণাভা ছড়িয়ে পড়ে এবারে অন্যপক্ষের তরুণ মুখে। সাংঘাতিক অপরাধ করে ফেলার পর দোষ স্বীকারের সময় যেমন গলা হয় কনফেসারের তেমনই অস্ফুট কণ্ঠে উত্তর আসে: আমিই সেই কটকের ছাত্র—আমার নাম সুভাষ।

সেদিনকার প্রেসিডেন্সী কলেজ মানে বাংলাদেশের সেরা ছাত্রদের ভিড়। দুটি দলে বিভক্ত এই ছাত্ররা। একদল যারা রুপোর চামচে মুখে করে জন্মেছে—আলালের ঘরের দুলাল, তারা বসত যেখানে তার নাম ছিল 'বাবুস বেঞ্চ'। আর একদল ছিল যারা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, কিন্তু মেধাবী ছাত্র। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে জন্ম নিল প্রেসিডেন্সী কলেজের সুদীর্ঘ ইতিহাসেও ইতিপূর্বে অনুপস্থিত সম্পূর্ণ নতুন একটা দল। কেবল বিলাসী অথবা বইয়ের পোকা নয় এই নতুন দল। জানার চেয়ে অজানা, চেনার চেয়ে অচেনা, নিশ্চিন্ততার বাঁধানো পথের চেয়ে অনিশ্চয়তা আর বিপদের বিপথ আকর্ষণ করে অনেক বেশী এই নতুন দলের নেতাকে। 'আর্য' পত্রিকার সম্পাদক তখন শ্রীঅরবিন্দ। তাঁর পাবকবাণীর একটি স্ফুলিঙ্গ আগুন ধরিয়ে দেয় দলপতির সমস্ত চিন্তায়, কর্মে, স্বপ্নে: "Work that India might prosper, suffer that she might rejoice!"

আগুনের সেই স্পর্শমণি, এই নতুন দলের নেতার নিভৃত চিন্তার নির্জন থেকে ছড়িয়ে যায় সবখানে—সকলের মনে।

প্রেসিডেন্সী কলেজে সেদিন কেবল যে পরবর্তী জীবনে স্বনামধন্য ছাত্ররাই পড়তে আসতেন তা নয়,দেশবিশ্রুত ব্যক্তিরা আসতেন পড়াতে। যোগ্য ছাত্রের সঙ্গে সুযোগ্য অধ্যাপকের মিলন সোনায় সোহাগা যোগ করছিল সেদিন এখানে—ভারতবর্ষের বহু ইতিহাসস্রষ্টা পুরুষের প্রতিভার প্রথম পরিচয়ে প্রদীপ্ত এই প্রেসিডেন্সী কলেজেই। এই কলেজে সেদিন ইংরেজী পড়াতেন যিনি তাঁর নাম ছিল মিস্টার ওটেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে অপ্রাসঙ্গিক ভাবে অশোভন মন্তব্যের কারণে ইনি অনায়াসে 'মাদার ইণ্ডিয়া' নামে 'কালো'-বইয়ের রচয়িত্রী

মিস মেয়োর সার্থক পূর্বসূরী হিসাবে মিস্টার মেয়ো বলে পরিচিত হবার দাবি রাখেন। সুভাষের আমলেও অপরিবর্তিত অধ্যাপক ওটেন জানতেই পারেন নি প্রেসিডেন্সী কলেজের অচলায়তনেও প্রস্তুত রয়েছে প্রতিবাদের বারুদ—যার মুখে একদিন তাঁরই একটি ব্যবহার আগুন ধরিয়ে দিল। সেই আগুনে দগ্ধ হয়ে পবিত্র হল, শুচি হল যে তার প্রতিভায় এই আগুন প্রতিভাত হল জীবনের প্রথম পরীক্ষারূপে। এবং সেই অগ্নিপরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে ইতিহাস সৃষ্টিকারী নতুন দলের নেতা—অনাগতকালের অধিনায়ক, নেতাজী সুভাষ।

ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক ওটেনের বিরুদ্ধে অসন্তোষের বারুদ স্তূপীকৃত হচ্ছিল দিনে দিনে।

এরই মধ্যে একদিন ওটেনের ক্লাসের সামনে দিয়ে হৈহৈ করতে করতে যাচ্ছিল একদল ছাত্র। ওটেন ক্লাস থেকে বেরিয়ে এসে অশ্রাব্য ভাষায় তাদের প্রথমে গালাগাল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। বারুদের স্তূপে আগুন ধরে যায় মুহূর্তে। প্রহৃত হন ওটেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের চার দেয়ালের মধ্যে সাদা চামড়ার গায়ে কালো আদমীর হাত ওঠে এই প্রথম। কলকাতার আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে যায় সে খবর আগুনের মত খবরের কাগজের মুখ থেকে। এই দুর্ঘটনার সময়ে সুভাষ সেখানে ছিলেন—এই হল তাঁর অপরাধ। অধ্যক্ষ জেমস বললেন: "I want to see the blood of the culprits !"

সুভাষকে জেরা করা হল সবচেয়ে বেশী।

তুমি মেরেছ ?

না।

তুমি ছিলে সেখানে ?

ছিলাম।

তা হলেও বলবে না ?

না।

সুভাষের সেই এক কথা। ছাত্ররা মেরেছে ঠিক, কিন্তু মেরেছে 'under great provocation'। এই এক কথাকে আঁকড়ে ধরে—এক কথায় সে বেরিয়ে গেল কলেজ থেকে। তাকে দিয়ে কেবল একবার একটি কথা বলাবার চেষ্টা হয়েছিল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে; 'যারা অন্যায় হয়েছে'—বাস্! এতেই মাফ হত সব অপরাধ। সেই একটি কথা সুভাষের কাছ থেকে একবারের জন্যেও বার করা গেল না। ফলে বেরিয়ে যেতে হল সুভাষকেই। প্রেসিডেন্সী কলেজের দরজা দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হবার মুহূর্তে যে যায়, সবাই তাকিয়ে দেখে সে ছাত্র নয়—একমুঠো আগুন। সাহেবরাও তাকিয়ে দেখে। কটকের শ্রেষ্ঠ উকীল জানকীনাথ বসুর পুত্র, প্রেসিডেন্সী কলেজের সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্রদের অন্যতম, বেরিয়ে যাচ্ছে মাথা উঁচু করে। সেই উঁচু মাথা—যার সামনে একদিন ইতিহাস এসে দাঁড়াবে মাথা নীচু করে। সাহেবরা অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে—দুখানা পা হেঁটে যাচ্ছে না, নিষ্ক্রান্ত হবার চেষ্টা করছে—একখানা খাপে ঢাকা বাঁকা তলোয়ার!

প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ওই একবারই কি বেরিয়ে যাওয়া তোমার ? না। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস থেকে একবার, কংগ্রেস সভাপতির আসন থেকে আর একবার, স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমির কাছ থেকে শেষবার! আদর্শের সঙ্গে কর্মের যখনই সংঘাত হয়েছে তখনই পদত্যাগ করেছ। দেশে থেকে দেশের মুক্তি অসম্ভব বুঝেছ যে মুহূর্তে সেই মুহূর্তে করেছ দেশত্যাগ। পদত্যাগ করেছ, বিপদ ত্যাগ করো নি কখনও! দেশ-ত্যাগ করেছ, দেশকে পরিত্যাগ করো নি কখনও স্বপ্নে অথবা জাগরণে।

তাই তোমার আসন আজও শূন্য!

তিন

১৯১৯। একজন সাহেব প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বার করে দিল সুভাষচন্দ্রকে। বিদ্রোহীর প্রতি এই বিতাড়নের আদেশ বিক্ষোভের বস্তু—বিস্ময়ের নয়। কিন্তু স্কটিশচার্চ কলেজে যিনি ডেকে নিলেন এই চিরবিদ্রোহীকে, তিনিও আবার আর এক সাহেব—বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে

এই। সেখান থেকে ১৯১৯-এ দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর অনার্স-প্রাপ্ত সুভাষ যাত্রা করলেন সাতসমুদ্র তেরো নদীর ওপারে। জন্মশত্রু সিংহের গুহায় তরুণ শার্দূল। British Lion-এর সঙ্গে Springing Tiger-এর প্রথম সাক্ষাৎ। সাক্ষাৎ হল ব্রিটিশসিংহের ডেনে—ইংলণ্ডে। সিংহের গুহায় সিংহকে পর্যুদস্ত করবার উন্মাদনায় বাবার কথাতে রাজী হলেন, সতীর্থদের বিস্ময় সঞ্চার করে আই. সি. এস. পরীক্ষা দিতে। 'আই', 'সি' এবং 'এস'—তিনটি অক্ষরের দিকে সেদিন তাকিয়ে থাকত তেত্রিশ কোটি মানুষ। কথামালার শৃগালের মত তাদের লোভী দৃষ্টির নাগালের বাইরের দ্রাক্ষাফলকে অতিশয় টক মনে করে চলে আসার পাত্র ছিলেন না সুভাষ। দ্রাক্ষাফল উপড়ে এনে তাকে ভোগ না করে ফেলে যাবার জন্যে এলেন ইংলণ্ডে।

ইংলণ্ডে তাঁর প্রথম প্রতিক্রিয়া একমাত্র তাঁরই যোগ্য। ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিক্রিয়ার জন্ম প্রেসিডেন্সী কলেজের দুর্ঘটনায়। দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়ায় যার প্রকাশ সেটির জন্ম রাগ থেকে নয়—অনুরাগ থেকে। শত্রুর মধ্যেও গুণের পরিচয় পেলে মহৎ চরিত্রে যে অনুরাগের সঞ্চার অবশ্যম্ভাবী হয়, সেই অনুভূতির প্রকাশ দেখি তাঁর দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়ায়। এও তাঁরই যোগ্য : 'এখানকার লোকেদের সময়জ্ঞান খুব প্রখর। এদের অনেক দোষ আছে, কিন্তু গুণও এত আছে যে তার কাছে মাথা নীচু করতেই হয়।' ইংরেজ চরিত্রের সেই গুণ ভূষিত করেছিল একদিন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী চরিত্র বিদ্যাসাগরকে।

এই গুণের সঙ্গে সুভাষের চরিত্রে যা যুক্ত হয়ে তাঁকে সকলের মধ্যে সকলের চেয়ে আলাদা করে তুলেছিল, লণ্ডনের ভারতীয় ছাত্রমহলে তা তাঁর নারী মদ এবং তরল আমোদের প্রতি তীব্র বৈরাগ্য। তুলনাবিহীন সর্বপ্রকার সংযমের কারণে উচ্ছৃঙ্খলতম ভারতীয় ছাত্রও যমের মত ভয় করত সুভাষকে। কিন্তু সেই মুখে যেমন স্বজাতির সামান্যতম পতনে ভয়ঙ্কর রাগের ছবি, তেমনি আবার ত্রুটি স্বীকার করামাত্র অভয়ঙ্কর অনুরাগের অকৃত্রিম হাসি একই সঙ্গে মেঘ ও রৌদ্রের মত খেলা করে। রাগকে অনুরাগ দিয়ে, অশ্রুকে হাসি দিয়ে, মৃত্যুকে জীবন দিয়ে পরাস্ত করাই ছিল সুভাষচন্দ্রের সারাজীবনের একমাত্র স্পোর্টস; তাঁর চেয়ে বড় স্পোর্টসম্যান রাজনীতির ক্রীড়াঙ্গনে দেখা গেছে কিনা সন্দেহ।

লণ্ডনে আট মাস মাত্র পড়ে ১৯২০ সনে সুভাষ আই. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; তাঁর স্থান হয় চতুর্থ।

১৯১৩ সনে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। লণ্ডনে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার খবর পৌঁছলে হাউস অব কমন্সে ডায়ার নিন্দিত হলেও ব্রিটিশ-জনমত-অভিনন্দিত হল সেই ঘাতকই। রবীন্দ্রনাথ ত্যাগ করলেন 'নাইট' উপাধি। গান্ধী ভারতীয়দের আহ্বান করলেন সর্বপ্রকার সরকারী চাকরিতে ইস্তফা দিতে।

সুভাষের বয়স যখন তেইশ, আই. সি. এস.—ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস, তখনও পর্যন্ত ভারতীয় চাকরির স্বর্গে পৌঁছবার সিঁড়ি। সেই সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দেবার অধিকার অর্জন করবার মুহূর্তেই নিরাপদ বন্দরের কাল হল শেষ। অকূল অজানা সমুদ্রের ডাক এলো স্বাধীনতা-হীনতার সন্ধিক্ষণে। হীনতার সঙ্গে সন্ধি করতে রাজী হলেন না সুভাষ; স্বাধীনতার সঙ্গে হল স্বাধীনতা-সংগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ সৈনিকের রাখীবন্ধন।

১৯২১ সনে সুভাষ ইস্তফা দিলেন। আণ্ডার-সেক্রেটারীকে বললেন: 'একই সঙ্গে ব্রিটিশরাজের এবং ভারতের সেবা আমার দ্বারা অসম্ভব।' বন্ধুকে দেশে চিঠি দিলেন: 'শুনে দুঃখিত হবে, আমি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাস করেছি……'।

দাসত্বের স্বর্গ থেকে বিদায়মুহূর্তে মনে পড়ে সুভাষের দীনহীনা অশ্রুআঁখি জননী জন্মভূমির মলিন মুখ। বুক

চিরে বেরিয়ে আসে দীর্ঘশ্বাস, চোখ ফেটে উদ্গত অশ্রু। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ আবৃত্তি করে :

'হে জননী পুত্রহারা,
শেষ বিচ্ছেদের দিনে যে শোকাশ্রুধারা
চক্ষু হতে ঝরি পড়ি তব মাতৃস্তন
করেছিল অভিষিক্ত—আজি এতক্ষণ
সে অশ্রু শুকায়ে গেছে। তবু জানি মনে
যখনি ফিরিব পুনঃ তব নিকেতনে
তখনি দুখানি বাহু ধরিবে আমায়,
বাজিবে মঙ্গলশঙ্খ,......'

দেশে ফিরে পিতা জানকীনাথকে জানালেন : কেবলমাত্র পারিবারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য অবলম্বন করেই আমরা যদি নিজের আদর্শ গড়ে তুলতে যাই, তবে কি সে আদর্শ এক অদ্ভুত বিসদৃশ ব্যাপার হবে না? কলকাতা থেকে বোম্বাই গেলেন গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। সুভাষ গান্ধী-পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন আর গান্ধী তার জবাব দেন। সন্তুষ্ট হন না সুভাষ। ফিরে আসেন কলকাতায়। দেশবন্ধুর সঙ্গে দেখা হয় সুভাষচন্দ্রের। একজন বিপুল বিত্তবান, পসার ত্যাগ করে নেমেছেন আন্দোলনে; আর একজন স্বর্গের দাসত্ব ত্যাগ করে নামতে চাইছেন দেশের দুঃখ দূর করতে। দেখা হয় আগুনের সঙ্গে বারুদের, বারিধারার সঙ্গে তৃষিত চাতকের, পথপ্রদর্শকের সঙ্গে পথিকের। দেখা হয় গুরুর সঙ্গে শিষ্যের। সিমলেপাড়ায় যেমন একদিন দেখা হয়েছিল রামকৃষ্ণের সঙ্গে বিবেকানন্দের। বিবেকানন্দকে দেখেই চিনেছিলেন রামকৃষ্ণ। সুভাষকে দেখেই চিনলেন দেশবন্ধু। এরই জন্যে অপেক্ষা করে ছিলেন তিনি। রামকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করেছিলেন বিবেকানন্দ : আমাকে ঈশ্বরদর্শন করাতে পারেন আপনি? দেশবন্ধুকে প্রশ্ন করেন সুভাষ : আমাকে স্বাধীনতার পথ দেখাতে পারেন আপনি? রামকৃষ্ণর মধ্যেই বিবেকানন্দ সেদিন দেখতে পেয়েছিলেন রাম এবং কৃষ্ণকে একাধারে। দেশবন্ধুর মধ্যে সুভাষচন্দ্র দেখতে পেলেন নিজের দেশকে।

দেশবন্ধুকে প্রণাম করলেন সুভাষ। দেশবন্ধু—প্রাণহীন মৃত্যুর দেশে যিনি এনেছিলেন সঙ্গে করে মৃত্যুহীন প্রাণ—সেই দেশবন্ধুকে প্রণাম করলেন সুভাষ। বিবেকানন্দকে সর্বস্ব দিয়ে ফকির হয়েছিলেন রামকৃষ্ণ। সুভাষকে দেশবন্ধুর প্রাণহীন মৃতদেহ যাবার আগে দিয়ে গেছে মৃত্যুহীন প্রাণ! সেই সুভাষকে আশীর্বাদ করলেন দেশবন্ধু—জরার দেশে যিনি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন চিরযৌবন—সেই সুভাষকে আশীর্বাদ করলেন দেশবন্ধু।

গঙ্গার সঙ্গে যমুনার, জীবনের সঙ্গে যৌবনের মিলন হল। স্বাধীনতা-সংগ্রাম এবং সুভাষচন্দ্রের জীবন-সংগ্রামের ইতিহাসচিহ্নিত সেই বৎসর হচ্ছে ১৯২১।

চার

সুভাষচন্দ্রের কালোত্তীর্ণ জীবন-মহাকাব্যে পরবর্তী স্মরণীয় তারিখ হচ্ছে—১৯৩৯। তারিখটা সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসেও অবিস্মরণীয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সেই বৎসর ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অদ্বিতীয় যোদ্ধা সুভাষচন্দ্রের পক্ষেও, তাঁর আদর্শের সঙ্গে কংগ্রেস-হাইকম্যাণ্ডের আদর্শের, মনের সঙ্গে মতের, বিবেকের সঙ্গে কৌশলের, জীবনের মূল নীতির সঙ্গে রাজনীতির সংঘাতে আর এক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ নিঃসংশয়ে। প্রথমবারের যুদ্ধে ত্যাগ করেছিলেন ব্রিটিশরাজের দাসত্ব, দ্বিতীয়বারের যুদ্ধে অস্বীকার করলেন কংগ্রেস-প্রভুত্বকে। প্রথমবারে আই. সি. এস. পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন স্বর্গের সিঁড়ি, দ্বিতীয়বার কংগ্রেস-সভাপতি নির্বাচিত হবার পর তবেই স্বেচ্ছায় রেহাই দেন কংগ্রেসপতিকে সুভাষচন্দ্র। জীবনে দেশ এবং দেশবন্ধু ছাড়া আর কারুর কাছে তাঁর

কোনও ঋণ নেই। প্রথমজনকে প্রণতি এবং দ্বিতীয়জনের কাছে নতিস্বীকার ছিল সুভাষচন্দ্রের নিত্যকর্ম।

১৯২১ সনে তিনি কংগ্রেস-রাজনীতিতে যোগদান করেন; ১৯৩৯ সনে তিনি কংগ্রেস-রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসেন। যিনি একদিন প্রবেশ করেছিলেন এখানে আর যিনি একদিন বেরিয়ে গেলেন এখান থেকে—সেই দুজন এক হয়েও 'এক' ব্যক্তি নন। যিনি ঢুকেছিলেন তিনি ছিলেন কংগ্রেসী বিচারে 'বিদ্রোহী সৈনিক', যিনি বেরিয়ে গেলেন তিনি ইতিহাসের পাতায়—আক্রমণোদ্যত জীবন্ত শার্দুল। ইংরেজকে 'কুইট ইণ্ডিয়া' বলবার আগে কংগ্রেস তার সর্বশ্রেষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবককে বলেছিল: কুইট কংগ্রেস। ইংরেজ বিয়াল্লিশের আন্দোলনে 'কুইট ইণ্ডিয়া' করে নি। সুভাষ কেবল কংগ্রেস নয়, ইণ্ডিয়া কুইট করলেন। তিনি সেই ইতিহাসনির্দিষ্ট নায়ক যিনি নির্দেশ পেয়েছিলেন নিজের অন্তর থেকে—তিনি ইণ্ডিয়া কুইট না করলে একজন ইংরেজকেও 'কুইট ইণ্ডিয়া' করানো যাবে না। কংগ্রেসের অফিসিয়াল ঐতিহাসিকের মতে দেশের স্বাধীনতা আনার একমাত্র কৃতিত্ব কংগ্রেসের। ভাবীকালের ইতিহাস নিজের হাতে মুছে দেবে এই অসত্যের চেয়েও মিথ্যা অর্ধসত্য; অন্ধকূপহত্যার মিথ্যা মুছে দিয়েছে যে ইতিহাস তার কণ্ঠ সেদিন শ্রুত হবে আবার: পলাশীর প্রান্তরে গঙ্গায় যে স্বাধীনতার সলিলসমাধি ঘটেছিল, তাকে আবার তুলে আনবার জন্যে শেষ আঘাত হেনেছিলেন সুভাষচন্দ্র মণিপুরের প্রান্তে। এই স্বাধীনতার নবসূর্যোদয় সম্ভব হয় নি একা কংগ্রেসের কৃতিত্বে; এর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য যোগ ক্ষুদিরাম-প্রফুল্লের, অরবিন্দ-রবীন্দ্রের; এবং দেশবন্ধু আর তাঁর দেশকে স্বাধীন করবার স্বপ্নে আকুল দেশত্যাগী সুভাষচন্দ্রেরও।

১৯৩৯ সনে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসবার মুহূর্তে ভারতীয় রাজনীতিবিদেরা সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন সুভাষের রাজনৈতিক মৃত্যু। ধূম উদ্গীর্ণ না হলেই যাঁরা মনে করেন নির্বাপিত হয়েছে অগ্নি তাঁরাই কেবল সুভাষকে মনে করেছেন চিরকাল ট্যাক্টলেস ইমোশনের স্তূপ—কংগ্রেসের অগ্রগমনের পথে বাধাস্বরূপ অচলগিরি মাত্র। এই বিশেষ অজ্ঞ রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের উত্তর দিয়েছেন সুভাষচন্দ্র ৩০শে এপ্রিল ১৯৪৪ সনে; সুভাষচন্দ্রের সৈন্যবাহিনী ভারতের মাটিতে তখন পা দিয়েছে। সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠ ধ্বনিত হয়েছে সেদিন ভারতের পূর্ব-সীমান্তে অপূর্ব উদ্দীপনায়: ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লেশ, পথশ্রম আর মৃত্যু—আজ এ ছাড়া তোমাদের আর আমার কিছুই দেবার নেই, তবে যদি জীবনে ও মরণে আমাকে তোমরা অনুসরণ কর,...আমি তোমাদের স্বাধীনতা ও জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেব।

অচলগিরি নয়—এ পাবকবাণী উচ্চারিত এক জীবন্ত আগ্নেয়গিরির মুখে।

এ বাণী সান্ত্বনার নয়, স্বাধীন ভারতে পদার্পণ না করা পর্যন্ত শান্ত না হবার 'কঠোর সন্তোষ'-এর প্রতিশ্রুতি। স্বরাজ এনে দেবার মিথ্যা স্তোকবাক্য নয়। ভারতের প্রথম স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভারতের মাটিতে; একজন ভারতীয় হয়েছিলেন সর্বোচ্চ অধিনায়ক, এই স্বাধীন সরকার ঘোষণা করেছে মন্ত্রিসভার নাম, ডাকটিকিট ছাপা হয়েছে, নিজেদের ব্যাঙ্কনোট ছাপা চলছে তখন।

এক ঘণ্টার জন্যে হলেও, একমুহূর্তের জন্যে হলেও ভারতের আকাশে উড্ডীন হয়েছিল স্বাধীন ভারতের জয়পতাকা!

আজাদহিন্দ সরকার স্থায়ী হয় নি এই কারণে যারা বলে সুভাষচন্দ্রের হার হয়েছে তারা জানে না যে কালের কষ্টিপাথরে এই অমূল্য 'হার'-এর তুলনায় হীরামাণিক্য-খচিত জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ রত্নহার-এর মূল্যও যৎসামান্য।

ইংরেজ ভারতের মাটি পরিত্যাগ করেছে চরকাকাটা, কচুরীপানা তোলা, অসহযোগ, অথবা আমরণ উপবাসের ভয় দেখানোয় বিড়ম্বিত অথবা উদ্বিগ্ন বোধ করে নয়। ইংরেজ ভারত ত্যাগ করেছে সেইদিন যেদিন সে বুঝেছে

বিশ্বপরিস্থিতিই তাদের ভারতবর্ষ আঁকড়ে থাকার প্রতিকূলে; আর বুঝেছে তার আগে, সৈন্যবাহিনীর মধ্যে যখন সঞ্চারিত করেছেন সুভাষ স্বাধীনতার স্বপ্ন, যখন হিন্দু-মুসলমানকে গ্রথিত করেছে আজাদহিন্দ ফৌজ একজাতি একপ্রাণ একতার সূত্রে। সেইদিনই জেগেছে নবভারতের জনতা। সেই জাগ্রত জনতার সঙ্গে আর চলবে না 'ডিভাইড অ্যাণ্ড মিসরুল'-এর চালাকি, বুঝতে পেরেই চলে গেছে চতুর বণিক। যাবার আগে সুভাষের অনুপস্থিতির সুযোগে ভাগ করে দিয়ে গেছে ভারতকে যাতে কোনদিন আর জোড়া না লাগে এমন নিপুণভাবে। যাবার আগে শেষ অস্ত্রে ঘোষণা করেছে অখণ্ড ভারতের কাল হল শেষ।

অর্ধশতাব্দীর সংগ্রামে যারা দিল সব তারা প্রায় পেল না কিছুই। বাসভূমি থেকে উচ্ছেদ হল তাদের, যাদের সমিধে স্বাধীনতার যজ্ঞ উদ্‌যাপিত—সমাধি হয়ে গেল তাদের স্বাধীন ভারতেই। এর চেয়ে বড় ভাগ্যের পরিহাসের কথা ইতিহাসে আজও অলিখিত। অর্ধশতাব্দী-কাল কংগ্রেসের এই সংগ্রামে অগণিত হিন্দু-মুসলমানের কারাদণ্ড, ফাঁসী, দ্বীপান্তর, অন্তরীণ কেন? কারণ, মিলিত হিন্দু-মুসলমানের স্বাধীন ভারতবর্ষ আনবে কংগ্রেস। সেই সংগ্রামের ঐতিহ্য-বিস্মৃত, জাতির জনকের উপদেশ-বিস্মৃত, আত্মবিস্মৃত কংগ্রেস গদির লোভে মেনে নিল সর্বনাশা দেশভাগ—বর্তমানের সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে ভবিষ্যৎ কতকাল ধরে কে জানে!

কংগ্রেস বিস্মৃত হোক, আমরা বিস্মৃত হতে পারি না সেই কাজীর বিচারের কাহিনী। দুই স্ত্রীলোকের একটি সন্তানকে নিজের বলে দাবি করার সেই অবিস্মরণীয় কাহিনী। কাজী কেটে ভাগ করে নিতে বলেন আধাআধি। যার সন্তান তার মাতৃহৃদয় হাহাকার করে ওঠে, অন্যজন মেনে নেয় ভাগ। কাজীর বুদ্ধির কষ্টি-পাথরে কষা হয়ে যায় সন্তান কার। দ্বিধাবিভক্ত এই ভারতবর্ষে এই কাহিনী ভাবায় আমাদের। ভাবি, সেই মাতৃহৃদয়বঞ্চিত আর এক স্ত্রীলোক, পরের সন্তানকে কেটে ফেলায় আপত্তি না করায় যে ধরা পড়ে যায় কাজীর বিচারে; ভাবি তার চেয়েও কি হৃদয়হীন তাঁরা, বর্তমানে যাঁরা ভারতভাগ্যবিধাতা—ভারতের গদিতে আসীন যাঁরা আজ গদা হাতে!

সুভাষচন্দ্রের আজাদহিন্দ ফৌজ ভারতের এই কলঙ্ক দূর করবার কীর্তিতে ইতিহাসের স্রষ্টা।

মণিপুরের প্রান্তে পৌঁছেও আজাদহিন্দ ফৌজ শেষ পর্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে গেছে এটুকুই মাত্র যারা মনে রাখবে তারাই চিরকাল নিজেদের স্বার্থে ইতিহাসকে বিকৃত করে। আজাদহিন্দ ফৌজের অস্থায়ী সরকার, তার ডাকটিকিট, স্বাধীন ভারতে তার পতাকা উত্তোলন—এই সবকিছুর চেয়েই বড় বলে বিবেচিত হবে যে কাজ তা ওই হিন্দু-মুসলমানের মিলন। ইংরেজ বিতাড়নের প্রতিজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ এই ফৌজের পতাকাতলে সুভাষচন্দ্র ১৮৫৭-র পর আর একবার তাঁর আদর্শ, ব্যক্তিত্ব এবং নেতৃত্বের সম্মোহনী শক্তিতে ব্যর্থ করতে পেরেছিলেন ইংরেজ শাসনের সাফল্যের অব্যর্থ কারণ 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল'-নীতি। এবং যে মুহূর্তে ইংরেজ বুঝেছিল সেনাদের মধ্যেও ছড়িয়ে গেছে সুভাষের মিলিত হিন্দু-মুসলমানের হিন্দুস্থানের স্বপ্ন এবং সাধনা; তাদের সমবেত কণ্ঠে যখন বজ্রনিনাদে ঘোষিত হয়েছে হিন্দুস্থানের জয় হোক, জয় হিন্দ—তখনই তারা মনে মনে প্রস্তুত হয়েছে, আজ অথবা কাল এদেশ ত্যাগ করে যেতে হবে তাদের। কুইট ইণ্ডিয়া করেছে তারা কংগ্রেসের আওয়াজে নয়। আজাদহিন্দ ফৌজ হেরে যাবার আগেই হারিয়ে দিয়ে গেছে তাদের ওই এক অস্ত্রে; হিন্দু-মুসলমানের মিলিত-কণ্ঠে যেই উঠেছে সেই গান: কদম কদম বাড়ায়ে যা—সেই কদম কদম পিছু হটতে আরম্ভ করেছে ব্রিটিশসিংহ।

যাবার আগে ভাগ করে দিয়ে গেছে ভারতকে। আজাদহিন্দ ফৌজ ভাগ্যবিড়ম্বিত না হলে, অনুপস্থিত না থাকলে সুভাষচন্দ্র, জাতির জনকের সতর্কবাণী বিস্মৃত না হলে হিন্দুস্থানে এবং পাকিস্তানে ভেদবুদ্ধির চারা পুঁতে

যেতে পারত না ধুরন্ধর ব্রিটিশ রাজনীতি। এই চারা আজ আর চারা নেই—চারিয়ে গেছে দেশব্যাপী নানা আত্মঘাতী রক্তাক্ত কলহের মধ্যে। এবং বিষবৃক্ষরূপে তার দেখা দেওয়ার দিন দূরে নয় আর। সে দুর্দিনের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে এখনই। সুভাষচন্দ্র উপস্থিত থাকলে সর্বশক্তিতে বাধা দিতেন কংগ্রেসের এই নির্বোধ আচরণকে। রাজনীতিবিদেরা তাঁকে আবার হঠকারিতার অভিযোগে নিন্দিত করতেন। সুভাষ আবার প্রমাণ দিতেন যে তিনিই ঠিক, তাঁরাই বেঠিক। আজাদ-হিন্দ ফৌজ গঠনের আগে যিনি মাথাগরম এবং ভাবপ্রবণ বলে নিন্দিত এবং আজাদহিন্দ গঠনের পর যিনি তাঁর কঠোরতম সমালোচকের দৃষ্টিতেও সর্বশ্রেষ্ঠ সংগঠক বলে অভিনন্দিত সেই সুভাষ আর একবার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাতেন আমাদের চোখের ওপর। প্রমাণ হয়ে গেছে সুভাষের অনুপস্থিতিতেই আজ যে ভারত ভাগ মেনে নিয়ে এমন ভুল করেছে কংগ্রেস, এমন জট পাকিয়েছে যে দিন থেকে দিনে সে জট খোলার পরিবর্তে আরও জটিল থেকে জটিলতর হবার পথে। সুভাষের উপস্থিতিতে এই জট পড়তেই পারত না ঐক্যের গ্রন্থিতে।

রাজনীতিজ্ঞরা বোঝেন নি। রাজনীতির উর্ধ্বে অসীমকালে পরিব্যাপ্ত যাঁর দৃষ্টি—বুঝেছিলেন সেই রবীন্দ্রনাথ। সুভাষচন্দ্রকে অভিষিক্ত করেছিলেন অনাগত কালের নায়কত্বে :

"বহুকাল পূর্বে একদিন আর এক সভায় আমি বাঙালী সমাজের অনাগত অধিনায়কের উদ্দেশ্যে বাণীদূত পাঠিয়েছিলাম। তার বহু বৎসর পরে আজ আর এক অবকাশে বাংলাদেশের অধিনেতাকে প্রত্যক্ষ বরণ করছি। দেহে ও মনে তাঁর সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারব আমার সে সময় আজ গেছে, শক্তিও অবসন্ন। আজ আমার শেষ কর্তব্যরূপে বাংলাদেশের ইচ্ছাকে কেবল আহ্বান করতে পারি। সেই ইচ্ছা তোমার ইচ্ছাকে পূর্ণশক্তিতে প্রবুদ্ধ করুক, কেবল এই কামনা জানাতে পারি। তারপরে আশীর্বাদ করে বিদায় নেব এই জেনে যে, দেশের দুঃখকে তুমি তোমার আপন দুঃখ করেছ, দেশের সার্থক মুক্তি অগ্রসর হয়ে আসছে তোমার পুরস্কার বহন করে।"

অরুণালোকে উদ্ভাসিত আকাশ থেকে এসে পড়ে অস্তোন্মুখ সূর্যের শেষ আশীর্বাদ ; স্পর্শ করে তরুণ ভারতের হৃদয়ের অধীশ্বর সুভাষচন্দ্রের মুকুটহীন মাথা। সেই মাথা—যা কারুর কাছে নত হয় নি আজও—তার উদ্দেশে প্রণাম জানায় আজ সমগ্র দেশ অবনত মস্তকে।

পাঁচ

১৯২১ সনে গান্ধীর সঙ্গে সেই প্রথম সাক্ষাতেই সুভাষ বুঝেছিলেন গান্ধীর নীতি মানুষ হিসাবে শ্রদ্ধার বিষয়, কিন্তু গান্ধীর রাজনীতি স্বাধীনতা-সংগ্রামের সৈনিকের আদর্শ নয়। গান্ধীর সম্পর্কে দেশবন্ধুর এই উক্তি : "গান্ধী আন্দোলন আরম্ভ করেন চমৎকার, নির্ভুল কৌশলে গড়ে তোলেন তা ; ক্রমাগত সাফল্যে আন্দোলনের চরম শিখরে ওঠেন—কিন্তু তার পরেই তাঁর স্নায়ু বিকল হয় আর তিনি থতমত খেতে থাকেন।" […"but after that he loses his nerve and begins to falter."] এটি সুভাষচন্দ্রেরও মনের কথা। গান্ধীর কাছ থেকে অপ্রসন্ন মনে ফিরে তিনি যান দেশবন্ধুর কাছে। এবং মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে পারেন এঁর কাছেই রাজনীতির দীক্ষা নিতে তিনি নিয়তি-নির্দিষ্ট। দেশবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক গুরু মাত্র নন, দেশবন্ধুর অস্তিত্বের একটা অংশ হয়ে ওঠেন তিনি। এই দেশবন্ধুর মৃত্যুর ফলেই হিন্দু-মুসলমানে মিলন হয় নি। আজ সুভাষের অনুপস্থিতিতেই যেমন সাম্প্রদায়িকতা দেখা দিয়েছে ভারতবর্ষে।

১৯২১-এ কংগ্রেসে ঢোকেন সুভাষ, ১৯৩৯-এ বেরিয়ে আসেন। এর মধ্যে ১৯২৪ সনে দেশবন্ধুর নেতৃত্বে

স্বরাজ্যদল কর্পোরেশন নির্বাচনে মেজরিটি পায়। সুভাষচন্দ্র কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসারের পদে নিযুক্ত হন; তখন তাঁর বয়স সাতাশ। এই পদে সুভাষচন্দ্র প্রমাণ করে দেন ইস্পাত দিয়ে গঠিত তিনি। লোকের বদলে চাদর-বাঁধা চেয়ারে চেয়ারে হাহাকার পড়ে গেল। সকলের আগে আসেন সুভাষ; সকলের পরে যান। প্রত্যেকটি লোকের উপস্থিতি-অনুপস্থিতি লিপিবদ্ধ করার খাতা নিজে পরীক্ষা করেন। প্রত্যেকটি ফাইল পড়ে তবে স্বাক্ষর দেন, প্রত্যেকটি অর্ডারের তলায় সই দেন নিজের হাতে। ঘড়ির কাঁটা বন্ধ হয়, কর্পোরেশনের কাজ বন্ধ হয় না তখনও। সুখের পায়রাদের দিন শেষ হয়, পাকা ঘুঘুদের শুরু হয় অশেষ দুর্দিন।

কর্পোরেশনের ইতিহাসে সেই প্রথম এবং সেই শেষবার প্রমাণ করে দেন সুভাষ: Where there is a will there is a way—ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়। কলিকাতা পৌরসভার ইতিহাসে সেই প্রথম বিনাব্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্যে একটি পৃথক শিক্ষাবিভাগের জন্ম হল। যোগ্য লোক বাছাই করে এডুকেশান অফিসারের চেয়ারে বসালেন। স্বাস্থ্য অ্যাসোসিয়েশনে সাহায্যদান, একাধিক ডিসপেন্সারির উদ্বোধন, শিশু ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা—কলিকাতা কর্পোরেশনকে সেই সর্বপ্রথম কলিকাতার নাগরিকদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান করে তুলল।

কর্পোরেশনের চীফ ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন জনৈক কোটস। শ্বেতাঙ্গরা সেদিন পদে পদে বুঝিয়ে দিত এদেশীয়দের যে তারা প্রভু; কারণ তারা সাহেব। এদেশীয়রাও তাদের বুঝতে দিতেন প্রতিমুহূর্তে যে বড় পদ অধিকার করলেও ভারতীয়রা তাদের দাস; কারণ তারা মোসাহেব। সেই আমলে কোটস এলেন সুভাষের সঙ্গে দেখা করতে। হাতে জলন্ত চুরুট। এসেই টেবিলের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে পড়লেন। সুভাষ তাকালেন একবার জলন্ত চুরুটের দিকে; জলন্ত চুরুটের চেয়েও অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন একপলক। চুরুটের আগুন নিভে গেল তদ্দণ্ডেই। আর একবার তাকালেন টেবিলের ওপর বসা কোটসের দিকে; কোটস উঠে দাঁড়ালেন সঙ্গে সঙ্গে।

বিদ্যাসাগর সাহেবের টেবিলের ওপর জুতোসুদ্ধ পা তুলে দেবার প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন নি; নিজের পায়ের চটি—বিদ্যাসাগরী চটি বলে বাংলার অন্যতম ঐতিহ্য হয়ে উঠেছিল যা সেদিনই—তা তুলে দিয়েছিলেন সাহেবের নাকের ওপর। স্যার আশুতোষ রেলগাড়ির কামরা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন সাহেবের কোট; সাহেবের রোষকষায়িত দৃষ্টির উত্তরে হেসেছিলেন। সাহেব, স্যার আশুতোষের জুতো তার আগেই ফেলে দেওয়ায়, সাহেবকে বলেছিলেন বাংলার বাঘ যে সাহেবের কোট বোধ হয় আশুতোষের জুতোজোড়াকে ফিরিয়ে আনতে গেছে। চুপ করে গিয়েছিল সাহেব; বুঝেছিল, এ কথা যাঁর, তিনিও বাংলার বটে, তবে তিনি শুধু 'বেঙ্গল' নন—'রয়াল বেঙ্গল'!

কর্পোরেশনের চীফ ইঞ্জিনীয়ার থেকে শুরু করে শ্বেতাঙ্গরা এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে সারা কর্পোরেশন জানল যে, চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসারের চেয়ারে যিনি এসে বসেছেন তাঁর কাছে ভোটের শিকে ছেঁড়া রাজনৈতিক ফলার নয় এই সৌভাগ্য; এই পদ পড়ে-পাওয়া চোদ্দ আনা নয়। মনে পড়ল তাদের এর আগে—অনেক আগেই, ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস—ভারতীয়দের স্বর্গের সিঁড়িতে ওঠবার যোগ্যতা অর্জন করে সুভাষ স্বেচ্ছায় বর্জন করে এসেছেন সেই চাকরি। কলিকাতা কর্পোরেশনে সেদিন তিনি এসেছেন, ভারতীয়রাও শাসনকার্য পরিচালনায় অনুপযুক্ত নয় যে উপযুক্ত সময় এলে তা বোঝা যাবে—এরই প্রমাণ আগে থেকে রেখে যাবার কারণে। স্বদেশীয় ত্রুটি সহ্য করবার পাত্র নন এই লোক যেমন, তেমনই বিদেশীর ভ্রূকুটিও এঁর কাছে সমান অসহ্য।

কর্পোরেশনের সর্বোচ্চ পদে সেদিন যে ছটফট করছিল সে সাতাশ বছরের যুবক সুভাষ নয়, পিঞ্জরের সোনার

শেকল কেটে বেরুবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল 'স্প্রিংগিং টাইগার'!

ছয়

কেবল গান্ধীর রাজনীতি সম্পর্কেই নয়, নেহেরু-চরিত্রের দ্বিধার বিষয়েও সুভাষ নির্দ্বিধায় বলেছেনঃ··· 'এ কথা বললে হয়তো ভুল হবে না যে তাঁর (জহরলালের) মাথা আছে বামপন্থীদের সঙ্গে, কিন্তু হৃদয় বাঁধা আছে মহাত্মা গান্ধীর কাছে।' গান্ধীভক্তদের সম্পর্কেও তাঁর ধারণা সুস্পষ্টঃ 'কংগ্রেসের যত মাথা সব একটি লোকের কাছে বাঁধা' [দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল]। গান্ধীর রাজনীতি আপোসের নীতি; সুভাষের সংগ্রাম আপোসহীন। সেই ১৯৩২-এর ২রা জানুয়ারি নেতৃস্থানীয় কংগ্রেসীদের সঙ্গে ধৃত সুভাষ ওই তারিখের দুদিন আগে এক পত্রে লিখছেন তাঁর বন্ধুকেঃ 'যদি পূর্ণ-প্রস্ফুটিত পুষ্পের সুবাস চাও তবে কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হও আগে; প্রসন্ন প্রভাতের সূর্যোদয়ের সাক্ষাৎ পেতে কর রাত্রির তপস্যা; পরাধীনতার দ্বার ভঙ্গ করে যদি আনতে চাও জ্যোতির্ময়ী স্বাধীনতা, তবে জয়গান কর জীবনের, যৌবনের; দুঃখের দীপ্তিতে, আত্ম-ত্যাগের তৃপ্তিতে নিঃসঙ্কোচে দাও মুক্তির মূল্য।'

জীবনে কোনও অবস্থার কাছে, কোনও ব্যক্তির কাছে নত হয় নি সুভাষের এই ব্যক্তিত্ব। স্বর্গের চেয়েও গরীয়সী স্বদেশভূমি। তার পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া আর যে কোনও প্রার্থনাতেই আত্মা অতৃপ্ত, আশা অপূর্ণ। দেশবন্ধুর দর্পণেই তিনি কেবল প্রতিবিম্বিত হতে দেখেছিলেন পরাধীন ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতিমূর্তি সেই প্রথম দিনেই। তাই দেশবন্ধুকে দেশের সবচেয়ে বড় বন্ধু বলে, বন্ধুর পথ এড়াতে হবে বলে যিনি কখনও রাজী হন নি বিবেকের সঙ্গে আপোস করতে, প্রতিজ্ঞা থেকে এক পা-ও সরে আসতে, পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যতীত স্বরাজের দ্বিতীয় আর কোনও অর্থ শেষদিন পর্যন্ত যাঁর কাছে স্বীকৃত হয় নি—সুভাষচন্দ্রের কাছে সেই দেশবন্ধুই ভারতের অদ্বিতীয় নেতা।

এই দেশবন্ধু কেবলমাত্র ভাবের উচ্ছ্বাসে স্বরাজ আসবে মনে করতে পারেন নি। চরকা, কচুরীপানা পরিষ্কার, অথবা অহিংসার ইনার ভয়েসের ভয়ে ব্রিটিশসিংহ ভারত ছেড়ে পালাবে ভাববার মত ভাবপ্রবণ অবিবেচক পুরুষ ছিলেন না চিত্তরঞ্জন দাশ। রাজনীতিতে যোগদান করবার আগে কুবেরের ঈর্ষাযোগ্য অর্থের উৎস বিপুল পসার পরিত্যাগ করে এসেছেন ধুরন্ধর ব্যবহারজীবী সি. আর. দাশ। একদিকে ছিল পূর্ণ স্বরাজ, আর নয় কিছুই না, এই নীতি; অন্যদিকে, শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ—চাণক্যের এই রাজনীতির তিনি মর্মার্থ উপলব্ধি করেছিলেন।

এবং তার প্রমাণ দিয়েছিলেন মুসলমানদের সঙ্গে স্বরাজ্য-প্যাক্টে। ইংরেজের হিন্দু-মুসলমান ভেদনীতির মূলেই কুঠারাঘাত করতে চেয়েছিলেন তিনি। মুসলমানরা যাতে আলাদা দাবি তোলার কোনও কারণ না পায়, কংগ্রেসের মাধ্যমেই যাতে তাদের দাবি গৃহীত হয় এই উদ্দেশ্যে তিনি সেদিন মুসলমানদের প্রাপ্যের তুলনায় কিছু বেশীই দিতে চেয়েছিলেন। যারা সেদিন আপত্তি করেছিল এতে, আজ তারা অনেকেই স্বাধীন ভারতে বেঁচে নেই। থাকলে দেখে যেতে পারত যে যাঁরা কয়েকটা বেশী চাকরি মুসলমানদের দিতে আপত্তি করেছিলেন, তাঁরাই, 'পরে উহাদিগকে মাতৃভূমির অঙ্গচ্ছেদ করিয়া বিশ্বের বৃহত্তম ইস্লামিক রাজ্য পাওয়াইয়া দিয়াছেন'।

এই দেশবন্ধুর শিষ্য সুভাষ। যৌবনের দুর্বার গতিবেগ, আর জীবন্ত আবেগের প্রতিমূর্তি সুভাষ। কিন্তু কেবল বেগ অথবা আবেগসর্বস্ব নন। কিছুতেই নন—কোনওদিন নন। তার প্রমাণ, হরিপুরা কংগ্রেসে

সভাপতি সুভাষচন্দ্রের জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন। জহরলালকে এই কমিটির চেয়ারম্যান করলেও এর পরিচালনার ভার ন্যস্ত করেন কে. টি. শাহ, মেঘনাদ সাহাদের ওপর। স্বাধীন হলেও ভারতের সংগ্রাম শেষ হবে না সেদিন, শুরু হবে নতুন করে—দেশের আভ্যন্তরীণ শত্রু অন্ধমোহ, কুসংস্কার এবং আত্মসন্তুষ্টির বিরুদ্ধে। এই কথা স্মরণে রেখে ভারত স্বাধীন হবার এক যুগ আগে যিনি এই বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা উপস্থিত করেন কংগ্রেস-মণ্ডপে তিনি কি শুধুই স্বপ্নবিলাসী?

গান্ধী যত আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছেন পরাধীন ভারতে, তার মধ্যে গুজরাটের অন্তর্গত বরদৌলি করবন্ধ আন্দোলন সাফল্যের সবচেয়ে সমীপবর্তী হবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও ব্যর্থ হয় গান্ধীরই নির্দেশে। চৌরীচৌরায় কতকগুলি লোক থানা পোড়ায় এবং পুলিসকে হত্যা করে। এই অপরাধে, ১৯২২-এর ৭ই ফেব্রুয়ারি যে আন্দোলন-আরম্ভের চরম পত্র ভাবিয়ে তুলেছিল ব্রিটিশ সরকারকে, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি এই হিংসাত্মক কার্যের অজুহাতে গান্ধী প্রত্যাহার করে নিলেন সেই সম্ভাব্য সর্বশ্রেষ্ঠ কংগ্রেস আন্দোলন। এই প্রত্যাহারে দেশবন্ধুর প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করেছেন সুভাষ এইভাবে: "I could see that he was beside himself with anger and sorrow at the way Mahatma Gandhi was repeatedly bungling."

সুভাষ অনেক বেশী ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যতীন দাসের আত্মবলিদান গান্ধীকে বিচলিত না করায়। জেলে রাজবন্দীদের উপযুক্ত মর্যাদারি দাবিতে ভগৎ সিং, রাজগুরু, সুকদেব এবং যতীন দাস আমরণ অনশন আরম্ভ করেন। ১৯২৯ সন। অন্য তিনজন অনশন প্রত্যাহার করলেন। যতীন দাস জলস্পর্শ করলেন না। দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্রিটিশ-কারাগারের কেউ তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারেন নি তাঁর প্রতিজ্ঞা থেকে। দিনের পর রাত্রি আসে, রাত্রির পর দিন। কারাগারের অন্ধকারে অর্ধচেতন একটি বন্দী জেগে থাকে তখনও, ঘুমিয়ে পড়লে যদি জোর করে খাইয়ে দেয় কিছু! কারাগারের বাইরে আকাশে আসন পাতা হয় শরতের। নিরুপম নীলে, শিউলি ফুলের সুরভিতে আসে আশ্বিন। মহাপূজার মন্ত্র উচ্চারণের এগিয়ে আসে পুণ্য লগ্ন। শুধু রাত্রির তিমিরে জ্যোতির্ময়ী তপস্যায় জেগে আছে যতীন দাসের মৃত্যুর চেয়ে সত্য এক মহৎ জীবন। ১৩ই সেপ্টেম্বর মহাপূজার বোধন হবার আগেই সমাপ্ত হয় বিজয়া, বিসর্জনের বাজনা বেজে ওঠে আশ্বিনের আকাশে। স্বাধীনতা-সংগ্রামে মাতৃপূজার মন্দির-প্রাঙ্গণে আত্মবলিদান করেন যতীন দাস; আমরণ অনশনের মহাব্রত উদ্‌যাপিত হয় জীবন-দানের শাশ্বত মহিমার মধ্যে।

গান্ধী সেদিন 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'য় স্বাস্থ্য, খাদ্যের ওপর পাতার পর পাতা অপব্যয় করেছেন; ব্যয় করেন নি কেবল যতীন দাসের আত্মোৎসর্গ বিষয়ে একটি অক্ষর, অথবা একটি আঁচড়ও। কারণ জিজ্ঞেস করলে বলেছেন যে লিখলে অপ্রিয় মন্তব্য করতে হত বলে একটি কথাও লেখেন নি। তরুণ সুভাষ এতদূর বিচলিত হয়েছিলেন গান্ধীর অবিচলিত থাকায় যে আত্মজীবনীতে তার উল্লেখ না করে পারেন নি: "In this connection the attitude of the Mahatma was inexplicable. Evidently the martyrdom of Jatin Das which stirred the heart of the country did not make any impression on him. The pages of 'Young India' had nothing to say about the incident."

দেশবন্ধুর অবর্তমানে সুভাষ ছাড়া গান্ধীর বিরুদ্ধে তখনও কংগ্রেসে শ্রুত হবার মত কণ্ঠস্বর মাত্র একজনেরই ছিল। জহরলাল নেহরুর সেই তখনও পর্যন্ত অবাধ্য কণ্ঠ চিরকালের জন্য রুদ্ধ হল লাহোর কংগ্রেসে গান্ধীর প্রস্তাব-

মত সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায়। সুভাষের মতে জহরলাল এর পর থেকেই গান্ধীর কথায় উঠতে বসতে আরম্ভ করেন।

ঠিক এই একই অস্ত্রে ধরাশায়ী করতে চেয়েই সুভাষচন্দ্রকে হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতির পদে আমন্ত্রণ করেন স্বয়ং গান্ধী ১৯৩৮-এ। যে অস্ত্রে জহরলালকে নিরস্ত করা সম্ভব হয়েছিল সে অস্ত্র ব্যর্থ হল সম্পূর্ণ হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতির অনমনীয় চরিত্রের ও 'দেশবন্ধু'-আদর্শের বর্মে প্রতিহত হয়ে। কংগ্রেস সভাপতির আসনে বেসুরো গাইলেন সুভাষচন্দ্র।

হরিপুরায় কংগ্রেসের সেবার ৫১-তম অধিবেশন। ৫১টি জয়তোরণের তলা দিয়ে ৫১টি বলদবাহী শকটে আরূঢ় সুভাষচন্দ্র প্রবেশ করলেন পরাধীন ভারতের সর্বোচ্চ আসনের দিকে। সমবেত দর্শকের সম্মুখে সেই রাজনৈতিক রাজ্যাভিষেকে গগন বিদীর্ণ করে উঠল সুভাষের জয়ধ্বনি।

সুভাষের মধ্য দিয়ে জয় হল যার, বিজয় ঘোষিত হল যার সে হচ্ছে নবীন ভারত। তরুণের স্বপ্ন সার্থক হতে চলেছে যাঁর জীবনে, ভারতপথিক সেই সুভাষচন্দ্র নবীন ভারতের নেতৃত্বের প্রতীক। তাঁর প্রতি অর্পিত মাল্য, নবীন ভারতেরই কণ্ঠে অর্পিত বিজয়মাল্য।

বিজয়ভাষণে ব্যক্ত হল আর একবার অপরাজিত কণ্ঠস্বর: 'স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেসকে শক্ত হাতে ক্ষমতা অধিকার করতে হবে। ভারতে শিল্পবিপ্লব আসবেই, বৃটেনের মত ধীরে ধীরে আসবে না, রাশিয়ার মত দ্রুতবেগে আসবে। তার জন্যে গভর্নমেণ্টকে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। শুধু ক্ষমতা অধিকার করলেই চলবে না, কংগ্রেস পার্টিকে দেশের পুনর্গঠনের দায়িত্বও নিতে হবে ওই সঙ্গে। ইয়োরোপীয় বিপ্লবের ইতিহাসে দেখা যায় যে তা না করলে বিশৃঙ্খলা আসে।'

এই উক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই সুভাষচন্দ্র জন্ম দিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম জাতীয় পরিকল্পনা সেই পরাধীন ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়েই। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটিতে গান্ধীর দলের দুজন ছিলেন, কিন্তু জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি যেই জানালেন যে কুটিরশিল্পেও বিদ্যুৎ ব্যবহার করার প্রস্তাব আছে এই কমিটির, সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীভক্তরা পদত্যাগ করে বেরিয়ে গেলেন।

বিদ্যুৎ হচ্ছে বিদ্রোহী যৌবনের, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জীবনের অগ্রদূত। নতুন যুগের প্রত্যুষে যে প্রবীণ বুদ্ধিমান নিত্যই শুধু সূক্ষ্ম বিচার করে, ভদ্রলোকের সান্ত্বনা খোঁজে সে; বজ্রালোকে তার শান্ত না হবারই কথা।

চিরবিদ্রোহীকে কাছে টেনে ঘুম পাড়াতে চেয়েছিল অহিংসার বাঁশী; ফণা তুলে উঠে দাঁড়িয়েছে সে ঘুমিয়ে-পড়ার পরিবর্তে। তার মাথায় মণি হয়ে জ্বলছে পরাধীন ভারতের অনির্বাপিত প্রাণবহ্নি। যুগসঞ্চিত বর্বর ব্রিটিশের পৈশাচিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ ভারতের পুঞ্জীভূত ক্রোধের এক পদ্মরাগমণি!

১৯৩৯-এ সেই চিরবিদ্রোহী বীর জাতির জনকের সুস্পষ্ট নির্দেশ অগ্রাহ্য করে দ্বিতীয়বার সভাপতির পদের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হলেন। ত্রিপুরী কংগ্রেসের এই ঐতিহাসিক শক্তিপরীক্ষা সুভাষের সঙ্গে গান্ধীর শিখণ্ডী সীতারামায়ার নয়—নবীনের সঙ্গে প্রবীণের, যুবকের সঙ্গে স্থবিরের, আপোষবিরোধী বিদ্রোহের সঙ্গে অসম্মানজনক শর্তাধীন সন্ধির।

সাত

১৯৩৯—ত্রিপুরী কংগ্রেস। সুভাষচন্দ্রের জীবনের সন্ধিক্ষণে এল ১৯৩৯-এর ত্রিপুরী কংগ্রেসে সম্মুখযুদ্ধের আহ্বান। বহু যুদ্ধের নায়ক ক্ষতবিক্ষত সুভাষের জীবনে একই সঙ্গে চরম দুর্ভাগ্যের এবং পরম সৌভাগ্যের দ্যোতক সেই ১৯৩৯। ইয়োরোপে বেজে উঠেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রণভেরী। সুভাষের জীবনেও এসেছে যুদ্ধের আহ্বান। সুভাষের সঙ্গে ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ সীতারামায়া।

কিন্তু খুঁটির জোরে লড়ছে সে, নিজের জোরে নয়। রাজাগোপালাচারী সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন সুভাষচন্দ্রের রণবিজয়ের মুহূর্তে: 'সুভাষ হচ্ছে ফুটো নৌকা!' সীতারামায়ার বিরুদ্ধে বিজয়ী সুভাষকে সেদিন ভোট দেয় নি প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বে বাংলাদেশের দল। সুভাষচন্দ্রের জয়লাভের পর ৮০টি গাধার গলায় প্রফুল্ল ঘোষের দলের ৮০ জনের নাম বিজ্ঞাপিত করে বেরুলো শোভাযাত্রা। পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর মতে 'শোভাযাত্রার নগরী কলকাতা'—উক্তি সার্থক করেছিল কলকাতা সত্যসত্যই সেই একদিন।

গান্ধী সীতারামায়াকে দাঁড় করিয়েছিলেন ইচ্ছে করেই। সেদিন কংগ্রেসের যে কেউ সুভাষের বিরুদ্ধে দাঁড়াত সেই হারত। সীতারামায়ার হার গান্ধী নিজের গলায় পরলেন অগত্যাই: 'Sitaramaya's defeat is my defeat!'

১৯৩৯-এর ১০ই মার্চ আরম্ভ হল ত্রিপুরী কংগ্রেসের অধিবেশন। অসুস্থ সভাপতি সুভাষচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে সভাপতির ছবি নিয়ে বেরুলো শোভাযাত্রা। সভাপতি এলেন স্ট্রেচারে শুয়ে। শত-সহস্র কাতর অনুরোধেও রাজকোট ত্যাগ করে গান্ধী এলেন না ত্রিপুরীতে; ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যদের মধ্যে রাজাগোপালাচারী, সর্দার প্যাটেলরা উপস্থিত হলেন, কিন্তু সভামঞ্চে গ্রহণ করলেন না আসন—গিয়ে বসলেন সাধারণ দর্শকদের চেয়ারে। সুভাষচন্দ্রের লেখা পড়লেন অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসু, হিন্দি অনুবাদ পড়ে শোনালেন আচার্য নরেন্দ্র দেব। সভাপতির ভাষণ কান পেতে শুনল নিস্তব্ধ সভাস্থল: ছ মাসের মধ্যে ব্রিটেন ভারতকে স্বাধীনতা না দিলে আবার আরম্ভ হবে আইন অমান্য আন্দোলন।

সুভাষের প্রস্তাব, যাদের ভোটে সুভাষচন্দ্র নির্বাচিত হয়েছিলেন, এবারে তাদের বিরোধিতায়ই পরাস্ত হল।

গোবিন্দবল্লভ পন্থকে দিয়ে সুভাষের ইচ্ছামত ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের পথ বন্ধ করে দেওয়া হল। প্রস্তাব এলো যে গান্ধীর অনুমোদন ছাড়া নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে পারবেন না সভাপতিও। কংগ্রেস-সংবিধানে বেআইনী এই প্রস্তাব পাস হয়ে গেল। এবং এই অস্ত্রেই সুভাষচন্দ্রকে পেছন থেকে হত্যা করল কংগ্রেস।

গান্ধী জানতেন সুভাষ কংগ্রেসে ভাঙন ধরানোর চেয়ে কংগ্রেস থেকে সরে যাওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করবেন। সদস্য নির্বাচনে গান্ধী রাজী হলেন না। সুভাষের সভ্যনির্বাচনের ক্ষমতা আগেই কেড়ে নেওয়া হয়েছে। অচলাবস্থার মধ্যে সভাপতির পদ ত্যাগ করে বেরিয়ে এলেন সুভাষচন্দ্র—২০ বছর আগে ব্রিটিশরাজের দাসত্ব ত্যাগ করে এসেছিলেন যেমন করে, অবিকল তেমনই ভাবে নিজের আদর্শে অবিচলিত থেকে কংগ্রেস-রাজের চাকরিতেও ইস্তফা দিয়ে বেরিয়ে এলেন।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মহল সেদিন সুভাষের অবশ্যম্ভাবী রাজনৈতিক মৃত্যু ছাড়া আর কিছু দেখতে পান নি; কারণ তাঁরা মনে করেছিলেন এই পদত্যাগ সুভাষচন্দ্রের পতন। সর্বমহিমান্বিত দেশপ্রেমের উন্নততম শিখরচূড়া থেকে অধঃপতন বলে যাকে মনে না করে পারেন নি তাঁরা তাকেই সুভাষচন্দ্রের জীবনসংহিতাকার হিউ টয় মনে করেছেন:

"This incident has been seen by many as the beginning of Bose's fall from the heights of sacrificial patriotism. It was indeed his second turning point. The first, he would have claimed, had been the result of a British injustice, now it was the injustice of his own people, his own comrades. For he had been democratically elected in preference to Gandhi's nominee; he was President, leader, by the will of the people, inspite of the will of Gandhi. Those who had voted for him had known his views and had deliberately chosen

them. His popular mandate had been denied by intrigue, intrigue not only against himself, but against the democracy which had elected him. He had been forced to show himself to the Congress as a leader who had failed. That was the grievous injustice."

কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এলেন কংগ্রেসের সর্বশ্রেষ্ঠ সৈনিক। অনেকদিন ধৈর্য ধরেছিলেন; সুযোগ দিতে চেয়েছিলেন কংগ্রেসকে। আশা করেছিলেন অভিজ্ঞতার তিক্ত অশ্রুজলের দর্পণে প্রতিবিম্বিত হবে কংগ্রেসের অন্ধ চোখেও যে স্বাধীনতার সংগ্রাম কেবল আপোসের দ্বারা সম্ভব নয়। রক্ত না দিলে, রক্তাক্ত না হলে দেখা দেয় না পরাধীনতার কৃষ্ণবর্ণ দিগন্তের নিশাবসানে জবাকুসুমসঙ্কাশ দিবাকর।

বারংবার হানা দেবে, দ্বারে দ্বারে পাবে মানা, তবু থামবে না তুমি। স্বাধীনতার পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পথে যুগ যুগ ধাবিত হে যাত্রী, নিরাপদ বন্দরের কাল হল শেষ।

তারই সঙ্গে এসেছে আদেশ: তুফানের মাঝখানে নূতন সমুদ্রতীর পানে দিতে হবে পাড়ি।

তোমার সেদিনকার একটি কথায় তারই প্রতিধ্বনি পাই: 'বাঁধা রাস্তার বাইরে অজ্ঞেয়ের সন্ধানে যে অভিযাত্রী জীবন, সেই জীবনই আমাকে বেশী করে টানে। এই জীবনে যেমন যন্ত্রণার শেষ নেই, তেমনই রোমাঞ্চও অশেষ। যেমন আছে রাত্রির অন্ধকার তেমনই রয়েছে রাত্রিপ্রভাতের রমণীয় সূর্যোদয়। আমি আমার দেশবাসীকে আহ্বান জানাই—এস, আমার সঙ্গে এস এই সব খোয়াবার, আবার সব পাবার সর্বনাশা পথে।'

ইতিহাসের হাত ছিল সেদিন তোমার বেরিয়ে আসার পেছনে, হে বিজয়ী বীর। কংগ্রেসের সঙ্গে সেদিন সন্ধি করলে, কংগ্রেসের আদর্শবিরোধী ভারতবিভাগ মেনে নেওয়া এই সরকারের অধীনে হতে পারতে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী অথবা কোনও প্রদেশে রাজ্যপাল। কংগ্রেসের ইতিহাসে হতে অন্যতম নেতা—কালের ইতিহাসে হতে পারতে না নেতাজী সুভাষ।

তাই বলি, হে বিজয়ী বীর, তোমার জন্যে নয় ঘরের মঙ্গলশঙ্খ; সন্ধ্যার দীপালোক নয়, নয় প্রেয়সীর অশ্রুজল। তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে কেবল কালবৈশাখীর আশীর্বাদ, শ্রাবণরাত্রির বজ্রনাদ। পথে-বিপথে কণ্টকের অভ্যর্থনায়, গুপ্তসর্পের গূঢ়ফণায়, ঈর্ষান্বিত হৃদয়ের নিন্দায় বাজে তোমার বিজয়শঙ্খ; সেই জেনো তোমার জন্যে বহন করে আনে রুদ্রের প্রসাদ। স্বাধীনতার অমৃতের অধিকার চেয়েছিলে তুমি! সে তো সুখ নয়, সে নয় বসন্তের আবেশহিল্লোল। মৃত্যু তোমাকে

আট

মধ্যপন্থায় আজীবন অবিশ্বাসী আপোসহীন মনোভাবের মূর্ত প্রতীক সুভাষচন্দ্রের জীবনে একটি অধ্যায় শেষ হয়ে গেল। যারা মনে করে নিল সুভাষের রাজনৈতিক জীবনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সুসম্পন্ন হল ত্রিপুরীতে, তারা তখনও ভাবতে পারে নি সুভাষের জীবনের চরম অধ্যায়ের সেই আরম্ভ। সুভাষ অশেষ শক্তির উৎস। যতবার প্রতিপক্ষরা ভেবেছে সুভাষের দিন শেষ, ততবার সুভাষ প্রমাণ দিয়েছেন তাঁর জীবনের শক্তি অশেষ। আপাত-হারকে তিনি কখনও পরাজয় বলে স্বীকার করেন নি; কংগ্রেসের কাছে অন্যায় যুদ্ধে এই হারকেও তিনি নীলকণ্ঠের মত গলার হার করলেন। তিন বছরের জন্যে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত সুভাষকে ডেকে আনলেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা কী হবে এ বিষয়ে তাঁর মত জানাটা হল এ আমন্ত্রণের

উপলক্ষ মাত্র ; লক্ষ্য হল যদি দুরন্ত দামালকে সামলানো যায়! অপমান করবার পর চেয়ার এগিয়ে দিল কংগ্রেস। ত্রিপুরী কংগ্রেসে যে কথা বলেছিলেন তারই পুনরুক্তি করলেন সুভাষ: ইংরেজকে এই সুযোগে আক্রমণ কর।

সুভাষের নয়—এ হুঙ্কার আক্রমণে উদ্যত জাগ্রত শার্দুলের। কংগ্রেস সেই শেষবারের মত বুঝল ঝুটো খাত্তিরের তাপে যে গলে সেই বরফ নয় সুভাষের হৃদয়; তুষার-গলানো রৌদ্রালোকে দেখা যায় যে পর্বতশ্রেষ্ঠকে সেই হিমালয়-হৃদয় সুভাষের। কোনও লোভে যা টলে না, কোনও অনুনয়ে যে নিজের আদর্শের আসন থেকে নড়ে না। কত আঘাত, কত ঝড়, কত বৃষ্টি মেঘ বয়ে যায় হিমালয়ের বুকের ওপর দিয়ে, তবুও মরে না মরে না কভু সত্য যাহা শত শতাব্দীর! আঘাতে যে টলে না, বিপদে হয় না অস্থির। বৃষ্টি, মেঘ, ঝড় মিথ্যা; শত শত শতাব্দীর সত্য শুধু হিমালয়। ওটেন, আই. সি. এস, ত্রিপুরী কংগ্রেস মিথ্যা, সত্য শুধু সেই বাণী যা সুভাষের লেখনীতে উজ্জ্বল হয়ে আছে ১৯২৭ সনের ৮ই মে ইনসিন জেল থেকে দাদাকে লেখা চিঠিতে:

'মনের মধ্যে আঁকা মূর্তিগুলো নিজেরাই নিজেদের ভাগ্যবিধাতা। আমরা তো হলাম তাল তাল মাটি; আমাদের দেহের কৌটায় বৈশ্বানরের স্ফুলিঙ্গ। আমাদের কাজ এই ভাবমূর্তির পায়ে নিজেদের ডালি দেওয়া। এইভাবে উৎসর্গ-করা জীবন কখনও বৃথা যায় না। আমাদের ঐহিক ও দৈহিক অস্তিত্বে যত ধাক্কাই আসুক আমি যে আদর্শের জন্যে লড়ছি, পরিণামে তার জয় যে হবেই—আমার এ বিশ্বাসের একচুল এদিক ওদিক হয় নি। কাজেই শরীর কেমন থাকল, অদৃষ্টে কী আছে না আছে—এসব নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।

…দোকানদার নই, আমি দর কষাকষি করি না, কূটনীতির পিচ্ছিল পথে আমি চলতে চাই না—ও আমার ধাতে নেই। আমি নীতি নিয়ে লড়েছিলাম। বাস্, মিটে গেল। দেহাশ্রয়ী জীবনটা এমন কিছু মূল্যবান নয় যে, দরদস্তুর করে তাকে টিঁকিয়ে রাখতে হবে। বাজারে যে জিনিসের যে দাম, আমার কাছে সে জিনিসের ঠিক সেই দাম নয়। আমি মনে করি না শারীরিক কিংবা আধিভৌতিক কষ্টিপাথরে জীবনের সার্থকতা অসার্থকতা যাচাই করা যায়।…আমাদের লড়াই এই মরদেহটার জন্যে নয়, পার্থিব সুখের জন্যে নয়।…আমাদের মল্লযুদ্ধ রক্তমাংসের সঙ্গে নয়—রাজদণ্ডটার সঙ্গে, প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার সঙ্গে, এই পৃথিবীর অন্ধকারের কর্তাদের সঙ্গে, যারা উচ্চাসনে বসে আছে তাদের দৌরাত্ম্যের সঙ্গে।

…যেদিকে স্বাধীনতা ও সত্যের আদর্শ আমরা সেইদিকে; দিনের পর রাত্রির মত এ আদর্শের জয় হবেই হবে। আমাদের দেহ এলিয়ে পড়তে পারে, দেহ ধ্বংস হতে পারে, কিন্তু যদি বিশ্বাস অটুট আর মনোবল বজায় থাকে, জয় আমাদের অনিবার্য। আমাদের প্রয়াস-প্রচেষ্টা যেদিন সার্থক হয়ে উঠবে, সেদিন আমাদের মধ্যে কে থাকবে কে না থাকবে—তা ঠিক করবার মালিক বিধাতা। নিজের সম্বন্ধে বলতে পারি বাঁচার মত বাঁচতে পেরে আমি সুখী—…'

এই সুভাষকে যারা বলে রাজনীতিতে অপরিপক্ব তারা মানবজীবনের মূলমন্ত্র বিস্মৃত; সবার উপরে সত্য যে মনুষ্যত্ব তার বিচারে রাজনীতির চেয়ে নীতি বড়। এবং এই মনুষ্যত্বের গান যেন সুভাষেরই জীবনের যৌবনের জয়গান।

কংগ্রেস ছেড়ে যাবার এক মাসের মধ্যে সুভাষ নতুন রাজনৈতিক দল ফরোয়ার্ড ব্লকের জন্ম দিলেন। ১৯৪০-এ রামগড় কংগ্রেসের পালটা জবাব দিলেন আপোসবিরোধী সম্মেলন ডেকে। এই সম্মেলনও মিলনের নয়, ব্রিটিশের সঙ্গে বিরোধের কথাই নতুন করে আবার বললেন। সুভাষহীন-কংগ্রেস সম্পর্কে ব্রিটিশের ভয় চলে গেছে, তারা বুঝে নিয়েছে, 'কংগ্রেস শুধু কথাই বলে, কাজের বেলায় দশ হাত দূরে থাকে।'

ডালহৌসি স্কোয়ারে অন্ধকূপ হত্যার কলঙ্কিত অসত্য স্মৃতিস্তম্ভ অপসারণের মধ্যে দিয়ে আরম্ভ হল সুভাষের নতুন আন্দোলন। সুভাষ জি. ও. সি. হওয়ায় যারা হেসেছিল তারা এবারেও উপহাস করল। ইংরেজরা হাসল না। ২রা জুলাই সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হল।

সুভাষ কখনও বিশ্বাস করেন নি যে অসহযোগ আন্দোলন করে ইংরেজ তাড়ানো সম্ভব। ভারতের মুক্তি আসবে ভারতের বাইরে থেকে সশস্ত্র আক্রমণে—তাঁর এই বিশ্বাসই আত্মগোপন করেছিল অবশ্য সুভাষের সেদিনকার এই উক্তিতে : 'অবশেষে ঠিক করলাম আমিই কাজের ভার নিয়ে দেশের বাইরে যাব।'

এই লক্ষ্যে স্থির, সংগ্রাম আরম্ভের জন্যে অস্থির সুভাষ, 'ফরোয়ার্ড ব্লক' পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখলেন : 'Day of Reckoning' ['হিসাব নিকাশের দিন']; রাজদ্রোহের মামলা রুজু হল সুভাষের নামে। মুক্তির দাবিতে অনশন আরম্ভ করলেন বন্দী সুভাষ। কারাগারের অন্ধকার অন্তরাল থেকে আমরণ অনশনের প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়চিত্ত বিদ্রোহী দেশের উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করলেন অভয়বাণী। দেশ থেকে চলে যাবার আগে, কংগ্রেস থেকে চলে আসবার পর এই তাঁর অন্তিম আবেদন। আবেদন নয়—বন্দীর মাতৃবন্দনা :

'এই মরজগতে কিছুই অমর নয়। অবধারিত মৃত্যু অপেক্ষা করে আছে সমস্ত পার্থিব বস্তুরই অন্তিমে ; মৃত্যু নেই শুধু মানুষের সাধনায়, আর তার স্বপ্নের। আদর্শই শুধু মৃত্যুঞ্জয়। দুঃসাধ্য ব্রত উদ্‌যাপনের মধ্যপথে যদি আসে মহিমান্বিত মৃত্যু—তবুও মৃত্যু হবে না তার আত্মার, তার আদর্শের। আদর্শের বীজ রক্তবীজের মতই মাটিতে পড়ে মরে না, অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে; মহীরুহের জন্ম হয় একদিন বহু শতাব্দীর ব্যবধানে। একের ভাবাদর্শ আর স্বপ্নের উত্তরাধিকারী হয় উত্তরকাল। বিপুলা এই পৃথ্বী জুড়ে নিরবধি কালের এই হচ্ছে সত্য : দুঃখ স্বীকার আর আত্মত্যাগের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে হয় না দুঃশাসনের অবসান।

'দেশের অগণিত মানুষকে বলে যেতে চাই—দাসত্বের চেয়ে দুর্বহ নেই আর কিছু এ কথা ভুলো না। ভুলো না অন্যায়ের সঙ্গে আপোস না করার চেয়ে বড় ন্যায় আর কিছু নেই। জীবন পেতে হলে দিতেই হবে জীবন। শহীদের শবের ওপরেই সব দেশে সব কালে সম্ভব হয়েছে স্বাধীনতার উৎসব।'

অনশনের ছদিন না যেতেই ছেড়ে দিল তাঁকে ব্রিটিশ সরকার। কিন্তু মামলা উঠিয়ে নিল না। এলগিন রোডের বাড়ির সামনে পাহারা দিতে লাগল পালা করে লাল পাগড়ি। ২৬শে জানুয়ারি, ১৯৪১— রাজদ্রোহের অপরাধের বিচারের পরবর্তী তারিখ পড়ল। সেইদিন তাঁকে আনতে গেল যে পুলিসের গাড়ি, সে গাড়ি ফিরে গেল আসামী ছাড়াই। সুভাষচন্দ্র তখন কোথায় বলতে পারল না কেউ।

সুভাষচন্দ্র জেল থেকে বাড়ি আসবার সময় না-পালাবার প্রতিশ্রুতি অর্থাৎ 'পেরলে' বেরিয়েছিলেন। শুচিবায়ুগ্রস্ত কেউ-কেউ তাঁর এই প্রতিশ্রুতিভঙ্গকে নিন্দা করেছে। তারা ইতিহাস থেকে কোনও পাঠ গ্রহণ করে নি বলেই মনে হয়। না হলে তাদের মনে পড়ত ইতিহাসের আর এক অবিস্মরণীয় চরিত্র মারাঠা বীর শিবাজী পালিয়েছিলেন ঔরংজেবের কয়েদখানা থেকে ফলের ঝুড়িতে। ঔরংজেব তাঁকে নিমন্ত্রণ করে এনে আটক করে রাখলে যদি অন্যায় না হয়ে থাকে তা হলে ঔরংজেবের কারাগার থেকে তাঁরও ফলের ঝুড়ির মধ্যে আত্মগোপন করে বেরিয়ে যাওয়া কাপুরুষের কাজ হয় নি ; পুরুষসিংহ শিবাজী চরিত্রের তা কলঙ্ক নয়। সুভাষচন্দ্রের আমলেই টেররিস্ট ধিংড়াকে যখন অভিযুক্ত করা হয় এই বলে যে যুদ্ধ ঘোষণা করবার আগে অতর্কিতে একজনকে আক্রমণ করা—সে ব্যক্তি শ্বেতাঙ্গ হলেও পুরুষোচিত নয়, তখনই ধিংড়া সেই ঐতিহাসিক প্রত্যুত্তর করেছিলেন যে

অত্যাচারীর সঙ্গে অত্যাচারিতের যুদ্ধ সমস্ত সময়ই চালু আছে, যখনই সুযোগ পাবে তখনই নিপীড়িত জবাব দেবে, অত্যাচারীর টুঁটি টিপে ধরে জবাব দেবে তার পীড়নের। ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের স্বাধীনতাসংগ্রাম চলছেই, নতুন করে তা জানাতে যাব কাকে? একবারই কেবল সময় আসবে তার, আমাদের সংগ্রামের শেষে ভারতের বিজয় এবং ব্রিটিশের পরাজয় ঘোষণার!

সুভাষের এই পলায়ন কাপুরুষের কাজ নয়; ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষের দেশ থেকে অন্তর্ধান! দেশের মুক্তি অর্জন না করা পর্যন্ত দেশের মাটিতে না ফেরার দুর্জয় সঙ্কল্পই এর একমাত্র পাথেয়। তাঁর চলে যাওয়ার পথের প্রত্যেকটি ধূলিকণা অমিতবীর্য এক পুরুষের পায়ের চিহ্নে চিরকালের জন্যে পরম পবিত্র হয়ে রইল।

নয়

দেশ থেকে অন্তর্ধান করবার আগে সুভাষচন্দ্র বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিষয়ে ভারতের বড়লাটকে চিঠি দিলেন; সে চিঠির ভাষা সুভাষের চরিত্রের মতই অনমনীয়। এর পরই আরম্ভ হল এলগিন রোডের ভারত-বিখ্যাত সেই বাড়িতে রুদ্ধদ্বার কক্ষে তাঁর ঐতিহাসিক নির্জনবাস। বাড়ির সামনে দিবারাত্র পাহারায় নিযুক্ত কংসের প্রহরী। সুভাষকে দেখতে পায় না তারা, কেবল একটা ছায়াকে আসতে যেতে দেখে দেওয়ালের গায়ে। ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত যাচ্ছে আসছে নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে। সেই ছায়া দেখেই তারা নিশ্চিন্ত হয় নির্জনবাসীর কায়া সম্পর্কে। কয়েকজন বন্ধু আসে দেখা করতে; প্রহরীদের সতর্ক দৃষ্টি তাদেরও ওপরে। তারা এসে দেখে আজীবন শ্মশ্রুবিহীন সুভাষের মুখভর্তি দাড়ির অরণ্য। সুভাষের কথায় ফেটে বেরোয় সংসার-বৈরাগ্যের সুর। রাজনৈতিক ব্যর্থতার অব্যর্থ ফ্রাসট্রেশান [!] আক্রমণ করছে তাদের প্রিয় বন্ধুকে বুঝে তারা দুঃখিত হয়, কিন্তু বিস্মিত হয় না। রাজনীতির জগতে রাজনীতির ওপরে নীতিকে স্থান দিতে গেলেই স্থানচ্যুত হতে হয় শ্রেষ্ঠ স্থানাধিকারীকেও। সুভাষের পতন ও বৈরাগ্য সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়ে ফিরে যায় তারা। দেওয়ালে আবার আসা-যাওয়া শুরু হয় ছায়ার। লাল পাগড়ি নিশ্চিন্ত হয় আবার। সেদিনকার তারিখ হচ্ছে ১৬ই জানুয়ারি।

২৬শে জানুয়ারি এগিয়ে আসে। পরাধীন ভারতের স্বাধীনতার সঙ্কল্পদিবস, আর সুভাষের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগে বিচারের দিন। জাতির জীবন এবং জাতির নেতার দিনপঞ্জীতে রক্তক্ষরা একটি দিন এগিয়ে আসে ধীর কিন্তু সুদৃঢ় প্রত্যয়ের পায়ে পায়ে ভর করে।

আবার আসে দুজন গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী। একজনের গালে দাড়ি, আর একজনের গাল দাড়ির অরণ্যমুক্ত—মসৃণ। ব্রিটিশের চর চোখ রাখে, তারা বেরিয়ে যায়। ১৭ই জানুয়ারির শেষ রাতে আসে সেই দুই গেরুয়া-পরা সন্ন্যাসীই। সেই একজন দাড়িওলা এবং আর একজন গোঁফ-দাড়ি কামানো। সাক্ষাতের পর একসময়ে তাঁরা বেরিয়ে এসে ওঠেন অপেক্ষমান গাড়িতে। প্রহরীদের চোখ গিয়ে পড়ে দেওয়ালে; সেখানে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত ছন্দে-তালে আসছে যাচ্ছে ছায়া। নিশ্চিন্ত হয় তারা।

নিশ্চিন্ত হতে পারে না কেবল ১৭ই জানুয়ারির সেই শেষরাত। পরাধীন ভারতের রাত্রি ভোর হতে দেরি কত আর এই প্রশ্ন তখন আসছে যাচ্ছে দেওয়ালে যার দিকে তাকিয়ে সরকারের চর ভাবতে পারে নি যে ওই ছায়া সেদিন আর তাদের লক্ষ্যের নয়! তাদের সতর্ক পাহারার অলক্ষ্যে সুভাষই দাড়িওলা গেরুয়াধারী হয়ে বেরিয়ে গেছেন তাদেরই চোখের ওপর অপেক্ষমান গাড়িতে উঠে। সঙ্গে সেই দাড়ি-গোঁফ কামানো আর একজন যাঁকে দেখে তারা নিঃসন্দেহ হয়েছিল যে যাঁরা দুজন এসেছিলেন তাঁরা দুজনই চলে গেলেন কেবল। দেওয়ালে ছায়া নড়ে এই

দুজন আগন্তুকের মধ্যে একজনের। আরও দুদিন সুভাষের প্রক্সি দিলেন তিনি। দেওয়ালে আসতে যেতে লাগল সেই ছায়া আরও আটচল্লিশ ঘণ্টা। সুভাষের খাবারের থালা যায় আর খালি বাসন ফিরে আসার খেলাও চলতে লাগল সেই আটচল্লিশ ঘণ্টা। তারপর একসময়ে ছায়ার পেণ্ডুলাম নড়ল না আর, খাবারের থালায় মুখ দিল না কেউ।

এল ২৬শে জানুয়ারির সেই পরমাশ্চর্য এক প্রভাত। আটত্রিশ কোটি আশি লক্ষ লোকের রক্তে বয়ে গেল বিদ্যুতের শিহরণ। সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধানের কাহিনী বহন করে নিয়ে এল স্বাধীনতা দিবসের সূর্য। সাত লাখ গ্রামে গাঁথা ভারতের পথে-প্রান্তরে, মন্দিরে-মসজিদে, নগরে-পল্লীতে, প্রাসাদে-পর্ণকুটিরে ছড়িয়ে গেল সেই বার্তা। বিস্তৃত হল সমুদ্রপারে, বিশ্বব্যাপ্ত হল সেই বিস্ময়বার্তা। তারায় তারায় অগ্নির অক্ষরে উচ্চারিত হয়ে রইল সেই কাহিনী চিরকালের কানে।

ঠিক সেই মুহূর্তে পেশোয়ার পরিত্যাগ করে জামরুদ কেল্লা ছাড়িয়ে কাঁচা সড়ক ধরে এগিয়ে চলেছেন একজন। লোকে জানে—তিনি মৌলভী জিয়াউদ্দীন। মৌলভী জিয়াউদ্দীন নয়, সুভাষচন্দ্র নয়, সেই মুহূর্তে জন্ম নিয়েছেন পরাধীন ভারতের শেষ পলাতকের জীর্ণবাস ত্যাগ করে স্বাধীন ভারতের পথে পরবর্তীকালে অগ্রসর প্রথম পদাতিক নেতাজী সুভাষ।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে ঠাকুমার কোলে শুয়ে রাজপুত্রের তলোয়ার হাতে রাক্ষসকে মেরে রাজকন্যা-উদ্ধারের রূপকথা নয়, ভারতের সবচেয়ে দুঃসময়ের দুদিনে মায়ের শৃঙ্খলমুক্তির কারণে সর্বস্ব পণ করে শত্রুপুরীর ভিতর দিয়ে, প্রহরীর চোখের ওপর দিয়ে উধাও হয়ে যাবার দুরন্ত এক দুঃসাহসীর অপরূপ কথা।

অনুমান করি কল্পনায়, শীতজর্জর পৌষপ্রখর ঝিল্লিমুখর পেশোয়ারের অন্ধকার রাতে ভারতের স্বাধীনতার সূর্যোদয়ের নবপ্রভাতের স্বপ্নচোখে অগ্রসর সেই অভিযাত্রী দুর্গম মরু-পর্বত-প্রান্তর দুস্তর সাগর পার হবার পথে প্রার্থনা করছেন ; অন্তরের অন্তস্তল থেকে মৃত্যুঞ্জয় আত্মার সৌরভ জড়িয়ে আছে যে-প্রার্থনার সর্বাঙ্গে : "রুক্ষ দিনের দুঃখ পাইতো পাব, চাই না শান্তি, সান্ত্বনা নাহি চাব।"

১৭ই জানুয়ারির সেই শেষরাত্রে মৌলভী জিয়াউদ্দীন-বেশী সুভাষকে নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে দিয়ে গেলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শিশির। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের পথ ধরে তাঁর গাড়ি চলত কেবল রাতের অন্ধকারে। উত্তর-ভারতের দিকে অগ্রসর এক ট্রেনে সুভাষকে উঠিয়ে দিয়ে গোমো থেকে ফিরে গেলেন তিনি। পেশোয়ারে সুভাষের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন শ্রীযুক্ত ভগৎরাম। দুদিন ছিলেন এখানে ; তখন আর মৌলভী নন—পাঠান। ভগৎরাম হলেন রহমৎ খাঁ। পুশতু এবং ফার্সি উচ্চারণে হিতে বিপরীত হতে পারে সন্দেহে সুভাষ মূকবধির সাজলেন। তিনি জানতেন তাঁর নিরুদ্দেশের দুঃসংবাদ ব্রিটিশ সরকারের কানে যাওয়া মাত্র সারা দেশ তন্ন তন্ন করে তছনছ করে ফেলবে তাদের চর। স্বর্গ মর্ত্য পাতালে এমন একটি পাথরও থাকবে না যা একবার না একবার উলটে দেখবে তারা নিরুদ্দিষ্টের সন্ধানে, অথবা তাঁকে ধরতে পারার সাহায্য হতে পারে এমন তুচ্ছতম কোনও হদিশের অনুসন্ধানে। সুভাষের সেই অনুমান সত্য প্রমাণিত হতে দেরি হয় নি যে পরবর্তী কয়েকদিনের ইতিহাস তারই পর্যাপ্ত সাক্ষী।

সুভাষের সংগ্রাম যে স্বপ্নবিলাস ছিল না তার সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে প্রোজ্জ্বল পরিচয় তাঁর এই পলাতক দিবসেই প্রদীপ্ত হয়েছে। কত দিন কত বিনিদ্র রাত্রি অতিবাহিত হয়েছে ; কত সতর্কতায়, কত ধৈর্যে, কত বিচক্ষণতায় এবং কি দূরদর্শী সেই পরিকল্পনায় প্রস্তুত এই পরাধীন ভারতের ইতিহাসে এই অভূতপূর্ব পলায়নের প্রত্যেকটি পর্ব, প্রতিটি পদক্ষেপ। এই সুভাষকে চিনেছিলেন শুধু

মহাত্মা গান্ধী। সুভাষের প্লেন-অ্যাক্সিডেন্টের খবর শুনে তিনি বিশ্বাস করেন নি। কেন বিশ্বাস করেন নি প্রশ্ন করলে বলেছিলেন: 'কোন প্রমাণ আমার হাতে নেই, কিন্তু এ কথা ঠিক যে, সুভাষের বুদ্ধির তুলনা নেই; হয়তো কোন প্ল্যান তাঁর ছিল এবং আত্মগোপনের সুবিধার জন্য 'দুসরা কিসিকো লাশ জ্বালা দিয়া হোগা'।'

মহাত্মা গান্ধীর এই কথাই যেন শেষ পর্যন্ত সত্য হয়। স্বাধীন ভারতের এ ছাড়া আর কোনও প্রার্থনা নেই আজ।

পেশোয়ার থেকে কাবুলের পথে পা বাড়ালেন রহমৎ খাঁ ওরফে শ্রীযুক্ত ভগৎরাম। এগিয়ে নিয়ে চললেন পাঠানবেশী মূকবধির সুভাষকে। পেশোয়ার থেকে কাবুলের এই পথই ভারতবর্ষের দুর্গমতম পথ। খাইবার গিরিসঙ্কটের প্রবেশমুখে পাহারা দিচ্ছে জামরুদ দুর্গ। দুর্গে পৌঁছবার আগেই সুভাষচন্দ্রের গাড়ি বড় পাকা রাস্তা ছেড়ে নামল কাঁচা মেঠো পায়ে-হাঁটা-পথের ওপর; কিছুদূরে এগিয়ে গাড়ি এগুলো না আর। গাড়ি ছেড়ে হাঁটা আরম্ভ হল দুজনের। উপজাতিদের গাঁয়ে রাত কাটিয়ে আরও দুজন সশস্ত্র পাঠান সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চললেন আফগান সীমান্তের দিকে। কাবুল-নদী পার হয়ে এসে পৌঁছলেন আড্ডা শরীফে। সে রাত কাটল এক মস্‌জিদে। সেখান থেকে লালপুরায়। চতুর্থ দিনে আবার কাবুল-নদী পার হয়ে উঠলেন বড় রাস্তায়। আফগানিস্থানের এত ভেতরে ততদিনে ঢুকে গেছেন যে পাসপোর্টের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। সশস্ত্র পাঠান-রক্ষীরা ফিরে গেল নদী পার করে দিয়ে; তাদেরও প্রয়োজন নেই আর। ক্লান্ত সুভাষ পথের ওপরই ঘুমিয়ে পড়লেন; গাড়ির সন্ধানে বেরুলেন ভগৎরাম। সন্ধ্যাবেলায় লরির মাথায় উঠে বসলেন মালপত্রের ওপর ভগৎরাম আর সুভাষ।

বরফঢাকা উপত্যকা পেরিয়ে কাবুলে পৌঁছলেন এক রাত এক দিন পর। লাহোর গেটে এসে সেই লরি থামল। ঠাণ্ডায় অবসন্ন দুজন বেরুলেন দিন-রাতের একটা ডেরা খুঁজতে। লরিচালকদের সরাইখানায় পাওয়া গেল জায়গা; সরাইখানার সেই রাত বুঝি আর কাটে না:

'বাইরে সারারাত ধরে প্রচণ্ড হিমেল হাওয়া বয়ে যায়; দরজা খুলে রাখা যায় না তাই। দরজা বন্ধ করলে ধোঁয়ায় ভরে যায় ঘর। শুকনো কাঠে আগুন জ্বালাই দুজন। বরফে জমে যাওয়া শরীর যদি চাঙ্গা হয় একটু। সন্ধ্যাবেলায় ভগৎরাম বাজার থেকে মোমবাতি, শুকনো রুটি আর কাবাব নিয়ে এল। আমি রুটি খেতে পারছি না দেখে ভগৎরাম আমাকে চা এনে দেয়। চায়ে ডুবিয়ে ডুবিয়ে সেই রুটি খেতে লাগলাম আমি।'

পর পর তিনদিন কাবুলে রুশ দূতাবাসে ঢোকবার চেষ্টা চলল। ভগৎরাম ফার্সি না জানায় নিদারুণ অসুবিধা হয়; সুভাষচন্দ্র তখনও কালা আর বোবা সেজে বসে আছেন সরাইখানার সেই নোংরা অন্ধকারে আরও নোংরা আর দুর্গন্ধযুক্ত জামাকাপড় পরে। বাইরে বাঘের গায়েও ছুঁচের মত বেঁধবার মাঘের বাতাস; দুর্দান্ত ঠাণ্ডা। রুশ দূতাবাসের গাড়ি পথের মধ্যে আটকেও তাদের ভাল করে বোঝানো গেল না উদ্দেশ্য; ভাষাই বাধা হয়ে দাঁড়াল। মরিয়া হয়ে ইতালীয় দূতাবাসে ভগৎরামকে পাঠান সুভাষ। সেখান থেকে স্বাগত অভিনন্দনের সঙ্গে ছাড়পত্রের প্রতিশ্রুতির সুসংবাদ নিয়ে ফিরলেন ভগৎরাম। সুভাষের মনের অবস্থা সেদিন তাঁর নিজের কথায়: 'বার্লিনে কিংবা রোমে যেতে চাইছে না আমার মন; কিন্তু আমি নিরুপায়।'

কিন্তু সরাইখানার নিরাপদ অন্ধকারে এসে হানা দিয়েছে ততক্ষণে পুলিসের টিকটিকি, গন্ধ পেয়েছে বুঝি গোপন কিছুর। ভগৎরাম প্রশ্নের উত্তরে পুশ্‌তুতে জানায় তারা মুসাফির, আর বোবা-কালা সঙ্গের লোকটি তার বড় ভাই। ওর জন্যেই দরগার পথে বেরুনো, কিন্তু দরগার পথ বরফে ঢাকা, তাই বাসের অপেক্ষায় এই সরাইখানায় তাদের দিন কাটানো। চলে যায় পুলিসের

লোক, তবে খালি হাতে যায় না—বাঁ হাতে নিয়ে যায় তাই, পুলিসের লোকের ডান হাতের জানতে নেই যা।

তিনদিন বাদে ফিরে আসে আবার। প্রশ্ন করে: দরগার পথ কি এখনও খোলা পেলে না? রহমৎ খাঁ ওরফে ভগৎরাম তখনও জানে না যে বাস চলছে। তাই ভগৎরাম তখনও বাসের অপেক্ষায় আছে বলতে ধমকে ওঠে সি আই-ডির লোক: ওসব বুজরুকি রেখে দাও, বাসস্ট্যাণ্ড থেকেই আমি আসছি। ভগৎরাম কথা না বলে বার করে দেয় দশ টাকার একখানা নোট। টিকটিকিও কথা বলে না আর। কথা বলার ফুরসত কোথায়!

সরাইখানায় থাকা যায় না আর। সুভাষের জীবনের সেই সন্ধিক্ষণে পাশে এসে দাঁড়ান যিনি তাঁর নাম উত্তমচাঁদ। নাম অথবা ছদ্মনাম জানি না। শুধু জানি, সুভাষচন্দ্রের সঙ্গেই স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখবার মত আরও দুটি নাম হল—ভগৎরাম ও উত্তমচাঁদের। সুভাষের নাম যতবার করি ততবার নাম করি তোমাদের; ভগৎরাম আর উত্তমচাঁদ—সুভাষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে চিরকাল নাম করার যোগ্য তোমরা।

আরও ছ হপ্তা কেটে যায়। ইতালীয় দূতাবাস থেকে প্রতিশ্রুতি রক্ষার প্রচেষ্টা কোথায়? রুশ দূতাবাস থেকেও মেলে না সাড়া। সুভাষ মনে মনে একার চেষ্টাতেই বেরিয়ে পড়বার মতলব আঁটেন। আর ঠিক সেই সময়েই, ১৮ই মার্চ ইতালীর দূত জানায় সব ব্যবস্থা পাকা। ওই তারিখেই ওরলান্দো মাসসোত্তা, এই নতুন ছদ্মনামে ছাড়পত্র নিয়ে রুশ সীমান্তের দিকে রওনা হয়ে যান নেতাজী সুভাষ। কাবুল থেকে বোখারার সেই দুর্গম পথ। হিন্দুকুশের আকাশউদ্ধত উঁচু পাহাড়, তাসকুরগানের গিরিনালা; প্রাচীন পবিত্রতীর্থ মাজার-ই-শরীফ, অরণ্যআদিম বিষণ্ণ অক্সাস, পাটা কেসরের প্রাগৈতিহাসিক পারঘাট, সমরখন্দের বুক চিরে কলের চিমনির ধোঁয়ার মুখে লেখা নবযুগের অগ্রগতির বার্তা সরে যায় ছবির মত। সারা পথ একবারের জন্যেও গতিরুদ্ধ না করে সুভাষ মস্কোয় পৌঁছলেন, কিন্তু স্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পেলেন না। ১৯৪১-এর ২৮শে মার্চ আকাশপথে উড়ে গেলেন বার্লিনে।

কাবুলে থাকার সময়েই তাঁর কাছে প্রশ্ন করা হয় যে, ভারতবর্ষে ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক দলাদলির দরুন দেশের ঐক্য কেমন করে সম্ভব হবে। সুভাষ তার উত্তরে বলেছিলেন:

'দেশে তৃতীয়পক্ষ অর্থাৎ বৃটিশরা যতদিন থাকবে ততদিন অসম্ভব হবে। যদি কোনও ডিক্টেটর বিশ বছর ভারতবর্ষকে রাখতে পারে কড়া ডিসিপ্লিনের চাকার তলায়, তবেই সম্ভব হবে এই ঐক্য। বৃটিশসিংহের ল্যাজ গুটনোর পরও কয়েক বছরের জন্যে ভারতে প্রয়োজন হবে একনায়কত্বের। এবং তা ছাড়া আর কোনও শাসনব্যবস্থায় কাজ দেবে না ভারতবর্ষে। ভারতের স্বার্থের জন্যেই স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন হবে একজন একনায়কের। ভারতের রোগ একটা নয়, আর সর্বাঙ্গে কবচ ধারণ করা যায় না কিছুতেই। ভারতের এই অসংখ্য রাজনৈতিক রোগের একমাত্র দাওয়াই হচ্ছে—ডিক্টেটরশিপ। কাজেই ভারতের সর্বাগ্রে প্রয়োজন হবে একজন কামাল পাশার।'

সুভাষচন্দ্রের জীবনচরিতকার হিউ টয় অতঃপর মন্তব্য করেছেন: ভারতবর্ষে কামাল পাশার ভূমিকায় তিনি কাকে কল্পনা করেছিলেন তা বুঝতে অসুবিধা হয় না একটুও।

আমরা কেবল তোমার পায়ের দাগ আজও লেগে আছে যেখানে সেই পুণ্য পবিত্র যাত্রাপথের দিকে অভিভূত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকব; আর বলব তোমার উদ্দেশেই যেন রচিত হয়েছিল রক্তের অক্ষরে লেখা এই বিচিত্রবাণী:

"তুমি ত আমাদের মত সোজা মানুষ নও,—তুমি দেশের জন্য সমস্ত দিয়াছ, তাই ত দেশের খেয়া-তরী তোমাকে বহিতে পারে না,·· তাই ত দেশের রাজপথ তোমার কাছে রুদ্ধ,..দুর্গম পাহাড় পর্ব্বত তোমাকে ডিঙাইয়া চলিতে হয়;—কোন্ বিস্মৃত অতীতে তোমারই জন্য ত প্রথম শৃঙ্খল রচিত হইয়াছিল, কারাগার ত শুধু তোমাকে মনে করিয়াই প্রথম নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল,—সেই ত তোমার গৌরব! তোমাকে অবহেলা করিবে সাধ্য কার! এই যে অগণিত প্রহরী, এই যে বিপুল সৈন্যভার, সে ত কেবল তোমারই জন্য! দুঃখের দুঃসহ গুরুভার বহিতে তুমি পারো বলিয়াই ত ভগবান এত বড় বোঝা তোমারই স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন! মুক্তিপথের অগ্রদূত! পরাধীন দেশের হে রাজ-বিদ্রোহী! তোমাকে শত কোটী নমস্কার!"

দশ

৪ঠা জুলাই ১৯৪৩। সুদূর সিঙ্গাপুর থেকে বেতার-তরঙ্গে ভেসে এল জাগ্রত এশিয়ার কণ্ঠস্বর: চল দিল্লি। আটত্রিশ কোটি আশি লক্ষ লোকের ভারতবর্ষ জেগে উঠল। দুলে উঠল তাদের বুক। পরাধীনতার আফিমে আচ্ছন্ন রক্তের নদীতে বান ডাকল নবজাগরণের। জীবনের শুকনো গাঙে নামল যৌবনের বন্যার উদ্দাম উন্মাদনা! জাগ্রত নবযৌবনের দূত নেতাজী সুভাষ। তাঁর মুখে সেদিন আহুতি পেল অগ্নির ভাষা, অপরাজিত জীবনের জয়বার্তা ঘোষিত হল দিকে দিকে। রোমাঞ্চ হল তারায় তারায়: মুক্তির দিন আসে; আমাকে অনুসরণ কর, আমি তোমাদের জয়ের আর স্বাধীনতার পথে নিয়ে যাব, স্থির লক্ষ্যে দেব পৌঁছে। ৯ই জুলাই, ১৯৪৩। ষাট হাজার সমবেত ভারতীয়ের এক সভায় গর্জন করে উঠল আবার সেই উদাত্ত কণ্ঠ। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টিকে গ্রাহ্য করল না সেদিন কেউ; সুভাষ ব্যাখ্যা করলেন আজাদহিন্দ ফৌজের উদ্দেশ্য:

'আমি ছিলাম বৃটিশ-জেলে। এগারবার তারা আমাকে বন্দী করেছে। সেই কারাগারের অন্ধকারেই লৌহ-প্রাচীরের কঠিন হৃদয় ভেদ করে একদিন আমার কাছে এসে পৌঁছল স্বাধীনতার আলোকবর্তিকা। সেই আলোয় আমি দেখলাম কারাগারের রুদ্ধকক্ষের নিরাপত্তা আমার জন্যে নয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যেই আমার ভারতবর্ষের বাইরে যাওয়া দরকার। সে পথে বাধা হোক যত দুস্তর আমার প্রতিজ্ঞা হবে তত দুর্বার, তত দৃঢ় তাকে অতিক্রম করার। সেই দুরূহ ব্রত উদ্‌যাপনের জন্যে প্রার্থনা করলাম। দেশ থেকে পালাবার আগে আমার প্রয়োজন জেল থেকে বেরুবার। সেই উদ্দেশ্যে আরম্ভ করলাম আমরণ অনশনের ব্রত। আয়ার্লণ্ডে কি ভারতে ব্রিটিশ সরকারকে মুক্তিসর্তে বাধ্য করতে পারে নি কেউ, জেনেও ঐতিহাসিক কর্তব্যপালনে আরম্ভ করলাম অনশন। সাত দিনের মধ্যেই ব্রিটিশ সরকার ভয় পেয়ে আমাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। তাদের মতলব ছিল আমাকে কিছুদিন পরে আবার তাদের খাঁচায় পোরবার। তার আগেই আমি স্বাধীন দেশের মাটিতে পা দিলাম।

আমার ভারত ত্যাগের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতার জন্যে ভারতের বাইরে থেকে ব্রিটিশসিংহকে আক্রমণে পর্যুদস্ত করা। জাতীয় মুক্তি আসবে কোন্ পথ দিয়ে আজ আমার শত্রুমিত্র দুজনকেই তা স্পষ্ট করে শোনাতে চাই। পূর্ব এশিয়ায় জন্ম নিয়েছে ভারতীয়দের প্রথম স্বাধীন সৈন্যদল—আজাদহিন্দ ফৌজ। এই ফৌজ যেদিন আক্রমণ করবে ব্রিটিশসিংহের পতাকা অস্বীকার করে সেদিন পরাধীন ভারতের জনসাধারণ এবং সৈনিক উভয়ের মধ্যেই আসবে বিপ্লব। বাইরে এবং ভেতরে আক্রমণের জাঁতাকলে পড়ে কচুকাটা হবে সেদিন ইংরেজ-সরকার। ভারত পৌনে দুশো বছর পর ফিরে পাবে

তার স্বাধীনতা কেবল এই পথেই। এই জন্যে অক্ষশক্তির কি মনোভাব ভারত সম্পর্কে তা জানবার প্রয়োজন হবে না যদি ভারতের ভেতরে এবং বাইরে ভারতীয়রা নিজেদের কর্তব্য পালন করে অকাতরে। ব্রিটিশসিংহের উদ্যত নখরের জবাবে উদ্যত নখর; হিংস্র চক্ষুর পরিবর্তে হিংস্র চক্ষু প্রদর্শন ছাড়া ভারতের স্বাধীনতা আসবার দ্বিতীয় কোনও পথ খোলা নেই আর।

তাই বন্ধুদের বলি পূর্ব এশিয়ার ৩০ লক্ষ ভারতীয়ের এই হোক একমাত্র রণহুঙ্কার! সর্বাত্মক যুদ্ধের জন্যে সর্বাত্মক প্রস্তুতি চাই। আর তারই জন্যে চাই ৩ লক্ষ সৈন্য, ৩ কোটি ডলার অর্থ। আরও চাই ভারতীয় নারীর এক বাহিনী। ১৮৫৭-য় ভারতের প্রথম মুক্তিযুদ্ধের অগ্রদূত ঝান্সির রাণীর যারা হবে যোগ্য উত্তরাধিকারিণী। আমাকে এই সর্বাত্মক প্রস্তুতি দাও, আমি তোমাদের দ্বিতীয় রণক্ষেত্রের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। সে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র হবে ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামের দৃষ্টিকোণ থেকে আসলে অদ্বিতীয় এক রণাঙ্গন।'

তেরশ পঞ্চাশের মন্বন্তরের কালো ছায়ায় তখন বাংলার আকাশ ঢেকে গেছে, তার বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে দুর্ভিক্ষের দীর্ঘশ্বাসে। এক লক্ষ টন চাল পাঠাতে চেয়েছিলেন নেতাজী, ব্রিটিশ সরকার তা পাঠাতে দেন না।

৮ই আগস্ট নেতাজী হলেন আজাদহিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক। ২৫শে আগস্ট বেরুলো তাঁর প্রথম 'অর্ডার অফ দি ডে': ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অগ্রদূত আজাদহিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়কত্ব গ্রহণ করলাম স্বহস্তে। বিভিন্ন ধর্মের ৩৮ কোটি ৮০ লক্ষ ভারতীয়ের সেবায় নিযুক্ত বলে নিজেকে মনে করি। এই স্বাধীনতার যুদ্ধে আমরা জয়যুক্ত হবই। আমাদের সেই সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। সেই সংগ্রামের ধ্বনি হচ্ছে—চলো দিল্লি। এই ধ্বনি ভারতের জয়ধ্বনি। লালকেল্লায় যেদিন উড্ডীন হবে স্বাধীন ভারতের পতাকা, আর সেখানে প্যারেড করবে আজাদহিন্দ ফৌজ, সেদিন শেষ হবে এই সংগ্রাম—তার আগে নয়।

পূর্ব এশিয়ায় আজাদহিন্দ ফৌজ গঠন এবং আজাদহিন্দ সরকারের জন্ম সম্ভব হত না যাঁর সহযোগিতা ছাড়া—তিনি হচ্ছেন রাসবিহারী বসু—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় একটি নাম।

আজাদহিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়কের পদে নেতাজীর প্রথম হুকুমনামার তারিখ হচ্ছে ২৫শে আগস্ট, ১৯৪৩; আর সুভাষচন্দ্রের ইয়োরোপে পদার্পণের তারিখ হচ্ছে ১৯৪১-এর মার্চ। এই সময়টায় তিনি হিটলারের সাহায্য চেয়ে ব্যর্থ হন প্রধানতঃ গোয়েবল্‌সের বিরুদ্ধতায়। এমন কি মুসোলিনী যখন হিটলারকে বললেন যে বসুকে তিনি পালটা সরকার গঠন করে আরও প্রকাশ্যে কাজে নামতে বলেছেন তখনও গোয়েবল্‌স্ 'নোট' করেছেন তাঁর দিনপঞ্জীর পাতায়: 'আমরা এই প্রস্তাবটি বিশেষ পছন্দ করছি না, কারণ আমাদের মনে হয় এখনও সেরকম রাজনৈতিক চাল দেবার সময় হয় নি।' হিটলারেরও মত ছিল অনুরূপ। মুসোলিনীর অভিমত পরিবর্তিত করতে পারলেও হিটলারকে টলাতে পারলেন না সুভাষচন্দ্র। তিনি চেয়েছিলেন অক্ষশক্তির সঙ্গেই আজাদ-হিন্দের পক্ষ থেকে ত্রিদলীয় ঘোষণা। হিটলারের সঙ্গে কথা বলে বুঝলেন এখানে ভারতীয় সৈন্যরা, জার্মেণী জয়ী হলে, জার্মাণ শক্তির কাছে পরাভূত হবে এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমাপ্তি ঘটবে অনেককালের জন্যে। তিনি তীব্র প্রচারকার্য চালাতে থাকলেও মুষড়ে পড়লেন। ১৯৪৩-এর ৮ই ফেব্রুয়ারি জার্মাণীর কিয়েল বন্দর ত্যাগ করে সাবমেরিনে পার হলেন ১৮ সপ্তাহের বিপদসঙ্কুল সমুদ্রপথ। সাবাং থেকে কর্নেল ইয়ামামোতো তাঁকে নিয়ে যান টোকিওতে।

দু বছর চেষ্টা করেও হিটলারকে যে ঘোষণায় রাজী করাতে পারেন নি তিনি, তোজোর তাতে সম্মতি দিতে ৪৮ ঘণ্টার বেশী সময় লাগল না। তোজোর ঘোষণায় উৎফুল্ল সুভাষ অভিনন্দন জানালেন এই বলে:

জাপান ভারতের শ্রেষ্ঠ বন্ধু, এই ঘোষণা এক ঐতিহাসিক ঘটনা— ইতিহাসের অমর অধ্যায়।

এশিয়ায় তাঁর সিদ্ধির পথ দীর্ঘকাল ধরে প্রস্তুত করেছিলেন একটু একটু ভারত থেকে অনেকদিন আগে পলাতক আর এক বীর—রাসবিহারী বসু।

১৯শে জুন, ১৯৪৩। প্রথম প্রেস-কনফারেন্স সুভাষের এশিয়ায়। সেখানে বললেন: আইন-অমান্য আন্দোলনকে সশস্ত্র আন্দোলনে রূপান্তরিত না করা পর্যন্ত, অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত ভারত স্বাধীনতালাভের যোগ্য হবে না কোনওমতেই।

দেশবাসীর উদ্দেশ্যে গর্জন করে উঠল তাঁর কম্বুকণ্ঠ: 'অক্ষশক্তিকে বিশ্বাস করবার প্রয়োজন নেই, ভারতবর্ষের বিশ্বাস দাবি করেন তিনি নিজে—সুভাষচন্দ্র। ব্রিটিশের প্রলোভন অথবা ভীতিপ্রদর্শন তাঁকে টলাতে পারে নি; আর কোনও শক্তিও সেপথে তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হবে, সন্দেহ নেই। ব্রিটিশেরা স্বেচ্ছায় সুজলাসুফলা মলয়জশীতলা, ভুবনমনোমোহিনী, নির্মল-সূর্যকরোজ্জ্বল এই ভারতবর্ষকে পরিত্যাগ করে যাবে, এ কথা যেন কেউ না ভাবে। অর্থনীতির কারণেই তাদের ভারতবর্ষকে শাসনের নামে শোষণের প্রয়োজন হবে চিরকাল। তিন সম্মিলিত অক্ষশক্তি আক্রমণ করেছে ইংলণ্ডকে। এই সুযোগের জন্যে ভারতের কৃতজ্ঞ হবার কথা অক্ষশক্তির কাছে। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা আনবার সংগ্রামে রক্ত দেবে না তারা, প্রথম পবিত্র রক্তবিন্দু ভারতের মাটিতে ভারতীয়ের হতে হবেই। সেই বীরের রক্তের বিনিময়েই কেবল স্বাধীনতা অর্জন এবং রক্ষা সম্ভব।'

সমগ্র এশিয়া সাড়া দেয় সেই ডাকে।

সুভাষচন্দ্রের দেশত্যাগ ব্যর্থ হয় নি। ইয়োরোপে এবং এশিয়ায় যুদ্ধের প্রকৃত নায়কদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করে বুঝেছেন যুদ্ধের গতি কোন্ দিকে; ইংলণ্ডের বিপদ কোন্ দিক থেকে আসছে এবং তার কতটা সুযোগ ভারত কি ভাবে নিতে পারে। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দেশে বসে আর কারুরই লাভ করার সৌভাগ্য হয় নি। ১৯৪৩-এর ৯ই জুলাই প্রবল বর্ষণের মধ্যেও অবিচলিত দণ্ডায়মান ষাট হাজার শ্রোতার সামনে তাই নিঃসংকোচে বলতে পেরেছিলেন সেদিন:

'ভারতবর্ষে দ্বিতীয় কোন স্বদেশী নেতা নেই যিনি আমার মত এত দিকে এত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন বলে দাবি করতে পারেন।'

১৯৪৩, ১লা আগস্ট জাপানীরা বর্মাকে স্বাধীন করে দেয়। সুভাষচন্দ্র এই উপলক্ষে এক ভাষণে বলেন: 'রেঙ্গুনে যেমন সরকারী ভবনে উড্ডীন স্বাধীন বার্মার ময়ূরকেতন, তেমনই দিল্লির লালকেল্লায় উড়বে স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত জয়পতাকা।'

ফিল্ডমার্শাল কাউণ্ট তেরোচি তখন দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় জাপানীদের সর্বাধিনায়ক। তিনি আজাদহিন্দ ফৌজের ওপর আস্থা রাখতে বারণ করছিলেন সুভাষকে। কারণ, আজাদহিন্দ ফৌজ মূলতঃ ইংরেজের সৈন্য ছিল একদিন। এবং ইংরেজদের হয়ে যুদ্ধে হেরে যাওয়া এই ফৌজরা ইম্ফল সংগ্রামের কঠোরতা সহ্য করতে সক্ষম হবে না। তারা চেষ্টা করবে আবার ইংরেজদের সঙ্গে ভিড়ে যেতে। জাপানী সৈন্যের ওপরই যুদ্ধের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তুলে দিতে বললেন তেরোচি নেতাজী সুভাষকে। নেতাজী তার উত্তরে জানালেন: জাপানীদের রক্তে এবং ত্যাগে নয়, ভারতের স্বাধীনতা আনবে ভারতবাসীর রক্ত এবং ত্যাগ। এই তাঁর বিপ্লবী বিবেকের সুস্পষ্ট নির্দেশ। একে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা নেই বলেই তিনি দেশত্যাগ করে এসেছেন। এখনও একে ত্যাগ করার অর্থই হচ্ছে আদর্শ পরিত্যাগ করা—যার অপর একমাত্র অর্থ নেতাজীর অভিধানে অপমৃত্যু ছাড়া আর কিছু নয়।

এদেশে একশ্রেণীর দেশদ্রোহী যখন সুভাষকে অক্ষশক্তির ক্রীড়নক, জাপানের দালাল বলে হেয় প্রতিপন্ন করবার উৎকট প্রচেষ্টায় কাণ্ডজ্ঞানলুপ্ত, এবং আর একদলের মুখপাত্র যখন নেতাজী এলে—বাঁশের লাঠি নিয়ে, ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দারের ভূমিকায় অবতীর্ণ, ঠিক তখনই নেতাজী জাপানের সর্বপ্রকার কর্তৃত্বের বন্ধন ছিন্ন করতে উদ্যত। দেশদ্রোহী আর খাঁটি বিদ্রোহীতে, অভিনেতা আর নেতায় এইখানেই সবচেয়ে বড় পার্থক্য মাথা উঁচু করে আছে চিরকাল।

সুভাষের ব্যক্তিত্ব ও যুক্তির কাছে হার মানেন কাউণ্ট তেরোচি। একটি সর্তে তিনি লড়তে দিতে রাজী হন আজাদহিন্দ ফৌজকে। আজাদহিন্দ ফৌজের একটি রেজিমেণ্টকে তিনি সঙ্গে নেবেন পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে। অর্থাৎ এই রেজিমেণ্ট যদি জাপানী ফৌজের সঙ্গে লড়াইয়ে সমানতালে পাল্লা দিতে পারে তবেই আজাদহিন্দের বাকী বাহিনী লড়বার সুযোগ পাবে—নইলে নয়। তেরোচির প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে নূতন উদ্যমে উঠে-পড়ে লাগলেন নেতাজী সুভাষ। যারা অলস, কর্মবিমুখ, বিশৃঙ্খল এবং বিশ্বাসঘাতক তাদের উদ্দেশ করে সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন নেতাজী সুভাষ; দূর হয়ে যেতে বললেন আজাদহিন্দের দল থেকে। এই ফৌজে কেবল কষ্টসহিষ্ণু, সুশৃঙ্খল এবং দেশপ্রেমিকদেরই স্থান। মাইনে এবং রেশন বাড়িয়ে দিলেন। নিজে তদারক করে বেড়াতে লাগলেন শিবিরে ঘুরে ঘুরে। ফৌজ তৈরি হতে লাগল জোর কদমে। শাহনওয়াজ খাঁর নেতৃত্বে সুভাষ-রেজিমেণ্ট প্রতীক্ষা করতে লাগল মণিপুর রণাঙ্গনে ডাকের জন্যে। এ ছাড়া বালকসেনার দল এবং মেয়েদের নিয়ে তৈরী ঝান্সিবাহিনীও গঠিত হল ইতোমধ্যে।

১৭ই অক্টোবর ১৯৪৩। ফিলিপাইনের স্বাধীনতা-উৎসবে তিনি বক্তৃতা দিলেন। স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকারের অস্তিত্ব ঘোষণার সময় এল এবার। জুন মাসেই তোজোর সম্মতি পাওয়া গেলেও সিঙ্গাপুরে হিকারি-কিকানের সঙ্গে দীর্ঘকাল টানাহেঁচড়ায় দেরি হয়ে যায়। ২০শে অক্টোবর রাত্রি প্রভাত হবার আগেই প্রস্তুত হয় অস্থায়ী আজাদহিন্দ সরকারের ঘোষণাপত্র—সুভাষচন্দ্রের নিজের হাতে যার খসড়ার জন্ম। আজাদহিন্দ সরকারের প্রচারমন্ত্রী শ্রীযুক্ত আয়ারের বর্ণনায় সেই রোমাঞ্চকর রাত্রি জীবন্ত হয়ে আছে: 'একগোছা সাদা কাগজে পেন্সিল না তুলে, না কেটে একবারও, লিখে চললেন সারারাত একা সুভাষচন্দ্র। এক পাতা শেষ হয় আর চলে যায় টাইপ হতে। টাইপ হবার পরও নড়চড় হয় না একটি কমা-সেমিকোলনেরও। যখন লেখা শেষ হয় তখন রাত্রিও শেষ হয় প্রায়। রাত জাগার নিদর্শন অসংখ্য কফির কাপের গোল দাগ টেবিলময় লেগে রয়েছে তখনও।'

পায়ে পায়ে এগিয়ে এল ১৯৪৩-এর ২১শে অক্টোবর। ভারতের প্রথম স্বাধীন সরকারের ঘোষণার গৌরবে বিভূষিত সেই চরম উত্তেজনার পরম উদ্দীপনার অবিস্মরণীয় একটি দিন। আজাদহিন্দ সরকারের জন্ম হল সেই তারিখে। সিঙ্গাপুরের ক্যাথে সিনেমার প্রেক্ষাগৃহে সুভাষচন্দ্র বললেন: অস্থায়ী সরকার গঠনের পেছনে ভারতের অসামরিক জনসাধারণের সমর্থন তো আছেই, এমন কি বৃটেনের অধীনে ভারতের সৈন্যদেরও আছে সহানুভূতি। বিপ্লব শুরু হবে ভারতের মাটিতে আমাদের ফৌজের পদার্পণে, যার অবশ্যম্ভাবী ফল হবে ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের সুনিশ্চিত অবসান।

বৈকালিক অধিবেশনে সুভাষবিরোধী ইয়ামামোতোর উপস্থিতিতে পড়া হল ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্র। জাতীয় পতাকায় আপাদমস্তক আচ্ছাদিত সেই ভবনে সেদিন তিলধারণের স্থান নেই। নেতাজী সুভাষ এবং তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্যরা দণ্ডায়মান সৈনিকের পোশাকে। মাইক্রোফোনের মুখে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত। প্রাচ্যের কূটনীতিক ও রাজনৈতিক নেতাদের সম্ভাষণ এবং আজাদহিন্দ ফৌজের 'গার্ড-অফ-অনার' সমাপ্ত হবার পর

আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে সুভাষচন্দ্র পড়লেন, সুভাষচন্দ্র নয়, নেতাজী সুভাষ :

'ঈশ্বরের নামে আমি এই পবিত্র শপথ নিচ্ছি। ভারতবর্ষকে এবং আমার দেশের আটত্রিশ কোটি আশি লক্ষ মানুষকে শৃঙ্খলমুক্ত করবার স্বাধীনতাসংগ্রামে, আমি সুভাষচন্দ্র বসু, আমার প্রাণবায়ু বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত পুণ্যকর্তব্যে নিরত থাকব।

আমি চিরদিন এই ভারতের দীনসেবক হয়ে থাকব এবং আটত্রিশ কোটি আশি লক্ষ ভাইবোনদের কল্যাণ-সাধন হবে আমার জীবনের স্বপ্ন, সাধনা।

স্বাধীনতালাভের পরেও স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামেও শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে যুদ্ধ করবার অঙ্গীকার করলাম।'

মন্ত্রীসভার সদস্যেরাও তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে শপথ গ্রহণ করল একে একে। 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা' জাতীয় সঙ্গীত আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায় সবাই। নেতাজী সুভাষ, ইয়ামামোতো, মন্ত্রীসভার সদস্যরা অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়ান। হর্ষধ্বনি, করতালি আর শ্লোগান ওঠে মুহুর্মুহু।

কল্পনায় ফিরে যাই সেই ঐতিহাসিক দিনটিতে। সিঙ্গাপুরের ক্যাথে সিনেমার প্রেক্ষাগৃহে। ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্নে আর সংগ্রামের প্রতিজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ সেই রক্তচিহ্নিত দিনটির মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াই একবার। কল্পনায় ভেসে ওঠে কল্পনাতীত এক বাস্তব। দেশ থেকে দূরে দেশকে তীব্রভাবে ভালবাসার কারণে জীবনে বহুবার নিপীড়িত এক বিদ্রোহী বীর; দেশকে স্বাধীন করবার সংগ্রামে দেশত্যাগী এক মহানায়ক; ভারতের যে স্বাধীনতা পলাশীর প্রান্তরে নিমজ্জিত, মণিপুরের প্রান্তে তাকে আবার তুলে আনার প্রতিজ্ঞায় শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত যুদ্ধ করে যাওয়ার সংকল্পে স্থির, দিল্লির লালকেল্লায় ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উড্ডীন করবার উন্মাদনায় অস্থির নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা সত্য হবার সময় যখন সন্নিকট তখন ধারণায় আনবার চেষ্টা করি তাঁর মনের অবস্থা।

শেষ হয়ে গেছে ক্যাথে সিনেমায় ঘোষণানুষ্ঠান। উৎসব-অন্তে ফিরে গেছে যে যার; মন্ত্রীদেরও বিদায় দিয়েছেন নেতাজী একে একে। তারপর গিয়ে দাঁড়িয়েছেন যাঁর ছবির সামনে তাঁর নাম দেশবন্ধু, যাঁর ছবি কোনও ভারতীয়ের মন থেকে কোনওদিন মোছবার নয়। দেশের স্বাধীনতার সূর্যোদয় হবার ব্রাহ্মমুহূর্ত যখন অন্ধকারতম রাত্রির অবসানে আসন্নপ্রায় তখন দেশের এবং তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বান্ধব দেশবন্ধু নেই পাশে। গভীর আনন্দের মধ্যেও তাই সুগভীর বেদনার দুফোঁটা জল নেতাজীর চোখে সেদিন কি টলমল না করে পেরেছে?

ফাঁসীর মঞ্চে যারা জীবনের জয়গান গেয়ে গেছে; নির্জন কারার অন্ধকারে করে গেছে রাত্রির তপস্যা—সেদিন সিঙ্গাপুরে ভারতের অস্থায়ী আজাদহিন্দ সরকার ঘোষিত হবার মুহূর্তে তারা এসে দাঁড়িয়েছে নেতাজীর অলক্ষ্যে। আর যারা লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজের সন্তানকে স্বাধীনতা সংগ্রামের যূপকাষ্ঠে দিয়েছে বলি, যাদের নাম হারিয়ে গেছে ইতিহাসের পাতা থেকে, যারা দিয়েছে সব, পায় নি কিছু, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের যারা অজ্ঞাত অখ্যাত শহীদ—তাদের কথাও মনে পড়েছে নিশ্চয়ই সেদিন আজাদহিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়কের; মনের স্মৃতিপটে নিশ্চয়ই উদিত হয়েছে তাদের রক্তাক্ত চিত্র।

আর মনে পড়েছে নিশ্চয়ই জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর ডাণ্ডীযাত্রার সেই অবিস্মরণীয় ছবি। যুক্তকরে প্রণাম জানিয়ে তাঁর উদ্দেশে প্রার্থনা করেছেন আশীর্বাদ।

অতীত ভারতের একটি দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটছে সেদিন অনুমান করি কল্পনায়, ভারত থেকে দূরে সিঙ্গাপুরের সেই ক্যাথে প্রেক্ষাগৃহে। গান্ধীজীর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে নেতাজী। জাতির জনকের প্রতিকৃতির সম্মুখে দণ্ডায়মান বিদ্রোহী সন্তান। দ্রোণের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে একলব্য।

দ্রোণের পায়ে একলব্য গুরুদক্ষিণা দিয়েছিলেন তাঁর

গুরুর ইচ্ছায় দক্ষিণপাণির অংশ ; জাতির জনকের করে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন সুভাষ স্বেচ্ছায় তাঁর অর্জিত অধিকার।

২১শে অক্টোবর সিঙ্গাপুর সিনেমা হলে আজাদহিন্দ সরকার ঘোষিত হয়। ৪-১৩ সামরিক প্রতিনিধি, ১৬-২১ পরামর্শদাতা, ২২ জন মন্ত্রী। সুভাষচন্দ্রের পরিচয় হল— রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, দেশরক্ষা এবং বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রী, আজাদহিন্দ ফৌজের প্রধান সেনাপতি। আজাদহিন্দ সরকারকে জাপান, ব্রহ্মদেশ, ক্রোটিয়া, জার্মেণী, ইতালি, ফিলিপিন, নানকিং, মাঞ্চুকুও এবং শ্যাম স্বীকৃতি দিল।

বৃহত্তর এশিয়া সম্মেলনে তোজো সহানুভূতির প্রমাণ-স্বরূপ আন্দামান এবং নিকোবর দান করলেন আজাদহিন্দ সরকারকে। নেতাজী দ্বীপ দুটির নতুন নামকরণ করলেন শহীদ এবং স্বরাজ দ্বীপ। যুদ্ধের চুক্তি হল এই যে আজাদহিন্দ বাহিনী জাপসৈন্যের সঙ্গে সমানে লড়বে; কম্যাণ্ড থাকবে জাপানী সৈন্যাধ্যক্ষের হাতে।

বর্মার ভিতর দিয়ে ইম্ফল আক্রমণে জাপানীরা প্রস্তুত হল ১৯৪৪-এর জানুয়ারিতে। জাপান প্রস্তাব করল যে সুভাষ-রেজিমেণ্টকে টুকরো টুকরো করে জুড়ে দেওয়া হোক জাপানী দলের সঙ্গে। নেতাজী বললেন, না। The first drop of blood to be shed on Indian soil should be that of a member of the I. N. A.! ৩রা ফেব্রুয়ারি সুভাষ-রেজিমেণ্ট ট্রেনে উঠল, নেতাজীর চোখে টলমল করে দু ফোঁটা আনন্দের অশ্রুজল।

আরাকান থেকে সুসংবাদ আসে। আজাদহিন্দ ফৌজের মেজর এস. এস. মিশ্রের পর্যবেক্ষণের গুণে মাও ভ্যালিতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে ব্রিটিশ-বাহিনী। ১৩ই মার্চ আজাদহিন্দ ও জাপানী ফৌজ সম্মিলিতভাবে প্রবেশ করল ভারতের মাটিতে প্রথম। তোজো দুদিন বাদে জাপানী পার্লামেণ্টে ঘোষণা করলেন : অধিকৃত এলাকা শাসন করবে আজাদহিন্দ অস্থায়ী সরকার। ৭ই এপ্রিল মণিপুর যুদ্ধের চরম মুহূর্তে সুভাষের ধারণা তিন সপ্তাহের মধ্যে ইম্ফল জয় হবে। এবং সেখান থেকেই আরম্ভ হবে আজাদহিন্দ ফৌজের ভারতের মুক্তি-সংগ্রাম। এইদিনে তাঁর সৈন্য ভারতের ভূমি স্পর্শ করেছে। নেতাজীর জীবনের অবিস্মরণীয় সেই একদিন।

নেতাজী তখনও মেমিওতে।

মণিপুরের যুদ্ধের রসদ-সংগ্রহের আয়োজন-সভায় নেতাজী নগদে ও গয়নায় ৫০ লক্ষ টাকা তোলেন।

মাতাগুচি ইম্ফল কোহিমা রাস্তা ভেঙে দেবার অর্ডার দিলে, আপত্তি করলেন নেতাজী। মাতাগুচি শুনলেন না; বললেন: ইম্ফলকে লেকে পরিণত করে মনের আনন্দে মাছ ধরব। ইম্ফল-কোহিমা; ইম্ফল-শিলচর দুটি রাস্তাই কেটে ইংরেজদের পালাবার রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হল নেতাজীর সুস্পষ্ট আপত্তি সত্ত্বেও। এই নির্দেশ অমান্য করে মাতাগুচি কত বড় সর্বনাশ ডেকে আনলেন তা দেখবার জন্যে রইলেন কেবল সুভাষ; মাতাগুচি তার অনেক আগেই মণিপুরের জলে মাছের বদলে কুমীর দেখে সরে পড়েছেন। ২৬শে জুলাই তোজো পদত্যাগ করেন এবং নেতাজী মণিপুর-সংগ্রামের ব্যর্থতা প্রকাশ্যে স্বীকার করেন।

১৯৪৪-এর শেষ তিন মাসে জাপানীরা পিছু হটেছিল ইরাবতীর তীর থেকে। আজাদহিন্দ ফৌজ এখান থেকেই আরম্ভ করে মণিপুরে দ্বিতীয় অভিযান। আরাকান থেকে খবর আসে, ব্রিটিশ সৈন্য মান্দালয়ের ৫০ মাইলের মধ্যে এসে গেছে। তবুও অদম্য নেতাজীর অনুপ্রেরণায় অগ্রসর হলেন মেজর ধীলন আজাদহিন্দ ফৌজ নিয়ে মণিপুরের দিকে। ইরাবতী পার হয়ে গেল আজাদহিন্দ বাহিনী সংঘর্ষ সত্ত্বেও। কিন্তু লেফ্টেন্যাণ্ট হরিরাম এবং অন্যান্যদের বিশ্বাসঘাতকতায় বিচলিত নেতাজী মাউণ্ট পোপা ফ্রণ্টে পাঠালেন শাহনওয়াজকে। শাহনওয়াজ দেখলেন পোপার ঘাঁটিতে ঠিক আছেন

সাইগল; কিন্তু নিয়াঙ্গুতে ধীলন অসুবিধের মধ্যে আছেন।

২৬শে ফেব্রুয়ারি শাহনওয়াজের সরজমিন তদন্তের রিপোর্ট পেয়ে তৎক্ষণাৎ মিচিলা থেকে পোপা যেতে চাইলেন নেতাজী। শাহনওয়াজরা বারণ করে, নিজের জীবন বিপন্ন করার অধিকার নেই প্রিয় নেতার। নেতাজী উত্তর দিলেন: আমাকে মারবার মত বোমা ইংরেজ আজও তৈরি করতে পারে নি। শ্রীঅরবিন্দকে আলিপুরের বোমার মামলা চলার সময়ে গণৎকার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল: তোমাকে ধরে রাখতে পারে এমন কারাগার আজও তৈরি হয় নি। সে কথা সত্য প্রমাণিত হয়। সুভাষের ভবিষ্যদ্বাণী নেতাজীর সম্পর্কেও মিথ্যে হবার নয়।

১৩ই মে পেগুতে শাহনওয়াজ এবং ধীলন আত্মসমর্পণ করলেন তাউঙ্গজীনের জীবন-মরণ যুদ্ধে অপূর্ব শৌর্যবীর্যের পরিচয় দেবার পর। ২০শে এপ্রিল জাপানীদের রেঙ্গুন থেকে সরে যাওয়ার দুঃসংবাদ আসে। ২৩শে এপ্রিল তারা জানতে চায় নেতাজী অতঃপর কি করবেন। জাপানীরা তাঁর জন্যে গাড়ি দিতে চাইলে বলেছিলেন: আমি বা ম নই, নিজের চামড়া বাঁচাবার জন্যে চাই না নিরাপত্তা। মে মাসে ব্রহ্মদেশে ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামের শেষ হয়। ১৩ই আগস্ট সংবাদ পাওয়া যায় জাপানের আত্মসমর্পণ-প্রস্তুতির দুঃসংবাদ। ১৪ই আগস্ট নেতাজী একটি দাঁত তোলান। তখন তিনি সিঙ্গাপুরে।

সিঙ্গাপুর থেকে ব্যাঙ্কক যাত্রার জন্যে ১৬ই আগস্ট সকাল সাড়ে নটায় প্লেনে ওঠেন নেতাজী। প্লেনে ওঠবার আগে হাত নেড়ে বিদায় অভিবাদনে বলেন: আবার দেখা হবে। জয়হিন্দ!

আমরা জানি আবার দেখা হবে, সত্য হবে তোমার বিদায়বাণী। আমরা জানি তুমি আসবে আমাদের জীবনে, আমাদের যৌবনে। আমাদের রক্তে, আমাদের অস্থিমেদমজ্জায়। তোমার জন্মভূমিতে ফিরে আসবে তুমি। দ্বিধাবিভক্ত দুর্ভাগ্যপীড়িত এই দেশে তোমার শঙ্খ আজ ধূলায় পড়ে। যে শঙ্খের মুখে তোমার একটি ফুৎকারে এসে দাঁড়িয়েছিল মিলিত হিন্দু মুসলমানের আজাদহিন্দ ফৌজ। সেই অপরাজিত জীবনের শঙ্খে তোমার যৌবনের ফুৎকার স্বাধীন ভারতের আকাশ থেকে সমস্যার কৃষ্ণকান্ত মেঘ নিমেষে দেবে দূর করে। পৌনে দু শতাব্দীর পরাধীনতার গ্লানি মুহূর্তে নিঃশেষ হবে। শেষ হবে অবসন্নতার অমারাত্রি। মৃত্যুহীন আদর্শের অপূর্ব আলোকে ভরে যাবে এই পূর্বদিগন্ত। অস্তাচলের অন্ধকারে বিলীয়মান সূর্য যেমন রাত্রির তিমির ছিন্ন করে দেখা দেয় দিগন্তে আবার, তেমনই আবার দেখা দেবে তুমি দ্বিগুণতর দীপ্তিতে এই ভূমিতেই। হয়তো অন্য কোনও ভূমিকায়, হয়তো আর কোনও দুরূহ ব্রত উদ্‌যাপনের দুশ্চর তপস্যায় জ্যোতি-দীপ্ত তোমার প্রসন্নাননে সেদিন প্রমূর্ত হবে কবির ঘোষণা: মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। সকলের জীবনে জীবন পাবে তুমি; জয়যুক্ত হবে সেদিন তোমার বাণী: এক জাতি! একপ্রাণ! একতা!

এই পৃথিবীতে যতবার অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের, সপ্তরথীর বিরুদ্ধে অভিমন্যুর, মৃত্যুর উত্তরে জীবনের প্রতিবাদ হবে জাগ্রতকণ্ঠ, ততবার ধ্বনিত হবে তাদের কণ্ঠে তোমার কণ্ঠস্বর। মৃত্যুহীন আদর্শের জন্যে মহাপ্রাণ বলি দেবে যতবার মানুষ, ততবার তাদের মৃত্যুতে ঘোষিত হবে তোমারই মৃত্যুহীন জীবনের জয়বার্তা।

স্বাধীন ভারতের পথে অগ্রগামী নায়ক, কানে আসে এখনও তোমার কণ্ঠনিঃসৃত অমর আহ্বান: চল দিল্লি।

তোমার সেই আহ্বান আমরা ভুলি নি। বাঙালীর হৃদয়ের হে মুকুটহীন রাজা! তুমি বলেছিলে, নতুন দিল্লিতে যেদিন উড্ডীন হবে স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা, লালকেল্লায় যেদিন কদম কদম বাঢ়ায়ে খুশীর গান গেয়ে যাবে আজাদহিন্দ ফৌজ সেদিন শেষ হবে এই স্বাধীনতা-সংগ্রাম।

নতুন দিল্লির আকাশে আজ উড্ডীন ভারতের জয়কেতন। তার বাতাসে প্রতিধ্বনিত আজ তোমার ঐক্যধ্বনি: জয়হিন্দ। তবুও শেষ হয় নি সংগ্রাম। বাইরের শত্রু নিধন হয়েছে। ঘরের শত্রু ভীষণমূর্তি ধারণ করেছে। সেই বিভীষণের বিনাশ না হওয়া পর্যন্ত তোমার সংগ্রাম নয় সমাপ্ত। নতুন করে সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছে আজ স্বাধীন ভারতে। দুরন্ত জীবনসংগ্রাম। সংগ্রাম তাদের বিরুদ্ধে যারা মানুষের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে গর্বান্ধ নিষ্ঠুর কালো-ব্যবসায়ে উন্মত্ত; সংগ্রাম তাদের বিরুদ্ধে যারা দেশে দেশে প্রদেশে প্রদেশে সাম্প্রদায়িকতার জোগাচ্ছে ইন্ধন; সংগ্রাম তাদের বিরুদ্ধে যারা শিশুর খাদ্যে, রোগীর ঔষধে ভেজালের কালো-কারবারের টাকার জোরে আরও কালো করে তুলছে বিচারের প্রহসন। সংগ্রাম তাদের বিরুদ্ধে যারা অন্যায় করছে আর যারা অন্যায় সহ্য করছে।

সবচেয়ে বড় সংগ্রাম তাদের সঙ্গে যারা ঘরের শত্রু বিভীষণ, ডেকে নিয়ে আসছে বিদেশী আক্রমণকারীকে। বিদেশী জারজ পিতার আদেশে মাতৃহত্যায় উদ্যত—পরশুরামের কুঠারের সঙ্গে আজ কঠোর সংগ্রাম।

লুব্ধ যারা, ক্ষুব্ধ যারা, মাংসগন্ধে মুগ্ধ যারা আত্মার দৃষ্টিহারা সেই শ্মশান-কুক্কুরদের বীভৎস হানাহানিতে মানুষের দেবতাকে ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে, সংগ্রাম তারই বিরুদ্ধে আজ সর্বাগ্রে। এরাই চাইছে স্বাধীন ভারতকে কবর দিতে আবার; নাট্যের কবররূপে বাকী রাখতে শুধু ভস্মরাশি, আর অদৃষ্টের অট্টহাসি। তারই বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম আজ। সেই সংগ্রামে হে মহাতাপস তোমারই মহৎ জীবনের অগ্নিবাণী উচ্চারিত: 'পরাজয় আমাকে নিরাশ করে না। আমি যোদ্ধা, আশা আমার চিরসঙ্গী।'

দিল্লি দূর অস্ত্। দিল্লি অনেক দূর। আজও।

দিল্লি অনেক দূর আজও তাদের কাছ থেকে যে অসংখ্য অগণন মানুষের জন্যে শত শহীদের রক্তের স্রোতে, সহস্র জননীর অশ্রুধারায় দিল্লিতে উড্ডীন আজ ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত জয়পতাকা। দিল্লি অনেক দূর আজও সেই অন্নহারা আশ্রয়হারা মানুষদের হৃদয় থেকে যারা নিজের বাসভূমে আজ পরবাসীর মত শঙ্কিতচিত্তে জীবনের প্রহর গুনছে। দিল্লি অনেক দূর আজও তাদেরই কারণে যারা দুরতিক্রম্য বাধার মত দাঁড়িয়ে আছে প্রবঞ্চনার দুর্ভেদ্য প্রাচীরের আড়ালে।

দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে এই দেশ কেবল ভৌগোলিক দিক থেকে নয়। দ্বিখণ্ডিত ভারত বিভক্ত হয়েছে আবার। তার একদিকে রয়েছে মুষ্টিমেয় কয়েকজন অসাধারণ, অন্যদিকে অসংখ্য অগণ্য অতি সাধারণ। একদিকে অতিরিক্ত প্রাচুর্য, আর একদিকে অতি রিক্ত অবস্থা। একদিকে কয়েকজনের অফুরন্ত বিলাসের চূড়ায় নিশ্চিন্তে বাস, অন্যদিকে দুবেলা দু-মুঠোর অভাবে অর্ধ-উপবাস। নিরীহ নিরস্ত্র মানুষের শবের ওপরে সাম্প্রদায়িকতার উন্মত্ত উৎসব দ্বিখণ্ডিত ভারতকে খণ্ড খণ্ড করতে উদ্যত আজ!

স্বাধীন ভারতবর্ষে তোমার শঙ্খ ধূলায় পড়ে। তাকে তুলে নাও আবার!

তোমার আসন শূন্য আজি হে বীর পূর্ণ কর।

আজকের এই ভারতবর্ষ যেদিন অতীতের ইতিহাসে পরিণত হবে সেই অনাগত কালের কানে রেখে গেলাম একটি অবিস্মরণীয় নাম; আটত্রিশ কোটি আশি লক্ষ মিলিত হিন্দু-মুসলমানের হয়ে বিনম্র বিমুগ্ধ চিত্তের একটি প্রণাম। এবং এই পরাধীন ভারতের শেষ পলাতক আর স্বাধীন ভারতের পথে অগ্রসর প্রথম পদাতিকের জীবন্ত সংগ্রামের ইতিবৃত্তের দিকে তাকিয়ে তাদের বিস্ময় বাধা মানবে না।

ঠাকুমার কোলে শুয়ে রূপকথা শোনবার দিন শেষ হয়ে যাবে সেদিন। ঠাকুমার কোলে শুয়ে সেদিন তারা শুনবে, হে বিজয়ী বীর, তোমারই জীবনের অপরূপ কথা।

ভবিষ্যতের উপন্যাস

অরবিন্দ পোদ্দার

আজ থেকে ছত্রিশ বছর আগে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একটি অভিভাষণে বলেছিলেন, "এই অভিশপ্ত, অশেষ দুঃখের দেশে, নিজের অভিমান বিসর্জন দিয়ে রুশ-সাহিত্যের মত যেদিন সে (অর্থাৎ, বাংলা সাহিত্য) আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ, দুঃখ, বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সেদিন এই সাহিত্য-সাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্ব সাহিত্যেও আপনার স্থান করে নিতে পারবে।" কথাটা তিনি আধুনিক বাংলা উপন্যাসের প্রসঙ্গেই বলেছিলেন; ছত্রিশ বছর পর বাংলা উপন্যাস হাল-আমলে কি পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে, সে সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক।

রুশ-সাহিত্যকে (অতিসাম্প্রতিক সাহিত্যের কথা বলছি না, টলস্টয় পর্যন্ত উনবিংশ শতাব্দীর রুশ-উপন্যাসের যে ধারা, তার কথা বলা হচ্ছে) পশ্চাদপটে রেখে বাংলা উপন্যাসের আলোচনা আজও ধৃষ্টতা। বাঙালী কেন, অন্য কোন দেশের কোন ঔপন্যাসিকই টলস্টয়ের মত মহৎ নন; তাঁর 'ওঅর অ্যাণ্ড পীস্' গ্রন্থে মানুষের অন্তর্লোক ও বাহিরবিশ্বের, তার প্রাত্যহিক ঘরকন্নার সীমা ও সার্বভৌম সত্তার যে পরিচয় লিপিবদ্ধ রয়েছে, তার সঙ্গে তুলনীয় অন্য কোন উপন্যাস পৃথিবীতে নেই। আবার, মানবাত্মার অতলস্পর্শী গভীরে ডস্টয়েভস্কি যেমন করে ডুব দিয়েছেন বিশ্বের অন্য কোন ঔপন্যাসিক তেমন গভীরতায় প্রবেশের অধিকার লাভ করেন নি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, এই বিংশ শতকের গোড়ার দিকে ফরাসী ঔপন্যাসিক প্রুস্ত বিপর্যস্ত মানব-চৈতন্যের বিশ্লেষণে যে নৈপুণ্য ও সাফল্য অর্জন করেছেন সাহিত্যে তার তুলনাও একান্ত বিরল। সুতরাং, নিজের দেশের উপন্যাসের সাফল্যের কথা বিবেচনা করার আগে এই কীর্তিস্তম্ভগুলোর সম্মুখে আমাদের মাথা নত করে দাঁড়াতে হয়; মনে সংশয় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে, ওই দিকপালদের পাশে আমরা কি, আমাদের রূপসৃষ্টির ঐশ্বর্যই বা কতটুকু!

আমরা প্রারম্ভে তাই এ কথা ঘোষণা করতে পারি, শরৎচন্দ্রের আশা চরিতার্থ হয় নি—অদূর ভবিষ্যতে চরিতার্থ হওয়ার সম্ভাবনাও অল্প। বাংলা উপন্যাসের শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে কয়েক বছর আগে। সাহিত্যের বিশ্বমর্যাদা লাভ করার পক্ষে এই সময়টা খুব দীর্ঘ নয়; আবার, আধুনিক জীবনপ্রবাহের দ্রুত রূপান্তরশীল সত্তার পরিপ্রেক্ষিতে নিতান্ত অল্পও নয়। এই কালের মধ্যে কোন উপন্যাসে যদি আমরা সমগ্র দেশের চিত্ত-সংবেদনার কলরোল শুনতে পেয়ে থাকি তো তাদের সংখ্যা যে অত্যন্ত অল্প, তা বলাই বাহুল্য। এ ছাড়া, অন্যান্য উপন্যাস বলে আখ্যাত রচনা নিছক গল্প-বলা কাহিনীমাত্র। প্রশ্ন হতে পারে, উপন্যাসে গল্প কি অনিবার্য নয়? নিশ্চিত। অবশ্যই স্বীকার্য, যে যে উপাদান আশ্রয় করে উপন্যাস আপনরূপে স্ব-মহিমায় গড়ে ওঠে, গল্প তার অন্যতম, কিন্তু একমাত্র নয়। পাঠকচিত্তে গল্পের যে আবেদন তা চিরন্তন, শাশ্বত; কিন্তু, সে আবেদন মানুষের আদিমতম প্রবৃত্তির নিকট, যা সময়ের অনুবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ঘটনাবলীর বিবরণ শুনে অথবা পাঠ করেই তৃপ্ত। অত্যন্ত প্রাজ্ঞজনের অন্তরেও সেই আদিকালের মানবশিশুটি আজও বেঁচে রয়েছে; তার নিত্যকালের জিজ্ঞাসা, 'তারপর?' 'আর তারপর?' শরৎচন্দ্রের উপন্যাস যে সংখ্যাহীন ত্রুটি-বিচ্যুতি ও রূপকারের অপটুত্ব সত্ত্বেও আজও পঠিত হয়, সমাদৃতও হয়, তার বিশেষ বিশেষ কারণের মধ্যে এও একটি যে তা গল্পে সরস।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের চিন্তা কর্ম ও ভাবনা অত্যধিক কাল-সচেতন, কালের বোধে সীমিত। কোন্ ঘটনার পর কোন্ ঘটনা ঘটে বা ঘটতে পারে, কি কথার
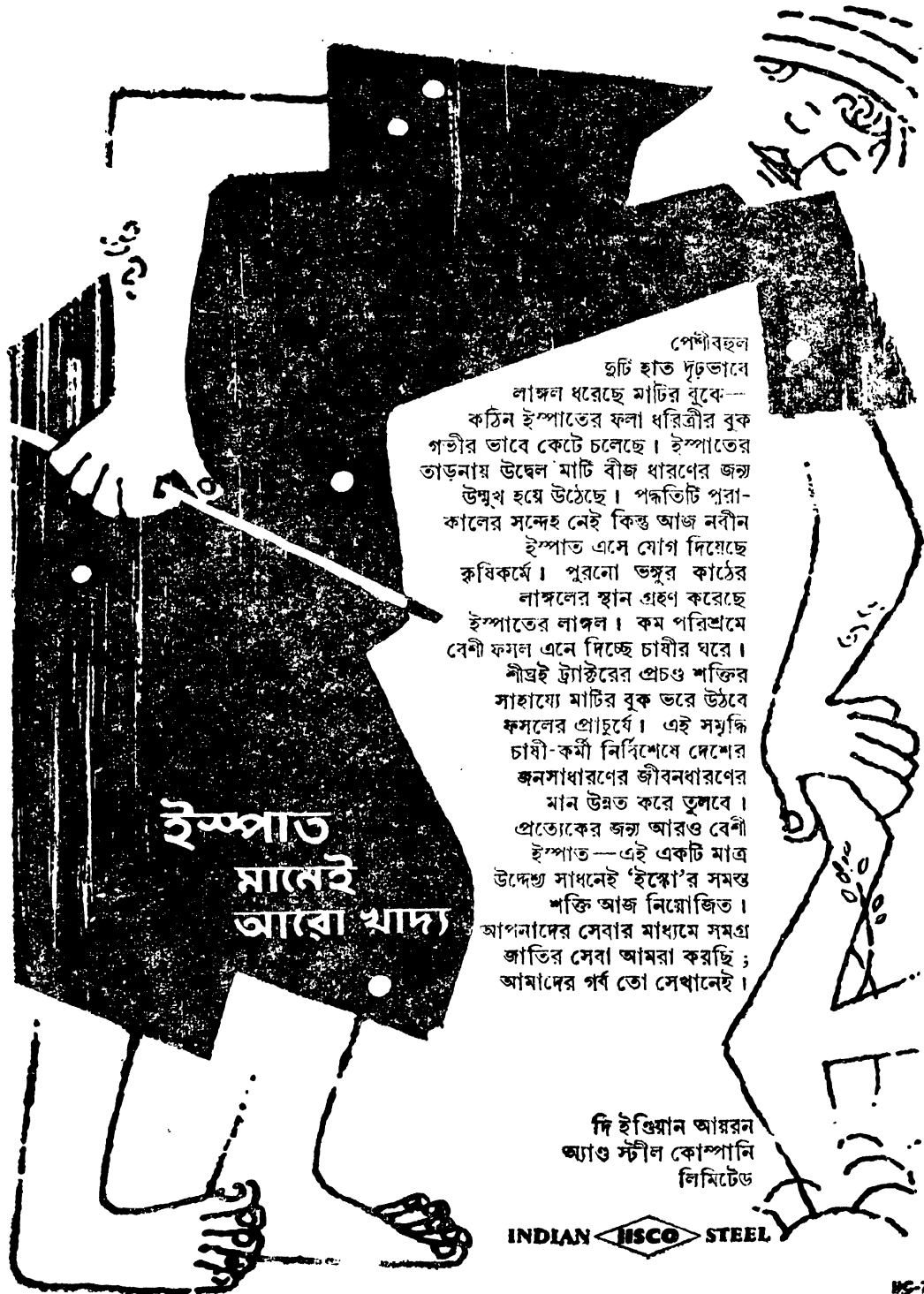
পেশীবহুল
দুটি হাত দৃঢ়ভাবে
লাঙ্গল ধরেছে মাটির বুকে—
কঠিন ইস্পাতের ফলা ধরিত্রীর বুক
গভীর ভাবে কেটে চলেছে। ইস্পাতের
তাড়নায় উদ্বেল মাটি বীজ ধারণের জন্য
উন্মুখ হয়ে উঠেছে। পদ্ধতিটি পুরা-
কালের সন্দেহ নেই কিন্তু আজ নবীন
ইস্পাত এসে যোগ দিয়েছে
কৃষিকর্মে। পুরনো ভঙ্গুর কাঠের
লাঙ্গলের স্থান গ্রহণ করেছে
ইস্পাতের লাঙ্গল। কম পরিশ্রমে
বেশী ফসল এনে দিচ্ছে চাষীর ঘরে।
শীঘ্রই ট্র্যাক্টরের প্রচণ্ড শক্তির
সাহায্যে মাটির বুক ভরে উঠবে
ফসলের প্রাচুর্যে। এই সমৃদ্ধি
চাষী-কর্মী নির্বিশেষে দেশের
জনসাধারণের জীবনধারণের
মান উন্নত করে তুলবে।
প্রত্যেকের জন্য আরও বেশী
ইস্পাত—এই একটি মাত্র
উদ্দেশ্য সাধনেই 'ইস্কো'র সমস্ত
শক্তি আজ নিয়োজিত।
আপনাদের সেবার মাধ্যমে সমগ্র
জাতির সেবা আমরা করছি;
আমাদের গর্ব তো সেখানেই।
ইস্পাত মানেই আরো খাদ্য
দি ইণ্ডিয়ান আয়রন
অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি
লিমিটেড
INDIAN IISCO STEEL
IISC-77 BEN

পর কি কথা আসে বা আসার সম্ভাবনা, তার একটি চিত্র, হয়তো বা অস্পষ্ট, আমাদের চৈতন্তে উদ্ভাসিত। সেজন্ত আমাদের বেশীর ভাগ কথায়, বেশীর ভাগ কর্মে সময়ের পারম্পর্য লক্ষণীয়। কিন্তু আমাদের দিনলিপিতে সময় ছাড়াও অন্য অনেক উপাদান আছে যা মানবসভ্যতার ঐতিহাসিক বিবর্তনের জটিলতা, হৃদয়াবেগের বিচিত্র প্রক্ষেপ ইত্যাদির ভিতর দিয়ে জন্মলাভ করেছে। তাদের একটিকে আমরা বলতে পারি মূল্যের চেতনা। অবশ্য কোন্ অভিজ্ঞতা মূল্যবান, কি হলে একটি অনুভব ও তার অভিব্যক্তি মূল্যবান হয়ে ওঠে, মানুষে মানুষে মূল্যের বোধ এক কি স্বতন্ত্র, এসব জিজ্ঞাসায় মতভেদ স্বাভাবিক; কিন্তু সত্য কথা, আমরা বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতা বা অনুভব বা আচরণকে মূল্য দিয়ে থাকি, মূল্য না দিলে আমাদের চলে না, এবং এই মূল্যের চেতনাই মানবেতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে, তার সংস্কৃতিকে করেছে বেগবান। সুতরাং আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে দুটি স্বতন্ত্র অথচ সৃষ্টিশীল ঐক্যের পরিমাপে ওজন করা চলে; একদিকে তা কাল-শাসিত, অন্যদিকে অনুভবের তীব্রতায় অর্থাৎ মূল্যের বোধে উজ্জ্বল। একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক; সাহিত্যের পাতায় এ ধরনের উক্তি প্রায়শঃই চোখে পড়ে, 'মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য দেখিয়েছিলাম, কিন্তু কী ভালই লাগল, এই রকমের উচ্ছ্বাসে সময় এবং মূল্য দুয়েরই স্বাক্ষর বর্তমান।

সার্থক উপন্যাসকে, তেমনি গল্প বলার সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের চেতনায় প্রোজ্জ্বল হতে হয়। এই মূল্যের প্রশ্নের সঙ্গে অনেক জটিল প্রশ্ন জড়িত; তার আলোচনায় অগ্রসর হব না। শুধু এ কথা বলাই যথেষ্ট যে, ব্যক্তির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিধিতে মূল্যের চেতনা ও পরিমাপ একরূপ; কিন্তু ব্যক্তিও তার বৃহত্তর সত্তার সঙ্গে অন্বয় অথবা বিরোধের সম্পর্কে সম্পর্কিত। সেই বৃহত্তর সত্তা তার পরিবার, সমাজ, দেশ অথবা বিশ্ব। এই বিশ্বে মূল্যের বোধ ও পরিমাপ আর এক রূপ। সত্তার এই বৃহত্তর স্বরূপে, জাগতিক ও মানবিক সম্পর্কের সমগ্রতায় উপন্যাস যখন মানুষকে আবিষ্কার করে, তখনই তা অতলস্পর্শী ঐশ্বর্যের অধিকার লাভ করে। এই বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণে রেখেই সম্ভবতঃ কোন কোন সমালোচক উপন্যাসকে মহাকাব্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন। উপন্যাস মহাকাব্যের পর্যায়ে উন্নীত হয় তখনই যখন বিরোধের মধ্যেও জীবনের সমগ্রতাকে সে তুলে ধরে, খণ্ডিতের মধ্যেও অস্তিত্বের অখণ্ডতার স্বীকৃতি থাকে; এবং যখন জীবনের অবাঞ্ছিত দুর্দৈবগুলোকে অবান্তর প্রেরণার অতিব্যাকুলতায় শুধু ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার মানদণ্ডে নয় দেশের সমগ্র জনসত্তার হৃদয়-কলরোলে উপস্থাপিত করা হয়, তখন সত্যসত্যই আমরা মহাকাব্যের অখণ্ড রস আস্বাদন করি। টলস্টয়ের 'ওয়র অ্যাণ্ড পীস্' বোধ করি এই অর্থেই মহাকাব্য।

বাংলা উপন্যাসে এই বৃহত্তর মহত্তর মূল্যচেতনার স্বাক্ষর বিরল; যদিও অন্য দিক থেকে 'মহাকাব্য' সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষণীয়। সম্প্রতিকালে আয়তনে বিপুল উপন্যাস রচনার একটা অত্যন্ত-সচেতন প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে; দু একটি ইস্পাত নগরীকে কেন্দ্র করে একাধিক উপন্যাস রচিত হয়েছে। একটি গ্রন্থ পাঠ করার সুযোগ আমার হয়েছিল; দেখেছি, লেখক যতটা কলেবরসচেতন, ততটা রূপসচেতন নয়। আয়তনে আর সব উপন্যাসকে ছাপিয়ে যাওয়ার জন্য যতটা দৃঢ়সঙ্কল্প, রূপসৃষ্টির নৈপুণ্যের তাঁর ততখানিই অভাব। 'মহাকাব্য' তো যুগযুগান্তরের প্রবাহিত জীবনধারার আবর্ত থেকে গড়ে ওঠে, বেড়ে ওঠে। সেই আবর্তকে ইতিহাসের আন্তর বেদনার সমগ্রতায় উপলব্ধি করা, তার সঙ্গে একাত্ম হওয়া, বোধের দীপ্তিতে তাকে প্রকাশের বাণী দেওয়ার জন্য যে মনীষা, মননশীলতা, সংযম ও ধৈর্য অত্যাবশ্যক—কোন বাংলা মহাকাব্যিক উপন্যাসপ্রচেষ্টায় তার কোন পরিচয় নেই। ব্যর্থতা তাই অনিবার্য। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, এই ব্যর্থতার ভিতর দিয়েও উপন্যাস ব্যাপ্তি অর্জন করেছে—এ কথা অবশ্য স্বীকার্য।

সার্থক, অথবা মূল্যায়নের মান নীচু করে বলা যায় মোটামুটি ভাল উপন্যাসে কোন না কোন ভাবে মূল্যবোধের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্রের প্রায় সমস্ত রচনায়ই এর স্বাক্ষর মিলবে; সে স্বাক্ষর অস্বচ্ছ হোক, রক্ষণশীল হোক অথবা সনাতন হিন্দু আচার-সম্মতই হোক—মূল্যের চেতনা তাঁর অধিকাংশ পাত্র-পাত্রীর সামাজিক, বা ব্যক্তিক আচরণে ও বোধে অবশ্য-- লক্ষণীয়। অবশ্য বলা যায়, এই মূল্যচেতনা যদিচ স্বতঃস্ফূর্ত এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রগাঢ়, তথাপি তা ব্যক্তিক সীমায় মর্মাহতরূপে সীমিত। সেখানে ব্যক্তির বৃহত্তর সত্তার পরিচয় যেমন অনুপস্থিত, তেমনি বৃহত্তর শ্রেয়সের বা মূল্যের বোধও অত্যন্ত অস্পষ্ট। দুঃখের বিষয়, মূল্যের এই সনাতন সংকীর্ণ বোধও একশ্রেণীর আধুনিক বাংলা উপন্যাসে দেখা যায় না; বিশেষতঃ, যে সব উপন্যাস 'পোশাকী শুচিতার' অন্তরালের সংবাদ পরিবেশন করায় আগ্রহশীল। সেখানে অবচেতন মনের ক্ষুধার পীড়নে মানুষের মানবত্ব বিনষ্ট, সুতরাং, তার পশু-সত্তাকে আলোয় উচ্ছ্বসিত করার প্রতি উপন্যাসকারের নজর অধিক। কিন্তু, এক্ষেত্রেও, মানব-চৈতন্য বিশ্লেষণে প্রুস্তের যে নৈপুণ্য তার আভাসমাত্র মেলে; তাই এদের রস অম্লরস। অপরিণত অক্ষম রূপকারদের রচনার বিচার বাদ দিলাম, কিন্তু 'বারো ঘর এক উঠোন'-এর মত অত্যন্ত নিপুণ রূপকর্মও শুধুমাত্র মানবিক মূল্যবোধের অভাবে কিভাবে অবহেলায় ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে তা আমাকে মর্মান্তিক পীড়িত করেছে। পক্ষান্তরে, দীপক চৌধুরীর কয়েকখানি উপন্যাসে মানবিক বোধ, সুস্থির মূল্যের চেতনা ও একটি ঐতিহাসিক কালের জীবনসাধনার সমগ্রতাকে উপলব্ধি করার প্রচেষ্টায় আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি। তাঁর রচনা প্রজ্ঞার দীপ্তিতে সপ্রতিভ, যেমন সপ্রতিভ সঞ্জয় ভট্টাচার্যের রচনা। বাংলা উপন্যাসে মূল্যচেতনার এই বলিষ্ঠ আবির্ভাবকে, শিল্পবিচারে ত্রুটিপূর্ণ হলেও, আমি ইতিপূর্বে এক আলোচনায় উপন্যাসের পক্ষে শুভচিহ্ন বলে স্বাগত জানিয়েছিলাম। শুধু পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থগুলিই নয়, বাংলা উপন্যাসের সামগ্রিক পরিচয় গ্রহণ করলে এই আশাই মনকে আনন্দিত করে যে, উপন্যাস দীর্ঘকালের অক্ষমতার আবরণ ভেদ করে সূর্যালোকে প্রবেশ করতে চলেছে।

বলা বাহুল্য, মননশীলতার মানদণ্ডে আধুনিক কালের উপন্যাস ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার উপন্যাস থেকে বহুগুণে দক্ষ; এই দক্ষতা একদিকে এনেছে সূক্ষ্ম কারুকারিতা, অন্যদিকে তাতে পৌরুষের ঋজুতাও যে কিছুটা না এসেছে তা নয়। অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'সত্যাসত্য' সিরিজের উপন্যাসগুলি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত; শুধু তা-ই বা কেন, এদের থেকে অনেক নীরস উপন্যাসেও গভীর মননশীলতার স্বাক্ষর মেলে।

শরৎচন্দ্র উপন্যাসের পাতায় পাতায় নাটকীয় সংঘাত ও পরিবেশ রচনায় অত্যন্ত কুশলী ছিলেন। তাঁর জীবনের বোধে ও চরিত্রের উপলব্ধিতে হৃদয়ের স্থান মুখ্য বলে তাঁর নারীপুরুষ উচ্ছ্বাসে ভঙ্গুর। "বলিয়া ঝড়ের বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল," "ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল," "বলিতে বলিতে হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল," ইত্যাদি ধরনের বিবৃতি সর্বত্র ছড়ানো। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে হৃদয়-সংঘাত নেই বলি নে, কিন্তু প্রতিটি কথা বা কর্মই সংঘাত এবং উচ্ছ্বাসের পরিবেশ সৃষ্টি করে না; শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে অবশ্যম্ভাবীরূপে করে। এটা নিঃসন্দেহে দুর্বলতার লক্ষণ, শক্তির লক্ষণ নয়। সেজন্য রাসবিহারী এবং কতকাংশে আশুবাবু ও বিপ্রদাস ছাড়া সমগ্র শরৎ-সাহিত্যে বলিষ্ঠ পুরুষ-চরিত্র আছে কিনা সে বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ। এমন কি, গৃহদাহের সুরেশও আপন শক্তির চেতনায় আত্মসমাহিত নয়। অন্যান্যরা হৃদয়বৃত্তির অতিশয্যতায় অপ্রয়োজনীয়ভাবে কোমল। তাই, সময়ের অনুবর্তনে সংঘটিত ঘটনাবলী ও আকস্মিকের সম্ভাবনা পাঠককে ধরে রাখলেও মন ভরে ওঠে না; অসতর্ক অনিপুণ রূপকর্মের অপূর্ণতায় মন ক্ষুব্ধ হয়।

কিন্তু আধুনিক কালের অক্ষম শিল্পীও কস্মিনকালে পূর্ব-কথিত দুর্বলতার পরিচয় দেবেন না। তাঁর রূপসৃষ্টি আরও বেশী সচেতন ও বিশ্লেষণপ্রয়াসী। তেমনি, আধুনিককালের কোন সার্থক ঔপন্যাসিকই কাহিনীর ধারা প্রতিহত করে কোনি চরিত্র সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতে বসবেন না। কোন চরিত্রের শঠতা অথবা সততা অথবা পৌরুষ প্রতিপন্ন করা যদি কাম্য হয়ে থাকে, তবে ঔপন্যাসিকের রায়েই তা সিদ্ধ হবে না, যদি না কাহিনীর বিবর্তনের মধ্য থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ওই সত্য প্রকাশিত হয়ে আসে। রূপকর্মের এই সমস্যা সম্পর্কে আধুনিক উপন্যাসকারদের দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর; পূর্বকালে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসেও এই সজাগ দৃষ্টির অভাব ছিল বলে লেখককে একটি-দুটি বিশেষণ ব্যবহার করে রায় দিতে হত। আজ তা নিষ্প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ রূপসৃষ্টির আলোচনায় বলেছিলেন, "সে (আধুনিকতা) বললে, আর্টের কাজ মনোহারিতা নয়, মনোজয়িতা; তার লক্ষণ লালিত্য নয়, যাথার্থ্য। চেহারার মোহকে মানলে না, মানলে ক্যারেক্টারকে, অর্থাৎ একটা সমগ্রতার আত্ম-ঘোষণাকে।... কেবল জোরের সঙ্গে বলতে চায় 'আমি দ্রষ্টব্য'। তার এই দ্রষ্টব্যতার জোর হাবভাবের দ্বারা নয়, প্রকৃতির নকলনবিশি দ্বারা নয়, আত্মগত সৃষ্টিসত্যের দ্বারা। এই সত্য ধর্মনৈতিক নয়, ব্যবহারনৈতিক নয়, ভাবব্যঞ্জক নয়, এ সত্য সৃষ্টিগত। অর্থাৎ সে হয়ে উঠেছে বলেই তাকে স্বীকার করতে হয়।" আত্মগত সৃষ্টিসত্যের নিয়মে উপন্যাসকে হয়ে ওঠার, গড়ে তোলার, কর্মের প্রতিই আধুনিক উপন্যাসকার মনোযোগী।

বর্তমানের ক্ষয়িষ্ণু সমাজের বস্তুবোধ ও রুচির অভিব্যক্তি অত্যন্ত স্থূল; তা ছাড়া সাহিত্যের পাঠক-সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধির পথে। কিন্তু অধিকাংশ পাঠক যেমন কোন স্থির মূল্যবোধে আশ্রয়শীল নন, তেমনি মননশীলতায় উজ্জ্বল রূপসৃষ্টির সমাদর করতেও তাঁদের মন অভ্যস্ত হয় নি। তাঁদের মনোরঞ্জনের জন্য ইদানীংকালে একপ্রকার রচনার আবির্ভাব হয়েছে, যা যুগপৎ ভ্রমণকাহিনী ও গল্প, বা ভ্রমণ ও উপন্যাস। গভীর কোন সত্যের আলোকে আলোকিত হওয়া বোধ করি এদের উদ্দেশ্য নয়; তাই এদের চিত্তজয়ী কোন আবেদন আছে বলে মনে হয় না। এতে যেমন না থাকে উপন্যাসের পরিব্যাপ্ত স্বাদ, তেমনি থাকে না ভ্রমণ-কাহিনীর তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাসবোধের দীপ্তি—কেমন যেন কয়েক শো পাতায় ছড়ানো এক তরলতা। এই শ্রেণীর রচনার যেমন কালজয়ী কোন আবেদন নেই, তেমনি এর দ্রুত প্রসারে আতঙ্কিত হবারও কোন সঙ্গত কারণ দেখি না। অবশ্য, উপন্যাস যে মুহূর্তে আত্মগ্লানির লজ্জা অতিক্রম করে সদরদরজা পার হয়ে বাইরের পথে পা বাড়িয়েছে, তখন সামগ্রিক চেষ্টায় তাকে বিশ্বমুখী করার প্রচেষ্টাই রূপস্রষ্টাদের নিকট কাম্য।

হাল-আমলে যে কোনও রচনাই যে শ্রেষ্ঠত্বের সার্টিফিকেট কপালে নিয়ে বাজারে উপস্থিত হচ্ছে, তার কারণ বোধ করি সাহিত্যের মূল্যায়নের সুস্থ মানদণ্ডের অভাব। অথচ, বাংলা সাহিত্য যখন সৃষ্টির প্রাচুর্যে অজস্র সম্ভাবনায় আপনাকে প্রায় নিঃশেষ করে দিচ্ছে, তখনই প্রয়োজন সুস্থির মানদণ্ডের। রূপের ক্ষেত্রে—সেটা সাহিত্যসৃষ্টিই হোক অথবা অন্য কোন চারুশিল্পই হোক মানুষের যা সৃষ্টি তা তার অন্যবিধ কর্মের তুলনায় কালজয়ী। তাই, রূপের একটি নিজস্ব, স্বতন্ত্র, আলোয় উচ্ছ্বসিত জগৎ কল্পনা করা সম্ভব, যেখানে যুগযুগান্তরের সমস্ত সার্থক সৃষ্টিই একই সঙ্গে অস্তিত্বশীল; সেই জগতে উন্নীত হয়ে বাংলা উপন্যাস রুশ উপন্যাসের সঙ্গে, অথবা ফরাসী উপন্যাসের সঙ্গে, সহ-অস্তিত্বশীল হতে পারবে কি না, সার্থক মূল্যায়নের ভিত্তিতে সে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। রূপকর্ম কি বৈশিষ্ট্যে আলোকিত হলে সেই সৌন্দর্য-বিশ্বে প্রবেশাধিকার লাভ করে, শিল্প-সমালোচনা সেই মানের নির্ণায়ক। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, তদ্রূপ শিল্পমান আমাদের বাংলাদেশে আজও পর্যন্ত নির্ণীত হয়

নি; হয় নি যে তা যে-সব গ্রন্থের বাজার-কাটতি অত্যধিক অথবা যে-সব উপন্যাস সম্প্রতিকালে রবীন্দ্র-পুরস্কার বা অ্যাকাডেমি পুরস্কার পেয়েছে তা থেকেই প্রমাণিত হবে।

অর্থাৎ, বাংলা উপন্যাসের বিদগ্ধ পাঠকসমাজ আজও অস্তিত্বহীন। বাংলা উপন্যাসকে যদি ইয়োরোপের সীমায় পৌঁছে দিতে হয়, তা হলে তার পূর্বসর্ত হিসেবে বিদগ্ধ পাঠকসমাজের আবির্ভাব সম্ভব করে তুলতে হবে। সেই পাঠকই উপন্যাসকে মহৎ সৃষ্টির পথ দেখাবে—যেখানে ব্যক্তিবিশেষ নয় মানুষ, ব্যক্তিক দুঃখবেদনা নয় মানবিক সুখদুঃখবেদনা।

উপন্যাস শুধুমাত্র গল্প-বলা গদ্য নয়, মানব-জীবনের গদ্য। এই গদ্যের লক্ষ্য, মানবজীবনকে ইতিহাসের প্রেরণায় স্থানকালের সমগ্রতায় গ্রহণ করা, এবং গ্রহণ করে তাকে রসের প্রাণ দেওয়া। অন্য শিল্পকর্মের তুলনায় তার উল্লেখনীয় বৈশিষ্ট্য হল, সে মানুষের অন্তরজীবনকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্যরূপে প্রকাশ করতে চায়, অন্তরকে বাইরের সম্পর্কে ধরতে চায়। এখানে ব্যক্তি তার অন্তরসম্পদ নিয়ে প্রকৃতি-পরিবেশ, সমাজ-পরিবেশ এবং সমাজেরই অঙ্গাবরণ ভাব-পরিবেশে, সংস্থাপিত হয়, এবং বিচিত্র ঘাত-সংঘাতের ভিতর দিয়ে বিকশিত হয়ে ওঠে। সুতরাং, উপন্যাসের বস্তুবোধ, তার জগৎ, তার বিশ্ববোধ কাব্য-নাটক-সঙ্গীতের জগৎ থেকে পৃথক। অন্যান্য শিল্পের জীবনরূপায়ণ থেকে এর জীবনরূপায়ণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; তার বিস্তৃতি বিপুল কিন্তু গভীর।

বলা বাহুল্য, বাংলা উপন্যাস সেই বিপুলতা সেই গভীরতা আজও অর্জন করে নি, অর্জন করার সম্ভাবনা সবে দেখা দিয়েছে মাত্র। প্রবন্ধের শুরুতেই শরৎচন্দ্রের যে উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে তাতে তিনি সব মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের সাহিত্যে জীবন্ত করে তোলার মধ্যে মহৎ সাহিত্যের আবির্ভাবের আশা প্রকাশ করেছেন। অবশ্য দুঃখতাপসহা মানুষকে উপন্যাসের পাতায় স্থান দিলেই তা মহৎ হবে, এমন কোন কথা নেই, যদি না রূপকর্ম নিপুণ হয়। অন্য পক্ষে এও সত্য, উপন্যাসের প্রাঙ্গণ থেকে মানবিক আকৃতি, তীব্র অনুভূতি ও দুঃখবেদনার জ্বালা কোন মতেই বাদ দেওয়া চলে না। কালের বেদনা ও পরম্পরা আমাদের অনেকের নিকট দুঃসহ বলে মনে হতে পারে, তেমনি মানুষের প্রতিও আমাদের অপরিসীম ঘৃণার কারণ থাকতে পারে। কালকে জয় করার, তার উর্ধ্বে ওঠার, তাকে কার্যতঃ অস্বীকার করার চেষ্টা যদিও বা করা চলে, যেমন করে থাকেন যোগীরা বা যেমন করেছিলেন এ যুগের গোড়ার দিকে ইউরোপ আমেরিকার কোন কোন ঔপন্যাসিক (গারট্রুড্ স্টেইন, জেমস্ জয়েস প্রভৃতি), কিন্তু মানুষকে উপন্যাসের প্রাঙ্গণ থেকে কোনক্রমেই বিসর্জন দেওয়া চলে না। যদি দেওয়া হয় তো বন্ধ্যা আকাশে নিস্পন্দ বায়ুগর্ভ কথার ফানুস ওড়ানো হবে শুধু।

এ কারণেই শরৎচন্দ্রের অত্যন্ত পীড়াদায়ক তরল ভাবপ্রবণতা এবং হৃদয়রসও আমাদের সহ্য হয়, কিন্তু মানবিক বোধের অভাবে ক্লিষ্ট কাহিনীর বিবরণপাঠে মন বিদ্রোহ করে; পশু-আমির পীড়নে ক্লান্ত হয়ে মানুষ-আমি বিদ্রোহ করে। আমার বিশ্বাস, এই সত্য একালের ঔপন্যাসিকদের চৈতন্যে যেমন উদ্ভাসিত নয়, তেমনি মননশীল প্রজ্ঞার দীপ্তির অভাব তাঁদের মানব-অভিজ্ঞতার অভিনব দিগন্তে অগ্রসর হতে দুঃসাহসী করছে না।

শরৎচন্দ্রের স্বপ্নকে যদি সার্থক করতে হয় তো নতুন বন্দরের দুর্গম পথে বাংলা উপন্যাসকে অবশ্যই যাত্রা করতে হবে।

নূতনত্ব

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

কবিতা হইতে অতি সহজেই
বাদ দেওয়া যায় ছন্দ,
গীতের সঙ্গে কিবা দরকার
বাদ্যটা কর বন্ধ।
নৃত্যেতে কেন বৃথা হিল্লোল?
লাফাও, ঝাঁপাও, দেবে দাও দোল,
চিত্রে কেবল রেখাই থাকুক—
রবে না রঙের গন্ধ।

২

কালে কালে শুধু হতেছে কৃষ্টি
একঘেয়েমিতে পূর্ণ,
কালাপাহাড়ের কুঠার চালায়ে
করিতে হইবে চূর্ণ।
এই যে হরফ, এই যে বানান—
বড় একঘেয়ে, বড় বেমানান,
এর বনিয়াদ যাক বরবাদ
সংস্কার হোক তূর্ণ।

৩

এখনো—এখনো মেয়েরা পরিবে
হার চুড়ি বালা দুল্‌ কি?
অলঙ্কারের বদলে চলুক
এখন আবার উল্‌কি।
সাড়ী শাড়ি পরা হল বহুদিন
ফেরানীর পুনঃ আসুক সুদিন
ভাঙিবে না হায়, রহিয়া যাবেই
একঘেয়েমির ভুল কি

৪

কত দিন হল—চলিয়া আসিছে—
একঘেয়ে সব খাদ্য,
চাল কেন? খাও ঘাস ও বিচালী,
খাইবারে কর বাধ্য।
দুধ খাইয়াছ—খাওনা গোবর,
সেই তো গব্য সবার উপর।
সার লয়ে কর নব কারবার
যার যতটুকু সাধ্য।

৫

সেই যে আদিম প্রণয়ের ধারা
বদলায় নাই বিন্দু,
একই ভাবের সৃষ্টির ধারা
অটুট রয়েছে কিন্তু।
কিছু বদলাতে কিছু বাদ দিতে,
হবেই হবেই নূতনে তুষিতে,
সজল করিতে হবে মরুভূমি
শুকাইতে হবে সিন্ধু॥

●

নিমগাছ

শ্রীকালিদাস রায়

বড়ই মিঠা হ'লো যে নিমপাতা,
নিমের ফুলের গন্ধ পেলে
চম্‌কে উঠে চাই।
পথে যেতে গুটিয়ে নিয়ে ছাতা
একটুখানি জুড়াই, যদি
নিমের ছায়া পাই।
মনে পড়ে নিরিবিলি
তালপুকুরের ধার,
বনে ঘেরা ঘাটে সে নিমগাছ।
ঝিকিমিকি বিকালবেলা
ছায়ার তলে তার
ছিপটি ফেলে বসে থাকা,
ধরছি যেন মাছ।
চন্দনে নিম পরিণত,
মিষ্ট নিমের পাতা।
কেন? শুধু তুমিই জানো
অন্যে জানে না তা'॥

●

ভেট-তত্ত্ব

গোপাল ভৌমিক

ভেটের উপর চলেছে দুনিয়া
ভোটের উপর নয়,
ভালমত ভেট পারবে যে দিতে
হবে তার হবে জয়।
ভেট মানে শুধু টাকা বা পয়সা
ভাবে যদি কেউ মনে
যীশু না হলেও সে জন যে শিশু
বুঝে নেবে গুণীজনে।
চোখে দেখা যায় দেখাও যায় না
এমন অনেক ভেট
আছে যদি বলি, শুনে অনেকের
মাথা হতে পারে হেঁট।
দেবতা তো এক, ভক্ত অনেক,
ভেটের রকমফের
তাই প্রতিদিন হয় বলে দেখি
নানান রকম জের।
ফুলবেলপাতা দুধকলা ভেট
এ-যুগের রীতি নয়
শ্রীমুখের বাণী শুনে গদগদ
হলে তার হবে জয়।
কূটনীতিবিদ অনেকে আবার
দেয় শুধু হাসি ভেট,
হাসির ছররা খেয়ে ফেটে যায়
যাক অপরের পেট।
আর একদল ভেট দিতে পারে
কথার তুবড়িবাজি—
প্রভাব এড়িয়ে যাবে দূরে সরে
কে এমন আছে গাজী ?
সময়মতন কাজ ভেট দিয়ে
কেউ চায় ফল পেতে—
ততটা ফসল জোটে না যদি বা
মাটি থাকে পুড়ে তেতে।
ভেট দিতে যারা জানে না তাদের
গা জ্বালাই শুধু সার—
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে যে, খঞ্জ
হয়ে যায় গিরি পার॥

বুদ্ধিবিত্ত

অসিতকুমার

ফার্স্ট স্টেজ

[প্রথম প্রহরে প্রভু···ইত্যাদি বাংলা প্রবচন]
হৃদয় বেকার। বিকল চিত্ত
আজ বাড়ে কফ কালকে পিত্ত
কফিহাউসের চাতালে নিত্য
বসে আমাদের বুদ্ধিবিত্ত।

* * *

কার মস্তকে বুলিয়ে হস্ত
ভাগ্যের পথ হবে প্রশস্ত
এই চিন্তাই জবরদস্ত
চারিদিকে চাবি আঁটা।

হায় সিনেমার সে কোন্ লাইনে
মওকা মিলবে। ঠিকানা পাই নে

যে দিকে তাকাই বাঁয়ে কি ডাইনে
বড় বড় ঢেরা কাটা।

অ্যাড্‌ভান্সড্ স্টেজ

কতকাল আমি ছেড়েছি আড্ডা, ইয়ার্কি ইত্যাদি,
বুশশার্ট ছেড়ে ধরেছি অঙ্গে অধ্যাপকীয় খাদি।
মাঠের মৌটিঙে খাই নে বাদাম, পুড়ে পুড়ে ঠাঠা রোদে,
মাঝে মাঝে শুধু সিনেমায় যাই, শ্রীমতীর অনুরোধে।
সন্ধ্যাবেলাটা বাড়িতেই কাটে। রাস্তায় বড় কাদা।
ছেলেপুলেদের উপদেশ দিই। বিপদে পড়লে চাঁদা॥

রেনিগেড

"কোন স্বর্গবঞ্চনার পাতকে সে পলাতক···ইত্যাদি"
—প্রেমেন্দ্র মিত্র

বিষণ্ণ বোসের নাম শুনলাম সেদিন আবার
কলেজে বিষণ্ণ ছিল অত্যন্ত নিপুণ এক ছেলে
এহেন বিষণ্ণ নাকি ডুবিয়েছে নামটি বাবার
কাকে যেন বিয়ে করে বনে গেছে বেদম সেকেলে।
ফরাসী কবির বই হাতে নিয়ে অতি অবহেলে
কফির পেয়ালা কোলে বলেছে সে ইজমের নাম
এখন সে সারাদিন আপিসে কলম ঠেলে ঠেলে
ঘরেতে ঘুমোয় এসে। মননের এই পরিণাম॥

হাত-ঘড়ির গান

সন্তোষকুমার দে

হাতে হাতে সব হাতঘড়ি বাঁধা
হাতকড়িরই তা নামান্তর,
চলে দিন রাত নিরন্তর—
—টিক্ টিক্ টিক্, টিক্ টিক্ টিক্॥

ভয়ে আড়চোখে চুপি চুপি দেখি
কাঁটা ঘুরে যায় কোন্ দিকে
মনে মনে জানি বন্দী কে,
খাঁচার পাখির মত পাখা ঝাপটাই
কানে তবু শুনি সেই স্বর—
—টিক্ টিক্ টিক্, টিক্ টিক্ টিক্॥

প্রভাতের আলো আগুনের মত
ঝিলিক মারিয়া যায় কাচে,
দুপুরেও ঘড়ি হাতে আছে।
সারাদিন ধরে করি ছুটাছুটি
মাথা কুটি নেই অবসর।
—টিক্ টিক্ টিক্, টিক্ টিক্ টিক্॥

রাতের তিমিরে যদি ঘরে ফিরে
কিছুখন চাই বিশ্রাম
তখনও চলে ঘড়ি, চলে অবিরাম,
আর তার সাথে ভেসে চলে যায়
সোঁতে ভাসা জীবনপ্রহর—
—টিক্ টিক্ টিক্, টিক্ টিক্ টিক্॥

●

পাগ্‌লা-গারদের কবিতা

[কয়েকজন বদ্ধ-পাগলের অর্থহীন কল্পনা চুরি করিয়া বিরচিত]

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

একটি কুকুরের কাহিনী

শহরের রাজপথ। ঝাঁ ঝাঁ রোদ। গরম দুপুর
হেথায় হোথায় আহা জলের কলের কালো গায়ে
জল শুঁকে শুঁকে ফেরে বৃথা এক তৃষ্ণার্ত কুকুর,
পায় না জলের গন্ধ; পিচের গরম লেগে পায়ে
ফোসকা প্রায় পড়-পড়, কিন্তু তবু পড়ে না পড়ে-ও
পড়িবে ইহার পায়ে? ছি ছি, এ যে তুচ্ছ সারমেয় !!!

*　　*　　*

হায় সরমার পুত্র, তোরও কি তৃষ্ণায় ছাতি ফাটে?
কিন্তু তোরে কে দেবে সরবৎ কিংবা রেফ্রিজারেটার থেকে
জল?
সঙ্গীহীন পদাতিক, এত যে ঘুরিস পথেঘাটে,
করে কি কেয়ার কেহ? তুই তোর আপন সম্বল,
আপন নির্ভর রে কুকুর! তোর মিছে ফরিয়াদ;
বেদরদী বিধাতার পেয়েছিস রুদ্র আশীর্বাদ।

*　　*　　*

তৃষ্ণার্ত কুকুর তবু দুরন্ত তৃষ্ণার কথা ভাবে,
কল থেকে কলান্তরে নাক দিয়ে শুঁকে শুঁকে চলে।
ভাবি নারিকেল যথা সুপ্ত হয়ে থাকে ডাবে ডাবে;
কিংবা বহু ফুল যথা পরিণাম খুঁজে মরে ফলে;
চীনে রেস্তোরাঁয় যথা রেস্ত ফোঁকে, নয়ন করুণ,
আদ্দির পাঞ্জাবি গায়ে হাড্ডিসার বাঙালী তরুণ।

*　　*　　*

কুত্তার তৃষ্ণার্ত চোখে সাইন-বোর্ড-প্রতিবিম্ব জাগে:
"চৈনিক ধোলাইখানা।" কুত্তা-চিত্তে জাগে কৌতূহল;
চীনের ধোলাই ধীরে বাংলায় নবীন অনুরাগে
পাতিছে আসন। আহা, এত প্রেম হবে কি বিফল?
কায়েম হয়েছে জুতো, এবার ধোলাই হবে তাই।
পিয়াসী কুকুর একা কেঁদে ফেরে "জল কোথা পাই?"

*　　*　　*

ওপাশে কলেজ এক, ছাত্রদল গিশ্‌গিশ্‌ করে
বিদ্যার বাজারে যেন। মনে হয় মৌমাছির চাক,
মধু নয়, ঝোলাগুড়ে ঠাসা; যেন কাটখোট্টা ঝড়ে
মলয়ের মৃদু সুর ডুবে গেছে, জেগে আছে পাঁক।
ও যেন কসাইখানা, ঠুলি চোখে পরেছে সবাই;
কত ভবিষ্যৎ হোথা বর্তমানে হতেছে জবাই।

*　　*　　*

কলেজ পিছনে ফেলে সারমেয় হয় অগ্রসর,
তৃষ্ণায় আকণ্ঠ ভরা, ঠোঁট দিয়ে জিভ চেটে চেটে।
সহসা সম্মুখে তার দেখা দেয় মস্ত ছবিঘর,
তারি পাশে আবহাওয়ায় উত্তেজনা পড়িতেছে ফেটে।
ম্যাটিনী টিকেট তরে ফুটপাথের 'পরে দণ্ডবৎ
ঝাঁ ঝাঁ রোদে প্রতীক্ষিছে বাংলার বহু ভবিষ্যৎ।

*　　*　　*

রঙীন পোস্টারে এক স্বচ্ছ-স্বল্প-বসনা উর্বশী
লোলুপললিতলাস্যে চিৎ-শয়নে শায়িতা সোফায়;
নীরবে সে যেন কহে, "আঁখি কেন রেখেছ উপোসী?"
কটাক্ষ-কোদাল দিয়ে বহু চিত্ত যেন সে কোপায়,
ইঙ্গিতে ইশারা করে "ভুলে গিয়ে ছোড়্‌দায় বড়্‌দায়
চলে এস ধন্য হতে মোরে দেখে রুপালী পর্দায়।"

*　　*　　*

অদূরের বিপণিতে পণ্য বহু রুপালী পত্রিকা
রুপালী পর্দার বহু নট-নটী চিত্র-সম্বলিত;
কি খান পরেন তাঁরা তারি বহু বিচিত্র তালিকা
রুপালী পত্রিকা-পাতা হতে হয়ে গোগ্রাসে গিলিত

অনেক সবুজ চিত্ত করে আহা আরও যে সবুজ—
জল খুঁজে খুঁজে ফিরে বোঝে না সে কুকুর অবুঝ।

*　　*　　*

সে পড়ে না রূপালী পত্রিকা, তাই জানে না খবর
চলচ্ছবি দুনিয়ার, নাহি জানে হালচাল তার।
(হায় রে কুকুর!　বল্ তোর ভাই এ কি শাপে বর?
কিংবা তার বিপরীত?　ওরে, এ যে বিচিত্র সংসার
যেথা মোরা করি বাস, অথবা বাসের অভিনয়
ক্ষীণভিত্তি ক্ষুদ্র ঘরে চিত্ত ভরা নিয়ে নিত্য ভয়।)

*　　*　　*

কুকুর পড়ে না গল্প, রম্য-রচনা বা উপন্যাস,
কিংবা চিত্র-তারকার বকলমে লেখা আত্মকথা;
নাহি বোঝে রাজনীতি; কি নিয়ে কাটায় বারো মাস
সেই জানে; আনমনে ল্যাজ নেড়ে ঘোরে যথাতথা,
কভু ঘেউ ঘেউ করে, কখনও বা একেবারে চুপ,
চতুষ্পদী চোখে দেখে দুইপদী পৃথিবীর রূপ।

*　　*　　*

হোথায় বেতার-যন্ত্রে বাজে বাংলা আধুনিক গান
সকরুণ থরথর নাকীস্বরে মড়াকান্নাসম।
বাংলার সঙ্গীত আহা হয়েছে কি হেন ক্ষীণপ্রাণ?
রে ভাগ্য-বিধাতা, তুই কেন এত হলি রে নির্মম?
সঙ্গীতে, সাহিত্যে, শিল্পে কোথা গেল সে মর্দানা সুর?
কোথা সেই দৃঢ় ঋজু মেরুদণ্ড?　জানে না কুকুর।

*　　*　　*

যা ছিল সোনার বাংলা, পেতলের হয়ে যাবে তা কি?
অথবা সীসের?　আহা কে রুখিবে দ্রুত নিম্নগতি
বাংলার তরুণ বিনে?　জাগিতে এখনও কত বাকি
ওরে কুম্ভকর্ণ জাতি?　খেয়েছিস যে লাথি সম্প্রতি
সে শুধু কলির সন্ধ্যে, সুক্ত যথা ভোজনের আগে;
সে-ই বুদ্ধিমান ওরে প্রথম লাথিতে যেবা জাগে।

*　　*　　*

এখনও রুখিয়া দাঁড়া তোর সর্ব প্রাণশক্তি নিয়ে,
ঘরোয়া কোন্দল ভুলে, রে দুর্ভাগা কোপঠাসা জাতি!
হাতী যদি খাদে পড়ে, অনেকেই যায় লাথি দিয়ে,
মরে না সে জাত তবু যে জাত না হয় আত্মঘাতী।
যদিও সম্মুখে কালো অসংখ্য দুস্তর বিঘ্ন বাধা,
তবুও দুর্গম পথে আলোর সাধনা হোক সাধা।

*　　*　　*

ওগো কথাশিল্পীদল, দোহাই দোহাই তোমাদের,
পিঁয়াজ রসুন দিয়ে পচা মাল চালায়ো না আর।
তরুণ-বখানো লেখা মহানন্দে লিখেছ তো ঢের;
লেখনী সংযত কর, আর দফা সেরো না বাংলার।
যদি পার সে সাহিত্য সৃষ্টি কর লেখনীর আগে,
নবজীবনের মন্ত্রে বাংলার তরুণ যাতে জাগে।

*　　*　　*

জাগাতে না পার যদি, অন্ততঃ তাদের বখায়ো না;
আপনার স্বার্থে জাতি-মেরুদণ্ডে ধরায়ো না ঘুণ।
বাংলার সবুজে আজও আবাদে ফলিতে পারে সোনা,
সেথায় ছড়ায়ে ঘুঁটে ওগো বন্ধু দিও না আগুন।
মুমূর্ষু জাতিরে দিতে তোমরাই পার নব প্রাণ
যদি বোঝ হাতে থাকা লেখনীর দায়িত্ব মহান্।

*　　*　　*

কিন্তু একি?　একেবারে ভুলে গেছি কথা কুকুরের!
চলে সে জলের খোঁজে পিচ ছেড়ে ফুটপাথ বেয়ে
দুপুরেব ঝাঁ ঝাঁ রোদে; কি তফাত মধু ও গুড়ের
জানে না বেচারা আহা, শুধু ছল ছল চোখে চেয়ে
কুকুরপ্রেমীর উক্তি ভাবে বুঝি মুখ করে কালো:
"মানুষেরে যত চিনি, কুকুরেরে তত বাসি ভালো।"

*　　*　　*

শোন্ রে কুকুর ভাই, এ কি, তোর চক্ষে কেন জল?
জল খুঁজে খুঁজে কি রে জল দেখা দিল তোর চোখে?
মুছে ফ্যাল চক্ষু ওরে, অশ্রু নয় পথের সম্বল।
ও দেখে তৃষ্ণার জল দেবে না দেবে না কেউ তোকে।
যত হোক ঝাঁ ঝাঁ রোদ, যত হোক গরম দুপুর
জল না মিলিবে তবু হায় ওরে তৃষ্ণার্ত কুকুর॥

কুয়াশা

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

আজি বিশ্বপ্রকৃতি অবগুণ্ঠনে, চাহে না নয়ন মেলি
তার অঙ্গে অঙ্গে জড়ানো রয়েছে ধূসর কুয়াশা চেলী!
যেন দীর্ঘশ্বাসের বিক্ষোভে কোন্ হতাশা দুর্নিবার
এই নিখিলের বুকে টানে নিষ্ঠুর আবরণ বারে বার!
আজি জেগে ওঠে তবু রুদ্ধ পরাণে মগ্ন-চেতনা মাঝে
শত বঞ্চনাভরা মর্ম-আরতি কল্পনা-রূপ সাজে!

মোরা অতীতের স্মৃতি-বন্দনা-গানে রহিয়াছি তন্ময়,
কবে বিজয়সিংহ-বিজয়বাহিনী করিল লঙ্কা জয়।
কবে দীপঙ্করের জ্ঞানের গরিমা প্রাচী দিগন্তে জ্বলে,
আর সোনার ভারত লাগিয়া জগৎ চেয়েছিল কুতূহলে!
সেই অতীতের গীতি, অতীতের গাথা অতীত-গর্ভে থাক্,
আজি নূতন জগতে নূতন দিশায় এল 'নূতনের ডাক'।

আজি আঁখি মেলি যবে চাহিবারে চাই জীবনের চারিধারে,
ঘন কুয়াশার ঘোর পৃথ্বীর কোলে নেমে আসে চুপিসারে!
একি কু-আশায় মাতি মানুষে মানুষে বিভেদ প্রাচীর তোলে
একি ভ্রান্ত নেশার কুহকে ভুলিয়া আশা-তরঙ্গে দোলে!
প্রাণে বিন্দু বিন্দু ম্লান কুহেলিকা রয়েছে জমাট বেঁধে,
তাই মনের আকাশে কুণ্ঠিত এক প্রার্থনা ওঠে কেঁদে।
নীচে কর্মসিন্ধু কল্লোলি ওঠে আঁধারে আত্মহারা—
বুঝি জ্যোতিহীন পথে গতিহীন প্রেম ফুঁসিছে পাগলপারা।

একি কঠিন নিয়তি জাতির ভাগ্যে নীরন্ধ্র আঁধিয়ার
তাই দুর্জয় যত সংগ্রাম শত ভেঙে পড়ে চারিধার!
বল, কোন্ অভিশাপে দুর্যোগ আসি করে সব খান্ খান্—
হয়, শুভ-কল্যাণ-ব্রতের সাধনা নিঃশেষে ম্রিয়মাণ।
তাই মৃত্তিকা আজি ধরে নাকো বুকে পূর্ণ শস্য-ডালা,
কূলে বহতা নদীর জলে রহে না যে স্নেহের পরশ ঢালা।
আজি বন-বৈভব হারায়েছে তার অন্তর সুষমায়—
তার পাতায় পাতায় মর্মর-ধ্বনি কম্পিত নিরাশায়।

আজি জনপদে যত সম্পদ তবু বঞ্চিত জনগণ,
এই জ্ঞানের দুয়ারে অবরোধ রচি বিভেদের আয়োজন!
তবু সাম্যবাদের মর্ম নিঙাড়ি সবারে বাঁধিতে চায়,
মায়ামরীচিকাসম হাতছানি দিয়ে দুস্তর সাহারায়।

তুলি অহঙ্কারের কুহেলী-প্রাচীর করিয়ে সমাজ-সেবা,
যদি গণদেবতায় করি আবেদন, শুনিতে চাহিবে কেবা?
এ যে সর্বনাশের সাধনা চলেছে, মৌলিক অধিকারে
জানি, সবাই ঘুরিছে আপন কক্ষে, আর কে ফিরাবে তারে!
তাই মনঃসাধ আর মতবাদে জাগে দুর্বোধ ব্যবধান—
নিয়ে বুকে ক্রূর হাসি, মুখে ভালবাসা-অভিনয়-অভিমান।
তাই কু-ঝটিকা আসি কুজ্ঝটিকায় ঢেকে দিল দশ দিক,—
সেথা ভিন্ন দলের ছিন্ন গর্ব চাহিল নির্নিমিখ।

আজি ভাবের কুয়াশা, ভাষার কুয়াশা, কর্মের কুয়াশায়
এই লোকধর্মের স্বচ্ছতা কেন কুয়াশায় ডুবে যায়!
তাই ক্ষুব্ধ প্রাণের অবরোধে কাঁদে শৃঙ্খলে বাঁধা মন—
এই মৃত্যুগহনে, কে করিবে বল, জীবনের আবাহন!

তবু আশার আলোক-বিন্দু জ্বলিছে মানস-কল্পনায়,
চির-চঞ্চল সে যে আবেগোচ্ছল জাগ্রত মহিমায়,
তার আদি নাই তার শেষ নাই কভু, সৃষ্টি-বহ্নি সে যে,
নিতি মূর্ছনাভরা সঙ্গীত তার অণুতে উঠিছে বেজে!

তারি স্পন্দন-লীলা তারায় তারায় আকাশে বাতাসে জাগে,
সে যে চিরন্তনের অভিসারে চলে অসীমের অনুরাগে।
তবে একদা বুঝি বা অতীন্দ্রিয়ের পূর্ণ পরশ মাগি
এই স্তব্ধ নিথর কুহেলিকা ভেদি জীবন উঠিবে জাগি॥

কবি ও সন্ধ্যা

শ্রীকৃষ্ণধন দে

গোধূলি শেষ, সন্ধ্যা যেন সেজেছে রূপজীবা,
মাথায় তারা-কনকচূড়া রূপালী বাঁকা চাঁদ,
হিমেল ছায়া-আঁচলে তার ঢেকেছে চারুগ্রীবা,
বেণীতে নিশিগন্ধা ফোটে, নয়নে অবসাদ।
চলিতে পথে শুধাম্নু হেসে—"কেন এ সাজ তব,—
কাহার তরে এ রূপ অভিনব ?"
বাতাস-কাঁপা কাননে তুলি সুরের প্রবাহিনী,
"তোমারি তরে"—বলিল হেসে সন্ধ্যা বিলাসিনী।

মাঠের তৃণগন্ধ আসে, দীঘির কাঁপে জল,
উতলা বায়ু আছাড়ি পড়ে কদমকেয়া-বনে,
বিটপীশাখে ভুলেছে পাখি কূজন-কোলাহল,
দিনের শেষে তন্দ্রা নামে ক্লান্তিভরা মনে।

অবাক চোখে সন্ধ্যাপানে চাহিয়া ধীরে কহি—
"কাহার তরে সেজেছ রূপময়ি ?"
সহসা মোর মাথার 'পরে পড়িল ফুল ঝরি
"তোমারি তরে"—বলিল হেসে সন্ধ্যা জাদুকরী।

আকাশে ধীরে ফুটিছে তারা, বাতাসে মাদকতা,
বিজন পথধূলিতে আলো-ছায়ার আলিপনা,
দেউলে কোথা শঙ্খরবে টুটিছে নীরবতা,
নদীর তটে জোছনা দেয় ছড়ায়ে মণিকণা।
শুধাম্নু হেসে—"কাহার তরে রূপের দীপ জ্বালো ?
কাহারে বল, বেসেছ তুমি ভালো ?"
ঝিল্লীরবে বাজায়ে মৃদু কাঁকন-রিণিরিণি,
"তোমারে কবি"—কহিল হেসে সন্ধ্যা মায়াবিনী॥

●

সম্ভাবনা

অমূল্যকুমার চক্রবর্তী

বহুক্রোশ পার হয়ে কোন দ্বীপে ক্লান্ত পাখি ফেরে,
সাগরে ডানার ছায়া! এ সাগর আমার মনের
মিতালি পাতিয়ে বুঝি অতলান্ত নীলসিন্ধু সনে
সর্পফণা শঙ্খচূড় তীরে বসে লক্ষ ঢেউ গনে।

কত নদী মোহনার কূলভাঙা উত্তাল জোয়ারে
স্বপ্ন-বুকে সাগরের ঢেউগুলি যেন দীর্ঘশ্বাস
অফুরন্ত আন্দোলন। এ বিপ্লব কেন, কি হারিয়ে ?
কি চেয়েছে মনে নেই সূর্যময় আকাশে তাকিয়ে।

প্রলয় তুফান কালবৈশাখীতে সে তাই কি চায় ?
তারাজ্বলা নীলাকাশ কোটি কোটি স্বপ্নচক্ষু মেলে
সহস্র বছর ধরে চেয়ে আছে।
মৃত্তিকার দ্বীপ
অঙ্কুরের মত আজ দেখা দিল নিষ্পাপ নতুন॥

●

গোচর

অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

পায়ে ফোঁটে চষা মাটি
বোশেখের রোদে ঝামা ইট,
তবু ভাল লাগে—
মাথায় গামছা ঢেকে
মন্থরগতিতে মাঠে চলা ;
সূর্যের আগুনে পুড়ে
মরে কত সাময়িক কীট ;
ছক-কাটা দাগে
আবার এগিয়ে যাওয়া,
তেষ্টায় শুকিয়ে ওঠে গলা।

স্নেহের সবুজ নেই
বাবলার বিশুষ্ক শাখায়,
তবু ভাল লাগে—
ওর কাছে চেয়ে নিতে
পাণ্ডুর একটুখানি ছায়া ;
জিভ দিয়ে জমি চাটে,
মাঝে মাঝে ভীরু চোখে চায়
আশেপাশে আগে
একটি নিরীহ জীব ;
দেখে কি হয় না বল মায়া॥

●

ছায়ামুখ

সলিল মিত্র

হৃদয়ে যা আঁকা আছে সে তো জানি তব মুখছবি।
স্মৃতিরাও নিত্যসঙ্গী। মন-পথে পায়ে পায়ে চলে,
নামে কি বা আসে যায় ঋতুপর্ণা না হয় মাধবী,
তুমি শুধু তুমি থাক : সূর্যমুখী নাই যদি হলে!
আমার ক্রন্দসী তৃষ্ণা কেঁদে ফেরে বেহাগের সুরে,
কামনাকে কেন্দ্র করি মন মোর হয় জ্যামিতিক—
রোমাঞ্চিত উজ্জীবন হৃদয়ের অন্তর্দেশ জুড়ে—
প্রমত্ত উদ্দাম আশা রক্তে নাচে আদিম নির্ভীক।

সূর্যমুখী মন নয় : সন্ধ্যার মালতী-মন চাই ;
তোমাকে বিস্ময়ে ভাব ফাগুনের স্তিমিত বেলায়-
প্রত্যাশার মূর্ছনাতে এ মনের অনেক কথাই
তোমার কবোষ্ণ বুকে গান হয়ে ঝরে যেতে চায় ;
বর্ণালী বিস্ময়ে শুধু চেয়ে থেকে খুশিয়ালি মন
দর্পণের প্রতিবিম্বে ছায়ামুখ করে অন্বেষণ।

●

জন্মদিন

মন্মথ রায়

[একাঙ্ক বিচিত্রা]

—আজ তোমার জন্মদিন।

—ও, তুমি এসে গেছ?

—প্রত্যেক জন্মদিনেই আসি।

—ভাগ্যিস তোমাকে কেউ দেখতে পায় না। শুনতে পায় না কেউ তোমার কথা। তাই রক্ষে। নইলে জন্মদিনে মৃত্যুর দেবতা তুমি আমার পাশে বসে আছ। সবাই আঁতকে উঠত।

—এ দিনটিতে তোমাকে যারা ভালবাসে, তারাই আসে তোমার কাছে। আমিও তাই এসেছি। তারা তোমাকে চায়। আমিও তোমাকে চাই।

—হ্যাঁ, ঠিক। তারা আমাকে চায়। তারা আমাকে দিতে চায়। তুমি আমাকে চাও। তুমি আমাকে নিতে চাও।

—বটেই তো। তাদের দেওয়া যখন ফুরবে, তখনই আমি তোমাকে নেব। জান তো, নিঃস্ব আর কাঙালের উপরেই আমার লোভ। হ্যাঁ, একজনের যখন কিছুই থাকে না, কিছুই রইল না, তখনই আমি তাকে বুকে টেনে নিতে পারি। তার আগে নয়। তাই প্রতি জন্মদিনে আমি ছুটে আসি দেখতে, তোমার এখনও কি আছে।

—কিন্তু এখনও তো আমার সবই আছে।

—হ্যাঁ আছে। স্ত্রী আছে। পুত্র কন্যা আছে। বন্ধু আছে। প্রচুর আত্মীয়স্বজন রয়েছে। কিন্তু তাদের নিয়ে গর্ব করবার মত এখনও তোমার কিছু আছে কি? তা যদি না থাকে তবে তো তারা থেকেও নেই।

—চুপ। আমার স্ত্রী আসছেন।...এস গো। দেরি কেন?

—স্নান সেরে পুজো করে এলাম। কই, পা দুখানি কই? প্রণাম করি।

—এতকাল ঘুম থেকে উঠেই এই দিনটিতে সবার আগে আমাকেই করতে প্রণাম।

—এতকাল তোমাকে ছাড়া আর কাউকে জানতাম না। তুমিই ছিলে আমার একমাত্র ইষ্ট! দীক্ষা নেবার পর থেকে জেনেছি, ওটা মায়া। জগৎটা, সংসারটা সচ্চিদানন্দের। তুমি আমার সেই সচ্চিদানন্দের দান, তোমাকে প্রণাম করে তাঁকেই প্রণাম করছি আজ।

—নতুন কথা শুনছি গো।

—গুরু বলেছেন, এইটাই একমাত্র সত্য। আজ এই দিনটিতে তাঁকে আসতে বলেছিলাম, তিনি এসেছেন। যাই, তাঁর ভোগের আয়োজন করতে দেরি হয়ে গেছে।

—কিন্তু আমাকে সকালের ওষুধটা দিতেও দেরি করে ফেলেছ সুরমা।

—এই যাঃ! ওষুধটা ফুরিয়ে গেছে। আনাই হয় নি। আচ্ছা, আমি আনাচ্ছি।

* * *

—কি বুঝছ?

—হ্যাঁ, বুঝছি।

—সুরমা দেবী তো চলে গেছেন। এবার প্রাণ খুলে আমাকে বল না, তোমাকে ছাড়া আর কিছু জানেন না তোমার স্ত্রী—এ গর্বটা কি তোমার এখনও আছে?

—হ্যাঁ, সেটা এখন ভেবে দেখার বিষয় বটে।

—মানুষের দোষই ওই। ভাঙে তো মচকায় না।

—চুপ, রমেন আসছে। আমার ছেলে।

* * *

—বাবা, কী বিপদ দেখেছ?

—বিপদ? কি বিপদ রমেন?

—তোমার পা দুখানি বের কর। আগে প্রণাম করি। তারপর বলছি।

—দীর্ঘজীবী হও বাবা। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক। কিন্তু বিপদটা কী?

—বিপদটা ঘটিয়েছেন বিধাতা। তোমার জন্মদিনেই হচ্ছে সুনন্দার জন্মদিন।

—কে সুনন্দা?

—বাঃ। সুনন্দাকে তুমি ভুলে গেলে? তোমার বন্ধু অশোক সেনের সেই ধিঙ্গি মেয়েটা। যাকে তুমি আনন্দময়ী বলে ডাক।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। আনন্দময়ী।

—সেই আনন্দময়ীর জন্মদিন আজ। আমি লিখেছিলাম বাবার জন্মদিনও আজ। কি করে বর্ধমান যাই বল। তা এখন ট্রাঙ্ককল এসে উপস্থিত। আমি না গেলে উৎসবই নাকি হবে না।

—না না, তুমি যাবে বইকি বাবা। অশোক আমার বাল্যবন্ধু। আর ওই আনন্দময়ী সুনন্দা—একদিন আমার ঘরের লক্ষ্মী হয়ে আসবে, এ আশাও আমি রাখি। তা বেশ, এ বাড়ির নেমন্তন্নের ভোজপর্বটা তো দুপুরে। ওটা মিটিয়ে দিয়েই তুমি বেরিয়ে পড়। বেলাবেলিই পৌঁছে যাবে বর্ধমানে।

—টেলিফোনে আমিও তাই বললাম বাবা। কিন্তু শুনছে না। বলছে এবেলাই এস। তুমি যাই বল বাবা, মেয়েটা বড় অবুঝ।

—তা বেশ, এখুনি রওনা হও। এদিককার ব্যাপার—আচ্ছা সে হবে এখন।

—সে তুমি ভেবো না বাবা। আমাদের ওই নতুন চাকরটা যেমন চালাক তেমনি চটপটে। ম্যানেজ করে নেবে। আচ্ছা বাবা, তা হলে আমি এই আটটা তেইশের গাড়িতেই—

—এসো।

* * *

—কি বুঝলে?

—হ্যাঁ, বুঝছি।

—ছেলে তো চলল আটটা তেইশের গাড়িতে।

—যাক না। মমতা, আমার মেয়ে—ট্রেনটা বোধ হয় লেট আছে। নইলে এতক্ষণ এসে পড়বার কথা। বাঁকুড়া গার্লস স্কুলের হেডমিস্ট্রেস। সে এসে পড়লে একাই একশো। ওই বুঝি এসে গেছে।...কিন্তু—কিন্তু তোমাকে তো চিনলাম না মা।

—আমার প্রণাম নিন। আর চন্দনকাঠের এই খড়মজোড়া নিন। মমতাদি আমার সঙ্গে পাঠিয়েছেন। আমি তাঁরই সহকারী শিক্ষয়িত্রী। আমার নাম রমা মিত্র।

—বেশ মা, বেশ। আশীর্বাদ করি সুখী হও। সার্থক হও। কিন্তু মমতা—সে এল না কেন? ভাল আছে তো?

—ও, সে জানেন না বুঝি? স্কুলে এবার রেলের কনসেশান পাওয়া গেছে—ভারতের সব দ্রষ্টব্য স্থান দেখার জন্য। স্কুলের শিক্ষিকারা সব দল বেঁধে বেরিয়ে পড়েছেন কাল। আজ আপনার জন্মদিন বলে প্রথমটায় মমতাদি যেতে চাইছিলেন না। কিন্তু সেক্রেটারী চঞ্চলবাবুর অনুরোধ এড়াতে পারলেন না। জানেন, ভারি মজার লোক এই চঞ্চলবাবু। বলছিলেন অজন্তা ইলোরায় গিয়ে নিজেদের খুঁজে পাবে তোমরা।

—তা তুমি গেলে না যে মা? নিজেকে হারাও নি বুঝি?

—আমিও যেতাম। কিন্তু কিছুদিন থেকে মায়ের শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। বিদেশে চাকরি করি। এই ছুটিছাটাতেই যা একটু সুযোগ পাই বাপ-মায়ের সেবা-শুশ্রূষার। ট্রেন থেকে সোজা আপনার এখানেই চলে এসেছি। হ্যাঁ, মমতাদি ওই খড়মজোড়া আজই সকালে দেবার জন্য বিশেষ করে বলে দিয়েছিলেন যে। আচ্ছা, আমি তবে আসি।

—এসো মা, এসো। তোমার মা হয়তো তোমার পথ চেয়েই আছেন। না, আর দেরি করো না।

* * *

—কি, বুঝলে?

—হ্যাঁ, এটা বুঝছি, অনেকের কাছ থেকেই ধীরে ধীরে আমি দূরে চলে আসছি।

—আর তত কাছে আসছ আমার। ওই যে আবার কে আসছে।

—আরে, এসো এসো—তাপস এসো। তোমার এত কাজের মধ্যে মনে করে যে আজ এসেছ—

—আসব না? তুমি কি বলছ সূর্যদা? যত কাজই থাক্, তোমার জন্মদিনে আমাকে আসতেই হবে। আমার মাসিকপত্র 'মশালে'র নামকরণ করেছিলে তুমি। তোমার লেখার আগুনে তখন বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার কতটা কেটে গিয়েছিল তা জানে দেশের লোক। তোমারই আশীর্বাদে দাদা, এবার আমার 'মশালে'র পূজাসংখ্যায় বেরুচ্ছে তিন তিনটে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। এক ডজন বড় গল্প। কবিতা আমি গুনি না। জানই তো এই পূজা-সংখ্যাটাই হল আমাদের নববর্ষসংখ্যা। দু লাইন আশীর্বাদ লিখে দাও দাদা।

—লিখে আর কি আশীর্বাদ করব। 'মশালে'র এই বার্ষিকসংখ্যার জন্যে একটা ছোটগল্প লিখে রেখেছি। ওটা নিয়ে যাও। ওই আমার আশীর্বাদ।

—দাদা, তুমি হলে গিয়ে বাংলাদেশের প্রবীণতম সাহিত্যিক। তোমাকে এই ছেলেছোকরার দলে মিশিয়ে মুড়ি-মিছরির একদর করতে পারব না। তা সে যে যাই বলুক। তুমি বরঞ্চ একটা আশীর্বচন লিখে দিলে এদের যাত্রাপথ সুগম হয়ে উঠত। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি বরঞ্চ সম্পাদকীয়তে লিখে দেব, তোমার আশীর্বাদ মাথায় নিয়েই আমাদের নববর্ষের জয়যাত্রা শুরু হল। চলি। আমার আবার একগাদা প্রুফ। এমন হয়েছে—মরবার সময় নেই।

*　　　*　　　*

—কি বুঝলে ?

—হ্যাঁ, সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

—আমার ঘর অস্তাচলের ওপারে। কিন্তু তাই বলে খুব দূরে নয়। এক নিমেষেই যাওয়া যায়।

—কিন্তু আমাকে নেবার জন্যে তোমারই বা এত আগ্রহ কেন ?

—সেটা তুমি ভুলে গেছ। এবং আশ্চর্য, যদি আজ আমি তা তোমাকে মনে করিয়ে দিই, বুঝেও তুমি না বোঝার ভান করবে। তোমার প্রতি জন্মদিনেই তো তোমাকে তা বলি। তুমি শুধু অবিশ্বাসের হাসি হাস।

—রাগ করছ কেন ? বল না, শুনি। আমার প্রতি তোমার এ প্রেম কেন ?

—কারণ তুমি ছিলে আমার। পৃথিবীর হাতছানিতে চুপিচুপি পালিয়ে এসেছ আমার বুক থেকে। ফিরে পেতে চাই আমি তোমাকে।

—কি যে তুমি বল, আমি বুঝি না। পালিয়ে যদি এসে থাকি, ভুল করি নি কিছু। শুনেছি তুমি আলোহীন প্রাণহীন পাষাণ। তাই তোমাকে আমার এত ভয়। যেতে চাই না আমি এ পৃথিবী ছেড়ে। জীবনে যত দুঃখই আসুক, যত নৈরাশ্যই জমা হোক, সবাইকে ছাপিয়ে তবু থাকে এমন কোনও সম্পদ, যার জন্যে মনে হয়, যত কাঙালই আমি হই না কেন, তবুও আমি সম্রাট।

—হ্যাঁ, এ গর্ব মানুষ করে থাকে বটে। কিন্তু এটাও কি সত্য নয় যে মানুষের কোনও সাম্রাজ্যই শেষ পর্যন্ত টেকে নি। ধ্বংস হয়ে গেছে। চুরমার হয়ে গেছে। আমি শুধু বলতে চাই, তোমার সাম্রাজ্যও যাবে। ভাঙন ধরেছে। প্রতি জন্মদিনে দেখতে আসি আর কত বাকী।

—বড় নিষ্ঠুর তুমি। শুধু নিষ্ঠুর নও, পৈশাচিক আনন্দ দেখছি তোমার চোখে। কিন্তু তুমি জেনো, তোমার আশা পূর্ণ হতে, আমাকে পেতে, তোমার এখনও ঢের ঢের বাকি।

—কোন্ অহংকারে এ কথা তুমি বলছ। চোখের উপর দেখছ না কি একে একে তোমার সকল অহংকার চূর্ণ হচ্ছে ?

—দেখছি। কিন্তু জানবে, এই পৃথিবী ধ্বংসের চেয়ে বড়—অনেক বড়। এত রূপ, এত রস, এত গান, এত গন্ধ আছে মানুষের জীবনে—ফুরবে না তা কোনদিন। এক দিকে হবে ক্ষয়, আর এক দিকে লাভ। শোন মৃত্যু—

—বল।

—আমার বাড়ির দুয়ারে রাজপথের ধারে পড়ে আছে এক কুষ্ঠরোগী। কুৎসিত, কদাকার, বীভৎস। দেহের মাংস খসে পড়ছে। কিলবিল করছে পোকা। দেখেছ ?

—হ্যাঁ, আমি সবই দেখি।

—লোকটাকে মৃত্যুকামনা করতে শুনেছ কখনও ?

—মুখে করেছে। কিন্তু মনের ইচ্ছা বাঁচতে। কিন্তু কেন ? কেন বাঁচতে চায় বলতে পার ?

—তবে শোন, কেন বাঁচতে চায়। দীনদুঃখী একটা ভিখারিণী রাতে এসে ওর কাছে বসে। ঘাগুলো ধুয়ে দেয়। ভিক্ষে করে যা পায় তা থেকে ওকেও খাওয়ায়। হয়তো প্রেম। হয়তো দয়া। কিন্তু এই-টুকু পাবার জন্যে ওর যেমন লোভ; ওইটুকু পেয়ে তেমনই গর্ব। কেউ যদি ভিক্ষে না দেয়, লোকটা তাকে শুনিয়ে দেয়, নাইবা দিলে তুমি ভিক্ষে, ভিক্ষে দেবার লোক আমার আছে।—ওর কাছে তবে তুমি হার মেনেছ মৃত্যু।

—আপাততঃ।

—অবশ্য আমি এত মূর্খ নই যে বলব আমরা অমর। মরব আমরা একদিন নিশ্চয়, কিন্তু তোমার সঙ্গে লড়াই

করে মরব বন্ধু। সগৌরবে লড়াই করব। আর তারই নাম হচ্ছে জীবন। ওই, কে আসছে! ক্রমাগত হারছি। তুমি এগিয়ে আসছ। ভাবছি, আজ কি তোমাকে রুখতে পারব না আমি?

—দেখ।

* * *

—আরে, এস এস বিপদভঞ্জন। তোমার কথা আজ যেন কেন বারবার মনে হচ্ছিল। না না, কোনও মামলা-টামলায় পড়ি নি। ভাবছিলাম, তুমি আর আমি এক-বয়সী। জন্মদিনে তাই তোমার কথা মনে হচ্ছিল।

—আরে, আমারও তো মন ছটফট করছিল তোমার কাছে ছুটে আসতে। কিন্তু তার কি জো আছে? আসব বলে বেরিয়েছি এমন সময় মক্কেল এসে উপস্থিত। পুলিস-কেসের আসামী। তুমি বলেছিলে সকাল সকাল আসতে, কিন্তু পড়ে-পাওয়া টাকা ফেলে আসতে পারি নে। কাজেই বসতেই হল।

—না না, টাকার চেয়ে বড় কিছু নেই। আমার জন্মদিনে নেমন্তন্ন রাখতে তোমার ক্ষতি হলে আমারই কি ভাল লাগত?

—তুমি ভাই আমার জন্যে যেসব ক্ষতি সহ্য করেছ, আমার কোনও ক্ষতি দিয়েই তাকে মাপা যাবে না সূর্যদা। ছিলাম বিপ্লবী। জেল খেটেছি, নতুবা এ-গর্তে সে-গর্তে পালিয়ে থেকেছি পুরো সাতটি বছর। এই সাত-সাতটি বছর তুমি আমার স্ত্রীপুত্রের মুখে ভাত জুটিয়েছ।

—থাক্, থাক্, ওসব কথা থাক্। কেসটা বেশ কিছুদিন চলবে? মানে, কেসটায় টাকা আছে তো?

—হ্যাঁ, বেশ টু-পাইস পাবার কেসই এটা। আসামী দুজন। একজন তো খুবই বড়লোক। আর একজন অবশ্য খুবই গরীব। তা মামলার খরচ অবশ্য বড়লোকের ছেলেটিই চালাবে। কিন্তু যা চার্জ, শুনে আমার গা ঘিনঘিন করছে।

—বল কি! কি কেস হে?

—জঘন্য। গরীব লোকটি হচ্ছে একটি বুড়ো বাপ। আর বড়লোকের ছেলেটি হচ্ছে একটি নরপশু। বুড়ো তার ষোড়শী মেয়েটিকে নিজে নিয়ে গেছে এক পার্কের কোণে। ওই পশুর হাতে তুলে দিয়ে, দূরে পাহারা দিয়েছে নিজে, যাতে কেউ ওদিকে না যায়।

—আশ্চর্য! বুঝছি, পেটের দায়ে বুড়ো এই—কিন্তু ঘেন্নায় মরতে ইচ্ছে হচ্ছে।...কে, ওখানে কে হাসছে?

—কই? হাসছে আবার কে!

—ও।...তা এরা ধরা পড়ল কি করে?

—ওই মেয়েটারই কোনও 'লাভার' হয়তো ব্যাপারটার গন্ধ পেয়ে অ্যান্টি-করাপ্‌শান্ পুলিসকে পূর্বেই খবরটা দিয়ে রেখেছিল—কাজেই এরা একেবারে হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছে।

—কিন্তু মানুষ কি এত নীচে নেমে গেছে? না না, হয়তো ওই 'লাভার'ই পুলিসকে হাত করে কেসটা সাজিয়েছে।

—হ্যাঁ, তা হতে পারে। ডিফেন্সও তাই হবে। কিন্তু আসামীরা আমার কাছে কবুল করেছে, ঘটনাটা সত্য। বড়লোকের ছেলেটি পাঁচশো টাকার নোট আমার হাতে গুঁজে দিয়ে পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগল, আমায় বাঁচান উকিলবাবু।

—তুমি বিপদভঞ্জন বোস। আশা করি ওদেরও বাঁচাতে পারবে, আর নিজেও বেঁচে যাবে ওদের টাকায়। তোমারও তো সামনে মেয়ের বিয়ে।

—না ভাই, এ কেস আমি নিই নি।

—নাও নি!

—না। আমিও মেয়ের বাপ।...ঘেন্না করল।

—কিন্তু তোমার মেয়ের বিয়েতে টাকার এত দরকার। কেসটা তুমি নিলে না?

—না। কেসটা শোনা অবধি নিজেকে কেমন যেন অশুচি বোধ হচ্ছে। তাই ছুটে এলাম একটা মহৎ লোকের পরশ পেতে।

—আরে আরে, একি! একেবারে যাকে বলে আলিঙ্গন যে। তা ভালই, আমার জন্মদিনে তোমার মত একটা খাঁটি লোকের ছোঁয়া পেলাম। জন্মদিন আমার সার্থক হল বিপদভঞ্জন। একি, চললে যে!

—কাছারির বেলা হয়ে গেছে।

—আরে, মিষ্টিমুখ করে যাবে না?

—টাকার বড় দরকার। আজ একটা জটিল রেন্ট সুট আছে। সকাল সকাল গিয়ে তদ্বির করতে হবে। মিষ্টি খাব বিকেলে এসে।

* * *

—কি? মরতে তবে মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়?

—ও, তাই বুঝি তুমি হোহো করে হাসছিলে? ভাগ্যিস আর কেউ শুনতে পায় নি। কিন্তু হোহো করে জয়ের হাসি হাসবার পালা বোধ হয় এবার আমার। মানুষ আজ কত নীচে নেমে গেছে এ কথাও যেমন ঠিক, মানুষ আজ কত উপরে উঠতে পারে তাও তো দেখা গেল বন্ধু। এমন বন্ধু-ভাগ্যে গর্ব করে বাঁচা চলে। চলে নাকি?

—হ্যাঁ। মনে হচ্ছে এ-বছরটিতেও তোমাকে আমি পাব না। আচ্ছা আজ তবে চলি। ও, না, আবার কে আসছে। আচ্ছা, তবে একটু বসেই যাই। দেখি, ইনি এসে তোমার পরমায়ু বাড়ান কি কমান।

* * *

—অমল যে! এসো এসো। এবার দেরি যে! বাঃ, কি সুন্দর সব ফুল। আচ্ছা অমল, তোমার শ্যামলী মা তিনি তো আর শ্যামলী নেই, পাকা বুড়ি হয়েছেন। তা তিনি এখনও কি নিজের হাতে তাঁর বাগানটির পরিচর্যা করেন? না না, এ ফুল আমার পায়ে রাখছ কেন? দাও, আমার হাতে দাও।

—কিন্তু শ্যামলী মা এ ফুল আপনার পায়ে রেখে আপনাকে প্রণাম করতে বলেছেন আমায়। তাঁর আদেশ অমান্য করার সাহস আমাদের নেই সার্।

—ও, তোমার শ্যামলী মা একটি বাঘা বুড়ী হয়ে দাঁড়িয়েছেন দেখছি। বেশ, তাঁকে বলো, আমি আমার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আশীর্বাদ করছি—তাঁর জীবন আরও সার্থক হোক। তোমাকে আশীর্বাদ করছি—দীর্ঘজীবী হও। হ্যাঁ, যে কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করছিলাম, শ্যামলী তাঁর বাগানের কাজ এখনও কি নিজের হাতেই করেন? ফুলের বাহার দেখে তাই কিন্তু মনে হচ্ছে অমল।

—অনাথ আশ্রমের অত বড় বাগান। এ-বয়সে অত বড় বাগানের কাজ তাঁকে আমরা কেন দেব করতে— যেখানে আমরা তাঁর শত শত ছেলেমেয়ে রয়েছি। তবে জানেন সার্, ওঁর নিজের ঘরের সামনে যে ছোট্ট বাগানটি, সেখানে কারও ঢোকার হুকুম নেই। তার কাজ করেন তিনি নিজেই। আচ্ছা সার্, শুনেছি, ওই বাগানের ফুলগাছগুলো নাকি আপনার নিজের হাতের?

—শুনলেই হল? ওরে বোকা ছেলে, কি করে তা হয়? তোদের শ্যামলী-মা'র ওই বাড়িতে থেকে আমি যখন এম. এ. পড়ি তখন আমার বয়স ছিল কুড়ি-একুশ। শ্যামলী তখন ম্যাট্রিক ক্লাসে। সে আজ কতকালের কথা বল্ দেখি। হ্যাঁ, তা বছর চল্লিশ হবে। চল্লিশ বছর বুঝি কোনও ফুলগাছ বেঁচে থাকে রে বোকা ছেলে!

—না না, সে আমরা শুনেছি। এখনকার গাছগুলো নাকি আপনার সেই গাছগুলোরই কাচ্চা-বাচ্চা।

—এসব কে বলেছে রে অমল? শ্যামলী বুঝি?

—না না, তিনি বলেন নি। তবে এ কথা কিন্তু আর সবাই বলে। আজ যখন এই ফুলের ঝাঁপিটি আমার হাতে তুলে দিলেন তখন আমি খুব সাহস করে শ্যামলী মাকে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা যা শুনি সেটা সত্যি কি? আমার কথায় তিনি হেসে উঠলেন। বললেন, এ ফুল আমার গুরুদেবের পায়ে রেখে তাঁকেই জিজ্ঞেস করিস অমল।

—বটে, এ কথা বলেছেন শ্যামলী? আর কি বলেছেন শ্যামলী?

—বেশী কথা আজকাল তিনি বলতে পারেন না। তাঁর যে খুব অসুখ।

—অসুখ! জানি নে তো। কী অসুখ?

—সে জানার উপায় নেই। মুখ বুজে সয়ে থাকেন সব যন্ত্রণা। আজকাল কথা বলেন কম, কিন্তু মুখে সেই হাসিটি লেগেই আছে।

—আমাকে যেতে বলেছেন?

—কি করে জানলেন সার্?

—আমার মন বলছে।

—শ্যামলী মা বলেছেন, তাঁর আশ্রমে এসব ফুলের চেয়েও আরও শত শত সুন্দর ফুল ফুটেছে। আপনাকে গিয়ে দেখে আসতে বলেছেন। আপনি নাকি সেখানে আজ বহুকাল যান নি। আজ যেতেই হবে আপনাকে। আশ্রমের গাড়ি নিয়ে এসেছি। চলুন সার্।

—সেই শত শত ফুলের একটি তো দেখছি তুমি। যাব, আমি যাব। তুমি পূজোর ঘরে গিয়ে প্রসাদ নাও। আমি তৈরি হচ্ছি।

* * *

—এবার কি বুঝছ?

—বুঝছি তোমার পরমায়ু অনেক। কিন্তু এ কি সেই শ্যামলী—যে ছিল একটি ধনী পতিতার মেয়ে, যার গার্জেন-টিউটর ছিলে তুমি?

—হ্যাঁ বন্ধু।

—তা দেখছি, তোমার শিক্ষাতেই পতিতার মেয়ে হয়েছে পতিতপাবনী।

—হ্যাঁ বন্ধু। জীবনে এইটেই আমার সবচেয়ে বড় গর্ব।

—আর গুরুটিকেও সে ভোলে নি।

—হ্যাঁ বন্ধু।

—গুরু আর শিষ্যা তোমাদের দুজনের জন্যেই দেখছি আমাকে অপেক্ষা করতে হবে আরও অনেককাল। তা করব। আনন্দের সঙ্গেই করব। হ্যাঁ, এই আশীর্বাদ করেই মৃত্যু আজ বিদায় নিচ্ছে। চলি আমি আমার অন্ধকার রাজ্যে—যাত্রা কর তুমি তোমার আনন্দলোকে। বিদায়।

—বিদায়।

৯ ভাদ্র ১৩৬৭

চড়

সুশীল রায়

আজ একটি ভিখারী-ছেলে ভিক্ষা চাহিয়া বিরক্ত করিয়াছিল। তাহাকে একটি চড় মারিয়াছি। চড়টা একটু জোরেই মারিয়াছিলাম, হাত এখনও জ্বালা করিতেছে।

শুধু হাত জ্বালা করিতেছে না, ভিতরেও বেশ জ্বালা বোধ করিতেছি। মেজাজ তখন ভাল ছিল না, এখন অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়াছে দেখিয়া হয়তো কেহ বলিল, যত তেজ আমার উপর, আর ভিখারীর উপর। গায়ের ঝাল ঝাড়ার বেশ সোজা জায়গা।

কথাটা তবে পরিষ্কার করিয়া বলি। প্রথমতঃ, জনৈক ছোকরা-সম্পাদক আমার লেখার উপর এমন টিপ্পনী কাটিয়া সম্পাদকী সন্দর্ভ লিখিয়াছেন যাহাতে মেজাজ খাপ্পা হইয়া আছে। দ্বিতীয়তঃ, আমার বিশ্বস্ত প্রকাশক আমার গ্রন্থের বিক্রয়ের যা হিসাব দিয়াছেন তাহা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় নাই। তৃতীয়তঃ, আমার কাছে তখন নাছোড়বান্দা এক তরুণ সাহিত্যিক নির্বিকার বসিয়া। তাঁহাকে বিদায় দিবার নানাবিধ কৌশল করিয়া হতাশ হইয়াছি। তিনি অযথা কেবলই হাসিতেছেন আর বকিতেছেন, আর আমারই কবিতার লাইন আওড়াইয়া তাহারই ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন। মনে হইতেছিল, তিনি আমাকে ব্যঙ্গ করিতেছেন। বড়ই অসহ্য ঠেকিতেছিল, ইহার চেয়ে তিনি যদি অশ্রাব্য ভাষায় আমাকে গালি পাড়িতে পাড়িতে ঘরের বাহির হইয়া যাইতেন তাহা হইলে আমি অনেক আরাম পাইতাম। এই অবস্থায় ভিতর-ভিতর তাতিয়া উঠিয়াছি। ভিতর-মহলে আমার এই শোচনীয় অবস্থার কথা বেতারেই ঘোষিত হইয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি। ও-মহলের রসবোধ কম নয়; তিনি আমার এই রোমহর্ষক অবস্থাটা বুঝিয়া নিশ্চয় মজা মারিতেছেন—এ কল্পনাও আমাকে আরও গরম করিয়া তুলিয়াছে।

এমন সময় "বাবু গো" বলিয়া নিখুঁত অভিনয়ের করুণ সুরে ভিখারী-ছেলেটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। বার-দুই তাহাকে নরম গলায় জানাইলাম—এখানে কিছু হইবে না, হইবার আশা নাই। তাহার পর সুর একটু চড়াইয়া বলিলাম, হবে না, এখন যাও। তাহাতেও সে গেল না, আবার ডাকিল, "বাবু গো"—। এবার তাহার ডাকে সাড়া দিলাম। এবং যা ঘটিল তা আপনারা জানিয়াছেন।

ফলে, ভিখারী-ছেলেটি তো পলাইলই, তরুণ সাহিত্যিক বন্ধুটি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন, আচ্ছা, আজকে আসি।

আমার স্ত্রীর নাম আধুনিক রুচিসম্মত নয়। অতএব তাঁর নামোল্লেখ না করিয়া তাঁহাকে ক বলিয়া উল্লেখ করিব।

ভিখারীটিকে মারিয়া অবধি ঘণ্টা-দুই যাবৎ মনোকষ্ট পাইতেছি। মেজাজের মাথায় অমন আহাম্মকের মত কাজ একজন ভদ্রলোকের সামনেই করিয়া বসায় লজ্জাবোধও করিতেছি। বসিয়া বসিয়া নানা কথা ভাবিতেছি।

এমন সময় ক আসিয়া বলিল, যত তেজ আমার উপর আর ভিখারীর উপর। গায়ের ঝাল ঝাড়ার বেশ সোজা জায়গা। আর সবার কাছে একেবারে কাদার মানুষ। ছি ছি, নিরীহ ছেলেটা! সারাদিন হয়তো ওর খাওয়াই জুটবে না।

ক-এর কথায় কর্ণপাত যেন করিতেছি না, এইরূপ ভান করিয়া বসিয়া রহিলাম।

ক বলিল, আমি এবার একটা ইন-আউট করাব। সারাদিন আউট করে রাখব। রাত্রে যখন ঘুমবে তখন ইন করে এসে শোব। অনর্গল আড্ডা মেরে মেজাজ হবে অগ্নিশর্মার মত, আর নিরীহরা পাবে শাস্তি।

বললাম, ক, ভিতরে যাও। আমি এখন ভাবছি।

কী ভাবছ?

বলিলাম, তুমিও তো কম নাছোড়বান্দা নও! ভাবছি, কেন তুমি ভিতরে যাচ্ছ না।

ক হাসিল, আমিও না হাসিয়া পারিলাম না। কিন্তু ভিখারী-ছেলেটির চড় খাইবার পরমুহূর্তের মুখের করুণ ভাবটি চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল। বলিলাম, একদিন ধরে এনে খাইয়ে দিতে হবে।

ক বলিল, কাকে ?

বলিলাম, তোমার ভাইকে না। ওই ভিখারীটাকে।

ক চটিয়া উঠিল, বলিল, জানি। আমার ভাই খেতেও চায় না। ভেবেছিলাম, তোমার আড্ডার কোনও—

মুখ একটু বিকৃত করিয়া নীরবে হাসিয়া থাকিব, আমার মুখের ভাব দেখিয়াই সে সম্ভবতঃ কথা শেষ করিল না।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ক বলিল, লজ্জাও করে না। তুমি বলেই হাস। আমি হলে মরমে মরে থাকতাম।

ক-কে কী করিয়া বুঝাইব যে, মরমে আমিও বাঁচিয়া নাই! আমিও অবিরত ওই ছেলেটির কথাই ভাবিতেছি। কিন্তু ক তাহা বুঝিতেছে না, ইহাতেও মর্মাহত হইতেছি।

সত্য কথা বলিতে কি, আমি একটু ভাঙিয়া পড়িয়াছি। কর্মফলের উপর একটু বিশ্বাস আছে, সেইজন্যই মনে মনে ভীত হইয়া উঠিয়াছি। আমি নিশ্চিত যে, আমার এই কর্মের উপযুক্ত ফল আমাকে ভোগ করিতে হইবে।

ভয়ে ভয়ে সারাদিন বাড়ির বাহির হইলাম না। কাহারও সঙ্গে দেখা করিলাম না। হিসাব করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিলাম —ক আমাকে এতক্ষণ যেভাবে ভর্ৎসনা করিল তাহাতে সব শোধবোধ হইয়া গেল কি না। হিসাবে বারবারই ভুল হইতে লাগিল, অঙ্ক মিলাইতে পারিলাম না।

আবার ভাবিলাম, এতক্ষণ যে মনোকষ্ট ভোগ করিলাম তাহার ওজন চড়ের ওজনের সমান কি না। কিন্তু নিশ্চিত কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিলাম না। সাপের বিষ তুলিতে ওঝারা নাকি সাপকেই ডাকিয়া পাঠায়, আমারও ভিখারী-ছেলেটিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।—

এই চরম সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়া চুপচাপ বসিয়া রহিলাম।

ছেলেটিকে একদিন পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া দিব। কেবল তাহাকে খাওয়াইলেই তাহার ক্ষুধা মিটিবে কি না

তা অবশ্য জানি না। তার মাও থাকিতে পারে, বাবাও থাকিতে পারে—দুজনের চোখ নাও থাকিতে পারে। তা ছাড়া, রোগা রোগা কয়েকটি ছোট ভাইবোন থাকাও অসম্ভব নয়। তার সংসারটি আমি যেন স্পষ্ট দেখিতে লাগিলাম। ভাবিয়া দেখিলাম, ইহাকে কষ্টকল্পিত চিত্র বলা চলে না। এমন তো সত্যই বিস্তর আছে।

ইজিচেয়ারে হেলান দিয়া ছিলাম, সোজা হইয়া বসিলাম। ছেলেটিকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। তাহাকে একবার পাইলে তাহার সংসারটিও চাক্ষুষ দেখিয়া আসা চাই।

ক বলিল, এখন খাবে না? ও-বেলা তো প্রায় ভাতে হাত দিয়ে উঠলে।

রুচি নাই বলিলে মেয়েলী শোনায়। তাই উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

পরদিন একাধিকবার অপদস্থ হইলাম। বুঝিলাম, কর্মের ক্রিয়া শুরু হইয়াছে। প্রকাশক জানাইলেন, আমি যদি হিসাব নিয়া অমন কড়াকড়ি করি তাহা হইলে তিনি আমার সম্মান রাখিতে অক্ষম হইবেন। তাঁহার কথায় মনে হইল, তখনও আমাকে তিনি অপমান করেন নাই। ছোকরা-সম্পাদক কাগজেই ঢুকিয়াছিলেন, রাস্তায় পাইয়া বেশ মিষ্টি করিয়া দু-কথা শুনাইয়া দিলেন; তাঁহার মতে কাব্যচর্চা আমার ছাড়িয়া দেওয়া উচিত, কেন না আমার লেখা 'পেশল উরস ভেদ করি...' লাইনটির উরস কথাটির অর্থ উরু করিলে তার অর্থ জঘন্য হইয়া যায়, এবং অভিধানে উরস শব্দের অর্থ যাহাই যাক্, এক্ষেত্রে উরু অর্থ ধরাই স্বাভাবিক—তিনিও তাই ধরিয়াছেন।

অপমানে মাথা ভারী হইয়া উঠিয়াছে। মাথা নীচু করিয়া বাড়ি ফিরিতেছিলাম। ভাবিতেছিলাম, আজও বাহির না হইলেই হইত। এমন সময় সেই তরুণ সাহিত্যিক বন্ধুটি আমার পাশে আসিয়া উপস্থিত। বিনয়ে গলিতে গলিতে তিনি বলিতেছেন ও সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিতেছেন—তাঁদের 'দুর্জয় সংঘে'র সম্পাদক তাঁহাকে নাকি আমার নিকট পাঠাইয়াছেন। তাঁহার পরম-সৌভাগ্য নাকি এই যে, রাস্তায়ই আমাকে তিনি ধরিতে পারিয়াছেন।

বাড়ি ঢুকিয়াই অবাক হইলাম। দেখিলাম, উঠানের এক কোণে বসিয়া পরম আনন্দের সহিত ভিখারী-ছেলেটি আহার করিতেছে। পাশে উবু হইয়া বসিয়া ক তাহার সঙ্গে কথা বলিতেছে। তৃপ্তিতে বুক ভরিয়া উঠিল।

শুনিলাম, ছেলেটি নাকি নিজেই ধরা দিয়াছে। আজও সে নাকি "বাবু গো—" বলিয়া হাজির। গলার স্বর শুনিবামাত্র ক নাকি তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

ক বলিল, প্রায়শ্চিত্ত কর। বসে খাওয়াও।

আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম দেখিয়া ক জিজ্ঞাসা করিল, সঙ্গে কেউ এসেছেন বুঝি?

বলিলাম, হ্যাঁ।

ক অবাক হইয়া তাকাইল আমার মুখের দিকে।

বলিলাম, আমাকে দুর্জয় সংঘের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি করতে চান। কি বল, যাব?

ক একটু ভাবিয়া বলিল, একে এখন ভরপেট খাইয়ে নাও। ওসব পরে হবে। যাবে না কেন, নিশ্চয় যাবে।

চলিলাম। ঘণ্টাখানেক বাদে ভিখারী-ছেলেটির সঙ্গে হনহন করিয়া হৃষ্টচিত্তে চলিলাম। চলিলাম তার গৃহাভিমুখে।

LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY SOAP

শেষের ফুলটি

শ্রীকুমারেশ ঘোষ

সবাই জানেন, দ্বাদশ বিশ্বযুদ্ধে ধ্বংস হল সভ্যতা।

শহর নগর গ্রাম মুছে গেল ধরণীর বুক থেকে, কুঞ্জ আর বনানী সব ধুলিসাৎ হল, বাগ-বাগিচাও। শিল্প আর কারুকার্যও রক্ষা পেল না।

পুরুষ রমণী আর শিশুরাও শেষে পশুর অধম হল।

প্রভুভক্ত কুত্তাগুলো নিদারুণ হতাশায় ছেড়ে গেল অকৃতজ্ঞ প্রভুদের।

পৃথিবীর প্রাক্তন প্রভুদের করুণ অবস্থা দেখে মুষিকের দুঃসাহস গেল বেড়ে।

বইপত্র চিত্রাবলী আর সঙ্গীত হল অদৃশ্য এই পৃথিবী থেকে এবং মানুষ চুপচাপ বসে রইল হাত-পা গুটিয়ে।

বছরের পর বছর গেল কেটে।

এমন কি জীবিত কজন সেনাপতি ভুলেই গেলেন শেষ যুদ্ধের পরিণতির কথা।

ছেলেমেয়েরা বড় হল, বোকা-দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে রইল এর-ওর দিকে, কারণ পৃথিবীতে তখন আর প্রেম বলতে কিছু নেই।

একদিন এক তরুণী সহসা দেখতে পেল একটি ফুল—পৃথিবীর শেষের ফুলটি।

সে আর সবাইকে ডেকে বলল, ওগো, শেষের ফুলটিও যে মরো-মরো!

তার সে কথায় কান দিল শুধু এক লক্ষ্যহীন তরুণ।

দুজনে—ওই তরুণ আর তরুণী সযত্নে সজীব করে তুলল ফুলটিকে।

একদিন এক মৌমাছি এসে বসল ফুলটায়, এবং একটি শিস-দেওয়া পাখি।

অল্প দিনেই দেখা দিল দুটি ফুল এবং পরে চারটি এবং শেষে আরও—আরও।

কুঞ্জ আর বনানী হল মুঞ্জরিত।

তরুণী প্রসাধনে হল মত্ত।

তরুণ আবিষ্কার করল, তরুণীর স্পর্শ রোমাঞ্চকর।

পৃথিবীতে আবার দেখা দিল প্রেম।

তাদের সন্তান-সন্ততি বেড়ে উঠল সুস্থ সবল দেহে এবং তারা দৌড়তে শিখল—হাসতেও।

কুকুরগুলো ফিরে এল ল্যাজ নেড়ে নেড়ে।

তরুণ শিখল, পাথরের পর পাথর সাজিয়ে কেমন করে আশ্রয় তৈরি করতে হয়।

শীঘ্রই দেখা গেল, সবাই ঘর বাঁধতে ব্যস্ত।

শহর নগর গ্রাম উঠল গড়ে।

পৃথিবী আবার পেল সঙ্গীতের সঙ্গ—

এবং কথক আর কৌশলীর,

এবং দর্জি আর চর্মকারের,

এবং শিল্পী আর কবিকুলের,

এবং ভাস্কর আর কর্মকারের,

এবং সৈনিকের,

এবং লেফটন্যান্ট আর ক্যাপ্টেনের,

এবং জেনারেল আর মেজর-জেনারেলের,

এবং ত্রাণকর্তাদের।

কতকগুলি লোক একটা জায়গা পছন্দ করে নিল বাস করবার জন্যে এবং অন্যেরা আর একটা জায়গা।

শীঘ্রই দেখা গেল, যারা উপত্যকায় গিয়েছিল, তারা পাহাড়ে বাস করতে চায়।

আর যারা পাহাড়ে বাস করছিল, তাদের মনে হল উপত্যকাই উপযুক্ত স্থান।

ওই ত্রাণকর্তারা, ঈশ্বরের নির্দেশমতই তাদের এই অস্থিরতার সুযোগ নিল।

এবং এই পৃথিবীতে আবার দেখা দিল যুদ্ধ।

আর, এবার প্রলয় এমন মূর্তিতেই দেখা দিল যে… পৃথিবীতে আর তেমন কিছুই থাকল না।

শুধু থাকল—

একটি পুরুষ,

একটি নারী

আর একটিমাত্র ফুল।

[ব্যঙ্গরসিক ও চিত্রশিল্পী জেমস থারবার লিখিত 'Fables for Our Time & The Last Flower'থেকে অনূদিত।]

থামতে জানা

শ্রীবিরূপাক্ষ

একবার সঙ্গীতজ্ঞ দিলীপকুমার রায় মহাশয় সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে কোন এক জলসা শুনতে যাবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করতে থাকেন।

শরৎচন্দ্র দিলীপকুমারকে বললেন, না ভাই দিলীপ, ও-সব কালোয়াতী গানটান আমি বুঝি না—তুমিই যাও।

দিলীপকুমারও নাছোড়বান্দা। কেবল বলতে থাকেন, দাদা, এ সেরকম জলসা নয়। ঘরোয়া ব্যাপার—এখানে যে কালোয়াতটি আসবেন তিনি একজন খুব উঁচুদরের গুণী, আপনি তাঁর গান শুনলে মোহিত হয়ে যাবেন। চমৎকার গান, একবারটি শুনেই আসবেন নয়, চলুন।

শরৎচন্দ্র সব শুনে একটু চিন্তিতভাবে বলে উঠলেন, হুঁ, তুমি যা বলছ দিলীপ, সবই বুঝলুম—গুণী লোক, গানও গায় ভাল, কিন্তু থামে তো?

দিলীপকুমার ও উপস্থিত কয়েকজন এ কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শরৎচন্দ্রের এই প্রশ্নটি হেসে উড়িয়ে দেবার মত নয়। আমরা অর্থাৎ ভারতবাসীরা অনেক কিছু শিখেছি কিন্তু কোথায় থামতে হয় সেইটেই শিখি নি। আমাদের গান থামে না, বক্তৃতা থামে না, উপদেশ থামে না, গালাগালি তো থামতেই চায় না—এ এক জ্বালা!

আমরা ছেলেবেলা থেকে উপদেশ শুনতে আরম্ভ করলুম—তা আর থামল না। গুরুজনরা আমাদের ভাল করবার জন্যে এত উপদেশ বিতরণ করলেন যে সমস্ত করণীয় কার্য ভুলে গেলুম। এ যেন গভর্ণমেন্টের নিত্য নতুন আইন পাস ও তা অনুসরণের নির্দেশ—সমস্তগুলো ধারা মুখস্থ থাকলে সুপ্রীমকোর্টের জজ হওয়া যায়, নইলে পদে পদে আইন লঙ্ঘন করে দশ-পনেরো বছর হাজতবাস করতে হয়। এই করো না, তাই করো না, এই কর, তাই কর বলতে বলতে আমাদের আর কোন কিছু করতে হল না, একেবারে কাজের বার হয়ে গেলুম। তাঁরা যদি উপদেশ একটু স্বল্পমাত্রায় দিতেন—উপকার হত। মাত্রা বাড়াতেই বিপদ হয়ে গেল।

এঁদের পর আরম্ভ হল মাস্টারমশাইদের উপদেশ, তারপর অফিসের কর্তাদের, তারও পরে বন্ধুদের। সর্বশেষে বাড়ির লোকদের। কেউ কখনও থামলেন না—এঁদের সকলের হাত এড়িয়ে একটু গড়ের মাঠে গিয়ে যে দুদণ্ড নিশ্চিন্তে হাওয়া খাবেন তারও জো নেই; সেখানেও মনুমেন্টের তলায় লাউডস্পীকার খাটিয়ে নেতাদের দুর্ধর্ষ নির্দেশ শুনতে শুনতে মাথা-টাতা সব ঘুলিয়ে যাবে।

তার ফলে কাজকর্ম ছেড়ে হয়তো ধর্মঘট করে বসে রইলেন—শেষে নাকখত দিয়ে আবার কেঁচোর মত অফিসে ঢুকুন; আর আগে যাঁরা বাবা দাদা বলে সবিনয়ে বাত-চিত করতেন, পরে তাঁদের কাছ থেকে সম্বন্ধীসুলভ আপ্যায়ন লাভ করে পশ্চাতে ঠোকর খেয়ে চিত হয়ে গড়াগড়ি খান!

অথচ এ দুর্ভোগ হয় না, যদি যথাসময়ে থামবার আর্টটা সকলের জানা থাকে। হুম্‌হাম করে তম্বিতম্বা পর্যন্তই ভাল—কিন্তু গুম্ করে লোকের পিঠে কিল বসিয়ে দেবেন না কখনও, তা হলেই সর্বনাশ! প্রতিপক্ষকে কখনও কিলের ওজন বুঝতে দিতে নেই। বাকযুদ্ধ করে কেল্লা ফতে করুন কিন্তু খবরদার নিজে থেকে কখনও সত্যি যুদ্ধ করতে যাবেন না—মারা পড়বেন। কিন্তু মজা এমন যে একবার আবেগ এলে তার বেগকে ঠিক তালমাফিক থামাবার কায়দা দেশবাসীর জানা নেই।

কোন্‌দিকের কথা বলব? আমরা বন্ধনকে স্বীকার করি না কিনা—সবেতেই মুক্ত, তাই কোনকিছু বাঁধা-বাঁধির মধ্যে থাকব কেন? কথা ছেড়ে দিন—যেখানে কোন কথাই নেই, সেখানেও শুধু আ—আ করেই আড়াই ঘণ্টা আমরা চালিয়ে দিতে পারি। থামতে বয়ে যাচ্ছে!

এই কলকাতা শহরে বিরামবিহীন ভাবে তিন দিন তিন রাত হাফ্-আখড়াই গানের আসর বসেছে নিজের চোখে দেখেছি। একবারও গান থামল না। সূর্য তিনবার উঠল, তিনবার ডুবে গেল, আখড়ার লোকেদের হাঁ বন্ধ হল না; গেয়েই চললেন। একদল ওঠে তো সঙ্গে সঙ্গে আর একদল বসে পড়ে, যেন বাঙালীর নেমন্তন্ন বাড়ি, ফার্স্ট ব্যাচের খাওয়ার পর সকড়ি তোলবারও টাইম দেয় না, সেকেণ্ড ব্যাচ হুড়মুড় করে উঠে পড়ে—কোন বিরতির অবকাশ নেই।

পঞ্চাশ বছর আগেও এদেশে থিয়েটার চলত সারারাত ধরে। ভোরের দিকে ঘুমে চোখ ঢুলে আসছে দর্শকদের, চড়চড় করে রোদ উঠে গেল, তখনও আলিবাবার নাচ চলছে। আবার এর মধ্যে মজাও দেখেছি, নিমীলিত-চক্ষু নিদ্রাকাতর সঙ্গীকে ধাক্কা মেরে তাঁর বন্ধু দর্শক বলছেন, এই চোখ চা না—দেখ্ না, বেশ ভাল সখীদের নাচ হচ্ছে। সে বেচারী ঈষৎ চক্ষুটি খুলেই আবার বুজে ফেললে ও হাই তুলতে তুলতে বলে উঠল, ও আর দেখব কি? বেটারা সব বাদ দিয়ে দিয়ে এখন প্লে করছে। বলেই কাঁধটা চেয়ারের পৃষ্ঠদেশে দিয়ে কেতরে পড়ল।

আশ্চর্য! কোম্পানিও থামবে না—এঁরাও টিকিটের পয়সা উসুল করবার জন্যে থিয়েটারে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও বসে থাকবেন। কোথাও কারুর থামা পড়ার যো নেই!

যদি বলেন, ওসব আগের যুগে হত, লোকের রসবোধের সূক্ষ্মতা তখন আসে নি, এখন প্রগতির যুগে ওসব চলত না। তা হলে আমি এর উত্তরে প্রগতিবাদীদের জিজ্ঞাসা করব যে, যে-পাড়ায় মশাইরা থাকেন সে কি চৌরঙ্গীর ওপর না আর কোথাও সাহেব-পাড়ায়?

উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম বা মধ্য কলকাতার কোথাও কি কখনও থাকেন নি? পাল-পার্বণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কি কখনও হয় নি আপনাদের চত্বরে? সকাল ছটা থেকে রাত সাড়ে বারোটার আগে পুলিস আইন দেখিয়েও ফুলিশদের ভাড়া-করা লাউডস্পীকারের বিদিকিচ্ছিরি আওয়াজ থামাতে পেরেছেন?

আগে তবু বাড়ির হাতার মধ্যে উঠোনে বা দালানে রস জ্বাল দেওয়া হত, এখন দেড় মাইল দূরে থাকলেও যে ভেয়ান বসে তাতে মাথা টনটন করিয়ে দেয়, দেখেন না?

আসলে থামার আর্ট কেউ জানে না এদেশে।

আমাদের পাড়ায় এক ভদ্রলোক কিছুতে বাড়ি ছাড়লেন না, বাড়িওয়ালা আদালতের পেয়াদা এনেও ভাড়াটেকে ওঠাতে পারলেন না। শেষে যে ব্যবস্থা করলেন, তাতে শুধু সেই ভাড়াটে নয়, আমরা আশেপাশে যেসব লোক অন্য বাড়িতে ছিলুম তারাও পাড়া ছেড়ে পালালুম।

মশাই, এক ডজন গলা-ভাঙা লোক জড় করে ছিয়াত্তর না আটাত্তর ঘণ্টা অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তনের ব্যবস্থা হল। ওঃ, সে অসহ্য! থামাবে কে? ধর্মের ব্যাপার, পুলিসের আওতার বাইরে—কাছাকাছি মসজিদ, চার্চ, হাসপাতাল কিছু নেই, অতএব প্রাণ ভরে নাম গাও! সেই নামের ঠেলায় লোকেরা স্ব স্ব পিতৃদেবের নাম বিস্মৃত হয়ে গেছলো সে সময়।

একটু থাম্—রামঃ! বললে আবার বেশী মাতন শুরু হয়। অখণ্ড কীর্তন কি না, থামলেই বৈকুণ্ঠের সুতো ছিঁড়ে যাবে, অতএব চালাও! এইভাবে কেত্তন চলে, দোলের সময় বাড়ির পাশে থানা থাকলে খচখচ ঘচমচর ঠেলায় কর্ণকুহর বধির করে ছেড়ে দেয়—থামবার নাম কেউ করে না। সবই ভগবানের উদ্দেশে তো পাঠানো। ভগবান যদি এই আসুরিক চিৎকার শুনেও নিজের বাসা ছেড়ে না পালান, তা হলে 'থ্যাঙ্ক গড্' বলা ছাড়া আর কোন উপায় নেই আমাদের।

ঋষিরা বলেছেন, চরৈবেতি—আরও এগিয়ে চল বাবা, থেম না, তবেই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে পারবে, কিন্তু আমরা সেদিকে না এগিয়ে যত বিদ্‌ঘুটে ব্যাপারের দিকে যদি সর্বদা এগোতে থাকি, তা হলেই যে সর্বনাশ! অনেক ব্যাপারে থেমে যাওয়াটা যে নিতান্ত আবশ্যক—এটা বোঝানো যায় কী করে?

শিক্ষিত অশিক্ষিত কেউই তো বোঝেন না। বক্তা বক্তৃতা দিতে উঠলেন, বিশেষ অধ্যাপক বা কাগজের সম্পাদক হলে তো কথাই নেই—থামবার নাম করবেন না
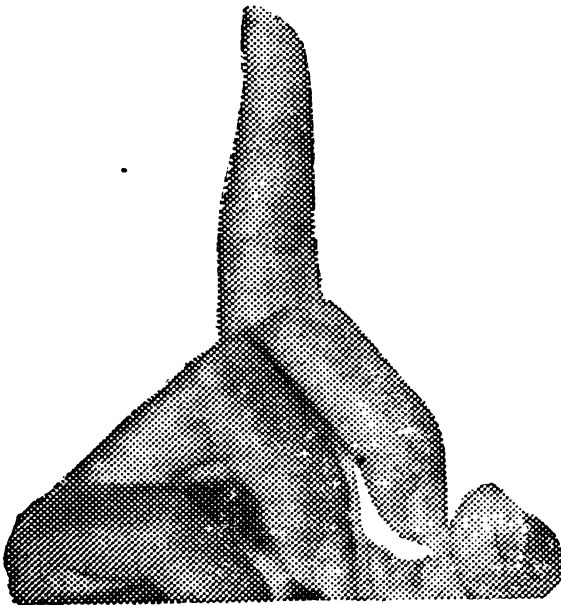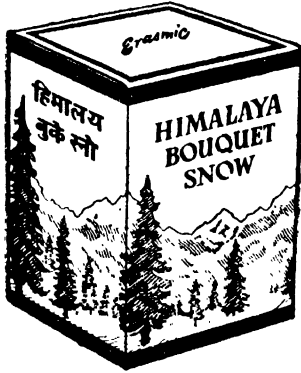
লোকে অতিষ্ঠ হয়ে প্রথমে মেঝেতে পা ঘষল, তারপর ঘনঘন বেমক্কা জায়গায় করতালি দিতে শুরু করল, আসনের অর্ধেক খালি হয়ে গেল—তবু হুঁশ নেই! পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞান শ্রোতাদের মগজে ঢুকিয়ে দিয়ে তবে তিনি মহাপ্রস্থান করবেন। ভবিষ্যতে আর কোন লোক এসে যে দুটো জ্ঞানের কথা বলে আপনার মাথার ফাঁক ভরাট করে যাবেন সে সুবিধে তাঁরা দেবেন না।

একবার একটি ইংরিজি কাগজে একটা কার্টুন বেরিয়েছিল—তার দুটি অংশ। প্রথম অংশে দেখা গেল—একটি বিরাট হল, লোক গিজগিজ করছে আর একজন বক্তা বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন। দ্বিতীয় অংশে পরিচিতি লেখা রয়েছে, "দু ঘণ্টা পরে"—সেই বক্তাই বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন, পাশে শুধু একটি লোক বসে আছেন। সমস্ত হল খালি, শূন্য চেয়ারগুলি শুধু পড়ে আছে। পরিশেষে বক্তা পরিতাপের স্বরে বলে উঠলেন, বড়ই দুঃখের বিষয়, আজকাল কেউ জ্ঞানের কথা শুনতে চায় না, মানুষকে ভাল কথা বলতে গেলে সে পালায়, কিন্তু সেরকম ধৈর্যশীল শ্রোতা যে একেবারে নেই তা বলতে পারি না, এখনও ভাল কথা শোনবার জন্য লোক রয়েছেন—নইলে, আমার পাশে এই এতক্ষণ একটি ভদ্রলোক ধৈর্য ধরে বসে থাকবেন কেন? আজকের অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা পর্যন্ত পালিয়ে গেছেন কিন্তু ইনি হল পরিত্যাগ করেন নি, ধৈর্যের প্রতিমূর্তি হয়ে বসে থেকে একটি আদর্শ শ্রোতার দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করে গেলেন, সেজন্য তাঁকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব ভেবে পাচ্ছি না।

তখন দ্বিতীয় বক্তা গম্ভীরভাবে বলে উঠলেন, 'ডোণ্ট ফরগেট্ স্যর, আই অ্যাম্ দি নেক্সট্ স্পীকার' অর্থাৎ আমি আপনার পরের বক্তা এইটে ভুলে যাবেন না।

আমার মনে হয় এর পরে কার্টুনে আর একটি অংশ আঁকা উচিত ছিল। "তিনঘণ্টা পরে"—দ্বিতীয় বক্তা বক্তৃতা করে চলেছেন, তিনি চেয়েও দেখছেন না যে তাঁর পাশে প্রথম বক্তা দাঁতমুখ ছরকুটে অজ্ঞান হয়ে চেয়ারে ঢ'লে পড়েছেন—একটি লোকও তাঁর চোখেমুখে জল দেবার জন্য উপস্থিত নেই।

বাস্তবিক কয়েকজনের কাণ্ডজ্ঞানহীন বিরাম-বিহীন বক্তৃতাপ্রবাহ মানুষকে অস্থির করে তুলতে পারে।

নারী পুরুষ কেউ কম যান না। বাড়িতে মহিলাদের দেখুন—সকাল থেকে কাকচিল বসবার জো নেই! চাকর, ঝি, ছেলেপুলে, কর্তা কাউকে ভাগে কম দেবেন না—স্বয়ং বীণাপাণি মহারাণীদের কণ্ঠে ভর করে জলতরঙ্গে ঝালা বাজিয়ে চলেছেন। এই হল না, ওই করলে না, একে দেখলে না, সেটা আনলে না, ওঁর জন্যে হাড়মাস ভাজা হয়ে গেল ইত্যাদি ভাল ভাল কথা কত শুনবেন শুনুন!

মহিলাদের এই অবিশ্রান্ত বকা একটা রোগ। প্রাতঃকাল থেকে রাত্তিরে যতক্ষণ না আড় হয়ে নাক ডাকাচ্ছেন, ততক্ষণ বকার বিরাম নেই।

সম্প্রতি একটি বিলিতি কাগজে পড়লুম যে কোন এক কুমারী চুয়ান্ন ঘণ্টা অবিশ্রান্ত বকে কথা-বলার রেকর্ড স্থাপন করেছেন। অবশ্য এ একটা এমন কিছু নয়—আমাদের নারীদের সঙ্গে পাল্লা দিতে এলে ঠাকরুণকে তিনবার ইংলিশ চ্যানেল পার করিয়ে দিত। এ বিষয়ে আমাদের মেয়েদের হারাবে, এটা ভাবতেও পারা যায় না।

তবে আমি কেবল ভাবি উক্ত মহিলাটির যিনি স্বামী হবেন, কিংবা হয়েছেন, তিনি যদি রামকালা না হন, তা হলে বেশীদিন ঘর-সংসার করতে পারবেন বলে তো মনে হয় না। এটা বললুম এইজন্যে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখেছি।

আমাদের এক ভবপিসী—পিসেমশাই সম্ভবতঃ তাঁর বচনের চোটে প্রাণত্যাগ করেছিলেন, সেই বিধবা মহিলাকে বত্রিশ বছর আমাদের বাড়িতে দেখেছি। প্রাতঃকাল ভোর চারটের সময় উঠে কলে গিয়ে চেঁচাতে শুরু করলেন, তারপর গঙ্গাস্নানে চেঁচাতে চেঁচাতে চললেন, ঘণ্টাদুয়েক পরে রাস্তায় চিৎকার করতে করতে ফিরলেন, সারাদিন লোকজন বাড়ির বৌ-ঝি প্রত্যেকের সঙ্গে ঝগড়া করে, রাত্তিরে ভাইপোদের আপিস থেকে ফেরার পর, প্রত্যেকের কুচ্ছো জানিয়ে, রাত বারোটা নাগাদ শুলেন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও বিড়বিড় করে বকতেন। এঁর

বিবরণী খবরের কাগজে বেরুলে, বোধ হয় একাদিক্রমে গালাগালি দেওয়ার রেকর্ড ভঙ্গ করার জন্য, আজকের দিনে কোন প্রতিযোগিতায় একটা মোটা রকমের পুরস্কার পেয়ে যেতেন।

অবশ্য শুধু পিসিরাই এরকম ব্যাপারে দোষী নয়, দু-চারজন পিসেমশাইও এদেশে আছেন যাঁদের বাচনিক সুধাবর্ষণের ফলে পৃথিবী অন্ধকার দেখতে হয়।

অত কথা ছেড়ে দিন—পরনিন্দে, পরের কেচ্ছা, বিশেষ যদি আবার তার সঙ্গে নারী জড়িত থাকে তা হলে লোকের কাছে তা খুব শ্রুতিমধুর লাগে, কিন্তু তারও পরিমাণ ঠিক না থাকলে যে মারপিট হয়ে যায়, এও স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি।

পাড়ায় চায়ের দোকানে সেধোবাবু আর কেঁদোবাবু বলে দুটি ভদ্রলোক সকাল সন্ধ্যে বসে বসে আড্ডা জমাতেন—কী ভাব উভয়ের! দুজনে যাকে বলে, হরিহর আত্মা। বয়েস উভয়েরই পঁয়ষট্টি পেরিয়ে গেছে তবু এ বয়সে দুজনের মধ্যে সর্বদা প্রীতির টাগ-অব্-ওয়ার্ চলত।

সেধোবাবুর শরীর খারাপ হলে কেঁদোবাবুর শরীর ম্যাজম্যাজ করত, আবার কেঁদোবাবুর সর্দিতে গলা খুসখুস করলে, সেধোবাবুর কাসি বেড়ে যেত। একজন কোনদিন একটু আসতে বিলম্ব করলে, অপরজন দোকানী-প্রদত্ত হুঁকোয় একটা টান মেরেই অপরের শরীরগতিকের খবর নিতে হনহন করে তার বাড়ির দিকে ছুটে যেতেন। এ হেন বন্ধুদের মধ্যেও একদিন শুধু এক ব্যাপারের পুনরাবৃত্তির ফলে, ছাতা পেটাপিটি হয়ে যাবার উপক্রম হল ও পরে মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। অথচ যে-জিনিসটাকে উপলক্ষ করে ব্যাপারটা ঘটল তা উভয়ের কারুরই স্বার্থবিরোধী ছিল না—শুধু একঘেয়ে ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি পরস্পরের মধ্যে ফাটল ধরিয়ে দিল।

ব্যাপারটা সংক্ষেপে বলি। সেধোবাবুর পাড়ায় কোন এক ভদ্রলোক নাকি চটে গেলেই তার স্ত্রীকে ঠেঙাতেন—এই সংবাদটি সেধোবাবু যেদিন বেশ রসিয়ে কেঁদোবাবুকে বললেন, সেদিন তিনি সেটি বেশ উপভোগ করেছিলেন। ঠেঙানো, ঠেঙানোর কারণ, স্ত্রীর চরিত্র, স্বামীর চরিত্র ইত্যাদি সবকিছু সংবাদ নিয়ে রীতিমত খুশীও হয়েছিলেন নিশ্চয়—নইলে সেধোবাবুর প্রাত্যহিক বক্তৃতার মধ্যে এটি একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হল কি করে?

প্রত্যহ এই ব্যাপার শুনতে শুনতে কেঁদোবাবু ক্রমশঃ অন্যমনস্ক হয়ে যেতে লাগলেন। অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করার চেষ্টা করতেও ক্রটি করলেন না। তাঁকে দূর থেকে আসতে দেখলেই বেশ গম্ভীর ভাবে খবরের কাগজ পাঠে মনঃসংযোগ করতে লাগলেন—সেধোবাবু কিন্তু খুঁটি ছাড়েন না—উক্ত নারী-পুরুষের নব নব কেচ্ছা শুনিয়ে চলেছেন।

কেঁদোবাবু একদিন লজ্জার মাথা খেয়ে বলেও ফেললেন, দূর ভাই, ছাড়ান দে ও-সব কথা, অন্য কথা পাড়্।

তাতেও সেধোবাবুর কোন অপ্রস্তুত ভাব লক্ষ্য করা গেল না। পরিশেষে বন্ধুকে দূর থেকে আসতে দেখলে কেঁদোবাবু পালাতে শুরু করলেন, কিন্তু এক পাড়ায় থেকে কদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকবেন? দেখা হতে লাগল আর কেচ্ছা শুরু হল—বুয়েছ কি না…

দিন পনেরো তাঁর হাত এড়াতে কেঁদোবাবু হাজারীবাগ পালিয়ে গেলেন, কিন্তু ফিরে আসতেই সেধোবাবু পাকড়ালেন তাঁকে। একটা দুটো অন্য কথা বলেই, বুয়েছ কেঁদো, তুমি তো ছিলে না, এতদিন তাই সব মজার কাণ্ড বলতে পারি নি…কাল রাত্তির দশটার সময়, আবার বুয়েছ কি না, বৌটাকে ধরে দিলে ঠেঙানি!

কেঁদোবাবু খেপে উঠে ছাতাটা বাগিয়ে ধরে হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠলেন, বেশ করেছে, ও তার বউকে ঠেঙিয়েছে, তোর বাবার কি? তোর বউ থাকে, তুই ঠেঙাগে যা। খবরদার, সেধো, ফের যদি ওই কথা আর তুলেছিস, তা হলে এই ছাতির বাঁট দিয়ে তোর মাথার ঘিলু আমি বার করে দেব—হঁা।

বাস্! সেই থেকে জন্মের মত ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

দেখুন, যথাসময়ে থামতে না জানলে অপরের কেচ্ছা শোনাও কী যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে। ঠিক সময়ে থামবার কৌশল না জানলে বিপদ ঘটবেই।

চতুর্দিকে আমাদের এত বিপদ ঘনিয়ে আসছে কেন? কারণ, আমরা থামতে জানি না। নাচ, গান, হুজুগ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শোভাযাত্রা, মহাপুরুষদের শ্রাদ্ধ, গালমন্দ কিছুই বাদ পড়ছে না—অবাধ, নিরঙ্কুশ, স্বাধীন ও অশ্রান্ত ভাবে আমরা একটা বিষয় নিয়েই অবিরাম মোচ্ছব চালিয়ে যাচ্ছি—থামবার নাম নেই আমাদের।

কিন্তু থামা দরকার। রসিক মাত্রই কোথায় থামতে হয়, ঠিক জানেন। ভগবানকে বলা হয়, রসো বৈ সঃ, তিনি রসস্বরূপ, প্রকৃত সুরসিক। তার প্রমাণ—যথাসময়ে তিনি আমাদের নাচনকোঁদন ও আস্ফালনকে একেবারে জন্মের মত থামিয়ে দেন। নচেৎ আমাদের অবিরত মুখভেঙানি দেখতে দেখতে ও শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী শুনতে শুনতে মানুষ বোধ হয় পাগল হয়ে যেত।

শিক্ষণীয়

রাণু ভৌমিক

ব্রহ্মা সরস্বতীকে বলিলেন, বৎসে, তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি—শ্রবণ কর।

আজ্ঞা করুন।—কৃতাঞ্জলিপুটে সরস্বতী দণ্ডায়মানা হইলেন।

উপবেশন কর।

ব্রহ্মা বলিলেন, তুমি সভ্যতার সংজ্ঞা জানিতে চাহিয়াছ?

সরস্বতী সম্মতিসূচকভাবে মাথা নাড়িলেন।

অপ্রকৃতকে প্রকৃতরূপে চালানোই সভ্যতা।

সে কি!—সরস্বতী চমকাইয়া ওঠেন।

নিম্নে দৃষ্টিপাত কর।—ব্রহ্মা বলিলেন, কিছু দেখিতেছ কি?

অসংখ্য মণিমাণিক্যখচিত দ্যুতিময় ভূষণ-ভূষিতা এক নারী। এ যে ঐশ্বর্যের দীপ্তিতে ইন্দ্রাণীকেও পরাজিত করে…

ইহা গ্রহণ কর।—একখণ্ড স্বচ্ছ ধাতব পদার্থ ব্রহ্মা সরস্বতীর হাতে দিলেন।

এ কি! কোথায় হীরকদ্যুতি, মুক্তার স্বচ্ছতা, স্বর্ণের ঔজ্জ্বল্য!

নকল।—ব্রহ্মার মুখে মৃদু হাসি।

আবার দৃষ্টিপাত কর।—পরক্ষণেই আদেশ করেন তিনি: কি দেখিতেছ?

কি অপূর্ব সুন্দরী!—সরস্বতীর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ: স্বর্গের উর্বশীও এত সুন্দর নয়।

মর্ত্যের লোকদেরও সেই ধারণা। তাই ওর নাম উর্বশী-উত্তমা। কিন্তু…

কিন্তু কি?

আমার মত ভিন্ন।

কেন?

প্রত্যুত্তরে ব্রহ্মা সেই ধাতব পদার্থটি আগাইয়া দিলেন। মুহূর্তেই সেই অপরূপার কৃত্রিম পোশাকের নীচের থলথলে দেহ এবং মুখ-অঙ্গরাগের অন্তরালে বলিরেখাঙ্কিত কুৎসিত মুখ প্রকট হইয়া উঠিল।

ওইদিকে দেখ।—ব্রহ্মা আবার বলিলেন।

সরস্বতী দেখিলেন, অধ্যয়নক্লিষ্ট শীর্ণদেহ কয়েকটি ছাত্র প্রাণপণে লিখিবার বিফল চেষ্টা করিতেছে এবং তাহাদের পাশে বসিয়াই ধূম্রপানকলঙ্কিত হস্তে একটি ছাত্র পুস্তক দেখিয়া মহানন্দে লিখিয়া যাইতেছে। ছেলেটির পাশে একটি কাগজে ছোরা ও লাঠি অঙ্কিত এবং সে মধ্যে মধ্যে কোন একটি গানের সুর ভাঁজিতেছিল। ব্রহ্মা গম্ভীরমুখে বলিলেন, এই ছেলেটিই সমবেত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী নম্বর পাইবে।

ক্রুদ্ধা সরস্বতী বিনা বাক্যব্যয়ে ব্রহ্মার হাত হইতে ধাতব পদার্থটি ছিনাইয়া লইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই শিহরিয়া উঠিলেন, এ কি! এই ব্যক্তি সাহিত্যসম্রাট সম্মানে ভূষিত হইতেছে! ইহাকে যে আমি অশ্লীল অর্বাচীন লেখার জন্য অভিশাপ দিয়াছিলাম।

সে অভিশাপে ইহার কিছুই হয় নাই। কারণ, তোমার আশীর্বাদপুষ্ট প্রাচীন সাহিত্যিকদের নকল করিয়াই ইহার সাহিত্যকীর্তি। মজা এই যে—

কি?—প্রশ্ন করেন সরস্বতী।

পুরস্কারদাতা বিচারকরাও জানেন যে ইনি পরস্মৈপদী।

তবে? রুদ্ধকণ্ঠে সরস্বতী জানিতে চাহেন।

তবে! নকলকে আসলের মত চালানই সভ্যতা।

ভ্রূকুটিকুটিল চোখে সরস্বতী ব্রহ্মার দিকে তাকান। হঠাৎ তাঁহার মনে হয় ব্রহ্মার অপর তিনটি মুখ সম্মুখের মুখটি অপেক্ষা অনেক সুন্দর। সেই মুখগুলির হাসি অনেক বেশী স্বর্গীয়, চোখের দীপ্তি উজ্জ্বলতর। তিনি ধাতব পদার্থটি ব্রহ্মার দিকে তুলিয়া ধরেন। ব্রহ্মা দ্রুত সরিয়া গিয়া স্বীকারোক্তির ভঙ্গীতে বলেন, নকল।

ফুলের জলসায়

দক্ষিণারঞ্জন বসু

এমনটি আর কোথাও দেখি নি। দেশে-প্রবাসে কোথাও না। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানিক্যাল মিউজিয়ামে এসে আমার চোখ যেন জুড়িয়ে গেল। এতক্ষণে দুটি চোখ আমার যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। চারদিকে শুধু প্রাসাদ আর প্রাসাদ। শুধু অন্তহীন ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি। মন পীড়িত হয়ে উঠেছিল তাতে। একটু ব্যতিক্রম খুঁজছিলাম। ইট কাট লোহা পাথরের এই রুক্ষতার মধ্যে একছিটে মিষ্টি সবুজের রেখা খুঁজে পেতে চাইছিলাম।

যা চেয়েছিলাম, এখানে এসে তাই পেলাম। বরং বেশীই পেলাম। এই বোটানিক্যাল মিউজিয়ামে দেখলাম, দিকে দিকে যেন অসংখ্য প্রজাপতির ভিড় জমেছে। যেন রামধনুর রঙ মুখে মেখে হাজার রকমের ফুল এখানে চোখ মেলেছে। কী তার তীব্র আকর্ষণ! কী তার নয়নাভিরাম রূপ! একবার তাতে চোখ লাগলে সে চোখ যেন আর ফেরানো যায় না। আমিও পাঁতিপাঁতি করে সে ফুলের উৎসব লক্ষ্য করছিলাম। লক্ষ্য করছিলাম আর ভাবছিলাম, কোথায় এলাম, কোন স্বর্গের নন্দন কাননে!

আমার সঙ্গে স্টুডেণ্ট গাইড। সে জিজ্ঞেস করল, কেমন লাগছে?

সুন্দর, চমৎকার!

হ্যাঁ, এ ফুল যে দেখে সেই মুগ্ধ হয়। সবাই এর প্রশংসা করে।

নিশ্চয়ই করবে। সুন্দর মুখ আর সুন্দর ফুলের প্রশংসা না করে উপায় কী? নইলে যে—

খুনী বলে ঠাওরাবে সকলে, না?—গাইড আমার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে হাসল। সেই হাসির স্ফুলিঙ্গ লাগল তার দুটি চোখেও। আমিও হাসলাম। বললাম, সে কথা তো কবিরা বলেছেন। দার্শনিকরাও বলেছেন। পৃথিবীর সকল ভাষার সকল সাহিত্যেই তা বলা হয়েছে। যা সুন্দর তা-ই আনন্দময়। তাই কল্যাণের আকর। সর্বত্র তার সমান আকর্ষণ। কিন্তু একটা কথা যে কিছুতেই বুঝতে পারছি নে।

কি? বলুন সে কথা।

সেই সুন্দরকে এখানে খাঁচায় আটকানো হয়েছে কেন? ওই কাচের খাঁচায়? এ কি তোমাদের ভোগমুখী সভ্যতার উৎকট লক্ষণ? যাকে চাই, তাকে বেঁধেছেদে আপন করে চাই। সে যেন কোনমতেই হাতের মুঠো থেকে ফসকে যেতে না পারে সেজন্য সতত হাস্যকর চেষ্টা।

আপনি কি এই ফুলগুলোকে কাচের বাক্সে রাখবার কথা বলছেন?

হ্যাঁ, আমি উত্তর দিলাম।

ছাত্রটি বলল, ওগুলো যে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অমূল্য সম্পদ মিস্টার বোস। শুধু এই উত্তর আমেরিকায়ই নয়, সারা দুনিয়া জুড়ে এ ফুলের সুখ্যাতি। এগুলো তো খুব যত্ন করেই রাখা প্রয়োজন।

ফুল ফুটবে, আবার ঝরবে। একদিন যে হেসেছিল আবার একদিন তার চোখে নামবে কান্না। এই কান্নার পর আবার একদিন হেসে উঠবে সে। আবার ফুল ফুটবে। এইভাবেই চলবে তার পরিক্রমা। কিন্তু কোনো ফুলকেই তো শাশ্বত করে রাখা যায় না। চিরকাল তার হাসিকে ধরে রাখা যায় না। সেই অসম্ভবকে সম্ভব করার এমন খেয়াল হলো কেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের?

গাইড আবার হাসল আমার কথা শুনে। আবার সেই হাসির ঢেউ লাগল তার স্বচ্ছ দুটি চোখের পাতায়। সে বলল, আপনি কি আসল ফুলের কথা বলছেন মিস্টার বোস?

হ্যাঁ। তাই তো।

কিন্তু এগুলো তো আসল ফুল নয়।

আসল ফুল নয়! তবে?—একটা বিস্ময় যেন আমার দু চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এল।

ছাত্রটি বলল, কাছে এসে দেখুন, এ সবই কাচের ফুল। বিচিত্র বর্ণের কাচ দিয়ে এ সব ফুল ও ফুলগাছ
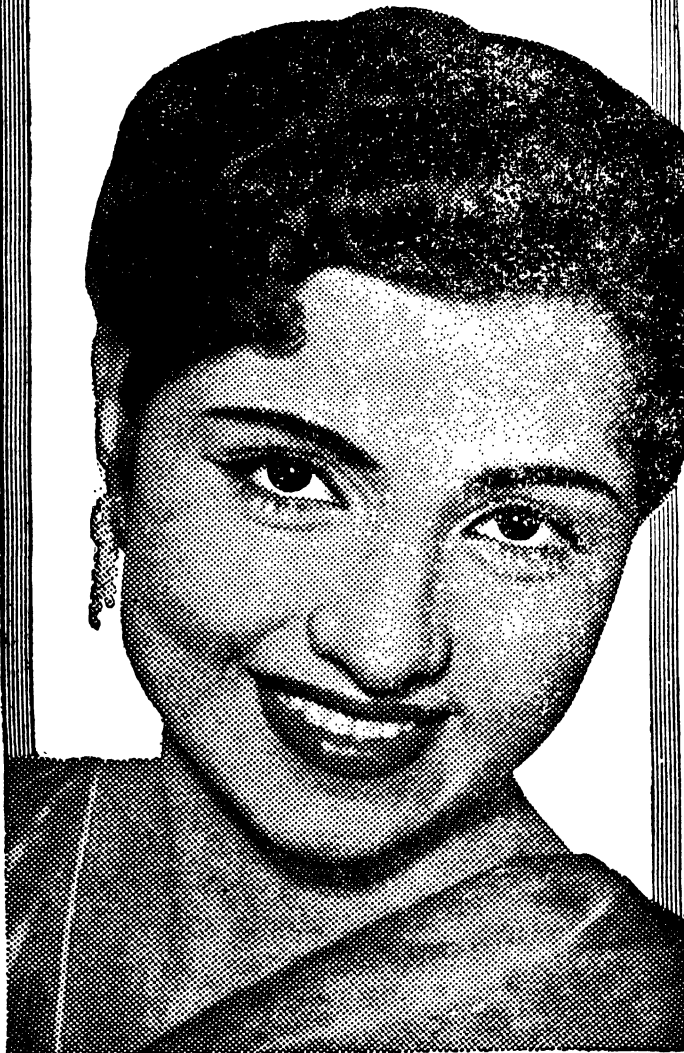
এবং কোথায়ও বা তার ফল গড়ে তোলা হয়েছে। খুব পাকা জহুরী না হলে দূর থেকে আসল-নকলের ব্যবধানটি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারবে না। আসলে, আসল আর নকলের ব্যবধানও খুব একটা নেই। আপনি নিজেই একবার লক্ষ্য করে দেখুন না।

গাইডের কথায় গ্লাস-কেসের খুব কাছে এসে মাথা নুইয়ে বেশ ভালো করে ফুলগাছগুলোর বৈশিষ্ট্য বুঝে নেবার চেষ্টা করলাম। আসল-নকলের তফাত ধরা পড়লো এতক্ষণে।

সত্যি তো! খুব নিপুণ শিল্পী এগুলো গড়ে তুলেছে। তাদের একাগ্রতা, তাদের সাধনা যেন বাঙ্ময় হয়ে আছে এখানকার প্রতিটি লতায়, প্রতিটি পাতায়, প্রতিটি ফুলে। শিল্পীর সাধনায় এখানে রচিত হয়েছে একটি অপরূপ উদ্যান।—গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে আমি মুগ্ধ হলাম। মুগ্ধ হয়ে উন্মুখ হয়ে উঠলাম এ উদ্যানের সৃষ্টির ইতিহাস ও স্রষ্টার পরিচয় জানবার জন্য। আমার গাইডই সে ব্যবস্থা করে দিল। তার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠানের একজন পরিচালকের সঙ্গে যোগাযোগ হলো।

মিউজিয়ামের সেই কর্তাব্যক্তির মুখেই এই উদ্যান-রচনার ইতিহাস শুনছিলাম। জার্মাণ শিল্পী লিওপোল্ড ব্লাচকা (Leopold Blaschka) ও তাঁর ছেলে রুডলফ হলেন এই কৃত্রিম মালঞ্চের স্রষ্টা। কাজটা আরম্ভ করেছিলেন শিল্পী লিওপোল্ড। ১৮৭৭ সন থেকে ১৮৯৫ সন পর্যন্ত দীর্ঘ আঠার বছর ধরে কাজ করার পর লিওপোল্ডের ওপারের ডাক এল। তিনি মারা গেলেন। পিতার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার জন্য এগিয়ে এলেন শিল্পী রুডলফ। ১৮৯৫ সন থেকে ১৯৩৬ সন পর্যন্ত তিনি কাজ করলেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি শ্রেণীর ফুলের একটি করে নমুনা এখানে ধরে রাখার পরিকল্পনা ছিল গোড়াতে। যদিও সে উদ্দেশ্য সফল হয় নি তবুও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৬৪টি কুসুম-পরিবারের অন্ততঃ সাত কোটি ফুলের নমুনা আছে এখানে। আছে নানান রকম ফল। আছে বিভিন্ন ফলের পর্যায়ক্রমিক বিবর্তনের নমুনা। আছে হাজার হাজার ফুলের বিভিন্ন অংশের বিবর্ধিত উদাহরণ। দর্শকেরা এ দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়। ছাত্ররা এ দেখে শেখে। কাজেই এই কৃত্রিম উদ্যান একদিকে যেমন মানুষের সৌন্দর্যের তৃষ্ণা মিটিয়ে চলেছে, অন্যদিকে পূর্ণ করছে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রয়োজন।

পরে দেখলাম, এই উদ্যানের সৃষ্টির কথা ও স্রষ্টাদের সংক্ষিপ্ত সচিত্র পরিচয় সামনেই বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে গ্লাস-কেসের মধ্যেই।

ফিরে আসবার পথে আমার গাইডকে আবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, এমন সুন্দর সৃষ্টিকে তোমরা পিঞ্জরবন্দী করে রেখেছ কেন?

আমার প্রশ্নে যেন আঁতকে উঠেছিল গাইড। খানিকক্ষণ তাকিয়েছিল আমার মুখের দিকে। তারপর বলেছিল, সবচেয়ে মূল্যবান জিনিসকে আপনারা কোথায় রাখেন? নিশ্চয়ই রাস্তায় ছড়িয়ে রাখেন না।

ছাত্রটির এ কথার ইঙ্গিত মোটেই অস্পষ্ট নয়। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানিক্যাল মিউজিয়ামের এই কৃত্রিম উদ্যানকে কর্তৃপক্ষ খুব মূল্যবান সম্পত্তি বলে বিবেচনা করেন। এবং সত্যি সত্যি এ তাই। তারই জন্য এর সংরক্ষণের এমন সুন্দর ব্যবস্থা। সেদিন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সুন্দর ফুলের জলসা থেকে প্রসন্ন মনে হোটেলে ফিরছিলাম। সে রঙ মন থেকে আজও মুছে যায় নি। কোনদিনই যাবে না।

অথ পাঠক-কথা

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

এদেশে পাঠক নিয়ে চিন্তা শুরু হয়েছে দীর্ঘদিন আগে। এ যুগে নয়, পুরাকালে। সত্যদ্রষ্টা মুনি ঋষিরাই এই চিন্তা শুরু করেছিলেন। শ্রুতি বলেছেন, সাধারণ পাঠক আর ব্রহ্মতত্ত্ব পড়ছে না, শিষ্যরাও তা বর্জন করতে চাইছে গুরুত্বের জন্য। অর্থাৎ সমাজটা হালকা হয়ে গেছে। ভারি কিছু পড়াতে হলে তাকে লঘুভাবে পরিবেশন করতে হবে। এই প্রয়োজনেই সাহিত্যে নতুন রীতির প্রবর্তন হল। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্ব পরিবেশন করা হল গল্পের আকারে।

রাজর্ষি জনকের অশ্বমেধ যজ্ঞে নানা দেশ থেকে বহু ব্রাহ্মণ উপস্থিত হয়েছেন। রাজর্ষির ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা শোনবার ইচ্ছা হল। তিনি এক সহস্র পয়স্বিনী গাভীর প্রতি শৃঙ্গে দশটি স্বুবর্ণ পদক বিলম্বিত করে রাজসভায় ঘোষণা করলেন: যো বো ব্রহ্মিষ্ঠঃ স এতা গা উদজতাম্। মানে, আপনাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্ তিনি এই সহস্র গাভী অনুগ্রহ করে গ্রহণ করুন।

সভাস্থ সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন। এ বড় দুঃসাহসের কাজ, অহঙ্কারের কাজও বটে। কেউই উঠে দাঁড়াতে সাহসী হচ্ছেন না। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য হঠাৎ তাঁর শিষ্যকে আদেশ করলেন: সামশ্রব, এই গাভী আমার আশ্রমে নিয়ে যাও।

কী!—সমবেত কণ্ঠে গর্জন করে উঠলেন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়: এত বড় স্পর্ধা! তবে এস, বিচার হোক।

বিচার শুরু হল। রাজর্ষি জনকের সভাপতিত্বে তর্ক-যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। অশ্বল, আর্তভাগ, ভুজ্যু, উষস্ত, কাহাল—একে একে সকলেই পরাস্ত হলেন। তারপর উঠলেন বচক্নু কন্যা ব্রহ্মবাদিনী গার্গী, ভারতের শ্রেষ্ঠ মনস্বিনী। গল্প জমে উঠল।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ আমরা পড়ি না। ছোট ছোট নিবন্ধে পড়ি গার্গী যাজ্ঞবল্ক্য বিচার, কিংবা মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ—যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্?

প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগে মহাভারতের যুগেও এই ক্ষোভ দেখেছি। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস দেখলেন যে, দিন দিন মানুষের স্মৃতি কমে আসছে। সকল শিষ্যের সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ স্মরণ রাখা আর সম্ভব হচ্ছে না। বেদ তখন ত্রয়ী নামে পরিচিত। ত্রিধা বিভক্ত—ঋক্, সাম, যজুঃ। ঋগ্বেদে পদ্য, সামবেদে গীত ও যজুর্বেদে গদ্য অংশ। বেদব্যাস এই বেদকে চার ভাগ করলেন। যাগযজ্ঞে অপ্রয়োজনীয় অংশকে অথর্ববেদের অন্তর্গত করলেন। তাতেও সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। দেখছিলেন যে, শিষ্যরা পরিশ্রমী নয়। বেদের শিক্ষা আরও সহজে তাদের বিতরণ করতে হবে। তাই একখানা সরল গ্রন্থ লিখলেন। প্রাচীন ইতিবৃত্ত ও উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে বেদের অর্থপ্রচারের চেষ্টা করলেন। এই গ্রন্থের নাম হল পুরাণ-সংহিতা। তার শ্লোকসংখ্যা চার লক্ষ। বেদব্যাস বেদ পড়ালেন চারজনকে, ও পুরাণসংহিতা ছয়জন শিষ্যকে। এঁদের মধ্যে তিনজন আরও তিনখানি পুরাণ রচনা করলেন। শিষ্যদের নামে নাম হল সাবর্ণি সংহিতা, শাংশপায়ন সংহিতা ও অকৃতব্রণ সংহিতা। এই থেকেই আঠার মহাপুরাণ ও ছত্রিশ উপপুরাণ। একশো বছরের মধ্যেই এই সমস্ত রচনা সম্পূর্ণ হয়ে গেল। মহর্ষি শৌনক নৈমিষারণ্যে যে যজ্ঞ করেছিলেন, সে সময় সমস্ত পুরাণ পাঠ করে শোনানো হল।

এ তো গেল সে যুগের পাঠকের কথা। এ যুগের

পাঠকের কথা এখনও কেউ লেখেন নি। তবে এ যুগের মানুষের কথা লেখা হয়েছিল কল্কিপুরাণে।

আশ্চর্যের কথা এই যে, আঠারটি মহাপুরাণ আর ছত্রিশ উপপুরাণের তালিকায় কল্কিপুরাণের স্থান নেই। মহাভারত ভাগবত ও অন্যান্য অনেক পুরাণে কল্কি অবতারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। কলিকালে কল্কি অবতার হবেন। এখনও তাঁর জন্ম না হয়ে থাকলেও কলিকালের মানুষের কথা সত্যে পরিণত হয়েছে। রামের জন্মের পূর্বে যেমন রামায়ণ রচনা, তেমনি কল্কিপুরাণ। কলির আবির্ভাবের অনেক আগেই পুরাণকার কলিযুগের বর্ণনা করে গেছেন।

পুরাণকার বললেন :

> প্রতিদানে ক্ষমাশক্তৌ বিরক্তিকরণাক্ষমে।
> বাচালত্বঞ্চ পাণ্ডিত্যে যশোঽর্থে ধর্মসেবনম্ ॥

ক্ষতি করতে না পেরে মানুষ ক্ষমা করবে, আর বিরাগ দেখাবে অক্ষমের প্রতি। পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্য লোক বাচাল হবে, আর ধর্মসেবা করবে যশের জন্য।

তারপর :

> ধনাঢ্যত্বঞ্চ সাধুত্বে দূরে নীরে চ তীর্থতা।
> সূত্রমাত্রেণ বিপ্রত্বং দণ্ডমাত্রেণ মস্করী ॥

ধনী হলেই লোকে সাধুর সম্মান পাবে, আর দূরদেশের জলকেই তীর্থ মনে করবে। গলায় সূত্র নিয়েই লোকে বিপ্র হবে, আর দণ্ড হাতে নিলেই হবে পরিব্রাজক।

পুরাণকার নারীকেও বাদ দেন নি। বলেছেন :

> স্ত্রিয়ো বেশ্যালাপসুখাঃ স্বপুংসা ত্যক্তমানসাঃ।

আর :

> স্ত্রিয়ো বৈধব্যহীনাশ্চ স্বচ্ছন্দাচরণপ্রিয়াঃ।

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আর মন থাকবে না, তারা বারনারীর মত আলাপ-সুখে মত্ত হবে। আর স্বেচ্ছাচারিণী হবে। কাজেই বিধবা তারা কোনদিন হবে না।

পুরাণকার নিজেও তাঁর পাঠক সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তাই কালিদাসী ঢঙে বর্ণনা করেছেন :

> তস্যাঃ স্মরক্ষোভ নিরীক্ষণেন
> স্ত্রিয়ো বভূবুঃ কমনীয়রূপাঃ ॥
> বৃহন্নিতম্বস্তনভারনম্রাঃ
> সুমধ্যমাস্তৎ স্মৃতিজাত রূপাঃ ॥

তাঁর নায়ক কল্কি যখন সিংহলরাজকন্যা পদ্মাবতীর প্রথম সাক্ষাৎ পাচ্ছেন, তাঁর সেই নায়িকা-সম্ভাষণ উদ্ধৃত না করাই ভাল। এখনও বোধ হয় সমাজে সে অবস্থা আসে নি। তবে আসতেও আর বোধ হয় বেশী দেরি নেই। আধুনিক সাহিত্যে তার লক্ষণ ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে।

এদেশে যে একদিন হিন্দু কোড বিল পাস হয়ে সামাজিক জীবনে স্বাধীনতা অবাধ হবে, বাল্মীকি বেদব্যাস তা জানতেন না। তা জানলে বলতেন না যে, ধর্মের জয় হবে। এ কথা বলে আর পাঠকের মনোরঞ্জন করা যায় না। বর্তমানের লেখক তাঁর প্রাণমন অর্পণ করছেন পাঠকের মনোরঞ্জনে। সাহিত্য কি সমৃদ্ধ হচ্ছে ?

দুটি পাতা ও একটি কুঁড়ি

নারায়ণ দাশশর্মা

১। প্রথম পাতা: স্ট্যাটিস্টিক্স

ইংরেজীতে যে বলে থাকে, মিথ্যা তিনরকম—মিথ্যে, ডাহামিথ্যে আর স্ট্যাটিস্টিক্স; আমরা, স্বভাবতঃ মিষ্টভাষী বাঙালীরা, তেমন করে বললে পরিসংখ্যান-বিজ্ঞানের ওপর বড়ই অন্যায় করা হবে। ওই ইংরেজী প্রবচনটির বাংলা অনুবাদ হওয়া উচিত এই: সত্য তিনরকম—সত্যি, বউয়ের কাছে তিন সত্যি, আর পরিসংখ্যান।

সেই গল্পটা আপনারা সবাই শুনেছেন। সেই যে, দক্ষিণ আফ্রিকার জাঁদরেল প্রধানমন্ত্রী স্মাট্‌স যখন কালা আদমীর চাইতে সায়েবরা ক্রমবিবর্তনের ধাপে দু-সিঁড়ি উঁচুতে রয়েছে এই তথ্যটা পার্লামেন্টে প্রমাণ করার জন্যে জুতসই স্ট্যাটিস্টিক্স চেয়ে পাঠালেন পরিসংখ্যানের সেবা পণ্ডিতের কাছে; আর তিনদিন তিনরাত একনাগাড়ে লাইব্রেরীর পর লাইব্রেরী ঘেঁটে শেষ করেও সেই পণ্ডিত মশাই পরিসংখ্যান কায়দা করতে পারলেন না; তখন স্মাটস্ সায়েব যা করেছিলেন—সেই গল্পটা? ঝুড়ি ঝুড়ি সংখ্যার ফুলঝুরি ফুটিয়ে পার্লামেণ্টকে হতবাক করে তারপর বুড়বাক্ হয়ে যাওয়া পণ্ডিতের বিস্ময়কে আশ্বস্ত করেছিলেন উনি এই কথা বলে, "আরে মশায়, আপনিই যে পরিসংখ্যান কায়দা করতে পারলেন না তিনদিন বসে, পার্লামেন্টের সাধ্য কি তিনঘণ্টার মধ্যে সেইসব বানিয়ে বলা সংখ্যার ভুল ধরবে?"

এ গল্পটা, আমার বিশ্বাস, একেবারেই বানানো গল্প। কিন্তু পরিসংখ্যান নিয়ে যত কথা শুনেছেন তার সবগুলো বানানো নয় তাই বলে।

যেমন ধরুন, যে ভদ্রলোক ভাঁটার সময় খিদিরপুরের ছোটগঙ্গা হেঁটে পেরোতে গিয়ে সে-বছর ডুবে মারা গিয়েছিলেন তিনি যে সেচ-বিভাগের পরিসংখ্যান থেকেই জেনেছিলেন, ভাঁটার সময় টালির নালার গড়পড়তা গভীরতা মাত্র দু ফুট দেড় ইঞ্চি—এটা তো আর বানানো কথা নয়। চার ফুট আর শূন্য ফুটের গড় যে মাত্র দু ফুট, এই সোজা কথাটা না বোঝাতেই এই বিপত্তি। গড়ের গড়খাইতে নিমজ্জন।

গড়ের মজায় শুধু ইনি নন, অনেকেই মজেছেন আরও। বিলেতের 'পাঞ্চ' পত্রিকা একবার গড়ের পায়ে গড় করে লিখেছিল, "সরকারী পরিসংখ্যান থেকে জানতে পারলুম, এদেশের প্রত্যেকটি পূর্ণবয়স্কা স্ত্রীলোকের গড়পড়তা ২·২-টি করে সন্তান আছে; আমরা বলি কি, ওই দশমিক ভগ্নাংশ বাচ্চা নিয়ে মেয়েদের নিশ্চয়ই ভারী অসুবিধে হচ্ছে, সরকার থেকে সাহায্য-টাহায্য দিয়ে আরও আট দশমিক সন্তান প্রসব করার জন্যে ওদের উৎসাহ দেওয়া উচিত, যাতে করে প্রতিটি মায়ের ছেলে-পুলের সংখ্যা ভাঙাচোরা না থেকে গোটা-গোটা হতে পারে।" এমন একটা সঙ্গত প্রস্তাবে কেন যে ব্রিটিশ সরকার কান দেন নি আমি তো কিছুতেই ভেবে পাই না।

ব্যাঙ্কশাল কোর্টে আমি সেদিন এক লরি ড্রাইভারের সাফাই শুনেছিলাম। বেচারী নাকি কাকে চাপা দিয়ে ভবযন্ত্রণা ঘুচিয়ে দিয়েছিল। পুলিস বলে, লরিটা ঘণ্টায় আশি মাইল বেগে ছুটছিল সে-সময়; কিন্তু পরিসংখ্যান দেখিয়ে ড্রাইভার প্রমাণ করে দিলে মশাই, যে তার গাড়ির স্পীড গড়পড়তা ঘণ্টায় পাঁচ মাইলেরও কম ছিল। কেন না, চাপা দেবার আগেকার চব্বিশ ঘণ্টায় লরিটা মোট একশো আট মাইল রাস্তা চলেছে, অর্থাৎ একশো আট ডিভাইডেড বাই চব্বিশ ইকোয়েল্‌স্ টু চার পয়েণ্ট পাঁচ মাইল্‌স্ পার আওয়ার; গড় হিসাবে একরকম গড়িয়ে গড়িয়েই চলছিল গাড়িটা। তবু যদি কেউ তার নীচে চাপা পড়ে মারা যায় তবে ড্রাইভারের দোষ কী?

আমি তো সত্যি বলতে কি কোন দোষ দেখতে পেলাম না ওর। একটা লোক মারা গিয়েছে তা না হয় মেনেই নেওয়া গেল, কিন্তু লোকটা ওই লরির নীচে চাপা না পড়লেও তো মরতে পারত। ভেবে দেখতে গেলে, লোকটার মারা যাবার সময় তো আসলে ঢের আগেই হয়ে গিয়েছে ; বাঙালীর গড় আয়ু একুশ বছর পার হবার পরও সে যে বেঁচেছিল তা থেকেই বোঝা যায় পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের ওপর লোকটার একদম শ্রদ্ধা নেই ; গড় সম্বন্ধে একদম আইডিয়া নেই ওর ; কাজেই, আইডিয়ার একান্ত অভাববশতঃই, গড়ে পাঁচ মাইল স্পীডে চলা একটা গাড়ির ধাক্কায় অক্কা পেয়ে সেই জ্ঞানহীন লোকটা অবশেষে প্রমাণ করে গেল—স্ট্যাটিস্‌টিক্সকে হেলাফেলা করা কতখানি বিপজ্জনক।

২। দ্বিতীয় পাতা ঃ পলিটিক্স

ইংরেজদের আর একটি কহাবৎ হচ্ছে, দেয়ার ইজ্ নাথিং আন্‌ফেয়ার ইন্ লভ অ্যাণ্ড ওয়ার—প্রেমে ও রণে অন্যায় বলে কিছু নেই। আমরা, বাঙালীরা, ও দুটো ব্যাপারেই একরকম অভিজ্ঞ—সিনেমার প্রেম এবং ডকুমেন্টারীর যুদ্ধ পর্যন্তই আমাদের অধিকাংশের দৌড় ; দু-চারজনের কপালেই শুধু উড়ো আপদের মতন প্রেমের কটাক্ষ ও যুদ্ধের বোমা এক-আধটা স্প্লিণ্টারের খোঁচা দিয়ে থাকবে। কিন্তু অন্য একটা ব্যাপারে আমরা ইংরেজদের চাইতে সকলেই বেশী সুদক্ষ—তা হচ্ছে পলিটিক্স। আমরা তাই ইংরেজী ওই কহাবৎটি একটু বদলে নিয়েছি, দেয়ার ইজ নাথিং ফেয়ার ইন্ পলিটিক্স—রাজনীতিতে ন্যায় বলে কিছু নেই। সবই অন্যায়।

ইংরেজদের রাজনীতি তেমন একটা আসে না, এর কারণ বোধ করি ওদের রাজা আছে। অর্থ থাকতে যেমন অর্থনীতির মারপ্যাঁচ ভাল খেলতে চায় না মাথায়, রাজা থাকলেও তেমনি রাজনীতিতে উৎসাহ জাগতে চায় না প্রজাদের। অর্থনীতির প্রেরণা দেয় ফাঁকা পকেট, রাজনীতির প্রেরণা নৈরাজ্য। আমরা সবাই রাজনীতিবিদ্ আমাদের এই প্রজার রাজত্বে।

আর পলিটিক্স মানেই পার্টি-পলিটিক্স ; দলের মাদল না বাজাতে পারলে রাজনীতির মহুয়ায় আমরা তেমন সোয়াদ পাই না। আমরা তিন কোটি বাঙালী শেষ পর্যন্ত তিন কোটি দল বানাব হয়তো, কিন্তু দলছাড়া হয়ে পার্টির সাইনবোর্ড কপালে না টাঙিয়ে পলিটিক্স করতে পারব না। যত মত তত পথ নয়, আমাদের মটো হচ্ছে যত মাথা তত মত। না, তাই বা কেন, মাথার চাইতেও মতের সংখ্যা হবে বেশী ; যত লোকের মুখ থেকে রাজনীতির মত বেরোয় হামেশা, বাংলাদেশে তত লোকের সকলের কি মাথা আছে সত্যিই ?

এবং এরাই বলে থাকে, মাথা থাকলেই মাথা ঠোকাঠুকি হয়। তা হয়তো হয়—যেমন ভেড়ার মাথার সঙ্গে ভেড়ার মাথায় ; কিন্তু শুধু মাথা না থেকে তার মধ্যে যদি মগজ বলে একটুখানি নরম বস্তুও থাকে তবে মাথা থাকলেই ঠোকাঠুকি কেন হবে, আমি বুঝতে পারি না।

প্রত্যেকটি বাঙালীই রাজনীতিতে এক্সপার্ট হলেও এরই মধ্যে আবার নানান রকম ইতরবিশেষ আছে ; অর্থাৎ রাজনীতিবিদ্‌দের প্রত্যেকের ইতরতা একপ্রকার নয়, তাতে কারও কারও বিশেষ অধিকার আছে। চায়ের দোকানে, সিনেমা-ঘরের কিউতে, ট্রামে এবং রকে যাঁরা পলিটিক্স করেন, অন্যত্র নয়—তাঁরা হচ্ছেন সৌখীন পলিটিশিয়ান ; পলিটিক্স এঁদের পেশা নয়, কেন না ভাল হোক, মন্দ হোক, অন্য একটা পেশা আছে এঁদের : কারও পেশা কলম পেষা, কারও বিড়ি পাকানো, কারও বা শুধু বেকারী। যাঁদের এসব কিছু নেই, তাঁরা হন পেশাদার পলিটিশিয়ান। আমাদের ছেলেবেলায় যাঁরা অন্য কিছু করার কায়দা না পেয়ে হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিশ করতেন, আমাদের ছেলেদের আমলে এখন সেই গুড-ফর-নাথিং-এর দল পলিটিক্সের পেশাদার হন। সে যুগে নামের সঙ্গে ওঁরা জুড়তেন এইচ-এম্-বি ; এ যুগে এঁরা জোড়েন এইচ্-এম্-ভি—হিজ মাস্টার্স ভয়েস।

জানি, বন্ধুরা আমাকে সিনিক বলবেন ; আর শত্রুরা আন্দাজ করবেন, নিশ্চয় আমি গত ইলেকশনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে দাঁড়িয়েছিলাম এবং আমার জামানত বাজেয়াপ্ত

হয়েছে। কিন্তু ছিটগ্রস্তই বলুন আর ইলেকশনে মার খাওয়াই বলুন, পলিটিক্স এবং পলিটিশিয়ান সম্বন্ধে আমার ধারণা আমি বদলাতে পারব না।

যীশুখ্রীষ্ট বলেছিলেন, পাপকে ঘৃণা কর কিন্তু পাপীকে নয়। সেই উপদেশ ভেঙেচুরেই আমরা অনেকে ইষ্টমন্ত্র বানিয়েছিঃ ঘুষকে হজম কর কিন্তু ঘুষিকে নয়। সে পর্যন্ত যদি বা আমি সহ্য করতে প্রস্তুত, তবু এ কথা আমি শুনব না যে পলিটিশিয়ানকে বর্জন করেও আমাদের পক্ষে পলিটিক্সকে বর্জন না করা সম্ভব। প্রথমটিকে যদি আমি 'স্থানত্যাগেন' মন্ত্রে পূজা করি, তবে শেষেরটিকেও অন্ততঃ 'হস্তসহস্রেণ' মন্ত্রজপে এড়িয়ে চলব।

কেন না, সংবিধানের খসড়াপ্রণেতা স্বর্গত ভীমরাও আম্বেদকার তাঁর তপশীলী দলের জন্য যে নির্বাচনী প্রতীক বাছাই করেছিলেন, তা আসলে—বুদ্ধিমান ছিলেন তিনি—আমাদের দেশের পলিটিক্সেরই যথার্থ প্রতীক। অন্নহীন, বস্ত্রহীন, গৃহহীন, শিক্ষাহীন, উদ্যমহীন, বিবেকহীন চল্লিশ কোটির পশুশালায় পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের ছায়ানুসারী যে রাজনীতি—তা একটি বিরাটকায় শ্বেতহস্তী ছাড়া আর কী?

৩। একটি কুঁড়িঃ ফিলসফি

আত্মার তত্ত্ব বোঝবার জন্য নচিকেতাকে যমালয় পর্যন্ত ধাওয়া করতে হয়েছিল; আমার জ্ঞানস্পৃহা এবং দুঃসাহস দুই-ই নচিকেতার চাইতে অনেক কম—আমি যমের বাড়ি না গিয়ে যমুনার বাড়িতে গিয়েছিলাম পরশু সন্ধ্যেবেলায়।

যমের বোন যমুনা নয়, এ যমুনা আমার স্ত্রীর বোন—শালী। শালী বলেই তাচ্ছিল্য করবেন না যমুনাকে; সে ফিলসফিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, কলেজের অধ্যাপিকা।

ঝাড়া আড়াই ঘণ্টা ইংরেজী-বাংলা-সংস্কৃত-পালি নানান ভাষায় কত না শাস্ত্র থেকে কোটেশন শুনিয়ে শুনিয়ে নানারকম আত্মার ব্যাখ্যা বোঝাল সে। কিন্তু আমার মাথায় যদি একটুও ঢুকত সে সব!

শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে ফিলসফিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট যমুনা একেবারে অদার্শনিক শালীজনোচিত কপট কোপ দেখিয়ে বলল, "আত্মা কি আপনার বাইনোমিয়াল থিয়োরেমের 'ঈ', যে নিটোল একটি ডেফিনেশন বানিয়ে দেব তার? আত্মা অনুভব করার বস্তু, দর্শনের তত্ত্ব; ওটা গণিতের ফর্মুলা নয় মশাই। যান, বাড়ি গিয়ে ঘুমোন। রাত সাড়ে দশটা বাজল।"

সেই রাত্রে স্বপ্ন দেখলুম আমি যেন যমুনাকে 'আত্মা'-র গাণিতিক ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দিচ্ছি; জলের মত সোজা—ক্লাস সেভেনের মেয়েকে বোঝানো যায়, এত সোজা!

স্বপ্নে পাওয়া সেই ডেফিনেশন যমুনাকে অবশ্য শোনাই নি আমি; যমুনার দিদিকেও না। কিন্তু আপনাদের শোনাতে ক্ষতি কী? আপনারা তো আমার স্ত্রী কিংবা শালী নন। শুনুন তবে:

মৌল স্বতঃসিদ্ধ—Brevity is the soul of wit (অর্থাৎ উইটের আত্মা হচ্ছে সংক্ষেপ I)

অর্থাৎ, $B = S \text{ of } W$

অথবা, $S = B \text{ of} \frac{I}{W}$

মানে, Soul is the brevity of wit reversed.

অর্থাৎ উইটের ঠিক উলটো ব্যাপারটিকে সংক্ষিপ্ত করলে যা দাঁড়ায় দর্শনশাস্ত্রের ভাষায় তাকেই বলে আত্মা।

উইটের সেই উলটো ব্যাপারটি কী, সে কথা আপনিও জানেন, আমিও জানি। হামেশাই দেখতে পাই তাদের, সেই হাফ উইট ব্যর্থ বিদূষকদের, জীবনের সর্বক্ষেত্রে। কিন্তু সোজাসুজি সাদা কথায় আমি বলতে চাই নে বুদ্ধির সেই বিপরীত কথাটি কী, যা সংক্ষিপ্ত করলে গাণিতিক ব্যাখ্যায় পাওয়া যায় আত্মার সংজ্ঞার্থ। বলতে চাই নে, পাছে আপনার আত্মা দুঃখ পায়!

আগামীর
প্রস্তুতি

জনৈক অহিফেনসেবীর পত্র

শ্রীখোশনবীস জুনিয়র

সম্পাদক মহাশয়!

পূজা-স্পেশিয়ালের জন্য লেখা চাহিয়াছেন। খুশী হইলাম। কিন্তু কী লিখিব, কী লিখিতে পারি, কী লিখিলে আপনার স্পেশিয়াল বাজারে কাটিবে, পোকায় কাটিবে না—তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। আপনি আমার নিকট কী জাতীয় সাহিত্য আশা করেন? এই কল্পবৃক্ষের নিকট যাহা চাহিবেন, তাহাই পাইবেন। মদ্‌গুরু শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তীর মত আমিও বলিতে পারি, গল্প বলুন, উপন্যাস বলুন, গদ্য বলুন, পদ্য বলুন—এ কল্পবৃক্ষে সাহিত্যের সকল ফলই ফলিতে পারে। ন্যাকামি, বোকামি, ভণ্ডামি, জ্যাঠামি, পাকামি বাঁদরামি—এই সকল 'আমি'-ই সাহিত্যের আধারে পরিবেশন করিতে সম্মত আছি। আমি স্বয়ং বঙ্গবিশ্রুত শ্রীল শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত চক্রবর্তী মহাশয়ের শিষ্য। কাজেই, সাহিত্যের সকল বিভাগেই আমার লেখনী চালনার জন্মগত অধিকার বা বার্থ রাইট আছে বলিয়া ধরিয়া লইতে পারেন। যদি বিশ্বাস না হয়, "কমলাকান্তের পত্রে"র প্রথম পত্র "কি লিখিব?" পড়িবেন, স্বয়ং গুরু এই অধম শিষ্যের সাধ্যের কথা সবিস্তারে বলিয়া গিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয়, এখন প্রশ্ন করি আপনার অভিরুচি কিসে? যদি কবিতা চান, উত্তম আধুনিক কবিতা রচনা করিয়া দিতে পারি। বাজি রাখিয়া বলিতে পারি, ইহার এক বর্ণও কেহ বুঝিতে পারিবে না; কিন্তু পণ্ডিত সমালোচকেরা ইহা হইতে প্রভূত সূক্ষ্ম সদর্থ আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইবেন। যদি আপনার প্রবন্ধে রুচি হয়, জানাইবেন। তাহাতেও এই শর্মা পিছপা নহে। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ভূবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন-বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, নরতত্ত্ব, নারীতত্ত্ব, মর্কটতত্ত্ব, রাসভতত্ত্ব—ইত্যাদি সকল বিদ্যা ও তত্ত্বেই জুনিয়র খোশনবীস সমান পারদর্শী। যাবতীয় বিষয়েই আলোচনা ও গবেষণার একশেষ করিয়া রাখিয়াছি। এখন আপনি আজ্ঞা করিলেই হয়। যে বিষয়ে বলিবেন সে বিষয়েই লিখিব।

সম্পাদক মহাশয়, আপনার কি গবেষণা-জাতীয় রচনায় রুচি আছে? উহা আমি অতি উত্তম লিখিতে পারি। হলফ করিয়া বলিতে পারি, কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের থিসিস অপেক্ষা উহা কোন অংশেই ন্যূন হইবে না। আমাদের বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিদ্যার আলয়ের অজরামরবৎ প্রাজ্ঞ কর্তৃপক্ষ রচনার যে-সকল সদ্‌গুণের জন্য লেখককে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করেন, আমার রচনায় তাহার ভূরিভূরি নিদর্শন পাইবেন। সমগ্র রচনায় একটি বাক্যও সুলিখিত পাইবেন না; কিন্তু প্রত্যেক পৃষ্ঠাতেই অসংখ্য ফুটনোট এবং কোটেশন দেখিতে পাইবেন। এই রচনায় আমার নিজস্ব বক্তব্য অধিক-কিছু থাকিবে না সত্য, কিন্তু একটিমাত্র বক্তব্যকেই বিভিন্ন ভাষায় এবং ভঙ্গিমায় কতরূপে বলিতে পারা যায় তাহার অত্যাশ্চর্য প্রমাণ আপনাকে দেখাইয়া ছাড়িব। আমার এই বক্তব্যটি অনেকটা এইরূপ হইবে: পরম-শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীল শ্রীযুক্ত অমুকচন্দ্র অমুক যখন বলিয়াছেন, গোরুতে গোবর নাদে, তখন তাহা অবশ্যই স্বতঃসিদ্ধবৎ সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। সম্পাদক মহাশয়, বলুন, ইহা অপেক্ষা সৎ যুক্তি এবং প্রাজ্ঞতার নিদর্শন আর কী হইতে পারে? যদি আপনার এ বিষয়ে কোন সংশয় থাকে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-কোন থিসিস পরীক্ষা করিয়া দেখুন—দেখিবেন, এই একটিমাত্র যুক্তি কেমন করিয়া স্পেশিয়াল বৃহৎ বগলামুখী কবচের ন্যায় সর্বসিদ্ধিদাতারূপে কাজ করিতেছে।

যাহা হউক, আমার রচনায় বক্তব্য কিছু না থাকিলেও কোটেশনের কোন অপ্রতুলতা দেখিতে পাইবেন না। যদিও একমাত্র মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য-কোন

ভাষাতেই আমার অক্ষর-পরিচয় নাই, তথাপি জগতের যাবতীয় ভাষা হইতেই কোটেশন সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি। সকল বঙ্গীয় নিবন্ধকারের ন্যায়, ইংরেজী ফরাসী জর্মন রাশিয়ান লাতিন গ্রীক হীব্রু ইত্যাদি সকল সুসভ্য ও অসভ্য ভাষা হইতেই কোটেশন আহরণ করা আছে। এ-বিষয়ে বর্তমান বঙ্গসাহিত্যের রথী-মহারথী এবং অগণ্য বালখিল্য পদাতিক বাহিনীর ন্যায় আমারও একটি বড় সুবিধা রহিয়াছে। যে-সকল বহি হইতে এই মাণিক্যতুল কোটেশনরাজি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার একখানিও আমি এ-পর্যন্ত চর্মচক্ষে দেখি নাই। আপনি হয়তো প্রশ্ন করিতে পারেন, তবে আমি উহা কিরূপে সংগ্রহ করিলাম। আমি সংগ্রহ করিয়াছি স্বদেশীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত অমূল্য প্রবন্ধসমূহ হইতে। কাজেই, ইহাতে কোনরূপ ভ্রান্তি বা ত্রুটির অবকাশই থাকিতে পারে না। সংবাদপত্রে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা অবশ্যই সত্য ; এবং সংবাদপত্রে যিনি লেখেন, তাঁহার তুল্য বিজ্ঞ সুপণ্ডিত সুরসিক এবং সর্বশাস্ত্রপারঙ্গম ব্যক্তি যে ভূভারতে বিরল—সে-বিষয়ে সম্পাদক মহাশয় নিশ্চয়ই দ্বিমত হইবেন না। তাহা ব্যতীত, এই সকল কোটেশনের ল্যাজা এবং মুড়া অজ্ঞাত থাকায়, ইহার প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে আমার যেরূপ গভীর ও ব্যাপক অধিকার জন্মিয়াছে, সেইরূপ উহার প্রয়োগ বিষয়েও অসামান্য নৈপুণ্য আয়ত্ত হইয়াছে। যে-কোন কোটেশন যে-কোন স্থানেই আমি বিনা দ্বিধায় প্রয়োগ করিতে পারি ; এবং এক পঙ্‌ক্তি লিখিলেই তৎসহ পাঁচটি কোটেশন এবং তিনটি ফুটনোট অনায়াসেই লাগাইয়া দিতে পারি। কাজেই, সম্পাদক মহাশয়, বুঝিয়া দেখুন—এইরূপ উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আপনার চাই কি ?

কিন্তু আমি বলি কি, এক্ষণে আপনি কেবল নবেল ছাপুন ; প্রবন্ধের দিকে তাকাইবেন না। বর্তমানে নবেলেরই কাল। সকলে নবেলই চাহে, নবেলই ছাপে, নবেলই পড়ে। পূজা-স্পেশিয়ালে প্রবন্ধ কেহ ছাপে না। তবে যে ইহাতে উহাতে দুই-চারিটি প্রবন্ধ দেখা যায়—উহা কেবল গৃহশান্তি রক্ষার নিমিত্ত। যদি আপনার পত্নীর ভ্রাতা অথবা ভগিনীর পুত্র কেহ প্রবন্ধ-লেখক থাকেন, তবে আপনিও প্রবন্ধ ছাপুন—আমি উহার হন্তারক হইব না। কিন্তু তাদৃশ মধুর-সম্পর্কের কেহ না লিখিলে প্রবন্ধ ছাপিবেন না। কেহ ছাপে না, ছাপিতে চাহে না, ছাপিয়া কোন ফায়দা হয় না। এক্ষণে সকলেই কেবল নবেল চাহে, নবেল লেখে।

সম্পাদক মহাশয়, চতুর্দিকে তাকাইয়া দেখুন। দেখিবেন, নবেলেরই রাজত্ব, নবেলেরই ছড়াছড়ি—সকলেই নবেল ছাপিতেছে। যে-কাগজ এক ফর্মার অধিক ছাপা হয় না, উহারাও চারিটি নবেল দিতেছে। সকলেই নবেলের জন্য বাঙ্গালা সাহিত্য-সংসারের বড়বাবু, মেজোবাবু, সেজোবাবু, ছোটবাবু, নবাবু ইত্যাদি বাবুদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছে। তাহাদের অর্থে বাবুরা সকলেই নবেল লিখিবার জন্য গৃহত্যাগী হইয়াছেন। কেহ গিয়াছেন গিরিডি, কেহ গিয়াছেন কাশী, কেহ গিয়াছেন দার্জিলিং। বাবুরা সকলেই গৃহ ছাড়িয়া, অসার সংসারপ্রপঞ্চের মোহমুক্ত হইয়া আপন আপন মুরুব্বী কাগজওয়ালাদিগের জন্য উত্তম উত্তম নবেল প্রস্তুত করিতেছেন। আর, যে-সকল কাগজওয়ালার তাদৃশ অর্থ-সামর্থ্য নাই, তাহারা এই নববাবুবিলাসে মজিতে পারে নাই। বাধ্য হইয়াই তাহারা বাবুদিগের পার্শ্বচর মোসাহেবকুলের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছে। তাহারাও সকলে নবেল লিখিতেছে। কেহ পাঁচখানা, কেহ সাতখানা, কেহ দশখানা। কেবল বঙ্গীয় মহিলাই সন্তান প্রসবে পটু নহে, বঙ্গীয় লেখকও নবেল প্রসবে সমান নিপুণ এবং দ্রুতগতি। (সম্পাদক মহাশয়, শুনিয়াছি আপনাদের সদাশয় সরকার বাহাদুর স্বদেশীয় মহিলাকুলের উপর্যুপরি গর্ভধারণকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা কি বঙ্গীয় লেখককুলের ঘন ঘন নবেল প্রসবের চটকবিলাসকেও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন না ? পারিলে ভাল হইত। বঙ্গীয় পাঠক অনেক গর্ভস্রাবের হাত হইতে বাঁচিত।)

সম্পাদক মহাশয়, এইজন্যই বলিতেছিলাম, আপনিও পূজা-স্পেশিয়ালে কেবল নবেল ছাপুন। ছাপিলে, লেখার জন্য আপনাকে বিন্দুমাত্রও ভাবিত হইতে হইবে না—

কেন-না, বঙ্গীয় লেখক যাহা লেখেন, তাহাই নবেল এবং তাহাই অত্যুৎকৃষ্ট। যদি বলেন তো শ্রীল শ্রীযুক্ত জুনিয়ার খোশনবীস একাই আপনার কাগজের সমস্ত নবেল যোগান দিবার ভার লইতে পারেন। সম্পাদক মহাশয়, আপনি কি তাহাতে রাজী আছেন?

সকলে এক ফর্মায় চারিখানি করিয়া নবেল দিতেছে। আমি আপনাকে এক পাতায় চারিখানি করিয়া নবেল দিব। এখন বাঙ্গালা সাহিত্যে যে-সকল নবেলের বড় জয়ধ্বনি শুনা যাইতেছে, তাহারা মূলতঃ চারি প্রকারেই বিভক্ত। আমি আপনাকে এই চারি প্রকারের নবেলই যোগান দিব। একখানি ঐতিহাসিক, একখানি রীয়্যালিস্ট, একখানি ভৌগোলিক এবং একখানি সহজিয়া তান্ত্রিক। চারিখানিতেই নায়ক-নায়িকা এবং কাহিনী একই থাকিবে। সকল রসের মূলীভূত যে আদিরস, এই চারিখানিতেই সেই আদিরসের নিষ্পত্তি ঘটিবে। কিন্তু এক এক দিক হইতে এক একখানিতে উহা ঘনাইয়া তুলিতে হইবে। অর্থাৎ, খোল-নল্‌চে একই থাকিবে, কেবল এক-একটিতে এক এক রূপ জল ভরিতে হইবে—কোনটায় গোবরজল, কোনটায় বা নর্দমার জল।

আপনাকে উদাহরণ দিয়া দেখাইতেছি। মনে করুন, নায়কের নাম রামা এবং নায়িকা রামী। রামা রূপবান রসিক যুবক, এবং রামী রূপবতী রসিকা যুবতী। উহারা অবশ্যই বিবাহিত দম্পতি নহে। বাঙ্গালা বৈষ্ণবের দেশ। কাজেই এ-স্থলে নায়িকামাত্রেই পরকীয়া। স্বকীয়া নায়িকা নায়িকাই নহে—সম্মার্জনীধারিণী গৃহকর্ত্রীমাত্র। পরকীয়াতেই সমৃদ্ধিমান রতির স্ফুরণ। কাজেই, রামী রামার পত্নী নহে—প্রণয়িনী, প্রাণেশ্বরী, মনবাগিচার ফুটন্ত কমল। রামা রামীর স্বামী নহে—প্রণয়ী, প্রাণেশ্বর, জীবনবল্লভ, চিত্ত-সরোবরের পানকৌড়ি।

যাহা হউক, এক্ষণে রামা-রামীর অভাবনীয় অভূতপূর্ব প্রচণ্ড প্রণয় চারিখানি নবেলে কিরূপ চারিপ্রকারে বর্ণিত হইবে, তাহা বলিতেছি—অবধান করুন।

১নং : ঐতিহাসিক নবেল ॥ টেকা-পঞ্জা-তুরুপ ॥

কাল—উনবিংশ শতাব্দী। রামা বিখ্যাত জমিদার। নিবাস কলিকাতা। রামী গরাণহাটার বাইজী-শ্রেষ্ঠা। রামীকে দেখিয়া রামা প্রণয়-সাগরে হাবুডুবু খাইতে লাগিল। কিন্তু রামী অন্যের রক্ষিতা। তাহাকে কিরূপে পাওয়া যায়? এদিকে রামার প্রাণ যায়-যায়। ঘনঘন বিরহের দশ দশা উপস্থিত হইতেছে। অবশেষে দূতী-বিলাসের দ্বারা মিলন ঘটিল। কিন্তু ধরা পড়িতে হইল হাতে-হাতে। কাজেই, ডুয়েল লড়িতে হইল। রামীর রক্ষক নিহত হইল। শুরু হইল মামলা। সর্বস্বান্ত হইয়া রামা মুক্তি পাইল। এবং অতঃপর, রামীর হাত ধরিয়া রামা শ্রীবৃন্দাবনধামের উদ্দেশে যাত্রা করিল।

[সম্পাদক মহাশয়, বলিবেন, ইহাতে ইতিহাস কোথায়? আছে। প্রথমেই বলিয়াছি কাল উনবিংশ শতাব্দী। উহাতেই যত ইতিহাস। রেনেসাঁস, হিন্দু কালেজ, সুরেন বাঁড়ুজ্জে, বিপিন পাল, পায়রা উড়ানো, বাইজীর নাচ—ইত্যাদি ঐতিহাসিক বিষয় যত্রতত্র বসাইতে হইবে। এতদ্‌সহ রামীকে বারংবার উলঙ্গ করা হইবে, এবং তাহার দাড়িম্ব-নিন্দিত বক্ষ ও রামরম্ভা-জিনি উরুর রসাল বর্ণনা দেওয়া হইবে।

সম্পাদক মহাশয়, বলুন, হিস্টোরিক্যাল নবেলের আর বাকি কি?]

২নং : রীয়্যালিস্ট নবেল ॥ মাথাভাঙ্গা ॥

কাল—বর্তমান সময়। রামা মাথাভাঙ্গা-তীরবাসী জেলে। রামী জেলেনী—অন্যের মৎস-চুপড়ি-বাহিনী (অর্থাৎ স্ত্রী)। রামী রামাকে চায়, রামা রামীকে চায়। কিন্তু পায় না। কেন? দায়ী ক্যাপিটালিজ্‌ম্‌। রামা ইহার-উহার দেহ চাখিয়া বেড়ায়—কিন্তু রামীকে পায় না। রামী ইহাকে-উহাকে দেহ দান করিয়া বেড়ায়—কিন্তু রামাকে পায় না। রামা বসিয়া বসিয়া রামীর ভারী পাছা দুলাইয়া চলন দেখে, ঘামের গন্ধ শোঁকে, আর ফোঁস ফোঁস করিয়া বিরহের নিঃশ্বাস ছাড়ে। হায়, হায়! ক্যাপিটালিজমের নিপীড়নে দুইটি জীবন ব্যর্থ হইয়া গেল!

[সম্পাদক মহাশয়, ইহাতে রীয়্যালিজমের সকলই পাইবেন। বুর্জোয়াদের অত্যাচার, বিদ্রোহ, শ্লোগান,

ঘামের গন্ধ, পুরুষের কামুকতা, নারীর ব্যভিচার—ইত্যাদি সবই থাকিবে। বলুন, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রীয়্যালিস্ট নবেল আর কি হইতে পারে ?]

৩নং : ভৌগোলিক নবেল ॥ পশ্চিম-পাষাণী ॥

কাল—যে-কোন। স্থান—পশ্চিমঘাট পর্বত। রামা পার্বত্য বন্য যুবক। রামী বন্য যুবতী। হরিণ-শিকারে গিয়া দেখা হইয়া গেল। হরিণী ফাঁদে পড়িল। কিন্তু উভয়ে পৃথক উপজাতির। কাজেই, মিলন হইতে পারে না। রামা অগ্রসর হইতে গেলে দুই উপজাতিতে যুদ্ধ বাধিল। রামা জিতিল, এবং রামীকে অধিকার করিল। মিলনের সময়ে রামী প্রথমে বাধা দিল, কিন্তু পরে আত্মসমর্পণ করিল। এবং তৎপর চাঁদের আলোকে উভয়ে ফক্‌স্‌-ট্রট নাচিতে-নাচিতে ডুয়েটে বন্য লারেলাপ্পা গাহিতে লাগিল। [ডিজলভ্‌]

[সম্পাদক মহাশয়, ইহাই উৎকৃষ্ট ভৌগোলিক নবেলের উদাহরণ। ইহাতে পর্বত আছে, অরণ্য আছে, বন্যজাতি আছে, তাহাদের নাচ আছে, যুদ্ধ আছে। ইহার সহিত খুঁজিয়া-পাতিয়া দুই-চারিটি বন্য ভাষার শব্দও যোগ করিয়া দিব। কাজেই, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভৌগোলিক নবেল আর কিছুই হইতে পারে না।]

৪ নং : সহজিয়া তান্ত্রিক নবেল ॥ কিষ্কিন্ধ্যাপুরের মাঠ ॥

স্থান—কিষ্কিন্ধ্যাপুরের মাঠ। শ্মশান। রামা তান্ত্রিক। রামী রসবতী বৈরাগী যুবতী। রামা মদ গেলে, এবং যুবতী মেয়েমানুষের দিকে আড়চোখে তাকাইয়া থাকে। রামা রামীকে চায়, রামী রামাকে চায়। কিন্তু মিলন হয় না। হয়-হয় হয় না, হয়-হয় হয় না।

[সম্পাদক মহাশয়, এইরূপ সহজিয়া তান্ত্রিক নবেলেরই আজিকালি বড় প্রচলন। ইহাতে লেখক-পাঠক উভয় পক্ষেরই সুবিধা। নায়ক যে-হেতু তান্ত্রিক, সে যাহা খুশি তাহাই করিতে পারে। এবং পাঠককেও, অশ্লীল রচনা পড়িতেছি, এরূপ আত্মগ্লানিতে ভুগিতে হয় না। কাজেই, আজিকালি সাহিত্যে ইহার বড় জয়জয়কার।]

সম্পাদক মহাশয়, আপনার পূজা-স্পেশিয়ালের জন্য এইরূপ আধুনিক নবেল চাহেন কি ? চাহিলে বলিবেন—আমি লিখিতে রাজী আছি।

বলিলাম, রাজী আছি। ভাবিয়াছিলাম, লিখিব। কিন্তু হইবে না, লিখিতে পারিব না। সম্পাদক মহাশয়, ইচ্ছার অভাব নাই। কিন্তু বাজারে গঞ্জিকার বড় অভাব।

আমি শ্রীপোশনবীস জুনিয়র, বঙ্গবিখ্যাত কমলাকান্ত চক্রবর্তী মহাশয়ের প্রশিষ্য। এতকাল কেবল অহিফেনের মৌতাতেই মন পাকাইয়াছি। কেবল আমি একেলাই নহি—বঙ্গীয় সকল লেখকই। এই অহিফেনের মৌতাতেই কমলাকান্ত পূর্ণচন্দ্রকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছেন; বঙ্কিমচন্দ্র অগম্য মুঘল অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাজকুমারীর প্রণয়লীলা দর্শন করিয়া আসিয়াছেন, মধুসূদন নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মেঘনাদ-কর্তৃক পিতৃব্য-ভর্ৎসনা শুনিয়া আসিয়াছেন। সাহিত্যে তখন অহিফেনেরই যুগ চলিতেছিল।

কিন্তু হায়, বঙ্গ-সাহিত্যে এখন সে-যুগ গিয়াছে। এক্ষণে কেবল গঞ্জিকার কাল। এক্ষণে গঞ্জিকার ধূম্রই সকল নবেলের উৎস। উত্তমরূপে গঞ্জিকা সেবন না করিলে আধুনিক নবেল রচনা করা যায় না।

সেইজন্যই গঞ্জিকার সন্ধানে বাজারে লোক পাঠাইয়াছিলাম। কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না। সর্বত্রই শুনিলাম, পূজা-স্পেশিয়ালের জন্য গুদাম সাবাড় হইয়া গিয়াছে। সমস্ত গঞ্জিকাই নববাবুকুল এবং তাহাদের ইয়ার-বক্‌শীরা কিনিয়া লইয়াছে।

সম্পাদক মহাশয়, এমতাবস্থায় আপনার স্পেশিয়ালের জন্য কিরূপে আধুনিক নবেল লিখিব ? কাজেই, লিখিতে পারিলাম না, লিখিতে পারিব না। আপনি আমাকে মার্জনা করিবেন। ইতি

আপনারই একান্ত···
শ্রীপোশনবীস জুনিয়র

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে

৩২শ বর্ষ,
১২শ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৬৭

সংবাদ-সাহিত্য

বিজয়া

দীর্ঘ শারদীয় অবকাশ অন্তে আসামের অভারতীয় বিভেদমন্যতা, উড়িষ্যা-বিহার-উত্তরপ্রদেশের বন্যার বন্যতা, শ্রীনির্মলকুমার সিদ্ধান্তের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিদায়কালীন বদান্যতা এবং প্রসিদ্ধ বামাচারী সাধক শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের শিলিগুড়িতে ছিন্নমস্তীয় আত্মহন্যতা সত্ত্বেও দুর্গতিনাশিনীকে ধন্যবাদ, আমরা ৺বিজয়ার প্রীতিবন্ধনে আবার মিলিত হইতে পারিতেছি। আমাদের অনুগ্রাহক গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের এবং যাবতীয় সহৃদয় পাঠকদের সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। আসন্ন নবনির্বাচন ও আদমসুমারির দামামাধ্বনি এবং ঢক্কানিনাদ এখনই আকাশবাতাস মুখরিত করিতেছে। আগামী কয়েক মাস সাহিত্যাদশমহাবিদ্যার প্রধানতঃ প্রচারমহিমাই প্রকট হইবে। এই ডামাডোলের বাজারে আমাদের শান্ দেওয়ার কোনও কাস্তে নাই। কাজেই বিশেষ শঙ্কা ও সঙ্কোচের সঙ্গে আমাদিগকে চিরাচরিত রুটিন মানিয়াই চলিতে হইবে; আমাদের পাঠকদের কোনও মজার আস্বাদ এই মাজুরকা-নৃত্যের আসরে দিতে পারিব তেমন ভরসা হয় না। মাজুরকা হইতেছে পোল-নৃত্য এবং পোলিং-ব্যাপারে আমরা নিতান্ত আনাড়ি। পূর্বাহ্ণেই অক্ষমতা নিবেদন করিয়া রাখিতেছি।

গোপালদার পুনরাবির্ভাব

গোপালদা দীর্ঘকাল গা-ঢাকা দিয়াছিলেন। গত চৈত্র মাসে হিমালয়-মাহাত্ম্য আমাদিগকে প্রণিধান করাইবার প্রয়াস করিয়া সেই যে তিনি সরিয়া পড়িয়াছিলেন বিজয়ার সম্ভাষণ-ছলে এতদিন পরে পুনরাবির্ভূত হইলেন। ডাক-মোহরের ছাপ দেখিতেছি লাডাকের প্রধান শহর লের। তাঁহার প্রীতিসম্ভাষণ-পত্রের আরম্ভটা বিচিত্র। লিখিয়াছেন, "ভায়া হে, সমুদ্র-সমতল হইতে ১১৫৩৮ ফুট উর্ধ্বে পশমের গুদামে বসিয়া গৌহাটি, বার্লিন, দার্জিলিং, কঙ্গো, অ্যালজিরিয়া, উনো ও বুয়েনস-আয়ার্সের যে সংবাদ শুনিতেছি তাহাতে মানুষের পাশবিকতা ও পশ্বাচার দৃষ্টে স্তম্ভিত হইতেছি। বিশেষ করিয়া বুদ্ধ তথাগতের এই পবিত্র তপ্‌তের পাদদেশে উপবিষ্ট হইয়া মানুষে মানুষে এই বীভৎস হানাহানি বড়ই বিসদৃশ ঠেকিতেছে। তোমরাও যে ভাবে মনিবের চেন গলায় পরিয়া কেন্দ্রীয় খুঁটিবদ্ধ অবস্থাতেই পরস্পরের লেজে কামড় মারিতেছ, তোমাদিগকেও পশু ছাড়া আর

কিছুই মনে করিতে পারিতেছি না। পশুকে আবার প্রীতিসম্ভাষণ জানাইব কি? কাজেই বিরত থাকিলাম।"

গোপালদা পত্রমধ্যে তিনটি কবিতা পাঠাইয়াছেন, কবিতাগুলি পড়িয়া মনে হইতেছে, যতই রাগ করুন, আমাদের আশা একেবারে ছাড়েন নাই, শেষ কবিতাটিতে তো বেদনায় বিগলিত হইয়া চোখের জল ফেলিয়াছেন। কবিতাগুলি তাঁহারই দেওয়া শিরোনামাসহ নীচে মুদ্রিত করিতেছি।

দেশীয় সংবাদ-পত্রের প্রতি

নিবিড় তিমিরে কে হবে তোমরা আলোর বার্তাবহ?
ঘুমন্ত দেশে ভোরের খবর কে এনেছ কহ কহ।
সারা পৃথিবীর পীড়িত মানুষ ধীরে তুলিতেছে মাথা,
একে একে ভাঙে রাজ্যবাদীর রাজশিরের ছাতা।
যারা এল বহু শাসন সহিয়া অত্যাচারীর পাদুকা বহিয়া
আফ্রিকা আর এশিয়ায় তারা খুলিছে "নতুন খাতা"।
মোর স্বদেশের বিমূঢ় মানুষে যুগের নূতন বাণী
তোমরা শুনাও ভীত মানুষের ঘুচাও আত্মগ্লানি।
কোন্ বলে বলী জনসাধারণ শোষক-শাসক-শক্তি হরণ
করিয়াছে, সহি' মৃত্যুসাধন-বেদনা দুর্বিষহ—
কহ তা সবারে কহ,
মুক্তি-বার্তাবহ॥

পরাধীনতার পঙ্ককুণ্ডে মোরা পড়ি অহরহ
কী জ্বালা সয়েছি, মুক্তি লভিতে কী করেছি সবে কহ।
সে মহাযজ্ঞে কত বীরপ্রাণ নিঃশেষে হ'ল বলি,
শোণিতসিক্ত সেই পথচলা কাঁটা-কঙ্কর দলি'
পেনু কতটুকু আলোর আভাস শত বছরের সেই ইতিহাস
ঝিমাইয়া পড়া স্বদেশবাসীরে জাগাও সে-কথা বলি।
এসেছি কি মোরা বাধাবিঘ্নিত সেই সাধনার শেষে—
তোমরা খবর ভাল জানো, দাও সে খবর এই দেশে।
ভাঙিয়া পাষাণ-কারার প্রাচীর ফাঁসীর মঞ্চ করি চৌচির
পার হয়ে মোরা এসেছি কি সেই শোষণের কালিদহ?
কহ তা' সবারে কহ,
মুক্তি-বার্তাবহ॥

ছিন্ন খণ্ড ভারত আবার মিলিছে কি প্রত্যহ,
ওগো দৈনিক, প্রতিদিন প্রাতে সেই সমাচার কহ।
ভ্রাতৃবিরোধ যদি থাকে ভাই, কর তার অবদান
উস্কানি দিয়ে আগুনে ক'রো না আর ঘৃতাহুতি দান,
কোথাও ঘটিলে বিশেষের ভুল টেনো না দোহাই সাধারণমূল,
ছবি-সংবাদে দীর্ঘ করো না ক্ষণিকের খতিয়ান।
তোমার কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠুক প্রেম-মিলনের ভাষা,
কলহ-কুয়াশা কাটাইয়া আনো ভায়ে ভায়ে ভালবাসা।
যুগান্তরের গ্লানি কর দূর, সাদা-বাজারের আনন্দ-সুর
নিয়ে এসে দেশে দীন গোপালের শুভাশিস্ সবে লহ।
মিলনের কথা কহ,
মুক্তি-বার্তাবহ॥

ছিন্নমস্তা

ছিন্নমস্তা আপন শোণিত আপনি করিছে পান,
লালে লাল হল ধূলামাটি জল, লাল হ'ল আস্‌মান।
মোরা দেখিতেছি ভয়ে বিস্ময়ে
আপন কুঠার আপন হৃদয়ে
উঠিছে পড়িছে—চৌদিক জুড়ি জাগিছে মহাশ্মশান,
তাণ্ডব তালে টলিছে মেদিনী, শিব লাজে ম্রিয়মাণ।

কবর-মাটিতে চিতার ভস্মে জাগো রে আবার দেশ,
মৃত্যুর আছে শেষ জানি, জানি জীবনের নাই শেষ!
থামিবে একদা এই তাণ্ডব,
শিবের স্পর্শে জেগে উঠে শব
আবার ধরিবে প্রাণ-পবিত্র আলো-ঝলমল্ বেশ—
আত্মঘাতের শোণিত-প্লাবনে ধুয়ে যাবে ঘৃণা-দ্বেষ।

ওরে ভয় নাই, যদিও জেগেছে ভীষণ ভয়ঙ্কর,
মরু-দাবদাহ ঢেকে দিবে দেখা শ্যাম শোভা মনোহর।
কেটে যাবে গ্লানি, কেটে যাবে মেঘ
রবে না স্মরণে এই উদ্বেগ,
এ গৃহ-আহবে যে প্রশ্ন জাগে পাব তার উত্তর,
মৃত্যু-মূল্যে চিনিতে পারিব কে আপন, কে বা পর।

শিবা-সারমেয়-চিৎকার আজ শুনিস্ না তোরা কানে,
শিব যে কোথায় ধূলায় গড়ায় শিবানী একাই জানে।
সম্বিৎ ফিরে পাইয়া সহসা
আপনি হেরিলে আপনার দশা
শিহরিয়া শ্যামা, লজ্জায় পুনঃ খুঁজে পাবে কল্যাণে।
কমলা-রূপেতে ছিন্নমস্তা শোভা পাবে এইখানে ॥

দিনশেষের প্রার্থনা

দেবতা, তোমারে প্রণাম করিয়া অজ্ঞাত পথ চলি,
দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব, পদে পদে পরাজয়।
সমুখে আকাশ আশার আলোকে কচিৎ উঠিছে ঝলি
নিবিড় তিমিরে করিতে নিরাশ্রয়।
ভুল ও ভ্রান্তি জীবনে অনেক ঘটিয়াছে বার বার,
আঁকাবাঁকা পথে চলিয়াছি ঘুরে ঘুরে।
তরুণ দিনের প্রখর দাহনে যা ছিল চমৎকার
শেষ দিনমানে কাঁদে পুরবীর সুরে।
দৃষ্টি স্বচ্ছ ভাবি' বিজ্ঞান-অঞ্জন-শলাকায়
দূর গ্রহলোকে করেছি দৃষ্টিপাত,
যে দেবতা মোর অন্তরে ছিল তাহারে উপেক্ষায়
দানবী লীলায় করিয়াছি করাঘাত
যক্ষপুরীর দুয়ারে দুয়ারে প্রমত্ত উল্লাসে—
যা মিলেছে দেখি সব ফাঁকি সব মেকী,
জড়ের ধোঁয়ায় ভারি করিয়াছি জীবনের নিঃশ্বাসে,
দেবতা বিমুখ, হায়, পরিণাম এ কী!
রূপের নেশায়, যশের নেশায় রূপার মুকুরে মুখ
দেখিয়া দেখিয়া আপনারে ছিনু ভুলে,
আপন দম্ভ-বিস্ফোরণেই প্রাণ করে ধুক্ ধুক্
ভীতি-শিহরণ লেগেছে মর্মমূলে।
শূন্যে ফানুস পুড়ে ফেটে যায়, জীবনের অঙ্কুর
আঁধার মাটিতে কাঁদিছে প্রকাশ খুঁজি—
দেবতা, আবার মৃত্তিকারসে নভোজ্বর কর দূর,
আলোকে ফুটিতে দাও আঁধারের পুঁজি।
মাটিই সত্য, সত্য আমার নিকটে যাহারা আছে,
সত্য আমার সংসার-পরিবেশ,
তারাই সত্য যারা সুখে দুখে মোর মুখ চেয়ে বাঁচে,
সত্য আমার দীন দরিদ্র দেশ।
মাটির মানুষ, ধূলার ধরায় যেথাই যে জন থাকো
হয়ো না মত্ত ক্ষণিকের স্পুটনিকে,
ধ্বংস-দেবতা আপনিই আসে। প্রাণ ভ'রে তাঁকে ডাকো
স্নেহে-প্রেমে যিনি গড়েন এ সৃষ্টিকে।

গোপালদার শারদীয় সাহিত্য-পরিক্রমা—"মন্না হাতী লাখ টাকা"

গোপালদা লিখিয়াছেন, "ভায়া হে, এতক্ষণ তো গুরুগম্ভীর দর্শনের কচকচি করিলাম, এখন একটু লঘু প্রসঙ্গে অবতরণ করা যাক। বাংলা দেশে ইহাই রেওয়াজ। খোদ বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে'র ফার্স্ট ফাইভ ইয়ার প্ল্যান শেষ হইতে না হইতে অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের শখের বাগানে 'ভ্রমর' হইয়া দুই এক কিস্তি চোঁ বোঁ করিয়া শেষ পর্যন্ত জামাতা রাখালের পাল্লায় পড়িয়া 'প্রচার' অর্থাৎ প্রোপাগাণ্ডার চার ফেলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সে চারে যে মৎস্যদেশে কাজ হয় নাই তাহার প্রমাণ 'প্রচারে'র ক্রমাবনতি এবং চারি বৎসরেই পঞ্চত্বপ্রাপ্তি। রবীন্দ্রনাথের অদৃষ্ট বঙ্কিম অপেক্ষা প্রসন্নতর ছিল না। 'সাধনা'স্তে 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে'র দার্শনিকতা তাঁহার ক্ষেত্রেও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পর্যন্ত পৌঁছায় নাই এবং তাঁহাকেও শেষ পর্যন্ত প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজ [তাল] পত্রে'র উপর পুচ্ছ নাচাইবার জন্য নবীন ও কাঁচাদের আহ্বান করিতে হইয়াছে। ঘরোয়া 'তত্ত্ববোধিনী' ও 'ভারতী' এবং স্বদেশী 'ভাণ্ডার' সামান্য মুখবদল মাত্র। বিংশ শতকের বাংলায় একমাত্র রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'দাসী' ও 'প্রদীপে'র ট্রেনিং লইয়া স্বদেশে 'প্রবাসী' থাকিয়া দীর্ঘকাল গুরু-গাম্ভীর্য বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন। তোমারও ট্রেনিং তাঁহার কাছেই শুরু তাই তুমি এখনও টিকিয়া আছ। তোমাদের গুরু-শিষ্যের ক্ষেত্রে সাহিত্যিক কৃতিত্ব অপেক্ষা রেঢ়ো গোঁ এই দীর্ঘ স্থায়িত্বের জন্য কতখানি দায়ী সে বিচার করিয়া তোমাদিগকে ছোট করিতে চাহি না।

তবে এবার তোমার শারদীয় সংখ্যাটি নাড়িয়া চাড়িয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে তুমিও ভোল পালটাইতে চলিয়াছ। ভালই করিতেছ। আমি শ্রীগোপাল শর্মা পূর্বাপর সকল বিষয় বিবেচনাপূর্বক বহাল তবিয়তে সুস্থ চিত্তে ঘোষণা করিতেছি যে শারদীয় সংখ্যার সর্বপত্রিকা-গ্রাহ্য পুরাতন ঐতিহ্য বর্জন করিয়া তুমি যে নূতনত্ব সম্পাদন করিয়াছ তাহা প্রশংসনীয়। বস্তাপচা মামুলী প্রেমের গল্পে পীড়িত পাঠক-সমাজ আরাম পাইয়াছে।

ভাবিতেছ, ভারতের উচ্চ প্রত্যন্ত দেশে আত্ম-নির্বাসনে থাকিয়া সমুদ্র সমতট বাংলা দেশের শারদীয় সাহিত্যের সহিত আমার যোগাযোগ সম্ভব হইল কেমন করিয়া! খুব সহজে ব্রাদার। মহামান্য দালাইলামার সহযাত্রী এক তরুণ লামা বাংলা "রোমাঞ্চ" গল্প পড়িবার জন্য পাগল। সঙ্গে অঢেল সোনা আনিয়াছেন। তাহাই কাগজে আর নিকেলে রূপান্তরিত করিয়া ফুড়ুৎ-ফুড়ুৎ দিল্লী যাইতেছেন এবং সঙ্গে বোঝা বোঝা বাংলা সাময়িক পত্র লইয়া আসিতেছেন। এবারের পূজার ফসল প্রায় পুরাপুরিই আসিয়াছে। তাঁহার এই নীহারিকা-বিলাসের কল্যাণে আমি আমার জাত-ভাইদের "সুবিপুল" সাহিত্য-কীর্তি পর্যালোচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছি। বিহঙ্গ-নয়নে দর্শন মাত্র নহে, একেবারে গভীরে তলাইয়া যাওয়া; চিটেগুড়ের মট্‌কায় পড়িলে বেচারা মক্ষিকার যে অবস্থা হয় আমার সেই অবস্থা হইয়াছে কিন্তু শ্রীমধুসূদনের কৃপায় একেবারে গলিয়া যাই নাই।

তাই মোদ্দা কথাটা লিখিতেছি—এবারকার গুরুভার শারদীয় নব-সাহিত্য-সম্ভার অতি পুরাতন সেই প্রবাদ-বাক্যই প্রমাণ করিয়াছে—মরা হাতী লাখ টাকা। এই মরা হাতীর দলে রবীন্দ্রনাথও আছেন—ডেড্ এলিফেন্ট রূপে। তাঁহার সেই সর্বজনমুখস্থ জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যা-কাণ্ডের প্রতিবাদে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ডকে লেখা "সার"-উপাধিত্যাগের ঐতিহাসিক পত্রের খসড়ার ব্লকছাপ হাতে দুই স্মৃতিপ্রমত্ত পালোয়ান—অমল হোম ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ দুই পত্রিকার রণাঙ্গণে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। 'আমিত্বের প্রসারে'র দুই নিরাকার ভার্সন অতিশয় কৌতুক-কৌতূহলপ্রদ। একজন আবার জোড়ে নামিয়াছেন, দেশের জোরবরাত!

এবারকার শারদীয় সাহিত্যে একটা বিশেষ লক্ষণীয়—চলচ্চিত্র ও স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের প্রভাব। লোকপ্রিয়তমদের নামে যুগকে নামাঙ্কিত করিলে বলিতে হইবে—বাংলা-সাহিত্যে এখন সেন-যুগ ও গুপ্ত-যুগ একসঙ্গে চলিতেছে। ফল ভাল হয় নাই। দেখিতেছি মরাহাতীদের মধ্যে ঐরাবতস্থানীয়রাও চিত্রায়ণ-মূল্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই গল্প ফাঁদিয়াছেন, এমন কি, কোন্ ভূমিকায় কে অভিনয় করিবেন সেটা পূর্বাহ্ণে স্থির করিয়া লইয়াই ঘটনা ও সংলাপ নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন; পুস্তু, গাড়োয়ালী, সাঁওতালী, বর্মী কোন ভাষাই বাদ নাই। এই গেল সেন-প্রভাব। ওদিকে গুপ্ত-প্রভাবে অতি সাধারণ ঘরোয়া কাহিনীই এমন জটিল করা হইয়াছে যে গল্পটা গল্প না চীনা হেঁয়ালী তাহা ভাবিতেই খানিকটা সময় যায়। আশ্চর্য এই, সিনেমা যাঁহাদের একান্ত উপজীবিকা ছিল সেই শৈলজানন্দ ও প্রেমেন্দ্র বোধ হয় অতি-পরিচিত অবজ্ঞায় ইহার মায়া কাটাইয়াছেন। শৈলজানন্দের স্মৃতি-কথা "অনেক দিনের অনেক কথা"য় পাক্ষিক সাহিত্য-পত্রিকা 'মাধুরী' আপিসের ছবিটি ছায়া-ছবির অপেক্ষায় আঁকা নয় বলিয়াই মনের মধ্যে গাঁথিয়া যায়। তেমনি প্রেমেন্দ্রের বড় গল্প "অন্য এক নাম"। এবারকার তোমাদের শারদীয় কথাসাহিত্যে আমার ধারণা ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। "সাপ" গল্পে প্রেমেন্দ্র খুবই সূক্ষ্ম মুন্সীয়ানা দেখাইয়াছেন বটে কিন্তু একটু স্থূল না হইলে চিরন্তন সাহিত্য হয় না। ডিকেন্স বালজাক টলস্টয় দৃষ্টান্ত। "অন্য এক নাম" গল্পে বড় ভাণ্ডারীর চরিত্র চিরন্তন। অসংস্কৃত ভাষায় এমন সংস্কৃত শাশ্বত সত্য সেই বলিতে পারে যে জীবনকে পুরাপুরি দেখিয়াছে। ভাণ্ডারী দেখিয়াছে।

চিরন্তন সত্যের দিক দিয়া 'বনফুলে'র "হাটে-বাজারে" উপন্যাস সার্থক সৃষ্টি। 'তৃণখণ্ড' 'বৈতরণীর তীরে' ও 'নির্মোকে'র ডাক্তারটিই পরিপক্ক দার্শনিক মূর্তিতে "হাটে-বাজারে" দেখা দিয়াছেন। ডাক্তারের যে পরিণাম "হাটে-বাজারে" কল্পিত হইয়াছে তাহা শুধু ভারতীয় নয়, মানব-দর্শনসম্মত।

মরা হাতীদের একজন কিন্তু নানা আধ্যাত্মিক অনুশীলন সত্ত্বেও কেচ্ছা-সাহিত্যের নাগ্নিমায়া কাটাইতে পারেন নাই। শুনিয়াছি তিনি হাকিম থাকাকালে আদালতের লাচ্ছেদার কাহিনীকে অর্থকরী কাজে লাগাইতেন। আলোচ্য গল্পে তিনি কলিকাতার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের কেচ্ছাকে কাজে লাগাইয়া উৎকট রুচির পরিচয় দিয়াছেন।

মোটের উপর, কথাসাহিত্যে এবার পূজার বাজারে জীবিত বাচ্চা হাতীরা তেমন জুত করিতে পারে নাই। প্রবন্ধ-সাহিত্যে তোমার তিনটি জীবনী-প্রবন্ধই সুলিখিত হইয়াছে এবং অভিনবত্বে গুণীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। বর্তমান সাহিত্যের হালচাল সম্পর্কে তোমার জুনিয়র খোশনবীস যে সকল মন্তব্য করিয়াছেন আমি তাঁহার সহিত একমত। মরা হাতী শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় "ড্রাগনের দাঁত" প্রবন্ধে স্বজাতিকে কামড়াইবার জন্য নিজের দাঁতটা একটু বেশী ব্যবহার করিয়াছেন, কে কবে তাঁহাকে উড়িয়া আখ্যা দিয়া তাঁহার আত্মাভিমানে ঘা দিয়াছিল এতদিন পরে আসামকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনি সেই ঝালটা ঝাড়িয়া লইয়াছেন। তিক্ততার বাহুল্যে গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিও ভাসিয়া গিয়াছে।

কবিতা-প্রসঙ্গ আর তুলিব না। আমি প্রাচীনপন্থী, কুমুদরঞ্জন, কালিদাস, সাবিত্রীপ্রসন্ন, প্রভাতমোহন, প্রেমেন্দ্র, অজিত, বুদ্ধদেবকে পাইলেই পড়ি কিন্তু তোমাদের ওই অতি-আধুনিক কবিতা! উহার ফাঁকির গোলকধাঁধায় ঢুকিতে পারি এত বড় পি. সি. সরকার এখনও হইতে পারি নাই। অতি-আধুনিকই যেখানে প্রবল সেখানে ও প্রসঙ্গ বর্জন করাই ভাল। বাচ্চা লামার কৃপায় এবারের বিজয়ায় আমার যে সাহিত্য-রসোপলব্ধি হইয়াছে তজ্জন্য ভগবান বুদ্ধের নিকট কৃতজ্ঞ আছি।"

"খতিয়ে দেখি"

"ড্রাগনের দাঁত" সম্পর্কে গোপালদার বিরূপ মন্তব্য সত্ত্বেও আমরা বলিব প্রবন্ধটি অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং প্রত্যেক বাঙালীর অবশ্যপাঠ্য। প্রবন্ধটি আমাদিগকে সত্যসত্যই ভাবিত করিয়াছে কারণ ভারতবর্ষের সর্বত্র একদা-মহিমান্বিত বাঙালীর উন্নাসিকতা লইয়া যে বিদ্বেষ-প্রতিক্রিয়া ধীরে ধীরে ধূমায়িত হইতে দেখিতেছি তাহাতে নিঃসংশয়ে বলিতে পারি নবসৃষ্ট মহাভারতের ঐক্য ও অখণ্ডতা বজায় রাখিতে হইলে মস্তিষ্কগর্বিত বাঙালীকেই সতর্ক সাবধান ও অবহিত হইতে হইবে। ভারতবর্ষের সুনিবিড় পরাধীনতা-অমা-যামিনীর ভোরে বাঙালীই সর্বপ্রথম জাগরিত হইয়া স্বাধীনতার কলধ্বনি তুলিয়াছিল এবং দিগ্বিজয়ের ঝোঁকে ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রসারিত হইয়া প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিল। আজ প্রতিষ্ঠা গিয়াছে কিন্তু বাঙালীর সর্বভারতব্যাপী অবস্থান বজায় আছে। ঐক্য ও প্রেমসূত্রে বাঁধা না পড়িলে সর্বত্র পকেটভুক্ত সংখ্যালঘু বাঙালীকে উৎখাত হইতেই হইবে। সহ-অবস্থানের প্রথম সূত্র উন্নাসিকতা বর্জন। অন্নদাশঙ্কর সে-কথা আমাদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন বলিয়া ধন্যবাদার্হ।

দিল্লীর পার্লামেণ্ট মহলের গোপন সংবাদ পাইলাম, বাঙালী-সমস্যাই সেখানে এখন প্রধান। যে বাঙালী আপনিই দমিয়াছে তাহাকে দাবাইবার জন্য অর্থাৎ মরার উপর খাঁড়ার ঘা দিবার জন্য সারা ভারতবর্ষ যেন উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। বাঙালী অনেক তেরীমেরী করিয়াছে, এখন কিছুকাল তাহাকে শান্ত হইয়া তেরীমেরী সহিতে হইবে। বনেদীয়ানা হইতে বিচ্যুত মানুষ অধৈর্য দেখাইলেই তাহার পতন দ্রুত ও অনিবার্য হইয়া উঠে। বাঙালীকে এখন শম দম তিতিক্ষা সন্তোষ প্র্যাকটিশ করিতে হইবে। এই কাজে তাহার প্রধান সহায় হইতে পারে দৈনিক সংবাদপত্র। গোপালদা তাঁহাদের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন, আমরাও জানাইতেছি।

বাঙালী দমিয়া গিয়াছে বইকি! বাংলাদেশের নব-প্রতিষ্ঠিত শিল্পনগর দুর্গাপুরের হালচাল যাহা জানিলাম তাহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম দক্ষিণ-ভারত পাঞ্জাব উত্তরপ্রদেশ এই পবিত্র স্থানে বাঙালীর হাতে তামাক খাইবার জন্য সমবেত হইতেছে। বড় বড় পোস্টে, যন্ত্র-নাড়াচাড়ার অর্থাৎ টেক্‌নিক্যাল কাজে বাংলাদেশের দুর্গাপুরে বাঙালীর সংখ্যা শতকরা দশের বেশী হইবে না।

চেয়ারে চাদর বাঁধিয়া পানদোক্তা চিবাইতে চিবাইতে রবীন্দ্রনাথের "দুরন্ত আশা"র মূর্তিমান বাঙালীরা সগৌরবে সেখানে ষাট টাকা মাহিনার কেরানীগিরি করিতেছে। অবাঙালী পেয়াদাদের বেতন তাহার অধিক। যে 'ইস্কন' আজ তেরটি ব্রিটিশ ফার্মকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া স্টীল প্ল্যান্টের কাজ চালাইতেছে তাহাতে বাঙালী নাই বলিলেই চলে, গোটা সাউথ ইণ্ডিয়া—নর্থ ইণ্ডিয়া বিশেষ করিয়া বাংলা-দেশের কাঁধে চাপিয়া বসিতেছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সুপরিকল্পিতভাবেই এইরূপ করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় সমগ্র প্ল্যান্টের কাজের দায়িত্ব হস্তান্তরিত করিয়া যখন ইস্কন বিদায় লইবে তখন দেখা যাইবে বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া যাহারা তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হইতেছে তাহাদের মধ্যে বাঙালী একটিও নাই। যে সকল জুনিয়র বাঙালী ইঞ্জিনীয়ার আজ সেখানে বহাল আছে তখন আর তাহারা কেহই থাকিবে না। দুর্গাপুর বাংলাদেশে একটি গোয়া হইয়া নানা সমস্যার সৃষ্টি করিবে। বাংলাদেশের শিরে যদি সর্পাঘাত হইয়া থাকে, বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে সে শিরটি বেমালুম কাটিয়া ফেলিয়া গরু গাধা ছাগল যে কোনও জানোয়ারের মুণ্ড সেখানে লাগাইবার এখনও সময় আছে।

অর্থাৎ এখন খতাইয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। কী দেখিব—আমরা স্থানান্তরে ছন্দোবদ্ধভাবে তাহার একটা ফিরিস্তি দিয়াছিলাম। সেই ফিরিস্তিই নীচে পুনর্মুদ্রিত করিলাম :

একদিন তো সবই ছিল, আজকে কোথা গেল সে সব ?
রামমোহন আর বিদ্যাসাগর মধু দীনবন্ধু কেশব—
এসেছিলেন বঙ্কিমও তো দর্শাতে বঙ্গের গৌরব ;
এসেও ছিলেন, চলেও গেছেন—বঙ্গবাসী পেয়েছে কী
আজকে এস সে হিসেবটা সবাই মিলে খতিয়ে দেখি।

এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, তস্য শিষ্য নরেন্দ্রনাথ
ভারতবাণী প্রচার ক'রে করেছিলেন প্রতীচী মাত।
ভারত দিব্যজীবন 'পরে করিয়ে ধরার দৃষ্টিনিপাত
অরবিন্দ এলেন গেলেন আশার কথা কতই লেখি—
একুনে ফল কী হয়েছে, এস হিসেব খতিয়ে দেখি।

এসেছিলেন বঙ্গ-রবি বিশ্বভুবন আলো ক'রে,
উদয়ে তাঁর বাঙালী কি জাগল কেহ নতুন ভোরে ?
কিম্বা তারা রাত রয়েছে ভেবেই আছে ঘুমের ঘোরে—
রবির কিরণ হেথায় কি হায়, বিফল পাষাণ-ত্বালে ঠেকি !
জন্মশতক-জয়ধ্বনির মাঝেই হিসেব খতিয়ে দেখি।

বঙ্গভূমির অঙ্গে আঘাত হান্‌তে গিয়ে লর্ড কর্জন
শুনতে যে পাই খুঁচিয়ে বাঘে শুনেছিলেন ঘোর গর্জন ;
ব্যাঘ্র যদি, কাঁপছে কেন—কাঁদছে শুনে ফেউ-তর্জন ?
কিম্বা ছিল চামটা বাঘের আক্কেকে ধরা পড়ল মেকী !
'রাহুলাটের রিপোর্ট'খানার সত্যাসত্য খতিয়ে দেখি।

স্বাধীনতার একক পথিক বঙ্গ-নেতা সুভাষচন্দ্র,
ব্রিটিশশাসন-লৌহকারায় বজ্র হেনে মুক্তি-রন্ধ্র—
কীর্তি তাঁরি শুনেছি তাই, সেই বাঙালী ক্রমেই বন্ধ
ভঙ্গ বঙ্গ-চতুঃসীমায়, সেথাও feel করছে shaky !
কেন এমন ঘটল এস, কারণটা তার খতিয়ে দেখি।

শিক্ষা-পদমর্যাদাতে ছিল এমন যার অভিমান,
মাদ্রাজী আর পাঞ্জাবীতে কাটছে কেন তাহার দু'কান ;
"ছিল"র কোনো দাম নাই ভাই, "আছে" যদি না দেয় প্রমাণ—
বুদ্ধি যাহার ছিল সে আজ কেন বুদ্ধির এমন ঢেঁকি !
সবাই এসো মিলেমিশে নিখুঁত হিসাব খতিয়ে দেখি॥

'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র সুলভ সংস্করণ ও কালোবাজারের সুবিপুল সম্ভাবনা

সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে আগামী বৈশাখ মাসে 'রবীন্দ্ররচনাবলী'র সুলভ সংস্করণ ২৫ হাজার সেট মুদ্রিত হইয়া মাত্র ৭৫ টাকা সেট মূল্যে বিক্রীত হইবে। পনের টাকা আগাম জমা দিয়া নাম রেজিস্ট্রি করিলেই চলিবে, বাকি দাম কিস্তিতে কিস্তিতে আদায় করা হইবে। এই সুসংবাদে আনন্দিত হইতে পারিতেছি না অনেকগুলি কারণে। প্রথম কারণ, বিজ্ঞাপনদৃষ্টে মনে হইল অধুনাপ্রচলিত ২৬ খণ্ড রচনাবলীই তেরখণ্ডে বাহির হইবে। আমরা রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিক

উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনাবলী একত্র পাইব এইরূপই আশা করিতেছিলাম। ছাব্বিশ খণ্ডে 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' সম্পূর্ণ হয় নাই। অচলিতসংগ্রহ দুই খণ্ড আগেই বাহির হইয়াছে এবং রবীন্দ্র-রচনার বহু অংশ এখনও গ্রন্থাবলীভুক্ত হইতে বাকি আছে। সমগ্র রচনা বাহির করিতে হইলে ২৮ (২৬+২) খণ্ডের অতিরিক্ত আরও অন্ততঃ ৮ খণ্ড প্রয়োজন। বিজ্ঞাপন দেখিয়া মনে হইল এগুলি প্রকাশের কোন ব্যবস্থাই হইতেছে না। মাত্র ২৬ খণ্ড অসম্পূর্ণ প্রচলিত রচনাই পরিবেশিত হইতেছে। এই উৎসবে অসম্পূর্ণ রচনাবলী দেশের লোক চাহে নাই।

দ্বিতীয় কারণ, বর্তমানে চালু রচনাবলীতে অনেক ফাঁক আছে। বহু গ্রন্থে ভ্রমক্রমে বর্জিত বহু প্রবন্ধ কবিতা যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। রচনাবলীর ভূতপূর্ব তত্ত্বাবধায়ক শ্রীপুলিনবিহারী সেন বিশেষ যত্নে রচনাবলীর "গ্রন্থ-পরিচয়" অংশে নষ্টোদ্ধারকাজে অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি গত ত্রিশ বৎসরের সাধনায় এই কার্যে যতখানি পারদর্শী হইয়াছেন তেমনটি আর কাহাকেও দেখি না। শুনিয়াছি সুলভ সংস্করণের কাজে তাঁহার হাত থাকিবে না, অর্থাৎ অসম্পূর্ণ রচনাবলী যেমন অবস্থায় আছে সেইভাবেই মুদ্রিত হইবে। অসম্পূর্ণ দান অসিদ্ধ। ইহার জন্য এত তোড়জোড়ের প্রয়োজন ছিল না।

তৃতীয় কারণ সর্বাপেক্ষা মারাত্মক এবং ভয়াবহ। এতাবৎকাল রবীন্দ্র-সাহিত্য লইয়া ব্যবসায়ে কালো-বাজারের কোনও অবকাশ ছিল না। বিশ্বভারতী যদি অধিক মূল্য দাবি করিয়া থাকেন, তাহার মুনাফা রবীন্দ্রনাথই পাইয়াছেন। ভুঁড়োপেট ব্যবসায়ীরা বাংলা-দেশের মানুষের অশন-বসন-প্রসাধন-পরিবহন-মান-ইজ্জত সকল ব্যাপারেই কালোবাজারের করালদংষ্ট্রা বিস্তার করিয়াছে। বাকি ছিল শিক্ষা ও সাহিত্য। শিক্ষাক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই ভুঁড়োপেটদের অনুপ্রবেশ যে ঘটিয়াছে তাহার প্রমাণ মিলিতেছে তথাকথিত টিউটোরিয়াল ব্যুরোগুলির পরিচালন-ব্যাপারে এবং প্রশ্নপত্র ফাঁসের ধূমে। একমাত্র বাকি রহিল সাহিত্য। এবারে এই 'রবীন্দ্ররচনাবলী'র পঁচিশ হাজারী সুলভ সংস্করণের কল্যাণে সাহিত্যেও কালোবাজার প্রবেশ করিবে। কানাঘুষায় এখনই শুনা যাইতেছে যে ভুঁড়োপেট ব্যবসায়ী মহলে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। কালোবাজারে লক্ষ টাকা কালোবাজার চালু রাখার কাজে লাগিবে ইহাতে কাহারও কিছু বলিবার নাই। পনের টাকা জমা দিয়া হাজার হাজার সেট আয়ত্ত করিয়া পরে বর্ধিত মূল্যে বেচিবার সুযোগ যদি ব্যবসায়ীরা পায় তাহা হইলে এই সুলভ সংস্করণ প্রচারের উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হইবে। দরিদ্র রবীন্দ্র-ভক্তদের সেই কালোবাজারের দরেই যদি রবীন্দ্ররচনাবলী সংগ্রহ করিতে হয় তাহা হইলে যে গবর্মেণ্টের ক্ষতি, বিশ্বভারতীর ক্ষতি এবং রবীন্দ্রনাথের অপমান হইবে সেই কথাটাই আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে উপলব্ধি করিয়া সাবধান হইতে বলি। আগামী জন্ম-শতবর্ষ উৎসবে ধনী ব্যবসায়ীরা যেন দরিদ্র জনসাধারণের রবীন্দ্র-সাহিত্যরস উপভোগের বাধা সৃষ্টি করিতে না পারে সেজন্য বিশেষ সতর্কতা এখন হইতেই অবলম্বন করিতে হইবে।

আবার বলি—(১) 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' যেন সম্পূর্ণ রচনাবলী হয়। (২) যেন বানান ও পাঠের ভুলে অপাঠ্য না হয় এবং (৩) সুলভ সংস্করণ যেন সত্যকার রসিক ভক্তজনের পক্ষে সুলভ হয়।

বাঙালীবিরোধী চক্রান্তের একটি দৃষ্টান্ত

গত ২২ অক্টোবর তারিখের 'যুগান্তরে' "দেহ-ব্যবসায়ের স্বর্গ" শিরোনামায় বোম্বাইয়ের 'ব্লিৎস' পত্রিকায় প্রবন্ধচ্ছলে বাংলাদেশের যে কুৎসা প্রচারিত হইয়াছে বঙ্গবিরোধী চক্রান্তের তাহা একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। 'যুগান্তর' এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন :

"উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট—আসাম হাঙ্গামার পর হইতে ইহা ক্রমশঃই স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে এবং এই ব্লিৎস পত্রিকা প্রবন্ধান্তরে আর একদফা বাঙ্গালী কুৎসা রটনা করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

প্রবন্ধের সূচনায় বলা হইয়াছে, কলিকাতার গণিকালয়-গুলিতে তিলধারণের স্থান নাই (এতো গণিকা!), নবাগতাদের সংখ্যা হইবে কয়েক হাজার এবং তাহারা রাস্তায় খোলাখুলি তাহাদের শিকার খুঁজিয়া ফেরে।

শিকারের সংখ্যাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। যে ব্যবসায় ছিল অন্ধকারের তাহা আজ সারা দিবসের পণ্য এবং রেস্তোরাঁ, বোর্ডিং, হোটেল পার্ক বা রকেও পাওয়া যায়।… একজন সমাজসেবিকা প্রবন্ধকারকে নাকি বলিয়াছেন, বিশ্বাস করুন এই সব মেয়েরা [সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে ৮৮০০০] অধিকাংশ আপনার আমার পরিবার হইতে আসিয়াছে।”

ধর্ম-ব্যবসায়ীর স্বর্গ বোম্বাইয়ের পত্রিকায় যখন কলিকাতার এই মনোরম চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তখন বুঝিতে হইবে কলিকাতার তথা বাংলাদেশের অবস্থা সত্যই শোচনীয়। শোচনীয় এই কারণে যে বোম্বাইয়ের সঙ্গে বাংলার কোনও দিক দিয়া কোনও বিরোধ না থাকায় বরং বহু বিষয়ে বহু মিল থাকা সত্ত্বেও ‘ব্লিৎস’কে দিয়া এই বঙ্গবিরোধিতা বাংলাদেশে ব্যবসায়সূত্রে অবস্থিত কোনও ধনী শক্তিশালী দল করাইতেছেন। আসাম-দুর্ঘটনার সময় কলিকাতার বিশেষ মহল্লার চাঞ্চল্য বোম্বাই পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আসাম গোলযোগের পিছনেও ইঁহারা ছিলেন অনেকে এইরূপ সন্দেহ করিয়াছেন। কেন্দ্রে টাকার জোরে ইঁহারা স্বাধীন ভারতবর্ষে বহু অঘটনই ঘটাইয়াছেন, সুতরাং কলিকাতাকে নরককুণ্ডে পরিণত করিবেন তাহাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নাই।

তাই বলিতেছিলাম, বাঙালী আজ জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঁচিতে হইলে তাহাকে নিঃশেষে মরার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। বাংলাদেশ আজ সত্যসত্যই ভারতবর্ষের যাবতীয় পঙ্কিল নর্দমার সমাবেশে নরকে পরিণত হইয়াছে। আমরা এখানকার বাসিন্দা, সুতরাং পঙ্কোদ্ধারের দায়িত্ব আমাদেরই। অন্যের উপর দোষারোপ করিয়া লাভ নাই। অতিরিক্ত লোভে এবং উদারতায় ভুল আমরাই করিয়াছি। অবিমৃষ্যকারিতা-বশতঃ শাইলকদের কাছে ঋণ করিয়া বসিয়া আছি। আজ মাংসলোলুপদের প্রাপ্য মাংস ওজন করিয়া তাহাদের ঋণ মিটাইয়া দিয়া তবে নূতনভাবে বাঁচিবার সাধনা করিতে হইবে। বাঙালী শান্ত থাকুক, স্থির থাকুক, তবেই আবার ধীরে ধীরে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাম্‌

কাজেই বাঙালীকে এবারে ভাবের স্বর্গ হইতে মাটিতে নামিয়া দাঁড়াইতে হইবে। সাহিত্য, সংস্কৃতি—কালচারের অভিমান এখন থাক্‌। হে বাঙালী, ভীষণ-ভয়ঙ্করের মুখামুখি দাঁড়াও, ভয় দূর কর। অভীঃ হও।

মরণ যখন ঘনিয়ে আসে জীবন তখন শোনায় প্রেমের কথা,
রহস্যময়, এ বিচিত্র খেলা তোমার বুঝতে পারি নাকো—
ভয়ে যখন ভাঙছে স্বপন, তখন কেন স্বপ্ন ব্যাকুলতা,
শ্মশান-ভূমির ধূসরতা শ্যামল শোভায় মিথ্যা কেন ঢাকো!
আজো দেখি কল্পলোকের দূতেরা সব করছে আনাগোনা,
আকাশ-গাঙে ছিপ ফেলে কি আজকে তারা-ধরার সময় হ’ল—
ছিঁড়েছে জাল এখন কেন নতুন ক’রে হতেছে জাল বোনা?
নগ্ন যাহা, সত্য যাহা দেখাও তাহা, মোহাবরণ তোল।
অপরূপকে দেখেছি যে সবুজ ধানে, নীলের গভীরতায়,
দেখেছি তায় আকাশ-ছোঁয়া তুষারধবল হিমাচলের চূড়ে,
দেখেছি তায় নিশীথ রাতে বধূর যখন ঘোমটা খ’সে যায়,
মুকুল ঝরা আমের ডালে কোকিল ডাকে ব্যাকুল করা সুরে।
দেখেছি তায় মেঘলা দিনে পেখম তোলা অধীর শিখীর নাচে,
মধ্যদিনের প্রখর দাহে আলিসাতে কপোতকূজন মাঝে,
মায়ের বুকে মুখটি রেখে দেখেছি তায় শিশু যেথায় বাঁচে,
দেখেছি তায় পাখীরা সব ফেরে যখন ক্লান্ত প্রাণে সাঝে।

বজ্রানলে পৃথ্বী জ্বলে, বহ্নিজ্বালা ছড়ায় দিকে দিকে,
এমন দিনে হে মহারাজ, শোনাও আদেশ অগ্নিদহন ভাষে,
রহস্যময়, বাণী তোমার রক্তলিখায় যাও না লিখে লিখে,
শূন্যপথে কানে আমার সেই বাণীরই আভাস যেন আসে।
ভাঙাগড়ার খেলায় তোমার বজ্রবীণা শুনতে সবায় দাও,
তোমার শান্ত মধুর লীলা জীবন ভ’রে অনেক দেখিলাম—
আজকে প্রভু, সেই আবরণ আপন হাতে তুমিই খুলে নাও,
নয়ন ভরে দেখি এবার মহৎ ভয়ের ভীষণ পরিণাম॥

[‘সমাবেশ’]

'বেস্ট ব্রেন' এবং সৃজনী কল্পনা

অচ্যুত গোস্বামী

দৈনিক পত্রিকার রবিবারের সংখ্যায় দেড় পৃষ্ঠাব্যাপী পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন থাকে। এই অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বিজ্ঞাপনগুলির দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করলে দেখতে পাওয়া যায়—যে-সব পাত্রীর পিতারা পাঁচ হাজার কি দশ হাজার কি তদূর্ধ্ব পরিমাণ পণ দিতে সক্ষম তাঁরা অবধারিতভাবে তিন শ্রেণীর পাত্র চান—ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার অথবা গেজেটেড অফিসার।

নেহাত পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন বলে বিষয়টাকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। এর ভিতর দিয়ে সমাজের চোখে কোন্ কোন্ শ্রেণীর লোক সবচেয়ে মূল্যবান বলে বিবেচিত হয় তার একটা নির্ভুল পরিচয় পাওয়া যায়। সংখ্যায় খুব অল্প হলেও বাঙালীদের মধ্যে কিছু-সংখ্যক শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী আছেন। পাত্রের বাজারে তাঁদের কিন্তু তেমন কোন চাহিদা নেই। আমি দেখেছি মাসে দু-তিন হাজার রোজগার করেন এমন ব্যবসায়ী সামান্য একটু ফরসা রঙের লোভে নিতান্ত সাধারণ ঘরের নিতান্ত স্বল্পশিক্ষিত মেয়েকে বিয়ে করতে বাধ্য হন। কাজেই সমাজের এই পক্ষপাতিত্বের কারণ নিছক বিত্ত নয়। বিত্তের সঙ্গে আরও একটা জিনিস চাই—কালচার। পূর্বাগত সংস্কার অনুযায়ী শিল্পপতি বা ব্যবসায়ীদের কালচার সম্পর্কে অনেকের মনেই সন্দেহ আছে। কিন্তু সমাজের সমস্ত লোকের সর্ববাদীসম্মত বিশ্বাস এই যে ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার এবং গেজেটেড অফিসারের মধ্যে দুটি জিনিসের রাজযোটক মিল ঘটেছে—বিত্ত এবং কালচার।

এই তিন শ্রেণীর লোকের কালচারের সঙ্গে সম্পর্কটা কেমন একটু খোঁজ নেওয়া যাক।

যে ডাক্তারের পসার আছে তিনি সাধারণতঃ কী বই পড়েন ?

এই ডাক্তার তিনটে থেকে চারটে পর্যন্ত এক ঘণ্টা সময় চেম্বারে রুগী দেখেন। দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘণ্টাখানেক গড়িয়ে নিয়ে (বা না নিয়ে) ঠিক দুটো পঞ্চাশে তিনি চেম্বারে আসেন। এই দশ মিনিট তাঁর কালচারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের সময়। হাতের কাছে থাকে কিছু আমেরিকান ফ্যাশান ম্যাগাজিন। তারই একখানা তিনি হাতে তুলে নেন। শুধু পাতা উলটিয়ে যেতে হয়—এ সব ম্যাগাজিন পড়ার জন্য নয়। সারিবদ্ধ বিচিত্র ভঙ্গীর বিরল-বসনা মার্কিনী নারীর বর্ণাঢ্য চিত্র তাঁর অলস চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যায়। অ্যানাটমি তাঁর পেশা হলেও এসব চিত্র তাঁর স্নায়ুতে এখনও সামান্য উষ্ণতা সৃষ্টি করে। সেইটুকুই তাঁর প্রয়োজন। তারপর তিনটে বাজবে। এক ঘণ্টার মধ্যে তিনি কুড়িটি পেশেন্টকে দেখবেন। রুগীপিছু গড়পড়তা তিন মিনিট করে সময়—দক্ষিণা বত্রিশ টাকা। চারটে বাজবে। তাঁর গাড়ি ছুটবে কোনও হসপিটালের দিকে। সেখান থেকে তাঁর নিজস্ব নার্সিংহোমে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন

রুগীর বাড়ি থেকে কল্ আসছেই আসছেই আসছেই। বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত বারোটা। কর্মযজ্ঞ শুরু হবে আবার পরদিন ভোর ছটা থেকে।

কাজেই এই কর্মব্যস্ত মানুষটির পড়ার কখনও সময় হয় না। তবু দৈব বলে একটা কথা আছে। কিন্তু সেই দৈবাতের মধ্যেও দুটো জিনিসকে তিনি খুব নিষ্ঠার সঙ্গে এড়িয়ে চলেন। এক নম্বর—বঙ্গভাষা নামে একটি ভাষায় লেখা সাহিত্য। দু নম্বর—বিদেশের মেডিক্যাল রিসার্চ সংক্রান্ত যে-সব জার্নাল নিয়মিত তাঁর ঠিকানায় আসে।

যে ডাক্তারের এখনও পসার জমে নি তিনি কী বই পড়েন?

তাঁর সময় অনেক। তবে মনটা একটু খারাপ থাকে। তিনি পাড়ার থিয়েটার-গ্রুপের পেট্রন। এবং সেই হিসাবে মন্মথ রায়, অপরেশ মুখুজ্জেদের দু-একখানা নাটকের বই তাঁকে পড়তেই হয়। এসব নেহাত দায়ে পড়ে পড়া—বাংলাদেশের নাটকের মান যে কত নীচু তা তিনি ভালই জানেন। কিন্তু তাঁর মনের মত পড়ার জিনিসও কিছু কিছু আছে কিনা বলা শক্ত হলেও এটুকু বলা চলে যে মন খারাপের অজুহাতে তিনি বাংলা ডিটেকটিভ উপন্যাসই বেশী পড়েন সময় কাটানোর জন্য।

যেসব ইঞ্জিনিয়ার সরকারী চাকরি করেন তাঁদের কাজের সঙ্গে সাধারণ কেরানীর কাজের কোন তফাত নেই—এক মাইনের তফাতটা ছাড়া। ডি. পি. আই. দপ্তরের শিক্ষাবিদরা যেমন অফিসে বসে ছেলে পড়ান, তাঁরাও তেমনি অফিসে বসে ব্রীজ বা বাড়ি তৈরি করেন—অর্থাৎ কেরানীরা সামনে কাগজ মেলে ধরে জায়গাটা দেখিয়ে দিলে তাঁরা সেই জায়গায় সই মারেন। কাজেই সরকারী ইঞ্জিনিয়ারদের আর গেজেটেড অফিসারদের কথা একসঙ্গে আলোচনা করা চলে। 'ইলাস্ট্রেটেড উইকলি' এবং 'স্টেটসম্যান' নিয়মিত তাঁদের বাড়িতে আসে। প্রথমটা পাতা ওলটানোর জন্য, দ্বিতীয়টা বড় হরফের লেখাগুলো পড়ার জন্য। তাঁরা খুব ভাল করেই জানেন যে দেশের তাঁরা সেরা ইন্টেলেকচুয়ালস। কিন্তু ভাগ্যদোষে তাঁরা সরকারী চাকুরে (এই ভাগ্য-দোষটুকু ঘটানোর জন্য অবশ্য তাঁদের জন্মের প্রথম দিন থেকেই সাধনা শুরু হয়েছিল)। তাঁদের হাত-পা বাঁধা। তাঁরা যদি লিখতেন তবে তাঁরা 'তথাকথিত' শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের অনায়াসে ছাড়িয়ে যেতে পারতেন। ভাগ্যদোষে অবাধ স্বাধীনতায় লেখার সুযোগ নেই বলে অগত্যা তাঁরা লেখেন না। ঘরে বসে যে-কোন বই পড়ায় অবশ্য আইনগত বাধা কিছু নেই। কিন্তু বুদ্ধিজীবীসুলভ মানসিক অসন্তোষের দরুন গুরুত্বপূর্ণ কিছু পড়তে প্রায়ই তাঁরা অনিচ্ছা বোধ করেন। কাজেই সংস্কৃতির তৃষ্ণা মেটানোর জন্য তাঁরা ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়েন। কোন বাঙালীর লেখা বই অবশ্য নয়—কারণ তাঁরা ইন্‌টেলেক-চুয়ালস্। সাধারণতঃ তাঁরা বিলিতী ডিটেকটিভ বই-ই নির্বাচিত করেন। আগাথা ক্রিস্টিদের চেয়ে এখন পিটার চেনিরাই বেশী জনপ্রিয় হচ্ছেন। পুরনো বইয়ের স্টলে দু টাকা জমা রেখে চার আনা করে দিলে একখানা করে বই পাওয়া যায়। পনেরো দিন লাগে একখানা বই শেষ করতে। কাজেই পাবলিক লাইব্রেরির মেম্বার হওয়ার চেয়ে এইভাবে বই পড়লেই খরচ কম পড়ে।

যেসব ইঞ্জিনিয়ার ফীল্ড ওয়ার্ক করেন তাঁরা কী বই পড়েন? এর জবাব দেওয়া খুব সহজ। তাঁরা কিছুই পড়েন না, এমন কি খবরের কাগজখানাও নয়। তাঁদের জীবনটা চালাকি নয়—মাঠেঘাটে ঘুরে পয়সা রোজগার করতে হয় তাঁদের। যদিও গাড়ি আছে, কিন্তু এ দেশের গাড়িতে এয়ারকণ্ডিশনিংয়ের ব্যবস্থা অত্যন্ত বিরল। গাড়িতে রেডিও এবং রেফ্রিজারেটারও ফিট করা থাকে না। গাড়ি বটে—আরাম কোথায়? সন্ধ্যাবেলায় তাঁরা বাড়িতে এসে ইজিচেয়ারে সটান শুয়ে পড়েন। চাকর গরম জল নিয়ে এসে পায়ে ফুটবাথ দেয়। স্ত্রী-কন্যারা চারপাশে মোতায়েন থাকেন কখন কী আদেশ হয় তামিল করার জন্য। তাঁদের পিছনে অবশ্য দু-একজন ঝি-চাকর থাকে—আসল কাজটা তারাই করে।

এই হচ্ছে আধুনিক বঙ্গের কুলটুর শিরোমণিদের একটি নিখুঁত চিত্র। স্ট্যাটিস্‌টিকস্ নিলে দেখতে পাওয়া যাবে এ চিত্র মোটেই অতিরঞ্জিত নয়। এঁদের জন্যই দশ হাজার

পঁচিশ হাজার পণ দিতে সক্ষম কন্যার পিতারা হাঁ করে বসে থাকেন। এবং নিঃসন্দেহে এঁরাই একসময়ে ছিলেন দেশের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্র। স্কুলবোর্ডের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাসের তালিকায় যাদের নাম প্রথম দশ-জনের মধ্যে থাকে তাদের কিছু মেধা আছে এ কথা অস্বীকার করা ঠিক নয়। সেই ছেলেরা পরে কোথায় হারিয়ে যায় কেউ বড় একটা খোঁজ নেন না। শিক্ষার ক্ষেত্রে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে বা এমন কি রাজনীতির ক্ষেত্রেও তাদের খুব কদাচিৎই দেখতে পাওয়া যায়। আসলে এই-সব ছেলেরা হারিয়ে যায় না—উপরোক্ত কুলটুর শিরোমণিদের মধ্যেই তারা বিরাজ করে। পরীক্ষায় ভাল ফল করার মেধা থাকার ফলে তাদের সামনে জীবনে উন্নতি করার পাকা সড়ক প্রসারিত থাকে। স্বভাবতঃই ডাইনে-বাঁয়ের অনিশ্চিত পথে তারা পা বাড়ায় না।

নতুন শিক্ষা সংস্কারের ফলে পঁচিশ বছর পরে আমাদের দেশের এই বেস্ট ব্রেনদের অবস্থা কী দাঁড়াবে তারও একটু খোঁজ নেওয়া যাক। অনেকদিন ধরেই ব্রেস্ট ব্রেনরা বিজ্ঞান শিক্ষার দিকে ঝুঁকেছেন—বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগবশতঃ নয়, প্রসপেক্টের প্রতি বিরাগ নেই বলে। তথাপি পুরনো শিক্ষাব্যবস্থায় ইণ্টারমিডিয়েট মান পর্যন্ত তাঁদের কিছু পরিমাণ ইংরেজী আর বাংলা সাহিত্য পড়তে হত। ভাল ফল করার তাগিদে তাঁরা এ পড়াটা যত্ন করেই পড়তেন। তারই ফলে পরবর্তী কালে যদিও সাহিত্যের সঙ্গে তাঁরা কোনই সম্পর্ক রাখেন না তবু তাঁদের সঙ্গে সামান্য দু-পাঁচ মিনিট কথা বলে সেটা ধরা যায় না।

কিন্তু নতুন শিক্ষাসংস্কারের ফলে এই অবস্থা আর থাকবে না। এখন একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছেলেদের ইংরেজীতে একটি লাইনও পড়তে হবে না। তারা অবশ্য ইংরেজী শিখবে—শুধু লিখতে] শিখবে, পড়তে শেখার প্রয়োজনটা আধুনিক শিক্ষাবিদরা স্বীকার করেন না। বাংলার ক্ষেত্রে অবস্থা একটু স্বতন্ত্র—শতখানেক পৃষ্ঠার একখানা চটি সংকলনগ্রন্থ ছাত্রদের পড়তে দেওয়া হবে। এই একশো পৃষ্ঠার সাহিত্যবিদ্যা সম্বল করে বাংলার ব্রেস্ট ব্রেনরা ডাক্তারী ইঞ্জিনিয়ারিং বা এম্. এস্-সি. পাস করে বেরিয়ে এ দেশের কুলটুর শিরোমণিদের দলপুষ্ট করবেন এবং কন্যার পিতাদের জিহ্বাগ্রে লালাক্ষরণের কারণ হবেন। কারণ, নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষা পাস করার পর বিজ্ঞানের ছাত্রদের পাঠ্যক্রমের সঙ্গে সাহিত্যের কোন সম্পর্ক থাকবে না।

কাজেই অনায়াসে অনুমান করা যায় পঁচিশ বছর পরে আমাদের ছাত্রাবস্থার বেস্ট ব্রেনরা, পরবর্তীকালের কুলটুর শিরোমণিরা বুক ফুলিয়ে সগর্বে ঘোষণা করবেন যে তাঁরা জীবনে একখানাও সাহিত্যের বই পড়েন নি। দৈবের মার বলা যায় না। দৈবাৎ মনের ভুলে বা সর্দিজ্বর হওয়ায় সাময়িক মানসিক দুর্বলতাবশতঃ কেউ হয়তো এক-আধখানা বই পড়েও ফেলতে পারেন। কিন্তু প্রকাশ্যে সে কথা তিনি সযত্নে গোপন রাখবেন সম্মান-হানির ভয়ে। কারণ এ কথাটা তখন আর ঢাক-ঢাক-গুড়গুড়ের ব্যাপার থাকবে না (যেমন এখন আছে) যে সাহিত্যটা নিকৃষ্ট মেধাসম্পন্নদের পাঠ্য।

হাসির ব্যাপার নয়। আমাদের জনকল্যাণমূলক সরকার এই বিধান দিয়েছেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্কেশ শিক্ষাবিদরা পাঠ্যক্রম তৈরি করার সময় ধরে নিয়েছেন যে বেস্ট ব্রেনদের সাহিত্যপাঠের দরকার নেই। সাহিত্য নিকৃষ্ট মেধাসম্পন্নদের জন্য।

পুরনো আলোচনায় ফিরে আসি। কন্যার পিতারা যাদের বেস্ট কালচার্ড বলে মনে করেন তাদের কথা বলছিলাম। আমি বলেছি যে এ দেশের মোস্ট কালচারড্‌রা সাহিত্য বলতে যা বোঝায় তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেন না। তবে কি কন্যার পিতারা একটা ভুল ধারণা পোষণ করেন? না সাহিত্যপাঠ কালচারের একটা অপরিহার্য অঙ্গ এই ধারণাটাই বর্তমানে সেকেলে হয়ে গিয়েছে। মহেঞ্জোদরোতে পয়ঃপ্রণালী আবিষ্কার করে আমরা ধরে নিয়েছি সেটা একটা উচ্চস্তরের সভ্যতা ছিল। উল্লিখিত ব্যক্তিদের বাথরুম ও ল্যাট্রিনের মার্বেল-স্টোন পারিপাট্য দেখে তাঁদের কালচারের উচ্চতা পরিমাপ করব না কেন? পারিবারিক রীতিনীতি, সাজসজ্জা, প্রসাধন দ্রব্যাদি, সুবেশ আগন্তুককে দেখে

মোলায়েম হাসির সঙ্গে অভ্যর্থনা করা আর আগন্তুকের মলিন বসন থাকলে চট্ করে মুখটাকে গম্ভীর এবং মেজাজটাকে তিরিক্ষি করে ফেলা—এ সবই কালচারের অঙ্গ।

শুধু তাই নয়। কালচারের আরও অঙ্গ আছে। সবচেয়ে প্রধান দুটি হল বিজ্ঞানের দান—রেডিও এবং সিনেমা। তার সঙ্গে যোগ করা যাক সিনেমার অনুসারী আধুনিক রঙ্গমঞ্চ এবং সঙ্গীত ও নৃত্যের আসরাদি। কালচারের এই দিকগুলো সম্পর্কে একটু বিশদ আলোচনা করার দরকার আছে। এক কথায় এই কালচারকে বলা যায় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইলেকট্রিসিটির দান।

এই ইলেকট্রিক-কালচারের প্রসঙ্গে সিনেমার কথাটা প্রথমেই আলোচনা করতে হয়। কারণ আচার-ব্যবহার-সজ্জাদিকে যদি কালচারের স্থিতিশীল অংশ বলি, তবে সিনেমা সাহিত্য ইত্যাদিকে বলতে হয় গতিশীল অংশ। এই গতিশীল কালচারের মধ্যে একমাত্র সিনেমার সঙ্গেই শেষ পর্যন্ত বেস্ট ব্রেনদের কিছু কিছু সম্পর্ক রাখা সম্ভবপর হয়। কারণ রেডিওটা বাড়ির মেয়েরা এবং শিশুরা দখল করে বসে থাকে। ইচ্ছে থাকলেও তাদের মধ্যে বসে রেডিও শোনা যায় না। তাতে প্রেস্টিজ নষ্ট হয়। কাজেই মাঝে মাঝে সিনেমায় যাওয়াটাই জীবন্ত কালচারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার একমাত্র উপায়। সেখানে ছ আনা থেকে সাড়ে তিন টাকা অবধি দামের টিকিট পাওয়া যায়।

সিনেমা এক আশ্চর্য জায়গা। সিনেমার সঙ্গে একমাত্র শ্মশানেরই তুলনা করা চলে। শ্মশান সম্পর্কে যেমন কবি বলেছেন—এখানে আসিলে উচ্চ-নীচ ধনী-দরিদ্র এক হইয়া যায়—সিনেমা সম্পর্কেও সেই কথা বলা চলে। বেস্ট ব্রেন এবং ওয়ার্স্ট ব্রেনদের মোলাকাত হয় এখানে। বসবার জায়গার তফাত থাকলেও দেখার জিনিসের তফাত নেই। মাঝারি ব্রেনরাও আসে এখানে, তবে তারা আবার কিঞ্চিৎ সাহিত্য-টাহিত্যও পড়ে বলে তাদের একটু স্বতন্ত্র করে দেখছি।

শ্মশানে মানুষের মৃতদেহের শেষ কৃত্য করা হয়, সিনেমায় মানুষের মৃত মনের শেষ কৃত্য করা হয়। একটু ব্যাখ্যা করে বলি।

শারীরধর্ম থেকে মনোধর্মে অগ্রগমনকেই আমরা সভ্যতার পথে যাত্রা বলি। বর্বর মানুষের সঙ্গে পশুর মৌলিক প্রবণতাগত তফাত খুব সামান্যই ছিল—ক্ষুন্নিবৃত্তি এবং প্রজননই ছিল উভয়ের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। কালক্রমে বর্বর মানুষের চোখে হয়তো সূর্যাস্তের বর্ণালি বা বন-পুষ্পের বর্ণ ও সৌরভ পার্শ্ববর্তী দৃশ্যগুলির তুলনায় একটু স্বতন্ত্র গৌরব অর্জন করেছে। শিল্প-বোধের সেইটেই সূচনা। পায়ে চলার মধ্যে দিন-রাত্রি বা ঋতুচক্রের আবর্তনের মধ্যে তারা একটা রিদম্ আবিষ্কার করতে পেরেছে। তার থেকে নাচ ও সঙ্গীতের জন্ম। এমনি করে অতি ধীরে ধীরে যে শিল্পবোধ জন্মলাভ করেছে তা দীর্ঘকাল পর্যন্ত একান্তভাবে ইন্দ্রিয়-নির্ভর ছিল। প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবীদের নিয়ে যেসব আদিম কাহিনী রচিত হয়েছিল সেগুলো পরিবেশিত হত সঙ্গীত নৃত্য অভিনয় কথকতা ইত্যাদির মাধ্যমে। তখনও আমরা ইন্দ্রিয়ের আধিপত্যকে অতিক্রম করতে পারি নি। যেদিন আমরা পড়তে শিখলাম সেদিন আমাদের এক আশ্চর্য মুক্তি ঘটল। সমস্ত পৃথিবীর দরজা জানলা বন্ধ করে, সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রামকে নির্জীব করে রেখে আমরা তালপাতার উপরে লেখা কালো কালো পিঁপড়ের সারির মত কতকগুলো অক্ষর বা প্রতীক পড়ে পড়ে শুধুমাত্র মনের কল্পনার সাহায্যে এক আশ্চর্য সৌন্দর্যলোক আপন মনে গড়ে তুললাম। আমাদের মানসদৃষ্টির সামনে বাড়িঘর লোকজন প্রকৃতিজ সৌন্দর্য গড়ে উঠল। এই মানসজগৎ বাস্তবজগতের মতই কিন্তু হুবহু এক নয়। বাস্তবে আমরা যা চাই তা পাই না, কিন্তু এখানে তা আছে। বাস্তবের যে অংশ ইন্দ্রিয়গ্রামের অনায়ত্ত, মনের জগতে তা ধরা পড়ে। বাস্তবে আমাদের কাছে অপর মানুষের মন ও হৃদয় অনধিগম্য। মনোজগতের স্বচ্ছদেহী মানুষদের মন আমাদের সামনে অনাবৃত হয়, তাদের হৃদয়কে আমরা স্পর্শ করতে পারি।

এমন কি ইন্দ্রিয়-নির্ভর শিল্পগুলিরও সাধনা ইন্দ্রিয়-

নির্ভরতার চেয়ে অতিরিক্ত কোন আবেদন সৃষ্টি করা। কোন সুন্দর মুখের ফটোগ্রাফ এবং শিল্পীর আঁকা পোর্ট্রেট আমি দেখেছি। বাইরের চোখের বিচারে ফটোগ্রাফটি বেশী সুন্দর। শিল্পী যেন ইচ্ছে করে মুখখানির অপূর্ণ সামঞ্জস্যকে ক্ষুণ্ণ করেছেন। কিন্তু মনের চোখ দিয়ে দেখতে পেলাম শিল্পীর চিত্রে মুখখানির আড়ালে যে মুখের মালিকটি ছিলেন তাঁর চরিত্র ধরা পড়েছে। ফটোগ্রাফের মধ্যে শুধুই বাইরের রেখাগুলো।

এ কথা হয়তো ঠিক—ইন্দ্রিয়ানুভূতিই সমস্ত শিক্ষা-বোধের ভিত্তি। কিন্তু ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে ইন্দ্রিয়নির্ভরতার হাত থেকে মুক্তি দিয়ে আমরা তার অসাধারণ ব্যাপ্তি গভীরতা এবং বৈচিত্র্য সম্পাদন করতে পেরেছি। শিল্পবোধের সাহায্যে আমরা যে মনোজগৎ রচনা করেছি, সেই মনোজগতের আলোতে আমরা আমাদের বাস্তব জীবন-যাত্রাকে নতুন করে পুনর্নির্মাণ করেছি; আমাদের বাস্তব আবেগ-অনুভূতিতে যে এত জটিলতা রহস্যময়তা এবং মাধুর্য, তার কারণ শুধুই অর্থনৈতিক জীবন নয়। তার কারণ আমাদের শিল্প-সাহিত্যের বিপুল ঐশ্বর্য। এ কথা বললে ভুল হয় না যে পশু-পাখি বাস করে মাটির পৃথিবীতে; মানুষ বাস করে তার নিজের তৈরী মনের পৃথিবীতে।

এই শিল্প-প্রতিভার আশ্চর্য স্ফুরণের পিছনে রয়েছে মানব-মনের একটি শক্তি—সৃজনী কল্পনা। কাব্য-সাহিত্য উপভোগ করা ও সৃষ্টি করার পিছনে এই একটি প্রেরণাই কাজ করে—সেটা সৃজনী কল্পনা।

কিন্তু বিজ্ঞানকে ধন্যবাদ, ইলেকট্রিক সংস্কৃতির প্রধান বাহন সিনেমা এই সৃজনী কল্পনার দাসত্ব থেকে আমাদের মুক্তি দিয়েছে। আমাদের সেই অনেক আগের ইন্দ্রিয়-নির্ভরতার যুগে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। সৃজনী কল্পনা যে মনেরই বিকশিত রূপ! তার দাসত্বের কি কোন প্রশ্ন ওঠে? ইন্দ্রিয়গ্রাম মনোরাজ্যের বাইরের জিনিস, মনের পাঁচটি দরজা, কিন্তু মন নয়। তার দাসত্বকে আমরা সভ্যতা বলে গ্রহণ করছি।

সিনেমার মধ্যে ভাল ছবি খারাপ ছবি আছে। কিছু কিছু খুব ভাল ছবি আছে যা স্মরণীয় হয়ে থাকার যোগ্য। সেই তারতম্যের আলোচনায় এখন গিয়ে লাভ নেই। সিনেমার শিল্প-প্রকৃতিই আপাততঃ আমার আলোচ্য বিষয়। সিনেমার শিল্প-প্রকৃতিই এমন যে তাকে দর্শকদের ইন্দ্রিয়গ্রামকে পরিতুষ্ট করতে হবে। চক্ষু এবং কর্ণ তো বটেই, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও একেবারে বঞ্চিত হয় না! সুন্দর মুখ, শোভন দৃশ্যাদি, চিত্তাকর্ষক আবহ-সঙ্গীত না হলে সিনেমা অচল।

সিনেমার একটি মর্মস্পর্শী দৃশ্যের স্থিরচিত্র নেওয়া যাক। সেটি ফোটোগ্রাফ, চিত্র নয়। জীবনের বাইরের রূপ-রেখা, অন্তরের রূপ নয়। মনের রূপকে পর্দায় প্রতিফলিত করা খুবই শক্ত বলে প্রতিভাবান পরিচালকরা নানা পন্থার আশ্রয় নিয়েছেন—প্রতীকের ব্যবহার, মন্টাজ, সুপার ইম্পোজিসন ইত্যাদি। তথাপি দীর্ঘায়ত দৃশ্যাদি বা দীর্ঘ সংলাপ যে সিনেমায় বিরক্তিকর, তার কারণ এই সব সময়ে নায়ক-নায়িকার প্রাণহীন ছায়াধর্মিতা দর্শকের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সিনেমার দ্রুতগতি এই ছায়াধর্মিতার অনুভূতিকে ভুলিয়ে রাখার জন্যই দরকার। তা ছাড়া এই দ্রুতগতির ফলে কয়েকটি ইন্দ্রিয়কে খুব পরিশ্রম করতে হয়। অঙ্গ পরিচালনায় আমরা যেমন একজাতের আনন্দ পাই, এই দ্রুত ইন্দ্রিয়-চালনাতেও তেমনি আনন্দ আছে। গতিশীলতা ইন্দ্রিয়গুলিকে দারুণভাবে পরিশ্রান্ত করে, মন ইন্দ্রিয়প্রেরিত ইম্প্রেশনগুলি গ্রহণ করতেই এত ব্যস্ত থাকে যে তার আর কিছু করার অবকাশ থাকে না। কিন্তু গতিশীলতাও একঘেয়ে হয়ে ওঠে বলে সিনেমায় পর পর কতকগুলি নাটকীয় মুহূর্ত দরকার। নাটকীয় মুহূর্তগুলির পিছনে যে বিপুল মানসিক প্রক্রিয়া থাকে সিনেমায় তা অনুপস্থিত; নাটকীয় মুহূর্ত যে বিপুল দীর্ঘস্থায়ী মানসিক প্রতিক্রিয়া এবং পরিবর্তন সৃষ্টি করে সিনেমায় তার পরিচয় দেওয়াও সম্ভব হয় না। কাজেই সিনেমা যারা বেশী দেখে তাদের মনে এই ধারণা সৃষ্টি হয় যে জীবন বুঝি কতকগুলি নাটকীয় মুহূর্তের সমষ্টিমাত্র। জীবনে তারা যথেষ্ট নাটক দেখতে পায় না বলে জীবন

সম্পর্কে তাদের মনে এক কৃত্রিম অসন্তোষ গড়ে ওঠে। সেই অসন্তোষ থেকে মুক্তিলাভ করার জন্য আরও বেশী সিনেমায়' যায়। এবং আরও বেশী অসন্তোষ নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসে।

আরও বেশী অসন্তোষের কারণ সিনেমার আবেদন নিছক শারীরিক, শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রামের কাছে। কিন্তু ইন্দ্রিয়কে তা শেষ পর্যন্ত পরিতৃপ্তি যোগাতে পারে না। সিনেমা ভোগের দৃশ্য দেখায়, ভোগ্য পণ্য সরবরাহ করে না। অথচ সিনেমার আলিঙ্গন চুম্বনাদির দৃশ্য তার স্থূলত্বের দরুনই মনের কল্পনার সঙ্গী হয়ে আমাদের ভাব-লোকের বাসিন্দাও হতে পারে না। ইলিয়াডের কাব্যে হেক্টর আর একিলিসের যুদ্ধ, দম্ভ আর প্রকৃত বীরত্বের মধ্যে সংগ্রামের এক নিদর্শন হিসাবে মনে চিরজাজ্জ্বল্যমান থাকে। সিনেমার পর্দায় এই যুদ্ধ এক নারকীয় বীভৎসতা মাত্র। কাজেই সিনেমার দৃশ্য না পারে আমাদের সৃজনী কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করে আমাদের মানস-লোকের সঙ্গী হয়ে উঠতে, না পারে ইন্দ্রিয়গুলির হাতে প্রকৃত ভোগ্য পণ্য তুলে দিতে। সেইজন্য সিনেমা যারা বেশী দেখে তাদের মনে এক অর্থহীন অসন্তোষ প্রকৃতিগত বিশেষত্ব হয়ে দাঁড়ায়। সিনেমার ফলাফল সম্পর্কে আরও বেশী আলোচনা ও গবেষণার প্রয়োজন আছে, কিন্তু আপাততঃ এই পর্যন্ত।

আমি আগে যে কথাটা বলেছিলাম—সিনেমায় মৃত মনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়—এখন বোধ করি কথাটা তত অসম্ভব বলে বোধ হবে না। সিনেমা নিছক একটি ইন্দ্রিয়-নির্ভর শিল্প; সিনেমার আবেদন প্রধানতঃ আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রামের কাছে। আমাদের সৃজনী কল্পনার সাহায্য না নিয়ে শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়সংশ্লিষ্ট স্নায়ুগুলোকে উত্তেজিত করেই সিনেমা আবেগ অনুভূতি সৃষ্টি করে। এবং এই আবেগ অনুভূতিগুলি খুব কদাচিৎই আমাদের কল্পলোকের স্থায়ী সঙ্গী হয়ে উঠতে পারে। শহরের প্রায় সব লোকই কমবেশী সিনেমা দেখে। কিন্তু যাদের মন জীবনের গভীর অনিশ্চয়তার সামনে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে ভয় পায়, যাদের মন পুরস্কারহীন শারীরিক পরিশ্রমের চাপে কুব্জ হয়ে গেছে, বা যাদের মন আপন অহঙ্কারের গহন দুর্গের বাসিন্দা হয়ে জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে ফেলেছে, তাদের পক্ষে সিনেমা অপরিহার্য। অর্থাৎ যাদের মন মরে গেছে, যাদের মধ্যে সৃজনী কল্পনা মরে গেছে তাদের সিনেমা না দেখলে বা অনুরূপ আনন্দের ব্যবস্থা (যেমন নাইট ক্লাব ইত্যাদি) না থাকলে চলে না।

আবার বলি, সৃজনী কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করে এমন ছবিও আছে। কিন্তু সেগুলো সিনেমা-শিল্পের ব্যতিক্রম, তার প্রকৃতির বিরোধী।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে সঙ্গীতের দুজন শরিক আছেন—একজন গায়ক, একজন শ্রোতা। দুজনেই সৃষ্টি করেন—একজন সুর দিয়ে, অপরজন মন দিয়ে। মাঝে মাঝে কলকাতা রেডিওর গান শুনে আমার মনে হয়েছে যে রেডিও-যন্ত্র এমন এক নাইটিঙ্গেল-লাঞ্ছিত অমানুষিক যান্ত্রিক মিষ্টত্ব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে যে তা শুধু ইন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্তি দেয়। এই পরিতৃপ্তি এমন নিরেট যে স্নায়ুমণ্ডলী ঝিমিয়ে পড়ে, মনের সৃজনী কল্পনা এক নিদ্রালুতার আবেশে Lotus Eaters-দের অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বিভিন্ন ধরনের গান শুনে দেখেছি যে তাতে একই ধরনের মানসিক আবেশ সৃষ্টি হয়। কৃত্রিম উপায়ে ইন্দ্রিয়কে প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিতৃপ্তি দিলে মন পার্থক্য নিরূপণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে বলেই আমার বিশ্বাস। এবং তখন বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য 'সি এ টি ক্যাট, ক্যাট মানে বিল্লি' জাতীয় গানের দরকার হয়।

খুব আতঙ্কের সঙ্গে আমি লক্ষ্য করছি যে এই ইলেকট্রিক-সংস্কৃতি আধুনিক রঙ্গমঞ্চকে পুরোপুরিভাবে গ্রাস করতে চলেছে। আধুনিক নাট্যপরিচালকরা বিশ্বাস করতে ভুলে গেছেন যে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা যদি জীবন্ত হয়, নাটক যদি নাটকীয় হয়, তবে নিছক অভিনয়ের সাহায্যেই দর্শকের সৃজনী কল্পনাকে জাগ্রত করে আবেগ সৃষ্টি করা যায়। তাঁরা আজকাল আলোক-সম্পাতের সাহায্যে নাটকীয়তা সৃষ্টি করেন, হঠাৎ কর্কশ বাদ্যধ্বনি করে দর্শকের হৃৎপিণ্ডকে চমকিত করে তাঁরা নাটকীয় অনুভূতি সৃষ্টি করেন। অভিনয় প্রায় গৌণ

হয়ে পড়েছে, ভাল নাটকের কোন প্রয়োজনই নেই—যে কোন নাটকই যথেষ্ট ভাল। আমার তো বিশ্বাস কয়েক টুকরো কালো রঙ-করা কাগজ কয়লার মত করে মঞ্চের উপর সাজিয়ে রাখলে তাই কয়লা-খাদের প্রতীক হিসাবে গণ্য হতে পারে। যাঁরা নাটক দেখতে যাবেন, তাঁরা কয়লার খাদ দেখতে যাবেন না, কয়লার খাদের জীবন-যাত্রার অনুভূতি জাগে এমন অভিনয়-নৈপুণ্য এবং নাটকীয় ঘটনাই দেখতে যাবেন। আলোকসম্পাতের সাহায্যে যে কয়লার খাদ এবং কয়লার খাদে বন্যার দৃশ্য সৃষ্টি করা যায়,এ চমৎকার খেলাটা ম্যাজিসিয়ানদের হাতে তুলে দিলেই তো হয়।

আসল কথা সিনেমা ও রেডিও যার উপর দাঁড়িয়ে আছে, রঙ্গমঞ্চও তাকে আশ্রয় করতে চাইছে। আমাদের সৃজনী কল্পনাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে, শুধুমাত্র আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রামকে, স্নায়ুমণ্ডলীকে উত্তেজিত করে আবেগ-অনুভূতি সৃষ্টি করতে চাইছে। মানুষের অভিনয়-ক্ষমতার প্রয়োজন ক্রমশঃ কমে আসছে ; ভাল নাটকের প্রয়োজনকে ইতিমধ্যেই পাশ কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে।

এই ইলেকট্রিক-সংস্কৃতির সংস্পর্শের জন্য শহরের লোক পতঙ্গের মত ছুটছে। কারণ প্রথমতঃ এই সংস্কৃতি প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়জ আনন্দ দেয়। দ্বিতীয়তঃ এ সব উপভোগের জন্য মনের সক্রিয়তার প্রয়োজন হয় না। তৃতীয়তঃ, ইন্দ্রিয়-গ্রামকেও চেষ্টা করে সক্রিয় রাখতে হয় না। শিথিল নিষ্ক্রিয় ইন্দ্রিয়কেও উত্তেজিত করতে পারে ইলেকট্রিসিটির এমন ক্ষমতা আছে। প্রধান সুবিধাই এই যে মনের সক্রিয় প্রয়াস ছাড়াই ইলেকট্রিক-সংস্কৃতি উপভোগ করা যায়। পরিণাম ফলগুলোও এক দুই করে বলে দেওয়া যায়। মূল্যবোধ হ্রাস পায়, সৃজনী কল্পনা বিনষ্ট হয়, সৌন্দর্য সৃষ্টিতে মানবীয় প্রয়াসের মূল্য গৌণ হয়ে পড়ে।

সাহিত্যের উপরেও ইলেকট্রিক-সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছে। কিন্তু সে আলোচনা অন্যত্র করা ভাল।

এবার আমরা আসল আলোচনায় ফিরে আসি। আমাদের বেস্ট ব্রেনরা সাহিত্য পড়েন না, কিন্তু ইলেকট্রিক-সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন। সেইজন্যই কন্যার পিতারা যখন তাঁদের সংস্কৃতিসম্পন্ন বলে মনে করেন তখন ব্যাকরণে ভুল হয় এ কথা বলা চলে না।

বেস্ট ব্রেনরা সাহিত্য পড়েন না সাহিত্য নিকৃষ্টতর ব্রেনদের রচনা বলে। আমরা কি কল্পনা করতে পারি যে, যে ডাক্তার প্রতিটি পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছেন, এফ. আর. সি. এসের মত কঠিন পরীক্ষা এক বছরে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন, তিনি বি.এ. পরীক্ষোত্তীর্ণ বঙ্কিমের উপন্যাস পড়বেন? কিন্তু সিনেমা দেখতে যাওয়ায় কোন বাধা নেই। সেটা মনের ব্যাপার নয়, নিছক শারীরিক সুখের ব্যাপার।

তা হলে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে আমাদের বেস্ট ব্রেনরা শুধু সেই সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসেন, যে সংস্কৃতি কেবলমাত্র শারীরিক তৃপ্তিবিধানের ব্যবস্থা করে। এই ঘটনাটি থেকে এই শ্রেণীর লোকদের চরিত্রের একটা মোটামুটি পরিচয়ও আমরা পেতে পারি। তাঁরা উৎকৃষ্ট মস্তিষ্কের অধিকারী, কিন্তু জীবনে তাঁরা শুধু শারীরিক সম্ভোগই অনুসন্ধান করে বেড়ান। তাঁদের শরীর খুব পটু নয়—প্রায়ই অম্বল বা আমাশায় ভোগেন। কাজেই ইলেকট্রিক-সংস্কৃতি তাঁদের অপরিতৃপ্ত ভোগতৃষ্ণাকে খানিকটা মেটায়। শারীরিক সম্ভোগের প্রতীক হচ্ছে টাকা, কারণ টাকা দিয়ে সম্ভোগ কেনা যায়। কাজেই ভোগতৃষ্ণাকে কোনক্রমেই শারীরিক দিক দিয়ে মেটানো যাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়, তাঁরা সেই চির-অপরিতৃপ্ত কামনার দ্বারা চালিত হয়ে অর্থ—আরও অর্থের পিছনে একচক্ষু হরিণের মত ছুটে বেড়ান।

সৃজনী কল্পনা এঁদের নেই, অনুভূতিশীলতায় এঁরা শারীরবৃত্তির থেকে বেশী উর্ধ্বে উঠতে পারেন না। অথচ এঁদের মেধা আছে। মেধা আছে বলেই আসামে বাঙালী নির্যাতন হওয়ার পর কী করে একই সঙ্গে বাংলার মনস্তুষ্টি সম্পাদন করেও দিল্লিস্থ প্রভুদের বিরাগভাজন না হতে হয় তা তাঁরা জানেন। ডি-ভি-সি, দণ্ডকারণ্য, কোক-চুল্লী প্রভৃতি পরিকল্পনার ব্যর্থতার পরেও তাঁদের চাকরি যায় না বুদ্ধি আছে বলে। সাধারণ কেরানী একবারের বেশী দুবার যোগে ভুল করলে চাকরি যায়।

মানবিক বুদ্ধি, আধা-মানবিক অনুভূতি ও কল্পনা এবং পাশব ইন্দ্রিয়াসক্তি—এই তিনের সমন্বয়ে আমাদের বেস্ট ব্রেনরা তৈরি। এই বেস্ট ব্রেনরা আমাদের দেশকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। মন্ত্রীমহোদয়গণ, রাজনৈতিক নেতৃবর্গ থেকে শুরু করে গেজেটেড অফিসার পর্যন্ত এঁদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের মানসিক গঠন, তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার দরকার আছে বইকি দেশবাসীর।

আমার বিশ্বাস কোন একচোয়ারী কমিটী নিয়োগ করলে তারা সহজে আবিষ্কার করতে পারবে যে আমাদের বেস্ট ব্রেনদের মনের সামঞ্জস্যহীন বিকাশ ঘটে। তাঁদের বুদ্ধি যতটা বিকশিত হয় অনুভূতি সেই পরিমাণে অবজ্ঞাত থাকে। ফলে বুদ্ধি শুভবুদ্ধিতে পরিণত হয় না। বিভিন্ন কাজে তাঁরা যতখানি অনায়াসপটুত্ব লাভ করেন, সেই পরিমাণে তাঁদের কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটে না। ফলে গঠনমূলক বা উদ্ভাবনমূলক পরিকল্পনায় তাঁরা শক্তির পরিচয় দিতে পারেন না। তাঁরা অত্যন্ত আত্মসুখ-সর্বস্ব হয়ে পড়েন। অথচ একটু কল্পনাশক্তি থাকলে তাঁরা বুঝতে পারতেন নিজের সুখের কথা কম ভাবলে তবু বরং সুখী হওয়ার কিছু সম্ভাবনা থাকে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে আমাদের যে রিক্ততা তার কারণ সৃজনী কল্পনার অভাব। গবেষণার উদ্দেশ্য যদি হয় ডিগ্রি-লাভ, ডিগ্রিলাভের উদ্দেশ্য যদি হয় অর্থপ্রাপ্তি, তবে গবেষকের কাছে গবেষণার নিজস্ব মূল্য কিছু থাকে না। গবেষণা একটা নীরস উপদ্রব, ভবিষ্যতের সুখের আশায় কিছুদিনের জন্য তা নীরবে সহ্য করতে হয়। বাড়িয়ে বলছি না, অবিকল এই মনোভাব নিয়েই তরুণ বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে ঢোকেন।

সৃজনী কল্পনার অভাবে আমাদের দেশটা মরে যেতে বসেছে। আমাদের রাজনীতিক নেতারা যাঁর যার কেরিয়ার তৈরি করার কাজে ব্যস্ত। কেরিয়ার কেন? না, সুখ পাওয়ার জন্য। এটুকু তাঁদের কল্পনায় আসে না যে দেশকে তৈরি করতে পারলে তাতেও কিছু আনন্দ পাওয়া যায়। বিরাট বিরাট পরিকল্পনার ইঞ্জিনিয়াররা অমন বিরাট নির্মাণযজ্ঞে কোন সৃষ্টির আনন্দ অনুভব করেন না। স্বভাবতঃই তাঁরা সুযোগ পেলে আত্মস্বার্থ-চরিতার্থতার পথ খোঁজেন।

আমি এমন কথা বলছি না যে বেস্ট ব্রেনদের মধ্যে অনুভূতি ও সৃজনী কল্পনার অভাবের একমাত্র কারণ সাহিত্যপাঠে অবহেলা। কিন্তু সাহিত্যপাঠের প্রতি অবজ্ঞা যে অন্যতম কারণ এ বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। এটা স্পেশালাইজেশনের যুগ বলে বিভিন্ন ব্যক্তিরা যাঁর যাঁর বিষয়ের প্রতি মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে বাধ্য হন। এইভাবে তাঁর মনের একদেশদর্শী বিকাশ ঘটে। দেশের জনসমষ্টির সঙ্গে তিনি নিজের মনের সংযোগচেতনা হারিয়ে ফেলেন। এই মানসিক বিচ্ছিন্নতা স্বার্থপর চিন্তার উর্বর ক্ষেত্র। সেইজন্যই যাঁরা বিজ্ঞান বা ইঞ্জিনিয়ারিং বা বাণিজ্যের ছাত্র, বিশেষ করে তাঁদের কিছু সময় উচ্চাঙ্গের সাহিত্য পড়ার প্রয়োজন খুব বেশী। সাহিত্য পড়ার জন্য খুব বেশী প্রস্তুতি বা আয়াসের প্রয়োজন হয় না, কারণ সাহিত্যের কোন টেকনিক্যাল ভাষা নেই। অথচ সাহিত্যের ভিতর দিয়ে অপর মনের সঙ্গে, দেশের ও বিশ্বের মনের সঙ্গে নিজের মনের সংযোগ স্থাপিত হয়। অবশ্য শুধু সাহিত্যপাঠই যথেষ্ট নয়, জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের কিছু সম্পর্ক আছে এই বিশ্বাস নিয়ে সাহিত্যপাঠ করা উচিত।

সাহিত্য অনুভবক্ষমতাকে বাড়ায়, সৃজনী কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করে। কবিতার রূপকল্প আর বিজ্ঞান-গবেষকের হাইপথেসিস বা অনুমান একই সৃষ্টিপ্রেরণার দুই ভিন্ন প্রকাশ। খবর নিলে দেখা যায় যে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীদের মধ্যে গভীর সাহিত্যানুরাগ বিদ্যমান ছিল।

কিন্তু এসব কথা বলে লাভ কি? ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদরা থ্রি. ইয়ার ডিগ্রি কোর্সের পাঠ্যসূচি রচনা করার সময় সিদ্ধান্ত করেছেন যে বিজ্ঞানের ছাত্রদের—অর্থাৎ এ দেশের বেস্ট ব্রেনদের, সাহিত্যপাঠের কোন আবশ্যকতা নেই।

গল্প

খাঁটী

সত্যপ্রিয় ঘোষ

শ্রীঅসিতকুমার ধর মহাপুরুষ নয়। অসাধারণও নয়। এ যে অসিত সম্পর্কে অন্য লোকের মত তা নয় (বস্তুতপক্ষে ও সাধারণ কি অসাধারণ এ নিয়ে কেউই এ পর্যন্ত কিছু ভাবেই নি হয়তো), আসলে এই মত অসিতের নিজের সম্পর্কে নিজের।

এবং এই মতামত বিষয়ে অসিতেব আন্তরিকতায় সন্দেহ করলে সত্যি অন্যায় করা হবে।

নিজেকে সে নির্ভেজাল মানুষ বলেও ভাবে না। অনেক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সে নিজের মধ্যে স্তরে স্তরে জমে থাকা গলদগুলি ধুয়েমুছে সাফ করে ফেলতে পারে নি, এই আত্মগ্লানিতে সদাই সে বিষণ্ণ, বিরক্ত এবং চিন্তিত।

মনের এই বোঝা নিয়ে সে জীবনের ঘাটে ঘাটে ঘুরে বেড়ায়, যদি কোথাও একটু ভার কমে, যদি মিথ্যা আর ভেজালের বেসাতিতে ভরা এই দুনিয়ার হাটে কোথাও এতটুকু বিশুদ্ধ বাতাসের সন্ধান পাওয়া যায় এই হতাশাভরা আশায়। জ্যান্ত কোন খাঁটী মানুষের সন্ধান আজ পর্যন্ত অসিত পায় নি এই তার আক্ষেপ।

এই জন্যে জনতার চাইতে নির্জনতার মধ্যেই অসিত পালিয়ে থাকতে চায়।

এমনি করতে করতে কবে না জানি তুমি সাধু হয়ে যাবে। ঘুম থেকে উঠে দেখব তুমি নেই, পালিয়ে গেছ। তোমার বাপু খামকা এসব চিন্তায় কী দরকার।— অসিতের বউ সুনীতির খনখনে ধাতব গলায় মাঝে-মাঝে এমনি সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়।

তাতে অবশ্য অসিতের বৈরাগ্য বেড়েই যায়, নিজের স্ত্রীরই লঘুগুরু জ্ঞান নেই ভেবে কখনও বা সে খেদে তলিয়ে যায়, কখনও বা অগ্নিমূর্তি ধারণ করে।

এমনি অবস্থায় এবারকার পুজো কাটাতে সে হাজারীবাগে এসেছে। শহরে নয়—সেখানে হট্টগোল, রোড-স্টেশনে—যেখানে ডাকাত পড়লেও কেউ ডেকে জিজ্ঞেস করবার নেই। এ জায়গাটা এবার সে নির্বাচন করেছে থেকে ঘুরে গেছে শুনে সে জিজ্ঞেস করেছিল জায়গাটা কেমন, উত্তরে সে বলেছিল, জনমানবশূন্য। চতুর্দিকে তাকালে মনে হয় যেন একটা বোবা কান্না থিতিয়ে আছে। তবে জলটা ভাল। ডিসপেপসিয়ার পক্ষে ধন্বন্তরি। রাক্ষুসে খিদে হয়। ওই শুনেই অসিতের মনটা আনচান করে উঠেছে এই থিতনো বোবা কান্নার সমুদ্রে সুনীতিকে এনে ফেলতে, যদি তাতে ওর ক্রনিক বাচালতা ব্যাধির উপশম হয় এই আশায়; আর সেই ফাঁকে সে ঘটি-ঘটি জল খাবে যদি তার নিজের পেটেরও কিছু সুরাহা হয়।

উঠেছে রেলের হলিডে হোমে। অসিত রেলের চাকুরে, শেয়ালদায় অ্যাকাউন্টস্ অফিসের লোয়ার ডিভিশন কেরানী, আগে থেকেই দরখাস্ত করে হলিডে হোমে জায়গা পেয়েছে।

বাঃ, এ তো দিব্যি! কী সুন্দর বাগান, কতরকম ফুল গো! ওই, দেখ দেখ পেয়ারা! এদিকে আবার কত বাতাবি দেখ! গাছভর্তি যে গো! এত কে খাবে? দেখেশুনে বাক্যি হরে যায় যে। ও! আবার দোলনা? আমার এখুনি দুলতে ইচ্ছে করছে। চল না, আমাকে একটু দোল খাইয়ে দাও। তারপরে ঘর দেখব—সেখানে না জানি আবার কোন্ রহস্য। উঃ! আমার নাচতে ইচ্ছে করছে।

থিতনো বোবা কান্নাব সমুদ্রে পা দিতে-না দিতেই সুনীতির এই প্রতিক্রিয়া দেখে অসিত একেবারে হতভম্ব। খ্যাঁক করে সে ধমকে উঠল: ঢ—

বলতে চেয়েছিল সে ঢলানী। ঢলাঢলি করার আর সময় পেলে না। কিন্তু রাগের অগ্নিস্রোত তার বক্তব্যের বোমাটাকে হঠাৎ এমনিভাবে তার মুখের মধ্যে ফাটিয়ে দিল যে তা সুনীতিকে জখম করবার বদলে, সেই বিস্ফোরণে নিজেই সে নাকালের একশেষ হল।

সুনীতি অসিতের বিকৃত মুখের আকৃতিটাকে ভেংচে উঠে শরীর দুলিয়ে বলে উঠল, কী রোগ রে বাবা!

অমন গাছ-ঝাঁকানো পেয়ারা আতা বাতাবি আরও কত-কী, দেখে নোলা টসটস করে, তাতে কোথায় মেজাজ ঠাণ্ডা হবে, না এ দেখি উল্টোচণ্ডী! খাঁড়া উঁচিয়েই আছে।' দাঁড়াও বাবা, আমি কটা ফুল মাথায় গুঁজে নিই।

আরে আরে, ফুল ছেঁড়া নিষেধ। ওই দেখ লেখা আছে।—কিন্তু কথাটা শেষ হবার আগেই অসিতকুমার পটপট করে ছেঁড়া বড় বড় চারটে গোলাপকে সুনীতির মাথার দু পাশে ঘুঁটের মত থাবড়ানো ডবল খোঁপার দিগন্তে লটকানো দেখতে পেল।

কোথাও কেউ দেখে ফেলল কিনা এই ভয়ে অসিতের হৃৎকম্প হল। এখনও কুলির মাথা থেকে মাল নামানো হয় নি, এখনও ঘরের দখল পাওয়া যায় নি—তার আগেই এমন বেআইনী কথাবার্তা আর কাজ? স্ত্রীর হঠকারিতায় শ্রীঅসিতের মুহূর্তের জন্য বিপত্নীক হতে ইচ্ছে হল। চার নম্বর ঘর বরাদ্দ আছে কুলিকে জানানো ছিল, সে সোজা বাড়িটার পেছন দিককার বারান্দায় এসে মাল নামিয়ে দিয়ে, অসিতকে নিয়ে মালির সন্ধানে চলল।

খুঁজতে হল না। মালি গোঠুয়া এসে সবিনয়ে বলল, এদিকে আসুন বাবু।

অফিসঘরে এসে কেয়ারটেকারের কাছ থেকে অসিত সব বুঝে নিল।

হলিডে হোমের সাজসরঞ্জামের ঘটা দেখে অসিতের পেটের মধ্যে কেমন করতে লাগল। এত বাড়াবাড়ি তার হজম হয় না, কোন ব্যাপারেই না, কখনই না। ধোপদুরস্ত শয্যা-উপকরণগুলো, টকটকে দামী কম্বলগুলো না হয় সইয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু রান্নার আর ভাঁড়ার ঘরের এতরকম টুকিটাকি, এমন সব পদার্থ—যা অসিত কখনও চোখে দেখে নি, যেসবের নামও কখনও শোনে নি; স্টেনলেস স্টীলের সব বাসনপত্র—যার একখানা থালার দাম ষোল টাকা, চায়ের জন্য অত-সব অনাবশ্যক পদার্থ, লক্ষরকম ছুরি বঁটি মশলাপাতির কৌটো, তার ওপর আবার তাস, ক্যারাম, ব্যাডমিন্টনের সরঞ্জাম—এসব কী ঠাট্টা? পনেরো দিনের জন্যে নিরিবিলি হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে এসেছে সে এখানে, তা কেন তার দম বন্ধ করে দেবার এই কুপ্রচেষ্টা? এসব দেখলে সুনীতি যা শুরু করবে তারপরে তাকে আর সামলানো যাবে? পনেরোদিন-কা বাদশাকে বেগম ও বাদশাজাদা-জাদীদের নিয়ে ফের কলকাতার ছকু খানসামা লেনে ফিরে যেতে হবে না? তখন কি হবে? কে তখন সুনীতিকে সামলাবে? রেলের কর্তারা? যাঁরা বাহাদুরী করে এমনি ইন্দ্রপ্রস্থ সাজিয়েছেন রেলের তৃতীয় শ্রেণীর জীবদের জন্যে? দেখেশুনে অসিতের পিত্তি জলে যায়। ভাবল সে প্রত্যাখ্যান করবে এত সব সাজসরঞ্জাম, যার একটা হারিয়ে কি চুরি গেলে গলায় গামছা দিয়ে দাম আদায় করে নেওয়া হবে তার কাছ থেকে; আর সেইসব অবিশ্বাস্য দাম যা রেলের খাতায় লেখা আছে। কিন্তু ভাবনাই সার হল, যতক্ষণ সে 'আমার এত সব দরকার নেই' এই কথাকটি বলবার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারল তার আগেই গোঠুয়া একপ্রস্থ মাল তার ঘরে দিয়ে এসে আর এক প্রস্থ মাথায় তুলছে।

বোকার মত সে মালপত্র-তালিকার নীচে একটা সই করে দিয়ে নিজের স্ত্রীর সম্মুখীন হতে চলল।

দূর থেকেই সে সুনীতির চিৎকার শুনতে পেল: এ কলকাত্তিয়া, হামকো বালবাচ্চাকে লিয়ে দো-তিনঠো বাতাবি নেবু পাড়কে দেগা? সেই কখন খায়া হায় সব, দেখছ না ভুখ লাগ গিয়া। বেশ পাকা পাকা আর বড়া দেখকে পাড়েগা, কেমন?

অসিত ঘরে এসে দেখল সুনীতি মহাব্যস্তভাবে পেয়ারা চিবোতে চিবোতে গোঠুয়াকে দিয়ে ঘর সাজিয়ে-গুছিয়ে নিচ্ছে। চার ছেলেমেয়ের বড়টির বয়স আট আর ছোটটির আড়াই, তাদের সবকটা হাতের মুঠোয় পেয়ারা—সবাই ব্যস্ত।

সবাই খুশী, সবাই মত্ত।

হলিডে হোমের এলাহী ব্যবস্থা দেখে তার আড়াই বছরের ছেলেটা থেকে শুরু করে সাড়ে সাতাশ বছরের বউটা পর্যন্ত কেউই মুষড়ে পড়ে নি দেখে অসিতকুমার নিজে ভারি মুষড়ে পড়ল। বিলাসিতার এই ছলনার ফাঁদে এরা মুহূর্তেই ধরা দিল। এদের ভবিষ্যৎ কী—এই চিন্তায় অসিতের থুতনি ঝুলে পড়ল।

দূরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে অসিতকুমার একটি সিগারেট ধরাতে যাবে এমনি সময় সে চমকে উঠল।

কী ব্যাপার, আপনি এখানে?

কমার্শিয়াল অফিসের বড়বাবু মুচকি হাসলেন। বললেন, বোদের ইচ্ছায়। কী বেরসিক জায়গায় এসে পড়েছি, ব্বাপ, কেউ ডেকে কথা বলে না হাসে না খেলে না। তবু মন্দের ভাল বোদে একটা চেনা মুখ এনে ফেলেছে এই মরুভূমিতে। দুটো মনের কথা বলা যাবে।—

এই পর্যন্ত বলে শ্রীভবেশকিঙ্কর দাস বিশাল একটা হাই তুললেন, তুড়ি দিলেম, তারপর হাত দুটো শূন্যে ছুঁড়ে জড়তা মেরে সোডার বোতল খোলার মত শব্দ করে বললেন, বোদে হে, পাপী তরাও!

ভবেশকিঙ্করকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে অসিতের আত্মারাম মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে। বাচালতার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের আশায় অসিত সুনীতিকে এখানে এনে ফেলেছে, পনেরো দিনে যদি উপকার কিছু দেখা যায় তখন না হয় বেশীদিনের জন্যে ফের আসা যাবে। কিন্তু এ কী, এ যে আর এক বাচাল! একা রামে রক্ষে নেই লক্ষ্মণ দোসর! পুজোর এই ভিড় ঠেঙিয়ে আসার সমস্ত ধকলটাই মাঠে মারা গেল। এখন ঘরে সেঁদিয়ে থাকলে সুনীতি, বাইরে বেরুলেই ইনি— জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ!

কবে এলেন?—অসিত ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, আর কদিন আছেন?

কে জানে কদিন আছি, বোদে যে-কদিন রাখে।—ভবেশ নিস্পৃহভাবে বললেন, থাকব কি, থাকতে মোটে ইচ্ছে হয় না। পারি তো এই মুহূর্তে পালিয়ে যাই। বাজারে কিচ্ছু পাওয়া যায় না, কিছু না বলতে একেবারে কিচ্ছুই না। বাজার-বাজার বলছি বটে, আসলে বাজার বলে এখানে কোন পদার্থ ই নেই! একটা গাছের তলায় ভোর-রাত্তিরে দু-চারজন এসে বসতে না বসতেই ফুস্! মাছ যা পাওয়া যাবে সেই তখন। তার আবার দর-ফর কিছু নেই। বাঘা-বাঘা সব ডাক্তিবাবুরা ছড়ি হাতে চাকর নিয়ে সেই শেষ রাত্তির থেকে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। বড় একটা রুই কি কাতলা এল, সবাই শ্যেনপক্ষীর মত তার ওপর ছোঁ মারলেন। যাঁর চাকর সবচাইতে ষণ্ডা সে মাছটা কেড়ে নিয়ে থলিতে পুড়ে নিল আর তার বাবু দুখানা দশ টাকার নোট ছুঁড়ে দিয়ে কোমর বেঁকাতে বেঁকাতে মর্নিং ওয়াকে চললেন।

বলেন কী!—অসিত আঁতকে উঠে বলল।

আর বলছি কী!—ভবেশকিঙ্কর ভুঁড়ি চুলকোতে চুলকোতে বললেন, এখানকার এক এ. এস. এম-এর শালা অপদার্থ বেকার। সে বেটা এখানে নানান বিজনেস করে। রেলের একখানা কার্ডপাস নিয়ে রোজ দুপুরের গাড়িতে চলে যায় কলকাতায়। সেখান থেকে বিশ টাকার মাছ কিনে ফিরতি ট্রেনে চলে এসে সেই বরফ-দেওয়া পচা মাছ চার টাকা সেরে পঞ্চাশ টাকায় ঝাড়ে। এই তো বাজার! চেঞ্জাররা এক-একজন রোজ তিরিশ-চল্লিশ টাকা নিয়ে বাজারে আসে, তারা নির্বিবাদে সেই টাকা বাজারে ফেলে দিয়ে যা পায় তাই নিয়ে চলে যায়। তাদের মেয়েরা নাক সিঁটকে মন্তব্য করে, দুর! কী জঙ্গলে এনে ফেলেছে, এর চেয়ে কলকাতা অনেক ভাল। ছুটি কাটাতে যত সব ভূতের মধ্যে এনে ফেলেছে, কিচ্ছুটি পাওয়া যায় না!

ভয়ে অসিতের বুকের মধ্যে গুড়গুড়িয়ে মেঘ ডাকতে লাগল। মনের মধ্যে খাড়া বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল।

দুধ?—অসিত জানতে চাইল: পাওয়া যায় তো?

অসিতের মুখের অবস্থা দেখে বড়বাবু ঝিরঝিরিয়ে হাসলেন। বললেন গলা নামিয়ে, ভয় কী। আমি ব্যবস্থা করে দোব এখনি। ওই ওদিকটায় আছে রামসাগর তালাও, তার পাশে গোয়ালাদের বাস। আমি কয়েকজনের সঙ্গে জমিয়ে নিয়েছি। নয়তো ওরা যা পাজি, গিয়ে দুধ চাইলে আগে হিসেব চাইবে দুধখানেওলা বালবাচ্চা কঠো হ্যায়। যদি বললে বালবাচ্চা নেহি হ্যায়, আমি স্বয়ং দুধখানেওলা হ্যায় তো সোজা রাস্তা দেখিয়ে দেবে, এক পো দুধও দেবে না। এ হচ্ছে, বুঝলে, রেশনিংয়ের ইল এফেক্ট। গোয়ালা যে গোয়ালা সেও বিদ্যে শিখে নিয়েছে, তার কাছে গিয়েও হিসেব দাখিল কর তবে দুধ পাবে! আরে বাবা, বালবাচ্চা নেহি হ্যায় তো নগদ পয়সা তো হ্যায়, তুই বেটা গোয়ালা, পয়সা গুনে নিয়ে দুধ দিবি। উঁহু, ওখানে সেল্ফ-গভর্মেণ্ট!

অসিত সহসা খুশী হয়ে বলল, তা হলে তো বলতে হয় এখানকার গোয়ালারা অনেস্ট—খাঁটী। সত্যিকারের বিচারবুদ্ধি আছে।

কেন!—ভবেশ আকাশ থেকে পড়লেন।

সাপ্লায়ের চাইতে বোধ করি ডিম্যাণ্ড বেশী।—অসিত

উজ্জ্বলতর মুখে বলল, তাই ওরা দুধ যাদের জন্যে না হলেই নয় সেই দুগ্ধপোষ্য শিশুদের জন্যেই—

কচুপোড়া!—ভবেশ মুখ বিকৃত করে বললেন, এ কি বাংলাদেশ যে হা দুধ! হা দুধ! এ যে গোমাতার মুল্লুক, এখানে মানুষের চেয়ে গরুর আদর বেশী। দুধ খেতেই তো এদেশে এয়েছি বাপ। ব্যাপার তা নয়। দুধ যত চাও তত পাবে, কিন্তু গোয়াল থেকে নয়। গোয়ালে ওরা ভেজাল মেশাবে না, এই ওদের সেন্টিমেন্ট। তাই গোয়াল থেকে সব দুধ বিক্রি হয়ে গেলে চলে কী করে! এই হচ্ছে রহস্য। সেয়ানা ওরা কম? যখন এয়েছি তখন লিলু মাহাতো টাকায় দেড় সের করে দিচ্ছিল, চেঞ্জারদের সংখ্যা দু-চারজন বাড়তেই পাঁচ পো।

আপনি বুঝি এক নম্বর?—সুনীতি এসে শ্রীভবেশকিঙ্কর দাসকে জিজ্ঞেস করল।

প্রশ্নের ধরন দেখে ভবেশ ভেবাচেকা খেলেন।

তাইতে অসিত খেঁকিয়ে উঠল সুনীতিকে: এক নম্বর মানে? এক নম্বর কী? কথা বলতে শেখ নি, চুপ করে থাকতে পার না?

ওমা, কী গেরো! অন্যায়টা—

আরে না না, বুঝতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি।—ভবেশ ব্যাখ্যা করলেন: খামকা বকাঝকা কেন আবার। উনি বলতে চেয়েছেন আমি এক নম্বর ঘরের লোক।

দেখলে?—সুনীতি তখন উলটে আক্রমণ করল অসিতকে: উনি তো আর তোমার মত বোকা—

জিভ কেটে সুনীতি সামলে নিল নিজেকে।

একগাদা নিমপাতা চিবিয়ে খাওয়ার মত মুখ করে অসিত স্থানত্যাগ করল।

নতুন পরিবেশ এবং চারপাশের মানুষজন কায়দাকানুন সম্পর্কে সম্বোধিলাভ করতে অসিতের দিন তিনেক লেগে গেল। প্রতিটি মানুষ আর প্রতিটি ব্যাপারের কতটুকু খাঁটী আর কতটুকু ভেজাল তা সে মনে মনে সব আঁচ করে ফেলল। তার মনের আদালতে অনেকের বিরুদ্ধেই মামলা দায়ের হয়ে গেল। কিন্তু পাঁচ নম্বর ঘরের পরিবারটা সম্বন্ধে তার একটু ধাঁধা লেগেছে, ওদের সম্পর্কে সুনীতি রিপোর্ট দিয়েছে, লোকটা রোগা হলে হয় কি, পেটে যেন বিদ্যে আছে মনে হয়। আর বউটার রিস্টওয়াচ আছে, বাচ্চাও মোটে একটা। শাঁখা-কাঁখার ধার ধারে না, সিঁদুরও নেই-নেই ভাব, আবার ভেবেচিন্তে কথা বলে। এ নিশ্চয় চাকরি-করা-মেয়ে, তুমি দেখে নিও, সমস্ত লক্ষণ মিলে যায় একেবারে। ভালই, লোক ওরা খারাপ না, বরটা যদিও একটু কাছাখোলা। তবে ওদের ঝিটা না, খু—ব! আমার মত পাঁচ-সাতটাকে এক হাটে কিনে আর এক হাটে বেচে দিয়ে আসতে পারে।

যা মেজাজ! সুনীতি যাই বলুক, এদের সকলের সঙ্গেই অসিতের নিজেরও আলাপ হয়েছে, তার প্রাথমিক বিচারে এরা সকলেই 'নট গিল্‌টি' পেয়েছে, চূড়ান্ত রায় যদিও আরও প্রমাণসাপেক্ষে মুলতবী আছে।

ইতিমধ্যে অসিত মানবচরিত্রের আর একটি অধ্যায় অধ্যয়ন করে ফেলল—হাটবারে হাটে যাওয়া নিয়ে। প্রতি বুধবার এখানে হাট বসে এবং ওই একদিনেই গোটা সপ্তাহের জিনিস কিনে রাখা এখানকার রেওয়াজ। আগামীকাল হাট, দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর পান চিবোতে চিবোতে ভবেশকিঙ্কর এসে ডাক দিলেন, ধর, বেঁচে আছ নাকি?

কোলের মেয়েটাকে কিছুতেই ঘুম পাড়াতে না পেরে অসিতের চোখ দুটো তখন রাক্ষসের মত জ্বলছে, পারলে সুনীতিকে চিবিয়েই খেয়ে ফেলে, কারণ সুনীতি তখন হাত-পা ছড়িয়ে দশ-বাঁও ঘুমের তলায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে তার চোখের সামনেই। ভবেশকিঙ্করের ডাক শুনে অসিত মেয়েটাকে কাঁধে ফেলে বারান্দায় চলে এল।

ভবেশ বারান্দায় ওঠেন নি, বাইরে দাঁড়িয়েই বললেন, জরুরী পরামর্শ ছিল একটা, দাঁড়াও।—তারপর পাঁচ নম্বর ঘরের উদ্দেশে গলা তুলে ডাকলেন, বলি শোভনবাবু, ঘুমোলেন নাকি? ও শোভনবাবু?

শোভন দত্ত তখন আরাম-কেদারায় দু-পা ছড়িয়ে দিয়ে নন্দলাল বসুর ছবির অ্যালবামে মগ্ন। ভবেশকিঙ্করের ডাক শুনে আতঙ্কে উঠে সে স্ত্রী ইরার দিকে তাকাল। ইরা তখন ছড়া বলে বলে মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে নিজের ঘুমের ওষুধ হিসেবে স্থূলকায় একটি বাংলা উপন্যাস সবে বুকের ওপর তুলেছে। ইরা চোখ পাকিয়ে বলল, বুড়ো তো আচ্ছা লোক! যাও বাইরে যাও, ঘরের মধ্যে ডেকে আনতে হবে না। জ্বালাতন বিশেষ!

শোভন পর্দা ঠেলে বারান্দায় চলে এল।

আসুন একটা পরামর্শ করা যাক।—বলে ভবেশকিঙ্কর সতর্কভাবে চারিদিক দেখে নিলেন কেউ তাঁদের লক্ষ্য করছে কিনা। চোখ-ইশারায় শোভন আর অসিতকে আরও কাছাকাছি করে নিলেন (ঘোর ষড়যন্ত্র পাকানোর একটা থমথমে ছায়াকে ভবেশের মুখের ওপর নড়তে দেখে ওদের দুজনেরই তখন প্রাণ ধড়াস ধড়াস করছে), খুব খাটো গলায় ভবেশ থেমে থেমে বললেন, কাল তো হাট। এইবেলা একটা কিছু ঠিক করতে হয়, কী বলেন? তুমি কিছু ভেবেছ, অসিত?

এ বিষয়ে ভাববার কী আছে তা দুজনেই প্রাণপণে ভাবতে লাগল।

আলু বা তরিতরকারির দিকে ঝুঁকে দরকার নেই, কী বল? হাঙ্গামাই সার, মার্জিন বিশেষ কিছু থাকে না, এ বেটারাও তো সেয়ানা হয়ে গিয়েছে। যা দিনকাল! গত হাটের দিনে আমি ঘুরে ঘুরে সব দেখেছি তো, এক ডিম আর মুরগীতে কিছু পড়তা থাকে, আর হাতের কাছে পছন্দসই কিছু পড়ে গেল তো কিনে রাখতে পার। পোড়া দেশ, কিছুই তো পাবার জো নেই। যাই হোক, ডিমটা একটু বেশী করেই প্রকিওর করা যাবে, কী বল?

ডিম।—ক্ষোভে ফেটে পড়ল অসিত: ঘোড়ার ডিম ছাড়া এ তল্লাটে অন্য কিছুর তো সন্ধান দেখি না। একটা ডিমের জন্যে এখানকার সমস্ত দোকানদারদের শুধু পায়ে ধরতে বাকি রেখেছি। যত দাম চাও দেব, তবু দে বাবা একটা ডিম। তা সবাই কেবল মাপ চায়, বলে আগে দেখুন—যেন আমি ভিখিরি!

যা বলেছেন—শোভন সমর্থন করল: লোকে বাজার করে পয়সা দিয়ে। কিন্তু এই স্বর্গরাজ্যে দেখছি পয়সা হলেই হয় না, দাঁতও দেখাতে হয়, সব কটা দাঁত না বের করে দোকানদারের সঙ্গে কথা বলারই উপায় নেই—কি ছেলে কি মেয়ে! আগে গিয়ে বত্রিশপাটি বিকশিত করে অবান্তর কথা বলুন, তারপর চুপিচুপি ডিমের প্রসঙ্গ।

এই রসিকতায় ভবেশকিঙ্করের ভীষণ হাসি পেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উনি বড়বাবু তো, হাসলেন না। দারুণ সংযমে উদ্গত হাসিটা গিলে ফেললেন, মুখটা ক্ষণিকের জন্য বিকৃত হল। বললেন, কালকে প্রচুর ডিম আসবে হাটে। কিন্তু বসা হাট থেকে কিনে তো কিছু ফয়দা নেই, চার আনা করে জোড়া নিয়ে নেবে—সেয়ানা হয়ে গিয়েছে তো। হাটে এসে বসবার আগেই ব্যাপারীদের ধরতে হবে। চারদিকের গাঁগুলো থেকে সব আসে তো। হেঁটে আসে গোরুর গাড়ি করে, আসে দূরদূরান্তর থেকে। আমার সব জানা আছে, কোন চিন্তা নেই, আমি শর্মা এখানে তো আর নতুন নয়—এই নিয়ে চতুর্থ বার এলাম। তা শোন, তিনটে পোস্টিং করতে হবে। ধানোয়ার রোড দিয়ে মাইল তিনেক গিয়ে একটা মোড়ের মাথায় একজন দাঁড়াবে, ওখানে দাঁড়ালেই ম্যাক্সিমাম ট্যাপ করা যাবে, তার এক ফার্লং গ্যাপ দিয়ে দিয়ে আরও দুটো পোস্টিং। ধর ডিম নেবে, তো ফার্স্টম্যান বলবে: কত করে? ওরা চোদ্দ পয়সা কি চার আনা চাইবে নির্ঘাত। তাতে বলবে, দু আনা করে হয়তো দাও, যা আছে সব নিয়ে নিই। দেবে না ওরা, এগুতে থাকবে। সেকেণ্ড পোস্টও প্রথমে বলবে, দু আনা, তারপরে দশ পয়সা পর্যন্ত অফার দেবে। যদি দিয়ে দেয় তো সব কটা হাতিয়ে নিতে হবে। না দিলেও থার্ড পোস্টে গিয়ে ওরা কাত হয়ে যাবে। থার্ড পোস্টও যখন বলবে দু আনা, তখন ওদের ধাঁধা লেগে যাবে, নিজেরাই তখন দাম কমিয়ে তিন আনায় দিতে চাইবে। চাইলে আর কথা নেই, যে কটা আছে সব নিয়ে নাও। সাইকোলজিকাল এফেক্ট আর কি!

হতভম্ব অসিত আর শোভনের পলকহারা দৃষ্টির সামনে ভবেশকিঙ্কর অতঃপর এখানকার হাট এবং ব্যাপারীদের সাধারণ চরিত্র বিষয়ে আরও অনেক চাঞ্চল্যকর তত্ত্ব ও তথ্য সবিস্তারে বললেন।

শোভন বলল, এ যা ব্যাপার দেখছি, আমার দ্বারা হবে না। আমার বদলে সুরোদি যাবে, এক্সপার্ট আছে।

ভবেশ অনুমোদন করলেন। খুশী হয়েই বললেন, তা বেশ, ছাতাটা নিয়ে যায় যেন।

সুরোদি শোভনদের একাধারে ঝি, অভিভাবিকা এবং সমস্ত রকম আপদবিপদে রক্ষাকর্ত্রী। তার বয়স পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে কিন্তু তার সম্বন্ধে খ্যাতি এই যে, সে যে-কোন পুরুষের বাবা!

অসিত তখন মনে মনে বিচার করছে, সামান্য ডিম কেনা নিয়েই মানুষের জীবনে এত ভেজাল!

ভবেশ বারবার করে সাবধান করে দিলেন এই প্ল্যান হলিডে হোমের আর কেউ যেন জানতে না পারে। কারণ লোক যত বেশী হবে ভাগাভাগি হবে তত—তাতে করে তাদের ভাগে ডিম কম পড়ে যাবে।

• •

পরে অসিতের ধারণা হয়েছে, হাটে যেখানে চার আনা জোড়া ডিম বিকিয়েছে সেখানে তারা এই কায়দায় তিন আনা করে নিয়ে আসতে পারলেও সম্পূর্ণ ব্যাপারটা এমন জঘন্য এক দুঃখ-স্মৃতি হয়ে তার জীবনে থাকবে যা সে কোনদিন ভুলতে পারবে না। হাট বসবে দুপুরবেলা, কিন্তু তারা বেরিয়েছে সেই সাতসকালে। কোনরকমে এক কাপ চা গিলে ভবেশকিঙ্করের সেই অনর্গল কানের পোকাখসানো বকবক বকবক শুনতে শুনতে মাইল তিনেক ধাওয়া করে যাওয়া, একা রাস্তায় ঝাড়া তিনটি ঘণ্টা লোকঠকানো ফাঁদ পেতে দাঁড়িয়ে থাকা এবং তারপর একগাদা ডিম, মাছ, মুরগী আর এটা সেটায় দু হাত বোঝাই করে সেই তিন মাইল ঠেঙিয়ে ফিরে আসবার সময় যখন আধ মাইল রাস্তা বাকি, হঠাৎ ঝপঝপিয়ে বৃষ্টি নামল—তখন সেটাকে বিধাতার নিষ্ঠুর ঠাট্টা বলেই মনে হল অসিতের।

এই প্রসঙ্গে অসিত সুরোদিকে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়েছে—ওর সৎসাহস এবং মেজাজ দেখে। পয়লা পোস্ট হিসেবে সুরোদিকে সবচাইতে দূরে অর্থাৎ সাড়ে তিন মাইল তফাতে জনমানবশূন্য রাস্তায় এক গাছের তলায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে তারা পিছিয়ে এসেছিল। সে দাঁড়িয়েছিল তিন মাইলের মাথায় আর ভবেশকিঙ্কর স্বয়ং আরও একটু পিছিয়ে গিয়ে—অর্থাৎ কিনা সেইটেই মোক্ষম ফাঁদ। ভবেশ সুরোদির কাছ থেকে তার বেঁটে ছাতাটা চেয়েছিলেন, কারণ তাঁকে যেখানে দাঁড়াতে হবে সেখানে রোদ থেকে মাথা বাঁচানোর জন্যে গাছটাছ কিছুই নেই, কিন্তু সুরোদি দেয় নি। স্পষ্ট বলে দিয়েছিল চাঁচাছোলা মৈমনসিংহী ভঙ্গীতে, আমার মাথা নাই? রোদ্দুর আমার মাথায় লাগত না? এতে অসিত মনে মনে ভারী খুশী এবং সুরোদির এই সৎসাহসের মধ্যে নিখাদ খাঁটিত্বের সন্ধান পেয়ে উল্লসিত হয়েছে। এর ওপর আবার সুরোদিকে আধঘণ্টাটাক বাদেই যখন ফিরতে দেখা গেল একটিও ডিম সংগ্রহ না করেই আগুনচোখে আগুনমুখে আগুন গতিতে, 'কী হল?'—তার এই প্রশ্নের উত্তরে যখন সুরোদি খেঁকিয়ে উঠে 'অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি' বলে শূন্য থলি দুলিয়ে চলে গেল তখন অসিত এই মেজাজকে মনে মনে কুর্নিশ করেছে আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছে—ভগবান, আগামী জন্মে আমাকে আর কিছু না হোক, এমনি খাঁটী মেজাজ দিও। এই যে দড়িবাঁধা ছাগলের মত ভবেশকিঙ্করের টানে-টানে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আমার এমনি পাপ যেন এ জন্মেই শেষ হয়।

হলিডে হোমের নাম 'আনন্দ ভবন', কিন্তু অসিতের দিনরাতগুলো কাটতে থাকে এমনি গ্লানির মধ্যে। লাভের মধ্যে সে দেখছে শুধু তার উদরের উন্নতি, এখানকার কাকচক্ষু টলটলে মিষ্টি জল আর মাইলের পর মাইল রাস্তা তার পেটের মধ্যে যেন একটা বকাসুরের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু সুনীতির তো কিছুই হয় নি, বাচালতা কমার বদলে বরং আরও ভিরুলেণ্ট আকারে দেখা দিয়েছে। দিনরাত সে বকেই চলেছে, যাকে পাচ্ছে তার সঙ্গেই তোফা জমিয়ে ফেলেছে, পেয়ারা গাছগুলো চিবিয়ে শেষ করছে, আতাগাছে আতাগুলোকে গাছে পাকতে দিলে শেষে যদি বেহাত হয়ে যায় এই ভয়ে কাঁচাই ছিঁড়ে নিয়ে আটার ড্রামে রেখে পাকাচ্ছে। একদিন তো মাছি আর বোলতা ভনভন-করা অলস দুপুরের অবসরে গোঠুয়ার ছেলে রামখেলাওনকে চার আনা বকশিশ কবুল করে বাতাবিলেবু গাছটা থেকে ঝুড়িখানেক লেবুই পাড়িয়ে নিয়ে ঘরে লুকিয়ে ফেলল, গাছটা ফরসা হয়ে গেল!

একদিন দুপুরে তাসের আসর বসেছে। মুরগীর মাংস খেয়ে ফুর্তিতে ভুরভুর করতে করতে ভবেশকিঙ্কর এসে ডাক দিয়েছিলেন, কই গো ধর, হয়ে যাবে নাকি একহাত? বলি ও সুনীতি, করছ কী? এস দেখি, তোমাকে ব্রে বানাই। বোদে হে! সবই তোমার ইচ্ছে। ও শোভনবাবু, তাসটা নিয়ে আসুন না মশাই।

বারান্দায় সতরঞ্চি বিছিয়ে অতঃপর ব্রে-র আসর জমে গেছে পাঁচজনে—ভবেশকিঙ্কর, অসিত, সুনীতি, শোভন আর ইরা।

অসিতের মোটেই ইচ্ছে ছিল না এখন তাসে বসতে। অর্ধনিমীলিতনেত্রে সে আশ্বিনের ঝিমন্ত দুপুরের রোদে ঝিরঝিরে হাওয়ায় সজনে গাছের পাতা-ঝরার দৃশ্য দেখছিল আর আত্মচিন্তা করছিল। এমন সময় তাস!

কিন্তু ভবেশকিঙ্করের কাছে সে সর্বাবস্থায় তেলা-পোকার কাছে কাঁচপোকার মত আত্মসমর্পণ করে, না করে যেন তার উপায় নেই।

খেলা জমিয়ে রেখেছেন ভবেশকিঙ্করই। খারাপ তাস পেলেই চোখমুখ শোচনীয় করে বলে উঠছেন, বোদে, জল দে! আর তাই শুনে শোভন হাসছে খুব। ইরাও হাসছে, তবে খুব মেপে মেপে। সুনীতি এত সামান্য কারণে হাসবার পাত্রী নয়, সে আপনাতেই মশগুল, খারাপ তাস পেলেই সে ওরে ব্বাস বলে হেঁচকি তোলার মত শব্দ করছে, আর সঙ্গে সঙ্গে অসিত কটমটিয়ে তাকাচ্ছে তার দিকে, কিন্তু সুনীতির ভ্রূক্ষেপ নেই।

সৌজন্যের খাতিরে (হয়তো ইরা আছে বলেই) ভবেশ একসময় স্বগতোক্তি করেছেন, বোদে খারাপ শব্দ নয়। আমি ভগবানের নিকনেম দিয়েছি 'বোদে'। বোদে বলে ডাকলে বেশ সাড়া পাওয়া যায়।

বোদেকে ডেকে ডেকে আপনি বেশ ভাল তাসগুলো হাতিয়ে নিচ্ছেন।—সুনীতি বলল।

বলতেই আর যাবে কোথায়, অসিত দাঁত খিঁচিয়ে উঠল: বড় যে ফটফট করছ, তুমি ওঁর চেয়ে ভাল খেলা জান বলতে চাও?

ও মা, তা আবার কখন বললাম!

তবে চুপ করে থাক।—অসিত আদেশ দিল, খেলতে বসেছ খেলবে, বাজে বকবে না।

একটু পরেই সুনীতি 'মাইনাস' করতে পেরেই আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠেছে। তাইতে অসিত আবার রেগে উঠল। কিন্তু এবার সুনীতিও ছেড়ে কথা কইল না, সেও উলটে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল: কেন তুমি আমাকে বারবার অপমান করছ বল তো। নিজে খেলতে পার না ভাল, কেবল পয়েণ্ট খাচ্ছ, আমি তো খাচ্ছি না তাই হিংসে। হিংসের বিষে কেবল জলেপুড়ে মরছ।

অসিত তাস ফেলে দিয়ে উঠে পড়বার উপক্রম করল। ভবেশ ওর হাত ধরে অনেক কষ্টে ওকে সামলালেন।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার দুজনের ঝগড়া বেধে গেল—চুরি করে অন্যের হাতের তাস দেখা নিয়ে। সুনীতির এই বদ অভ্যাস আছে, কিন্তু এটা সে করে নিজেরও অজানতে। কিন্তু অসিতের তা জানা আছে। তাই সুনীতি ইরার তাস দেখবার চেষ্টা করতেই অসিত ডাক দিয়ে উঠেছে, কিন্তু সুনীতি তা মানবে কেন। ক্রমে এই নিয়ে একসময় ভীষণ ঝগড়া বেধে যাবার উপক্রম হল। কিন্তু এই পরিস্থিতিটাও ভবেশকিঙ্কর অনেক কষ্টে সামলালেন এবং ইরা সরে বসে সতর্কতা অবলম্বন করল।

ভবেশের ব্রে হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিল। তাঁর তখন বিরাশি, তার পরেই অসিতের সত্তর, ইরার পঞ্চাশ, শোভনের চোদ্দ এবং সুনীতির মাত্র পাঁচ। এই অবস্থাতে হঠাৎ আবার দাঙ্গা লেগে গেল। কারণ সেই দানের শেষাশেষি ইরা সহসা প্রতিবাদ জানাল সুনীতিকে, ও মা সে কী, আপনার হাতে চিড়িতন আছে? তা হলে যে আগে পাস দিলেন? কী একটা যেন পাসালেন?

না না, হতেই পারে না।—সুনীতি জোর গলায় প্রতিবাদ করল।

কিন্তু প্রতিবাদে ফল হল না। ইরা তার নিজের পাওয়া পিটগুলোর থেকে খুঁজে বের করে সুনীতির ভুলটা হাতেনাতে প্রমাণ করে দিল।

সুনীতি লজ্জা পেল ভীষণ। আরক্ত মুখে বলল, ঠিক আছে, আমার শাস্তি হোক, আমার নামে পঁচিশ লিখে দিন।

লিখছিল শোভন। সে হেসে বলল, না না, ভুল মানুষ মাত্রেরই হয়। এ দানটা বাতিল। নিন ভবেশবাবু, তাস দিন।

অসিত উঠে গেল বিনা বাক্যব্যয়ে। কোথায় গেল ভেবে সবাই ধাঁধায় পড়ে গেল।

তাস দেওয়া হয়ে গেছে। সবাই অপেক্ষায় আছে অসিতের জন্য। কিন্তু অসিত আর আসে না।

সুনীতি বলল, ও আর আসবে না। ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছে বোধ হয়।

ভবেশ চিৎকার করে কয়েকবার ডাকলেন। কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

হঠাৎ জ্বরে-পড়ে-যাওয়া বড় ছেলে পুণ্যের শিয়রে পাখা হাতে প্রায় সারাটা রাতই বিনিদ্র কাটিয়ে দিয়ে শেষ রাতের দিকে অসিত তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়েছিল। ভোরের প্রথম মোরগের ডাকেই তার সেই তন্দ্রা ছুটে গেল। ছেলের কপালে হাত দিয়ে দেখল জ্বর কমে গেছে, উত্তাপ স্বাভাবিক। দারুণ উৎকণ্ঠা তার বুক থেকে নেমে গেল।

সুনীতির দিকে তাকিয়ে দেখল সে তখনও বেহুঁশের মত ঘুমোচ্ছে, সারারাতে একবারও তার ঘুম ভাঙে নি।

না ভাঙুক, ছেলের জ্বর নেমে তো গেছে, সেই ঢের। নিঃশব্দে অসিত উঠল। জামাটা গায়ে দিল। শীত-শীত লাগছে। জাম্পারটা খুঁজে গায়ে চড়াল। আলোয়ানটাও টেনে নিল। তারপর অ্যালুমিনিয়মের দুধের পাত্রটা।

মনে পড়ল এখানকার পাট আজকেই শেষ।

পা টিপে টিপে কারও ঘুম না ভাঙিয়ে চুপিসাড়ে সে বেরিয়ে পড়ল।

শিশিরে ভেজা লাল কাঁকরে ছাওয়া পথ হলিডে হোমের ফটক পর্যন্ত। শিউলির গন্ধমাখা শরতের হাওয়া তার শরীরের গ্লানি অনেকখানি টেনে নিল।

আশ্রম রোড বরাবর সে চলল, লিলু মাহাতোর গোয়ালে দুধ আনতে।

পেছন থেকে ডাকল শোভন, অসিতবাবু নাকি?

অসিতের বিরক্তি লাগল। এই সময়ে তার কথা বলতে ভাল লাগে না, কারও সঙ্গেই না। অসিত থমকে দাঁড়াল। ভাবল, তবু রক্ষে এই যে ভবেশকিঙ্কর নয়, শোভন দত্ত।

আপনার তো অদ্যই শেষ রজনী?—শোভন জিজ্ঞেস করল।

হুঁ। কাল সকালের গাড়িতে যাব।

পুণ্যর জ্বর কেমন?

কমের দিকে। রেমিশন হয়েছে।

তারপর চুপচাপ। রাস্তার দু পাশে সারিবদ্ধ সব বাগানবাড়ি ফুলের সমারোহে উদ্ভিন্ন। সেখানে দু-একজন করে বৃদ্ধ ছাড়া আর কারও ঘুম ভাঙে নি এখনও। কুয়াশা পড়েছে ঘন হয়ে। পূর্ব দিগন্তে পরেশনাথ পাহাড় এখন লুপ্ত।

আজ আপনার ওয়াইফ এলেন না যে?—অবশেষে অসিতই নীরবতার ধ্যান ভেঙে দিয়ে বলল।

এমনই।

আপনার ওয়াইফকে আমি যতটা স্টাডি করেছি—অসিত একটু গুম হয়ে থেকে ফের বলল, তাতে আপনাকে সুখী মানুষ বলে মনে হয়।

শোভন হাসি চেপে বলল, কি রকম?

ভবেশবাবুর কাছে শুনেছি উনি বি. এ. বি. টি.। তাই তো?

তা ঠিক।

অথচ দেখুন কী সংযম। একটি বাড়তি কথা কখনও শুনলাম না। আমি অনেক গ্রাজুয়েট দেখেছি যাদের বিদ্যের সঙ্গে বুদ্ধি প্লে করে না। খাঁটী শিক্ষা না হবার ফলে যত বাজে চেঁচামেচি, মিথ্যে কথা আর অসংযমে এদের চরিত্র এমন যে, অশিক্ষিতদের সঙ্গে এদের ডিফারেনশিয়েট করা যায় না।

একটু দম নিয়ে অসিত আবার শুরু করল, আপনাকে প্রথম দর্শনেই আমার ভাল লেগেছিল। তারপর আপনার ওয়াইফকে যখন দেখলাম, বুঝলাম আপনি প্রকৃত সুখী লোক। প্রকৃত ভাগ্যবান। আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করি, বাইরে আপনার ওয়াইফকে তো বেশ ভালই মনে হয়, ভেতরেও তিনি তাই তো—মানে সাংসারিক খুঁটিনাটি ব্যাপারে বিদ্যের সঙ্গে ওঁর বুদ্ধি খেলে তো?

শোভনের হাসি পেল, কিন্তু অসিতের গুরুগম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে সে হাসতে সাহস করল না, শুকনো মুখেই জবাব দিল, তা খেলে।

অসিত আরও জানতে চাইল, আপনার মেয়ের অসুখবিসুখ হলে রাত জাগে কে? আপনি একা, না উনিও জাগেন?

শোভন হাসি চাপতে গিয়ে হেঁচে ফেলল। তারপর জবাব দিল, উনিও জাগেন।

অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে অসিত এবার চূড়ান্ত রায় দিয়ে দিল, খাঁটী শিক্ষার ফল। আপনি প্রকৃতই সুখী লোক। দেখেও আনন্দ হয়। আমার হাজারিবাগ আসা সার্থক।

শোভন অবাক হয়ে অসিতের মুখের দিকে তাকাল।

ওয়াইফ যদি খাঁটী হয়—অসিত একটি সিগারেট ধরিয়ে বলল, তা হলে কত শান্তি। আমারটি ভেজাল!

বিশ্বসাহিত্যের সূচীপত্রে

শ্রীদীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল

ওল্ড্ গোরিও [৩]

"I am hungry, Laure, will ever my two immense desires be satisfied—to be famous and to be loved ?" [বোনকে লেখা বালজাকের চিঠি]

এই চিঠিতে বালজাকের দুটি দুরন্ত জীবনতৃষ্ণার নাম উচ্চারিত। অনুচ্চারিত তৃতীয়টির নেশা ছিল কিন্তু আরও তীব্র, আরও মধুর। দুটি নয়—তিনটি তারা জলজল করেছে জীবনভোর বালজাকের ভাগ্যাকাশে। সেই তিনটি তারার নাম: খ্যাতি, প্রেম আর ঐশ্বর্য। দুর্যোগের ঘনঘটা ব্যর্থতার অন্ধকার মেঘ বিরহের অশ্রুজল বারংবার ঢেকে দিতে চেয়েছে তাদের, কিন্তু মুছে দিতে পারে নি কোনওদিন। দুর্বার বেগে অগ্রসর, বাধার সম্মুখে দুর্নিবার দুরাশার তুরঙ্গে সওয়ার, ব্যর্থতায় বিক্ষুব্ধ, প্রতিজ্ঞায় অবিচল, দীর্ঘপথের বন্ধুর দূরত্ব অতিক্রমের অপেক্ষায় অস্থির, রাত্রির তিমির-অন্তে সুনিশ্চিত সুপ্রভাতের প্রতীক্ষায় স্থিরচিত্ত বালজাকের হাসিকান্নার হীরাপান্নায় গাঁথা 'দি কমেডি হিউমেন'-এর পৌষফাগুনের আকাশেও দপদপ করে জলছে যে তিনটি তারা—তারা ওই খ্যাতি, প্রেম আর ঐশ্বর্য।

কেবল বালজাক নয়, সভ্যতার প্রত্যুষ থেকে সকল কালের সমস্ত মানুষের উর্ধ্বশ্বাস যাত্রার উদ্যম যাকে ছুঁতে না পেরে হার মানে নি, ছুঁতে পেরে মনে করেছে তাদের হার—সে ওই অবধারিত নক্ষত্রত্রয়—খ্যাতি, প্রেম আর ঐশ্বর্য। মানবজীবনের মহাভারত একই সঙ্গে এই না পেয়ে হার-না-মানার এবং পেয়ে হার-মানার মহৎ নাটক। বালজাকের নিজের জীবন-নাট্য যেমন এর ব্যতিক্রম নয়, তাঁর নাট্যজীবনও তেমনই ওই তিনটি তারার আলোয় আলোকিত।

খ্যাতি প্রেম আর ঐশ্বর্যের সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত এই মানুষই অশ্রুসিক্ত 'দি কমেডি হিউমেন'-এর রক্তাক্ত মডেল।

কাদার তাল থেকে যে তৈরি করে পুতুল সে কুমোর; সেই পুতুল যার অদৃশ্য হাতের ছোঁয়ায় মুহূর্তে হয়ে ওঠে প্রতিমা—সেই-ই শিল্পী। পাথর কেটে যে বানায় পথ সে মজুর; সেই পাথরে যে ফুল ফোটায়, সেই-ই শিল্পী। যার ছবিতে মানুষের মুখ অবিকল ধরা দেয় সে আলোকচিত্রী; যার তুলিতে মানুষের মনের বিকলতাও ফুটে ওঠে—সেই-ই শিল্পী। মানুষের মুখের হাসি যার রচনায় শুধু হাসিই হয়ে থাকে, তার বেশি কিছু হয় না; মানুষের চোখের জল যার সৃষ্টিতে কেবল কাঁদায়, ভাসায় না—সে artisan; হাসির চোখে জল যে দেখতে পেয়েছে, অশ্রুর মুকুরে যার প্রতিবিম্বিত অনুরাগের সূর্য-তারা—কেবল সেই-ই artist। মানবজীবনের মহত্তম ট্রাজেডির নাম তাই শুধু বালজাকের লেখনীতেই হতে পেরেছে, 'দি কমেডি হিউমেন'। মানুষের ট্রাজেডি এই নাট্যোপন্যাসে কমেডি; তার কমেডি এখানে ট্রাজেডি। খ্যাতি প্রেম আর ঐশ্বর্যের সংগ্রামে মানুষের পরাজয় এখানে জয়; আর তার জয় হয়েছে তার চরম পরাজয়। সাফল্য ও ঈর্ষার রৌদ্র-মেঘে, হাসিকান্নার রাগে-অনুরাগে, অভাব ও ঐশ্বর্যের আলো-ছায়ায়, বিশ্বাস এবং বিশ্বাসঘাতকতার সাদা-কালোয়

চার মানা এবং হার-না-মানার বিরামবিহীন অন্তর্দ্বন্দ্বে আলোড়িত মানবজীবনের মহাভারত 'দি কমেডি হিউমেন'—জীবনের কুরুক্ষেত্রে জয় এবং পরাজয় যেখানে কালের কষ্টিপাথরে তুল্যমূল্য।

এবং 'ওল্ড্ গোরিও' সেই সমগ্র মানবজীবনকাব্যের অবশ্যম্ভাবী ভূমিকা; বালজাকের মানবচরিত্রের স্মরণীয় মানচিত্র 'দি কমেডি হিউমেন'-এর অবিস্মরণীয় পটভূমিকা।

'ওল্ড্ গোরিও'র এবং তার সঙ্গে আরও দু-হাজারের বেশী চরিত্রের সমাবেশে বিশালকায় 'দি কমেডি হিউমেন'-এ হাত দিতে বালজাকের জীবনের মধ্যাহ্ন কখন অপরাহ্নে এবং অপরাহ্নও কখন অকাল-সায়াহ্নে গড়িয়ে গেছে বালজাক নিজেও তা জানতে পারেন নি। তাঁর জীবন এবং সাহিত্য-যাত্রার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়; বরং তা দুর্গম এবং বন্ধুর। উপরে উদ্ধৃত পত্র রচনার সময়ে তিনি গ্রাসাচ্ছাদনের কারণেই কেবল:

"He worked at a white fever, turning out stories after a set formula. He wrote sixty pages a day. In three years, under various pseudonyms, he completed thirty-one volumes of adventure—and still he was neither loved, nor famous."

সাহিত্যের সেই সব সবজান্তা ভবিষ্যদ্বক্তা, যাঁরা সব দেশে-কালে নিঃসঙ্কোচে রায় দেন, দ্বিধা করেন না এতটুকু বলতে যে—বেশী লিখলেই বাজে লিখতে হয় এবং বেশীদিন বাজে লিখলে তাকে আর লিখতেই হয় না বেশীদিন—পৃথিবীর অনেক সাহিত্যরথীরই রচনার ভয়াবহ সংখ্যা হয়তো তার বিপক্ষে রায় দেয় কিন্তু বালজাকের মত এই উক্তির এমন জীবন্ত প্রতিবাদ সম্ভবতঃ সাহিত্যের ইতিহাসে আর দ্বিতীয় নেই। গুণের এবং সংখ্যার ওজনে অদ্বিতীয় 'দি হিউম্যান কমেডি'-কারের আবির্ভাবই যেন সাহিত্যের বিশ্বনাথদের পদে পদে অপদস্থ করতে।

মহৎ লেখার জন্ম দিতে যে-সব অস্ত্রে শান দিতে বলে গেছেন সব যুগের সাহিত্যশাস্ত্রকারেরা এবং উচ্চারণ করে গেছেন নিষেধের বাণী যেসব ক্ষেত্রে, বালজাক তার প্রত্যেকটি 'হ্যাঁ'-কে 'না' এবং 'না'-কে 'হ্যাঁ' করবার জন্যেই যেন কলম হাতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন বিশ্বসাহিত্যের কুরুক্ষেত্রে।

সাহিত্যের শাস্ত্রকারেরা যখন বলেছেন মহৎ রচনা মহত্তর সাধনা, ধৈর্য এবং সংযমের পরাকাষ্ঠা ছাড়া অসম্ভব, তখন বালজাক সম্পর্কে তাঁর সমালোচক বলছেন: "There was no literary crime that he did not commit at that time, his pen was at the service of anyone who cared to pay for it,..." বৈয়াকরণরা সাহিত্যের পান থেকে ব্যাকরণের চুন খসলে যখন খড়্গহস্ত, বালজাকের ব্যাখ্যাকার কিন্তু তখনও না বলে পারেন না যে: "It is generally agreed that Balzac wrote badly. He was a vulgar man (but was not his vulgarity an integral part of his genius?) and his prose was vulgar. It was prolix, pretentious and too often incorrect. Emile Faguet, a very distinguished critic, in his book on Balzac has given a whole chapter to the faults of taste, style, syntax and language of which the author was guilty....Now it is admitted that Charles Dickens wrote English none too well, and I have been told by cultivated Russians that Tolstoy and Dostoevsky wrote Russian very indifferently. It is odd that the four greatest novelists the world has known should have written their respective languages so ill. It looks as though to write well were not an essential part of the novelist's equipment; but that vigour and vitality, imagination, creative force, observetion, knowledge of human nature, with an

interest in it, and sympathy with it, fertility and intelligence are more important." [Great Novelists and their Novels]

টাকার জন্যে লিখতে নিষেধ করেছেন সাহিত্যের মহাজনেরা। কিন্তু বালজাকের বেলায় দেখি: "One hundred and seventy thousand francs in debt by the time he is forty. Rapid figuring. The interest alone on that amount would come to six thousand francs a year.…He writes a novel in three days, completes another in six weeks with only eighty hours of sleep—an average of two hours a day——…"

সাহিত্যজীবনের শুরুতে শুনেছিলেন বালজাক: "In the future do anything but write"; হাস্যমুখে কেবল অদৃষ্টকে নয়, সাহিত্যের পরীক্ষিত সমস্ত রীতিনীতি মিথ্যে প্রমাণ করতে পেরেছিলেন বালজাক। করতে পেরেছিলেন তার কারণ জীবনে এবং সাহিত্যজীবনে স্বাস্থ্যরক্ষার ধার ধারেন নি তিনি কোনওদিন। স্বাস্থ্যই তাঁকে রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে আজীবন। করতে পেরেছিলেন তার কারণ, প্রাণোজ্জ্বল বীর্যোচ্ছল বালজাকের কপালে যে নিজের হাতে পরিয়ে দিয়েছিল জীবনের জয়টিকা, তার নাম—প্রতিভা।

সমস্ত প্রচলিত রীতিনীতিকে যে শিকার করে এবং সমস্ত যুগের বিশ্বনাথদের করে অস্বীকার 'দি হিউমেন কমেডি'র জন্ম দিয়েছে সেই-ই—কোনও দেশে কোনও কালে নিরূপিত হয় নি যার সংজ্ঞা, সেই বিশ্লেষণের অনায়ত্ত, ব্যাখ্যার অতীত, সমস্ত সৃষ্টির উৎস, প্রতিভা যার নাম মাত্র, কিন্তু সম্পূর্ণ পরিচয় নয় কিছুতেই।

'দি হিউমেন কমেডি' বিশ্বসাহিত্যের বিস্ময়; কিন্তু 'ওল্ড্ গোরিও' বিস্ময়ের অতীত বস্তু—বালজাকের প্রতিভার পদ্মরাগমণি।

'ওল্ড্ গোরিও'কে বালজাকের বিপুল রচনার অরণ্যে বনস্পতির সম্মান দেবার কারণ প্রদর্শন করতে ব্যস্ত সমারসেট মম বলছেন: "It is not easy out of Balzac's immense production to choose the novel that best represents him.…I have chosen Old Man Goriot for several reasons. The story it tells is continuously interesting. In some of his novels Balzac interrupts his narrative to discourse upon all kinds of irrelevant matters, but from this defect Old Man Goriot is on the whole free. He lets his characters explain themselves by their words and actions as objectively as it was in his nature to do. Old Man Goriot is well-constructed,…."

মম যে 'continuosly interesting'-এর কথা বলেছেন তা সম্পূর্ণ সঙ্গত। যে 'objectively'-লেখার প্রশংসা করেছেন তাও সত্য। কিন্তু কেবল মাত্র এই কারণে 'ওল্ড গোরিও' বিশ্বের দশটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের একটি—এর চেয়ে অসঙ্গত উক্তি আর কিছু হতে পারে না। Continuously interesting বলে কোনও বই বেস্ট সেলার হতে পারে; সেই সঙ্গে অবজেকটিভ রাইটিংয়ের কল্যাণে আকর্ষণ করতে পারে বিদগ্ধজনের দৃষ্টি। কিন্তু বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রচনার অন্যতম পরিগণিত হতে কেবল ওই দুই গুণ নয় পর্যাপ্ত।

'ওল্ড্ গোরিও'র অনুবাদক এম্. এ. ক্রফোর্ড 'ইনট্রোডাকশানে' লিখছেন: "I can only say to the reader, 'Here's richness!' and leave him to explore it, assuring him, if he has not yet read any novels of the Comedie humaine, that Old Gorio is one of the most delightful to begin with."

'Delightful to begin with' বললে বিশেষ করে এই বইটি অনুবাদের কারণই কেবল অনুধাবনযোগ্য হয়; হতে পারে। কিন্তু delightful বলে কোনও রচনা 'দি

কমেডি হিউমেন'-এর ফসলশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হতে পারে কি ?

মম অবশ্যই 'continiously interesting'-ই যে বালজাকের 'ওল্ড্ গোরিও'র একমাত্র ভূষণ তা বলতে চান নি। চরিত্রের মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্র জানতেন বালজাক। মমের আলোচনায় বালজাকের সৃষ্টিক্ষমতার এই দিকটা আলোকিত হয়ে আছে : "...they live and breathe ; and you believe in them, I think, because Balzac so intensely believed in them himself." প্রমাণ হিসেবে তিনি তুলে ধরেছেন ডক্টর Bianchon-এর চরিত্র। এই সৎ এবং বুদ্ধিমান [মমের চোখে] চরিত্রটি বালজাকের একাধিক উপন্যাসে দেখা দিয়েছে। অক্ষরের অস্থিমজ্জায় গঠিত ডক্টর Bianchon কিন্তু বালজাকের চোখে রক্তমাংসে সজীব হয়ে ওঠে এতদূর যে মম্ লিখেছেন : "...when Balzac was dying he said : 'Send for Bianchon. Bianchon will save me'."

এবং পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের একটি—এই তকমা 'ওলড্ গোরিও'কে দিতে গিয়ে 'Of Human Bondage'—বিংশ শতাব্দীর শেষ সৃষ্টিধর্মী মহৎ উপন্যাসের স্রষ্টা বলতে বিস্মৃত হন নি যে :

"Old Man Goriot is noteworthy also because in it we meet for the first time one of the most thrilling characters Balzac ever created. Vautrin. The type has been reproduced a thousand times, but never with such striking and picturesque force, nor with such convincing realism. Vautrin has a good brain, willpower and immense vitality. It is worth the reader's while to notice how skillfully Balzac, without giving away a secret he wanted to keep till the end of the book, has managed to suggest that there is someting sinister in the man. He is jovial, generous and good-natured ; he is strong, un-commonly clever, self-possessed ; you not only admire him, you sympathise with him, and yet he is strangely frightening. You are fascinated by him, as was Rastignac, the ambitious, well born young man who comes to Paris to make his way in the world ; but you feel in the fellow's company the same instinctive uneasiness as Rastignac felt. Vautrin may be a figure of melodrama, but he is a great creation."

স্পষ্টতঃই বোঝা যায়, মম্ বালজাকের 'ওল্ড্ গোরিও'কে বুঝতে পারেন নি। কেন বুঝতে পারেন নি সে কথা আগে বলেছি ; মহত্তম রচনা বোঝবার নয়, বাজবার। ওস্তাদ যখন ভৈরবী আলাপ করে তখন তা শুনতে শুনতেই যার মনের আকাশ না ভরে যায় ভোরের আলোয়, সে শ্রোতা মাত্র—ভোক্তা নয়। কেবল কানকে যা তৃপ্ত করে তা বাদ্যযন্ত্র মাত্র। ইন্দ্রিয় পার হয় মর্মে গিয়ে বাজে যা, এই ধূলিধূসর মর্ত্যলোক থেকে যা তুলে নিয়ে যায় একটু ঊর্ধ্বে, অমর্ত্যলোকের যা অবারিত করে দ্বার তা কিন্তু বাদ্যযন্ত্র নয় ; তা গুণীর হাতে মুহূর্তে রূপান্তরিত হয়েছে বাদ্যযন্ত্র থেকে বীণায়—সরস্বতীর হাতেই যার কেবল শাশ্বত অবস্থান। রচনার ক্ষেত্রেও যে লেখা কেবল বুদ্ধিকে স্পর্শ করে তা চিন্তাকর্ষক, কিন্তু তা চিরকালের ধন নয়। যে বিস্ময়কর রচনায় নতুন আর এক বিশ্বরচনা সম্ভব না হয়, যে রচনা পড়তে পড়তেই পাঠক না বিস্মৃত হয় পারিপার্শ্বিক, তার মনের আকাশে যা না ধরায় আর একটু রঙ, সেও লেখা ; কিন্তু সে লেখা নয় কিছুতেই—যা ধরণীর তলে, গগনের গায়, সাগরের জলে, অরণ্যছায় আর একটুখানি নবীন আভায় রঙীন করে দিয়ে যায় সংসার-মাঝে দু-একটি সুর, করে দিয়ে যায় আরও মধুর ; দু-একটি কাঁটা দূর করে দিয়ে যে ছুটি নেয় তবেই।

আর সে লেখা কেবল তারই জন্যে লেখা যার শুধু

মাথা নেই—হৃদয়ও আছে। যে কেবল বুদ্ধিমান নয়—হৃদয়বানও বটে। যে শুধু বিদগ্ধ পাঠক নয়—সহৃদয়হৃদয়ও বটে।

মমের মত 'ওল্ড্ গোরিও'র অনুবাদকও বালজাকের শ্রেষ্ঠ রচনার অন্তরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে পারেন নি। 'ওল্ড্ গোরিও' সম্পর্কে ক্রফোর্ডের বক্তব্য হচ্ছে এই মাত্র :

"The work is quite complete in itself, and requires for its enjoyment no knowledge of any other volume of the Comedie humaine, the great series to which it belongs. At the same time, the immense fertility of the author's mind, the breadth of his sympathies, and the range and multiplicity of his interests that sought an outlet in the whole vast undertaking are reflected in this small part of it ; so that it gains by being part of a major plan."

'ওল্ড্ গোরিও' বিশ্বসাহিত্যের বিস্ময় 'দি কমেডি হিউমেন'-নিরপেক্ষ সুখপাঠ্য সৃষ্টি বলে নয়। বস্তুতঃ কোনও সাহিত্যসৃষ্টিই সে কারণে মহৎপদবাচ্য হয় নি কোনওদিন; হবেও না কোনও কালে। মহত্ত্বের যে একমাত্র মাপকাঠি বিশ্বসাহিত্যের বিচারশালায় চিরগ্রাহ্য তা হচ্ছে—বৃহৎ বক্তব্য। হয় কোনও একজনের, নয় অনেকজনের অর্থাৎ গোটা একটা যুগের প্রতিনিধি নয় যে উপন্যাস তা স্মরণীয় হতে পারে নানা কারণে, কিন্তু কোন যুক্তিতেই তা অবিস্মরণীয় সৃষ্টি নয়।

চিরকালের বীণায় সত্য শুভ ও সুন্দরের বাণী যখনই বেজেছে তখনই কেবল সে লাভ করেছে বীণাপাণির বরমাল্য।

বালজাকের 'ওল্ড্ গোরিও' একটা যুগের পূর্ণ চিত্র; তার সম্পূর্ণ ইতিহাস। সেই যুগের—যে যুগ প্রথম পৃথিবীটা কার—এই নিরুত্তর জিজ্ঞাসার উদ্ধত উত্তরে উদ্দীপিত হয়েছিল এই বলে যে পৃথিবী টাকার! বালজাকের আগে কোনও রচনায় অনুপস্থিত এই যুগের রক্তাক্ত মর্মমূল যে উপন্যাসে প্রথম উদ্‌ঘাটিত এবং সেই কারণে সাহিত্যের অবিস্মরণীয় কীর্তি—তারই স্মরণীয় নাম : 'ওল্ড্ গোরিও'। আমরা অতঃপর তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হব জানবার জন্যে কেন 'ওল্ড্ গোরিও' বিশেষ এক যুগের কথা হয়েও চিরযুগের কাহিনী।

[ক্রমশঃ]

আদিম

সন্তোষকুমার অধিকারী

পেরোলাম অনেক স্বপ্নের পথ কল্পনা-বিলাসে।
এবার বিবিক্ত মন চেতনার সুতীক্ষ্ণ আলোকে
রিক্ততায় অবহিত। পুঞ্জীভূত ম্লান অবিশ্বাসে—
দেখেছি জীবন ছিন্ন অনির্বাণ যন্ত্রণার চোখে।
জেনেছি প্রলাপমাত্র, এ পৃথিবী মানুষের নয়।
সদিচ্ছা করুণা, মৈত্রী বাক্য শুধু—প্রয়োগে শাণিত।
অলীক অর্থের ফেরে সৃষ্টি করি বিচিত্র জগৎ,
অথচ জান্তব লোভে এ হৃদয় হয়েছে চিহ্নিত।

দেখেছি বিদ্যুদ্দীপ্তি, অন্ধকারে বিচ্ছুরিত মন।
দুরন্ত হিংসায় তবু শকুনি-ইচ্ছার সঞ্চরণ।
বর্বর নিষ্ঠুর লোভে যেন সেই আরণ্য আঁধার,
সভ্যতার পলিমাটি পলকে হারায় দুনিবার
জলস্রোতে। জ্বেলে যাই করুণার সুতীব্র 'নিওন'
অথচ হৃদয়ে এক আদিম বন্যতা সুগোপন॥

যদি সে আবার ডাকে

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

যদি সে আবার ডাকে সাড়া দেব, যাব তার সাথে
যেখানে অরণ্যপথ কিংবা মৌনপর্বত শিখর ;
সন্দিগ্ধ হব না আর, ক্লান্ত হাত রেখে তার হাতে
শুনব নির্জন পথে বালুতটে সমুদ্রের স্বর।
বন্ধ্য কামনারা যত ছত্রভঙ্গ প্রতীক্ষার বাণে,
আকাঙ্ক্ষার মরালীকে ছিন্ন করে সময়-শিকারী ;
মাঘের স্তম্ভিত শীত ফাল্গুনের বনে হিম আনে,
অতৃপ্ত উদ্যোগ আজও যেন কোনও খর তরবারি।

তথাপি দুর্মর আশা, সচকিত হব তার ডাকে,
হাড়ের পাহাড়ে ফের সবুজের স্নিগ্ধ সঞ্চরণ ;
যেখানে হীরকদ্যুতি অন্ধকারে বিচ্ছুরিত থাকে—
সে স্নিগ্ধ হৃদয়মনে সমন্বিত হবে এই মন।

গভীর আশায় আমি বারবার বাহুর বিস্তারে
সঞ্চারিত হতে চাই, শুষ্ক ক্ষেতে চাই জলধারা ;
হৃদয়ে আহত পাখি জটায়ুর মত পাখা নাড়ে,
সভ্যতার জ্বালামুখে প্রস্ফুরিত ত্রাসের ইশারা।

সর্বদা প্রস্তুত তবু সে কেবলি মায়াবী প্রচ্ছদে
বাড়ায় বিচিত্র তৃষা ধাবমান আহত জগতে॥

●

বর্ষাশেষে

আর্যপুত্র সুপ্রিয়

এবারের বর্ষাশেষে কিছু তো খবর পাওয়া গেছে।
আবিল বানের জল অলক্ষিতে পদ্মপত্রে এসে
থমকিয়ে টলমল করেছিল দুই-একবার—
এক ফোঁটা যার,
চমকিয়ে দেখি আজ,
হয়ে গেছে সুকঠিন শিশিরের মত।
দৃষ্টির সীমায় এসে
এনেছে সে
নবতর সঞ্জীবনী আলোর আন্দাজ।
এর পর আপনারই লীলায় হঠাৎ,
ভয় হয়, অন্য কোনদিন,
এই স্থূল আলোকের প্রাণ
তরুণ রবির মোহে আবার কি হবে বাষ্পসাৎ!
কিংবা এক অকাল বর্ষণে
আপন তারল্য সত্তা
ফিরে পাবে অন্য কোন অনাদৃত ক্ষণে।

●

রূপকথা

উমা দেবী

নিশীথ-সমুদ্র জলে তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসে যে দীপ্ত সঙ্গীত
আমি তাহা শুনি নিত্য। ভরে নিই বেদনার আনন্দ সম্বিৎ
দেহযন্ত্রে। অন্ধকারে ভরে ওঠে স্বপ্ন-পারাবার—
নদ-নদী ফুলে ওঠে রতিযন্ত্রণার
তীব্র সুধারসে। আর সেইক্ষণে অনেক মমতা
বারবার ক্ষমা করে বারবার ভেঙে-যাওয়া প্রেমের
সততা।

অন্ধকার ছায়া নয়। সে তো এক রক্তিম লালসা
হৃদয়কে ঘিরে থাকে। প্রমত্ত প্রকট ভালবাসা
বয়ে যায় সুড়ঙ্গের গুপ্তপথে, ধমনীর ললিত স্পন্দনে
সবকিছু পেয়ে গিয়ে কিছু না পাওয়ার এক স্তিমিত ক্রন্দনে।
রসায়িত হয়ে ওঠে জীবনের গুপ্ত-কোষগুলি—
কে যেন বুলায় দেহে মমতায় নিলীন অঙ্গুলি।
সে মুহূর্তে তীব্রতম বাসনার সুখ-যন্ত্রণায়
বিগুণিত দেহকোষ সহস্রধা ফেটে যেতে চায়।

অন্ধকার—অন্ধকার—
ভরে তোল হে নিশীথ—মননের গভীর জোয়ার
দাঁড়াক নিকটে এসে গোপন প্রেমিক সেই—ভয়াল,
সুন্দর—
দূর স্রোতে ভেসে-আসা নিকট মুহূর্তে মনোহর—
সর্বেন্দ্রিয় রুদ্ধ করে সর্বেন্দ্রিয়ে যার আগমন—
অরণ্য-হৃদয় করে শান্ত তপোবন।
নিশীথ-সমুদ্র জলে আলোক-তরঙ্গে ভাসে যে নব সঙ্গীত
স্মরণ করাবে সেই মুহূর্তেই দুজনার একক সম্বিৎ।

নিদ্রা

কুমুদ ভট্টাচার্য

আছ, এইটেই তোমার জানা।
নেই, সেটি তোমার জানার এলাকায় পড়ে না।
সুতরাং ভাবনাটা কিসের!

জানার মধ্যে 'নেই' নেই।
না-জানার মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড
তার সমস্ত অতীত আর ভবিষ্যৎকে নিয়ে।
তুমি আজকের দিনটিকে নিয়েই খুশী হও।

প্রতি রাত্রির নিদ্রায় তুমি থাকো না।
সুতরাং না-থাকায় তুমি অনভ্যস্ত নও!
প্রতি প্রভাত তোমাকে জাগিয়ে দেয় বলে,
না জাগালে কী করতে!

যাকে, ভয় করছ সে কি নিদ্রা ছাড়া আর কিছু?
দীর্ঘতায় ছাড়া দুটোতে প্রভেদ কী!

পৃথিবীর প্রার্থনা

দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

মেঘ নেই খরশূন্যে : আনন্দের অশ্রুবাষ্পে আকাশের
বুক ভরে দাও,
মায়াবী মেদুর ঐ কোমল-কাজল মেঘে ধরণীর নয়ন জুড়াও।

রঙ নেই এ শ্মশানে : অরণ্যের নীল হতে এক কণা রঙ
দাও ঢেলে,
একটি আনন্দ-লতা অঙ্কুরিত হোক এই বন্ধ্যা বালু ঠেলে।

রস নেই এ ভুবনে : লাবণ্যের শ্যামসুধা এক ফোঁটা
ছিটাও হরষে,
হৃদয় রঙীন হোক, জীবন শ্যামল হোক সবুজের সেই
সোমরসে।

রূপ নেই এ নিখিলে : অমৃতের পূর্ণ-ঘটে রঙ-করা
তুলিটি ডুবিয়ে
ছিটাও সৃষ্টির মুখে, করো তারে অপরূপ অনন্তের রঙেতে
ছুবিয়ে।

ফুল নেই এ দিগন্তে : নন্দনের স্বর্ণ-বৃন্ত পারিজাত
পুষ্পের কেশর
এখানে ছড়াও কিছু : অনঙ্গের অঙ্গরাগে হোক তারা
বসন্তের বর।

পাখি নেই এ আকাশে : অদৃশ্য দিগন্ত হতে সুন্দরের
ভুরুর নাচন
দেখাও একটুখানি : জাদু লেগে পাখি হোক, প্রজাপতি-
পাখা হোক মন।

মায়া নেই এ মানসে : মমতার মর্ম হতে তুলে আনো
একটি নিঃশ্বাস,
ঢালো এ শুষ্ক প্রাণে, বুক হোক বিগলিত বেদনার সুধার
নির্যাস।

প্রেম নেই এ পাষাণে : আনন্দের রাঙাঠোঁটে এ পাথর
একটু ছোঁয়াও :
অমৃতের মুখামৃতে শিলা হোক ফুল-তনু প্রাণভস্ম ফুলে
ভরে দাও।

●

সংশয়

সুনীলকুমার লাহিড়ী

ফিরে কেন বাঁধো আজ অবেলায় মায়ার জালে ?
আগমনী-সুর বাজাও কেন যে বিদায় কালে !
যা পেরেছি মোর অক্ষম গানে গিয়েছি রাখি—
দৈন্য আমার, লজ্জা আমার রাখি নি ঢাকি—
অকপটে আমি প্রকাশ করেছি আপনারে পলে পলে ;
সে দীন-লজ্জা মহা-গৌরবে মণি হয়ে জলে বক্ষতলে।

ছেঁড়া তারগুলো বেঁধে কি আবার সাধার পালা ?
কুসুম চয়নে ভরিব কি তবে পুরানো ডালা ?
আবার নয়নে লাগিবে কি সেই নেশার ঘোর ?
ফুল-উৎসবে বসন্ত-নিশি হবে কি ভোর ?
কি জানি আবার দ্বিধা-বিজড়িত শঙ্কিত ভীরু মনটি বাহি
শেষকথা মোর শেষবার শুধু যাবে কি গাহি ?

●

ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞা বিচার

ইতিহাস বাস্তব ঘটনানির্ভর, আর উপন্যাস কল্পনাশ্রয়ী। সুতরাং 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' কথাটিকে শোনায় 'সোনার পাথরবাটি'র মত। কিন্তু পৃথিবীর ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকেরা প্রমাণ করেছেন, ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠার সঙ্গে কথাশিল্পীর তন্নিষ্ঠ (objective) দৃষ্টি ও সহৃদয় অনুভূতি মিশ্রিত হয়ে রসোত্তীর্ণ উপন্যাস রচিত হওয়া সম্ভব।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের সার্থকতা বিচারপ্রসঙ্গে প্রথমে 'ইতিহাস' ও ইতিহাস-নির্ভর উপন্যাসের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা করে নেওয়া প্রয়োজন ; না হলে এরূপ বিচারকার্যে পদে পদে ভ্রান্তির সম্ভাবনা।

এক সময়ে মনে করা হত ইতিহাস ও কাহিনীর মধ্যে কোন সূক্ষ্ম ভেদরেখা টানা যায় না। বস্তুতপক্ষে 'ইতিহাস' কথাটির গ্রীক-মূল—যার অর্থ হল অনুসন্ধানের সাহায্যে কোন খবর জানানো। Augustine Birrell তাই ইতিহাসের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন এভাবে :

"The natural definition of history...is the story of man upon earth, and the historian is he who tells us any chapter or fragment of that story."

কিন্তু এই যে মানুষের কাহিনী সে কি সত্য-নিরপেক্ষ ? আধুনিক সমালোচক মনে করেন, যে মুহূর্তে এ কাহিনী কোন যথাযথ বা লোকপ্রসিদ্ধ ঘটনা থেকে চুলমাত্রও বিচ্যুত হয় তখন তা ইতিহাসধর্ম-বর্জিত হয়ে রূপান্তরিত হয় ঐতিহাসিক উপন্যাসে। এ প্রসঙ্গে A. T. Sheppard বলেন :

"To my mind, the moment any chapter or fragment of that story wanders by a hair's breadth from exact and established fact, the historian ceases to be historian and becomes an historical novelist."*

কিন্তু ইতিহাসের ধর্ম সম্পর্কে এ ধারণা লোকের বরাবরই ছিল এমন কথা বলা চলে না। আমাদের দেশে তো বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সাহায্যে বাস্তব-নির্ভর ইতিহাস লেখবার রেওয়াজ খুব বেশী দিনের নয় ; এমন কি পাশ্চাত্ত্য দেশেও ইতিহাস লেখবার প্রথম যুগে Bede প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা সত্য ঘটনার সঙ্গে কল্পনাশ্রয়ী ঘটনার মিশ্রণ ঘটাতে কুণ্ঠিত হন নি। তাঁদের বিশ্বাস ছিল সত্য ঘটনার উপর কল্পনাসমৃদ্ধ মনোরঞ্জনী প্রলেপ ব্যবহার করতে না পারলে সে ইতিহাস ভবিষ্যদ্বংশীয়দের কাছে হৃদয়গ্রাহী হবে না। এ প্রসঙ্গে Dean Inge বলেন :

"The motives for falsifying history are in exact proportion to the interest of posterity in knowing the truth. Falsified history has perhaps had more influence than true history."

কিন্তু কল্পনারঞ্জিত ইতিহাস সাধারণ পাঠকের কাছে চিত্তাকর্ষক মনে হলেও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এ ধরনের ইতিবৃত্তকে কখনও শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারেন নি। Sir Robert Walpole এ ধরনের ইতিহাসের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে তাঁর ছেলেকে সোজাই বলেছিলেন : "Read anything but history, for history must be false." Lord Chesterfield-এর মতে "History is only a confused heap of facts." আর ইতিহাস সম্পর্কে Carlyle-এর বক্তব্য হল : "...it is the essence of innumerable Biographies ;

* Sheppard. A. T.—The Art and Practice of Historical Fiction—p. 12.

a distillation of rumours; the letter of Instructions which the old generations write and posthumously transmit to the new."

তা হলে আদর্শ ইতিহাসের রূপ হবে কী—এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে আসে। এ সম্পর্কে মেকলের ইঙ্গিত খুবই স্পষ্ট। মেকলে বলেন:

"The perfect historian must possess an imagination sufficiently powerful to make his narrative affecting and picturesque; yet he must control it so absolutely as to content himself with the materials which he finds, and to refrain from supplying deficiencies by additions of his own. He must be a profound and ingenious reasoner; yet he must possess sufficient self-command to abstain from casting the facts in the mould of his hypothesis."

কিন্তু ইতিহাস রচনায় সত্য উপস্থাপনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে Cervantes এবং Gradgrind যে মন্তব্য করেছেন তাতে ইতিহাসের প্রকৃত ধর্ম পাঠকের কাছে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে:

"History is like sacred writing, because truth is essential to it..."—Cervantes.

"Now what I want is facts—stick to facts, sir!"—Gradgrind.

এবার ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধর্ম কী তা বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করা যাক।

উপন্যাসের ধর্মবিশ্লেষণে মনস্বী রাসকিন একটি চমৎকার সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেন: উপন্যাস হল "A feigned, fictitious, artificial, supernatural, put-together-out-of-one's-head thing."

বর্তমান বাস্তবধর্মিতার যুগে উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য বিচারে রাসকিনের "feigned, fictitious, artificial, superficial" প্রভৃতি লক্ষণগুলি স্বীকৃত হবে না সত্য, কিন্তু উপন্যাস যে "put-together-out-of-one's-head thing" এতে সন্দেহ নেই।

ঐতিহাসিক উপন্যাস হল Mr. Gradgrind-প্রোক্ত তথ্য (facts) ও রাসকিনের "put-together-out-of-one's-head thing"-এর অপূর্ব সংমিশ্রণ।

গত এক শতাব্দী ধরে বহু চিন্তাশীল লেখক ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞা নির্ণয়ের প্রয়াস পেয়েছেন। একটা বিষয়ে প্রায় সকল লেখকই একমত—ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের বিচরণভূমি হল অতীতে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাসের সমালোচক A. T. Sheppard বলেন: "An historical novel must of necessity be a story of the past in which imagination coms to the aid of fact." John Buchan বলেন: "an historical novel is simply a novel which attempts to reconstruct the life and recapture the atmosphere, of an age other than that of the writer."

এখানে ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞার আর একটু বিস্তারও লক্ষ্য করা যায়। ঐতিহাসিক উপন্যাস শুধু অতীত ঘটনানির্ভর নয়, এ ধরনের উপন্যাসে অতীত জীবন পুনর্গঠন ও অতীত পরিবেশের পুনস্থাপন-প্রয়াসও দেখা যায়। এই যে অতীত, সে কতকালের অতীত? John Buchan বলেন: "The age may be distant a couple of genrations or a thousand years." কিন্তু শুধুমাত্র নিরঙ্কুশ কল্পনার সহায়তায় অনির্দিষ্ট অচিহ্নিত অতীতকে নিয়ে উপন্যাসে ইতিহাস-সচেতন পাঠকের মনে আবেদন সৃষ্টি করতে না পারারই সম্ভাবনা। সেজন্যে Jonathan Neild ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞা বিচারে আর একটু সতর্কভাবে অগ্রসর হয়েছেন। তিনি বলেন: "A novel is rendered historical by the introduction of dates, personages, or events, to which identification can be readily given."

Arnold Bennett ভিন্নতর প্রেক্ষিত থেকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞা নিরূপণের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক তাঁর রচনায় এমন একটি যুগের পুনর্সৃষ্টি করেন যে যুগে তিনি বর্তমান ছিলেন না (the first thing about an historical novel is that the author re-creates in it an age in which he did not live.)।

বেনেটের উক্ত ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞাকে মর্যাদা দিতে গেলে আলেকজাণ্ডার ডুমার 'The she-wolves of Machecoul' বা টলস্টয়ের "Sevastopol" উপন্যাসকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে স্বীকার করাই চলে না; কারণ দুজন ঔপন্যাসিকই উপন্যাস-বর্ণিত কালসীমার মধ্যে বা কাছাকাছি কোন সময়ে জীবিত ছিলেন।

'অতীত' কথাটি অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট বলে ঐতিহাসিক উপন্যাসের বর্ণিত কালকে একটি নির্দিষ্ট সীমায় চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন Leslie Stephen। তাঁর মতে অন্তত: ষাট বছরের অতীত জীবনকে নিয়ে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হতে পারে (স্কটের মতে অবশ্য পঞ্চাশ বছরের অতীত; বস্তুতপক্ষে তাঁর 'Waverly' উপন্যাসের উপশীর্ষ-নাম তিনি দিয়েছিলেন—"'Tis fifty years since.")। চিন্তাশীল সমালোচক A. T. Sheppard-ও মনে করেন, পঞ্চাশ বছরের অতীতকে নিয়ে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করা যেতে পারে; কারণ পঞ্চাশ বছরের মধ্যে যৌবন পরিণত হয় বার্ধক্যে, মধ্যবয়স্ক ও বৃদ্ধেরা সংসার থেকে বিদায় নেয়। শুধু তাই নয়, পঞ্চাশ বছর কালের ব্যবধানে আদব-কায়দা, পোশাক-আশাক, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি সমস্তই বিবাতত বা পরিবর্তিত হয়; ধ্বংস ও অনিবার্য পরিবর্তন গত যুগের ঐশ্বর্যময় জীবনের উপর ম্লান ছায়া বিস্তার করে, এবং সে জীবনকে সমসাময়িক জীবন থেকে দূরে সরিয়ে নেয়।

কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাসের বর্ণনীয় জীবনকে কোন নির্দিষ্ট কালসীমায় সীমাবদ্ধ করতে গেলে ঔপন্যাসিকের স্বাধীন কল্পনার ওপর হস্তক্ষেপ করা হয়। সেজন্যে জার্মান ঔপন্যাসিক Freidrich Spielhagen তাঁর বিখ্যাত "Technik des Romans" নামক গ্রন্থে ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন এভাবে: "The historical novel is one that portrays a time on which the light of the living generation's memory does not fall any longer in its full force."

ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞা নির্ণয়ে এই মধ্যপন্থা অবলম্বন করলে সমস্যার সমাধান বোধ হয় সহজতর হয়ে আসে। যে জগতে আমরা একদিন বাস করতাম সে জগৎ যখন কালের ব্যবধানে আমাদের চোখের সামনে রহস্যময় রূপ নিয়ে দেখা দেয়, এবং সে বিখ্যাত কুহেলিকাচ্ছন্ন জগতে প্রবেশ করে যখন আমরা সৌন্দর্যের মধু আহরণ করি তখনই হয় ঐতিহাসিক উপন্যাসের জন্ম। শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের পরিচয় প্রসঙ্গে তাই A. T. Sheppard তাঁর 'The Art and Practice of Historical Fiction' গ্রন্থে বলেছেন:

"The really great historical novelists, it seems to me, are those who invest and surround their characters—the men and women 'of lost years' with the haze of wistfulness and glamour which is comparable to that gloss or film on pre-historic implements and weapons; time's own work, not to be copied by any human tool or process."

শেপার্ডের উক্ত সংজ্ঞা মেনে নিলে ইয়োরোপীয় সাহিত্যে ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে প্রশ্নাতীত কৃতিত্বের অধিকারী হলেন—Scott, Dumas, Ainsworth, Lytton, Hugo, Bernard Capes, Henry, Hewlet, Manzoni, Merezhkovsky, Jokai, Sabatini এবং Mary Johnston. স্কটের পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী রোমান্টিক লেখকদের মধ্যে Cervantes, Bunyan, Defoe, Lever, Smollet,

Fielding প্রভৃতি প্রথমোক্ত লেখকদের মত এত উচ্চশ্রেণীর শিল্পনৈপুণ্যের অধিকারী না হলেও ঐতিহাসিক উপন্যাসশিল্পী হিসেবে তাঁদের নামও অনুল্লেখ্য নয়।

॥ দুই ॥

ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রকৃতি

ঐতিহাসিক উপন্যাসের মুখ্য উপকরণ সংগৃহীত হয় ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে। সেজন্যে অনেকের ধারণা ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা বুঝি সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক বা রাজনৈতিক উপন্যাসের চাইতে সহজতর। শেষোক্ত ধরনের রচনায় শিল্পীকে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বা সন্ধানী দৃষ্টির সাহায্যে উপন্যাসের বিষয়বস্তু সংগ্রহ করতে হয়। কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় লেখককে বিষয়বস্তু বা চরিত্র-পরিকল্পনার জন্যে তেমন হাতড়ে বেড়াতে হয় না। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা সম্পর্কে এ লোকপ্রচলিত ধারণা যে কতটা ভ্রমাত্মক তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় 'The Path of the King,' 'Mid winter' প্রভৃতি উপন্যাসের লেখক John Buchan-এর মন্তব্য থেকে। Buchan বলেছেন, ঐতিহাসিক উপন্যাস হল সকল শ্রেণীর উপন্যাসশিল্পের মধ্যে কঠিনতম সৃষ্টি। জনৈক ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক অকুণ্ঠভাবে এমন স্বীকৃতিও জানিয়েছেন, প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে তাঁর যে সময় ব্যয় হয়েছে তার পঞ্চমাংশ সময়ে তিনি ইতিহাসাশ্রিত রোমান্টিক উপন্যাস লিখতে সক্ষম হয়েছেন। এই দু' ধরনের (ইতিহাস-কেন্দ্রিক) উপন্যাস রচনায় যিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, তিনি প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার দুরূহতা সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন।

সকল শ্রেণীর উপন্যাসের মধ্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা দুরূহতম—এর অন্যতম প্রধান কারণ, এ ধরনের উপন্যাস রচনায় লেখককে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার জগৎকে অতিক্রম করে প্রবেশ করতে হয় বিগত যুগের এমন একটি জগতে যার সঙ্গে তাঁর পরিচয় শুধু পুঁথিগত। কিন্তু আধুনিক ঔপন্যাসিকের মত লোকচরিত্রজ্ঞান না থাকলে ঐতিহাসিক উপন্যাস সৃষ্টিতে তাঁর ব্যর্থতার সম্ভাবনা পদে পদে। এ ছাড়া এমন অনেক বিষয়ে তাঁর জ্ঞান থাকা দরকার যা শুধু পুস্তকের সাহায্যেই লভ্য। যেমন, যে বিগত যুগের ঘটনা নিয়ে তিনি উপন্যাস রচনা করবেন সে যুগের রাজনীতি, যুদ্ধবিদ্যা, আইন-কানুন, চিকিৎসাপদ্ধতি ধর্মশাস্ত্র, বংশানুক্রম, প্রাচীন ভৌগোলিক ও স্থানিক তথ্য, পোশাক-আশাক প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর ধারণা যদি স্পষ্ট না হয় এবং অত্যন্ত সতর্কভাবে প্রাচীন যুগের যথাযথ বর্ণনা যদি তিনি দিতে না পারেন, তা হলে কালানৌচিত্য-দোষে সে ঐতিহাসিক উপন্যাস ব্যর্থ হতে বাধ্য।

অতীত জগৎ সম্পর্কে বিস্তৃত জ্ঞান, মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের আয়ত্তে থাকা চাই একটি সূক্ষ্ম শিল্পকৌশল—যে কৌশলের সহায়তায় তিনি সহজেই আবিষ্কার করতে পারেন বিপুল ঐতিহাসিক ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে প্রবল সংঘাতময় ঘটনা ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চরিত্র। এ ছাড়া স্ব-যুগের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিতিও ঐতিহাসিক উপন্যাসের সার্থকতার মূলে। কিন্তু এ স্বচ্ছন্দ জীবন-পরিচিতি শুধুমাত্র জনতার সঙ্গে অবাধ মেলামেশা বা কল্পনার জানলা দিয়ে জীবনকে দেখার মধ্য দিয়ে লাভ করা যায় না। তার জন্যে চাই সর্বযুগের জীবনের প্রতি স্রষ্টার অন্তহীন সহানুভূতি।

কালনিরপেক্ষ ও নির্বিশেষ মানব-জীবনের সঙ্গে একাত্মতার ফলেই ঐতিহাসিক উপন্যাস বাস্তবিকপক্ষে শ্রেষ্ঠত্ব ও স্থায়ী মূল্য অর্জন করে। পৃথিবীর সমস্ত উৎকৃষ্ট উপন্যাসের সার্থকতার মূলেও রয়েছে একটা সহৃদয় মানবতার স্পর্শ—যে স্পর্শ স্রষ্টা, চরিত্র ও পাঠককে একই অদৃশ্য সূত্রে বিধৃত করে। ইতিহাস-বর্ণিত চরিত্রের সঙ্গে ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক যখন পাঠক-মনের অন্তরঙ্গ পরিচয় স্থাপন করতে পারেন তখনই হয় এই শ্রেণীর উপন্যাস সার্থক।

অতীত যুগের মর্মমূলে প্রবেশ করবার জন্যে অতীত যুগের ভাষা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিদেশী ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ও ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের পক্ষে অপরিহার্য। অবশ্য লেখকের নিজের ভাষায় প্রাঞ্জল ও চিত্তাকর্ষকভাবে লেখবার ক্ষমতা থাকা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

পুরাতত্ত্বজ্ঞান তাঁর ভাষাকে যদি আর্য-ভাবাপন্ন করে তোলে তা হলে সে ঐতিহাসিক উপন্যাস মনোমুগ্ধকর কাহিনী ও চরিত্রসৃষ্টি সত্ত্বেও সাধারণ পাঠকের কাছে আবেদনহীন হয়ে ওঠে।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রকৃতি বিচারে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য বিষয় বোধ হয় লেখকের কল্পনাসমৃদ্ধি ও সৃষ্টিপ্রতিভা। ইতিহাসের নির্দিষ্ট ঘটনাকে ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক একান্ত সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে উপস্থাপিত করতে বাধ্য এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তার চাইতেও উল্লেখযোগ্য বিগত যুগের রীতিনীতি, সুর ও মেজাজকে ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক জীবন্ত করে তুলবেন তাঁর সৃষ্টি-কর্মে। ইতিহাসের জড় কঙ্কালকে সজীব ও সরস সৃষ্টিকর্মে রূপান্তরিত করবার জন্যে যে ক্ষমতার প্রয়োজন সে শক্তিকে হাড্‌সন অভিহিত করেছেন—"Creative imagination" ও শেপার্ড চিহ্নিত করেছেন—"Realistic imagination" বলে। এই creative বা realistic imagination যে কত দুর্লভ শক্তি তা ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকমাত্রই উপলব্ধি করেন। অতীত ঘটনাকে অবলম্বন করে কল্পনা-সমৃদ্ধির সাহায্যে বর্ণাঢ্য রূপ ও রসজগৎ সৃষ্টি করা অপেক্ষাকৃত সহজ; বস্তুতপক্ষে ইংরেজী সাহিত্যে রোমান্টিক যুগের ঔপন্যাসিকমাত্রই এঁ ধরনের শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু শুধুমাত্র রসকল্পনার উপর আত্যন্তিক নির্ভরতার ফলে বহু লেখকের ঐতিহাসিক উপন্যাসও যে নিছক রোমান্সে পর্যবসিত হয়েছে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আলেকজাণ্ডার ডুমার উপন্যাস। এমন কি স্কটের সমালোচকেরাও এ বিখ্যাত ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের রচনাকে কালানৌচিত্যদোষে (anachronism) দোষী করতে ছাড়েন নি। যতদিন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইতিহাস রচনা শুরু হয় নি, ততদিন পর্যন্ত না হয় ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিককে সত্যভ্রষ্টতার জন্যে ক্ষমা করা যেত। কিন্তু বর্তমান ঐতিহাসিক বস্তুনিষ্ঠার যুগে ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের পক্ষে ইতিবৃত্তকারের দায়িত্ব গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর নেই। এ যুগের ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিককে একদিকে যেমন একনিষ্ঠভাবে ইতিহাসের দাবি মানতে হয়, আর একদিকে তেমনি শিল্পের দাবিও মানতে হয়। ইংরেজী সাহিত্যে স্কটের পূর্বে বহু উপন্যাসশিল্পী ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন সত্য, কিন্তু ইতিহাসের আনুগত্য-হীনতার জন্যে Walter Raleigh সে সমস্ত লেখককে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার অধিকারী বলেই মনে করেন নি। Sir Walter Raleigh ("Secundus") তাঁর বিখ্যাত 'The English Novel' নামক গ্রন্থে বলেছেন: "The historical novelist who preceded Scott chose a century as they might have chosen a partner for a dance, gaily and confidently, without qualification or equipment beyond a few outworn verbal archaisms." ঐতিহাসিক সত্য উপস্থাপনে কিছু ত্রুটিবিচ্যুতির পরিচয় দিলেও অধ্যাপক Saintsbury তাই Scott-এর উপন্যাস সম্পর্কে বলেছেন: "Scott created historical novel after some thousand years of unsuccessful attempt."

ঐতিহাসিক উপন্যাসের টেকনিক কত দুরূহ, স্কটের উপন্যাসের সমালোচনা থেকে তা কতকটা অনুমান করা যায়। ভিক্টোরীয় যুগের কোন কোন সমালোচক স্কটের উপন্যাসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেও অনেক বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও সমালোচক স্কটের উপন্যাসকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন, কিংবা এত ক্ষীণ কণ্ঠে প্রশংসা করেছেন যে তাকে অপ্রশংসার সামিলই বলা চলে। যেমন, কারলাইলের মতে 'ওয়েভারলি' উপন্যাসে স্কটের বড় কৃতিত্ব হল, সেগুলো খুব দ্রুত লিখিত এবং পৃথিবীর সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে সবচাইতে বেশী অর্থকরী হয়েছিল। টেইনও স্কটের উপন্যাসের শিল্পমূল্য বিচার অপেক্ষা জনপ্রিয়তার কথাটাই সগর্বে উল্লেখ করেছেন। Leslie Stephen স্কটের বিখ্যাত 'Ivanhoe', 'Kelinworth', 'Quentin Durward' প্রভৃতি উপন্যাসকে ঐতিহাসিকতা বিচারে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয়েছেন। Miss Marjorie

Bowen স্কটের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেও পরবর্তী লেখকদের উপর তাঁর প্রভাব স্বীকারে দ্বিধান্বিত। আর্নল্ড বেনেটের মতে স্কটের উপন্যাস যে শুধু মৌলিকতাহীন তা নয়, বিগত যুগের চিত্রাঙ্কনেও স্কট সব সময় সত্যের অনুসরণ করেন নি। স্কটের কোন কোন ঐতিহাসিক উপন্যাসের উৎকর্ষ প্রশ্নাধীন হলেও এ শ্রেণীর পরবর্তী রচনার উপর তাঁর প্রভাব সমালোচক-মহলে স্বীকৃত। তথাপি স্কটের ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্পর্কে এত বিরূপ সমালোচনা দেখে আদর্শ ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা যে কত কঠিন শিল্প-প্রয়াস সে সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়।

॥ তিন ॥

ঐতিহাসিক উপন্যাসের গঠন-প্রকরণ

উক্ত আলোচনার পর ঐতিহাসিক উপন্যাসের আঙ্গিকসৌষ্ঠব কি রকম হওয়া উচিত সে প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে আসে। ঐতিহাসিক উপন্যাস সৃষ্টি নিয়ে য়ুরোপে বহুকালব্যাপী অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে এবং 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীসে'র মত আদর্শ ঐতিহাসিক উপন্যাসও রচিত হয়েছে। এই শ্রেণীর ঐতিহাসিক উপন্যাস পাঠ করবার ফলে জনৈক সমালোচক ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শ সম্পর্কে নিম্নোক্ত ধারণায় উপনীত হয়েছেন :

"It must preserve dignity and avoid grandiloquence, preserve atmosphere and avoid the archaic carried to extremes, preserve accuracy of background and avoid the crowding out of the human interest, preserve strength and avoid the needlessly coarse and ruthless and morbid, preserve the dramatic without being melodramatic, preserve proportion without sacrificing detail."*

ইতিহাসের গাম্ভীর্য থাকবে অথচ ভাবোচ্ছ্বাস থাকবে না, পরিবেশসৃষ্টি অকৃত্রিম হলেও চরম আর্যভাবাপন্ন হবে না, পটভূমিকাসৃষ্টি যথাযথ হবে অথচ মানবীয় আবেদনের ভিড় থাকবে না, বলিষ্ঠতা (প্রাচীন যুগের) সংরক্ষিত হলেও অনাবশ্যক কর্কশতা, নিষ্ঠুরতা বা অসুস্থ মনোভাববর্জিত হবে, নাটকীয় উপাদান থাকলেও অতি-নাটকীয় হবে না, এবং বর্ণনার খুঁটিনাটি অক্ষুণ্ণ রাখলেও পরিমিতিবোধের পরিচয় থাকবে।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রকৃতি বিশ্লেষণে এর থেকে সুচিন্তিত মতামত আর বোধ হয় হতে পারে না।

কিন্তু আদর্শকে বাস্তবে রূপ দান করা চিরকালই শিল্পীর পক্ষে দুরূহ কর্ম। উপরে আদর্শ ঐতিহাসিক উপন্যাসের আঙ্গিক-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে ধারণা ব্যক্ত হয়েছে তা আদৌ কার্যে পরিণত হবে কি না তা সন্দেহজনক। এ পর্যন্ত যত শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হয়েছে সেগুলিও সর্বপ্রকারের দোষমুক্ত নয়। এ ধরনের উপন্যাসশিল্পীর শিল্পরচনা নেহাত দৈবপ্রভাবে না হলে প্রায়ই আদর্শে পৌঁছতে সক্ষম হয় না। তবুও আদর্শকে সামনে রেখে প্রত্যেক শিল্পীরই শিল্পরচনায় অগ্রসর হওয়া উচিত।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিষয়বস্তুর প্রকৃতি কি হবে এখন তাই আমাদের বিবেচ্য। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক লর্ড লিটন বলেন, ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের প্রথম প্রয়াস হবে মননগ্রাহ্য একটা মহৎ ও অখণ্ড বিষয়ের পরিকল্পনা। চিত্রশিল্পী যে ভাবে ভাবদৃষ্টি দিয়ে তাঁর শিল্পরচনার একটা কাঠামো প্রথমে মনে মনে তৈরি করে নেন, উপন্যাস-শিল্পীকেও ঠিক সে ভাবেই অগ্রসর হতে হবে।*

তারপর প্রশ্ন ওঠে, ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিষয় নির্বাচন। মানুষের জীবন-কাহিনীর মত ইতিহাসের কাহিনীও বহুবিস্তৃত। এই সুবিপুল ঘটনাপুঞ্জ থেকে কোন ঘটনা উপন্যাসের উপযোগী হবে ঐতিহাসিক উপন্যাস

---

* Sheppard, A. T.—The Art & Practice of Historical Fiction, p. 82.

* "To my mind a writer should sit down to compose a fiction as a painter prepares to compose a picture. His first care should be the conception of a whole as lofty as intellect can grasp."—Lytton.

লিখতে গেলে লেখক প্রথমেই এ প্রশ্নের সম্মুখীন হন। ঐতিহাসিক উপন্যাসের উপাদান ছড়িয়ে আছে উপন্যাসের যে কোন যুগে। যে কোন কাহিনী, নিঃসঙ্গ শ্মশান, ভগ্নপ্রায় অট্টালিকা, ধ্বংসোন্মুখ নগরী, কিংবা ছোট একটি কবিতাংশের ভেতরও এ ধরনের উপন্যাসের উপাদান সংগ্রহ করতে লেখককে বেগ পেতে হয় না।

কিন্তু কোন্ বিষয়টি গ্রহণ করলে তা রসগ্রাহ্য শিল্প-সৃষ্টিতে পরিণত হবে তা ভেবে লেখক প্রথমে বিভ্রান্ত হন। তাঁর সামনে দ্বিতীয় বিভ্রান্তি আসে উপন্যাসের নাম নির্বাচনে। দু' যুগের কাহিনী নিয়ে রচিত ডিকেন্সের বিখ্যাত উপন্যাসখানির 'A Tale of two Cities' নামকরণের পূর্বে ডিকেন্স উপন্যাসখানির নিম্নলিখিত নামগুলি পরিকল্পনা করেছিলেন :

"Time! The Leaves of the Forest. Scattered Leaves. The Great Wheel. Round and Round. Old Leaves. So Long Ago. Far Apart. Fallen Leaves. Five and Twenty Years. Day after Day. Felled Trees. Memory Carton. Rolling Stones. Two Generations."

অতএব উপন্যাসের নাম যাতে ভাবানুযায়ী ব্যঞ্জনা-ধর্মী হয় সেদিকে লেখকের দৃষ্টি রাখা প্রথমেই কর্তব্য।

তারপর ইতিহাসের এত চরিত্র ও ঘটনার ভিড়ের মধ্যে উপন্যাসের চরিত্র ও ঘটনা নির্বাচনেও লেখককে কম বেগ পেতে হয় না।

অতএব ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের সর্বপ্রথম বিচার্য হল সার্থক উপন্যাস সৃষ্টির জন্য কি কি উপাদান গ্রহণ এবং কি কি উপাদান বর্জন করতে হবে। এ গ্রহণ-বর্জনের সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর না হলে লেখকের ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় সার্থকতা লাভ করবার স্বপ্ন সুদূরপরাহত।

এ হল ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার সুনির্দিষ্ট কৌশলের কথা। কিন্তু উপন্যাস রচনা একটা যান্ত্রিক কাজ নয়, এবং উপন্যাসশিল্পীও যন্ত্রশিল্পী নন। অতীত ঘটনা বা চরিত্র উপস্থাপনে ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক সুপরিকল্পিত চিন্তা নিয়ে অগ্রসর হন সত্য, কিন্তু ঘটনা যখন বিস্তারলাভ করে তখন লেখকের মৌলিক পরিকল্পনার উপর শিল্পীর অনুভূতিনির্ভর কল্পনা যে কখন প্রধান হয়ে ওঠে তা হয়তো শিল্পী নিজেই টের পান না। প্রকৃতপক্ষে এ বন্ধনহীন কল্পনাই তো অতীতের অমসৃণ জড় ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে মুক্ত হাওয়া প্রবাহিত করে দিয়ে ইতিহাসকে রূপান্তরিত করে হৃদয়গ্রাহী শিল্পকর্মে। প্রখ্যাত ইংরাজ ঔপন্যাসিক স্কট নিজেই এ কথা স্বীকার করেছেন, যে পরিকল্পনা নিয়ে তিনি উপন্যাস রচনা শুরু করতেন, পরিসমাপ্তিতে তা ভিন্ন রূপ ধারণ করত। লিখতে লিখতে নিত্যনতুন কল্পনা এসে তাঁর পূর্বনির্দিষ্ট ছকবাঁধা উপন্যাসের কাঠামোকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যেত। শুধু স্কটের বেলায় নয়, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস-শিল্পীর শিল্পরচনাপ্রয়াসেও অনুরূপ ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। (বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাসেও এরূপ অকল্পিত কল্পনা বিস্তার সমভাবে লক্ষণীয়)। স্কট নিজে তাঁর উপন্যাসে এরূপ অচিন্ত্যপূর্ব কল্পনার আনুগত্য স্বীকার করলেও, এরূপ পন্থা অবলম্বনের সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে নতুন লেখকদের সতর্ক করে দিয়েছেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে নিজের জার্নালে তিনি লিখছেন : "A perilous style, but I cannot help it. I would not have young writers imitate my carelessness, however."

উক্ত আলোচনায় এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠল, ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রারম্ভে কাহিনীর যে বীজ বপন করা হয় তা ক্রমশঃ শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে এমন পরিণতি লাভ করে যে পরিণতির সঙ্গে উৎসের সাদৃশ্য খুব ঘনিষ্ঠ হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে। কাহিনী শুরু করেন লেখক সাধারণতঃ স্বল্প কয়েকটি কথার রেখায়, আবার অনেক সময় দেখা যায় কথারম্ভে কাহিনী কোন সুস্পষ্ট রূপই লাভ করে নি। ষ্টিভেনসনের উপন্যাসের প্রারম্ভে এরূপ ছায়াময় কল্পনার আভাস পাওয়া যায়। বঙ্কিমের

'রাজসিংহ' উপন্যাসের প্রারম্ভ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আবার Nathaniel Hawthorne-এর উপন্যাসে দেখা যায় উপন্যাস রচনায় তদ্গতভাবে আত্মনিয়োগ করবার আগে তিনি পরিকল্পিত উপন্যাসের একটি সংক্ষিপ্তসার পূর্বেই তৈরি করে নিচ্ছেন। শুধু হথর্ন নয়, স্কট, ডুমা, ষ্টিভেনসন হার্ডি প্রভৃতি প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকই হাতের কাছে একটা নোটবুক রাখতেন যার মধ্যে থাকত তাঁদের ভবিষ্যতে লিখিতব্য উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনা। রীড তো দিনের অনেকটা সময় ব্যয় করতেন এ সমস্ত নোট এবং সংগৃহীত অংশ পাঠ করতে। উপন্যাসের বিষয়বস্তু বা মোটামুটি কাঠামো যে কোন সময় যে কোন জায়গায় পাওয়া যায়, এমন কি স্বপ্নের মধ্যেও অনেক সময় উপন্যাসের কাহিনী এসে ধরা দেয়। কিন্তু স্বপ্নে যে কাহিনীকে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বলে মনে হয় দিনের আলোকে তাকে মনে হয় অর্থহীন। স্বপ্নলব্ধ কাহিনীর মধ্যে খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে 'ডাঃ জেকিল ও মিঃ হাইড।' কিন্তু জনপ্রিয় হলেও কাহিনীটির উৎসমূলে একটু দুর্বলতা আছে।

লেখকের প্রিয় কোন বিশেষ স্থানের প্রতি অনুরাগ বহু ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। জর্জ ইলিয়টের 'রমলা' এ ধরনের একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস। পুষ্পসজ্জাবিভূষিতা ফ্লোরেন্সকে তাঁর কাছে বেশী আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল রোম থেকে। ফ্লোরেন্সের সে ঐশ্বর্যই তাঁর মনকে উদ্দীপ্ত করেছিল এই রোমান্সধর্মী চিত্তাকর্ষক উপন্যাস রচনায়। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় এরূপ অভিজ্ঞতা বহু লেখকের বেলায় ঘটেছে। বঙ্কিমের বহু ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসও এরূপ অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ ফল ('দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের পটভূমিকা এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য)। কিন্তু কোন বিশেষ যুগের পটভূমিকায় কোন স্থানের প্রাণধর্মের সঙ্গে পরিচিত হতে হলে সে স্থানে শুধুমাত্র কয়েকদিন ঘুরে আসাই যথেষ্ট নয়। এরূপ ক্ষণিক অভিজ্ঞতা লেখকের সৌন্দর্যচেতনা বা ভাবোচ্ছ্বাসকে হয়তো জাগ্রত করতে পারে, কিন্তু ইতিহাসের মর্মমূলে প্রবেশ করতে সাহায্য করে না। কোন কালের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানবিশেষের ইতিহাসের প্রাণমূলে প্রবেশ করতে হলে চাই সেই স্থান সম্পর্কে শিল্পীর বিস্তৃত তথ্যাভিজ্ঞতা। এ অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় সে যুগের এবং স্থানের ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিতির ফলে। এ পরিচয় সম্ভব হয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সে যুগের ইতিহাস পাঠে। জগতের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকমাত্রই যে স্থান ও কালকে কেন্দ্র করে আখ্যান রচনা করে বিখ্যাত হয়েছেন সে স্থান ও কাল সম্পর্কে তাঁরা গভীর ইতিহাস-জ্ঞানেরও পরিচয় দিয়েছেন।

কি ধরনের ঐতিহাসিক ঘটনার আশ্রয়ে ঐতিহাসিক উপন্যাস শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তিতে পরিণত হবে এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে আসে। সাধারণতঃ পাঠকের ধারণা এই যে, ইতিহাসের প্রবল সংঘাতময় অধ্যায় বা যুগান্তরকারী ঘটনাকে আশ্রয় করেই এ ধরনের উপন্যাস সার্থকতা লাভ করে বেশী। চিন্তাশীল সমালোচক জর্জ সেইন্টস্‌বারি কিন্তু মনে করেন ইতিহাসের বড় বড় ঘটনাশ্রয় এই শ্রেণীর উপন্যাসে সার্থকতা লাভের পরিপন্থী। অবশ্য সার্ ওয়াল্‌টার স্কটের মত শক্তিমান শিল্পী উক্ত ধারণার ব্যতিক্রম। এ ছাড়া সেইন্টস্‌বারির মতে লেখকের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিত এমন একটি চরিত্রসৃষ্টিতে যে চরিত্র সম্পূর্ণ কাল্পনিক, কিংবা যে চরিত্র সম্পর্কে ইতিহাসে বিশেষ কোন বর্ণনা নেই। তা হলে উপন্যাসকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে লেখক কল্পনা-বিস্তারের অফুরন্ত অবকাশ পাবেন। ইতিহাসের বাস্তব ঘটনা বা পরিবেশকে লেখক ব্যবহার করবেন কাহিনী-বিকাশের পরিপূরক হিসাবে বা চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তুলতে। এ কৌশল অবলম্বন করেছিলেন ইংরাজ কথাশিল্পী ডুমা তাঁর সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে। একই কৌশল অবলম্বন করেছিলেন স্কট তাঁর কোন কোন বিখ্যাত উপন্যাসে। বঙ্কিমের 'রাজসিংহ' উপন্যাসেও ঔরঙ্গজীব-রাজসিংহের প্রচণ্ড সংঘাতময় ঐতিহাসিক কাহিনীকে অতিক্রম করেছে মোবারক-জেবউন্নিসার ট্র্যাজিক বেদনাসুন্দর কাল্পনিক কাহিনী। সাম্প্রতিক-

কালে 'কেরী সাহেবের মুন্সী'তে লেখকের বিস্তৃত ইতিহাসচেতনার উপরে কল্পলোকের মহিমা বিস্তৃত হয়েছে রেশমীর কাল্পনিক চরিত্র অবতারণায়। কিন্তু এ কথাটা এখানে স্মরণযোগ্য, কাল্পনিক চরিত্রের অবতারণা ঐতিহাসিক উপন্যাসকে চিত্তাকর্ষক করে তুলতে পারে যদি সে চরিত্রের বিকাশ দেখানো হয় ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। যে মোবারক-জেবউন্নিসার কল্পিত প্রণয়-কাহিনী রাজসিংহ উপন্যাসকে লোকপ্রিয় করে তুলেছে তার পটভূমিকায় স্থাপন করা হয়েছে মোগলযুগের পরিবর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ঐতিহাসিক পরিবেশ। 'কেরী সাহেবের মুন্সীতে'ও কাল্পনিক রেশমী-চরিত্রের বৈচিত্র্যপূর্ণ বিকাশ একটি সম্পূর্ণ আজগুবী কাহিনীতে পরিণত হত যদি না সেই অদ্ভুত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চরিত্রটিকে সে-যুগের পরিবর্তমান ইতিহাসের পটভূমিকায় স্থাপন করা হত। বহু অসম্ভাব্য ঘটনার চকিত-চমক সত্বেও রেশমী-কাহিনী যে উপকথায় পর্যবসিত হয় নি তার কারণ সমকালীন যুগের চিত্রাঙ্কনে লেখকের ইতিহাসনিষ্ঠা।

কাল্পনিক চরিত্রের নিপুণ অবতারণায় ঐতিহাসিক উপন্যাস জমে ভাল সন্দেহ নেই, কিন্তু তাই বলে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক চরিত্রের আশ্রয়ে যে উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করা যায় না, এ কথাও বলা চলে না। আসলে ঐতিহাসিক হোক, বা অনৈতিহাসিক হোক, জীবন্ত চরিত্রসৃষ্টি নির্ভর করে লেখকের ক্ষমতার ওপর। একজন সত্যিকারের ক্ষমতাবান শিল্পী কাল্পনিক চরিত্রকে যেমন চিত্তাকর্ষক রূপ দিতে পারেন, ঐতিহাসিক চরিত্রকেও তেমনি সজীব করে তুলতে পারেন উপন্যাসে। কিন্তু স্বল্প ক্ষমতাশালী লেখকের পক্ষে ইতিহাসের বাস্তব-চরিত্রকে উপন্যাসে চিত্তাকর্ষক রূপ দেওয়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে; এই শ্রেণীর লেখকদের উচিত ইতিহাসের অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিচিত চরিত্রকে উপন্যাসে রূপ দেওয়া। লেস্‌লি ষ্টিফেন একবার টমাস হার্ডির কাছে লিখেছিলেন: উপন্যাসে ঐতিহাসিক চরিত্রের অবতারণা প্রায় সব সময়ই বোকামির পরিচায়ক সন্দেহ নেই, কিন্তু পটভূমিকা হিসাবে ইতিহাসের আশ্রয় নেওয়া আমি খুবই পছন্দ করি। তৃতীয় জর্জের সময়ের কোন ঘটনা নিয়ে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করতে গেলে তৃতীয় জর্জের জীবনচিত্র সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত না করে তাঁকে রাখতে হবে কাহিনীর এক প্রান্তে।

উক্ত মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে বঙ্কিমের ইতিহাসাশ্রিত সামাজিক উপন্যাসগুলিও ঐতিহাসিক উপন্যাসের কোঠায় পড়ে।

ঐতিহাসিক উপন্যাসে লেখক যদি বৃহৎ ঘটনার পটভূমিকায় শুধু বড় বড় চরিত্রগুলিকে উপস্থিত করেন, তা হলে সমকালীন সাধারণ লোকের জীবনচিত্র সেই উপন্যাসে উপেক্ষিত হয়, অথচ যে উপন্যাসে সমকালীন সর্বস্তরের জীবনের একটি পূর্ণ পরিচয় উদ্ঘাটিত হয় না, তাকে ঠিক ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা চলে না।

ঘটনা নির্বাচনের মত উপযুক্ত কালনির্বাচনও ঐতিহাসিক উপন্যাসের গঠনের পক্ষে অপরিহার্য। ঘটনার কাল যত দূরবর্তী যুগের হয় লেখকের পক্ষে ততই তা সুবিধাজনক; কারণ সে কাল সম্পর্কে পাঠকের ধারণা অসম্পূর্ণ এবং অস্বচ্ছ বলে লেখক সে কালকে অবলম্বন করে কল্পনাবিস্তারের সুযোগ পান বেশী। কিন্তু অস্পষ্ট অতীতের কাহিনী ভবিষ্যৎ পাঠকের কাছে বৈচিত্র্যহীন মনে হওয়ার সম্ভাবনা আছে। গবেষণার ফলে অতীত সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান যখন বৃদ্ধি পাবে তখন সে-সমস্ত কাহিনীকে অলীক বলে মনে হতে পারে।

কালনির্বাচন শেষ হলে অতীত যুগের জীবনধারা এবং ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করার প্রশ্ন ওঠে। পুরনো যুগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা বা ভাবসংঘাতের সঙ্গে পরিচয় লাভ করা এবং সামঞ্জস্য রক্ষা করে সে সমস্ত ভাব বা ঘটনাকে উপন্যাসের কাহিনীতে যথাযোগ্য স্থান দেওয়া যে কত কষ্টসাধ্য ব্যাপার, এ ধরনের কাহিনী যাঁরা রচনা করেন তা তাঁদের অজ্ঞাত নয়। যে নির্দিষ্ট কালের ঘটনা নিয়ে লেখক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় ব্রতী হন, সেই যুগের সম্ভাব্য সকল প্রকার ইতিহাসের উপকরণের সঙ্গে তিনি

পরিচিত হবেন। তারপর এই সংগৃহীত তথ্যপুঞ্জের ভিতর থেকে উপন্যাসের জন্য কোন্ ঘটনা গ্রহণীয় বা বর্জনীয় সে সম্পর্কে স্থির করবেন। সর্বশেষে ঐতিহাসিক ঘটনাপারম্পর্যের মধ্যে যেখানে তিনি কোন ফাঁক দেখতে পাবেন তাকে নিজ কল্পনা দিয়ে ভরাট করে তুলে লিখিত ইতিহাসকে সম্পূর্ণতা দান করবেন।

এ ছাড়া যে যুগের কাহিনীকে ভিত্তি করে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হয়, লেখককে পরিচিত হতে হবে সে যুগের পোশাক-পরিচ্ছদ, মুদ্রা, অপর রাজ্যের সমসাময়িক ইতিহাস, সমসাময়িক চিঠিপত্র, দৈনন্দিন লিপি, রাজকীয় পত্র, দলিলদস্তাবেজ, এমন কি চিকিৎসা সম্পর্কীয় বইয়ের সঙ্গে। সেই যুগের উদ্ভিদ ও কৃষি-বিজ্ঞানের সঙ্গেও তাঁর পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। এ ছাড়া ওই যুগের চিত্রশালা কিংবা প্রাচীন কীর্তির সংগ্রহশালা, কিংবা সেই যুগের মঠ মন্দির দুর্গ প্রভৃতি সব কিছুর সঙ্গে লেখক যত ঘনিষ্ঠ পরিচিতি লাভ করবেন ততই ঐতিহাসিক উপন্যাস বাস্তবধর্মী হয়ে উঠবে। এক কথায় যে যুগকে কেন্দ্র করে তিনি উপন্যাস লিখছেন, সেই যুগের সব কিছুর সঙ্গে যেন তাঁর মোটামুটি অন্তরঙ্গ পরিচয় থাকে।

সুদূর অতীতের যে স্থানিক পরিবেশকে কেন্দ্র করে ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিত হয় তার সঙ্গে লেখকের পরিচয় না থাকলেও সে অপরিচয় খুব বড় বাধারূপে দেখা দেয় না। কারণ, আমাদের সমকালেই এমন অনেক ধ্বংসপ্রায় প্রাচীন স্থান দেখা যায় যা আমাদের প্রাচীন স্থানগুলিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু উপন্যাসে প্রাচীন ব্যক্তিজীবনের সজীব রূপদান এত সহজসাধ্য কাজ নয়। কারণ, সে যুগের নরনারী আমাদের যুগের নরনারীর মত শরীরী জীব হলেও তাদের জীবনের গতি-প্রকৃতি ছিল আমাদের চাইতে আলাদা। সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস-লেখক হলেন তিনি যিনি বিগত যুগের নরনারীর চরিত্রের সঙ্গে নিজে একাত্ম অনুভব করেন। কিন্তু অনুভূতির প্রসারের সাহায্যে প্রাচীন যুগের মানুষের সঙ্গে একাত্মতা স্থাপন করলেও অতীত যুগের মৃত নরনারীকে উপন্যাসে সজীব করে তোলা এত সহজ কাজ নয়। কারণ, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল অদ্ভুত এবং এ যুগের চাইতে আলাদা। তাদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল এ যুগ থেকে পৃথক, পরিবেশ ছিল ভিন্নতর। তারা যে ভাষায় কথা বলত তা আমাদের কাছে অজ্ঞাত। যে আইনকানুনের দ্বারা তারা পরিচালিত হত তা এ-যুগের আইন-কানুন থেকে আলাদা। পৃথিবী এবং স্বর্গলোক সম্বন্ধে তাদের ধারণা ছিল এ-যুগের চাইতে পৃথক। যে ধরনের লোকের সঙ্গে আমরা নিত্যনিয়ত কথাবার্তা বলছি বা মিশছি তাদের সম্পর্কে লেখার চাইতে এই ধরণের অজ্ঞাত জীবন সম্বন্ধে লেখা কত কষ্টসাধ্য তা সহজেই অনুমেয়। তবে বিভিন্ন যুগের মানুষের জীবনে শত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সর্বযুগের মানবমনের একত্ব উপলব্ধিই ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিককে অনুপ্রাণিত করে বিস্মৃত অতীত জীবনের সজীব রূপদানে।

॥ চার ॥

ইতিহাসের ভুল ও ঐতিহাসিক উপন্যাস

ঐতিহাসিক উপন্যাসের কেন্দ্রস্থলে থাকবে ইতিহাসের বাস্তব ঘটনা। কল্পনাশ্রিত ঘটনাকে অবলম্বন করে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হলে সে উপন্যাস রূপকথার পর্যায়ে পর্যবসিত হবে—এ মন্তব্য পূর্বেই করা হয়েছে। কিন্তু যে ইতিহাসকে আশ্রয় করে লেখক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় অগ্রসর হন সে ইতিহাসই যদি ভুল তথ্যে পূর্ণ হয় তা হলে ঔপন্যাসিকের অবস্থা কি দাঁড়ায় এখন তাই হবে আমাদের বিবেচ্য। উপন্যাস রচনার প্রথম যুগে—কি পাশ্চাত্য দেশে কি আমাদের দেশে যে সমস্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হয়েছিল সেগুলিকে কল্পনামিশ্রিত রোমান্স বলে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা আমাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছে। কিন্তু বিচার করে দেখা দরকার, যে যুগে ওই সমস্ত ঔপন্যাসিক ইতিহাসাশ্রিত ঘটনা অবলম্বনে উপন্যাস লিখে এই বিভাগের সাহিত্যকে

জনপ্রিয় করে তোলেন তখন ইতিহাসের প্রকৃত রূপ ছিল কী?

আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সাহায্যে ইতিহাস লেখবার পদ্ধতি তখনও আবিষ্কৃত হয় নি। সেজন্য সে-যুগের ঔপন্যাসিককে আশ্রয় করতে হত সমকালীন ঐতিহাসিকদের ব্যক্তিগত ধারণানির্ভর ইতিহাসের কাহিনী। যে নেপোলিয়ান বোনাপার্টিকে সমস্ত পৃথিবীতে অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী বলে বিবেচনা করা হয়, তাঁর সম্পর্কেও বিভিন্ন ইতিহাসে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। কেউ তাঁকে বলেছেন একজন প্রচণ্ড প্রতিভাবান ব্যক্তি, কেউ বলেছেন তিনি ছিলেন একজন মাঝামাঝি ধরনের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ, আবার কেউ বলেছেন তাঁকে ভীরু। আমাদের দেশেরও ঐতিহাসিক মহলে প্রতাপ, রাজসিংহ, শিবাজী, ঔরঙ্গজেব প্রভৃতি চরিত্র সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা আছে দেখা যায়। মুসলমান ও ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা অনেক সময় স্বজাতিপ্রীতি ও স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত হয়ে মধ্যযুগের ইতিহাসের রূপ দিয়েছিলেন। ঔপন্যাসিকেরাও তাঁদের প্রয়োজনমত সেই বিকৃত ইতিহাসের আশ্রয়ে উপন্যাস রচনা করেছিলেন। ফলে তাঁদের উপন্যাসে ইতিহাসের বহু প্রমাদপূর্ণ ঘটনা যে আত্মপ্রকাশ করবে তাতে আর বিচিত্র কী?

বাংলা উপন্যাসের প্রথম যুগে সার্ ওয়াল্টার স্কটের প্রতিভামুগ্ধ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের বরাবরই ইচ্ছা ছিল ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করে খ্যাতিমান হবেন। তাঁর কয়েকখানি সামাজিক ও গার্হস্থ্য উপন্যাস বাদ দিলে দেখা যায়, তিনি তাঁর সমস্ত উপন্যাস ঐতিহাসিক ঘটনার আশ্রয়ে রচনা করেছিলেন। কিন্তু 'রাজসিংহ' ছাড়া আর কোন উপন্যাসকে তিনি নিজেও ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেন নি। তার প্রধান কারণ নিশ্চয়ই এই যে সেই সমস্ত উপন্যাসের ঘটনা তাঁর নিকট কল্পনারঞ্জিত মনে হয়েছিল। মুসলমান ঐতিহাসিকদের রচনাকে তিনি নির্ভরযোগ্য মনে করেন নি। তাঁর মতে মুসলমান ঐতিহাসিকেরা একদেশদর্শী এবং হিন্দুদের প্রতি বিদ্বিষ্ট। সেজন্য 'রাজসিংহ' রচনায় বঙ্কিম মুখ্যতঃ গ্রহণ করেছিলেন বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের ইতিবৃত্ত। কিন্তু সে ইতিবৃত্ত যে প্রমাদশূন্য ছিল তার সাক্ষ্য দেবে কে? বস্তুতঃপক্ষে বঙ্কিমের এত সতর্কতা সত্ত্বেও 'রাজসিংহ' উপন্যাসে যে অনেক অনৈতিহাসিক ঘটনা আত্মপ্রকাশ করেছে তার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন আচার্য যদুনাথ সরকার এবং ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত। এ-ছাড়া হিন্দুর বাহুবল প্রতিপন্ন করার যে সচেতন উদ্দেশ্য নিয়ে বঙ্কিম 'রাজসিংহ' কাহিনী রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন সে উদ্দেশ্য তাঁর নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকে করেছিল খণ্ডিত।

এ অবস্থায় আধুনিক সমালোচক 'রাজসিংহ' উপন্যাসকে প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাসের মর্যাদা দিতে না পারলে তাতে ক্ষুণ্ণ হবার কারণ নেই। বঙ্কিমযুগে রমেশচন্দ্র দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কিংবা রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক দৃষ্টি একনিষ্ঠ হলেও যে ঐতিহাসিক ঘটনার আশ্রয়ে তাঁদের উপন্যাস রচিত হয়েছিল সে সমস্ত ঘটনার অভ্রান্ততার প্রমাণ কি? বরং পরবর্তী যুগের ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস ইতিহাসানুগত্যের জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। তার কারণ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সাহায্যে বাংলাদেশের ইতিহাস পুনর্গঠনের কাজে তিনি যেমন অসাধারণ নৈপুণ্য অর্জন করেছিলেন, উপন্যাসে ইতিহাসের ঘটনাবিন্যাসে সে একই নৈপুণ্য প্রদর্শিত হয়েছে। সাম্প্রতিককালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, প্রমথনাথ বিশী, বিমল মিত্র প্রভৃতি খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক এবং রমাপদ চৌধুরী, মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য প্রভৃতি অনেক উদীয়মান কথাসাহিত্যিক চমকপ্রদ ঐতিহাসিক ঘটনার আশ্রয়ে উপন্যাস রচনা করে তরল প্রেমনির্ভর বাংলা উপন্যাস-জগতে বৈচিত্র্য আনয়ন করেছেন। কিন্তু তাঁদের উপন্যাসের বর্ণিত ঘটনা ঐতিহাসিকতার দিক দিয়ে কতটা নির্ভরযোগ্য তা পরীক্ষাসাপেক্ষ।

আসলে ঐতিহাসিক উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনার ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে বাস্তব পরিস্থিতি হল এই যে,

যদি চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে উপস্থিত করা হয়, তা হলে বিচারহীন পাঠক লেখক-বর্ণিত যে কোন ঘটনাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। উপন্যাসের যে কাহিনী পাঠকের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে, মনে নেশা ধরিয়ে দেয়, সে কাহিনী সত্য কি মিথ্যা তা সতর্কভাবে পরীক্ষা করবার অবকাশ পাঠক পায় না। অপরপক্ষে এ প্রশ্নও ওঠে, প্রাচীন ঐতিহাসিকেরা যে ইতিহাস রচনা করেছিলেন সে কি সত্যিকারের ইতিহাস? যে ইতিহাসে সাধারণ মানুষের জীবন উপেক্ষিত, শুধুমাত্র রাজরাজড়াদের জীবনের উত্থান-পতনের কাহিনী যে ইতিহাসকে ভারাক্রান্ত করে সে ইতিহাস আংশিক ইতিহাস, পূর্ণ ইতিহাস নয়। ভিক্টর হুগো সেজন্য রোমান্সকে ইতিহাসের উপর প্রাধান্য দিয়েছিলেন। কারণ ইতিহাসে যে সত্যের প্রকাশ তা খণ্ডিত, আর রোমান্সে যে সত্যের ব্যঞ্জনা ঘটে তা হল নৈতিক সত্য। আনাতোল ফ্রাঁসও বলেছেন, ইতিহাস রচনা হল একটা আর্ট, এবং যে ইতিহাসে কল্পনাবিস্তার আছে সে ইতিহাসের উৎকর্ষ অবশ্যস্বীকার্য। 'ওয়েভারলি' নভেলের অসম্ভাবিত সার্থকতা দেখে মেকলেও বলেছিলেন, ইতিহাসের কাজ হল প্রাচীন যুগের ব্যক্তিত্ব ও পরিবেশকে জীবন্তভাবে বর্তমান যুগের পাঠকের সামনে উপস্থিত করা, এবং ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকই ইতিহাসের সে দাবি পূর্ণ করেছেন। স্বীয় যুগের ইতিহাসের উৎকর্ষ বিচার-প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, যাকে প্রকৃতপ্রস্তাবে ইতিহাস বলা চলে তা আমাদের দেশে বর্তমানে নেই। ইতিহাসের নামে যা আমাদের দেশে প্রচলিত তাকে বলা চলে ঐতিহাসিক রোমান্স। অবশ্য মেকলের এই মন্তব্য বর্তমান ইতিহাস সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। কারণ বর্তমান যুগে অনেক ভাল ইতিহাস লিখিত হয়েছে। এ যুগের বিখ্যাত ঐতিহাসিক-উপন্যাসের সমালোচক এ. টি. শেপার্ড অবশ্য মনে করেন, ইতিহাস যত নির্ভুল হবে ঐতিহাসিক উপন্যাসের উৎকর্ষও তত বাড়বে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ কথাও বলেছেন, নিরামিষাশী ব্যক্তি মাংসবর্জিত নির্দোষ নিরামিষ আহারের সময় নিজের অজ্ঞাতে যেমন অনেক সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা খেয়ে ফেলেন, তেমনি ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি গভীর অনুরাগসত্ত্বেও ইতিহাস-লেখক নিজের অজ্ঞাতে এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও বহু কাল্পনিক কাহিনীকেও ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করেন।

উল্লেখ্য ইংরাজ ঐতিহাসিক সম্পর্কে যদি এ মন্তব্য সত্য হয়, ভারতবর্ষের ঐতিহাসিকদের সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য আরও অধিকতর সত্য। অতএব কাল্পনিক কাহিনী-আশ্রিত ইতিহাস অবলম্বনে উপন্যাস রচনা করায় বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসে বহু দুর্বলতা আত্মপ্রকাশ করা বিচিত্র নয়। কিন্তু কল্পনাশ্রয় সত্ত্বেও ইতিহাসের উৎকর্ষ যদি স্বীকৃত হয় তা হলে ঐতিহাসিক উপন্যাসের উৎকর্ষ স্বীকৃত হবে না কেন?

এ হল ঐতিহাসিক উপন্যাসের উৎকর্ষ বিচার-প্রসঙ্গে বাস্তব অবস্থার কথা। কিন্তু বাস্তব আর আদর্শ এক বস্তু নয়। যে কল্পনাপ্রবণ লেখক ইতিহাসকে উপন্যাসের পটভূমিকা হিসাবে গ্রহণ করেন ঐতিহাসিক আবহ সৃষ্টিতে তিনি যতই স্বাধীন কল্পনার পরিচয় দিন না কেন, ঘটনা উপস্থাপনে ঐতিহাসিক সত্য থেকে বিচ্যুত হবার তাঁর কোন স্বাধীনতা নেই। এই শ্রেণীর উপন্যাসে ঐতিহাসিক ঘটনা যত যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় ততই উপন্যাসের উৎকর্ষ বাড়ে, এ মন্তব্য আগেও করা হয়েছে। শুধুমাত্র প্লটের খাতিরে ছাড়া কালানুক্রম (chronology) সম্বন্ধে কোন রকম গোলযোগ সৃষ্টি করা তাঁর উচিত নয়। যেখানে লেখক কাল সম্পর্কে সুনিশ্চিত নন, সেখানে শুধু কয়েকটি ঘণ্টা বা দিনের উপস্থাপনে কিছু ভুল হতে পারে। কিন্তু ইতিহাসের বড় বড় ঘটনাকে ভিন্নতর রূপে উপস্থিত করবার কোন স্বাধীনতাই ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের নেই। একটু বিশ্লেষণ করে পড়লেই দেখা যায় পৃথিবীর বড় বড় ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকেরা ইতিহাসের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা করেই এই শ্রেণীর উপন্যাস রচনায় স্থায়ী যশ অর্জন করেছেন।

কালানুক্রমের যথাযথ অনুসরণ ছাড়াও আরও দুটি বিষয়ে ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিককে সতর্ক হতে হবে:

প্রথমতঃ, যে যুগের আইনের ব্যবহার কিংবা ঔষধের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে লেখক উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিচ্ছেন তা যেন সত্যনির্ভর হয়। কারণ এই দুটি বিষয়ের উপর উপন্যাসের ঘটনাগতি অনেক সময় আবর্তিত হয়। সেজন্য এই দুটি বিষয় যদি বাস্তবতাবর্জিত হয় তা হলে সেই উপন্যাস কাল্পনিক রূপকথায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। সর্প-দংশনে মৃত মোবারককে বনৌষধির সাহায্যে মানিকলাল পুনরুজ্জীবিত করল—এই ঘটনা আপাতদৃষ্টিতে ক্ষুদ্র মনে হলেও 'রাজসিংহ' উপন্যাসের ঘটনা নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। গুপ্তচরের মুখে খবর শুনে শাসনকার্য-ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রকাশ্য আইনের পর্যায়ে না পড়লেও সাম্রাজ্য পরিচালনায় মোগল সম্রাটেরা বিশেষতঃ সম্রাট ঔরঙ্গজেব এই উপায় অবলম্বন করতেন, কিংবা আইন প্রণয়ন করে সম্রাট ঔরঙ্গজেব হিন্দুদের কাছ থেকে বিশেষ কর আদায় করতেন—একটা বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তা হয়েও উক্ত সম্রাটের সন্দেহপ্রবণতা এবং প্রজা-পক্ষপাত মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হয়েছিল। এই ঐতিহাসিক সত্যের উপর ভিত্তি করেই বঙ্কিমচন্দ্র 'রাজসিংহ' উপন্যাসে একজন ক্ষুদ্র সামন্তরাজার কাছে প্রবলপ্রতাপান্বিত সম্রাট ঔরঙ্গজেবের শোচনীয় পরাজয়-কাহিনী বর্ণনা করেছেন। ঔরঙ্গজেব-প্রবর্তিত আইনের এই ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া যদি ইতিহাস-সমর্থিত না হত, তা হলে 'রাজসিংহ' ঐতিহাসিক উপন্যাসের কোঠা থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্যুত হয়ে নিছক কল্পনাপ্রধান রোমান্টিক কাহিনীতে পর্যবসিত হত।

ইতিহাসের রাজ্যে কাল্পনিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরিত্র বা কাল্পনিক কথোপকথনের অনুপ্রবেশ অবাঞ্ছিত। এমন কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার তারিখের অদল-বদলও ঐতিহাসিকের অনভিপ্রেত। কিন্তু ক্ষুদ্র চরিত্রের এবং কাল্পনিক কথোপকথনের বর্ণনায় এবং ক্ষুদ্র ঘটনার তারিখকে আবশ্যকমত পরিবর্তনেও সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা সম্ভব। ইতিহাসের সত্যকে যিনি এভাবে গ্রহণ-বর্জনের ভিতর দিয়ে উপন্যাসে রূপ দিতে পারবেন ঐতিহাসিক উপন্যাসের জগতে একমাত্র তিনিই স্থায়ী যশের অধিকারী হবেন।

॥ পাঁচ ॥

ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংলাপ ও ভাষা

বিগত ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হবে এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ইতিহাসের চরিত্রগুলি যে ভাষায় কথা বলত সে ভাষায় উপন্যাসের সংলাপ রচিত হলে কী ভয়াবহ ব্যাপার দাঁড়াবে তা সহজেই অনুমেয়। বৈদিক যুগ, উপনিষদের যুগ, পুরাণের যুগ কিংবা তৎপরবর্তী হিন্দুযুগের কথা বলছি না, মধ্যযুগের ইতিহাসোল্লিখিত মুসলমান যুগের নরনারীরা যে ভাষায় কথা বলতেন সে ভাষা যদি সে যুগের নায়ক-নায়িকার মুখে বসিয়ে দেওয়া যায় তা হলে সে ঐতিহাসিক উপন্যাস স্বভাব-অনুযায়ী হলেও আধুনিক কজন পাঠকের বোধগম্য হবে?

তা হলে প্রশ্ন ওঠে, সংলাপ-রচনায় লেখক কোন্ পথে অগ্রসর হবেন? বিগত যুগের অবোধ্য ভাষা ব্যবহার করে তিনি কি সংলাপকে স্বাভাবিক করবার চেষ্টা করবেন, না সে যুগের নরনারীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের ভাব আবেগ বেদনা এবং আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করবেন আধুনিক ভাষায়। ঐতিহাসিক উপন্যাসের মর্মজ্ঞরা বলেন, এই শ্রেণীর উপন্যাসে অতীত জীবনকে সজীব রূপ দেবার অভিপ্রায়ে লেখক যদি সে যুগের নরনারীর মুখে দুর্বোধ্য প্রাচীন ভাষা বসিয়ে দেন তা হলে সে উপন্যাস আধুনিক পাঠকের কাছে হবে অপাঠ্য। সেজন্য ঐতিহাসিক উপন্যাসে প্রাচীন পরিবেশ এবং বাস্তবতা সঞ্চারের জন্য শুধুমাত্র মাঝে মাঝে তিনি ইতিহাসোল্লিখিত যুগের সংলাপের ভাষা ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু সংলাপে প্রাচীন ভাষা ব্যবহারে তিনি যদি মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন তা হলে সে উপন্যাস আবেদন-সৃষ্টির দিক দিয়ে ব্যর্থ হবে।

সংলাপ রচনায় লেখককে আরও একটি দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। উপন্যাসে যে যুগের নরনারীর জীবনকে আশ্রয় করে লেখক শিল্পসৃষ্টির প্রয়াস পান, সেই নর-নারীর কথাবার্তায় যদি তিনি এমন সব বিষয়ের অবতারণা করেন যাতে মনে হয় তারা আধুনিক সিনেমার নায়ক-নায়িকা বা ভাবীযুগের নরনারী, তা হলেও সে উপন্যাস ব্যর্থ হতে বাধ্য। অর্থাৎ সংলাপ রচনায় ঐতিহাসিক-ঔপন্যাসিক যদি যুগ-সচেতন না হন তা হলে সে উপন্যাস স্বাভাবিকতাবর্জিত কাল্পনিক কাহিনীতে পরিণত হবে।

উপন্যাসে উল্লিখিত যুগের কথ্যভাষা ব্যবহারে লেখকের সতর্কতা অবলম্বন আরও বেশী প্রয়োজনীয়। এটা অবশ্য-স্বীকার্য, অশিক্ষিত ইতরজনের অমার্জিত ভাষা ব্যবহারের সাহায্যে লেখক সুকৌশলে একটা স্থানের বা কালের ইঙ্গিত দিতে পারেন। কিন্তু এ ধরনের দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার যদি উপন্যাসে প্রাধান্য লাভ করে তা হলে সে উপন্যাস যে পাঠকের কাছে অপাঠ্য বিবেচিত হবে তা সহজেই অনুমেয়। সেজন্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিশেষজ্ঞরা বলেন, এ ধরনের ভাষা ব্যবহারে ঐতিহাসিক-ঔপন্যাসিক 'must aim at suggestion rather than reproduction.' প্রাচীন কথ্যভাষার সঙ্গে একটু পরিচিত হলে সে স্বল্পজ্ঞানকে পাঠকসমাজে জাহির করবার জন্যে অবশ্য লেখকের ঝোঁক চাপে। সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার জন্য লেখকের এরূপ প্রবণতা সর্বদা বর্জনীয়।

॥ ছয় ॥

চরিত্রসৃষ্টি : উপন্যাসের নামকরণ

আমাদের জীবন-পরিবেশে যে সব মানুষের সঙ্গে আমাদের নিত্য পরিচয় ঘটে, সে সব মানুষের ভিতর থেকে ঔপন্যাসিক সামাজিক উপন্যাসে তাঁদের চরিত্র নির্বাচন করেন। কিন্তু ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক যে চরিত্রগুলি বিকাশের জন্য সযত্ন হন, সে সমস্ত চরিত্র পাঠকের বাস্তব-অভিজ্ঞতা বহির্ভূত। একটা কথা সমালোচক-মহলে প্রচলিত আছে, ইতিহাসের বৃহৎ ঘটনার রূপদান-প্রচেষ্টা যেমন সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস-সৃষ্টির প্রতিকূল, তেমনই ইতিহাসের স্মরণীয় চরিত্রের অবতারণাও উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক উপন্যাস-সৃষ্টির পক্ষে অপরিহার্য নয়। কিন্তু এই প্রচলিত ধারণা সমর্থনযোগ্য বলে মনে হয় না। ইতিহাসের বৃহৎ চরিত্রের সাহায্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস-সৃষ্টিপ্রচেষ্টা যদি ভ্রমাত্মক বলে বিবেচিত হয় তা হলে স্কট থেকে শুরু করে বহু খ্যাতনামা ঔপন্যাসিকই ভুল করেছেন বলতে হবে। ইতিহাসের বর্ণনা পড়ে কিংবা বহু-প্রচলিত ধারণা থেকে যে সমস্ত চরিত্র পাঠকের মনে মুদ্রিত থাকে, সে সমস্ত চরিত্রের আশ্রয়ে সার্থক উপন্যাস রচনা করা কষ্টকর সন্দেহ নেই, কারণ যে মুহূর্তে তিনি সে চরিত্রের সজীব রূপদানের উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক বর্ণনা বা প্রচলিত ধারণাতীত কোন ঘটনা বা চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য কল্পনার সাহায্যে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেন সে মুহূর্তেই পাঠকের কাছে তা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমের 'রাজসিংহ' উপন্যাসের ঔরঙ্গজেব-চরিত্র স্মরণীয়। প্রচণ্ড হিন্দুবিদ্বেষী, সন্দেহপরায়ণ, ক্রূর প্রকৃতির ঔরঙ্গজেবের পক্ষে একটি সামান্য রাজপুত নারীর প্রতি মোহমুগ্ধ অনুরাগ ইতিহাস-সমর্থিত নয়; কিন্তু এই মানবিক স্পর্শের অবতারণায় মানবচরিত্রাভিজ্ঞ বঙ্কিম ঔরঙ্গজেব-চরিত্রের যে সজীব রূপ দিয়েছেন বাস্তব ইতিহাসের অনুস্মৃতির সাহায্যে তা সম্ভব হত না নিশ্চয়ই।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের শিল্পকৌশল সম্পর্কে সার্থক আলোচনা করেছিলেন E. B. Osborn নামক লেখক ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের (২৩শে এপ্রিল) 'মর্নিং-পোস্ট' পত্রিকায়। সে প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, চরিত্রসৃষ্টিতে, সংলাপসৃষ্টিতে বা ঘটনার অবতারণায় ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক মৌলিক কল্পনার পরিচয় দিতে পারেন সত্য, কিন্তু যে যুগের পটভূমিকায় তিনি কাল্পনিক চরিত্র সংলাপ বা ঘটনা সৃষ্টি

করবেন তা যেন সে যুগ-প্রবৃত্তি অনুযায়ী হয়। ছোটখাটো ব্যাপারে কাল্পনিকতার আশ্রয় গ্রহণ করলেও ঐতিহাসিক চরিত্রের বিকৃতিসাধনের অধিকার অবশ্য লেখকের নেই। কালানুক্রম অনুসরণে স্বাধীনতা প্রদর্শনও তাঁর অধিকার-বহির্ভূত। এ ছাড়া অতীতের বৃহৎ তাৎপর্যময় ঘটনার পরিবর্তন সাধনেও তাঁর কোন স্বাধীনতা নেই। আধুনিক ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের কর্তব্য নির্ধারণ প্রসঙ্গে ওসবর্ন আরও বলেছেন, "The modern novelist is expected to give historical personages fair play, not to accept every picturesque label and to be content with melodramatic convention which classes them as sheep or goats."

ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের সুবিধা এই যে তিনি কাল্পনিক চরিত্রকে জীবিতের পোশাক পরিয়ে শুধু যে তাদের মুখে কথাবার্তা জুড়ে দিতে পারেন তা নয়, তাদের সচলও করে তুলতে পারেন। ঐতিহাসিকের কিন্তু এই স্বাধীনতা নেই। 'রাজসিংহ' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র কাল্পনিক চরিত্র মানিকলালকে, কিংবা 'কেরী সাহেবের মুন্সী'র লেখক রেশমীকে যে ভাবে মুখর ও সক্রিয় করে তুলেছেন ঐতিহাসিকের পক্ষে তা সম্ভব হত না। ঐতিহাসিক এরূপ অজ্ঞাত চরিত্রের রূপ যে ইতিহাসে ফুটিয়ে না তোলেন তা নয়, কিন্তু সে রূপ তিনি অস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলেন সমষ্টিচিত্রের মধ্যে—ঔপন্যাসিকের মত কাল্পনিক চরিত্রের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বপ্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়ে নয়। এ ছাড়া ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক সুকৌশলে নির্বাক জনতাকেও যে ভাবে সক্রিয় ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন করে তুলতে পারেন ঐতিহাসিকের পক্ষে তা কখনও সম্ভব হয় না। বাস্তবিক-পক্ষে ঐতিহাসিক উপন্যাসকে চিত্তাকর্ষক করে তুলতে হলে কাল্পনিক চরিত্রের অবতারণা অপরিহার্য। স্মরণীয় ইংরাজ ঔপন্যাসিক স্কট তাঁর সার্থক উপন্যাসগুলিতে সুপরিচিত ঐতিহাসিক চরিত্রের অবতারণা করলেও এটা খুবই উল্লেখযোগ্য যে তাঁর উপন্যাসের নায়ক বা নায়িকা সাধারণতঃ কতকগুলি কাল্পনিক চরিত্র। গত যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাজসিংহে' বা এ যুগের বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস 'কেরী সাহেবের মুন্সী'তে যে চরিত্র অত্যন্ত সজীব—সে চরিত্র ঐতিহাসিক নয়, কাল্পনিক।

ইতিহাসে আমরা যে ব্যক্তিপরিচয় পাই তার ভিতর তার অন্তর্নিহিত প্রকৃতির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু ঔপন্যাসিক হলেন মানবজীবনের রহস্য-সন্ধানী। সেজন্য অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে আলোকিত করে তোলেন তিনি ঐতিহাসিক চরিত্রের অন্তর্লোক। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব ক্রুর, কপট, খল এবং বিদ্বেষপরায়ণ। হিন্দু-সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর তিনি নানাভাবে আঘাত হেনেছেন। সেজন্য তাঁর প্রতি মনীষী বঙ্কিমের বীতস্পৃহার অন্ত নেই। কিন্তু তাঁর নিষ্ঠুর প্রকৃতি এবং কঠোর হৃদয়ের অন্তরালে যে প্রেম-বুভুক্ষু একটা সজীব মানবিকসত্তা বিদ্যমান ছিল সে আবিষ্কার শিল্পী বঙ্কিমের। কিংবা কেরী সাহেবের মুন্সী রামবসুর মনে রেশমীর সৌন্দর্যমুগ্ধ রোমান্স-বিলাস একান্তভাবে ঔপন্যাসিকের মানস-পরিমণ্ডলে সৃষ্ট ঘটনা। যে রামবসুকে আমরা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখতে পাই সে রামবসু তাঁর থেকে ভিন্নতর মানুষ। শিল্পী তাঁর সহৃদয় হৃদয়ানুভবের সাহায্যে গ্রন্থপণ্ডিত রামবসুকে সৃষ্টি করেছেন একই সঙ্গে রোমান্স ও বাস্তবপ্রিয় এ যুগের মানুষ হিসাবে।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের নামকরণ প্রসঙ্গ ইতিপূর্বেও একটু আলোচিত হয়েছে—আর একটু আলোচনার পর এই প্রসঙ্গের সমাপ্তিরেখা টানা যেতে পারে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের বহু সমালোচক এই মত প্রকাশ করেছেন, উপন্যাসের প্রধান নায়কের নামে উপন্যাসের নামকরণ করা সর্বোত্তম। এই উপায় অবলম্বন করেছিলেন চার্লস্ ডিকেন্স তাঁর David Copperfield, Oliver Twist, Nicholas Nickleby, Edwin Drood,

Pickwick Papers প্রভৃতি উপন্যাসে। স্কট এবং তাঁর ভাবশিষ্য বঙ্কিমও নায়কের নামে উপন্যাসের নামকরণ করতে ভালবাসতেন। কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাসের নামকরণ চমকপ্রদ চিত্তাকর্ষক এবং ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধও হতে পারে। বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের এরূপ ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ নামকরণ করেছিলেন সর্বপ্রথমে রমেশচন্দ্র দত্ত 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত', 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা', 'মাধবীকঙ্কন' প্রভৃতি উপন্যাসে। এ যুগেও কোন কোন ঔপন্যাসিক ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ নাম ব্যবহার করে ঐতিহাসিক উপন্যাসকে জনপ্রিয় করবার প্রয়াস পেয়েছেন।

ব্যঞ্জনাময় উদ্ধৃতির সাহায্যেও অনেকে বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছেন। মিসেস স্টীলের 'On the Face of the Waters,' রাফায়েল স্যাবাটিনির 'The Tavern Night', মার্জরী বাওয়েনের 'I will maintain' প্রভৃতি এ-ধরনের উপন্যাসের দৃষ্টান্ত। এ ভাবে উপন্যাসের নামকরণ বিভিন্ন ঔপন্যাসিকের রুচি অনুযায়ী আরও বিভিন্ন রকমের হতে পারে।

উপসংহারে শুধু এ কথা বলা যায় বর্তমান বাস্তবতা-প্রধান মনস্তত্ত্বনির্ভর বাংলা উপন্যাস-জগতে ঐতিহাসিক উপন্যাসের পুনরাবির্ভাব একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা নয়। বরং ইতিহাসের মুক্ত হাওয়ায় রচিত এই শ্রেণীর উপন্যাসে বাঙালী পাঠক এক নতুন স্বাদের সন্ধান পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথই ছিলেন প্রথম ঔপন্যাসিক যিনি সর্বপ্রথমে ব্যক্তিমন সমাজমন ও বিশ্বমনের গভীরে প্রবেশ করে বাংলা উপন্যাসের সীমাবদ্ধ আকাশে নতুন দিগন্তের সন্ধান দেন। তাঁর সমসাময়িক শরৎচন্দ্রের রচনায় নতুন সমাজচিন্তার আশ্রয়ে বাংলা উপন্যাস অভিনব তাৎপর্য অর্জন করে। শরৎচন্দ্রের সমকালেই এ শতাব্দীর উত্তর-তিরিশের এক শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের রচনায় মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের নামে উৎকট বাস্তববিলাস প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল। চতুর্থ ও পঞ্চম দশকে অবশ্য কোন কোন লেখকের রচনায় নবতর সমাজচিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এই শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের সংখ্যা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। সাম্প্রতিক কালে অধিকাংশ ঔপন্যাসিকের রচনার বিষয়বস্তু ব্যক্তিমননির্ভর। সমাজ-চিন্তার বন্ধুর পথে বিচরণ করবার শক্তি সামর্থ্য বা রুচি মননহীন বহু লেখকেরই নেই। ফলে বেশির ভাগ সাম্প্রতিক সামাজিক উপন্যাস (?) রুচিশীল পাঠকের কাছে মূল্যহীন ও একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। এ অবস্থায় ইতিহাসের ছত্রচ্ছায়ায় রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস আজ কৌতূহলী পাঠকের নিকট আবার জনপ্রিয় হতে চলেছে।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের পুনরাবির্ভাব ও জনপ্রিয়তার মূলে আরও একটি গুরুতর কারণ বর্তমান। আধুনিক বিজ্ঞান বিশ্লেষণী শক্তির সাহায্যে মানুষের সৌন্দর্যস্বপ্নকে তীব্রভাবে আঘাত করেছে। অথচ বাস্তব দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ চিরকালই অবকাশের স্বপ্ন রচনায় আনন্দ পায়। এ যুগের বিজ্ঞান দস্যুর মত মানুষের সেই অবকাশের স্বপ্ন লুণ্ঠন করায় মানুষ আজ পুনরায় ব্যাপৃত হয়েছে অতীত জীবনরাজ্য থেকে সেই বিনষ্ট স্বপ্নসম্পদ পুনরুদ্ধারের কার্যে। আধুনিক রুচিশীল লেখক ও পাঠক মহলে ঐতিহাসিক উপন্যাসের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ হল এই।

শেষটা বোঝা গেল না

ভুপেন্দ্রমোহন সরকার

১৯৬৩—

নিখিল ভারত ছাত্রসংস্থার পশ্চিমবঙ্গ শাখার কেন্দ্রীয় অফিস। সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতির খাসকামরায় টেবিলের কেন্দ্রীয় আসনে সভাপতি স্বয়ং। তাঁর দু পাশে দুজন করে চারজন সম্পাদক-সদস্য। সমকোণে এক পাশে আছেন মহিলা-সম্পাদক।

বয়স সকলেরই আঠারো থেকে একুশের মধ্যে। গোঁফের রেখা স্পষ্ট হলেও দাড়ি এখনও কামানোর মত হয় নি।

সভাপতি সুইচ টিপতেই প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক বেয়ারা প্রবেশ করল।

সভাপতি টেবিলের ওপর ওজন চাপা দেওয়া কাগজের একটা টুকরো তুলে বেয়ারার হাতে দিয়ে বললেন, বোলাও।

বেয়ারার সঙ্গে দুজন পঞ্চাশোর্ধ্ব ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করে নমস্কার করলেন।

সভাপতির গম্ভীর ইঙ্গিতে ভদ্রলোক দুজন বসলেন।

বলুন।—সভাপতি যেন আদেশ করলেন।

একজন মাথা চুলকে বললেন, আমরা একটা দরখাস্ত করেছিলাম। তার কোন জবাব পাই নি।

সভাপতি বলে উঠলেন, জবাব পাবেন না। আমরা নির্দেশ জারি করেছি। নিশ্চয় জানতে পেরেছেন।

দ্বিতীয় আমতা আমতা করে বললেন, হ্যাঁ, সেইজন্যেই আমরা পুনর্বিবেচনার অনুরোধ করতে চাই।

প্রথম যোগ করে দিলেন: আমরা দরিদ্র অধ্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি।

উপায় নেই।—সভাপতি বললেন, আপনারা অনেককাল ছাত্রদের ওপর অত্যাচার করেছেন। প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। ছাত্ররা চেয়ার টেবিল ভেঙেছে ঠিকই। কিন্তু সংবাদপত্রে সকলেই আপনাদের বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছে। আপনারা প্রশ্নপত্রেই আপনাদের সমস্ত পাণ্ডিত্য প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন, পড়ানোর ব্যাপারে কিছু করেন নি বা পড়ানো হয়েছে কিনা কোন চিন্তা করেন নি কোনদিন। ছাত্রদের পরীক্ষা নিতে চান নি, ঠকাতে চেয়েছেন। আপনারা প্রশ্নপত্র রচনার অযোগ্য প্রমাণিত হয়েছেন। কাজেই প্রশ্নপত্র এখন থেকে ছাত্ররাই রচনা করবে এ নির্দেশ আমাদের অপরিবর্তনীয়।

মহিলা-সম্পাদক বললেন, আপনারা কি ভুলে গেছেন এই প্রশ্নপত্র রচনার অধিকার অর্জন করতে আমাদের তিনটে শহীদ আর তিনশো জখম হয়েছে?

প্রথম অধ্যাপক বললেন, না, ভুলি নি। আমরা অধ্যাপকদের তরফ থেকে একটা অনুরোধ জানাতে এসেছিলাম। আমাদের আর্থিক ক্ষতির কথা যদি আপনারা একটু বিবেচনা করেন এই আশায়।

সভাপতি বললেন, উপায় নেই। আচ্ছা, আমাদের অনেক কাজ আছে।

অধ্যাপকদ্বয় নমস্কার করে উঠে চলে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে চারজনই প্রায় লাফিয়ে উঠে পড়লেন। মেয়েটির উঠতে ওদের চেয়ে একটু বেশী সময় লাগল। কিন্তু উঠলেন তিনিও।

সভাপতি টেবিলের এক কোণে চেপে বসে অধীর কণ্ঠে বলে উঠলেন, আর সময় নেই, আমাদের পরবর্তী আন্দোলনের প্রস্তুতি দরকার। ভাইসচ্যান্সেলারের পদচ্যুতি চাই, আর ভাইসচ্যান্সেলার নির্বাচন অথবা নিয়োগের ক্ষমতা চাই।

সদস্যগণ সমস্বরে চিৎকার করে উঠলেন, চমৎকার দাবি।

প্রথম সম্পাদক বললেন, প্রথম দিনের বিক্ষোভে আমার মনে হয় অন্তত: পাঁচ হাজার দরকার হবে।

মহিলা-সম্পাদক বললেন, আমার মনে হয় প্রথম

দিনেই দশ হাজার ব্যবস্থা করলে একদিনেই মীমাংসা হয়ে যাবে। . .

সভাপতি বললেন, না, তা ভাল হবে না। প্রথম দিনে পাঁচ হাজার থাক্‌। দ্বিতীয় দিন দশ। তারপরেও দরকার হলে তৃতীয় দিনে ত্রিশ হাজার ছেড়ে দেব। তবে আমরা আশা করছি এই সামান্য দাবির জন্যে তিন দিনের বিক্ষোভ দরকার হবে না। ওরা এবার বিলম্ব করতে সাহস পাবে না।

এক মাস পরে—

সম্পাদকমণ্ডলী সভাপতিসহ পূর্ববৎ আসীন।

ষাট বৎসর বয়স্ক ভদ্রলোক একজন প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করেই নমস্কার করলেন। তারপর বসলেন। বললেন, আমিই আপনাদের আন্দোলনের ফলে পদচ্যুত ভাইসচ্যান্সেলার। আপনারা কি ছাত্রদের ভেতর থেকেই ভাইসচ্যান্সেলার নিযুক্ত করবেন?

কেন, আপনি কি বলতে চান?—সভাপতি কিছু ভ্রূকুটি করে বললেন।

যদি বাইরে থেকে নেন তবে আমি একজন প্রার্থী হিসেবে দরখাস্ত রেখে যেতে চাই। আর, ব্যক্তিগতভাবে আমার কোন দোষ ছিল না সেই সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আমার লিখে এনেছি।

রেখে যান।

ভদ্রলোক পকেট থেকে বার করে দরখাস্তখানার সঙ্গে লিখিত বক্তব্য পেশ করলেন।

সভাপতি বললেন, যথাসময়ে জানতে পারবেন। আচ্ছা—আমাদের সময় কম।

ভদ্রলোক নমস্কার করে বেরিয়ে গেলেন।

১৯৬৩—

সভাপতি বললেন, মুখ্যমন্ত্রীর পদচ্যুতির দাবির আন্দোলন আমাদের অবিলম্বে আরম্ভ করা দরকার।

প্রথম দিনেই দশ হাজার ছাড়তে হবে।—টেবিলে ঘুষি মেরে একজন বললেন।

দ্বিতীয় দিনে ত্রিশ।—আর একজন।

তৃতীয় দিনে পঞ্চাশ হাজার, বাস্‌।—বললেন সভাপতি।

দু সপ্তাহ পরে—

পঁয়ষট্টি বৎসর বয়স্ক এক ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করেই নমস্কার করলেন। তারপর বসলেন। বললেন, রাজ্যপাল নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করবার জন্যে আমাকে আহ্বান করেছেন। কিন্তু তার আগে আমি আপনাদের সমর্থন আশা করি।

সভাপতি বললেন, আমাদের আলোচনা চলছে। সম্ভবতঃ আপনাকে আমরা সমর্থন করব। কিন্তু কয়েকটা শর্ত থাকবে।

কী শর্ত জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

কাল সকাল আটটার মধ্যে জানাব। একটা শর্ত এখনই আপনাকে জানিয়ে দিতে পারি—পদচ্যুত মুখ্যমন্ত্রীকে কোনক্রমেই মন্ত্রীসভায় গ্রহণ করা চলবে না।

আচ্ছা বেশ। অবশ্য তেমন কোন সম্ভাবনাও ছিল না। তা হলে এখন আমি যাচ্ছি। নমস্কার—

নমস্কার।

ভাবী মুখ্যমন্ত্রী চলে গেলেন।

১৯৬৫, সেপ্টেম্বর—

নতুন সম্পাদকমণ্ডলী সভাপতিসহ ঘরের মধ্যে উত্তেজিত পদক্ষেপে পায়চারি করছেন।

সর্বকনিষ্ঠ সদস্য বাঁ হাতের তালুতে ডান হাতের একটা ঘুষি লাগিয়ে বললেন, আঃ, একটা অদ্ভুত কাণ্ড হবে!

সভাপতি বললেন, হ্যাঁ, এইটেই আমাদের শ্রেষ্ঠ আন্দোলন। কেন্দ্রীয় সরকারের পতন ঘটাতে পারলে সারা দুনিয়ার ছাত্র-আন্দোলনের ইতিহাসে একটা শ্রেষ্ঠ কীর্তি হয়ে থাকবে।

পারলে কেন? পারবই তো!

আমাদের মোট এক লাখ ছাত্র ছাড়বার কথা। আমরা লাখ দেড়েক পারব না?

কিছু বেশি আমরা দেবই। সারা ভারতে দশ লাখ ছাত্রের বিক্ষোভে আমাদের কোটা এক লাখ। লাখ দেড়েকের চেষ্টা আমরা করবই।

গুলি চলবে মনে হয়?

সাহস পাবে না। এটা গণতান্ত্রিক দেশ। কিন্তু আর সময় নেই। এক মাস মাত্র সময়। এর মধ্যে আমাদের প্রস্তুত হতে হবে।

১৯৬?, অক্টোবর—

গোপন ঘাঁটিতে গুপ্ত কক্ষ। এক কোণে একটি রেডিও বসানো আছে। মাঝে মাঝে সেটাতে কেন্দ্রীয় গোপন ঘাঁটি থেকে খবর আসছে।

সভাপতি একা উত্তেজনায় দু হাত কচলাতে কচলাতে পায়চারি করছেন।

ছুটে ষোল বছরের একটি ছেলে প্রবেশ করল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, গুলি চলছে।

আর আমরা? হটছি?

হ্যাঁ। আমাদের দক্ষিণ আর পশ্চিম দিকটার ছাত্ররা এখনও এসে পৌঁছয় নি।

ও, আমাদের ফুল স্ট্রেংথ্‌ এখনও জমায়েত হয় নি।

ছেলেটি বেগে বেরিয়ে গেল। রেডিও বেজে উঠল—

সেণ্টার বলছি—সেণ্টার বলছি। আমরা এগুচ্ছি। কয়েক রাউণ্ড গুলি হয়েছে। মাত্র ত্রিশজন হত আর পাঁচশো আহত। কিন্তু আমরা এগুচ্ছি। ওরা পিছিয়ে যাচ্ছে। গুলি আর করছে না।

রেডিও বন্ধ হল।

আর একটি ছেলে বেগে প্রবেশ করল। দম নিতে নিতে বলল, সবদিক থেকে এসে গেছে। আমরা এগুচ্ছি। গুলি করছে না আর।—ছেলেটি ছুটে বেরিয়ে গেল।

সভাপতি বসলেন। পরক্ষণে লাফিয়ে উঠলেন। ঘরের মধ্যে বেগে পায়চারি করলেন কিছুক্ষণ। আবার বসলেন।

অকস্মাৎ রেডিও আবার বেজে উঠল, সেণ্টার বলছি—সেণ্টার বলছি। আমরা জয়ী হয়েছি। স্বৈরাচারী সরকারের পতন হয়েছে।

একটা চিৎকার করে লাফিয়ে উঠলেন সভাপতি।

রেডিও বলে চলল, সরকারী দপ্তর আমরা দখল করেছি। পরবর্তী ঘোষণা সরকারী রেডিও স্টেশন থেকে জানানো হবে।

সভাপতি ছুটে বেরোলেন রাস্তায়। কিছুদূর গিয়েই দেখলেন অনেক ছেলে জয়ধ্বনি দিতে দিতে ফিরে আসছে।

তিনি একটা প্রচণ্ড জয়হুঙ্কার দিয়ে ছুটে গিয়ে ওদের সামনে পড়লেন। আগেই নিজে খবর দিলেন, কেন্দ্রে আমাদের জয় হয়েছে। সরকার আমরা দখল করেছি।

ওরা বলল, আমরাও শুনেছি। এখানেও এরা পদত্যাগ করে পালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ধরা পড়েছে। আমরা সব দখল করেছি।

সভাপতি আবার জয়ধ্বনি করলেন: তারপর, কি হল সব বলুন। আপনারা কেন্দ্রের খবর কোথায় পেলেন?

মাইকে ঘোষণা করেছে। দখল হবার পরে সরকারী ভবনের বারান্দায় মাইক বসিয়ে ঘোষণা করে বলল যে সর্বত্র আমাদের জয় হয়েছে। সরকার আমাদের দখলে এসেছে। আর বলল যে তোমাদের কাজ শেষ হয়েছে—এখন তোমরা অবিলম্বে ঘরে ফিরে যাও।

কেন?

তাই তো বলল।

কিন্তু বলল কারা?

তা তো দূর থেকে বোঝা গেল না।

বোঝা গেল না?

না—আমরা নীচে অনেকটা দূরে তো!

ও। তা হলে ছাত্ররা সকলে ফিরেছে?

এখন ফিরছে। আমরা হৈ-হুল্লোড় করছিলাম। কিন্তু ওরা আবার বলল যে আর এক মুহূর্ত দেরি করা চলবে না। এখনই রাস্তায় মিলিটারি ট্যাঙ্ক নিয়ে বেরিয়ে পড়বে।

ট্যাঙ্ক! ট্যাঙ্ক কেন?

শান্তি রক্ষার জন্যে। বলল যে রাস্তায় লোক দেখলেই তারা গুলি করবে।

সভাপতির মুখ পাংশু হয়ে গেল। বললেন, কিন্তু ট্যাঙ্ক পাঠাচ্ছে কারা?

তা তো বোঝা গেল না।

চলুন, রেডিওতে কি বলছে শোনা যাক।

ঘরে গিয়ে রেডিও খুলে দিতেই শোনা গেল।

আবার বলছি, তোমাদের কাজ শেষ। এখন যে যার ঘরে ফিরে যাও। সরকার এখন আমাদের দখলে, তোমাদের আর কিছু করার নেই। কোন রকম রাজনীতিতে তোমাদের আর যোগ দেওয়া চলবে না। কোন ছাত্র-ইউনিয়ন চলবে না। কোন আন্দোলন চলবে না। তবে দেশের জন্যে যখন যা করতে হবে আমরা পরে বলে দেব। এই পর্যন্ত। আবার বলছি—তোমরা যার যার ঘরে ফিরে যাও। আমাদের মিলিটারি পুলিস ট্যাঙ্ক নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছে। লোক দেখলেই গুলি করবে।

সভাপতি প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, কিন্তু এরা কারা?

কয়েকজন সমস্বরে বললেন, তা তো বোঝা যাচ্ছে না।

স্তর

সঙ্কর্ষণ রায়

ন্যাশনাল অ্যারচাইভ্‌সের ধূলিধূসর একটি প্রায়-অন্ধকার ঘরে বসে অঘোর আলমারিতে ফাইল সাজাচ্ছিলেন। সরকারী বিভিন্ন দপ্তর থেকে এসেছে এক-রাশ ফাইল। বিষয় অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ করে সাজাচ্ছিলেন তিনি সেগুলো।

যেসব ফাইল বিশেষভাবে সংরক্ষণের জন্য নির্বাচিত হয়, সেগুলো পাঠিয়ে দেওয়া হয় ন্যাশনাল অ্যারচাইভ্‌সে। ইতিহাসের উপকরণ এগুলো—ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদের কাজে আসবে।

বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় পরিকল্পনা সম্পর্কিত মোটা মোটা ফাইলের মধ্যে একটি ছোট্ট ফাইল অঘোরের চোখে পড়ল। ফাইলটি খুলে দেখলেন যে একটিমাত্র বাদামী রঙের কাগজ গাঁথা আছে। অস্পষ্ট হিজিবিজি অক্ষরে কী সব লেখা। পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করেন অঘোর। খারাপ হাতের লেখা পড়ার অভ্যাস আছে তাঁর। পড়লেন। বাণিজ্যদপ্তরের কোন্ এক অফিসার অফিসের করিডরে থুথু ফেলার পাত্র রাখার প্রস্তাব করেছেন।

পড়তে পড়তে আপন মনেই অঘোর হেসে ফেলেন। এ ফাইল এখানে কেন? বুঝি বা কয়েক মুহূর্তের জন্য হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। পরক্ষণে ফাইল-নোটের নীচের স্বাক্ষরটি তাঁর চোখে পড়ে। নামটা তাঁর অপরিচিত নয়। বাণিজ্যদপ্তরের মন্ত্রীমশাইয়ের ভাগ্নের নাম। এবারে বুঝতে পারেন ফাইলটা কেন এসেছে এখানে। এ ধরনের অনেক ফাইল ইতিপূর্বে তিনি পেয়েছেন।

ফাইলগুলো বিভিন্ন আলমারিতে সাজাতে সাজাতে অঘোরের সঞ্চরমাণ দৃষ্টি পুরনো সব ফাইলের স্তূপে ঘোরে-ফেরে। পুরনো কাগজের কিরকম একটা সোঁদা সোঁদা গন্ধ নাকে আসে। মস্তিষ্কের মধ্যে যেন নেশা ধরে যায়। সুদূরবিস্তৃত অতীত যেন সেই গন্ধ বেয়ে আসে তাঁর কাছে—তাঁর কানে কানে কথা কয়।

একটি আলমারির নীচের থাকে আঠারশো ছাপ্পান্ন সনের একটি ফাইল তাঁর চোখে পড়ল। পুরনো কাগজের ঝিম-ধরানো গন্ধের নেশায় অনেকবার পড়া ফাইলটা আবার পড়তে থাকেন তিনি। ফাইলের ওপর লাল কালিতে লেখা 'কনফিডেন্‌শিয়াল'। একশো বছর আগেকার লাল কালির রঙ মেটে হয়ে গিয়েছে। ফাইলটিতে লর্ড ডালহৌসীর স্বহস্তলিখিত একটি পরোয়ানা অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলি শাহের নির্বাসনের। আঁকাবাঁকা নীল অক্ষরে একটি কুচক্রী মনের স্বাক্ষর বুঝি ফুটে উঠেছে।

ওয়াজেদ আলি শাহের নির্বাসনদণ্ডের সঙ্গে আজকের এই উনিশশো ষাট সনের সমন্বয় কি করা যায়? হয়তো যায়। ঐতিহাসিকরা বিবর্তনের কথা বলবেন, কার্যকারণ-পরম্পরায় অতীতকে টেনে আনতে পারবেন এই বর্তমানে ওই থুথুফেলার পাত্র রাখার প্রস্তাবের ফাইলে। কিন্তু অঘোর—যাঁর কাজ হচ্ছে আলমারিতে ফাইল সাজানো—তাঁর চোখে অতীত অতীত, বর্তমান বর্তমান—একটি অন্যটির ওপর স্তরে স্তরে বিন্যস্ত হয়ে আছে—দুয়ের মধ্যে অন্বয় বা সমন্বয় অসম্ভব। জলের ওপর তেলের মত অতীতকে চাপা দিয়ে আছে বর্তমান। আলমারির ওই ফাইলগুলোর মত কালানুক্রমে স্তরীভূত হয়ে আছে সিপাহীবিদ্রোহের ওপর বর্মার রাজা থিবোর বিরুদ্ধে অভিযান—তার ওপর প্রথম মহাযুদ্ধ, তার ওপর রাউলাট আইন, তার ওপর অসহযোগ আন্দোলন। উপরের স্তরটির সঙ্গে নীচের স্তরের মিল খুঁজে পান নি অঘোর।

ইতিহাসের ধারাবাহিকতা বিশ্বাস করেন না অঘোর।

বিভিন্ন জাতির ও সভ্যতার উত্থান-পতন, অনেক ভাঙা-গড়ার কাহিনী যেন ওই আলমারির থাকে থাকে শ্রেণীবদ্ধ ফাইলগুলোর মত ইতিহাসে স্তরীভূত হয়ে আছে।

ইতিহাসের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে শুধু নয়, মানুষের দৈনন্দিন জীবনেও অঘোর দেখেছেন বিভিন্ন সমাজ ও গোষ্ঠীতে স্তরীভূত হয়ে পড়েছে মানুষের অস্তিত্ব।

তাঁর ঠাকুরদা তাঁকে বুঝিয়েছিলেন যে মানুষের শ্রেণী-সচেতনতা ঘুচবে না কখনও, সভ্যতা যতই অগ্রসর হোক না কেন। ঠাকুরদার ঠাকুরদা কৌলিন্যের দাবিতে বিশিষ্ট সম্মান পেতেন, উচ্চস্তরের কুলীন ছিলেন বলে অকুলীন ব্রাহ্মণদের সঙ্গেও পঙ্‌ক্তিভোজনে বসতেন না। সামাজিক নিমন্ত্রণে বিশেষ মর্যাদা পেতেন। এসব গল্প তিনি ঠাকুরদার কাছে অনেক শুনেছেন।

তারপর দিন বদলের পালা এসেছে। কৌলীন্যের মর্যাদা দিয়ে তাঁর ঠাকুরদা নিজের দারিদ্র্যকে আড়াল করতে পারেন নি।

ঠাকুরদা অঘোরকে বলেছিলেন, দারিদ্র্য আমাদের সমাজের নিম্নতম স্তরে ঠেলে দিয়েছে, প্রাণপণ চেষ্টা করো এই হেয়তাবোধের গ্লানি থেকে নিজেকে উদ্ধার করতে।

অঘোর প্রশ্ন করেছিল, দারিদ্র্য হেয়তাবোধ আনবে কেন? দারিদ্র্যের জন্য গ্লানিই বা অনুভব করব কেন?

ঠাকুরদা জবাব দিয়েছিলেন, না করে যে উপায় নেই। সামাজিক মূল্যবোধ বদলে গেছে, অর্থনৈতিক মানদণ্ড দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সবকিছু।

ঠাকুরদা ঠিকই বলেছিলেন। দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে অঘোর অনুভব করতেন পঙ্কিল অস্তিত্ব-বোধের তিক্ততা। পাঁকের মধ্যে ফুটে-থাকা পদ্মফুলের উপমা শুনলে তাঁর হাসি পেত। তাঁর জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধি যথেষ্ট পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও দারিদ্র্যের পঙ্ককে অতিক্রম করতে পারেন নি কখনও।

ন্যাশনাল অ্যারচাইভসে একটি ভাল চাকরির জন্য তৎকালীন অধিকর্তা অধীর চক্রবর্তীর কাছে দরবার করতে গিয়ে অপদস্থ হয়েছিলেন তিনি। তাঁর ইতিহাসের দ্বিতীয় শ্রেণীর এম. এ. ডিগ্রী বা গবেষণার অভিজ্ঞতা কোনও দিকে নজর ছিল না চক্রবর্তী সাহেবের—তিনি শুধু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিলেন তাঁর জীর্ণমলিন পোশাক-পরিচ্ছদে নগ্ন দারিদ্র্যের আত্মঘোষণা। রিসার্চ অফিসারের চাকরি তাঁর হয় নি, কনিষ্ঠ কেরানীর একটি পদে তাঁকে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

অঘোর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, যে কোন প্রকারে হোক দারিদ্র্যের হীনম্মন্যতা থেকে নিজেকে তুলে ধরবেন। ছোটখাটো দুঃখ থেকে নিজেকে বৃহত্তর জীবনের প্রসারে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু নিজে তিনি রিক্ত ও ব্যর্থ—নিজেকে দিয়ে কিছু করার সাধ্য ছিল না তাঁর। সরকারী দপ্তরের কনিষ্ঠ কেরানীর শক্তি নেই নিম্নতম স্তরের অন্ধকার থেকে আলোতে বেরিয়ে আসার। তাই তিনি ছোট ভাই অতনুর চোখের সামনে মেলে ধরলেন সুদূরপ্রসারিত জীবনের আকাঙ্ক্ষা।

অতনু উচ্চাকাঙ্ক্ষী। নিজেকে বঞ্চিত করে যে সুযোগ-সুবিধা অঘোর তাকে করে দিয়েছিলেন তার ষোল-আনা সদ্ব্যবহার সে করেছিল।

অঘোর চমৎকৃত হয়ে দেখলেন যে তাঁর আঁধারঘেরা জীবনের ওপর চমৎকার আলোঝলমল একটা প্রকোষ্ঠ গড়ে তুলেছে অতনু। এই ন্যাশনাল অ্যারচাইভসেরই উপ-অধিকর্তা হয়ে বসল সে একদিন।

অন্য জীবন, অন্য স্তর। অন্ধকার কানাগলি থেকে রাজপথে উপনীত হল অঘোরের প্রসারিত জীবনবোধ।

স্তর থেকে স্তরান্তর। উপরের স্তর থেকে নীচের স্তর নজরে আসে না। মানুষের ইতিহাসে বিবর্তনবাদ বিশ্বাস করেন না অঘোর।

বিগত জীবন বিস্মৃত দুঃস্বপ্ন। ন্যাশনাল অ্যারচাইভসের অবসরপ্রাপ্ত অধিকর্তা অধীর চক্রবর্তী হাত জোড় করে সেদিন তাঁর কাছে এসেছিলেন। অতনুর সঙ্গে তাঁর একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিতে চান তিনি।

চমৎকার কোয়ার্টার পেয়েছে অতনু। সুন্দর বাগান। আলোঝলমল অস্তিত্ব—যেখান থেকে আকাশের ছোঁওয়া পাওয়া যায়।

অভিমন্যু তাড়া দিল : বল।

হঠাৎ আমার এক কৃষককন্যার কথা মনে পড়ল। উত্তর-জীবনে সেই কন্যাই এই শহরকে বর্তমান ইন্দোরে পরিণত করেন। বললুম : একটা মেয়ের গল্প শুনবে ?

অভিমন্যু বলল : ছেলের গল্প বল।

বিপদের কথা।

মিনতির দিকে চেয়ে বললুম : এর চেয়ে ভূতের গল্প বলা সোজা দেখছি।

না না, ভূতের গল্প নয় : মিনতি যেন আর্তনাদ করে উঠলেন : ওই সব আজগুবী গল্প শুনে শুনে ছেলেরা বড় ভীতু হয়ে যায়। তার চেয়ে আপনি মেয়ের গল্পই বলুন।

ততক্ষণে আমার সেই মেয়ের শ্বশুরের কথাও মনে পড়েছে। তাঁর শৈশবটাও গল্পের মত। বললুম : বেশ তো, ছেলের গল্পই বলছি। মলহর রাও নামে একটি মহারাষ্ট্রী ছেলে। খুব গরিব। মামার বাড়িতে সে রাখালের কাজ করে। কিন্তু সে কাজ তার একটুও পছন্দ নয়। তার ইচ্ছে সৈনিক হয়ে যুদ্ধ করবার। যতই সে বড় হচ্ছে ততই তার আগ্রহও বাড়ছে। একদিন তার সুযোগ মিলে গেল। শিবাজীর নাম শুনেছ ?

মিনতি তাড়াতাড়ি বললেন : মারাঠা বীর শিবাজী। সেই বাঘের নখের গল্প মনে নেই ?

বিজ্ঞের মত অভিমন্যু বলল : আছে বইকি !

বললুম : শিবাজী তখন মারা গেছেন, কিন্তু পেশোয়ারা খুব জোর করেছে। তাদের অনেক সৈন্য। অনেক শক্তি। সবার সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে তারা সারাক্ষণ তৈরি। পেশোয়া বাজীরাওয়ের সেনাদলে মলহর রাও একটা সামান্য চাকরি পেয়ে গেল। কিন্তু যে সাহসী ও বীর, সে কি একটা সামান্য চাকরিতে সন্তুষ্ট থাকতে পারে ! দেখতে দেখতে সবাই তার সাহস আর বীরত্বের কথা জেনে গেল। বাজীরাও মহা খুশী। বললেন, তোমাকে আমি এই মালব দেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলাম। শাসনকর্তা কাকে বলে জান তো ? প্রায় রাজারই মত। এই ইন্দোর তখন একটা ছোট্ট শহর, এখানেই তার রাজধানী হল।

অভিমন্যু মনোযোগ দিয়ে গল্প শুনছে। আমি থামতেই বলল : তারপর ?

তারপর সেই ছোট্ট মেয়ের গল্প। চাষীর মেয়ে। কিন্তু আজ তাঁকে সবাই জানে। বলে প্রাতঃস্মরণীয়া। সকালে উঠে প্রণাম করবার মত মহারাণী।

অভিমন্যু এবার আর আপত্তি করল না। বললুম : মলহর রাও একদিন পুনা যাচ্ছিলেন। পথে একটি মন্দিরে বসে একজন লোকের সঙ্গে কথা বলছেন। সেই সময় সেই মেয়েটি এল। চমৎকার ফুটফুটে মেয়ে। তাঁর ভারি ভাল লাগল। ভাবলেন, তাঁর ছেলে খণ্ডে রাওয়ের সঙ্গে এই মেয়েটির বিয়ে দেবেন। বড়লোকের এক কথা—তাঁরা যা ভাবেন তাই করেন। মলহর রাও তাঁর ছেলের সঙ্গেই এই চাষীর মেয়েটির বিয়ে দিলেন।

মিনতি বললেন : কার কথা বলছেন ?

বলছি।

কিন্তু আর কিছু বলবার আগেই বিরূপাক্ষ ফিরে এলেন। এসেই বললেন : চল।

অভিমন্যু বলল : গল্প ?

তার জন্যে ভাবনা কি ? পথেই আমরা গল্প করব।

বিরূপাক্ষ একখানা টাঙ্গা ঠিক করেছিলেন। তাস করে অন্ধকার হবার আগে সেই-ই আমাদের সব ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবে। রেলের লোকের মধ্যস্থতায় গাড়ির ব্যবস্থা। ভাড়া নাকি সামান্যই লাগবে।

অভিমন্যুকে নিয়ে আমি টাঙ্গার সামনে বসলুম। কিন্তু চুপ করে বসে থাকতে সে দিল না। চারিদিকটা ভাল করে দেখে নিয়েই বলল : বল এই বারে।

বললুম : চাষীর মেয়ের কপালে অত সুখ সইবে কেন ! একটা যুদ্ধে খণ্ডে রাও মারা গেলেন। সেই মেয়েটির বয়স তখন আঠারো বছর, একটি ছোট ছেলে আর একটি মেয়ে হয়েছে তার। বলল, চিতায় উঠে আমি সহমরণে যাব। একসঙ্গে পুড়ে মরবে। কিন্তু বুড়ো রাজা রাজী হবেন কেন ! তিনি বললেন, ছেলে গেছে, মেয়েও যদি যায় তো আমি কাকে নিয়ে বাঁচব ! বুড়োর কান্না দেখে বউয়ের আর মরা হল না।

বিরূপাক্ষ বললেন : এ কার কথা বলছেন ?

বললুম : এক চাষীর মেয়ের কথা। সামান্য শিক্ষা পেয়ে রাজঅন্তঃপুরে এসেছিলেন। স্বামীকে হারিয়ে এবারে রাজকার্য শিখতে লাগলেন বুড়ো রাজার কাছে। যখন তাঁর তিরিশ বছর বয়স, তখন বুড়ো রাজার মৃত্যু হল। রাজা হল তাঁর ছেলে। অসচ্চরিত্র অপদার্থ ছেলে। ন মাস পরে তারও মৃত্যু হল।

এইবারে প্রজা বিদ্রোহ। প্রজারা চায় তাদের মনোনীত কোন লোক রাজা হোক, আর রাজমাতা চান রাজ্য তাঁরই হাতে থাক। এই ষড়যন্ত্রের সংবাদ পেয়েই তিনি কঠিন হাতে এই বিদ্রোহ দমনের ব্যবস্থা করলেন। প্রতিবেশী মারাঠা রাজাদের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠিয়ে নিজে বেরুলেন তাঁর সেনাদল নিয়ে। রাজমাতাকে হাতির পিঠে উঠে সৈন্য চালনা করতে দেখে সবাই মেতে উঠল। যুদ্ধ আর হল না, ভয়ে সবাই পালিয়ে গেল। ইন্দোরের রাণী হলেন চাষীর মেয়ে অহল্যাবাঈ।

মিনতি আশ্চর্য হলেন। কিন্তু বিরূপাক্ষ বললেন : চাষীর মেয়ে কথাটার ওপর আপনি বড় বেশী জোর দিচ্ছেন।

আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে।

আপনি বোধ হয় বলতে চেয়েছেন যে প্রাতঃস্মরণীয়া হবার জন্য রাজকন্যা হবার প্রয়োজন নেই।

মীরাবাঈও সাধারণ ঘরের মেয়ে ছিলেন। আধ্যাত্মিক জগতে তিনি অবিস্মরণীয়া।

এই ইন্দোরে অহল্যাবাঈ তিরিশ বৎসর রাজত্ব করেছেন। ১৭৬৫ থেকে ১৭৯৫। বর্তমান শহরে তাঁর কীর্তি অক্ষয় হয়ে আছে। সরস্বতী ও খান নদীর তীরে এই শহর—সমুদ্র সমতলে নয়, প্রায় দু হাজার ফুট উঁচু মালভূমির উপর। প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন রাজপথ, ঘরবাড়ি সবই একটা আধুনিক রুচির পরিচয় দিচ্ছে। শহরের প্রধান স্থানেই পুরাতন প্রাসাদ। পথের উপরেই তার উঁচু তোরণ। হোলকার পরিবারের স্মৃতিস্তম্ভগুলি সব নদীর ধারে। মলহর রাও হোলকারের সমাধি ছত্রিবাগে। সরস্বতী নদীর ধারে আমরা লালবাগ প্রাসাদ দেখলুম, আর দেখলুম এডওয়ার্ড হল।

আর একটি মন্দির আমরা দেখলুম। জৈনদের কাচ মন্দির। বাইরে থেকেই একটা প্রাসাদের মত সুন্দর, ভিতরে ঐশ্বর্যের বিজ্ঞাপন। আজমীরেও আমরা জৈনদের একটি মন্দির দেখেছি। সে মন্দির আবু পাহাড়ের দিলওয়ারার মত গভীর নয়, রাজা বাদশাহের শিসমহলের মত রঙিন স্বপ্নের। দেবতার প্রতি ভক্তির বদলে ঐশ্বর্য দেখে বিস্ময় জাগে। অভিমন্যু আনন্দ পেল অপরিমিত।

ফেরার পথে বিরূপাক্ষ বললেন : ইন্দোরে যা দেখলাম না, দেখেছি তা ভারতের সর্বত্র।

মিনতি বললেন : সে আবার কী ?

বিরূপাক্ষ বললেন : ভারতের সমস্ত তীর্থস্থানে অহল্যা-বাঈয়ের কীর্তির শেষ নেই। তীর্থ যত দুর্গম, তাঁর দান তত অকৃপণ। সীমাচলমের সিঁড়ি কে বাঁধিয়ে দিলেন ? অহল্যাবাঈ। কাশীতে ঘাট কে বেঁধে দিলেন ? অহল্যাবাঈ। গয়ার মন্দির কে সংস্কার করে দিলেন ? অহল্যাবাঈ।

বিরূপাক্ষ বোধ হয় আর কিছু ভেবে পেলেন না। পেলে নিশ্চয়ই বলতেন। এ শুধু তাঁর কীর্তির একটা সামান্য পরিচয়। অহল্যাবাঈয়ের কীর্তি নেই, এমন তীর্থ বুঝি ভারতে নেই। ভারতে তীর্থ আর অহল্যার নাম বুঝি অঙ্গাঙ্গিভাবে মিলে আছে।

মিনতি বললেন : তাঁর নিজের রাজধানীতে সত্যিই কিছু দেখলাম না !

তাঁর নিজের রাজধানীতে শুধু একটি কথা বেঁচে আছে।

পিছন থেকে দুজনেই আমার দিকে ফিরে তাকালেন।

বললুম : তিনি বলতেন, খাজনা আমার চাই নে, চাই প্রজার সুখ। প্রজা সুখী হলেই আমি সুখী হব। এ তাঁর মুখের কথা নয়। জনৈক রাজকর্মচারীকে তিনি লিখে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর নিজের জীবন ছিল ফুলের মত পবিত্র। প্রত্যূষে স্নান-সন্ধ্যার পর তিনি ধর্মপুস্তক পাঠ করতেন। দরিদ্রকে ভিক্ষা দিয়ে ও ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে সামান্য কিছু আহার করতেন। তারপর রাজকার্য, সে প্রায় রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত। সায়াহ্নে ঘণ্টাতিনেক সন্ধ্যাবন্দনা।

আর একটি কথা না বললে অহল্যাবাঈয়ের কথা সম্পূর্ণ হবে না। কেন, তিনি তীর্থে তীর্থে তাঁর সমস্ত সম্পদ ব্যয় করেছিলেন, সেই কথা। তাঁর নিজ ব্যয়ের জন্য রাজকোষ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা বাৎসরিক বরাদ্দ ছিল। আর রানী হবার সময় হাতে পেঁয়েছিলেন দু কোটি টাকা। নিজে তপস্বিনীর জীবনযাপন করে এই টাকা তিনি ভুখা ভারতবাসীর ভোগে দিয়েছিলেন—দেহের ক্ষুধা নিরসনে নয়, আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষের জন্য। গৃহে আছে বন্ধন, সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা। পথে মুক্তি, উদার প্রসন্নতা। অনির্দিষ্ট পথের শেষ নেই, তীর্থের পথ এক তীর্থ থেকে অন্য তীর্থে গেছে। রানী অহল্যাবাঈ বেরতেন মুঠো মুঠো বীজ সঙ্গে নিয়ে। রাস্তার দু ধারে সেই বীজ বপন করতেন। সেই বীজ আজ মহীরুহে পরিণত হয়েছে।

একটি প্রাণ। শাশ্বত ভারতীয় প্রাণ। পথে কাঁটা আছে, তুলে ফেলে দাও। মৃত্যুভয় আছে, নিজে বুক পাত। পিছনের পথ হোক নিষ্কণ্টক, পিছনের মানুষ আসুক নির্ভয়ে। অহল্যাবাঈ ভারতের সেই আদিম পথিক। নমস্যা, প্রাতঃস্মরণীয়া।

পাঁচ

মোটরবাসের খোঁজখবর নিয়ে আমরা স্টেশনে ফিরে এলাম। যোগাযোগটা ভাল হল। স্কুল-কলেজের এক-দল ছেলেমেয়ে মাণ্ডু দেখতে যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে কয়েকজন অভিভাবক। তাঁরা এসেছিলেন একখানা বাস রিজার্ভ করতে। সেই বাসেই জায়গা পাওয়া গেল। তাতে লাভ হল দু রকমের। পথে লোকজন ওঠা-নামায় দেরি করবে না। আর মাণ্ডুর সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থান ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবে। তার জন্য কয়েক আনা পয়সা অতিরিক্ত দিতে হবে। ভোর পাঁচটায় পৌঁছতে হবে বাসস্ট্যাণ্ড।

আমরা রুটি মাখন আর কলা কিনে আনলুম। এর চেয়ে নিরাপদ খাবার আর নেই। বিরূপাক্ষ বললেন: সকালে ওঠার ভাবনাও নেই। আমার আত্মীয় একজনকে বলে রাখব। রাত চারটেয় জাগিয়ে দেবে।

কাজেই খেয়েদেয়ে নিশ্চিন্ত মনে শোওয়া গেল। ওয়েটিংরুমে শোবার জায়গা বেশী নেই, আমি মেঝের উপরেই চাদর বিছিয়ে শুলুম।

সহসা ঘুম এল না। মনে পড়ল, কয়েকদিন আগে সোমনাথ দর্শনে গিয়ে ভেরাবলের ওয়েটিংরুমে আমরা একটি রাত কাটিয়েছি। মামা মামী ও স্বাতির সঙ্গে আমি ছাড়াও ছিলেন কালীঘাটের কালীকেষ্ট হালদার। যে মানুষকে মামা মামী ঘৃণার চেয়ে ভয় পান বেশী, তিনিও আমাদের পরিবারভুক্ত হয়ে গেলেন। কিন্তু তার পিছনে একটু ইতিহাস আছে। তার শুরু হয়েছিল দ্বারকায়।

তোতাদ্রি মঠের একটা বেঞ্চিতে বসে অনেক রাত্রি পর্যন্ত আমরা কথা বলেছিলুম। ঘরে এসে দরজা বন্ধ করতেই মামা জিজ্ঞাসা করলেন: কার সঙ্গে কথা বলছিলে ?

হালদারের নাম শুনে তিনি চমকে উঠলেন। মামা তাঁকে ভয় পান। লোকটা বিশেষ সুবিধের নয়। ধর্মের নামে অধর্ম করেই নাকি হাত পাকিয়েছেন। রামেশ্বরের সেই ঘটনার পর মামী এঁরই ভয়ে মরে যাচ্ছিলেন। মুখরোচক মিথ্যা এ যুগে কেউ যাচাই করে দেখে না বলেই মামীর দুর্ভাবনার শেষ নেই। মামা বললেন: কী বলছিল লক্ষ্মীছাড়া ?

আমি সত্যি কথাই স্বীকার করলুম: সমুদ্রের ধারে স্বাতিকে দেখেছেন আমার সঙ্গে।

মামা ক্ষেপে উঠলেন: দেখেছে বলছে ?

আর মামী তাঁর গায়ের চাদর ফেলে দিয়ে উঠে বসলেন বিছানার ওপর। ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন: আমি আগেই জানতাম যে এমন একটা কেলেঙ্কারি হবে।

স্বাতি ভয় পাবার মেয়ে নয়, বলল: কেলেঙ্কারি কিসের ?

কিসের কেলেঙ্কারি তা তুমি বুঝবে কেন !

মামী যেন গুমরে উঠলেন।

স্বাতি বলল: তোমরা ভয় পাও বলেই তো ও অমন পেয়ে বসেছে।

ভয় তাঁরা সঙ্গত কারণেই পান। সেবারের সম্বন্ধটা

ভেঙে গেছে। মামীর ধারণা, সে হালদারের জন্যেই ভেঙেছে। রানার সঙ্গে নতুন সম্বন্ধটাও গেল ভেস্তে। মামীর উদ্বেগের আর অন্ত নেই। কিন্তু মামা হঠাৎ প্রসন্ন হয়ে উঠলেন: ওই লক্ষ্মীছাড়াকে আমি আর ভয় পাই নাকি! কী করবে আমার! কী বলে বেড়াবে!

আশ্চর্য হয়ে মামী বললেন: তুমি কি পাগল হলে! বুঝতে পারছ না, দেশে ফিরে কী সর্বনাশ করবে!

মামা অনেকক্ষণ ধরে হাসলেন রসিয়ে রসিয়ে। তারপর বললেন: সে আমি বুঝব।—তাড়াতাড়ি আমি বললুম: আপনার পয়সায় এবারে অমরনাথ যাবে বলছে।

যাওয়াচ্ছি। বাড়ি গেলেই বুঝতে পারবে যে হেঁটে ফিরতে হবে কালীঘাটে। ট্রাম ভাড়ার পয়সা যদি পায় তো আমার নাম অঘোর গোস্বামী নয়।

দু চোখ বিস্ফারিত করে মামী আমার দিকে চেয়েছিলেন। হঠাৎ এত সাহস তিনি পেলেন কোথা থেকে। স্বাতি আমার দিকে চেয়ে হেসে ফেলল। সে হাসি মামী দেখতে পেলেন না।

স্বাতির হাসিটি আমার অদ্ভুত লাগল। মনে হল, মামার নির্ভীক হৃদয়ের সংবাদ তার জানা আছে। স্বাতিকে সে কথা জিজ্ঞাসা করে নিতে হবে।

এই হালদারের সঙ্গে জেতলসরে আবার দেখা হল। তিনিও সোমনাথ চলেছেন। আমরা জুনাগড়ে নামলুম, কিন্তু তিনি নামলেন না। শুধু খানিকক্ষণ সঙ্গ দিয়ে আমাকে বিপর্যস্ত করে গেলেন। বললেন: বুড়ি ওই বাঁদরটাকে পছন্দ করলেন, আর ভাগনে হয়ে মামীর মন ভোলাতে পারলেন না।

বুঝতে ভুল হল না যে তিনি জো রায়ের কথা বলছেন। বললুম: কিন্তু জো রায়কে আপনি চিনলেন কী করে?

একটা ভেংচি কেটে উত্তর দিলেন: কী নাম বললেন। জো রায়! জনার্দন বলতে বুঝি মান যায়! হনুমান বললেও তাকে সম্মান করা হয় যে।

এই জো রায়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল ওখার পথে। দ্বারকায় যে প্রথম শ্রেণীর কামরায় মামারা উঠেছিলেন, সাহেবী পোশাকে জো রায় সেই গাড়িতেই যাচ্ছিলেন। অযাচিত ভাবে তিনি সাহায্য করেছিলেন, মামা বাধ্য হয়েছিলেন তাঁকে ধন্যবাদ দিতে।

আমি তাঁর চেয়েও বেশী পেয়েছিলুম। সেই পাওয়ার কথা আমার অনেকদিন মনে থাকবে। সবাইকে তুলে দিয়ে আমি নিজের গাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলুম। মামা ডেকে বললেন: গোপাল, এ গাড়িতেই এস।

আমি দাঁড়াতুম না, কিন্তু জো রায়ের গলা শুনে থমকে দাঁড়ালুম: আপনার লোক বুঝি?

এই লোক শব্দটির মানে বড় স্পষ্ট। রামখেলাওন মামার লোক, আমিও ওইরকম কিছু। হয়তো বাজার-সরকার, কিংবা জমিদারী সেরেস্তার গোমস্তা, জমিদারের সঙ্গে প্রভেদটা বড় বেশী। আমি কেন দাঁড়িয়েছিলুম তা জানি, মামা কী জবাব দেন, সেই কথা জানবার আগ্রহ ছিল। সেই কথাটি জানা হলেই আমার ভবিষ্যৎটাও বুঝি জানা হবে। জানলার সামনে থেকে আমি সরে গিয়েছিলুম। মামা আমাকে দেখতে পাচ্ছিলেন না। কিন্তু আমি তাঁর উত্তর শুনতে পেলুম। এতটুকু দেরি না করে স্পষ্ট জবাব দিলেন: আমার ভাগনে।

তারপরেই স্বাতিকে বললেন: ধরে আন্‌তো মা। ওর চালচালিয়াতি যেন অন্যকে দেখায়।

আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলুম। মনে হয়েছিল, এই মুহূর্তে মামা আমাকে আমার প্রাপ্যের চেয়ে অনেক বেশী স্নেহ দিয়ে ফেললেন। সেইটুকু ঢাকবার জন্যই বাইরের এই রূঢ়তা।

গাড়িতে জো রায়ের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। একটা ফার্মের বড় অফিসার। হেডকোয়ার্টার্স বোম্বে, কাজের এলাকা কচ্ছ ও সৌরাষ্ট্র। বিলেত ঘুরে এসে পিতৃদত্ত জনার্দন নাম হয়েছে জো, কথায় ও কাজে পুরোদস্তুর সাহেবিয়ানা। মিঠাপুরে তাঁর কাজ ছিল, কিন্তু নামতে পারলেন না। আমাদের সঙ্গেই ওখা গেলেন, ওখা থেকে বেট দ্বারকা। ফেরার পথেও তাঁর মিঠাপুরে নামা হল না। আমাদের সঙ্গে তিনিও

সোমনাথ দেখবেন। কিন্তু স্বাতির কথায় তা হল না। ভদ্রলোককে নেমে যেতেই হল।

জো রায়কে মামীর ভাল লেগেছিল। চুপিচুপি মামাকে বলেছিলেন : বেশ ছেলেটি, তাই না!

গম্ভীর ভাবে মামা বলেছিলেন : হুঁ।

এতবড় চাকরি, অথচ অহংকার নেই এতটুকু।

হুঁ।

মামী পরামর্শ দিয়েছিলেন : ওর ঠিকানাটা লিখে রাখ। ওই সঙ্গে ওর বাপের নাম ঠিকানাও।

মামা তাতেও বলেছিলেন : হুঁ।

গাড়িতে খাওয়াদাওয়ার পর জো রায় বলেছিলেন, সোমনাথ তাঁর দেখা হয় নি।

মামী তখনি প্রস্তাব করেছিলেন : বেশ তো, চলুন না আমাদের সঙ্গে।

হাত দুটো কচলে জো রায় বলেছিলেন : আমাকে আপনি বলবেন না।

উত্তর শুনে মামী খুশী হয়েছিলেন, বলেছিলেন : তা বটে। তুমি তো আমার ছেলেরই মত।

মামীকে খুশী করবার জন্যে জো রায়কে আমি বলেছিলুম : আপনি এই গাড়িতেই থাকুন, আমিই যাব পাশের গাড়িতে।

কিন্তু স্বাতির চোখের দিকে চেয়ে মুখে আর কথা জোগাল না। বুঝতে পারছিলুম, সে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছে। শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল : সোমনাথ পরে দেখলে আপনার চলবে না!

মামী রুখে উঠলেন : একসঙ্গে যদি দেখতে পারা যায় তো পরে দেখবে কেন?

কাজের চেয়ে কি আর কিছু বড় আছে!

স্বাতির উত্তরে কোন উষ্মা প্রকাশ পেল না। বরং আরও নম্র, আরও মিষ্টি শোনাল তার কণ্ঠস্বর।

ব্যস্তভাবে জো রায় বলেছিলেন : সে খুব ঠিক কথা। আমি তো এদিকেই আছি, আমি অন্য সময়ে সোমনাথ দেখব।

গাড়িতে। আর মামী অনেকক্ষণ ধরে স্বাতিকে বকেছিলেন। স্বাতি একটি কথারও উত্তর দেয় নি।

হালদারের মুখে জো রায়ের কথা শুনে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম : এত রাগ কেন ভদ্রলোকের ওপর?

ভদ্রলোক! কে ভদ্রলোক! আমি কোন্ ছার, ওর বাপ ওকে কুলাঙ্গার বলে। তবে কিনা—

হালদার হেঁহেঁ করে হাসলেন রসিয়ে রসিয়ে। তারপর বললেন : আমি আমার কাজ গুছিয়ে নিয়েছি। কাল রাতে যখন গাড়ি থেকে ছোঁড়া নামল, ক্যাঁক করে তার গলা টিপে ধরলুম। কালীকেষ্ট হালদারকে ফাঁকি দেবে, এমন ছেলে এখনও মায়ের পেটে আছে।

এ কথা মেনে নিতে হালদার আত্মপ্রসাদ পেলেন। বললেন : বললুম, ওখানে গিয়ে ভিড়েছ তো! দাঁড়াও সব ফাঁস করে দিচ্ছি। তবে একটা জিনিস তার দেখলুম, বিপদটা সে টক করে বুঝে নিল। বোঝাতে হল না। হাতে পায়ে ধরে বলল, বুড়োবুড়িকে রাজী করেছি, আপনি আর বাদ সাধবেন না।

সেই সঙ্গে বললেন : অঘোর গোঁসাইকে সে এখনও চেনে নি। বুড়ি ভুলতে পারে, কিন্তু বুড়ো কম সেয়ানা নয়। যে লোক কালীকেষ্টকে চিনেছে হাড়ে হাড়ে, সে ওই বাঁদরকে কি আর চিনবে না! পঞ্চাশ টাকায় পার পেতে চেয়েছিল, পাঁচশো টাকায় রফা হল। একশো টাকা দিয়েছে, বাকিটা কলকাতার ঠিকানায় পাঠাবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন : কারও সম্বন্ধেই কিছু বলি না। অভাব না থাকলে ভয়ও দেখাতুম না। কালীকেষ্ট হালদারের নাম তা হলে কালীকৃষ্ণ বসু হত। এই হচ্ছে আজকের সমাজ, আজকের সভ্যতা। একটা মুখোশমাত্র। পয়সার মুখোশ। পয়সা থাকলে জানোয়ার মানুষ সাজতে পারে। কিন্তু মানুষ নিজের পরিচয় হারায় পয়সার অভাবে। লোকে চিনতে পারে না।

বললেন : গোপালবাবু, নিজের পরিচয়টা যদি দিতে পারতেন, তা হলে বুড়োবুড়ি আজ পাত্র খুঁজে বেড়াত না। চিনেছে শুধু মেয়েটা।

LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY SOAP

এগিয়ে এসেছিলেন। খবর দিলেন যে রাতের মত একটু ব্যবস্থা করা গেছে। ঝগড়া করে স্টেশনের একটা ওয়েটিং-রুম খালি করে রেখেছেন। মামার ইচ্ছেয় তবু একবার স্টেশনের বাইরে যেতে হল ডাকবাংলোর চেষ্টায়। সেখানে স্থানাভাব। ফেরার পথে হালদার আমার হাত টেনে ধরলেন: দাঁড়ান একটু, কথা আছে। বুড়ি যদি টাকার কথা জিজ্ঞেস করে, উত্তরটা এড়িয়ে যাবেন।

কিসের টাকা?

লটারির মোটা একটা টাকা পেয়েছেন, সেই খবর দিয়েছি।

এ যে মিথ্যে কথা। এ কথা আপনি কেন বললেন?

এক ঢিলে দু পাখি মেরেছি। বুড়ো আমাকে সন্দেহ করছিলেন, কোন মতলব নিয়ে দেখাশুনো করছি। তাইতেই বললুম, খাতির করছি গোপালবাবুকে। এতে আপনারও মঙ্গল হবে মশাই, বুড়ির নজরটা পালটাবে।

ছি ছি!

হালদার আরও একটা কেলেঙ্কারি করেছিলেন। চুপি-চুপি আমি যা কিছু লিখেছিলুম, সেই কথা প্রকাশ করে দিলেন হাটের মাঝে। হালদার কোথায় এ খবর পেলেন, সেই ভেবে আমার বিস্ময় জেগেছিল। স্বাতি এ কথা জানত, কিন্তু কাউকে আমার বই দেখায় নি। লেখক সম্বন্ধে ওঁদের ধারণা নাকি ভাল নয়। ওঁরা ভাবেন, যারা কোন কাজের যোগ্য নয়, তারাই বসে বসে বই লেখে। একটা মাস্টার বা কেরাণী হতে পারলেও তারা বর্তে যায়।

কিন্তু আমার মনে হয়েছিল, স্বাতি এ কথা গোপন করে তার দুর্বল মনের পরিচয় দিয়েছে। গরিব আত্মীয়ের পরিচয় দিতে মানুষ সঙ্কোচ বোধ করে। বড়লোক হলে ফলাও করে অনেক কথা বলে। লেখক হিসাবে আমার প্রতিষ্ঠা থাকলে স্বাতি হয়তো তার বাপ-মার কাছে আমার কথা লুকোত না। কিংবা সেই প্রতিষ্ঠার দিনের প্রতীক্ষা করে আছে। সেদিন কি আসবে!

ভেরাবলের ডাকবাংলোর সেই পরিবারটি আমাকে প্রাপ্যের অতিরিক্ত সম্মান করলেন। মামা মামী সবই দেখলেন, দেখল স্বাতিও। আর মনে মনে হাসলেন হালদার। এক ঢিলে তিনি সত্যিই দু পাখি মেরেছেন। আমাকে সম্মান করে তিনি নিজে সম্মান পেয়েছেন। ঘৃণার বদলে সৌহার্দ্য। এই পরিবারে তিনি আর শত্রু নন, পরম মিত্র বলে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন।

হালদার ঠিকই বলেছিলেন। আমার সৌভাগ্যের সংবাদ পেয়ে মামীর নজর পালটাল। যাচাই কিছুই করলেন না, সত্য বলে সবটুকুই বিশ্বাস করে নিলেন।

সোমনাথের নূতন মন্দিরের পিছনে সমুদ্রের ধারে বসে আমরা গল্প করছিলুম। আমি আর স্বাতি। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। বড় রাস্তার উপর সোমনাথের মেয়েরা নাচছে গরবা নাচ:

তালিউ না তালে গোরি
গরবে ঘুমি গায় রে
পূণম্‌ণি রাত উগি
পূণম্‌ণি রাত।

পিছনে হঠাৎ মামার কণ্ঠস্বর শুনলুম। ভূত দেখার মত চমকে চেয়ে দেখি মামার সঙ্গে মামী আছেন, আছেন কালীঘাটের হালদারও। ভদ্রলোক ফিসফিস করে বললেন: এখানে বসেও শাস্ত্রালোচনা হচ্ছে?

ফিসফিসানি বটে। গভীর বনে অজগরের নিঃশ্বাসও বুঝি এর চেয়ে মিষ্টি হয়। স্বাতি চমকে উঠল। মামা হাসলেন নিঃশব্দে। আর মামীর মুখ দেখলুম অদ্ভুত এক প্রসন্নতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। আমি লজ্জা পেয়েছিলুম।

আরতি দেখে বাড়ি ফেরার সময় মামী আমাকে ডাকলেন: গোপাল, তুমি বাবা এই গাড়িতে এস।

লক্ষ্মী মেয়ের মত স্বাতি আগেভাগেই এই গাড়িতে উঠেছিল। মামা উঠলেন হালদারের গাড়িতে।

সমুদ্রের ধারের প্রশস্ত পথ জ্যোৎস্নালোকে মাতাল হয়ে ছিল। বন্ধ গাড়ির ভিতরেও বুঝি নেশা লাগছিল। কারও মুখে আর কথা নেই।

হঠাৎ স্বাতি বলল: সোমনাথে আমরা আবার আসব মা।

মামী আসব বললেন না, বললেন: এস।

মুখে তাঁর প্রসন্নতা তখনও লেগে ছিল। এ তাঁর প্রসন্ন মনের প্রতিচ্ছবি।

স্বাতি গুনগুন করে গান ধরল। কথা নয়, শুধু সুর। কিন্তু কথাগুলি আমার জানা—

পূণম্‌ণি রাত উগি
পূণম্‌ণি রাত।

[ক্রমশ]

——

[পূর্বানুবৃত্তি]

এ সংসারে এক জাতের লোক আছে যাদের বাইরে থেকে দেখলে আর পাঁচজনের মতই মনে হয় নিরীহ ভাল মানুষ, কিন্তু কাজের সময় কোথা থেকে তারা যেন প্রচণ্ড শক্তি পায়, সবকিছু ভুলে গিয়ে মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করে, তখন আর তাদের দেখে চেনবার উপায় থাকে না। সুরজিৎ সেই জাতের মানুষ।

সুরজিৎ রতীন ঘোষালের কথায় এবং হৃষীকেশবাবুর সনির্বন্ধ অনুরোধে রুবী থিয়েটারের পরিচালক হতে রাজী হল বটে, তবে একেবারে বিনা সর্তে নয়। তার নির্দেশ-মত প্রদীপ মুখার্জী থেকে শুরু করে সবচেয়ে ক্ষুদে আর্টিস্টকেও জড়ো করা হল রিহার্সাল দেবার ঘরে। রতিবাবু যে অসুস্থ সে কথা থিয়েটারের সকলেই ইতিমধ্যে জেনে গেছে। তবে তার জায়গায় যে পরিচালনা করবে নাম-না-জানা নাট্যকার সুরজিৎ সেনগুপ্ত, সেকথা অনেকেই ভাবতে পারে নি।

সুরজিৎ সময় নষ্ট না করে হৃষীকেশবাবুকে পাশে বসিয়ে শিল্পীদের সম্বোধন করে বলে, আপনারা শুনেছেন বোধ হয়, এ থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের ইচ্ছে এই নতুন নাটক পয়লা বৈশাখ নামে। রতিবাবু অসুস্থ, অতএব পরিচালনার গুরুভার আমায় দিতে চান। চেষ্টা করলে সাতদিনের মধ্যে যে বই নামাতে পারব না তা নয়, কিন্তু তার জন্যে চাই আপনাদের সকলের পূর্ণ সহযোগিতা। আপনাদের মধ্যে অনেকে আমার চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ, অনেক বেশী অভিজ্ঞ। তাই আগে থেকেই বলে রাখছি, মঞ্চজগতে আমি নবীন, আমার পরিচালনা-পদ্ধতিও ভিন্ন। যদি আমাকেই পরিচালনা করতে হয় তা হলে আজ থেকে পয়লা বৈশাখ পর্যন্ত প্রতিদিন প্রত্যেক শিল্পীকে নির্দিষ্ট সময় আসতে হবে, আমার নির্দেশ মত মহলা দিতে হবে। কোনরকম ওজর আপত্তি আমি শুনব না। মঞ্চের ওপর কে কোথায় দাঁড়াবেন, কথা বলতে বলতে কতদূর এগোবেন তা আমি ছক কেটে বেঁধে দেব। সেইমত আপনাদের চলতে হবে।

রসময় ফস করে জিজ্ঞেস করে, তার মানে? শিল্পীদের কোন স্বাধীনতা থাকবে না?

সুরজিৎ গম্ভীর স্বরে উত্তর দেয় না। যেখানে যাকে দাঁড়াতে বলব সেইখানে দাঁড়িয়েই প্রতি রজনীতে অভিনয় করতে হবে—সে যত রাত্রিই হোক না কেন। আমি মনে করি, নাটক-অভিনয়ের সাফল্য নির্ভর করে শিল্পীদের টীমওয়ার্কের ওপর। এ অনেকটা ফুটবল খেলার মত। প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ের মধ্যে সহযোগিতা থাকা চাই, একজন সেণ্টার ফরোয়ার্ড ভাল খেলল, কি গোলকীপার জান লড়িয়ে গোল বাঁচাল, তার ওপর সে টীমের নৈপুণ্য নির্ভর করে না। নাটকও তাই, নায়ক-নায়িকার অভিনয়টাই সব নয়, সামান্য ভৃত্যের পার্টটাও কেমন হচ্ছে তা মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে।

প্রদীপ মুখার্জী স্বভাবসুলভ খাদের গলায় বলে, তার মানে এতদিন আমরা যা শিখে আসছি, আপনি বলতে চাইছেন তা ঠিক নয়?

সুরজিৎ হেসে জবাব দেয়, সে ঔদ্ধত্য আমার নেই, আমি একধরনের কাজে বিশ্বাসী। আমাকে কাজ করতে হলে সেই ভাবে করব, আপনারা তা মেনে নেবেন কি না সেইটাই হল প্রশ্ন, আর আমার কোন বক্তব্য নেই।

সুরজিতের এ প্রস্তাব অন্য সময় হলে নিশ্চয় কেউ মেনে নিত না, হয়তো পাগলের প্রলাপ বলে হেসে উড়িয়ে দিত। কিন্তু এ যাত্রা তা হল না, অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেনে নিল সকলে, শুধু হৃষীকেশবাবুর মুখের দিকে চেয়ে। তিনি নাকি ইতিমধ্যেই চড়া দামের নাম করা শিল্পীদের গোপনে ডেকে জানিয়ে দিয়েছেন, আগের নাটক চালিয়ে তাঁর লোকসান হয়েছে প্রচুর, অতএব পয়লা বৈশাখ থেকে নতুন বই খুলতে না পারলে রুবী থিয়েটার বন্ধ করে দেবেন। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার ইচ্ছে তাঁর নেই। সুতোর কলের মুনাফার টাকা থিয়েটারের লোকসান মেটাবার জন্যে ঢালতে তিনি রাজী নন।

অগত্যা শুরু হল প্রচণ্ড রিহার্সাল। তিনতলার ঘরে বসে রিহার্সাল দিলে চলবে না। তাই যে সময় মঞ্চ খালি আছে—সে সকাল দুপুর রাত্রি যখনই হোক না কেন মহলা দেওয়া হচ্ছে সীনের পর সীন। খাবার ব্যবস্থা হয়েছে থিয়েটারেই—মাংস আর গরম ভাত।

এ কদিন অফিস থেকে ছুটি নিয়েছে সুরজিৎ, বাড়িতে বলে রেখেছে কখন ফিরবে তার ঠিক নেই। রিহার্সাল দিয়ে শিল্পীরা চলে গেলেও সুরজিৎকে থিয়েটারেই আটকে থাকতে হয়। সেটের কাজ চলছে, নতুন ডিজাইনের সেট, সুরজিৎকে তারও তদারক করতে হয়। স্টেজ-ম্যানেজার মুকুল নন্দী সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে, পান-খাওয়া দাঁত বার করে বলে, এ আপনি এক নতুন জিনিস দেখালেন স্যার, একমিনিটের বিশ্রাম নেই, কী অমানুষিক পরিশ্রম! এ সব ছিল পুরনো কর্তাদের আমলে। সাতদিনের নোটিসে নতুন নাটক খুলত। আজকাল যে যুগ বদলেছে, তিনশো চারশো রাত্রি নাটক চালিয়ে তার ছিবড়ে বার করে তবে একটা বই বদলানো হয়। আর্টিসরাও তাই কুড়ে মেরে গেছে। এই তো দেখি হোলনাইটের রাত্রে দু'টার বেশী তিনটে নাটকে প্লে করতে বললেই মুখ ব্যাজার। শুধু পয়সা আর পয়সা। সত্যিকারের আর্টিস আর কেউ নেই।

সুরজিৎ লক্ষ্য করে দেখেছে আজকের দিনের তালটা থিয়েটারের লোকেরা কেউ দেখতে পায় না। তাই ইচ্ছে করে বলে, কিন্তু দেখুন, আমি নতুন লোক অথচ এ থিয়েটারের পুরনো আর্টিস্টরাও তো সবাই কথা শুনছেন।

দেখুন কদিন শোনে।

মেয়েদের গ্রীনরুম থেকে মন্দিরা একটা আটপৌরে শাড়ি পরে বেরিয়ে আসে। সুরজিতের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, দোতলার ঘরের জানলাটায় সবুজ রঙ দিলেন কেন?

মন্দিরাকে এসময় সুরজিৎ দেখতে পাবে মোটেই আশা করে নি। একদফা রিহার্সাল হয়ে গেছে সকালবেলা, আবার দুপুর থেকে ছোট আর্টিস্টদের নিয়ে পড়তে হবে। তাই তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করে, আপনি বাড়ি যান নি?

না। রিহার্সালের পর দুজন লোক এসেছিল, একটা ফিলিমের জন্যে। কথা বলতে বলতে দেরি হয়ে গেল। দুপুরবেলা তো আবার রিহার্সাল, তাই ভাবছি এখন আর বাড়ি যাব না।

দুপুরে তো আপনার ছুটি, ছোটখাটো পার্টগুলোর রিহার্সাল নেব।

তা হলেও রিহার্সাল দেখতে আমার খুব ভাল লাগে। দরকার হলে আপনাকে সাহায্যও করতে পারি। অবশ্য আপনি আপত্তি করলে থাকব না। গ্রীনরুমে একটু ঘুমিয়ে নেব।

সুরজিৎ বাধা দিয়ে বলে, থাকলে তো ভালই, একলা কাজ করতে করতে এক এক সময় বড় বিরক্ত লাগে।

মন্দিরা ব্যাগের ভেতর থেকে পান বার করে খায়। বলে, বেশ তো, যাকে কিছুতেই সামলাতে পারবেন না আমার হাতে ছেড়ে দেবেন, পাখি পড়ার মত করে শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ে আসব। কিন্তু বললেন না তো, দোতলার জানলায় সবুজ রঙ দিতে বলেছেন কেন?

কেন, ভাল দেখাচ্ছে না?

আপনার বুঝি চোখ নেই? ওটা এখুনি বদলে খয়ের রঙ করতে বলুন।

মুকুল নন্দী চট্ করে কথার খেই ধরে: মোনোদি কিন্তু এটা ঠিক বলেছে, আমিও ভাবছিলাম আপনাকে বলব বলে, সাহস হল না। জানলা দরজা খয়ের রঙ হলে ও সীনখানা কিন্তু খুব চোখে ধরবে।

সুরজিৎ বোঝে, এদের রঙের জ্ঞান সেই মান্ধাতার আমলের—বেগুনী রঙের দেয়াল, খয়েরী জানালা, আর গোলাপী পর্দা যে যুগের ড্রইংরুমের একচেটে ফ্যাশান ছিল। তবু হেসে বলে, যিনি আর্ট ডিরেক্টার, তাঁকে জিজ্ঞেস করে যা হোক একটা ঠিক করা যাবে।

মন্দিরাকে সুরজিতের সঙ্গে কথা বলতে দেখে বিপিন এসে সেখানে দাঁড়ায়। বিপিন রূপশ্রী থিয়েটারের ইলেকট্রিশিয়ান, আলোকসম্পাতেরও কাজ করে। মন্দিরার কাছে এসে ফিসফিস করে বলে, বাবুর কাছে আমার আরজিটা পেশ করেছেন?

মন্দিরার কথাটা মনেই ছিল, তবু বিপিনকে দেখে যেন কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেইরকম ভান করে: ওহো, আপনাকে বলতে ভুলে গেছি। বিপিনদার ইচ্ছে নতুন নাটক খোলা হচ্ছে, এই সুযোগে কিছু স্পট লাইট কেনা হোক।

বিপিন মিস্ত্রী সায় দিয়ে বলে, সত্যি বাবু, কয়েকটা আলো না হলে আর চলছে না। দু সারি লাইট ওপরে আর নীচে ফুট লাইট। এ ছাড়া তো আছে সবে ধন নীলমণি দুখানি আর্ক ল্যাম্প। এ নিয়ে আর আলোর খেলা কী দেখাব?

সুরজিৎ উত্তর দেয়, এ নিয়ে আমি আগেই ভেবেছি, হৃষীকেশবাবুর সঙ্গে কথাও হয়ে গেছে। আমার এক বন্ধু আছে, লাইটিং করে, তাকে নিয়ে আসব।

বিপিন ভুরু কোঁচকায়, কে বলুন তো?

অলক ঘোষ।

বেশ ছিপছিপে ফরসা চেহারা? মাঝখানে সিঁথে?

চেনেন নাকি?

চিনি বইকি, কলকাতায় কে কোথায় কি রকম লাইটিং করছে সব খবর রাখি। অলকবাবু তো এই কদিন আগেই এসেছিল, এই বোর্ডে অ্যামেচার পার্টির সঙ্গে। বেশ ভাল কাজ করে। লাস্ট সীনে এমন একটা জলের খেলা দেখাল যে আমাকেই তাজ্জব করে দিয়েছে।

সুরজিৎ মৃদু হাসে: আজকালের মধ্যেই ওকে নিয়ে আসব।

বিপিন হাততালি দিয়ে ওঠে: তা হলে আর দেখতে হবে না, এ একেবারে ফার্স্ট ক্লাস বই হবে। দুশো রাত চোখ বুজে।

ওর কথা বলার ধরন দেখে মন্দিরা হাসে: বিপিনদাকে খুব খুশী দেখছি। দাঁড়ান, আগে নাটক নামুক, পয়সা দিয়ে লোকে টিকিট কাটুক—তবে তো।

বিপিন সগর্বে বলে, হবে গো দিদি, ঠিক হবে। সবাই মিলে আমরা প্রাণ দিয়ে খাটছি, তার একটা দাম নেই। আজকাল সব ফাঁকিবাজীর কাজ হয়েছে, লক্ষ্মীঠাকুরও তাই ফাঁকি দেন।

বাড়িতে ফিরতে পারবে না সুরজিৎ তা জানত, ভেবেছিল কাছাকাছি কোন হোটেল থেকে খেয়ে এসে আবার রিহার্সাল নেবে, কিন্তু মন্দিরা তা করতে দিল না। বলল, হৃষীবাবু আমাকে বলে গেছেন, আপনার খাবার থিয়েটারে আনিয়ে দেবার জন্যে। আমি ম্যানেজারবাবুকে বলেও রেখেছি, ঠিক একটার সময় মাংসের কাটলেট, পাঁউরুটি আর কারি নিয়ে আসবে। আর আপনার খাবার তদারক করব বলে আমার জন্যেও ওই একই খাবার আসবে কোম্পানির পয়সায়।

সুরজিৎ মৃদুস্বরে বলে, এত হাঙ্গামা করার কিছু দরকার ছিল না।

ছিল না কেন, নিশ্চয়ই ছিল। আপনি যে এই দিন নেই রাত নেই ভূতের মত খাটছেন, কার জন্যে—না থিয়েটারের জন্যে, তবে তারাই বা আপনার সুখ-সুবিধেটা দেখবে না কেন?

যথাসময়ে খাবার এল। রমেন চৌধুরী দোতলার গ্রীনরুমে খাবার ব্যবস্থা করে ডেকে পাঠালেন সুরজিৎ

আর মন্দিরাকে। খাতির করে বসিয়ে একগাল হেসে বললেন, আপনাদের জন্যে আমি এতক্ষণ অপেক্ষা করে আছি।

মন্দিরা শুহ যেন মুখ ফসকে বলে ফেলে, তবে তো আমাদের মাথা কিনেছেন।

না, তোমার কথার ধরন দেখছি সেই একরকম রয়ে গেল। কার সামনে কী বলতে হয় তা বোঝ না। সুরজিৎবাবু নতুন লোক, উনি এ সব শুনলে কি ভাববেন বল তো।

সুরজিৎ হেসে অন্য কথা পাড়ে: আপনার বোধ হয় এখনও খাওয়া হয় নি।

কই আর হল! এখন বাড়ি যাব, স্নান করব, খাব।

মন্দিরা তার কথা শেষ করতে না দিয়ে একই সুরে বলে যায়, ঘুমব, বউয়ের সঙ্গে গল্প করব, যে খোসামোদ করবে তাকে থিয়েটারে নামাব।

রমেন চৌধুরী এবার সত্যি বিরক্ত হয়: আ মন্দিরা, তোমার দেখছি কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই।

সুরজিৎ দুজনকে থামিয়ে দেয়: তা হলে আর আপনি দেরি করবেন না, বাড়ি গিয়ে খেয়ে নিন।

রমেন চৌধুরীর শুকনো মুখে হাসি ফোটে: আর যা দরকার হবে মন্দিরাকে বলবেন, বাইরে চাকর রইল, ডাক দিয়ে আনিয়ে নেবে। আমি তা হলে চলি।

হাত তুলে নমস্কার করে রমেন চৌধুরী চলে গেল। সেইদিকে তাকিয়ে মন্দিরা বক্রোক্তি করে, একটা ভিজে বেড়াল।

সুরজিৎ হেসে ফেলে: কেন বলুন তো, ওঁকে বুঝি আপনার ভাল লাগে না?

ভাল লাগবার মত তো ওঁর কিছু নেই।

দুজনেরই খিদে পেয়েছিল খুব, রান্নাগুলোও উতরেছে ভাল, দুজনেই তার সদ্ব্যবহার করে। মাংসের ঝোলে রুটি ডুবিয়ে মন্দিরা তারিয়ে তারিয়ে খায়। গল্পচ্ছলে বলে, আপনি এ থিয়েটারে যোগ দেওয়ায় কারা সবচেয়ে খুশী হয়েছে জানেন?

কারা?

স্টেজ-ম্যানেজার মুকুলদা, লাইটের বিপিনদা, ড্রেসার গোকুলদাস—এদের আনন্দের সীমা নেই। সত্যি কথা বলতে কি, রতীনদা তো আর এদের নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। পুরনো ড্রেস, পুরনো সেট এই সব দিয়েই কাজ চালাতেন। আপনি আসার পর এরা একটু কাজ দেখাবার সুযোগ পাচ্ছে।

সুরজিৎ দুষ্টুমি করে হাসে: কিন্তু আর্টিস্টরা কি বলছে?

কুচো আর্টিস্টরা মহা খুশী। তাদের নিয়ে তো আগে কোনদিন রিহার্সালই হত না। তারা আপনার ভক্ত হয়ে পড়েছে।

কিন্তু প্রদীপবাবুরা?

মন্দিরা মুচকি হাসে: ওঁরা বোধ হয় একটু বিপদে পড়েছেন। এত বেশী বাধ্যবাধকতা মোটেই পছন্দ করছেন না। আপনি যখন থাকেন না রসময়দা আপনাকে নিয়ে ক্যারিকেচার করে লোক হাসায়। ও আপনার নাম দিয়েছে—

সুরজিৎ হেসে বলে, শায়েস্তা খাঁ।

মন্দিরা বিস্মিত হয়: কি করে জানলেন!

আপনারা আমাকে যতটা বোকা মনে করেন, আমি বোধ হয় ততটা বোকা নই।

মন্দিরা দুঃখিত স্বরে বলে, আপনি আমাকে কেন জড়াচ্ছেন। আমি মোটেই ওদের দলে নই। আমি তো চাই আপনাদের মত শিক্ষিত লোক আসুন, থিয়েটারের উন্নতি হোক।

সুরজিৎ অন্যমনস্ক স্বরে বলে, সত্যিই কি চান?

কেন, বিশ্বাস হয় না?

মন্দিরা তার বড় বড় চোখ দুটো তুলে নিষ্পলক দৃষ্টিতে সুরজিতের মুখের দিকে তাকায়। বড় পবিত্র সে চাউনি। তাকে অবিশ্বাস করা যায় না।

সুরজিৎ ইচ্ছে করেই অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নেয়। মন্দিরার এই ধরনের অভিমানভরা কথা শুনলে, তার ওই অচপল চোখের দিকে তাকালে অনেক সময় তাকে খুব কাছের মানুষ বলে মনে হয়—যেন বহুদিনের পরিচয়।

মনের ভাব গোপন করে সুরজিৎ জিজ্ঞেস করে, পরশু সকালে আপনাদের বাড়ি যাব? দেখা হবে বাবার সঙ্গে?

মন্দিরা খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়ায়: নটগুরুর কাছে যাবেন?

ইচ্ছে তাই।

বেশ তো, সাড়ে নটার সময় আসবেন। বাবা নিয়ে যাবেন। একটু থেমে বলে, হাত ধোবেন তো নীচে চলুন, সাবান আছে মুকুন্দদার কাছে।

সুরজিৎ আর মন্দিরা নীচে নেমে যায়।

মাত্র ক বছর কলকাতায় এসেই অলক ঘোষ রীতিমত নিজের প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে। ছেলেবেলা থেকে সে যে আলো নিয়ে খেলা করেছে, যৌবনে যার সাধনায় লেখাপড়া পর্যন্ত করতে পারে নি, এখন তারই সঙ্গে খানিকটা ব্যবসাবুদ্ধি লাগিয়ে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে, সেই সঙ্গে টাকাও। টাকা অনেকের সর্বনাশ করে, কিন্তু অলক ঘোষকে কিছু করতে পারে নি। নিঃস্ব থেকে বড় হয়েছে বলেই বোধ হয় টাকা রোজগারের তার একটা নিজস্ব পদ্ধতি আছে। প্রগতিমঞ্চের মত যে সব প্রতিষ্ঠান নাটকের উন্নতির জন্য প্রাণপণে খাটে, তাদের কাছ থেকে সে টাকা নেয় নামমাত্র। এমন কি তাদের লোকসান হলে কত সময় পয়সা না নিয়েও চলে আসে। সে টাকাটা সে উসুল করে নেয় বড়লোকের বাড়ির বিয়েতে, ছেলের ভাতে কিংবা দেয়ালীতে অবাঙালীদের বাড়ি আলো দিয়ে সাজিয়ে। শুধু তাই নয়, বছর দশেক ধরে কলকাতায় যেন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্লাবন বইছে। তার মধ্যে যে দু-চারটে সত্যিকারের ভাল অনুষ্ঠানও হয় না তা নয়, কিন্তু বেশীর ভাগই হুজুগের ওপর চলে যাচ্ছে। সাহেবপাড়ার বড়লোকী হল এম্পায়ারে এমন কোন রবিবার সকাল ফাঁকা যায় না যেদিন কোন না কোন নাটক হচ্ছে। সবই প্রায় খেয়ালী সংঘ, বছরে একটা অনুষ্ঠান করে। এদের ওপর কিন্তু অলক ঘোষের এতটুকু দয়ামায়া নেই, নির্দয়ভাবে টাকা আদায় করে। তবে ফাঁকি দেয় না, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে আলোর চরকি ঘুরিয়ে, মঞ্চে বৃষ্টি পড়িয়ে, আকাশে মেঘ উড়িয়ে দর্শকদের কাছ থেকে হাততালি আদায় করে।

কিন্তু যা পায় না তা হল আনন্দ। যে সৃষ্টি করতে চায়, তার ভাল লাগে না মামুলী পাঁচটা কাজ করে টাকা রোজগার করতে। তাই সে কাজ করে প্রগতিমঞ্চে কিছু সৃষ্টি করার আশায়, ঢুকতে চায় সাধারণ রঙ্গমঞ্চে, যদি কিছু সে দিয়ে যেতে পারে।

কদিন বাদেই সুরজিৎ হাজরাকে দিয়ে তাকে কফিহাউসে ডেকে পাঠিয়ে যখন বলল রুবী থিয়েটারে যোগ দেওয়ার কথা, অলক ঘোষ সানন্দে বলেছিল, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এই সুযোগ দেবার জন্য।

সুরজিৎ সব ব্যাপার পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেয়: হঠাৎ আমার ঘাড়ে এতরকম ঝক্কি এসে পড়েছে যে ভাল মন্দ কি হবে কিছু বুঝতে পারছি না। তাই আপনাকে পেলে আমার নিজের বড় উপকার হবে।

আমার যতদূর ক্ষমতা আপনাকে সাহায্য করব।

তবুও সুরজিৎ সহজ হতে পারে না, কি যেন ভেবে ইতস্তত করে: ওরা আপনাকে এর জন্যে কত টাকা দেবে আমি এখন কিছু বলতে পারছি না।

অলক ঘোষ প্রাণ খুলে হাসে: এজন্যে ভাবনার কিছু নেই—কাজ দেখাব, খুশী হলে ওঁরা টাকা দেবেন, বাস্। শুধু গোড়া থেকেই বিজ্ঞাপনে যেন নামটা আমার যায়।

সুবোধ হাজরা মাঝখান থেকে বলে, তোমাদের যে দুজনকে ভিড়িয়ে দিলাম, আমার দালালীটা চাই।

অলক ঘোষ তখুনি তিন কাপ কফির সঙ্গে সেই পরিমাণ কেক আর স্যাণ্ডউইচ আনার অর্ডার দেয়।

পরের দিন থেকেই অলক ঘোষ মেতে উঠেছে 'নূতন যুগের ভোরে'র লাইটিং চার্ট করতে। সুরজিতের কাছ থেকে নাটক চেয়ে নিয়ে পড়ে, কোথায় সাধারণ আলো পড়বে, কোথায় দিতে হবে স্পেশাল এফেক্ট তা লাল পেনসিল দিয়ে দাগ কেটে নিয়েছে। সুরজিতের অবসর-মত তার সঙ্গে বসে নাটকের বক্তব্যটা পরিষ্কার করে বুঝে নিয়ে মনে মনে স্থির করে রেখেছে আলোর সাহায্যে

কতরকম আবহাওয়া তাকে সৃষ্টি করতে হবে। এর জন্যে অবশ্য চাই নানা রকম আলো, তার সঙ্গে লাগোয়া ডীমার। সুরজিতের সঙ্গে গিয়ে হৃষীবাবুকে আলো সংক্রান্ত সব কথা সে বুঝিয়ে এসেছে, হাতে ধরিয়েও দিয়েছে একটা লম্বা ফর্দ—কি কি আলো রুবী থিয়েটারকে এখুনি কিনতে হবে।

হৃষীবাবু অবশ্য চোখ কপালে তুলে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি আমাকে ফতুর করে ছাড়বেন নাকি মশায় ?

অলক ঘোষ হেসে উত্তর দেয়, দেখবেন কি খেলা দেখাই, নাটকের নাম দিয়েছেন 'নূতন যুগের ভোরে', আলোকসম্পাতেও দেখবেন নতুন যুগের সূচনা করব এই রুবী থিয়েটারে।

হৃষীকেশবাবু তখনও নাক কোঁচকান : কিন্তু খরচ যে অনেক।

তা একটু হবে বইকি। তবে নাটক চললে এক মাসে উঠে যাবে—বলেন তো প্রথম মাসটা আমি নিজের আলো দিয়েই চালিয়ে দেব, ভাড়া হিসেবে যা হয় দেবেন, তারপর নাটক ধরলে নিজেরা কিনে নেবেন।

পাকা ব্যবসাদারের মত কথাটি বলে অলক ঘোষ তীক্ষ্ণ চোখে হৃষীবাবুকে লক্ষ্য করে। যা ভেবেছিল তাই, ওষুধ ঠিকই ধরেছে। হৃষীবাবু কানের মধ্যে পালক চালিয়ে বেশ খানিকক্ষণ ধরে সুড়সুড়ি দিয়ে সুরজিৎকে বললেন, আপনার বন্ধু এ কথাটি মন্দ বলেন নি, ওঁর প্রস্তাবে আমি রাজী আছি।

• সুরজিৎ আশ্বস্ত হয়ে বলে, ওর নামটা কিন্তু বিজ্ঞাপনে দিতে হবে।

হৃষীবাবু জোর দিয়ে বলেন, নিশ্চয় দেব। কাল থেকেই যাতে কাগজে অলকবাবুর নাম ছাপা হয় আমি তার ব্যবস্থা করছি।

হৃষীবাবুর কথার নড়চড় হয় নি। পরদিন থেকে রুবী থিয়েটারের নতুন নাটকের বিজ্ঞাপনে নাট্যকার-পরিচালক সুরজিৎ সেনগুপ্তর সঙ্গে আলোকসম্পাতে অলক ঘোষের নামও ছাপা হয়েছে। শুধু যে নামই একত্রে ছাপা হল তা নয়, এর পর থেকে প্রায়ই এদের দুজনকে একসঙ্গে দেখা যেত রুবী থিয়েটারে, কফিহাউসে কিংবা সুরজিৎদের বাড়িতে। অলক ঘোষের পক্ষে আর একজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা সহজ, কারণ নিজের মতামতকে সে কখনও নির্ভুল বলে আঁকড়ে বসে থাকতে চায় না। নিজের রুচিমত সুরজিৎকে নানারকম পরামর্শ দেয় শুধু আলোকসম্পাতেই নয়, অভিনয় নাটক দৃশ্যসজ্জা সব বিষয়ে। সুরজিৎ তার কথামত কাজ করলে খুশী হয়, কিন্তু না করলে রাগ করে না—এইটেই তার বৈশিষ্ট্য।

একটা কাজের মধ্যে দিয়ে আলাপ বলেই বোধ হয় তারা এতখানি অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পেরেছে—যা দেখলে কেউ বুঝতে পারে না তাদের পরিচয় অতি অল্প দিনের। পরকে আপন করে নেবার ক্ষমতা এক একজনের থাকে, অলকের তা আছে খুব বেশী মাত্রায়। সেইজন্যে সুরজিতের বাড়িতে সকলের সঙ্গে সে বেশ আলাপ জমিয়ে নিয়েছে। সুরজিৎ বাড়িতে না থাকলেও অলক এখন নিঃসঙ্কোচে মাধবী এবং পদ্মাবতীর সঙ্গে গল্প করে।

সেদিন হঠাৎ কালবৈশাখীর ঝড় উঠল। কদিন চাপা গরমের পর এ ঝড়কে সাগ্রহে অভ্যর্থনা জানাল সকলেই। দরজা জানলা সব বন্ধ করে মাধবী সবেমাত্র নীচে নেমে এসেছে এমন সময় কে দরজায় ধাক্কা মারল। হয়তো সুরজিৎ ফিরে এসেছে ভেবে তাড়াতাড়ি মাধবী দরজা খোলে।

সুরজিৎ নয়—অলক ঘোষ। একগাদা কাগজপত্র নিয়ে ঝড়ের মতই ঘরে ঢুকে পড়ে। বলে, উঃ কি বিশ্রী ঝড়, দরজাটা বন্ধ করে দিন।

মাধবী ছিটকিনি আটকে দিতে দিতে বলে, আমি ভেবেছিলাম দাদা ফিরল।

অলক ঘোষ গা হাত পা থেকে ধুলো ঝাড়ছিল। চোখ তুলে জিজ্ঞেস করল, সেকি, সুরজিৎবাবু বাড়ি নেই ?

কই এখনও ফেরে নি তো। সেই সকালবেলা থিয়েটারে গেছে।

অলক হাতের ফাইলগুলো নাড়াচাড়া করে : আশ্চর্য, আমাকে যে বললেন পাঁচটার সময় এখানে আসতে ! ঝড়ের জন্যে আমার আসতে দেরি হয়ে গেল।

তা হলে হয়তো দাদা কোথাও আটকে গেছে। বলেছে যখন ও নিশ্চয় আসবে, আপনি বসুন।

অলক হেসে বলে, বসব তো নিশ্চয়, এই ঝড় মাথায় করে তো আর বেরিয়ে যেতে পারব না। তা ছাড়া ওঁর সঙ্গে দেখা করতেই হবে, জরুরী দরকার। যদি এখানে দেখা না হয় ছুটতে হবে রুবী থিয়েটারে।

একটু অপেক্ষা করুন, আমি মাকে বলে আসি আপনি এসেছেন।

মাধবী ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

অলক পকেট থেকে কলম বার করে কাগজের ওপর আঁক কাটে। সারা রাস্তা আসতে আসতে সে ভেবেছে সুরজিতের এই নতুন নাটকে কোন ঝড়ের দৃশ্যের অবতারণা করা যায় কি না। প্রথম অবসর পেয়েই ছক কেটে বোঝবার চেষ্টা করে। মঞ্চের কোথায় কি ধরনের আলো দিলে ঝড়ের সৃষ্টি করা সম্ভব।

এইভাবেই তার মাথায় এক একটা খেয়াল চাপে। বাসে করে ময়দান পেরিয়ে আসবার সময় আজ সে লক্ষ্য করেছে, পশ্চিমাকাশের কালো মেঘের ঘনঘটা। চারদিক অন্ধকার করে উঠল ধুলোর ঝড়, ফাঁকা মাঠের ওপর সে কী ধুলোর ঘূর্ণী। অন্য সবাই যখন ঝড়ের ভয়ে বাসের জানলা বন্ধ করতে ব্যস্ত, অলক তখন বাসের সিঁড়ির কাছে বেরিয়ে এসে দু চোখ ভরে দেখেছে ঝড়ের রুদ্র মূর্তি, মনে জেগেছে তার উল্লাস, নতুন কিছু সৃষ্টি করার আগে বুকের ভিতরটা কেমন যেন অজানা আনন্দে পুলকিত হয়ে ওঠে।

পদ্মাবতী ঘরে ঢুকে দেখেন অলক তন্ময় হয়ে কাগজে ছবি আঁকছে। হেসে প্রশ্ন করলেন, কাজ করছ?

পদ্মাবতীকে দেখে অলক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। হেসে বলে, না, মাথায় এক পাগলামি চেপেছে তাই দেখছি কিছু করা যায় কিনা।

দাঁড়ালে কেন, বস। শুনি কি পাগলামি তোমার?

অলক কাগজে আঁকা নকশাটা টেবিলের ওপর মেলে ধরে: ভাবছি এই কালবোশেখীর ঝড়টা স্টেজের ওপর দেখানো সম্ভব কি না।

পদ্মাবতী পুরনো যুগের কথা ভাববার চেষ্টা করেন: আগেও যেন দেখেছি মনে হচ্ছে কোনও থিয়েটারে ঝড় উঠল, খুব বৃষ্টি।

অলক ঘোষ হেসে বলে, সেসব জানলার পেছনে তো, আমি খুব জানি। তবে ও জিনিস চাইছি না। আমি দেখাতে চাই প্রচণ্ড ঝড়, দেখাতে চাই মঞ্চের ওপর ধুলোর ঘূর্ণী—যা দেখে দর্শকরা ভয় পাবে, শিউরে উঠবে, নাকেমুখে কাপড় চাপা দেবে।

বলতে বলতে অলক ঘোষ উত্তেজিত হয়ে ওঠে, এ যদি করতে পারি, 'নূতন যুগের ভোরে' একেবারে 'হিট' হয়ে যাবে, কিন্তু—

মাধবী চা-জলখাবারের ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকেছিল, অলকের হাত পা নাড়া দেখে না হেসে পারে না। বলে, কি হল, অভিনয় করছেন বুঝি?

মাধবীর কথা বলার ধরনে অলক হেসে ফেলে। পদ্মাবতী ট্রে থেকে কাপডিসগুলো নামিয়ে টেবিলের ওপর সাজিয়ে দেন: অলক ভাবছে একটা ঝড়—

মাধবী থামিয়ে দেয়, আমি সব শুনতে পেয়েছি, বলতে নেই গলাটা ওঁর বেশ থিয়েটারে অ্যাকটিং করার মত। শেষ রো পর্যন্ত দর্শক শুনতে পাবে।

অলক সজোরে হেসে বলে, আপনাদের ভাইবোনের কথা বলার ধরনটা এক রকমের। বেশ হিউমার আছে। তবে কি জানেন একটু মুশকিল আছে।

কিসের মুশকিল?

অলক চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলে, মুশকিল আপনার দাদাকে নিয়ে। জানেন মাসীমা, আপনার ছেলের সব ভাল, কিন্তু বড় একগুঁয়ে। একবার যদি বেঁকে বসে কিছুতেই ঝড় তুলতে দেবে না।

তা হলে কি করবেন?

খুব ভাবনার কথা। থিয়েটারে নাম দিয়েছে শায়েস্তা খাঁ।

শুনেই মাধবী খিলখিল করে হেসে ওঠে: তাই নাকি, দাদা তো কই আমায় বলে নি!

অলক ঘোষ ভয় পায়: দেখবেন, আমি বলেছি আবার

বলবেন না। তা হলে আর ঝড়ের কোন চান্স থাকবে না।—একটু থেমে বলে, আমি কি ভাবি জানেন মাসীমা, লোকে কেন আমার মত হয় না।

মাধবী সকৌতুকে প্রশ্ন করে, তা হলে কি হত?

কোন গণ্ডগোলই থাকত না। আমি হলাম কি রকম জানেন—অনেকটা মেয়েদের মত অর্থাৎ তরল পদার্থ। যে পাত্রে রাখবেন তারই আকার পাব।

দেখছ মা, অলকবাবু আমাদের ঠুকে কথা বলছেন।

অলক চট্ করে উত্তর দেয়, যদি ঠোকবার ইচ্ছে থাকত, নিশ্চয় নিজেকে জড়িয়ে কথা বলতাম না।

এদের কথাবার্তা শুনে পদ্মাবতী হাসেন: তোমার জন্যে আরও একটু চা নিয়ে আসি অলক।

বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে কিন্তু, আর এক কাপ গরম চা পেলে মন্দ হয় না মাসীমা।

মাধবী চা আনবার জন্যে উঠতে যাচ্ছিল, পদ্মাবতী বাধা দিয়ে বললেন, তোমরা বসে গল্প কর, আমি চা ক'রে আনছি।

পদ্মাবতী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

তখনও দুর্গাশঙ্করের চোখ থেকে ঘুম যায় নি। বিছানায় শুয়ে শুয়েই এপাশ ওপাশ ফিরছেন, ঘরে পাখা নেই, বেশ গরম। কোঁচার খুঁটটা নিয়ে বুক পিঠের ঘাম্ মুছে ফেলেন, কানে যায় বাইরে তুমুল ঝগড়া চলছে।

মন্দিরার গলা, খন্‌খনে তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর: আমাকে আর নিয়ম শেখাতে এস না, বাড়িটাকে তো আঁস্তাকুড় করে ছেড়েছ, তার ওপর যতসব লম্বা-চওড়া কথা। থাকত আজ মা বেঁচে, গলাধাক্কা দিয়ে তোমাদের বিদেয় করত।

সঙ্গে সঙ্গে ওপর থেকে তীব্র আক্রমণ হয়—মন্দিরার দিদি গিরিবালা চিৎকার করে বলে, আমাকে রাগাস না বলছি মনো, যদি একবার মুখ ছোটাই তা হলে আর থামাতে পারবি না। বয়েস আছে তাই থিয়েটারে পার্ট পাচ্ছিস, তার জন্যে অত মেজাজ কিসের? আমাদেরও একদিন ছিল। শেষবেশ দেখব, কিসের রোজগারে হাঁড়ি চড়ে। জামাই পুষে ভদ্রলোক হয়েছেন।

এ ঝগড়া নতুন নয়, প্রায়ই লেগে থাকে। যে কোন অছিলায় গিরিবালা ঝগড়া বাধায়, পাড়া মাথায় করে মন্দিরার পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করে। ভাবতেও দুর্গাশঙ্করের আশ্চর্য লাগে, করুণাময়ীর মেয়ে কি করে এতটা নীচে নেমে গেল। পয়সার অভাবই কি এর একমাত্র কারণ, না মন্দিরার ওপর হিংসে।

নীচে মন্দিরা থেমে গেছে, কিন্তু তখনও গিরিবালার গলা ভেসে আসে, বলি ওই মোদো-মাতালটাকে যে বাড়িতে রেখেছ, বুঝলাম না হয় তোর বাপ, কিন্তু আমার ছেলেমেয়েগুলো কি শিক্ষে পাবে শুনি। একটু বয়েস হলেই তো গিয়ে শুঁড়ীর দোকানে ঢুকবে।

এ গালমন্দও প্রায় দুর্গাশঙ্করকে রোজ শুনতে হয়, অথচ একদিন ওই গিরিবালা আর তার ভাইকে নিজের ছেলেমেয়ের মত করে তিনি মানুষ করেছেন। জ্ঞানতঃ মন্দিরার সঙ্গে কোনদিন তাদের পার্থক্য করেন নি, কিন্তু আজ! মন্দিরাই তাঁকে শুধু বাবা বলে স্বীকার করে, আর সকলের তিনি শত্রু। এক একসময় তাঁর নিজের ওপর বড় রাগ হয়, কেন রোজগারের কোন চেষ্টা না করে এই বাড়িতে এসে উঠলেন অন্যের গলগ্রহ হয়ে। অথচ এখন শরীরটাও ভেঙে পড়েছে, কাজ পেলেও বোধ হয় করতে পারবেন না। তার ওপর মৌতাত—কেমন যেন সারাদিনটাই আচ্ছন্ন করে রাখে। যতক্ষণ না বেহুঁশ হয়ে পড়েন ততক্ষণ আর শান্তি নেই।

একটু পরে মনে হল বাইরের আবহাওয়া ঠাণ্ডা হয়েছে। অন্ততঃ কারুর গলা শোনা যাচ্ছে না।

দুর্গাশঙ্কর আস্তে আস্তে বাইরে বেরিয়ে এসে ভয়ে ভয়ে চারদিক দেখে নিয়ে দাওয়ায় বসে বালতি থেকে আঁজলা করে জল নিয়ে বারকয়েক কুলকুচো করে মুখটা ধুয়ে ফেললেন।

মন্দিরার পাঁচ বছরের ফুটফুটে মেয়েটা দাদুর কাছে এসে গলা জড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, দাদু চা খাবে?

নাতনীকে দেখে দুর্গাশঙ্কর খুশী হয়ে হাসেন, তাকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করে প্রশ্ন করেন, কে জিজ্ঞেস করল।

খুকু দাদুর পৈতেটা আঙুলে জড়াতে জড়াতে উত্তর দেয়, গোবিন্দর মা।

মা কোথায় রে?

চান করতে গেছে।

আচ্ছা চাটা দিতে বল্।

খুকু চলে গেলে দুর্গাশঙ্কর দাওয়াতে বসে বসেই চারদিকটা ভাল করে দেখেন। সত্যি, এ ক বছরের মধ্যে বাড়িটার কী অবস্থাই না হয়েছে। তবু যা হোক মন্দিরা একতলাটা সাধ্যমত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখে, কিন্তু ওপরের তলাগুলো এখনি মিস্ত্রী লাগানো দরকার। দেয়ালে দু তিন জায়গায় ফাট ধরেছে, বহুদিন রঙ না পড়ে জানলা-দরজার কাঠগুলোও ছাতাপড়া দেখায়। কিন্তু করবে কে? যেমন গিরিবালা তেমনই তার ভাই। না আছে তাদের ইচ্ছে, না আছে সামর্থ্য। করুণাময়ীর সময়ে এ বাড়ির বোলবোলার কথা মনে পড়লে দুর্গাশঙ্করের দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

কাল রাত্রে বোধ হয় বেশী কিছু খাওয়া হয় নি, বেশ খিদে পেয়েছে। ঘরে ঢুকে পাঞ্জাবির পকেট হাতড়ে দু আনা পয়সা নিয়ে বেরিয়ে এলেন একেবারে বাড়ির বাইরে। সামনের দোকানে গরম তেলেভাজা ভাজছে, পাতার ঠোঙায় খানকয়েক গরম বেগুনি নিয়ে আবার বাড়িতে ঢুকলেন। খুকুকে তেলেভাজা দিলে মন্দিরা রাগ করে, তাই নিজেই বসে বসে খেতে শুরু করলেন।

এমন সময় সুরজিৎ এসে দরজার কাছে দাঁড়াল। দুর্গাশঙ্কর দেখেও যেন দেখলেন না।

সুরজিৎ তাঁকেই জিজ্ঞেস করে, এটা কি মন্দিরা দেবীর বাড়ি?

দুর্গাশঙ্কর গরম তেলেভাজা মুখে পুরে কোনরকমে সামলাতে সামলাতে বলেন, পুরো বাড়িটা নয়, এই একতলাটা।

সুরজিৎ ঠিক বুঝতে পারল না, আবার প্রশ্ন করে, উনি বাড়িতে আছেন?

চান করছে।

আমার এই সময় আসবার কথা ছিল।

অন্যমনস্ক দুর্গাশঙ্কর উত্তর দিলেন, ভাল।

সুরজিৎ ভেবে পেল না এখন সে কী করবে। ভদ্রলোক ভেতরে যেতেও বললেন না, তবে কি সে বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকবে।

কিন্তু বেশীক্ষণ এ ভাবে দাঁড়াতে হল না, গোবিন্দর মা দুর্গাশঙ্করকে চা দিতে এসে বাইরে সুরজিৎকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল। মাথার ঘোমটা টেনে দিয়ে বলল, আপনি দিদিমণিকে খুঁজছেন তো বাবু, ভেতরে আসুন। উনি এখনই আসছেন।

গোবিন্দর মা দুর্গাশঙ্করের কাছেই একটা মোড়া পেতে দিয়ে সুরজিৎকে বসতে বলে ভেতরে চলে গেল।

দুর্গাশঙ্কর বেশ ভাল করে সুরজিতের আপাদমস্তক লক্ষ্য করলেন। কি মনে হতে তেলেভাজার ঠোঙাটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, খাবেন নাকি?

সুরজিৎ ছোট্ট উত্তর দিল, না।

গরম তেলেভাজা। অতি উপাদেয়।

আপনি খান।

একটু চুপ করে থেকে দুর্গাশঙ্কর আবার জিজ্ঞেস করেন, তেলীপাড়ার ঘুগনি খেয়েছেন?

প্রশ্ন শুনে সুরজিৎ বেশ মজা পায়। বলে, না।

তবে তো কিছুই খান নি। অবশ্য বয়েসই বাকি, খাবার সময় এখনও যায় নি।

ইতিমধ্যে গোবিন্দর মা চা দিয়ে গেল, ইচ্ছে না থাকলেও সুরজিৎ না বলতে পারল না। কাপটা হাতে নিয়ে বুঝল চা একেবারে ঠাণ্ডা।

দুর্গাশঙ্কর তেলেভাজা শেষ করে জল দিয়ে হাতটা ধুয়ে কোঁচায় মুছে ফেলেন: আপনি বুঝি স্টুডিওর লোক?

আজ্ঞে না।

তবে কি অ্যামেচারে থিয়েটার করেন?

সুরজিৎ হেসে বলে, আগে তাই করতাম, তবে এখন রূপী থিয়েটারে যোগ দিয়েছি।

দুর্গাশঙ্কর বিরাট একটা হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে বলেন, যোগ দিয়েছেন বেশ করেছেন, কিন্তু কখনও পাবলিক থিয়েটারে অ্যাপ্রেনটিশ আর্টিস্ট হবেন না। তা হলেই সর্বনাশ, কোনদিন আর অ্যাক্টর হতে হবে না।

আপনার রূপ লাবন্য
আপনারই হাতে !
মুখশ্রীকে অকারণ রোদে—ধুলোয় কালো
বা নষ্ট হতে দেন কেন? চেহারার লাবণ্যতা রক্ষার
ভার হিমালয় বুকে স্নোর ওপরই ছেড়ে দিন—
তারপর দেখুন চেহারার চমক। একটু খানি
হিমালয় বুকে স্নো ঘষে দেখুন, হারানো কান্তি
ধীরে ধীরে আবার কেমন ফিরে আসছে !
ক্লান্ত শুষ্ক ত্বক সঞ্জীব হয়ে উঠছে !
হিমালয় বুকে স্নো আপনার মুখে কখনও ব্রণ
বা দাগ পড়তে দেবে না। নিজের চেহারায়
দেখুন···লাবণ্যতা এনে ধরেছে···
হিমালয় বুকে স্নো !
Erasmic
হিমালয় বুকে স্নো
HIMALAYA
BOUQUET
SNOW
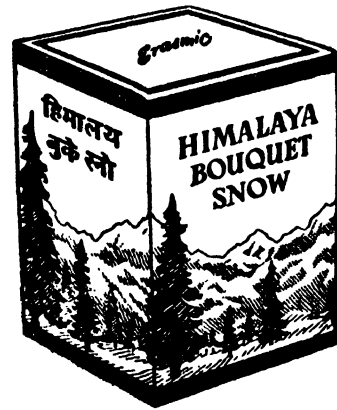
সুরজিতের শুনতে ভালই লাগছিল। তাই কথাটা চালু রাখার জন্য প্রশ্ন করে, কেন বলুন তো?

আজকাল শুনি অ্যাপ্রেনটিশরা প্রথম থেকেই পাঁচ-সাত টাকা হাতখরচ পায়, কিন্তু আগেকার দিনে তাও ছিল না। তখন অ্যাপ্রেনটিশ আর্টিস্ট হওয়া মানে পাঁচ-সাত বছর ভূতের ব্যাগার খাটা। বড় আর্টিস্টদের ফাই-ফরমাশ খাটবে, রাস্তায় হ্যাণ্ডবিল বিলি করবে, ম্যানেজারের কলকে বদলে দেবে, এইসব হল আসল কাজ। স্টেজে মাঝে মাঝে নামতে পেলেও কথা বলতে পাবে না। বছর দুই এমনই খেটেই সব পালিয়ে যেত, যারা টিকে থাকত অন্ততঃ বছর পাঁচেক, মাইনে হত পাঁচ টাকা।

তবে আর লোকে অ্যাপ্রেনটিশ হত কেন?

দুর্গাশঙ্কর অভিজ্ঞের মত হাসেন: নেশা মশাই, থিয়েটারের নেশা। একবার ঢুকলে আর কেউ বেরুতে পারে না। তবে তখনকার দিনে একটা সুবিধে ছিল। যদি কোন ছোঁড়ার চেহারা ভাল হত, কোন নামকরা অ্যাকট্রেসের নজরে পড়ে গেলে তার পোয়া বারো। খুঁটির জোরে ভেড়া লড়ত।

ঠিক এমনি সময় সেজেগুজে এসে মন্দিরা হাত তুলে নমস্কার করে: মাপ করবেন, আপনাকে মিছিমিছি বসিয়ে রেখেছি।

সুরজিৎ ভদ্রতা করে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, না, আমিও এখুনি এসেছি। ওঁর সঙ্গে বসে বেশ গল্প করছিলাম।

মন্দিরা আলাপ করিয়ে দেয়: আমার বাবা।

সুরজিৎ নমস্কার করে বলে, সে আমি আগেই বুঝতে পেরেছি।

দুর্গাশঙ্কর মন্দিরার দিকে তাকান: আমি তো ঠিক এঁকে চিনতে পারলাম না।

মন্দিরা বিরক্ত হয়ে বলে, আহা সুরজিৎবাবু— আমাদের থিয়েটারের নাট্যকার, পরিচালক।

দুর্গাশঙ্কর একগাল হেসে ফেলেন: আরে আপনি তো তা হলে মহাশয় ব্যক্তি, আগে থেকে বলতে হয়। আমি তো ভাবছিলাম কোন অ্যাপ্রেনটিশ আর্টিস্ট।

মন্দিরা অধৈর্য হয়ে পড়ে: না বাবা, তোমাকে নিয়ে আর সত্যি পারা যাবে না। কতদিন থেকে বলে রেখেছি, সুরজিৎবাবু আসবেন, তুমি ওঁকে গুরুদেবের কাছে নিয়ে যাবে।

দুর্গাশঙ্কর লজ্জিত হয়ে পড়েন: সত্যি মনো, আজকাল যে আমার কী হয়েছে, কোন কথাটা মনে থাকে না। তা হলে বলুন সুরজিৎবাবু, কবে যাবেন?

আমি তো আজকেই যাবার জন্যে এসেছিলাম।

তাই নাকি!—দুর্গাশঙ্কর উঠে দাঁড়ান, আমি এখুনি তৈরি হয়ে আসছি।

দুর্গাশঙ্কর চলে গেলে মন্দিরা মাথা নাড়তে নাড়তে নিজের মনে বলে, বাবা যেন হঠাৎ বড় বুড়ো হয়ে পড়েছেন।

ওঁর মুখে পুরনো দিনের থিয়েটারের কথা শুনতে খুব ভাল লাগছিল।

দেখবেন, সাবধান। একবার শুরু করলে আর থামতে চান না।

সুরজিৎ পকেট থেকে রুমাল বার করতে গিয়ে একটা কাগজ হাতে ঠেকায় আগে সেইটাই বার করে আনে। অলকের আঁকা ঝড়ের লাইটিং প্লট। বলে, আর কিছু না হোক, 'নূতন যুগের ভোরে' লাইটিংয়ের জন্যে নাম করবে।

কি রকম?

অলকের মাথায় ঢুকেছে শেষ দৃশ্যের আগে একটা কালবৈশাখীর ঝড় দেখাবে স্টেজের ওপর। ঠিকমত হলে খুব হৈচৈ পড়ে যাবে, নাটকও জমবে খুব। প্রচণ্ড ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেল জীর্ণ পুরাতনকে, তারপর এল নতুন প্রভাত।

মন্দিরার চোখ আনন্দে জ্বলে ওঠে: সত্যি, খুব সুন্দর ভেবেছেন।

সুরজিৎ সেই কথা ভাবতে ভাবতেই বলে, আর যদি কটা দিন সময় পেতাম! এ যেন শিয়রে সংক্রান্তি। সেট, লাইটিং, তার ওপর অভিনয়, অতগুলো চরিত্র—

মন্দিরা মুচকি হাসে: আর কাউকে নিয়ে আপনার

ভাবতে হবে না, আপনাদের নায়িকার ওপরে একটু নজর দেবেন।

সুরজিৎ বিস্মিত হয়, কে! সুচরিতা বোস?

হ্যাঁ। ছবিতে নাম আছে ঠিক কথা, কিন্তু এটা তো পর্দা নয়, মঞ্চ। পরিচালক হিসেবে সেটা বোধ হয় আপনাকে মনে করিয়ে দেওয়া দরকার।

এ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা আর গেল না। দুর্গাশঙ্কর হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন: আর দেরি করব না, চলুন। বেলা বেড়ে গেলে রোদের তাত অসহ্য হয়ে উঠবে।

মন্দিরার কাছে বিদায় নিয়ে সুরজিৎ দুর্গাশঙ্করের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে।

নটগুরু অনিমেষচন্দ্র এখন অতি বৃদ্ধ, বয়সের কোঠা সত্তর পেরিয়ে গেছে। বছর দশেক আগেও তিনি রীতিমত সাধারণ রঙ্গালয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন, অভিনয় করেছেন নাটকের নাম ভূমিকায়। কিন্তু তারপর তাঁকে অবসর নিতে হয়েছে ইচ্ছার বিরুদ্ধেই একরকম।

বঙ্গরঙ্গমঞ্চের যখন সবচেয়ে বড় দুঃসময় সেই সময় অনিমেষচন্দ্র নাট্যজগতে প্রবেশ করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলাল দুজনেই তখন ইহজগতের মায়া কাটিয়ে চলে গেছেন। সেযুগের বড় বড় নাট্যরথীরা প্রায় সকলেই অস্তগামী। মুমূর্ষু নাট্যমঞ্চ। কয়েকজন ধনী জমিদারের খামখেয়ালীর ফলে নতুন নতুন থিয়েটারের জন্ম হলেও, কোনটিই দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি। অত্যন্ত স্বল্পায়ু তাঁদের।

ঠিক সেই সময় অনিমেষচন্দ্র এলেন নতুন যুগের বার্তা নিয়ে। অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অপরিসীম জ্ঞান, ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা প্রতিভার ঔজ্জ্বল্যে দীপ্ত। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে নাট্যজগতে এল নতুন জোয়ার, নতুন ভাবধারা।

অনিমেষচন্দ্র কিন্তু পুরনো যুগকে অগ্রাহ্য করলেন না। উদ্ধত নবীনের মত ধুয়ে মুছে শেষ করে দিলেন না তার অস্তিত্ব। বরং পুরনো নাটকের যথাযথ সংস্কার করে আবার তাদের ফিরিয়ে আনলেন দর্শকদের সামনে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকের মাধ্যমে। জয়জয়কার পড়ে গেল চারদিকে। শুরু হল তাঁর নাট্যজীবনের দিগ্বিজয়।

তারপরের ইতিহাসে কোন বৈচিত্র্য নেই। খ্যাতির শিখরে উঠলেন অনিমেষচন্দ্র। হুজুকে বাঙালী তাঁকে মাথায় করে নাচল, নটগুরু উপাধি দিল, যে নাটকই তিনি মঞ্চস্থ করলেন তাই নিয়ে মাতামাতি করে বেড়াল। কিন্তু তারপর যা হয়ে থাকে তাই হল। এদেশের বহু প্রথিতযশা শিল্পীর ভাগ্যে যা ঘটেছে অনিমেষচন্দ্রের বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হল না। জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলি প্রাণপণ করে খেটে যে দর্শকসমাজকে তিনি এতদিন আনন্দ দিয়ে এসেছেন, তারাই প্রৌঢ় অনিমেষচন্দ্রের থিয়েটারে যাওয়া বন্ধ করল। ব্যবসা অচল হয়ে পড়ল, চারদিকে দেখা দিল পাওনাদার। নিঃস্ব অনিমেষচন্দ্র অপমানে লজ্জায় মলিন হয়ে বেরিয়ে এলেন রঙ্গমঞ্চ থেকে। আশ্রয় নিলেন বেহালার পৈতৃক ভাঙা বাড়িতে।

যেদিন তাঁর অতি সাধের 'মঞ্চশ্রী' থিয়েটার পাওনাদারদের হাতে তুলে দিয়ে নিঃসম্বল অবস্থায় বেরিয়ে এলেন, সেদিনের কথা প্রত্যক্ষদর্শীরা কেউ বর্ণনা করতে পারে না, চোখে তাদের জল এসে পড়ে। শেষজীবনে অনিমেষচন্দ্র 'মঞ্চশ্রী'র পিছন দিকের একটি ঘরে বাস করতেন। বিদায়ের দিন সকাল থেকে লুঙ্গি পরে, হাতে একটা চুরুট ধরিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন সারা থিয়েটারে। মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে দেখলেন সারি সারি খালি চেয়ার। প্রত্যেকটি চেয়ারই যেন তাঁর অতিপরিচিত, কত সহস্র দর্শক ওই চেয়ারে বসে তাঁর অসাধারণ অভিনয় দেখে আনন্দে অধীর হয়ে কলরব করতে করতে প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে গেছে। মঞ্চের উপর জমা রয়েছে বিভিন্ন নাটকের কত সেট, কত সীন। কত রাত জেগে তিনি শিল্পীকে দিয়ে এই সব কাজ করিয়েছিলেন। স্তূপীকৃত আসবাবপত্র। শাজাহানের ময়ূর সিংহাসনের পাশেই পড়ে রয়েছে হালফ্যাশানের সোফাসেট, কে বা তার খবর রাখছে।

অনিমেষচন্দ্রের চোখে জল আসে, বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। প্রত্যেকটি সাজঘরে ঢুকে চারদিকটা ভাল করে দেখেন। কত রাতই না কেটেছে এইসব ঘরে। কত

রঙবেরঙের সাজ পরে বহুরূপী সেজে এইসব আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কৌতুক বোধ করেছেন। কখনও বৃদ্ধ সম্রাট, কখনও অত্যাচারী নবাব, কখনও ব্যাধিগ্রস্ত জমিদার, কখনও উদারচিত্ত মধ্যবিত্ত নায়ক।

পুরনো দিনের স্মৃতির মধ্যে সমাহিত অনিমেষচন্দ্র সেদিন পাগলের মত এ-ঘর থেকে ও-ঘর ছুটে বেড়িয়েছেন, কারুর সঙ্গে সামনাসামনি দেখা হলেই অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলেছেন, আপনারা ব্যস্ত হবেন না, আমি এখুনি চলে যাব।

অন্যেরা তাড়াতাড়ি বলেছে, এ বলে আমাদের লজ্জা দেবেন না, আপনার যখন খুশি যাবেন।

না না, নিশ্চয় আপনারা বিরক্ত হচ্ছেন, শুধু এতদিনের স্মৃতি—

বলতে বলতে অনিমেষচন্দ্র ঢুকে গেলেন ড্রেসারের ঘরে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক সামাজিক নাটকের সাজ-পোশাক বার করে স্তরে স্তরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে মাদুরের ওপরে। দড়িতে ঝুলছে নবাব-বাদশাদের মূল্যবান চোগা-চাপকান। ধনী ব্যারিস্টারের ড্রেসিং-গাউন, পৌরাণিক নাটকের দামী মেরজাই। বহু যত্নের কাশ্মিরী শাল। বিলিতী দোকানে তৈরী খানকয়েক গরম স্যুট। এ পোশাকগুলোকে দেখলেই সে চরিত্রগুলোর কথা মনে পড়ে। রাতের পর রাত মঞ্চে বেরিয়ে যারা দর্শকের আপনজন হয়ে পড়েছিল, আজ অনাদরে অবহেলায় পরিত্যক্ত এই বেশ, কোথায় হারিয়ে গেছে সেই চরিত্রগুলো!

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অনিমেষচন্দ্র উদ্‌ভ্রান্তের মত বলেন, কতদিন ওই পোশাকগুলো পরে কাটিয়েছি, যদি অনুমতি দেন দু-একখানা সঙ্গে করে নিয়ে যেতাম।

সে আবার কি কথা, যা আপনার ইচ্ছে স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেতে পারেন।

পারি!—আনন্দে অনিমেষচন্দ্রের চোখ দুটো জ্বলে ওঠে, কিন্তু পরক্ষণেই বিষণ্ণ স্বরে বলেন, না থাক্। কি হবে কতকগুলো মায়া বাড়িয়ে। ওরা আমার কে—কেউ নয়। আমি একা, আমার কেউ নেই। কেন আমি লিখতে পারলাম না! যদি হাত দিয়ে কবিতা বেরুত, মধুসূদনের মত বলতাম—

> দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে
> তিষ্ঠ ক্ষণকাল।

না, আমি তাও লিখতাম না, আমার মৃত্যুতে বাঙালীর কী আসে যায়। বাঙালী নেই, বাঙালী মরেছে।

আর কোন কথা না বলে গায়ে একটা পাঞ্জাবি পরে নাটকীয়ভাবে প্রস্থান করলেন অনিমেষচন্দ্র। এই দীর্ঘ দশ বছরের মধ্যে আর কোনদিন ফিরে যান নি থিয়েটারের পাড়ায়।

সুরজিৎরা যখন অনিমেষচন্দ্রের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছল, দশটা বেজে গেছে। তিনি দোতলায় নিজের ঘরে একখানা ভাঙা সোফায় বসে ছিলেন। সামনে ঘরজোড়া খাট। তারই ওপর বসতে বললেন সুরজিৎ আর দুর্গাশঙ্করকে। সামনের তাকে অনেকগুলো বই, বেশীর ভাগই বিদেশী নাটক। বার্ধক্যের চাপে দেহ নুয়ে পড়ে নি, সোজা হয়ে বসে থেকে আলাপ করলেন সুরজিৎদের সঙ্গে।

কি নাটক লিখেছ?

সুরজিৎ ধীর স্বরে উত্তর দেয়, লিখেছি অনেক রকম, তবে যেটা রূবী থিয়েটারে হচ্ছে সেটা হল সামাজিক নাটক।

তা আমার কাছে এসেছ কেন?

কথা বললেন দুর্গাশঙ্কর, গুরুদেব, ওকে আশীর্বাদ করুন।

অনিমেষচন্দ্র হাসলেন: আমার আশীর্বাদে কোন ফল হবে না, একদিন ব্রাহ্মণ ছিলাম এখন আর নই। একদিন অভিনেতা ছিলাম, এখন তাও নই। জীবনে যে ব্যর্থ হয়েছে তার কাছে আশীর্বাদ নিয়ো না। তবে আমার শুভকামনা তোমাদের জন্যে রইল।

সুরজিৎ সাহস করে বলে, বড় ইচ্ছে ছিল একদিন আপনাকে নাটকটা দেখাবার।

না ভাই, সে অনুরোধ করো না, আমি রাখতে পারব না। থিয়েটারে যাওয়া আমি ছেড়ে দিয়েছি বহুদিন।

সুরজিৎ মনে মনে ভেবে এসেছিল নটগুরুর সঙ্গে অনেক কথা নিয়ে আলোচনা করবে, কিন্তু কোন কথাই ওর জিজ্ঞেস করা হল না। বৃদ্ধের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের সামনে নিজেকে বড় ছোট মনে হল। উঠে আসবার সময় তাঁর পায়ের ওপর মাথা রেখে ভক্তিসহকারে প্রণাম করল সুরজিৎ।

নটগুরু তার মাথায় হাত দিয়ে বিড়বিড় করে ইংরেজীতে বললেন, গড ব্লেস ইউ মাই বয়।

এ কদিনের অক্লান্ত পরিশ্রম করে সকলেরই মনে হয়েছিল নাটক ক্রমশঃ বেশ দানা বেঁধে উঠছে। খণ্ড খণ্ড দৃশ্যের অভিনয় অনেককেই মুগ্ধ করেছিল, কিন্তু প্রথম যেদিন স্টেজ-রিহার্সালের সময় আলো সেট ও যন্ত্রসঙ্গীতের সঙ্গে মিলিয়ে পুরো নাটকটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অভিনয় করা হল সেদিন কিন্তু অনেকের মনে সন্দেহ জেগেছে এ নাটক দর্শকরা নেবে কি না। সবচেয়ে বেশী হতাশ হয়েছে সুরজিৎ। রিহার্সাল শেষ হয়ে যাবার পর একে একে সবাই চলে গেলে অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহের পিছনের দিকের একটা সীটে চুপচাপ বসে থাকে।

কিছুক্ষণ বাদে অলক ঘোষ এসে বসল তার পাশে, এতক্ষণ সুরজিৎকেই সে খুঁজছিল। কোথাও না পেয়ে এখানে এসে হাজির হয়েছে। আস্তে জিজ্ঞেস করে, কি ভাবছেন ?

সুরজিৎ শুকনো গলায় উত্তর দেয়, সবটাই পণ্ডশ্রম হয়ে গেল।

মোটামুটি কিন্তু আমার বেশ ভাল লাগছে, হৃষীবাবুও বলছিলেন।

সুরজিৎ মৃদু হাসে : কে কি বলছিল জেনে আমার কোন লাভ নেই। নিজে তো বুঝতে পেরেছি, কিছুই হয় নি। এতটা গোঁয়ার্তুমি না করলে বোধ হয় ভাল করতাম। যদি নাটক না চলে, এই নবনাট্য আন্দোলন কতখানি পেছিয়ে যাবে।

অলক ঘোষ সুরজিৎকে উৎসাহিত করার জন্য জোর দিয়ে বলে, মোটেই তা হবে না, আপনি মিথ্যে ভয় পাচ্ছেন। এখনও আমার লাইটের কাজ কিছুই হয় নি। আপনি হৃষীবাবুকে বলে ব্যবস্থা করে দিন, আমি সারারাত লাইটের রিহার্সাল করব। এ বোর্ডের মিস্ত্রীদের আমাকে শেখাতে হবে, বিশেষ করে দেখুন না ওই ঝড়ের জায়গাটা—একেবারে ক্লাইম্যাক্সে তুলতে পারল না। আজ আমি আলোর দিকের কাজ পুরো শেষ করে দেব।

সুরজিৎ খুব যে ভরসা পায় বলে মনে হয় না। বলে, পরশু তো উদ্বোধন রজনী।

তাতে কি হয়েছে, কালকে আর একটা ফুল রিহার্সাল আমরা পাচ্ছি, দরকার হলে কাল রাত্রেও আমি আলোর কাজ করব।

সে রাত্রে রুবী থিয়েটারের সিফটাররা কেউ ঘুমোতে পারল না। সমস্ত রাত্রি অলক ঘোষ তাদের দিয়ে সীনের পর সীন আলোর কাজ করিয়েছে। সকাল থেকে সন্ধ্যে, সন্ধ্যে থেকে রাত্রি দেখাতে কম বেশী আলোর যে কারসাজি, তা বারবার করে করিয়ে মিস্ত্রীদের মনে গেঁথে দিয়েছে—বিশেষ করে ঝড়ের দৃশ্যের রিহার্সাল হয়েছে কম করে তিন ঘণ্টা। শেষ পর্যন্ত এলে গিয়ে মিস্ত্রীদের মুখপাত্র হিসেবে বিপিন বলে ফেলে, আর আমাদের দেখাতে হবে না অলকবাবু, কাল দেখবেন সত্যিকারের ঝড় বইয়ে দিতে পারি কিনা।

. সুরজিৎও রাত্রে বাড়ি ফেরে নি, অলকের সঙ্গে বসে বসে আলোর রিহার্সাল দেখেছে। শেষ পর্যন্ত সে চেষ্টা করে দেখবে নাটককে জমাটি করা যায় কিনা।

মন্দিরাও এসেছিল একবার খোঁজখবর নিতে। রাত তখন প্রায় বারোটা। অলক স্টেজের ওপর মিস্ত্রী নিয়ে ব্যস্ত। সে এসে সুরজিতের পাশে বসে পড়ে। বলে, পারেনও বটে, এতক্ষণ রিহার্সাল দিয়ে এখন আবার আলো দেখা।

সুরজিৎ চেয়ারের ওপর গা এলিয়ে দিয়ে বসেছিল, মন্দিরাকে দেখে উঠে সোজা হয়ে বসে : এত রাত্রে যে ?

মন্দিরা হাসতে হাসতে বলে, আমারও কি মরবার

সময় আছে। এখানে আপনার কাছে রিহার্সাল দিয়ে কাছেই গিয়েছিলাম মসজিদবাড়ী স্ট্রীটে। পাড়ারই একটা ক্লাব, সেখানে তিন সীন 'সরমার' রিহার্সাল দিয়ে এলাম। এ পথ দিয়ে বাড়ি ফিরছি, দেখলাম থিয়েটারে আলো জলছে, তাই ঢুকে পড়লাম।

সুরজিৎ পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরায়। প্রশ্ন করে, ফুল রিহার্সাল দেখে কিরকম মনে হল?

দু-চারদিনের মধ্যেই নাটক জমে যাবে।

পরশু তো শুরু।

মন্দিরা সুরজিতের দিকে তাকিয়ে দুষ্টুমি করে হাসে: আপনি এখনও অ্যামেচারদের মত কথা বলছেন। শুরু হবে তো কি হয়েছে? দু-চারদিন পরেই সকলের পার্ট রপ্ত হয়ে গেলে দেখবেন নাটক দিব্যি জমে যাবে।

সুরজিৎ একমুখ ধোঁয়া ছাড়ে: কি জানি, খুব একটা উৎসাহ পাচ্ছি না।

বই খোলবার আগে ওইরকমই মনে হয়। এখন দোষগুণ কিছুই বোঝা মুশকিল। প্রথম রাত্রে দর্শক দেখার পর তাদের হাসিকান্না শুনে তবে আপনি নাটকের ছাঁটকাট করতে পারবেন। তবে এটুকু বলে দিচ্ছি, এই এক নাটকে আপনার নাম হয়ে যাবে।

সুরজিৎ মন্দিরার দিকে ফিরে তাকায়: কি করে বুঝলেন?

মন্দিরা আগের মতই বড় বড় চোখ দুটো তুলে পূর্ণ দৃষ্টিতে সুরজিতের দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বলে, জানেন না? আমি যে থিয়েটারের মেয়ে।

কথাটা সামান্য, কিন্তু সুরজিতের শুনতে ভাল লাগে।

পয়লা বৈশাখ। সকাল থেকে রুবী থিয়েটারে কাজের সমারোহ। নতুন নাটকের শুভ উদ্বোধন। রাস্তার ওপর নিয়নের আলো দেওয়া হয়েছে, ভেতরে গেট সাজানো হয়েছে ফুলপাতা দিয়ে। ঘরামী ধরিয়ে মেঝে সাফ করা হচ্ছে বিলিতী পালিশ দিয়ে। সীটগুলোও একদিনে অনেকটা পরিষ্কার করা হয়েছে, সকাল থেকে টিকিট-ঘরে দর্শকের আনাগোনা। বিক্রি বেশ ভালই। মনে হয় এ ভাবে চললে চারটের মধ্যেই 'হাউসফুল' বোর্ডটা টাঙাতে হবে বাইরে।

টিকিট-ঘরের লোকেরা সব খুশী। অনেকদিন বাদে তারা ব্যস্ত হবার সুযোগ পেয়েছে। হৃষীবাবু মাঝে মাঝে ওপর থেকে নীচে তদারক করে বেড়াচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে রমেন চৌধুরী। হৃষীবাবুর মুখ থেকে কথা বেরবার আগেই হাত পা নেড়ে হুকুম করছে অন্যদের। কারুর আজ বিশ্রাম নেবার সময় নেই।

সত্যি সত্যিই সন্ধ্যের আগে হাউসফুল হয়ে গেল। একে একে শিল্পীরা এসে জড়ো হল সাজঘরে। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অভিনয় করার আনন্দের সঙ্গে প্রথম রজনীর ভয় মিশে প্রত্যেকের মনে এক বিচিত্র অনুভূতি। সকলেই আজ চুপচাপ, যে যার নিজের পার্ট নিয়ে ব্যস্ত, মুখে রঙ লাগাতে লাগাতেও বিশেষ সীনগুলো আর একবার করে দেখে নিচ্ছে।

সুরজিৎ ইচ্ছে করে এল দেরি করে। শিল্পীদের প্রত্যেকের কাছে গিয়ে শুভেচ্ছা জানাল। চারদিক ঘুরে দেখে নিল, সেট আলো সব ঠিকমত সাজিয়ে রাখা হয়েছে কিনা।

অলকের সঙ্গে দেখা হল আলো ফেলার মাচায়—স্পট লাইটে রঙিন কাগজ লাগাচ্ছে। সুরজিৎ তার পিঠে হাত রেখে বলল, উইশ ইউ বেস্ট অফ লাক্।

অলক হেসে ফিরে তাকাল। সুরজিতের হাতটা ইংরিজী কায়দায় নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে, সেম্ টু ইউ।

মন্দিরার সঙ্গে দেখা হল নাটক শুরু হবার দশ মিনিট আগে। সুরজিৎ তখন মঞ্চে আসবাবপত্রগুলো সাজিয়ে রাখছে। সেজেগুজে মন্দিরা এসে দাঁড়াল: দেখুন, সাজ ঠিক হয়েছে কিনা।—নিজেই সে চারদিকটা ঘুরে দেখাল। মন্দিরাকে দেখতে ভাল লাগল সুরজিতের, এতটা মানাবে সে আগে বুঝতে পারে নি। খুশী হয়ে বলে, আমি ঠিক এই রকমই চেয়েছিলাম।

মন্দিরা এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল সুরজিৎকে। সুরজিৎ বাধা দিয়ে বলে, ওকি করছেন।

মন্দিরা হেসে উত্তর দেয়, মঞ্চের এই নিয়ম। যিনি পরিচালক তাঁকে প্রণাম করতে হয়। এর আগে প্রণাম করেছি পরমহংসদেবের ছবিকে। তারপর এই মঞ্চকে।—বলেই মন্দিরা আবার মঞ্চ থেকে ধুলো তুলে মাথায় ঠেকায়: এইখান থেকেই যে আমাদের রুটির রোজগার।

নাটক শুরু হতেই সুরজিৎ মঞ্চ থেকে বেরিয়ে আসে, দোতলার একটা বক্সে গিয়ে বসে থাকে। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা—তার নিজের লেখা নাটক সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় হচ্ছে, সাগ্রহে দেখছে কত দর্শক। এক একবার তারা হাসছে, খুশী হয়ে হাততালি দিচ্ছে, আবার কখনও নাটকীয় করুণ মুহূর্তে বিষণ্ণ মনে চোখের জল ফেলছে। সুরজিৎ কিন্তু নাটক দেখতে পারে না, সে দেখছে শুধু দর্শকদের—তাদের মুখের হাসি বিরক্তি কান্না।

প্রথম অঙ্ক শেষ হতেই সে মিশে যায় ভিড়ের মধ্যে। চেষ্টা করে তাদের কথাবার্তা শুনতে, বুঝে ফেলতে তাদের অভিমত। পানওয়ালার দোকানের সামনে, পাশের গলিতে চতুর্দিকে সে কান খাড়া করে ঘুরে বেড়ায়। শুনতে পায় কেউ বলছে, রসময় ভাঁড়ামী করে জমিয়ে রেখেছে নাটক, কারুর মতে প্রদীপ মুখার্জীর অভিনয় অনবদ্য, কেউবা বাসুদেবের চেহারার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। প্রথম অঙ্কের মধ্যেই মন্দিরার অভিনয় অনেকের মনে দাগ কেটেছে, নায়িকা সুচরিতা বসুর অনুরাগীর সংখ্যাই বোধ হয় সবচেয়ে বেশী। চারদিকেই তার বিষয়ে আলোচনা।

দ্বিতীয় অঙ্ক শুরু হতে সুরজিৎ আর ওপরে গেল না। নীচে দাঁড়িয়ে রইল অন্ধকারে, এককোণে। বোঝা গেল নাটক জমে উঠেছে বেশ, সকলেই শুনছে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে। কিন্তু হঠাৎ একজায়গায় বাসুদেব ভুল কথা বলায় দর্শকের মধ্যে থেকে কে চেঁচিয়ে উঠল: ঘাড় ধরে বার করে দাও। শুধু রূপ দেখতে আসি নি, আমরা কথা শুনতে এসেছি।

অন্যেরা বুঝি বাধা দিতে গিয়েছিল: আঃ, চুপ করুন মশাই।

সে ভদ্রলোক চিৎকার করে ওঠে: এটা প্রফেশ্যনাল থিয়েটার, যা-তা জিনিস দেখব কেন, টিকিটের পয়সা ফেরত দিন।

সুরজিৎ ঘাবড়ে গিয়েছিল, কিন্তু পরক্ষণেই শান্ত হল রমেন চৌধুরীর কথায়। সে কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ফিসফিস করে বলে, ও মশাই ভাড়াটে দর্শক, পয়সা দিয়ে পার্ল থিয়েটার পাঠিয়েছে, প্রথম কয়েক নাইট এরকম গোলমাল হবেই, ঘাবড়াবেন না, মনে হচ্ছে বই আপনার ধরে গেল।

বই যে সত্যিই ধরে গেছে তা বোঝা গেল ঝড়ের দৃশ্যে। বাহাদুরী আছে অলক ঘোষের। কদিন আগের সেই কালবোশেখীর ঝড় সে হুবহু বইয়ে দিল মঞ্চের ওপর। প্রথমটা দর্শকরা ঘাবড়ে গিয়েছিল, কিন্তু পরে যখন হাততালি দেওয়া শুরু হল সে আর থামতে চায় না। আনন্দে সুরজিতের বুক ভরে ওঠে, তারপর আর কোনদিকে খেয়াল থাকে না। কখন যে নাটক শেষ হয়ে গেছে, কখন দর্শকরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে করতে তারই সামনে দিয়ে চলে গেছে, কিছুই সে দেখে নি। খেয়াল হল হৃষীবাবুর কথায়, আনন্দে উদ্ভাসিত প্রৌঢ় হৃষীবাবু সুরজিৎকে জড়িয়ে ধরলেন বুকে: আমার থিয়েটারে কোন নাটকের প্রথম রজনী এত সাফল্যলাভ করে নি। ধন্য আপনি, ধন্য আপনার নাটক।

নিজের অজানতে সুরজিতের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

[ক্রমশ]
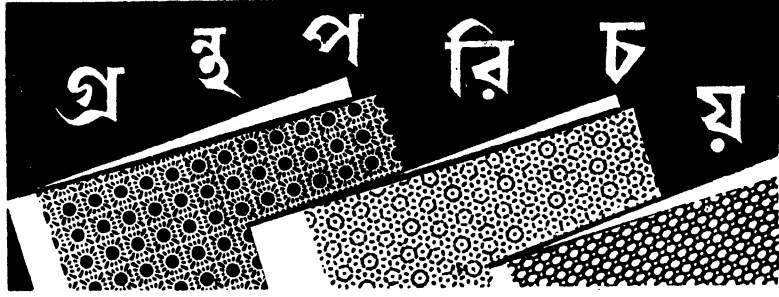
বিদ্যাসাগর-পরিচয়ঃ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা ৩৭। দুই টাকা।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কর্মবহুল জীবনের বিস্তৃত বিবরণ বহু গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে—তাঁহার জীবনের নানাদিক লইয়া বিভিন্ন মনীষী আলোচনা করিয়াছেন। আলোচ্য পুস্তিকায় শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় সংক্ষেপে মনোজ্ঞভঙ্গীতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশিষ্ট অবদানসমূহের পরিচয় দিয়াছেন। গল্পের মত করিয়া তিনি বিদ্যাসাগরের কৃতকার্যের বর্ণনা করিয়াছেন। পটভূমিকা হিসাবে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবকাল ও তাঁহার অব্যবহিতপূর্ব সময়ের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির দিগ্‌দর্শন বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। শিক্ষাসংস্কারে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষা ও বাংলা শিক্ষা সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ এই দুই প্রকার শিক্ষার পুনর্গঠন ব্যাপারেই বিদ্যাসাগরের কর্মময় জীবনের প্রধান অংশ অতিবাহিত হয়। তাঁহার সাহিত্যসাধনা ইহার বিশিষ্ট অঙ্গ। 'সাহিত্য-সাধনায় বিদ্যাসাগর' শীর্ষক অধ্যায়ে তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। 'শিক্ষাবিস্তারে বিদ্যাসাগর' ও 'সমাজহিতে বিদ্যাসাগর' নামক দুইটি অধ্যায়ে বিদ্যাসাগরের জীবনের আর দুইটি প্রসিদ্ধ কর্মধারার পরিচয় পাওয়া যাইবে। সাহিত্যসাধনার বিবরণ দিতে গিয়া বাগল মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃত গদ্যপদ্য রচনার উল্লেখ করিয়াছেন। পণ্ডিতমহলেও এইসব রচনা সুপরিচিত নহে। এগুলি সংগৃহীত ও প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাঁহার সম্পাদিত ও সংকলিত সংস্কৃত গ্রন্থগুলিও আজ দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। অথচ এক যুগে এগুলি বিশেষ সমাদৃত ছিল। দুঃখের বিষয়, তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে ইহারা অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। বাগল মহাশয় লিখিয়াছেন—সংস্কৃত কলেজের পঠনপ্রণালী সংস্কার করিতে গিয়া বিদ্যাসাগর 'সংস্কৃতের মাধ্যমে অঙ্কশাস্ত্র পাঠের ব্যবস্থা তুলিয়া দিলেন' (পৃঃ ২৮)। তখনকার দিনে অঙ্ক শিখাইবার জন্য কোন্ সংস্কৃত বই পড়ানো হইত জানিবার আগ্রহ হয়। কাশীর সংস্কৃত কলেজে বিভিন্ন আধুনিক বিষয়ের পঠনপাঠনের জন্য এই সময়ে কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল—কলিকাতা হইতেও কিছু পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, কলিকাতা বা কাশীর সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারে এখন আর এই সমস্ত পুস্তকের কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না। ব্রিটিশ মিউজিয়মের পুস্তক-তালিকায় অনেকগুলি গ্রন্থের উল্লেখ আছে। বর্তমান সময়ে সংস্কৃত ভাষার পূর্ব গৌরব ফিরাইয়া আনিবার উদ্দেশ্যে যখন বিভিন্ন প্রদেশে সংস্কৃত টোল ও পাঠশালায় সংস্কৃতের সাহায্যে বিভিন্ন আধুনিক বিদ্যা শিখাইবার প্রচেষ্টা পুনঃপ্রবর্তিত হইতেছে তখন শতবর্ষ পূর্বে সংকলিত ও প্রকাশিত এই জাতীয় গ্রন্থগুলির সন্ধান করা দরকার মনে হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় কেন এই প্রচেষ্টাকে বাতিল করিয়া দিয়াছিলেন তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা সমীচীন। বাগল মহাশয়ের পুস্তকখানি পড়িয়া আজ এই কথাটি আমার বিশেষ করিয়া মনে জাগিতেছে। একটু সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে আমরা বিভিন্ন দিকে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া চলিতেছি এবং চলা সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। সহসা ে

পথ পরিত্যাগ করিতে হইলে বিশেষ সতর্ক হওয়া প্রয়োজন, সন্দেহ নাই।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

বীরবল ও বাংলা সাহিত্য : ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। ক্লাসিক্ প্রেস, ৩/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। চার টাকা।

প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য ও কাব্য সম্পর্কে, তাঁর মন ও মনন সম্পর্কে সম্প্রতি কিছু কিছু আলোচনা শুরু হয়েছে। বাংলায় প্রমথ চৌধুরীর দানের অনন্যতা সম্বন্ধে রসিকসমাজ আজ নিঃসংশয় বটেন, কিন্তু এ কথা না বলে পারি নে যে, প্রমথ-সাহিত্যে যতখানি অনুরাগ ও আনুগত্য প্রকাশ করা উচিত ছিল, বাঙালী বা বাংলাদেশ ততখানি কেন, তার সিকির সিকি অংশও করেন নি বা করতে পারেন নি। গদ্যরচনার শিল্পকৃতিত্বে প্রমথনাথ কত বড়, বুদ্ধিদীপ্ত সনেট রচনায় বাংলা তথা ভারত-সাহিত্যে তিনি একক কি না, এবং সর্বোপরি আবেগ-বিহীন অথচ বেগবান সাহিত্যের বাস্তব আদর্শ—কতখানি শক্তি থাকলে বাংলার চিন্তাশরীরে সহজ আনন্দ সঞ্চার করা সম্ভব—এসব তথ্যের সন্ধান পরীক্ষা ও নিরপেক্ষ বিচার বর্তমানে শুরু হয়েছে দেখে আমি সুখী হয়েছি।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'বীরবল ও বাংলা-সাহিত্য' ক্ষুদ্রায়তন একখানি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ হলেও তথ্যগর্ভ এবং যুক্তিসমৃদ্ধ। প্রমথ চৌধুরী সম্বন্ধে যাঁরা প্রথম পাঠ নেবেন তাঁদের কাছে এ গ্রন্থ তো সমাদৃত হবেই, প্রমথ-বিশেষজ্ঞ যাঁরা, তাঁরাও এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু, বিচার-পদ্ধতি ও নিরপেক্ষ রীতির সরল বৈশিষ্ট্যে আনন্দবোধ করবেন। বীরবল-প্রতিভার যে-কটি দিক তিনি বিচার করেছেন, সংযত ও শ্রদ্ধাশীল উত্তরসাধকের মনোভাব নিয়েই করেছেন—কোথাও অযথা মুরুব্বীয়ানা অথবা অর্থহীন অসাধু মন্তব্য প্রকাশ পায় নি।

'বীরবল ও বাংলা সাহিত্য' ছাত্রদের কাজে আসবে, অধ্যাপকদেরও আসবে। 'বাংলাসাহিত্যে মোহমুক্তি' ও 'উত্তরকাল' বিষয়গৌরবে প্রণিধানযোগ্য রচনা। 'বীরবল' ও 'বীরবলের আত্মকথা' খুবই সুখপাঠ্য নিবন্ধ। 'বীরবলী সনেট' সম্বন্ধে আরও গভীর কিছু প্রত্যাশা করেছিলাম—তবে যা পেয়েছি তাও নিতান্ত কম নয়। 'প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যাদর্শ' ও 'রূপচেতনা' এ গ্রন্থের সবচেয়ে ভাল রচনা। এ দুটি লিপিকৌশলে ও তথ্য-বিন্যাসে ছিদ্রান্বেষী বিশেষজ্ঞদেরও প্রশংসা অর্জন করবে।

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

বহুরূপে— : শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭। সাড়ে ছয় টাকা।

কতদিন আগের কথা, বয়স তখন সাত কি আট, আমি তখন এক কল্পনাপ্রবণ বালক, পরিবারের পাঁচজনের সঙ্গে চলেছি হরিদ্বারে তীর্থদর্শনে। সেইদিন থেকেই হিমালয়ের সঙ্গে হয়েছে মনের মিতালি। প্রথম প্রণয়-পরশমুগ্ধ সেই চিত্ত আজও দুলে ওঠে হর-কী-পৌড়ীর পাশে ব্রহ্মকুণ্ডের ধারে, গঙ্গার নীলধারা দেখে, চণ্ডী-পাহাড়ের দিকে চেয়ে। শিবালিকের সঙ্গে যেতে যেতে সত্যিই মনে হয় ঋষিক্ষেত্রে এসে পড়লাম, শুধু অভাব যে হৃষীকেশ হৃদিস্থিত নন। পঞ্চাশ বছর আগে যে মন উদাস হয়ে উঠত তুঙ্গী নগাধিরাজের মহাস্ত-রূপ দেখে, আজ সে মন হয়তো হারিয়ে গেছে সংসারের কলকোলাহলের মধ্যে, কিন্তু লছমনঝোলার নীচে দাঁড়িয়ে সেদিনও বলে এসেছি—যে গঙ্গোত্রী থেকে এই খরধারা নেমে এসেছে সেই জ্যোতির্ময় শুভ্রতার ভিতর-মহলে যদি প্রবেশ করতে পারতুম! মনে পড়ছে সেই বৈদান্তিকের কথা—ভোজনং যত্র তত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে, মরণং গোমতীতীরে, অথবং বা কিং ভবিষ্যতি। সেই মৈত্রীতে মিথুনলগ্ন এনে দিয়েছিলেন জলধর সেন সামধ্যায়ী, প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধ সান্যাল এবং আরও কত জানা-অজানা কাহিনীকারেরা। রোমাঞ্চিত হয়ে পড়েছি কেদারবদরী কৈলাসমানসের পরিক্রমার কথা, মহাপ্রস্থানের পথের কাহিনী, গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রীর উপাখ্যান। উত্তরাখণ্ডের পথে পথে কত দীর্ঘশ্বাস, কত নিবেদন, কত প্রণাম, কত মান-অভিমান, কত আশ্বাস কত বিশ্বাস, কত প্রেম ঘৃণা ভালবাসা, কত অদ্ভুত দর্শন,

লৌকিক ও অলৌকিক অভিজ্ঞতা, আর তার পিছনে দাঁড়িয়ে শুধু একটি তুষারশুভ্র নীরবতা—পৃথিবীর মানদণ্ডের মত রত্নকল্লোজ্জ্বলাঙ্গ রজতগিরিনিভ মহান্। তাইতো আমাদের কল্পনায় হিমালয় শুধু মৃন্ময় নন, অব্যয় চিন্ময়ও বটে। এই ধূসর উষর বর্বর রুক্ষ শান্তদান্ত গিরিমালা ভৌগোলিক প্রতীকই নয়, জাতির জীবনের সঙ্গেও অঙ্গাঙ্গিভাবে গ্রথিত। যুগ যুগ ধরে তারই পদচিহ্ন ধরে চলেছে যাত্রী তপস্বী মনস্বী, ভোগী ত্যাগী বিরহবিধুর মিলনচঞ্চল মানবমানবীর দল। সে যাত্রার আজও শেষ নেই। দেখেছে তারা এই রূপরসিক দেবতাকে, বলেছে 'ঠাড়ি রহো মেরা আঁখনকা আগে'।

তাই শ্রদ্ধেয় শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়ের বই 'বহুরূপে—' নতুন করে জাগিয়ে দিল পুরনো সেই স্মৃতি—অদ্যাবধি সেই লীলা করে যে গৌর রায়। লেখকের ভাষাতেই বলতে পারি—রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরিপূর্ণ আমার স্মৃতির মধুচক্র। শুধু কি তাই, মণীন্দ্রবাবুর লেখার সরসতা, ভাষার স্বচ্ছতা, আর কাহিনী বলার নিপুণতার গুণে এই ধরনের হিমালয়-ভ্রমণের সাহিত্যে বইটি যে একটি সর্বজনমান্য স্বীকৃতি লাভ করবে এর মধ্যে অত্যুক্তি নেই। তা ছাড়া তাঁর বিবরণে ঠিক চিরাচরিত এইসব আখ্যায়িকার গতানুগতিক পুনরাবৃত্তি যেমন নেই, তেমনি আছে কতকগুলি নতুন ধরনের অভিজ্ঞতার ছাপ—যা তাঁর যাত্রাপথকে শুধু মনোরম করে নি, চিত্তজয়ীও করেছে।

জয় কেদারনাথজী—বলে এই ইতিহাসের আরম্ভ, খণ্ড-কালের মধ্যে সীমিত সীমানার মধ্যে অখণ্ডকে অসীমকে ধরবার চেষ্টা। মণীন্দ্রবাবু শুধু নীরস সাংবাদিক নন, সরস সাহিত্যিকও বটে; কবিধর্মী মন সংশয়বাদকে ঠেলে উঠেছে। নির্মেঘ আকাশের নিবিড় নীলিমার পটভূমিকায় কেদারনাথের অপ্রাকৃত মহিমাও তাঁর কাছে প্রকট হয়েছে। তিনি দেখছেন একটি পঞ্চস্তীবাণীর বহিরঙ্গরূপকে, একখানি ছন্দোবদ্ধ পাথরের কবিতা। মণীন্দ্রবাবুর অতি সঙ্গত প্রশ্ন—কী আছে ওই মন্দিরে যার আকর্ষণে পথে পায়ে-চলার দুঃসহ ক্লেশ হাসিমুখে সহ্য করে দেশদেশান্তর থেকে অগণিত নরনারী এখানে আসে? তার জবাব তিনি নিজেই দিয়েছেন শেষে, যখন বাবা বদরীবিশাল ফিরিয়ে দিলেন তাঁদের। রূপও নয় অপরূপও নয়, প্রতিরূপ। মানুষ যে নিজের অজানতে প্রতি পদক্ষেপে জাগ্রত বদরীনাথকে চোখ ভরে দর্শন করছে বলেই তো রূপরসশব্দগন্ধের এত প্রাণময় স্মৃতি। হ্যাঁ, তীর্থযাত্রার সুফল তো এই—যিনি বিশাল তিনিই বলতে পারেন—আমি আছি, বহুরূপে আছি, মানুষে মানুষে মিলিয়ে যে মহাদেবতা, সেও যে আমি—তার সেবা আমারই সেবা, তাই বদরীনাথের অতি নিকটে গিয়েও হল না বিগ্রহ দর্শন, কিন্তু দেবতার দর্শন মিলল ভারবাহী একটি মানুষকে কেন্দ্র করে। লেখক বলছেন, শঙ্করাচার্য বদরীনাথে দিব্যজ্ঞান লাভ করে জীবনের শেষপূজা করতে এসেছিলেন কেদারক্ষেত্রে। একালের যাত্রীরা কেদারনাথকে দর্শন করবার পর জীবনের দেবতা বদরীনারায়ণের দেউলের উদ্দেশে যাত্রা করে।

এই আখ্যায়িকায় ফুটে উঠেছে কয়েকটি পার্শ্বচরিত্র চমৎকার ভাবে। প্রথমেই আমরা পাই জিতেনকে—যার মধ্যে কঠোরে কোমলে একটা বিচিত্র বিন্যাস psychological hard core হয়ে স্পর্শকাতর মনকে মাঝে মাঝে আঘাত করছে বটে, কিন্তু তার পেছনে কাজ করছে একটা উদাসী বৈরাগী হৃদয়—যার প্রমাণ বাহাদুরের কথায়: "ছোটা বাবুজী ন মালুম কিসলিয়ে উদাস হো গিয়া"। তারপরে আছে গঙ্গোত্রী ও তার মা আর তাদের চাচাকাহিনী। শম্ভুজী ও তার কন্যাও বিচিত্র চরিত্র। শম্ভুজী কিরকম লোক, না, শাপ দিয়ে ভস্ম করে দিতে পারেন অনাচারী পাপীকে আর তার কন্যা সীতা ফুলের মত নিষ্পাপ কুমারী, তবু তার দুঃখের সীমা নেই। পনছী মহারাজ চক্রধর—আরও কত লোক ছড়িয়ে আছে কাহিনীতে।

বইটিতে সত্যিকার সাহিত্যের স্বাদ আমরা পাই শুধু একটি উপাদেয় ভ্রমণকাহিনী হিসাবে নয়, রম্যরচনা হিসাবে নয়, একটি মনোরম উপন্যাসের পটভূমিকা হিসাবে নয়, মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ হিসাবেও নয়, সব মিলিয়ে একটা উচ্চতর গ্রামের সুরও জড়িয়ে আছে সমগ্র বইটিতে।

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেক সুর : দক্ষিণারঞ্জন বসু। এভারেস্ট বুক হাউস, ৯৪ সাউথ সিঁথি রোড, কলিকাতা-৩০। তিন টাকা।

'অনেক সুর' প্রখ্যাত সাংবাদিক-সাহিত্যিক দক্ষিণারঞ্জন বসুর নূতন গল্প-সংগ্রহ। মোট সাতটি গল্প এই সংগ্রহে স্থান পেয়েছে—বুধুর মা, পটুয়া, নাগ বাসুকি, আচার্য পীঠ, পূর্ণগ্রাস, আশ্রয় এবং জনগণেশ। গল্পগুলির প্রত্যেকটিই গত দু-এক বছরের মধ্যে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে; এবং সে-সময়ে পাঠকদের প্রসংশালাভেও বঞ্চিত হয় নি। কাজেই, এ-সংগ্রহ সাহিত্যামোদীর খুশীর কারণ যোগাবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

দক্ষিণারঞ্জন বসু সেই জাতীয় লেখক, যাঁর রচনায় এম্‌ফ্যাসীস্ এবং স্টাণ্ট এ দুয়েরই অভাব আছে। এবং সেইজন্যই কোন-একটিমাত্র রচনায় তাঁর লেখক-সত্তার পরিচয়কে চিহ্নিত করতে যাওয়াটা মূর্খামি। বর্তমান সংগ্রহ সম্বন্ধেও এ-কথা সমান প্রযোজ্য বলেই আমার ধারণা। 'অনেক সুরে'র কোন একটি বা দুটি গল্পকে ভাল অথবা মন্দ বলে অন্যগুলি থেকে পৃথক করে নেওয়া যায় না—এর প্রত্যেকটিই সমান মনোযোগের দাবি রাখে। সমস্ত রচনার মধ্য দিয়ে সব মিলিয়ে লেখকের যে পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সে পরিচয় মানব-দরদীর, মানব-কল্যাণীর। বিশেষ করে বুধুর মা, পটুয়া এবং আশ্রয় গল্প সম্বন্ধে এ-কথা সুনিশ্চিতভাবেই প্রযোজ্য। জনগণেশ গল্পটির বিদ্রূপের সুর ঠিক এ-সুরের সঙ্গে খাপ খায় না। ও-গল্পটিকে লেখক বর্তমান সংগ্রহে ঠাঁই না দিলেই ভাল করতেন।

'অনেক সুরে'র প্রচ্ছদ-শিল্প আমার মনোহরণ করে নি। দ্বিতীয় সংস্করণে এটি পরিবর্তনের অনুরো[ধ] জানাচ্ছি। এ ছাড়া, ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

দেবব্রত ভৌমি[ক]

সৈনিকের প্রাণবীণা : চুনীলাল গঙ্গোপাধ্যা[য়]। যুগসাহিত্য মন্দির, ৬ বেনিয়াপুকুর লেন, কলিকাতা-১[৪]। এক টাকা।

দীর্ঘকাল পূর্বের কথা। 'শনিবারের চিঠি'তে এক ধারাবাহিক রম্য-উপন্যাস পড়ে ভাল লাগে, লেখকে[র] নাম চুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায়। চুনীবাবুর রচনা পড়ে [এ] কারণে ভাল লাগে যে, তিনি আগে বাঙালী—তারপ[র] ভারতীয়। তাঁর সার্থক ফসল 'সৈনিকের প্রাণবীণা' কাব্যে জীবনস্বপ্ন এবং মাতৃবন্দনার সুর। বাংলা বাঙালীর প্রাণরসে পরিপূর্ণ। যখন পড়ি—'নিত্যদিনে ভবানী বঙ্গভূমি, আজিকে জননী ছিন্নমস্তা তুমি'—তখ[ন] ব্যথার সঙ্গে অনুভব করি, বঙ্গদেশ আজ খালি খণ্ডিতই ন[য়] সর্বভারতীয় নেতৃবর্গের পাশাক্রীড়ার মল্লভূমি; বাঙা[লী] জাতি আজ শুধু হৃতসর্বস্ব আর শরণার্থীই নয়, সা[রা] ভারতবর্ষের সে অনুগ্রহের দাস; ঠিক এইসময়ে বাঙালী[র] মনে আত্মচেতনা উদ্রেক করার মতন রাজনৈতি[ক] এবং সাহিত্যিকের প্রয়োজন ছিল। দুঃখের কথা, আ[জ] তাঁদের কেউ বিগত, কেউবা বিভ্রান্ত। এমন সময় চুনীবা[বু] যে কঠিন কর্তব্যের পথ বেছে নিয়ে আত্মসুখ জলাঞ্জ[লি] দিয়েছেন, তার পুরস্কার হয়তো দেশবাসী আজ তাঁ[কে] দেবে না; কিন্তু নিষ্ক্রিয় যুগে বলিষ্ঠ চেতনার উদ্বোধ[নের] ইতিহাস যেদিন লিখিত হবে, সেদিন ঐতিহাসিকের [হাতে] শ্রীচুনীলাল নিশ্চয়ই সুবিচার পাবেন। তিনি যে বোধ[ের] সঙ্গে মননকে মিশিয়ে লেখনী সঞ্চালনে ব্রতী হয়েছেন, বঙ্গসমাজের পক্ষে অত্যন্তই আশার কথা।

শ্রীরণজিৎকুমার [সে]

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : ৫৬-২৮৩৬